সচিত্র মাসিক পত্র

৩৬শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৩

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

কার্ত্তিক-চৈত্র

৩৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড —১৩৪৩ সাল

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

চিত্র ... পৃষ্ঠা

চিত্র ... পৃষ্ঠা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৪৩

১ম সংখ্যা

পরিশোধ

(নাট্যগীতি)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য্য।

১

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্যামা

এখনো কেন সময় নাহি হোলো
নাম-না-জানা অতিথি,
আঘাত হানিলে না দুয়ারে
কহিলে না, দ্বার খোলো।
হাজার লোকের মাঝে
রয়েছি একেলা যে,
এসো আমার হঠাৎ আলো
পরাণ চমকি' তোলো॥
আঁধার বাঁধা আমার ঘরে
জানি না কাঁদি কাহার তরে॥
চরণ সেবার সাধনা আনো,
সকল দেবার বেদনা আনো,
নবীন প্রাণের জাগর মন্ত্র
কানে কানে বোলো॥

রাজপথে

প্রহরীগণ

রাজার আদেশ, ভাই,
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,
কোথা তারে পাই ?
যারে পাও তারে ধরো
কোনো ভয় নাই ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী

ধর ধর ঐ চোর ঐ চোর।

বজ্রসেন

নই আমি, নই নই নই চোর।
অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে।
নই আমি নই চোর।

প্রহরী

ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর।

বজ্রসেন

এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।
আমি পরদেশী
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর
নই চোর, নই আমি, নই চোর।

শ্যামা

আহা মরি মরি
মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে ল'য়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি।

সহচরী

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে ;
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে ।
আর্ত্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জ্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্ব্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে ।

প্রহরীদের প্রতি

শ্যামা

তোমাদের এ কী ভ্রান্তি,
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি
প্রহরী মরি মরি,
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে ?
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে ।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে ?

প্রহরী

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই যে ক'রেই হোক্ ।
হোক্ না সে যেই কোন লোক ;
নহিলে মোদের যাবে মান ।

শ্যামা

নির্দ্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ
দুই দিন মাগিনু সময় ।

প্রহরী

রাখিব তোমার অনুনয় ।
দুই দিন কারাগারে র'বে
তার পর যা হয় তা হবে ।

বজ্রসেন

এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক !

কেন দাও অপমান দুখ,
মোরে নিয়ে কেন
কেন এ কৌতুক।

শ্যামা

নহে নহে নহে এ কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ অলঙ্কার
সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

বজ্রসেন

কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমির রাত্রি ভেদি'
দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে,
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্ম্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনা হাসি॥

—০—

২

কারাঘর

(শ্যামার প্রবেশ)

বজ্রসেন

এ কী আনন্দ
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হোলো যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ।
এলে কারাগারে
রজনীর পারে ঊষা সম,
মুক্তিরূপা অয়ি, লক্ষ্মী দয়াময়ী।

শ্যামা

বোলো না বোলো না আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।

পরিশোধ

এ কারা-প্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।
আমি দয়াময়ী,
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।

বজ্রসেন

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে।
জেনো প্রিয়ে
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে।

শ্যামা

হে বিদেশী এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী
জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না
পাল তুলে দাও দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল
হৃদয় দুলিল দুলিল দুলিল
পাগল হে নাবিক
ভুলাও দিগ্‌বিদিক
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

শ্যামা

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥

স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ॥
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে ॥

৩

বজ্রসেন ও শ্যামা

(তরণীতে)

শ্যামা

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা মরি গো মরি ॥
ফুল ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি ॥
জল উঠেছে ছলছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে,
মরমরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে,
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি ॥

বজ্রসেন

কহ কহ মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

শ্যামা

নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

ঐ রে তরী দিল খুলে।

তোর বোঝা কে নেবে তুলে॥

সামনে যখন যাবি ওরে,

থাক্ না পিছন পিছে প'ড়ে,

পিঠে তারে বইতে গেলে

একলা প'ড়ে রইবি কূলে॥

ঘরের বোঝা টেনে টেনে

পারের ঘাটে রাখলি এনে

তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হোলো গেলি ভুলে।

ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্,

বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,

জীবনখানি উজাড় ক'রে

সঁপে দে তার চরণমূলে॥

বজ্রসেন

কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত

কহ বিবরিয়া,

জানি যদি প্রিয়ে

শোধ দিব এ জীবন দিয়ে

এই মোর পণ॥

শ্যামা

নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

তোমা লাগি যা করেছি

কঠিন সে কাজ

আরো সুকঠিন আজ

তোমারে সে কথা

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,

ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।

মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ

নিজ 'পরে ল'য়ে সঁপেছে আপন প্রাণ।

এ জীবনে মম ওগো সর্ব্বোত্তম
সর্ব্বাধিক মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া ॥

বজ্রসেন

কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষ নীড় বজ্র আঘাতে।
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু আঁধারে ॥

শ্যামা

ক্ষমা করো নাথ ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন

এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্ নিঃশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী!

শ্যামা

তোমার কাছে দোষ করি নাই
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;
তিনি করিবেন রোষ
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া
স'বে না স'বে না স'বে না ॥

বজ্রসেন

তবু ছাড়িবি নে মোরে।

শ্যামা

ছাড়িব না ছাড়িব না!
তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করো মর্ম্মাঘাত।
ছাড়িব না।
(শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা)
(নেপথ্যে)
হায়, এ কি সমাপন!
অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো, হারালো,
কলঙ্কে অসম্মানে॥

৪

পথিক রমণী

সব কিছু কেন নিল না, নিল না
নিল না ভালোবাসা।
আপনাতে কেন মিটাল না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে
ভালো আর মন্দেরে?
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দে রে॥
(প্রস্থান)

বজ্রসেন

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা—
পাপীজন-শরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমো হে মম দীনতা।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে প্রেমেরে আমি হেনেছি
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি,
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে-অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা.
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণ-লোক হ'তে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন,
নীরস মম ভুবন
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে॥

(নূপুর কুড়াইয়া লইয়া)

হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর।
তোর ঝঙ্কারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর॥

(শ্যামার প্রবেশ)

শ্যামা

এসেছি প্রিয়তম।
ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরাণ মম
তব নিঠুর করুণ করে।

বজ্রসেন

কেন এলি, কেন এলি কেন এলি ফিরে—
যাও যাও চলে যাও।

(শ্যামার প্রণাম ও প্রস্থান)

বজ্রসেন

ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ,
কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন
এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্ঝটিকা,
দীর্ণ করিবি না কি রে।
অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে
নিদারুণ বিষ,
লোভ না রাখিস্
প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে॥

পরিশোধ

কার্ত্তিক

নির্ম্মম বিচ্ছেদ সাধনায়
পাপ ক্ষালন হোক,
না করো মিথ্যা শোক,
দুঃখের তপস্বী রে,
স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন,
আয় বাহিরে
আয় বাহিরে ॥

(নেপথ্যে)

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তর বিদ্রোহে ॥
যাক্ পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক্ মিলায়ে কামনা কুয়াশা।
স্বপ্ন আবেশবিহীন পথে
যাও বাঁধন-হারা,
তাপ-বিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে ॥

আশ্বিন, ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

—দোহাই তোমার। নইলে লেপ চাপা প'ড়ে দম আটকে ওর নীচে ঠিক ম'রে থাকব।—

বরদা এসে কৈফিয়তের ভাবে বললেন—চুরুট পেলাম, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার পর শীত-শীত করতে লাগল, তাই জামা-টামা এঁটে এলাম। একটু দেরি হয়ে গেছে,—ভয় কচ্ছিল না ত?

উমা তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল—নাঃ—ভয় কিসের? আপনি শুয়ে পড়ুন গে বাবা, আমার ভয় করে না।

বরদা কথা কানে তুললেন না, নিশ্চিন্তে চৌকির উপর বসলেন। উমা গুটিসুটি হয়ে খাটে বসেছে। বরদা বললেন—হাঁ মা, লেপটা গায়ে তুলে ব'সো। পাশ-বালিশের উপর চাপিয়ে রেখেছ কেন?

উমা বলল—বড্ড গরম।

—বল কি? একগাদা গায়ে চাপিয়েও আমার শীত যাচ্ছে না—আর তোমার গরম? তার পর তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য ক'রে বললেন—উঁহু, ঐ যে কাঁপছ। শীত লাগছে বুঝতে পারছ না।

বরদা উঠবার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই তড়িঘেগে উমা এসে তাঁর কাছে মেজের উপর ব'সে পড়ল। যে বাস্তবাগীশ মানুষ—কিছু বিশ্বাস নেই—হয়ত নিজেই লেপ তুলতে যাবেন। উমা বলল—শীত নয়ত, বাবা। ভয়-ভয় করছে তারই কাঁপুনি। চোখ বুজলেই দেখছি, সেই বেরাল—বাঘের মত বড় বড় চোখ। আমি আর শোব না, আপনার সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করব।···আচ্ছা, আজকে কাছারীতে কি মামলা ক'রে এলেন, সেকথা ত বললেন না কিছু।

এ কৌশল কেবল উমা নয়, পাড়ার ছোট ছেলেটা অবধি জানে। মামলার গল্প বরদাকান্তকে একবার ধরিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। বরদা আরম্ভ করলেন—সে কি বলবার মত কিছু? বাজে একটা চুরির কেস—আমি এক রকম উপযাচক হয়ে বিনি-পয়সায় আসামীর তরফে দাঁড়ালাম। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—আইনে যা-ই থাক, আমি বলব এ কিছুতে অন্যায় নয়। রসগোল্লার হাঁড়ি ছিল কাচের আলমারীতে; দোকানে কেউ ছিল না—লোকটা তিন দিন খেতে পায় নি, কাচ ভেঙে একটা মিষ্টি গালে দিতে যাচ্ছে, অমনি তাকে ধ'রে পুলিসে চালান দিল—

উমা বলল—যা-ই হোক, চুরি ত বটে—

বরদা বলতে লাগলেন—হোক চুরি। পেটে আগুন জ্বলছে, সামনে খাবার সাজানো,—বলি, মুনি-ঋষি ত কেউ নয়। আমি তাই হাকিমকে বললাম, আমি হ'লে—

উমা প্রশ্ন করল—আপনি হ'লে কি করতেন, বাবা?

বরদা বললেন—আমি হ'লে পুলিস না-ডেকে রসগোল্লার হাঁড়ি তার হাতে তুলে দিতাম। আহা বেচারা, যত খুশী খেয়ে নিক। দোকানদার বেটাদের দয়ামায়া নেই—

উমা মৃদু হেসে বলল—আপনার মত হ'ত যদি সবাই—

লেপের নীচে অনন্তশয্যা থেকে নীলাদ্রির ইচ্ছা করতে লাগল, বেরিয়ে এসে উমার মুখ চেপে ধরে এবং বাবার মুখের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে—আজ্ঞে না—আপনিও কম নন। আপনি হ'লে চোরকে জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে দিতেন—

গল্পে বাধা পড়ে গেল। সৌদামিনী এলেন। পিছনে চাকরের হাতে হারিকেন।

বরদা হেসে বললেন—ও গিন্নি, পুণ্যির বোঝা বয়ে আনতে পারলে? না—হারানচন্দোর আছে বুঝি সঙ্গে! গান শেষ হয়েছে?

সৌদামিনী বললেন—কেন, আমার জন্যে কি কাজ আটকে আছে, শুনি?

—কি কাজ? উমাকে দেখিয়ে বরদা বলতে লাগলেন—এই যে বউমা, পরের বাড়ীর এক ফোঁটা মেয়ে, একা একা প'ড়ে আছেন—কে পাহারা দেয়?

সৌদামিনী হাসিমুখে একবার উমার দিকে চাইলেন। বরদার কাছে স'রে এসে নীচু গলায় বললেন—তোমার ব্যবস্থা ভাল। বউ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, পাহারা দেবে পাড়ার লোকে?

বরদা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললেন—ছেলের বয়ে গেছে। তার বলে এগ্‌জামিন···কত পড়াশুনো। সে আমার ছেলে—অকর্মা আড্ডাবাজ ত নয়?

সৌদামিনী হেসে ফেললেন।—ছেলে না পারে, বাপে ত পাহারা দিচ্ছে। সে-ই বেশ।···তুমি এখন যাও দিকি। নীলুর উপরে আসবার এখনও দেরি আছে, ততক্ষণ আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই—

বরদা চলে গেলে বিছানার দিকে সৌদামিনীর নজর পড়ল। আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—এ কি বউমা, এ ঠিক হারানের কাণ্ড! দিগ্‌গজ এক বালিশ এনে খাট জুড়ে রেখেছে—শুবি কোথায়?

উমা তাড়াতাড়ি বলল—শুয়েই ত ছিলাম। পাশ-বালিশে শোওয়া আমার অভ্যাস। কিছু অসুবিধে হবে না—

সৌদামিনী শুনলেন না।—না, হবে না বইকি? আর একটা ছোট পাশ-বালিশ দেব এখন···দাঁড়া, এটা আলমারির মাথায় তুলে দিই—

বলতে বলতে দেখা গেল, পাশ-বালিশ স্বয়ংই উঠে দাঁড়িয়েছে। সৌদামিনী অবাক হয়ে বললেন—নীলু!

নীলাদ্রির চোখে জল আসবার মত। কিন্তু সে-জল এক মুহূর্ত্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল; সে বজ্রাহতের মত দাঁড়াল। হায় রে, বিপদের কি শেষ নেই! বরদা চুরুটের কৌটা ফেলে গিয়েছিলেন, সেটা নিতে মন্থর পায়ে আবার এসে ঢুকলেন। ছেলেকে দেখে দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে এল। বললেন—এরই মধ্যে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে এলে? ক'টা বেজেছে?

নীলাদ্রি জড়িত কণ্ঠে বলল—বারোটা—

—কক্ষণো নয়। এগারটা সাত—তার সিকি মিনিট বেশী নয়। পড়তে গেলেই ঘড়ি তোমার ঘোড়ার মত ছুটতে থাকে। যাও—নীচে যাও—

সৌদামিনী বাধা দিয়ে উঠলেন—না, নীচে নয়। নীচে বড্ড মশা—শেষে ম্যালেরিয়ায় ধরুক। পড়তে হয়, এখানে বসেই পড়ুক—

বরদা বললেন—কোথায় মশা? ছেলেকে ননীর পুতুল করতে চাও যে। আমরা কাজকর্ম্ম ক'রে থাকি,—মশাটশা ত দেখি নে—

মায়ের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে এক পলক তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল—রাত্তেই উপদ্রবটা বেশী হয় কি না—

বরদা বললেন—তা হ'লে আমার ঘরে ব'সে পড় গে। বারোটা বাজতে এখনও বাহান্ন-তিপান্ন মিনিট। চিটিং-এর চ্যাপ্টার আজ শেষ করতেই হবে। কোনখানে আটকে গেলে আমি বুঝিয়ে দেব। সে ভালই হবে—নয়?

বরদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। নীলাদ্রি মাথা নেড়ে কাতর কণ্ঠে সায় দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—

সৌদামিনী রুখে উঠলেন—আমার হবে না। ও আলো জেলে ব'সে ব'সে সমস্ত রাত পড়বে, আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না—

বরদা বললেন—তুমি এখানে ঘুমোও। পড়া হয়ে গেলে তার পর যেও। রোজই হচ্ছে, আজ নতুন মানুষ হয়ে গেলে নাকি!

সৌদামিনী জেদ ধ'রে বসলেন—রোজ হচ্ছে ব'লে আজ হবে না। শরীর আমার ভেঙে পড়ছে। আবার যে এক-ঘুমের পর ছুটোছুটি করব, সে পেরে উঠব না; তাতে তোমার ছেলের পড়া হোক আর না-ই হোক—

—মুস্কিল! কি করা যায়! বরদা চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন।—তা হ'লে বউমাকেও নিয়ে চল। নীলে এখানে পড়ুক। বারোটা বাজলে উনি আসবেন—

সৌদামিনীর তাতেও আপত্তি।—না, বউমা যাবে না। তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা রয়েছে, বৌমা গেলে হবে না।

অতঃপর বরদার আর ধৈর্য্য থাকল না। রাগ ক'রে বললেন—হবে না ত কি হবে? পরের মেয়েকে সত্যি সত্যি ত একটা ঘরে একলা ফেলে রাখা যায় না—

সৌদামিনী প্রস্তাব করলেন—নীলুকে বল, সে যদি—

—সে কি ক'রে হবে? ওর এগ্‌জামিন। বলতে বলতে সৌদামিনীর 'পরে একটু করুণাও হ'ল। অবোধ মেয়ে-লোক—বোঝে না এগ্‌জামিন কি—এবং পেনাল-কোড কি বস্তু!—ঘাড় নেড়ে বরদা বললেন—সে আমি কিছুতে পারব না। এগ্‌জামিন সামনে, ওকে আমি বলব কোন্ হিসেবে? একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে ত?

অত্যচ্ছ তরল কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন—আছে নাকি? যাক, দুর্ভাবনা ঘুচল। তিনিই তখন ছেলেকে ডেকে বললেন—নীলু, বাবা, তুই আজকের রাতটা এখানে ব'সে পড়।

বউমা একটা কথাও বলবেন না, খাটে ঘুমিয়ে থাকবেন। অসুবিধে হবে ?

ছেলে খুব মাতৃভক্ত বলতে হবে। ঘাড় নেড়ে তখনই রাজী। বরদা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বুঝেসুজে ঠিক ক'রে বলছ ?

নীলাদ্রি বলল—আজ্ঞে, কোন অসুবিধা হবে না—

—হবে না, কি ক'রে বল ? এখন নেই, পরেও ত হ'তে পারে ? তুমি কি দৈবজ্ঞ হয়ে বসেছ ? বরদার ধারণা, নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় ছেলে মায়ের কথা ঠেলতে পারছে না। যেতে যেতে আবার মুখ ফিরিয়ে উপদেশ দিলেন—চেঁচিয়ে পড় ; চেঁচিয়ে পড়লে খুব মনঃসংযোগ হয়। আমি ও-ঘর থেকে শুনব। চিটিং আজ রপ্ত ক'রে ফেলতেই হবে। কাল আমি ওর থেকে জিজ্ঞাসা করব---

ওঁরা চলে যেতেই নীলাদ্রি দরজায় খিল এঁটে বাঁচল। উমা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়ে আবার চোখ বুজেছে।

—উমারাণী ?

—উঁ—

নীলাদ্রি বিছানার ধারে এসে অনুনয় আরম্ভ করল—লক্ষীটি, চোখ মেল। দেখ, কি চমৎকার রাত ! একটি বার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—

উমাও বলল—চমৎকার !

—কি ?

—আজকের রাত—

—তোমার মুখ ত এদিকে ; এদিকের দরজা জানালা বন্ধ—

উমা চোখ মেলে স্বামীর একাগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বলল—রাত্তির বেলা বন্ধ ঘরই ত খাসা—

—ঘুমোবার মজা হয়—না ?

উমা বলল—আচ্ছা, ঘুমের 'পরে তোমার অত রাগ কেন, বল ত ? নিজের ঘুমোবার জো নেই—বই মুখস্থ করতে হয়—অন্যের ঘুম দেখলে তাই হিংসা হয়—না ?

নীলাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলল—এমন রাত্রে ঘুমনো অপরাধ—

চপলকণ্ঠে উমা বলল—তোমার পেনাল-কোডে এ-সব লেখা রয়েছে বুঝি ?

—হ্যাঁ---এবং ঘুমলে কি শাস্তি তা-ও রয়েছে। শুনবে ?

উমা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—রক্ষে কর, মশাই। এখন নয়—কাল বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁকেই শুনিয়ে দিও—

দরজায় করাঘাত। বাইরে থেকে বরদা ডাকছেন··· নীলে, নীলে—

প্রদীপ উস্কে নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে যা মনে এল চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল। সর্ব্বনাশ, গোলমালের মধ্যে পেনাল-কোড ত উপরে আনাই হয় নি—আইনের কোন বই-ই নেই—খুঁজতে খুঁজতে কুলুঙ্গির কোণে মিলল, মায়ের আধছেঁড়া মহাভারতখানা। সেইটা সামনে নিয়ে সে প্রাণপণ চীৎকারে আইনের ধারা মুখস্থ ক'রে চলল।

আরও বিস্তর ডাকাডাকির পর মনোযোগী ছাত্র দরজা খুলে দিল। বরদার প্রসন্ন মুখ, ছেলের পাঠ অভ্যাস বাইরে থেকে কিছু কিছু তাঁর কানে গিয়েছে নিশ্চয়। তিনি সোজা উমার খাটের কাছে গিয়ে ডাকলেন—অ বউমা, বউমা, ঘুমুচ্ছ ত ?—দেখতে এলাম।

ঘুমন্ত লোকে কথা বলে না ; অতএব উমার জবাব পাওয়া গেল না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বরদা ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—ষাঁড়ের মত ত চেঁচাচ্ছ। শুয়ে-শুয়ে তাই মনে হ'ল, মা-লক্ষ্মীর ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে না ত ?

নীলাদ্রি বলল—তবে মনে মনেই পড়ি—

বরদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না—তাতে কাজ নেই—আগাগোড়া মুখস্থের ব্যাপার, ও কি মনে মনে পড়ার কাজ ? বিশেষ, যখন কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না···কিন্তু সাবধান, সাবধান ! পরের মেয়ে এসেছেন, গিয়ে নিন্দে-মন্দ না করেন। ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সেটা দেখবে।

নীলাদ্রি বলল—তা দেখছি বইকি। ঐ ত—খুব অসাড় হয়েই ঘুমুচ্ছে—

—তোমার যা কাণ্ডজ্ঞান, তোমার উপর আমি ভরসা করি কি না ! আবার এসে আমি খবর নিয়ে যাব—

মনের বিরক্তি গোপন ক'রে সহজ সুরে নীলাদ্রি বলল—শীতের দিনে বার-বার কষ্ট ক'রে আসবার দরকার কি, বাবা ?

বাপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—কষ্ট হয়, আমার হবে। তোমার তাতে ক্ষতিটা কি শুনি ? পরের মেয়ে এসেছে, আমার নিজের মেয়ে নেই—তাকে একটু যত্নআত্তি করব, তাতে তোমার হিংসে হয় বুঝি ?

তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের ভাবে নীলাদ্রি বলল—মানে, বার-বার দুয়োর খোলা—পড়ায় মনঃসংযোগের একটু ক্ষতি হয় কি না—

এতক্ষণে বরদার নজর পড়ল, দালানের দিক্‌কার জানলাগুলোও বন্ধ। বললেন—সমস্ত এঁটে দিয়ে অন্ধকূপ ক'রে রেখেছ। তাই ঘর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি না। তোমার বার-বার দুয়োর খুলতে হবে না বাপু, জানলা খুলে রাখ—আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে যাব—

উমা নির্ব্বিকার নিরীহ মানুষটির মত প'ড়ে আছে ; এবং সে যে ঘুমোয় নি, কোন দিক্ থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না। নীলাদ্রির কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হ'ল, চাপা হাসির প্রবাহে ওষ্ঠ তার একটু একটু নড়ছে এবং চোখজুটো মিটমিট করছে। অথচ এর প্রতিকার নেই। সূচ পড়বার শব্দও খোলা জানলার পথে বাবার শব্দভেদী কানে গিয়ে পৌঁছবে, এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে জানলায় উদয় হয়ে তিনি প্রশ্ন করবেন—চিটিং শেষ হ'ল ?

নীচের ঘর থেকে সে পেনাল-কোডখানা নিয়ে এল। উমার শিয়রের দিকে খানিকটা দূরে টেবিল টেনে আনল। তার পর যথাসম্ভব উমার কর্ণবিবর লক্ষ্য ক'রে আকাশভেদী কণ্ঠে পড়া সুরু করল। ঘুমের ঘোরে উমা পাশ ফিরল, পড়া আরও তীব্র হ'ল ; ঘুমের ঘোরেই বোধ করি সজোর হাতখানা কানের উপর চাপা দিয়ে এসে পড়ল, বিপুলতর উৎসাহে নীলাদ্রি আরও গলা চড়িয়ে দিল।

জানলার ওদিকে এসে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—নীলু, কি আরম্ভ করেছিস ? বাড়িসুদ্ধ কাউকে ঘুমুতে দিবি নে ?

নীলাদ্রি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলল—বাবা যে বললেন—

—ওঁর কি, একটা কিছু বললেই হ'ল ! মা-লক্ষ্মীর জন্য এদিকে দরদ উথলে ওঠে,—আরে, এ পড়ায় যে মরামানুষ ডাক ছেড়ে জেগে ওঠে—

বরদাও সঙ্গে এসেছিলেন। বিরক্ত ভাবে তিনি বললেন—আবার ওর এগ্‌জামিন, সেটা দেখতে হবে ত ?—তা নীলে, বরঞ্চ যত পড়েছ এখন মনে মনেই আবৃত্তি কর। চিটিং-এর কত দূর ?

নীলাদ্রি বলল—আজ্ঞে, রপ্ত হয়ে গেছে—

সৌদামিনী বললেন—আবার জানলা খুলে দিয়েছিস কেন রে, নীলে ? চোখে আলো গিয়ে লাগছে ; ঘুম হচ্ছে না।

নীলাদ্রি বলল—বাবা যে বললেন—

বরদা সদয় হয়ে বললেন—তা নীলে, এখন বরং জানলা বন্ধ করেই পড়। ওর যখন ঘুম হচ্ছে না—ওর শরীরটে আজ ভাল নেই—

সশব্দে জানলা বন্ধ হতেই বরদা মনের আনন্দ আর গোপন রাখতে পারলেন না। হেসে হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—দেখছ গিন্নি, একবার ফেল হয়ে তোমার ছেলের কি রকম পড়াশুনোয় চাড় হয়েছে ! বারোটা কখন বেজে গেছে, পড়াতে পড়তে তা হুঁশই নেই। আমি আবার ওদিকে চুরি ক'রে ঘড়ির কাঁটা পনর মিনিট পেছিয়ে রেখেছিলাম। নীলে এবার ঠিক পাস হয়ে যাবে—

সংস্কৃতসাহিত্যের পাখী ও তাহার নামতালিকা

শ্রীসত্যচরণ লাহা

১

আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যে পাখীর এমন ভূরি ভূরি নাম পাওয়া যায়, অনেক সময় তাহাদের অল্পবিস্তর পরিচয়ও লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, শুধু যে সাহিত্যের উপাখ্যানগুলির মধ্যে বর্ণিত নায়কনায়িকার সঙ্গে তাহাদের কাহিনী ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকিলেও কবিকল্পনাহিসাবে লিপি-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ সেই পরিচয় বাস্তব হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন গণ্য করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই, পক্ষি-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এ-সম্বন্ধে কালিদাসসাহিত্যে প্রকৃতি-বিশ্লেষণতত্ত্ব লইয়া গবেষণায় পূর্ব্বে আমি দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি – এই সমস্ত পাখীর নাম ও তৎসম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় বিপুল সংস্কৃতসাহিত্যের স্তরে স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে গ্রথিত হইয়া আছে, তাহাদের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে ও স্বরূপনির্ণয়ে আমরা একেবারে উদাসীন, তাই তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত অধিক। আমাদের শাশ্বত ধর্ম্মগ্রন্থে, বেদে, পুরাণে, নীতিশাস্ত্রে, কাব্যনাটকে, বৈদ্যক, জ্যোতিষ ও কোষগ্রন্থমধ্যে প্রচুর পাখীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত পরিচয়ের খণ্ডাংশগুলি একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক আলোকপাতে তাহাদের সারবত্তানির্ণয়ের চেষ্টা কখনই অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। পরন্তু প্রতীচ্যে, এমন কি প্রাচ্যে, সারা সভ্য জগৎ জুড়িয়া বিজ্ঞানের যে গবেষণা ও আন্দোলন চলিতেছে ভারতবর্ষের প্রাক্তন শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা হইতে তাহার সহযোগী কোন উপকরণ শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানোন্নতিকল্পে যোগাইতে পারা যাইবে না? পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসার উপাদান-হিসাবে মনে হয় আমাদের সংস্কৃতসাহিত্য মন্থন করিয়া এইরূপ পাখীর নামতালিকা ও পরিচয় সংগ্রহের প্রয়াস পাইবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত।

আয়াসসাধ্য এই কার্য্য সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া এইরূপ সংগ্রহপ্রচেষ্টার ফলে আমি যতটুকু কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহাতে যে তালিকাগঠনের সুবিধা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাটি সজ্জিত করা যাইতেছে আপাততঃ ইহা প্রাথমিক বা provisional হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। তালিকার নামগুলি সম্বন্ধে অনেক স্থলেই স্পষ্ট ধারণা আমাদের সহজ হয় না; প্রামাণ্য কোষগুলিতে এই সমস্ত নামের উল্লেখ প্রায় নাই, কখন কখনও হয়ত মাত্র একটি কোষগ্রন্থেই কোন পাখীর নাম দেখা যায়, অন্যত্র নহে, তাহাতে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠে এবং পাখীর সংস্কৃত নামগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়া পক্ষিবিজ্ঞানের দিক্ হইতে তাহাদের স্বরূপনির্ণয় বিষয়ে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এই সকল জটিল ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিতে গেলে বিষম ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা, তাই পুনর্বিচার ও দীর্ঘ আলোচনার অবকাশসাপেক্ষে আমি মন্তব্যপ্রকাশে বিরত রহিলাম। তালিকাভুক্ত নামগুলির মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও সন্দেহের নিরাকরণ হইয়া স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা গিয়াছে তাহাদের যথাযথ পরিচয়হিসাবে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নামগুলি লিপিবদ্ধ করিতে কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

অকিঞ্চন—ময়ূর।

অগৌকা—পাখীর সাধারণ সংজ্ঞা। এই অর্থে "নগৌকা" শব্দও ব্যবহৃত হয়। অমরকোষে পাখীর ২৭টি সাধারণ সংজ্ঞার অন্যতম বলিয়া ইহার নির্দ্দেশ আছে।

বৃক্ষ বা পর্ব্বতবাসে অভ্যস্ত পাখী।

বিশেষার্থদ্যোতক হিসাবে বৃক্ষশাখাশ্রয়ী দণ্ডবাসনিপুণ পক্ষী; পক্ষিবিজ্ঞানে এরূপ একান্ত বৃক্ষবাসে অভ্যস্ত পাখীর বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত এবং তজ্জন্য একটি স্বতন্ত্র বর্গভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়; Passeres অথবা Perching bird আখ্যায় তাহারা অভিহিত। পদ ও পদাঙ্গুলির গঠনবৈচিত্র্যে

বৃক্ষশাখা সহজে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলাফেরার যে সুবিধা আছে তাহাতে ভূচর অথবা জলচারী বিহঙ্গ হইতে তাহাদের প্রভেদ প্রধানতঃ সূচিত হয়,—পায়ের এই বৈশিষ্ট্যকে passerine লক্ষণ বলে। পায়ের চারিটি অঙ্গুলির মধ্যে তিনটি পুরোভাগে এবং একটি পশ্চাতে এমনভাবে বিন্যস্ত যে সামনের অঙ্গুলিত্রয় পশ্চাদ্দিকে গুল্‌ফনিম্নে বাঁকাইয়া সমান্তরালভাবে এবং পশ্চাদঙ্গুলিটি পুরোভাগে হেলাইয়া
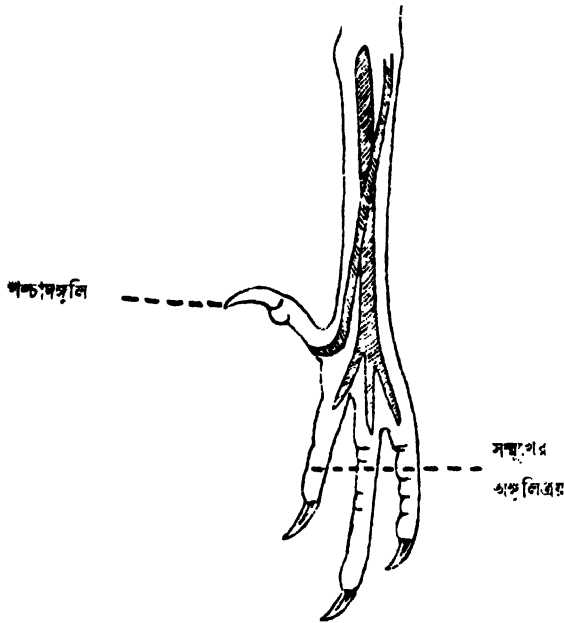
দৃঢ়রূপে ডালপালা আঁকড়াইয়া ধরা সহজ হয়। পায়ের প্রধান মাংসপেশীদ্বয়ের একটি ত্রিধাবিভক্ত হইয়া সম্মুখের তিনটি অঙ্গুলিতে এবং অপর পেশীটি সোজাসুজি পশ্চাদঙ্গুলিতে এমনভাবে মিশিয়াছে যে তাহাতে সামনের ও পশ্চাতের অঙ্গুলিগুলির বিপরীত মুখে সন্নিবেশ সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

অগ্নিচূড়—কুক্কুট, বনকুক্কুট। ইহার যে চূড়া বা শিখা দেখা যায় তাহা অবশ্য পুংপক্ষীটার মাত্র, তজ্জন্য 'শিখণ্ডিক' এমন কি 'শিখী' নামও অন্যান্য নামের সঙ্গে পাওয়া যায়। এই শিখা অনাবৃত মাংসপিণ্ডবিশেষ, তাহাতে কোন লোমশ বা পতত্রের আচ্ছাদন নাই; শিখার বর্ণ অগ্নির ন্যায় বলিলে বিশেষ দোষ দেখা যায় না, যেহেতু বনকুক্কুটের comb বা চূড়ার বর্ণ পক্ষিতত্ত্বের দিক্‌ হইতে বিবৃত হইয়াছে—brick red to scarlet red। এই পরিচয় হইতে 'অগ্নিচূড়' 'তাম্রচূড়' 'স্বর্ণচূড়' প্রভৃতি আখ্যাগুলির সার্থকতা কতকটা উপলব্ধি হয়।

অগ্নিসহায়—কপোত, বনকপোত, ঘুঘু।

রাজনিঘণ্টুতে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ও কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায়,—

স্যাৎ কপোতঃ কোকদেবো ধূসরো ধূম্রলোচনঃ।
দহনোঽগ্নিসহায়শ্চ ভীষণো গৃহনাশনঃ॥

সহজে প্রতীয়মান হয় যে এই পাখী অশুভসূচী। ঘুঘু সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে, পারাবত সম্বন্ধে কিন্তু নয়, বরং পারাবতের যে "ঘরপ্রিয়" আখ্যা দেখা যায় তাহা হইতে "গৃহনাশনের" বিপরীত ভাব ব্যক্ত হয়।

'বন্যপারাবত,' 'wild pigeon' (কোন কোন অভিধানে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে) ইত্যাদি পরিচয় এই কারণেই গ্রহণ করা চলে না।

কপোত শুধু পারাবতকে বুঝায় না, বিহগান্তর অর্থাৎ ঘুঘুকেও নির্দ্দেশ করে;—পারাবতঃ কপোতঃ স্যাৎ কপোতো বিহগান্তরে" ইতি বিশ্বঃ।

'অগ্নিসখ' শব্দ 'ধূম্রবর্ণ পারাবত' অর্থে 'বিশ্বকোষে' পাওয়া যায়। এই শব্দ 'অগ্নিসহায়ে'র সমার্থবাচক বলা যাইতে পারে, তাহাতে 'ধূম্রবর্ণ পারাবত' অর্থ করিলে অসমীচীন বিবেচিত হয়।

অগ্রজ—কাকবিশেষ; ভাসপক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অঙ্গারক—"বিহগান্তর" (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ), পক্ষিবিশেষ।

অঙ্গারচূড়ক—প্রতুদ পক্ষীদিগের অন্যতম। চরকের টীকাকার গঙ্গাধর ইহাকে বুলবুল বলিয়াছেন।

অজির—তিত্তির (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অজু—বৈজয়ন্তীতে পাখীর ৪০টি সাধারণ সংজ্ঞার অন্যতম বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে।

অজুবাক—পক্ষী (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

অজুষ—পক্ষিসাধারণ (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

অচলত্বিট্‌—কোকিল।

অজয়—হংস।

অঞ্জল—কোকিল (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অটি বৈদ্যকশব্দসিন্ধু গ্রন্থে এই শব্দ দেখা যায় এবং ইহার অর্থ লিখিত হইয়াছে—"শরারিপক্ষিণি। হলা.।" প্রকৃতপক্ষে হলায়ুধে 'অটি' শব্দ পাওয়া যায়, 'আটি' নহে। বিশ্বকোষেও এইরূপ ভুল উক্তি করা হইয়াছে।

অণ্ডজ—পক্ষিসাধারণ।

অণ্ডপ টিট্টিভ। বৈজ্ঞানিক নাম *Lobivanellus indicus* (Boddaert)। বোধ করি পাখীটার প্রসূত ডিম্বের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ এই নামকরণ হইয়াছে। মৎপ্রণীত "জলচারী" গ্রন্থ (১৯৩৫) হইতে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় (৫৩-৫৪ পৃ.) উদ্ধৃত হইল,—

"ভূমিতলে সযত্নরক্ষিত ডিম্বগুলির নিকটে কাহাকেও আসিতে দেখিলে সে (টিট্টিভ) চঞ্চল হইয়া উঠে; ছলে কৌশলে আগন্তুককে সেখান হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য সে বিচিত্র ভঙ্গীতে কখনও উড়িতে থাকে, কখনও বা ভূমিতে অবতরণ করিয়া কণ্ঠস্বরে ও গতি-ভঙ্গীতে পথিককে প্রলুব্ধ করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। পঞ্চতন্ত্রের টিট্টিভী যখন ডিম্ব প্রসব করে নাই, তখনই তাহার দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে কেমন করিয়া অণ্ডগুলিকে সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্রের কবল হইতে রক্ষা করা যায়। সাগরতরঙ্গে ডিম্ব যখন ভাসিয়া গেল, তখন দেবতার শরণাপন্ন হইয়া তাহার উদ্ধারসাধন করা হইল। গল্পের কথা হইলেও বোধ করি ইহার মধ্যে টিট্টিভদিগের একটি বিচিত্র রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"

অতায়ী—গৃহ্যসূত্রের কৃষ্ণমিশ্রকৃত ভাষ্যে এই শব্দ দেখা যায়—অর্থ দেওয়া আছে 'চিল্ল'। বাস্তবিক কিন্তু 'আতায়ী' শব্দের প্রয়োগ এই অর্থে প্রসিদ্ধ।

অতিচর—পক্ষিভেদ (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অতিজাগর—নীলক্রৌঞ্চ; রাজনিঘণ্টুতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়—"নীলক্রৌঞ্চস্তু নীলাঙ্গো দীর্ঘগ্রীবোঽতিজাগরঃ"। এই পরিচয় হইতে দীর্ঘ গ্রীবা এবং দেহের নীলবর্ণ ইহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। 'অতিজাগর' বকের সাধারণ লক্ষণ মাত্র, সকল বকই প্রায় সন্ধ্যায় এবং অতি প্রত্যূষে দিবালোকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে জাগরূক থাকিয়া আহার্য্য সন্ধান করে।

গৌড় দেশের 'কোঁচ বক' বলিয়া রাজনিঘণ্টুর টীকায় ইহার পরিচয় দেওয়া আছে; কিন্তু এই অত্যন্ত সাধারণ বকের বর্ণ নীল নয়, গলদেশও বিশেষরূপে দীর্ঘ এরূপ বলা চলে না। বিশ্বকোষে এই 'অতিজাগর' বিহঙ্গকে 'কোয়া বক' বলা হইয়াছে। 'কোয়া বক' কিন্তু 'ওয়াক বকে'র নামান্তর মাত্র, এবং যদিও ইহার দেহের অল্পবিস্তর ধূসরতা নীলাভ প্রতীয়মান হয়, তথাপি এই বিহঙ্গ অন্যান্য বকের তুলনায় 'দীর্ঘগ্রীব' আদৌ নয়। 'কুঁড়ো বকে'র সঙ্গেও এই কারণে 'নীলক্রৌঞ্চে'র সাম্যনিরূপণ হয় না, যদিও ইহার আকৃতি অত থ্যাবড়া নয় এবং ইহার দেহবর্ণের ভাস্বর হরিৎ আভার মধ্যে কিঞ্চিৎ নীল-ধূসরের সমন্বয় অন্তর্নিহিত।

বকবংশের মধ্যে দীর্ঘ গ্রীবা Ardea-গণভুক্ত বকদিগের বৈশিষ্ট্য,—সাধারণতঃ এই বকেরা 'কঙ্ক' বা 'কাক' নামে পরিচিত। যে কাকের বৈজ্ঞানিক অভিধা *Ardea cinerea* Linn. সাধারণ ইংরেজের নিকট সে Blue Heron অথবা Grey Heron নামে খ্যাত। ভস্মবর্ণ ইহার দেহাংশ-বিশেষে প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। 'অতিজাগর নীলক্রৌঞ্চে'র সঙ্গে ইহার স্বরূপনির্ণয়ে বোধ করি বাধা হয় না।

মনিয়র উইলিয়মসের অভিধানে ইহার Black Curlew বলিয়া যে উল্লেখ আছে তাহা আপত্তিজনক বিবেচনা করি; প্রথমতঃ দেহের বর্ণসম্বন্ধে যাহা নীল বা নীলাভ তাহা কখনই কালো হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ক্রৌঞ্চ বা বকবিশেষকে Curlew বলিলে পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে বিষম ভুল করা হয়।

অত্যূহ—দাত্যূহ, ডাহুক বা ডাকপাখী। বৈজ্ঞানিক নাম *Amaurornis phoenicurus* (Pennant)। চরকের মতে ইহা প্রতুদ পাখীদের অন্যতম।

আভিধানিক অর্থ—'অতিশয়বিতর্ক' অর্থাৎ অত্যন্ত কলরবকারী বিহঙ্গ। মেদিনীকোষে ইহার পরিচয় আছে—"কালকণ্ঠ খগে পুমান্"—কালে অর্থাৎ বর্ষাকালে কণ্ঠ অস্য, বর্ষাকালে যাহার কণ্ঠধ্বনি বেশী শুনা যায়। ইহার যে-কয়টি নামান্তর (যথা দাত্যৌহ, কালকণ্ঠ, মাসঙ্গ, শিতিকণ্ঠ, কচাটুর) শব্দরত্নাবলীতে প্রদত্ত আছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা আমার "জলচারী" গ্রন্থে (১৯৩৫) দ্রষ্টব্য (১৫-১৭ পৃষ্ঠা)।

ইহা 'নীলকণ্ঠ খগ'কেও বুঝায়; 'অত্যূহা' দ্রষ্টব্য।

অত্যূহা—"নীলকণ্ঠ খগে দ্বয়োঃ" (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে নীলকণ্ঠ বিহঙ্গ বা ময়ূরকে বুঝায়।

অধর—জলপক্ষিবিশেষ (নানার্থার্ণবসংক্ষেপ)।

অধ্বগকর্মী—পক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অনম্বু—চাতক।

অনিমক—কোকিল।

অন্নগ—পাখীর সাধারণ সংজ্ঞা।

অন্নভাস—কাকবিশেষ (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

অন্নুলাস—ময়ূর।

অন্নুলাস্য—ময়ূর।

অনেকজ—পক্ষী।

অন্ধকাক—কাকাকার পক্ষী। পানকৌড়ি (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)।

বিজন নদীর কূলে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিজন নদীর কূলে
কল্পনা দিয়ে বাঁধিয়াছি ঘর, সাজাই স্বপন-ফুলে।
সুমুখে বহিছে দূর দিগন্তে উছল লহরী-দল
গানে গানে তারা আকাশ-বাতাস করি তোলে চঞ্চল,
দিবস রজনী ভরি ওঠে গানে, ভরি ওঠে সারা হিয়া
জীবন হেথায় কুসুম-কোমল, আলোক-মধুর, প্রিয়া।
সৌরভে নিঃশ্বসি
আমাদের ঘিরি পাপ্‌ড়ির মত দিনগুলি যায় খসি।

হেথায় মোহিনী মায়া,
দিবস বিতরে মদির আলোক, রাত্রি মোহিনী ছায়া।
উষার হাসির অমিয়-পিয়াসে দিবস ছুটিয়া চলে,
কে জানে কোথায় দূর দিগন্তে মিলায় গগন-তলে!
দিন চলে যেতে সন্ধ্যা সে নামে, রাঙা মেঘে গা এলায়,
বুকের বসন টুটিতে অমনি হেসে চায় ছলনায়।
জলের মুকুরে তার
এলানো শাড়ীর রঙ্‌-ছায়া পড়ে ফুরে যৌবন-ভার।

সন্ধ্যা সে যায় চলি
মুঠিতে ছড়ায়ে কালো-কুঙ্কুম মুগ্ধ চাঁদেরে ছলি।
আঁখি মেলি চাঁদ থমকি দাঁড়ায়, পলায়েছে প্রিয়া তার
খ'সে পড়ে গেছে শুভ্রবসনার কটির তারার হার।
এমনি করিয়া সন্ধ্যা-সকাল চলিছে প্রেমের খেলা
ফুল-পাখা মেলি দ্রুত উড়ে যায় দিনরাত ডুই বেলা।
নাহি কোন কলরব—
ঢেউয়ের ওপার সুনীল আকাশে মিলায়ে গিয়েছে সব।

শুধু স্বপনের রাশি
স্রোতের কুসুম দূর হ'তে আসি কোথা দূরে যায় ভাসি।
জীবনের তাপ নিবিয়া গিয়াছে, সোনালী মেঘের পুরী
ভাঙিছে গড়িছে কে যেন মায়াবী মনের আকাশ জুড়ি,
আপন খেয়ালে মণি-রতনের রচিছে ইন্দ্রজাল,—
চিরযুগ তার রহে সম্পদ, আনে মায়া চিরকাল;—
আমি বিস্ময়-ভরে
শুধু হেরি কত বরণ-বিলাস আঁকিছে সে থরে থরে!

ডাক-হরকরা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার ডাকে চলিয়াছে।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—তাহার উপর আকাশে দুর্যোগ; মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারা নাই—সাধারণ অন্ধকারের মধ্যে থাকে যে স্বল্প স্বচ্ছতা তাহাও নাই—ঘন মেঘের কালো ছায়ায় প্রগাঢ় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন হারাইয়া গিয়াছে। চারি পাশে শুধু অজস্র সঞ্চরমান জোনাকীর দীপ্তি জ্বলে আর নেবে—জ্বলে আর নেবে, যেন অসীম অনন্ত গাঢ় মৃত্যু-পরিব্যাপ্তির মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনদীপ্তি জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ পাইয়া পাইয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ রাস্তার একটা কাদা-ভরা গর্ত্তে গরুর গাড়ীখানা পড়িয়া একটা ঝাঁকুনি খাইতেই ডাক্তারের চিন্তার ঘোর কাটিয়া গেল। চারি পাশে জলভরা মাঠে ব্যাঙের চীৎকার—আশেপাশের বৃক্ষপল্লবের মধ্যে ঝিঁঝির ডাক—তাহারই সঙ্গে গরুর গাড়ীখানার চাকার বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সুরের মত একটি সকরুণ দীর্ঘ শব্দ বেশ শোভন ভাবেই মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার পাশের গাছগুলির পাতায় পাতায় জল ঝরিতেছে টুপ্ টাপ্—টুপ্ টাপ্। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তার নুড়িপাথরের কঠিন বন্ধুরতার উপর দিয়া গাড়ীখানা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ডাক্তার একদৃষ্টে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল। দূরে যেন একটা জোনাকী অনির্ব্বাণ দীপ্তিতে জ্বলিতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেটা এই দিকেই আসিতেছে!

ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কি আলো, অটল?

বর্ষার রাতে অটল ঘুমে ঢুলিতেছিল—সে একবার জোর করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিয়া বলিল—কে জানে মশায়! অঁই—অঁই—ই-গরুদে কি বলতে হয় বল দেখি! বলিয়া গরু দুইটিকে একবার তাড়না করিয়া আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

হাঁ আলোই ওটা, ক্রমশঃ দীপ্তিটা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে—বিন্দুর আকার হইতে ক্রমশঃ আকারে বড় মনে হইতেছে। আলোটা দ্রুতবেগে এই দিকেই আসিতেছে! ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল! এই দুর্যোগ মাথায় করিয়া কে এমন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে! রোগীর বাড়ীর লোক নয়ত!

ঝুন্-ঝুন্-ঝুন-ঝুন—মৃদু ঘণ্টার শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল। ডাক্তার হাঁকিল—কে? কে? কে আসছে?

উত্তর আসিল—ডাক! সরকার বাহাদুরের ডাক! ডাক-হরকরা আমি।

বলিতে বলিতে লোকটি নিকটে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল—বেঁটে, কালো, আধা-বয়সী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেলব্যাগ ঝুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছোট একটি মাথালী, একহাতে একটা বল্লম—ওই বল্লমটারই ফলার সঙ্গে ঝুলানো ঘণ্টা ঝুন্ ঝুন্ শব্দে বাজিতেছে।

ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কে রে, দীনু?

দীনু ডোম ডাক-হরকরা, মেলরাণার, সাত মাইল দূরবর্ত্তী আমদপুর ষ্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে হরিপুর পোষ্ট আপিসে।

সচল দীনু উত্তর দিল—আজ্ঞে হাঁ।

—কতটা রাত্রি হ'ল বল দেখি দীনু?

—আজ্ঞে ক রাত ভেঙে এসেছে—তিন পহর গড়িয়ে এল আর। দীনুর কথার শেষ অংশের সাড়া আসিল গাড়ীর পিছন দিক হইতে। মেলরাণার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতেই সে গাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টার শব্দ ক্রমশঃ মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, আলোর শিখাটা ক্রমশঃ আবার পরিধিতে হ্রাস পাইয়া বিন্দুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

অটল কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ডাক্তার বাবু—ওই বস্তার ভেতরে কি থাকে?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল—চিঠি রে, চিঠি! কত দেশ-দেশান্তরের খবর, বুঝলি? এই এক-শ দু-শ পাঁচ-শ ক্রোশ দূরে যা-সব ঘটছে, সেই সব খবর ওই ব্যাগের মধ্যে থাকে।

অটল নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল—দেশ-দেশান্তরের খবর! কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—উঃ সাধে বলে বায়ের আগে বার্ত্তা ছোটে।

বায়ুরও আগে বার্ত্তা নাকি ছুটিয়া চলে! ডাক্তার পিছনের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে ডাক-হরকরার সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টার শব্দ আর শোনা যায় না, অসংখ্য খদ্যোৎ দীপ্তির মধ্যে ডাক-হরকরার আলোক জোনাকীর আলোর মতই ক্ষুদ্র হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। ডাক্তার অটলকে বলিল—বায়ের আগে বার্ত্তা ছোটে! কথাটি বেশ, অটল!

ডাক্তারের গাড়ী অন্ধকার পথ ধরিয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

* * *

ডাক-হরকরা তাহার অভ্যস্ত নিদ্দিষ্ট গতিতে ছুটিতে ছুটিতে চলিতেছিল। হাতের হারিকেনটার শিখা দ্রুত গমনের জন্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধোঁয়ায় চিমনীটাকে প্রায় কালো করিয়া তুলিয়াছে। দীনুর হাতে বল্লমটা বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। মাথায় মাথালীটা দড়ি দিয়া চিবুকে বাঁধা—মাথালীতে শুধু মাথাই বাঁচিয়াছে—দীনুর সমস্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বৃষ্টিটা জোরে নামিল।

দীনু কিন্তু সমান বেগে চলিতেছিল—এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, হুকুম নাই। গতি পর্য্যন্ত শিথিল করিতে পাইবে না। ডাকবাবু বলেন—এক মিনিটের ফেরে হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে দীনু।

দীনুর বুকটা শঙ্কায় কেমন গুর্-গুর্ করিয়া উঠে। আবার একটু গৌরবও অনুভব করে।

তাহাদের পাড়ার নোটন ডোম চৌকিদারি কাজ করে, দীনু তাহাকে বলে—এ বাবা তোমাদের চৌকিদারি কাজ নয় যে, ঘরে শুয়েই জান্‌লা থেকে দুটো হাঁক মেলেই খালাস, চাকরি হয়ে গেল! এ হ'ল সরকারী ডাকের কাজ—এক মিনিট দেরি হ'লেই—বাস—হাতে হাতকড়া!

আজ সাত বৎসর দীনু ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে; প্রত্যহ রাত্রে সে ডাক লইয়া যায়—লইয়া আসে, কিন্তু কোন দিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই। বরং সে-বার পুল ভাঙিয়া এক দিন কলিকাতার ডাকগাড়ী আসে নাই—এক দিন পথে মালগাড়ী ভাঙিয়া রাস্তা বন্ধ হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ীর আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল, কিন্তু দীনু ঠিক সময়ে যায়—ঠিক সময়ে আসে।

শ্রাবণ-রাত্রির আকাশে মেঘ যেন জমাট অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে সে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অজগর-জিহ্বার মত বিদ্যুৎ-রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া খেলিয়া যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ মেঘের গম্ভীর মৃদু গর্জ্জন—দূরের লাইনের পুলের উপর ডাকগাড়ীর শব্দের মত দীনুর মনে হয়। অকস্মাৎ একটা তীব্র নীল আলোকে দীনুর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কঠোর বজ্রধ্বনিতে সমস্ত যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য ত্রাসে বিহ্বল হইয়া দীনু বলিয়া উঠিল—রাম—রাম—রাম!

দূরে কোথায় বাজ পড়িয়াছে! মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দীনু আবার তাহার অভ্যস্ত গতিতে ছুটিয়া চলিল। বল্লমের ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল—ঝুন—ঝুন—ঝুন—ঝুন।

ডাকঘরে যখন সে পৌঁছিল, তখন ভোর হইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পুঞ্জিত মেঘস্তর পরিষ্কার রূপে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডাক নামাইয়া দিয়া দীনু একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল—উঃ বাজ যা আজ একটা পড়ল বাবু—সাঙীন বাজ! বাপরে—বাপরে! পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—ওঃ বিছানাতে থেকেই আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম দীনু।

তার পর দীনুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এঃ—ভিজে গিয়েছিস যে রে—এঁা! দাঁড় বাবা, ইনশিওর-রেজিষ্ট্রীগুলো দেখে নিয়ে তোর ছুটি ক'রে দিই—তুই বাড়ী গিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল!

দীনু বলিল—তামাক দেন কেনে একটুকু, সাজি একবার। উঃ বড্ড কাঁপুনি লেগেছে মশায়।

অতঃপর পোষ্টমাষ্টার ইনশিওর-রেজিষ্ট্রী লইয়া বসিলেন, পিয়ন চিঠিগুলির উপরে খট্ খট্ শব্দে ছাপ মারিতে আরম্ভ করিল, দীনু আপন মনে তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। তাহার শীত করিতেছিল, কিন্তু উপায় নাই—ডাক না মিলিলে তাহার ছুটি হইবে না।

—ওহে কাগজখানা দাও দেখি, যুদ্ধের খবরটা একবার দেখি! ইহারই মধ্যে এই ভোরেই জনকয়েক লোক পোষ্টাপিসের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালী বাবুর সংবাদপত্রের সংবাদের জন্য উৎকট নেশা—তিনি হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আর ছিল গোবিন্দ রায়। লোকটি স্কুল-মাষ্টার, তাহার নেশা যত ফ্রি-স্যাম্পেলের উপর। 'বিনামূল্যে' দেখিলেই গোবিন্দ রায় সেখানে চিঠি লিখিয়া বসিবে। জার্ম্মেনী হইতে বিনামূল্যে সে তাহার কোষ্ঠী তৈয়ারী করাইয়া আনিয়াছে। সে প্রত্যহ আসে, পাছে তাহার স্যাম্পেল গোলমাল করিয়া অন্য কেহ লইয়া লয়! আর আসিয়াছিল আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠির জন্য কয় জন যুবক। প্রৌঢ় রমানাথ চাটুজ্জেও আজ আসিয়াছিল—দূর দেশে তাহার জামাইয়ের খুব অসুখ; চাটুজ্জে উৎকণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেকখানি চিঠির ঠিকানা পিয়ন পড়িয়া শেষ করে—এ দিকে চাটুজ্জে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এ চিঠি তাহার নয়!

ইনশিওর-রেজেষ্টীর কাজ শেষ হইয়া গেল, দীনুর এবার ছুটি, সে বাড়ী চলিল। হাতে তাহার খান-দুই রঙীন খাম—কাহার ছেঁড়া চিঠির ফেলিয়া দেওয়া খাম—সে-কয়খানা সে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল।

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—গরুটার ঘাস দিতে এত দেরি করিস কেন দীনু! একটু সকালে সকালে দিস!

ডাকবাবুর গরুর জন্য ঘাস দীনুকে দিতে হয়।

—তাই আনব। বলিয়া দীনু চলিয়া গেল।

পথে রমানাথ চাটুজ্জের বাড়ীতে তখন মেয়েদের বুক-ফাটা কান্নার রোল উঠিয়াছে। সে ধ্বনির মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা-স্পর্শে এই প্রভাতেও শ্রাবণের আকাশ যেন কাঁদি-কাঁদি করিতেছিল।

দীনু চলিতে চলিতেই একবার আপন মনে বলিল—আহা!

* * *

বাড়ীতে আসিয়া পাঁচ বছরের মেয়ে লক্ষ্মীর হাতে খাম দুইখানি দিয়া দীনু বলিল—কেমন খাম এনেছি দেখ লক্ষ্মী! কেমন ছবি, আবার কেমন সু-বাস উঠছে দেখ! বেলাত থেকে এসেছে চিঠি।

লক্ষ্মী খাম দুইখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিল—চিঠি কি বাবা?

—কালি দিয়ে কাগজে সব নেকা থাকে মা!

—কি নেকা থাকে বাবা?

—তুমি কেমন আছ—আমি ভাল আছি—।

—আর?

আর কি থাকে—দীনুর মনে সেটা জোগাইল না, সে চুপ করিয়া রহিল।

মেয়ে আবার প্রশ্ন করিল—আর?

অকারণে বিরক্ত হইয়া দীনু এবার বলিল—জানি না যা। আবার কি থাকবে?

লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে—বাপের বিরক্তি দেখিয়া সে আর প্রশ্ন করিল না, খাম দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল।

দীনু স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল—নেতাই কোথা, মাঠে গিয়েছে?

নিতাই দীনুর একমাত্র পুত্র। স্ত্রী বলিল—জানি না বাপু, কাল সন্জেতে সেই বেরিয়েছে—এখনও ফেরে নি। সারা রাত আখড়াতে মদ খেয়েছে, আর ঢোল বাজিয়ে সব চেঁচিয়েছে। দু-বার আমি ডাকতে গেলাম ত, আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীনুর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিল—লবাবের বেটা লবাব, হারামজাদা, আমার রোজকারে খাবেন আর টেরী কাটিয়ে লব্বাগি ক'রে বেড়াবেন। তাকে আমার ঘর ঢুকতে দিও না ব'লে দিচ্ছি—হ্যাঁ!

নিতাইয়ের মা বলিল, সে তুমি ব'লো বাপু, আমি লারব।

দীনু উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে আরও রুক্ষস্বরে বলিল—কেনে লারবি কেনে শুনি?

—ব'লে কে মার খাবে বাপু? ছেলের চোখ যেন লাল কুঁচ—আর লাটাই ঘোরা হয়ে ঘুরছে।

দীনু চীৎকার করিয়া উঠিল—মারবে! সে হারামজাদা কত বড় মরদের বেটা দেখে লোব আমি!—বলিয়া সে কোদালী ও ঘাস কাটিবার জন্য কাস্তে ও ঝুড়ি লইয়া মাঠে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। স্ত্রী পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—এই দেখ, নিজের করণটা একবার দেখ—খাওয়া নাই কিছু নাই, মরদ চললেন রাগ ক'রে। খেয়ে যাও বলছি। সারা রাত দোড় দিয়ে হাঁটা—।

দীনু ফিরিল, বলিল—ট্যাঁক ট্যাঁক করা তোর এক স্বভাব! দে তাই মদের ভাঁড়টা বার ক'রে দে—ওই খেয়েই যাই এখন। যে জল সমস্ত রাত—জমির আল-টাল আর কি আছে! সময়ে না দেখলে খাবি কি ধুমসী!

দীনুর স্ত্রী স্থূলাঙ্গী। স্ত্রী বলিল—এই দেখ, গতর খুঁড়ো না বলছি। মদের ভাঁড়টা স্বামীর হাতে দিয়া কিন্তু ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—তা বাপু, গতর যদি একটুকুন কমে ত বাঁচি।

নিঃশেষে ভাঁড়ের মদটুকু পান করিয়া দীনু বাহির হইয়া গেল। চাক লইয়া ফিরিয়া প্রাতঃকালে এটুকু তাহার না হইলেই নয়। সে বলে, এ আমার চা।

ঘণ্টা-দুয়েক পরে কদমাক্ত দেহে, মাথায় ঝুড়িতে এক বোঝা ঘাস ও আঁচলে এক আঁচল কই-মাগুর মাছ লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। মাঠে মাছগুলি সে ধরিয়াছে। বাড়ীর বাহির হইতেই সে শুনিল তাহার 'লবাবপুত্তু' নিতাই বেশ জড়িত স্বরে উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিয়াছে—

হায় কি কঠিন রোগ উঠেছে ওলাউঠো—
লোক মরিছে অসম্ভব।

মাছ পাইয়া দীনুর মেজাজ বেশ খুশী হইয়া উঠিয়াছিল—আর খালি-পেটে মদের নেশাটাও আজ জমিয়াছে ভাল। সে ছেলেকে কোন কটু কথা বলিল না, ঘরে ঢুকিয়া বেশ হাসিয়া বলিল—গানের ছিরি দেখ দেখি বেটার! তাই একটা ভাল গান গা রে বাপু!

বলিয়া সে নিজেই আরম্ভ করিল—

ওরে আমার কাল মেয়ে জোবনও করেছে আলো!

নিতাই বলিয়া উঠিল—থাম থাম বাপু, ষাঁড়ের মত আর চেঁচিয়ো না তুমি। আমি গাই, শোন—

দীনু অত্যন্ত চটিয়া গেল, সে গান থামাইয়া বলিল—রাখ তোর গান। বলি—আমার কথার জবাব দে দেখি আগে! মাঠে যাস নাই কেনে শুনি?

নিতাই তাচ্ছিল্যভরে নিতাই জবাব দিল, ধু—রো—মাঠে গিয়ে কি হবে? মাঠে গিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে শুনি!

দীনু অবাক হইয়া গেল।

নিতাইয়ের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল—এই একরাশ ধান বেচলে তবে তোর একটা টাকা! ধু—রো—মাঠে গিয়ে কি হবে?

নিতাইয়ের মা বলিল—ওরে লবাবের বেটা লবাব, খুব যে মুখে টাকা দেখাইছিস, বলি একটা পয়সা কখনও এনেছিস তুই।

নিতাই ট্যাঁক খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল—যেন নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু সেটা। তার পর বলিল—ওই লে—ফের যদি টিক্‌টিক্ করবি ত বুঝতে পারবি!

মা তাহার অবাক হইয়া গেল। দীনু কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলিল—তুই টাকা কোথা পেলি রে নেতাই?

হি হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উত্তর দিল—রাজারা মাণিক কোথা পায়?

দীনু গম্ভীরতর স্বরে বলিল—হাসি-তামসা নয় নেতাই। বল, তুই টাকা কোথা পেলি!

নিতাই বিরক্তিভরে উঠিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল—মর তুই ওইখানে বক্ বক্ ক'রে, হ্যাঁ!

দীনু উঠিয়া পিছন পিছন দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে ডাকিল—নেতাই, শোন, শুনে যা, ফিরে আয় বলছি!

নিতাই তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া আখ্‌ড়ায় চলিয়াছে,

পীরিতি হল শূল সখি, পীরিতি হল শূল।
ও—আমি বসিলে উঠিতে নারি আমায় হাতে ধ'রে তুল গে।

দীনু ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। নিতাইয়ের স্বভাবের ভাব-গতিক তাহার বেশ ভাল লাগে না। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার

ও বিড়ি-সিগারেটের প্রাচুর্য্য দেখিয়া দীন্থ সন্দেহ করিত স্ত্রীকে—সে-ই বোধ হয় নিতাইকে গোপনে পয়সাকড়ি দিয়া থাকে। কিন্তু আজ পুরা একটা টাকা এমন তাচ্ছিল্য-ভরে ফেলিয়া দেওয়ায় দীন্থর চিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, শেষ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

স্ত্রী বলিল—মুড়ি দিয়েছি খাও। খেয়ে একটুকুন গড়াও, বিছানা ক'রে দিয়েছি। খাস আমি মাষ্টারবাবুর বাড়ীতে দিয়ে আসছি।

দীন্থ স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, নেতাই টাকা কোথা পেলে বল দেখি ?

স্ত্রী বলিল—ভ্যালা মানুষ তুমি বাপু! ওই নিয়ে তুমি ভাবতে বসলে ? বেটাছেলে—কোথাও হয়ত পেয়েছে!

দীন্থ কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

অপরাহ্ণে আহারের সময় পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হইল। তখন দীন্থর মদের নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু নিতাইয়ের চোখ তখনও লাল। দীন্থ নিতাইয়ের আপাদ-মস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। দীন্থর চোখ জুড়াইয়া গেল। ভরা-জোয়ান হইয়াছে নিতাই! সুন্দর সুগঠিত সবল দেহখানি কে যেন কালো পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারী করিয়াছে! সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। দীন্থ পরিতুষ্ট চিত্তে স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে বলিল—এইবার ত জোয়ান হয়েছিস নেতাই, এইবার একটা কাজে-কম্মে লেগে যা। ডাকঘরের কাজেই লেগে পড়্। নতুন ডাকঘর হচ্ছে আবার রামনগরে—এই ফাঁকে লেগে যা।

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ঢের লোক আছে তোর কাজ করবার। উ-কাজ আমি লারব। বাবাঃ সারা পথ ধুকুর-ধুকুর ক'রে ছোটা—উ কি মানুষে পারে ?

নিতাইয়ের মা বলিল—কেনে, তোর বাবা পারে—আর তুই পারবি না কেনে ? তোর বাবা কি মানুষ লয় না কি ?

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিল—উ একটা আস্ত ভূত। লইলে হ্যাঃ—!

দীন্থ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—লইলে কি ?

—যাও—যাও ব'কো না বেশী তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়লোক হয়ে যেতে তুমি কোন্ দিন!

—তার মানে ?

—মানে আবার কি ? বললাম, তুমি ভেবে দেখো কেনে! বলিয়া নিতাই হাত মুখ ধুইয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। দীন্থ নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রী বলিল—হতভাগা উ কি বললে বল দেখি ?

দীন্থ সে-কথার কোন উত্তর দিল না—তাহার আর সময় ছিল না, সে বল্লম-পেটি মাথালী ও লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক যাইবার সময় হইয়াছে।

* * *

ঝুন-ঝুন-ঠুন্-ঠুন্!

ডাক-হরকরা মৃদুতালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে বরাবর সমান ভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পথে এক দণ্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দীন্থ কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার উপর পথে কোথায় ওভারসিয়ার হয়ত লুকাইয়া আছে, কোন জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোন গাছের ডালে বসিয়া ডাক-হরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সামান্য একটু শৈথিল্য দেখিলেই সে রিপোর্ট করিয়া বসিবে, সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে জরিমানার হুকুম আসিয়া পড়িবে!

দীন্থ একবার মাত্র জরিমানা দিয়াছে। গতি-শৈথিল্যের জন্যও নয়, পথে সে বিশ্রামও করে নাই, তবুও তাহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছে। তখন সে নূতন কাজে ভর্ত্তি হইয়াছে, বয়সও তাহার তখন অল্প। ওভারসিয়ারকে সে ঠকাইয়াছিল। সেদিন যে পথে ওভারসিয়ার লুকাইয়া থাকিবে এ-সংবাদ হরিপুরের পিয়ন তাহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছিল—দীন্থ আজ সাবধান, পথে আজ থাকবে। কে থাকিবে সে-কথা দীন্থ পিয়নের ভ্রূ-নৃত্য দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। পথে সে সতর্কদৃষ্টি রাখিয়াই সেদিন আসিতেছিল। সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

সুন্দীপুরের বুড়া-বটতলার অল্প দূরে আসিয়া দীনুর মনে হইল গাছের একটা ডাল যেন অল্প অল্প দুলিতেছে। তরুণ দীনুর তরল চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের পথে নামিয়া পড়িল। গাছটাকে পাশে খানিকটা দূরে ফেলিয়া স্থানটা সন্তর্পণে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বল্লমের ঘন্টাটা সে হাতের মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঘন্টারও কোন শব্দ হইল না। তার পর ও-পাশে আবার পাকা রাস্তায় উঠিয়া ষ্টেশনে ছুটিল। সেদিন খুব একচোট হাসিয়া সে আপন মনেই বলিয়াছিল—থাক বাবাধন পথের পানে তাকিয়ে গাছের ওপর ব'সে!

ওভারসিয়ার এদিকে গাছের উপর বসিয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল। নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল তবু মেল-রাণার আসিল না দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে নিজেই ছুটিতে ছুটিতে হরিপুর পোষ্টাপিসে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে আসিয়া তাহার চিন্তার পরিমাণ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল, কোথায় গেল মেল-রাণার! সে আবার আমদপুর ষ্টেশন রওনা হইল। দীনু তখন সেখানকার ডাক লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই হরিপুরে ফিরিয়া আসিতেছে। ওভারসিয়ার রিপোর্ট করিয়া বসিল। মিথ্যা বলিলে দীনুর জরিমানা হইত না, বরং ওভারসিয়ারেরই লাঞ্ছনা হইত, কিন্তু দীনু মিথ্যা বলিতে পারে নাই। পিয়ন তাহাকে বার-বার বলিয়া দিয়াছিল—তুই বলবি, আমি ঠিক গিয়েছি হুজুর, ইষ্টিশানের টাইম দেখুন—আবার ঠিক সময়ে ফিরেছি—এখানকার টাইম দেখুন। ওভারসিয়ার বাবু হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন!

দীনু চিন্তিত মুখে উত্তর দিয়াছিল—তা আজ্ঞে কি ক'রে বলব আমি?

সুন্দীপুরের বটতলার নিকট আসিয়া দীনুর প্রায়ই কথাটা মনে পড়ে। সে অল্প একটু হাসে। আরও কতবার এইখানে ওভারসিয়ারের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্য হইতে এখনও কোন কোন দিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ডাক-হরকরা?

দীনু উত্তরে প্রশ্ন করে—'টায়েন' ঠিক আছে বাবু?

জঙ্গলের ভিতর হইতেই উত্তর আসে অথবা হাসিতে হাসিতে ওভারসিয়ার রাস্তার উপর আসিয়া বলে—ঠিক আছে রে। তোর কিন্তু এক দিনও দেরি হ'ল না দীনু!

ডাক-হরকরা কিন্তু দাঁড়ায় না, ওভারসিয়ারের এ ছলটুকুও সে জানে। সে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াই যায়, তাহার বর্শার ফলায় বাঁধা ঘন্টা ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিতেই থাকে।

ঝন-ঝন-ঝন্-ঝন! আজও দীনু নিয়মিত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ওভারসিয়ারের কথা মনে পড়ায় নিতাইয়ের চিন্তা ভুলিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি—আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। তারকাদীপ্তিহীন মেঘলা আকাশ যেন অন্ধকারের মধ্যে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়াছে। দীনুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধ চক্ষুর মত জ্যোতিহীন পাণ্ডুর।

অন্ধকার বটবৃক্ষের তলদেশ হইতে একটি মানুষ আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। দীনু প্রশ্ন করিল, 'ওপরস্যার' বাবু!

উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল। ডাকাত! ডাক লুটিতে আসিয়াছে!

মুহূর্ত্তে দীনু ক্ষিপ্র গতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উঁচু করিয়া ধরিল।

—খবরদার, সরকারের ডাক!

—এই দেখ, ব্যাগটা দাও বলছি!

দীনুর হাতের বল্লমটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল—কে—নেতাই?

নিতাই দাঁ করিয়া দীনুর কম্পিত হস্ত হইতে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে সে ঝাঁপ দিয়া মেল-ব্যাগের উপর শিকারী পশুর মত লাফাইয়া পড়িল। দীনু পড়িয়া গেল, মাথার মাথালীটা গড়াইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও দীনু সবলে মেল-ব্যাগ নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সব্বনাশ হবে নেতাই—কালাপানি—ফাঁসি হয়ে যাবে!

নিতাই ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত ব্যাগটা ধরিয়া টানিতেছিল—টানিতে টানিতেই হিংস্রভাবে সে বলিল—তখন বললে না কেনে—ব'লে রেগে দিলাম এমন ক'রে! দাও বলছি, রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালাব চল।

দীনু এবার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—ডাকাত—ডাকাত!

নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সহসা একটা আলোকরশ্মির আভাসে গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া নিতাই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল আলো দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ আলোর প্রভায় স্থানটা প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতেছে। সে এবার শেষ চেষ্টা করিল, হাতের লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে দীনুর মাথায় বসাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে ফিন্‌কি দিয়া কাল একটা তরল ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া দীনুর মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিল। দীনু কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা গোঃ! আলোটা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই ব্যস্তভাবে আর একবার ব্যাগটা ধরিয়া আকর্ষণ করিল—কিন্তু দীনুর জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আলোটা একটা বাইসিক্লের আলো। আরোহী পথিক রক্তাক্ত দীনুকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের প্রয়োজনের শেষ নাই, পথে পথিকের পথচলার বিরাম নাই, কিছুক্ষণ পরেই দূরে মানুষের সাড়া আসিল—কে সাড়া দিল।

* * *

দীনুর জ্ঞান হইলে সে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা পাকা ঘরে একখানা লোহার খাটের উপর সে শুইয়া আছে—মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা—কপালে হাত দিয়া অনুভব করিল, কাপড় দিয়া মাথাটা তাহার বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার খাটের পাশেও সারি সারি লোহার খাটে আরও কত লোক শুইয়া আছে। দীনু বুঝিল এটা হাসপাতাল। সে পূর্ব্বে কয়বার শহরে আসিয়া হাসপাতাল দেখিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দীনুর সব মনে পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরই পোষ্টাপিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—এই যে জ্ঞান হ'য়েছে তোমার?

দীনু তাহাকে চিনিত, কিন্তু সে তাহার মুখ-পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল শুধু। সাহেব বলিলেন—খুব বাহাদুর তুমি! সরকার তোমার ওপর খুশী হয়েছেন। তুমি যে নিজের মাথা দিয়েও সরকারের ডাক বাঁচিয়েছ এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড—মানে পুরস্কার পাবে!

দীনু তবুও নির্ব্বাক!

সাহেব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন—কত জন ছিল তারা—কাউকে তুমি চিনতে পেয়েছ?

দীনু এবার ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব নিজে পাখাটা লইয়া বাতাস দিয়া বলিলেন—ভয় কি, কাঁদছ কেন তুমি? কোন ভয় নেই, শীগ্‌গির ভাল হয়ে যাবে তুমি। ডাক্তার বলেছেন কোন ভয় নেই তোমার!

তিনি নিজে রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। তার পর বলিলেন—আচ্ছা, সুস্থ হয়ে ওঠ তুমি, আমি আবার আসব—রোজ এসে তোমায় দেখে যাব। ওবেলায় ফল পাঠিয়ে দেব আমি।

দীনু অকস্মাৎ যেন বলিয়া উঠিল—হুজুর!

—কিছু বলবে আমায়, কি বলবে বল?

দীনু অতিকষ্টে বলিল—হুজুর আমার ছেলে—।

—তোমার ছেলে, তোমার ছেলেকে তুমি দেখতে চাও?

দীনু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—কহিল হাঁ হুজুর!

—আচ্ছা। সাহেব চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আসিল পুলিস। পুলিসের বড়সাহেব নিজে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিন্তু ডাক-সাহেবের মত এত সহজে দীনুকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তিনি বার-বার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—কাউকেই তুমি চিনতে পার নি?

দীনু উত্তর দিল—অন্ধকার হুজুর!

—কত জন ছিল তারা?

ভাবিয়া-চিন্তিয়া দীনু আবার বলিল—অন্ধকার হুজুর—!

—আচ্ছা কি রকম দেখতে বল ত? খুব জোয়ান?

—আজ্ঞে হাঁ।

—ভদ্রলোক—কি ছোটলোক?

দীনু চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল—সে কি বলিবে? কাহার নাম সে করিবে? মিথ্যা করিয়া অন্য কাহারও নাম—দীনু শিহরিয়া উঠিল!

সাহেব তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দীনুকে লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি বলিলেন—দেখ, তুমি তাদের জান, চিনতে পেরেছ; বল তুমি, সে কে?

দীনু বিবর্ণ মুখে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব এবার রক্ত-চক্ষু হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—বল!

দীনু বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল—হুজুর, আমার ছেলে নেতাই।

সাহেব বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন না, তবুও সামান্য বিস্মিত না হইয়াও পারিলেন না, বলিলেন—সে তোমার ছেলে?

রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দীনু বলিল—হাঁ হুজুর।

—আর? আর কে?

—আর কেউ না।

পুলিস কিন্তু নিতাইকে পাইল না। সেই রাত্রি হইতেই নিতাই নিরুদ্দেশ। তাহার উদ্দেশ করিতে পুলিস উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল।

* * *

তার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল এগার বৎসর। দীনু আজও ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে। অন্ধকারে জ্যোৎস্নায়, বাদলে বর্ষায়, দুরন্ত শীতের রাত্রে এখনও সে তেমনই কোমরে পেটি বাঁধিয়া বল্লম-আলোহাতে ডাক লইয়া যায় আসে। এখনও তেমনই তাহার ঘড়ির কাঁটার মত গতি।

নিতাই কিন্তু সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে আজও তাহার কোন সন্ধান মেলে নাই। সরকারের মুলুকে সর্ব্বত্র থানায় থানায় নাকি তাহার আকৃতির বিবরণ দিয়া হুলিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় নিতাই!

দীনুর স্ত্রী সময় সময় ঘরের মধ্যে অতি মৃদুস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে; দীনু বাড়ীতে থাকিলে নির্ব্বাক হইয়া বাহিরে দাওয়ার উপর দুই হাতে মাথা ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। সান্ত্বনাও দিতে পারে না—বিরক্তি প্রকাশও করে না।

পাড়াপড়শীরা দীনুর নাম দিয়াছে যুধিষ্ঠির। তাহাদের অশিক্ষিত জড়তাযুক্ত জিহ্বায় তাহারা বলে—যুজিষ্টির।

লজ্জায় দীনুর মাথাটা নোয়াইয়া আসে। মাথা হেঁট করিয়া পাড়ার পথে সে যাওয়া-আসা করে। পোষ্টাপিসেও তাহার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে-কেহ নূতন ডাকবাবু কি ডাকসাহেব আসেন তিনিই জিজ্ঞাসা করেন—দীনু কে?

দীনু মাথা হেঁট করিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়ায়। সেদিন সে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠে, অকারণে পিয়নদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসে। সেদিন তাহাদের বাসন মাজিয়া দেয় না, ডাক-বাবুর গরুর ঘাস আসে অত্যন্ত কম।

পিয়ন বলে—এত গরম ভাল নয় রে, বুঝলি!

সেদিন কার্ত্তিক মাসের একটি স্বল্প শীতকাতর রাত্রি। কার্ত্তিক মাসেই শীত এবার ঘন হইয়া আসিয়াছে। দীনু ডাক লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়েই আমদপুর পোষ্টাপিসে হাজির হইল। এই আমদপুরেই রেলওয়ে ষ্টেশন, এখানকার পোষ্টাপিসেই আবার ডাক লইয়া দীনু হরিপুর ফিরিবে। ডাক ফেলিয়া দিয়া সে তাহার নির্দ্দিষ্ট চটখানা বিছাইয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল। আপ-ডাউন মেলট্রেন চলিয়া গেলে ডাক লইয়া তাহাকে আবার রওনা হইতে হইবে। পাশে আরও কয়েক জন মেল-রাণার শুইয়া আছে। তাহারা গল্প করিতেছিল ওভারসিয়ারকে লইয়া। জরিমানার প্রত্যক্ষ কারণ এই লোকটি কখনই ভাল লোক নয় এই তাহাদের প্রতিপাদ্য ছিল। ওদিকে দুই জন বোধ হয় ঘরের সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছিল।

ওদিকে ষ্টেশনে আপ-মেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

দীনু বিরক্ত ভাবে বলিল—একটুকুন ঘুমো বাপু সব! পশ্চিমের ডাকগাড়ীর ঘণ্টা হয়ে গেল। কলকাতার গাড়ী এলেই ত আবার সেই তল্পী কাঁধে তোল!

এক জন ব্যঙ্গ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চুপ চুপ, ধর্ম্মপুত্তু্র যুজিষ্টির রেগেছে!

চাপা হাসির গুঞ্জনের শব্দে দীনু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মনে পড়িয়া গেল নিতাইকে! নিতাই মরিয়া গেলে দীনু এত দিন হয়ত তাহাকে ভুলিত! জীবন্ত মানুষ হারাইয়া যাওয়ার চেয়ে সে শতগুণে ভাল; এ যে প্রতি প্রভাতে মনে হয় আজ সে আসিবে; দিন ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কাল সে আসিবে!

সকলের চেয়ে বড় আক্ষেপ দীনুর—নিতাইয়ের সন্ধান সে করিতে পাইল না। সেদিন এক জন যাত্রী এই ষ্টেশনেই একটা আনি হারাইয়া সমস্ত রাত্রি পথের ধূলা ঘাঁটিয়া খুঁজিয়াছে। আর একটা মানুষ— !

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম ভাঙিল তাহার পিয়নদের ডাকে। ডাউন মেলট্রেন চলিয়া গিয়াছে—ঘরের মধ্যে বিভিন্ন পোষ্টাপিসের জন্য ডাক বাঁধা হইতেছিল। হরকরারা আপন আপন পেটি বল্লম লণ্ঠন লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। প্রস্তুত হইয়া দীনু তামাক সাজিতে বসিল। ওদিকে ছোকরারা একটা আগুন জ্বালাইয়া হাত-পা গরম করিতে বসিয়াছে।

ঘরের ভিতর হইতে পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—ওঃ দীনু, আফ্রিকাতে তোর কে আছে রে? এ্যাঁ—ইনশিওর ক'রে টাকা পাঠাচ্ছে!

দীনু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল—সি আজ্ঞে কোথা বটেন?

—ওঃ সে জাহাজে ক'রে যেতে হয় রে সমুদ্দুর পেরিয়ে। কাফ্রির মুলুক সে, মানুষে সেখানে মানুষ খায়, প্রকাণ্ড বড় বড় বন, সিংহ গণ্ডার বাঘ-ভাল্লুকে ভর্ত্তি সে সব।

দীনু আরও বিস্মিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে সে দেশের নামই আমি শুনি নাই কখনও!

···দাঁড়া দাঁড়া কে পাঠাচ্ছে দেখি!···এ যে দেখছি সাউথ আফ্রিকান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী—জাহাজ-কোম্পানী দেখছি! ওঃ এ যে অনেক টাকা রে—সাড়ে পাঁচ-শ টাকা।

দীনু অবাক হইয়া ভাবিতেছিল। সহসা সে বলিল—আজ্ঞে দেখি বাবু একবার!

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—দেখে আর কি করবি বাবা, একেবারে হরিপুর পোষ্টাপিসেই গিয়ে নিবি।

ডাক বাঁধিয়া দীনুর কাঁধে তুলিয়া দিয়া দীনুকে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। আকাশে শেষরাত্রির জ্যোৎস্না তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে—চাঁদ পাণ্ডুর, 'সাত ভাই' তারাগুলি আর ডুবিল বলিয়া, শেষরাত্রির বাতাসে যেন হিম ঝরিতেছে। দীনু জনহীন পথে চলিয়াছে—ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন! চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—কোন্ দেশ-দেশান্তর হইতে জাহাজ-কোম্পানী তাহাকে টাকা পাঠাইল কিসের জন্য?

অল্প টাকা নয়—সাড়ে পাঁচ-শ টাকা—উঃ সে কত টাকা! ব্যাগটা যেন দীনুর ভারী মনে হইতেছিল। সহসা দীনুর খেয়াল হইল—একি, সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে! সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে পথের কোন্‌খানে কতদূর আসিল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু মন তাহার দেশ-দেশান্তরের এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। কে সে কোম্পানী? কিসের জন্য তাহাকে এত টাকা পাঠাইয়াছে সে? সে যেন দেখিতেছিল বিশাল অন্ধকার অরণ্য—বাঘ সিংহ ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কিন্তু তাহার মধ্যে কোম্পানী কই—দীনু তাহার পিছনটা দেখিতেছে—সে যেন পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে!

সহসা তাহার মনে হইল—ওই কোম্পানী তাহার নিতাই নয়ত? নিতাই হয়ত দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে! পাকা বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, চাকর—! কল্পনার গভীর অরণ্যে মুহূর্ত্তে গড়িয়া উঠে বাবুদের চুণকাম-করা পাকা বাড়ীর মত বাড়ী!

দীনুর সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হিম-শীতল রাত্রির শীতজর্জ্জর সেই শেষ প্রহরেও সে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল কাঁধের কাগজের বস্তা যেন সোনায় বোঝাই বস্তার মত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে! একটি পরম উত্তেজিত মুহূর্ত্তে কাঁধ হইতে ব্যাগটা ধপ্ করিয়া মাটির উপর ফেলিয় সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাহার পাশে দাঁড়াইল—চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছিল! বুকের মধ্যে উৎকণ্ঠার পরিমাণ হয় না, হৃৎপিণ্ডটা শরবিদ্ধ পশুর মত যেন ছট্‌ফট্ করিতেছে! দীনুর ইচ্ছা হইল এই মুহূর্ত্তে—এইখানেই ব্যাগটা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া লয়!

পর-মুহূর্ত্তে সে আবার ব্যাগটা ঘাড়ে তুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, প্রাণপণে ছুটিল।

এ কি—পাখীরা কল কল করিয়া ডাকিয়া উঠিল যে! ভোর কি হইয়া গেল না কি? কই আকাশে 'ভুক্কো' তারা কই? কিন্তু দীনুর যে এখনও অনেক পথ বাকী! এই ত

ষোল মাইলের পাথর সে পার হইল! এখনও যে তিন মাইল পথ তাহাকে যাইতে হইবে!

দীনু যখন হরিপুর পোষ্টাপিসে পৌছিল তখন বেলা সাড়ে সাতটা—প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরি হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট-মাষ্টার, পিয়ন, সংবাদপ্রার্থীর দল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দীনু শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে ব্যাগটা ফেলিয়া দিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—এত দেরি কেন হ'ল রে?—এ কি, তোর কি অসুখ ক'রেছে দীনু?

দীনু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—ডাকটা কেটে ফেলেন বাবু!

—আচ্ছা—আচ্ছা ব'স, শীগ্‌গির তোর ছুটি ক'রে দিচ্ছি।

ডাক কাটিয়া পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—এ কি রে, তোর নামে যে একটা ইনশিওর দীনু! টাকাও ত কম নয়, সাড়ে পাঁচ-শ! ওঃ এ যে আফ্রিকা থেকে আসছে দেখি!

দীনু কথা কহিতে পারিল না, শুধু হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, সে হাত তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—দাঁড়া একটু, জমা ক'রে নি।

পিয়ন বলিল—আমাদের কিন্তু পাঁচ টাকা দিতে হবে, মিষ্টি খাব।

দীনু নির্ব্বাক। জমা করিয়া লইয়া পোষ্টমাষ্টার বলিল—এইখানে একটা টিপ ছাপ দে ত দীনু, হ্যাঁ—নে এই নে।

খামখানা হাতে লইয়া দীনু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল—জাহাজের ছবি আঁকা সুন্দর খাম, ছাপা হরফে নাম লেখা।

মাষ্টার বলিলেন—দে, দেখি খুলে!

সন্তর্পণে ছুরি দিয়া খামখানা কাটিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি নোট কয়খানা দেখিয়া বলিলেন—নে ঠিক আছে সব। এ নোট আবার তোকে ভাঙাতে হবে। এই যে চিঠিও রয়েছে!

চিঠিখানা তিনি মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ওদিকে পিওন ডাক বিলি করিতেছিল—

পরম কল্যাণীয়া—জগত্তারিণী দাসী কুড়িগ্রাম!

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—এই বাঁড়ুজ্জে মশায়—চিঠি।

এটা আবার হিন্দী—কি—? ডাংখানা হরিপুর। সু—সুখন চৌবে।

দীনু বলিল—বাবু!

বাবু ভাবিতেছিলেন, কি বলিবেন! নিতাইয়েরই সংবাদ, নিতাই সেখানে জাহাজে খালাসীর কাজ করিত, সে মারা গিয়াছে! কোম্পানী তাহার অন্তিম-নির্দ্দেশ মত তাহার সঞ্চিত অর্থ দীনুকে পাঠাইয়াছে।

দীনু আবার প্রশ্ন করিল—বাবু!

—কি লিখেছে বেশ বুঝতে পারছি না রে! আচ্ছা নিতাই কে? নিতাই ত তোর সেই ছেলে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ—কেমন আছে সে—কোথা আছে?

পোষ্টমাষ্টার নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দীনু বলিল—নিতাই নাই!

পোষ্টমাষ্টার নীরব হইয়াই রহিলেন। দীনুও মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল। কত কথা এলোমেলো ভাবে তাহার শোকাতুর মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সবই নিতাইয়ের কথা।

পোষ্টমাষ্টার অপরাধীর মত বলিলেন—আনন্দ ক'রে চিঠিটা খুললাম দীনু, কিন্তু শেষ আমিই তোকে এই খবরটা দিলাম!

দীনু চমকাইয়া উঠিল—তাহার মনে পড়িল—সে নিজেই ত চিঠিখানা আনিয়াছে!

থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—উঃ, এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে! কত—কত—কত—সংখ্যা হয় না! মনে হইল আজও পর্য্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে!

সে চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল

—আমি আর কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।

রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন

(১৭৯৭—১৮১৪)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

রামমোহন রায়ের বয়স যখন প্রায় সাড়ে চব্বিশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা রামকান্ত রায়, ১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর (১২০৩ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ) তারিখে সম্পাদিত একখানি বণ্টনপত্রের দ্বারা, নিজের প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তি তিন ভাগে বিভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দান করিয়াছিলেন। মধ্যম পুত্র রামমোহন রায়ের ভাগে লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীর অর্দ্ধাংশ, কলিকাতা জোড়াসাঁকো পুকুরসহ একখানি বাড়ী, এবং ৯০ বিঘা জমি পড়িয়াছিল। বাঁটোয়ারার প্রায় ৯ মাস পরে, ১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (১২০৪ সনের ভাদ্র মাসে), রামমোহন রায় নিজের পরিবার (wives) লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে, মাতা তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে, রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিষয়কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন।* বাঁটোয়ারার পূর্ব্বে রামমোহন রায় কি কাজ করিতেন, এবং বাঁটোয়ারার পরে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কি কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। পরবর্ত্তী কালে তিনি কোম্পানীর কাগজ বেচা-কেনা করিতেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। সুতরাং অনুমান হয় কোম্পানীর কাগজের কারবার তাঁহার বরাবরই ছিল।†

* গুরুপ্রসাদ রায়ের জবানবন্দী; তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। অন্যান্য আদালতের কাগজপত্রের মত মহামান্য হাইকোর্টের কাগজপত্রের সহি মোহরের নকল না লইলে তাহা প্রকাশ করা যায় না। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদারকে গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহন রায় এবং দুর্গা দেবী বনাম রামমোহন রায় এই দুই মোকদ্দমার হস্তলিখিত নকল লইয়া প্রকাশিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই লেখক ডাক্তার মজুমদারের সহিত হাইকোর্টে গিয়া এই সকল নকল মিলাইয়া লইয়াছেন। মহামান্য হাইকোর্টের ওরিজিনেল বিভাগের রেজিষ্ট্রার এ এল কলেট সাহেব (M. A. L. Collet) এবং রেকর্ড কিপার শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সেনগুপ্ত এই কার্য্যে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

† গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দী; ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর। গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দী; ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর।

কলিকাতায় আসিয়া বিষয়কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া [রাম]মোহন রায় এত দ্রুত এত দূর উন্নতি লাভ করিয়া[ছিলেন] যে বৎসরেক পরে তিনি কোম্পানীর সিভিল ক[র্ম্মচারী] মাননীয় এণ্ড্রু রামজেকে (Honorable An[drew] Ramsay, a Civil Servant) ৭৫০০৲ সাত [হাজার] পাঁচ শত টাকা ধার দিতে সমর্থ হইয়াছিলে[ন।*] তার পর, ১৭৯৯ সালের ১৫ই জুন (১২০৬ সনের আষাঢ়) তিনি গঙ্গাধর ঘোষের নিকট হইতে ৩[১০০৲] তিন হাজার এক শত টাকা মূল্যে গোবিন্দপুর ত[ালুক] এবং আপনার খুড়তুত-ভাই রামতনু রায়ের নিকট [হইতে] ১২৫০৲ বার শত পঞ্চাশ টাকা মূল্যে রামেশ্বরপুর ত[ালুক] খরিদ করিয়াছিলেন।†

দুই তিন বৎসরের মধ্যে রামমোহন রায়ের বিষ[য়ের] এত উন্নতি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে [পারে] তিনি কি উপায়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত [উন্নতি] লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? অসাধারণ [প্রতিভা]সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সুযোগ উপস্থিত হইলে [ইহা] অসম্ভব নহে। বাঁটোয়ারার পূর্ব্বে নিজের উপার্[জ্জিত] বা পিতৃদত্ত কিছু মূলধন হয়ত তাঁহার ছিল। ৪৩[৫০৲] টাকা মূল্য দিয়া রামমোহন রায় যে দুই[খানি] তালুক খরিদ করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক মু[নাফা] দাঁড়াইয়াছিল ৫৫০০৲ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা।‡ সুত[রাং] এই দুইখানি তালুকই তাঁহার বৈষয়িক উন্নতির [মূল] হইয়াছিল।

* গোলোকনারায়ণ সরকারের জবানবন্দী।

† রাজীবলোচন রায়ের বরাবরে রামমোহন রায়ের ফারসি কব[ালা] বাংলা-গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড-বিভাগের মৌলবী আজিজর রহমান খাঁ-স[াহেব] ফারসি দলীলের পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

‡ রাজীবলোচন রায়ের জবানবন্দী। বেচারাম সেনের জবানবন্দী

১নং চিত্র : রাজা রামমোহন রায়ের দস্তখতী ফার্সী কবালা

মহামহিম শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী রাজীব লোচন রায় কস্য একরার নামা পত্রমিদং
কার্য্যঞ্চ আগে আমি আপনকার অনুমতি ক্রমে ও আপনকার
টাকায় নাং রামেশ্বরপুর মৌজানকে পরগনে [illegible] একটি
গোবিন্দপুর মৌজানকে পরগনে জাহানাবাদ জেই নাটের সদর জমা
সবলগে ২১৮১৮৷১৩ একুইস হাজার আটসত আটাসিয়া তঙ্কা বার আনা
তিন গণ্ডা ৪০০১ চারি হাজার এক টাকা সিক্কা পানে শ্রী রামমোহন রায়
তালুকদার হস্তে সন ১২০৬ সালের ৭ পৌষ কোবালা করিয়া আপনার
আপন নামে আপনকার বিনামীতে খরিদ করিলাম এই ইস্নাটের মালিকত্ব
দান বিক্রের অধিকারী আপনি আমার সহিত কিম্বা আমার ওয়ারিসানের
সহিত কিছু এলাকা নাই কোন মিছা দাওয়া আমি ইহাতে করি কিম্বা
কেহ করে বাতিল এবং মিথ্যা এতদার্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম
ইতি সন ১২০৬ বারসত ছয় সাল তারিখ ৭ সাতই পৌষ।

ইসাদ

শ্রী ব্রজরাজ সিং
সাং [illegible]
পং জাহানাবাদ

শ্রী [illegible]
সাং রঘুনাথপুর

শ্রী [illegible]
সাং [illegible]

২নং চিত্র : রাজীবলোচন রায়ের একরার-পত্র

১৭৯৯ সনের শেষভাগে রামমোহন রায় পাটনা, বারাণসী এবং অন্যান্য দূর দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এমন উন্নতিশীল কারবার আরম্ভ করিবার পরে কেন যে রামমোহন রায় এই সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা বলা সহজ নহে। তাঁহার অনুপস্থিতে যাহাতে তালুক দুইখানির শাসন-সংরক্ষণের কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারে তজ্জন্য তিনি উহা রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে সাফ কবালা করিয়া দিয়াছিলেন। এই কবালা পারস্য ভাষায় লিখিত (১ নং চিত্র)। কিন্তু রামমোহন রায় এই দলীলে বাংলায় নাম দস্তখত করিয়াছেন—

শ্রীরামমোহন রায়
সাকিম লাঙ্গুড়পাড়া
পরগণে বায়ড়া—

এই দলীলে রামমোহন রায়ের পিতামহ মৃত ব্রজবিনোদ রায়ের নাম আছে, এবং দুইখানি তালুকের মোট সদর জমা লেখা আছে ২১৮৬৮৫১৯, এবং নামতঃ মূল্য ৪০০১৲। এই দলীলের তারিখ ১২০৬ সন, ৭ই পৌষ (১৭৯৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর)। বিনামদার রাজীব-লোচন রায় রামমোহন রায়ের বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল চন্দ্রকোণা পরগণার অন্তর্গত জাড়া মৌজায়। চন্দ্রকোণা সেকালে বর্দ্ধমান (এখন মেদিনী-পুর) জেলার অন্তর্গত।

রামমোহন রায় যখন বিদেশ-ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়া-ছিলেন তখন তাহার কোনও সন্তান ছিল না। সুতরাং বিদেশে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তালুক দুইখানি যাহাতে তাঁহার ভগিনীর একমাত্র পুত্র, তৎকালে দশ-এগার বৎসর বয়স্ক, গুরুদাস মুখোপাধ্যায় পাইতে পারে এই জন্য রামমোহন রায় রাজীবলোচন রায়ের দ্বারা গুরুপ্রসাদের বরাবরে একখানি একরার-পত্র লেখাইয়া লইয়াছিলেন (২ নং চিত্র)। এই একরার-পত্রে লিখিত হইয়াছে—

"মহামহিম শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরেষু। লিখিতং শ্রীরাজীবলোচন রায় কস্য একরার নামা পত্রমিদং কায্যঞ্চ আগে আমী আপনকার অনুমতি ক্রমে ও আপনকার টাকায় লাট রামেশ্বরপুর মোতালকে পরগনে চন্দ্রকোনা ও লাট গোবিন্দপুর মোতালকে পরগনে জাহানাবাদ জে দুই লাটের সদর জমা মবলগে ২১৮৬৮৫১৯ একুইস হাজার আট সত আটসট্টি তঙ্কা বার আনা উনিস গণ্ডা ৪০০১ চারি হাজার এক টাকা সিক্কা পণে শ্রীরামমোহন রায় তালুকদার হইতে ১২০৬ সালের ৭ই পৌষে কোবালা করিয়া আমার আপন নামে আপনকার বিনামীতে খরিদ করিলাম এই দুই লাটের মালিক ও দান বিক্রীর অধিকারী আপনী আমার সহিত কিম্বা আমার ওয়ারিসানের সহিত কিছু এলাকা নাই কোন মিছা দাওয়া আমী ইহাতে করি কিম্বা কেহ করে সে বাতিল এবং মিথ্যা এতদার্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২০৬ বার সত ছয় সাল তারিখ ৭ সাতএী পৌষ।"

এই দলীলের সাক্ষীগণের মধ্যে এক জন, শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা, সাং রঘুনাথপুর। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। এই একরার-পত্র সম্পাদিত হইবার পরের বৎসর রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

অনুপস্থিতে তালুকরক্ষার এবং উত্তরাধিকারের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ১৮০০ সালের আরম্ভেই বোধ হয় রামমোহন রায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। কত দিন তিনি বিদেশে ছিলেন তাহা জানা যায় না। বোধ হয় ১২০৮ (১৮০১—১৮০২) সনে তিনি কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। এই বৎসর গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাহার কলিকাতার তহবিলদার নিযুক্ত হইয়াছিল। গোপীমোহনের জবানবন্দীতে ১৮০১ হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের কলিকাতার কারবারের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কলিকাতায় রামমোহন রায়ের স্থায়ী দপ্তর বা গদি ছিল। ১২০৯ সনে (১৮০২ সালে) রামমোহন রায়ের আদেশমত গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় টমাস উডফোর্ড (Thomas Woodforde) নামক কোম্পানীর এক জন সিভিল কর্ম্মচারীকে ৫০০০৲ পাচ হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই উডফোর্ড সাহেবের সহিত পরিচয়ের ফলে রামমোহন রায়ের চাকরী আরম্ভ হইয়াছিল। উডফোর্ড সাহেব ঢাকা-জালালপুরের (ফরিদপুরের) অস্থায়ী কালেক্টার

নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৮০৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।* রামমোহন রায় উডফোর্ড সাহেবের সঙ্গে বা উডফোর্ড সাহেবের আহ্বানে ঢাকা-জালালপুর গিয়াছিলেন। ঢাকা-জালালপুরের কালেক্টরীর দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র ১৮০৩ সালের ৭ই মার্চ্চ পদত্যাগ করায় উডফোর্ড সাহেব রামমোহন রায়কে ঐ তারিখেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।† উডফোর্ড সাহেব ঐ সালের ১৪ই মে অস্থায়ী কালেক্টরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, ঐ তারিখেই রামমোহন রায়ও দেওয়ানের পদ ত্যাগ করিয়া বোধ হয় কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ১৮০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঢাকা-জালালপুর হইতে ফিরিয়া রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার একেশ্বরবাদী (Unitarian) পাদ্রি বন্ধু আডাম (William Adam) সাহেব লিখিয়াছেন, "রামমোহন রায় কথাপ্রসঙ্গে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বরে আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন তাঁহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন প্রাণবায়ু বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা একান্ত ভক্তিভরে 'রাম' 'রাম' বলিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"‡ রামমোহন রায় কলিকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।‡

উডফোর্ড সাহেব ১৮০৩ সালের ১১ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদের আপিল-আদালতের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।§ রামমোহন রায়ও বোধ হয় উডফোর্ড সাহেবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন, এবং সেইখানে তুহ্‌ফৎ-উল-মুয়াহিদ্দীন নামক একখানি ফার্সি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কত দিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন তাহা আমরা জানি না। সম্ভবতঃ ১৮০৫ সালের মে মাসে তিনি তাঁহার এক জন প্রধান বন্ধু এবং সহায় জন ডিগবীর চাকরী গ্রহণ করিয়া রামগড় যাত্রা করিয়াছিলেন। ডিগবী সাহেব ১৮১৭ সালে লণ্ডনে রামমোহনের কৃত "কেন" উপনিষদের এবং "বেদান্তসারে"র (Abridgment of Vedant) পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, ১৮০১ সালে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। ১৮০৫ সালের ৯ই মে ডিগবী সাহেব রামগড়ের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ১৮০৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত রামগড়ে ছিলেন।* এই সময় রামমোহন রায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই আড়াই বৎসরের মধ্যে তিন মাস কাল রামমোহন রায় রামগড়ের ফৌজদারীর সেরেস্তাদারের কার্য্য করিয়াছিলেন। বাকী সময় তিনি কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন? রংপুর হইতে ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত (O. C. 8 February 1810, No. 9) একখানি চিঠিতে ডিগবী সাহেব প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন, যখন আমি যশোহরের অস্থায়ী কালেক্টর ছিলাম, তখন রামমোহন রায় খাস-মুন্সীরূপে আমার সঙ্গে ছিলেন। রামমোহন রায় বোধ হয় আগে উডফোর্ড সাহেবের এবং পরে ডিগবী সাহেবের খাস-মুন্সীর পদে বরাবর নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার খাস-মুন্সীর এক কাজ হয়ত ছিল সাহেবকে ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেওয়া। ডিগবী সাহেবের চিঠিপত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, খাস-মুন্সী সাহেবের আফিসের কার্য্যেও সহায়তা করিতেন। সেকালে ফার্সি ছিল আদালতের চলিত ভাষা, এবং আমলাদিগের মধ্যে খুব কম লোকেই ভাল ইংরেজী জানিত। সুতরাং যে-সকল সাহেব কর্ম্মচারী ভাল ফার্সি জানিতেন না, তাঁহাদিগকে হয় আমলাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত, আর না-হয় বিশ্বস্ত খাস-মুন্সীর সহায়তায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। কালেক্টরের খাস-মুন্সীরূপে রামমোহন রায় কালেক্টরীর সকল বিভাগ সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর

* Board of Revenue, Mis. 8 February, 1803, No. 63.

† Board of Revenue, Mis. 11 March, 1803, No. 23.

‡ S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta 1913, p. 8.

‡ তারিণীদেবীর স্বেয়ার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন।

§ Dodwell and Miles, *Alphabetical List of the Bengal Civil Servants, London.* 1839। এই তালিকাভুক্ত টমাস উডফোর্ডের বিবরণ অসম্পূর্ণ। তিনি যে এক সময় ঢাকা-জালালপুরে কার্য্য করিয়াছিলেন এই তালিকায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

* Dodwell and Miles। রামগড় হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত; এক সময় ঐ জেলার প্রধান নগর ছিল।

ডিগবী সাহেব যশোহরের অস্থায়ী কালেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিন সপ্তাহ পরে (১৮০৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী) ভাগলপুরের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস ভাগলপুরে কাজ করিয়া আবার তিনি যশোহরে বদলী হইয়াছিলেন, এবং ১৮০৯ সালের ৩০শে জুন রংপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডিগবী সাহেবের সঙ্গে রামমোহন রায় যশোহর, ভাগলপুর এবং শেষে রংপুর গিয়াছিলেন।

১৮০৩ হইতে ১৮০৯ সালের মধ্যে রামমোহন রায় চারি খানি পত্তনী তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১২১০ সনে (১৮০৩-০৪ সালে) তাঁহার নায়েব জগমোহন মজুমদারের দ্বারা তিনি বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত লাঙ্গুড়পাড়া তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইহার কিছু কাল পরে, উক্ত মজুমদারের যোগে, ৭২৫্ টাকা মূল্যে ভুরসুট পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নামক পত্তনী তালুক খরিদ করা হইয়াছিল। ১২১৫ সালে (১৮০৮-০৯ সালে) রামমোহন রায় রাজীবলোচন রায়ের নামে জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত বীরলোক নামক পত্তনী তালুক, এবং ১২১৬ সনে (১৮০৯-১০ সালে) ঐ পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর নামক পত্তনী তালুক খরিদ করিয়াছিলেন।* গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের কর্ম্মচারী এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমায় তাহার পক্ষের সাক্ষী বেচারাম সেন তাঁহার জবানবন্দীতে এই চারিখানি তালুকের সদর-জমা এবং মূল্যের এই প্রকার হিসাব দিয়াছেন—

তালুকের নাম	সদর-জমা	মূল্য
লাঙ্গুড়পাড়া	প্রায় ৬০০্	---
শ্রীরামপুর	১৮০০্	১৩০০্
বীরলোক	১৬০০০্	১১০০০্
কৃষ্ণনগর	৫০০০্	৭১০০্

তার পর বেচারাম সেন বলিয়াছেন, এই চারিখানি তালুক হইতে রামমোহন রায় মোট পাঁচ-ছয় হাজার টাকা মুনাফা পাইতেন। বেচারাম সেন কিছু দিন রামমোহন রায়ের দপ্তরের মোহরের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তাহার পূর্ব্বে রাজীবলোচন রায়ের দপ্তরের মোহরের ছিলেন। সুতরাং এই সকল বিষয়ে খবর পাইবার তাঁহার সুযোগ ছিল। কিন্তু মুনাফার হিসাব দেখিতে গেলে বেচারাম সেন তিনখানি তালুকের যে-মূল্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অত্যধিক বলিয়া মনে হয়। রামমোহন রায়ের জবাবের সহায়তায় বেচারাম সেনের একটি ভুল সংশোধন করা যাইতে পারে। এই জবাবে উক্ত হইয়াছে, রামধন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে শ্রীরামপুর তালুক সিক্কা ৭২৫্ মূল্যে খরিদ করা হইয়াছিল। বেচারাম সেন বলিয়াছেন শ্রীরামপুরের মূল্য ১৩০০্ টাকা। রামমোহন রায়ের জবাবে আর তিনখানি তালুকের মূল্য উল্লিখিত হয় নাই। কৃষ্ণনগর এবং শ্রীরামপুর তালুকের মূল্যের টাকা দেওয়া সম্বন্ধে বেচারাম সেন বলিয়াছেন, এই টাকা সাক্ষীর (বেচারাম সেনের) সাক্ষাতে লাঙ্গুড়পাড়া হইতে বর্দ্ধমানে পাঠান হইয়াছিল (money was despatched to Burdwan from Langulparah in the presence of him this deponent)। বীরলোক তালুকের মূল্যের টাকা সম্বন্ধে বেচারাম সেন বলিয়াছেন, "আমার সাক্ষাতে জগন্নাথ মজুমদার কতক টাকা রামমোহন রায়ের নগদ তহবিল হইতে (partly out of the funds in his hands belonging to the said Rammohun Roy) দিয়াছিলেন, এবং কতক টাকা রামমোহন রায়ের নামে ধার করিয়া দিয়াছিলেন।" (partly with money which he borrowed on the credit of the said Rammohun Roy)।

১৮০৯ সালের ২০শে অক্টোবর ডিগবী সাহেব রংপুরের স্থায়ী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০৯ সনের নবেম্বর মাসের গোড়ায় রংপুরের কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ খালি হওয়ায় ডিগবী সাহেব রামমোহন রায়কে ঐ পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া ঐ নিয়োগ অনুমোদন করিবার জন্য ৫ই নবেম্বর রেভিনিউ বোর্ডকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে রামমোহন রায়ের যোগ্যতার এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

A man of very respectable family and excellent education; fully competent to discharge the duties of such an office, and from a long acquaintance with him I have reason to suppose

* রামমোহন রায়ের জবাব।

he will acquit himself in the capacity of Dewan with industry, integrity and ability" (O. C. 14 December 1809, No. 23.)

রামমোহন রায় "অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং সুশিক্ষিত; এই পদের কার্য্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ যোগ্য; এবং দীর্ঘকালের পরিচয়ের ফলে আমি অনুমান করিতে পারি যে তিনি শ্রমশীলতার, সততার এবং যোগ্যতার সহিত দেওয়ানের কার্য্য সম্পাদন করিবেন।"

এই পত্রের উত্তরে বোর্ড ডিগবী সাহেবের সুপারিশ অনুসারে রামমোহন রায়ের নিয়োগ মঞ্জুর না করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ইনি কাহার অধীনে কোন্ কোন্ সরকারী চাকরি করিয়াছেন এবং কে তাঁহার জামীন হইবে। উত্তরে ডিগবী সাহেব রামমোহন রায়ের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিলেন তাহাতে বোর্ড সন্তুষ্ট হইলেন না।* রামমোহন রায় যে ১৮০৩ সালের ৭ই মার্চ্চ হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত ঢাকা-জালালপুরের কালেক্টরীর দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন এই কথা ডিগবী সাহেব উল্লেখ করিয়াছিলেন না। বোর্ড রামমোহন রায়কে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত রাখিতে অসম্মত হওয়ায় ডিগবী সাহেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারীর চিঠিতে (8 February, 1810, No. 9) সেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডিগবীর এই কড়া চিঠির উত্তরে বোর্ড তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "বোর্ড তাঁহার লিখনভঙ্গীর (style of addressing them) তীব্র নিন্দা করেন (greatly disapprove) এবং ভবিষ্যতে বোর্ডের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে বোর্ড তাহা ক্ষমা করিবেন না" (O. C, 8 February 1810, No. 10)।

১৮১৪ সালের ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত, প্রায় পাঁচ বৎসর কাল, ডিগবী সাহেব রংপুরের কালেক্টর ছিলেন, এবং এই পাঁচ বৎসর রামমোহন রায় রংপুরে বাস করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের কলিকাতার তহবিলদার গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়া গিয়াছেন, বিদেশে চাকরী করিবার সময় রামমোহন রায় সময়-সময় আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতেন, কিন্তু তিনি দুইবার মাত্র লাঙ্গুড়-পাড়া গিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যখন রংপুরে ছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় একাদিক্রমে চারি বৎসর তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন।† রংপুরে ১৮১২ সালের ১৪ই জানুয়ারী গুরুদাস রামমোহন রায়কে গোবিন্দ-পুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক সাফ কবালা করিয়া দিয়া-ছিলেন। এই কবালা ফার্সি ভাষায় লিখিত (৩ নং চিত্র)। এই কবালার এক জন সাক্ষী শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা, সাকিম পালপাড়া। এই নন্দকুমার শর্ম্মা অবশ্য পূর্ব্বোল্লিখিত নন্দ-কুমার বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং দেখা যায়, ইনিও রামমোহন রায়ের সঙ্গে রংপুরে ছিলেন। গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত কবালায় তাঁহার পিতা শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের নাম আছে। ১৮১২ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখেই এই কবালাখানি রেজেষ্টারী করা হইয়াছিল। ইহাতে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার জন ডিগবীর স্বাক্ষর আছে।

১৮১২ সালের চৈত্র (মার্চ্চ-এপ্রিল) মাসে রামমোহন রায়ের অগ্রজ জগমোহন রায় পরলোকগমন করিয়াছিলেন।‡ গুরুদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন, তিনি রংপুর থাকিতে জগমোহন রায়ের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার পিতা পত্রদ্বারা তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। জগমোহন রায়ের মৃত্যুসময়ে গুরুদাস মুখোপাধ্যায় যখন রংপুরে ছিলেন, তাঁহার মাতুল রামমোহন রায়ও তখন রংপুরে ছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। সুতরাং

* ১৮০৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ডিগবী সাহেব বোর্ডকে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন সেই মূল চিঠির (O. C.) পৃষ্ঠে B. C. স্বাক্ষরযুক্ত, তৎকালে বোর্ডের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট ক্রিস্প (Crisp) সাহেবের পেন্সিলে লিখিত এবং বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায় দুইটি মন্তব্য আছে। ইহার একটি মন্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন - "I understand that the man recommended by Mr. Digby was formerly in the confidential employ of Mr. Woodforde when acting collector of Dacca-Jallalpore. I have also heard unfavourable mantion of his conduct as seristadar of Rangpur." উডফোর্ড সাহেবের confidential employ অর্থ তাঁহার খাস-মুন্সীগিরি; ফৌজদারীর সেরেস্তাদার রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে ছিল না। সুতরাং বোর্ডের নিকট সেরেস্তাদারের আচরণ সম্বন্ধে খবর পৌঁছা সম্ভব নহে। ডিগবী সাহেবের চিঠির উত্তরে বোর্ড তাঁহার নিকট এই মন্তব্যের নকল পাঠান নাই, এবং তিনিও ইহার উত্তর দিবার অবকাশ পান নাই। সুতরাং ক্রিস্প সাহেবের মন্তব্যে উল্লিখিত গুজব ধর্ত্তব্য নহে।

† গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দী।

‡ গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জি

জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। তিনি যদি কলিকাতায় থাকিয়া নিজে কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার কাজ করিতেন, এবং আর যে কারবার চলিতেছিল তাহা এবং তালুকদারী নিজে দেখাশুনা করিতেন, তবে বোধ হয় তাঁহার আরও বেশী আয় হইত। যদি কেহ বলেন, ভবিষ্যতে কালেক্টরীর দেওয়ানী পদ লাভের আশায় তিনি খাস-মুন্সীর চাকরী লইয়াছিলেন, বোর্ডের ১৮১০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠি সেই আশা চিরতরে ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। তথাপি মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া * তার পরও রামমোহন রায় সাড়ে চারি বৎসর কাল ডিগ্‌বী সাহেবের খাস-মুন্সীর চাকরী করিতে সম্মত হইলেন কেন? অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া রামমোহন রায় বার বৎসর চাকরী করিয়াছিলেন এই কথা বলিতেই হইবে। তাহার উপর, নিজের সমস্ত বিষয়কর্ম্ম কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, অনেকটা বিপদও ঘাড়ে লইয়াছিলেন। আমাদের অনুমান হয়, এই ত্যাগস্বীকার করিয়া, এই বিপদ মাথায় লইয়া, রামমোহন রায়ের বিদেশে চাকরী করিতে যাওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল, তিনি পরে কলিকাতায় আসিয়া যে মহাব্রত অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তজ্জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, এবং গৌণ লক্ষ্য, কলিকাতা হইতে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকায় যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল চাকরীর বেতনের টাকার দ্বারা কতক পরিমাণে তাহার পূরণ করা।

রামমোহন রায়ের জীবনের মহাব্রত সাধনের জন্য অর্থ এবং বিদ্যা এই দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখিয়াছি বাঁটোয়ারার পর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অর্থসঞ্চয়ের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যার মধ্যে সংস্কৃত, ফার্সি, আরবী তিনি আশৈশব অনুশীলন করিয়াছিলেন। বাকী ছিল, এবং বিশেষ আবশ্যক ছিল, ইংরেজী বিদ্যা। ১২ বৎসর কাল সাহেবদিগের চাকরী করিয়া রামমোহন রায় সুন্দর রূপে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ডিগবী-সাহেব পূর্ব্বোল্লিখিত "কেন" উপনিষদের এবং "বেদান্ত সারের" ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

"At the age of twenty-two [really twenty-four, *i. e.* in 1796] he commenced the study of the English language, which not pursuing with application, he five years afterwards [1801], when I became acquainted with him, could merely speak it well enough to be understood upon the most common topics of discourse, but could not write it with any degree of correctness. He was afterwards employed as Dewan, or principal native officer, in the district in which I was for five years Collector in the East India Company's Civil Service. By perusing all my correspondence with diligence and attention, as well as by corresponding and conversing with European gentlemen, he acquired so correct a knowledge of the English language as to be able to write and speak it with considerable accuracy. He was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the continental politics chiefly interested him."†

এই ইংরেজী বচনে বন্ধনীর মধ্যে যে কয়েকটি কথা আছে তাহা মিস্ কলেট যোগ করিয়া দিয়াছেন। ডিগবী সাহেবের সংস্কার ছিল, রামমোহন রায় ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিস্ কলেট অন্যান্য প্রমাণ অনুসারে স্থির করিয়াছেন, রামমোহন রায়ের জন্ম হয় ১৭৭২ সালের মে মাসে। উভয়ের মতে রামমোহন রায়ের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল ১৭৯৬ সালে। এই সালের ১লা ডিসেম্বর রামকান্ত রায়ের বণ্টনপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল। বাঁটোয়ারার পূর্ব্বাবধিই বোধ হয় রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে এবং ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে, ১৮০১ সালে, ডিগবী সাহেবের সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম আলাপ হয়, তখন তিনি ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেন, কিন্তু শুদ্ধ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল যখন তিনি ডিগবী সাহেবের চাকরী লইয়া তাঁহার আফিসের

*১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারীর চিঠিতে ডিগবী সাহেব Boardকে লিখিয়াছেন,

"Being thoroughly acquainted with the merits and abilities of Rammohun Roy, it would be very repugnant to my feelings, to be compelled so far to disgrace him in the eyes of the natives as to remove him from his present employment." (O. C. 8 February, 1810, No. 9.)

† Collet, *op. cit.* P. 15.
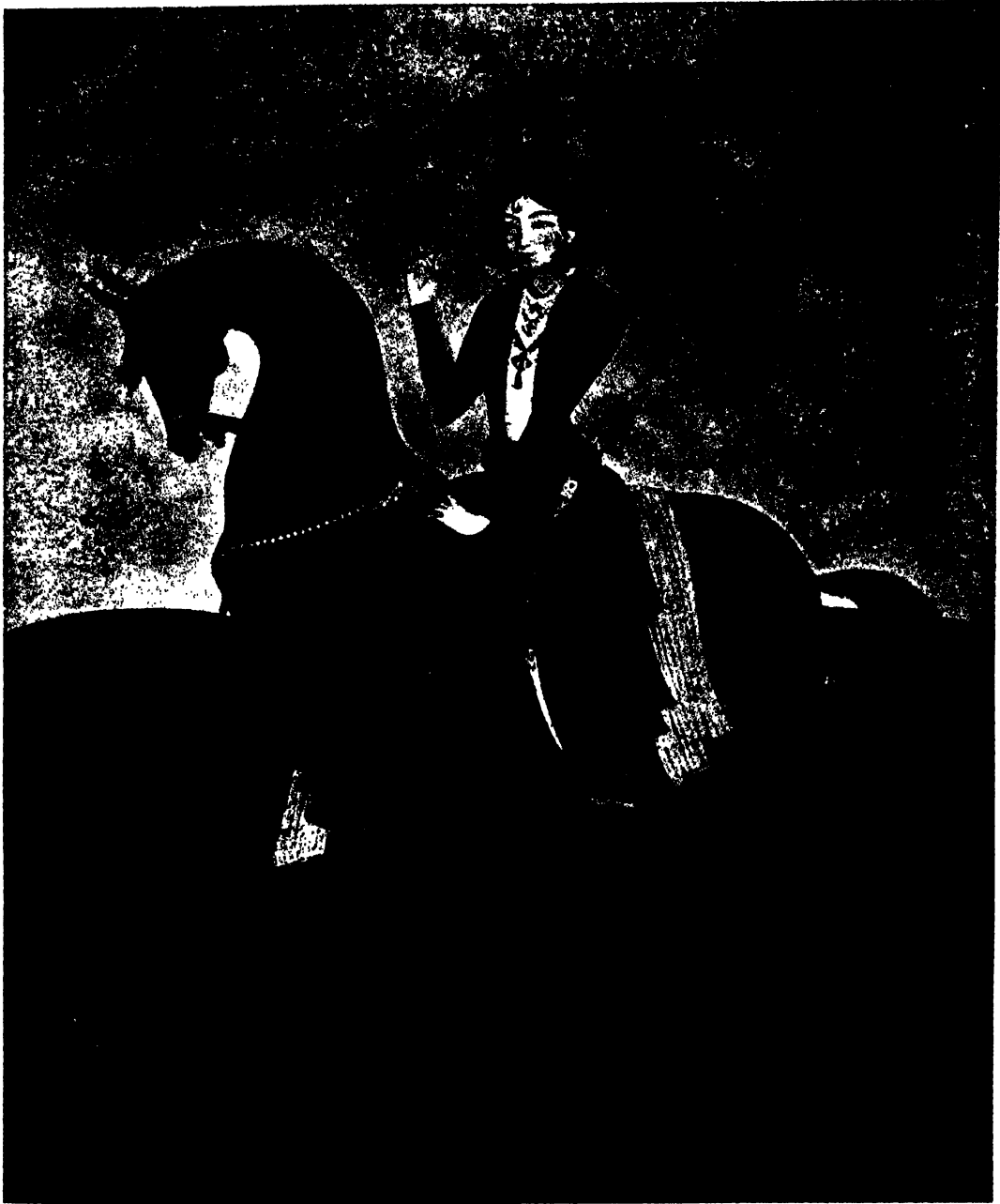
কাগজপত্র নিয়মমত পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সর্ব্বদা মনোযোগ-সহকারে এই সকল কাগজপত্র পড়িয়া, ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িয়া, এবং সাহেবদিগের সহিত ইংরেজীতে আলাপ করিয়া তিনি অবশেষে ইংরেজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের অর্থ সম্বন্ধে যেমন, বিদ্যা সম্বন্ধেও তেমনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি অপবাদ না হউক, অমূলক সংবাদ, প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"But we would have it distinctly understood that his English writings do not furnish legitimate criterion of his English knowledge." *

"আমরা চাই যে (লোকে) পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া রাখুক যে তাঁহার (রামমোহন রায়ের) ইংরেজী পুস্তকগুলি তাঁহার ইংরেজী জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় দেয় না।"

রামমোহন রায়ের নামে চলিত ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকৃতপ্রস্তাবে কাহার রচনা, এই সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া-মিত্র মহাশয় একটি মাত্র প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন—

"It had been remarked by those who came into contact with him that he wrote English much better than he spoke it."

অর্থাৎ যাঁহারা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তিনি যেরূপ ইংরেজী বলিতেন তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল ইংরেজী লিখিতেন, এবং এই প্রমাণের উপরে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রামমোহন রায়ের নামে প্রচারিত ইংরেজী রচনা অন্যে লিখিয়া বা সংশোধন করিয়া দিতেন।† রামমোহন রায়ের বিনামায় ইংরেজী লেখক বা তাঁহার রচনার সংশোধক সম্বন্ধে মিত্র-মহাশয় একবার বহুবচন (European friends) এবং আর একবার একবচন (intelligent and educated friend) ব্যবহার করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রথম ইংরেজী পুস্তিকা, বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদ (Abridgment of Vedanta) ১৮১৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর গভর্ণমেণ্ট গেজেটে (Government Gazette-এ) সমালোচিত হইয়াছিল; অর্থাৎ ১৮১৫ সালের শেষভাগে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র এই পুস্তিকার মুখবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারেন নাই।

যখন এই মুখবন্ধ লিখিত হইয়াছিল তখন কোন্ ইউরোপীয় বন্ধু বা পণ্ডিত যে রামমোহন রায়ের সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। সুতরাং ইংরেজী বেদান্তসারের মুখবন্ধটি রামমোহন রায়ের নিজের রচনা, এবং তিনি ভাল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। ডিগবী সাহেবের পূর্ব্বোদ্ধৃত অভিমত এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে।

ইংরেজী শিখিবার জন্যই কি রামমোহন রায় উডফোর্ড সাহেবের এবং ডিগবী সাহেবের খাস-মুন্সীর চাকরী লইয়া বার বৎসর এক প্রকার অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন? ইংরেজী বিদ্যালাভ এবং কিঞ্চিৎ অর্থলাভ ভিন্ন আর কি লাভের জন্য যে তিনি কলিকাতার পশার ফেলিয়া এতকাল মফস্বলে চাকরী করিয়াছিলেন তাহা এখন বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ১৭৯৭ হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন যে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অনুষ্ঠিত মহাব্রতের জ্ঞানতঃ আরব্ধ উদ্যোগপর্ব্ব এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ডিগবী সাহেব ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গেলে, রামমোহন রায় বেকার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া অগত্যা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে এবং সানুবাদ বেদান্তদর্শন এবং উপনিষৎ ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না। প্রচারক এবং সংস্কারক রামমোহন রায়ের জীবনের সহিত তাঁহার বৈষয়িক জীবন অচ্ছেদ্য সূত্রে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। পরজীবনের কথা উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বজীবনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে ভুল না হইয়া পারে না।

* Calcutta Review, vol iv, 1845, p. 364.

† ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী লেখক বলিয়া যশস্বী আরও অনেকে ইংরেজী বলেন যেরূপ, লেখেন তার চেয়ে অনেক ভাল। ইহাদের ইংরেজী কে লিখিয়া দেয়?

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে রামমোহন রায়ের খুব ভাল ইংরেজী লিখিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্যত্র যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

আশ্বিনের প্রবাসীর শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪৫	২	২৮	১৭২২	১৭৭২
৮৪৭	১	১১	ষ্টেণ্ডফোর্ড	সানফোর্ড
"		"	Standford	Sanford
৮৪৯	২	২১	Burnoo	Bursoot
৮৫০	১	৩৩	১৮০৪ সালের ১৫ই কি ১৬ই ফেব্রুয়ারী	১৮০৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী
৮৫২	২	১৫	"পথ্যপ্রদান"	"পালঙ্পীড়ন"

খুড়ীমা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি। বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। বর্ষা-বাদল না হইলে বিনোদ-মাষ্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি বাদলাই নামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং আমার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল। আজও মনে আছে লোকটার গায়ে একটা ময়লা চিট্ কামিজ, খালি পা, রুক্ষ চুল। বয়েস বুঝিবার উপায় নাই, অন্ততঃ আমার পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এত দিন ছিলাম মামার বাড়ীতেই। এ-গ্রামে আমি আসিয়াছি বেশী দিন নয়। যখন চলিয়া গিয়াছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাষ্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর?

লোকটা উঠানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া বলিতে গেলাম—আসুন না ওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাষ্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—কি চাই পরেশ? লোকটা আর একবার কেমন এক ধরণের হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরণের হাসা উচিত ছিল তেমন নয়—যেন নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক হাসি হাসিতেছে। ছেলেমানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা অসংলগ্ন ধরণের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জ্যাঠতুতো ভাই শীতল বাড়ীর ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে পরেশ-কাকা কোথা থেকে? কোথায় ছিলেন এত দিন?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটি মুড়ি আনিয়া লোকটার কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন, এমন সময় লোকটা একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদা'র দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকীগুলি একবার রাইট্-য়্যাবাউট্-টার্ণ করিয়া ঘুরপাক খাইয়া উঠানময় কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে কি একটা দুর্ব্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার সুরে—

> গুগ্‌লি ঝিনুক খা—
> খোঁদার চাল গামছায় বাঁধি
> গুগ্‌লি ঝিনুক খা—
> গুগ্‌লি ঝিনুক—
> গুগ্‌লি ঝিনুক—

তখনও সে ঘুরপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন সময় আমার জ্যাঠামহাশয় দুর্লভ রায়—তিনি অত্যন্ত রাশভারী ও কড়া মেজাজের লোক—বাড়ীর ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে উঠান হইতে অন্দরে যাইবার দরজায় দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে চেঁচামেচি করে দুপুর-বেলা? ও পাগ্‌লাটা? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেন ও-রকম ক'রে ফেললে যে বড়—বদ্‌মায়েসী করবার আর জায়গা পাও নি?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পরে তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন—বেরোও এখান থেকে, আর কোনদিন দরজায় ঢুকেছ ত মেরে হাড় গুঁড়ো করবো—আমার বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়ের ধাক্কার বেগে রোগা ও পাতলা লোকটা খানিক দূর ছিটকাইয়া গিয়া কাদায়-পিছল

উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবার থুথু ফেলিল—রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের দরজায় জড় হইয়াছিল—লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমার মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েরই মুখুজ্যে-বাড়ীর ছেলে। পশ্চিমে কোথায় যেন চাকুরী করিত, বয়স বেশী নয় এই মাত্র পঁচিশ। হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথা খারাপ হওয়ার দরুন চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়া পথে পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সে যে-বাড়ীর ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্ম্ম করে, এখানে কেহ থাকে না, উন্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্য্যন্ত দেখায় নাই। পাগল পরের বাড়ী ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেয় না, মাঝে মাঝে মার-ধরও খায়।

এক দিন নদীর ধারে পাখীর ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় এক জন সন্ধান দিয়াছিল গাং-শালিকের অনেক বাসা গাঙের উঁচু পাড়ে দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াও পাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপরও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন ছায়া নামিয়াছে। বাড়ী ফিরিতে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাতলার শ্মশানে গ্রামের প্রহ্লাদ-কলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কে বসিয়া আছে।

ভয় হইল। ভূত নয়ত?

একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘরের মেজেতে শ্মশানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—একটা পয়সা আছে কাছে?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া সবাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলাম। আমি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্য্যন্ত মার খাইয়াছে ছাড়া মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একটা দগ্‌দগে ঘা, ঘায়ে মাছি বসিতেছে, পাশে একটা মাটির মালসায় কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জঙ্গলের মধ্যে আছেন কেন কাকা? আসবেন আমাদের বাড়ী? আসুন, শ্মশানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, শ্মশান বুঝি, এ ত আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ী রয়েছে, দোমহলা বাড়ী। দু-হাজার টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরি করে টাকা জমাই নি ভেবেছিস?

কত করিয়া খোসামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাদুর ছাড়িয়া কিছুতে উঠিল না।

ইহার কিছু দিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামারা আসিয়া তাহাকে হুগলী লইয়া গিয়াছে।

দুই বৎসর পরে আমার উপনয়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচ করিয়াছিল।

কি সুন্দর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগল অবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা ধুলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতে পারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, দেখিয়া খুশী হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীর মেয়ে। বৈকালে আমাদের গ্রামে বৌ লইয়া পরেশ-কাকার আসিবার কথা—মনে আছে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুন বরবধূর পৌঁছিতে এক প্রহর রাত্রি হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া বরণ হইল। এসিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধূর মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ-সব অঞ্চলে অমন সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই

একবাক্যে বলিল বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছু দিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরে আবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকাদের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ীর সকলে তখন কি-একটা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। অনেক আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরি-পাড় শাড়ী পরনে, আমাদের স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গড়ানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মত মুখশ্রী।

আমরা সামনের উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে-ছিলাম। পরেশ-কাকার বৌ ওখানে বসিয়া থাকাতে সেদিন আমার যেন উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়িমাকে খুশী করি। সে কি লাফঝাঁপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিলাম হঠাৎ! গায়ে যেন দশ জনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ীর ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল? বেশ চোখ-দুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর পাবু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—ডাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদে ছুটাছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন তা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসের যে লজ্জা!

গিয়া প্রথমেই এক প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নাম কি? পাবু? ভাল নাম কি?

লজ্জা ও সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাণীব্রত—

তিনি বলিলেন—বাঃ বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড় ত? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাত্রে আনন্দে আমার বোধ হয় ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের দেবী কি রূপকথার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়?

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ী রোজ যাইতে আরম্ভ করিলাম, দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীমার সঙ্গে! আমার বয়স তখন বারো, খুড়ীমার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তাঁর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বিবাহের পর-বৎসর গ্রামে খবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরীস্থলে আবার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই হইল বাপের বাড়ী। পাগল হইবার সংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। খুড়ীমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই, খুড়ীমার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড় ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি পত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীমার আসিবার সংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও চেহারায় দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি সুকুমার, বিদ্যুতের মত রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তরে হাসিয়া খুড়ীমার সামনে মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—আপনি ভাল ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভাল থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু!

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীমার জন্য দুঃখ হইল। অভাগিনী খুড়ীমা!

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসে ব'সো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালবাস—না? ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি। পাবু, এ গাঁয়ে তোর মত ভালবাসে না কেউ আমায়।

লজ্জায় রাঙা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিতাম। তেরো বছরের ছেলে কি কথাই বা জানি!

—কলকাতা দেখেছ পাবু?

—না, কে নিয়ে যাবে?

—আচ্ছা, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। বেশ আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে, কেমন ত?

—কবে যাবেন খুড়ীমা? শ্রাবণ মাসে? না, এখন কিছু দিন থাকুন এখানে। যাবেন না এখন।

—কেন বল ত?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিতাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশী উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীমা নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্য খাবার করিয়া রাখেন, কোন দিন মোহনভোগ, কোন দিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে দেন। অনেক রকম ব্রত করিতেন, তার ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পয়সাই কত জমা হইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাক্সটাতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীমার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কত আবোলতাবোল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীমা বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই প'ড়ে শোনা দিকি? ভারি ভাল লাগে আমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে। তোর গলার স্বর ভারী মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং বেশ ভাল গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,
দেখা হবে মনে মনে।
আমার নিশীথ স্বপনে এসে
এস তন্দ্র আবরণে।

খুড়ীমা প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও ত?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীমাকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রায়-বাড়ীর বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম—কি জানি বাপু জানি নে, ও সব কলকেতার কাণ্ড। সোয়ামী যার পাগলাগারদে, তার এত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসের, অত পাতাকাটার বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশীই বা আসে কোথা থেকে! কিবে ঢং, কিবে শাড়ীর রং—না বাপু, আমার ত ভাল লাগে না—তবে আমরা সেকেলে বুড়ো-হাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান্ ত জানি নি?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অন্য অন্য লোকের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুষি লাগাইয়া দিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদের বলি—না, তোমরা জান না। তোমাদের মিথ্যা কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীমা ভাল—খুব ভাল।

কিন্তু যাহারা বলে তাহারা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বয়স অনেক বেশী। কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

তাঁহার চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব যে স্পষ্ট মনে আছে, তাহা নয়। কেবল এক দিনের তাঁর অপূর্ব্ব কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখ গভীর ভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল। যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কৌতুকপ্রিয়া, হাস্যমুখী সুন্দরী তরুণীকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঙ্গপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজনেগাছ, ঝোপঝাপ পঙ্গপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীমা ও আমি ছাদে দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—দু-জনের কেহই আর যে কখনও পঙ্গপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ খুড়ীমা বিস্ময়ে ও কৌতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, দ্যাখ দ্যাখ—রায়েদের নিমগাছে একটা পাতাও রাখে নি, শুধু গুঁড়ি আর ডাল, এমন কাণ্ড ত কখনও দেখি নি—ও মাগো!

বলিয়াই কৌতুকে ও আনন্দে বালিকার মত খিল্ খিল্

করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িল। আমাদের নদীর দু-ধারে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু শুভ্র মেঘখণ্ড বাদামবনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদের সায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরীশ-জ্যাঠাদের বড় আমবাগানের উপর দিয়া শুভরত্নপুরের মাঠের দিকে কোথায় উড়িয়া যায়···বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত সুরু করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাপিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই রহিয়া গেলেন। পরেশ-কাকাও পাগলাগারদ হইতে বাহির হইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ী তার ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নাম শাস্তিরাম, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালই। অল্প দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে সে কুটুম্ববাড়ী ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, যাইলেই অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার কিছু কাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তার নামের সঙ্গে খুড়ীমার নাম জড়াইয়া একটা কুকথা লোকে রটনা করিতেছে। এক দিন দুপুরের পরে খুড়ীমাদের বাড়ী গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পেঁপেতলার জানালার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শাস্তিরাম বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এক-মনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—কি খাবু, দুপুরবেলা বেড়ানো কি? পড়াশুনো করো না? যাও এখন যাও—

আমি শাস্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমার দুঃখ হইল যে খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি তখনই ওদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটি কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও খুব কমাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর তেমন করিয়া পাই না; শাস্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই, অসময় নাই, ছাদে কি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প করিতেছে—আমার যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শাস্তিরামের কথার উপর কোন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ায়-পাড়ায় যে-কথা রটনা হইতেছে তাহা আমার কানে প্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, খুড়ীমার উপর আমার ইহার জন্য কোনই রাগ নাই, যত রাগ শাস্তিরামের উপর। সে দেখিতে ফর্সা বটে, বেশ শহুরে-ধরণের গোছালো কথাবার্ত্তা বটে, সৌখীন সাজপোষাকও করে বটে, কিন্তু হয়ত তাহার সেই ফিট্‌ফাটের সাজগোজের দরুনই হোক্, কিংবা তাহার শহর-অঞ্চলের বুলির জন্যেই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমি কেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভাল না। বালক-মনের ভাল লাগা না-লাগার মূলে অনেক সময়ই কোন যুক্তি হয়ত থাকে না কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে বালকদের ধারণা বড়-একটা ভুল হয় না।

এক দিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রাণায় সর্ব্ব চৌধুরী ও কালীময় বাঁড়ুয্যে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটিমাছ-মারা ছিপ-হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকে দেখিয়া উহারা কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম। সর্ব্ব চৌধুরী বলিল—তাই ত ছোঁড়াটা যে আবার এখানে।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—বল, বল, ও ছেলেমানুষ কিছু বোঝে না।

সর্ব্ব চৌধুরী বলিল—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমরা এমন হ'তে দিতে পারি নে। একটা মিটিং ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন হ'য়ে উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরীর স্থানে, আর ওই শাস্তিরাম না কি ওর নাম—ওকে শাসন ক'রে দিতে হয়।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—শাসনটাসন আর কি—ওকে এ-গ্রাম থেকে চলে যেতে বলো। না যায়, আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরী ছেড়ে আসবে এখন

কুটুম্ব শাসন করতে? সে যখন বাড়ী নেই তখন আমরাই অভিভাবক।

সর্ব্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়ীটাও নাকি বড্ড বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—তাই ত শুনছি। বয়েসটা খারাপ কিনা? তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময়-জ্যাঠা আমাকে যতই বোকা ভাবুন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহারা হয়ত খুড়ীমাকে কোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিংবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে এ-কথা আমি বলিতে পারিব না—কোন মতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরের সংসারের শান্তি নষ্ট করিতে? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না? এত দিন কুটুম্ববাড়ী পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও ত হওয়া উচিত ছিল।

ইহার কিছু দিন পরে আমি কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিব বলিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মাকে ছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান্ হয়ে আসবে, কত বড় চাকুরী করবে! মনে থাকবে ত খুড়ীমার কথা?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলবো না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছিস্ ভুলবি নে কখনও পাবু?

জোর গলায় বলিলাম—কক্ষনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সজল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যই বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতে হইল বাবার কড়া হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন্ ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম? মাস ছয়-সাত পরে গরমের ছুটিতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-এক বার খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের কাহারা চাকদায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে—ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহনা ইত্যাদি। আরও একবার ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমা'র সঙ্গে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি ফেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এ-সব। কিন্তু এ-সব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার ত মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক্, এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আছে, তা নয়। আমার মনের সঙ্গে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিন্তু খুব সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় ত হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল। খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এ-খবর কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটী কি কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিলেই কত বার ভাবিয়াছি এই সব জায়গায় কোথাও হয়ত খুড়ীমা আছেন। নামিয়া কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপল্লীর সহিত তাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি

নাই কোন দিন। কেন, তাহা জানি, বোধ হয় বাল্যে কাঁচরাপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার একটা কারণ আছে। আমার মনে এ-কথা কে যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। যে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়া ফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান্ তাঁকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধ হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নূতন ভালবাসা, নূতন মুখ, নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনের অতি-মধুর হাসি ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল, কত নূতন মুখের নূতন হাসিতে দিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনে এ-রকমই হয়। এক দিন যাহাকে না দেখিলে বাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ এক দিন দেখা গেল তাহার নামটাও আজ মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই ওলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-হৃদয়ের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবান্ই রাখিয়াছেন।

কিসে জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কত কাল চলিয়া গিয়াছেন। পদ্মপালও আর কখনও তার পরে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিমগাছটি এখনও আছে। বেশী দিনের কথা নয়—বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়েদের বাড়ী জমাজমি সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটায় নজর পড়াতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলাম। বহু দিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা। পরক্ষণে দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের এক হাস্যমুখী বালিকার কৌতুক ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলক্ষিতে মনটা এমন একটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল যে দলিলের আলোচনার কোন উৎসাহ খুঁজিয়া পাইলাম না, দেখিলাম, খুড়ীমাকে ত এখনও ভুলি নাই!

বয়েস হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠার-উনিশ বছর বয়েস ছিল খুড়ীমার! কি ছেলেমানুষই ছিলেন!

মানুষের মনে মানুষ এই রকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বীথিপথ বহিয়া কত নববধূ গ্রামে আসিয়াছেন, গিয়াছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছর আগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিস্মৃতা হতভাগিনী তরুণী বধূটি আজও এই গ্রামে বাঁচিয়া আছেন।

ভীরু প্রেম

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রয়েছ কাছে কাছে
তবুও মনে পাছে
হারাই এই ভয় নিতি,
আঁচলখানি ঘিরে
মাটির দীপটিরে
আড়ালে রাখিবার রীতি।

এমনিতরো হায়
দ্বিধায় দিন যায়
যে জন প্রাণে পায় প্রীতি
কভু বা ফোটে হাসি,
অশ্রুজলে ভাসি
কভু বা ভোলে সব গীতি॥

তিব্বতী পরিবার

সম্ভ্রান্ত তিব্বতী পুরুষ

বিচিত্র শিরোভূষণে তিব্বতী রমণী

তিব্বতী রমণী সুতা কাটিতেছে

[রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]

তিব্বতী রমণী

তিব্বতী রমণীর বিচিত্র শিরোভূষণ

বিচিত্র শিরোভূষণে সজ্জিত তিব্বতী রমণী

তিব্বতী মাতা-পুত্র

[রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৬

তিব্বতের বিখ্যাত তান্ত্রিক কবি ও সিদ্ধপুরুষ জে-চুন্-মিলা-রে-পা'র নির্জ্জনবাসের স্থান বলিয়া লপ্-চী ভোটিয়া-দিগের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডুক্‌পা লামা ঐখানেই তাঁহার শেষজীবন নির্জ্জনবাসে অতিবাহিত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু লপ্-চীর পথের লা (গিরিসঙ্কট) তুষার-পাতে দুর্গম বলিয়া কিছুদিনের মত যাত্রা স্থগিত রহিল। কুতীতে বাসস্থান বসতি সবই ভাল, বিশেষতঃ লবণ-ক্রেতা-বিক্রেতা অনেক দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া ভীড় করিয়াছে, সুতরাং সেখানেই আরও কিছু দিন তাঁহার বিশ্রাম করা প্রয়োজন হইল। কুতী পৌঁছিবার পরদিনই আমি আমার পথপ্রদর্শক ও সাথীকে নেপালী তের মুহর (৫।১০) দিয়া বিদায় দিলাম। তাতপানী পর্য্যন্ত আসার জন্য তাহার পারিশ্রমিক চার মুহর ধার্য্য হইয়াছিল, সুতরাং ঐ হিসাবে তাহার প্রাপ্য আট মুহর মাত্র এবং তাহাই তাহার নিজের হিসাবে যথেষ্ট। আশাধিক দক্ষিণা পাওয়ায় অতি সন্তুষ্টচিত্তে প্রচুর লবণ কিনিয়া সে দেশে ফিরিয়া গেল।

বর্ষা আগতপ্রায়; এই সময়ের পূর্ব্বের দুই তিন মাস কাল কুতীর পথঘাট লোকে ভরা থাকে। নেপালীরা চাউল, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য লইয়া আসে এবং ভোটীয়ের দল ভেড়া বা চমরীর পৃষ্ঠে লবণ বোঝাই করিয়া আনে। কুতীতে অনেক নেপালী সওদাগরের দোকান আছে, তাহারা শস্য ও লবণ দুই-ই কিনিয়া রাখে, কেহবা বিনিময়ে সোডা শস্য বা লবণ গ্রহণ করে। লবণ ভিন্ন ভোটীয়েরা সোডাও বিক্রীর জন্য আনে; এই সকল পদার্থই তিব্বতের কয়েকটি হ্রদের কূলে পাওয়া যায় এবং এগুলির উপর শুল্কও নির্দ্ধারিত আছে। কুতীর এই বিরাট হাটে নেপালীরা যে-কোন ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকে কিন্তু ভোটীয়দের ভেড়া ও শত শত চমরীর পালের সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরেই থাকিতে হয়।

আমি যেদিন কুতী পৌঁছিলাম সেই দিনই কয়েক জন নেপালী ব্যবসায়ী শীগর্চীর (টশী-লুন্-পো) পথে কুতীতে আসিল। এই পথে শীগর্চী-লাসা-যাত্রী নেপালীরা এইখানেই ঘোড়া-ভাড়ার ব্যবস্থা করে। ভাড়া টশী-লুন্-পো পর্য্যন্ত ৪০-৪৫ সাং (তখন ১৲—দেড় সাং)। এক ঘোড়ায় অত দূর যাওয়া যায় না, পথে কয়েক বার ঘোড়া বদল করা প্রয়োজন। এই ভাড়ায় ঘোড়া বদল মায় খাওয়া থাকার ব্যবস্থা সবই ঘোড়া-ওয়ালা করে। আমিও আমার সঙ্গী এই সওদাগরের দলের সঙ্গে যাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহারা রাজী হইল না। চারি দিকেই নিরাশ হইলাম, এদিকে ডুক্‌পা লামার পূজায় লোকের সমাগম বাড়িয়াই চলিল। চাউল, "খাতা" ও অন্যবস্ত্র মুহর ক্রমেই স্তূপাকার ধারণ করিতে লাগিল, মাংস ও ডিম্বও নিবেদন হইতে থাকিল।

২৭শে মে ডুক্‌পা লামার নিকট "জোঙ্-পোন" (জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয়ের তলব আসিল। সঙ্গীর দলের কেহ কেহ আমাকেও ঐ সঙ্গে যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন "আমরা বলিব তুমি লদাখী"। কিন্তু আমার কি আর কাজ নাই তাই "আয় ষাঁড়, আমায় গুঁতো" এই উদ্দেশ্যে যাইব? সুতরাং ডুক্‌পা লামার দলে আমি যাই নাই। জোঙ্-পোন্ আগেই ডুক্‌পা লামার নাম শুনিয়াছিলেন, সুতরাং বিশেষ খাতির করিলেন, লামা মহাশয়ও ভাগ্য-ভবিষ্য গণনা ও মন্ত্র-পূজাপাঠ করিলেন। সন্ধ্যার সময় দল ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম এখন এক জন মাত্র জোঙ্-পোন্ আছেন, অন্য জন মৃত, তবে তাঁহার বিধবা সম্প্রতি কিছু কাজকর্ম্ম দেখেন। এখনও অন্য জোঙ্-পোন্ নিযুক্ত হন নাই। তিব্বতে প্রতি গ্রামে প্রধান (গোবা) আছে এবং প্রতি অঞ্চলে ইহাদের উপর জোঙ্-পোন্ থাকে, (জোঙ্ অর্থে কেল্লা এবং পোন্ অর্থে অধ্যক্ষ বা প্রধান কর্ম্মচারী) এবং এই জোঙ্ সাধারণতঃ পাহাড় বা টিলার উপর স্থাপিত হয়। কুতীর নিকট সেরূপ পাহাড় না-থাকায় কেল্লা নীচের ভূমিতে স্থাপিত।

ছোট ও বড় প্রদেশ হিসাবে জোঙ্-পোন্ পদেরও স্তরভেদ আছে এবং প্রতি জোঙ্ দুই জন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে যাহাদের মধ্যে এক জন গৃহস্থ ও অন্য জন সাধু-সন্ন্যাসী। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়, যেমন এখন কুতীতে হইয়াছে। জোঙ্-পোনের উপরে সাক্ষাৎ দালাই লামার গভর্ণমেণ্ট; ন্যায় ও ব্যবস্থা এই দুই ব্যাপারেই জোঙ্-পোনের যথেষ্ট অধিকার, এমন কি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এক-একটি রাজা বলিলেই হয়। ইহাদের নিয়োগ লাসা হইতেই হয় এবং অধিকাংশই দালাই লামার কৃপাপাত্রগণের আত্মীয় বা প্রেমাস্পদ। এখন যে জোঙ্-পোনের স্থান শূন্য তাহার বিরুদ্ধে এই প্রদেশের প্রজাগণ লাসায় আবেদন করে। দরবার তাহাদের দুঃখগাথা শুনিয়া বিরূপ হইয়াছেন এই শুনিয়া ঐ জোঙ্-পোন্ লাসার নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন এইরূপ শুনিলাম।

নেপাল-সরকারের নিয়ম অনুসারে ভোটদেশে বাণিজ্যের জন্য যাইতে হইলে নেপালী ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ পত্নীকে দেশে ছাড়িয়া যাইতে হয়। এই জন্য প্রায় সকল নেপালী ব্যবসায়ীর ভোটীয় স্ত্রী রক্ষিতা থাকে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যা হয়। তিব্বতের স্থানে স্থানে নেপালীদের বিশেষ অধিকার অনুসারে নেপালের প্রজাদের বিচার নেপাল-সরকার-নিযুক্ত বিচারক করে। এইরূপ বিচারকের নেপালী নাম 'ডিঠা'; কেরোং, কুতী শীগর্চী গ্যাঞ্চী ও লাসায় নেপাল-সরকারের ডিঠা আছে। লাসায় সহকারী ডিঠা ও নেপাল রাজদূত আছে, গ্যাঞ্চীতেও রাজদূত আছে। ইহাদের বিচারে ভোটীয় স্ত্রীর গর্ভজাত নেপালীর পুত্র নেপালের প্রজা, কন্যা তিব্বতের প্রজা! এইরূপ সন্তানের নেপালী নাম "খচরা"। তাহাদের মাতাপিতার সম্পত্তির উপর এই সন্তানদেরও কোন অধিকার থাকে না—পিতা স্বেচ্ছায় যাহা দেয় তাহাই তাহারা ভোগদখল করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সত্ত্বেও ইহারা নেপালী পিতা ও পতির কারবারের যেরূপ [illegible]তা করে তাহা আশ্চর্য্যজনক।

* * * *

৩০শে মে পর্য্যন্ত আমি অগ্রসর হইবার কোনই উপায় করিতে পারিলাম না। কুতীর নিকটস্থ নদীর পুলের পাশে রাহদারী (লম্-ইক্ অর্থাৎ পাসপোর্ট) দেখিবার লোক আছে, নদী পার হইবার পরও য়া-লেপ্-এ পুনর্ব্বার রাহদারী দেখাইতে হয়। যখন এই সব ঘাটি পার হওয়ার কোনও উপায় দেখিলাম না তখন ঠিক করিলাম মঙ্গোলীয় ভিক্ষু সুমতি-প্রজ্ঞকে বলিয়া দেখি তিনি যদি কিছু করিতে পারেন। তিনি তখন কুতীতেই ছিলেন, তাঁহাকে বলিলাম "আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।" তিনি মহা খুশী হইয়া বলিলেন, "আমি কাল লম্-য়িক আনিব এবং আমরা কালই এখান হইতে যাত্রা করিব।" তিনি ত নিশ্চিন্ত মনে একথা বলিলেন কিন্তু আমার ঘোর সন্দেহ ছিল কাজটা এতই সোজা হইবে কি না। আমি এক জন ভারতীয় "সাধু-বাবা"কে প্রায়ই দেখিতাম, যিনি দুই মাস যাবৎ এখানে আটকাইয়া আছেন, আগে যাওয়া বা ফেরা কোনটাই করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, একবার চেষ্টা করায় দোষ কি?

সেই রাত্রে এক নেপালী সওদাগরের গৃহে ভূত-প্রেত বিতাড়ন ও ভাগ্য প্রসন্ন করার জন্য পূজা-পাঠ করিতে ডুকৃপা লামার আমন্ত্রণ হইয়াছিল, আমি সেখানে চলিলাম। অনেক স্ত্রীপুরুষ বাল-বনিতার ভীড়ের মধ্যে এ-ব্যাপারের আয়োজন হইল। মনুষ্য-জঙ্ঘার হাড়ের বীণ, যুগ্ম নরকপালের ডমরু ইত্যাদি ভয়াবহ উপকরণ লইয়া সশিষ্য ডুকৃপা লামা পূজায় বসিলেন।

ঘৃত-দীপের ক্ষীণ আলোক ক্ষীণতর করা হইল, পূজারী বৃন্দকে পর্দ্দায় ঘেরা হইল। তাঁহাদের ঋষভ-কণ্ঠের মৃদুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ, ক্ষণে ক্ষণে ডমরুর নিনাদ ও তাহার সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুর করুণ ক্রন্দনের শব্দের মত হাড়ের বীণের স্বর, এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্রমুগ্ধ না হওয়া দুরূহ। পূজা অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল, তাহার পর সমবেত মণ্ডলীকে পূজা-জলে অভিষেক করিলে পরে সকলে নিদ্রার আয়োজন করিতে গেল।

৩১শে মে প্রত্যুষেই আমি যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একত্র করিতে লাগিলাম ও সুমতি-প্রজ্ঞকে লম্-য়িকের চেষ্টায় রওয়ানা করাইয়া দিলাম। সে সময় আমার কাছে ষাট বা সত্তর টাকা মাত্র ছিল, তাহার মধ্যে ত্রিশ টাকার নোট আলাদা বাঁধিয়া বাকী টাকায় কিছু মালপত্র কিনিলাম, কিছু ভাঙাইয়া ভোটীয় টঙ্কা সংগ্রহ

করিলাম। টাকায় নয় টঙ্কা দর পাওয়া গেল, যদিও মুদ্রা প্রায় সবই অর্দ্ধ-টঙ্কা পাইলাম। শীতের ভয়ে চার টাকায় একটি ভোটায় কম্বল কিনিলাম, মাথার আবরণ হিসাবে ডাম্‌গ্রামের সজ্জনের কাছে পীতবর্ণ পশমের টুপী উপহার পাইলাম। কিছু চিঁড়া, চাউল, চীনা চা, সত্তু ও মশল্লা ইত্যাদিও কিনিলাম, কিন্তু এর পর নিজের সকল বোঝা নিজের কাঁধেই বহিতে হইবে সেজন্য সবই অল্প পরিমাণে লইলাম। ডুক্‌পা লামা আমাকে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন, ইতিমধ্যে সুমতি-প্রজ্ঞ আমাদের দু-জনার জন্য ছাড়পত্র লইয়া আসিলেন। দুই মাসের ঘনিষ্ঠতার পর বিদায়ের সময় আমি ও সঙ্গীদের সকলেই মিত্রবিয়োগের দুঃখ অনুভব করিলাম। ডুক্‌পা লামা অতি সহৃদয়তার সহিত আমার মঙ্গলকামনা করিলেন এবং চা ও কিছু কিছু অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিলেন।

মোট বহিবার বাঁকের মধ্যভাগে মালপত্র বাঁধিয়া পিঠে করিয়া, হাতে লম্বা লাঠি লইয়া তীর্থযাত্রীর বেশে বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা দুই জনে কুতী হইতে রওয়ানা হইলাম। অল্পক্ষণেই পুল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলাম ছাড়পত্র-পরীক্ষক সেখানে নাই। পুল সাধারণ কাঠ পাতিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহা পার হইতেই চড়াই আরম্ভ হইল। বোঝা-স্কন্ধে জীবনে এই প্রথম চলিতে হইতেছে সুতরাং চড়াইয়ের কষ্টের কথা আর কি বলিব! মাঝে মাঝে কেবল মনে হইতেছিল যে প্রত্যেক মানুষেরই এই অভ্যাস রাখা উচিত। অল্প চড়াইয়ের পরই আমরা কোসী নদীর দক্ষিণবাহিনী মুখ্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চড়িতে লাগিলাম। পথ সাধারণ চড়াইয়ের, বোঝাও বিশ-পঁচিশ সেরের অধিক নহে, তবুও অল্পদূর যাইতেই কাঁধ ও জঙ্ঘার বিষম ব্যথা আরম্ভ হইল। সুমতি-প্রজ্ঞ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সেরের বোঝা কাঁধে অম্লান-বদনে গল্প-গুজব করিতে করিতে চলিতেছিলেন, আমার তখন কথা বলা দূরে থাক কথা শোনাও বিরক্তিজনক মনে হইতেছিল। নদীর কূলের উপত্যকা চওড়া কিন্তু কোথাও বৃক্ষের চিহ্নমাত্র নাই। পথের ধারে এক-আধটি ঘরও দেখা যাইতেছিল—ঠিক যেন পাথরের স্তূপ—এবং দু-চারটি শস্যের ক্ষেতও এখানে-ওখানে ছিল।

ডাম্‌গ্রামের সজ্জনের লপ-চী যাইবার কথা ছিল, সকালেই তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার টশী-গঙে থাকিবার কথা। সুমতি-প্রজ্ঞ পরামর্শ দিলেন যে আজ আমাদেরও সেখানেই থাকা ভাল। সন্ধ্যা-নাগাদ ফব্‌-ক্যো-লিঙ মঠ (গুম্বা) দেখা দিল। গুম্বার আগে এক ছোট গ্রামে বোঝা বহিবার লোকের খোঁজ করিলাম কিন্তু পাওয়া গেল না, সুতরাং গুম্বায় চলিয়া গেলাম। গুম্বার বাহিরের রূপ অতি সুন্দর, সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিক্ষুর ব্যবস্থা আছে। বোঝা বাহিরে রাখিয়া আমরা দেবদর্শনে চলিলাম। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য নানা দেবদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি, নানা প্রকারের সুন্দর বর্ণরঞ্জিত চিত্রপট ও ধ্বজা প্রভৃতি অখণ্ড দীপের আলোকে প্রকাশিত ছিল। মঠে জে-চুন-মিলার সম্মুখে স্থাপিত চঙ (কাঁচা মদ) দেখিয়া আমি সুমতি-প্রজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা ত গে-লুক্‌-পা (পীতটুপীযুক্ত লামা-সম্প্রদায়) শ্রেণীর মঠ, তবে এখানে মদ কেন?" তিনি বলিলেন জে-চুন-মিলা সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ ও দেবতাদিগের ভোগে গে-লুক্‌-পা সম্প্রদায়ও মদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের নিজেদের ইহা পান করা নিষিদ্ধ। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম আমাদের জন্য চা আসিয়াছে; মন্দিরের অঙ্গনে বসিয়া দু-চার পেয়ালা চা পান করিলাম। ভিক্ষুগণ আমার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সুমতি-প্রজ্ঞ, লাসার ডেপুঙ গুম্বা ও আমি লদাখের নাম করিলাম। আমরা বলিলাম যে গ্যা-গর্ (ভারতবর্ষ) দোজে-দন্ (বজ্রাসন, মধ্যযুগ হইতে সংস্কৃত লিপিলেখে বুদ্ধগয়ার এই নাম প্রচলিত) তীর্থ দর্শন করিয়া আমরা লাসায় ফিরিতেছি।

আমি এ-সময় অত্যন্ত ক্লান্ত। সবসুদ্ধ কুতী হইতে পাঁচ মাইল মাত্র আসিয়াছি তবুও আমার পক্ষে এক পাও চলা দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। এমন সময় ওখানে টশী-গঙ-এর এক বালক বলিল ডাম্‌গ্রামের 'কুশোক' (ভদ্রলোক) টশী-গঙে বিশ্রাম করিতেছেন। সুমতি-প্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ ওখানে যাইতে চাহিলেন, আমিও ভাবিলাম সেখান হইতে কাল হয়ত মোট বহিবার লোক পাওয়া যাইবে এবং এই আশায় যাইতে স্বীকার করিলাম। মঠেই সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা সেই বালকের পিছু পিছু চলিলাম। নদীর কিনারা ধরিয়া কিছু দূর গিয়াই পুল পাওয়া গেল এবং পার হওয়া গেল। আরও

কিছু পরে চষা ক্ষেত, তাহাতে বুঝিলাম এবার গ্রামের নিকট আসিয়াছি। খানিক পরে কুকুরের ডাকে বুঝিলাম গ্রাম আরও নিকটে। কিন্তু শুনিলাম আমাদের গন্তব্যস্থল আরও দূরে। শেষে কোনক্রমে ডাম্‌গ্রামের সজ্জনের বিশ্রামস্থানে পৌঁছাইলাম।

তিনি সে সময় লোহার চুল্লীতে আগুন দিয়া পাতলা খিচুড়ী রন্ধনে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেখিয়া অতি প্রসন্ন হইয়া তাড়াতাড়ি বিছানা বিছাইয়া দিলেন। আমি ত বোঝা ফেলিয়া সটান শুইয়া পড়িলাম। চা তৈয়ার ছিল, থুক্‌পা (খিচুড়ী)-ও অল্পক্ষণ পরে প্রস্তুত হইল, তখন উঠিয়া দুই তিন পাত্র গরম গরম থুক্‌পা খাইয়া একটু "ধাতস্থ" হইয়া চা পান করিতে করিতে পরদিনের "প্রোগ্রাম" ঠিক করিতে লাগিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "লপ্‌-চী" মহাতীর্থ (চা-ছেন-বো), উহা জে-চুন-মিলার সিদ্ধ-স্থান, চলুন আমরাও ইঁহার সঙ্গে ওখানে যাই।" লপ-চী যাইতে হইলে আমাদের সোজা রাস্তা ছাড়িয়া উচ্চ লা (গিরিসঙ্কট) পার হইয়া পূর্ব্ব দিকে তুম্বা কোসীর ঘাটিতে যাইতে হইবে, পথে একটি জোঙ্‌ও পড়িবে। সেখান হইতে আবার দুইটি লা পার হইলে তবে পুনরায় আমাদের গন্তব্য তিঙ্‌রী যাইতে পারিব। এই সব বাধাবিঘ্নের কথা ভাবিয়া আমার মন ত ওদিকে কোন মতেই যাইতে চাহিতেছিল না, কিন্তু সেকথা বলিয়া নাস্তিকতার পরিচয় দেওয়াও কঠিন! পরে যখন তাঁহারা আমার বোঝা বহিবার লোকের ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন, তখন আমার আর আপত্তির উপায়ই বা রহিল কোথায়? শেষে রাজী হইলাম, এবং স্থির হইল কাল খাওয়ার পরই যাত্রা করা যাইবে।

পরদিন পূর্ব্বকথামত দ্বিপ্রহরে রওয়ানা হওয়া গেল। আমার খালি-হাত, সুতরাং মহানন্দে চলিতে লাগিলাম। পথ ক্রমেই চড়াইয়ের দিকে চলিল, ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের পর টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরিচ্ছদ পশমী হওয়ায় ভোটীয়েরা বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপও ক'রে না, সুতরাং আমরা চলিতে থাকিলাম। কিছু দূরে এক জায়গায় পথ বক্র ও ঢালু পর্ব্বতপার্শ্বের উপর দিয়া গিয়াছে, সেখানের মাটি নরম এবং মধ্যে মধ্যে মাটি ও পাথরের রাশি খসিয়া সশব্দে কয়েক শত ফুট নীচের খাদে পড়িতেছে। আমার ত ঐ দৃশ্যে হৃৎকম্প আরম্ভ হইল, কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, "আমিও না ঐ মাটি-পাথরের সঙ্গে নীচের খাদে চলিয়া যাই।" সঙ্গীরা বোঝা-স্কন্ধে বেপরোয়া চলিতে থাকিলেন, পশ্চাতে পড়িতে দেখিয়া এক জন আমাকে তাঁহার হাত ধরিতে বলিলেন কিন্তু আমি নিজেকে নির্ভয় বলিয়া পরিচিত করিতে চাহি, সুতরাং বিনা সাহায্যেই "প্রাণ হাতে ক'রে" কোন প্রকারে পার হইলাম। আমার ভোটীয় জুতা বিশেষ ঢিলা হওয়ায় একটু ভয়ের কারণ ছিল, কেননা তাহাতে পা হড়্‌কাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আরও উপরে উঠিতে বৃষ্টির বিন্দুর বদলে এলাচ-দানার মত ছোট ছোট নরম বরফ পড়িতে লাগিল। আমরা সে-সব গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া বেলা দুইটার সময় লর্সেতে (লার নীচে থাকিবার জায়গা) পৌঁছিলাম। এখন বরফ পেঁজা-তুলার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের আকারে পড়িতেছিল। সঙ্গীদের কতক চমরীর ঘুঁটের সন্ধানে মাঠে ছুটিলেন, অন্যেরা পাথরে দড়ি বাঁধিয়া ছোলদারী তাম্বু দাঁড় করাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। এ জায়গাটা প্রায় চৌদ্দ-পনর হাজার ফুট উঁচু, কাজেই শীত খুব, উপরন্তু ক্রমাগত তুষারপাত হওয়ায় শৈত্যের আধিক্য বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কোনপ্রকারে ছোলদারী দাঁড় করাইয়া তাহার ভিতর ঘুঁটের আগুন জ্বালান হইল। আমরা সবাই চারি দিকে ঘিরিয়া বসিলাম, ঘুঁটেতে বাতাস দিয়া আগুন জ্বালাইয়া চা-সুদ্ধ জল চড়াইয়া দেওয়া গেল। চারি দিকের জমি তুষারে ঢাকিয়া গেল, মাঝে মাঝে ছোলদারীর চাল নাড়াইয়া বরফের রাশি ফেলিতে হইতেছিল। আগুনও যেন শীতে আড়ষ্টপ্রায়—অত উচ্চে জল ফুটান দুরূহ নহে, কিন্তু ফুটন্ত জলের উত্তাপ অল্প—অতি কষ্টে চা প্রস্তুত করা গেল। চা যদিবা হইল, তাহাতে মাখন দিয়া মন্থন করে কে? প্রত্যেকের পেয়ালায় মাখনের টুকরা ফেলিয়া তাহার উপর গরম কাল চা ঢালিয়া দেওয়া হইল। কুশোক (ভদ্র পুরুষ) তাঁহার কাছে যে ছোট বিস্কুট ও কমলালেবুর মিঠাই ছিল তাহা সকলকে দিলেন। আগুনের ঐ অবস্থায় থুক্‌পা রন্ধন অসম্ভব, সুতরাং অন্যেরা সত্তু খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন, আমি চায়ের মধ্যে চিঁড়া ফেলিয়া খাইলাম।

চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ঘিরিয়া আসিল, কুশোক তাঁহার লণ্ঠন জ্বালাইয়া আমাকে "বোধিচর্য্যাবতার" হইতে পাঠ

করিতে বলিলেন। আমার কাছে উক্ত পুস্তকের সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ ছিল এবং তাহার তিব্বতী অনুবাদের সমস্ত শ্লোক কুশোকের কণ্ঠস্থ ছিল। আমি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও তাহা ভাঙা ভোটীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিলাম, কুশোক ভাবার্থ বুঝিয়া তিব্বতী শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মচর্চ্চা করার পর সকলেই সেই ছোলদারীর নীচে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া পড়িলেন। শৈত্যের প্রভাবে অস্নাত জনমণ্ডলীর কাপড়ের দুর্গন্ধ পাইলাম না বটে, কিন্তু সকালে উঠিয়া বুঝিলাম যে আমার কাপড়ের মধ্যে কয়েক শত উকুন আশ্রয় লইয়াছে। কাপড়-চোপড়ে খুঁজিয়া অনেকগুলি বাহিরও করিলাম। সারারাত বরফ পড়িয়াছে দেখিলাম, ছোলদারীও বহুবার ঝাড়িতে হইয়াছে শুনিলাম।

প্রাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কাল যে-ভূমি নগ্ন ছিল আজ তাহা এক ফুটের অধিক পুরু তুষারের আবরণে আচ্ছাদিত। তুষারস্তূপ গলিয়া একটি ক্ষীণ ধারা নীচের দিকে বহিতেছে, সেখানে গিয়া মুখ হাত ধুইলাম। আগুনের জন্য ঘুঁটে পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং চায়ের আশা ছাড়িয়া বিস্কুট ও কমলালেবুর মিঠাই খাইয়া প্রা তরাশ শেষ করিলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞ নীচে উপরে চারি দিকের তুষারস্তূপ দেখিয়া বলিলেন, "এখানেই এত বরফ, উপরের লা নিশ্চয়ই আরও তুষারাবৃত, এদিকে তুষারপাত সমানে চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের লপ্-চী যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত।" আমি ত তাহাই চাই। কুশোকের কাছে বিদায় লইলাম, তাঁহাকে লপ্-চী যাইতেই হইবে। পুনরায় নিজের বোঝা কাঁধে করিয়া নীচের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথও তুষারাবৃত, তবে উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফের আবরণী পাতলা হইয়া আসিল। শেষে তুষার-রহিত ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম, এখানে টুপ্‌টাপ্ বৃষ্টি চলিয়াছে। এইরূপে ভিজিতে ভিজিতে বেলা দশটায় আমরা টশী-গঙে ফিরিয়া আসিয়া, সেখানকার গোবার (মোড়ল) গৃহে আশ্রয় লইলাম। গোবা আমাকে আশ্বাস দিলেন যে পরদিনের গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ভারবাহী লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাদের দু-জনেরই জুতার তলা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, গোবার ছেলেকে কিছু পয়সা দিয়া তাহাও মেরামত করাইয়া লইলাম। এইরূপে ২রা জুন সেখানেই কাটিয়া গেল, দিনের বেলা চমরীর দুধের ঘোলে সত্তু মাখিয়া খাইলাম, রাত্রে সুমতি-প্রজ্ঞ ভেড়ার চর্ব্বি দিয়া থুক্‌পা রাঁধিলেন। পরে শুনিলাম কুশোকের দলের কয়েক জন বরফের মধ্যে রাস্তা খুঁজিয়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন আমরা গেলে আমাদেরও ঐ দশা হইত।

* * *

চা-সত্তু খাইয়া, ভারবাহীর পিঠে মালপত্র চাপাইয়া, ৩রা জুন সকাল ৭-৮টার সময় আমরা রওয়ানা হইলাম। ভারবাহীর পক্ষে এক মণ দেড় মণ বোঝা তুচ্ছ, সুতরাং আমি খালি-হাত এবং সুমতি-প্রজ্ঞের বোঝাও খুবই হাল্কা, রাস্তাও বরাবর উৎরাই চলিয়াছে। বেলা এগারটার মধ্যেই আমরা তর্গ্যে-লিঙ গ্রামে পৌঁছিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ চতুর্থ বার এই পথে ফিরিতেছেন, এই জন্য পথের পাশের বসতিগুলিতে স্থানে স্থানে তাঁহার পরিচিত লোক ছিল। এখানেও মোড়লের গৃহেই আমাদের স্থান হইল। গৃহকর্ত্রী পঞ্চাশোর্দ্ধবয়স্কা, তাহার স্বামীর বয়স অনেক কম। তিব্বতে এই ব্যাপার খুবই সাধারণ। আমি ত প্রথমে এই দম্পতীর পতি-পত্নী সম্বন্ধ বুঝিতেই পারি নাই, যখন দেখিলাম পুরুষটি স্ত্রীর চুল খুলিয়া তাহা ধোওয়া ও চাঙ প্রদেশের ধনুকাকার শিরোভূষণে তাহার সংবরণে সাহায্য করিতেছে, তখন জিজ্ঞাসা করায় আসল সম্বন্ধ জানিলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞ বৈদ্য, তান্ত্রিক এবং ভাগ্যগণনায় পটু, তিনি চা পানের পর গ্রামের ভিতর চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম তিনি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা এক বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে সন্তান লাভের জন্য যন্ত্রদান করিতে যাইতেছেন। তিনি ভোটীয় অক্ষর লিখিতে পারেন না, সুতরাং আমাকে প্রয়োজন। শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, বলিলাম, "প্রৌঢ়ার উপরও আপনি আপনার বিদ্যার পরীক্ষা করিতে চান?" তিনি বলিলেন, "ওখানে হাসিও না যেন, ধনী স্ত্রীলোক,

উপস্থিত কিছু সত্তু, মাখন লাভ হইবেই এবং যদি তীর লাগিয়া যায় তবে ভবিষ্যতের জন্য একটি উত্তম যজমানও হইয়া থাকিবে।" আমি বলিলাম, "তীর লাগিবার কথা ভুলিয়া যান, তবে, হাঁ, উপস্থিত দেখা ভাল।" সেখানে গিয়া দরজা পার হইতেই এক মহাকায় কুকুর শিকল নাড়িয়া গর্জ্জন আরম্ভ করিল। বাড়ীর এক ছোট ছেলে তাহার কাপড়ে কুকুরের মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলে তবে আমরা তাহাকে পার হইয়া উপর-তলার সিঁড়িতে উঠিতে পারিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহ-পত্নীকে ঔষধ-যন্ত্র ও পূজা-মন্ত্র দিলেন, আমাদের সের-দুই সত্তু, কিছু চর্ব্বি ও চা দক্ষিণা জুটিল। ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে সঙ্গে লোক লইয়া পথে অগ্রসর হওয়া গেল। গ্রামের কাছেও বৃক্ষের চিহ্ন নাই, ক্ষেতগুলিতে সবে মাত্র চাষ আরম্ভ হইয়াছে। লাল পশমের গুচ্ছে সজ্জিত বিশালকায় চমরীতে হল টানিতেছে; কোথাও কোথাও চাষী হলকর্ষণের সঙ্গে গান জুড়িয়া দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে য়া-লেপ্ পৌঁছান গেল, গ্রামের অল্প নীচেই প্রাচীন লবণের ঝিল শুকাইয়া আছে। য়া-লেপে পুরনো আমলের চীন দুর্গ আছে, কিছু দূরে নদীর ওপারেও কাঁচা দেওয়ালযুক্ত কেল্লার ভগ্নাবশেষ আছে। চীন-সাম্রাজ্যের প্রভুত্বের সময় য়া-লেপের দুর্গে কিছু সৈন্য থাকিত, এখনও সরকারী লোকজন সেখানে আছে কিন্তু দুর্গ শ্রীহীন দেখা যায়; ঘর, দেওয়াল সবই মেরামতের অভাবে জীর্ণ।

এক পরিচিত গৃহস্থের ঘরে চা-পান ও সত্তু-ভোজন করা গেল। সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে বুদ্ধগয়ার প্রসাদী কাপড়ের টুকরা দিলেন। এই স্থানে লম্-য়িক (ছাড়পত্র) লওয়া হয়, ইহার পর আর পাসপোর্টের হাঙ্গামা নাই, সেই জন্য এক জন পরিচিত লোকের হাতে সেগুলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার দেওয়া গেল। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরের পথে আসিবা মাত্র একটা প্রকাণ্ড কুকুর হাড়-চিবান ছাড়িয়া আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। এই সব শৈত্যাধিক্যের দেশের কুকুরের গায়ে শীতকালে লম্বা লোমের নীচে নরম পশম জন্মায় যাহাতে উহাদের শীতের প্রকোপ লাগে না। গ্রীষ্মকালে সেই লোম ও পশম সাপের খোলসের মত ঝরিয়া পড়ে, এই কুকুরটারও সেই রকম "খোলসছাড়া" অবস্থা ছিল। যাই হোক, আমরা তিন জন লোক ছিলাম, কাজেই কুকুরে কি ভয়? য়া-লেপ্ হইতে প্রায় তিন মাইল পথ চলিবার পর দক্ষিণ হাতে লে-শিঙ্ ডোল্মা গুম্বা নামক ভিক্ষুণীদের বিহার দেখা গেল। এখানে নদীর ধারা অতি ক্ষীণ, কিছু দূর যাইয়া আমরা নদী পার হইয়া অন্য পারে চলিয়া আসিলাম। এ দিকে দূর-বিস্তৃত ক্ষেত্রের সারি; ছোট ছোট নালী-দ্বারা আনীত নদীর জলে সেচকার্য্য চলিতেছিল। আরও কিছু দূর গিয়া আমরা থো-লিঙ্ গ্রামে পৌঁছিলাম। এই গ্রামটিতে বিশ-পঁচিশ ঘর লোকের বাস এবং ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তের-চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ। তর্গ্যো-লিঙ্ হইতে যে-লোক আনা হইয়াছিল তাহার এই গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবারই কথা ছিল। সে প্রথমে তাহার পরিচিত এক গৃহে আমাদের লইয়া গেল, সেখানে রাজকর্ম্মচারী বা উচ্চপদস্থ লোকেরা আসিয়া থাকেন শুনিয়া আমার থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। পরে সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক ঘরে যাওয়া গেল, সেটি গ্রামের মধ্যভাগে স্থিত। সেখানে কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ রৌদ্রে বসিয়া সুতাকাটা ও তাঁত চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল, সুমতি-প্রজ্ঞকে দেখিয়া "জু-দনজ" (আগন্তুকের অভ্যর্থনা) করিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর হইতে পরিচিত কয়েক জন লোক বাহিরে আসিলে পরে আমাদের থাকিবার স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল। বাড়ীটি দু-তলা, চতুর্দ্দিকে কুঠরি, মধ্যে ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য মাটির ছাদে বড় ছিদ্র আছে।

সুমতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে কিছু চা তৈয়ারী করিবার জন্য দিলেন। গৃহকর্ত্রীর মুখ হাত কাপড়চোপড়—সকলেরই উপর মোটা কাজলের মত তেলকালির এক স্তর জমিয়া ছিল। সে বহুমুখ-চুল্লীর উপর জল ও চা চড়াইয়া ভেড়ার নাদির ইন্ধনে বাতাস দিয়া আঁচ তুলিল। চা ফুটিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে অল্প ঠাণ্ডা জল দিয়া নামাইয়া লম্বা কাঠের চোঙ্গায় ঢালা হইল। সুমতি-প্রজ্ঞ এক ডেলা মাখন দিতে, মাখম ও লবণ চায়ে দিয়া বার আট-দশ মন্থন-দণ্ড চালাইতেই চা মাখন ও লবণ মিশ্রিত হইয়া সফেন পানীয়ে পরিণত হইল। চা-মন্থনের পাত্রটি এক মুখ বন্ধ (অন্য মুখের ঢাকনির মধ্য দিয়া মন্থন-দণ্ড চলে) দুই আড়াই হাত লম্বা পিচকারীর মত। মন্থনীটি পিচকারির মত উপর নীচে চালাইলে ভিতরে সজোরে হাওয়া যাওয়ায় পিচকারির দণ্ডের মুখের গোল চাকতিতে তরল চা ও মাখন আলোড়িত হইয়া সবই দ্রুত মিশিয়া যায়।

এখান হইতে যাইবার পথে আমাদের থোঙলা (থোঙ নামক গিরিসঙ্কট) পার হইতে হইবে। ভারবাহী লোক লওয়া অপেক্ষা ঘোড়ায় যাওয়াই শ্রেয় মনে হইল, এবং সেই জন্য এখান হইতে লঙ-কোর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য আঠার টঙ্কায় (দুই টাকায়) দুটি ঘোড়া ভাড়া করা হইল।

ক্রমশঃ

বাংলা বানান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তার একটা অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে—এইখানে সেটা উত্থাপিত করি। যথোচিত আলোচনা দ্বারা তার চরম মীমাংসা প্রার্থনীয়।

হ-ধাতু খা-ধাতু দি-ধাতু ও শু-ধাতুর অনুজ্ঞায় তাঁরা নিম্নলিখিত ধাতুরূপের নির্দেশ করেছেন—

হও, হয়ো।
খাও, খেও।
দাও, দিও।
শোও, শুয়ো॥

দেখা যাচ্চে, কেবলমাত্র আকারযুক্ত খা- এবং ইকারযুক্ত দি- ধাতুতে ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় তাঁরা প্রচলিত খেয়ো এবং দিয়ো বানানের পরিবর্তে খেও এবং দিও বানান আদেশ করেছেন। অথচ হয়ো এবং শুয়ো-র বেলায় তাঁদের অন্যমত।

একদা হয় খায় প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বানান ছিল হএ, খাএ। "করে" "চলে" যে নিয়মে একারান্ত সেই নিয়মে হয় খায়ও একারান্ত হবার কথা—পূর্বে তাই ছিল। তখন খা, গা, চা, দি, ধা প্রভৃতি একাক্ষরের ধাতুপদের পরে য়-র প্রচলন ছিল না। তদনুসারে ভবিষ্যৎবাচক অনুজ্ঞায় য়-বিযুক্ত "ও" ব্যবহৃত হোতো।

এ নিয়মের পরিবর্তন হবার উচ্চারণগত কারণ আছে। বাংলায় স্বরবর্ণের উচ্চারণ সাধারণত হ্রস্ব, যথা খাএ, খাও। কিন্তু অসমাপিকায় যখন বলি খেএ (খেয়ে) বা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় যখন বলি খেও (খেয়ো) তখন এই স্বরবর্ণের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। খাও এবং খেও শব্দে ওকারের উচ্চারণে প্রভেদ আছে। সন্দেহ নেই এ সকল স্থলে শব্দের অন্তস্বর আপন দীর্ঘত্ব রক্ষার জন্য য়-কে আশ্রয় করে।

একদা করিয়া খাইয়া শব্দের বানান ছিল, করিআ, খাইআ। কিন্তু পূর্ব স্বরের অনুবর্তী দীর্ঘ স্বর য়-যোজকের অপেক্ষা রাখে। তাই স্বভাবতই আধুনিক বানান উচ্চারণের অনুসরণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুয়ো হয়ো শব্দে একথা স্বীকার করেছেন, অন্যত্র করেন নি। আমার বিশ্বাস এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

আমরা যাকে সাধু ভাষা ব'লে থাকি বিশ্ববিদ্যালয় বোধ করি তার প্রচলিত বানানের রীতিতে অত্যন্ত বেশি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নন। নতুবা খাইয়া যাইয়া প্রভৃতি শব্দেও তাঁরা প্রাচীন বিধি অনুসারে পরিবর্তন আদেশ করতেন। আমার বক্তব্য এই যে, যে-কারণে সাধুভাষায় করিয়া হইয়া বলিয়ো খাইয়ো চাহিয়ো বানান স্বীকৃত হয়েছে সেই কারণ চলিত ভাষাতেও আছে। দিয়েছে শব্দে তাঁরা যদি "এ" স্বরের বাহনরূপে য়-কে স্বীকার করেন তবে দিয়ো শব্দে কেন য়-কে উপেক্ষা করবেন? কেবলমাত্র দি- এবং খা-ধাতুর য় অপহরণ আমার মতে তাদের প্রতি অবিচার করা।

দুটি দিন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে—একদিন
দেখা হ'ল তার সাথে, যেন স্বপ্নলীন
একখানি সুখস্মৃতি। চিনি চিনি করি
চিনিলাম—সে যে প্রেম। দিবা বিভাবরী
মেশে বর্ণচ্ছটাময় আকাশের পটে;
দাঁড়াইয়া জীবনের সেই সন্ধ্যাতটে
শুধাইনু তারে, "আজি সুন্দর দেবতা
স্বর্গ হ'তে হেথা কেন?" শুনি সেই কথা
মুখ তুলে চায় প্রেম মৃদু হাসি হেসে;
অনন্ত রহস্য যেন সে কৌতুকে এসে
যোগ দেয়। তার কথা শোনে শশী রবি।
করিল উত্তর প্রেম, "জান না কি কবি,
স্বর্গ পিতা, মৃন্ময়ী যে মা আমার?
থেকে থেকে মা'র কাছে ছুটে আসি; তার
শ্যামাঙ্গিনী মূর্ত্তি, তার শ্যামল অঞ্চল,
মায়াভরা মুখখানি, অশ্রু-ছলছল
দুটি চোখ—ভালবাসি, বড় ভালবাসি।
স্বর্গের প্রাসাদ ত্যজি ছুটে ছুটে আসি
মায়ের কুটীরে তাই বার বার; হায়,
জাগে যেথা যুগ যুগ চির-প্রতীক্ষায়
দুখিনী জননী একা দূর বনবাসে,
—কবে আসি আপনার সিংহাসনপাশে
নিয়ে যাবে রাজা তার! আমি দু-জনের;
উভয়ের আমিই বন্ধন, তা কি টের
পাও নাই এত দিনে কবি?" জানি, জানি,
কি আনন্দময় গ্রন্থি তুমি দিলে টানি
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝে! তব আগমনে
হৃদয় চমকি ওঠে তাই ক্ষণে ক্ষণে
স্বর্গের আভাস পেয়ে। যেয়ো না সুদূর,
মর্ত্ত্যে এস মানবের প্রেমের ঠাকুর,
তুমি আমাদেরি থাক!

আর এক দিন।
সে স্বপ্নের স্মৃতি কবে হয়ে গেছে ক্ষীণ,
যুগান্তর কেটে গেছে, বুঝি জন্মান্তর;
কত বন্যা বয়ে গেছে জীবনের 'পর।
কোথা প্রেম, করি অন্বেষণ। বনে বনে,
মনে মনে খুঁজে ফেরে তারে জনে জনে
পৃথিবীর নরনারী। হয়ত আভাসে—
শারদ আকাশে আর বসন্ত-বাতাসে,
গোধূলির সূর্য্যাস্ত-আভায়, চন্দ্রালোকে,
এর মুখপানে চেয়ে, ওর দুটি চোখে
মুহূর্ত্তের পরিচয় পায় একবার।
মূর্ত্তি ধরে নাই প্রেম মর্ত্ত্যে কভু আর।

আকাশ নির্ম্মল, শুধু গুটি কত তারা
অপরূপ নীলিমায় হয়ে গেছে হারা;
প্লাবিত জ্যোৎস্নার স্রোতে কোথা ভেসে যায়
হৃদয়ের তরী! কে-বা তারে নিবারিতে চায়?
এমন সময়—দেখি দূরে একাকিনী
অচকিতা, অচঞ্চলা, চিরবিরহিণী,
মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি, কি লাবণ্য ঝরে
অঙ্গে অঙ্গে, মায়াময়ী, নীলাম্বরে
ঢাকা তনু, স্নিগ্ধকান্তি শ্যামলা সুন্দরী
বসুন্ধরা চলে অভিসারে। আজি, মরি,
দীর্ঘ বিরহের বুঝি হ'ল অবসান?
এসেছে এসেছে তার রাজার আহ্বান।

থেমে যায় কালস্রোত। গতিহীন রাতি।
কে-জানে কে-যেন কোথা, কোন্ স্বপ্নসাথী
দেখালো অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিতে আমায়,—
আকাশ ঢলিয়া পড়ে অনন্ত জ্যোৎস্নায়,
হৃদয় গলিয়া যায় অপূর্ব্ব আবেগে;
যামিনীর প্রাণ হ'তে কোন্ সুর জেগে
পূর্ণ করি সর্ব্ব শূন্য সারাটা অন্তর
ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুর্দ্দিক, অবনী অম্বর,
শেষহীন, সীমাহীন,—সৌন্দর্য্যের পায়
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে মুগ্ধ মূর্চ্ছনায়।
শেষ হয়, হয়-নাকো, সেই বাঁশী বাজে
মধু-মিলনের বাঁশী। আর তার মাঝে
ফুলশয্যা পাতা, ফুলের সজ্জায় সাজা
হর্ষিতা ধরণী আর ধরণীর রাজা।

জাভায় বিবাহ-উৎসব

উপরে : সানুচর ও সুসজ্জিত বরগণ

নীচে : ওলন্দাজ রাজপুরুষের নিবাসে রাজকন্যাগণ

উপরে : রাজকন্যাগণ চতুর্দ্দোলায় ওলন্দাজ রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন
নীচে : উৎসবে রাজকুমারীদের নৃত্য

বিচিত্রবেশে জাভ-সুরকর্তার রাজা সুসুহুননের নবোঢ়া কন্যাগণ
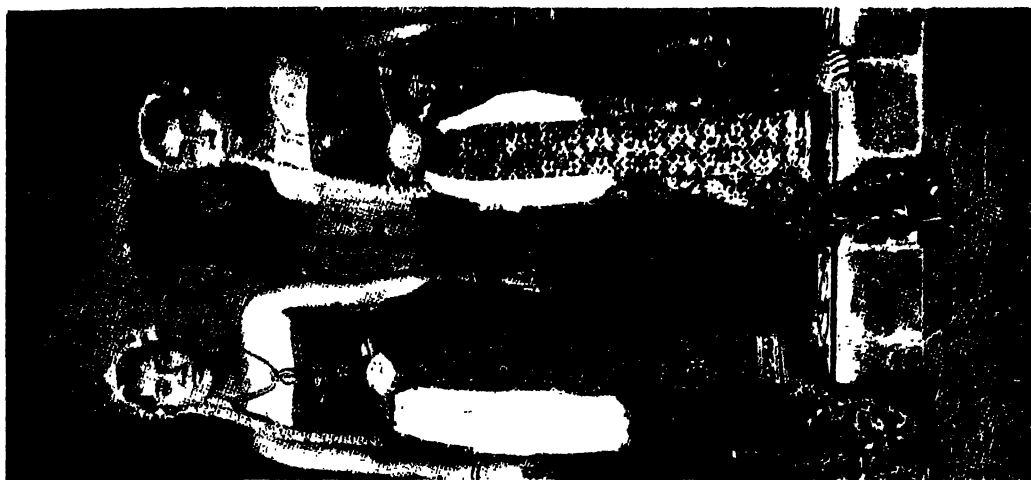
[৬১-৬৩ পৃষ্ঠার চিত্রগুলি "এশিয়া"র সৌজন্যে মুদ্রিত]

উপরে : নৃত্যসভায় বালিদ্বীপের নর্ত্তকীগণ
নীচে : বালিদ্বীপের রমণী, ধান ভানিতেছে [শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত চিত্র

জাভার রাজকুমারীদের বিবাহের শোভাযাত্রা.

জাভায় বিবাহ-উৎসব

[উৎসবের দেশ জাভা- ও বালি- দ্বীপে প্রকৃতি নবযৌবনময়ী, তারই অঙ্গনে নিত্য বিচিত্র উৎসবের রচনা। এমন কি, অন্ত্যেষ্টি-সৎকারও সেখানে উৎসবের বিষয় ব'লে পরিগণিত।

জাভা ও বালির উৎসবাবলীর প্রধান উপজীব্য হ'ল নাচ—এই নাচের অধিকাংশকেই নৃত্যনাট্য বলা চলতে পারে—ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বহু কাহিনী ও চরিত্র অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে এই নৃত্যনাট্যে নাচের ভাষায় ছন্দে ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়ে থাকে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান অবলম্বন ক'রে সকল দেশেই উৎসবের ক্ষেত্র রচিত হয়ে থাকে; বিদেশীয় ভ্রমণকারিণীর স্মৃতিলিপি থেকে সংকলিত জাভা-শূরকর্ত্তার রাজা শুসুহুনের ছয় কন্যার বিবাহ-অনুষ্ঠানের এই বিবরণ থেকে জাভায় এই উৎসবের প্রকৃতির আভাস পাওয়া যাবে, সেই উৎসবের অনুষঙ্গ রূপে জাভার নৃত্যনাট্যের স্বল্প পরিচয়ও আছে।]

জাভায় বিবাহ-অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা বরের, বধূর নয়; রাজকুমারীরা তাই উৎসব-অঙ্গনে দেখা পর্য্যন্ত দেবেন না। নানা বিচিত্র প্রাচীন প্রথার সমাবেশে এই মঙ্গল-অনুষ্ঠান সুসম্পূর্ণ।

প্রাসাদদ্বারে সুবেশ সৈন্যদল উত্তীর্ণ হয়ে আমরা অবশেষে একটি অভ্যর্থনা-কক্ষে পৌছলুম, রাজার সহোদরেরা সেখানে আমাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন, দীপ্ত, অভিমান-প্রদীপ্ত তাঁদের কান্তি, পরিধানে বাটিকের কাজ-করা বসন, তাঁদের শিরস্ত্রাণ কর্ণভূষা ও অঙ্গুরীয় থেকে মণি-মাণিক্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত।

আমাদের দলের মহিলাদের স্থান হ'ল অন্তঃপুরে—সেখান থেকেই আমরা উৎসব-দর্শনের সুযোগ পাব। রাজান্তঃপুরিকাদের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময়ান্তে আসন গ্রহণ করবামাত্র মধুর 'গামেলান' বাদ্য আরম্ভ হ'ল, আর তারই সঙ্গে রাজা ও তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের নানা কীর্ত্তিকাহিনীর সঙ্গীত। অবশেষে রাজা উৎসবস্থলে প্রবেশ ক'রে সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিবাহের প্রধান পুরোহিত ও রাজসভাসদ্‌গণ উপবিষ্ট, ক্রমশ এক এক ক'রে বিবাহের বরেরাও এসে সমবেত হলেন—উত্তরাঙ্গ অনাবৃত, সাজসজ্জায় তেমন বৈচিত্র্য নেই, নেই কোন মণি-মাণিক্যের ছটা—বিনীতবেশেই এসেছেন বধূলাভের সম্মান স্বীকার ক'রে নিতে। প্রধান আচার্য্যের শাস্ত্রানুশাসন-পাঠ সমাপ্ত হ'লে বিবাহার্থীরা এক এক ক'রে সাষ্টাঙ্গে ও করজোড়ে রাজার সম্মুখে প্রণত হলেন; এই প্রণতিদ্বারাই তাঁরা রাজকুমারীদের পাণিপ্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। যাচ্ঞা স্বীকৃত হয়ে গেলে তাঁরা বিনীতভাবে সভাস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

উৎসবের এই অঙ্গ সমাপ্ত হ'লে পাটরাণীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের পালা। দর্শন-গৃহে রাণী তাঁর সখীর দলে পরি-

জাভা-শূরকর্ত্তার রাজা সুসুহুনন ও তাঁর পাটরাণী

আমারও যেন পরজন্মে সে-ভাগ্য হয়—পরজন্মে আমি যেন বিদেশীর ঘরেই জন্ম নিয়ে আসি।

প্রাসাদের পর্ব্ব শেষ ক'রে আমরা ওলন্দাজ রাজপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর আবাসস্থলে গেলাম। স্থানীয় প্রথানুসারে, নবোঢ়া রাজকুমারীরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন; আমরা তারই প্রতীক্ষায় আছি, এমন সময় উদ্যানবাটিকার সম্মুখে জনতার পদধ্বনি শোনা গেল, দীর্ঘ-মশালবাহী শত শত লোকের জনতা। দ্বার খুলে দেওয়া হ'ল, জাভার ছায়ানাট্যের পুতুলের মতন সজ্জিত বহু মশাল-বাহী প্রথমে প্রবেশ করল, তাদের অনুসরণ ক'রে প্রবেশ করল বিচিত্র বেশে সজ্জিত বহু জাভানীয়, তাম্রপাত্রে শিশু বোধিতরু বহন ক'রে। তার পর বহু শত জাভানীয় বীরকে পুরোভাগে নিয়ে এল প্রথম-রাজকন্যার পাল্কী, গালায় ও সোনায় বিচিত্র কাজ করা; সেই পাল্কীতে সখিপরিবৃতা রাজকন্যা ব'সে, যেন কোন মন্দিরবেদী থেকে দেবী-প্রতিমাকে কে তুলে নিয়ে এসেছে। পাল্কী থেকে নেমে এসে কন্যা রাজ-কুলোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে রাজপুরুষকে নমস্কার নিবেদন করলেন। এর পর অশ্বপৃষ্ঠে এলেন বর ও তাঁর পিতা। বর আর এখন দীনবেশে সজ্জিত নন, বীরবেশে রাজোচিত ঐশ্বর্য্যে ও সজ্জায় বধূকে নিয়ে যেতে এসেছেন। ক্রমে ক্রমে ছয় জন রাজকন্যা ও বরই এসে পৌঁছলেন, আর এল অশ্বারোহীর দল। উপস্থিত সকলকে পানীয় পরিবেষিত হবার পর বরবধূরা বিদায় নিলেন, তাঁদের অনুসরণ ক'রে বিচিত্র শোভাযাত্রাও অন্তর্হিত হয়ে গেল।

বেষ্টিত হয়ে আছেন, উজ্জ্বল স্বর্ণময় বসনভূষিতা,—জাভার নানা কাহিনী দেয়ালে রেশমে চিত্রিত ও খচিত। রাণীর বসন-ভূষণে অলঙ্করণে প্রাচীন পদ্ধতির প্রভাব এত বেশী যে প্রাম্বানানের মন্দিরে খোদিত মূর্ত্তির কথাই তাঁকে দেখে আমাদের বার-বার মনে হচ্ছিল। বাল্যে ভ্রাতার কাছে, যৌবনে স্বামীর আশ্রয়ে চিরদিনই তিনি প্রাসাদ-পালিতা, তার বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সঙ্কীর্ণ; আমার কন্যা চীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে এসেছে শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাণী বললেন, ভগবান,

বিবাহ-উৎসবের সকল অনুষ্ঠান এখনও শেষ হয় নি। উন্মুক্ত নিশীথাকাশের তলে উৎসব-অঙ্গনে সূর্য্যবংশীয়েরা সমবেত হয়েছেন, অশ্বারোহণে বরগণ ও পাল্কীতে বধূরা এলেন। বধূরা নিজ হাতে তাঁদের স্বামীদের পা ধুইয়ে দিলেন, তার পর দেব-মন্দিরের পুরোহিত সেই জল দিয়ে বরবধূর ললাটে কি মঙ্গল-চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিলেন। এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে গেলে বরবধূরা পুনরায় উৎসবস্থল থেকে প্রস্থান করলেন।

এর পর চল্‌ল অভ্যাগতদের প্রীতিভোজনের পালা, বিচিত্র আহার্য্য ও নানা মধুর পানীয়ের সমাবেশে।

বালিদ্বীপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : দাহানশেষ ভস্ম দারুময় মন্দিরে বহন করিয়া শোভাযাত্রায় সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিতেছে
[শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত চিত্র]

উৎসব-অঙ্গনের এক কোণে পুনরায় গামেলান বেজে উঠ্‌ল, রাত্রির কোন্ রহস্যকক্ষ হ'তে ধীরপদবিক্ষেপে রাজকুমারীরা সভাস্থলে প্রবেশ করলেন, অতীতের সুখস্বপ্নের মত—তনু দেহ ঈষৎ চঞ্চল, চরণতল মাটি ছোঁয় কি না-ছোঁয়—এমন পারিপাট্যের সঙ্গে সাজ ক'রে এসেছেন যেন অঙ্গের গতি কোন-ক্রমে বাধা না পায়। মুহূর্ত্তের জন্য সিংহাসনের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে থেকে আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে রাজাকে প্রণতি জ্ঞাপন করলেন, লীলায়িত তাঁদের প্রতি অঙ্গ, বহুকালের কলাবিদ্যা তাঁদের রক্তধারায় সঞ্চারিত, কত শিল্পীর সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন তাঁদের দেহলীলায় পুঞ্জিত, সুদূর অতীতের শিল্পধারা তাঁদের ভঙ্গীতে যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ক্রমশ গামেলানের বাদ্য আরও মধুর আরও মনোহর হ'য়ে উঠ্‌ল; পুষ্পের দল যেমন ক'রে বিকশিত হয়ে ওঠে যেন তারই রূপ অনুকরণ ক'রে রাজকুমারীদের নৃত্যলীলা আরম্ভ হ'ল, উন্নত তাঁদের দৃপ্ত শির, মধুর মুখশ্রীতে কোন ভাব-বৈগুণ্যের চিহ্নমাত্র ধরা পড়ে না, দীর্ঘ পক্ষ্মভার চোখের উপর আনমিত—কেবল দেহলীলায় বিরহ-মিলন-প্রেম, হৃদয়ের কত বেদনা-বাসনা উদ্বেলিত। অস্থিরচিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি রাজকুমারীর প্রণয়-নিবেদনের আখ্যায়িকাকে অবলম্বন ক'রে এই নৃত্য রচিত—ভারতবর্ষের এমন কত পৌরাণিক কাহিনী অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে আজও জাভায় প্রচলিত আছে। এই নৃত্যের একটিমাত্র অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত অনাবশ্যক বা অতর্কিত নয়, অঙ্গের একটি ভঙ্গী সহজেই অপর একটি ভঙ্গীতে মিলিয়ে যায়, দৃষ্টিকে পীড়িত করে না।

ক্রমশ এই নৃত্যের শেষ হ'ল, রাজকুমারীরা অন্তর্হিত হলেন। এবার আর একটি তরুণীর নাচের পালা—তার সমস্ত অঙ্গ সুবর্ণময় বসনে আবৃত, অনাবৃত কণ্ঠদেশ ও বাহুতে মণি-মাণিক্যের ছটা। এই বালিকা রাজবংশোদ্ভবা নয়, নর্ত্তকী মাত্র, প্রেমলীলার ক্রীড়নক। তার কপোলে ঈষৎ রক্তিমা; ফুল্ল রক্তাধরে নীরব প্রেমের বেদনা প্রস্ফুট। নম্রভাবে সভাস্থলে প্রবেশ করে সে রাজসিংহাসনের সামনে আভূমি নত হয়ে পড়ল, বাদ্যধ্বনিও ক্রমশ আরও মুখর হয়ে উঠ্‌ল। রাজার মস্তক-হেলনে নৃত্যের অনুমতি লাভ ক'রে নর্ত্তকী গাত্রোত্থান ক'রে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিল; তার দেহগ্রন্থি যে স্বভাবের কোনও বাধা মানে এমন মনে হ'ল না, এমনই বিচিত্র তার

দেবালয়ের পথে বালিদ্বীপের মহাদেব-সেবিকা
[শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত চিত্র]

অঙ্গলীলা। অবশেষে এক সময় এই নৃত্য-বিলাস পরিসমাপ্ত হ'ল, নৃত্যশ্রমে ক্লান্ত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ল।

এর পর বালকদের বানর-নৃত্যের পালা, রাজা সুসুহুননের বালক ভ্রাতুষ্পুত্রদের হনুমান ও তার বানর সঙ্গীর সাজে নৃত্য; তার পর রাজ্যলাভ-নৃত্য—সুলতানের চার পুত্র, বিভিন্ন মাতার অঙ্কে একই দিনে তাঁদের জন্ম—অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সিংহাসনের অধিকার-প্রতিষ্ঠায় তাঁরা যত্নবান, এই কাহিনীটি নৃত্যাভিনয়ে বর্ণিত হ'ল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর অতীত হয়, এইবার উৎসব-শেষের পালা; রাজারাণী স্বর্ণদোলায় প্রস্থান করলেন, বর-বধূরাও অন্তর্হিত, উৎসব-অঙ্গন ক্রমে নির্জ্জন হয়ে এল, আমরাও প্রাচীন জাভার স্মৃতিসৌরভ-ব্যাকুল এই রূপকথার পুরী থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

গন্ধের গন্ধ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুগন্ধি—যা তুমি আমারে বন্ধু, দিয়েছিলে উপহার—
শেষ হয়ে গেছে, প'ড়ে আছে খালি শিশি;
—তাও বুঝি নাই,—কে কবে কোথায় করিয়াছে অধিকার,
জঞ্জাল-মাঝে গিয়েছে সে কবে মিশি!

খস্—না, হেনা—না, অজানা সে কোন্ শস্পের মৃদুবাস—
ছিল,—তাও আর পড়েনাক ভাল মনে;
শুধু থেকে-থেকে গন্ধে-ভরা সে অতীতের ইতিহাস
সুদূর স্মৃতিটি জাগায় ক্ষণে-ক্ষণে!

কোথা তুমি আজ, কোথায় বা আমি—কোন্ দূরান্ত দূরে,
—সবই গেছে, শুধু আছে গন্ধের গন্ধ!
ভালবেসে-দেওয়া উপহারটুকু,—আছে যা হৃদয় জুড়ে,
এ-শেষ-জীবনে জেগে থাক্ সে আনন্দ!

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লখা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন।]

৮

মহামায়ার শরীর আর কিছুতেই ভাল হয় না। হৈমবতী একলা সমস্ত সংসারের কাজ পারিয়া উঠেন না। লুচি ভাজিতে গেলে বেলিয়া দেয় কে? মাছ কুটিতে গেলে উনানের আগুন উস্কায় কে? কাজকর্ম্মে বড় বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। সুধা প্রায় এগার বছরের মেয়ে হইল, তাহাকে কাজেকর্ম্মে টানিয়া আনিলে তবু হৈমবতীর অনেকখানি সুরাহা হয়; কিন্তু ছোট খোকার পিছনে অষ্টপ্রহর ছুটিতে ছুটিতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়, সে হৈমবতীকে সাহায্য করিবে কি করিয়া? খোকা এক বছর পার হইয়া গিয়াছে, টলিয়া টলিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলা ও সংসারের সমস্ত জিনিষ উন্মত্ত ভৈরবের মত দুই হাতে টানিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করাই তাহার কাজ। সংসারটা পাছে একলাই সে রসাতলে পাঠাইয়া দেয় তাই সতর্ক প্রহরীর মত সুধা এই ক্ষুদ্র কালাপাহাড়কে বন্দী করিবার ফন্দীতে দিনরাত ব্যস্ত।

আজ সে খাট হইতে পড়িয়া গিয়া স্থাড়া মাথাটা আমের আঁঠির মত ফুলাইয়া বসিয়া আছে, তাই সুধা তাহাকে লইয়া বড় বিব্রত। পিছন পিছন দৌড়াইতে সুধা খুব পারে, কারণ সেটা যেমন খোকাকে আগলানো তেমন সুধারও একটা খেলা। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত দস্যু ছেলেটাকে সারাদিন কোলে করিয়া বেড়ানো কি তাহার মত ছেলেমানুষের সাধ্য? খোকা কোলের ভিতরই এমন জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়া খাড়া হইয়া উঠে যে দাঁড়াইয়া থাকিলে সুধা সুদ্ধ সেই ধাক্কায় পড়িয়া যাইবার যোগাড় হয়। অথচ ঐ তালের মত ফোলা মাথাটা লইয়া উহাকে আজ ত আবার দস্যিপনা করিতে দেওয়া যায় না?

সুধা হৈমবতীর শরণ লইল। "পিসিমা, খোকনকে যদি তুমি রাখ, তাহলে তোমার সব কাজ আমি ক'রে দেব। ওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর আমি পারছি না।"

পিসিমা বালিসুদ্ধ ভাঙা খোলা উনানে বসাইয়া তাহার উপর কুচি দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া খই ভাজিতেছিলেন। তপ্ত খোলায় শুভ্র বেলফুলের মত মোটা মোটা খইগুলা ভোজবাজির মত এক মুহূর্ত্তে রাশি রাশি ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্যে বাঁ হাতে লোহার চোঙাটা ধরিয়া পিসিমা তাঁহার ভারি গাল দুটি আরও ফুলাইয়া উনানে ফুঁ পাড়িতেছিলেন। কাঠের উনানের ধোঁয়ায় ও আগুনের তাতে তাঁহার মুখখানা গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সুধার কথা শুনিয়া পিসিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাকে আর আমার কাজ করতে হবে না। তুমি যাবে ত কলকাতায় মেমসাহেব হতে! এই বুড়ী পিসির সঙ্গে খই ভাজতে কি তোমার বাপ মা তোমায় এখানে রেখে দিয়ে যাবে?"

ছোট খোকা কোল হইতে ছাড়া না পাইয়া তখন সজোরে সুধার ঘন চুলের মুঠি ও কানের পার্শি মাকড়ি দুই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। এক হাতে চুল ও কান ছাড়াইতে ছাড়াইতেই সুধা বলিল, "কোথায় যাবে সবাই, পিসিমা?"

পিসিমা আধপোড়া খড়ের বিঁড়ার উপর ধপাস করিয়া গরম খোলাটা নামাইয়া বলিলেন, "আসন্ন ঘরে মশাল নেই

ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া! তোমার বাপ এই পাড়াগাঁয়ের চালই চালাতে পারছেন না, বৌ এক বছর শয্যেশায়ী। এখন চলেছেন ছেলেমেয়েকে ইংরেজীয়ানা শেখাতে। কে সেখানে সংসার ঠেলবে বাপু? খেয়ে প'রে ছেলেপুলেগুলো বেঁচে ছিল সেইটাই বড়, না না-খেয়ে ইংরিজী শেখা বড়?"

সুধা বিস্মিত হইয়া পিসিমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের কলিকাতা যাইবার কথা একটা আব্‌ছা আব্‌ছা কিছুদিন হইতে সে শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া শুনে নাই। যাই হোক, পিসিমা যখন এত রাগ করিতেছেন তখন নিশ্চয় তাঁহার মনে বেদনা লাগিবার মত কিছু হইয়াছে।

সুধা ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা গেলেই বা কলকাতায়। আমি ইস্কুলে ভর্ত্তি হলেও কাজ করতে পারব। তুমি আমায় একটু একটু ক'রে সব শিখিয়ে নিও। ভাত নামাতে ত আমি শিখেছি। মা না পারেন, আমরা দুজনেই কাজ করব।"

হৈমবতী সরোষে বলিলেন, "আমি যাব কিনা সেখানে তোমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে? আমি যে এখানে তোমাদের আঁধার ঘর আলো ক'রে ব'সে থাকব।"

সুধার মনটা বড় মুষড়াইয়া গেল। সে বলিল, "কেন পিসিমা, তুমি যাবে না কেন?"

হৈমবতীর স্বর হঠাৎ নরম হইয়া আসিল। খই ভাজা রাখিয়া শিল-নোড়া হলুদ সরিষা টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, "সবাই ঘরবাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলে চলে কি মা? এখানে যে সাতভূতে আড্ডা ক'রে নরক গুলজার ক'রে তুলবে। এত দিনের গড়া সংসার অমন ক'রে কি কেউ জলে যেতে দেয়? এই আগলে যক্ষি হয়ে আমায় ব'সে থাকতে হবে।"

পিসিমার উত্তরে সুধার মন খুশী হইল না। সংসারে তাহারাই যদি কেহ না রহিল তবে সে-সংসারকে এত করিয়া বুক দিয়া আগলাইয়া বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন? সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার বুদ্ধি সুধার তখনও হয় নাই। সে মনে করিল এটা পিসিমার এ-সংসারের প্রতি মমতা মাত্র। মমতা তাহারও আছে কিন্তু প্রাণহীন ঘরদুয়ারের প্রতি মমতার জন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রিয়জনদের সে ছাড়িতে পারে না। নহিলে আজন্মের পরিচিত এই স্নেহনীড় ছাড়িবার কথা শুনিয়া তাহারই কি বুকের শিরা-উপশিরায় টান লাগিতেছে না? জন্ম অবধি এ-গৃহের আবেষ্টন যে তাহার দুই চোখে মায়া-অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া ইহাকে ফেলিয়া সে নূতন জগতের মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে? এ ত বছর-বছর পূজায় মামার বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া নয়! এ এক লোক হইতে অন্য লোকে প্রয়াণ! ছোট খোকাকে দুই হাতে কোলের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া সুধা বলিল, "পিসিমা, আমরা বুঝি আর এ-বাড়ী ফিরে আসব না!"

হৈমবতী হলুদমাখা হাতখানাই মুখের উপর তুলিয়া তর্জ্জনী উঁচাইয়া বলিলেন, "ষাট্, ষাট্, ও কথা কি বলতে আছে? বাড়ী এক-শ বার আসবে। তবে চন্দ্র যে কলকেতাতেই চাকরি নিয়ে বসেছেন। এখন কি আর হুট করতেই ঘরে এসে বসা যাবে? পরের গোলাম, ছুটি না পেলে এক পা বাড়াবার সাধ্যি নেই। তার উপর তোমার মায়ের চিকিচ্ছে, তোমাদের ইস্কুলমিস্কুল কত কি! বুড়ী পিসিকে কি তখন আর মনে পড়বে যে দু-বেলা দেখতে আসবি?"

হৈমবতী এমন স্নেহকোমল স্বরে ত কখনও কথা কহেন না? তাঁহার কথা শুনিয়া সুধার চোখে জল আসিয়া গেল। সে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমি জলখাবারের পয়সা জমিয়ে তোমায় নিয়ে যাব পিসিমা; তুমি মাঝে মাঝেও কি যেতে পারবে না?"

ছোট খোকা কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া অন্যমনস্ক হৈমবতীর শিল হইতে এক খামচা হলুদ তুলিয়া লইয়া বলিল, "পাব্বে।"

সুধা খোকার পিঠে সাদরে মৃদু একটা চড় দিয়া হাসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মনের ভিতর তাহার হাসিটা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইল না। সে মনটাকে হাল্কা করিবার জন্য শিবুর খোঁজ করিতে লাগিল। তাহার মনের অল্প বয়সের গাম্ভীর্য্যটাকে হাসি ও খেলার মলয়হিল্লোলে উড়াইয়া দিবার জন্য ছোট ভাই শিবু ছাড়া আর ত তাহার দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল না।

মহামায়া সংসারের কাজে ক্রমশঃই অপটু হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ভারটাই বেশী করিয়া নিজে টানিয়া লইতেছিলেন। সুধা যতক্ষণ ছোট খোকার দৌরাত্ম্য লইয়া ব্যস্ত থাকে, মহামায়া ততক্ষণ শিবুর মানসিক উন্নতির চেষ্টায় মন দেন। খাওয়াদাওয়ার পর খোকন শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে সুধা তাহার বালি কাগজের খাতা, আখ্যানমঞ্জরী, উপক্রমণিকা, সুতাতোলা রুমাল ও মিহি চুলের দড়ি ইত্যাদি লইয়া মায়ের কাছে আসে। হয়ত আজ এতক্ষণে শিবুর পড়া হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া সুধা আসিয়া দেখিল, মেঝের উপর 'বোধোদয়' ও 'নব ধারাপাত' গড়াগড়ি যাইতেছে, শিবু শ্লেটখানা বুকের উপর চাপিয়া চিৎ হইয়া মা'র কোলে মাথা রাখিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মা শিবুকে গল্প বলিতেছেন। বুড়ো ছেলের এখনও মা'র কোলে শুইয়া গল্প শোনার সখ মিটে নাই।

সুধা ছোটখোকাকে মেঝেতে ছাড়িয়া দিয়া দূর হইতে শুনিতে লাগিল, গল্প ত নয়, মা কি সব ছড়া বলিতেছেন :—

"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাস হ'ল দড়ি
আয়রে ভাই সাগরজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"
"ভাত কড় কড় ব্যন্নন বাসি দুধ বিড়ালে খায়,
তোমার খেলাবার সাথী উপবাসী যায়।"

মা কেন আজ এই সব ছড়া বলিতেছেন? সুধা মনে করিয়াছিল মা হয়ত শিবুকে সাত বউয়ের গল্পের

"সাত বৌএর সাত আস্‌কে, খড়কের আগায় ঘি
খুঁত খুঁত খুঁত করছ কেন খেতে লারছ কি?"

ছড়া শুনাইতেছেন। তাহা ত নয়, মা'রও মন চঞ্চল হইয়াছে, তাই এই সব বিচ্ছেদব্যথার করুণ সুর তাঁহারও মনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। হৈমবতী সুধার খেলার সাথী নন, তবু সুধার মনে হইল তাহারা যখন তাঁহাকে এই শূন্যগৃহে ফেলিয়া দিয়া দূরে চলিয়া যাইবে, তখন আনমনা পিসিমার ভাত ব্যঞ্জন এমনই অবহেলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে, তিনি উপবাসী বসিয়া মানসচক্ষে সুধা শিবু খোকার প্রিয় মুখগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবেন। সদ্যমাতৃবক্ষচ্যুতা শিশুবধূর মত তাঁহারও প্রিয়জনবিরহে সাগরজলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিবে।

এই করুণ সুর সুধার আর ভাল লাগিল না। সে বলিল, "মা, খোকনের ঘুম এসেছে, ওকে তুমি একটু দেখো। শিবু, চল্ মুখুয্যেবাঁধের ধারে অনেক চক্‌মকি পাথর দে'খে এসেছি, কুড়িয়ে আনি গে।"

শিবু তড়াক্ করিয়া মা'র কোল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বই দুইটা ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া দিয়া আবার লুফিয়া লইল। তাহার পর সাঁওতালদের সুরে—

"বাবুদের কলাবাগানে,
ওলো, আমার গোলাপকাঁটা ফটেছিল চরণে।"

গাহিতে গাহিতে সুধাকে টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া শিবু সানন্দে সুধার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া বলিল, "দিদি, জান আমরা কলকাতা যাব? দু-জনেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হব।"

সুধা গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ করিয়া বলিল, "তোর ভাল লাগছে?"

শিবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ভাল? আমার ইচ্ছে করছে এখ্‌খুনি হনুমানের লঙ্কা যাত্রার মত এক লাফে কলকাতায় গিয়ে পড়ি।"

সুধা বলিল, "ভাগ্যে ভগবান্ তোকে লেজটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। না হ'লে তুই সাক্ষাৎ হনুমানের মত গাছের ডাল থেকে আর নামতিস না। কলকাতা যাবার জন্যে যে এত ক্ষেপেছিস, সেখানে কি এমনি আমগাছ আর পেয়ারা গাছের ডালে ব'সে থাকতে পাবি? পিসিমা বলেছেন সে ভারী শহর, সেখানে শুধু রাস্তা বাজার আর বাড়ী, গাছপালা কিচ্ছু নেই।"

শিবু বলিল, "আগাগোড়াই নূতন রকম দেশ, তাহলে ত আরোই মজা।"

কিন্তু সম্পূর্ণ নূতনের কল্পনায় সুধার মন ভরিল না। ভোরবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার চিরপরিচিত শিরীষ ফুলের গাছের পিছনে আকাশ রাঙা করিয়া স্বর্ণ কলসের মত সূর্য্যের উদয় যদি না দেখিতে পাওয়া যায়, যদি মেঘে মেঘে সাত রঙের ফাগ ছড়াইয়া সন্ধ্যার সূর্য্য ঐ ন্যুব্জপৃষ্ঠ শৈলমালার পিছনে না অন্তর্হিত হয়, তবে কিসের সে কলিকাতা? শুক্ল পক্ষের মাঝ রাত্রে অন্ধকার ঘরে যখন ঘুম ভাঙিয়া যাইবে তখন পুকুর পাড়ের ঝাঁকড়া কালো

নিম গাছের অন্তরালে থালার মত চাঁদটিকে ধীরে ডুবিয়া যাইতেও কি সেখানে দেখা যাইবে না? দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে এই যে রূপদ্যুতি মনকে ভুলাইয়া দেয় ইহাকে ছাড়িয়া জীবনের আনন্দ যে অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। সুধা ত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। তাহার কতখানি যে পড়িয়া থাকিবে এই স্থূলকাণ্ড মহুয়া গাছের ডালে ডালে শাদা বকের শোভায় আর এই পাহাড়ে পথের ধারে ভীমকায় কালো কালো পাথরে তাহা কে জানে? এই পুকুরের পাড়ে পাড়ে চক্‌মকি কুড়াইয়া আগুন জ্বালিয়াছে, জোড়ের ক্ষীণ জলধারায় পা ডুবাইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে যে সুধা ও শিবু কত দিনের পর দিন, তাহারা ত ঐ সকল বিগত দিনের ভিতর দিয়া এইখানেই রহিয়া গেল; তাহাদের কতটুকু যাইতে পারিবে ইহাদের ফেলিয়া?

সমস্ত নয়ানজোড় যেন আজ ম্লান মুখে সুধার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সজীব নির্জীব সচল অচল সকলের মুখে সুধার মনের বেদনার ছায়াই ম্লানিমা আনিয়া দিয়াছে। ইহারা যে সুধার পরম আত্মীয়। কলিকাতার সৌধমালা ও তাহার সুসভ্য অধিবাসীরা কি নয়ানজোড়ের মত এই পল্লীবাসিনী ছোট্ট সুধাকে আপনার বলিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইবে?

সুধা বলিল, "মজা ত ভারি? ওখানকার আমরা কিচ্ছু জানি না, সবাই আমাদের পাড়াগেঁয়ে বলবে। তুই ভাই সাবধান, লোকের সামনে যা-তা ব'লে বসিস না। লোকে যদি শোনে যে আমিও তোর সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি খেলি আর কোমর বেঁধে গাছে উঠি তাহলে কিন্তু শহরের মেয়েরা ভয়ানক হাসবে।"

শিবু বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, "হাসল ত বয়েই গেল। যারা ডাণ্ডাগুলি খেলতে আর গাছে উঠ্‌তে পারে না তারা ত ভারি মেয়ে, তা আবার পরকে দে'খে হাসবে।"

কিন্তু সুধা বুঝিয়াছিল যে শিবু যাহাই বলুক, তাহার এ বীরত্বটা শহরের নারীত্বের কাছে গৌরবের জিনিষ নয়। তাহাদের অতিপ্রিয় খেলাগুলি তাহাদের নিজেদের যতই মনোহরণ করুক, বাহিরের লোকের চোখের কাছে দাঁড় করাইয়া সেগুলিকে পরের হাসির ও অবজ্ঞার বাণে বিদ্ধ করিতে সে পারিবে না। সুধা ও শিবুর ছেলেখেলার পর্ব্ব এই নয়ানজোড়েই শেষ করিয়া যাইতে হইবে। শিবু ছেলেমানুষ, হয়ত আবার নূতন খেলায় মাতিবে, কিন্তু সুধার শৈশব তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিবে। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূর মত সে শৈশব নিজের পরিচিত গণ্ডীর বাহিরে অমর্য্যাদার ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত নয়ানজোড় জুড়িয়া দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তাহার শৈশব ধূলি-মাটি-জলে যে স্বর্গ তিলে তিলে রচনা করিয়াছে তাহা যে এখানে অতলস্পর্শ শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহাকে টানিয়া তোলা ত যায় না! এই যে ঘরের জানালার ধারে সবুজ ঘাসের মাঠ এ কি শুধু মাঠ? এ ত রত্নাকর অনন্ত জলধি, ওই জানালায় বসিয়া একটা ভাঙা ঘড়ির স্প্রিং লইয়া এই মহাসমুদ্র হইতে সুধা ও শিবু কত রাশি রাশি নীলকান্ত মণি ও পদ্মরাগ মণি তুলিয়া ঘর বোঝাই করিয়াছে। কলিকাতার কেহ কি এ-কথা বিশ্বাস করিবে? তাহারা শুনিলে সুধাদের পাগলা গারদের পথ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, যাহাদের মনের চোখ নাই তাহারাই অপরকে পাগল ভাবে। এই চোখের দৃষ্টি সুধাই ত হারাইয়া ফেলিবে এখান হইতে চলিয়া গেলে। সে কি আর কলিকাতায় গিয়া জানালার ধারে এই ঐশ্বর্য্যশালী মহাসমুদ্রকে কোনও দিন খুঁজিয়া পাইবে?

সুধা বলিল, "সেখানে ত আমরা আলাদা আলাদা ইস্কুলে ভর্ত্তি হব। তুই আর আমি একলা আর কখন খেলব ভাই? আমাদের সব খেলা নষ্ট হয়ে যাবে। অন্তদের সঙ্গে ত আর এসব খেলা হবে না। গল্পগুলো যে আমরা চালাচ্ছিলাম তার কি হবে? বিক্রম চন্দ্রেশ্বর সবাইকার কথা ত একেবারে শেষ ক'রে দিতে হবে? এখনও ওদের কত গল্প বাকি, ওরা ত মোটে বুড়ো হতে পেল না, আগেই সব ফুরিয়ে যাবে?"

বেপরোয়া ভাবে শিবু বলিল, "তাতে কি? তেমন ক'রে শেষ করব না। যত ভাল ভাল জিনিষ আছে, সোনার বাড়ী, রূপোর ঝরণা, শ্বেত হস্তী, গজমোতি, সব ওরা রোজ পেতে লাগ্‌ল, এই রকম ক'রে শেষ করব।"

ক্ষুণ্ণ সুরে সুধা বলিল, "তাহলেও আমরা ত ওদের ভুলে যাব! আমরা ত ওদের আর বড় করব না, সাজাব না, কিচ্ছু না!"

উপায় নাই। সে দুঃখ মানিয়া লইতেই হইবে। শিবু তাহাতে দমিবে না।

এই বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বর সুধা ও শিবুর মানস পুত্র। ঐ সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের ধারে আমগাছতলায় কালো পাথরের ঢিবির উপর তাহাদের দুই জনের প্রকাণ্ড দুই রাজ্য। চোখে দেখিতে ঐ পাথরের ঢিবিটা মাত্র, কিন্তু সে রাজ্য এত বড় যে মাপিয়া শেষ করা যায় না। ধনে ধান্যে ঐশ্বর্য্যে রাজ্য উছলিয়া পড়িতেছে। বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বরের অপ্সরার মত সুন্দরী রাণী, অশোকবনের চেড়ীর মত ভয়ঙ্করী দাসী, ভীমের মত বলশালী সেনাপতি, অর্জ্জুনের মত রূপগুণবান্ পুত্র, কিছুরই অভাব নাই। সুধা ও শিবু এই দুই রাজ্যের বিধাতা। তাহাদের আশীর্ব্বাদে বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বরের ধন সম্পদ্ অর্থ সামর্থ্য সকলই না-চাহিতে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের জীবনধারা মহাভারতের যুগেই আবদ্ধ নয়। সুধা ও শিবু অনন্তস্নেহে আধুনিক যুগে বিচরণ করিবার বরও তাহাদের দিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা করিলে পুষ্পক রথে চড়ে, ইচ্ছা করিলে মোটর হাঁকাইতেও পারে। অতীত ও বর্ত্তমান পৃথিবীর কোনও সুখ হইতে ইহাদের বঞ্চিত হইতে সুধারা দেয় নাই। 'অসম্ভব' বলিয়া কথা তাহাদের জীবনে নাই। কেবল একটি জিনিষ সুধা ও শিবু তাহাদের দিতে চায় না, নয়ানজোড়ের এই বাস্তব মানুষগুলার কাছে সুধারা উহাদের বাহির হইতে দেয় না। উহারা দুই ভাইবোন ছাড়া পাছে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বিক্রমদের কথা শুনিয়াও ফেলে, তাই বিক্রম-চন্দ্রেশ্বরের রাজ্যের ভাষা বাংলা ভাষা নয়। সে ভাষা সুধারাই গড়িয়া দিয়াছে। কত সময় আর পাঁচ জনের কাছে এই ভাষা বলিয়া ফেলিয়া সুধারা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রক্ষা যে, কি কথা হইতেছে বাহিরের পাঁচজন তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সুধারা চুপি চুপি এ-রাজ্যে প্রবেশ করে, চুপি চুপি ফিরিয়া আসে, কেহ জানিতে পারে না। কাব্যে সঙ্গীতে রূপে সে দেশ ঝলমল্ করিতেছে। কিন্তু নয়ানজোড়ের এই নিভৃত আমতলা ছাড়িয়া কলিকাতার কলকোলাহলের ভিতর এ-রাজ্য কি আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পাইবে? বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বর খেয়াল হইলে আধুনিকতা করে বটে; কিন্তু কলিকাতার ভীড়ের ভিতর উগ্র সভ্যতার মাঝখানে তাহারা নূতন রাজ্য গড়িতে চাহিবে না। এই বিপুল বৈভব সমেত তাহাদের রাজ্য দুটি এইখানেই ফেলিয়া সুধাদের চলিয়া যাইতে হইবে মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে। এই পাড়াগাঁয়ে সুধা শিবুদের অনাদরে অযত্নে তাহারা একদিন নিঃশেষে ইহলোক হইতে ঝরিয়া যাইবে। তাহাদের ভাগ্যবিধাতারাও সেদিন তাহাদের জন্য আর শোক করিতে আসিবে না।

সুধা মনে করিয়াছিল, মাঠে ঘাটে শিবুর সঙ্গে খেলা করিয়া সে তাহার নবজাগ্রত বিরহব্যথাকে ভুলিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইল না, খেলার ভিতরেও সকল কথা ঐ ব্যথার স্থানটিকেই ছুঁইয়া যায়। ইহার চেয়ে বাড়ী যাওয়াই ভাল। মনটা ত কোথায়ও স্থির হইতেছে না। অসুস্থতার মাঝখানেও মা'র কাজকর্ম্ম ব্যবহারের ভিতর যে একটা অচঞ্চল শান্তির শ্রী আছে তাহার কাছে বসিলেও অন্যের মন শান্ত হয়।

ছোট খোকা এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মা নিশ্চয় বসুমতীপ্রকাশিত তাঁহার ছেঁড়া বঙ্কিম গ্রন্থাবলীটি লইয়া মেঝের উপর পা ছড়াইয়া পড়িতে বসিয়াছেন। দেবীচৌধুরাণী ও বিষবৃক্ষের গল্প তের-চৌদ্দবার তাঁহার পড়া হইয়া গিয়াছে, সুধারাই ত তিন-চার বার শুনিয়াছে, তবু এখনও প্রত্যহ দুপুরে সেই বইখানা লইয়া বসিতে মা'র অতৃপ্তি নাই। কাছে বসিলেই মা "ও পি, পি, প্রফুল্ল পোড়ার মুখী," কিংবা দিবা ও নিশার গল্প পড়িয়া শুনাইতে রাজি। পিসিমা মেঝের উপরেই আঁচল বিছাইয়া শুধু মাথাটুকু তাহার উপর রাখিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর একবার শুইলে তাঁহার চোখে ঘুম নামিতে দেরী হয় না।

২

যাত্রার আয়োজন চলিতেছে। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় আর একটু বেশী মাহিনায় একটা ইস্কুলেরই কাজ পাইয়াছেন। তাই নয়ানজোড়ের ঘরবাড়ী হৈমবতী ও মৃগাঙ্কর ভরসায় রাখিয়া দিয়া তাঁহারা কলিকাতা যাওয়াই স্থির করিয়াছেন।

মহামায়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরঝিও বলছেন, আমারও মনে হয় এই সামান্য আয়ে কলকাতায় গিয়ে আমাদের টানাটানিতে পড়তে হবে, এখানেও দেখাশুনোর

অভাবে আয় ক'মে যাবে। তার চেয়ে এখানেই একরকম ক'রে চ'লে যেত। নাইবা গেলাম ?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "এমনিতেই তোমার চিকিৎসার দু-আড়াই বছর দেরী হয়ে গেল, আর যদি দেরী করি তাহলে আমার নিজের উপর সমস্ত শ্রদ্ধা চ'লে যাবে। খানিকটা আলস্য আর খানিকটা অভাবে যেটা হয়েছে তার প্রতিকার যেটুকু হাতে আছে না ক'রে ছাড়তে আমি পারব না। অনিশ্চিত মন্দ আশঙ্কায় নিশ্চিত ভাল চেষ্টাটা ছাড়া উচিত নয়।"

মহামায়া কিছু বলিলেন না, রোগ সারিতেছে না বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে তিনিই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই জন্য মনে মনে নিজেকে স্বামীর ও সংসারের নিকট অপরাধী ভাবিয়া নীরবেই রহিলেন।

পুরাতন ঝি চাকরদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। করুণা ঝি মহামায়ার দুই ছেলেমেয়েকেই মানুষ করিয়াছিল, খোকারও অনেক কাজ সে করে। তবে মহামায়ার শরীর অসুস্থ হওয়াতে সংসারের কাজে ও তাঁহার সেবায় অনেক সময় তাহার চলিয়া যায়। এখন তাহাকে ঠিক ছেলের-ঝি আর বলা চলে না।

সুধাকে সে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসিত। সুধাকে ছাড়িয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া ? কলিকাতা যাত্রার কথা শুনিয়াই সে বলিল, "সুধা রাণী, রাঙা বর এসে তোমায় পাল্কী ক'রে নিয়ে চ'লে যাবে আর ইঁদুরমাটিতে তোমার পা-দুখানির ছাপ নিয়ে আমরা চোখের জল ফেলব, এই কথা ভেবে আমার বুকটা দুরু দুরু করত, কে জানত তার আগেই তুমি এমন ক'রে চ'লে যাবে ! এ ত রত্নজোড় নয় যে গরুরগাড়ীতে যাব, তেঁতুলডাঙা নয় যে সাত কোশ হাঁটব। কলকাতার রাস্তা আমি জম্মে চিনি না, রেলগাড়ীকে বড় ডরাই।"

শিবু পিছন হইতে গান করিয়া উঠিল,

"কলগাড়ী বাতাসে নড়ে না,"

মহামায়া বলিলেন, "কলগাড়ী যাতেই নড়ুক, তুই অকারণে মানুষকে জ্বালাতন করিস নে।"

শিবু বলিল, "করুণা দিদি এইবার রোজ প্রাণভরে মৃগাঙ্ক দাদার চরণামৃত খেতে পারবে, আর ত বাবা তাকে বকতে আসবেন না।"

করুণা বলিল, "পৈতে হ'লে তোমারই চন্নাম্মিত খেতাম দাদা, তা ত তুমি হতে দিলে না। এত বড় বাস্তন-সন্তান কোথায় পেতাম ?"

শিবু বলিল, "তুমি না আমার ভিক্ষে-মা হবে বলেছিলে, তবে আবার চন্নাম্মিত খেতে কি ক'রে ছেলের পায়ের ?"

করুণা বলিল, "আমি গরীব তাঁতির মেয়ে, আমার কি ধনদৌলত আছে দাদা, যে অমন সাধ পূর্ণ করব ?"

মহামায়া বলিলেন, "সাধ ত একদিকে পূরেইছে, ছেলেকে মা বলাতে পারলে না, কিন্তু মেয়ে ত আমার তোমায় মা'র বাড়া ক'রে তুলেছে।"

শিবু বলিল, "দিদি যা বোকা, এখনও থেকে থেকে করুণাদিদিকে মা ব'লে বসে।"

বাস্তবিকই সুধার করুণা সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা ছিল। এই খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায়া তাম্রবর্ণা করুণার স্বল্পবাস মূর্ত্তি সুধার আজন্ম-পরিচিত বলিয়া কিনা জানি না মাতৃমূর্ত্তিরই একটি ছায়া বলিয়া মনে হইত। শিশুকালে করুণার হাতে ছাড়া আর কাহারও হাতে সে খাইতে চাহিত না। একদিনের জন্য করুণা বাড়ী যাইতে চাহিলে মহামায়ার ভাবনা হইত, 'মেয়েটা বুঝি না খেয়েই মারা যাবে।' হৈমবতীর হাতের ভাতের গ্রাস ঠেলিয়া দিলে তিনি রাগিয়া বলিতেন, "মেয়ের তোমার পছন্দকে বলিহারি বলি বউ, মা রইল পিসি রইল প'ড়ে, ঐ রূপসী তাঁতিবুড়ীর হাতে ছাড়া তাঁর মুখে অন্ন রোচে না।"

শুনিয়া মহামায়া বলিতেন, "কি করব, একেই ওঁটার খাওয়া কম, তার উপর বামনাই ফলিয়ে ওকে ত শুকিয়ে রাখতে পারি না। ওর যা রোচে তাই খাক্ গে।"

হৈমবতী বলিলেন, "রুচি না আরও কিছু ! সব ওই তাঁতিমাগীর বজ্জাতি। চাকরি বজায় রাখবার জন্যে মেয়েটাকে বশ করেছে। আমি হ'লে দু-দিন উপোষ দিয়েও ও বদরোগ ছাড়াতাম।"

এই তর্কাতর্কি শুনিয়া সুধা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় লজ্জা পাইত, কিন্তু তবু করুণার মায়া কাটাইতে পারিত না। বেচারী করুণা তাহার মুখে মা ডাক শুনিতে ভালবাসিত বুঝিয়াই সুধা বড় হইয়াও কত সময় লুকাইয়া তাহাকে 'মা'

বলিয়া ডাকিয়াছে। এই জন্য মৃগাঙ্ক-দাদা তাহাকে কত ক্ষেপাইত!

করুণা বলিল, "মা, সংসারে আর আমার মায়া নেই। ছেলে বল, মেয়ে বল, সবাই টাকার বশ। টাকা না দিতে পারলে ছেলেও মুখে লাথি মারবে। তাদের অচ্ছেদ্দার ভাত আমি খেতে চাই নে। তোমার ভাত এতদিন খেলাম, বাকি ক'টা দিনও যদি খেতে পেতাম তার কি ব্যবস্থা হয় না?"

মহামায়া বলিলেন, "সেখানে দুখানা আট হাত দশ হাত ঘর বাছা, তার ভেতর তোকে নিয়ে আমি কোথায় রাখব? আপনি পাশ ফিরতে জায়গা পাব না, পরকে দুঃখ দিতে নিয়ে যাব কেন?"

করুণা বলিল, "আহা, তবে কেন মা এ সোনার সংসার ছেড়ে সীতের বনবাসে যাচ্ছ?"

শিবু শুনিয়া বলিল, "মা, আমি তোমার জন্যে সাত মহলা বাড়ী ক'রে দেব। দুখানা ঘরে তুমি কথ্খনো থাকবে না। তুমি ঘরজোড়া খাটে শুত খুশী পাশ ফিরবে।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "টাকা কোথায় পাবি রে?"

শিবু বলিল, "কেন? হাটে নোট ভাঙাতে দেব। করুণা দিদি টাকা নিয়ে আসবে।"

সুধা বলিল, "আর নোটগুলো কি গাছ থেকে পড়বে?"

শিবু হার মানিবার ছেলে নয়। সে বলিল, "ওঃ, ভারি ত নোট, অমন আমি ঢের বানাতে পারি।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন "তবেই হয়েছে! একেবারে সাতমহলে মায়ে পোয়ে বন্দী হব।"

দুপুর বেলা পুরানো পাড়ের রঙীন সুতা তুলিয়া হৈমবতী বুড়া আঙুলে বাঁধিয়া পাক দিতেছিলেন। গল্পের শব্দ পাইয়া কাছে আসিয়া হৈমবতী বলিলেন, "বাসা বাড়ী কি আর বাড়ী? পরের কাছে হাত জোড় ক'রে থাকা! এ বলছে দূর দূর উঠে যেতে হবে, সে বলছে দূর দূর উঠে যেতে হবে। মানুষের মান সম্ভ্রম থাকে না ওতে। আমি আর কি বলব বল? আমার কথায় ত কেউ চলবে না? সুখে থাকতে সব ভূতে কিলোচ্ছে।"

মহামায়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "আদত দোষ ত আমার ঠাকুরঝি! তুমি অকারণ অন্যের উপর রাগ করছ কেন?"

মা যে কোনও বিষয়ে দোষ করিতে পারেন একথা মা'র মুখে শুনিয়াও শিবুর বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত মানহানি হইত। সে রাগিয়া বলিল, "মা, তুমি কিছুই জান না। অসুখ করলে কখনও কারুর দোষ হতে পারে না।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "সে টুকুন বুঝি বাছা! কিন্তু আমারই জন্যে যে সমস্ত সংসারটা ওলটপালট হতে চলল এটা কি আর দোষের চেয়ে ছোট কথা?"

হৈমবতী বলিলেন, "থাক্‌গে, ছেলেপিলের কাছে বাপ মায়ের দোষগুণ বিচার করতে হবে না। ওরা কচিকাঁচা, অত কথার মানে কি জানে? যা, তোরা যা দিখি, আপন চরকায় তেল দিগে যা।"

শিবু বলিল, "ও বুঝতে পেরেছি, আমি চ'লে গেলেই মাকে বুঝি তুমি বকবে?"

পিসিমা ধমক দিয়া বলিলেন, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপারা চক্কর, উনি এলেন আমায় শাসন করতে! কে কার নাড়ী কেটেছিল রে?"

এবার আর শিবুর সাহসে কুলাইল না। সে সেখান হইতে এক দৌড় দিয়া আমবাগানে পলাইল। গাছে কচি কচি আম ধরিয়াছে, যদি কিছু দুপুরবেলা একেলার জন্য সংগ্রহ করা যায়।

হৈমবতী ও মহামায়া করুণাকে লইয়া সিন্ধুক খুলিয়া বাসন বাছিতে বসিলেন। হাল্কা দেখিয়া কাঁসা-পিতলের কিছু বাসন কলিকাতা লইয়া যাইতে হইবে। যে সকল বাসনের সঙ্গে তাঁহার মা-ঠাকুমার স্মৃতি জড়িত, সেগুলি হৈমবতী সযত্নে আলাদা করিয়া রাখিলেন, "এ সব সাত কালের জিনিষ বাসাবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, কে কোথায় ভেঙে ছড়িয়ে নষ্ট করবে।"

ননদ সম্পর্কে ত বড়ই, বয়সেও অনেক বড়, কাজেই মহামায়া তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। হৈমবতী যাহা বাছিয়া দিলেন মহামায়া তাহাই করুণার হাতে দিয়া নিজের ঘরে পাঠাইলেন। নিজের পছন্দ ও মতামত প্রকাশ করিলেন না।

পাড়াগাঁয়ে কাঠের বাক্স পাওয়া যায় না, ছোটবড়

ঝুড়িতে বাসনকোশন বসাইয়া কাপড়ে বাঁধা হইল। মহামায়ার টিনের ট্রাঙ্কে সুধা ও শিবুর সামান্য কাপড়চোপড় কাচিয়া কুচিয়া তোলা হইল। শহরে দেশে কাপড়-চোপড় যে বেশী লাগে এবিষয়ে মা ও পিসিমার গল্প শুনিয়াই সুধা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার আটপৌরে চারখানা শাড়ীর উপর আর মাত্র দুখানা ডুরে ও দুখানা নীলাম্বরী শাড়ী। একবার পিসিমা সখ করিয়া একখানা গুলবাহার শাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেইখানাই একমাত্র জমকালো শাড়ী। দাদামহাশয় তিন বৎসর আগে যে চন্দ্রকোণার চৌখুপী শাড়ী দিয়াছিলেন সেখানা সুধার ছোট হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচখানা তোলা কাপড়ে শহরে সুধার মান থাকিবে কিনা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মা'র চেয়ে ত সুধার মান বেশী নয়। মাও ত পাঁচ-ছয়খানা মাত্র ভাল কাপড় লইয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলিয়াছেন। তাঁতিনীরা শহরে কি আর কাপড় বেচিতে আসে না? পূজার সময় ব্যাপারীরা কলিকাতাতেও নিশ্চয় যায়। তাহাদের কাছে দুই-একখানা ডুরে কি চেলি মা দরকার বুঝিলে ঠিক কিনিয়া দিবেন। এ সামান্য জিনিষ লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

হৈমবতী সধবাকালে এবং পরেও কিছুদিন কলিকাতা শহরে ছিলেন। সুধার কাপড়চোপড় গুছাইবার সময় তিনি বলিলেন, "দেখ বৌ, শহরে সব ঘাগ্‌রার উপর শাড়ী বেড়িয়ে পরে, তাতে আবার সেপ্‌টিপিন। তোমাদের ত ঘাগ্‌রাও নেই, সেপ্‌টিপিন্‌ও নেই, লোকের কাছে খেলো হবে না ত!"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "দু-গজ কাপড় কিনে সুধার জন্যে ঘাগ্‌রা ক'রে দিলেই হবে। আমার বুড়ো বয়সে ও-সবে কাজ নেই।"

হৈমবতী বলিলেন, "তবে এইখানেই ক'রে দাও না। একেবারে প'রে যাবে, নইলে সেখানে পরের দেখে শেখার নাম হবে। আর ঐ লোহার সেপ্‌টিপিনগুলো যেন মেয়েকে পরিও না। একটা সোনার ক'রে দিও।"

মহামায়া বলিলেন, "আমাদের ছোট বউ বলছিল যে সেখানে পার্শি মাকড়ি পরার রেওয়াজ এখন আর নেই, এখন সব বল ইয়ারিং পরে। সুধার মাকড়ি জোড়া ভারি আছে, ভেঙে দুল আর সেফটিপিন দুই হবে এখন।"

দু-গজ মার্কিন কাপড় কেনা হইল। কিন্তু মা ও পিসিমা দুইজনেই আধুনিক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ। পেটিকোটটা ঘাগ্‌রার সঙ্গে কোন্‌খানে স্বতন্ত্র তাহা তাঁহাদের জানা নাই। কিন্তু ঐ সামান্য ব্যাপারে হৈমবতী ভীত হন না, তিনি কাপড়ের টুক্‌রাটার দুই মুখ জুড়িয়া পাশ বালিশের খোলের মত সেলাই করিয়া একটা কাপড়ের পাড় পরাইয়া কার্য্য সমাধা করিলেন। এই হইল সুধার আধুনিক সজ্জায় হাতে খড়ি। তবে আপাততঃ লোহার সেফ্‌টিপিনই পরিতে হইল, কারণ নয়ানজোড়ে তখন জাপানী গিল্টির ব্রোচ পাওয়া যাইত না।

সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে মহামায়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমাদের ত সব ব্যবস্থাই হ'ল; কিন্তু ঠাকুরঝি এই পাড়াগাঁয়ের দেশে ঐ ছেলেটাকে সম্বল ক'রে পড়ে থাকবেন, এইতেই যা ভাবনা।"

হৈমবতীর দর্পে ঘা লাগিল। তিনি যেন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আনন্দি বাম্‌নীর মেয়ে হেমি বাম্‌নী ভয় ডর কাউকে করে না। আমার মা ডাকাতের মুখে জুমড়ো ঠেসে দিয়েছিলেন, আমার ঠাকুমা বর্গীর হ্যাঙ্গামের সময় সারা গাঁয়ে একলা ছিলেন আঁতুড়ের ছেলে নিয়ে। গাঁসুদ্ধ পালিয়ে গিয়েছিল, এক ঘটি জল দেবার লোক ছিল না, তবু তিনি ভয় পান নি।"

মা-ঠাকুরমার শৌর্য্যে হৈমবতী আপনার বর্ম্ম গড়িতে চাহিলেও তাঁহার চোখের কোণটা হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

কথা ঘুরাইয়া মহামায়া বলিলেন, "তোমার সাহসের কথা কি আর জানি না ভাই? তার কথা হচ্ছে না। অসুখ-বিসুখের উপর ত মানুষের হাত নেই, সেই ভাবনাটাই আসল।"

হৈমবতী বলিলেন, "তোমরা নিজেদের সামলিও তাহলেই আমার অনেক উপকার হবে। আর ভাবনার কোনও কারণ নেই।"

মহামায়া হৈমবতীর দুর্জ্জয় অভিমানের পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ননদের কাছে ভাবপ্রবণতা প্রকাশ

করিবার সাহস তাঁহার ছিল না ; তিনি কোনও রকম দরদ দেখাইবার চেষ্টা করিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

শাল ফুলের মধুর গন্ধে সমস্ত নয়ানজোড় ভরিয়া উঠিয়াছে, শিরীষ ফুল গাছ ভরিয়া যেন আকাশের দেবতার গায়ে চামর দোলাইতেছে, পলাশের রঙে বন আলো হইয়া উঠিয়াছে ; এমনই দিনে হৈমবতীর দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারই হাতে ঘরদ্বার সঁপিয়া চন্দ্রকান্ত স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সেই লখা মাঝির খড়পাতা গরুর গাড়ী, সেই বনের ভিতর রাঙা সিঁথির মত পথ, পথে আনন্দলহরী লইয়া বৈষ্ণব ভিক্ষুক গান করিতেছে "নিতাই আমার গৌর।"

মহামায়ার আঁচলে আজও হৈমবতী সিঁদুর-কৌটা বাঁধিয়া দিলেন, সুধাদের জন্য দিলেন কদমা ও টানালাড়ু ; কিন্তু এবার ত রতনজোড়ে মামার বাড়ী যাওয়া নয়, যন্ত্ররথের আশায় এ দূর ষ্টেশনের পথে যাত্রা। ঘরদ্বার, মরাই, পুকুর, ঘরের আসবাব, রান্নাঘরের শিলনোড়া যাঁতা সবই যেন পিছন হইতে ডাক দিতেছে,—শিবু, সুধা, ফিরে এস।

শিবু হাসিয়া সুধা কাঁদিয়া তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া গেল। পলাশের রঙে আলো বন্যপথে শিবুর হাস্যচটুল কণ্ঠের গান পিছনে রণিত হইতে লাগিল,

"জাম ফুল নাই ঘরে,
দুটো ভালুক হুঁকুর হুঁকুর করে।"

মহামায়া বলিলেন, "আর এদেশ ওদেশ করব না ; যেখানে যাব সেইখানেই খুঁটি গেড়ে বসব। কেবল গড়া আর ভাঙা, গড়া আর ভাঙা, মন এতে সায় দেয় না।"

(ক্রমশঃ)

ওমরের প্রতি

শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার

১

হে কবি তোমার গানে যে ক্রন্দন-সুর
রণিয়া রণিয়া উঠি করিছে বিধুর
উতলা মানবহৃদি—কোথা তা'র মূল
নাহি জানি মোরা আজি ; বিরহ-ব্যাকুল
তোমার মানসপটে ভাসে কার ছবি,
পারস্যের কোন্ দূর দিনান্তের রবি
রঞ্জিত করিল বিশ্ব গোধূলি-আভায়,
বিস্মৃতির তমোগর্ভে তা'রা লুপ্ত, হায় !

জানি শুধু দেবরোষে ম্লান, ছিন্নদল
লুণ্ঠিত ধরণীবক্ষে সৌন্দর্য্য-কমল ;
একে একে দল তা'র করিয়া চয়ন,
সিক্ত করি অশ্রুনীরে, করেছ বয়ন
একখানি প্রেমহার মর্ম্মস্মৃতি ঢালা ;
সুরভি করিছে বিশ্ব কবিগাঁথা মালা।

২

ইরাণের উপবনে কোন্ সে তরুণী
নিয়েছিল নিখিলের সব ধন লুটি,
হাস্যে কা'র পুষ্পশোভা উঠেছিল ফুটি
মুখর মঞ্জীর কা'র ছন্দে তব শুনি ;
নিবিড় প্রেমের জাল দিয়েছিল বুনি
বিভোল পরাণে তব কা'র আঁখি দু'টি,—
কাহার বিরহে কবি বক্ষ তব টুটি
বন্যাধারা উঠে জাগি—জানি ওগো গুণী।

মানসসুন্দরী সে যে, অতনু, ভাবিনী ;
অন্তর বাহিরে তার মিলে না সন্ধান,
সীমার বন্ধনে কভু দেয় না সে ধরা,
কভু কানে পশে না যে তাহার কিঙ্কিণী
আঁখি কভু দেখে নাই সে রূপ-বিতান—
তাই বুঝি গান তব মর্ম্মলোরে ভরা।

বর্ষামঙ্গল

পর্জন্য স্তব

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজূতানি সন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রাঃ আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু।

মেঘবায়ুময় দিকসকল একত্র হইয়া উৎপতিত হউক, বাতপ্রেরিত মেঘসকল ঘন নিবিড় হইয়া উঠুক, গর্জ্জনরত মহাবৃষভের নিনাদের মতো নদিত হইয়া মেঘসমূহের ধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক।

সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং বেগাসঃ পৃথগ্ উদ্‌বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তাম্ বীরুধো বিশ্বরূপাঃ।

(হে মরুদ্‌গণ) গানরত আমাদের নয়নে মেঘাড়ম্বর আজ প্রত্যক্ষ করাও। ধারাস্রোতের বেগ আজ নানা দিকে উচ্ছলিত হইয়া ধাবিত হউক। উচ্ছ্বাসের পর বর্ষণের উচ্ছ্বাস আজ পৃথিবীকে মহনীয় করুক। বিশ্বরূপ বীরুধসকল আজ নানা বিচিত্ররূপে আবির্ভূত হউক।

উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্
ত্বেষো অর্কো নভ উৎপাতয়াথ।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু।

... হে মরুদ্‌গণ সমুদ্র হইতে (মেঘসকলকে) ঊর্দ্ধে প্রেরণ করো, দীপ্তিমৎ জলময় মেঘসকলকে ঊর্দ্ধে প্রেরণ কর। গর্জ্জনরত মহাঋষভের নিনাদের ন্যায় নদিত হইয়া মেঘসমূহের ধারা পৃথিবীকে তপ্ত করুক।

সং বোরুন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু।

উদারধারা উৎসসকল অজগর সর্পের মতো দিকে দিকে ধাবিত হইয়া তোমাদের সন্তৃপ্ত করুক। মরুদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রচ্যুত মেঘসকল পৃথিবীর উপর বর্ষণ করুক।

মহান্তং কোশমুদচাভিষিঞ্চ সবিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ।
তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দিনীরোষধয়ো ভবন্তু।

হে পর্জন্য, (সমুদ্র হইতে) তুমি মহা জল সঞ্চয়কে উত্তোলিত কর। (বিশ্ব) অভিষিক্ত কর, বিদ্যুতে বিদ্যুতে ও ঝঞ্ঝায় আকাশ ছাইয়া ফেল। দিকে দিকে প্রভূতভাবে মুক্ত জলধারা যজ্ঞকে বিস্তার করুক। ওষধিসমূহ আনন্দিত হইয়া উঠুক।

গান*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলে ছলছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়
কিনারায় কিনারায়।
ওকে মেঘের ডাকে ডাকল সুদূরে
আয় আয় আয়।
কূলে প্রফুল্ল বকুল বন
ওকে করিছে আবাহন,
কোথা দূরে বেণুবন গায়—
আয় আয় আয়।
তীরে তীরে সখি,
ঐ যে উঠে নবীন ধান্য পুলকি।

---

* এই লেখাগুলি কবিতা নয় এগুলি গান। পাঠ-সভায় এদের স্থান নয়, গীত-সভায় এদের আহ্বান; সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো-নেভা প্রদীপের মতো॥ রবীন্দ্রনাথ

বকতে আসবেন না।"

কাশের বনে বনে
দুলিছে ক্ষণে ক্ষণে
গাহিছে সজল বায়—
আয় আয় আয়।

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু
বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশথ পল্লবে অশান্ত হিল্লোল
সমীর-চঞ্চল দিগঙ্গনে।
নদীর কল্লোল, বনের মর্ম্মর
বাদল-উচ্ছল নির্ঝর ঝর্ঝর
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে,
শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিল রাগিণী।
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধ মদিরা
অজস্র লুঠিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া,
ভয়ার্ত্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া,
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব
মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া॥

ঐ মালতীলতা দোলে দোলে,
পিয়াল তরুর কোলে
পূব হাওয়াতে।
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা
ফিরি আপন ভোলা,—
মোর ভাবনা কোথায় হারা
মেঘের মতন যায় চ'লে॥
জানি নে কোথায় জাগো
ওগো বন্ধু পরবাসী
কোন্ নিভৃত বাতায়নে।
সেথা নিশীথের জলভরা কণ্ঠে
কোন বিরহিণীর বাণী
তোমারে কী যায় ব'লে॥

স্বরলিপি

গান : ঐ মালতীলতা দোলে দোলে

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

সা সা II সা রা জ্ঞা রা । মজ্ঞা -া মজ্ঞরা সা I সজ্ঞা -রা সা -া । সা রা রপা -া
ঐ ০ মা ল তী ল তা ০ ০০ ০ দো০ ০ লে ০ দো ০ লে ০

I পা ধা ণা র্সা । ণা র্সা -ণা পধা I মা -পা মা -া । জ্ঞা রা সা -ন্‌া I
পি য়া ল ত রু ০ ০ র কো ০ লে ০ ০ ০ 'ঐ' ০

I সা রা জ্ঞা রা । মজ্ঞা -া মজ্ঞরা -সা I সজ্ঞা -রা সা -া । -া -া -া -া I
মা ল তী ল তা ০ ০০ ০ দো০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্রা র্সা র্সা । র্সা ধা ণা ধা I ণা ধা ণা পা । পা পধা পা মা I
পূ ব্ হাও য়া তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মা ল০ তী ল

I মজ্ঞা -া রা সা । সজ্ঞা জ্ঞরা সা -া I -া -া না না । না না না না I
তা ০ ০ ০ দো০ ০ লে ০ ০ ০ মো র্ হৃ দ য়ে ০

I না না না র্সা । ধনা -া -র্সা -া I নর্সা -ধা ণা ধা । ণা ধা ণা ধপা I
লা ০ গে ০ দো ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা ধণা -া । ণা -া ণধা পা I পধা ণধা ধপা -া । -া -া সা সা I
ফি রি আ০ ০ প ০ ন০ ০ ভো০ ০০ লা ০ ০ ০ মো র্

I সা রা জ্ঞা রা । মজ্ঞা -া -া রসা I সা রা রা পা । -া -া -া -া I
ভা ব না কো থা ০ ০ য়্‌০ হা ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I পর্সা র্সর্রা র্সা র্সা । ণা -ধা ধপা ধা I মা -পা মা -া । জ্ঞা রা সা -ন্‌া II
মে ঘে০ র ম ত ন্ যা য়্ চ ০ লে ০ ০ ০ "ঐ" ০

। -া -া -া -া II{ গা গা গা গা । গা গা গা -মা I -মা -া -া -া । মা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
০ ০ ০ ০ জা নি নে কো থা য়্ জা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ ও গো

I জ্ঞা -রা জ্ঞমা জ্ঞমা । -জ্ঞা -া রা সা I রা ন্‌া -সা -া । -া -া -া -া I
ব ন্ ধু০ ০০ ০ ০ প র বা ০ সী ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া সা -জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা রা I সা -া রা ন্‌া । সা -া -া -া } I
০ ০ কো ন্ নি ভৃ ত বা তা ০ ০ য় নে ০ ০ ০

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ-উৎসব

বৃক্ষরোপণ-উৎসবে আশ্রমবালিকাগণ মঙ্গলশঙ্খ ও মাঙ্গল্যদ্রব্যাদি বহন করিয়া উৎসবস্থলে চলিয়াছেন

[শ্রীজ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

উপরে : বৃক্ষরোপণ ও জলাশয়প্রতিষ্ঠা উংসবে রবীন্দ্রনাথ আসীন : পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মন্ত্রপাঠ করিতেছেন

নীচে : মাঙ্গল্যদ্রব্যবাহিনী আশ্রমবালিকাগণ চতুর্দ্দোলায় বাহিত তরুশিশু

[শ্রীজ্যোংস্না চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

I{ -া -া পা পা । পা পধা মা মা I পা পা পা ধা । না না র্সা -া I
০ ০ সে থা নি শি০ থে র জ ল ভ রা ক ণ্ ঠে ০

I -া -া -া -া । র্সা -র্রা -র্সা র্সা I র্সা -ণা ণা ণা । ণধা -া পা -া } I
০ ০ ০ ০ কো ন্ বি র হি ০ ণী র বা ০ ণী ০

I পা ধা ণা -া । পধা -া পা পা I মা -পা সা -া । জ্ঞা রা সা -ন্া II II
তো মা রে ০ কি ০ যা য়্ ব ০ লে ০ ০ ০ "ঐ" ০

[বর্ষামঙ্গলের অপর দুইটি গানের স্বরলিপি প্রবাসীতে ক্রমশ প্রকাশিত হইবে]

জলোৎসর্গ

জল-প্রশস্তি : বৈদিক

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন।

মহে রণায় চক্ষসে॥

হে জল যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদিগকে অন্নলাভের যোগ্য কর, মহৎ ও রমণীয় দৃষ্টিলাভের যোগ্য কর।

বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীর্

আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু॥

সর্ব্ববিধ দোষ ও মালিন্যদূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি

খনিত্রিমা উত বা যা স্বয়ংজাঃ।

সমুদ্রার্থা যা শুচয়ঃ পাবকাস্তা

আপো দেবীরিহ মাম্ অবন্তু॥

দ্যুলোক হইতে যাহা অবতীর্ণ, অথবা যাহা (ভূতলে) প্রবহমান, অথবা যাহা (ভূগর্ভ হইতে) খননের দ্বারা প্রাপ্ত বা যাহা স্বয়মুচ্ছ্বসিত, সর্ব্ববিধ জলেরই শেষ অর্থ (লক্ষ্য) সমুদ্র, অতএব তাহা শুচি দীপ্তিমান ও পাবক; সেই দিব্য জল আমাকে রক্ষা করুক।

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে

শং য়োরভি স্রবন্তু নঃ॥

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম

জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে॥

শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ

শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ॥

এই দিব্য জল আমাদের ইষ্টকল্যাণ হউক, পানের জন্য ণময় হউক, ইহা আমাদের জন্য মঙ্গল ও আরোগ্য বহন য়া আনুক।

হে জল, আমার শরীর হইতে সর্ব্ব রোগ দূরে রাখ, আমার শরীরস্থ সর্ব্বরোগের ভেষজ (আরোগ্যকারী) হও, আমি যেন চিরকাল জীবিত থাকিয়া সূর্য্যকে দেখিতে পাই।

জলহীন কঠিন দেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণকর হউক, সজল প্রদেশের জল আমাদের কল্যাণকর হউক, খননের দ্বারা প্রাপ্ত জল আমাদের কল্যাণকর হউক, বর্ষণ সংগৃহীত জল আমাদের কল্যাণকর হউক।

পুত্রং পৌত্রম্ অভিতর্পয়ন্তীরাপো মধুমতীরিমাঃ।

আপো দেবীরুভয়াং স্তর্পয়ন্তু॥

এই অমৃতময় জল যেন আমাদের পুত্র পৌত্রদের অভিতৃপ্ত করে। এই দিব্যজল আমাদের (পূর্ব্বপর) উভয় কুলকে তৃপ্ত করুক।

জল-উৎসর্গ : তান্ত্রিক

উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্তমম্।

তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥

আমি সর্ব্বভূতের উদ্দেশ্যে এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম। ইহাতে স্নান পান ও অবগাহন করিয়া সর্ব্বপ্রাণী পরিতৃপ্ত হউক।

সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্।

সুপ্রীয়ন্তাং সর্ব্বভূতা নভো-ভূ-তোয়বাসিনঃ॥

সর্ব্বজীবের জন্য সমান ভাবে আমি এই জল উৎসর্গ করিতেছি। নভো-ভূ-তোয়বাসী সর্ব্বভূত ইহা পানে উত্তম তৃপ্তি লাভ করুক।

মৎপরে কোটিকুলজা সপ্তদ্বীপনিবাসিনঃ।

সর্ব্বে তে সুখিনঃ সন্তু মদ্দত্তেন জলেন বৈ॥

আমার পরে কোটি কুলজগণ ও সপ্তদ্বীপনিবাসী সকল লোক আমার প্রদত্ত এই জলে সুখী হউক।

প্রীয়ন্তাং মনুজা নিত্যং প্রীয়ন্তাং ভূমিগাঃ খগাঃ।

লতাবনস্পতিবৃক্ষাঃ প্রীয়ন্তাং জলবাসিনঃ॥

কীটাঃ পতঙ্গা যে চান্যে দৃষ্টাদৃষ্টাশ্চ প্রাণিনঃ।

ভূতা বৈঃ ভাবিনঃ সর্ব্বে প্রীয়ন্তাং সর্ব্বজন্তবঃ॥

এই জলে মানবগণ নিত্য প্রীতি লাভ করুক, ভূমিগ ও খগগণ প্রীতি লাভ করুক, লতা বনস্পতি বৃক্ষ ও জলবাসা জীবগণ সকলেই তৃপ্তি লাভ করুক।

কীট, পতঙ্গ ও অন্য যে সব দৃষ্ট ও অদৃষ্ট প্রাণী, যাহারা জন্মলাভ করিয়াছে ও জন্মলাভ করিবে এমন সর্ব্ব জন্তুই এই জলে প্রীতিলাভ করুক।

পুষ্করিণীকে প্রণতি

শুভাং সুভদ্রাং পুষ্টিং ত্বাং প্রাণদাং পদ্মমালিনীম্।
সর্ব্বশান্তিং নমস্কুর্মঃ সর্ব্বকল্যাণকারিণীম্॥

শুভা, সুভদ্রা, পোষণদায়িনী, প্রাণদা, পদ্মমালিনী, সর্ব শান্তিপ্রদা, সর্ব্বকল্যাণকারিণী (পুষ্করিণীকে) আমরা নমস্কার করি।

অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের অনুষ্ঠানসূচির শেষভাগে আছে আমার অভিভাষণ। কিন্তু যে-বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হ'ল, তার পরে আমি আর কিছু বলা ভাল মনে করি না। সেগুলি এত সহজ এমন সুন্দর এমন গম্ভীর যে তার কাছে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য্য, তার প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্ম্মল উৎসের মত উৎসারিত।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা ব'লে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে-জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র পঙ্কবিলীন, যে করে আরোগ্য বিধান সে-ই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত্ত মলিন রুগ্ন উপবাসী। ঋষি বলেছেন—হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য কর। সর্ব্ববিধ দোষ ও মালিন্য দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।—জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃশ্যলাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে। নিজের চারি দিককে অমলিন অন্নবান অনাময় ক'রে রাখতে পারে না যে বর্ব্বরতা, তা রাজারই হোক আর প্রজারই হোক, তার গ্লানিতে সমস্ত দেশ লাঞ্ছিত। অথচ একদিন দেশে জল ছিল প্রচুর, আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলায় কবরস্থ মৃত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে, আর তাদেরই প্রেত মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ দেশের সঙ্গে আপন প্রাণাত্মবোধের পরিচয় আজও ভাল ক'রে দিল না। অন্য সকল লজ্জার চেয়ে এই লজ্জার কারণকেই এখানে আমরা সব চেয়ে দুঃখকর ব'লে এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণান্তিক বেদনা-সম্বন্ধে দেশের চেতনার উদ্রেক হয়েছে। ধরণীর যে অন্তঃপুরগত সম্পদ, যাতে জীবজন্তুর আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনার গোড়ায়, এই সহজ কথাটি স্বীকার করবার শুভদিন বো[ধ] হচ্ছে আজ অনেক কাল পরে এসেছে।

যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সব চেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে,—তাই মন্ত্রে আছে, আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মত আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরের পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার পাঁচ মাইল তফাৎ থেকে মধ্যাহ্ন-রৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন ক'রে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ্য দান।

অথচ বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই, যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে এক জনের নাম করতে পারি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের

বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্ব্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা ক'রে গ্রামবাসীদের জল দান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কী রকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।

সেই ভুবনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পূর্ব্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্যে নিঃসন্দেহ তাঁর কাছে যেতুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তিসমবায়ের দ্বারা এই যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরও বেশী। এই রকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এখানে ক্রমে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চার দিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমূর্ত্তি ধারণ করেছিল। আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। বন্ধুরা অনেকে অক্লান্ত যত্নে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শক্তির অনুপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক খর্ব্ব করতে হয়েছে। আয়তন এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোখ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরূপ গ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হ'ল।

এই জলপ্রসার সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের আভায় রঞ্জিত হয়ে নূতন যুগের হৃদয়কে আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিহৃদয় থেকে একে অভ্যর্থনা করছি। এই জল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত ক'রে শস্যদান করুক। এর অজস্র দানে চার দিক স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

বৃক্ষরোপণ

মধুমন্মূলং মধুমদ্ অগ্রম্ আসাম্
মধুমন্ মধ্যং বীরুধাং বভূব।
মধুমৎ পর্ণং মধুমৎ পুষ্পম্ আসাম্
মধোঃ সংভক্তা অমৃতস্য ভক্ষঃ।

ইহাদের মূল মধুময়, অগ্রভাগ মধুময়, এই বীরুধদের মধ্যভাগও হইয়াছে মধুময়। ইহাদের পর্ণ মধুময়, পুষ্পও ইহাদের মধুময়। এইখানেই অমৃতরসের পান ও অমৃতের উপভোগ।

উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলা ভুবঃ।

ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও সমুৎফুল্ল তোমার সকল পর্ণ তুমি সৌভাগ্যের হেতুভূতা, সর্ব্বজয়ী তোমার শক্তি। হে দেবপ্রেরিত বীরুধ, আমাদের নিকট তুমি সুফলা হও, তোমার সহিত আমাদের অন্তরের প্রীতির যোগ হউক।

পুষ্পবতীঃ প্রসূমতীঃ ফলিনীরফলা উত।
সংমাতর ইব দুহ্রাম্ অস্মা অরিষ্টতাতয়ে।

পুষ্পে প্ররোহে ইহারা ঐশ্বর্য্যবতী; ফলবতীই হউক আর অ-ফলাই হউক, সম্মিলিত মাতৃগণের মতো ইহারা আপন স্নেহস্তন্যরসে এই মানবকে সকল দৈন্য ও হীনতা হইতে মুক্ত করুক।

যত্রাশ্বত্থা ন্যগ্রোধা মহাবৃক্ষা শিখণ্ডিনঃ।

যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জ্জুনা উত যত্রাঘাটাঃ কর্করয্যঃ সংবদন্তি।

যেখানে শোভন চূড়াবিশিষ্ট অশ্বত্থ বট প্রভৃতি মহাবৃক্ষবিরাজিত সেখানেই শোভা পাইতেছে হরিত ও শুভ্র সব দোলা, সেখানেই একতানে বাজিতেছে সব বংশী ও মন্দিরা।

রাত্রী মাতা নভঃ পিতা অর্য্যমা তে পিতামহঃ।

হে বৃক্ষ, রাত্রি তোমাদের মাতা, নভ তোমাদের পিতা, প্রেম ও আলোকের দেবতা তোমাদের পিতামহ।

অসদ্ ভূম্যাঃ সমভবৎ তদ্ দ্যাম্ এতি মহৎ ব্যচ।
শতেন মা পরি পাহি সহস্রেণাভি রক্ষ মা।

যাহা ছিল না, পৃথিবীর অন্তর হইতে তাহা হইল আবির্ভূত। তাহারই মহাবিস্তার চলিয়াছে দ্যুলোকের দিকে। শতভাবে তুমি আমাকে পরিপালন কর, সহস্রভাবে আমাকে অভিরক্ষণ কর।

উজ্জিহীধ্বে স্তনয়ত্যভিক্রন্দত্যোষধীঃ।

হে ওষধিগণ, মেঘ স্তনিত হইতেছে, আকাশের অভিক্রন্দন চলিয়াছে, এখনই তো তোমাদের ঊর্দ্ধদিকে মাথা তুলিয়া সমুৎফুল্ল হইয়া উঠিবার সময়।

সর্ব্বাঃ সমগ্রা ওষধীর্বোধন্তু বচসো মম।

এই সমগ্র বিশ্ব ওষধি আমার বাণীকে আজ উদ্বোধিত করুক।

দেবাস্তে চীতিম্ অবিদন্ ব্রহ্মাণ উত বীরুধঃ।
চীতিং তে বিশ্বে দেবা অবিদন্ ভূম্যামধি।

হে বীরুদ্‌গণ, দেবগণ জানেন তোমাদের অন্তরের চিন্ময় সঞ্চয়কে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ জানেন তোমাদের সেই নিগূঢ় সঞ্চয়ের রহস্য। এই ভূমির উপর (স্বর্গ হইতে অপরূপ) তোমাদের সেই সঞ্চয়ের রহস্য একমাত্র বিশ্বদেবগণই পারিয়াছেন বুঝিতে।

[উপরে মুদ্রিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বঙ্গানূদিত।]

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবগুলিকে এখানকার শিক্ষাধারার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গরূপেই গণ্য করা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে যথার্থ আত্মীয়তাবোধ জন্মালে যে মানুষ একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং পবিত্র সৌন্দর্য্যানুভূতি লাভ করতে পারে, এই সত্যটি এখানকার আশ্রমে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে নদী পুকুর শুকিয়ে যায়, গাছপালার সবুজ শোভা আর থাকে না, জীবজন্তু হাঁপিয়ে ওঠে। তার পরে যখন এক দিন বর্ষা আসে মেঘের সমারোহ নিয়ে, তখন যেন প্রকৃতির চার দিকে নবজীবনের সাড়া পড়ে যায়। বৃষ্টির স্নিগ্ধ স্পর্শে মৃতপ্রায় লতাগুল্ম অকস্মাৎ সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, শীর্ণ নদীস্রোতে আসে প্লাবন, মাঠে মাঠে শস্যের ক্ষেতে অন্ন আর আনন্দদানের আয়োজন চলে পূর্ণ উদ্যমে। বর্ষারম্ভে প্রকৃতির সাজগোজের অন্ত থাকে না; রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে নবযৌবন লাভ ক'রে আমাদের প্রাচীনা পৃথিবী আবার তরুণীর বেশ ধারণ করেন। প্রকৃতির দিকে আমাদের হৃদয়কে যদি অবরুদ্ধ ক'রে না রাখি, তবে নববর্ষার এই স্বতউৎসারিত আনন্দ অতি সহজে আমাদের অনুভূতিতেও সঞ্চারিত হ'তে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল এই আনন্দানুভূতিকেই অর্ঘ্যদান করতে চায়।

এবারকার বর্ষামঙ্গলে একটু নূতনত্ব ছিল। চিরপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্ত্তী ভুবনডাঙা গ্রামে। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্ম্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটিকে খনন ক'রে নির্ম্মল জলের সম্বল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল-উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। তাই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়েছিল।

এই জলাশয়ের তীরেই উৎসব-প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে শান্তিনিকেতনের আর একটি দান প্রতিষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগত পুত্র, এই আশ্রমের সর্ব্বজনপ্রিয় ছাত্র মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (মুলু) উদ্যোগে ভুবনডাঙাতে ১৩২৪ সালে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার মৃত্যুর পর বিদ্যালয়টি বালকপ্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিরক্ষার্থ "প্রসাদ-বিদ্যালয়" নামে পরিবর্ত্তিত হয়ে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অর্থসাহায্যে এবং শ্রীনিকেতনের তত্ত্বাবধানে এখনও গ্রামবাসীদের বিদ্যাদানকার্য্যে ব্রতী আছে। তাই এবারকার বর্ষামঙ্গল-উৎসব এই বিদ্যাদানের স্মৃতি এবং জলদানের প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আশ্রমের বাইরে, অথচ, আশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্রের গণ্ডীর মধ্যেই, অনুষ্ঠিত হয়ে একটি বিশেষ মর্য্যাদালাভ করেছিল।

"বৃক্ষরোপণ" এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি শিশুবৃক্ষকে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অভিনন্দিত ক'রে এই উপলক্ষ্যে রোপণ করা হয়, যেন তারা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়ে আমাদের ফলদান, ছায়াদান এবং আনন্দদান করে।

৭ই ভাদ্র সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি তেঁতুল-চারা সযত্নে চতুর্দ্দোলায় স্থাপন করা হ'ল—তারাই ত উৎসবপতি। দুই জন লোক সেই চতুর্দ্দোলা বহন ক'রে চলল পুরোভাগে, আশ্রমবালিকারা নৃত্যগীতসহযোগে অনুসরণ করতে লাগল পশ্চাতে। তাদের কারও হাতে মঙ্গলশঙ্খ, কারও হাতে ধূপধুনো চন্দন, কেউ থালায় সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফুলের মালা, কেউ বা জলের পূর্ণকুম্ভ। আশ্রমের সীমা ছাড়িয়ে সুবিস্তীর্ণ নূতন জলাশয়, তার উঁচু পাড় দিয়ে শোভাযাত্রা চলল ভুবনডাঙাতে উৎসব-প্রাঙ্গণ অভিমুখে। নীচে জলের ভিতরে তার ছায়া কম্পমান, ডাইনে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত, প্রভাতের আলোবাতাস জেগে উঠল গানে গানে—

> "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
> হে প্রবল প্রাণ।
> ধূলিরে ধন্য কর করুণার পুণ্যে
> হে কোমল প্রাণ।"

গ্রামবাসীদের উৎসাহের অন্ত নেই, সারারাত জেগে তারা মণ্ডপ সাজিয়েছে, পুকুরের জলে চার দিকে হাঁড়ি ভাসিয়ে তার ভিতরে বসিয়েছে নিশান। সেগুলো নেচে নেচে দুলছে বাতাসে, আকাশে বর্ষণক্লান্ত মেঘ।

উৎসব-প্রাঙ্গণে এসে চতুর্দ্দোলাসহ শিশু গাছগুলোকে রাখা হ'ল মাটিতে, মেয়েরাও তাদের আনীত মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলো রাখল চার দিকে সাজিয়ে। আশ্রমবাসী এবং অতিথিগণ এসে সমবেত হয়েছেন। কবি শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত উত্তরীয় এবং শ্বেত শ্মশ্রুরাশিতে শোভিত হয়ে বসেছেন তাঁর আসনে—সম্মুখে বিশাল জলাশয়ের বুকে কাঁচা রোদের মায়া।

গ্রামের দুটি ছোট মেয়ে এসে কবিকে মালাচন্দনে ভূষিত ক'রে অর্ঘ্যদান করল। গান সুরু হ'ল—

"আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালকতরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল্ আমাদের ঘরে চল্।"

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, তরুশিশু এবং আমাদের ঘরের শিশুগুলি যেন এক হয়ে মিশে গেল। উভয়ের অস্ফুট প্রাণের মধ্যে যে একই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ, এই সহজ সত্যটি অন্তরে এসে প্রবেশ করল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে।

তার পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক মন্ত্রদ্বারা তরুশিশুগুলিকে অভিনন্দিত করার পর কবি একটি কমণ্ডলুর জলদ্বারা তাদের সাদরে অভিষেক করলেন।

"বৃক্ষরোপণ" অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়-প্রতিষ্ঠারও উৎসব আরম্ভ হ'ল। এই উপলক্ষ্যে নির্ব্বাচিত বৈদিক মন্ত্রগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সময়োপযোগী হয়েছিল। জলের আনন্দরূপ এবং মাতৃরূপের সহজ বর্ণনার পশ্চাতে কি গভীর অনুভূতি, কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধ! সর্ব্বশেষে কবি তাঁর মধুর কণ্ঠে নব-উৎসারিত জলকে অভিনন্দিত ক'রে একটি অভিভাষণ দ্বারা উৎসবকে সুসম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভুবনডাঙার অধিবাসিবৃন্দ এই জলাশয় প্রতিষ্ঠার একটি সুদৃশ্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছেন।

সেই দিন রাত্রেই গ্রন্থাগারের বারান্দায় নাচগানের আয়োজন হয়েছিল। কবি অনেকগুলি বর্ষার কবিতা আবৃত্তি ক'রে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। রাত্রে উৎসবশেষে সকলেই এই অনুভূতিটি মনে নিয়ে ফিরলেন যে, বর্ষা এসেছে তার পুঞ্জিত মেঘের ছায়া বিস্তার ক'রে—শুধু আকাশের কোণে নয়, আমাদের অন্তর্লোকেও।

যাত্রী—শিল্পী শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

বর ও নফর

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[এই চরিত্রগুলির নিবিড়তর পরিচয়ের জন্য ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে "বরযাত্রী" গল্পটি একবার পড়িয়া লইলে ভাল হয়।]

১

গন্‌শা বলিল—"আমার ক-ক-কপালে পরের শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে সুখ লেখা নেই। সে-বারে কালসিটেয় তিলুর বরযাত্রী হয়ে গিয়ে ওই হ'ল ; পরশু মামীর বাড়ী গেচ্‌লাম। মা-মামী ডেকে ডেকে তেইশ জনকে পেরনাম করালে,—তিন জন ফাউ ; সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-কোমরের ফিক্ ব্যাথাটা এসা আউড়ে উঠেছে···"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"ফাউ মানে ?"

"তি-তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল ; মানে, ঘাড় তুলে দেখবার ত আর ফুরসৎ ছিল না।

কে. গুপ্ত বলিল—"ভিড় জিনিষটা ফুটবলের মাঠেই ভাল মশায় ;—গাড়ীতে বলুন, শ্বশুরবাড়ী-কুটুমবাড়ীতে বলুন···"

গোরাচাঁদ বলিল—"নেমন্তন্নয় বল—বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।"

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল—"তোর নিজের বিয়ের কি হ'ল র‍্যা গন্‌শা ? মামা বলে কি ?"

গন্‌শার মুখটা অদ্ভুত ভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল—"কুষ্ঠির মিল হয়ত গু-গু-গুষ্ঠির মিল হয় না ; ওরা বলে এক, মামারা বলে আর। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু বো-বৌয়ের কথা চাপা পড়ে গেছে।

ঘোঁৎনা বলিল—"আসলে ওর মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি-বাকরি হ'য়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাঞ্জেস্ মিলে ত সেদিন গিছলি, কি বললে ?"

গোরাচাঁদ বলিল—"ভিড়ের কথা যদি বললি ত আমার শ্বশুরবাড়ী ভাল।—বউ, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী ; একটি শালী, শালা আর শালাজ ; পিসেমশাই বলে ডাকবে, তার জন্যে শালাজের একটি ছেলেও দিয়েছেন ভগবান,—মানে যে-ক'টি দরকার ঠিক সাজান, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজেমার্কার মধ্যে এক শ্বশুর—তা সে-বেচারি সন্ধ্যের পর আপিম খেয়ে পড়ে থাকে—নিশ্চিন্দি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধ হয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোরাচাঁদ আবার বলিল—"শিগ্‌গির একবার যেতে লিখেছে ; শাশুড়ী অনেক দিন দেখে নি কি না।"

রাজেন প্রশ্ন করিল—"কবে যাচ্ছিস্ ?"

"বাবা বলছে এটা মলমাস ; ক'টা দিন যাক্, তার পর।"

গন্‌শা বলিল—"বে-বেটা ছেলের আবার মলমাস ! তুই ত আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস্ না।"

রাজেন শিস্ দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিল, থামাইয়া বলিল—"আমি ত বুঝি শ্বশুরবাড়ী যাব—ঠিক যখন কেউ ভাববে না যে জামাই আসছে। তাহ'লেই ত যার জন্যে যাওয়া তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। বলা নেই, কওয়া নেই, হুট ক'রে গিয়ে পড়লাম—বৌ বোধ হয় তখন গা ধুয়ে উঠে কালো চুলে রাঙা গামছা জড়িয়ে জল নিংরোচ্ছে···"

গন্‌শা বলিল—"ঘুম থেকে উঠে—ক-কড়াইমুড়ি চিবোতেও ত পারে, নয়ত মুখ ভেংচে ঝগড়া করতে কারও সঙ্গে···"

গোরাচাঁদ রাজেনের মত কবি না হইলেও রাজেনের কথাটা তাহার মনে লাগিল।—নূতন বিবাহ ত! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"কিন্তু তা'তে খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধে হয়, জোগাড়যন্ত্র কিছু থাকে না কি না, আর আমার শ্বশুরবাড়ী একটু আবার পাড়া-গাঁ-গোছেরও।"

ত্রিলোচনের নববিবাহের রসচেতনায় একটু আঘাত

লাগিল। বিরক্তভাবে বলিল—"তোর শুধু খ্যাটের চিন্তা গোরা। বিয়ে না দিয়ে কাকা যদি তোর একটা হোটেলে ওয়েটারের চাকরি ক'রে দিত ত···"

গোরাচাঁদ বলিল—"গন্‌শা কি বলিস্—যাব একবার কাউকে কিছু না জানিয়ে ?"

গন্‌শা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল—"চ-চ্চল না।

সকলেই একজোটে বলিয়া উঠিল—"চল না, মানে ?"

গন্‌শা উত্তর করিল—"আম্মো তাহলে একবার দেখে আসি গোরার শ্বশুরবাড়ী।"

গোরাচাঁদ একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গন্‌শার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"চল মাইরি; আমার বন্ধু জানলে তারা···"

গন্‌শা বলিল—"হ্যাঁ, তোর বন্ধু হ'য়ে গিয়ে বাইরের চালের বাতা গুণি, আর তোর আপিমখোর শ্বশুরের বক্তার শুনি।"

রাজেন প্রশ্ন করিল—"তবে ?"

"ভাবছি চা-চ্চাকর সেজে গেলে কেমন হয়।"

ত্রিলোচন একটু অন্যমনস্ক ছিল; বোধ হয় বিনা খবরে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথাটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আর সবাই উল্লসিতভাবে বলিয়া উঠিল—"গ্র্যাণ্ড হয়, উঃ!"

ঘোঁৎনা বলিল—"যাবি যে গোরা, বাড়ীতে কি বলবে ? দু-দিন থাকবে ত ?···তুই-ই বা কি বলবি ?"

রাজেন বলিল—"গোরা বলবে—আমাদের কারুর জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল কোথাও।···তোর শালীর বয়স কত রে গোরা ?"

কে. গুপ্ত বলিল—"আর গণেশ বাবুর বললেই হবে চাকরি খুঁজছিলেন।"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া বলিল—"চা-চ্চাকরি কি হারান গাই-গরু মশাই যে তিন দিন ধ'রে দিন নেই রাত নেই খুঁজতে থাকবে ?···ব'লে দিলেই হবে একটা কিছু; মা-আমাদের তো ঘুম হচ্ছে না গন্‌শার ভাবনায়।

২

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গোরাচাঁদের মনে একটা মস্ত লোভের উদ্রেক হইয়াছিল, 'সন্ধ্যা-বাজার'-এর নিকট পৌঁছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; বলিল—"যখন দু-জনেই যাচ্ছি গন্‌শা, কিছু গলদাচিংড়ি, দার্জ্জিলিঙের কপি, কড়াইসুঁটি আর নৈনিতাল-আলু নিয়ে গেলে হ'ত না! —আর কিছু মিষ্টি। মানে তোর খাবার না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ-গোছের জায়গা কি না। আমরা পৌঁছুবও সেই যার নাম আটটা—রাত হয়ে যাবে।"

গন্‌শা বলিল—"কিন্তু গাড়ীর আর মোটে আধঘণ্টাটাক দেরি।"

যাহোক, বাজারটা একেবারে হাতের কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশী সময়ই লাগিল। গোরাচাঁদ তরকারির ঝুড়িটা লইল, গন্‌শা খাবারের হাঁড়িটা। তাহার পর ক্ষিপ্রতার জন্য গন্‌শা যে-বাসটায় উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্রতার অভাবেও, কতকটা ঝুড়িটার জন্যও গোরাচাঁদ সেটা ধরিতে পারিল না। দুইটি 'ষ্টপ' পার হইয়া যাওয়ার পর গন্‌শা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গোরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। ষ্টেশনে প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্লাটফর্মে ঢুকিয়া গনশা জিজ্ঞাসা করিল—"ডা-ডানদিকেরটা না বাঁদিকেরটা র‍্যা গোরে ?"

পাশাপাশি দুইটা গাড়ী দাঁড়াইয়া। ঢুকিবার সময় প্লাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে; সন্দেহ আছে বুঝিলে গন্‌শা আবার পাছে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে সেই ভয়ে গোরাচাঁদ পরিণাম চিন্তা না করিয়াই বলিল—"না, বাঁদিকেরটা।"

গাড়ীতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এক কোণে গিয়া দুই জনে একটু জায়গা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাঙ্কের এক কোণে রাখিল; গন্‌শার হাত হইতে হাঁড়িটা লইয়া চুপড়ির মধ্যে বসাইয়া দিল।

ক'দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে; তায় দৌড়া-দৌড়ি, তাহার উপর ভিড়। গন্‌শা ঠেলিয়া ঠুলিয়া আসিয়া প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল—"ফাষ্টো বেল হয়ে গিয়েছে বাপু।"

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল—"যাওয়া হবে কনে ?"

"সিঙ্গুর।"

"সিঙ্গুর!—সে ত বাবা তারকেশ্বরের লাইন। এ গাড়ী ত নয়; ঐ সামনেরটা।"

গনশা কতকটা অবিশ্বাসে, কতকটা উদ্বেগে বলিল—"কে বললে!"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধ হয় একটু রগচটা; বলিল—"কেউ বলে নি; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেষে এটাও হাতছাড়া করবে, গাটের পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ···উঠে পড়।"

হুইস্‌ল্ দিয়া গাড়ী ষ্টার্ট দিল। গনশা চীৎকার করিয়া বলিল—"গোরা, শি-শি-শিগ্‌গির নেমে পড়; বলছে···"

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াই ছিল একটু; "কে বলছে?—কে বলছে র‍্যা?"—বলিতে বলিতে হন্তদন্ত হইয়া, লোকদের পা মাড়াইয়া, মোট ডিঙাইয়া আসিয়া কোন মতে নামিয়া পড়িল। গনশা চোখ রাঙাইয়া বলিল—"ত-ত্তবে যে তুই বললি—বাঁদিকেরটা।"

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়ীটার দিকে চাহিয়া বলিল—"যাঃ চুপড়িটা গেল ছেড়ে, হাঁড়িসুদ্দু! হায়, হায়,···"

একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"মশাই! চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে—ঐ বাঙ্কে রয়েছে—উত্তুর দিকে—মানে পূর্ব্ব দিকের উত্তুর—মানে উত্তুর কোণটায় আর কি···"

গনশা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল—"ছো-চ্ছোট, দৌড়ো দিল্লী পর্য্যন্ত ঐ বলতে বলতে···"

পাশের গাড়ীর প্রথম বেল পড়িল। এক জন রেল-কর্ম্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; গনশা জিজ্ঞাসা করিল—"এটা তারকেশ্বর লাইনের গাড়ী ত স্যার?"

"হ্যাঁ, শিগ্‌গির উঠে পড় গিয়ে।"

ভুলের সমস্ত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল—"যে তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর আছে—?"

গনশাও উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটা ধমক খাইয়া দুই জনে তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গনশা প্লাটফর্মের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়াছিল; গোরাচাঁদ পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল—"গলা বাড়িয়ে দেখ্‌ত গনশা—খাবারের ভেণ্ডারটা আছে কাছেপিটে?—বেশ খানিকটা ছুটোছুটি, হয়রাণি হ'ল কিনা।"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, হুইস্‌ল্ দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—"সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধ হয় লিলুয়া পেরিয়ে গেল—হাঁড়িসুদ্দু! একটাও যে মুখে ফেলে দেব এমন ফুরসৎ হ'ল না।"

যাহোক, গাড়ীটার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দু-জনেরই মনমরা ভাবটা কাটিয়া গেল। গনশা, চাকরের মুখে মানায় এই রকম ভাব ও ভাষার একটা গান ধরিল—'পরাণ যদি লিলেই রে প্রাণ ···।' সেটা জমিয়া উঠিতে কোলের কাছে যখন একটু জায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ গিয়া সেইখানটিতে বসিল। প্রথম গুন্‌গুন্ করিয়া গানে একটু যোগ দিল, কিন্তু গনশার তোৎলামির জন্য কোরাসে অসুবিধা হওয়ায়, গাড়ীর বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ী রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে এক দল বরযাত্রী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চেঁচামেচি, এসেন্সের, জুঁইয়ের গোড়ের গন্ধ; চেলিপরা, কপালে চন্দনের ফুটকি-দেওয়া বর।···গনশার গানটা মৃদু হইতে হইতে থামিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল—"হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তোর শা-শা-শালীর বয়স কত র‍্যা গোরা? মানে যদি বিয়ের যুগ্যি হয় ত শিবপুরে পাত্তোরটাত্তোর দেখি; একটা ভদ্দল্লোকের উপ্‌গার ক'রতে পারা মস্ত একটা ভাগ্যি কি না।"

গোরাচাঁদ বলিল—"বৌয়ের ষোল যাচ্ছে, এ কাত্তিকেয় সতেরয় পড়বে; শালী হ'ল দু-বছর তিন মাসের ছোট—তাহ'লে···"

গনশা হিসেবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল—"বিটুইন্ তেরো এণ্ড চোদ্দো। হেলথ্ কেমন?"

"বৌয়ের চেয়ে ভালই ব'লতে হবে। বৌটা ম্যালেরিয়ায় বড্ড ভুগলো কিনা; একেবারেই হাড্ডিসার হ'য়ে গিয়েছিল, ধন্যি বলতে হবে পান্নালাল ডাক্তারকে—যাকে বলে মড়া মানুষ চাঙ্গা ক'রে···"

গনশা প্রশ্ন করিল—"দে-দ্দেখতে কেমন?"

আত্মনিমগ্না

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

গোরাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল—"যাঃ; আহা, উনি যেন দেখেন নি, তবে যে বললি সেদিন—গোরা, তিন্নুর বৌয়ের চেয়ে তোর বৌয়ের রংটা···"

গন্‌শা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না—"তোর শালীর কথা জিগ্যেস ক'রছি, না, স্রেফ বৌ—বৌ ক'রে···"

গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তাই বল্‌। আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি গণেশ জেনেশুনেও ও-কথা জিগ্যেস ক'রছে কেন! শালী হচ্ছে যাকে বলে···হ্যাঁ সুন্দরীই···"

"লেখাপড়া কেমন? ক-কথা হচ্ছে কেউ জিজ্ঞেস ক'রলে আবার খুঁটিয়ে বলতে হবে কিনা। নইলে বলবে—খুব খোঁজ রাখেন ত মশাই!"

"ছাই লেখাপড়া, ওর চেয়ে বৌ অনেক পড়েছে; কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াও দিকিন শালীর।"

গন্‌শা হাসিয়া বলিল—"সত্যি নাকি?" মৃদু হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলাইয়া কি চিন্তা করিল খানিকটা, তাহার পরে ধীরে ধীরে ত্রিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা ধরিল—"মুহা পঙ্কজ সোঙরি, সোঙরি···"

শেওড়াফুলিতে পৌছিতে গোরাচাঁদ বলিল—"তোর খিদে পায় নি গন্‌শা?—সে চুবড়িটা বোধ হয় এতক্ষণ চন্দন-নগরে—তোর কি আন্দাজ হয়?"

গন্‌শা বলিল—"তেষ্টা পাচ্ছে বটে, একটা লেমনেড হ'লে হ'ত।"

গোরাচাঁদ বলিল—"তুই তবে তাই খা, ঐ ভেণ্ডারটা আসছে; আমি দেখি নেমে যদি খাবারটাবার পাওয়া যায় কিছু।"

গন্‌শা ধমক দিয়া উঠিল—"গ-গ-গর্দ্দভ কোথাকার; আর একটুখানি সহ্যি ক'রে থাকবে তা নয়, পথে যা-তা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে।"

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। প্রকাশ করিয়া বলিলও—ঠিক বলেছিস গন্‌শা, পাড়াগাঁয়ের রাত হ'লেও জামাইমানুষ পৌছেছে, যত দূর সাধ্য করবেই তারা,—একটা মস্ত আহ্লাদের কথা ত। কিছু না হ'লেও পুকুরের মাছ আর গরুর দুধটা ত আছেই। আমিও তাহলে একটা লেমনেডই খাই এখন; খিদেটা জলে চাপা রইল, তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস!"

লেমনেড ছিল না, দু-জনে দুটা সোডাই পান করিল। গন্‌শা একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল—"চা-চ্চাপা কি! খিদে একেবারে শান দেওয়া রইল।···মাছ যদি তেমন ওঠে ত একবার কালিয়া রেঁধে দেখাই গোরে। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আবার চাকরের রান্না খাবে না যে।

গন্‌শা উল্লসিত হইয়া বলিল—"রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় ব'সে তুই বাৎলে দে না কেন শালাজকে,—সেই রাঁধে কিনা। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে, গল্পও করতে থাকবি আবার শালী, বৌ সবাই থাকবে···তারা ভাববে জামাইবাবুর চাকর, ওটার কাছে আবার লজ্জা। চাকরবাবু যে এদিকে শিবপুরের ডাকশাইটে গণেশরাম!···"

দুই জনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সিঙ্গুরের আর দেরি নাই। গাড়ীর এদিকটায় তাহারা মাত্র দুই জনে বসিয়া। গন্‌শা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুন্টি-দেওয়া ফরসা পিরান পরিল, মাথার টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা বিড়ী গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়াটা গোরাচাঁদের ছোট স্থটকেসটায় গুছাইয়া ফেলিল; তাহার পর হঠাৎ চোখ দুইটা ট্যারা করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল—"দা' ঠা উর!"

দুই জনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

৩

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ী সিঙ্গুরে পৌছিল।

গল্প করিতে করিতে ষ্টেশনের বাহির হইয়া দু-জনে চলিতে আরম্ভ করিল। বৌয়ের কথা শালী-শালাজের কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ বলিল—"হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে! এদিকে এসেও পড়েছি অনেকটা;—তোকে কি ব'লে ডাকব র‍্যা শ্বশুরবাড়ীতে? মানে বৌটা আবার তোর নাম জানে কিনা"

গিয়াছে। দুই জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্বশুর কি স্থির করে সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া রহিল। আরও খানিক ক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হুঁকাটা বাড়াইয়া শ্বশুর বলিলেন—"ভাবিয়ে তুললে যে!—উপোস ক'রে থাকবেন?"

নিধিরাম কলিকাটা পাক দিয়া হুঁকা হইতে খুলিতে খুলিতে বলিল—"রামঃ, সে কি হয়?"

"উপায়?"

নিধিরাম পরম ভক্তিভরে কলিকাটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"বাবা আছেন।"

গন্‌শা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া মাথা নাড়িল—অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।

"আমি বলি—" বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে যাইতেছিল, নিধিরাম হাসিয়া বলিল—"তুমি যা বলবে বুঝতেই পারছি দা'ঠাকুর,—খবর দিয়ে আসতে পার নি ব'লে আর খুব রাত হয়ে গেছে ব'লে পথে—শেওড়াফুলিতে খেয়ে এসেছ—এই ত?···শুনছেন জামাইবাবুর কথা কর্ত্তা?"

নেশাটা চটিয়া যাইতেছে, জামাইয়ের হাঙ্গামা না মিটাইলে অব্যাহতি নাই; বৃদ্ধ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দ্যাৎ, সে তুই-আমি করতাম ব'লে কি ও ছেলে-মানুষেরাও করবে?—না, সেটা উচিত হ'ত?"

—অর্থাৎ সেইটাই উচিত হইত, এবং যদি না হইয়া থাকে ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমানুষ বলিয়াই হয় নাই।

গন্‌শা গোরাচাঁদ বিমূঢ় ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। গোরাচাঁদ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল; পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান কিছু বলিয়া বসে সেই ভয়ে গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল—"আজ্ঞে, বললে বিশ্বাস যাবেন না,—দা'ঠাউর সত্যই খেয়ে এসেছেন।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া, মরিয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটা ঢেকুর ঠেলিয়া বাহির হইল। তবু যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা সোডা···"

গন্‌শা তাহার দিকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া, মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"তি-তিন গণ্ডা রসগোল্লা, পোয়াটাক কচুরি সিঙ্গাড়া মিলিয়ে পোখানেক মিহিদানা···"

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার মুখের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গন্‌শা বলিল—"শেষে আমি বললাম—দা'ঠাউর; একটা সোডা খেয়ে নাও; তাঁরা ত সেখানে খাবার জন্যে জেদাজেদি করবেনই···"

নিধিরাম বলিল—"করব না জেদাজেদি?—ঘরের জামাই এলেন, বাঃ!"

গন্‌শা ক্রমাগত চোখ-টেপানি দিতেছে। আর কোনও আশা নাই দেখিয়া গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়া বলিল—"দুখীরামের কথা শুনে আমি বললাম —হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব?"—বলিয়া চেষ্টা করিয়া আর একটা ঢেকুর তুলিল।

শ্বশুর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিল—"আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না। নিধে কি বলিস্!"

হাঙ্গাম-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইয়া আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"অবিশ্বাসের ত হেতু দেখছি না, কর্ত্তামশাই; নোতুন জামাই মিছে কথা বলবেন কি?"

"তাই ত!" বলিয়া বৃদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি বলি কি নিধে, জামাইকে না-হয় নেমন্তন্ন-বাড়ী নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর···এটির নাম কি?"

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল—"ক্ষুদিরাম।"

"আমাতে আর ক্ষুদিরামে ব'সে ব'সে গল্প করি না হয়। ··বেহাই বেহান-ঠাকরুণ আছেন কেমন ক্ষুদিরাম?"

"বেশ আছেন"—বলিয়া গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিল—"আজ্ঞে, আমি ত জা-জ্ঞান থাকতে দা'ঠাকুরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না;—এই সাপখোপের দেশ! কর্ত্তাবাবু বললেন—দুখীরাম ম-মলমাস—ছেলেটা একলা যাচ্ছে, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকবি—খ-খ-খবরদার···"

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"নিধু খুব বিচক্ষণ লোক গন্···দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। তোর কোন ভাবনা নেই; নিশ্চিন্দি হয়ে বাবার সঙ্গে গল্প কর। কথা হচ্ছে খিদে ত একেবারেই নেই, কিন্তু শাশুড়ী

ঠাকরুণকে দেখবার জন্মে প্রাণটা কেমন আইঢাই করছে; অনেক দিন পায়ের ধুলো নিই নি কিনা।"

গনশা ভিতরে ভিতরে জলিয়া খাক হইতেছিল, গোরাচাঁদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল—"বি-বিনি পায়ের ধুলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুজে, তাখন আর একটা কি দুটো ঘণ্টা কোন রকমে কাটাও না দা'ঠাউর; মা-ঠাকরুণ ত এক্ষনি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরবেন,—ছিচরণ সঙ্গে নিয়ে ··"

শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"সে আজ সমস্ত রাত আসবে না,—তারা কেউ না; সম্পর্কে আমার নাতনীর বিয়ে কিনা, গিন্নী বাসর জাগাবে···ওকি!—ধর—ধর "

শেষ আশা একটু ছিল, শাশুড়ীর; সেটুকুও যাওয়ায়, গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরাচাঁদ ভাঙা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল, গনশা, নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল।

শ্বশুর বলিলেন—"আহা, ঘুম ধরেছে।"

নিধিরাম বলিল—"চাপ খাওয়া হয়েছে কি না।"

শ্বশুর উঠিয়া বলিলেন—"তবে বাবাজী চল, দুর্গা শ্রীহরি ব'লে শুয়েই পড়বে চল। খিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রণাম করবার জন্মে কোশটাক পথ ভেঙে মাঝরাত্রে গিয়ে কি দরকার? ওঠ, তাহ'লে। দুখীরামকে না-হয় গোটা-কয়েক খইচুর এনে দোব?"

গনশা উত্তর দেওয়ার আগে গোরাচাঁদ প্রতিহিংসাবশে বলিল—"না, না; খাওয়ার ওপর খেয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসবে শেষে; ওর ভরসায়ই বাবা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, মলমাস অগ্রাহ্যি ক'রে।"

গনশার পানে না চাহিয়া শ্বশুরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল।

৫

প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক আরও কাটিল। গোরাচাঁদ ভিতর বাড়ীতে ক্ষুধার জ্বালায় এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায় বিছানাতে পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের দুয়ারের কাছে গনশা ডাকিল—"দা'ঠাউর।"

গোরাচাঁদ উত্তর দিতে যাইতেছিল, নিধিরামের গলার আওয়াজ শুনিল—"ঘুমে এলিয়ে পড়েছেন, আর তুলে কাজ নেই। তুমি তাহ'লে এই দোর-গোড়াটায় শুয়ে থাক দুখীরাম ভাই; আমি যাই কর্ত্তার কাছে; এই সতরঞ্চি রইল।"

নিধিরাম চলিয়া গেলে গনশা ভিতর-বাড়ীর কপাট বন্ধ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, গোরাচাঁদ ধীরে ধীরে ডাকিল—"গনশা!"

"জেগে আছিস্!" বলিয়া গনশা দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

গোরাচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল—"ঘুমুতে পারছি না ভাই, আর সাহসও হচ্ছে না। এসা খিদে গনশা! মনে হচ্ছে ঘুমুলে আর ওটা হবে না, জামাইকে ওদের সকালে টেনে বের ক'রতে হবে।"

গনশা মশার কামড়ে চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"চাকর সেজে এলে আবার মশারি দেবে না মনে ছিল না রে—উঃ!—তার ওপর দু-বেটা আফিমখোরের বক্তার!—নেশা চটে গেছে কিনা···"

গোরাচাঁদ বলিল—"তাও যেমন ভগবান দয়া ক'রে ভুল গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়েছিলেন,—যদি রেখে দিতেন পেটটা খালি থাকলে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা করে রে—জানতাম না।···নিধেটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস্?"

"দুটোই খিদেয় মরছি, অথচ কেমন বলিয়ে নিলে—খেয়ে এসেছি! না-ন্না ব'ললে আর মান থাকত না।"

খানিকটা চুপচাপ গেল। তাহার পর গনশা মাথাটা মশারির মধ্যে গলাইয়া দিয়া পূর্ব্বের চেয়েও চাপা গলায় বলিল—"গোরে, এক মতলব বের করেছি; ভাবছি রাজী হবি কিনা; তোর আবার শ্বশুরবাড়ী কিনা···"

গনশার মতলব বের করায় কত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়, গোরাচাঁদ পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল—কি মতলব র‍্যা গনশা?"

"বুড়ো সেই খইচুরের কথা ব'লেছিল···"

"দিয়েছে না কি?"—বলিয়া গোরাচাঁদ মশারি জড়াইয়া এক রকম পড়-পড় হইয়া নামিয়া গনশার সামনে দাঁড়াইল।

গনশা বলিল—"দেয় নি; তবে—তবে বাড়ীতেই ত আছে···"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া একেবারে গলা নামাইয়া বলিল—"চুরি ?"

গন্‌শা উপরে নীচে মাথা নাড়িল।

গোরাচাঁদ ঝোলটানার শব্দ করিয়া বলিল—"কেই বা দেখছে !···আর এসা চমৎকার খইচুর এখানকার গন্‌শা ; সন্দেশ রসগোল্লা ফেলে···"

"ভাড়ার-ঘর কোন্‌টে জানিস্ ?"

গোরাচাঁদ আবার ভাঁড়ার-ঘর চিনিবে না—তাও শ্বশুরবাড়ীর ! বলিল—"উঠোনের ওদিকে রান্নাঘরের পাশে ···হ্যাঁ রে গন্‌শা, আমার ত একটা-আধটায় হবে না ; ক'মে গেলে ওরা সব টের পেয়ে যাবে না ত যে জামাই রাত্তিরে উঠে এই কাণ্ডটি···"

"গা-গ্-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ! আগে চল আলো নিয়ে, যদি তালা দেওয়া থাকে ত আবার—"

গোরাচাঁদের বুকটা যেন ধ্বসিয়া গেল ; ভীত, নিরাশ দৃষ্টিতে বলিল—"তাহ'লে ?"

"চল্ না, ইডিয়ট্ !" বলিয়া গন্‌শা তাহাকে একটা ঠেলা দিল। বালিশের তলা হইতে দেশলাইটা লইল।

প্রদীপ লইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইতে গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল—"তোরই মতলবের ওপর আমার এক মতলব এসে গেল গন্‌শা,—রান্নাঘরটাও অমনি একবার দেখে নিলে হয় না ? কপাল যেমন তাতে যে কিছু পাব···তবু ধর যদি ওবেলার ভাজা মাছটা-আশটা "

গন্‌শা বলিল—"হ্যাঁ চল ; কখন কখন জল দিয়ে পান্তা ক'রেও রাখে মেয়েরা—খুব তোয়াজ বোঝে কিনা,—নেমন্তন্ন খেয়ে শরীরটা গরম হবে "

উঠান পার হইয়া রকে উঠিয়া গোরাচাঁদ উৎফুল্ল ভাবে বলিল—"তালা দেওয়া নেই রে গন্‌শা ! ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন।"

ভগবান সত্যিই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিতেই দুই জনে দেখিল—সামনে একটা শিকেয় টাঙান একটা বেশ বড় সাইজের হাঁড়ি, তাহার উপর একটা জামবাটি, তাহার উপর একটা কড়া ; পাশে আর একটা শিকেয় একটা পিতলের কড়া।

একটা বিড়াল উনানের পাশে বসিয়া ছিল, ইহাদের দেখিয়া লাফাইয়া জানালায় উঠিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া পিতলের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বাহির করিয়া লইল, উল্লাসে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—"দুধ রে গন্‌শা—মিল্ক !"

গন্‌শা বলিল—"নামা।"

চঞ্চল হাতে নামাইতে গিয়া একটু সরসুদ্ধ দুধ ছলকিয়া গোরাচাঁদের কপালের উপরটায় পড়িয়া গেল ! বাঁ-হাতে সরটি মুছিয়া মুখে দিয়া গোরাচাঁদ বলিল—"বেশ মোটা সর রে ! দুটো বাটি পাওয়া যেত "

গন্‌শা বলিল—"আগে হাঁড়ির শিকেটা দেখে নে।·· এই রে তোর কপালে কড়ার কালি লেগে গেল যে !"

সৌন্দর্য্যের দিকে গোরাচাঁদের খেয়াল ছিল না। "ঠিক বলেছিস্,—দুধটা শেষ পাতের জিনিষ কি না"—বলিয়া কপালটা ডান হাতে মুছিয়া অন্য শিকাটার দিকে অগ্রসর হইল।

গন্‌শা বলিল—"আমি ধরছি শিকেটা ; তুই একটা-একটা ক'রে পাড়। আবার জামায় হাতটা মুছলি বুঝি ?—এঃ, ভূত হয়ে গেলি যে !"

গন্‌শা শিকের একটা দড়ি ধরিল। গোরাচাঁদ উপরের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বলিল—"ঝোল, গন্‌শা !" আঙুলগুলা চালাইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—"মাছের ঝোল !"

আর তর সহিতেছিল না, গোটাকতক মাছ বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া আনন্দের চোটে গন্‌শার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"পুঁটিমাছের টক্ মাইরি !"

গন্‌শার উঁচু-করা মুখে জল আসিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"তাহ'লে হাঁড়িতে নির্ঘাৎ পান্তা আছে ; জামবাটিটা দেখ ত।·· আমার হাত ধরতে গেলি কেন ?—দেখ্ ত—আমায়ও বাঁদর বানিয়ে ছাড়লি।

বিড়ালটা জানালার উপর ডাকিল—"মিউ।"

গোরাচাঁদ বলিল—"তাড়া ত বেটাকে।···ভাগীদার জুটেছেন !"

গন্‌শা বলিল—"না, না, আমি এক মতলব ঠাউরেছি,—

যাবার সময় সব ফেলে-ছড়িয়ে বেড়ালটাকে ঘরে বন্ধ ক'রে যাব।"

"তোর এতও মাথায় খেলে, মাইরি!" বলিয়া গোরাচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল—"ঠিক ক'রে ধরিস্ আমায়; হাতটা কাঁপছে।"

৬

কড়াটা বাঁ-হাতে একটু তুলিয়া জামবাটির মধ্যে হাত দিতে যাইবে এমন সময় বাহিরের রকের একোণটায় বাঘা উৎকট স্বরে ঝাঁউ ঝাঁউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। একে আচমকা, তায় চোরের মন, দুই জনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল এবং তাহাদের হস্তধৃত দড়ি ও কড়াটা কাঁপিয়া গিয়া কড়াটা বাঁকিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা অম্বলের মাছ আর ঝোল হড় হড় করিয়া গোরাচাঁদের মাথার উপর পড়িয়া গেল। গন্‌শা একটা লাফ দিয়া পিছনে সরিয়া গেল, কিন্তু তবু সে নিতান্ত বাদ গেল এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার নিকট হইতে আওয়াজ আসিল—"বাঘা, আমরা সব; থাম্।"

ঝোলে-বোজা চোখে কোন রকমে পিট পিট করিয়া চাহিয়া গোরাচাঁদ দেখিল গন্‌শা চোখ দুইটা বড় করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে; অতিমাত্র ভীত চাপা স্বরে বলিল—"আমার সম্বন্ধী—শিবু-দা।"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল—"উপায়!"

আওয়াজ অগ্রসর হইতে লাগিল—বিয়ে-বাড়ীর চর্চ্চা। সবাই রকে উঠিল। শিবু বাহিরের দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল—"বাবা, ও বাবা!···নিধে···দু-জনেই নিঃসাড়···এই নিধে!"

কর্ত্তার গলারই উত্তর হইল—"এলি তোরা? জামাই এসেছেন।"

দুয়ার খোলার শব্দ হইল। প্রবেশ করিতে করিতে শিবু প্রশ্ন করিল—"আমাদের গোরাচাঁদ?—কখন এল?"

গন্‌শা ফিস্ ফিস্ করিয়া ডাকিল—"গোরে!"

গোরাচাঁদ কাঠ হইয়া গিয়াছে; একবার নিজের অম্লসিক্ত শরীরটা দেখিয়া বিহ্বলভাবে গন্‌শার পানে চাহিয়া রহিল।

সদর-দুয়ারে করাঘাত হইল। গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল—"কি করবি বল ত গন্‌শা? কাপড়-জামাটা ছেড়ে···"

গন্‌শা বলিল—"পাগল!—সময়ই বা কোথায়? আর সুটকেসটাও বাইরে।"

ঘন ঘন করাঘাতের সঙ্গে তাগাদা হইল—"গোরাচাঁদ দোর খোল হে!"

"জামাইবাবু!"

গন্‌শা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া বলিল—"পালাতে হবে গোরে,—খিড়কিটা কোন্ দিকে বল্ ত?"

এত বিপদেও গোরাচাঁদের এ-সম্ভাবনাটা মনে হয় নাই; চরম বিস্ময়ের সহিত বলিল—"পা-লা-তে হবে? শ্বশুরবাড়ী যে!···আর সত্যিই ত, তা না হ'লে···"

বাহিরে শোনা গেল—"নিধে, তুই ওদিক থেকে একটু হাঁক দে ত। শালা যেন কুম্ভকর্ণ! আর চাকরটাই বা কি রকম! দোর খোল হে!"

জোর কড়ানাড়ার শব্দ হইল, কপাটে দু-একটা লাথিরও ঘা পড়িল।

এমন সময় যেখানটা কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছিল সেখানটায় নিধিরামের শঙ্কিত কণ্ঠ শোনা গেল—"দাদাবাবু, রান্নাঘরে আলো দেখছি যে! মা-ঠাকরুণ জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন না কি?"

"কই না!···হে বাবা তারকেশ্বর!!"—মেয়ে-গলার কাঁপা আওয়াজ হইল।

খানিক ক্ষণ একেবারে চুপচাপ। শিবু নিধিরামের কাছে আসিয়া বলিল—"সত্যিই ত! আর দু···"

গোরাচাঁদ এক ফুৎকারে আলোটা নিবাইয়া দিল। গন্‌শা বলিল—"কি করলি?—গাধা!"

"নিবিয়ে দিলে—চোর!—চোর!!···বাবা জেনেশুনে চোর ঢোকালে বাড়ীতে!···নিধে?"

"দেখলাম জামাই—সেই রকম মুখচোখ, কথাবার্ত্তা; দিব্যি প্রণাম করলে···"

"তবে আর কি!—'প্রণাম করলে!'···শিগ্‌গির খিড়কি আগলোগে নিধে; নিশে বাগ্দীকে হাঁক দে—ও রতনের মা···ও সামন্ত—সামন্ত!"

একটু দূরে বনের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসিল—"এজ্ঞে!"

"শিগ্‌গির এস—সড়কিটা হাতে ক'রে—দু-শালা ঢুকেছে।"

"এলাম। সটকায় না যেন, একসঙ্গে গাঁথব। রতনের মা, তোর সেই কাটারিটা নিয়ে বেরো।"

গন্‌শা আর গোরাচাঁদ ঘর ছাড়িয়া উঠানের মাঝামাঝি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, গোরাচাঁদ, একসঙ্গে গাঁথার কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

আওয়াজ হইল—"নিধে!"

"আমি এই খিড়কিতে—বাঘাকে নিয়ে।"

গন্‌শা চারি দিকে চাহিয়া নিরাশ ভাবে বলিল—"কি করা যায়?..."

তাহার পর হঠাৎ গোরাচাঁদের পায়ের নিকট হইতে একটা আদ্ধা-ইট কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"হয়েছে—চল খিড়কির দিকে; তুইও পিঁড়েটা তুলে নে।"

গোরাচাঁদ শঙ্কিত ভাবে বলিল—"খুন ক'রে পালাবি নাকি—নিধেকে?"

গন্‌শা বলিল—"আর বাঘাকে...নয়ত কি খু-খ্‌খুন হবো—সামন্তর সড়কিতে?...কোন্‌টে খিড়কি?—এগো।"

কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় কুকুরটা হঠাৎ নিধিরামের নিকট হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে কি একটা তাড়া করিয়া রান্নাঘরের পিছনে গেল এবং সেখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া উঁচুমুখে প্রবল সোরগোল লাগাইয়া দিল।

শিবু একটু লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে; সব এই দিকটা চ'লে এসো—এখনও আছে শালারা; নিধে আয় দিকিন, সামন্ততে আর তোতে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওদিকে পড়।...বাঘা ঠিক চোখে-চোখে রাখবি ঐ ভাবে।"

বাঘা রাখিতেও ছিল,—কালো বিড়ালের মত শত্রু আর তাহার নাই। বাঘাহীন খিড়কিতে নিধিরামের পা থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া সবিক্রমে বলিল—"হ্যাঁ, ওঠ ত সামন্ত খুড়ো; দাও সড়কিটা ধ'রে থাকি তত ক্ষণ..."

গন্‌শা ও গোরাচাঁদ গিয়া খিড়কি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যেই বুঝিল নিধিরাম সরিয়া গিয়াছে, দোর খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইল। গন্‌শা খুব সন্তর্পণে শিকলটা তুলিয়া দিল। খুব অন্ধকার ঝোপঝাপ। গোরাচাঁদ অগ্রসর হইল; হাতটা পিছনে করিয়া গন্‌শার জামা ধরিয়া খুব চাপা গলায় বলিল—"আয়, একটু ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তা।...বাঘা সরে নি, ওরা বাড়ী নিয়েই থাকবে একটু।"

এত বিপদেও বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল—"একটা রাতও কাটল না।"

গন্‌শা কালসিটের ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া শুধু একবার প্রশ্ন করিল—"পানাপুকুর নেই ত?"

* * *

শিবপুরে ষ্টীমার-জেটির রেলিঙে হেলান দিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া—রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত, গন্‌শা আর গোরাচাঁদ। রাজেন প্রশ্ন করিল—"তার পর, গোরের শ্বশুর-বাড়ী কেমন লাগল গন্‌শা?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"এক রাত্তির থেকেই চ'লে এলি যে বড়?"

গোরাচাঁদের মনটা অপ্রসন্নই ছিল, একটু ব্যঙ্গের সুরে উত্তর করিল—"শ্বশুরবাড়ী এক রাত্তিরের বেশী থাকলে মান থাকে নাকি?"

গন্‌শা কুটা না কি একটা দাঁতে কাটিতেছিল; গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিল—"আসতে কি দি-দ্দিতে চায়?—অনে-ক্কষ্টে..."

আর শেষ করিতে পারিল না। কথাটা বাড়ী ঘেরাও করিয়া আটকানোর সঙ্গে এমন মিলিয়া গেল যে আপনিই যেন তাহার গলার মাঝপথে বাধিয়া গেল।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

পূর্ব্ব পরিচয়

[মানুষের মন উপন্যাসটির বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত গল্পাংশ নিয়ে দেওয়া হইল। ইহার পর হইতে উপন্যাসটির নামকরণ হইল "ত্রিবেণী"।]

ধনী জমিদার শচীন্দ্রনাথ প্রয়াগে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলায় তার সুন্দরী পত্নী কমলা ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে বহু অনুসন্ধানের পর হতাশ-ভগ্নচিত্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লণ্ডনে পৌঁছেই জ্বরে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে। লণ্ডনে পালিত পিতৃহীন চাকুরীজীবী পার্ব্বতী অক্লান্ত সেবায় তাকে সুস্থ করে এবং বিবাহিত না জেনে তাকে ভালবাসে। সুস্থ হয়ে কৃতজ্ঞ শচীন্দ্র তাকে নিজের দুঃখের ইতিহাস বলে এবং কুণ্ঠিতচিত্তে তার প্রেমগ্রহণে অক্ষমতা জানায়। পরে শচীন্দ্রের অনুরোধে পার্ব্বতী ভারতবর্ষে ফিরে কমলার স্মৃতিকল্পে এক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুরী।

এদিকে বৎসরের পর বৎসর নারীপ্রতিষ্ঠানের চক্রে আবর্ত্তিত কার্য্যপরম্পরায় পার্ব্বতীর মন এক এক সময় শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তবু তার অন্তর্নিহিত প্রেমের মোহে শচীন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে দূরে যেতে পারে না। শচীন্দ্রের অন্তরে কমলার স্মৃতি ক্রমে নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে, তবু স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠতায় অভ্যস্ত তার চিত্ত পার্ব্বতীর প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রেমের প্রভাবকে জোর ক'রে অস্বীকার করে অথচ পার্ব্বতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সূত্রে তার আকর্ষণ বেড়ে চলে। এই দ্বন্দ্বের আন্দোলনে তার চিত্ত দোলায়মান।

প্রয়াগ থেকে মাতাল উপেন্দ্রনাথ কমলাকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এনে তার বাড়ীতে বন্ধ করে এবং অত্যাচারে বশীভূত করবার চেষ্টা করে। একদা প্রহারে জর্জ্জরিত কমলা পাশের বাড়ীতে নন্দলাল ও তার স্ত্রী মালতীর আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে পড়ে এবং বহুদিন কঠিন পীড়ায় অজ্ঞান থেকে তাদের সেবায় বেঁচে ওঠে কিন্তু সমস্ত নামের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। নন্দ শিক্ষিত ব্যবসায়ী। স্বভাবভীরু। কমলের রূপে আকৃষ্ট। প্রাণপণ চেষ্টাতেও নিজেকে বশে আনতে না পেরে এখন লোভাতুরচিত্ত। কমলা এই দুর্দ্দৈব থেকে মালতী ও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এক হাঁসপাতালে নার্সের কাজ শিখতে যায়। সেখানে ডাক্তার নিখিলনাথের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করে। এদিকে স্নেহময়ী সরলা মালতী কমলার পুত্র অজয়কে তার নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের সব স্নেহটুকু উজাড় ক'রে ভালবেসেছে—কমলাও তার নিজের বোনেরই মত। এ বাড়ীতে কমলাকে নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোৎস্না।

নিখিলনাথ পাঠ্যাবস্থায় বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে জেল খেটেছিল। এখন পরিবর্ত্তিত জনহিতব্রতী। একদা বিপ্লবী মেয়ে সীমার আহ্বানে শ্রীরামপুরে গিয়ে তার পূর্ব্ব নায়ক সত্যবানকে এক পোড়ো বাড়ীতে মৃতকল্প অবস্থায় দেখে। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে তার অসাধারণ ব'লে মনে হয়। তার সেবা, একাকী তার কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ঠা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সত্যবানের মুখে পুলিসের গুলিতে তাদের দলের সকলের মৃত্যু, নিজে আহত অবস্থায় সীমার সাহায্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বনে জঙ্গলে, পরিত্যক্ত কুটীরে পালিয়ে বেড়ানোর ইতিহাস, সীমার বীরত্ব এবং দেশপ্রীতির কথা শুনে এবং নিজের চোখে তার শ্রান্তিহীন একনিষ্ঠতা দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হয়।

বিপ্লবের আগুনে এতগুলি মহামূল্য প্রাণকে বিসর্জ্জন দেওয়ায় মৃত্যুকালে অনুতপ্ত সত্যবান সীমাকে এই আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে নিখিলনাথকে বলে।

নন্দলাল হাসপাতালে আত্মীয় হিসাবে কমলার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যায় এবং তার বিক্ষুব্ধচিত্তের আক্রোশে একদা নিখিলনাথ সম্বন্ধে কমলাকে অপমান করে এবং তারই সঙ্কোচে কিছুদিন তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

৩৩

"ওগো শুনছ? জ্যোৎস্নাদি'কে কতকাল দেখি নি বল ত? একবার তাকে নিয়ে আসবে এই শনিবারে?"

কথাটা শুনতে যত সহজ নন্দলালের কাছে কথাটা তত সহজ নয়। নিখিলনাথ সম্বন্ধে সেদিনকার সেই কুৎসিত উক্তির পর কমলার কাছে যাওয়া এক দিক দিয়ে তার পক্ষে যেমন লজ্জাকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এক দিকে কমলার এই বিরূপতা তার মনটাকে তিক্ত ক'রে তুলেছে। তার নিজের বাসনার উত্তেজনায় কমলার প্রতি তার মনের ভাব প্রায় ক্রোধের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোৎস্নার মনে কি কৃতজ্ঞতা বলে কোন বস্তু নেই? বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে 'কৃতজ্ঞতা' বলতে নন্দ উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে নি।

নন্দলালের মনের চিন্তার এই ধারা কিছু দিন তার মনটাকে কমলার প্রতি ক্রোধে উত্তপ্ত ক'রে রেখেছিল। কিন্তু অনেক দিন অতিবাহিত হ'লেও যখন সে অপর পক্ষ থেকে কোন উত্তেজনার সাড়া পেল না এবং দিনের পর দিন ধীরে ধীরে তার চিত্তের উত্তাপ স্তিমিত হয়ে এল তখন সে আবার কেমন ক'রে জ্যোৎস্নার বিশ্বাস ফিরিয়ে পাবে তারই উপায় চিন্তা করতে লাগল।

কিছু দিন খোকাকে সে চাকরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল—নিজে ওপথ মাড়াল না। তার পর আরও কিছু দিন সে নিজে গিয়ে দরোয়ানের কাছে দিয়ে এবং নিয়ে আসতে লাগল। কমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার দুঃসাহস তার হ'ল না। তা ছাড়া তার ব্যবহার যে অনুতাপঘটিত এবং লোভের

পর্য্যায়ভুক্ত নয় এমনটি দেখানোরও ভাব তার মনে ছিল। জ্যোৎস্নার মনের অবস্থাটা কি, তা না-জানতে পেরে আড়ালে খোকাকে প্রশ্ন করতে লাগল। বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না। মনে মনে জ্যোৎস্নার মনোভাব জানবার জন্যে সে ছটফট করতে লাগল।

জ্যোৎস্নাকে সে অনেক দিন দেখে নি। তার মনেও তাকে দেখবার ইচ্ছা কিছু কম ছিল না। নিজের বাড়ীতে আনলে সে সুযোগ সহজে ঘটতে পারে বটে, কিন্তু স্ত্রীর সামনে পাছে অশোভন কিছু ঘটে কিংবা তার চেয়েও বিপদের কথা জ্যোৎস্না যদি ওর কাছে কোন কথা ফাঁস ক'রে দেয় তবে আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। কোন কথা যে সে সহজে প্রকাশ করবে না এ-সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিত ধারণা তার মনের মধ্যে অবশ্য ছিল। জ্যোৎস্নাকে সে যত দূর দেখেছে তাতে ব্যস্ত হয়ে অশোভন কিছু করবার মত চপলতা যে তার নেই এ সে জানত; তাই তার মন কমলের প্রতি কতকটা কৃতজ্ঞও ছিল বটে—তবু ভয়ও তার ঘুচ্‌তে চায় না—স্ত্রীলোক—!

এমন সময় মালতী এক দিন তাকে বললে—কতদিন তাকে আন নি বল ত? আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ! দিদির আর তেমন ক'রে খোঁজখবরই কর না। তোমাদের সবই নতুন নতুন।

—তুমি আমার 'নিতুই নব'—কি বল?

মালতী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—ঢং! আর রসিকতায় কাজ নেই। বুড়ো বয়সে ঢং বাড়ছে! সমস্ত দিনরাতের মধ্যে চোখে দেখবার জো নেই, তার আবার কথা!

—ওগো সেও তোমারই জন্যে। কাজের চাপে সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি কই? আর ক'টা বছর সবুর কর, তার পর বুঝলে কি না—হেঁ হেঁ—

—বুঝেছি গো সব। ব্যবসা দুনিয়াতে ত কেউ আর করে না, সবাই যেন দিনরাত পাগলের মত হৈ হৈ ক'রে বেড়ায়, না?

—দেখো আস্‌ছে বছর, যখন গাড়ী কিন্‌ব। তখন যেখানে খুশী—

মালতী আবার ঝাঁজিয়ে উঠ্‌ল—গাড়ী-গাড়ী বাড়ী-বাড়ী ক'রে দেহটা কি করেছ একবার দেখতে পাও? একটা শক্ত ব্যায়রাম-স্যায়রাম না হয়ে পড়লে তোমার মনস্কামনা ত সিদ্ধি হবে না! রাতদিন ঘুরে ঘুরে শেষে যদি বিছানায় প'ড়ে থাক তখন কি হবে বল ত? ও-সব আমি শুন্‌তে চাই নে। তুমি দিদিকে শনিবারে নিয়ে আস্‌বে কি না তাই বল।"

—তোমার দিদিকে আন্‌তে ত এখন লোকের দরকার হয় না। তিনি ত এখন স্বাধীন জেনানা, লিখে দাও না আসতে। লোকের অভাব হবে না গো!

নন্দলাল আনতে গেলে কমলা যে আসবে না নন্দ তা এক রকম নিশ্চয়ই জানত। তা ছাড়া, সেদিনের পর ভাব-গতিক না বুঝে কমলার কাছে যাওয়ার সাহস সে সঞ্চয় করতে পারছিল না। তবু মনের ঝাঁজটুকু সামলাতে পারলে না।

মালতী বললে—ও আবার কি কথার ঢং? কেন, তুমি বুঝি আর একটু সময় ক'রে গিয়ে নিয়ে আসতে পার না? ওগো একটু সময় দিলে তোমার ব্যবসা একেবারে ফেল পড়বে না।

—ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকতে ব্যবসা ফেল পড়া কি মুখের কথা? কিন্তু তুমি কখনও যাবে না আর সে যদি রাগ ক'রে না আসে ত আমি গেলেই কি আসবে?

—আমি জানি না বাপু; ঘরসংসার সামলে, খোকাকে নিয়ে আমার ফুরসুৎ কোথায় বল ত?

—তা বটে, এ ত আর ব্যবসা নয়। আধ ঘণ্টা না থাকলেই চাকরবাকর সব ঘর-সংসার লুটপাট ক'রে রসাতলে দেবে।

—দেবেই ত? না সত্যি, তুমি যাও দিদিকে একটু ব'লে-কয়ে নিয়ে এস।

—সে আমি পারব না। তোমার দিদিকে পার ত তুমি গিয়ে নিয়ে এস—আমি বড়জোর সঙ্গে যেতে পারি।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর সেই কথাই ঠিক হ'ল। শনি-বার সকাল-সকাল ফিরে নন্দ স্ত্রী এবং খোকাকে নিয়ে জ্যোৎস্নাকে আনতে যাবে।

৩৪

সেদিন নন্দলাল চলে যাবার পর কমলাকে এই কথাটাই বিচলিত ক'রে তুলেছিল যে পৃথিবীতে তার এই অভিশপ্ত জীবনের কি আবশ্যক আছে। তার বেঁচে থাকায় কার কোন্ উপকারে সে এল। খোকনের জন্যে সংসারে তার জীবনধারণের যে দায়িত্ব তা যে কোনও দিন সে মাথা পেতে নিজের উপর তুলে নেবার অবকাশ পাবে এমন সম্ভাবনা সে দেখতে পেলে না। সন্তানহীন মালতীর কাছ থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার যে নিষ্ঠুরতা তা তার মাতৃস্নেহে বাধবে। অথচ নন্দলালের গৃহে তার সন্তানকে চিরকাল প্রতিপালন করতে হবে এ চিন্তা তার পক্ষে অসহ্য। চিত্তের এই নিরুপায় উদ্বেগের উত্তেজনায় তার মনে হ'তে লাগল যে মৃত্যু ব্যতীত এর বুঝি কোন সমাধান নেই। তার জীবনের উপর, তার অভিশাপগ্রস্ত রূপের উপর তার ধিক্কার জন্মে গেল। কিছু দিন তার মন যে কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে শান্তিলাভ করেছিল সে শান্তি তার মন থেকে ঘুচে

গেল। তার নিদারুণ এই যন্ত্রণার মধ্যে এমন একজন লোকের কথা সে ভাবতে পারে না যার কাছে হৃদয়ের ভার মোচন ক'রে এই আত্মঘাতী চিন্তা থেকে সে নিষ্কৃতি পায়। মালতী তাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু তারই স্বামীর বিরুদ্ধে তার কাছে সে নালিশ জানাবে কোন লজ্জায়! তা ছাড়া তাদের নিরাময় নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে জেনে শুনে সে এই সর্ব্বনাশের বীজ বপন করবে কেমন ক'রে! তবে সে কি করবে? এই নূতন সর্ব্বনাশ থেকে মালতীকে এবং নিজেকে বাঁচাবে কেমন ক'রে?

দিনে রাত্রে তার স্বস্তি অন্তর্হিত হয়ে তাকে পীড়িত করতে লাগল। কয়েক দিন খাওয়াদাওয়া একরকম সে পরিত্যাগ করলে। শুধু মুখে কিছু রোচে না বলে নয়; নিজের দুরপনেয় দুর্ভাগ্যকে নির্জ্জিত করবার অন্য কোনও সহজ উপায় চিন্তা ক'রে উঠতে পারে নি বলে। আত্মহত্যা করার সাহস বা উদ্যম তার ছিল না কিন্তু আত্মনিগ্রহের চেষ্টাকে তার অন্যায় অকারণ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সে যে এক প্রকার আত্মবিনাশের আস্বাদন পায় তার থেকে নিজেকে সংযত করতে সে চায় না। এমনি ক'রে ক'রে একদা সত্যই সে পীড়িত হয়ে পড়ল।

নিদারুণ মাথার যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় যেন সে পাগল হয়ে যাবে ক্রমে সে-যন্ত্রণা এত বেড়ে উঠল; এমন ক'রে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে আনতে লাগল যে তার মনে হ'ল এর থেকে তার বুঝি আর নিষ্কৃতি হবে না; এবার সে বাঁচবে না; এবং এ কয়দিন যে-মৃত্যুকে তার বরণীয় বলে মনে হয়েছিল তারই আতঙ্কে তার সমস্ত মন যে এমন অভিভূত হয়ে পড়তে পারে এর রহস্য কে নির্ণয় করবে? তার স্বামীর মুখ সে কোন দিন আর দেখতে পাবে না এই চিন্তায় তার হারানো স্বামীর জন্যে অনেক দিন পরে তার নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হ'য়ে উঠল। ঘোর নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে কেমন ক'রে যে তার স্বামীকে ফিরে দেখবার আশা বেঁচে ছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়। এই নিঃসহায় অবস্থায় তার মনে নিখিলনাথের কথা জেগে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে নন্দ সম্ভবত অন্বেষণের চেষ্টা থেকে ইচ্ছা ক'রেই বিরত থেকেছে; এবং নিখিলনাথকে জানালে এতদিন একটা উপায় হতেও পারত। এতদিন নিখিলনাথকে জানায় নি বলে তার অনুশোচনা হ'ল এবং নিখিলনাথকে কোনও সুযোগে সমস্ত কথা খুলে বলবে বলে মনে মনে সংকল্প করলে।

৩৫

সীমা তার কাজকর্ম্ম সমাধা ক'রে রোগীর রাত্রের পথ্য প্রস্তুত ক'রে নিয়ে হলঘরে ফিরে এল। তখন নিতান্ত শ্রান্ত হয়েই বোধ হয় সত্যবান চুপ করেছে—এবং খোলা দরজার মুক্তপথে বাইরের ঘনকৃষ্ণ নিরেট অন্ধকারের উপর তার নিনিমেষ দৃষ্টি রেখে রোগীর পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নিখিলনাথ। মনে হয় যেন তার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মাগ্র দৃষ্টির নিয়ত একাগ্র চেষ্টায় সে ঐ অন্ধকার কালো পাথরটার মধ্যে ছোট একটু ছিদ্রপথ সৃষ্টি করতে চায়, আনন্দময় অনন্ত আলোকের একটি মাত্র রশ্মিরেখাও যার অবকাশে তার দিশাহারা চিত্তের মধ্যে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সীমা এসে পথ্যটি রোগীর মাথার কাছে সযত্নে ঢেকে রাখল। পিঁপড়ের ভয়ে একটা কেরোসিন তেলের ন্যাতা দিয়ে বিছানার চারিপাশ পরিষ্কার ক'রে মুছে নিলে। টুকিটাকি সব গোছগাছ ক'রে রেখে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

নিখিলনাথ বসে মনে মনে এই মেয়েটির নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মের বিরামহীন ধারার কথা আলোচনা করছিল। ক্লান্তি যেন এই মেয়েটির অপরিচিত অথচ কোনো আতিশয্য বা সঙ্কোচ এর কোনো কাজের সৌষ্ঠবকে কুণ্ঠিত করে না। ও যেন শাণিত তীরের মত—তেম্‌নি তীক্ষ্ণ, তেম্‌নি ক্ষিপ্র, তেম্‌নি সঙ্গীহীন, তেম্‌নি লক্ষ্যপথে অমোঘ গতি বোধ হয় তেম্‌নি ভয়ঙ্কর। কোন্ মন্ত্রে সত্যবানের হাতের জ্যামুক্ত এই অগ্নিবাণকে সম্বরণ ক'রে জীবনের অমৃতরসধারায় শান্তির পথ সে দেখাবে? বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎবহ্নিকে বিগলিত ক'রে তাকে সে ধারাবর্ষণে পরিণত করবে কোন্ মারুৎমন্ত্রে? সত্যবানের উপর অসহায় অভিমানে তার মন বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চাইলে। সীমাকে এমন একান্ত বিপদের মধ্যে নিঃসহায় ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মধ্যে সত্যবানের এই মুক্তিকে তার স্বার্থপরের মত বোধ হ'তে লাগল। সীমার প্রতি অপরিসীম করুণায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং সীমাকে এই সর্ব্বনাশ থেকে, এই মৃত্যুর পথ থেকে, এই মহত্ত্বের উন্মত্ততা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে মনে মনে বারম্বার সে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে লাগল। সে এই প্রতিজ্ঞার সূত্রে, তার নিজেরই গোপন অবগাঢ় মনের বাসনার প্রেরণায়, নিজের অগোচরে সত্যবানেরই ইচ্ছা যে প্রতিপালন করতে চলেছে একথা তার মনে রইল না।

এমন সময় একটা পুঁটলী-হাতে পাশের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর গাছকোমর ক'রে পরা, ফতুয়ার উপর একটা গামছা জড়ানো, মাথায় একটা টোকা। সেই স্বল্প আলোকে নিখিলনাথ মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখল। কলেজে-পড়া শকুন্তলার বর্ণনা তার মনে পড়ে গেল "ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী" এবং অকারণেই সে অন্ধকারে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সীমা মাথার টোকাটা খুলে ফেলে কাছে এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে বললে, "চলুন আপনাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি।" তার মুখে অনাবশ্যক লজ্জা বা অস্বাভাবিকতার

আভাসমাত্র ছিল না। এই অর্দ্ধপরিচিত পুরুষটিকে যে স্ত্রীজনোচিত কোনরূপ সঙ্কোচের ব্যঞ্জনায় খাতির করা আবশ্যক, তার নিতান্ত ভাববিহীন মুখে তার কোনো চিহ্নমাত্র নাই। ব্যাপারটা সামান্যই কিন্তু নিখিলনাথের পৌরুষ আজ দ্বিতীয়বার যেন লুব্ধ বালকের মত তিরস্কার লাভ করলে। অকারণেই সে নড়েচড়ে সংযত হয়ে বসল।

ঠিক সেই সময় দারুণ যন্ত্রণায় সত্যবানের শরীরটা চক্রদলিত সাপের মত মোচড় দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। দুই জনই এক সঙ্গে তার উপর ঝুঁকে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় সত্যবানের চোখ সেই প্রায়ান্ধকার শূন্যকে যেন ফুঁড়ে ছুটে বেরতে চায়,—দুটো জ্বলন্ত গুলি যেন, বন্দুকের নলের মুখে এসে আটকে গেছে। নিখিলনাথ তার ডাক্তারী জীবনের বহু মৃত্যুদৃশ্যের অভিজ্ঞতার মধ্যেও যন্ত্রণার এমন বীভৎস এমন প্রকট মূর্ত্তি কখনও দেখে নি। কি করবে কিছুই দিশা না পেয়ে ক্ষিপ্র হাতে তার পকেট-কেস বার ক'রে আবার একটা ইন্‌জেক্‌শনের আয়োজন করতে লেগে গেল।

নিখিল কম্পিত হাতে সব ঠিকঠাক ক'রে রোগীর দিকে যখন মন দিলে তখন রোগীর দেহ স্থির হয়েছে। সীমা নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে অসহায় দু-খানা হাত সত্যবানের গায়ে মাথায় অকারণে রেখে। তার সমস্ত ভঙ্গীটির মধ্যে স্নেহের অভিব্যক্তি যেমন পরিস্ফুট নিজেকে অবিচলিত রাখার ভাব তেমনি সুস্পষ্ট। রোগীর শান্ত মুখের দিকে চেয়ে নিখিলের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি সে হাতটা নিয়ে তার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করবার চেষ্টা করলে—ষ্টেথস্‌কোপ্‌টা বার করে বারম্বার মূঢ় আশায় পরীক্ষা করতে লাগল। হায় নেই, নেই, কোথাও সেই দীপ্ত শিখার ক্ষীণতম রশ্মিরেখাও চোখে পড়ে না। ডাক্তার হ'লেও সত্যবানের এই বীভৎস মৃত্যু সে যেন কিছুতেই মনে মনে স্বীকার ক'রে নিতে পারছে না। কিছুতেই মনে বিশ্বাস যেন হয় না যে অতবড় একটা দাবানল দপ্‌ ক'রে নিবে গেছে। চীৎকার ক'রে তার একবার ডাকৃতে ইচ্ছে হচ্ছে "সত্যদা"—যদি এই ঘনান্ধকার নিশীথের দূরতম দিগন্ত থেকেও একটা উত্তর পায়। তবু অসহায় বেদনায় চুপ ক'রেই সে ব'সে রইল। সীমার দিকে চাইতে তার সাহস হয় না। কেমন ক'রে সে ঐ মেয়েটিকে জানাবে যে, যে-মহাপ্রাণের দীপ্তিকে সে সৌদামিনীর মত বুকে ক'রে দেশ থেকে দেশান্তরে ফিরেছে—সে আজ স্তিমিত। এখন তার বর্ষণের পালা সুরু হবার দিন এসেছে!

কতক্ষণ সে চুপ ক'রে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসেছিল তার মনে নেই। হঠাৎ সীমার হাতের স্পর্শে সে চমকে ডাকলে "সত্যদা"! অতর্কিতে মনে হয়েছিল বুঝি সত্যবানেরই হাত। সীমা তৎক্ষণাৎ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে নিঃশব্দ থাকতে ইঙ্গিত করলে। দূরে বাইরে কোথায় একটা আলেয়া দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে আবার নিবে গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে গিয়ে সীমা ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিলে। অতি অল্পক্ষণ, দু-মিনিটও না-হ'তে পারে,—তবু মৃত সত্যবানের পাশে বসে তার মনে হ'তে লাগল সময় যেন নিজের আবর্ত্তে একই জায়গায় ক্রমাগত পাক খাচ্ছে; কিছুতে আর এগোতে পারছে না। বিস্ময়ে এমন কি ভয়ে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। এবং এক সময়, কল্পনাতেই বোধ হয়, কিসের একটা শব্দ অনুভব ক'রে সে মৃতদেহের পাশ থেকে নিজের অজ্ঞাতে স'রে বসল। যে-সত্যবান এতক্ষণ তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, ইতিমধ্যেই তার মনের অগোচরে সে অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

অল্পক্ষণ পরেই সীমা এসে তাকে বাইরে নিয়ে এল. এবং শব্দমাত্র না ক'রে অন্ধকার বনের দিকে অগ্রসর হ'ল। নিখিল আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে "সীমার কাছে এই মৃত্যুসংবাদ অপরিজ্ঞাত আছে।" সে সীমাকে থামিয়ে বললে "এখন যাব না সত্যদাকে ছেড়ে।" সীমা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে "বিপদ আছে—একটুও দেরী করা চলবে না" বলে তার হাত ধরে দৃঢ়পদে বনপথে প্রবেশ করলে। এই মেয়েটির আদেশ যে অগ্রাহ্য করা চলবে না তা মনে মনে অনুভব করে নিখিল অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করতে লাগল। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল "সত্যদা একলা প'ড়ে রইল। মৃতদেহের প্রতি—সত্যবানের মত মহাত্মার প্রতি—এ যে অসম্মান!"

একটা অপরিণত মেয়ের অঙ্গুলিপরিচালনায় সে তার কর্ত্তব্য পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে এই কথা চিন্তা ক'রে সে যেমন বিস্মিত হ'ল, নিজের প্রতি বিরক্তও হ'ল ততোধিক। সে বারম্বার নিজেকে সংহত ক'রে নিয়ে এই পলায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু ফলে সে কল্পনায় নিজের মনে সীমার সঙ্গে অকারণে তর্কবিতর্ক করতে করতে তারই কোমল হস্তের অব্যাহত আকর্ষণে অগ্রসর হ'য়ে চলল অন্ধকার বনতলের নানা চক্রপথে।

কতক্ষণ তারা এমনি ক'রে কত পথ চলেছে নিখিলের তা খেয়াল নেই। এক ঘণ্টাও হ'তে পারে—কিন্তু তার যেন মনে হয় অল্পক্ষণই হবে—চলতে চলতে তারা বন থেকে বেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল। নিঃশ্বাস যেন এতক্ষণ অবরুদ্ধ ছিল। অকস্মাৎ মুক্ত বাতাসে এসে সহজে শ্বাস গ্রহণ করতে পেরে সে নিজের মধ্যে নিজেকে অনুভব করলে। রাস্তা উঠে সে তার এতক্ষণের অনুতপ্ত চিন্তাকে মুক্তিদান করলে। বললে "সত্যদাকে এমনি ক'রে ফেলে যেতে আমার মন চাইছে না। চল ফিরে যাই।"

সীমা নিখিলের হাতটা মুক্ত ক'রে দিয়ে শুষ্ক কঠিন সুরে বললে, "ফিরে যাবেন? কোথায় যাবেন ফিরে? আর এক

মুহূর্ত্ত দেরী করলেও আপনাকেই ফিরিয়ে আনতে পারা যেত না। তা ছাড়া, তাঁকে ত ফেলে যাচ্ছি না। তিনি আমার সঙ্গেই আছেন এ অনুভূতি যদি আমার স্পষ্ট না থাকত তা হ'লে কি তাঁকে ফেলে চলে আস্‌তে পারতুম? তিনিই আমাকে এখনও চালাচ্ছেন। একথা মুখের নয়। তাঁর দেওয়া কাজের ভার কাঁধে নিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। নইলে আসবার দরকার ছিল না।"

নিখিলনাথ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল এই মেয়েটির এই নিষ্কম্প দৃঢ়তা দেখে। এই মেয়েটিকেই কেমন ক'রে মৃত্যুসংবাদ জানাবে এই ভেবে আবার সে মনে মনে সঙ্কুচিত হচ্ছিল!

সীমার বাইরের আচরণ লক্ষ্য ক'রে নিখিলনাথের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে তার অন্তরে কি স্রোত বইছে। যে-দেহটাকে পুনর্জ্জীবন দান করবার জন্যে এই কয় মাস ধরে সে অসাধ্য সাধন করেছে অনায়াসে তাকে সত্যিই জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ ক'রে সে চলে এল কেমন ক'রে! মনে পড়ল সে-যুগে তারাও প্রাণপণে গীতার শ্লোক মুখস্থ করেছে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়", কিন্তু এমন ক'রে কেউ যে জীবনের সত্যে তাকে পরিণত করতে পারে তা তার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব বোধ হ'তে লাগল। সত্যদার আদেশ যদি প্রতিপালন করতে হয় তবে এই মেয়েটিকে তাদের জতুগৃহ থেকে রক্ষা করতে হবে তাকেই। কিন্তু এ যে কি কঠিন ব্যাপার তা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগল। তবু তার এই চিন্তাধারার অন্তরালে, সমস্ত সম্পদ বিপদের দুঃসহ সমস্যার সমাধানের অবকাশে এই জনশূন্য প্রান্তর, এই নক্ষত্রখচিত অন্ধকার এবং অনন্ত আকাশের বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যে এই যে ছোট একটুখানি সান্নিধ্য, সমস্ত জনতাপূর্ণ কোলাহলময় জগৎ থেকে নিঃসঙ্গ নিবিড় এই যে দু-জনের নির্ভরপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তার মাধুর্য্যটুকু তাকে আবিষ্ট ক'রে তুললে। অল্প একটু স্পর্শ, সামান্য একটু নিবেদনের তৃষ্ণায় তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠতে চাইল; কিন্তু কোন প্রকার প্রগল্‌ভ আচরণের আঘাতে ঐ সমাহিতচিত্ত নারীকে সে তার গভীর মনোলোকের সমাধি থেকে তার নিজের চঞ্চল ভাবলোকের মধ্যে উত্তীর্ণ করার চেষ্টাকে এক প্রকার চপলতা ক'রেই যেন নিজেকে সংযত ক'রে রাখলে।

অনেক ক্ষণ চলার পর একটা পাকা রাস্তায় উঠে সীমা কথা কইলে। তার কণ্ঠ রসলেশহীন। বললে "এ-কথা নিশ্চয় আপনাকে বলার দরকার নেই যে আজকের ঘটনাকে আপনার জীবনের পাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে দিতে হবে; নইলে আপনার বা আমার কারুরই মঙ্গলের সম্ভাবনা নেই। এ-পথ আপনার অপরিচিত নয়, সুতরাং আপনাকে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র। আবার যদি কখনও আপনার শরণাপন্ন হ'তে হয়, আশা করি সেদিন আজকেরই মত আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব না।" তার পর অল্প একটু থেমে বললে, "আর আমায় কিছু বলবার নেই। আপনি এই রাস্তা ধরে সোজা মাইল দুই গেলেই ষ্টেশন পাবেন। নমস্কার।"

নিখিলনাথ এতক্ষণ নিজের স্বপ্নে বিভোর ছিল। সীমার কথার ভঙ্গীতে অকস্মাৎ যেন একটা কষাঘাতে সম্পূর্ণ জাগ্রত হ'ল। ব্যাকুল হয়ে বললে, "তুমি, তুমি যাবে না? তুমি কোথায় যাবে? একলা, এই রাত্রে তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না। তুমিও চল।"

এই বৃহৎ বালকটির ধৃষ্টতায় অবাক হয়েই যেন কয়েক মুহূর্ত্ত নিখিলের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটি রেখে সীমা বললে "নষ্ট করবার বেশী সময় এখন আমার নেই। আমি এখন কোথায় যাব সে-খবর দেবার অধিকারও আমার নেই। আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রে অযথা নিজের বিপদ বাড়াবেন না।"

নিখিলনাথ নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব ক'রে নিজের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে প্রাণপণ বলে নিজেকে আত্মস্থ ক'রে নিলে এবং চেষ্টাকৃত সহজ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল "সত্যবানের আজ্ঞা প্রতিপালনের ভার আমারও উপর কিছু আছে। মৃত্যুশয্যায় তিনি সনির্ব্বন্ধে যে-ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন আমরণ আমাকে তা বহন করবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকেও আমি অনুরোধ করছি যে বারম্বার বিপদের ভয় দেখিয়ে অযথা আমাকে আমার কর্ত্তব্যচ্যুত করবার চেষ্টা ক'রে কোন ফল নেই। সত্যবানের আজ্ঞাতেই তোমার খবর রাখবার অধিকার আমার আছে।"

সীমা হেসে বললে "সত্যবান কি আপনাকে আমার উপর স্পাই নিযুক্ত ক'রে গেছেন নাকি?"

"না, স্পাই তোমার পিছনে যাতে আর না লাগে তার চেষ্টা করবার ভার দিয়ে গেছেন।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, এ-পথের থেকে তোমাকে নিরস্ত করবার ভার আমাকে দিয়ে গেছেন।"

সীমার মুখে একটা বিরক্তি ও প্রায়-অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল, বললে "আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবেন। কিন্তু আজ আমার সময় নেই ডাক্তারবাবু। পরে সময়মত আমার ঠিকানা জানাব না-হয়, আপনার নীতিবিদ্যালয়ের পুঁথিপত্র নিয়ে যাবেন তখন। কি বলেন? এর পর দেরী করলে আর গাড়ী ধরতে পারবেন না কিন্তু। নমস্কার।" বলে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না ক'রে কাঁচা রাস্তা বেয়ে সে ফিরে গেল।

এই মুষ্টিমেয় বালিকাটির অবিচলিত দৃঢ়তায় এক প্রকার

অসহায় ভাবেই নিখিল কিছুক্ষণ সেখানে স্তম্ভিত হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সীমার প্রত্যাগত ছায়ামূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। ছায়া সেই আব্‌ছা আঁধারে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, ক্রমে তাকে চোখের আলোয় আর প্রত্যক্ষ করা গেল না কিন্তু নিখিলনাথের অন্তরের অস্পষ্ট অন্ধকারের সীমান্তরেখা সে যেন কিছুতেই উত্তীর্ণ হ'তে পারল না।

৩৬

এই কর্ম্মজালের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার কথাটা কেমন ক'রে পার্ব্বতীর কাছে উপস্থিত করবে, শচীন্দ্র এই চিন্তায় আবিষ্ট হ'য়ে কপালের উপর নিজের বাহু ন্যস্ত ক'রে আবার আরাম-চেয়ারে শুয়ে পড়ল। পার্ব্বতী একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। শচীন্দ্রের এমন ভাব-বৈলক্ষণ্য তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না, সুতরাং ঠিক কি কারণে সে অকস্মাৎ এমন চিন্তাকুল হয়ে উঠতে পারে তা বুঝতে না পারলেও শচীন্দ্র যে কোন একটা বিশেষ কথা তাকে বলতে গিয়ে সঙ্কোচে চুপ ক'রে রইল এইটুকু বুঝতে তার দেরী হয়নি।

সে নিজের গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে "আপনার কিছু বলবার আছে মনে হচ্ছে—যেটা বলতে আপনি বাধা পাচ্ছেন। যদি আশ্রম-সংক্রান্ত কিছু হয় তবে আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। কারণ ইচ্ছে ক'রে না হ'লেও দোষত্রুটি সহজেই হ'তে পারে। তাছাড়া নির্জ্জনে, এই চক্রে আবর্ত্তিত কার্য্যপরম্পরা, দিনের পর দিন সম্পন্ন ক'রে যেতে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অবসাদ আসে তা আমি স্বীকার করছি—"

শচীন্দ্রের মনটা যে সুরলোকের বীণার সুরে এই সন্ধ্যার তমসাচ্ছন্ন মোহময় মায়াজালের প্রভাবে রণিত হচ্ছিল সেখানে সহসা কঠিন বস্তুজগতের আঘাত পেয়ে সে সম্ভ্রস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পার্ব্বতীকে থামিয়ে বল্‌লে "এ-কথা কেন বলছ পার্ব্বতী! এই সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে তুমি যে ভাবে গ'ড়ে তুলেছ পৃথিবীতে অন্য কোন মেয়ের পক্ষে তা কখনই সম্ভব হ'ত না। আমার কতটুকুই বা শক্তি ছিল যে একে আমি রূপ দিতে পারতুম। সম্পূর্ণ তোমারই শক্তিতে এমনটা যে সম্ভব হয়েছে তার ভিতরকার রহস্যটুকুই আমার কাছে পরমাশ্চর্য্যের বস্তু। সেই পরমাশ্চর্য্য অভিনবতার কাছে আমার কুণ্ঠিত চিত্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তোমাকে ছোট করতে চাই নে। কিন্তু কেন বল ত? এই নির্ব্বাসনের আত্মবিলোপী অন্ধকারের মধ্যে তোমার এমন অমূল্য জীবনকে বলি দিতে বসেছ? প্রতি মুহূর্ত্তে এতে আমার মন অপরাধে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে; আজ সেই কথাই তোমাকে বলবার চেষ্টা করছি। এই অন্ধকূপ থেকে জোর ক'রে না বেরিয়ে পড়লে তোমার পরিত্রাণ নেই।"

পার্ব্বতী চুপ ক'রে রইল। শচীন্দ্রের কথা পার্ব্বতীর বুকের ভিতর যে কি আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে শচীন্দ্রের উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে তার ধারণা করবার অবসর ছিল না। খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে আবার সুরু করলে "পার্ব্বতী, তোমার অভাব এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে কতদূর ক্ষতিকর তা আমি জানি। তবু আমি এই কলের যাঁতায়, তোমার জীবনটাকে চূর্ণ হ'য়ে যেতে দিতে পারি না। স্বার্থপরতারও একটা সীমা থাকা উচিত।"

সম্প্রতি শচীন্দ্রের অন্তরে অন্তরে পার্ব্বতী সম্বন্ধে তার পূর্ব্বতন সহজ বন্ধুতার পরিবর্ত্তে যে একটা ভাবপ্রবণ ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের আভাস ঘনিয়ে উঠেছে এ-কথা পার্ব্বতীর কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট না থাকলেও সম্পূর্ণ অগোচরও ছিল না। তবু শচীন্দ্রের আজকের এই চাঞ্চল্যের সম্যক রূপটি তার নিজের বিক্ষুব্ধ চিত্তের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হ'ল না।

পার্ব্বতীর চিত্তে নানা সন্দেহ আশা-নিরাশার দোলায় আসা-যাওয়া করতে লাগল। কিন্তু শচীন্দ্রের মনের কথা ঠিকমত কল্পনা করতে না পেরে শান্ত কণ্ঠে তর্কের সুর মিশিয়ে বললে "দেখুন, মানুষের জীবন কার কি ভাবে সার্থক হয় তা কি কেউ ঠিক বলতে পারে? আমার শক্তি দিয়ে জগতের মঙ্গল কাজে যদি কিছুমাত্র সহায়তা হ'য়ে থাকে ত সেই কাজের মধ্যে দিয়েই আমি কি সার্থক হই নি? আপনার অর্থ, আপনার অন্তরের প্রেরণা, এমন কি আপনার মৃত পত্নীর প্রতি আপনার যে অক্ষয় প্রেম, তাজমহলের মত কি তা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সার্থকতা লাভ করে নি?" কথাটার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত একটা মৃদু তিক্ততা ও শ্লেষের আভাস ছিল কি না কে জানে। কিন্তু শচীন্দ্র সেটুকু কল্পনা করেই বোধ করি একটু তর্কের উত্তেজনা মিশিয়ে বললে, "হয়ত করেছে। কিন্তু···"

"এর মধ্যে কিন্তু কোথাও নেই শচীন বাবু। যে অনন্যনিষ্ঠ প্রেম আপনাকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছে সে একমাত্র আপনাতেই সম্ভব—এটাই কি আপনি মনে করেন? ছোটখাটো হ'লেও প্রত্যেক মানুষই নিজের শক্তি অনুসারে জগতে এই তাজমহল গ'ড়ে চলে। মহত্তর কিছু করবার প্রেরণা তারা তাদের প্রাণ থেকেই পায়।"

শচীন্দ্র তার তর্কের সুরে অন্তরের ক্ষোভের আভাস পেয়ে একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ছিল। তার পর ধীরে ধীরে শান্ত গভীর স্বরে বললে "পায়। কিন্তু তাদের পিছনে থাকে তাদের সার্থক প্রেমের অমৃত উৎস। চিরদিন তাজমহলের মরীচিকা গড়ে তুলতে আমি তোমাকে দিতে

পারব না। এর থেকে তোমাকে আমি ছুটি দিতে চাই পার্ব্বতী।”

ম্লান হাসিতে পার্ব্বতীর মুখটা বিকৃত হয়ে এল। কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক’রে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললে “ছুটি দিলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? ছুটি নিলে আমি থাকব কি নিয়ে বলুন ত?” কথাটা বলেই সে নিজের প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হ’য়ে উঠল এবং সেটা চাপা দেবার জন্য হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে “কিন্তু তত্ত্বালোচনা ক’রেই কি আজকের রাতটা আমাদের কাটবে নাকি? উঠুন, যা হয় দুটো মুখে দিয়ে নিন। নইলে অনেক রাত ক’রে খেলে আবার আপনার হজম হবে না।” ব’লে সে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

শচীন্দ্র সেখানে ইজি-চেয়ারে চুপ ক’রে পড়ে ভাবতে লাগল। পার্ব্বতীর কথাগুলোর মধ্যে তার ব্যর্থ জীবনের যে গভীর নিরাশাপূর্ণ বেদনার স্বর বেজে উঠেছিল তার মধ্যে শচীন্দ্রের প্রতি কি একটা অভিমানের আভাস ছিল না? শচীন্দ্রের মনটা নিজের সঙ্গে যেন কোন মতে বোঝাপড়া ক’রে উঠতে পারছিল না। আবার তার মনের মধ্যে এই দুর্ভেদ্য সমস্যা অন্য রূপ নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল। তার মন কি সত্যই এখনও কমলের মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিকে আশ্রয় ক’রে চলেছে তার অনন্ত যাত্রায়? যেখানে এক দিন সে পরিপূর্ণতার মধ্যে ফিরে পাবে তাকে? না, এ শুধু পত্নীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করায় অভ্যস্ত তার মন কিছুতেই তার এত দিনের অভ্যাসকে অস্বীকার করতে পারছে না? উদ্‌ভ্রান্ত শিবের মত কমলার স্মৃতিকঙ্কাল বহন ক’রে বেড়ানোর লৌকিক মূল্যের ভিক্ষাপাত্র এবং আত্মবিমোহনের নাগপাশ কি তার সমস্ত সত্যকে সমগ্র অন্তরাত্মাকে আবিষ্ট ক’রে ফেলেছে এত দিন ধ’রে? সে তার অন্তরের ধ্যানলোকে তার নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর মুখ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু সেই বিরাট তারা-খচিত ম্লান অন্ধকারের পটে কোথাও তাকে যেন সে খুঁজে পেল না। সে বিশেষ ক’রে ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরের সেই শেষ দৃশ্যের মাঝখানে তার হারানো স্ত্রীর কৌতূহলোদ্দীপ্ত ছবিখানি মনের মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু সেই বিপুল চলচঞ্চল শোভাযাত্রার ভিড়ে সে যেন এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে গেল। সে তার মনের দৃষ্টিকে সুদূর অতীতের মধ্যে প্রসারিত ক’রে দিয়ে পড়ে রইল। কিন্তু তার পত্নীর প্রতিকৃতি তার চিত্তপটে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টার মধ্যে সে-মুখ হারিয়ে হারিয়ে গেল। এমনি ক’রে বহুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশ হ’য়ে এই ব্যর্থতাকে কমলার স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা বলে কল্পনা ক’রে তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের চিন্তাস্রোতকে ফিরিয়ে ভবিষ্যতের গৃহ রচনায় প্রবৃত্ত করলে এবং সেই গৃহে পার্ব্বতী সহজ আনন্দে দীপ্তিময়ী কল্যাণীরূপে বিরাজ করছে, এমনি একটা সুখচ্ছবিকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ক্ষণ চুপ ক’রে এই চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থেকে এক সময় অকস্মাৎ সচেতন হ’য়ে দেখলে যে বহু চেষ্টাতেও এতক্ষণ যার ছবি সে ফোটাতে পারে নি সেই অর্দ্ধবিস্মৃত নারী কখন তার সমস্ত কাল্পনিক ভবিষ্যৎকে মুছে ফেলে দিয়ে সুপরিচিত বাস্তব গৃহচিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট হ’য়ে উঠেছে। সে আর চুপ ক’রে বসে থাকতে না পেরে বারান্দায় উঠে পায়চারি করতে লাগল। একবার মনে করলে পার্ব্বতীর কাছে যায়, গিয়ে বলে “পার্ব্বতী, এমনি ক’রে তুমি নিজেকে আবদ্ধ রেখে আমাকে বেঁধো না। তোমার উপযুক্ত মূল্য দিতে আমি অক্ষম। আমার এই দুর্গ্রহ নিয়ে আমাকে একলা দুঃখ ভোগ করতে দাও।” কিন্তু সে কিছুতেই মন স্থির ক’রে উঠতে পারলে না। তার পায়ের শব্দ পেয়ে পার্ব্বতী এসে নিঃশব্দে অন্ধকারে দরজা ধরে চুপ ক’রে ভাবতে লাগল। শচীন্দ্রের এই অস্থিরতার কারণ সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে ভরসা পায় না। তার নারীসুলভ সহজ অনুভূতি দিয়ে যে সন্দেহ তার অন্তরে জেগে ওঠে তাকে তার আনন্দভরা দুরাশার মধ্যে কিছুতেই আমল দিতে চায় না। আশা-আশঙ্কা-আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায় তার হৃদয়ের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তাল হ’য়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের নিভৃত শয়ন কক্ষে বিছানার উপর বালিশটাকে বুকে প্রাণপণ বলে চেপে ধ’রে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

অনেক ক্ষণ পরে সে বারান্দায় ফিরে এল; দেখলে, শচীন্দ্র বারান্দার একটা থাম ধ’রে স্থির হয়ে পরপারে কৃষক-কুটীরের সেই অচঞ্চল রশ্মিরেখার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পার্ব্বতী ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল এবং কিছু না বলে চুপ ক’রে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মনের সুগভীর অন্তরালে অশ্রুর যে-উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইছিল তাকে অন্তরের মধ্যে প্রাণপণ বলে চেপে ধীরে ধীরে সে অত্যন্ত স্নেহে চিন্তাতাপক্লিষ্ট শচীন্দ্রের একখানি হাত তার হাতে তুলে নিলে। স্নেহাভিব্যক্তির এই কোমল স্পর্শের মধ্যে এই চিরবঞ্চিতা নারীর তাকে সান্ত্বনা দেবার গভীর করুণাটুকু শচীন্দ্রের মনে এসে একটা অনুশোচনার মত আঘাত করলে এবং নিজের দুর্ব্বলতায় সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করতে লাগল। পুরুষের যে আত্মসমাহিত দৃঢ়তা যে আত্মপ্রত্যয় নারীর নিকটে তাকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, তার সহজ আত্মদানের প্রতিষ্ঠাভূমি করে, নিজের মধ্যে সেই অবিচলিত পৌরুষের দৈন্য অনুভব ক’রে মনে মনে সে নিজেকে তিরস্কার করলে “না, এমনি ক’রে পার্ব্বতীর নিরাশ্রয় মনের উপর তার নিজের পীড়িত চিত্তের ভার সে চাপতে দেবে না। হয় সে

পার্ব্বতীকে তার অবলম্বনরহিত শূন্যতা থেকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে টেনে নেবে; না-হয় তাকে নিশ্চিন্ত মুক্তি দান করবে। এমনি ক'রে নিজের প্রতি করুণায় পার্ব্বতীকে পীড়িত হতে দেবার তার কোন অধিকার নেই।" এবং এক সময় ভূমিকামাত্র না-ক'রে অতি ধীরে পার্ব্বতীর হাত থেকে হাতটা মুক্ত ক'রে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে "চল, খেতে যাই।" যদিও শচীন্দ্রের ব্যবহারে বা স্বরে কোন রূঢ়তা প্রকাশ পায় নি তবু এই সামান্য একটু ভঙ্গী এবং তার কণ্ঠস্বরের অতর্কিত শান্ত স্বাভাবিকতায় পার্ব্বতী একটু আশ্চর্য্য হ'ল এবং কেন জানি না কেমন যেন একটু আঘাত পেল। তবু সে নিজেকে সংযত রেখে প্রায় স্বাভাবিক গলায় "এক মিনিট অপেক্ষা করুন" বলে ঘরের দিকে চলে গেল এবং টেবিল সাজাবার নানা কাজে ব্যস্তভাবে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে দিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজেকে যেন কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চাইলে।

হাতখানা অমন ক'রে টেনে নেবার ইচ্ছা শচীন্দ্রের ছিল না; তবু তার অনতিপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নিজের মনের যে দুর্ব্বলতা এবং দ্বিধায় তার অন্তর্নিহিত পৌরুষ অবমানিত হয়েছিল এই হাত ছাড়িয়ে নেওয়াটা বোধ করি তারই অনিচ্ছাকৃত মৃঢ় প্রতিক্রিয়া।

পার্ব্বতী যে একটু আহত হয়ে চলে গেল এই বোধ শচীন্দ্রকে মনে মনে অস্বচ্ছন্দ ক'রে তুললে। সে এক প্রকার অনুতপ্ত হয়েই পার্ব্বতীর আহ্বানের অপেক্ষা না ক'রে একেবারে খাবার ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঘরটি ছোট। মাঝখানে একটা টেবিল সাদা ধবধবে চাদর দিয়ে ঢাকা। টেবিলের উপর দু'বাতির একটা শেজ জ্বলছে। খাবার সরঞ্জাম সব সাজানো হয়ে গেছে। পার্ব্বতী কি একটা গরম করবার জন্যে মাটিতে একটা ষ্টোভে স্পিরিট জেলে সামনে বসে আছে। আগুনের এবং বাতির আলোয় তাকে অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। শচীন্দ্র দেখলে যে একদৃষ্টে সেই ক্রীড়ারত অগ্নিশিখাটুকুর দিকে চেয়ে তার চোখের জল যেন বাধা মানছে না। অত্যন্ত অনুশোচনায় তার মনটা ভরে গেল, এবং এক মুহূর্ত্তে পার্ব্বতীর কৈশোরের দুঃখের ইতিহাস থেকে সুরু ক'রে প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ঘটনা প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনার রূপ নিয়ে যেন তার আছে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজের অপেক্ষাকৃত সহনীয় বিরহবেদনাকে এই পীড়িত নীরব স্নেহশালিনী নারীর দুঃখের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো স্বার্থপরতার নামান্তর বলেই মনে হতে লাগল। পার্ব্বতীর অশ্রুস্নাত মুখের দিকে চেয়ে শচীন্দ্রের চিত্তের সমস্ত অবরুদ্ধ স্নেহ করুণা প্রীতি কৃতজ্ঞতা উদ্বেল হয়ে উঠে ভাবরসবন্যায় তার হৃদয়ের বিচারক্ষেত্রের সুস্পষ্ট ছবিগুলিকে প্লাবিত ক'রে একাকার ক'রে দিয়ে গেল। সেই ভাববন্যার আবেগে তার অন্তরের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে সে প্রেম বলেই মেনে নিলে। এই জটিল চিন্তার তরঙ্গাঘাতে বিপর্য্যস্ত তার চিত্ত নিজেকে বিশ্লেষণ করবার ধৈর্য্য আর স্বীকার করতে চাইলে না। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে যে তার পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠতার অভিমানে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করছিল সে কথা তার মনে রইল না।

ঘরে ঢুকে পার্ব্বতীর কাছে এসে বললে, "আমাকে ক্ষমা কর পার্ব্বতী—"

পার্ব্বতী এত নিবিষ্ট হয়ে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল যে হঠাৎ শচীন্দ্রের আগমনে সে চমকে একটা অব্যক্ত শব্দ ক'রে উঠল। তার পর নিজেকে সামলে নিলে। শচীন্দ্রের কথার মধ্যে থেকে তার অনুকূল চিত্তের দক্ষিণ পবনের স্নিগ্ধতা যেন তার ললাটকে এসে স্পর্শ করলে। চোখ মোছবার কোনো চেষ্টা না ক'রে মৃদু হেসে আস্তে আস্তে বললে 'নটি বয়'; বলে উঠে, হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশে-উদ্যত শচীন্দ্রের মুখের উপর একটা হাত চাপা দিয়ে হাত ধ'রে তাকে একটা চেয়ারে নিয়ে বসাল।

শচীন্দ্র নিজের আনন্দ এবং উচ্ছ্বসিত অভুক্ত হৃদয়ের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ পার্ব্বতীর হাতটা মুখের উপর চেপে ধরলে। পার্ব্বতী বাধা দিলে না—শচীন্দ্র মুঠোর মধ্যে তার নরম হাতটুকু নিয়ে আদর ক'রে ধ'রে রইল।

শচীন্দ্রের এই আত্মনিবেদনের ইঙ্গিতে পার্ব্বতীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু তার অশ্রুজলের করুণায় বিগলিত শচীন্দ্রের এই নিবেদন তার সম্মোহিতপ্রায় আত্মমর্য্যাদাকে সচেতন ক'রে তুললে; এবং ধীরে অতি ধীরে অথচ সুস্পষ্ট নিশ্চয়তার ভঙ্গীতে, কোনো কথা না বলে, সে নিজের হাতটা মুক্ত ক'রে নিয়ে নিবে-যাওয়া ষ্টোভটা জালাবার চেষ্টায় গিয়ে শচীন্দ্রের দিকে পিছন ফিরে বসল।

শচীন্দ্রের পুরুষের মন বাধা মানতে চায় না। তার নিবেদিত প্রেমকে স্বীকার না-করার সুব্যক্ত ইঙ্গিতে তার আত্মাভিমান অনাহত রইল না এবং তার প্রেম যে অবিমিশ্র প্রেমই, কোন একটা অকাট্য প্রমাণের দ্বারা তা জানিয়ে দিতে তার মনটা উদ্যত হয়ে উঠল। কিন্তু পার্ব্বতীর মুখের দিকে চেয়ে সে চুপ ক'রে গেল। পার্ব্বতীর স্নেহশীলতার অন্তরালে যে একটি আত্মসমাহিত দূরত্ব তাকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকত সেই ব্যবধান শচীন্দ্রের মনে শাসিত চপল বালকের মত একটা সলজ্জ সম্ভ্রম জাগিয়ে কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশের চপলতা থেকে তাকে নিবৃত্ত ক'রে রাখলে। (ক্রমশঃ)

সিংহলের উৎসব ঃ কাণ্ডি-নৃত্য বা 'উদারানাটুম্'

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

সিংহলের কাণ্ডি-নৃত্যের ছবি যখন প্রথম দেখি তখন খুব আশ্চর্য্য লেগেছিল নর্ত্তকদের দাঁড়াবার কায়দা ও হাত-পায়ের বিচিত্র ভঙ্গী দেখে। এর পূর্ব্বে উচ্চাঙ্গের পুরুষ-নৃত্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কেবল মণিপুর ও উত্তর-ভারতের কয়েকটি নাচের সঙ্গে পরিচয়

রূপার মুকুট-পরা 'নাইয়াণ্ডি'-নর্ত্তক
শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত

ছিল। সিংহলের এই ছবিতে নর্ত্তকদের দেহের ভঙ্গীতে বীরোচিত নৃত্যের আভাস পেয়েছিলাম। তার পরে দক্ষিণ-ভারতের পুরুষ-নৃত্য 'কথাকলি' শেখার সুযোগ হয়। কিন্তু তখনও সিংহলের সেই নর্ত্তকদের ছবির কথা মন থেকে যায় নি। ১৩৩৪ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অভিনয় উপলক্ষ্যে সিংহলে গিয়ে কাণ্ডিব বীরোচিত পুরুষ-নৃত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এ-বছর শান্তিনিকেতনের এক সিংহলী বন্ধুর নিমন্ত্রণ পেলাম, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শান্তিনিকেতনের নাচ শেখাবার জন্য। রাজী হলাম, ভাবলাম সে-দেশের বিখ্যাত পুরুষ-নাচও এই সুযোগে শিখে আসব।

'নাইয়াণ্ডি'-নর্ত্তক
শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে নৃত্য-সম্বন্ধে অনেকে জানতে ইচ্ছুক ও মনোযোগী হয়েছেন, সিংহলের নৃত্যের কথা সম্ভবত সকলের চিত্তাকর্ষক হ'তে পারে।

সিংহলী ভাষায় এই নৃত্যের নাম 'উদারানাটুম্'। বর্ত্তমানে এই নাচটি এ-দেশের শ্রেষ্ঠ নৃত্য ব'লে সিংহলীরা মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত অধিবাসীরা একে কাণ্ডি-নাচ নামে সর্ব্বত্র

প্রচার করেছেন। বর্ত্তমানে সিংহলের মধ্যপ্রদেশের শহর কাণ্ডির নামেই এই নৃত্য পরিচিত; এই শহরের নামেই প্রদেশটিও কাণ্ডি-প্রদেশ নামে পরিচিত। এই প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের নর্ত্তকদের প্রধান সমাবেশ-স্থল। কাণ্ডিতে বুদ্ধের দন্ত-মন্দির আছে, শহরটি বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থ-স্থান। এইখানেই সিংহলের শেষ নরপতির রাজধানী ছিল। প্রাচীন কালের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবগুলি আজও বেঁচে আছে। দলে দলে নাচিয়েরা আসে গ্রাম থেকে, উৎসবে যোগ দিতে।

কাণ্ডি-নৃত্যের বাদ্যযন্ত্র
১। 'বেড়ে' ২। 'পান্তের' ৩। 'উডেক্কি'
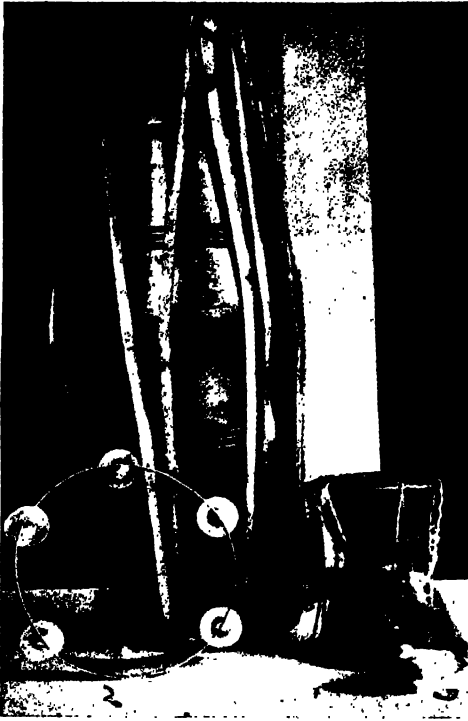
বর্ত্তমানে সিংহলের গানের বিষয় জান্‌তে গিয়ে দেখতে পাই—অতি সাধারণ চাষীর গান, গরুর গাড়ীর গান, নৌকার গান, ছেলে-ভুলানো গান অথবা নাচের সঙ্গে জড়িত গান, তা ছাড়া আর কোন প্রকার গান নেই বললেই হয়; এগুলি প্রায় সবই একগোত্রীয়—পল্লীসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত জাতীয়, অতি সাধারণ কথা ও সাধারণ মিষ্টি সুর। সে-দেশের তামিলদের ভিতর দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটী সঙ্গীতের চলন আছে খুবই, তবে সে-দেশের বৌদ্ধদের ভিতর এই গান বেশী আমল পায় না, তারা উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতকেই পছন্দ করে বেশী। উত্তর-ভারত থেকে কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশের বৌদ্ধ যুবকদের চেষ্টায় থিয়েটারী গানের আমদানী হয়েছিল খুব। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। বর্ত্তমানে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানের প্রতি বিশেষ ভাবে তারা যত্ন নিচ্ছে।

পান্তের নৃত্য — লেখক ও তাঁহার [illegible]

নাচের এখনও অতটা দুরবস্থা আসে নি। এদেশে অনেকগুলি প্রাচীন নৃত্যধারা আজও অশিক্ষিত জনসাধারণ সচল রেখেছে। তার ভিতর কাণ্ডির নাচই প্রসিদ্ধ। এ-নাচ যে এ-দেশেরই উৎপত্তি তা মনে হ'ল না; এর সূত্রপাত হয় দক্ষিণ-ভারতের নাচ থেকে।

এই নাচের প্রথম সূত্রপাত করেন গজবাহু নামে নরপতি, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাঁর রাজধানী ছিল অনুরাধাপুরে। ইনি দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাজাকে এক বার পরাজিত করেন; তারই স্বীকৃতি-স্বরূপ চোল-রাজ বার শত বন্দী ও সেদেশের পট্টিনী দেবীর অর্থাৎ দুর্গার পায়ের সোনার মল গজবাহুকে উপহার দেন। গজবাহু রাজধানীতে ফিরে এসে দক্ষিণ-ভারত-বিজয়ের স্মৃতি-স্বরূপ একটি উৎসব প্রচলিত করেন, ও পট্টিনী দেবীর মন্দির স্থাপনা ও তাঁর পূজা প্রচার করেন। তামিল-বন্দীর মধ্যে নর্ত্তকশ্রেণীর যারা ছিল, তাদের প্রতি আদেশ হ'ল নৃত্যে গানে এই উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে। আজকালও এই উৎসব কাণ্ডিতে চলে আসছে সেই বীরের স্মৃতিপূজারূপে।

ক্রমে এই নাচ উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, সিংহল-বাসীরাও এ-নাচে দক্ষ হয়ে উঠল। এ-নাচ বর্ত্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গরূপে দেখছি, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ-নাচের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন যোগ ছিল না। সেই সময় পোলানারুয়ার রাজা বিজয়বাহু সর্ব্বপ্রথম এই নাচকে বৌদ্ধ উৎসবের অঙ্গীভূত করেন। রাজা নিজেও এ-নাচ খুব পছন্দ করতেন। সেই শতাব্দীতে পরাক্রমবাহু নামে আর এক নরপতি এ-নাচে বিশেষ ক'রে উদ্যোগী হন, তাঁর চেষ্টায় রাজপরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নাচের চর্চ্চা রাখতেন। রাজা নিজেও সুদক্ষ নর্ত্তক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশেষ ক'রে পুরুষদের এ-বিষয়ে উৎসাহিত করেন। বর্ত্তমানে ডম্বরু-হাতে নাচ কাণ্ডি-নাচের একটি প্রথা। এর প্রথম চলন করেছিলেন এই রাজা স্বয়ং। নাচের আরও পরিবর্ত্তন তিনি এনেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক গোলযোগে এই নাচ আর তেমন উৎসাহ পায় নি; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাণ্ডি-নাচকে রাজা বিজয়বাহু আবার সজীব করলেন, সব নাচিয়েদের একত্র ক'রে। সব প্রাচীন উৎসবাদির তিনি পুনঃপ্রচলন করলেন। কিন্তু সেই রাজার মৃত্যুর পর আর সে রকম উৎসাহ দেবার লোক ছিল না। তখন দেশে পর্ত্তুগীজদের আধিপত্য, তাদের জ্বালায় সুস্থির হয়ে কেউ রাজধানী গড়বার সুযোগ পায় না। নাচিয়েরাও রাজাদের উৎসাহ বা সাহায্য না পেয়ে নিরাপদ স্থানে থাকবার ইচ্ছায় মধ্য-প্রদেশ কাণ্ডিতে আশ্রয় নিল। সেখানে নিজেরা কোন রকমে নাচের প্রতি নিজেদের ভালবাসার টানে এই নাচকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই সময় থেকে এই নাচ সম্পূর্ণরূপে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তারাই 'বেরোয়া' নামে লোকের কাছে পরিচিত।

বহুকাল পরে দ্বিতীয় বিমলধর্ম্মাসূর্য্য ধর্ম্মের প্রচারে উদ্যোগী হন ও বুদ্ধের দন্ত-মন্দির স্থাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচিয়েরা এসে তাতে যোগ দিল।

পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কীর্ত্তিশ্রী খুব উৎসাহের সহিত ধর্ম্মকার্য্যে মন দিলেন। তিনিই নূতন ক'রে ভিক্ষুসংঘ ইত্যাদি স্থাপনা, মন্দির-রচনা প্রভৃতি করলেন। কীর্ত্তিশ্রী রাজা গজবাহুর দক্ষিণ-ভারত-বিজয় উৎসবের পুনঃপ্রবর্ত্তন করলেন, পট্টিনী দেবীর মন্দির স্থাপনা করলেন। বর্ত্তমান কাণ্ডিতে যতগুলি বৌদ্ধ উৎসবের চলন আছে তার পুনঃপ্রবর্ত্তক এই রাজা। তাঁরই উৎসাহে নাচিয়েরাও আবার নাচের চর্চ্চায় মনোযোগ দেয়, তার পর থেকে ধর্ম্ম-উৎসবাদি ও নাচ-গান নির্ব্বিঘ্নে আজ পর্য্যন্ত চ'লে আসছে।

কাণ্ডি-পেরহেরার শোভাযাত্রা ; হাতীগুলির পিছনে এক দল নর্ত্তক

এই নর্ত্তক-সম্প্রদায়ের সকলেই বৌদ্ধ এবং এদের নাচ বৌদ্ধ উৎসবের সঙ্গে জড়িত হলেও অনেক উৎসবে হিন্দু দেব-দেবীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কাণ্ডিতে বুদ্ধদন্ত-মন্দির ছাড়া আরও তিনটি মন্দির আছে, একটি পট্টিনীদেবীর (দুর্গা), একটি নাথ-দেবতার (মহাদেব), একটি কাতারগামার (কার্ত্তিক) ও অপরটি বিষ্ণুর। বৌদ্ধরা এই দেবতাদেরও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করে। পট্টিনী দেবীর এদেশে আগমনের কথা আগেই বলা হয়েছে, অন্য দেবতারাও এসেছিলেন এইরূপ নানা অবস্থায় প'ড়ে।

আগেই বলেছি, সিংহলের কাণ্ডি-প্রদেশের বেরোয়া জাতই এ-নাচের চর্চ্চা ক'রে থাকে। রাজা কীর্ত্তিশ্রীর পরে কোন রাজাই জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচার করবার

আর চেষ্টা করে নি। তার ফলে হ'ল এই, অন্যান্য সম্প্রদায় মনে করতে লাগল, এ-উৎসব-সংক্রান্ত নাচ বেরোয়াদেরই জন্যে। সাধারণে একে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিল এই কারণে। অন্যান্য প্রাচীন নাচও বর্ত্তমানে দুরবস্থায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু বৌদ্ধ উৎসবের কল্যাণে কাণ্ডি-নাচ তার মান বাঁচিয়ে আছে।

কাণ্ডি-নাচে অভিনয়ের ভাগ নেই বললেই হয়। মনে হয় ছন্দোবদ্ধ নাচটাকেই এরা বড় ক'রে দেখেছিল; তবে নাচের সব অঙ্গ মিলিয়ে দেখলে একটা প্রচণ্ড বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। সব নাচগুলিই গানের সুরে তালে খুব পাকাপাকি ভাবে বাঁধা, কোন গোঁজামিল বা অনাবশ্যক জিনিষ নেই।

মন্দিরের বহির্ভাগে বুদ্ধদন্ত-পেটিকাবাহী হস্তী

এক-একটি গানের নামে এ-নাচগুলির পরিচয়। এই ভাবের আঠারটি গান আছে; এগুলির নাম এরা দিয়েছে 'বন্নম্'। যেমন;

দাহক (শঙ্খের গোল দ.গ), গজ, তুরঙ্গ, উরগ, মুষল (খরগোস); উকুসা (ঈগল পাখী), বৈরুডি (প্রসিদ্ধ মণি), হনুমা (হনুমান), ময়ুরা (ময়ূর), কুাউলা (মুরগী), সিংহাধিপতি (সিংহ), অসদৃশ (কোন দেবতার নাম) কীরলা (সমুদ্রের পাখী), মণ্ডুক, ইনাডি (কাশ-জাতীয় পুষ্প), সুরপতি, গণপতি ও উদার (গর্ব্বিতা রমণীর অহঙ্কার)।

এই যে আঠারটি নাম দিলাম, এর কতকগুলি তৈরি হয়েছিল জন্তুর চলন বা ভঙ্গি অনুকরণ ক'রে—উপরে সেগুলির নাম দেখে তা বোঝা যাবে। অন্যগুলি তৈরি হয়েছিল তাদের গুণ- ও রূপ- বর্ণনা নিয়ে; যেমন সুরপতি, গণপতি, উদার ইত্যাদি।

বন্নম্-এর আবার চারটি ভাগ—'তানম্', 'কবিয়ে', 'কাস্তেরম্' ও 'আড়াউবা'। তানম হ'ল ঠিক উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের তেলেনার মত। তাতে কোন কবিতার কথা নেই, কেবল তা না না, তা নে না এই প্রকারের কতকগুলি শব্দ তালের সঙ্গে গাওয়া হয়। সব তানম্-এর পদক্ষেপ, দেহভঙ্গি ও হস্তচালনা প্রায়ই এক প্রকারের। এর পরে আরম্ভ হয় 'কবিয়ে'। এই অংশে পূর্ব্বের তানম্-এর সুরের সঙ্গে কথা বসানো থাকে। এই কথাগুলিতেই গানের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। এই অংশের নাচের ভঙ্গিতে এক নাচের সঙ্গে অপর নাচের কিছু প্রভেদ বোঝা যায়। এদেশে নাচিয়েরা নিজেই গান গেয়ে নাচে। 'কবিয়ে' শেষ হয় ছোট একটি তালের তেহাই বাজনার সঙ্গে। এই ছোট তেহাইয়ের অংশের নাম এরা দিয়েছে 'কাস্তেরম্'। তার পরেই আরম্ভ হয় 'আড়াউবা', অর্থাৎ সেই গানের তালের তোড়া ও পরণ ইত্যাদি। এই ভাবে একটি 'বন্নম্' সম্পূর্ণ হ'লে, আবার আর একটি 'বন্নম্' আরম্ভ করে। কাণ্ডি-নাচের গানে যে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে তা নয়। গ্রাম্য সঙ্গীতের ধরণের অল্প-পরিসর সুরের মধ্যেই লাইনের পর লাইন এক ভাবে গেয়ে যায়। তবে একটি বন্নম্-এর সঙ্গে অপর বন্নম্-এর সুরে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। বর্ত্তমানে গানের প্রতি নজর এই নাচিয়েরা ততটা দেয় ব'লে বোধ হয় না। কোন রকমে তালে গেয়ে গেয়ে যেতে পারলেই এরা সন্তুষ্ট। তবে মনে হয়, আরম্ভে গানগুলি সম্ভবতঃ আরও সুন্দর ছিল। এখানে আমি একটি সম্পূর্ণ বন্নম্-এর নমুনা তুলে দিলাম, তাতে আমার উপরের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হ'তে পারে। এই বন্নম্‌টির নাম 'বৈরুডি', উত্তর-ভারতের দাদ্‌রা তালে রচিত।

'তানম্'
তানানে তানেনা তানেনা তানা
তানানে তানাতে তানানে তানা
তানেনা তানা তানেনা তানা
তানেনা তানা তাম দে না তাম দে
না নাম্ ॥

'কবিয়ে'

অগর বদন কবি বরণ, রঙ্গয়দনে কল রচনা
মট উরণ নোব মেদিনা মহতুগে অবসর রাগেনা
সমাব ॥

ইশ্বর দেবীন্দু বডিনাদিন', কেহেতু বিমনা দেকনিতিন
এমবিমনা দেবীবডিনা, কেহতুদদক কোই বডিতি
কমাবা ॥

বিমনা সমগা কেহেতুগণ', ইশ্বর দেবীন্দুতুতি দেমিন',
মেমবরুণা কল এহেনা পাতাল বৈরুডি বন্নমমেব' ॥
ওবিনা মেসব তুল পেমিন', কবিয়নেত্তব বরুবরুণা
কলদুদনা নেতাওবিনা, উগতুগে বল বেদি মেকাদ
পমাবা ॥

গানটির অর্থ নীচে দিলাম। নর্ত্তকেরা দর্শকদের গানে জানাচ্ছে,

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আমার মনের কথা আপনাদের জানাচ্ছি – নাচের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য উপভোগের সামর্থ্য সকলের হয় না, যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের পক্ষেই ত সম্ভব।

ভগবান ইশ্বর পথে যেতে "কেহেতু"র নাচ দেখে আনন্দ পান, ও নৃত্যের দ্বারা তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন—তারই নাম পাতাল বৈরুডি বন্নম্ ॥

আমি আজ যে-নাচ দেখাতে যাচ্ছি, সে-নাচ ভগবান ইশ্বরের সেই আনন্দের নাচ। আশা করি এতে সকলে আনন্দ পাবেন।

সব বন্নম্-এর কবিয়ে-অংশে, এই ভাবে কি ক'রে সেই নাচের আরম্ভ হ'ল, কি তাল ব্যবহার হচ্ছে, কি ভাবে নাচতে হবে, সে সব বিষয়েরই আলোচনা হয়।

'কাস্তেরম'

\+ • + •
তাৎ তারেকিটাকুন্দাৎ তারেকিত' কুন্ দা দোং
\+ • +
রাজেন্ জিকুনদা তা ॥

'আড়াউবা'

\+ + +
তাক্রোম্ দাং গাজিং জিকুনদা তাকরাজিকরা
\+ + +
তাতা জিকরা তাকরোম দাং গাজিন্ জিকুনদা
\+ + +
তা জিৎতারে কিটা কুনদাৎ তা ॥

এই ভাবে বন্নমগুলি প্রায় সব তালেই রচিত হয়েছে; কাওয়ালী, দাদরা, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওড়া ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকারের। যে কোন বন্নমে, 'আড়াউবা' সব সময় যে একটিই হবে তার কোন কথা নেই, বড় বড় নর্ত্তকেরা "আড়াউবা"য় বহু প্রকারের তালের নৃত্য ক'রে থাকে।

'নাইয়াণ্ডি'-নৃত্য

নর্ত্তকেরা এ-নাচ বাইরে মুক্ত আকাশের তলে দল বেঁধে নাচে। সাধারণত এক-এক দলে পাঁচ-ছয় থেকে আরম্ভ ক'রে আরও বেশী লোক থাকতে দেখা যায়। কয়েকটি কারণে এ-নাচ ঘরে হ'তে পারে না। এক কারণ, এ-নাচ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, তাই বদ্ধঘরে অল্পক্ষণের মধ্যেই নর্ত্তকেরা কাতর হয়ে পড়ে; এর জন্য যেরূপ প্রশস্ত ঘরের প্রয়োজন তাও পাওয়া কঠিন, এবং সঙ্গে যে-বাজনা ব্যবহৃত হয় তার শব্দ অত্যন্ত কড়া, কোন রঙ্গমঞ্চ বা গৃহের উপযোগী একেবারেই নয়। সাধারণত নাচিয়েদের সঙ্গে দু-জন বাজিয়ে থাকে। এই বাজনার উচ্চ শব্দে নাচিয়েরা খুব উৎসাহিত হয়, ঘণ্টার পর

ঘণ্টা নেচেও কোন কষ্ট বোধ করে না। যন্ত্রটির নাম 'বেড়ে'। শোনা যায়, এটি তামিলদের 'বরবাদ্য' নামে বাদ্যযন্ত্রের অপভ্রংশ। আকারে প্রায় উত্তর-ভারতীয় পাখোয়াজের মত কিন্তু শব্দের পার্থক্য আছে অনেক; দক্ষিণ-ভারতের 'কথাকলি' নৃত্যের বাজনা 'মাদলম্'-এর মত অবিকল দেখতে।

'নাইয়াণ্ডি'-নৃত্য

এই কাণ্ডি-নাচের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমটির নাম 'নাইয়াণ্ডি', খালি-হাতে নাচ। এই পদ্ধতিটিই শ্রেষ্ঠ। এতে আমরা নাচের ভঙ্গির বৈচিত্র্য পাই বেশী। নাচের সময় হাত-পা ও দেহ সব যেন এক হয়ে নাচতে থাকে, এইটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। এ-কথাটা একটু বিস্তৃত ক'রে বলা দরকার।

ভারতের অনেক নাচে দেখা যায় হাতের ভঙ্গি বা মুদ্রার আধিপত্য বেশী, আবার কোন কোন নাচে দেখি পায়ের নানা প্রকার তালের কাজ দেখানোই নাচিয়েদের প্রধান চেষ্টা। অবশ্য এ-বিষয়ে মণিপুরের কাজ অন্য রকমের; তারা হাত-পা ও দেহ সকলের ভিতর একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে-নাচে লালিত্যের

'নাইয়াণ্ডি'-নর্ত্তকদল

প্রতি ঝোঁক বেশী। কাণ্ডি-নাচের মধ্যে সেইখানে আমরা পাই হাত-পা ও দেহের সামঞ্জস্য, এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড বেগ ও পুরুষোচিত বীর্য্যের প্রকাশ।

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম হ'ল 'উডেক্কি' নাচ। উডেক্কি বা 'ডম্বরু' এক হাতে ধ'রে অপর হাতে বাজিয়ে নাচতে হয়। এতে ভঙ্গির কিছু নূতনত্ব পাই না—পায়ের চলন ও ভঙ্গি নাইয়াণ্ডি নাচের অনুরূপ, গানগুলিও এক। এই ডম্বরু দক্ষিণ-ভারতের একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। এটি সেখান থেকেই সিংহলে গিয়েছিল ব'লে সকলে একমত।

তৃতীয় নাচটির নাম 'পান্তেরু'। পান্তেরু হচ্ছে পিতলের একটি চেপ্টা দেড় ইঞ্চি চওড়া রিং। তাতে অনেকগুলি ছোট ছোট পিতলের জোড়া চাকৃতি লাগানো, ঝাঁকুনি দিলেই ঝম্ ঝম্ শব্দ হয়। নাচের সময়, দুই হাতে, বাজনার তালে, কখনও ঝাঁকুনি দিয়ে, কখনও শূন্যে তুলে লুফে ধরে বাজাতে হয়। এই নাচেও পায়ের কাজ অবিকল নাইয়াণ্ডি নাচের মত।

আজকাল সিংহলে এই নাচ দেখবার বিশেষ সুযোগ

বৌদ্ধ উৎসবগুলিতে। নর্ত্তকেরা কোন-না-কোন বৌদ্ধ মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট। সাধারণত তারা চাষবাস করে, উৎসবের ডাক পেয়ে একত্র হয়। এই উৎসবগুলির কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। উৎসবের নাম এদের ভাষায় 'পেরহেরা'—'অবিরুধু পেরহেরা', 'বৈশাখ পেরহেরা', 'পোষম্ পেরহেরা,' 'কাণ্ডি পেরহেরা,' 'কারচি পেরহেরা' ও 'আলুট্-সাল্ পেরহেরা'।

'অবিরুধু' পেরহেরা হ'ল নববর্ষের উৎসব; বাংলা নববর্ষের সঙ্গে দুই-এক দিনের পার্থক্য হয়।

'বৈশাখ পেরহেরা' হ'ল এ-দেশের সব চেয়ে বড় উৎসব, এই উৎসব হয় বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, এই দিন ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এবং বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব স্বয়ং ঐ দিনেই সিংহলে এসেছিলেন। এই সময় দেশের গ্রামে নগরে রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সাজিয়ে, মেয়ে-পুরুষ দলে দলে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে। ধনীরা রাস্তায় খাবার বিলি করে, বৌদ্ধরা বাড়ীর সামনে বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প অবলম্বন ক'রে মূর্ত্তি ছবি টাঙিয়ে রাখে। দলে দলে নরনারী ও শিশুরা দর্শনপ্রার্থী হয়ে মন্দিরে যায়, নর্ত্তকেরা সদিন নাচে গানে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে তোলে।

নর্ত্তকদের রূপোর গয়না রূপোর মুকুট

তৃতীয় উৎসব হ'ল—'পোষম্ পেরহেরা'। অশোক-পুত্র মহিন্দ অনুরাধাপুরের নিকটবর্ত্তী 'মহিন্‌তালে' পাহাড়ে, রাজা 'দেবানম্‌পিয়াতিস্‌সা'কে যেদিন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, সেই শুভ দিনকে স্মরণ করার জন্যই এই উৎসব। এর প্রধান আড্ডা অনুরাধাপুর; সেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভিড় হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি এই উৎসব হয়।

সিংহলের একটি প্রাচীন নৃত্য : মুখোস-নাচ

ভাদ্রমাসে কাণ্ডিতে যে পেরহেরা হয় তার খুব নাম। বিদেশে 'কাণ্ডি পেরহেরা'র খবর লোকে খুব জানে। এটি হ'ল কাণ্ডি-নাচিয়েদের বিশেষ উৎসব। পূর্ব্বেই বলেছি এ-উৎসবের আসল উপলক্ষ্য হচ্ছে রাজা গজবাহুর বিজয় উৎসব। এই পেরহেরায় মিছিল বের হয় খুব চমৎকার। তার জাঁকজমকে দেশী বিদেশী সকলেই মুগ্ধ। বহু সংখ্যক হাতী, লোকজন, ও নাচিয়েরা দলে দলে এই মিছিলে থাকে। কাণ্ডি-নাচের ভাল কিছু দেখ্‌তে হ'লে এই হ'ল উপযুক্ত উৎসব।

এর পরে হেমন্তকালে উৎসব হয়—আমাদের দেশের দীপালি উৎসবের মত, প্রায় সেই সময়েই পড়ে। তখন মন্দিরে মন্দিরে হাজার হাজার বাতি জ্বালানো হয়; পূজাও হয়ে থাকে। এই উৎসবের নাম 'কারচি'।

আমাদের দেশের নবান্নের মত এ-দেশেও নূতন ধানের একটি উৎসব হয়। প্রথম গৃহীরা নূতন চাল মন্দিরে উৎসর্গ করবে,—পরে সব একসঙ্গে রান্না ক'রে পুরোহিত তা দেবতার

প্রসাদ ক'রে সকলকে বিলিয়ে দেন। এই নাচের নাম 'আলুটসাল্'।

কাণ্ডি-নাচিয়েদের ভিতর মুখোস ব্যবহারের রীতি নেই। এ-দেশের অন্যান্য পুরাতন নৃত্যের মধ্যে মুখোসের ব্যবহার খুব দেখা যায়। আলোচ্য নর্ত্তকেরা ব্যবহার করে মাথায় রূপোর মুকুট, বুকে সুন্দর পুথির গহনা, কোমরে কাপড়ের বিচিত্র ভাঁজের উপরে রূপোর কাজ-করা ঝকঝকে কোমরবন্ধ, হাতে থাকে মোটা পিতলের বালা। ব্যয়বাহুল্যের জন্য রূপোর মুকুটটা সব নাচিয়েরা ব্যবহার করতে পারে না।

এই নাচের ঐতিহাসিক উৎপত্তির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এবার নাচিয়েদের মুখে এই নাচের উৎপত্তির যে গল্প শুনেছি তাই লিখে শেষ করি।

এ-দেশের প্রাচীন নাচিয়েদের বিশ্বাস, ভগবান মহা-ব্রহ্মণ্ 'তদ্' 'জিৎ' 'তোম্' 'নাম্' এই কয়টি তালের শব্দ প্রথম উচ্চারণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁর মুখ থেকে এই শব্দ কয়টি শুনে, তাই নিয়ে তিনি বত্রিশ রাগের সৃষ্টি করেন ও নয়টি নয় প্রকারের নাচ তৈরি করেন; নাচের উপযোগী দুটি বাদ্য-যন্ত্রও তৈরি করলেন, একটির নাম 'বেড়ে' অপরটি 'ডাক্কি'। পরে ঈশ্বরের সামনে এই নিয়ে নাচ-গান ক'রে শোনালেন। তখন "মনু" অথবা "মহাসম্মত" পৃথিবীর রাজা হয়ে রাজত্ব করছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা, ঈশ্বর ও অন্যান্য দেবতারা গন্ধর্ব্ব সহ তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে এই নাচ তাঁকে দেখান। নরপতি সেই নাচ বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে পেয়ে পরে পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

নাচের আরম্ভে যে-বন্দনা গান হয়, তার সাধারণ অর্থেও এই গল্পটিকে প্রকাশ করে:

ভগবান বিশ্বকর্ম্মা নাচের সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বরকে দেখান, তাঁরা উভয়েই মর্ত্ত্যে মানুষের কাছে তার প্রচার করেন। পৃথিবীর অধিপতি মহাসম্মত এই নাচ গ্রহণ করেন। সেই দেবতাদের নমস্কার, তাঁরা এ-নাচকে তাঁদের আশীর্ব্বাদ দ্বারা রক্ষা করুন।
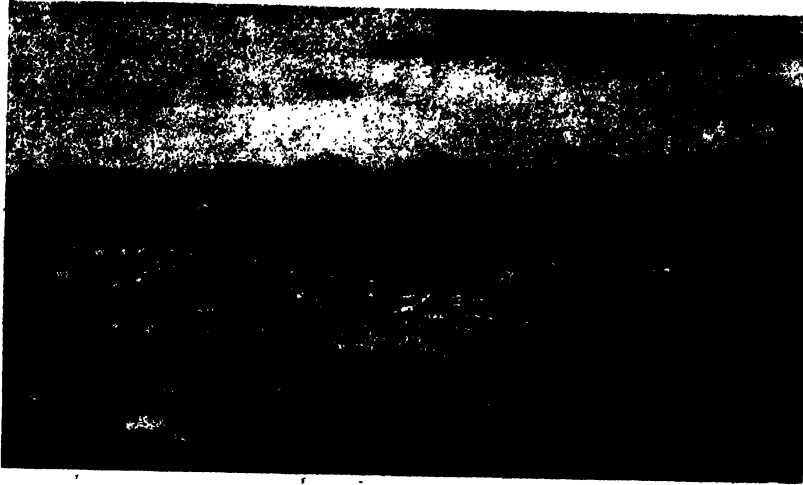
কাণ্ডি শহরের সাধারণ দৃশ্য
লেকের উপরে ছোট বাড়ীটির পিছনে দন্ত-মন্দির

ফিনল্যাণ্ডের প্রধান শহর হেলসিনকির একটি উৎস : সিন্ধু-সিংহ পরিবেষ্টিতা
কুমারী হেলসিনকি সমুদ্রতল হইতে উঠিতেছেন

ফিনল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী টুকু শহর—প্রচলিত সুইডিশ নাম ওবো শহর

ফিনল্যাণ্ডের চিঠি

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

··উড়ো জাহাজ এইমাত্র ফিনল্যাণ্ডের ঘাটে এসে পৌছল। াল্টিক সাগরের জল রোদ্দুরে ঝলমল করছে, এখন সকাল াটটা।· ওবো-শহরে নেমেছি—ঘণ্টা-কয়েক থাক্‌ব, তার র ট্রেনে ক'রে হেলসিংফোরস্ যাব। কি সুন্দর দেশ! াওয়া আলো এখন ঠিক আমাদের দেশের মত—ঠিক কমের ঠাণ্ডার স্পর্শ, আকাশ নির্ম্মল নীল।

ফিনল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার সিবেলিয়স
আধুনিক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-স্রষ্টাদের অন্যতম

ট্রামে ক'রে শহরের বাগানে একটা কাফেতে এসে ছি—সাম্‌নে ছোট্ট অরা নদী, ছোট্ট ছোট্ট নৌকো, ার-বোট ভাস্‌ছে, ওপারে বাগানবাড়ী, এপারে ঘাসের বাগানে ফুল ফুটেছে। এখনও কেউ আসে নি এই তে খেতে,—ভাষা ত বোঝা অসাধ্য, তাই হাত পা বোঝালাম, কফি আর প্রাতরাশ চাই। এখনই ব। তার পর ছোট্ট শহর ঘুরে দেখব। এখানকার ব্দ্যালয় এবং বিদ্যার্থী-পরিষদে খবর দিয়েছে সুইডেন থেকে, তাদের প্রতিনিধি দুপুরবেলা আমাকে নিয়ে ঘুরবে, আতিথ্য দেবে।
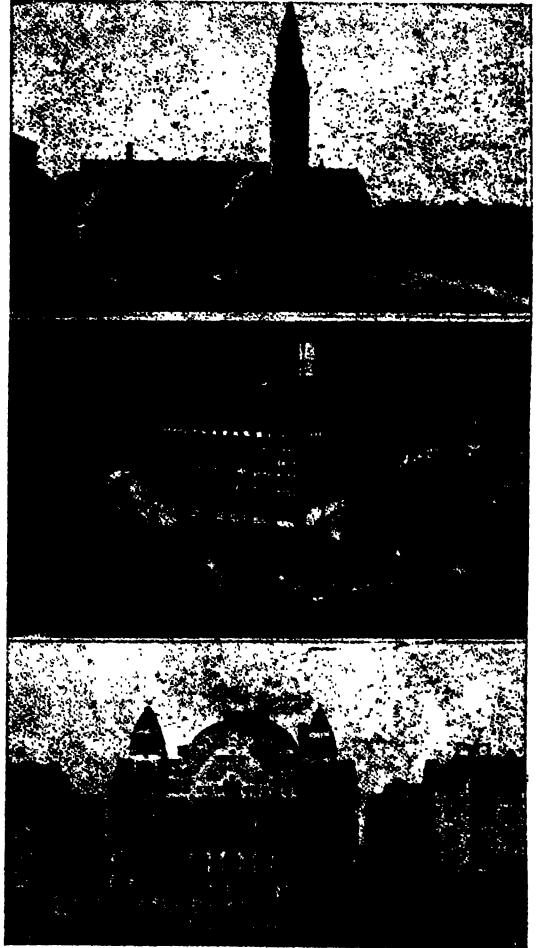
হেলসিনকি, ফিনল্যাণ্ড

ন্যাশনাল মিউজিয়ম
বৃহত্তম দোকান ঘর
ন্যাশনাল থিয়েটার

বহুকাল থেকে মনে স্বপ্ন ছিল ফিনল্যাণ্ড দেখব—এত দিনে সার্থক হ'ল। অরণ্য, হ্রদ এবং দ্বীপের এই দেশ—

নানা জাতি নানা ভাষার আদিম মিশ্রণ এখানে; শীতকালে বরফে সমস্ত জীবন-সংসার বন্দী হয়ে থাকে, তখন ধূসর-শুভ্র মেরুর প্রকাশ পাইন-বন থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত। বাকী সময় প্রাণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্য, গ্রামে শহরে নূতন কালের

হেলসিনকি, ফিনল্যাণ্ড

সঙ্গীত-সদন
রেলওয়ে ষ্টেশন
পার্লেমেণ্ট-সৌধ
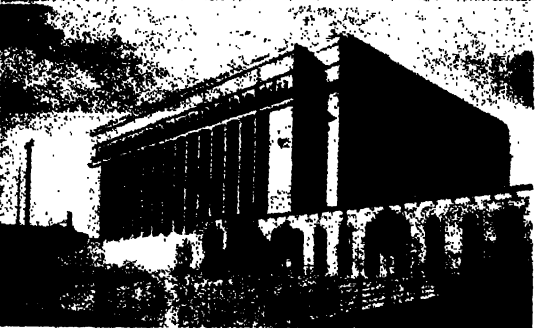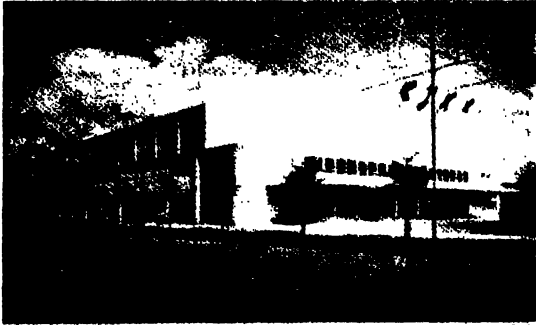
আনন্দিত আত্মপ্রকাশ। রাশিয়া এবং সুইডেনের দুই প্রান্ত এসে ঠেকেছে ফিনল্যাণ্ডের সীমানায়, এদের সভ্যতায় তার পরিচয়। অথচ ভাষায় ব্যবহারে শিল্পে এদের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং আধুনিক কালে এরা দ্রুত এগিয়ে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় এরা কারও চেয়ে কম নয়—সুইডেনের মত এখানেও ইলেক্‌ট্রিসিটি যুগান্তর এনেছে; এদের মাছের ব্যবসা, কারুশিল্পের প্রচলন বিজ্ঞানকে ব্যবহারে লাগিয়েছে। হায় রে ভারতবর্ষ! এখনও দেশে বহু লোক ভাবছে বিদেশী তাড়িয়ে কোন মতে পাড়াগাঁর ডোবায়, মন্দিরে, ম্যালেরিয়ায় অভিভূত হয়ে থাকতে পারলেই মোক্ষলাভ হবে! বিদেশীর হাত হ'তে নিষ্কৃতি যে-প্রবল জাগ্রত বুদ্ধির যোগে সম্ভবপর হবে সেই বুদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দূরে রাখে না, সে-বুদ্ধি পাণ্ডাপুরোহিতকে দূর ক'রে পঞ্জিকা পুড়িয়ে জ্ঞানের উন্নত গগনে নূতন কালে আপনাকে জানতে চায়। হয়ত সেই চেতনা আমাদের দেশে আজ সক্রিয় হয়ে উঠছে, কিন্তু দেশের কাগজে তার তেমন পরিচয় পাই না, দেশের সাহিত্যেও তার সহজ আগ্রহ দেখি না। ফিনল্যাণ্ডের সামান্য সাধারণ কাঠুরে বা মাঝি যে-স্বাধীনতাকে প্রাত্যহিক অভ্যাসে, চিন্তায় স্বীকার করতে চায়, আমাদের দেশী বহু নেতা বা শিষ্যদল তাকে অস্বীকার ক'রে চক্রান্ত এবং মিথ্যা আন্দোলনের যোগে রাষ্ট্রিক মুক্তি কামনা করছেন।

জহরলালের মত মনস্বী নেতা দুর্লভ, আশা করা যায় তিনি কিছু পরিমাণে দেশের মন বদলাতে পারবেন। সুভাষ বাবুকে ত শাসনতন্ত্র বন্দী ক'রেই রাখ্‌ল। বাংলা দেশে নূতন মননের নেতা আজ কোথায়? হয়ত কলেজ স্কোয়ারে বাংলার গ্রামের কোণায় এখানে-ওখানে তাঁরা জাগছেন—তাঁরা যেন ফিনল্যাণ্ডকে মনে রাখেন! অর্থাৎ আগামী ভারত-সভ্যতাকে নূতন যুগের চোখে, পৃথিবীর মানুষ জাতির আত্মীয়রূপে চেয়ে দেখেন। তবেই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রে, লোক-ব্যবহারে আধ্যাত্মিক সত্যবোধে জীবন-কর্ম্মে মুক্ত হবে।

আমার এই পশ্চিম-ভ্রমণ তীর্থযাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তীর্থযাত্রা, কিন্তু আপন আত্মীয়মণ্ডলীর মহলে মহলে আনাগোনা। যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম তাতে জীবন সার্থক হ'ল। জানলাম, স্বীকার করলাম, মানুষের পৃথিবীতে এসে প্রাণকে ভালবাসলাম। প্রাণের জয়গান শুন্‌লাম দ্বীপে দ্বীপে, বন্দরে বন্দরে, কত নিভৃত সুদূর লোকালয়ে। দুঃখ, অন্যায় অসত্যকে ছিন্ন ক'রে দেশে দেশে এই ওঙ্কার উঠেছে জীবনযাত্রার—কত সন্ধ্যায় কত লোকের বাড়ীতে, উৎসবে, নিভৃত আলাপে মনে মনে বলেছি 'এই ত পেয়েছি'! আজ স্বদেশে

...ার কালে ভাবছি, কি ভাবে দেশের আলোয় ...াকালয়ে পুনর্ম্মিলনের সুরে শুন্‌ব প্রাণের এই আহ্বান, প্রাণের এই স্বীকৃতি। আর কিছু নয়, জীবন থেকে বিদায় ...নবার আগে দেশে শুনতে চাই সত্যের সুরে স্বাধীনতার ...ঙ্গীত, যেন দেখতে পাই এখনকার নবীন বাঙালীর জীবনে ...ানব-সংসারের বিশ্বভূমিকা।

অনেক সময়েই ভিড়ের মধ্যে থাকি, হোটেলে, মিটিংএ, ...িমন্ত্রণ-পর্ব্বে, অল্প সময়ে অনেক কিছু করতে হয়, তাই ...ড়োহুড়ি অনিবার্য্য।···সুইডেনে আশ্চর্য্য সমাদর পেয়েছি: ...ামবুর্গের প্রকাণ্ড কন্‌ফারেন্সের কাগজপত্র ছবি হয়ত ...ত দিনে পৌঁচেছে। কি বিরাট আয়োজন—একমাত্র জার্ম্মান ...াতিই এমন নিপুণ, সুন্দর ব্যবস্থা করতে পারে। জার্ম্মানদের ...াধুনিক রাষ্ট্রিক ব্যবহারে বহু অন্যায় প্রবল হয়ে রয়েছে, ...কন্তু ওদের ভিতরকার বীর্য্য মরে নি—কন্‌ফারেন্সের প্রতি ...লায় তার পরিচয় পেয়েছি ওদের অকৃত্রিম সৌজন্যে, বুদ্ধির ...সন্ন নির্ম্মল প্রকাশে, জ্ঞানের গভীরতায়। সমস্ত শহর ...ড়ে এই Welt-Congress-এর উৎসব—সে যে কি প্রকাণ্ড ...াপার তা আরও বই ছবি যখন বেরবে তখন জানা ...বে।

সময় পেলে উড়োপথের বিবরণ লিখব—আকাশযাত্রীর ...রতীয় চোখে পশ্চিমদেশ দর্শন! কি আরামে ঘুরেছিলাম ...বল্‌ব! এখন এই বাল্টিকের ছোট্ট জাহাজও বেশ লাগছে—...। কবিত্ব অন্য রকম। এক পৃথিবীর জীবনে কতখানি ধরে!

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা-লাভের উৎসবে ছাত্রীগণ

যেন একা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

মিশিয়া আছে সবার মাঝে অথচ যেন একা,
সকল কাজে লেগে-না-লাগা সে ছুটি করলেখা।
আড়ে আড়ে সে নিরালা থাকে,
জানি না আর কে জানে তাকে,
তবে কি জানি কোন্ সে ফাঁকে
কারে কে দেয় দেখা!

হয়ত কিছু দেখিতে ক্ষীণ, রঙেও কিছু কালো,
দেখিলে তারে ভাবিতে পারো এমনই কি বা ভালো!
চোখে লাগিবে অনেক ভুল,—
কেন সে এঁটে বাঁধে না চুল,
জামার হাতা কাঁধে আদুল,—
ওই বা কোথা শেখা!

জেনে-না-জানা অবহেলায় আঁচল ফেলা পিঠে,
দেখে-না-দেখা তাকানোটুকু দেখ না আধ-দিঠে!
মুখচাপা সে ভাবের ভোল
বুঝিতে যদি বাধে বা গোল,
চেয়ো না, মন রেখো অটল;
নাই ত কিছু ঠেকা!

কিছু না, তবে স্বরটি মিঠে কথাটি টানা-টানা,
—হয়ত ক্রমে উঠিবে মনে এমনি কথা নানা।
ইচ্ছা হবে,—দেখি আবার,
শুধু দেখাতে দোষ কি আর!
ছায়া ত র'বে আঁখির পার
আদর নিরপেখা!

দেখিতে হয় দেখো তখনো; দেখ তোমরা কত!
আমরা শুধু জানিতে চাই, সে কি দেখার মত?
চোখে চোখে ত নাই আটক;
শত হ'লেও অবলা লোক,
—একটু তাই রাখিয়ো চোখ,—
মনে না কাটে রেখা॥

জীবাণুর আলো

মানুষ এ পর্য্যন্ত যত রকমের আলোক উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপের ভাগই বেশী। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত আলোকের প্রায় চৌদ্দ আনাই উত্তাপে বাজে খরচ হইয়া যায়। মোটের উপর আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা কার্য্যকরী ভাবে কৃত্রিম ঠাণ্ডা আলোক উৎপাদন করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। অথচ স্বাভাবিক উপায়ে জাত বিভিন্ন রকমের ঠাণ্ডা আলো অহরহ আমাদের নজরে পড়িয়া থাকে। জোনাকী, কেঁচো ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ অতি স্নিগ্ধ আলো প্রদান করিয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙের কোন কোন অঞ্চলে দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীরের চতুর্দ্দিক হইতেই এক প্রকার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ, নীলাভ আলোক নির্গত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে অনেকে এই আলো কাজে লাগাইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকায় অগ্নিমক্ষিকা নামে জোনাকী-পোকার মত উজ্জ্বল আলোপ্রদানকারী এক প্রকার বড় বড় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম অধিবাসীরা কয়েকটি পোকা একত্র রাখিয়া অন্ধকারে সেই আলোতে কাজকর্ম্ম করে। আমাদের দেশেও জোনাকী-পোকা ফাৎনায় আটকাইয়া রাত্রির অন্ধকারে অনেককে ছিপে মাছ ধরিতে দেখিয়াছি।

এই সব কীটপতঙ্গের শরীর-অভ্যন্তরস্থ আলোবিকীরণকারী কোষ হইতে নির্গত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেণুসমূহের মধ্যে লুসিফেরিণ নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই লুসিফেরিণই আলোক প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তৎসঙ্গে লুসিফারেজ নামে এক প্রকার 'এন্‌জাইম' আলোক উৎপন্ন করিতে সহায়তা করে। সুইচ্ টিপিলে যেমন আলো জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ ঘর্ষণ বা অন্য কোনরূপ আলোড়নের ফলে এন্‌জাইম আলো জ্বালিয়া দেয়। এই জাতীয় জান্তব আলো জ্বলিবার জন্য অক্সিজেন একান্ত প্রয়োজনীয়।

কীটপতঙ্গ ব্যতীত কোন কোন ফুল এবং ব্যাঙের ছাতা হইতেও আলোক নির্গত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলের বনে জঙ্গলে স্নিগ্ধ নীলাভ আলোপ্রদানকারী গাছপালাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক প্রকার আণুবীক্ষণিক ছত্রাক-সূত্রই গাছপালার আলোক উৎপাদনের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আমাদের দেশের আলোবিকীরণকারী গাছপালা সম্বন্ধে প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে আলোচনা করিয়াছিলাম।

এতদ্ব্যতীত সমুদ্র ও নদীর মোহানায় নোনাজলে অন্ধকারে এক প্রকার আলো দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীনালার জলের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এইরূপ আলোর খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। একটু জোরে বাতাস বহিলে বা জল একটু আলোড়ন করিলেই যেন তরল অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠে।

উত্তাপবিহীন স্বাভাবিক আলোর কথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ অবগত ছিল। কিন্তু তাহারা এই আলোক-উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ইহাতে দৈবশক্তির সম্বন্ধ আরোপ করিত। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের মাস্তুলের উপর সময়ে সময়ে 'সেণ্ট এল্‌মোজ্ ফায়ার' নামে এক প্রকার নীলাভ বৈদ্যুতিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীরিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা মনে করিত ক্যাষ্টর ও পোলাক্স নামে আমাদের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত দুই যমজ দেবতা এই অগ্নি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অত্যুচ্চ পিরামিডের শীর্ষদেশে উঠিয়া হাত উঁচু করিয়া তুলিলে ঋতু-বিশেষে সময় সময় শরীরের মধ্যে সূচ বিঁধিবার মত এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকে তদ্দেশবাসী আরব পথ-প্রদর্শকেরা, পিরামিড-গহ্বরে সমাহিত মৃতের আত্মার কোন অলৌকিক ক্রিয়া বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু সমুদ্রজলে আলোর খেলা সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। এমন কি হোমারের মত কবি, যিনি সাগরের উত্তাল তরঙ্গরাজির জীবন্ত বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, তিনিও সাগরোর্ম্মির এই অদ্ভুত হৃদয়গ্রাহী আলোর খেলার কথা উল্লেখ করেন নাই। ডারউইন দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরের আলোর মনোমুগ্ধকর বিচিত্র লীলা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—অন্ধকার রজনীতে একদিন যখন আমাদের জাহাজ চলিতেছিল তখন সমুদ্রজলে এক অপরূপ দৃশ্য চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তখন অল্প অল্প স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছিল। দিনের বেলায় ঢেউএর মাথায় যেসব সাদা

ফেনা দেখিতে পাওয়া যায়, যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দ্দিকেই সেই ফেনাগুলি যেন এক প্রকার স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। আমাদের জাহাজের সম্মুখভাগের দিকে চাহিয়া মনে হইল, জাহাজ যেন তরল অগ্নিরাশিকে দুই ভাগে কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। আর পিছনে চাহিয়া মনে হইল, যেন আকাশের ছায়াপথের মত অথচ অধিকতর উজ্জ্বল আলোর পথ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই যেন এই অপূর্ব্ব আলো সমুদ্রজলে ফুটিয়া উঠিতেছে। দিগন্তের আকাশও যেন কিছুদূর পর্য্যন্ত এই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য অবর্ণনীয়।

সমুদ্রজলের এই প্রাকৃতিক আলোর উৎপত্তির কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত রহস্যাবৃতই ছিল। অবশ্য এই বিষয়ে আজও কতকগুলি সমস্যা সুমীমাংসিত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা মনে করিতেন সমুদ্র দিনের বেলায় সূর্য্যকিরণ শোষণ করিয়া লয় এবং রাত্রি-বেলায় সেই আলো বিকীরণ করিবার কালে নিষ্প্রভ আলোক দৃষ্টিগোচর হয়।

রবার্ট বয়েল প্রতিপাদন করিলেন যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য বাতাস ও জলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ঘর্ষণের ফলেই এই আলোর উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীতেও কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে সমুদ্রজলের ফস্‌ফরাসই আলোক-উৎপত্তির কারণ। কিন্তু সমুদ্র-জল বা অন্য কোথাও ফস্‌ফরাসের নিরবচ্ছিন্ন পৃথক অস্তিত্ব দেখা যায় না। যৌগিক পদার্থ হইতেই ইহা পাওয়া যায়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে দুই জন ইটালীয়ান প্রফেসরই সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রজলে আলোক-উর্ম্মির প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করেন। এড্রিয়াটিক সমুদ্রের জল পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা তাহাতে আলোবিকীরণকারী এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। তৎপরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে কালক্রমে সমুদ্রজলবিহারী আলোবিকীরণকারী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও বহুপ্রকারের জীব ও জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমুদ্রজলে আলোক উৎপত্তির প্রধান কারণ সাধারণতঃ 'নক্‌টিলুকা মিলিয়ারিজ' নামে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু। মাইক্রস্‌কোপের নীচে এই জীবাণুদিগকে দেখিতে যেন এক টুকরা গোলাকার জেলীর মত পদার্থ। পাশাপাশি ভাবে ইহাদের শরীর এক ইঞ্চির ৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। শরীরের একদিকে খাঁজকাটা। সমগ্র পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া পাতার ন্যায় কতকগুলি শিরা-উপশিরা ছড়াইয়া আছে। গর্ত্তের মত স্থান হইতে লেজের ন্যায় একটি উপাঙ্গ বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই লেজ আন্দোলন করিয়া উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর
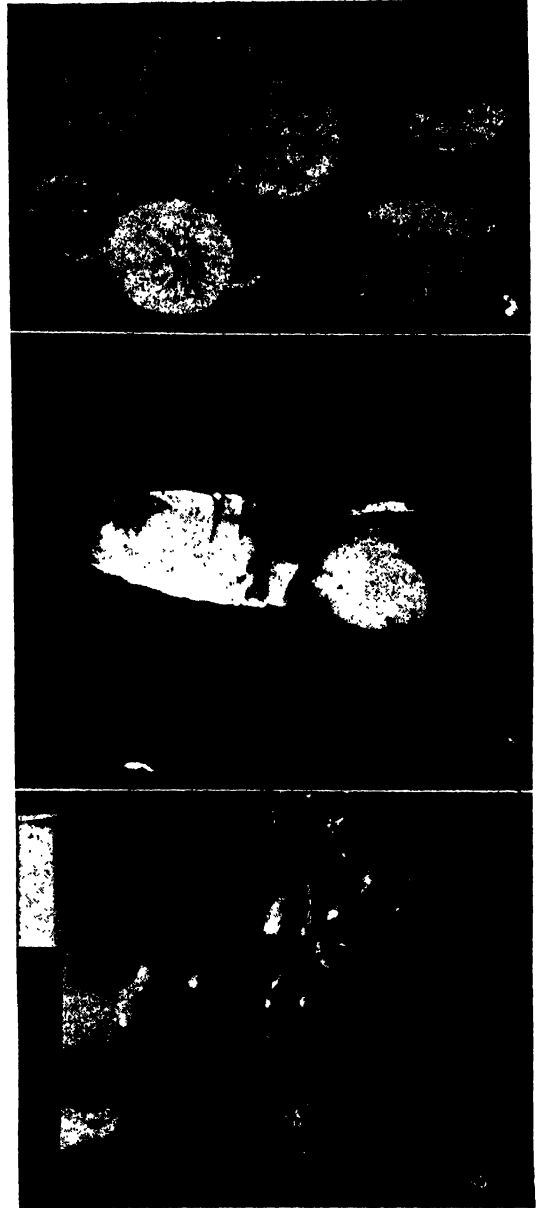
১ নক্‌টিলুকা মিলিয়ারিজ : ইহাদের শরীর হইতে নির্গত আলোকে সমুদ্রজল আলোকিত হইয়া থাকে

২ চিংড়িমাছের মধ্যে আলোক-বিকীরক জীবাণু জন্মাইবার পর অক্সিজেন-প্রয়োগে অন্ধকারে গৃহীত ছবি

৩ কাচের পাত্রে রক্ষিত চিংড়িমাছ হইতে আলো নির্গত হইয়া পার্শ্বের মূর্ত্তির উপর পড়িয়াছে। সেই ক্ষীণ আলোকে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর অস্পষ্ট ছবি ফুটিয়াছে

[ফটোগ্রাফ লেখক-কর্ত্তৃক গৃহীত]

আণুবীক্ষণিক প্রাণীদিগকে লেজের গোড়ার দিকে মুখের কাছে ঠেলিয়া দেয়। জেলীর পিণ্ডের বহিরাবরণস্থিত প্রোটোপ্লাজম হইতে আলো নির্গত হয়। নক্‌টিলুকা পরিণত বয়সে উপনীত হইলে পাশাপাশি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবাণুতে পরিণত হয়। তাহারা আবার কালক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বংশ-বিস্তার করিতে থাকে। কাজেই আকস্মিক কোন বিপদ না ঘটিলে ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বলিতে গেলে স্বাভাবিক মৃত্যু ইহাদের নাই। পরীক্ষার্থ অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ইহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা চলে। এ অবস্থায় যদি কোন কারণে আলো বিকীরণ না করে তবে এক ফোঁটা সুরাসার বা ক্ষীণবীর্য্য অম্ল ফেলিয়া দিলেই ইহারা উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং আলো বিকীরণ করিতে থাকে। জীবাণুমিশ্রিত জল ব্লটিং কাগজে ছাঁকিয়া লইলে সেই কাগজ হইতে এত আলো পাওয়া যাইবে, যাহার সাহায্যে ৮।৯ ইঞ্চি দূর হইতেও অনায়াসে বইয়ের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ জলের মধ্যে সহজ-উত্তেজক থার্ম্মোমিটার দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উহাতে উত্তাপের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু ইহাদের শরীরে কি করিয়া আলোর উৎপত্তি হয় তাহা আজও নির্দ্দিষ্টরূপে জানা যায় নাই। স্থলজ কীটপতঙ্গ এবং বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যের মধ্যে যে আলো দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আলো যৌন ব্যাপারের সহায়ক; কিন্তু নক্‌টিলুকার শরীরের মধ্যে স্নায়ুজালের অস্তিত্ব নাই। তাহাদের চক্ষুও নাই, এমন কি যৌন পার্থক্য পর্য্যন্ত নাই।

মেরুপ্রদেশ হইতে উষ্ণ প্রদেশ পর্য্যন্ত সাগর মহাসাগরেই এই আলোর দৃশ্য দেখা যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে কোন কোন স্থানে এত অধিক নক্‌টিলুকা দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই জলে অবগাহন করিলে প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর আলোকময় দেখায়; অষ্ট্রেণ্ডের সমুদ্রজলেও এই জীবাণু এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে সমুদ্রের উপকূল-ভাগের ভিজা বালুকারাশিকে রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত লাভার মত প্রতীয়মান হয়।

সমুদ্রযাত্রীরা দেখিয়াছেন, রাত্রির অন্ধকারে ভারত-সমুদ্রের কোন কোন স্থান এই জীবাণুর আলোকে বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রের মত দেখায়। সমুদ্রের জলে এই জীবাণু ব্যতীত গভীর জলের নিম্নতম প্রদেশে অনেক রকমের মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শরীর হইতে বৈদ্যুতিক আলো আবার কাহারও কাহারও শরীর হইতে ঠাণ্ডা আলো নির্গত হইয়া থাকে। ইহারাও দলে দলে বিচরণ করিয়া স্থানে স্থানে সমুদ্র জল আলোকিত করিয়া তোলে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন রকমের মাছ ও জলচর পাখীর মাংসে প্রচুর পরিমাণে একপ্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের শরীর হইতেও নীলাভ আলোক নির্গত হয়, ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'ব্যাক্টিরিয়াম্‌-ফস্‌ফোরেসেন্স' বলে। নোনা জলের চিংড়ি-মাছের শরীরে প্রায়ই এই জাতীয় আলোপ্রদানকারী জীবাণু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মরিবার প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা পরে মিঠা জলের চিংড়ি মাছের দেহে কমবেশী আলো-বিকীরণকারী জীবাণু জন্মিতে দেখা যায়। সময় সময় নোনা জলের চিংড়িমাছের শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণ আলোক নির্গত হয় যে দশ-বার ইঞ্চি দূর হইতেও তাহার সাহায্যে অন্ধকারে বইয়ের অক্ষর পড়িতে পারা যায়। এই আলো-বিকীরণকারী মাছ হইতে দুই-চারিটি জীবাণু তুলিয়া লইয়া বিশেষভাবে প্রস্তুত 'এগার-এগার' বা ভাতের মণ্ডের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে উপযুক্ত উত্তাপে সে-স্থলে তাহারা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ-বিস্তার করে কাজেই যে-পাত্রে 'এগার-এগার' রাখিয়া জীবাণু ছাড়িয়া দেওয়া হয়, দিন দুইয়ের মধ্যেই সে-পাত্রটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চিংড়িমাছ মরিবার প্রায় আট-দশ ঘণ্টা পরে আলো দেখা দিতে সুরু করে অন্ধকারে রাখিয়া যে-কোন সময়েই যে-কেহ এই আলো প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আলো অনুজ্জ্বল হইলে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োগে ইহার ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ছবির ফটোগুলি সবই মাছের আলোতে তোলা। চিংড়ি মাছের আলো-বিকীরণ সুরু হইবার প্রায় দু-তিন ঘণ্টা পর মাছের আলোতেই অন্ধকার ঘরে ফটো লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ, শরীরের মধ্যস্থলে ও মাথার কাছেই বেশীর ভাগ জীবাণু জন্মিয়া থাকে। লেজ ও মুখের প্রান্তভাগ নিষ্প্রভ।

চিংড়িমাছ ব্যতীত স্যাড্‌স্‌ ও ইলিসমাছ বাসি করিয়া রাখিলেও সময় সময় আলোবিকীরণকারী জীবাণু জন্মিতে দেখা যায়। হাঁস ও মুরগীর মাংস রাখিয়া দিলেও সময় সময় ঐরূপ নীলাভ আলো জ্বলিতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সম্মোহিত অবস্থা

আকস্মিক ভয় অথবা স্থানবিশেষে অতর্কিত আঘাতের ফলে মানুষকে যেমন কোন কোন অবস্থায় সম্মোহিত হইতে দেখা যায়, নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীর মধ্যেও অতর্কিত ভয় বা আঘাতের ফলে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ভয়ের কারণ ঘটিলে মাকড়সারা সাধারণতঃ ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু অতর্কিতভাবে

ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কোন কোন জাতীয় মাকড়সার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় তখন হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা অসাড়ভাবে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ বা পাগুলিকে একত্র করিয়া শরীরের উভয় দিকে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত খড়কুটার মত নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে। পাতিহাসকে হঠাৎ চিং করিয়া দিলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন একটা সাময়িক জড়তা আত্মপ্রকাশ করে; এই অবস্থায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ায় 'টনি-ফ্রগমাউথ' নামে এক প্রকার কাঠ-ঠোক্‌রা-জাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ কোন রূপ ভয় পাইলে ইহারা বসিবার ডালের সমান্তরালে শরীর সোজা করিয়া দেয় এবং কাঠের মত নির্জীবভাবে অবস্থান করে। দেখিয়া গাছের অংশ-বিশেষ বলিয়াই ভুল হয়। 'ময়োসাস' নামে এক প্রকার রাত্রিচর কাঠিপোকার উপর হঠাৎ তীব্র আলোক নিক্ষেপ করিলে ইহারা এমনভাবে শক্ত ও অসাড় হইয়া পড়ে যে, শত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে শুষ্ক কাঠি ব্যাতীত জীবন্ত প্রাণী বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সাপ যখন ফণা বিস্তার করিয়া সোজা হইয়া ওঠে, তখন কৌশলক্রমে মাথার পিছন দিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেই একেবারে অসাড় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাপকে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ব্যাঙকে পিছনের পায়ে ধরিয়া হঠাৎ চিং করিয়া ফেলিলেই সে মড়ার মত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশীয় জলজ কাঠিপোকাকে ঘাড়ের কাছে হঠাৎ আঘাত করিলে হাত পা গুটাইয়া সে এক খণ্ড কাঠির মত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নির্জীবভাবে অবস্থান করে। চিংড়িমাছকেও এই রূপ সম্মোহিত করা যাইতে পারে। চিংড়ির লেজের দিক হইতে পিঠের উপর দিয়া মাথা পর্য্যন্ত একটু জোরে চাপ দিয়া উল্টা দিকে কয়েক বার আঙুল বুলাইলে দেখা যায় যে উহার শরীরের মাংসপেশীগুলি শক্ত ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। তখন সে আর মোটেই নড়াচড়া করিতে পারে না। এ-অবস্থায় চিংড়িকে দাঁড় করাইয়াই হউক বা হেলানো ভাবেই হউক যে-কোন রকমে রাখিয়া দিলে ঠিক সেই ভাবেই অবস্থান করিবে। বিভিন্ন জাতীয় ফড়িঙের মধ্যেও এরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ফড়িঙকে অতর্কিতভাবে ধরিয়া চিং করিয়া রাখিয়া দিলে সে একেবারে মৃতের ন্যায় অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকিবে। চিং করিয়া ফেলিবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে ইহাকে যে-কোন অবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাদের এ-অবস্থা অতি স্বল্পকালস্থায়ী।

লেখক-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র — সম্মোহিত প্রাণী

উপরের সারি: চিংড়িমাছের পিঠের উপর উল্টাভাবে আঙুল টিপিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে।
সামান্য আঘাতে মৃতবৎ কাঠি-পোকা।
নীচের সারি: জোরে ঝাঁকুনি দেওয়ার ফলে মৃতবৎ সাপ।
হঠাৎ চিৎ করিয়া ফেলায় মৃতবৎ ব্যাঙ।
নিস্পন্দ ফড়িঙ।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভীরু

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সেদিন অকস্মাৎ
উদ্দাম হ'ল মনের পবন,
কাঁপায়ে তুলিল শান্ত ভবন,
জাগিল ঝঞ্ঝা, বন উপবন নিমিষেতে ধূলিসাৎ।
অন্তর মাঝে জাগে বর্ব্বর,
শান্তির মাঝে প্রলয়ের ঝড়,
সহসা রুদ্র নটেশের যেন স্খলিত চরণপাত!
কেই বা মানিবে শাসনের মানা,
পক্ষীশাবক মেলিতেছে ডানা,
স্থির সরোবর সহসা হইল অথির জলপ্রপাত।
গুমরি গুমরি মনের মাঝারে
ভীরু মন আর রহিতে না পারে,
ছিঁড়িয়া বাহির হ'ল একেবারে, সমুখে তিমির-রাত!
সেদিন অকস্মাৎ।

হ'ল যে অনেক কাল—
ঘুমজড়া চোখে তটে হানে কর,
হেলিয়া পড়েছে তপন প্রখর,
সাগরের জলে জেগেছিল ঝড়, উদ্দাম উত্তাল।
ঢেউয়ের শিখরে দুলেছিল তরী,
বলেছিল মন, বাঁচি কিবা মরি,
ভেবেছিনু মনে, সঞ্চয় যত জীবনের জঞ্জাল!
সারিদল বেঁধে গগনের গায়
গগনবিহারী পাখী উড়ে যায়,
অকূল সাগরে ব্যাকুল বাতাসে ফুলে উঠেছিল পাল।
চলিতেছিলাম কোথায় না জানি,
শুনি নাই পিছে কারো কানাকানি,
সমুখে আলোক দেয় হাতছানি পিছে মায়া-তমোজাল!
হ'ল সে অনেক কাল।

আজি নিস্তেজ বেলা,
সহসা টুটেছে রৌদ্রের মায়া
ঘনায় দু-ধারে কালো কালো ছায়া,
পিছন সমুখে ধরে যেন কায়া, এ এক নূতন খেলা।
যে স্নেহ-প্রীতিরে ফেলে এনু পিছে
চেয়ে দেখি তার সমুখে জাগিছে,
সাগরে কখন ডুবিয়াছে তরী সার হ'ল ভাঙা ভেলা!
বসিয়া বসিয়া শুধু দিন গণি,
মানুষই হয়েছে নয়নের মণি,
মানুষের প্রীতি মানুষের স্নেহ, মানুষের অবহেলা।
বাহিরের ঝড় বহিছে বাহিরে
তটিনী ছুটেছে সাগরে চাহি রে,
ঘরেই আমারে ঘিরিয়া বসেছে বহু বাসনার মেলা।
আজি নিস্তেজ বেলা।

তোমরা ক্ষমিও মোরে,
সেদিন বুঝিতে পারি নি কেবল
নয়ন থাকিলে বুকে থাকে জল,
যদিও জগৎ চলচঞ্চল বাঁধা পথে সেও ঘোরে।
বন্ধু, সেদিন পারি নি বুঝিতে
আমি পথহারা আমারে খুঁজিতে,
নিশীথ-তিমিরে সায়াহ্ন মোর খুঁজিছে আমারই ভোরে।
ধূমকেতু সেও ফিরে ফিরে আসে,
ধরার আকাশ সে কি ভালবাসে?
স্নেহের ভিক্ষা মাগিছে মৃত্যু জীবনের দোরে দোরে।
ভেসেছিল তরী যে-বাঁধন ছিঁড়ে
তারই টানে তটে এল ফের ফিরে
ভরসা পাই না অজানা তিমিরে ছিঁড়িতে সে মায়া-ডোরে
তোমরা ক্ষমিও মোরে।

শয়ন-শিয়রে মম
দুলিছে আমার রজনী দিবস
কভু চঞ্চল কভু বা বিবশ,
আলোকদীপ্ত কভু দিক্ দশ, কভু সুনিবিড় তম
ঢেকে রাখে মোরে দুটি ডানা দিয়া,
অকারণ ভয়ে উঠি শিহরিয়া,
জানি না বুঝি না তবু বার-বার, বলি, নমো নমো নমঃ।
প্রলয়-ঝঞ্ঝা গগনে গগনে,
প্রদীপ জ্বলিছে আমার ভবনে,
নির্ভর সুখে ঘুমায় তাহারা যারা মোর প্রিয়তম।
জানি একদিন ঝঞ্ঝার বায়ে
শয়নঘরের প্রদীপ নিবায়ে
চোরের মতন শঙ্কিত পায়ে আসিবে সে নির্ম্মম
শয়ন-শিয়রে মম।

মণ্ডল-বাড়ী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দিদিমার সঙ্গে মামার বাড়ী যাইতেছিলাম।

আমাদের গ্রামকে আমরা বলি শহর। পাকা ইটের াস্তা,—অন্ধকার রাত্রিতে রাস্তায় মিটমিটে কেরোসিনের ালো জ্বলে, অনেক কোঠাবাড়ী, নিত্য বাজার বসে, বড় ্লে, পোষ্ট আপিস এমন কত কি যাহা দিদিমাদের ওই মাইল দুই দূরের পাড়াগাঁখানিতে নাই। আমাদের শহর হইতে ওই পাড়াগাঁয়ে যাইবার দুটি পথ। এক মাঠের ভিতর দিয়া, অন্যটি কতকগুলি ছোট বড় আমবাগানের মধ্য দিয়া বিলের ধারে গিয়া পড়িতে হয়। বিলকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া একেবারে মামারা যে-ঘাটে স্নান করিতে আসেন সেইখানে উঠিতে হয়।

দিদিমা এ-পথে আসিতে চান না। আমাদের শহরের আমবাগানের শেষপ্রান্তে—বিলের উঁচু পাড়ে কয়টি বড় বড় অশ্বত্থগাছ যেখানটা দিনের আলোকে সর্ব্বক্ষণই ঢাকিয়া আছে, পথ অসমতল—একটু অসাবধান হইলে গাছের শিকড়ে প্রায়ই হোঁচট খাইতে হয়—ওইখানটায় কাহাদের বউ নাকি এক বাদল-সন্ধ্যায় জল আনিবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল। পড়িয়া সে আর উঠিতে পারে নাই। তার পর পীরপুরের এক অসতর্ক পথিক···এমনি অনেক অলৌকিক কাহিনী স্থানটিকে একাকিনী কোন পল্লীনারীর যাত্রাপথকে সুদুর্গম করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে মামার বাড়ী গিয়াছি দিদিমার কোলে চাপিয়া—আজ চলিতেছি হাঁটিয়া। দশ বছরের যে-বালক জুতা পায়ে দিয়া ছোট কোঁচা দোলাইয়া, সরু একগাছি চাঁটের বেত দিয়া দু-ধারের ঝোপঝাড় ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে াগে আগে চলিয়াছে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে বাধা দিতে ্বা দিদিমার সাহসে কুলায় নাই। গ্রীষ্মকালের বেলা, সূর্য্য ্বিতে বহু বিলম্ব। সুতরাং নিঃশঙ্কেই চলিয়াছি।

ঘাটে পৌছিবার পূর্ব্বে সেই অশ্বত্থগাছের সারি, সেই ্ধুর পথ, শিকড়-ওঠা রাস্তা। যে-কাহিনী মামার বাড়ী ্ত্যেকের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, দূরে থাকিয়া যে-াহিনীকে উপকথার মতই মনোরম লাগিয়াছে—আজ াৎ তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া, কি জানি কেন, মনে হইল, ই ঘন পত্রের ছায়ায় সুপ্ত অন্ধকারে চারি দিকে বনঝোপের ্ং আন্দোলনে বাতাসের রহস্যময় শনশনানিতে সে-হিনী আর শুধুই কৌতূহলের বস্তু হইয়া নাই।

চলার গতি থামাইয়া দিদিমাকে ডাকিব ভাবিতেছি; এমন সময় পাশের ঝোপ নড়িয়া উঠিতেই দেখি,—এক কালো মূর্ত্তি। চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই দিদিমা পিছন হইতে হাঁকিলেন—কে রে, গিরে নাকি?

মূর্ত্তি বাহির হইয়া হাসিয়া বলিল,—হাঁ-মা-ঠাকরোণ। এনারে বুঝি লিয়ে এসতেছ? উঃ বাবুর যা ভয়! শউরে বটে! দিনকতক রাখ ইখানে—ডর যাক।

—তুই এখানে কি করছিলি?

—কাঠের লেগে আইলাম।—একটু রও মা-ঠাকরোণ, তোমাদের আগুয়ে দিই।

—না রে না, তুই কাঠ গুছিয়ে নিয়ে আয়। এত বেলা রয়েছে—এই ত এসে পড়লাম।

ঘাটের ধারে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম।

প্রকাণ্ড বহুদূর বিস্তৃত মাঠ—একেবারে নীল আকাশের কোলে মাথা রাখিয়াছে। কোথাও বনরেখা নাই, অস্পষ্টতা নাই। মাঠের বুকে শ্যামল শস্যের তরঙ্গায়িত রূপ, মনে হয় সে-রূপ শস্যের নয়—মাঠের। সাদা রুক্ষ মাঠ হইলে দৃষ্টির লক্ষ্য অত দূর প্রান্তে পৌছিত না। মাঠকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া কালো জল ভরা বিল। অল্পই চওড়া—গভীরতা আছে। কেমন ছোট ছোট পানকৌড়ি অনবরত ডুব দিতেছে, আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলাম,—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠসে—
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোটসে।

কত লাল, সাদা পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, পদ্মের পাতাগুলি জলের উপর কেমন চক্ চক্ করিতেছে—ইচ্ছা করে উহার একখানি তুলিয়া আনিয়া ভাত খাইতে বসি। এদিকে হাঁটু-জলে দাঁড়াইয়া 'হিস্' 'হিস' শব্দে ধোপারা পাটের উপর কাপড় আছড়াইতেছে। ধোপানীরা ঢালু তীরের উপর কাপড় শুকাইতে দিয়া উনানে কি সিদ্ধ করিতেছে। কতক-গুলা কালো কালো লোক কঞ্চির ছিপ জলে ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। পাশে তাহাদের ছোট খালুইয়ে কত রকমের ছোট ছোট মাছ!—পা আর চলে না।

দিদিমা অনবরত হাত ধরিয়া টানিতেছেন।

—বেলা যে গেল, চ! এখনও পোয়াটাক পথ।

টানিতে টানিতে তিনি বুনোপাড়ার মধ্যে আনিয়া

এই গাঁ—নাম নবিপুর। ধূলাভরা পথ, একপাল দিগম্বর ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। পথের দু-ধারে বন-ঝোপ—কতকগুলা কুকুর শুইয়া আছে। বুনোদের নোংরা খড়-ওঠা চালা, ভাঙা দাওয়া; তেমনই ময়লা 'টেনা' পরিয়া গোল হইয়া বসিয়া জটলা করিতেছে—তাস পিটিতেছে আর তামাক টানিতেছে! দিদিমাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—কি গো ঠাকরোণ, লাত্তি বটেক?

আরও খানিকটা আগাইয়া পাইলাম কুমোরপাড়া। সারি সারি হাঁড়ি সাজানো। পোয়ানে আগুন জালিবার উদ্যোগ চলিতেছে—যত রাজ্যের কাঠের পালা আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। তার পরেই ওই বড় তেঁতুলগাছটা। ওইখান হইতে একদৌড়ে মামার বাড়ী যাওয়া যায়। মনে আছে পূর্ব্বে এই তেঁতুলগাছতলায় আসিয়াই দিদিমার কোল হইতে নামিয়া পড়িতাম। নামিয়াই দে ছুট। কলু-বাড়ীর মোড় হইতে মামারবাড়ীর দোর পর্য্যন্ত রাস্তাটিতে দিব্য এক হাঁটু ধুলা। ধুলার মধ্যে পা ঘষিতে ঘষিতে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতাম,—'কু'। তার পর দৌড় আর 'ঘস' 'ঘস' শব্দ। এমন ধুলা উড়িত যে বুড়া দাদামহাশয় দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া স্নেহভরে আমার কান দুটিতে অল্প একটু দোলা দিয়া বলিতেন—ওগো, শহর থেকে তোমাদের ধুলোভরা মালগাড়ী এল। এখন নাইয়ে ধুইয়ে শালাকে মানুষ ক'রে নাও।

বলিতাম—ইঃ, আপনি ত পাড়াগেঁয়ে।

—পাড়াগেঁয়ে! আচ্ছা শালা, বল্ দেখি তোদের শহরে এমন ধুলো আছে?

—হুঁ, অনেক।

—তোদের শহরে শেয়াল ডাকে?

—কত।

—তোদের বাড়ীর পাশে হালুম ক'রে বাঘ বেরোয়!

—বেরোয়ই ত।

—এই এত বড় বড় গাছ আছে?

—আছেই ত।

—দূর শালা—শহরে ভূত!

বুড়া হাসিতে হাসিতে ধুলাসুদ্ধই আমায় কোলে তুলিয়া লইতেন। লইয়াই চুমা একটি নহে—অনেকগুলি।

...এখনও তেঁতুলগাছ তেমনই ঝোপভরা, কলুপাড়ার মোড়ে তেমনই প্রচুর ধুলা। আমি তত শিশু নহি, শহর কি অল্প অল্প বুঝি। ধুলায় ছুটিবার লোভ আছে, ফরসা কাপড় ময়লা হইবার ভয়ও আছে। পথের শেষে কান ধরিয়া যিনি কোলে তুলিয়া লইতেন, তিনি কেবল নাই। থাকিলে বলিতাম, শহরে ধুলা নাই, শেয়াল নাই, বাঘ নাই, বনজঙ্গল নাই। ও-সব নাই বলিয়াই ত শহর—শহর! কিন্তু আশ্চর্য্য কেহ আর 'শহুরে' বলিয়া ঠাট্টাও করে না!

* * *

মামাদের অনেক শিষ্যসেবক আছে। তাহাদের অধিকাংশই চাষী। গরিব—চাষ-আবাদ করিয়া বৎসরের অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। জমিদারের প্রাপ্য মিটাইয়াও হয়ত বৎসরের শেষে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, কিন্তু রোগের আতিশয্যে সেটুকু ভরসা তাহাদের নাই। চৈত্রে যেমন খাজনার তাগাদায় সতর্ক নায়েব প্রজামহলে শাসনের বিভীষিকা জাগাইয়া তোলেন, ভাদ্রের রৌদ্রে পাতা পচিয়া ম্যালেরিয়া তেমনই নিয়মিত ভাবে হানা দেয়। চাষীর ঘর, হিসাব বলিয়া বালাই নাই। যদি বা এ-সব বাঁচাইয়াও কিছু জমিল ত কিসে খরচ করিবে যেন উহারা ভাবিয়াই পায় না। ঘটা করিয়া সত্যনারায়ণের সিন্নি দেয়, বউদের রাঙা-পাড় কাপড় আসে, নবান্নের আয়োজন, পৌষপার্ব্বণের ধুম, গাছ-প্রতিষ্ঠা এবং গুরুদের প্রণামীতে খরচ করিয়া তবে উহারা নিশ্চিন্ত হয়।

পরের দিন দুপুরবেলা দিদিমা তাড়াতাড়ি খাইয়া উঠিয়াই একখানি ফরসা কাপড় পরিলেন। গায়ে একখানা নামাবলী জড়াইয়া মামীমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—বউ, আশু রইল—একটু নজর রেখো। কাল আমি ফিরে এসে ওকে দিয়ে আসবো।

মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কি গোঁসাই-চরে চললেন? মণ্ডল-বাড়ী বুঝি?

দিদিমা উত্তর দিলেন—হাঁ। তাদের ছেলের ভাত—পরশু হাটে লোক এসে খবর দিলে। ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল। তাহ'লে যাই।

আমি দিদিমার আঁচল ধরিয়া কহিলাম—যাব।

—যাবি? কোথায় রে? এই দেখ ছেলের অন্যায় কথা। সে যে অজ পাড়াগাঁ—

—হাঁ, পাড়াগাঁ? আর এ বুঝি শহর?

—হাঁটতে হাঁটতে মাজা খ'সে যাবে। বালির রাস্তা, বন—

—তা হোকআমি যাব।—বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইলাম।

দিদিমা বিষণ্ণ মুখে মামীমার পানে চাহিয়া বলিলেন—বউ—

মামীমা বলিলেন, আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন—শুনল ত কথা! যে বাঘ পথের ধারে—গিয়ে দেখুক না মজা!

যাঘের দোহাই কার্য্যকরী না হওয়াতে অগত্যা দিদিমা রাজি হইলেন।

পাড়াগাঁর পথ চলিতে দু-ধারে অনেক কিছু নজরে পড়ে। সে-সব দিকে না-চাহিয়া চলিবার আনন্দেই দৌড়াইতে লাগিলাম।

দিদিমা যথাশক্তি পা চালাইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন— ওরে থাম, থাম, বাঁ-দিকে—বাঁ-দিকে। আবার আমতলায় দাঁড়ায়। দেখ, দেখ, প'ড়ো আম মুখে দিলে? ওরে-ও আশু—

আশু তখন আমের মিষ্টত্বে পূর্ণতোষ, কে শোনে নিষেধবাণী! সময় থাকিলে কি ফলসাগাছের পাকা ফলের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম? মাঠের জামগাছগুলি কত নীচু! কি থ'লো থ'লো পাকা জাম উহার প্রত্যেকটি শাখায়! কিন্তু এ-সবের লোভ করিতে গেলে আজ আর মণ্ডল-বাড়ী পৌছান যাইবে না। ফিরিবার মুখে দেখা যাইবে।

ঘণ্টাখানেক চলিয়া গঙ্গার তীরে খেয়াঘাটে পৌছিলাম। দিব্য বালু-বিছানো তীর—কেমন ঢালু হইয়া গঙ্গার ভিতর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। শেয়াকুল-কাঁটা দিয়া ঘেরা দু-ধারের জমি—মেলাই পটলের ফুল ফুটিয়াছে, ছোট ছোট পটল ধরিয়াছে—কি চমৎকার! হাতের নাগালে থাকিলে গোটাকতক পটল তুলিয়া দিদিমাকে দেখাইয়া বলিতাম, 'দেখ, কেমন সত্যিকারের পটল!'

মাঝি নৌকা আনিলে আমরা নৌকায় উঠিলাম। একটা লোক ছাগল লইয়া উঠিতে সে কি নাকাল! জল দেখিয়া ছাগলটার যা 'প্যা'-'প্যা' ডাক! অন্য লোকগুলি বিরক্ত হইয়া বলে—আঃ, কানের পোকা বার করলে যে!

লোকটা অপ্রতিভ ভাবে ভাঙা কাঁঠালের ডালটা ছাগলের মুখে ধরিয়া বলে—কি করি মশায়, গিয়েলাম পানপাড়ার হাটে—ন-সিকেয় যায়—এত বড় খাসী। গোপাল ময়রার কাছ থিকে ধার চেয়ে কেনলাম।

—তা গাঁতে নিয়েছ—জোলার পো। কোরবানিতে জুৎ দেবে। লোকটা হাসিতে হাসিতে গল্প জুড়িয়া দিল।

হঠাৎ মাঝি চেঁচাইয়া উঠিল—এই খোকা বাবু—পানিমে হাঁত দিয়ো না,—কুম্ভীর আছে।

দিদিমা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—সব তাতে দুষ্টুমি, হাত ওঠা।

আমি হাতখানি অল্প তুলিয়া চুপি চুপি বলিলাম, কই কুমীর? আবার স্রোতের বিপরীত দিকে হাত নামাইলাম। গঙ্গার ঠাণ্ডা জল—কেমন হাতের উপর দিয়া স্রোত কাটিয়া চলে! বেশ একটা 'কল' 'কল' শব্দ হয়। খানিক ক্ষণ রাখিলে হাত ব্যথা হইয়া উঠে। কালো জল হাতের ঠেলায় সাদা কাচের মত জলিয়া উঠে, এক খাবলা খাইয়া দেখি, বেশ মিষ্ট! কিন্তু জল তুলিতে গেলে অঙ্গুলিতে অল্পই উঠে। পা-দুখানি ডুবাইতে পারিলে···কিন্তু ওদিকে দাঁড় ধরিয়া মাঝি চাহিয়া আছে—এ-দিকে দিদিমা আমার একখানি হাত ধরিয়া ঠায় বসিয়া আছেন। যেন কয়েদীকে নৌকায় চাপানো হইয়াছে!

ওপারের মত এপার সমতল নয়। আমাদের শহরের দোতলা-সমান উঁচু পাড়, নীচে দাঁড়াইয়া উপরে চাওয়া যায় না। পাড়ের ও-পাশেই একটা মস্ত আমগাছ শিকড় বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দিদিমা সেই দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন—ওই মণ্ডলদের বাগান। চ—উপরে আর উঠবো না, একেবারে ওদের ঘাট দিয়েই যাই।

ধারে ধারে মিনিট-দুই হাঁটিয়াই ঘাট পাওয়া গেল। তালগুঁড়ি দিয়া সিঁড়ি করা। ঘাটের কিনারে বসিয়া একটি কালো বউ বাসন মাজিতেছিল। আমাদের দেখিয়া ডান হাতের মাঝখান দিয়া মাথার ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিল।

দিদিমা তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—কে, কেদারের বউ?

বউটি মাথা হেলাইয়া বলিল—হাঁ, মা-ঠাকরোণ। খোকাটি কে?

—নাতি।

—ওঃ। চন্দুদের বাড়ী 'ভাতে' এলে বুঝি? বাঃ দিব্যি খোকা। একটু দৈড়িয়ে যাও—মা-ঠাক্‌রোণ—জলে হাতটা ধুয়ে একটা পেন্নাম করি।

—থাক, থাক, জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক।···হুঁ— কালও আছি। যাব? যাব বইকি। কেদার ভাল ত? বলিতে বলিতে আমাকে লইয়া দিদিমা উপরে উঠিলেন। সেখান হইতে মণ্ডল-বাড়ী কতটুকুই বা! এই বাগান-সংলগ্ন বাড়ী—ছেঁচার বেড়া দিয়া ঘেরা—সারি সারি কয়েকখানা চালা। চালার ওধারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিতেছে; বয়স্থা গৃহিণীর শাসনের স্বর, কাঠ-চেলাইবার শব্দ—ছেলেদের কলরবের সঙ্গে মিশিয়া বাড়ীখানিকে বেশ সজীব করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, দিদিমাদের গাঁয়ের চেয়েও এই অজ-পাড়াগাঁয়ে বন কোথায়, ধুলাই বা কই? এ-ধারে ও-ধারে যে ধারেই চাও—খালি মাঠ। কোথাও কুমড়ালতায় ভরা, কোথাও ফুটি তরমুজ রাশীকৃত বিছানো, কোথাও সবুজ চারা ধানগাছের গালিচা পাতা, কোথাও বা কলাবাগান। বেড়ার ধারে কেমন ঝিঙের হলদে ফুল ফুটিয়াছে, লাল নটে শাকের জমিখানি ঠাস বুনানিতে ভরা। না, চমৎকার গ্রাম এই গোঁসাইচর।

* * *

বাড়ীর মধ্যে যে-ঘরখানির দাওয়ায় আমরা বসিলাম তাহা সবচেয়ে উঁচু এবং পূব-দুয়ারী। বাড়ীর অন্যান্য ঘরগুলি হইতে পৃথক; দিব্য নিকানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিমা-দর্শনকালে চারি দিকে যেমন ভিড় জমিয়া উঠে, আমাদের ঘিরিয়া তেমনই এক দল ছেলেমেয়ে বউ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। কৃশকায়া কালো বয়স্থা একটি বউ পিতলের কানা-উঁচু একখানা থালা আনিয়াছেন, গঙ্গাজল-ভরা মাজা চক্‌চকে ঘটি আনিয়াছেন, নূতন শুকনা গামছাও একখানি তাঁহার কাঁধে রহিয়াছে। আমাদের পায়ের কাছে বসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিলেন, দেখাদেখি সেই সমবেত জনতা আমাদের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল।

যেটুকু ধুলা পায়ে জমিয়াছিল, অতগুলি লোকের করস্পর্শে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। তার পর দিদিমার একখানি পা টানিয়া বউটি সেই কানা-উঁচু পিতলের থালার উপর রাখিলেন এবং ঘটির জল দিয়া পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ধোয়ানো শেষ হইলে নূতন গামছা দিয়া পা মুছিয়া নিজের আঁচলে সযত্নে মুছাইয়া দিলেন। তার পর আমার পালা। আমি নিজে পা ধুইব বলাতে বউটি বলিল—ওমা সে কি কথা! আমাদের ছিচরণের চন্নামেত্ত দেবা না, বাবা? তা কি হয়? নক্ষী গোপাল একটু থির হয়ে ব'সো।

আপত্তি বৃথা।

উভয়ের ধৌত পাদোদকে থালা ভরিয়া উঠিল। অতঃপর ছেলে বুড়া মিলিয়া সেই ময়লা জল পরম পরিতৃপ্তিতে মাথায় ঠেকাইয়া খাইয়া ফেলিল—যেমন করিয়া আমরা দেব-দেবীর চরণামৃত পান করি। কে জানে, ইহারা আমাদের দেবতা মনে করিয়াছে বুঝি!

প্রথম পর্ব্ব মিটিলে বউটি করজোড়ে বলিল—কি সেবা হবে, মা? ঘরে ঘি-ময়দা মজুদ, তরকারির মধ্যে পটল আছে, ভাল মিষ্টি ত নেই।

দিদিমা বলিলেন—মিষ্টি কি হবে লা, ঘরের গুড় আছে ত?

বউটি ঘাড় নাড়িল—হুঁ, খাঁড় (আকের) গুড় আছে।

—ওতেই হবে।

—আর মা, তোমার আভী (রাঙা গরু) বিইয়েছে—আমি গাঙে একটা ডুব দিয়ে এসে গাই দুইবো। হেই মা একবারটি উঠে দেখ না—বিছানা-টিছানা সব ঠিক আছেন কিনা। সেই পোষ মাসে এয়েলে কেচেকুচে তুলে আকলাম।

—হেঁমা, খোকার নাম কি?—

—আশু।

—রাশু? তা বেশ, বড় মেয়ের ছেলে বুঝি? দিব্যি খোকা—আজপুত্তুর।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁলা বউ, তোর দেওরের বিয়ে দিবি কবে?

—আর মা, বলিয়া বউ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, সোমত্ত বয়েস—বাড়ী আসে না আত্তিরে। এত চেষ্টা-চরিত্তির—মরদ একবার ইধারে মাথা চালে, একবার উধারে। স্বর আরও একটু নামাইয়া বলিল, জানই ত সৈরভী জেলেনীকে, শুনিছি গাছচালা জানে—মানুষ বশ করবে তার আর আশ্চর্য্য কি! বলিয়া বউ গালে হাত দিল।

দিদিমা বলিলেন—আচ্ছা আজ আসুক, আমি ব'লবো।

—ব'লো, মা, ব'লো, তোমাদের আশীব্বেদে যদি মত্তি-গতি ফেরে। মোদের মা হাঁকাই মেরে ওঠে। তোমার বড়ছেলের দুস্‌কুই ত ওই। বলে, বউ—নাঙল ধরবো কোন্ হাতে? গুয়োটা যদি কথাটা শোনে ত মোদের মোয়াড়া নেয় কে? নেখন! বলিয়া কপালে হাত দিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

আর দুটি বউ—মেজ এবং সেজ—পাশে বসিয়াছিল। রং কালো হইলেও বড় বউয়ের মত রোগা নহে, বেশ মোটা-সোটা। হাতে রূপার পৈঁছা, রূপার খাড়ু, কপালে উল্কি। দিদিমা মেজটির পানে চাহিয়া বলিলেন—পৈঁছে নতুন হ'ল বুঝি?

মেজবউ আহ্লাদে একমুখ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল—হেঁমা, আর দিদির গোট।

বড়বউ হাসিয়া উঠিল—মুখে আগুন মোর, বলতে ভুলে গিছি মা। এই গোট মা, গেলবার কোষ্টা (পাট) বেচে কিছু হয়েলো; তোমার ছেলে বললে, কে কি নেবা বল্? আমি বললাম, বয়স ভারি হয়েছে গোট দ্যাও, মেজোরে দ্যাও পৈঁছে। সেজ সাধ ক'রে নিলে খাড়ু।

—তা বেশ হয়েছে। গতর সুখে থাক, ভোগদখল কর। তা কর্ত্তাদের কি হ'ল?

—কার আর কি হবে মা! ন-কত্তা কিনেলো ছাইকেল। ও ত মারমুখো—সে-ও তেরিয়া। মাথা-ফাটাফাটি হয় ব'লে বললাম—হয় ধার হোক ছেয়ের ছাইকেল ওরে দ্যাও। উই দ্যাখ, মা—ঠ্যাং ভেঙে চালের বাতায় ঝোলছেন উনি।

—ও মা গো, এক গাদা টাকা নষ্ট করলি? তোরা চাষ করবি—তোদের এ-সব মত্তিগতি কেন?

—নল্লাটের নেখন। বলিয়া বড় বউ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

দিদিমা কি কথা বলিবার আগে মেজবউ বলিল—এস মা, ঘর দেখবা।

দিদিমার সঙ্গে আমিও উঠিলাম।

পূবে অল্প একটু মোড় ফিরিতেই দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড এক দাওয়া। দাওয়ায় এক সারিতে চারি খানি ঘর। ঘর-গুলিতে দেখিবার এমন বিশেষ কিছু নাই। ঢুকিবার দুয়ার বিচিত্র আলিপনায় ভরা। সাদা পিটুলি-গোলার ধারায়, হলুদের আর লাল সিঁদুরের ছাপে চৌকাঠ বিচিত্রিত।

ঘরের মাটির দেওয়ালেও হলুদ আর সাদা পিটুলির আঁক। কড়ির আলনা, কুলুঙ্গীতে মাটির পুতুল ; পেতে, ধামা, কুলা, ধান ও আনাজপাতিতে ঘর ভর্ত্তি। একখানা করিয়া তক্তাপোষ পাতা। আর যে কি আছে ভাল করিয়া নজরে পড়ে না। ঘরের ঐ একটি মাত্র দুয়ার, জানালা নাই, কিন্তু গ্রীষ্মকাল হইলেও ঘরের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা। কোন ঘরে নক্সা-করা কাঠের সিন্দুক আছে, কোন ঘরে জলচৌকীর উপর ঝক্‌ঝকে সাদা কাঁসার বাসন সাজানো। কাঁথা বালিশগুলি পরিষ্কার। মাটির হইলেও ঘরের মধ্যে বা দাওয়ায় কোথাও ধুলা জমিয়া নাই বা কোথাও ভাঙাচোরা নহে। পশ্চিমের দাওয়া একটু দূরে—সেখানিতে রান্না চলে। উত্তরে গোয়াল-ঘর। বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান, কোথাও জঞ্জাল জমিয়া নাই, একটা দূর্ব্বাও অঙ্কুরিত হইতে পায় না। কেবল আমাদের পুব-দুয়ারী ঘরের দাওয়ার পাশে মাটির মঞ্চে স্বাস্থ্যবান্ এক তুলসীগাছ—প্রভাতের জলসিঞ্চনে পরিপুষ্ট ও সন্ধ্যার দীপালোকে দীপ্তিময়।

ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিবার স্পৃহা এ-বাড়ীর কোথাও নাই। অথচ নিঃশব্দে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ছাড়া কি-ই বা বলিতে পারি। প্রকাণ্ড উঠানে বড় মরাইটি ঘিরিয়া যে চারিটি ছোট মরাই রহিয়াছে উহার কোনটিতে মুগ, কোনটিতে কলাই বা মুসুর। ঘরের দাওয়ায় স্তূপীকৃত আলু, পেঁয়াজ, সরিষা, ফুটি, কাঁকুড় ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর কোন্ দ্রব্যটিরই বা অভাব ? বলদ ছাড়া আট-দশটি গাভী, ছোট গোয়ালে কতকগুলি ছাগলও ডাকিতেছে। এইমাত্র পুকুর হইতে জোড়া-দশেক হাঁস 'প্যাঁক' 'প্যাঁক' শব্দ করিতে করিতে উঠানের উপর দিয়া গোয়ালের পাশে দর্মাঘেরা কুঠুরিতে গিয়া ঢুকিল।

রান্নাঘরের পাশে ঢেঁকিঘর। দমাদম শব্দে ঢেঁকি পড়িতেছে। কাল ছেলের ভাত, আনন্দ-নাড়ুর চাল কোটা হইতেছে। এত ক্ষণ দিদিমা আসেন নাই বলিয়া এই সমস্ত কাজে পূর্ণোদ্যমে উহারা লাগিতে পারে নাই। একছুটে বাহিরটাও দেখিলাম।

প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সামনে হাল, লাঙল এবং খানদুই গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে। দাওয়ায় বসিয়া মুনিষজন তামাক টানিতেছে. আর সামান্ত কথায় হাসির ঢেউ তুলিতেছে। বাড়ীর লাগাও পুকুর। আমাদের দেশে ডোবা বলি—উহারা বলে পুকুর। জ্যৈষ্ঠের দিন বলিয়া হাঁটুভোর জল উহাতে আছে। তবু শোনা গেল এ-অঞ্চলে উহাই নাকি বড় পুকুর! অনেকগুলি ফাল্গুনেই ফুটিফাটা হইয়া যায়—চৈত্রে জলবিন্দুও খুঁজিয়া মিলে না। পুকুরপাড়ে কয়েকটা নারিকেল ও তাল গাছ। নারিকেল গাছগুলিতে তেমন তেজ নাই। নোনা জমি না হইলে ফলন নাকি তেমন হয় না।

চাষাদের ছেলেগুলি যেমন কালো তেমনি রোগা, কিন্তু কথাবার্ত্তাতে অকপট। বেশ একটু গ্রাম্য টান আছে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন অনেক গাছ চিনাইয়া দিল যাহার অভিজ্ঞতা লইয়া শহরের আত্মম্ভরী ছেলেগুলিকে অনায়াসে ঠকাইয়া দিতে পারি।

খেজুর গাছ দেখাইয়া বলিল—শীতকালে আসিলে পেট-ভোর রস খাওয়াইয়া দিতে পারিত, এখন মাঠে কি-ই বা আছে। তখন ক্ষেতে ক্ষেতে মটরশুঁটি, ছোলার শুঁটি, আক প্রচুর পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়িলে এত বড় বড় শাঁকালু বাহির হয়। মূলা তুলিয়া খাইতেও কম মজা নহে। ছোট ঝাঁকড়া গাছগুলিতে কেমন সুন্দর কুল পাকিয়া থাকে। এখন খালি ফুটি আর তরমুজ।

মাঠের মাঝে বসিয়া তরমুজ ভাঙিয়া খাইলাম। কি মিষ্ট, কেমন ঠাণ্ডা জল। কতক খাইলাম, কতক ফেলিলাম। এমন করিয়া প্রকৃতি মা'র কোল হইতে জিনিষ উঠাইয়া লইয়া খাইতে যা তৃপ্তি! কাপড়ে ধুলা লাগিয়াছে, তরমুজের জল মুখ বাহিয়া জামা ভিজাইয়া দিয়াছে, চলিতে চলিতে পা-ব্যথা হইতেছে, সন্ধ্যা অত্যাসন্ন—তবু এই অজানা সীমাহীন মাঠে অজানা সঙ্গীর সঙ্গে কলরব করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে এতটুকু আশঙ্কা, ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, এমনি করিয়া সারা রাত্রি সারা মাঠখানিতে ঘুরিয়া বেড়াই, এমনি করিয়া অনর্গল বকিয়া যাই, ভূমি হইতে খাদ্যকণা খুঁটিয়া খাই, আর না-ঘুমাইয়া ওই তারাভরা আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকি!

* * *

ফিরিয়া দেখি, আমার খোঁজে চারি দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। লণ্ঠন জ্বালিয়া কর্ত্তারা বাহির হইতেছেন, সোরগোলে কান পাতা দায়। দিদিমা কেবল 'হায়' 'হায়' করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। আলো ফেলিয়া কর্ত্তারা ছেলেগুলিকে ধরিয়া প্রহার দিল—আর কি সে অকথ্য গালাগালি! বড়কর্ত্তা আমাকে দু-হাতে মাথার উপর তুলিয়া একবারে বাড়ীর মধ্যে দিদিমার সম্মুখে আসিয়া বলিল—কেমন গা মা-ঠাকরোণ, ইনিই-ত? এনার জন্তে ছেলেগুলোকে আজ খুন করলাম না, নইলে চাষার আগ (রাগ) জানই ত!

দিদিমা আমায় খুব খানিকটা বকিলেন ; কি করিব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সে বকুনি হজম করিলাম। বাহিরে রোরুদ্যমান বালকগুলির বেদনায় বুকটা কেমন মোচড় দিয়া উঠিল। আহা! আমারই জন্য ত বেচারীরা মার খাইল।

বড়কর্ত্তা দাওয়ার উপর বসিল। জোয়ান চেহারা, কিন্তু বড় কর্কশ। কালো দৈত্যের মত ঝাকড়া চুলে ভরা মাথা, মস্ত গোঁফ, চওড়া হাত, কথাগুলি পর্য্যন্ত মিষ্ট নহে। দিদিমা দিব্য হাসিয়া কথা কহিতেছেন, আমি মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিলাম।

—বোঝলে মা, এবার ভুঁই কিছু বেরিয়ে (বাড়াইয়া) নেলাম। বোল বিঘেয় আলুর চাষ দেব ভাবছি। নীলে অয়েছে, অল্প অয়েছে—বলে ভাবনা কি, বোঝলে মা। ভাদ্দরের পাটে কিছু প্যালাম—তোমার বউরো বললেন পৈচে চাই, গোট চাই, খাড়ু চাই। বললাম, নে বিটি তোদের গব্বেই যাক। খড়কুটো বেচে কিছু জমেলো, ন-কর্ত্তা ছাইকেল কিনলেন। কলুইয়ে এবার যা নাভ হয়েছেন—খোকার ভাতে ঘটা ত হোক।—তার পর আ'শ, আমন ধান আছে, গুড় আছে, পাট আছে; মনে করছি একটা মন্দির পিতিষ্টে করবো, বুঝলে মা। গাঙের অবস্থা দেখলে ত। উনি আমাদের বাগানের আধখানা নিয়েছে, আসছে বার্ষেয় বাকিটুকু থাকবেন না। তাই ভাবছি কোশটাক দূরে ওই হিজুলীতে গিয়ে এবার চালা বাঁধবো। বাপ-পিতেমোর ভিটে, বুঝলে মা, তা দেবতার মন্নি মনিষ্যিতে কি করতে পারে। তেনারা দিয়েছে—তেনারাই নিক।—বলিয়া মণ্ডল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দিদিমা বলিলেন—ভাল ক'রে পূজো-আচ্ছা দে, দেবতা মুখ তুলে চাইবেন বইকি।

—ছুত্তোরি দেবতা! ও সুমুন্দিরা কারও ভাল দেখতে পারে! গেল বার দেই নি জোড়া-পাঁঠা? অক্তে (রক্ত) মাটি ভিজে জবজবে। জষ্টিতে পূজো খেলেন আর আষাঢ়ে বাগানে ঢোকলেন। ছুত্তোরি দেবতা!

—এবারেও ভাল ক'রে পূজো দে, বাবা।

—দেবই ত। ওই গোয়ালে চারটে পুরুষ্টু কালো পাঁঠা, দেখি—বেইমানি কাণ্ড! পূজো খেয়েও যদি বাগান পানে ঝোঁক ধরেন ত নাতি মেরে এই ছাউনি উপড়ে ওই হিজুলীতে গিয়ে ওঠবো—দেখব ওনার জারিজুরি কত!

—তা হাঁরে, আগে নবার বিয়েটা ত এ ভিটে থেকে দিয়ে যা।

মণ্ডলের গলার স্বর আগ্রহে উত্তেজিত হইল—তোমারে বললে নাকি কিছু! করবে বিয়ে?

—করবে না, বয়েস ত হয়েছে।

—বয়েস-কাল বলেই ত ওনার ছড়াদ্দর জোগাড় ক'রে একেছি। গুয়োটা শোনে কই?

—ছিঃ! ভাইকে ও-কথা বলতে আছে?

—সাধে বলি, আগে পিত্তি জলে যায়। বলবো কি মা-ঠাকরোণ—নিতাইয়ের অমন মেয়ে—ন গণ্ডা পণে দিতে চায়। সুমুন্দি বলে, না।

—মেয়েটির বয়েস কত?

—এজ্ঞে একটু বেশীই—এই ন পেরিয়ে দশে পড়েছেন। তাই কি ওই বিটিদের মত গায়ের অং, যেন বেলেডাঙার দুগ্‌গো পিত্তিমে!—

—ওই মেয়েই ঠিক কর, আমি মত করাবো। এই মাত্র এসে আমায় প্রণাম ক'রে গেল। বিয়ের কথা বলাতে বললে—দাদারে ব'লো—আমি রাজী।

—হ্যাঁ, আজী? ও হারামজাদী মাগী, দেখ কত্তা নেই—দুমদাম ঢেঁকিতে পার দিচ্ছেন!

—ওরে মাগী—ইদিকে আয়—আজ তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। তুই আমায় জানাস নি!

ঢেঁকিশাল হইতে উত্তর হইল—মর ভাগাড় মর—মা-ঠাকরোণ অয়েছেন না? তোর কি একটু নজ্জা নেই—হায়া-খেকো! ওনার সামনে কি গাঁ মাথায় ক'রে বলবো, ও গো—তোমার ভাই পিণ্ডি গিলবে গো গিলবে।

মণ্ডল আর কিছু না বলিয়া দিদিমার পায়ের উপর শুইয়া পড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ, বাঁচালে মা-ঠাকরোণ।

—তা, চন্নু—ছেলের কি নাম রাখলি?

—পুৎঠাউর বললেন, আমনিবাস।

—রামনিবাস! তা বাপু, যা তোদের মুখে বেরোয় এমন নাম রাখলেই ত হ'ত।

—কিন্তু মা-ঠাকরোণ—উনি যে হয়েছেন আমের মত। এমনি কোঁদা কাঁদা (মোটাসোঁটা) নবদুব্যোদল শ্যাম।

দিদিমা হাসিতে লাগিলেন।

দিদিমা সারা রাত্রি জাগিয়া আনন্দনাড়ু ভাজিলেন। মোড়লরা কয় ভাই দাওয়ায় বসিয়া কত কি বকিতে লাগিল। বউয়েরা এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিয়া ফায়ফরমাস খাটিতে লাগিল। ছেলেরা নাড়ু খাইয়া খানিক ছুটাপাটি করিল, তার পর দাওয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। গরম লুচি, পটল-ভাজা, এক বাটি দুধ ও মিষ্ট খাইয়া আমিও আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে শুইলাম। অজানা জায়গা, একলা বহুক্ষণ ঘুম আসিল না। ভাবিতে লাগিলাম, বেশ জায়গা, স্কুল নাই, পড়ার তাড়া নাই, সময়ানুবর্ত্তিতায় ছুটাছুটি করিতে হয় না। সকালে উঠিয়াই ছেলেরা ছোটে মাঠে—সারা দিন খেলিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা পাইলে ক্ষেতের ফল তুলিয়া খায়, পুকুরের জলে ঝাঁপ খায়, দুপুরে ভাত খাইতে বসে, না ঘুমাইয়া আবার ছোটে মাঠে—কত দূর—যেখানে নীল আকাশ জমির কোলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কেহ বারণ করিতে নাই, বকিতে নাই। খালি সাদা মাঠ আর খোলা আকাশ; ছায়া নাই, তাপ নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই! বলা বাহুল্য, গ্রীষ্মের অপরাহ্নটুকু বেড়াইয়া এই স্নিগ্ধ ভাবটুকু চিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইয়াছে!

* * *

পরদিন সকালে উঠিয়া যে আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, সারা গ্রামখানি আজ মোড়ল-বাড়ী পাত্তা পাড়িবে। প্রকাণ্ড এক তাগাড় কাটা হইল—একসঙ্গে

আট-দশটি হাঁড়ি চাপিতে পারে। শুনিলাম মণ-কয়েক চাল রান্না হইবে। মোড়লদের একখানি বড় ঘর খালি করিয়া এ-ধার ও-ধার কলাপাতা বিছাইয়া দিল—পাতার উপর ফরসা চাদর পাতিল—উহার উপর ভাত ঢালা হইবে। ডাল ঢালিবার জন্য প্রকাণ্ড দুইটা জালা আনান হইল। রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, ছয় মাস অন্তর জাগিয়া কুম্ভকর্ণ এমনই আহার করিয়া থাকেন। আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, না জানি কোন্ কুম্ভকর্ণের জন্য চাষা-গাঁয়ের এই বিপুল আয়োজন!

যাহা হউক, ভোজের সময় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এক-এক জন লোক যাহা খাইতেছে তাহা দেখিবারই মত। শুধু ভাত শুধু ডাল তিন-চার থালা দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল—তরকারি পাতে পড়িতেছে ত কথাই নাই! আর সে কি তরকারি খাওয়ার ঘটা! আমাদের বাড়ীতে দশ-বার জন দু-বেলায় যে এক কড়াই তরকারি খাইয়া থাকে উহারা এক-এক জনে অনায়াসে সেই পরিমাণ তরকারি খাইয়া বলিতেছে, আন্না যা হয়েছেন উত্তম। আর একটু সুক্তুনি দেও ত মা-ঠাকরোণ।

সন্ধ্যা হইতে আর ঘণ্টাখানেক দেরি আছে—এমন সময় দিদিমা বলিলেন—আশু, জামাকাপড় পরে নে, আজই আমরা যাব।

মোড়লরা কি যাইতে দেয়।

—হেই মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আর একটা দিন থেকে যাও। সেবা হ'ল না, যত্ন হ'ল না—ছিচরণে দুটো কথা হ'ল না। হেই মা—

পুনরায় শীঘ্র আসিবার আশ্বাস দিয়া দিদিমা বিদায় লইলেন। বড় মোড়ল আমায় কাঁধে চাপাইয়া কহিল—চলেন খোকাবাবু। কাঁধে উঠিতে কেমন লজ্জা বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু মোড়ল নাছোড়বান্দা! খেয়ার নৌকায় চাপাইয়া আমাদের প্রণাম করিয়া মোড়ল বলিল, আবার আসবা ঠাকুর। শীতকালে খেজুর অস, পাটালি গুড় খাওয়াবো। ওরে কানাই সঙ্গে যা। এই মুগ আধ মণ কলুই আধ মণ আর আনাজগুলো মা-ঠাকরোণের বাড়ী পৌঁছে দে গা। এই গাঁঠরিটা নে—বস্তোর আছে। কুমড়ো দুটো দেতাম—তা, মা কি বইতে পারবা?

—খুব পারবো।

—তবে হেই মাজিভাই দাঁড়া—একদৌড়ে কুমড়ো দুটো এনে দেই।

মোড়ল ছুটিয়া চলিয়া গেল ও দুটা বড় বিলাতী কুমড়া আনিয়া নৌকার উপর রাখিয়া পুনরায় প্রণাম করিল। —আর মা, এই পাঁচটা ট্যাকা আমাদের দেবতাকে পুজো ও গো। তোমার মদনগোপাল ভারি জাগন্ত দেবতা গো। সেবার ওনারে মানত ক'রে একগাছ কাঁঠাল হয়েলো, কিন্তু এমনি আলিস্যি ধরলো, যাই-যাই ক'রে যেতে পারলাম না। সেদিন মোরে স্বপনে বললেন, তোর কাঁঠাল খাওয়ালি নে ব্যাটা, দেখ শেয়ালে খেয়ে গেছে। ওমা, সক্কালে উঠে দেখি—বড় আটটা কাঁঠাল শেয়ালে আর কিছু আখে নি গো। মনে মনে ঠাকুরের কাছে নাক-কান মললাম।

মোড়লের কথার মাঝেই নৌকা ছাড়িল।

লোকটা দেখিতে কুশ্রী হইলে কি হয় মনটি ভারি সাদা।

* * *

দ্বিতীয় বার যখন মণ্ডল-বাড়ী যাই—সে পাঁচ বছর পরের কথা। দিদিমা বুড়া হইয়াছেন—একা যাইতে কষ্ট হয়, আমাকেই সঙ্গী লইলেন। মামার ছেলেরা বড় দুরন্ত—বুড়ীর পিছনে লাগিয়াই আছে। বুড়া হইলেই ভুলভ্রান্তি মানুষের পদে পদে ঘটে। সেই ভুলের সুযোগে উহারা এমন ঠাট্টা করে যাহাতে দিদিমা সময়ে সময়ে কাঁদিয়া ফেলেন। সেই জন্য দিদিমা উহাদের সঙ্গে লইতে চান না। আমার ছুটি অবশ্য দুই দিন। আজ গিয়া কাল সকালে ফিরিতে পারিব। সুতরাং রাজী হইলাম। আরও গঙ্গার ধারে সেই পাঁচ বছর আগে দেখা গ্রামখানি কল্পনায় বেশ একটু রং ধরাইতেছিল।

সমস্ত পথ এবং পারঘাটা সহসা এমন বদলাইয়া গেল কেন? পাঁচ বছরে অনেক রং ফিকা হইয়াছে—রূপের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পথের ধুলায় মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

পার হইয়া বলিলাম—গঙ্গার ধারে ধারে চল, দিদিমা, সেই শেকড়-বার-করা আমগাছটার ধার দিয়ে উঠবো।

দিদিমা হাসিলেন—আ আমার কপাল! সে আম-বাগান কি আর আছে—গঙ্গার মধ্যে! মোড়লরা এক কোশ দূরে উঠে গিয়েছিল, গঙ্গার এমন কোপ সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

মুহূর্ত্তে সমস্ত গ্রাম-সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গেল। এখনও আধ ক্রোশ ধুলা ভাঙিয়া হাঁটিতে হইবে!

কি আর করি পারে উঠিয়া হাঁটিতে লাগিলাম!

সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আছে, মাঠে প্রচুর ধান ফলিয়াছে। অগ্রহায়ণের অল্পায়ু অপরাহ্নে মাঠে মাঠে সোনার সূর্য্যরশ্মি। ফিঙে পাখীর কাকলি ধানভরা ক্ষেতের উপর আশীর্ব্বাদের মত ভাসিয়া চলিয়াছে। চাষী বসিয়া তামাক টানিতেছে আর এই পরম সম্পদভরা ক্ষেতের পানে চাহিয়া গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে।

আমার মন বছর-পাঁচেক পূর্ব্বে মোড়ল-বাড়ীর চালা-ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছে। কোথায় সে কোলাহল? সম্পন্ন সুসমৃদ্ধ গৃহস্থালীর শতমুখোৎসারিত জীবন-চাপল্য? কোথায় সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তুলসী-মঞ্চের স্নিগ্ধ দীপালোক [illegible]

মতই সুকোমল হইয়া উঠিবে—দীপের আলোয় দিদিমা কম্বল পাতিয়া বসিবেন—আর সম্মুখে পুরাণ-কাহিনী শুনিতে ভক্তিমতী পল্লীনারীরা স্তব্ধ বাক্যে করজোড়ে আঁচলে পা ঢাকিয়া বসিবে? শত রকমের সরল প্রশ্ন—নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকাশ যাহাতে পরিস্ফুট—তেমন ধারা প্রশ্নে দিদিমার কাহিনীকে তাহারা শতবার বাধা দিতে থাকিবে। দিদিমা বিরক্ত হইবেন, আবার হাসিয়া বাধাপ্রাপ্ত কাহিনীর সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইবেন।

বহুদূর হাঁটিয়া অবশেষে মোড়ল-বাড়ী পাইলাম।

এতটা সঙ্কীর্ণ স্থানে উঁহাদের কেমন যেন খাপছাড়া বোধ হইল। কুঠরিগুলি তেমনই দক্ষিণমুখী, কিন্তু আয়তনে ছোট—দাওয়া সঙ্কীর্ণ। দাওয়ায় ও ঘরে তেমন মুগ কলাই বা ধান চালের ছড়াছড়ি নাই;—ছোট গোয়াল-ঘর। হাঁসের 'প্যাঁক' 'প্যাঁক' শব্দ বা ছাগলের তীব্র ধ্বনি শুনিলাম না। ঢেঁকিশালে সেই বড় ঢেঁকিটাই আছে, উঠানের মরাই সংখ্যায় ও আয়তনে কমিয়া গিয়াছে। কতটুকুই বা উঠান। আমাদের পূবদুয়ারী ঘরটি তেমনই আছে;—আলনায় গুরুর জন্য অস্পর্শিত শয্যা, গুরুর ব্যবহারোপযোগী জিনিষগুলি স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা। তেমনই পদপ্রক্ষালনের আয়োজন ও পাদোদকগ্রহণ।

কিন্তু বড় বউয়ের মুখের হাসি স্তিমিতপ্রায়। রুগ্নমুখে কতকগুলি শিরা প্রকট হইয়াছে। মেজ ও সেজ বউ আর তেমন স্বাস্থ্যবতী নাই। হাতে পৈঁছা, খাড়ু সবই আছে, কেবল বিষণ্ণ চাহনিতে ও ধীরমন্থর চলনে এমন একটি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা পূর্ব্ব সম্পদের ভগ্নশ্রী মাত্র।

ততগুলি প্রফুল্লমুখ ছেলেও দেখিলাম না।

ছেলেগুলি অতিরিক্ত রুগ্ন। দেহের কালো রং কেমন যেন ফ্যাকাসে, মুখগুলি জ্যোতিহারা। রুগ্ন, দুর্ব্বল; তেমন করিয়া উঠানে লাফাইতে ত পারেই না, কথা কয় কেমন গম্ভীর ভাবে—মাথা নাড়ে বিজ্ঞের মত। এ কোন্ মণ্ডল-বাড়ী দিদিমা আমায় আনিয়া ফেলিলেন? একটি ছেলেকে পরিচিতবোধে কহিলাম—ষষ্ঠী না? মাঠে যাবি? ছেলেটি মাথা নাড়িয়া বলিল—না গো ঠাকুর; ঠাণ্ডি লাগবে। কাল সক্কালে যাব, মোদের যে ম্যালোয়ারী হয়েছে।

বলিলাম—বেশ ত, বেশী দূর কেন, ওই মাঠটাতে একটা খেজুরগাছ দেখলাম—রস খেয়ে আসি চ।

—ও যে গরুরদের গাছ, অসের জন্যে জান দেব, ঠাকুর। কাল উই যে গো-ভাগাড়ের মাঠ—হোথাকে মোদের গাছ আছে, তোমারে অস খেইয়ে আনবো, ঠাকুর।

—কেন, এ-সব জমি তোদের নয়?

—মোদের জমি আদ্দেক গেল গাঙে, আদ্দেক আবাদ হয় না। বাবা আসতেছে—ওনারে সুদোও গা।

মোড়ল, না তাহার শীর্ণ কঙ্কাল? কেবল গোঁফজোড়াটি আর বড় চোখ দুটিতে তাহাকে চেনা যায়।

কাছে আসিয়া কহিল—কি ঠাকুর, অস খাবা? আচ্ছা। সেই আলে ঠাকুর, দু-বছর আগে আসতে পারলে না। পেরাণ ভরে অস খাওয়াতাম। মা-ঠাকরোণ, ভাল?

—হাঁ, ভাল। সবই শুনেছি, তা বাবা, একটু মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর।

—হাত্তোরি মন! দেবতার বাদ—মানুষে কি করতে পারে। গাঙে ঘর গেল, জমি গেল, ভেবেলাম মরুক গে—ভাই কটা ত আছে—বুকের জোরে নোকসান পুইষে নেব। তা এমন থানে এলাম মা-ঠাকরোণ—রোগের জ্বালায় জেরবার। ভিটে ছেড়ে এসে দুটো মাসও গেল না—বিয়ের যুগ্যি সোমত্ত ভাইটা ওলাওঠায় অক্কা পেল। শোক সামলে উঠতে-না-উঠতে ছোট মলেন পিলে জ্বরে। তার পর দেখছ ত, আমার জ্বর, মেজটার জ্বর, বউগুলো ধুঁকছেন, বাচ্চাগুলো মরমর—এ হাবাতের জায়গার মাথায় মারি ঝাঁটা। রোগে মানুষরে নড়ে বসতে দেয় না, খাটবে কোত্থেকে?

—আহা!

—আবার সব্বনাশী এয়েছেন। মণ্ডলের ভিটে বড় মিঠে কিনা—এয়েছেন। আর দুটো বছর সবুর করবেন না, দেখ নি ত বার্ষেকালে। ভিটে যায়-যায়। মরণ হয় ত বাঁচি মা, নইলে বাস উইটে যাই কোথায় বল ত?

—তাই ত, এবার না হয় বেলেডাঙ্গায় যা। দেবতার কোপ!

—কোপ! কোপ কিসের! পূজো পান না! পাঁঠা যে কত দিয়েছি—অক্তে মাটি লাল হয়ে গেছে।—তা নয়, আমাদের খাবে—সব্বনাশীর ঝোঁক। তা খা, পাঁঠা আর দিচ্ছি নে—আমাদের খা। উ-হু-হু—আবার বুঝি কাঁপুনি এলেন। বউরে বউ—কাঁথা খানা দে, বড্ডা শীত—কাঁথাখানা দে। ওরে ভুবন রে—ভুবন, ওই পচ্ছিমের মাঠ থেকে ঠাকুরের জন্যে এক কলসী অস এনে দিস। উ-হু-হু—বড্ডা শীত—অস এনে দিস রে, অস এনে দিস।

মোড়ল কাঁথার মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

খানিক পরে সেজবউ আসিয়া দিদিমার কাছে বসিল ও ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

দিদিমা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁলা হাসছিস যে?

সেজবউ হাসিতে হাসিতে বলিল—মা-ঠাকরোণ, একটা কথার জবাব দাও ত। আসকে পিটে গড়বার সময় যদি কেউ বলে

কুটীর

শ্রীললিতমোহন সেন

চিত্রাধিকারী শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাদা শুঁড়ি বকের পাক
যেমন শুঁড়ি তেমনি থাক।

তাহলে সে কথা ফলে ?

—ফলে বইকি। ওযে পিঠে-খারাপ-করা মন্তর।

—ফলে ? ফলে ?—হি-হি-হি।—দিদি বলে মিছে কথা। ফলেই ত।

সাদা শুঁড়ি বকের পাক—
যেমন শুঁড়ি তেমনি থাক।

বলেলাম, ফলে গেল।—এক্কেবারে কাঁচা পিঠে—ভ্যাত-ভেতে চাল। যেমন খাওয়া, অমনি মা ওলাবিবি এলেন। উঃ মাগো।

হঠাৎ তীব্র একটা চীৎকার করিয়া সেজবউ সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

মেজবউ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হ'ল, মা ?

পিঠে খাওয়ার কথা ব'লছিল।

মেজবউ বলিল—কি একটা ছড়া বলে। যাক, তুমি বলেছ ত মা, মিথ্যে কথা !

হতভম্বের মত দিদিমা বলিলেন—তা ত জানি না, মা, ব'ললাম সত্যি মন্তর।

মেজবউ কপালে করাঘাত করিয়া কহিল—সব্বনাশ করেছ, মা। ন-দ্যাওর যেদিন মরেন, তার আগের দিন ছেল পিঠে-পার্ব্বণ। বড়দি পিঠে ভেজেলো কাঁচা-কাঁচা, ওই আবাগী নাকি চুপি চুপি পিঠে-খারাপ-করা মন্তর পড়েলো। দ্যাওর এল মাঠ থেকে, বলে বড্ডা খিদে—পিঠে দে। বড়দি বললো দাঁড়া ভাল পিঠে ভেজে দিই। শোনলে না মা, সেই কাঁচা পিঠে গুড় দিয়ে খেলে। সেই আত্তিরে ভেদবমি—

আঁচলে চোখ মুছিয়া মেজবউ বলিতে লাগিল—দ্যাওর ম'লো—সেজবোর হ'ল মাথা খারাপ। যাকে পায় সুধোয়, হ্যাগা সত্যি ? মন্তর ফলে ? আমরা বলি, না।

—তাই ত বউ, আমি ত কিছুই জানি নে। দেখ, তোরা ভাল ক'রে ঠাকুরের পূজো দে, তোদের ভিটে ব'দলে দেখছি নানান খানা লেগেছে। ওখানে ত রোগ-ঘোগ ছিল না, এখানে এসে একি !

—তুমি পায়ের ধুলো দাও, মা-ঠাকরোণ—সব যেন বজায় থাকে। ইদিকে ভাইরে মার-ধোর গাল দেতেন—কিন্তুক সে মরার পর সব্বাই হুপ্‌ভাঙা হয়েছে। ওই দেখ মা, ভাঙা ছাইকেল ফেলেন নি—চালের বাতায় গোঁজা অয়েছেন।

সহসা ওদিক হইতে বমির শব্দ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বউয়ের গলা,—এই ক'টি কক্‌কড়ো ভাত—নেবুর অস দিয়ে খেয়ে ফ্যাস গো খেয়ে ফ্যাল। দুরন্ত আত (রাত) গো। সারাদিন টো-টো ক'রে মাঠে ঘোরা, স্যাও—খেয়ে ফ্যাল।

—ডুঃ হারামজাদী—ওয়াক্। কাঁথা দে উ-হু-হু—চেপে ধর—ওয়াক্—

মেজবউ বলিল—আত উপুসী থাকা কি ভাল, মা-ঠাকরোণ ? ওনার বড্ডা অ্যাকারের ধাত—খেলেই ওয়াক। আমাদের ওনারা জ্বর এলেও চাড্ডি খায়। সারা দিনে গতর-জল-করা ছেরোম, না খেয়ে কে পারে, মা ?

* * *

নদীর মত এই পরিবারেও ভাঙন ধরিয়াছে। চারি দিকে ফাঁকা মাঠ, বাড়ীর নীচে খরস্রোতা গঙ্গা, আলো হাওয়ার অপ্রতুলতা কোথাও নাই, তথাপি রোগের বীজ কোথা দিয়া যে গ্রামের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়, কে বলিবে ?

পরের দিন সকালে মাঠে মাঠে বেড়াইলাম। মাঠ বহু-দূর বিস্তৃত—মুগ, কলাই, মটর অজস্র ফলিয়াছে। সুপক্ক ধানের ভারে গাছগুলি মাটির পানে হেলিয়াছে, শিস্ দিয়া গান গাহিয়া কঙ্কালসার রুগ্ন চাষী মাঠে মাঠে ফিরিতেছে। প্রভাতের সূর্য্য সোনার রৌদ্র ঢালিয়া উহাদের অভিনন্দিত করিতেছেন। কিন্তু ভিন্ন গাঁয়ে মোড়লদের জমি অল্পই। ফণি-মনসার বেড়া-দেওয়া প্রকাণ্ড মাঠ—পূর্ব্ববঙ্গের কোন মুসলমান প্রজা আসিয়া জমা লইয়াছে। তার কোলে ফল-ভারে সুসমৃদ্ধ ভূঁই সাঁওতালদের। সাঁওতালরা মজুর খাটিতে এদেশে আসিয়াছিল, আজ জমি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিয়া মহাজন হইয়াছে। স্বাস্থ্য ভাল, জমিতে দিবারাত্র লাগিয়া থাকে—যে-ফসলটি দিলে টাকা আসে তাহা উহারা ভাল রকমই জানে।

মোড়লদের জমি একটু দূরে ; খাটুনির অভাবে ফসল ভাল হয় নাই। না হউক, জমিদারের খাজনা মিটাইয়া যাহা থাকিবে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন তাহাতে অনায়াসে হইবে।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন জমিগুলির পানে চাহিয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল। মাঠে আর ভাল লাগিল না।

ফিরিয়া আসিয়া দিদিমাকে বলিলাম, বাড়ী চল।

—খাওয়া-দাওয়া না ক'রে গেলে ওরা দুঃখু করবে, বুঝলি ?

বলিলাম—তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির রাঁধ, আমার ভাল লাগছে না। এখনও মোড়লদের কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী আছে, ঘরে নলেন খেজুর গুড় আছে—দিদিমা পায়স রাঁধি-লেন। ছেলে বুড়া পরিতৃপ্তি করিয়া খাইল।

বড়বউ বলিল—মা, তোমাদের এক আন্না—কেমন ভুর ভুর ক'রে গোন্দ বেরুচ্ছে। আর আমরা আঁধি গরুর জাব। পোড়া কপাল !

আজ আর বড় মোড়লের জ্বর আসে নাই। পেট ভরিয়া পায়স খাইয়া বলিল—চল খোকাবাবু, তোমারে কাঁধে ক'রে ঘাটে পৌছে দেই। আজ গায়ে অনেক বল হয়েছে।

বলিলাম—না, থাক। আমি বেশ হেঁটেই যাব।

হাসিয়া মোড়ল বলিল—বড় হয়েছেন কিনা, নজ্জা। নোকের কাঁধে চেপে যেতে বড় নজ্জা করে, নয় গা? বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

এবারও মোড়ল মুগ, কলাই, লাউয়ের বোঝা নৌকায় চাপাইয়া দিয়া গেল। প্রণামীর টাকা দিল, কাপড় দিল এবং হাসিমুখে বলিল—মা-ঠাকরোণ গো, এবার যখন আসবা তখন উই বেলেডাঙায় গিয়ে উঠিছি দেখবা। সব্বনাশী কি মোদের থল বাঁধতে দেবেন গা!

বলিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, ওই কঙ্কালসার কর্কশ চেহারার লোকটি কাঁদিতেছে।

* * *

আরও কয়েক বছর পরে যেবার মণ্ডল-বাড়ী যাই সে-বার বেলেডাঙায় গিয়া উঠিয়াছিলাম। বেলেডাঙায়ও গঙ্গা মণ্ডল-বাড়ীর নিম্নে পাড় ভাঙিতেছিল। কিন্তু গঙ্গাকে ভয় করিবার উহাদের অবশিষ্ট কিছু ছিল না। ছোট একখানি বাগান—অর্দ্ধেকটা তাহার গঙ্গাগর্ভে—বাকি অর্দ্ধেকটায় মোড়লদের বাসগৃহ। বাসগৃহ ত বাসগৃহ! মাত্র ছোট দুখানি ঘরের কোলে ফালি একটু দাওয়া। সঙ্কীর্ণ উঠান—মরাইয়ের চিহ্ন নাই, গরু ছাগলের ডাক শোনা যায় না—এমন কি ছেলেমেয়ের কোলাহলও শুনিলাম না।

বিধবা বড়বউয়ের কোলে পাঁচ বছরের এক রুগ্ন ছেলে মণ্ডল-বংশের শেষ আশা-প্রদীপ! ঝড় এই বংশের উপর দিয়া ভাল ভাবেই বহিয়া গিয়াছে—মহীরুহ উৎপাটিত হইয়াছে, ছিন্নশাখা অর্দ্ধমৃত এই শিশুতরুমাত্র ধুঁকিতেছে!

বৃদ্ধা দিদিমার পায়ে পড়িয়া মোড়ল-বউ কত দুঃখের কান্নাই কাঁদিল। সে-সব বিলুপ্ত গৌরবের করুণ কাহিনী এখানে পুনরুক্তি করিয়া কি-ই বা লাভ?

সংসারে রোগ আছে, মৃত্যু আছে, আরও অনেক বিপদ আছে। মণ্ডল-পরিবারে একে একে সে-সবের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার শেষ এখনও হয় নাই,—এই রুগ্ন শিশু ও বিধবা রক্ষয়িত্রী তার সাক্ষ্য। গঙ্গাগর্ভে উচ্চ পাড় ভাঙিয়া পড়িয়া যেদিন মণ্ডলদের ভিটাটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে সে-দিন অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কেহ আর নয়ন অশ্রুসিক্ত করিবে না।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মোড়ল-বউ ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম আর শেষ হয় না। মণ্ডল-বংশের স্থায়িত্ব ও এই সন্তানের আয়ু প্রার্থনা করিয়া মণ্ডল-বউ তুলসীতলায় মাথা কুটিতে লাগিল। বহুক্ষণ প্রার্থনার পর বউ সেই প্রদীপ তুলিয়া লইয়া আমবাগানের মধ্য দিয়া গঙ্গার কূলে গিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ উঁচু করিয়া বউ দেবীকে সকাতর মিনতি জানাইতে লাগিল—হেই মা, মুখ তুলে চা। ফিরে যা ফিরে যা। ভিটেটুকুতে আর নোভ করিস নে মা, মুখ তুলে চা। বাড়ী ফিরিয়া বউ শাঁখে বার-কতক ফুঁ দিল।

সন্ধ্যা দেখানো শেষ করিয়া দিদিমার কাছে আসিয়া বসিল ও রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—মা গো, নিত্যি দেবতাকে বলি, ভিটেটুকু বজায় রাখ—বংশধরকে বাঁচা। হাঁ মা, এত কি মহাপাতকী মুই যে মোদের কতা শোনবেন না!

দিদিমা বলিলেন—শুনবেন বইকি মোড়ল-বউ।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে খেয়া পার হইতেছিলাম। দুটি ছোট পুঁটুলি কোলের উপর রাখিয়া মণ্ডলদের ভিটার পানে চাহিয়া ছিলাম। কাঠাখানেক (আড়াই সের) মুগ ও ছোলা আধ কাঠা;—দিদিমাও লইবেন না—মোড়ল-বউও ছাড়িবেন না—অনেক কান্নাকাটি অনুনয়-বিনয়ে দুটি পুঁটুলি ও খেয়া-পারের পয়সা লইতে হইয়াছিল।

নৌকার উপর বসিয়া অনেকে অনেক কথা বলিতেছিল। এমন সময় দূরে আমবাগানের মধ্যে প্রদীপের আলো দেখা গেল। শীর্ণকায়া মণ্ডল-বউয়ের মূর্ত্তি চোখে পড়িল না—প্রদীপটি বারকয়েক আন্দোলিত হইল মাত্র। নদী-দেবতার কাছে নিত্যকার সান্ধ্য প্রার্থনা বহিয়া যে দীপশিখা আম্র-বনাভ্যন্তরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে তাহার অন্তরালে তপঃক্লিষ্টা মঙ্গলপ্রার্থিনী বধূটিকে মনে পড়িল। দীপের আলোয়—যিনি নদীর প্রসন্নতা মাগিয়া বাস্তুদেবতার স্থিতি কামনা করিতেছেন এবং শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি তুলিয়া উর্দ্ধগ দেবতার চরণে বংশধরের আয়ু ভিক্ষা করিতেছেন।

কে এক জন সেই দিকে চাহিয়া বলিল—বউটার পূজো মা গঙ্গা নিয়েছেন। দেখ নি, এ-ধারে চড়া পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

দেবী প্রদীপের আরতি গ্রহণ করিয়াছেন, দেবতা কি মঙ্গলশঙ্খের ডাক শুনিতে পাইবেন?

শরশয্যা

বনফুল

শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

…ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন…দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি?…সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি…কলেজের স্পোর্টে সকলের সেরা ছিলাম…কিন্তু শরীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ যদি নারীত্বের মর্য্যাদা না রক্ষা করিতে পারি?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে—উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলা আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলো তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি!…দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু—ঘাপ্‌টি মারিয়া বসিয়া আছে—সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। এক জন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে…ছি, ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়—বহু সন্তরণশীল, ব্যায়ামশীল, লম্ফনশীল বীরপুরুষদের ছবি দেখি—ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেশের যৌবন চঞ্চল হইয়া ওঠে অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিত ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত না মৃত! অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম।…সাঁৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর একটা গাড়ী আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-ষ্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ষ্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এ-দেশে আর কখনও আসি নাই। চাকুরীর চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুর-মহাশয় তাঁহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরী জুটিতে পারে।

২

এই শহরে ইতিপূর্ব্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর-মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। ষ্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম—হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌঁছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন—দ্বিতলের একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়াও দিলেন। যৎসামান্য

সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বিষয়ে নবতম তথ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদের উপযোগী গ্রন্থ ছাড়া, সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য প্রণালীতে রচিত অথচ আধুনিক উচ্চজ্ঞানপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পর্য্যায়বদ্ধ গ্রন্থাবলী সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তদুপরি পণ্ডিতেরা সাংসারিক লোক ও শ্রমজীবীদিগের অবসরকালীন শিক্ষার জন্ত সরল ভাষায় বিশ্ববিদ্যা-প্রসারিণী বক্তৃতা (University Extension Lectures) প্রদান করিয়া এই সব নব জ্ঞান কলেজের বাহিরে বিতরণের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে নবোন্মেষশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যক; কারণ ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয় ভাষার সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ কালের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্ত্তমান যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রামে নব্যতম জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ মুমূর্ষু তা প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সদগ্রন্থের দ্বারা ভারতময় সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।

এই জন্য বাঙ্গলায় ও পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় "বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ" নামে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা Home University Library [হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী] এবং Cambridge Manuals of Science and Literature-এর [কেম্ব্রিজ ম্যানুয়েল্‌স্ অব্ সায়েন্স এণ্ড্ লিটারেচারের) আদর্শে রচিত হইবে।

অতঃপর মুদ্রিত হইয়াছিল এই পরিকল্পনাটির নিয়মাবলী

(১) প্রতি গ্রন্থ স্মল পাইকা অক্ষরে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২০০ হইতে ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে।

(২) প্রতি গ্রন্থের শেষে দুই এক পৃষ্ঠা ছোট অক্ষরে শ্রেণীবিভাগ করা প্রমাণপঞ্জী (bibliography) দিতে হইবে।

(৩) প্রতি গ্রন্থের মূল্য বারো আনা হইবে।

(৪) সকল বিষয়ের নবোদ্ভাবিত তথ্য সকল এই গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হইবে। গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষিত লোকদিগের বোধগম্য হইবে। দীর্ঘ সমাস ও কঠিন সংস্কৃতমূলক শব্দ অথবা প্রাদেশিক ভাষা যথাসম্ভব বর্জ্জনীয়।

(৫) সম্ভবমত বিদেশী শব্দের বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু যে সব বিদেশী শব্দ আমাদের নিকট অধিকতর সহজ হইয়াছে বা যে-সকল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বাঙ্গলা ভাষায় গ্রহণ করাই শ্রেয়, এই গ্রন্থাবলীতে তাহাই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইবে; তাহার দুর্বোধ সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইবে না।

(৬) অধ্যক্ষসমিতি এই গ্রন্থাবলীর সর্ব্বস্বত্বাধিকারী হইবেন। তাঁহারা গ্রন্থকারকে দুই শত টাকা পারিশ্রমিক দিয়া প্রতি গ্রন্থের কপি-রাইট কিনিয়া লইতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থে পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

(৭) প্রতি বিভাগের লেখকগণ সেই বিভাগের সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থ রচনা করিবেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে উক্ত সম্পাদকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(৮) "বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ" ছয় বিভাগে বিভক্ত হইবে, এবং স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্য্যনির্ব্বাহক রহিবেন।

বিভাগগুলি ও তাহাদের সম্পাদকগণ:—

(ক) দর্শন (সম্পাদক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)।

(খ) বিজ্ঞান (সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।)

(গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি (সম্পাদক শ্রীযদুনাথ সরকার)।

(ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষা (সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)।

(ঙ) কলা (সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(চ) শিক্ষাবিজ্ঞান (অস্থায়ী সম্পাদক স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ইহার পর ইতিহাস-বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার দিয়াছিলেন

ইতিহাস বিভাগ—গ্রন্থাবলী

১। ভারতবর্ষের অভিব্যক্তি—যদুনাথ সরকার।
২। হিন্দুযুগের ইতিহাস—
৩। মুসলমান যুগের "—
৪। ব্রিটিশ যুগের "—রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৫। বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৬। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ জগৎ—বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৭। দ্রাবিড় সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
৮। বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। মারাঠা " —সুরেন্দ্রনাথ সেন।
১০। শিখ " —
১১। সিপাহী বিদ্রোহ-
১২। ভারতের বাণিজ্য, প্রাচীন ও নব্য ইউরোপীয়—
১৩। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস—
১৪। ভারতীয় মুদ্রা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। ভারতীয় অর্থনীতি—যদুনাথ সরকার।
১৬। অশোক—কালিদাস নাগ এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
১৭। আকবর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। আওরাংজীব—যদুনাথ সরকার।
১৯। চৈতন্য—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
২০। রামমোহন রায়—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।
২১। প্রাচীন মিশর—
২২। " বাবিলন—
২৩। চীন—
২৪। জাপান—
২৫। গ্রীস—
২৬। আলেকজান্দার—
২৭। রোম (সীজারের মৃত্যু পর্য্যন্ত)—
২৮। রোমক সাম্রাজ্য (১৪৫৩ পর্য্যন্ত)—
২৯। ইংলণ্ড (১৬০৩ পর্য্যন্ত)—
৩০। " (১৬০৩—১৯১৭)—
৩১। ফ্রান্স—

৩২। ইউরোপে নবযুগ (১৪৫৩—১৯১৭)—
৩৩। আধুনিক ইউরোপ (১৮৪৮ হইতে)—কিরণশঙ্কর রায়।
৩৪। আমেরিকা—
৩৫। নেপোলিয়ন—
৩৬। ব্রিটিশ উপনিবেশ—
৩৭। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস—
৩৮। মুহম্মদ ও আব্বাসীয় খালিফাগণ—
৩৯। ইসলামীয় জগৎ—মিশর, স্পেন ও তুর্কী—
৪০। পারস্য—
৪১। এসিয়ার গ্রীক সাম্রাজ্য—
৪২। গ্রীক সভ্যতা, আলেকজান্দারের পরবর্ত্তী—কালিদাস নাগ।
৪৩। ঐতিহাসিক প্রণালী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৪। ভারতের অবস্থা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৪৫। প্রাচীন ভূগোল—
৪৬। ইউরোপে আবিষ্কারের যুগ, (১৪০০—১৬০০)—
৪৭। লিপিতত্ত্ব—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৮। ভারতের বাহিরে হিন্দু সভ্যতা—
৪৯। ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ—
৫০। শাসনতন্ত্র (Political Philosophy)—
৫১। ভারতের প্রাচীন ভূগোল (অভিধান)—
৫২। ফরাসীবিপ্লব (১৭৮৯—১৭৯৬)—কিরণশঙ্কর রায়।

যদুনাথ সরকার, সম্পাদক।
ঠিকানা—মোরাদপুর পোষ্ট,
পাটনা জেলা।

এই পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে ১৩২৪ সালের শ্রাবণের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল :—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহযোগিতায় "বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ" প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় দিয়াছেন। তাঁহার বিভাগের কতকগুলি পুস্তক লিখিবার ভার ইতিমধ্যেই কেহ কেহ লইয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভাগেও কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন।

কাজটি যেমন কঠিন, আংশিক ভাবে করিয়া তুলিতে পারিলেও বঙ্গদেশের পক্ষে তেমনই হিতকর হইবে। এই জন্য উদ্যোগীরা যোগ্য ব্যক্তিগণের সাহায্য পাইবার আশা করেন। এখন কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য * কিন্তু "শুভস্য শীঘ্রম্‌" নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা কাগজ সস্তা হইবার অপেক্ষা না করিয়া সত্বর দু-একখানি বহি প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থাবলীর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই; লিখিত হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু সেজন্য উদ্যোগীদিগের মধ্যে কাহাকেও দোষ দিবার নিমিত্ত এই বিষয়টি বিস্মৃতির গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করি নাই। এই পরিকল্পনাটির বৃত্তান্তে যাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছিল, উহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ার জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ দায়ী ছিলেন বলিয়া অন্ততঃ আমি অবগত নহি। এই পরিকল্পনাটি হয়ত এখনও কাহারও-না-কাহারও কাজে লাগিলে প্রীত হইব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিতে চাহিয়াছেন, তাহার সংবাদ বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু উনিশ বৎসর আগেকার এই পরিকল্পনাটির সংবাদ প্রবাসী ছাড়া আর কোন কাগজে বাহির হয় নাই কেন, তাহা বলা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহারা চালান, তাঁহারা যেরূপ বিদ্বান ও খ্যাতিমান, সেইরূপ খ্যাতিমান ও বিদ্বান লোকদের নামের উল্লেখ এই পরিকল্পনাটির বৃত্তান্তেও দেখা যায়। অবশ্য সংবাদপত্রমহলে এইরূপ একটা দস্তুর আছে বটে, যে, কোনও সম্পাদক একটা ভাল কিছু করিলে বা করিতে চাহিলে অন্য অনেক সম্পাদক তাহার খবরটা পর্য্যন্ত অনেক সময় ছাপেন না। কিন্তু আলোচ্য পরিকল্পনাটি যে একমাত্র, প্রথমতঃ, প্রধানতঃ, বা অংশতঃও প্রবাসী-সম্পাদকের মস্তিষ্কপ্রসূত, এমন কোন কথা উহার বৃত্তান্তে ছিল না। সুতরাং অন্য সম্পাদকদের এই বিষয়টির আলোচনা বা উল্লেখ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অকৃতিত্ব সম্বন্ধে যাহা অস্পষ্ট ভাবে মনে আছে, তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। আমার সেই অস্পষ্ট স্মৃতিটি এই, যে, কাজটি আমি করাইয়া লইব এইরূপ একটা অলিখিত উহ্য সর্ত্ত (understanding) ছিল। অবশ্য, আমি তাগিদ না-দিলে কেহ কিছু করিবেন না, এরূপ কোন সর্ত্ত ছিল না। আমি কেন্দ্রস্থলে তাগিদ দি নাই, ইহাও মনে পড়িতেছে। যে-কারণে তাগিদ দি নাই, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দায়ী নহেন। সেই কারণ আমার একটা ধারণা। তাহা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যদি করিতাম, তাহাতে সার্ব্বজনিক কোন হিত সাধিত হইত না।

রামমোহন রায় স্মৃতিসভা

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। প্রতি বৎসর ঐ তারিখে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে তাঁহার স্মৃতিসভা হইয়া থাকে।

* তখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক

এ বৎসরও হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সভার অধিবেশন হউক বা না-হউক, তাহাতে রামমোহন রায়ের কোন হিত বা অহিত হয় না। আমরা যদি বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন তাঁহাকে স্মরণ কৃতজ্ঞতার ও শ্রদ্ধার সহিত করি, তাহা হইলে আমাদের উপকার হয়।

এই বৎসরের সভাগুলির সংবাদের একটি বিশেষত্ব বা অসম্পূর্ণতার কারণ আমরা স্থির করিতে পারি নাই। অন্য অনেক জায়গায় যেমন স্মৃতিসভা হইয়াছিল, তেমনই গত বহু বৎসরের মত কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলেও সভা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার কোন দৈনিক কাগজে এই সভার এক পংক্তি রিপোর্টও দেখিতে পাই নাই, যদিও বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের অন্য অনেক রামমোহন-স্মৃতিসভার সংবাদ বাহির হইয়াছে।

—

রামমোহন রায়ের চাকরী-গ্রহণের কারণ

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাঁহার চাকরী-গ্রহণের কারণ আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার অনুমান এইরূপ, যে, অন্য কারণ যাহাই থাকুক, তিনি শাসন, বিচার, খাজনা নির্দ্ধারণ ও আদায় প্রভৃতি নানা সরকারী বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যও চাকরী লইয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী স্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডের ইতস্ততঃ গতির মত ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তিনি জীবনে কি করিবেন, তাহা আগে হইতেই ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়া থাকিবেন। ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়ে সংস্কার সাধন তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া মনে মনে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। রাষ্ট্রীয় নানা বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার সংস্কার সাধন করা যায় না। সেই জ্ঞান যে তাঁহার ছিল, তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়িলে তাহা জানা যায়। বিলাতী পার্লেমেন্টের অবগতির জন্য তিনি এ-দেশের বিচার-বিভাগ, খাজনা-বিভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রশ্নোত্তর রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ভ্রমরহিত ছিল। আমার অনুমান, ঐরূপ জ্ঞানলাভ তাঁহার চাকরী গ্রহণের, একমাত্র বা প্রধান না হইলেও, অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

—

রামমোহন রায়ের বিচার

আগে আগে ক্লাইব ও ওয়ারেন হেষ্টিংস সম্বন্ধে ইংরেজরা যে-সব বহি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর যে-সব বহি লিখিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিতে দোষ ক্ষালনের ও চাপা দিবার চেষ্টা আছে। ইহার কারণ, ইংরেজরা স্বদেশের প্রসিদ্ধ লোকদিগকে ভাল লোক বলিয়া জগতের কাছে উপস্থিত করিতে চায়।

আমরা আমাদের দেশের কোনও প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির দোষ চাপা দিবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে কেবল অনুমান করা যায়, প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই, সেখানে মন্দটাই অনুমান করিবার রীতি সমর্থনযোগ্য মনে করি না। মন্দটারই অনুমান মক্ষিকাবৃত্তি মাত্র।

রমাপ্রসাদ বাবু প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় (৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায়) মিঃ ক্রিস্পের একটা মন্তব্যে উল্লিখিত শোনা কথা ধর্ত্তব্য নহে বলিয়াছেন। কিন্তু, ধরুন, যদি তাহা বোর্ডের চিঠিতেই থাকিত, তাহা হইলেও তাহা হইতে রামমোহনের কোন একটা দোষই কেন কল্পনা বা অনুমান করা হইবে? রামমোহনের জীবনচরিতের আলোচক ৺ পাঠকেরা জানেন, যেমন সৌজন্য সেইরূপ আত্মসম্মানবোধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। কোনও ইংরেজের চাকরী করেন বলিয়া তাঁহার উদ্ধত, অশিষ্ট, বা অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করিবার বা অবৈধ গর্হিত আদেশ পালন করিবার লোক তিনি ছিলেন না। সেকালের (এবং একালেরও) সব ইংরেজ কর্ম্মচারী ডিগ্‌বী সাহেবের মত ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন না। অন্য রকমের কোন ইংরেজ কর্ম্মচারী রামমোহনের স্বাধীনচিত্ততা ও আত্মসম্মানবোধের জন্যই তাঁহার সম্বন্ধে 'প্রতিকূল উল্লেখ' ("unfavourable mention") করিয়া থাকিতে পারেন, ইহা কি হইতে পারে না?

রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অনেকের যে একটা উদ্ধত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাব ছিল, তাহা তৎকালীন সমর-সচিব (military

secretary) কর্ণেল ইয়াঙের প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেন্থামকে রামমোহন সম্বন্ধে লিখিত ১৮২৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের চিঠি হইতে জানা যায়। কর্ণেল ইয়াং লিখিয়াছিলেন :—

"His (Rammohun Roy's) whole time almost has been occupied for the last two years in defending himself and his son against a bitter and virulent persecution which has been got up against the latter nominally—but against himself and his abhorred principles in reality—by a conspiracy of his own bigoted countrymen; protected and encouraged, not to say instigated, by some of ours—influential and official men who cannot endure that a presumptuous 'Black Man' should tread so closely upon the heels of the dominant white class, or rather should *pass* them in the march of mind."

তাৎপর্য্য। গত দুই বৎসর রামমোহন রায়ের সমস্ত সময় অতি তীব্র ও বিদ্বেষপূর্ণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আপনার ও আপনার পুত্রের পক্ষ সমর্থনে গিয়াছে। এই উৎপীড়ন নামতঃ তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে হইলেও ইহা বস্তুতঃ তাঁহার ও ঘৃণাস্পদবিবেচিত তাঁহার স্বাধীন মতসমূহের বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। ইহা তাঁহার কতকগুলি পরমতাসহিষ্ণু ধর্ম্মান্ধ স্বদেশবাসীর চক্রান্তের ফল; তাহারা আমাদের স্বদেশবাসী (অর্থাৎ ইংরেজ) প্রভাবশালী কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর আশ্রয়প্রাপ্ত, তাহাদের দ্বারা উৎসাহিত—বলিতে গেলে—প্ররোচিত হইয়া এই (মোকদ্দমা রূপ) উৎপীড়ন চালাইয়াছে। এই ইংরেজরা সহ্য করিতে পারে না, যে, এক জন 'ধৃষ্ট' কালা আদমী প্রভুত্বশালী শ্বেতকারদের এত সমান সমান হইবে, অথবা বরং, সত্য বলিতে গেলে, মানসিক অগ্রগতিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

ইহার পর কর্ণেল ইয়াং লিখিয়াছেন, যে, নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম আদালতে যুদ্ধ করিয়া রামমোহন বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে এবং ন্যায় তাঁহার পক্ষে ছিল বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে।

কর্ণেল ইয়াং যে-সময়ে এই চিঠি লিখিয়াছিলেন, তখন রামমোহন রায় চাকরি করিতেন না এবং নানা বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া ভারতীয় ও ইংরেজ সমাজের অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বালক ছিলেন বলিলেও বলে, তখনও স্বাধীন মত প্রকাশ করায় তাঁহার পিতা ও অন্য অনেকে ভারতবর্ষে ও তিব্বতে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। চাকরি করিবার সময় তাঁহার এই স্বাধীনচিত্ততা ছিল না বা তাহা তিনি প্রকাশ করিতেন না, মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে, যে, কোন উপরওয়ালা ইংরেজ কর্ম্মচারীর তাঁহার প্রতি অসন্তোষের কারণ, তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা ও তাঁহার আত্মমর্য্যাদাসূচক উন্নত মস্তক ও ঋজু মেরুদণ্ড।

—

বঙ্গের জন্য অকৃত সরকারী কাজ

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে গবর্ন্মেণ্ট তথাকার অধিবাসীদের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, বাংলা দেশের জন্য তাহা করেন নাই ও করিতেছেন না। অথচ বঙ্গেও সেই সকল কাজের প্রয়োজন আছে এবং বঙ্গে গবর্ন্মেণ্ট অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম রাজস্ব আদায় করেন না, বরং বেশীই করেন।

বঙ্গের বাহিরে অন্য অনেক প্রদেশে গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষার জন্য—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য—যত ব্যয় করিয়াছেন ও করেন, বাংলা দেশে গবর্ন্মেণ্ট তত ব্যয় করেন নাই ও করিতেছেন না।

পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে গবর্ন্মেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থার নিমিত্ত কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। বঙ্গে তাহার তুলনায় কিছুই করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান এবং বঙ্গে—বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গে—জলসেচনের বন্দোবস্ত একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার জন্য ও জলসেচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সরকারী ব্যয়ের তালিকা আমরা আগে আগে দিয়াছি। সেই জন্য এখন দিলাম না। পরে আবার দিতে পারি।

বহু পূর্ব্ব হইতে যে-যে দিকে অন্যান্য প্রদেশে অধিকতর সরকারী ব্যয় হইতেছে, তাহার দুটি দৃষ্টান্ত দিলাম। সম্প্রতি আরও কয়েকটি দিকে অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ ব্যয় হইতেছে, বঙ্গে তাহা হইতেছে না। তাহার তিনটি দৃষ্টান্ত দিব।

কৃষিকার্য্যে ও কোন কোন কুটীরশিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রযুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে ও অল্প সময়ে কাজ হইতে পারে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে গ্রাম-অঞ্চলেও সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি জোগাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে—কোথাও কোথাও ইতিমধ্যেই হইয়াছে। এই বন্দোবস্তটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য আগ্রা-অযোধ্যা গবর্ন্মেণ্ট ঋণ লইতেছেন ও তাহা শোধ করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বঙ্গেও এই প্রকার বন্দোবস্ত আবশ্যক। কিন্তু সরকার এ-বিষয়ে উদাসীন। কোন বড় জমীদার নিজের জমীদারীর অন্ততঃ দু-একটা গ্রামেও সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার আয়োজন করুন না? সব জমীদার তো দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত বা

দেউলিয়া নহেন? গবন্মে‍র্ণ্ট যে কিছু করিতেছেন না, তাহা গবর্ন্মেণ্টের দোষ বটে, কিন্তু শুধু গবর্ন্মেণ্টের দোষ দেখাইলেই দেশের উন্নতি হইবে না।

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে নানা রকম ফল জন্মে। কিন্তু অনেক ফল এরূপ, যে, সেগুলি পাকিবার পর বেশী দিন রাখা যায় না, এবং পাকেও কেবল দু-এক মাসের মধ্যে। যদি ফলগুলি স্বাভাবিক টাটকা অবস্থায় দীর্ঘতর কাল রাখিবার উপায় হয়, তাহা হইলে যে-যেখানে সেগুলি জন্মে তথাকার লোকেরা অনেক দিন তাহা খাইতে পায় এবং যেখানে জন্মে না সেখানেও বিক্রীর জন্য প্রেরিত ও রক্ষিত হইতে পারে। সবাই জানে, গরমে ফল শীঘ্র পাকে ও শীঘ্র পচে। যদি খুব ঠাণ্ডা জায়গায় ফল রাখা যায় তাহা হইলে পাকা ফলও শীঘ্র পচে না। বরফদ্বারা ঠাণ্ডা রাখিবার ভাণ্ড, বাক্স বা অন্য রকম পাত্র এবং কক্ষ থাকিলে ফল নষ্ট হয় না। উত্তর-ভারতের নানা স্থানে এই প্রকারে শৈত্যদ্বারা ফল টাটকা রাখিবার (অর্থাৎ কোল্ড ষ্টোরেজের) বন্দোবস্ত হইতেছে। বঙ্গেও অনেক ভাল ফল জন্মে এবং আরও বেশী জন্মিতে পারে। বঙ্গে কিন্তু এরূপ কোন ব্যবস্থা হইতেছে না।

বাংলা দেশ অন্য সব প্রদেশের চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষয়িষ্ণু। অতএব, এখানে অন্য সব প্রদেশের চেয়ে অধিবাসীদের চিকিৎসার উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত হওয়া উচিত—অন্ততঃ অন্য যে-কোন প্রদেশের সমান ত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু বঙ্গে তদ্রূপ কোন বন্দোবস্ত নাই। বোম্বাই গবর্ন্মেণ্ট সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, যে, নির্ব্বাচিত কয়েকটি গ্রামসমষ্টিতে প্রত্যেক তিন-চারটি গ্রামের জন্য এক-এক জন পাস-করা ডাক্তার থাকিবেন এবং গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৫০্ পঞ্চাশ টাকা ভাতা দিবেন। ডাক্তার সপ্তাহের এক-একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে এক-একটি গ্রামে যাইবেন। তা ছাড়া তিনি দর্শনী লইয়া রোগী দেখিতেও পারিবেন। তাঁহার আয় বেশী না হইলেও এইরূপ আয়েও পাস-করা অনেক ডাক্তার কাজ করিতে রাজী হইবেন। বাংলা দেশের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক। এখানেও পূর্ব্ববর্ণিত আয়ে কাজ করিবার ডাক্তার পাওয়া যাইবে। মেডিক্যাল কলেজের পাস-করা কোন ডাক্তারই বেকার বা প্রায়-বেকার নহেন, বলা যায় না। মেডিক্যাল স্কুলগুলি হইতে পাস-করা ডাক্তারদের মধ্যে বেকার বা প্রায়-বেকার লোক হয়ত আরও বেশী আছেন। অথচ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে—এমন কি অনেক শহরেও—বিনা চিকিৎসায় কত লোকের যে মৃত্যু হয়, তাহার গণনা হয় নাই। অবশ্য, খুব ভাল চিকিৎসকের চিকিৎসা সত্ত্বেও অনেক রোগী মরে বটে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, চিকিৎসা হয় না বলিয়া এমন অনেক রোগী এখন মারা পড়ে, চিকিৎসা হইলে যাহারা বাঁচিত। ভদ্রভাবে জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট ন্যূনতম একটা আয়ের আশা পাইলে অনেক ডাক্তার পল্লী-গ্রামে যাইতে রাজী হইবেন যাঁহারা ভবিষ্যতে আয়ের আশায় এখন শহরেই বসিয়া আছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে কেবল এলোপ্যাথীর ডাক্তারদের কথাই বলিলাম, কেন-না সরকারী সাহায্য কেবল এলোপ্যাথী মতের চিকিৎসকদিগকেই এখন দিবার সম্ভাবনা আছে।

সরকার কিছু না-করিলেও সমবায়-সংঘ দ্বারা এক-একটি গ্রামসমষ্টির চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে, ইউনিয়ন বোর্ড-গুলির দ্বারাও হইতে পারে। ধনী জমিদার ও ব্যবসাদারেরাও ইহা করিতে পারেন—কেহ কেহ হয়ত করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মত অনুসারে সুশিক্ষিত কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও নিযুক্ত করিতে পারেন।

—

"বর্ন্যাকুলার" মানে কি দাস-ভাষা?

সেদিন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মান্দ্রাজের মিঃ সত্যমূর্ত্তি এবং আরও কোন কোন সদস্য এই প্রশ্ন করিলেন, ও তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্কও করিলেন, যে, যেহেতু "বর্ন্যাকুলার" (Vernacular) মানে দাসদের ভাষা, অতএব গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষীয় নানা ভাষা বুঝাইতে ডাকঘরের গাইড ও অন্যান্য বহিতে ও শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট আদিতে ঐ শব্দ কেন ব্যবহার করেন ও কেন উহার ব্যবহার রহিত করিবেন না। ঐ তর্কবিতর্ক দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহার রিপোর্ট এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সরকারী ইংরেজ বা ভারতীয় সদস্য কেহই এ কথা বলিলেন না, যে, "বর্ন্যাকুলার" শব্দটি দাস-

ভাষা অর্থে ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় না। ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নহে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হওয়ায় আমাদের এই সন্দেহ হইল, যে, আমরা ইহার প্রকৃত অর্থ এত দিন জানিতাম না, ও সেই জন্য দেশী ভাষা অর্থে ইহা অগণিত বার ব্যবহার করিয়াছি। তাই অভিধান দেখিতে হইল।

সকলের চেয়ে নূতন প্রামাণিক বড় ইংরেজী অভিধান—অন্ততঃ অন্যতম নূতনতম প্রামাণিক বড় ইংরেজী অভিধান—১৯৩৪ সালে প্রকাশিত "Webster's New International Dictionary, Second Edition"। ইহাতে Vernacular শব্দটি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

Vernacular, adj. [L. vernaculus born in one's house, native, fr. *verna* a slave born in his master's house, a native, of uncert. origin.] 1. Belonging to, developed in, and spoken or used by, the people of a particular place, region, or country; native; indigenous;—now almost solely of language; as, English is our *vernacular* tongue; hence, of or pertaining to the native or indigenous speech of a place; written in the native, as opposed to the literary language; as, the *vernacular* literature, poetry; *vernacular* expression, words, or forms.

Which in our *vernacular* idiom may be thus interpreted. *Pope.*

2. Characteristic of a locality; local; as, a house of *vernacular* construction. "A *vernacular* disease." *Harvey.*

3. Of persons, that use the native, as contrasted with the literary, language of a place; as, *vernacular* poets; *vernacular* interpreters.

Vernacular, *n.* The vernacular language, esp. as a spoken language; one's mother tongue; often the common mode of expression in a particular locality or, by extension, in a particular trade, etc.

ওয়েবষ্টারে শব্দটির ইংরেজী যে-কয়টি অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'দাস-ভাষা' তাহার একটিও নহে। বরং অর্থ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, "as, English is our Vernacular tongue," "যেমন, ইংরেজী আমাদের বর্ন্যাকুলার ভাষা।" আমেরিকানরা বা ইংরেজরা দাস নহে। শব্দটির অর্থ দাস-ভাষা হইলে আমেরিকান বা ইংরেজ কোন কোষকার এরূপ দৃষ্টান্ত দিতেন না।

শব্দটির সঙ্গে দাসের সম্পর্ক কেবলমাত্র এইটুকু যে, উহার ব্যুৎপত্তি স্থলে বলা হইয়াছে, যে, উহা বের্না (Verna) হইতে উৎপন্ন যাহার মানে 'নিজ প্রভুর গৃহে জাত দাস,' 'নেটিভ,' কিন্তু তাহার পরেই বলা হইয়াছে, ইহার উৎপত্তি অনিশ্চিত।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি যাহাই হউক, প্রচলিত অর্থ কি তাহাই দেখিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত অক্সফর্ড অভিধানও দেখিলাম, শব্দটির দাস-ভাষা অর্থ পাইলাম না। খ্রীষ্টিয়ান শব্দটি প্রথমতঃ অবজ্ঞাসূচক ছিল, কোয়েকার শব্দটি বিদ্রূপাত্মক ছিল। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে এখন অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের ভাব জড়িত নাই। বাইবেলের লাটিন অনুবাদকে ইংরেজীতে 'ভল্গেট' (Vulgate) বলে। এই কথাটি, এবং 'নীচ' 'অভদ্র' যাহার মানে সেই 'ভল্গার' (Vulgar) কথাটার উৎপত্তি একই লাটিন কথা হইতে। কিন্তু সে কারণে কেহ ভল্গেট শব্দের অব্যবহার ইচ্ছা করে না।

একটা ইংরেজী কথার মানে লইয়া এত কথা লিখিবার কারণ এই, যে, বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতিতে উহার ব্যবহার রহিত করিবার চেষ্টা হইতে পারে—মিঃ সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। বঙ্গেও রহিত হইলেই যে কোন ক্ষতি আছে তাহা বলিতেছি না। কিন্তু একটা কথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যয় করিবার সার্থকতা দেখিতেছি না। মাতৃভাষা বুঝাইতে একটা কথা চলিত আছে। থাক্ না!

—

পি ই এন্ অন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাতাহাতির উপক্রম

আশ্বিনের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, পি ই এন (P. E. N.) লেখকদের সভ্যজগদ্ব্যাপী একটি ক্লাব। Poets and Playwrights (কবি ও নাট্যকার), (Editors and Essayists (পত্রিকাসম্পাদক ও প্রবন্ধলেখক), এবং Novelists (ঔপন্যাসিক)—এই সকলের আদ্য অক্ষর লইয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহার শাখা ও প্রশাখা আছে। তাহার বৃত্তান্ত দিয়া লিখিয়াছিলাম, "এই ক্লাবের উদ্দেশ্য সকল দেশের লেখকদের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপন। তাহার দ্বারা সকল দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও মৈত্রী স্থাপনের সহায়তা হইতে পারে।" তাহা যে-সব কারণে হইতে পারিতেছে না, তাহার উল্লেখ করিয়া সংবাদ দিয়াছিলাম, যে, এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টাইন সাধারণতন্ত্রের রাজধানী

বোয়েনোস আইরাস নগরে এই ক্লাবের অন্তর্জাতিক কংগ্রেস হইবে। তাহাতে যোগ দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া ও অধ্যাপক কালিদাস নাগ গিয়াছেন। শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া আগেই গিয়াছিলেন। অধ্যাপক নাগ পরে একটি জাপানী জাহাজে কোলোম্বো হইতে যান। তাহাতে তাঁহার দু-জন জাপানী সহযাত্রীও ঐ কংগ্রেসে যাইতেছিলেন। এশিয়ার এই তিন জন প্রতিনিধির ছবি দিয়া ব্রাজিলের রাজধানী রীও-ডে-জানীরোর "গ্লোব" নামক কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছে। ঐ দেশের ভাষা স্পেনিশ। তাহা জানি না। নামগুলি হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত বলিয়া অনুমান করিয়া কয়েকটি বাক্য তুলিয়া দিতেছি।

O representante dos intellectuaes da India ao Congresso dos P. E. N. Clubs é o Sr. Kalidas Nag, professor de Historia Universal da Universidade de Calcuttá e secretario do P. E. N. Club do seu paiz. E' tambem, jornalista, director do "India and World", que se edita em Calcuttá.

E' amigo particular de Tagore, cuja obra estudou e analysou, surgindo dahi um livro, que tem o nome do grande poeta, o maior da India.

O Sr. Nag, que se dedica mais á poesia que á prosa faz nessa obra estudo completo e magnifico da personalidade de Tagore.

Elle proprio considera esta obra o seu mais perfeito trabalho.

Como acima dissémos, o Sr. Kalidas Nag é o secretario do P. E. N. Club de Calcuttá e seu representante no congresso a realizar-se na capital argentina.

Do P. E. N. Club de Calcuttá e presidente o poeta Tagore.

এই কংগ্রেসটিতে সাহিত্যিক নানা বিষয়ের আলোচনাই হইবার কথা। কিন্তু আজকাল 'সভ্য' জগতে রাষ্ট্রনীতির প্রাদুর্ভাব এত বেশী এবং ইউরোপের অন্ততঃ কয়েকটি জাতির মন সেই কারণে এমন অশান্ত ও উত্তেজিত হইয়া আছে, যে, আমরা এদেশে থাকিয়াও খবরের কাগজে দেখিয়াছি, বোয়েনোস আইরাসের এই লেখক-কংগ্রেসেও হাতাহাতির উপক্রম হইয়াছিল। দ্বন্দ্বটা হয় ইটালী ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের মধ্যে। এ-বিষয়ে আমরা বোয়েনোস আইরাস হইতে প্রাপ্ত একটি ব্যক্তিগত চিঠি হইতে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

"এই কংগ্রেস মসীজীবীদের আড্ডা। এসে দেখি, মসীযুদ্ধও ক্রমশঃ গড়িয়ে অসিযুদ্ধে পরিণত হবার জোগাড়। কারণ ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে রাজনৈতিক গোল এত পাকিয়েছে, যে, সেটা এই সাহিত্যের আখড়ায়ও বিশেষ আশঙ্কার কারণ হয়েছে। ইতালীর প্রতিনিধি ও ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক Jules Romainsর মধ্যে এমন ব্যাপার হ'ল, যে, তার পর দুই দলের গুণ্ডার গণ্ডগোল শেষ duel লড়ায়ে (দ্বৈরথ যুদ্ধে) না দাঁড়ায়। সকলের মাথা বোঝাই হয়ে আছে পলিটিক্স দিয়ে। আর্জেণ্টাইনের লোকেরা সবাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে অবশ্য তাঁদের কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছেন ও আমাদের খুবই যত্ন করছেন।

স্বামী বিজয়ানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্র গড়েছেন, তার কর্ম্মীরা (এদেশীয় অবশ্য) চমৎকার খাঁটি মানুষ।

এখানে ভোর না হতেই টেলিফোন। কারণ হোটেলের ঘরের এক পাশে বাঁধা রেডিও আছেই—সব প্রোগ্রাম শোনাচ্ছে। তার উপর ফোন অন্য পাশে। চা খেয়েই কংগ্রেসে ছোটা। বারোটা একটায় ফিরে মধ্যাহ্নভোজ এবং তার মধ্যেই যত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। সন্ধ্যা ছটায় আবার কংগ্রেসের অধিবেশন ও রাত নটায় ফিরে যাওয়া ও আবার লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আদি। এর মধ্যে দু-বার বক্তৃতা দিতে হয়েছে, কাল রবিবার এখানকার ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন আমায় বিশেষ বক্তৃতা দেওয়াচ্ছে। বহু সহস্র লোক, যারা কোন কালে এই কংগ্রেসে ঢুকবে না ও ভারতে আসতে পারবে না, তাদের অতীত ও বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বলব এবং কবি রবীন্দ্রনাথ এবং অন্য লেখক ও লেখিকাদের প্রশস্তি করব। ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসে বক্তৃতা দেব। সেখানেও বাংলা-সাহিত্যের নাম প্রচার হবে। ১৫ই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ আছে। ভারতবর্ষের আর্ট ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। ইংরেজীতে ও স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৬ই এখানে শেষ দিন রোটারী ক্লাবে নিমন্ত্রণ করেছে। সেখানেও কিছু বলতে হবে।"

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, ভারতবর্ষকে অসভ্য বলিয়া মনে করিয়া, মনে করিবার ভান করিয়া ও সেই বর্ণনা করিয়া যে-সব লোকের লাভ হয় বা হইতে পারে, তাহারা ভিন্ন অন্য সব বিদেশীর মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্ভ্রমের ভাব আছে এবং তাহার গৌরব সম্বন্ধে কৌতূহল

আছে। সেই জন্য ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, বোয়েনোস আইরাসের খবরের কাগজগুলি অন্য সব দেশ ও দেশের প্রতিনিধিদের চেয়ে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশী কথা লিখিয়াছে। শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, মহিলা, বিদেশীদের চোখে যাহা হিন্দুয়ানী তাহাতে নিপুণ, শাড়ী পরেন, এবং কপালে লাল টিপ পরেন। সুতরাং যেমন সিনেমা 'তারকা' (Film Star)-দিগকে জনতা ঘিরিয়া বেড়ায় ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়, শ্রীমতী ওয়াডিয়াকেও সেইরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্থানীয় নেশ্যন ("La Nacion") নামক একখানি কাগজ ত তাঁহার কপালের টিপটিকে 'অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক' (a symbol of inner vision) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে! তিনি বক্তৃতাও কয়েকটি করিয়াছেন— ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশে।

বঙ্গের প্রতিনিধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বক্তৃতা ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বক্তৃতার পর স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইল—"India easily leading", "ভারতবর্ষ সহজেই সবার আগে চলেছে"। প্রবাসীর সম্পাদক ভারতীয় পি ই এনের অন্যতম সহকারী সভাপতি রূপে নিজের যে বক্তব্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহা স্থানীয় কাগজগুলিতে স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বাহির হইবে।

আগেই লিখিয়াছি, এই অন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাতাহাতির উপক্রম হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও ইহা সমুদয় গবর্মেণ্ট ও জাতিকে সম্বোধন করিয়া একটি অনুরোধপত্র সকল প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধের নিন্দা ও কুফল বর্ণনা করা হইয়াছে, গত মহাযুদ্ধের দ্বারা কোন জাগতিক সমস্যার সমাধান হয় নাই বলা হইয়াছে, 'ধর্ম্ম'-সম্বন্ধীয় যুদ্ধের বিভীষিকা বর্ণিত হইয়াছে, এবং সকলকে সর্ব্বপ্রযত্নে যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্ররোচনার বিরোধিতা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই কংগ্রেসে সমবেত লেখকেরা নিজে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল মানুষের পৈত্রিক সম্পদ রূপ সভ্যতাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

—

গান্ধী জয়ন্তী

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের আরও এক বৎসর পূর্ণ হইল। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত পালন করিতে থাকুন।

তাঁহার সকল মতের ও সকল কাজের সমর্থন সকলে করেন না,—আমরাও করি না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে মতে না মিলিলেই অকপটে তাঁহার প্রশংসা করা যায় না, বরং নিন্দা করাই উচিত বা স্বাভাবিক, ইহা আমরা মানি না। সকল মানুষের মত এক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বাস্তবিক বলিতে গেলে সকলের সব মত এক হওয়া উচিত নয়, স্বাভাবিক নয়। জ্ঞান অপরিসীম, সত্য অপরিসীম। সব জ্ঞান কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না, সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি কেহ করিতে পারে না। সকলেরই জ্ঞান, সকলেরই সত্যোপলব্ধি অল্পাধিক অসম্পূর্ণ। এই জন্য কেহ যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সত্য যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, অন্যের লব্ধ জ্ঞান ও অন্যের উপলব্ধ সত্যের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিতে পারে।

মতের মিল থাক্ বা না থাক্, মানুষের উদ্দেশ্য কি, চেষ্টা কিরূপ, নিষ্ঠা কেমন, চরিত্র কিরূপ, বিবেচনা করা আবশ্যক।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মহাত্মা গান্ধী যে ভারতবর্ষে আমাদের জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুভূত হয়।

তিনি আযৌবন সত্যের অনুসন্ধানে ও আচরণে এবং নিজের ও অন্য মানুষের হিতকর পবিত্র জীবন যাপনে ব্যাপৃত আছেন। মধ্যে মধ্যে ভুল— খুব বড় ভুল—তিনি করিয়াছেন; কিন্তু ভুল স্বীকারও করিয়াছেন। এরূপ অকপটে ভ্রমস্বীকার কয় জন মানুষে করে?

পবিত্র সংযত জীবন লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি যে সাধনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় নিজের যে-সব দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হওয়া উচিত নহে, যে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। বিবাহিত জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ও ধারণা যাহা, তদনুসারে তিনি তাঁহার জীবনের প্রথম অংশের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সেই রূপ আদর্শ অনুসারে নিজ নিজ জীবনের বিচার ও সমালোচনা অন্যেরা করেন না বলিয়া এবং তিনি

করিয়াছেন বলিয়া, তিনি কোন বয়সেই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এমন মনে করা উচিত নয়—মনে করিলে ভুল হইবে এবং তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

এরূপ ভুল যে কেহ করেন না, এমন নয়। এইরূপ ভুল করিয়া এক যুবক তাঁহাকে চিঠি লেখায় তিনি তাহার চিঠি হইতে "হরিজন" কাগজে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিয়া শান্ত ভাবে উত্তর দিয়াছেন :—

"Whatever over-indulgence there was with me, it was strictly restricted to my wife.......I awoke to the folly of indulgence for the sake of it even when I was twenty-three years old, and decided upon total *Brahmacharya* in 1899, *i. e.*, when I was thirty years old."

অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়াই মহাত্মা গান্ধীর জীবন আলোচনা বা তাহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি নূতন কি করিয়াছেন? কংগ্রেসের উপর তাঁহার প্রভাব এবং দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাভিভাবী হইবার পূর্ব্বে, কোন কোন মননশীল ভারতীয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের উপায় সম্বন্ধে যেরূপ মতই পোষণ করিয়া থাকুন, ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মীদের ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মত এই ছিল, যে, ইংরেজদের ন্যায়বুদ্ধি জাগাইয়া তুলিতে পারিলে ও তাহাদের দয়া হইলে তাহারা ভারতবর্ষকে কিছু পৌর ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবে। আরও একটা মত ছিল। তাহা কিন্তু ছাপায় অসঙ্কোচে প্রকাশ পাইত না। তাহা এই, যে, যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইবে। গান্ধীজি এই উভয় মতের কোনটাই সমর্থন না করিয়া বলিলেন, স্বাবলম্বন দ্বারা, আত্মনির্ভর দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইবে, কিন্তু তাহা সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা নহে—আত্মিক শক্তির (soul forceএর) প্রয়োগ দ্বারা, অহিংস অসহযোগ ও প্রতিরোধ দ্বারা, অপরকে আঘাত না-করিয়া নিজেই সর্ব্ববিধ দুঃখ বরণ ও সহ্য করিয়া অথচ অন্যায় আদেশের পদানত না হইয়া, স্বরাজলাভ করিতে হইবে। এই নীতি জয়যুক্ত হয় নাই, সত্য কথা। কিন্তু ইহার প্রচারে ভারতবর্ষের অগণিত লোকের মনে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে—আশার উদ্রেক হইয়াছে, ভয় ভাঙিয়াছে, সাহসের আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক পুরুষ ও নারী যে স্বয়ং অহিংস থাকিয়া সকল দুঃখ—মৃত্যু পর্য্যন্ত—সহ্য করিতে প্রস্তুত, তাহা আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছে।

অগণিত লোকের এই মানসিক পরিবর্ত্তন মহাত্মা গান্ধীর কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

এ পর্য্যন্ত যত পরাধীন জাতি স্বাধীন হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, ইহা মোটের উপর সত্য। স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ, এই মত সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, যুদ্ধ যে উদ্দেশ্যেই করা হউক, তাহাতে হিংসা নিষ্ঠুরতা ছল কপটতা আছে ও থাকিবে; সুতরাং মানবপ্রেমের সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই, তাহা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম নহে, নীতিসঙ্গত নহে। এই জন্য নানা দেশে নানা মননশীল ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের এমন একটি উপায় অনুসন্ধান করিয়াছেন যাহা ধর্ম্মনীতিসঙ্গত এবং যাহা যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অবলম্বিত হইলে ফলপ্রদ হইবে। আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স্ ইহাকে "মর‍্যাল সব্‌ষ্টিটিউট্ ফর্ ওয়ার্" বলিয়াছেন। গান্ধীজি এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা মনে করেন, অহিংস এবং, আবশ্যক হইলে, মরণান্ত, প্রতিরোধ সেই উপায় উচ্চতম নৈতিক ও ধার্ম্মিক আদর্শের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে এবং যাহা ফলপ্রদ। গান্ধীজি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা প্রথম চেষ্টায় অভীপ্সিত ফল পান নাই বটে; কিন্তু উপায়টির যে ধর্ম্মের ও মানবপ্রেমের সহিত বিরোধ নাই, তাহা স্বীকার্য্য।

বলা বাহুল্য, যে, মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা চান। এ বিষয়ে তিনি জগতের অন্য শান্তিকামীদের সহচর ও সমকক্ষ।

গান্ধীজি ভারতবর্ষে পূর্ণস্বরাজ চান। পূর্ণস্বরাজের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও পূর্ণস্বরাজের রূপ নির্দ্দেশ তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাশে উদয়ের পূর্ব্বেও বঙ্গে হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা লাভের জন্য গান্ধীজি যেরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গীয় নেতারা সেরূপ উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই।

অহিংস ভাবে আইনলঙ্ঘন করিতে হইবে, গান্ধীজির

এই মতের সহিত আরও কতকগুলি মতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যেমন, সরকারী আদালতের সাহায্য না লওয়া, সরকারী চাকুরি না-করা, সরকারী আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি যে-সব কাজ করে সেই সব কাজ নিজেরাই করা, সরকারী বা সরকারের অনুমোদিত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার পরিবর্ত্তে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যাহা 'গঠনমূলক' (constructive) তাহা রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আগে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। কেবল শিক্ষার দিকে রবীন্দ্রনাথ ত এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেনই (এবং তাহা আংশিক ভাবে এখনও চলিতেছে), অন্যেরাও বঙ্গে করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এখন যাদবপুরে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চলিতেছে।

"কারাবরণ করিতে হয় করিব, দেহ শৃঙ্খলিত হয় হইবে, কিন্তু অন্যায় সহ্য করিব না, অথচ অহিংস থাকিব, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করিব না," এইরূপ আদর্শ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে অনেক দিন হইতে রহিয়াছে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Everything is fair in love and war; অর্থাৎ প্রণয়ের ব্যাপারে ও যুদ্ধে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সব কিছু করা চলে, কিছুই অবৈধ নহে। তেমনই আরও একটা এইরূপ ভ্রান্ত মত পৃথিবীর সব দেশের প্রায় সব রাজনৈতিকদের মধ্যে চলিত আছে, যে, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ, মিথ্যাসূচন, ছল চাতুরী, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা—কার্য্যসিদ্ধির জন্য এ সবই করা চলে। "শঠে শাঠ্যম্ সমাচরেৎ" উক্তি এইরূপ মত হইতে উদ্ভূত। গান্ধীজি বলিলেন, বলিয়াছেন, বলেন,—না, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, ধর্ম্মনীতির (ethicsএর) উচ্চতম আদর্শ রক্ষা করিতে হইবে, অকপট হইতে হইবে, হিংসাদ্বেষের পরিবর্ত্তে মানবপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, লোভ ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মানুগত করিতে চাহিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দটি সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানসমূহের ও মতসমূহের সমষ্টি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। তিনি সে অর্থে রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মানুগত করিতে চান নাই। ধর্ম্মের সারবস্তু যে আধ্যাত্মিকতা, সাত্ত্বিকতা ও সুনীতি, রাষ্ট্রনীতিকে তাহারই অনুগত করিতে চাহিয়াছেন।

গান্ধীজির আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবে, নারীদের অবরোধ যে-যে প্রদেশে ছিল ও আছে, সেখানে উহা শিথিল হইয়াছে।

সামাজিক বিষয়ে তিনি বাল্যবিবাহবিরোধী, অসবর্ণ বিবাহের অবিরোধী ও আবশ্যক মত তাহার সমর্থক, এবং বিধবা-বিবাহেরও সমর্থক।

অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস থাকিলে ও তদনুযায়ী আচরণ থাকিলে হিন্দুত্ব ও হিন্দু সমাজ টিকিবে না, তাঁহার এই বিশ্বাস ও উক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন, কিন্তু প্রচলিত আকারের জাতিভেদ মানেন না। বর্ণাশ্রম ত এখন নাই, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার আশাও নাই। সুতরাং গান্ধীজির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাস ও জাতিভেদে অবিশ্বাস—এই উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ, থাকিলে, বুঝিবার চেষ্টা না করিলেও চলে। ব্রাহ্মসমাজ অনেক আগে হইতে জাতিভেদে, সুতরাং অস্পৃশ্যতায়, অবিশ্বাসী।

চরখা ও খাদি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যাহা বলেন, তাহা সকল দেশের ও কালের জন্য আবশ্যক না হইলেও, ভারত-বর্ষের গ্রাম অঞ্চলে তাহার খুব প্রয়োজন ও ফলোপধায়কতা আছে। ইহা অনেকের ঘরে বসিয়া উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া দিয়াছে। খদ্দরের ব্যবহারে মানুষের চালচলন সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর হয়। ইহা ধনী ও নির্ধনকে বাহ্যতঃ সমশ্রেণীস্থ করে। ধনী মহিলারা ইহা ব্যবহার করিলে দরিদ্র মহিলা-দিগকে পূজাপার্ব্বণে উৎসবে বিবাহ-সভায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতে হয় না। ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে এবং নানা বিজাতীয় পরিচ্ছদ ও বিলাসদ্রব্যের প্রাদুর্ভাবে আমাদের দেশে একটা নূতন রকম জাতিভেদ আসিয়াছে। তাহা ভারতীয় মহাজাতিগঠনের একটা প্রধান বাধা। আগেকার মহাপণ্ডিত সংস্কৃতের অধ্যাপক ও নিরক্ষর চাষা যতটা হৃদ্যতার সহিত পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন, এখনকার ইংরেজী-জানা হালফ্যাশনের পরিচ্ছদ পরিহিত মানুষ তেমন করিয়া তাঁহাদের নিরক্ষর বা বাংলানবীস স্বদেশ-বাসীদের সহিত মিশিতে পারেন না। অন্ততঃ পরিচ্ছদে সব শ্রেণীর লোক এক রকম হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিদের

প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের সহিত মিশিতে ভয় সঙ্কোচ কিছু দূর হইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী "পাড়াগেঁয়ে" হইয়াছেন ও অন্য সকলকেও "পাড়াগেঁয়ে" করিতে চান। কিন্তু তাহা ভাল অর্থে—জীবনের অনাড়ম্বরতা, সরলতা, সরসতা, হৃদ্যতা, পরস্পরের প্রতি প্রতিবেশীর ভাব তিনি রাখিতে চান। দূর করিতে চান গ্রামের অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামি, জলস্থলবাতাস কলুষিত করিবার অভ্যাস, চাষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে লোকদের বেকার অবস্থা ও আলস্য, উপার্জ্জনের নানা উপায়ের অভাবে দারিদ্র্য, এবং অজ্ঞতা।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই, যে, সকলেই নিজের নিজের ধর্ম্মে থাকুন ও তাহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ অনুসারে চলুন। কোন ধর্ম্মের লোকদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা বা কোন ধর্ম্মের লোককে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করান তিনি পছন্দ করেন না। তিনি হিন্দু। মূর্ত্তিপূজা বিগ্রহপূজা আদিকে তিনি প্রতীক-পূজা মনে করেন। কিন্তু ইহাকে যে তিনি হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ রূপ মনে করেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি বলিয়াছেন, তিনি মূর্ত্তিপূজা করেন না এবং দেবমন্দিরের কোন বিগ্রহ দেখিলে তাঁহার ভক্তি হয় না। হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বর্ত্তমান বৎসরের ৩রা অক্টোবর তারিখের "হরিজন" কাগজে লিখিয়াছেন :—

"Hinduism is ever evolving. It has no one scripture like the Quran or the Bible. Its scriptures are also evolving and suffering additions."

তাৎপর্য্য। হিন্দু ধর্ম্ম চিরবিবর্ত্তনশীল, বরাবর ইহার ক্রমবিকাশ হইতেছে। কোরান বা বাইবেলের মত ইহার কোন একটি মাত্র শাস্ত্র নাই। ইহার শাস্ত্রগুলির বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ হইতেছে এবং তাহাতে নূতন জিনিষ সংযুক্ত হইতেছে।

—

অধ্যাপক শশীভূষণ দত্ত

গত মাসে ৮৬ বৎসর বয়সে শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এত বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপকের কাজ হইতে অবসর লইয়াছিলেন, যে, তাঁহার যে-সব ছাত্র জীবিত আছেন, তাঁহারাও বৃদ্ধ এবং অনেকে তাঁহার পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার মত বেশী নম্বর কোন ছাত্র পান নাই। কথিত আছে, এই পরীক্ষায় তাঁহার উত্তরগুলি এরূপ নির্ভুল ও যথাযথ হইয়াছিল, যে, পরীক্ষক-বোর্ড দীর্ঘকাল তাহা আদর্শ উত্তর রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। যদিও দর্শনে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তথাপি অন্য নানা বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। সেই জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন কলেজে দর্শন, ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃত এবং গণিতেরও অধ্যাপকতা কৃতিত্বের সহিত করিয়াছিলেন। তিনি কিছু কাল একটি ডিবিজনের স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন। অনেক বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া তিনি পেন্সান গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রেরা যেমন তাঁহার বিদ্যাবত্তার গুণে জ্ঞানলাভ করিত, তেমনি তাঁহার মত সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া উন্নত জীবন লাভে সমর্থ হইত। অবসর সময়ে তিনি আয়ুর্বেদ, এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা প্রণালীর অনুশীলন করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। লোক-হিতসাধন তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত আযৌবন যুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন, সুতরাং কখনও কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দেন নাই। কিন্তু আমরা জানি, তিনি দেশের পরাধীনতা অনুভব করিয়া বিশেষ বেদনা বোধ করিতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন আমেরিকান ভারতবন্ধু আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধগুলি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন ও তাঁহার মতের অনুমোদন করিতেন। তিনি অনাড়ম্বর, মিষ্টভাষী, অল্পভাষী ও নম্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

—

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের ভারত প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে গোপনে আমেরিকা চলিয়া যান। গোপনে যাইবার কারণ, গবর্ন্মেণ্ট সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞাত কোন কারণে তাঁহাকে অন্তরায়িত করিতে (ইন্টার্ণ করিতে) চাহিয়াছিলেন।

এত দিন তিনি দেশে ফিরিতে পারেন নাই, কেন-না ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে আসিবার অনুমতি দেন নাই। এখন অনুমতি পাইয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝা-

মাঝি তিনি দেশে পৌঁছিবেন। আমেরিকায় থাকিতে তিনি ভারতবর্ষীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেরিকান শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের রেডিওতে কথোপকথনের যখন প্রথম ব্যবস্থা হয়, তখন তাঁহার উদ্যোগে আমেরিকার

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোক এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনিও রেডিওযোগে কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর, তাঁহার এবং শ্রীযুক্ত রামলাল বাজপাইয়ের ফোটোগ্রাফও আসিয়াছিল।

শৈলেন্দ্র বাবুর নিবাস যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী গ্রাডুয়েট। তিনি বি-এস্‌সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং ১৯১৫ সালে এম্-এস্‌সিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষক ছাত্র রূপে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। অতঃপর তারকনাথ পালিত বৃত্তি পাইয়া তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ আমেরিকা যাইবার আয়োজন করেন। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তখন তাঁহার পাসপোর্ট (বিদেশ যাইবার অনুমতি-পত্র) কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে বন্দী করিবার হুকুম হয়। এখন তাঁহার বয়স ৪৪। তাঁহাকে গবর্ন্মেণ্ট যে-সর্ত্তে ও যে-প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। সরকার বলিয়াছেন, তাঁহার অতীত কার্য্যকলাপের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে তত দিন কোন মোকদ্দমা হইবে না যত দিন তিনি আইনানুগ ভাবে চলিবেন এবং গবর্ন্মেণ্ট-বিপর্য্যাসক কোন প্রচেষ্টায় আবার গিয়া না-পড়িবেন। তিনি যে আগে এরূপ কোন প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত ছিলেন, সর্ব্বসাধারণ তাহা অবগত নহে, এবং তাঁহাকে কিংবা অন্য কাহাকেও গবর্ন্মেণ্ট বিনা বিচারে ও বিনা প্রকাশ্য অভিযোগে বন্দী করিয়া রাখিতে সমর্থ।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকার সদ্ভাবজ্ঞাপক প্রতিনিধিবর্গ

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে মিঃ হফমেয়ার প্রমুখ একদল শ্বেত প্রতিনিধি ভারতবর্ষের প্রতি সদ্ভাব জানাইতে এদেশে

মিঃ হফমেয়ার

আসিয়াছেন। বোম্বাই হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় জায়গায় তাঁহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে। তাঁহারাও অনেক ভাল কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের সরলতায় অবিশ্বাস করিতেছি না, এবং ইহাও জানি, যে, উচ্চপদস্থ কোন সরকারী কর্ম্মচারীর সদিচ্ছা থাকিলেও স্বশাসক দেশের লোকমতের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করিতে পারেন না। তাহা হইলেও, দক্ষিণ-আফ্রিকার যে-সকল প্রতিনিধি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই দেশের লোকদিগকে ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া যান এবং স্বদেশে গিয়া তত্রত্য ভারতীয়দিগের প্রতি ন্যায্য জনমত ও জনমনোভাব উৎপাদনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এদেশে আসা ও এদেশের লোকদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা লাভ করা বৃথা হইবে না।

—

প্যালেষ্টাইনে আরব বিদ্রোহ

আরবেরা প্যালেষ্টাইনের প্রধান অধিবাসী। কিছু ইহুদীও বরাবরই সেদেশে ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ইহুদীদের কিছু সাহায্য পাইয়া ও আরও অধিক সাহায্য পাইবার আশায় এবং প্যালেষ্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার একটি প্রধান ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ঐ দেশটিকে ইহুদীদের ন্যাশন্যাল হোম বা জাতীয় বাসভূমি বলিয়া ঘোষণা করেন। লীগ অব নেশ্যন্সে ব্রিটেনের প্রভাব খুব বেশী। লীগের নিকট হইতে ব্রিটেন প্যালেষ্টাইনের ম্যাণ্ডেট পান অর্থাৎ তাহার অভিভাবক হন। তাহার পর হইতে প্যালেষ্টাইনে দলে দলে ইহুদী আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা অবশ্য এখনও আরবদের চেয়ে সংখ্যায় খুব কম আছে। কিন্তু তাহাদের আগমন যদি অবাধে চলিতে থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে তাহারা সংখ্যায় আরবদের সমান, এমন কি, তাহাদের চেয়ে অধিক হইতে পারে। ইহুদীদের শিক্ষা, উদ্যম, অর্থবল আরবদের চেয়ে বেশী। এই জন্য আরবদের ভয় হইয়াছে, যে, দেশটা কালক্রমে আর প্রধানতঃ তাহাদেরই স্বদেশ না থাকিয়া প্রধানতঃ ইহুদীদেরই স্বদেশ হইয়া যাইতে পারে। তাহাদের অশান্ত ভাবের ও বিদ্রোহের ইহা একটা কারণ। এরূপ সংবাদও পাওয়া যাইতেছে, যে, ইতালী আরবদিগকে উস্কাইতেছে ও সাহায্য দিতেছে বা দিবার আশা দিয়াছে।

ইহুদীদের আগমনে দেশটির সম্পদ বাড়িয়াছে। আরবদেরও আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের একটা আপত্তি এই, যে, ইহুদীরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, এবং প্রাচ্যভাবাপন্ন প্যালেষ্টাইনে পাশ্চাত্য ভাব আসিয়া একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাইতেছে। এরূপ বিপ্লব কোন দেশের লোকই চায় না। আমাদের ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্য সংস্পর্শে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং আরও ঘটিবে। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের যে সবটাই মন্দ, তাহা নহে। প্যালেষ্টাইনের আরবরা যদি স্বাধীন হইত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে অন্য সব সভ্য দেশের সমকক্ষ হইতে চাহিত, তাহা হইলে স্বাধীন অবস্থাতেও তাহাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে কিছু কিছু লইতে হইত। স্বাধীন তুরস্ক, স্বাধীন আফগানিস্থান, স্বাধীন ইরান পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, এমন কি সামাজিক, অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। পোষাকে তো তুরস্ক ঠিক ইউরোপীয় দেশগুলির মত হইয়াছে। অতএব, ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমদানী করিতেছে বলিয়া তথাকার আরবদিগের বিদ্রোহ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

প্যালেষ্টাইনে আরবদের অন্যতম পবিত্র তীর্থ আছে বলিয়াই যে সেখানে আগন্তুক ইহুদীরা বসবাস করিতে পাইবে না, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে প্যালেষ্টাইন ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র দেশ এবং সেখানে তাহাদেরও তীর্থ আছে।

ঐতিহাসিক যে-কারণ বা কারণসমষ্টিতেই হউক, ইহুদীরা বহু শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও তথায় বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পক্ষে একটি "জাতীয় বাসভূমি" আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। প্রাচীন কালে প্যালেষ্টাইন তাহাই ছিল, এবং কিছু ইহুদী বরাবরই সেখানে বাস করিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্যালেষ্টাইনকেই তাহাদের "জাতীয় বাসভূমি" করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। জার্ম্মেনী ও অন্য

কোন কোন দেশে ইহুদীরা উৎপীড়িত হইতেছে ও সাধারণ পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা কোথাও জায়গা পাইবে না, এমন হইতে পারে না। প্যালেষ্টাইনে এখনও লক্ষ লক্ষ আরব ও ইহুদীর স্থান হইতে পারে। ইহুদী আসিলেই আরব বেদখল হইতেছে, এমন নয়।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা যে-ভাবে প্যালেষ্টাইনের আরবদের পক্ষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দিক্ দিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক আন্দোলন করিতেছে, স্বাধীন তুরস্ক, আফগানিস্থান ও ইরান তাহা করে নাই। ইরাক, সৌদী আরবদেশ ও ট্রান্সজোর্ডান তো প্যালেষ্টাইনের আরবদিগকে মারামারি কাটাকাটি ছাড়িয়া দিতে ও ব্রিটেনের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিতে অনুরোধ করিতেছে।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা এক সময় খিলাফৎ আন্দোলন করিয়াছিলেন ও তাহাতে কংগ্রেসও যোগ দিয়াছিলেন। তাহার ফল অজানা নাই। তুরস্কের সুলতান খলিফা ছিলেন। তুরস্ক সাধারণতন্ত্র হইয়া সুলতানকেও রাখে নাই, খলিফাও রাখে নাই। অন্য দেশের মুসলমানদের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্ম্মের দিক দিয়া উত্তেজিত হওয়া এবং সেই উত্তেজনা ও আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া সুফলপ্রদ হইতে পারে না, সুতরাং বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারতীয় মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে বড়লাটের কাছে একটি অনুরোধপত্র দাখিল করেন। বড়লাট তাহার জবাবও দিয়াছেন। তিনি ঐ প্রতিনিধিদের বক্তব্য বিলাতের মন্ত্রীদের কাছে নিজের মতামতসহ পাঠাইয়া দিবেন। তাহার বেশী কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিরা এদেশের সকল মুসলমান-দলের প্রতিনিধি কিনা জানি না। তাঁহারা প্যালেষ্টাইনের আরবদের মত, প্যালেষ্টাইনে তাহাদের দেশের ব্যবস্থা তাহাদেরই করিবার অধিকার (self-determination) চান, অর্থাৎ তথাকার আরবদের স্বাধীনতা চান। আমরাও প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষপাতী—শুধু প্যালেষ্টাইনের কেন, সকল দেশেরই স্বাধীনতার পক্ষপাতী। এবং এই "সকল" দেশের মধ্যে আমরা ভারতবর্ষকেও একটি দেশ বলিয়া ধরি। উক্ত ভারতীয় মুসলমান-প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কাহাকেও কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের আত্মভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব (self-determination) দাবী করিতে শুনি নাই। তাহার কারণ কি এই, যে, ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ এবং প্যালেষ্টাইনে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ? আরও একটা কারণ কি এই, যে, ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যোগ্যতা বা লোকসংখ্যার অনুপাতে যত চাকরি ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যতা পাইতে পারিতেন, গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী চাকরি ও সদস্যতা পাইয়াছেন?

প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছেন এবং তথায় সামরিক আইন জারি করিয়াছেন। অন্য দিকে জেনিভায় লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের অভিভাবকত্ব কমিশনের (Mandates Commissionএর) এক অধিবেশনে, ব্রিটেন আরবদিগকে কেন ঠাণ্ডা করিতে পারে নাই, তাহার কড়া সমালোচনা হইতেছে।

—

ভারতবর্ষে ও বিদেশে সংবাদপত্রের কাটতি

কিছু দিন ধরিয়া বিলাতী ডেলি এক্সপ্রেস ও ডেলি হেরাল্ড নিজেদের কাটতি লইয়া মসীযুদ্ধ করিতেছিলেন। উভয়েই বলিতেছিলেন, আমাদের কাটতি পৃথিবীতে সব কাগজের চেয়ে বেশী—প্রতিদিন কুড়ি লাখের উপর। কিন্তু জাপানের খবরে উভয়কেই অ-বাক করিয়াছে। "দি ওয়ার্ল্‌ড্‌স্ প্রেস নিউসে" ("The World's Press News"এ) লিখিত হইয়াছে, যে, জাপানের ওসাকা মাইনিচি প্রত্যহ ত্রিশ লক্ষ এবং তাহার ভগিনী তোকিও মাইনিচি প্রত্যহ চব্বিশ লক্ষ কাটতির দাবী করেন। জাপানে নিতান্ত শিশু ছাড়া স্ত্রী- ও পুরুষজাতীয় সকলে লিখিতে পড়িতে পারে। এই জন্য কাগজের কাটতি বেশী।

আমাদের দেশে আনন্দবাজার পত্রিকা অর্দ্ধ লক্ষের উপর কাটতি দাবী করেন। ইহা অপেক্ষা বেশী কাটতি অন্য কোন ভারতীয় ইংরেজী বা দেশী ভাষার কাগজের আছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে অ-রাষ্ট্রনৈতিক গভীর বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ মাসিক কাগজেরও খুব কাটতি হয়। আমেরিকার আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের সম্পাদিত "দি য়ুনিটেরিয়ান" মাসিকপত্রের কাটতি ছিল তিন লক্ষ।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক পড়িতে লিখিতে জানে না, ও তাহার উপর গরীব। এবং তদুপরি পয়সা দিয়া না-কিনিয়া কাগজ পড়ার ফ্যাশন সচ্ছল অবস্থার অনেক লোকের মধ্যেও প্রচলিত।

—

নারীশিক্ষা সমিতি

শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসুর নেত্রীত্বে নারীশিক্ষা সমিতি ১৭ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় ও মফস্বলে নারী-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন। সমিতির আয় বাড়িলে আরও অনেক কাজ ইহার দ্বারা হইতে পারে। কলিকাতার বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বিধবা মহিলারা যে শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা স্বাবলম্বনে সমর্থ হওয়ায় তাঁহারাই যে উপকৃত হন

তাহা নহে, বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়সমূহে যে যথেষ্ট শিক্ষয়িত্রীর অভাব অনুভূত হয়, সেই অভাবও কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয়। হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা এত বেশী, তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীলা করিবার প্রয়োজন এত অধিক, এবং বঙ্গে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এরূপ একান্ত আবশ্যক, যে, নারীশিক্ষা সমিতির বার্ষিক আয় যদি কয়েক লক্ষ টাকা হইত, তাহা হইলেও তাহা অধিক হইত না।

—

কলিকাতায় ছাত্রীনিবাস

ছাত্রীদের কলেজে শিক্ষালাভের রীতি বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু মফস্বল হইতে যে-সকল ছাত্রী কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তাঁহাদের থাকিবার সমুচিত ব্যবস্থা নাই। এই অভাব দূর করা আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদালয় এই বিষয়ে মন দিয়া উচিত কাজ করিয়াছেন। পরলোকগত বিহারী লাল মিত্র স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বার্ষিক ৪৮০০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হইবে।

ইহা নির্ম্মিত হইলে ইহার তত্ত্বাবধানের ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

—

প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া অনবরুদ্ধা কন্যা সমস্যা

বঙ্গে বাল্যবিবাহ ও নারীদের অবরোধ চিরাগত প্রথা। এখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে এবং অবরোধ-প্রথাও ক্রমশঃ কমিতেছে। এই জন্য প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া অনবরুদ্ধা কন্যাদের কি কি পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম মানা উচিত এবং অন্যদেরও (বিশেষতঃ পুরুষদের) তাঁহাদের সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম ও শিষ্টাচার পালন করা কর্ত্তব্য, হিন্দুসমাজের নেত্রীবর্গের ও নেতাদের তাহাতে মন দেওয়া আবশ্যক। বাঙালী খ্রীষ্টিয়ান সমাজে ও ব্রাহ্মসমাজে এ-বিষয়ে কিছু অলিখিত নিয়ম থাকিলে তাহা জানা ভাল। কিন্তু মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট প্রভৃতি ভারতবর্ষের যে-সকল প্রদেশে অবরোধপ্রথা কোন কালে ছিল না, এবং যে-যেখানে বঙ্গেরই মত বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, তথায় কিরূপ আদবকায়দা আছে, তাহা জানা আরও আবশ্যক। ঐ সকল প্রদেশে শিক্ষিত বাঙালী পুরুষ ও মহিলারাও আছেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজকে জানাইতে পারেন।

মেয়েরা যে শিক্ষা পাইতেছেন তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্য সমাজের চালচলনের সহিত তাঁহারা পাশ্চাত্য উপন্যাস নাটক ও গল্পের মধ্য দিয়া পরিচিত হইতেছেন ও তাহার প্রভাব তাঁহাদের উপর পড়িতেছে। পাশ্চাত্য অনেক পাপ, মোহিনী কুরীতি ও অন্য অনেক জিনিষ তাঁহারা জানিতেছেন, যাহা তাঁহারা (এবং আমাদের বালকেরা ও যুবকেরাও) না জানিলে মঙ্গল হইত। সিনেমার মধ্য দিয়াও অনেক অবাঞ্ছিত বিষয়ের জ্ঞান তাহাদের হইতেছে। এই সকল কারণে আমাদের দেশের চিরন্তন সংযম, সাত্ত্বিকতা ও পবিত্রতার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখা কঠিন হইতেছে। অতীত কালে এদেশে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপ ছিল না, এমন নয়। কিন্তু সংযম সাত্ত্বিকতা ও পবিত্রতার আদর্শও ছিল ও তাহা খুব উচ্চ ছিল, এবং অগণিত লোকের জীবনে তাহা অনুসৃতও হইত।

কোন বয়সের নারীদিগকেই পিঞ্জরের পাখী করিয়া রাখা সুরীতি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে। স্বাধীনতা সকলের জন্যই চাই। কিন্তু সংযম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা স্বাধীনতার যোগ্য হওয়া ও থাকা আবশ্যক। যেহেতু অনেক পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল, অতএব অনেক নারীকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে, সাম্যের অর্থ ইহা নহে। প্রত্যুত সকল পুরুষকেই চরিত্রবান্ হইতে হইবে।

—

বেকার সমস্যা ও গবর্ন্মেণ্ট

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকেই বেকার। গবর্ন্মেণ্ট মনে করেন, অনেকে বেকার থাকায় সন্ত্রাসক বা বিভীষিকা-পন্থী দলের নেতাদের নিজেদের দলে লোক জুটাইবার সুবিধা হয়। ঠিক তাহা হয় কিনা, সে-বিষয়ে আমরা কিছু জানি না; কিন্তু হওয়া অসম্ভব নয়। গবর্ন্মেণ্ট বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা আমরা মোটেই যথেষ্ট মনে করি না, কিন্তু অযথেষ্ট যাহা করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ মূল্যহীন মনে করি না। গবর্ন্মেণ্টের এই রূপ চেষ্টায় যদি বেকারদের সংখ্যা কিছু কমে, এবং এই উপায়ে যদি পরোক্ষ ভাবে বিভীষিকাপন্থার আকর্ষণ কিঞ্চিৎ কমে, তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে।

বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সে-বিষয়ে বঙ্গের সরকারী শিল্প-বিভাগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কতকগুলি যুবককে কোন কোন শিল্প শিখান হইতেছে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসায়ীরা যাহাতে নূতন ও উন্নত ধরণের উপায় অবলম্বন দ্বারা নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহাদিগকে সে-বিষয়ে সাহায্য দিবার নিমিত্ত শিল্প-বিভাগ একটি গবেষণাগার খুলিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসায়ীদিগকে আর্থিক সাহায্য ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কতগুলি ব্যবসা কি পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছেন, জানি না। এই ব্যবসাদারদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধামত বাজারের সন্ধান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কতকগুলি যুবক সাবান, ছুরি, কাঁচি,

ছাতার বাঁট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। কোন কোন স্থানে নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখান হইতেছে। এইরূপ কতকগুলি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে কতকগুলি যুবক শিক্ষা করায় কোথাও কোথাও শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে বহুসংখ্যক লোকের উপার্জ্জনের পথ খুলিয়াছে। কাঁচা মাল কোথায় পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানও শিল্পবিভাগ দিয়া থাকেন। শিল্পবিভাগের এইরূপ চেষ্টার বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়।

—

রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি

গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতার প্রধান নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার শেষ ইংলণ্ড প্রবাসকালে তাঁহার নেতা ও বন্ধু রামমোহন রায়ের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি তখনকার প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন গিবসনের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠাইয়া দেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহা নিজের বেলগাছিয়া উদ্যানে স্থাপিত করিবেন এই ইচ্ছা জানান। কিন্তু ইংলণ্ডেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও ঋণ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এবং মূর্ত্তিটির বিষয় কাহারও বড় মনে ছিল না। পরে ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গৃহে রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করা হইবে, তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার পরিবারবর্গ ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ২১১-সংখ্যক ভবনে শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ইহার একটি ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত করিলাম।

রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি

দুর্ভিক্ষ

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। উত্তর-ভারতে বহুপ্রদেশে বন্যা হওয়ায় সেখানেও নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের মত হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

হৈমন্তিক ধান্য না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গের যে-সব জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে লোকের কষ্ট চলিতে থাকিবে। তাহার পরও যে নিরন্নদের সচ্ছল অবস্থা হইবে এমন নয়। তাহাদের দুঃখের কিছু উপশম হইবে মাত্র।

বঙ্গের দশ বারটি জেলায় অন্নকষ্ট ও বস্ত্রাভাব হইয়াছে।

আমরা সর্ব্বত্র সাহায্য দানের কাজ চালাইবার মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব না এবং আমাদের সব জায়গায় কর্ম্মীও নাই। ইহা জানিয়া আমরা কেবল বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি কেন্দ্রে যথাসাধ্য সাহায্য দিবার চেষ্টা করিতেছি। এবারকার দুর্ভিক্ষে টাকা অতি সামান্যই আসিয়াছে। পুনর্ব্বার সাহায্য পাঠাইতে সদাশয় ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

—

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রসিদ্ধ সংগীতবেত্তা পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংগীতবিদ্যা ও হিন্দুস্থানী রীতির সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার শ্রম ও কৃতিত্ব অসাধারণ। হিন্দুস্থানী সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত তিনি লক্ষ্ণৌতে মরিস কলেজ এবং গোয়ালিয়রে সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

—

নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে মহিলাদের সভা

গত ১৯শে আশ্বিন কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটির হলে শিক্ষিতা মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হয়। বাংলা দেশে নারীহরণ ও নারীর উপর পাশবিক ও পৈশাচিক অত্যাচারের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে সমবেত মহিলারা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অন্য মহিলাদের মত শহরের শিক্ষিতা মহিলারাও নারীনিগ্রহের বেদনা ও অপমান অনুভব করেন। তাঁহারা যে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ভাবে আপনাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই বা নারীনিগ্রহের প্রতিকারচেষ্টা করেন নাই, তাহার সমস্ত দোষটা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপান উচিত নয়। সামাজিক প্রথা বঙ্গের নারীদিগকে দীর্ঘ কাল কেবলমাত্র অন্তঃপুরিকা করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই কালক্রমে নারীদের দুঃখদূরীকরণ-কার্য্যে ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

মহাবোধি সোসাইটি হলের সভায় মহিলাগণ বঙ্গে নারী-হরণ ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার দমন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট কঠোরতর আইন ও বিশেষ ব্যবস্থার দাবী করেন। কড়া আইন, কড়া আইনের সমুচিত প্রয়োগ এবং পুলিস ও শাসক কর্ম্মচারীদের উপর বিশেষ আদেশ যে অত্যাবশ্যক, সংবাদপত্রে ও জনসভায় অনেক দিন হইতে তাহা বলা হইতেছে। গবর্মেণ্ট একেবারে উদাসীন আছেন, বলা যায় না বটে, কিন্তু যথোচিত মনোযোগীও হন নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া বিশেষ ভাবে মনোযোগী হওয়া গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

খোর্দ-গোবিন্দপুরের মোকদ্দমার দ্বিতীয় বার বিচারে সেশ্যন জজের রায় সম্বন্ধে মহিলারা বলিয়াছেন :—

"এই মোকদ্দমায় অপরাধীদিগকে যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহাদের অপরাধের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইয়াছে। এই জন্য এই সভা আশা করিতেছে, যে গবর্মেণ্ট সেশ্যন জজের রায়েরবিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়া অত্যাচারীদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা দ্বারা বঙ্গের নারীদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবেন।"

মহিলাদের এই মত সাতিশয় ন্যায্য। এই মত অনুসারে কাজ করা গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

আর একটি প্রস্তাবে মহিলারা বলিয়াছেন :—

"জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত নারীই নারী, এবং যাহারা অত্যাচার করে তাহারা অত্যাচারী। এ-ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বা জাতির কথা উঠিতেই পারে না। সুতরাং আমরা এই সভায় নারীদিগের পক্ষ হইতে দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিতেছি, যে, অত্যাচারী কর্ত্তৃক নারীর উপর অত্যাচার ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোনক্রমেই সঙ্গত নহে।"

কোন ন্যায়পরায়ণ বিবেচক ব্যক্তিরই এ-বিষয়ে অন্য মত থাকিতে পারে না। অত্যাচারী হিন্দু হইলে সমগ্র বাঙালী সমাজের লজ্জার বিষয়—বিশেষ করিয়া হিন্দু

বাঙালীদের লজ্জার বিষয়; অত্যাচারী মুসলমান হইলেও সমগ্র বাঙালী সমাজের লজ্জার বিষয়—বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের লজ্জার বিষয়। বস্তুতঃ অত্যাচারী মানুষগুলা কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক তাহা ভাবাই অনুচিত ও অনাবশ্যক; তাহারা সমুদয় ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট।

ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, যে, ১৯৩৫ সালে যে ভারতশাসন আইন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রণীত হইয়াছে, তাহা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয়ের সম্মিলিত বিজ্ঞতার ফল। এইরূপ কথা তিনি দিল্লীতে তাঁহার প্রথম রেডিও বক্তৃতাতেও বলিয়াছিলেন। তাহা যে সত্য নহে, ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে এবং কংগ্রেসের ও লিবার্যাল বা মডারেট দলের নেতাদের মন্তব্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল—দেখান হইয়াছিল, যে, কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা বা লিবার্যাল দলের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ঐ আইনের প্রণেতারা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টেরই বাছাই-করা অতিবড় নরমপন্থী অতিবড় রাজভক্তি-ব্যাপারী অতি-বড় সাম্প্রদায়িক চাঁইদেরও কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও, লর্ড লিনলিথগো আবার ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন! ইঁহারা ভ্রমের অতীত, এবং ভারতবর্ষের কাহারও কোন কথার মূল্য ইঁহাদের কাছে নাই যদি তাহা তাঁহাদের কথার প্রতিধ্বনি বা সমর্থক না হয়।

ভারতবর্ষ না-কি প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী পাইয়াছে!

আলোচ্য বক্তৃতাটিতে লাট সাহেব বলিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত আইন দ্বারা ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালী অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন ("representative self-government") দেওয়া হইয়াছে। যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিনিধি-তন্ত্র শাসনপ্রণালী কিনা, তাহা প্রথমে বিচার্য্য।

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এখন ভারত-সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩৪ কোটি। তাহার মধ্যে ৮ কোটি লোক দেশী রাজ্যসমূহে বাস করে। এই আট কোটি লোককে নূতন আইন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে অর্থাৎ ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে মোট যত লোক বাস করে প্রায় তাহাদের সমানসংখ্যক লোককে, এই আইন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। ইহার নাম প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী!

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ ও দেশী রাজ্যসমূহ লইয়া সমগ্র ভারত। এই সমগ্র ভারতের জন্য একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা-পক সভা (Federal Legislature) থাকিবে। উভয়ের মোট সদস্যসংখ্যা হইবে ৬৩৫। ইহার মধ্যে দেশী রাজ্য-সমূহ হইতে আসিবে ২২৯ জন সদস্য, বা এক-তৃতীয়াংশের অধিক। অর্থাৎ যে দেশী রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের মোট লোকসংখ্যার সিকিরও কম, সেই দেশী রাজ্যসমূহ হইতে আসিবে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক সদস্য! তাহারা যদি তথাকার অধিবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইত তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু তাহা হইবে না। এই এক-তৃতীয়াংশের অধিক ২২৯ জন সদস্য দেশী রাজ্যগুলির রাজা মহারাজা নবাব প্রভৃতি জনকতক লোক মনোনীত করিবেন, এবং তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের রেসিডেণ্ট প্রভৃতির প্রভাবাধীন। এই রাজা মহারাজা প্রভৃতিকে এত ক্ষমতা দিবার কারণ, তাঁহারা স্বৈরশাসক (autoc ats) এবং ভারতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের স্বৈরিতার (autocracyর) সমর্থন দ্বারা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকদের স্বরাজ্যলাভ-প্রয়াসে বাধা দিতে পারিবেন।

অতএব, ভারতবর্ষকে কিরূপ প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী দেওয়া হইতেছে তাহা উপরে লিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

তাহার পর, শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করুন।

ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভার দুই কক্ষে ব্রিটিশ-ভারতের সদস্য থাকিবেন ৪০৬ জন। এই ৪০৬ জনের ৪০৬টি আসনের মধ্যে ১৮০টিকে জেনার্যাল অর্থাৎ সাধারণ আসন বলা হইয়াছে। সেইগুলির অধিকারী হইবেন হিন্দুরা ও তাঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি। ব্রিটিশ-ভারতে শুধু হিন্দুরাই সমগ্র লোকসংখ্যার মোটামুটি শতকরা ৭০ জন (হিন্দুদের সঙ্গে সংযুক্ত বৌদ্ধ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম)। এই শতকরা ৭০ জনকে প্রকৃত কোন প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীতে শতকরা ৭০টি আসন দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু নূতন আইন তাহা দেয় নাই! ইহাদিগকে শতকরা ৪৪·৩টি আসন দিয়াছে। যদি এমন হইত, যে, হিন্দুরা ভারতবর্ষে শিক্ষায় বুদ্ধিবিদ্যায় সার্ব্বজনিক হিতকর কার্য্য সম্পাদনে ব্যবসাবাণিজ্যে ধনশালিতায় সর্ব্বাধম, তাহা হইলেও বা তাহাদিগকে এত কম আসন দানের পক্ষে কিছু বলিবার থাকিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ভারতবর্ষে শিক্ষা, বুদ্ধিবিদ্যা, সার্ব্বজনিক কার্য্যে উৎসাহ, ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা ও ধন যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। সুতরাং কি সংখ্যা-বহুলতায়, কি উল্লিখিত কারণে, হিন্দুদের শতকরা ৭০টি আসন ন্যায্য পাওনা। অথচ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৪৪·৩টি মাত্র! ইহারই নাম প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী!

হিন্দুদিগকে এই প্রকারে বঞ্চিত করিবার কারণ, তাহারা অধিক পরিমাণে স্বরাজ্যকামী এবং স্বরাজ্যের অর্থ ব্রিটেনের প্রভুত্বলোপ বা হ্রাস এবং তজ্জনিত নানা দিকে স্বার্থের ক্ষতি।

এই আজব প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালীর আরও বাহার আছে। ইহাতে মুসলমান হইবে মুসলমানের প্রতিনিধি, হিন্দু হইবে হিন্দুর প্রতিনিধি, খ্রীষ্টয়ান হইবে খ্রীষ্টিয়ানের প্রতিনিধি, জমিদার হইবে জমিদারের প্রতিনিধি, ইত্যাদি; কিন্তু সব ধর্ম্মসম্প্রদায় ও সব শ্রেণীর লোককে লইয়া যে মহা-জাতি বা নেশ্যন, তাহার প্রতিনিধি কেহই হইবে না। বস্তুতঃ ভারতীয়দের জাতীয়ত্বা বা নেশ্যনত্ব অস্বীকার করাই এই আইনটির একটি প্রধান কীর্ত্তি। অথচ বলা হইতেছে, এই আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের লোকদিগকে প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী দেওয়া হইতেছে!

নূতন ভারতশাসন আইনে স্বশাসনের রূপ

লর্ড লিনলিথগো বলিয়াছেন, নূতন ভারতশাসন আইন দ্বারা ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনুযায়ী স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আইনটার প্রতিনিধি-তন্ত্র শাসনপ্রণালী কি প্রকার তাহা দেখাইয়াছি। উহা ভারতবর্ষকে স্বশাসন দিতেছে কিনা, তাহা এখন বিচার্য্য।

স্বশাসক দেশসকলের চূড়ান্ত ক্ষমতার পীঠস্থান থাকে সেই সেই দেশেই। যেমন ব্রিটেনের আছে লণ্ডনে, ফ্রান্সের আছে প্যারিসে, আমেরিকার আছে ওয়াশিংটনে, জাপানের আছে তোকিওতে। কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও রাষ্ট্রীয় শক্তির সারবস্তু যাহা তাহা তাহাদের আছে—ব্রিটেন তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কিছু করাইতে পারে না; এবং তাহাদের এই সারবস্তু সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত ক্ষমতার পীঠস্থান তাহাদেরই স্ব স্ব দেশে আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষমতার পীঠস্থান লণ্ডন—দিল্লী নহে, সিমলা নহে। ভারতশাসন আইনের সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও তাহা ভারতবর্ষে কোথাও করা যাইবে না, ৬০০০ মাইল দূরবর্ত্তী লণ্ডনে তাহা হইবে।

স্বশাসক দেশসমূহের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েন তথাকারই কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা তথাকারই কোন লোক-সমষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষের চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন ভারত-বর্ষীয় ব্যক্তি-বিশেষের বা কোন ভারতীয় লোকসমষ্টির হাতে নাই, আছে ব্রিটেনে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের হাতে। নূতন ভারতশাসন আইনের সামান্যতম পরিবর্ত্তনও একমাত্র ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টই করিতে পারে, ভারতবর্ষের কেহ পারে না।

স্বশাসক দেশসমূহ নিজেদের উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগকেও নিজেরাই নিযুক্ত বরখাস্ত অবসৃত উন্নমিত অবনমিত পুরস্কৃত তিরস্কৃত ইত্যাদি করিতে পারে। ভারতবর্ষ গবর্ণর জেনারেলকে বা প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে নিযুক্ত ইত্যাদি করিতে পারেই না, নূতন আইন অনুসারেও পারিবে না; অধিকন্তু যে-সব সাধারণ সিবিলিয়ান জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর হন, পুলিস সাহেব হন, জেলার ডাক্তার সাহেব হন, শিক্ষা-বিভাগের বড় বড় কর্ত্তা হন, জলসেচন-বিভাগের বড় বড় কর্ত্তা হন, তাঁহাদেরও নিয়োগ আদি ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে থাকিবে না। সব করিবেন লণ্ডনে ভারতসচিব বা ভারতে ইংরেজ বড়লাট। সিবিলিয়ান প্রভৃতিরা নামে মাত্র দেশী মন্ত্রীদের তাঁবেদার হইবেন। মন্ত্রী বেচারারা তাঁহাদের বেতন বাড়ান কমান পদচ্যুতি ইত্যাদি তো করিতে পারিবেনই না, বদলী পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না! মন্ত্রীদের বেতন কমান বাড়ান, মঞ্জুর না-মঞ্জুর করা, তাঁহাদিগকে অপসারিত করা, এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সমূহের সাধ্যায়ত্ত। নূতন আইনে তাহা থাকিবে না, মন্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণরের অধীন হইবেন।

কানাডাকে, অষ্ট্রেলিয়াকে, দক্ষিণ-আফ্রিকাকে, আয়ার্ল্যাণ্ডকে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট যেরূপ আইন দ্বারা স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিল, নূতন ভারতশাসন আইন সেরূপ কোন বিধি নহে। ইহা সেরূপ কোন স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই। শুধু তাই নয়। ব্রিটেনের ভক্ত ও পক্ষসমর্থক কাহারও ইহা বলিবারও উপায় নাই, যে, এই আইন একবারে এখনই স্বায়ত্তশাসন না দিয়া থাকিলেও ইহার জোরে ভারতবর্ষ ধাপে ধাপে ক্রমশঃ স্বরাজ্যসৌধে আরোহণ করিবে। কারণ, এই আইনের কোথাও এমন কোন কথা নাই, যে, ভারতীয়েরা ভবিষ্যতে অধিকতর ক্ষমতা পাইবে, কোথাও এমন একটি ধারা নাই যাহার প্রভাবে ভারত অধিকতর ক্ষমতা পাইতে পারিবে, এমন কোন সর্ত্ত নাই যাহা পূরণ করিলে স্বরাজ পাওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায়, এই আইন স্বরাজ-প্রদাতা আইন নহে, ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনের দ্বারা প্রাপ্য স্বরাজের আইনও ইহা নহে।

ভারতবর্ষকে ইহা কি ক্ষমতা দিয়াছে—অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে কি ক্ষমতা দেয় নাই, সে-বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

স্বশাসক দেশসমূহ আত্মরক্ষার মালিক। তাহারা জলে স্থলে আকাশে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং করে। সেই উচ্চ অধিকার ও কর্ত্তব্য তাহাদেরই। ভারতবর্ষের স্থল-সৈন্যদলের কর্ত্তা ভারতবর্ষ নহে, ব্রিটেন। প্রধান সেনাপতি, ছোট ছোট সেনানায়ক ও অন্য সামরিক অফিসারদের নিয়োগ ব্রিটেনের বা ব্রিটেনের রাজপুরুষদের হাতে। প্রধান ও অপ্রধান সামরিক অফিসাররা প্রায় সবাই ব্রিটিশ। সামরিক বিভাগটা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্পূর্ণ অধিকার-বহির্ভূত। নামমাত্র রণতরী সামান্য যাহা আছে, আকাশ-যুদ্ধের সামান্য ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহার উপরও ভারতীয়দের কোন হাত নাই।

অতএব স্বশাসনের একটি প্রধান অঙ্গ ভারতীয়দের নাই।

প্যালেষ্টাইনে আরব বিদ্রোহ : টেল-আবিবের কারাগারে আরব বন্দীদিগকে খানাতল্লাস করা হইতেছে

ইঙ্গ-মিশর চুক্তির স্বাক্ষর ; নাহাশ পাশা বক্তৃতা করিতেছেন
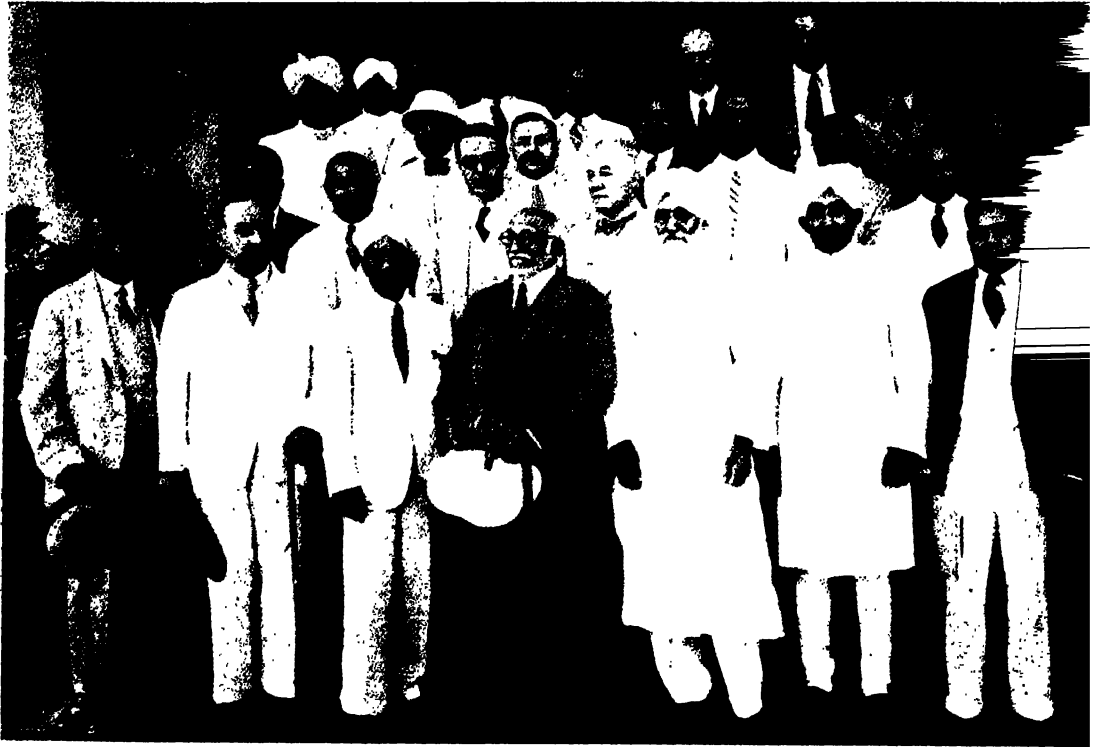
বোম্বাইয়ে দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী-সম্মিলন : ফেডারেশন-সম্পর্কিত প্রশ্নাদির আলোচনার জন্য ইহারা সম্মিলিত হইয়াছে

বোম্বাইয়ে বণিক-পরিষৎ দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন

বার্লিন ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা হইতে সম্প্রতি প্রত্যাগত অমরাবতী হনুমান-ব্যায়ামশালার সভ্যগণ
কে এফ নরীম্যান (মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান) ইহাদের সংবর্দ্ধনা করিতেছেন

গোয়া বন্দর। জর্ম্মণ গবর্ম্মেণ্ট প্রাচ্যে নাৎসিবাদ প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই বন্দর পর্টুগীজ গবর্ন্মেণ্টের
নিকট হইতে কিনিয়া লইবেন শোনা গিয়াছে।

হ্যারি রিচমণ্ড ও ডিক মেরিল বিমানযোগে আটলাণ্টিক পাড়ি দিতে যাত্রা করিতেছেন ;
জনতা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

বিগত ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দৌড়ে স্বর্ণপদক-বিজেতা, "কালো চিতা" (ব্ল্যাক প্যান্থার) জেসি
আওয়েন্স লণ্ডনে স্বাক্ষর-প্রার্থী ছাত্রদের সহিত স্বীয় দৌড়ের নৈপুণ্য দেখাইতেছেন।

পুলিস-বিভাগও কার্য্যতঃ ভারতীয় মন্ত্রীদের অধীন থাকিবে না। কোন মন্ত্রী পুলিসের গোপনীয় কথা জানিবার অধিকারী হইবেন না।

অর্থাৎ ভারতীয় লোকপ্রতিনিধিরা যত ইচ্ছা বকুন, সৈনিক ও পুলিস-বিভাগের নিম্নতম লোকটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে থাকিবে। তাঁহাদের মতামতের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া তাহারা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

স্বশাসক দেশের একটা প্রধান অধিকার ও কর্ম্মচারীদিগকে লোকমত অনুসারে চালাইবার প্রধান উপায় রাজস্বের উপর ক্ষমতা। অর্থাৎ স্বশাসক দেশে লোকপ্রতিনিধিদের মত অনুসারে ট্যাক্স বসে, বাড়ে, কমে, উঠিয়া যায়, এবং ট্যাক্সদ্বারা লব্ধ অর্থ কি ভাবে খরচ করা হইবে, তাহাও লোক-প্রতিনিধিরা স্থির করেন। কিন্তু ভারত-গবর্ন্মেণ্টের রাজস্বের শতকরা ৮০ টাকা ননভোটেবল্, অর্থাৎ গবর্ন্মেণ্ট তাহার ব্যয় সম্বন্ধে লোকপ্রতিনিধিদের মত লইতে বাধ্য নহেন। বাকী শতকরা কুড়ি টাকার ব্যয় ভোটেবল্ অর্থাৎ লোকপ্রতিনিধিদের সম্মতিসাপেক্ষ হইলেও, গবর্ণর-জেনারেলকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভোটেবল্ খরচগুলিও তিনি লোকপ্রতিনিধিদের অসম্মতি সত্ত্বেও করিতে পারিবেন। অর্থাৎ ভারত-গবর্ন্মেণ্টের রাজস্বের শতকরা ৮০ টাকার উপর লোক-প্রতিনিধিদের কোনই ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকিবে না, বাকী ২০ টাকার উপরও ক্ষমতা থাকা না-থাকা গবর্ণর-জেনারেলের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে।

প্রদেশগুলির রাজস্ব সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অনেকটা এইরূপ।

অতএব নূতন ভারতশাসন আইন আমাদিগকে সেইরূপ স্বশাসন দিয়াছে, যেমন এক জন গৃহস্বামী তাহার সর্ব্বস্বের উপর অধিকার ব্যক্তিবিশেষকে এই বলিয়া দিয়াছিলেন, "সর্ব্বস্ব তোমার, কেবল চাবিটি আমার।"

বিদেশের ও বিদেশীদের সহিত মিত্রতা ও যুদ্ধবিগ্রহ আদির কথাবার্ত্তা চালান এবং চুক্তিসন্ধি প্রভৃতি করা স্বশাসক দেশের একটি প্রধান অধিকার। এ সব বিষয়ে ভারতবর্ষের লোক-দের তো কোন অধিকার থাকিবেই না, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি, ভারতীয়দের বিদেশযাত্রা ও তথায় বসবাস এবং বিদেশীদের ভারতে আগমন ও এখানে বসবাস ইত্যাদি বিষয়েও আমাদের কোন অধিকার থাকিবে না।

খ্রীষ্টিয় ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদের বেতনাদির উপরও আমা-দের কোন হাত থাকিবে না। অর্থাৎ প্রধানতঃ অখ্রীষ্টিয়ান করদাতাদের টাকা হইতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকদের পুষ্টি সাধিত হইতে থাকিবে।

মুদ্রাবিনিময়ের দর, স্বর্ণমান, রৌপ্যমান, নোটের প্রচার বাড়ান কমান, বাণিজ্য-শুল্ক বসান উঠান কমান বাড়ান, দেশী লোকদের মূলধন ও দেশী লোকদের দ্বারা চালিত পণ্যদ্রব্যের কারখানায় সরকারী সাহায্য দান, ইত্যাদি কাজ স্বশাসক দেশের লোকপ্রতিনিধিদের মত অনুসারে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে তাহা হইবে না।

রেলওয়ের দ্বারা শুধু লোকদের যাতায়াত নহে, দেশের পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং স্বাস্থ্যের সহিতও ইহার সম্পর্ক আছে। স্বশাসক দেশসমূহের রেলগুলি সেই দেশেরই কল্যাণার্থ বিদ্যমান। ভারতবর্ষের রেল সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। ভবিষ্যতে অবস্থা আরও খারাপ হইবে। কারণ, রেলওয়ে-বিভাগের উপর লোকপ্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না—ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে একটি স্ট্যাটুটারি রেলওয়ে বোর্ডের উপর। তাহাতে ইংরেজদেরই প্রভুত্ব থাকিবে।

সমুদ্রপথে যাতায়াতের উপায়ও পররাষ্ট্রগত হইয়া গিয়াছে। উহাকে স্বরাষ্ট্রগত করা নূতন আইন সুদূরপরাহত করিয়া দিয়াছে।

আকাশযান সম্পূর্ণ গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতার অধীন।

ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত যে-কোন আইন গবর্ণর-জেনারেল বা গবর্ণরের সম্মতিসাপেক্ষ হইবে। সম্মতি না দেওয়ার, প্রতিষেধ করিবার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে। ইহার কোন প্রতিকারের উপায় আইনে নাই।

গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণর নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিবেন।

অতঃপর এমন একটি ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেলকে দেওয়া হইয়াছে, যাহা ইংলণ্ডে রাজারও নাই। গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণরেরা ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতিরেকে, ব্যবস্থাপক সভার অসম্মতি বা আপত্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং স্থায়ী আইন করিতে পারিবেন। এই সব আইন ঠিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সহযোগে প্রণীত আইনেরই মত বলবৎ ও কার্য্যকর হইবে।

ইহার নাম স্বায়ত্তশাসন! গবর্ণর-জেনারেল-আয়ত্ত ও গবর্ণর-আয়ত্ত শাসন বলিলে অধিকতর অন্বর্থ হইত।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই, যে, গবর্ণর-জেনারেল আবশ্যক মনে করিলে সমগ্রভাবে নূতন আইনে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগের কার্য্যের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত বা অংশতঃ রদ করিয়া সমুদয় বা কোন কোন বিভাগ চালাই-বার ক্ষমতা নিজের হাতে লইতে পারিবেন। প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকেও তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদেশে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ এই তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন-প্রদায়ক আইন প্রণয়ন করিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট স্বায়ত্তশাসন তো ভারতীয়-দিগকে দেনই নাই, অধিকন্তু প্রধান শাসকদিগকে তাঁহাদের বিবেচনায় সঙ্কটসময়ে স্বৈরশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন।

পূজার ছুটি

শারদীয় পূজা উপলক্ষে প্রবাসী-কার্য্যালয় ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর হইতে ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

প্রজাপতির লুকোচুরি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পাখীরাই সাধারণতঃ কীটপতঙ্গের প্রধান শত্রু। পাখী এবং অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ এড়াইবার জন্য কীটপতঙ্গ-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অনুকরণপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পাখীকে সাধারণতঃ ফড়িং বা প্রজাপতিকে আক্রমণ করে না। গুবরে-পোকা, বাদলা-পোকা আকাশে উড়িবামাত্রই যেমন বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইবার জন্য আকাশ ছাইয়া ফেলে, ফড়িং ও প্রজাপতির বেলায় তাহার বিপরীত ঘটনাই পরিলক্ষিত হয়। ফড়িং ও প্রজাপতিরা পাখীদের আশেপাশে নির্ভয়ে উড়িয়া বেড়ায়। ফড়িংদের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য শত্রুতা যথেষ্ট; সুযোগ পাইলেই সবল দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া খাইয়া ফেলে। কিন্তু প্রজাপতিদের মধ্যে সেরূপ কোন শত্রুতা নাই। তথাপি কোন কোন জাতের প্রজাপতির মধ্যে অদ্ভুত অনুকরণপ্রিয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রজাপতিদের স্বাভাবিক শত্রু যে একেবারেই নাই তাহা নহে। টিকটিকি, গিরগিটি, কোন কোন জাতের মাকড়সা ও পিপীলিকা সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের অপরূপ সৌন্দর্য্য ও বর্ণবৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া মানুষেরাও ইহাদের যথেষ্ট শত্রুতা করিয়া থাকে। বোধ হয় এই স্বাভাবিক শত্রুদের কবল হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন কোন জাতের প্রজাপতি ডানা মুড়িয়া গাছের পাতার অনুকরণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা দুর্গন্ধ ছড়াইয়া শত্রুকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিবৃত্ত করে। আমাদের দেশীয় 'মথ'-জাতীয় এক প্রকার শ্বেত প্রজাপতি ঠিক পাখীর বিষ্ঠার অনুকরণ করিয়া থাকে। এই প্রজাপতিদের আকৃতি-প্রকৃতি অতি অদ্ভুত; দেখিতে ঠিক পাতলা টিস্যু' কাগজের ন্যায়। ডানার পৃষ্ঠদেশে দুই প্রান্তে দুইটি কালো ফোঁটা আছে। মনে হয় যেন দুটি চোখ। ইহারা ডানা মেলিয়া পাতার গায়ের সঙ্গে এমন ভাবে লাগিয়া থাকে যে সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি সত্ত্বেও, বিশেষ মনোযোগ করিয়া না দেখিলে পাতার উপর চূণের দাগের মত মনে হয়, ক্রমবিবর্ত্তনের ফলেই হয়ত প্রজাপতির এই প্রকার অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'হয়ত' বলিলাম এই জন্য যে, পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখিয়াছি— কোন কোন জাতের মাকড়সারা পিপীলিকার হুবহু অনুকরণ করিয়াও শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আশেপাশে বিভিন্ন জাতের মাকড়সা থাকাসত্ত্বেও কোন কোন কুমীরে-পোকা, বাছিয়া বাছিয়া ঠিক একই রকমের বহুসংখ্যক পিঁপড়ে-মাকড়সা শিকার করিয়া তাহাদের গর্তের মধ্যে রাখিয়া দেয়। ইহা হইতেই সন্দেহ জন্মে প্রজাপতির অনুকরণপ্রিয়তাও সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক কি না।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিবার এবং সেই সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারের সুরক্ষিত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আত্মগোপন করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। যে-সকল প্রাণী বাসস্থান নির্ম্মাণ করে না তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম উপভোগ করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের আশেপাশে অহরহ যে-সকল প্রজাপতি দেখিতে পাই তাহারা কেহই বাসা বাঁধে না; কিন্তু নিরুপদ্রবে অবসরকাল কাটাইবার জন্য আত্মগোপনোপযোগী বিশ্রামস্থল বাছিয়া লয়। ইহার ফলে সুরক্ষিত বাসগৃহ না থাকিলেও অপেক্ষাকৃত অনাবৃত স্থানে থাকিয়া ইহারা মানুষ বা অন্যান্য শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হয়। এস্থলে আমাদের দেশের কয়েক প্রকার সাধারণ প্রজাপতির বিশ্রামকালীন আত্মগোপন কৌশলের বিষয় আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে সচরাচর এক প্রকার সাদা প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ডানা প্রসারিত করিলে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাশাপাশিভাবে দুই ইঞ্চিরও কিছু বেশী লম্বা হয়। ডানার উপরিভাগ দুধের মত সাদা; কিন্তু উভয় ডানার সংযোগস্থল হইতে কতকটা অংশ ঈষৎ হলদে। ডানার নিম্নভাগ নীলাভ ফিকে সবুজ। উড়িবার সময় সাদা দিকটাই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। উড়িতে উড়িতে কখনও অল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে উহারা সাধারণতঃ যমজপত্রসমন্বিত গাছের পাতার উপর আধাআধি ডানা মেলিয়া বসে। পাতার রঙের সহিত ইহাদের গায়ের রং ও আকৃতি এমন ভাবে মিলিয়া যায় যে, অতি নিকটে থাকিয়াও ইহাদিগকে গাছের পাতা বলিয়া ভুল হয়। কিন্তু

প্রজাপতির লুকোচুরি
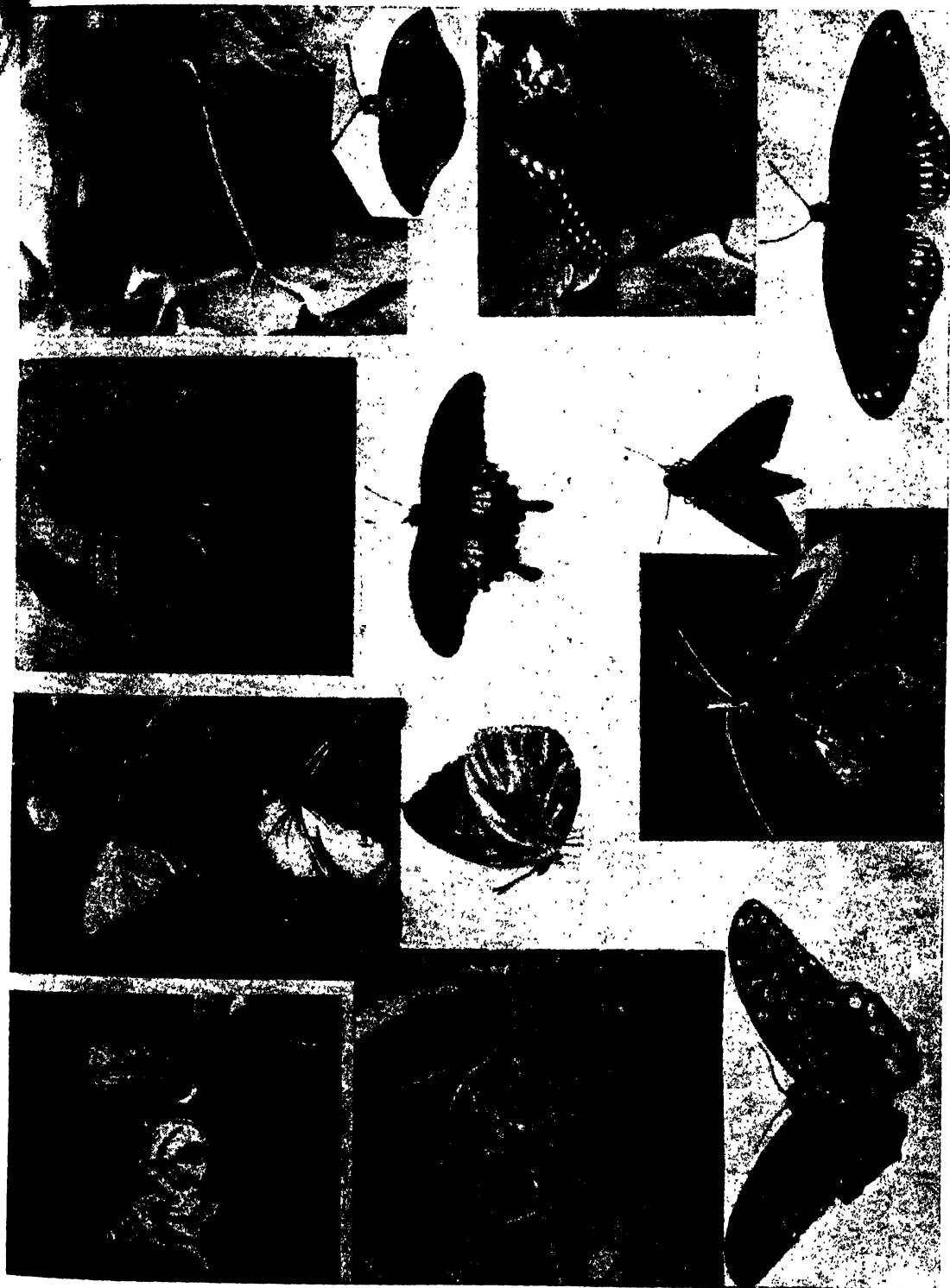
ভয় পাইলে, অথবা রাত্রিবাস করিবার সময় উড়িয়া গিয়া গাছের উঁচু ডালের পাতার উপর ডানা মুড়িয়া বসে। তখন পাতার রঙের সহিত এমন ভাবে মিলিয়া থাকে যে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাশাপাশিভাবে প্রায় তিন ইঞ্চি, সাড়ে-তিন ইঞ্চি লম্বা ফিকে হলদে রঙের এক প্রকার প্রজাপতিকে সর্ব্বদাই ফুলে-ফুলে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাদের ডানার উপরে ও নীচে বড় বড় কতকগুলি কালো ফোঁটা আছে। ডানার এই বর্ণ-বৈচিত্র্য বশতঃ হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশ্রাম করিবার সময় ইহারা পত্রবিরল লতার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ডানা গুটাইয়া এই জাতীয় লতার মধ্যে অবস্থানকালে লতার আঁকাবাঁকা ডাঁটাগুলির সঙ্গে মিলিয়া প্রজাপতির গায়ের বর্ণগুলি এমন একটা দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করে যে উহার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও প্রজাপতি লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।

এদেশের বনে জঙ্গলে 'লাল-ফোঁটা' বা রক্ত-তিলক নামে ঘোর কালো রঙের এক প্রকার বড় বড় প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রজাপতির নিম্ন ডানার প্রান্তভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কতকগুলি রক্তবর্ণ ফোঁটা সারবন্দীভাবে অঙ্কিত থাকে, নিম্নভাগের ডানার মধ্যস্থলে পাশাপাশিভাবে কয়েকটি সাদা দাগ আছে। দিনের বেলায় ক্ষণিক বিশ্রাম করিবার সময় এবং রাত্রিকালে এই প্রজাপতিরা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ঝোপের মধ্যে গাঢ় সবুজ রঙের পাতার উপরেই ইহারা বসিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রজাপতিদের ডানার নিম্নভাগের রং ফিকে এবং নিষ্প্রভ হইয়া থাকে এবং বসিবার সময় ডানা ভাঁজ করিয়া রাখে, কাজেই সহসা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কিন্তু এই রক্ত-তিলক প্রজাপতিদের ডানার নীচের দিক উপরের দিক অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। যে কারণেই হউক, ইহারা ডানা ভাঁজ করিয়া বসে না, মথ' জাতীয় প্রজাপতিদের মত ইহারা ডানা মেলিয়াই বিশ্রাম করে। কাজেই পৃষ্ঠদেশের অনুজ্জ্বল অংশই বাহিরের দিকে থাকে। অন্ধকার স্থানে গাঢ় রঙের পাতার উপর বিশ্রাম করিবার ফলে ইহারা অনায়াসে শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে।

আর এক প্রকারের কালো রঙের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ক্ষুদ্রতর ডানা দুইটির প্রান্তভাগে সারবন্দীভাবে কতগুলি সাদা ফোঁটা থাকে। এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং নিম্নভাগের রং অপেক্ষা অনেক হাল্কা ও অনুজ্জ্বল। গাছের যে-সব পাতা শুকাইয়া কালো হইয়া ঝুলিয়া থাকে এই প্রজাপতিরা সেই সব পাতার গায়ে বসিয়া অতি সহজে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি লম্বা হলদে রঙের এক প্রকার প্রজাপতিকে দলে দলে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা বিশ্রাম-সময়ে এক প্রকার ফিকে হলদে রঙের পাতাওয়ালা ছোট ছোট গাছের ডালে ডানা মুড়িয়া বসিয়া থাকে। হঠাৎ দেখিয়া ইহাদিগকে সেই গাছের পাতা বলিয়াই মনে হয়।

দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি লম্বা মথ'-জাতীয় এক প্রকার প্রজাপতিকে গাছের পাতার উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অধিকাংশ সময়ই ইহারা বসিয়া কাটায় এবং মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে ডানা নাড়িয়া থাকে। প্রায়ই ইহাদিগকে আমগাছের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গুটীর রং আমপাতার মত গাঢ় সবুজ এবং শরীর ত্রিকোণাকার গুটীগুলি আমপাতার গায়ে ঝুলিয়া থাকে। পাতা ও গুটীর রং এক হওয়াতে কদাচিৎ নজরে পড়িয়া থাকে। এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং ধূসর কিন্তু তলদেশ হাল্কা ধূসর বা ফ্যাকাশে রঙের। এই প্রজাপতিরা যখন পাতার উপর বসিয়া বিশ্রাম করে তখন পৃষ্ঠদেশই নজরে পড়ে এবং পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙের বিশেষ কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে পাতার উপর বসিয়া থাকিলে ইহারা মোটেই নজরে পড়ে না।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা মথ'-জাতীয় পতঙ্গদের গায়ের রং সাধারণতঃ অনেক স্থলেই ধূসর বা অনুজ্জ্বল বাদামী হইয়া থাকে। ইহারা ছোট ছোট গাছের শুষ্কপত্রের উপর নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে। তখন শুষ্ক পত্রের রং-এর সঙ্গে যেন ভাবে মিলিয়া থাকে যে সহজে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না, মনে হয় যেন শুষ্ক পত্রেরই একটা ছিন্ন অংশ আটকাইয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে এই জাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর পতঙ্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে রং মিলাইয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিবার কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

চিত্রপরিচয়

উপরের সারি (বাঁ দিক হইতে) হলদে রঙের প্রজাপতি ডালের গায়ে পাতার ফাঁকে বসিয়া আছে। কাঞ্চনফুলের পাতার উপর সাদা প্রজাপতির বিশ্রাম—পাতার আকৃতি ও রঙের সহিত প্রজাপতির সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান (তন্নিম্নে, সাদা প্রজাপতি, সাধারণ ভাবে)। ঝোপের পাশে কালো রঙের পাতার মধ্যে রক্ততিলক প্রজাপতির আত্মগোপন (তন্নিম্নে, রক্ততিলক প্রজাপতি, সাধারণভাবে)। 'মথ' জাতীয় ধূসরবর্ণ প্রজাপতি পাতার উপর বসিয়া আছে (তন্নিম্নে, ঐ 'মথ'-জাতীয় প্রজাপতি)।

বাঁ দিকে উপর হইতে দ্বিতীয় চিত্র: পাতার ঝোপে কালো ফোঁটাওয়ালা হলদে প্রজাপতির আত্মগোপন (তন্নিম্নে, ঐ প্রজাপতি, সাধারণ অবস্থায়)।

ডান দিকে উপর হইতে তৃতীয় চিত্র: সাদা ফোঁটাওয়ালা কালো প্রজাপতি শুষ্ক পত্রের সহিত ডানা মিলাইয়া আছে (তন্নিম্নে, ঐ প্রজাপতি সাধারণ অবস্থায়)।

নিম্নের সারির মধ্যভাগের চিত্র: ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা 'মথ'-জাতীয় পতঙ্গ গাছের শুষ্ক পত্রের সঙ্গে রং মিলাইয়া আছে (তৎপার্শ্বে, ঐরূপ পতঙ্গ, সাধারণ অবস্থায়)।
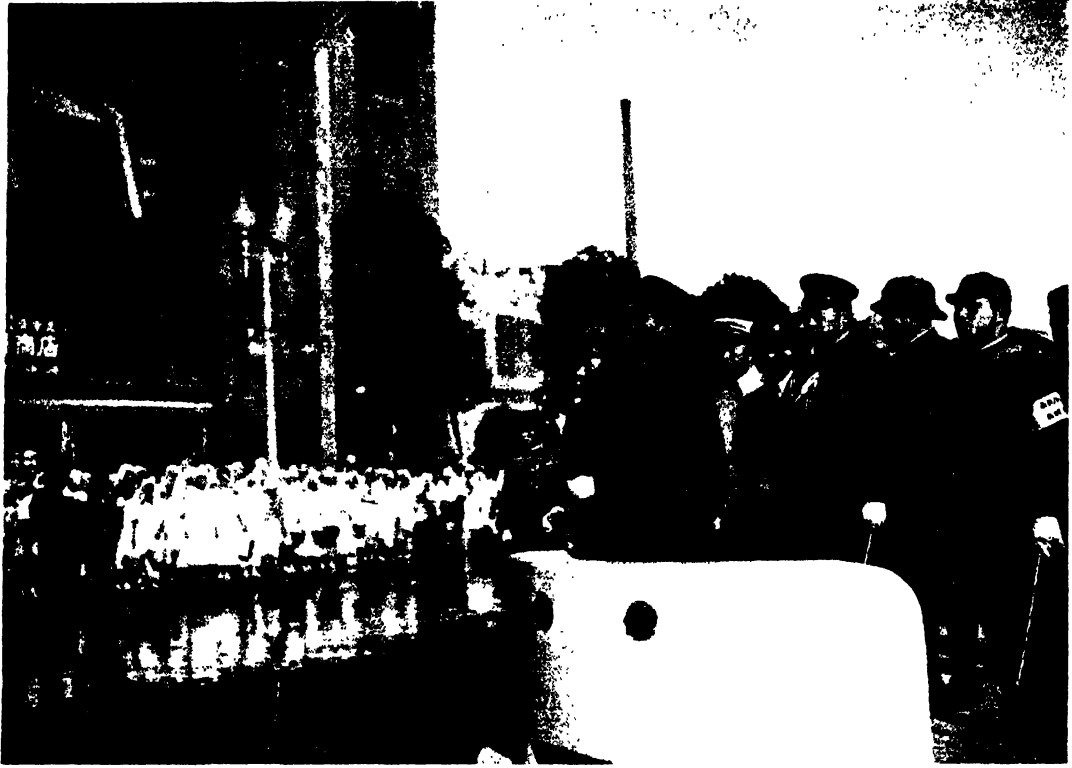
বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধে শিক্ষিত জনসাধারণকে জাপানের প্রিন্স চিচিবু পর্যবেক্ষণ করিতেছেন

ইংলণ্ডের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম

জার্ম্মেনীতে ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা
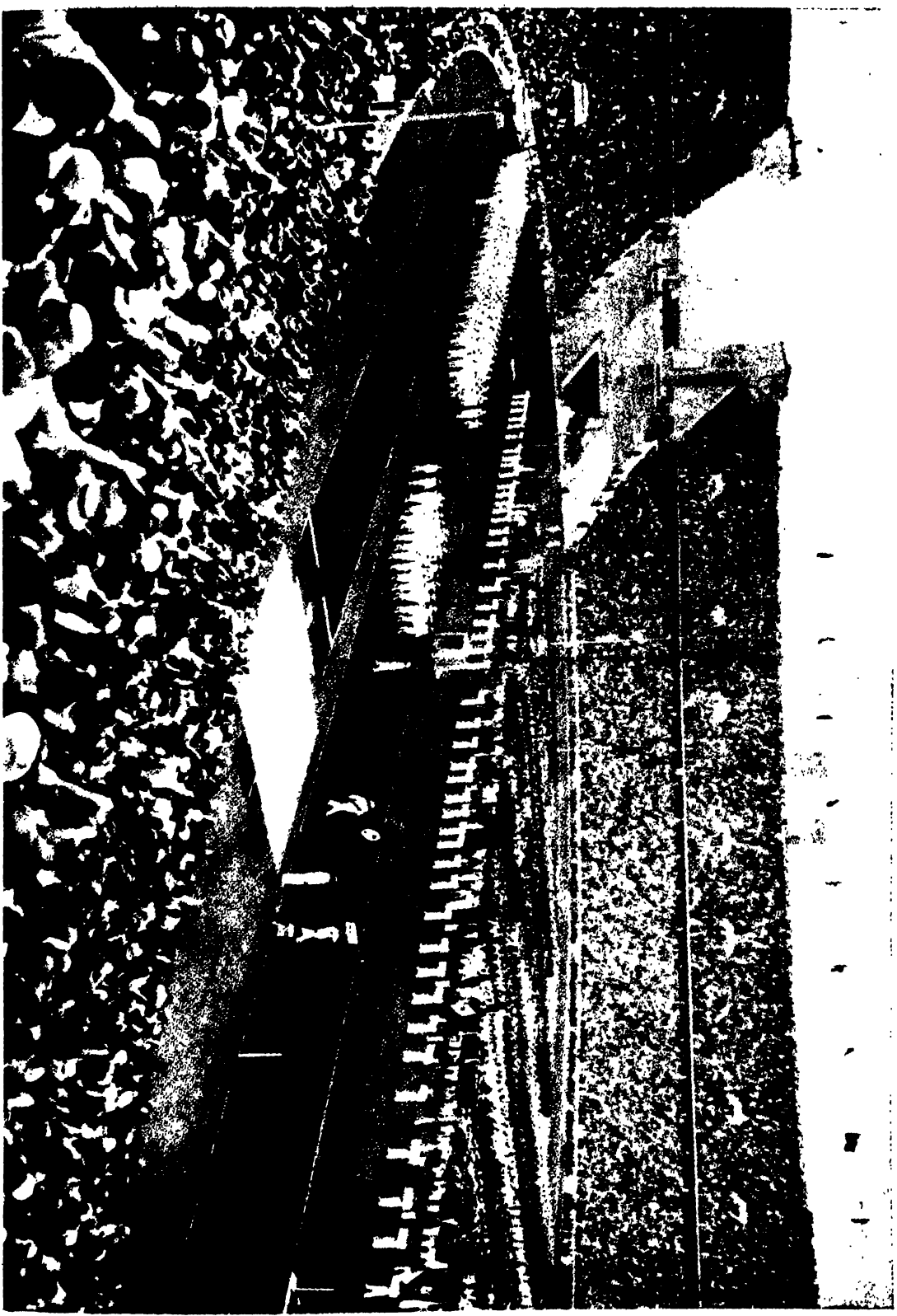
জার্ম্মেনীতে ওলিম্পিক ক্রীড়া-সংশ্লিষ্ট নৃত্যাবলী ঃ জার্ম্মেনীর শ্রমিকদের অবসর-বিনোদন

মেরী উইগম্যান

শ্রমিক-তরুণীদের ক্রীড়

মারিয়ান ভোগেলসাঙ্

ক্যাল কেমি কোর
— কেশ প্রসাধনী
শুদ্ধ সুগন্ধি
লাইম জুস গ্লিসারিণ
কেশের পারিপাট্য সাধন
করে
লাইজু
সুরভি সংযুক্ত
মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
চুল ঘন কালো করে
ও
মস্তিষ্ক শীতল
রাখে
BHRINGOL
ভৃঙ্গল
চামেলিগন্ধ
বিশুদ্ধ
তিল তৈল
শীতল ও
প্রীতিকর
Tilol
তিলল
গন্ধরাজের
সুগন্ধযুক্ত
বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল
কেশ বর্দ্ধন
করে
KoKonol
কোকোনল
কেশমার্জ্জন ও
মাথাঘষার জন্য
সুগন্ধি "শ্যাম্পু"
বা
সাবানের নির্য্যাস
সিলট্রেস
স্নিগ্ধ সুরভিত
বিশুদ্ধ ক্যাস্টর অয়েল
টাকপড়া
রোধ করে
ক্যাষ্টরল
ক্যালকাটা কেমিক্যাল বালিগঞ্জ কলিকাতা
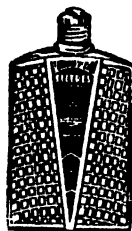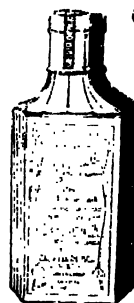
সম্প্রতি নূতন করিয়া ইংলণ্ড ও মিশরে যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে সুদান ইঙ্গ-মিশরীয় প্রথম চুক্তি বলেই শাসিত হইবে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ঘটনার পর অংশীদারেরা যে সকল ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এখন তাহা লাভ করিল, সন্ধির প্রথম ও প্রধান লাভ ইহাই।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

বিদেশে ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র-সম্মেলন

গত ১০ই জুলাই হইতে ১২ই জুলাই চেকোশ্লোভাকিয়া প্রাগ শহরে প্রবাসী ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,

"ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষের কোন প্রকৃত প্রতিনিধি নাই; আমাদের সম্মিলন বিদেশে এই ভারত-পরিচয়ের পথ গ্রহণ করিতে পারে। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের কথা, বর্তমান আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা, জাতীয় সংগ্রামের কথা, বিদেশে সম্যক প্রচারের ও অনুকূল জনমত গঠনের ভার আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।"

সম্মিলনে সম্প্রদায়মূলক অনেক প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আনন্দ-সূচক একটি প্রস্তাবও সম্মিলনে গৃহীত হয়।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় →

ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র সম্মিলন ... শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ... ডা. বাক্লা, পাদের মহর, ... অধ্যাপক লেমান

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থা হইতেই ভারতবর্ষের চিত্র ভাস্কর্য্য স্থাপত্য বিষয়ক সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রশংসনীয় অনুসন্ধিৎসা দেখাইয়া আসিতেছেন। তিনি অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার সমধিক কৃতিত্বের সূচনা করে। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিয়া তথায় কয়েক শতাব্দী আগে আগত বাঙালী উপনিবেশিকদের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয়। এত আগেকার বাঙালী ব্রহ্মদেশে আছেন তাহা আমরা জানিতাম না। কয়েকদিন পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে জয়পুর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাস বলিতেছিলেন, তিনি একবার জয়পুরে একদল ব্রহ্মদেশীয় বাঙালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা কতকটা ব্রহ্মদেশীয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা প্রায় ২০।২৫ জন তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়

এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙালী রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সংযুক্ত-প্রদেশে আসিয়া ইনি আলিগড়ে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৮০ সালে ইনি মুনসেফ হন এবং নানা শহরে নানা পদে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া ১৯০৭ সালে কানপুরে ছোট আদালতে জজরূপে অবসর গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ইঁহার পরলোক গমনে এলাহাবাদের ও এই অঞ্চলের বাঙালী ও অ-বাঙালী সমাজ বিশেষ সন্তপ্ত।

—

ভারতবর্ষ

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন : চতুর্দ্দশ অধিবেশন

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন আগামী বড়দিনের অবকাশে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের কার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সম্মেলনের কার্য্যালয় বর্ত্তমানে সি ১৪, হিনু ; পোঃ হিনু, রাঁচি, এই ঠিকানায় অবস্থিত। সম্মেলন-সংক্রান্ত পত্র ব্যবহার এই ঠিকানায় করিতে হইবে।

রাঁচি অধিবেশনে প্রবাসী বাঙালীর চিরহিতৈষী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একাধিক সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হইবে বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের মূল ও বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিত্ব করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মূল ও সাহিত্য— রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও সাংবাদিকতা — শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
(প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সম্পাদক)

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব— ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ পি-এইচ্-ডি।
(লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)

সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু। (সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বারাণসী।)

ইতিহাস, বৃহত্তর-বঙ্গ ও প্রত্নতত্ত্ব— ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,
এম-এ, পি আর-এস, পি-এইচ্-ডি। (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)

মহিলা বিভাগ —শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

অবশিষ্ট বিভাগগুলির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে বিজ্ঞাপিত হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী,
সহকারী সম্পাদক, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন
চতুর্দ্দশ অধিবেশন, রাঁচি।

ভ্রমসংশোধন

আষাঢ়ের প্রবাসীতে অন্ধ্রদেশ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, কাকানাড়ার ডাক্তার স্বামীর পুত্র বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে শিক্ষানবীশ আছেন। ইহা ভ্রম। সেখানে তাঁহার কাজ শিখিবার কথা হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তিনি কলিকাতার অন্য একটি রাসায়নিক কারখানায় প্রবেশ করেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
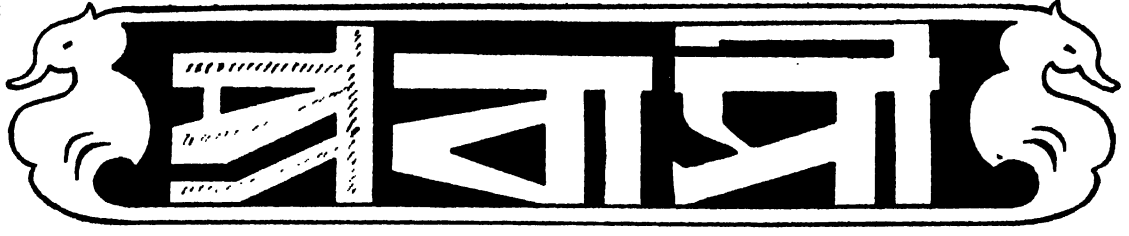
"সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড — অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ — ২য় সংখ্যা

ঘট ভরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"শেষ সপ্তকে" সাতাশ-সংখ্যক যে কবিতাটি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে সেটা মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা হয়েছিল। তারই পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে পাঠানো হ'ল। শান্তিনিকেতন ২৪শে আশ্বিন ১৩৪৩

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকাল পেতে রাখি
ঝরণাধারার নিচে।
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
সবুজ দিয়ে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝরঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে
বেগনি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ঐ হাটের মানুষ
ধারে ধারে উঠছে চড়াইপথে,

বলদ দুটোর পিঠে বোঝাই
শুকনো কাঠের আঁটি ;
ঝুনুঝুনু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।
ঝরঝরানি আকাশ ছাপিয়ে
ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
পথহারানো দূর বিদেশে ।

রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রং,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
বেলা হ'ল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়
"দেরি করলি কেন ?"
চুপ ক'রে সব শুনি ;
ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না ত কেউ ॥

"ঘট ভরা" কবিতার বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি

নারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই পেটাই করা মিস্ত্রীর কাজে। সেটা আধখানা শেস হ'তে-না-হ'তেই প্রকৃতি সুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীব-পালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল ক'রে জড়িত করেছেন নারীর দেহ মনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি, নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে, নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে স্নেহে সকরুণ ধৈর্য্যে। মানব-সংসারকে গড়ে তোলবার বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এ সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকার-প্রকার-হীন বাষ্পের মত; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্ত্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদি প্রাণের সহজ প্রবর্ত্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেই জন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত—তা প্রয়োজন অনুসারে বিধিপূর্ব্বক খনন করা জলাশয়ের মত নয়, তা উৎসের মত, যার কারণ আপন অহৈতুক রহস্যে নিহিত।

প্রেমের রহস্য, স্নেহের রহস্য অতি প্রাচীন; এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্যে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্যা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই গৃহে নারী যেমনই প্রবেশ করেছে, কোথা থেকে অবতীর্ণ হ'ল গৃহিণী, শিশু যেমনই কোলে এল, মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধা-তরঙ্গের ওঠা-পড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় পর্য্যস্ত ক'রে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন ক'রে বাঁধতে হয় তার কীর্ত্তির ভূমিকা। পাল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম্ম কেবলই দেহ পরিবর্ত্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্য পরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটি-সংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড় হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এই রকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থির প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ ক'রে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রলয়াবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মত, ঝড়ের মত, দাবদাহের মত, আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্য্যন্ত কতবার সে গ'ড়ে তুলেছে আপন বিধি বিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হ'ল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর এক কালে, উল্‌টিয়ে গেল তার ইতিহাস। করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলটপালটের ভিতর দিয়ে নারীর

জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়-সম্পদ দিয়েছেন নিত্য কৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ঘোরায়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্যে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার ইচ্ছার তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই—তাতে বারো আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহিণীরূপে জননীরূপে মেয়েদের যে কাজ, সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসঙ্গত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্য্যের দ্বারা নিজের অনুগত ক'রে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালী ক'রে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্য্যের ঐশ্বর্য্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে কোনো শিক্ষায় কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে সম্বল অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অন্যের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ ঐশ্বর্য্যবান দেশকে বলবান নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ ক'রে রাখতে চায়। অনুর্ব্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখীর ডানা সুন্দর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী ক'রে মানুষ গর্ব্ব অনুভব করে; তার সৌন্দর্য্য সমস্ত অরণ্যভূমির এ-কথা সম্পত্তি-লোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়-মাধুর্য্য ও সেবা-নৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেই জন্যে এটা সর্ব্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না—সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন কি মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দ্দিষ্ট সীমা-বদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা তার বিশ্বাস, বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এই জন্যে নির্ব্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্ব্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন ক'রে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অন্ধ বিচার-বুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দীশালা এমনি ক'রে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

এদিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এশিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্ব্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন ক'রে ঘিরে রাখতে পারে না,—তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হয়ে পড়ছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পাল্‌কির যুগ। মানী ঘরে সেই পাল্‌কির উপরে পড়ত ঘেরাটোপ। বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সব-প্রথমে ভর্ত্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পাল্‌কিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে

সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ-পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা ক'রে রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পাল্‌কির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্ত্তন আপনিই ঘটেছে—এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্ত্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তর-প্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে-মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড় ক'রে চিন্তা করতে বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্ব্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই সুরু হ'তে থাকে। এই অবস্থায় সে নানা রকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হ'তে হবে। সঙ্কীর্ণ সীমায় পূর্ব্বে মন যে-রকম ক'রে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্ত্তনে দুঃখ আছে বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় ক'রে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোট পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না বলেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল, যে-মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্ত্তাদের। তারা জানে অজ্ঞানের, অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছ-শাসনের সুযোগ রচনা করে, মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জ্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে ক'রে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ ক'রে বুদ্ধির চর্চ্চা বিদ্যার চর্চ্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লজ্জা; পূর্ব্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি; বাট্‌না-বাটা কোট্‌না-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ গার্হস্থ্য বাজারদরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো আনা খাটছে না। যে-বিদ্যার মূল্য সার্ব্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবী ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিঃশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিতে আরম্ভ হ'ল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনই একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিল। আজ তা ভেদ ক'রে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে, যা মুক্ত আকাশের, যা সর্ব্বলোকের।

বহু দিনের যে-সব সংস্কার-জড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল, যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মত প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থা-ভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র, অর্থনীতি, সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে ছিল এক-ঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঙ্কস্তরের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত, সেই অরণ্য বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে প্রতিদিন সূর্য্যতেজ সঞ্চয় ক'রে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদ্ঘাটিত হ'ল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্য্য-তেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে, তখনি নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনই অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায় বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছিল অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটি মাত্র বড় আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে-ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে-মানবসমাজে তারা জন্মেছে, সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি কেবল ঘরের লোককে নয় সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতা-দুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে; তারা নির্ম্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ ক'রে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্ব্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে, রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবদ্ধ ক'রে. এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত ক'রে এ সভ্যতা বধ ক'রে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ ক'রে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই সুরু হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না, শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তি-হননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতা-সৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই

আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্ব্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হ'লে মোহমুক্ত মনকে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে—এমন কি, না আসতেও পারে, কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্ব্বাগ্রে।

২ অক্টোবর ১৯৩৬
শান্তিনিকেতন

[নিখিলবঙ্গ মহিলাকর্ম্মীসম্মিলন উপলক্ষ্যে লিখিত]

সেকালের উৎসব

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই বৃদ্ধ বয়সে, যখন সুদূর অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন সর্ব্বাগ্রেই আমার মনে হয় যে, বাঙালীর জীবনের, বাঙালী সমাজের রসধারা যেন অতি দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে বা যৌবনে, দেশে যেরূপ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, আজকাল যেন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। বয়স-দোষে হয়ত আমাদের রসানুভূতি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু সেকালের মত আমোদ-প্রমোদের সার্ব্বজনীন উপাদানও ত এখন আর দেখিতে পাই না। সেকালে লোকে যেমন নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত, রবাহূত-অনাহূত সকলকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিত, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। হয়ত মফস্বলে, পল্লীগ্রামে এখনও সেইরূপ ভোজে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" হইয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে এবং মফস্বলের অনেক শহর অঞ্চলেও সেরূপ 'ঢালাও' খাওয়ান আজকাল এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। পঁচিশ জন লোককে নিমন্ত্রণ করিলে যে এক শত লোকের মত আয়োজন করিতে হয়, তাহা এখন কয় জন গৃহস্থ বা ধনবান মনে করেন? সেকালে সবই যেন অপরিমেয় ছিল, একালে সমস্ত ব্যাপারই যেন বাজেট করিয়া—মাপকাঠিতে মাপিয়া করা হয়। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, এক শত লোককে নিমন্ত্রণ করিলে লোকে এক মণ ময়দা, এক মণ মিষ্টান্ন, এক মণ দধি এবং তদনুরূপ তরকারির আয়োজন করিতেন। অথচ তাঁহারা জানিতেন যে, এক মণ ময়দার লুচি এক শত ব্যক্তি ভোজন করিয়া শেষ করিতে পারে না। তথাপি তাঁহারা যে ঐরূপ আয়োজন করিতেন, তাহার কারণ, তাঁহারা মনে করিতেন যে, এক শত লোককে নিমন্ত্রণ করিলে অন্ততঃ তিন শত জন সেই আহার্য্য ভোজন করিবে। আর আজকাল লোকে ভোজের আয়োজন করে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যা হিসাব করিয়া। কুড়ি জনের স্থানে পঁচিশ জন লোক যদি ভোজবাটীতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গৃহস্বামীকে বিষম বিপদে পড়িতে হয়, কারণ, তিনি কুড়ি জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই কুড়ি জনের উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যই প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। সেকালের লোকে এইরূপ সঙ্কীর্ণতাকে ঘৃণা করিত।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, সেকালে লোকের অবস্থা যেরূপ সচ্ছল ছিল, একালে সেরূপ নাই, সেই জন্যই লোকে ভোজ প্রভৃতি ব্যাপারে ততটা উদারতা দেখাইতে পারে না। কিন্তু তাহা নহে, সেকালের লোকের প্রাণ ছিল, তাহারা স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও পরকে খাওয়াইতে পারিত। এখন লোকের সে প্রাণ নাই। সেকালে আমরা দেখিয়াছি, এক জন দরিদ্র গৃহস্থের সংসারেও তিন-চারি জন দূরসম্পর্কীয়

আত্মীয় বা আত্মীয়া বাস করিত এবং ঐ সকল আত্মীয় বা আত্মীয়ারা আপনাদিগকে পরের গলগ্রহ বলিয়া মনে করিত না, কারণ, গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনী সেই সকল আত্মীয়স্বজনকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহাদিগকে নিজ পরিবারভুক্ত অবশ্যপোষ্য বলিয়াই মনে করিতেন। আর একালে দেখিতে পাই যে, বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থও স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয়কেই পর বলিয়া মনে করেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়াই তাঁহাদের 'পরিবার', ইহার বাহিরের অন্য সকলেই পর। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের পাড়াতে মাসিক এক শত টাকা আয়শালী লোকের সংখ্যা তিন-চারি জনের অধিক ছিল না, এখন ঐরূপ বিত্তশালী লোকের সংখ্যা কুড়ি জনের ন্যূন নহে। কিন্তু সেকালে সেই তিন-চারি জন ভদ্রলোকের বাটীতে যত জন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বা আত্মীয়াকে দেখিয়াছি, এখন এই কুড়ি জন ভদ্র-লোকের বাটীতে তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যাও দেখিতে পাই না। শুনিয়াছি ইউরোপীয় সমাজে "ফ্যামিলি" বলিলে কেবল স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকেই বুঝায়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি "ফ্যামিলির" অন্তর্গত নহে। এই পাশ্চাত্য প্রথা ক্রমে ক্রমে আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে আমাদেরও 'পরিবার' ঐ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাতেই পরিণত হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতামাতা এখনও আমাদের সমাজে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন সত্য, কিন্তু আরও কিছু দিন পরে যে তাঁহারা পরিবারের তালিকায় স্থান পাইবেন না, তাহার লক্ষণও নানাভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। রেল-কোম্পানী, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রেল-কর্ম্মচারীর বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং বিধবা মাসী, পিসীকে সেই কর্ম্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বিনা মাশুলে ট্রেনে ভ্রমণের 'পাস' দিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, রেল-কোম্পানী, কর্ম্মচারীদিগের পিতা মাতা এবং বিধবা আত্মীয়দিগকে পাস দেওয়া বন্ধ করিয়া, উঁহারা যে রেল-কর্ম্মচারীর পরিবারভুক্ত নহেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। একালে আমরাই যখন আমাদের পারিবারিক গণ্ডী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতেছি, তখন রেল-কোম্পানীই বা করিবেন না কেন? সেকালে বাঙালী যেমন পাঁচ জন আত্মীয়কে লইয়া এক সংসারে বাস করিতেন, সেইরূপ পল্লীবাসীদিগকে লইয়া মধ্যে মধ্যে উৎসবও করিতেন। উৎসব অর্থেই পরিচিত-অপরিচিত, নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত সকলকে লইয়া আনন্দ উপভোগ করা। কেবল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া কোন উৎসব হয় না। উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সকলকে আনন্দ বিলাইতে হয়, এই কথা সেকালের সকলেই মনে করিত। বাঙালী হিন্দুর বাটীতে পূজা-পার্ব্বণের অভাব নাই; "বারমাসে তের পার্ব্বণ" বাঙালীর বাটীতেই হইত। বঙ্গদেশে দেবদেবীর যত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা হয়, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ হয় না। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, সরস্বতী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা ত আছেই, তাহার উপর রক্ষাকালী, ব্রহ্মা, গণেশ, ভুবনেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতির মূর্ত্তি গঠন করিয়াও অনেক স্থানে পূজা হইত, এখনও কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত দেবদেবীদিগের পূজা সাধারণতঃ বারোয়ারিতে অর্থাৎ সকলের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া হইত।

আমরা যে-সকল দেবদেবীর পূজার কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে একমাত্র দুর্গাপূজাই উৎসব নামে অভিহিত হইত, অন্য কোন পূজাকে লোকে উৎসব বলিত না, কিন্তু অন্য পূজাকে উৎসব নামে অভিহিত না করিলেও সেই সকল পূজা প্রকৃতপক্ষে উৎসবেই পরিণত হইত। দুর্গাপূজা তিন দিন ব্যাপী এবং অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য, সেই জন্য সেকালে যাঁহারা দুর্গাপূজা করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কালীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি করিতেন। এই সকল পূজা অনেক পল্লীতে বারোয়ারিতেও হইত। এখনও অনেক স্থানে বারোয়ারিতে জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, সরস্বতী এবং কালী পূজা হইয়া থাকে।

পঞ্জিকাতে এই সকল পূজার দিন নির্দ্ধারিত থাকে। কিন্তু আবার অনেক পূজা আছে, যাহার উল্লেখ পঞ্জিকাতে থাকে না; লোকে সুবিধা বুঝিয়া যে-কোন সময় সেই সকল পূজা করিত। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগরে, জগদ্ধাত্রীর প্রকাণ্ড প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পাঁচ ছয় স্থানে তিন দিন ধরিয়া পূজা হইত। মধ্যে ঐরূপ বড় প্রতিমা মাত্র দুইখানি হইত, এই দুইখানিই বাজারে দোকানদারদিগের নিকট হইতে চাঁদা লইয়া করা হইত। ইহার পর বাগবাজারের

জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করিয়া বাজারের প্রাতমার সমান করা হইলে মোটের উপর তিন-খানি বড় প্রতিমা হইল। ১৩৪১ সালে বাজারের চাউলপটীর বারোয়ারির কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতানৈক্য হওয়াতে চাউল-পটীর বারোয়ারি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বাজারে দুইখানির পরিবর্ত্তে তিনখানি বড় প্রতিমা হইতেছে।

চন্দননগরে এই বারোয়ারিতে জগদ্ধাত্রী-পূজা এক শত বৎসরেরও পুরাতন। বাজারের বারোয়ারি পূজার চাঁদা ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ লভ্যাংশ হইতে দিয়া থাকেন। যেখানেই বাজারে বারোয়ারি পূজা হয়, সেইখানেই এই উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হয়। পূজার জন্য পৃথক রক্ষিত ঐ লভ্যাংশ দেবতার 'বৃত্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাগবাজারের বারোয়ারির উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কৌতুককর ব্যাপার আছে। এক শত বৎসরেরও পূর্ব্বে, চন্দননগর বাগবাজারে ঈশ্বর দাস নামে এক সূত্রধর বাস করিত। সে একটু কৃপণস্বভাব ছিল। তাহার বন্ধুরা তাহার কিছু অর্থব্যয় করাইবার উদ্দেশ্যে, জগদ্ধাত্রী-পূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে, একটি ছোট জগদ্ধাত্রী প্রতিমা রাত্রিকালে ঈশ্বর দাসের বাটীতে রাখিয়া আসে। গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহার বাটীতে এইরূপ প্রতিমা রাখাকে লোকে "ঠাকুর ফেলা" বলে। কোন গৃহস্থের বাটীতে এইরূপ "ঠাকুর ফেলিলে" গৃহস্থকে সেই ঠাকুর পূজা করিতে হয়, না করিলে পাপ হয় এবং চাই কি সেই গৃহস্থের অমঙ্গলও হইতে পারে, লোকের এইরূপ ধারণা ছিল। অশিক্ষিত ঈশ্বর দাস কিন্তু পাপের ভয় বা পারিবারিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা না করিয়া সেই রাত্রিতেই প্রতিমাকে সন্নিহিত পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিল, কেহই জানিতে পারিল না। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিমা-নিক্ষেপকারী বন্ধুরা যখন দেখিল যে, ঈশ্বর দাসের বাটীতে প্রতিমা নাই, তখন তাহারা প্রতিমার অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সেই পুষ্করিণী হইতে সেই প্রতিমার কঙ্কাল অর্থাৎ খড়-জড়ান কাঠাম বাহির হইল। যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রতিমা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারা, প্রতিমার পূজা না হইলে তাহাদেরই অমঙ্গল হইবে মনে করিয়া প্রত্যেকে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া সেই প্রতিমার সংস্কার করিয়া পূজা করাইল। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসরই বাগবাজারে বারোয়ারিতে জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়া আসিতেছে।

চন্দননগরে এই বারোয়ারি পূজা ব্যতীত আরও অনেক-গুলি বারোয়ারি পূজা হইত। তন্মধ্যে গড়ের বাজারে রাজরাজেশ্বরী পূজাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাঁক হইত। এই পূজা উপলক্ষে গড়ের বাজারে কয়েক দিন ব্যাপী মেলা হইত। প্রতিমার সম্মুখে আটচালাতে তিন-চারি দিন যাত্রা, পাঁচালি, কবির লড়াই হইত। প্রতিমার উভয় পার্শ্বে গ্যালারি বা বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, ইন্দ্রজিৎ-বধ, এবং কৃষ্ণলীলার বিবিধ দৃশ্য পুতুল গড়িয়া দেখান হইত। সে-সকল পুতুল ছোট নহে, এক জন মানুষের আকৃতির সমান করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত। শুনিয়াছি কৃষ্ণনগর হইতে শিল্পী আনাইয়া ঐ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইত। ঐ সকল পৌরাণিক বিষয় ব্যতীত, পথের ধারে ছোট ছোট দরমার ঘর বাঁধিয়া নানা প্রকার সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রও পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া দেখান হইত। কোনটাতে এক জন নব্য যুবক, যুবতী পত্নীকে স্কন্ধে লইয়া বৃদ্ধা জননীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কোনটাতে এক জন গণিকা একটা ভূপতিত মাতালের মুখে পদাঘাত করিতেছে, এইরূপ কত দৃশ্যই থাকিত। ঐ গড়ের বাজার নামক পল্লীতেই আমাদের স্কুল অবস্থিত ছিল। আমরা প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় এবং স্কুলের ছুটির পর ঐ সকল সং দেখিবার জন্য আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দাঁড়াইয়া থাকিতাম। মনে আছে, এক বৎসর, চন্দননগরের একটা সামাজিক ব্যাপার ঐ বারো-য়ারিতে সং গড়িয়া দেখান হইয়াছিল। চন্দননগর মানকুণ্ডার খাঁ-বাবুরা বিশেষ ধনশালী ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মানুরাগ ও দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জাতিতে শৌণ্ডিক, সেই জন্য কোন সদ্ব্রাহ্মণ তাঁহাদের দান গ্রহণ করিতেন না বা তাঁহাদের বাটীতে জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা এক বার কি একটা কার্য্য উপলক্ষে, রূপার ঘড়া বিতরণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় কয়েক জন লোভী ব্রাহ্মণ, রূপার ঘড়ার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া গোপনে সেই ঘড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সেই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িলে সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা হয়। এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও নাকি সেই দান গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়া-ছিলেন "উপঢৌকনে দোষং নাস্তি"। পর বৎসর গড়ের বাজারে বারোয়ারিতে এই ঘটনা উপলক্ষে একটা সং দেওয়া হইল—কয়েক জন ব্রাহ্মণ রূপার ঘড়া হাতে করিয়া দণ্ডায়মান আর

তাহাদের বক্ষস্থলে লেখা—"উপঢৌকনে দোষং নাস্তি"।

এইরূপ বারোয়ারি পূজা চন্দননগরে বৎসরে বিভিন্ন সময়ে পাঁচ-ছয় স্থানে হইত। এখন চন্দননগর হাটখোলায় ভুবনেশ্বরী ব্যতীত অন্য কোন পল্লীতে আর জাঁকালো বারোয়ারি পূজা হয় না। কোন কোন পল্লীতে বারোয়ারিতে সরস্বতী বা কার্ত্তিক পূজা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি হয় না, সেই পূজা এক দিনেই শেষ হয়। তাহাকে উৎসব বলা যাইতে পারে না। দেশে হরিজন-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে অনেক গ্রামে যেরূপ বারোয়ারিতে চাঁদা করিয়া সার্ব্বজনীন পূজা হইতেছে, চন্দননগরেও সেইরূপ হরিজন-পল্লীর বারোয়ারিতে একখানি সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা গত কয়েক বৎসর হইতে হইতেছে। হরিজনদিগকে প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইবার জন্যই কয়েক জন সংস্কারকামী উচ্চবর্ণ ভদ্রলোকের চেষ্টাতেই এই পূজা হইতেছে; ইহার মূল সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা। সেকালে যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের জন্য বারোয়ারি পূজা হইত, ইহা সেরূপ পূজা নহে।

আমাদের দেশে দুর্গোৎসব ব্যতীত আরও দুইটি উৎসব প্রচলিত ছিল, বোধ হয় এখনও কোন কোন স্থানে আছে। তন্মধ্যে একটি নন্দোৎসব, দ্বিতীয়টি ফল্গুৎসব। নন্দোৎসব জন্মাষ্টমীর পরদিন হইত। নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে পরদিন ব্রজপুরবাসী গোপগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উৎসব করিয়াছিল; তাহারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নন্দোৎসব প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বাপর যুগে, ব্রজবাসী গোপগণ কিরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল জানি না, কিন্তু আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের পাড়ায় ঠাকুর-বাটীর প্রাঙ্গণে খানিকটা জায়গা খুঁড়িয়া জল ঢালিয়া কাদা করা হইত, ঠাকুরবাড়ীর [illegible]জক সেই কাদার মধ্যস্থলে একটা ঝুনা নারিকেল ফেলিয়া [illegible]তেন, আর সেই পাড়ার বালক ও যুবকগণ সেই নারিকেল [illegible]ইবার জন্য কাড়াকাড়ি এবং সঙ্গে সঙ্গে কাদাতে গড়াগড়ি [illegible]য়া একেবারে ভূত সাজিত। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার [illegible]রূপ কাদা-মাখামাখির পর সকলে মিলিয়া সেই নারিকেল [illegible]য়া স্নান করিতে যাইত। স্নানান্তে সকলে পুনরায় সেই ঠাকুর-বাটীতে সমবেত হইলে, পূজারী-ঠাকুর সকলের হস্তে দেবতার প্রসাদ কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করিতেন। প্রাতঃকালের উৎসব এইরূপে শেষ হইত।

তাহার পর অপরাহ্নে "বাধাই" বাহির হইত। এই বাধাই শব্দের উৎপত্তি কি তাহা আমি জানি না। বাধাই শোভাযাত্রা বা মিছিল। কলিকাতায় চৈত্র-সংক্রান্তির দিন যেরূপ জেলেপাড়ার সং বাহির হয়, বাধাইও সেইরূপ গীত-বাদ্য-প্রহসন-সংবলিত একটি মিছিল। এই মিছিল আট দশ দলে বিভক্ত হইত। প্রথম দুই-তিনটা দলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ্যে গীতবাদ্য হইত। তাহার পর একটা দলে সামাজিক ব্যঙ্গকৌতুক, কোন দলে কোন পৌরাণিক নাটকের একটা গর্ভাঙ্কের অভিনয়, কোন দলে মাতাল, কোন দলে উড়িয়ার কলহ প্রভৃতির অভিনয় হইত। এই বাধাই বাহির হইত চন্দননগরের বৈদ্যপোতা নামক পল্লী হইতে। যে-পথ দিয়া বাধাই যাইত, সেই পথ লোকে লোকারণ্য হইত। সেই পথের পার্শ্বে যে-সকল গৃহস্থের বাস, তাঁহারা বাধাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিজ নিজ বাটীতে আনাইয়া রাখিতেন। এই বাধাইমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ছিলেন ৺ ননীলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি যে-দলে থাকিতেন, সেই দলের চতুর্দ্দিকে ভীষণ জনতা হইত। কারণ, তিনি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া এবং নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিয়া বিলক্ষণ হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ছড়ার নমুনা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তিনি মুখে মুখে কিরূপ ছড়া বাঁধিতেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য—

> "আনন্দে ছাইল ব্রজপুরী
> গোলক হ'তে নরলোকে এসেছেন হরি।
> বিইয়েছে বিদকুটে কালো যশোদা সুন্দরী
> কেউ বলে দাঁড়কাকের বাচ্ছা কেউ বা বলে পরী।
> দাঁত খিঁচিয়ে আছেন রাণী, খেয়ে খালের শুঁড়ি।
> নন্দ রাজা এনে দিলে তেঁতুল এক ঝুড়ি

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করাতে স্বর্গ হইতে দেবতারা মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিশুরূপী হরিকে দেখিতে আসিয়াছেন, সকলেই কিছু কিছু উপহার আনিয়াছেন, যথা—

> "কেউ এনেছে ছানাবড়া কেউ এনেছে গজা
> কেউ এনেছে শেরী শ্যাম্পেন কেউ এনেছে গাঁজা [illegible]

বেলা ২টা ২॥ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত নানা পল্লীর ভিতর দিয়া বাধাই পথে পথে বেড়াইত।

তাহার পর ফল্গুৎসব বা দোলযাত্রা। পাঁচ জনে না মিলিলে হোলিখেলায় আনন্দ হয় না, তাই দোলযাত্রাও উৎসব বলিয়া গণ্য। বাংলা দেশ অপেক্ষা উত্তর-ভারতে অর্থাৎ বেহার, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে হোলি-খেলায় অনেক অধিক জাঁকজমক হয়। সেকালে বঙ্গদেশেও হোলিখেলায় আমোদ বড় অল্প ছিল না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, অশিক্ষিত-শিক্ষিত, ইতর-ভদ্র, দরিদ্র-ধনী সকলেই রং মাখিয়া ও মাখাইয়া আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত হইত। পল্লীর সর্ব্বজনশ্রদ্ধাভাজন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত দোলের দিন রং মাখিয়া সং সাজিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; আবীরে বৃদ্ধদের শ্বেত কেশ লাল হইয়া যাইত। আজকাল দেখিতে পাই, ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকগণ গায়ে রং মাখিতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে, এইরূপ আবীর বা রং লইয়া মাতামাতি করা বর্ব্বরতার চিহ্ন, কেননা শ্বেতাঙ্গগণ ইহাকে বর্ব্বরতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইউরোপীয়গণ আমাদের কোন প্রথা বা আচার-ব্যবহারকে বর্ব্বরতা বলিলেই কি সেই প্রথা বর্ব্বর হইবে এবং সেই প্রথাকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে? ইউরোপীয় সমাজের "বল" নৃত্যও ত আমাদের নিকট অত্যন্ত রুচিবিগর্হিত এবং বর্ব্বর বলিয়া মনে হয়। অর্দ্ধাবৃতবক্ষ রমণীদিগের পরপুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া সলম্ফ নৃত্যকে প্রাচ্যদেশবাসীরা বর্ব্বরতার চরম বলিয়াই মনে করে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানের দৃষ্টিতে এই প্রকার নৃত্য শ্লীলতাবর্জ্জিত ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক বলিয়াই মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আফগানিস্থানের কোন ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ ইউরোপে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য লণ্ডনের রাজপ্রাসাদে "বল"-নৃত্যের আয়োজন হইয়াছিল। নৃত্য আরম্ভ হইবার কিছু পরে আফগান-যুবরাজ রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তাঁহাকে সসম্মানে নৃত্যসভাতে লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু তিনি নৃত্যসভাতে প্রবেশ করিয়াই নৃত্যপরায়ণা রমণীদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়াই সলজ্জে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য কক্ষে গমন করিলেন। তাঁহার এই আচরণে সকলে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া নৃত্যকক্ষ পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, যেখানে সম্ভ্রান্ত মহিলারা অসম্বৃত পরিচ্ছদে উপস্থিত থাকেন, সেখানে কোন ভদ্রলোকের থাকা কি উচিত? আফগান-যুবরাজের এই মন্তব্য শুনিয়া সে-সময়ে ইংলণ্ডে বেশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এক দল লোক যুবরাজের এই মন্তব্যকে একান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ ধর্ম্ম-যাজকগণ যুবরাজের মন্তব্যের সমর্থন করিয়াছিলেন। আবার অন্য দল এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধসভ্য আফগান, পাশ্চাত্য সভ্যতার মহিমা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ বলিয়াই আফগান-যুবরাজ ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আফগান-যুবরাজের মন্তব্য শুনিয়াও ইংরেজ জাতি "বল"-নৃত্য পরিবর্জ্জন করেন নাই। কোন প্রথা বিদেশীয়ের দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হইলেই যে সেই প্রথাকে ত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি অর্থহীন।

অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে বিষয়কার্য্য উপলক্ষ্যে কলিকাতার বড়বাজারে, মাড়োয়ারী মহাজন-দিগের গদীতে বা কার্য্যালয়ে যাতায়াত করিতে হইত। তাঁহাদের মধ্যে এক-এক জন অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি অর্থাৎ "রাসভারি" লোক ছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে বা তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইত না। কিন্তু দোলের দিন দেখিয়াছি, তাঁহাদের সেই গুরুগম্ভীর প্রকৃতি যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইত; তাঁহারাও রং লইয়া বালকের মত ছুটাছুটি লাফালাফি করিতেন, সেদিন তাঁহাদের লঘু-গুরু, অধমর্ণ-উত্তমর্ণ জ্ঞান লোপ পাইত, যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন, তাহাকেই আবীরে ও রঙে লাল করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু পরদিন তাঁহারাই যখন গদীতে বসিয়া বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিলে, কেহই বলিতে পারিত না যে, ইঁহারাই পূর্ব্বদিন রং লইয়া মাতামাতি করিয়াছিলেন।

যখন আফ্রিকায় বুয়ার-যুদ্ধ হয়, তখন আমি কলিকাতার কোন শ্বেতাঙ্গ বণিকের আপিসে কার্য্য করিতাম। লেডী-স্মিথ নামক স্থানে ইংরেজ-বাহিনী বুয়ারদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে আমাদের আপিসের প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর মুখে এরূপ বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছিল যে, দেখিলে মনে হইত,

তাঁহাদের কোন আত্মীয়স্বজন হয়ত লেডীস্মিথে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আমি দুই-এক জন সাহেবকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম যে, যখন তাঁহাদের কোন আত্মীয় বন্ধু অবরুদ্ধ হয়েন নাই, তখন তাঁহারা এত বিষণ্ণ হইয়াছেন কেন? উত্তরে এক জন সাহেব বলিয়াছিলেন, লেডীস্মিথ শত্রুপক্ষের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে ইংরেজ জাতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের বিষাদের কারণ; যদি তাঁহার ভ্রাতা বা পুত্র যুদ্ধে নিহত হইতেন, তাহা হইলে বিষাদের পরিবর্ত্তে গৌরব বোধ করিতেন। সেই সময় আমাদের আপিসে মিঃ ডেঞ্জারফীল্ড (Mr. Dangerfield) নামক এক সাহেব কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার মত খিটখিটে এবং বদমেজাজি লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি; আমরা কখনও তাঁহাকে হাসিতে দেখি নাই। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বুয়ার-যুদ্ধের সময় "ইংলিশম্যান" সংবাদ পত্রের আপিস হইতে প্রত্যহ চারি-পাঁচ বার করিয়া ক্রোড়পত্র বা অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইত। সেই সকল অতিরিক্ত সংখ্যায় কেবল তারযোগে প্রাপ্ত যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশিত হইত। এক দিন দেখিলাম, আপিসের দ্বারবান একখান অতিরিক্ত সংখ্যা "ইংলিশম্যান" আনিয়া ডেন্‌জারফীল্ড সাহেবের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। সেই অতিরিক্ত সংখ্যাগুলি খামের মধ্যে থাকিত; সাহেব খাম ছিঁড়িয়া কাগজে দৃষ্টিপাত মাত্র এক বিকট গর্জ্জন করিয়া এক প্রকাণ্ড লম্ফ প্রদান করিলেন এবং দৌড়াইয়া বড়সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যাঁহার মুখে কখনও হাসি দেখি নাই বা যাঁহার মুখে কখনও মিষ্ট কথা শুনি নাই, সেই ভীষণদর্শন ডেনজারফীল্ড সাহেবের বালকোচিত চপলতা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হইলাম। ক্ষণকাল পরে অন্য এক জন সাহেব বড়সাহেবের কক্ষ হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লেডীস্মিথ বুয়ারদিগের অবরোধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাই বড়সাহেব আজ আপিস বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন, আপনারা বাড়ী যান।" আমরা তখন মিঃ ডেনজারফীল্ডের গর্জ্জন এবং উল্লম্ফনের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম যে, জীবিত জাতির শোক বা আনন্দ বোধের যেরূপ শক্তি আছে, আমাদের মত মৃত জাতির তাহা নাই; আমরা শোক প্রকাশ করিতেও জানি না, আনন্দ প্রকাশ করিতেও পারি না। তাই শোক-সভাতে গিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট পরিচিত লোকের সহিত খোস-গল্প করি, আর উৎসবে যোগদান করিয়াও সাংসারিক অভাব-অভিযোগ, অশান্তির বিষয় আলোচনা করি। সেকালে বাঙালীর মধ্যে প্রাণ ছিল, তাই তাঁহাদের নানা প্রকার উৎসবও ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেকালে বারোয়ারি পূজার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল, এবং প্রায় সকল বারোয়ারিতেই যাত্রা, পাঁচালি, কবি, তরজা প্রভৃতি হইত। অনেক স্থলে কথকতাও হইত। সেকালের যাত্রার মধ্যে একমাত্র গোপাল উড়ের দল ব্যতীত সকল যাত্রাতেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইত। দাশরথি রায়ের পাঁচালির মধ্যে দুই-চারিটা পালা সামাজিক ব্যাপার অবলম্বনে রচিত, অবশিষ্ট সমস্ত পালাই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কথকতার সমস্ত পালাই পৌরাণিক। এই সকল যাত্রা, পাঁচালি এবং কথকতার দ্বারা অশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে যেরূপ উপদেশ এবং ধর্ম্মভাবের প্রচার হইত, সেরূপ আর কিছুতেই হইত না। সেকালের যে-কোন পল্লী-গ্রামের অশিক্ষিত কৃষক বা শ্রমিক রামায়ণ-মহাভারতের গল্পাংশ মুখে মুখে বলিতে পারিত। এখন যেরূপ "শিশু-রামায়ণ" "শিশুমহাভারতের" সাহায্যে বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যান প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, সেকালে এরূপ ছিল না। যাত্রাওয়ালা এবং কথকেরাই লোকশিক্ষক ছিলেন, তাঁহারাই অশিক্ষিত জন-সাধারণের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের মুখে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেকালের প্রাচীন-প্রাচীনারা বালক-বালিকাদিগকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইতেন। সুতরাং সেকালের উৎসবে যে কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" হইত তাহা নহে, উৎসব উপলক্ষে যাত্রা এবং কথকতা দ্বারা লোকশিক্ষারও সহায়তা হইত, জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইত।

এই সকল যাত্রা এবং কথকতা প্রভৃতি প্রায়ই বারোয়ারি-তলার আটচালায় হইত, কোন কোন স্থানে ধনবানদিগের বহির্ব্বাটীর প্রশস্ত অঙ্গনেও যাত্রা বা কথকতা হইত এবং তাহার ব্যয়ভার গৃহস্বামীরাই বহন করিতেন, সেজন্য গ্রামবাসীকে চাঁদা দিতে হইত না। বারোয়ারির আট-

চালাতেই হউক আর ধনবানের অজনেই হউক, যাত্রা বা কথকতা প্রভৃতি শ্রবণের জন্ম সকলের পক্ষেই অবারিত-দ্বার ছিল; যাহার ইচ্ছা, স্ত্রীপুরুষ, ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেরই তথায় গমনের অবাধ অধিকার ছিল। যাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র বা কার্ড ছাপান হইত না। যেখানে কথকতা হইত, সেখানেই কেবল ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের জন্ম পৃথক আসনের ব্যবস্থা হইত। কারণ, সকলের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকে এক আসনে বসিয়া শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিতে নাই। স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান পৃথক এবং চিকের অন্তরালে হইত। যাত্রা উপলক্ষে কোন কোন স্থানে চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হইত, কথকতা উপলক্ষে অবশ্য এত লোকের সমাগম হইত না। কথকতা কোন কোন স্থানে একাদিক্রমে এক মাস, তিন মাস বা ছয় মাস ধরিয়া হইত, সাধারণতঃ এক মাসের কমে কোথাও হইত না। যাত্রা বড়জোর দুই দিন বা তিন দিন হইত। এক দিন যাত্রাতে যে অর্থব্যয় হইত, সেই অর্থে এক মাস কাল কথকতা হইতে পারিত। যাত্রা অপেক্ষা কথকতা ঘন ঘন হইত, কারণ কথকতা যে কেবল বারোয়ারি-তলাতে হইত তাহা নহে, অনেক মধ্যবিত্ত-শালী গৃহস্থের বাটীতেও হইত। বাটীতে রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমৎভাগবত প্রভৃতি পুরাণের অনুষ্ঠান করা সেকালের লোকে ধর্ম্মাচরণ বলিয়া মনে করিতেন; এমন কি অনেক অনাথা দরিদ্র বিধবা চরকায় সুতা কাটিয়া বা অন্যের বাটীতে শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহার উদ্বৃত্ত অংশ "কথা" দিয়া ব্যয় করিত। অনেক স্থলে এরূপও হইত যে কোন গ্রামে এক জন কথক কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক এক মাসের জন্ম নিযুক্ত হইলেন। সেই এক মাস অতীত হইতে-না-হইতে অন্য এক গৃহস্থের কোন বৃদ্ধা প্রস্তাব করিলেন যে আরও পাঁচ দিন কথকতা হউক, তিনি সেই পাঁচ দিনের ব্যয়-ভার বহন করিবেন। আবার সেই পাঁচ দিন শেষ হইতে-না-হইতে এক জন কৃষক, কথকঠাকুরকে আরও তিন দিন কথকতা করিবার জন্ম অনুরোধ করিলে আরও তিন দিন কথা হইল। এইরূপে অনেক সময় কথক-মহাশয়েরা এক মাসের জন্ম কোন গ্রামে গমন করিলে তিন-চারি মাসের কমে সেই গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিতেন না। যাত্রা শুনিবার জন্ম মফস্বলে অনেক দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও লোক-সমাগম হইত, কিন্তু কথকতা শুনিবার জন্ম লোকে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে বড় যাইত না। সেই জন্ম, যাত্রা অপেক্ষা কথকতার স্থানে লোকসমাগম অনেক অল্প হইত এবং শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী হইত। সেকালে কথকদিগের "উপরি-পাওনা" তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক অপেক্ষা অনেক অধিক হইত। কথকদের পারিশ্রমিক সাধারণতঃ দৈনিক দুই টাকা হইতে তিন টাকা ছিল। কোন কোন খ্যাতনামা কথকের পারিশ্রমিক দৈনিক পাঁচ-সাত টাকাও ছিল। কিন্তু অধিকাংশ কথকের আয় উপরি-পাওনা হইতেই বেশী হইত। কথকেরা কথা কহিবার সময় মস্তকে ও গলদেশে পুষ্পমাল্য ধারণ করিতেন। কথা আরম্ভ হইবার পর কোন শ্রোতা, বেদীতে যৎকিঞ্চিৎ রজতখণ্ড অর্থাৎ টাকা দিয়া প্রণাম করিলে কথক-ঠাকুর স্বীয় মস্তকের বা গলদেশের পুষ্পমাল্য খুলিয়া আশীর্ব্বাদী-স্বরূপ সেই প্রণত ব্যক্তিকে প্রদান করিতেন। তাহার পরেও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই টাকা, আধুলি বা সিকি দিয়া কথককে প্রণাম করিত, কারণ, কথকের মুখে শাস্ত্রকথা বিনা দক্ষিণায় শুনিতে নাই, সেই জন্ম কথককে কিছু প্রণামী দিবার প্রথা ছিল। আমাদের কোন আত্মীয় এক মাস আশী হইতে এক শত টাকা পারিশ্রমিক লইয়া কথকতা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই এক মাসে প্রায় দেড় শত টাকা প্রণামী পাইতেন। ইহার উপর বস্ত্র, অলঙ্কার, সিধা এবং মিষ্টান্ন যে কত পাইতেন তাহার সীমা ছিল না। এই সকল দ্রব্য কথকেরা অযাচিত উপহার রূপে পাইতেন। বস্ত্রহরণের দিন কথক-ঠাকুরকে বস্ত্র (শাড়ী) দেওয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশনের দিন বা শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষার দিন, লক্ষ্মণ-ভোজনের দিন নানা প্রকার ভোজ্য সাজাইয়া সিধা দেওয়া এবং দুর্ব্বাসার পারণ দিনে নানাবিধ মিষ্টান্ন উপহার দেওয়া সকলে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। শুনিয়াছি, কোন কোন ধনবতী মহিলা, কথক-ঠাকুরকে বেনারসী শাড়ী এবং নানা প্রকার অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বেদীতে বসাইয়া কথা শুনিতেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল বস্ত্র ও অলঙ্কার কথক-ঠাকুরেরই প্রাপ্য হইত।

যাত্রা বা থিয়েটারে অভিনয় করা অপেক্ষা কথকতা করা

অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। প্রথমতঃ যিনি কথকতা করিবেন, তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণে এবং নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা প্রয়োজন। "কথা" কহিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আলোচ্য শাস্ত্র ব্যতীত উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মপুস্তকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। ঐ সকল ব্যাখ্যা যাহাতে নির্ভুল হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। কারণ শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেহ সংস্কৃতজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি কথকের ভুল ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন। থিয়েটার বা যাত্রায় অভিনেতাদিগের পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের কথ্য বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে এবং তাহা যথোপযুক্ত হাবভাব সহ আবৃত্তি করিতে পারিলেই অভিনেতার কর্ত্তব্য শেষ হয়। তাহার পর যাত্রা বা থিয়েটারে কেহ রাজার ভূমিকায়, কেহ রাণীর ভূমিকায়, কেহ বিদূষকের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে বা আসরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কথক-ঠাকুরকে একাই সমস্ত ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতে হয়। তাঁহাকে পুরুষ ও নারী উভয়েরই কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া কখনও রাজা আবার কখনও রাণীর কথ্য বিষয় বলিতে হয়। তাঁহার বক্তৃতাতে বীররস, রৌদ্ররস, করুণ রস প্রভৃতি সকল রসেরই সমাবেশ করিতে হয়। করুণ রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতাদিগের নয়নে অশ্রুর প্রবাহ বহাইতে হয়, আবার পরক্ষণেই হাস্যরসের অবতারণা করিতে হয়। তাঁহার কথা শুনিয়া যখন শ্রোতারা হাস্য করিতে থাকে, তখন তিনি সহসা ভক্তিরসাত্মক গান গাহিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। এইরূপে তাঁহাকে একাকী সকল চরিত্রেরই অভিনয় করিতে হয়। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গান করিতে হয়, সেই জন্য তাঁহার সুকণ্ঠ হওয়া আবশ্যক। আবার রাগরাগিণী সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সন্ধ্যাবর্ণনায় পূরবী ও মুলতান, নিশীথ-বর্ণনায় বেহাগ, শঙ্করা, জয়জয়ন্তী এবং প্রভাত-বর্ণনায় ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর আলাপ করিয়া শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে হয়। সুতরাং কথকের কার্য্য যে কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেকালে এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন কথক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত। এইরূপ শিক্ষার সহিত আনন্দ-বিতরণের ব্যবস্থা অন্য কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজে যে-সকল অনিষ্টকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে, সেকালের যাত্রা এবং কথকতার প্রতি লোকের অনাসক্তি অন্যতম। যাত্রা এবং কথকতা সেকালে উৎসবের অঙ্গ-স্বরূপ ছিল। শর্করামণ্ডিত তিক্ত ঔষধ-বটিকা যেরূপ লোকে আগ্রহ সহকারে গলাধঃকরণ করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন ও ব্যাধির প্রতিকার করে, সেকালের যাত্রা ও কথকতা সেইরূপ জনসাধারণকে অনাবিল আনন্দ প্রদান করিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করিত, তাহাদের চরিত্র গঠন করিত। আমাদের মনে হয় যে, পৌরাণিক যাত্রা এবং কথকতার পুনঃপ্রবর্ত্তনে সমাজ-নেতৃগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এখনও যে বাংলাতে কোন উৎসব নাই, তাহা নহে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, সেকালের মত একালের উৎসবে লোকের আন্তরিকতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। সেকালের লোকে যেমন আমোদে উন্মত্ত হইতে পারিত, প্রাণ খুলিয়া উচ্চহাস্য করিতে পারিত, একালের লোকে সেরূপ পারে না। একালের লোকে এই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা হারাইয়া আপনাদের অক্ষমতাকে সভ্যতা নামে অভিহিত করিবার চেষ্টা করে। একালের লোক থিয়েটার, বায়স্কোপ বা টকিতে যে অর্থব্যয় করে, তাহাতে অনেক কথক ও যাত্রাওয়ালার জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। অবশ্য থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি যখন এদেশে আমদানী হইয়াছে, তখন উহা দেশে থাকিয়াই যাইবে, হাজার চেষ্টা করিলেও উহা দেশ হইতে যাইবে না। কিন্তু উহাদের সাহায্যে লোকশিক্ষার বিস্তার না হইয়া যদি বিপরীত ফল হয়, তাহা হইলে আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। থিয়েটার সিনেমার পরিচালক-গণের দৃষ্টিও এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃপণের স্বর্গ

শ্রীসীতা দেবী

রমাপতির যে আবার কোনও দিন বিবাহ হইবে এ দুরাশা তাহার আত্মীয়-স্বজন কাহারও ছিল না। বন্ধু-বান্ধবে বহুদিন তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। আর তাহাদের এখন রমাপতির ভাবনা ভাবিবার অবসরও নাই, রুচিও নাই। বাড়ীতেই প্রত্যেকের একটি, দুইটি, কোনও দুর্ভাগ্য ব্যক্তির বা ততোধিক অবিবাহিতা কন্যা বসিয়া আছে, তাহাদের বিবাহের ভাবনা ভাবিবে, না প্রৌঢ় রমাপতির ভাবনা ভাবিবে? ভাবিবার দিন যখন ছিল তখন বন্ধু আত্মীয় কেহই ভাবিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু রমাপতির কোনই গা ছিল না, কাজেই বিবাহ হইল না।

রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বাপ দেশে জমিজমা বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন, কলিকাতায়ও রাখিয়া গিয়াছেন ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা এবং খান-দুই পাকা বাড়ী। ছেলেমেয়ে অনেকগুলিই তাঁহার হইয়াছিল, কিন্তু বাঙালী-সংসারের যেমন নিয়ম, তাহার অর্দ্ধেকগুলি শিশুকালেই চলিয়া গিয়াছে। বুড়া যদুপতি মরিবার সময় রাখিয়া গেলেন, দুই ছেলে গণপতি আর রমাপতি, আর তিন মেয়ে, সরলা, তরলা আর বিমলা। মেয়ে তিনটিরই বিবাহ তিনি দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেজ-মেয়ে তরলা ইহারই মধ্যে আবার বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বিধবা হইয়া, সঙ্গে একটি ছেলে। অন্য দুই বোন স্বামীর সংসারেই সুখে দুঃখে দিন কাটাইতেছে।

যদুপতির বৃদ্ধা গৃহিণী বাতে একেবারে পঙ্গু, নড়িয়া বসিবার সাধ্য তাঁহার নাই। কাজেই বিধবা কন্যাকে দেখিয়া তিনি দিনে দশবার চোখে আঁচল দেন বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করেন যে তরি না থাকিলে দিনান্তে বুড়ী মায়ের গলায় জলবিন্দুও পৌঁছিত না। সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবা তিনি, ঝি-চাকরের হাতে জল খাইতে ত পারেন না? ঘরে একটা বউ নাই যে দুইটা রাঁধিয়া দিবে, বা এক ঘটি জল অগ্রসর করিয়া দিবে।

কিন্তু বউই বা নাই কেন? যদুপতি যখন মারা যান তখন বড় ছেলে গণপতির বয়স সাতাশ আর রমাপতির পঁচিশ। পড়াশুনা তাহাদের শেষ হইয়াছে, স্বাস্থ্য এই বয়সের পাঁচটা ছেলের যেমন হয় তেমনই, বাপের যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি আছে, তবু ঘরে বউ আসে নাই কেন? ছেলে-দের তেমন বদ্‌নামও ত কিছু নাই? আর বদ্‌নাম থাকিলেই কি হিন্দুর সংসারে পুরুষ মানুষের বিবাহ আটকায় নাকি? তবু তরি না রাঁধিয়া দিলে তাহার বিধবা মাতার খাওয়া হয় না কেন? অবশ্যই তাহার কিছু কারণ আছে।

গণপতি কিঞ্চিৎ সাহেবী মেজাজের মানুষ। বাড়ীর সাবেকী চালচলন, সনাতনপন্থী আবহাওয়া তাহার একেবারে ভাল লাগে না। বাপ থাকিতে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না। যতই আড়ালে তাঁহাকে ওল্ড ফসিল (old fossil) বলিয়া গালি দেওয়া যাক্ না কেন, সামনাসামনি তাঁহার অর্থকে খাতির করিয়া চলিতে হয়। এ যে দায়ভাগের দেশ, এদেশে পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ না বলিয়া উপায় কি? কলমের এক আঁচড়ে পথে বসাইয়া দিতে পারে যে? সুতরাং বিলাত যাইবার ইচ্ছা গণপতিকে মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং ঘরে মাছের ঝোল এবং আলু-পটোলের ডাল্‌না দিয়াই দগ্ধোদর পূর্ণ করিতে হইত। অবশ্য পয়সা-কড়ি যখনই হাতে আসিত, তখনই বাহিরে গিয়া সে নানাভাবে মুখ বদলাইয়া আসিত। বিবাহ সম্বন্ধেও তাহার রুচি ছিল আধুনিক রকম। মেমসাহেব বিবাহে তাহার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, যদি মেমসাহেবের আপত্তি না থাকে, কিন্তু হায় হতভাগ্য, এ-কথা সে বলিবে কাহার কাছে? তাহার মত মনোবৃত্তি ত এ-বাড়ীতে আর একটা কাহারও নাই। স্ত্রীলোকগুলিকে ত সে মানুষের মধ্যেই ধরিত না, কারণ তাহারা সকলেই শাড়ী পরে, এবং শুধু মাত্র শাড়ীই পরে। বাপ ত মূর্ত্তিমান সনাতন ধর্ম্ম, এবং ভাই রমাপতি একে বোকা তায় দারুণ কৃপণ। মেমসাহেব বাড়ীতে আসিলে কি পরিমাণ পয়সা খরচ হইবে তাহা ভাবিলেই আতঙ্কে তাহার

চোখ কপালে উঠিয়া যায়। এ হেন মানুষের কাছে আধুনিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া কোনও লাভ নাই, কারণ আধুনিক জিনিষ মাত্রেরই এই দোষ যে তাহা ব্যয়সাপেক্ষ।

সরলা, তরলা এবং বিমলা তিনজনেরই অতি-বালিকা-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। এমন কি বিমলা একটু বেশী কালো ছিল বলিয়া তাহার বাবা-মা ন-বৎসর পুরিতে-না-পুরিতে তাহাকে গৌরীদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বেশী বয়স হইয়া গেলে এ-মেয়ে আবার কেমন দাঁড়াইবে তাহা কে জানে, সকাল সকাল পার করিয়া দেওয়াই ভাল। এখন গোলগাল মোটাসোটা আছে, একরকম পাঁচজনের সামনে বাহির করা যায়।

বলা বাহুল্য, পুত্রদের জন্যও কর্ত্তা-গৃহিণী এইরকম কনেই খুঁজিতেছিলেন। ছেলে যত বড়ই হউক, মেয়ে বারো বৎসরের বেশী বয়সের হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহাদের পণ। ঐ দেখিতে দেখিতে ডাগরটি হইয়া উঠিবে বিয়ের জল গায়ে পড়িলেই, তাহা হইলেই আর ছেলেদের পাশে অসাজন্ত দেখাইবে না। ছেলেরাও যে দেখিতে দেখিতে বার্দ্ধক্যের দিকে আরও খানিক অগ্রসর হইয়া যাইবে, তাহা আর তাঁহারা ভাবিতে রাজী ছিলেন না। ধাড়ী মেয়ে আনিয়া মোটে বাগ মানানো যায় না, ইহা গৃহিণী বহুবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাহারা সর্ব্বদাই বাপের বাড়ীর দিকে বেশী টানে, ছেলেকে নিজের পিতামাতার বিরুদ্ধে চলিতে প্ররোচনা দেয়, এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনকে কেবলমাত্র স্বামীর আত্মীয়-স্বজনই ভাবে। খাল কাটিয়া এমন কুমীর ডাকিয়া আনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু দুই ছেলেই বিবাহে নারাজ। গণপতির বিবাহ করিতে আপত্তি নাই যদি বউ তাহার পছন্দমত হয়, কিন্তু সে-কথা বাপ-মায়ের কাছে তুলিতে সাহস হয় না। অতএব বিবাহ পরে করিবে বলিয়া সে ক্রমাগত পিছন হাঁটিতে লাগিল। রমাপতির কোনও রকম বিবাহই পছন্দ ছিল না, সে তাই মা-বোনের কাছে তারস্বরে আপত্তি জানাইতে লাগিল। বড় ভাইয়ের বিবাহ না হইলে ছোট জনের হইতে পারে না, কাজেই তখনকার মত রমাপতির উপর খুব বেশী চাপ পড়িল না। কর্ত্তা যদুপতি যদি আরও কিছুকাল টিকিয়া যাইতেন, তাহা হইলে দুই ছেলেকেই কানে ধরিয়া সংসারে ঢুকাইয়া যাইতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কিঞ্চিৎ অসময়ে তিনি চলিয়া যাওয়াতে গণপতি এবং রমাপতির স্বাধীনতার পথে আর কোনও অন্তরায় রহিল না, দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাপের প্রয়োজন তাহাদের বহুদিন চুকিয়া গিয়াছিল, তাঁহার জোর করিয়া বাঁচিয়া থাকাটা কেহই বিশেষ ভাল চক্ষে দেখিত না। গণপতি এখন ইচ্ছামত চলিতে-ফিরিতে পারিবে, এবং রমাপতি হাতে টাকা পাইয়া সেই টাকা সাধ্যমত বাড়াইয়া সিন্দুক ভর্ত্তি করিতে পারিবে। বাপের বিষয়-আশয় নগদ টাকা, কোথায় কি আছে সবই তাহার নখদর্পণে ছিল। তিনি যে টাকা খাটাইবার কোনও ব্যবস্থাই করেন না, ইহা রমাপতির মোটেই ভাল লাগিত না। তাহা ছাড়া বাপের নানা রকম অপব্যয়ও ছিল, তাহারও রমাপতি সমর্থন করিত না। তিনি দুস্থ আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করিতেন, তীর্থে যাইতেন, এবং পূজাপার্ব্বণ করিতেন। ইহার কোনও একটারও প্রয়োজনীয়তা রমাপতি স্বীকার করিত না। কতকগুলা অলস লোককে বসিয়া খাওয়াইয়া কি লাভ? ইহা ত আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। একটা দেশ আর একটার চেয়ে পবিত্র যে কি করিয়া হয়, তাহাও রমাপতি ভাবিয়া পাইত না। মাটি বা জল বিশ্লেষণ করিয়া কোনও শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন ত পাওয়া যায় নাই, তবে অনর্থক পয়সা খরচ করিয়া ছুটাছুটি কেন? আজকাল বারোয়ারি বা সার্ব্বজনীন পূজা প্রতি পাড়ায় হয়, তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতেও কেহ ছাড়ে না, তবে আবার খরচ করিয়া বাড়ীতে এ হাঙ্গাম করা কেন? তাহার ভাগের টাকা এইভাবে নয়-ছয় করিয়া নষ্ট করায়, সে পিতার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি ঘটা করিয়াই হইল, রমাপতির আপত্তি সত্ত্বেও। বাড়ীর সবক'টা মানুষ একদিকে টানিলে, একলা রমাপতি কি করিয়া ঠেকায়? আর শ্রাদ্ধের ব্যাপারে বেশী প্রতিবাদ করাটা ভালও দেখায় না।

কিন্তু পরদিনই সে কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া গেল। গণপতির কাছে গিয়া বলিল, "দেখ দাদা, আমাদের দুজনের মোটে মতে মেলে না, আমাদের আলাদা আলাদা থাকাই ভাল।"

কানে একেবারে শোনেন না এবং চোখেও প্রায় কিছুই দেখেন না। সুতরাং যাহাকে হউক ধরিয়া আনিয়া নৈকষ্য কুলীন-কন্যা বলিয়া তাঁহার কাছে চালাইয়া দেওয়া যায়। তরলা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, নর্সের ঠিকুজী-কোষ্ঠী দেখিবার মত ক্ষমতা তাহার নাই। কানু ওসবের ধার ধারে না, মা সারিয়া উঠিলেই সে বাঁচে। কিন্তু অত টাকা যে খরচ হইয়া যাইবে? কিন্তু লোক না হইলেই বা চলে কিরূপে? টাকা খরচের ভয় রমাপতির অত্যধিক বটে, কিন্তু প্রাণের ভয়ও সে কিছু কিছু করে। টাইফয়েড ব্যাপারটি ত কম নয়, সব কয়জনকে চাপিয়া ধরিলে কাহারও আর নিস্তার থাকিবে না। তরলা শুইয়া ত সংসার অচল হইয়াছে। রমাপতি আর কানু বাজারের খাবার কিনিয়া খাইয়াছে, রমাপতির মা শুধু দুধ আর ফল খাইয়া আছেন। স্ত্রীলোকেরও যে জগতে প্রয়োজন আছে, তাহা রমাপতি এইবার স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দুপুরবেলাটা আজও বাজারের খাবার কিনিতে হইল। কানুর পেট কামড়াইতেছে, সে বেশী কিছু খাইতে চাহিল না, কাজেই রমাপতি তাহার ভাগটা রাত্রে কাজে লাগাইবার আশায় তুলিয়া রাখিল। তরলা জ্বরের ঘোরে অচেতন, সে নিশ্চয়ই কিছু খাইতে চাহিবে না, কাজেই তাহার জন্য কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল না। বুড়ী মা একটু জোলো দুধ খাইয়া খানিক বক্ বক্ করিয়া থামিয়া গেলেন। মুখে একটাও দাঁত নাই, তাঁহাকে অন্য খাবার কিনিয়া দিয়াই বা লাভ হইবে কি?

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বাবুর গাড়ীটা আবার দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তার নামিলেন আগে এবং তাঁহার পিছন পিছন নামিল একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। তাহার হাতে একটি বড় কেম্বিসের ব্যাগ। এই তাহা হইলে নর্স? আর রক্ষা নাই। রমাপতির গায়ের রক্ত হিম হইয়া আসিল, সে ব্যাকুল চোখে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার তখন কিছু না বলিয়া সোজা রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া গেলেন, স্ত্রীলোকটিও তাঁহার পিছন পিছন চলিল। ব্যাগটা একটা জানালার উপর নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরই অসুখ বুঝি?"

ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ, এঁর চুলটুলগুলো আঁচড়ে পরিষ্কার কর, আর বিছানা কাপড়চোপড়ও বদলে দাও, বড় সব নোংরা হয়ে রয়েছে।" তাহার পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই একে নিয়ে এলাম আর কি? পাস-করা নর্স নয়, তবে রোগীর কাজ মোটামুটি জানে। দেখিয়ে দিলে সবই করতে পারবে। আপনাদের যে আবার হাজার হ্যাঙ্গাম, খ্রীষ্টান চলবে না, হেন তেন। এ হিন্দুরই মেয়ে। কোথায় কি আছে ব'লে-ট'লে দিন।" বলিয়া তিনি রোগিণীকে পরীক্ষা করিতে লাগিয়া গেলেন।

স্ত্রীলোকটির বয়স বছর ত্রিশ হইবে। রং বেশ পাকা কালো, হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা। মাথায় চুল বেশী নাই। হাত খালি, পরনে সাদা নরুনপাড়ের ধুতি আর সাদা একটা ব্লাউসের মত কি। রমাপতির দিকে চাহিয়া বলিল, "এঁর কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর এসব কোথায়? বদলে দিই।"

রমাপতি তরলার বাক্স বিছানা সব দেখাইয়া দিল। বোনের আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া কাপড়চোপড় কিছু কিছু বাহির করিয়াও দিল। তাহার পর ডাক্তারের পিছন পিছন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার ত বসিলেন প্রেস্‌ক্রুপশন্ লিখিতে। রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁকে কত ক'রে দিতে হবে? ওঁর নাম কি?"

ডাক্তার মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "মাস-হিসাবে হ'লে মাসে ত্রিশ টাকা, দিন-হিসাবে হ'লে কিছু বেশী পড়বে। ওর নাম সরযূ সেন।"

ত্রিশ টাকা! খানিকক্ষণ রমাপতির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাহার পর বলিল, "খেতে দিতে হবে ত?"

ডাক্তার চটিয়া বলিলেন, "তা আপনার বাড়ী কি না খেয়ে কাজ করবে মশায়?"

রমাপতি বলিল, "না না, না খেয়ে কাজ করবে কেন? তবে রান্নাবান্না সব আমার বোনই করত কিনা, এখন কি ব্যবস্থা হবে তা ত ভেবে পাচ্ছি না।"

ডাক্তার প্রেস্‌ক্রুপশন্ টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বলিলেন, "সে যা হয় আপনি করবেন। নর্সের ব্যবস্থা

করলাম ব'লে রাঁধুনীর ব্যবস্থাও আমি করতে পারব না। চললাম এখন, ঢের রুগী এখনও বাকি আছে।" বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

রমাপতি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরের দিকে চলিল। আজ আগাগোড়া সবই মন্দ। ভালর মধ্যে শুধু এই যে ডাক্তার তরলাকে বার্লির জল ভিন্ন আর কিছু খাইতে বলে নাই। নবাবী রকম পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া গেলে বেচারা রমাপতিকে আজ ধনেপ্রাণে সারা হইতে হইত। কিন্তু বার্লির জলই বা করে কে? রমাপতিকে কি শেষে এই বয়সে হাত পুড়াইয়া রাঁধিতে বসিতে হইবে? নর্সটাকে বলিয়া দেখিলে কেমন হয়? চটিয়া উঠিবে না ত? নর্সরা স্ত্রী-জাতীয় হইলেও, ঠিক স্ত্রীলোকের মত ব্যবহার তাহাদের সঙ্গে করা চলে কি না সে বিষয়ে রমাপতির যথেষ্টই সন্দেহ ছিল।

কানু তখন বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া নামতা মুখস্থ করিতেছে। সময় কাটাইবার ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপায় সে বেচারা আর কিছু ভাবিয়া পায় নাই। রমাপতি অন্দরে গিয়া তরলার ঘরের ভিতর একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। সরযূ সেন নর্স হইলেও স্ত্রীলোকের মতই কাজ করিতেছে। তরলার বিছানাটা পরিষ্কার করিয়াছে, কাপড়চোপড় বদ্‌লাইয়াছে, চুলও বোধ হইল আঁচড়াইয়া দিয়াছে। ঘরটাও যেন অনেকখানি পরিচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, সে কি ঝাঁটও দিয়াছে নাকি? তাহা হইলে উনুন ধরাইয়া বার্লি সিদ্ধ করিতে বলিলে মারিতে নাও আসিতে পারে। রমাপতি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এ-বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ নাই, কেরোসিনের ল্যাম্পই জ্বলে। তরলার ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, সরযূ রমাপতির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আলো কোথায়?"

রমাপতি তক্তপোষের তলায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল একটি চিম্‌নী-ভাঙা হারিকেন্ লণ্ঠন রহিয়াছে। আরও বলিল, "উপরে উঠবার সিঁড়ির পাশে বোতলে তেল আছে।"

নর্স লণ্ঠনটা টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর এক টুকরা ছেঁড়া ন্যাকড়ার সাহায্যে চিম্‌নীটাকে পরিষ্কার করিতে লাগিল। রমাপতির খুবই ইচ্ছা করিতে লাগিল, মায়ের ঘরের ও নিজের ঘরের লণ্ঠন দুইটাও আগাইয়া দেয়, কিন্তু প্রথম দিন অতখানি ভরসায় কুলাইল না। সরযূ চিম্‌নি পরিষ্কার করিয়া, তেল ভরিয়া, আলো জ্বালাইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল। বুড়ীর ঘরের আর রমাপতির ঘরের আলো অসংস্কৃতই রহিয়া গেল। রমাপতি লণ্ঠন দুইটি জ্বালাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আবার বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। কানু তখনও পড়া করিতেছে।

বাহির হইতে নর্স আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বার্লি কি করা হয়েছে? কোথায় আছে? আর আপনার মা জল চাইছেন, আমি কি তাঁকে জল দেব?"

রমাপতিকে আবার উঠিয়া আসিতে হইল। সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "বার্লিটা যদি ক'রে নেন, রাঁধুনীটার অসুখ করেছে ব'লে চ'লে গেছে। মায়ের ঘরেই ত জল আছে, আমি দিচ্ছি।"

সরযূ গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা তাই নাকি? তা আমাকে আগে বলেন নি কেন? এতক্ষণে হয়ে যেত। ব'সেই ত আছি তখন থেকে। আমি জল গড়িয়ে দিচ্ছি, আমার হাতে খাবেন কি না তা ত জানি না, তাই জিগ্‌গেষ করছিলাম।"

মানুষটা ত বেশ ভালই বোধ হইতেছে; রমাপতি যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারাও বৈদ্য, এই স্ত্রীলোকটিকেও তাহাই বোধ হইতেছে। ইহার হাতে জল খাইতে মায়ের আপত্তি হইবে কেন? তবে আজকার মত থাক্।

সে সরযূকে রান্নাঘরের দরজাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ যে রান্নাঘর, এখন অবধি উনুনে আঁচ পড়ে নি। সকালে বাজারের খাবার কিনে খেতে হয়েছে। আপনি উনুনটা ধরান, আমি মাকে জল দিয়ে আসছি। কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে সব ওখানেই আছে।"

মা এতক্ষণ নিজের ঘরে আপন মনে বক্‌বক্ করিতে-ছিলেন। "চার পহর বেলা গড়িয়ে গেল, এখন অবধি মুখে এক ফোঁটা জল পড়ল না। তরি মরেছিস্ নাকি? যমে আমায় ভুলে আছে। ওরে ও মুখপোড়া রমা, তোরা সব গেলি কোথায়?"

রমাপতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "যাব আর কোন্ চুলোয়, বাড়ীতেই আছি। কার বা মুখে জল পড়েছে? তরি ত

কাল থেকে জ্বরে অজ্ঞান, কে কার পিণ্ডির ব্যবস্থা করে ? এই নাও জল।"

মা জলের ঘটি হাতে করিয়া বলিলেন, "তুই দিলি ? তোর ত আচার-বিচার কিছু নেই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন যার তার হাতে খাব ? তরির আবার জ্বর হ'ল ? দুটো চাল ডাল সেদ্ধ করে কে ?"

রমাপতি চটিয়া বলিল, "আছ কেবল নিজের তালে। আর আচারের ভাবনা ভাবতে হবে না, যা হাতের কাছে পাচ্ছ, গেল। তরি বলে মরছে, সে আসবে তোমার চাল ডাল সেদ্ধ করতে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাকে কে দেখছে ?"

রমাপতি বলিল, "ডাক্তারবাবু এক জন নর্স নিয়ে এসেছেন, সেই দেখছে।"

মায়ের হাত হইতে জলের ঘটিটা ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেল, ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওমা কোথায় যাব গো! খীরিষ্টানের হাতে খাবে নাকি আবাগী শেষে ? আমার ঘরে যেন কেউ না ঢোকে তা ব'লে দিচ্ছি, আমি তাহলে মাথা খুঁড়ে মরব।"

রমাপতি মাকে টানিয়া জলপ্লাবন হইতে সরাইয়া বসাইয়া দিল। বিরক্ত ভাবে বলিল, "খ্রীষ্টান নয়, খ্রীষ্টান নয়, তোমাকে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতে হবে না। হিন্দুর মেয়ে, বৈদ্যের মেয়ে, তুমিও ত তার হাতে জল খেতে পার। কাল থেকে তাই খেতে হবেও, না-হয় ত শুকিয়ে থেক। আমি ত আর কাজকর্ম্ম ফে'লে তোমায় আগলে বসে থাকতে পারব না ?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ হিন্দুর মেয়ে, হিঁদু ত কাঁদছে! তাহলে নর্সের কাজ করবে কেন ?"

এই বেয়াক্কেল বুড়ীর সঙ্গে বকিয়া লাভ নাই, রমাপতি বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পেটে আগুন ধরিলে মা ঠিক খাইবেন সরযূর হাতে, তখন আর অত বিচার থাকিবে না।

সরযূ বার্লি জ্বাল দিয়া আনিয়া রোগিণীকে খাওয়াইল। তাহার পর বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর সকলের রাতে খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে ?"

রমাপতি বিব্রত ভাবে বলিল, "তাই ত ভাবছি। বাজার থেকে খাবার কিনে আনব ?"

নর্স বলিল, "না না, বাজারের খাবার ভারি খারাপ জিনিষ, ওসব খাবেন না। এক জন ত অসুখে পড়েছে, বাকিদের হলে মহা মুস্কিল হবে।"

রমাপতি বলিল, "তাহলে ?"

নর্স বলিল, "উনুনে আঁচ ত দেওয়াই আছে, আমিই দুটো চাল ডাল সেদ্ধ ক'রে নিচ্ছি। ভাঁড়ারে সব আছে ত ?"

রমাপতি মহোৎসাহে বলিল, "এই ত পরশু এক মাসের ভাঁড়ার আনলাম, সবই আছে নিশ্চয়। আলু পটোলও আছে।" ভাগ্যে হিন্দু নর্স আনার প্রস্তাব সে করিয়াছিল, না হইলে এ সুবিধাটুকু ত হইত না।

সরযূ চলিয়া গেল। তরলা ঘুমাইতেছে, তাহার কাছে বসিবার তখন দরকার নাই। ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর সে খিচুড়ী রাঁধিয়া ফেলিল, আলু পটোলও ভাজিয়া লইল। তাহার পর কানু ও রমাপতিকে ডাকিয়া আনিয়া খাইতে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মা কি খাবেন ?"

রমাপতি খাইতে খাইতে বলিল, "তিনি দুধ ছাড়া রাত্রে কিছু খান না, আপনি খেয়ে নিন্।"

সরযূ রান্নাঘরে ঢুকিয়া নিজের খাবার বাড়িতে লাগিল। রমাপতি খাওয়া শেষ করিয়া নিজের এঁটো থালা-গেলাস উঠাইয়া লইয়া কলতলায় ধুইতে চলিল, দেখাদেখি কানুও তাহাই করিল। সরযূ রান্নাঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝিও নেই বুঝি ?"

রমাপতি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "সেটাও বাড়ী চ'লে গেছে।"

সরযূ আর কথা না বলিয়া খাইতে লাগিল। তাহার পর রান্নাঘরের বাসন ধুইয়া, ঘর পরিষ্কার করিয়া, তরলার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

রমাপতি সকালেই উঠে। কিন্তু উঠিয়া দেখিল নর্স তাহারও আগে উঠিয়াছে। ঘর-দোর ঝাঁট দিয়াছে, এবং উনুন ধরাইয়া রান্নাও চড়াইয়াছে। দেখিয়াই রমাপতির চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। হাজার হউক হিন্দুর মেয়ে ত ? নর্সের কাজ করিলে কি হয় ? ঘরকরনার কাজ নিশ্চয়ই

॰ জানে, এবং করিতেও তাহার কিছু আপত্তি নাই। ।লি মাসে ত্রিশ টাকা মাহিনা যদি না চাহিত।

সরযূ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চা খান নাকি আপনারা? ।মি কিন্তু খাই।"

রমাপতি বলিল, "না খাই না, তা আপনি নিজের জন্যে ন।"

নর্স বলিল, "তাহলে কয়েক পয়সার চা এনে দিন, চিনি ঘরেই আছে।"

রমাপতি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দুধ আবার কোথা থেকে ল?"

সরযূ বলিল, "কেন আপনাদের গয়লানী ত দিয়ে গেল, ললে রোজ এক সের ক'রে দুধ আপনারা রাখেন। মাপনার বোনকে ছানার জল দিতে হবে ডাক্তারবাবু ব'লে গেছেন, তাই দুধটা আমি রাখলাম।"

রমাপতির শনির দশা ধরিয়াছে, না হইলে এত উৎপাত তাহার উপরে কেন? এক সের দুধ? মাসে ছ' সাতটা টাকা? তরি হতভাগী নিজের টাকা কয়টা এমনই করিয়াই জলে দেয়। নিজের দুধ চাই, ছেলের মাছ চাই, যেন সব নবাব খাঞ্জা খাঁয়ের নাতী নাতনী! বলিল, "এক সের দুধই কি ছানার জল করতে লাগবে?"

নর্স বলিল, "তা নাও লাগতে পারে, দুবার দিলে আধ সেরেই হবে। খোকা দুধ খায় না?"

খোকা ত কত। গোঁফ বাহির হইবার বয়স হইতে চলিল। রমাপতি বলিল, "নাঃ, অতবড় ছেলের আবার দুধের দরকার কি? দুবেলা ভাতই ত খাচ্ছে।" নর্স মানুষ চেনে, সে আর কথা বাড়াইল না।

দিনটা মোটের উপর ভালই গেল। নর্স ঘরের সব কাজই করিতেছে, তবে যে কাজের জন্য তাহাকে আনা, সেইটাই প্রায় বাদ পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে রমাপতির আপত্তি নাই। হিন্দুঘরের বিধবা, চট করিয়া মরিবে না। মুখে জল ত পড়িতেছে, ঔষধও পড়িতেছে, আবার কি চায় তরলা? রাত্রে একটা মানুষও ঘরে থাকে তাহাকে আগ্-লাইবার জন্য। ঐ ঢের।

আজ সরযূ সব ঘরের লণ্ঠনই পরিষ্কার করিয়া জ্বালিয়া দিল। তরলা ভাল থাকিতে রমাপতি যতটা আরামে ছিল, তাহা ত ইহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না? এ রমাপতির এঁটো বাসন মাজে না, কাপড় কাচে না, বিছানাও করিয়া দেয় না। এতগুলি টাকা ত লইবে। কিন্তু যেমন রমাপতির কপাল। নইলে তরি হতভাগীই বা টাইফয়েড্ বাধাইবে কেন? বিপদের উপর বিপদ্, সেইরাত্রেই রমাপতির কোমরের বাতটা চাগাইয়া উঠিল। এ-গোষ্ঠীর সকলেরই এ-রোগ অল্পবিস্তর আছে, রমাপতির মা এবং সে নিজে বিস্তরের অধিকারী। সারারাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া সকালের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কানু হতভাগা এককাঁড়ি গিলিতে জানে, কিন্তু তাহাকে দিয়া কাণাকড়ির উপকারের প্রত্যাশা নাই। সারারাত মামার কাতরোক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সে মহানন্দে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

সকালে একটু বেলা করিয়া উঠিয়া সে সরযূকে বলিল, "আজ আর ভাত খাব না, বড় বাতে ধরেছে।"

সরযূ বলিল, "ও মা, আমি ত চাল চড়িয়ে দিয়েছি, জানি না ত? তা যাক্ গে, আপনাকে দুখানা রুটি ক'রে দেব কি?"

তা খাইবে বইকি? পরের পয়সা কিনা? রমাপতি বলিল, "ভাতটা জল দিয়ে রাখবেন, কানু খাবে এখন। ও পান্তা ভাত খুব ভালবাসে। রুটি আমার চাই না, আমি মুড়ি খাব এখন। তরি কেমন আছে?"

সরযূ বলিল, "একটু ভালই বোধ হচ্ছে। এই যে চা-টা খেয়ে টেম্পারেচার নেব এখন। বোধ হয় চোদ্দ দিনেই জ্বর ছেড়ে যাবে, খুব শক্ত টাইপের নয়।"

কিন্তু চোদ্দ দিনে ছাড়িল না, একুশ অবধি গড়াইয়া গেল। একটু সেবাশুশ্রূষা করিলে হয়ত আরও আগে সারিতে পারিত, কিন্তু করে কে? রমাপতি নিজেকে লইয়া ব্যস্ত, আর সরযূ সংসার লইয়া ব্যস্ত। রান্নাই তাহাকে দুবার করিতে হয়। একবার মাছের রান্না, একবার নিরামিষ, বৃদ্ধার জন্য। তিনি বাধ্য হইয়া এখন সরযূর হাতেই খাইতেছেন। সরযূকে দেখিলে ত বিধবাই মনে হয়, কিন্তু মাছ ত দিব্য খায়। পাছে পলায়ন করে ভাল খাইতে না পাইলে, এই ভয়ে রমাপতি মধ্যে মধ্যে মাছ কিনিয়া আনিতে বাধ্য হয়।

তরলা ত সারিয়া উঠিল, অর্থাৎ জ্বরটা ছাড়িয়া গেল। তবু ও হতভাগী বিছানা ছাড়িয়া উঠে না, কথা বলিলে জবাব দেয়

না, মহা মুস্কিল। কতকাল আর এভাবে চলিবে? এখন উঠিয়া পড়িয়া নিজের কাজকর্ম্মের ভার নিজে গ্রহণ করিলে রমাপতি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কানুর জ্যাঠামহাশয়ের কাছ হইতে যে এক শ' টাকা আদায় করিয়াছিল, সরযুর মাহিনা ত্রিশ টাকা দিয়া দিলে, তাহার আর অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, রমাপতির নিজের পয়সায় যদি হাত না পড়ে।

ডাক্তার সেদিন আসিতেই রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু, জ্বর ত ছাড়ল, কিন্তু এ যে ওঠেও না, হাঁটেও না, কত দিন আর এভাবে চলবে? গরীবের ঘর, কাজকর্ম্ম করতে হবে ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "আগে বাঁচুক মশায়, তারপর কাজ-কর্ম্ম। এ ত সহজ রোগ নয়, সারলেও বেশীর ভাগ চির-কালের মত একটা না একটা উপসর্গ রেখে যায়। এঁর ত বোধ হচ্ছে ডান দিক্‌টা অবশ হয়ে গেছে।"

রমাপতি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ, কতদিন এমন থাকবে?"

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা কি বলা যায়? সময়ে সেরেও যেতে পারে," বলিয়া অতি অবিবেচকের মত প্রস্থান করিলেন।

আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তরলা উঠিয়া কাজ করিবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। সরযূ আসিয়া বলিল, "দেখুন, ইনি ত সেরে উঠেছেন, মানে নর্সের আর কোনও দরকার নেই, ঝি দিয়েই কাজ চলতে পারে। আমার মাইনেটা যদি দিয়ে দেন ত আমি চলে যাই, আমার আর একটা 'কল্‌' এসেছে।"

রমাপতির মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সরযূ চলিয়া গেলে উপায় হইবে কি? ঝি ত দুহাতে পয়সা চুরি করিবে, বাড়ীর জিনিষপত্রও যে না চুরি করিবে তাই বা বলা যায় কিরূপে? তাহার উপর সে রান্না করিবে না, একটা রাধুঁনীও রাখিতে হইবে। সর্ব্বনাশ, খাইয়াই তাহারা রমাপতিকে পথে বসাইয়া দিবে।

সে কাতরভাবে বলিল, "আরও দিনকতক থাকুন, তবি সেরে উঠুক।"

সরযূ বলিল, "ওঁর সারতে এখন ঢের দেরি, ন-মাস হ'তে পারে, বছর ঘুরে যেতে পারে। তত দিন আমি এখানে শুধু শুধু থাকলে লোকে বলবে কি? আপনিই বা অত পয়সা খরচ করবেন কেন? একটা ঝিয়েই যখন চলে!"

তাই ত, মাসে ত্রিশটা করিয়া টাকা! এমন কোনও উপায় হয় না যাহাতে বিনা খরচে ইহাকে রাখা যায়? সারারাত ভাবনায় রমাপতির ঘুম হইল না। উপায় ত সে ভাবিয়া পাইল, কিন্তু সরযুর কাছে বলিতে যে লজ্জা করে?

কিন্তু বলিতেই হইল। কারণ তাহার পরদিনও সরযূ মাহিনা চাহিতে আসিল। রমাপতি মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "এ মাসে দিচ্ছি, কিন্তু পরের মাস থেকে আর দিতে পারব না।"

সরযূ গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, তা মাইনে না দিলে আমি থাকব কেন?"

রমাপতি বলিল, "এই, আমি বলছিলাম কি—যে একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, যাতে মাইনে লাগে না?"

নর্স বলিল, "সে আবার কি?"

রমাপতি ঘামিতে ঘামিতে বলিল, "এই ধর আমি যদি আপনাকে বিয়ে করি, তাহলে ত—"

সরযূ বলিল, "তা মাইনে লাগবে না বটে। তা আমি বিধবা মেয়ে আমায় বিয়ে করলে সমাজে খাটো হ'তে হবে না?"

রমাপতি বুক ফুলাইয়া বলিল, "বয়েই গেল, সমাজের আমি খাই না পরি?"

পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল, দুটো ভাইই অপদার্থ। একটা আনিল মেম, আর একটা করিল বিধবা বিবাহ। রমাপতি কিন্তু আনন্দে দিশাহারা। বউ ঘরের কাজ ত করিবেই, উপরন্তু নর্সিং-জানা বউ, বাতের শুশ্রূষাও ভাল মতে করিবে।

কিন্তু দুই দিন পরে বউ যখন মায়ের ঘরের লোহার সিন্দুক খুলিয়া এক গা গহনা পরিয়া আসিল, তখন রমাপতি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "প'রো না, অতগুলো প'রো না, সোনা ক্ষয়ে যাবে।"

সরযূ বলিল, "হুঁ, পরব আবার না। ক্ষইবে ব'লে এয়োস্ত্রী মানুষ গহনা পরব না? অত কিপ্টেমী চলবে না।"

রমাপতি দেখিল সব সুখস্বপ্নেরই অবসান আছে।

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(৭)

হেন মতে কিছুদিন চণ্ডী রাসমণি।
সাধন প্রসঙ্গে রহে দিবস রজনী॥
যদিও সমাজ তাহে নাহি ভাবে আন।
তত্রাপি নকুল সবে ভালই বুঝান॥
নকুল চণ্ডীর হয় সমাজ-সুহৃৎ।
মহামানী বিচক্ষণ বহুশাস্ত্রবিৎ॥
নর মধ্যে চণ্ডীর কর্ম্মের কিবা ফল।
আদৌ তা বুঝিতেন তিনিই কেবল॥
হেথায় রোহিণী নিশি জাগে অভিসারে।
প্রায় উঠি যায় কোথা কেহ না ঠাউরে॥
একদিন বুঝিতে পারিল দয়ানন্দ।
কোথা যায় বলি তার মনে হইল সন্ধ॥
কিছু না বলিয়া কভু তাহার পশ্চাতে।
চলিলেন দয়ানন্দ সবার অজ্ঞাতে॥
আজি তোরে না বধিয়া না ফিরিব ঘর।
এই কথা রোহিণী কহিলা অতঃপর॥
ভাবে তবে দয়ানন্দ এই কথা শুনি।
কি হেতু কাহারে বধ করিবে রোহিণী॥
মাঝে মাঝে ফেও ফেও ডাকে ফেরুপাল।
হুক্কা রবে কুকুর ফিরয়ে পালে পাল॥
নির্ভয়ে এলায়ে কেশ চলিছে রোহিণী।
গজেন্দ্র-গমনে যথা নগেন্দ্র-নন্দিনী॥
বরাবর যায় চলি পবন-গমনে।
কত বড় বড় ঘর রাখিঞা দক্ষিণে॥
উপনীত হইল শেষ রাজ-দরবারে।
হেথা সেথা করি দেখে ভিতর বাহিরে॥
তথা হতে গেল চলি বাগানবাড়ীতে।
উঁকি-ঝুঁকি মারি তবে পাইল দেখিতে॥
ধ্যানমগ্ন রহে রাজা উত্তর-হামীর।
এক তীক্ষ্ণ খড়্গ রামা করিল বাহির॥

যেমন করিবে রাজ-অঙ্গে খড়্গাঘাত।
দয়ানন্দ ছুটি গিঞা ধরে দুটি হাত॥
কর কি রোহিণী বলি মুখপানে চায়।
চমকি রোহিণী তবে সরিঞা দাঁড়ায়॥
তখন সে দয়ানন্দে কিছু না বলিয়া।
তথা হতে দ্রুতবেগে আইলা চলিয়া॥
২৩৩/] কিছু দূর আসি কহে পিতৃ-হন্তা জনে।
অবশ্য কর্ত্তব্য মোর বধিতে পরাণে॥
কেন ধর্ম্ম নষ্ট মোর করিলে স্বামিন্।
যাক আজ কিন্তু তারে বাঁচাবে কদিন॥
দয়ানন্দ কহে তুমি কুলবতী নারী।
কেমনে ধরিবে প্রাণ নর-হত্যা করি॥
রোহিণী রুষিয়া কহে চাহি প্রতিশোধ।
তাহে দুর্ব্বলতা মাত্র পাপ-পুণ্য-বোধ॥
যদ্যপি বধিতে আমি না পারি তাহারে।
রাজধর্ম্ম ক্ষমিবে না জন্ম-জন্মান্তরে॥
এক পক্ষে হঞি আমি অতিবলহীন।
আর পক্ষে হই কিন্তু কুলিশ-কঠিন॥
রাজার নন্দিনী আমি কহি তব আগে।
তেঁই মম প্রতিহিংসা সদা মনে জাগে॥
যেরূপে জনকে মোর কাটিলা হামীর।
সেই মত কাটিয়া পাড়িব তার শির।
বক্ষে ধরি তার পর চরণ তুমার।
সংসার করিব এই প্রতিজ্ঞা আমার॥
দয়ানন্দ বলে ওহো কি বলিস ক্ষেপী।
রাজারে নাশিলে দেশ উঠিবে যে ক্ষেপি॥
রোহিণী কহিলা শুন হৃদয়-দেবতা।
স্বর্গে থাকি কি আদেশ করিছেন পিতা॥
যাই যাই থাক বাবা সুখে স্বর্গপুরে।
আজ কিম্বা কাল আমি বধিব হামীরে॥

এত বলি রোহিণী হইলা অন্তর্দ্ধান।
বসি পড়ে দয়ানন্দ হঞে হতজ্ঞান॥
কিছু ক্ষণ পরে উঠি চলে ধীরে ধীরে।
উপনীত হইল গিঞা শয়ন-মন্দিরে॥
হেথা প্রভু চণ্ডীদাস বসিঞা ধ্যানেতে।
সকল বৃত্তান্ত তিনি পারিলা জানিতে॥
ধ্যান-ভঙ্গে উঠি তবে চলিলা সত্বর।
রাজ-অন্তঃপুরে যথা হামীর-উত্তর॥
ধীরে ধীরে চক্ষু মেলি দেখে নৃপমণি।
সমুখেতে চণ্ডীদাস ভক্ত-চূড়ামণি॥
দণ্ডবত্ নমি রাজা কহিলা তখন।
হেনকালে কেন প্রভু হেথা আগমন॥
উত্তরিলা চণ্ডীদাস কি কহিব আর।
বড়ই বিপদ রাজা সমুখে তুমার॥
নিশি-যোগে আসে যায় নারী একজন।
চোরাঘাতে তুমার সে বধিতে জীবন॥
নারী বলি কভু তারে না ভাবিহ হীন।
গুপ্ত ভাবে অন্তঃপুরে থাক কিছু দিন॥
বিস্মৃত না হও রাজা খুব সাবধান।
এত বলি চণ্ডীদাস হইলা অন্তর্দ্ধান॥
ভাবিতে লাগিল তবে হামীর রাজন।
কি হেতু নাশিবে মোরে কেবা সেই জন॥
নিত্য কর্ম্ম হয় যার পর-উপকার।
তাহার মরণে বাঞ্ছা হয় তবে কার॥
প্রাণ-ভয়ে থাকি যদি অন্দর-মহলে।
বাঁচিয়াও মরা আমি হব যে তা হলে॥
কিন্তু যদি হেনমতে ঘটে তিরোভাব।
মরিয়াও অমরত্ব হবে মোর লাভ॥
নিত্য আমি রব হেথা ধ্যানেতে মগন।
যায় যাবে যাক তাহে আমার জীবন॥
এত ভাবি নর-রায় বসি সেই স্থানে।
নিত্য কর্ম্ম করে নিত্য নির্ব্বিকার মনে॥
একদিন ধ্যান-মগ্ন আছে নরমণি।
ধীরে ধীরে গিঞা তথা পশিলা রোহিণী॥

যেমন মারিবে খড়্গ নৃপতির মাথে।
২৪/] কে ছুটি ধরিল হাত পশ্চাৎ হইতে॥
চেয়ে দেখে চণ্ডীদাস আছে ধরি হাত।
রোহিণীর শিরে যেন হইল বজ্রাঘাত॥
চণ্ডীদাস কহে রুষি আরে হতভাগী।
রাজ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবি কি লাগি॥
কুলের কামিনী তুই এমন রাক্ষসী।
এই দোষে হস্ত তোর পড়িবে যে খসি॥
কোন্ দোষে কহ তবে কহিলা রোহিণী।
ভবানীরে কইল বধ এই নৃপমণি॥
বেশ ত আছেন তিনি সিংহাসনে বসি।
কই তার হাত ছুটি পড়ে না ত খসি॥
জনকে যেদিন রাজা করিল নিধন।
তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ॥
বয়েস পর্য্যন্ত যার না দেখিলা মুখ।
ভাশুর শ্বশুর পর সবার সমুখ॥
হেন মাতা কইলা যবে চিতা-আরোহণ।
তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ॥
রাজ-কন্যা হঞে আমি দাসী-বৃত্তি করি।
কত লাথী খেঞেছিনু রাজ-পদে ধরি॥
হত বা না হত কভু উদর-পূরণ।
তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কি ছিল না সেকালে।
কি আছে রাজার ধর্ম্ম কর্ত্তব্য লঙ্ঘিলে॥
রাজ-কন্যা আমি এই রাজ্য-অধিকারী।
হামীরে নাশিব কিম্বা দিব দূর করি॥
পিতৃ-সিংহাসনে মোর বসিব এখন।
ইথে কি অধর্ম্ম তুমি দেখিছ ব্রাহ্মণ॥
হামীর-উত্তর কহে করি যোড়পাণি।
ব্রাহ্মণ রাজার কন্যা তুমিই রোহিণী॥
এস মাগো রাজলক্ষ্মী বস সিংহাসনে।
তোরে রাজা করি আমি যাইব যে বনে॥
ধর মা মুকুট পর মস্তকে তুমার।
রাজ-রাজেশ্বরী তুমি লহ রাজ্যভার॥

দিব্য করি বলি কিন্তু শুনে থাক কানে।
তোর পিতৃহত্যা এই হামীর না জানে॥
চমকি উঠিঞা তবে কহিলা রোহিণী।
মোর পিতৃ-হত্যা তুমি জান না নৃমণি॥
কে দিলা তোমায় তবে এই রাজ্য-ভার।
কে করিল হত্যা কহ পিতারে আমার॥
রাজা কহে পিতা তব ভবানী-ঝোর‍্যাত।
সামন্ত রাজার বংশ করিঞা নিপাত॥
বসিয়াছিলেন এই সিংহাসনোপরি।
দুরন্ত সামন্ত জাতি দিলা দূর করি॥
লোকমুখে শুনি মা গো কিছু দিন পরে।
বৈশাখের অগস্ত্যে[৩৫] এ রাজ-দরবারে॥
ছদ্ম-বেশে আসিঞা সামন্ত বার জন।
কৌশলে করিলা তোর পিতার নিধন।
এ রাজ্যের হঞা তারা সম-অধিকারী।
মাসে মাসে হয় রাজা এক জন করি॥
তাহাতে না হয় দেখি রাজ্যের সুসার।
মোরে কন্যা দিঞা এক দিলা রাজ্যভার॥
জাতে ছত্রী হই আমি ছিলাম পশ্চিমে।
মাতুল-আশ্রমে মোর বারাণসী ধামে॥
চণ্ডীদাস প্রভুর সে পরশি চরণ।
সঙ্ক্ষেপে কহিনু এই সত্য বিবরণ॥
কর মা বিচার তুই নিজ স্বার্থ ছাড়ি।
কে কাহার রাজ্য তবে লঞেছিল কাড়ি॥
শুনিঞা রোহিণী তবে হাস্য করি বলে।
রাজ্য কাড়াকাড়ি লঞে বিচার না চলে॥
কাড়াকাড়ি বিনা রাজ্য কে কোথায় পায়।
সমরে লইলে কাড়ি নাহি দোষী তায়॥
কিন্তু রাজ্য চোরাঘাতে লয় যেবা কাড়ি।
না করি তাহার হিংসা কেবা দেয় ছাড়ি॥

জানি আমি তুমি রাজা ধার্ম্মিক সুজন।
পরমপণ্ডিত তুমি অতি বিচক্ষণ॥
প্রতিজ্ঞা করিঞা তেঁঞি কহি মহাভাগ।
এ রাজ্যের দাবী আজি করিলাম ত্যাগ॥
যদি হত্যা-পাপ না পরশে এই ভূমে।
২৪৵] সুখে রাজ্য কর রাজা বংশ-অনুক্রমে॥
কিন্তু তায় কলুষিত হলে এই মাটি।
মরিবে সকল রাজা করি কাটাকাটি॥
দিলাম এ রাজ্যে আমি এই অভিশাপ।
দেখি শুনি দাও রাজা অন্ধকূপে ঝাঁপ॥
এত বলি নমি বামা চণ্ডীর চরণে।
অদৃশ্য হইলা এবে সহাস্য বদনে॥
চণ্ডীদাস মুখপানে চাহি নররায়।
কহিলেন কহ দেব কি করি উপায়॥
উত্তরিলা চণ্ডীদাস কহে চতুর্ব্বেদ।
ব্রহ্ম-বধে প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ-অশ্বমেধ॥
কিন্তু কলিযুগে তাহা না হয় শোভন।
কর রাজা নব-রাত্রি হরি-সংকীর্ত্তন॥
সর্ব্ব পাপ হয় দূর মাত্র হরিনামে।
বলি গেলা চণ্ডীদাস আপন আশ্রমে॥
এই মতে করি রাজা বহু আয়োজন।
নব-রাত্রি করিলেন হরি-সংকীর্ত্তন॥
খাইলা অসংখ্য দ্বিজ বৈষ্ণব ভিখারী।
আইলেন নররায় বহু তীর্থে ফিরি॥
গয়াভোজ্য দিঞা তবে বসিলেন পাটে।
নিয়োজিলা বিপ্র কত বেদ-চণ্ডী-পাঠে॥
এইরূপে ব্রহ্ম-বধ-পাপ-বিমোচনে।
থাকেন হামীর রায় হরষিত মনে॥
রাস-পূর্ণিমার আর বেশী দেরি নাঞি॥
চলিলেন বিষ্ণুপুরে চণ্ডীদাস রাই॥
আবার হেরিব বাঁকা মদন-মোহন।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ হইল আনন্দে মগন॥

* | * | *

---

৩৫) বৈশাখ মাসের অগস্ত্যযাত্রার দিন, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ। ইহার পূর্ব্বদিন চড়ক হইয়াছিল। সেদিন ভবানী-ঝোর‍্যাৎ খঞ্জরের আঘাতে নিহত হন। দ্বাদশ সামন্ত রাজ্যের অধিকারী হইয়া এক এক মাসে এক এক জন রাজা হইত।

বিষ্ণুপুর বনগ্রাম বাঙ্গালার মাথা।
মল্লেশ গোপাল-সিংহ নিবসেন যথা॥
চলে তথা চণ্ডীদাস চতুর্দ্দোলে চড়ি।
সঙ্গে রামী রামরূপ ফুলচাঁদ ছড়ি॥*
রামরূপ ফুলচাঁদ মল্লরাজ-দূত।
নৃপতির প্রিয় অতি জাতিতে রজপুত॥
শঙ্খনাদ করি তবে যত পুরবাসী।
চণ্ডীর মস্তকে ফুল ছুড়ে রাশি রাশি॥
কেহ করে জয়ধ্বনি কেহ গুণ গায়।
এইরূপে চণ্ডীদাস হইলা বিদায়॥
মল্লরাজ-পুরে তবে উপনীত হন।
নগরের শোভা দেখি প্রফুল্লিত মন॥
অবিশ্রান্ত যাতায়াত করে নর নারী।
সারি সারি শোভে কত দোকানী পসারী॥
কত শত দেবালয় স্বর্ণ উচ্চ-চূড়া।
প্রবাল মুকুতা মণি মাণিক্যেতে জড়া॥
বড় বড় বাপী কত না যায় বর্ণন।
প্রকাণ্ড পরিখা গড় করেছে বেষ্টন॥
আম্র তাল তমাল বিশাল তরু-রাজি।
মনোমত করি যেন রাখা আছে সাজি॥
অভেদ্য সুদীর্ঘ এক প্রাচীরেতে বেড়া।
রাজ-অট্টালিকা শোভে ধরি উচ্চ চূড়া॥
ঢোল ঢক্কা বাজে কত শঙ্খ নহবত।
কেহ নাচে কেহ গায় বাজায় সঙ্গত॥
বার্ত্তা পেঞে মল্লরাজ বাহিরে আইসে।
করপুটে প্রণাম করিলা চণ্ডীদাসে॥
কহিলেন আজ্ঞি মম অতি সুপ্রভাত।
ঘরে বসি পাইনু তেঞি প্রভুর সাক্ষাৎ॥
কৃপা করি অন্তঃপুরে করুন গমন।
মহিষী করিবে তব চরণ দর্শন॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস শুন নরমণি।
পুর মধ্যে কারো কভু নাহি যাই আমি॥

* ছড়ি-দার।

তবে যদি পাই দেখা মদন-মোহন।
অবশ্যই অন্তঃপুরে করিব গমন॥
২৫/] রাজা কহে থাকে মুক্তা শুক্তির ভিতরে।
কিন্তু সে কি জানে মুক্তা কত গুণ ধরে॥
কত রত্ন গর্ভে সিন্ধু করঞে ধারণ।
জানে কিসে রত্ন কত যতনের ধন॥
আছে বটে মল্লপুরে সে অমূল্য ধন।
আমি কি চিনিব তায় হঞে নরাধম॥
একাত্মা সে চণ্ডীদাস শ্রীরাধা-বল্লভ।
তব ইচ্ছা হলে সে ত নহে অসম্ভব॥
মোর পাশে থাকেন যে রূপে যবে তিনি।
দেখাইব আমি তাঁরে লইবেন চিনি॥
তুমিও আইস মা গো রাই রাসমণি।
তব আগমনে আমি বহুভাগ্য মানি॥
এইরূপে পরস্পর করি সম্ভাষণ।
রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে করিলা গমন॥
ছিলা রাণী স্থির-নেত্রে দাঁড়াঞে প্রাঙ্গণে।
প্রণাম করিলা তবে দোঁহার চরণে॥
সসম্ভ্রমে মৃগচর্ম্ম পাতিলেন তিনি।
তাহাতে বসিলা প্রভু চণ্ডীদাস রামী॥
তাড়াতাড়ি করে কেহ চরণ খালনে।
কেহ ছুটাছুটি করি তাম্রকূট৩৬ আনে॥
আস্তে ব্যস্তে আসি কেহ চামর ঢুলায়।
বসি কাছে কত কথা কহে নররায়॥
বালক বালিকা বহু ফিরে দলে দলে।
অসংখ্য রমণী রহে অন্দর-মহলে॥
আবার কহিলা রাজা কে আছ হোথায়।
তামাকু সাজিয়া পুন আনহ ত্বরায়॥
চণ্ডীদাস হাস্যমুখে কহিলা তখন।
কোথা মল্লেশ্বর তব মদন-মোহন॥

৩৬) প্রায় ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে এদেশে তামাক চলিয়াছে। গল্প আছে, মদন-মোহন বালক-বেশে তাঁহার ভক্ত রাজা বীর-হাম্বীরের নিমিত্ত কলিকায় তামাক সাজিতেন। বোধ হয় কৃষ্ণসেন গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন।

রাজা কহে এর মধ্যে আছেন যে তিনি।
অন্তর্যামী তুমি প্রভু লহ তারে চিনি ॥
পুরমধ্যে তিনি মোর স্নেহের সন্ততি।
রণ-ক্ষেত্রে হন তিনি মোর সেনাপতি ॥
রাজ-কাজে মন্ত্রী তিনি বিপদের বন্ধু।
তিনিই তরণী মোর তরিবারে সিন্ধু ॥
বসিলেন চণ্ডীদাস ধ্যানস্থ হইঞে।
আইল বালক এক তাম্রকূট লঞে ॥
কলিকা না লয় কেহ থাকে সেহ ধরি।
মাঝে মাঝে দেয় ফুঁক কলিকা উপরি ॥
দেখিল তখন চণ্ডী মেলিঞা নয়ন।
কলিকা ধরিঞা রহে মদন-মোহন ॥
প্রভু প্রভু বলি তবে উঠে অকস্মাত।
রাণী কোলে হাস্য করি উঠে জগন্নাথ ॥
মহিষীর পদে চণ্ডী মূরছি পড়িল।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যে যেথায় ছিল ॥
মোহ ত্যজি চণ্ডীদাস কহিলা তখন।
কোথা মা যশোদে তব সে নীল-রতন ॥
বহুভাগ্যবান রাজা বহু ভাগ্য তোর।
একবার দে মা তারে ধরি বুকে মোর ॥
বহুপুণ্যফলে আমি কইনু আগমন।
এই তোর বিষ্ণুপুর নব বৃন্দাবন[৩৭] ॥
রাণী কহে প্রভু আমি অতিজ্ঞানহীন।
না হেরি নয়নে তারে আর কোন দিন ॥
আজি রাই চণ্ডীদাস পুর-পদার্পণে।
প্রত্যক্ষ করিনু আমি মদন-মোহনে ॥
জ্ঞান-শূন্য ছিনু তেঁই নাহি জানি আমি।
কোল হতে কতক্ষণ গিঞাছেন নামি ॥
আবার বসিলা চণ্ডী মুদিয়া নয়ন।
হৃদয়-মাঝারে হেরে মদন-মোহন ॥

সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষণে কণ্টকিত তায়।
সিক্ত হইল বক্ষস্থল নয়নধারায় ॥
নিকটে বসিঞা তবে রাই রাসমণি।
২৫৮/] কর্ণমূলে বার বার করে হরিধ্বনি ॥
ক্রমে ক্রমে চণ্ডীদাস পাইলা চেতন।
চেতন পাইঞা করে আত্মসম্বরণ ॥
কিছু ক্ষণ পরে প্রভু কহিলা রাজন।
বিশ্রাম করিব আমি কোথায় আশ্রম ॥
একটি সুরম্য স্থান গড়ের বাহিরে।
নির্দ্দিষ্ট করিলা রাজা আশ্রমের তরে ॥
তথা রামী চণ্ডীদাস থাকে মনসুখে।
যখন যা চান তাঁরা আনি দেয় লোকে ॥
দিনরাত যাতায়াত করে নরনারী।
কিন্তু সবে দেয় গালি বহু নিন্দা করি ॥
দয়ানন্দ-সরস্বতী বিষ্ণু-শিরোমণি।
মহানন্দ-উপাধ্যায় যত মহামানী ॥
কার্য্য না বুঝিয়া তাঁর উঠিলেন চটে।
শুনিলে চণ্ডীর নাম গালি দিঞা উঠে ॥
একদিন গেলা সবে রাজ-সন্নিধানে।
কহিলা অনেক কথা যা আইলা মনে ॥
অন্তরে হাসিয়া রাজা কহিলা তখন।
উচিত তা হলে হয় পরীক্ষা এখন ॥
করহ যেমতে পার পরীক্ষা তাহার।
পশ্চাত যা হয় আমি করিব বিচার ॥
এত কহি মনে মনে হাসি নরপতি।
কহিলেন প্রভুপদে এ মোর মিনতি ॥
প্রকাশ মহিমা তব সবার সমুখে।
লেগে যাক চূণকালী সবাকার মুখে ॥
প্রকাশ্যে কহিলা রাজা যাও সবে এবে।
কর গে পরীক্ষা তায় পার যেই ভাবে ॥
যে আজ্ঞা বলিঞা তবে সবে চলি গেল।
পরীক্ষার পথ তারা খুঁজিতে লাগিল ॥
কেহ কহে রামীরে লুকাঞে রাখ কোথা।
কেহ কহে তা হলে না রবে কারো মাথা ॥

---

৩৭) বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য হইয়া বিষ্ণুপুরকে নব বৃন্দাবন করিয়াছিলেন। বাজের নাম ও নিকটস্থ গ্রামের নাম বৃন্দাবন হইতে লইয়াছিলেন।

আসিয়াছে যত বার চণ্ডীদাস রামী।
রাজার অপার ভক্তি দেখিয়াছি আমি ॥
তার মধ্যে রামীরে অধিক ভক্তি তার।
না করিবা তার প্রতি কোন অত্যাচার ॥
কেহ কহে সেই ভাল আইলে বাহিরে।
রামীরে ধরিয়া কোন ঘরে রাখ পুরে ॥
তার স্থানে বেশ্যা এক করুক গমন।
রামী-কণ্ঠে করুক সে প্রেম-আলাপন ॥
দেখিব গোপনে কিবা করে চণ্ডীদাস।
এই কথা শুনি দেয় সকলে সাবাস ॥
একদিন সন্ধ্যাকালে রজক-ঝিয়ারী।
গিঞাছেন কোথা কিন্তু না আইলা ফিরি ॥
ধ্যান-ভঙ্গে চণ্ডীদাস রাই বলি ডাকে।
যাই বলি পড়ে সাড়া কিছু দূর থেকে ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই হইল যে রাতি।
বেশ্যা কহে রামী-কণ্ঠে তাহে কিবা ক্ষতি ॥
কিন্তু এক নিবেদন করিনু তুমারে।
গিঞাছিনু আমি আজি লাল-সরোবরে[৩৮] ॥
শুন দেব কত নারী রূপেতে বিজলী।
নাগর ধরিঞা বুকে করে জল-কেলি ॥
দেখিঞা আমার মন হয় উচাটন।
সর্ব্বাগ্রে আমারে তুমি দাও আলিঙ্গন ॥
চণ্ডীদাস কহে এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা।
তুমি সেই রামী কিম্বা আরো কোন জনা ॥
সঞ্জীবনী দিঞা রাই বাঁচালি যে মোরে।
ভুজঙ্গিনী হয়ে সে কি দংশিবার তরে ॥
দেখালি স্বর্গের শোভা নন্দন-কানন।
এখন করাতে চাস নরক-দর্শন ॥
সে চক্ষু যে বহুদিন হারাঞেছি রাই।
কেমনে তুমার তবে বাসনা পুরাই ॥
পূর্ণিমা কহিলা হাসি শুন মহাশয়।
পূর্ণ কর বাঞ্ছা মোর বিলম্ব না সয় ॥

জান নাকি চণ্ডীদাস রমণীর আশা।
পূর্ণ না করিলে তার ঘটে কি দুর্দ্দশা ॥
চণ্ডী কয় জানি আমি ক্লীব হয় সে বা।
চির-ক্লীব চণ্ডীর তাহাতে ভয় কিবা ॥[৩৯]
হেন কালে রাসমণি বাতি লঞা হাতে।
পশিলা আশ্রমে তবে আসি কোথা হতে ॥
পূর্ণিমা পলাঞে গেল ছুটিঞা বাহিরে।
দেখিলেন রাসমণি কিছু পাশে ফিরে ॥
কহিলেন চণ্ডীদাসে দেখিলাম একি।
চণ্ডী কহে তোর মুখে এ প্রশ্ন সাজে কি ॥
হইল দুপুর রাতি তবু দেখা নাই।
হায়রে আমার এমনি গুণমঞি রাই ॥
রামী কহে কত জন না বুঝি কারণ।
অবরুদ্ধ করি মোরে রাখে এতক্ষণ ॥
চণ্ডী কহে এই সেই তারি পরিণাম।
বড়ই অদ্ভুত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম ॥
দিতে পারি কৃপণেও দাতা-কর্ণ নাম।
জামাতার অন্নদাসে বলি ভাগ্যবান ॥
শিব-তুল্য হলেও এ বলা বড় দায়।
দুষ্টের নিকটে মান রবে কিবা যায় ॥
এইরূপে রাজ-স্থানে লইলে বিদায়।
অবশ্য তাহাতে মোর কিছু ক্ষতি নাই ॥
কিন্তু সেটা আমার কর্ত্তব্য নাহি হবে।
এই হেতু কিছু শিক্ষা দিব আমি সবে ॥
রামী কহে সত্য কিন্তু আত্মরক্ষা চাই।
নইলে হবে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই[৪০] ॥
চণ্ডী কহে বাসলীর যা ইচ্ছা তা হবে।
তত্রাপি উচিত মোর শিক্ষা দেওা সবে ॥
এত কহি হইলেন ধ্যানেতে মগন।
রাসমণি নীরবেতে করিলা গমন ॥

৩৮) এই সরোবরের প্রচলিত নাম লালবাঁধ। বিষ্ণুপুরের লালজী ঠাকুরের নামে বাঁধের নাম। বিষ্ণুপুরে সাতটি বাঁধ বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ।

৩৯) (মহাভারতে) সুরলোকে অর্জুন উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া শাপে ক্লীব হইয়াছিলেন। বিরাটভবনে অর্জুন বৃহন্নলা।

৪০) মহাভারত আদিপর্ব্বে (২০৯-২১২ অঃ) সুন্দ ও উপসুন্দ অত্যন্ত বলশালী এক-রূপ-ধর দুই দৈত্য ভ্রাতা ব্রহ্মার বরে ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হইয়াছিল। তাহাদের নাশের নিমিত্ত তিলোত্তমা প্রেরিত হইলে তাহাকে পাইবার জন্য দুই ভ্রাতা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়।

সেথায় পড়িল মুক্ত বাসলীর পদে।
বুঝিলেন মাতা চণ্ডী পড়েছে বিপদে॥
ধরিলেন করে শ্যামা খড়্গ খরসান।
মল্লরাজ-পুরে গিঞা হইলা অধিষ্ঠান॥
পূর্ণিমার মুখে শুনি নির্ধ্যাস বারতা।
সকলে পাইল বড় অন্তরেতে ব্যথা॥
সরস্বতী কহে সবে শুন সর্ব্বজন।
অদ্য রাত্রে কারো যদি ঘটএে মরণ॥
চুপে চুপে আশ্রমে লইএে সেই শবে।
রাখি আসি প্রহরায় রব মোরা সবে॥
ডাকি ভূপে দেখাইএে কব চণ্ডীদাস।
অর্থ-লোভে হে রাজন করিয়াছে নাশ॥
উপাধ্যায় কহে সেটা সম্ভব কি হবে।
অর্থে লোভ চণ্ডীর যে কভু না সম্ভবে॥
রামী সঙ্গে ছিলা তার বড়ই প্রণয়।
এ কথা বলিলে কিছু সঙ্গত বা হয়॥
সরস্বতী কহিলেন সেটা হবে পরে।
রোগীর সন্ধান এবে কর ঘরে ঘরে॥
অদ্য রাত্রে একাজ নিশ্চয় হওা চাই।
২৬৮/] পুনঃ পুনঃ কহি সবে দিলেন বিদায়॥
সারাদিন সবে মিলি ফিরি হেথা সেথা।
মরণ-উন্মুখ রোগী না দেখিলা কোথা॥
দয়ানন্দ-ঘরে সবে আইলা তখন।
কহিল কোথাও রোগী নাহি এক জন॥
সরস্বতী বলে তবে কি হবে উপায়।
আজ নয় কাল হবে কহে উপাধ্যায়॥
পুনঃ কহে দয়ানন্দ দুষ্টের কৌশল।
যত শীঘ্র পড়ে ধরা ততই মঙ্গল॥
হেন কালে ছুটাছুটি আসি এক নারী।
কাঁদিয়া কহিল কর্ত্তা আইস ত্বরা করি॥
আচম্বিতে খোঁকার কি হইল নাহি জানি।
ঝলকে ঝলকে রক্ত করিতেছে বমি॥
খোঁকা দয়ানন্দের সে একই সন্তান।
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু দেখিতে সুঠাম॥

ছুটি গিঞা সবে মিলি দেখিলা তখন।
চিরদিন তরে খোঁকা মুদেছে নয়ন॥
দয়ানন্দ কাঁদি উঠে বক্ষে কর হানে।
সুশীল সুশীল বলে ডাকে ঘনে ঘনে॥
উঠিল কান্নার রোল কে কারে সামালে।
কাঁদে মাতা উচ্চরোলে শব লঞা কোলে॥
উপাধ্যায় শিরোমণি দিতেছে সান্ত্বনা।
কি বলিছে কি বুঝিছে কানেই শুনে না॥
কহে পরে উপাধ্যায় দয়ানন্দে ডাকি।
জ্ঞান-বৃদ্ধ তুমি ভাই তবে কর একি॥
বাঁচা-মরা সকলই ঈশ্বরের হাত।
তার জন্য তুমি কি করিবা আত্মঘাত॥
শুন বলি এক কথা অই শব লএে।
রাখি চল চুপে চুপে চণ্ডীর আলয়ে॥
সারা রাত সবে মিলি রব প্রহরায়।
প্রভাত হইলে ডাকি দেখাব রাজায়॥
তার পর ফলাফল দেখিব কি হয়।
পুত্র ত গেছেই তবে শত্রু হোক ক্ষয়॥
দয়ানন্দ ধীরে ধীরে দিলা তবে সায়।
সেই মত করি সবে রহে প্রহরায়॥
তখনি করিলা গ্রামে সর্ব্বত্র প্রচার।
হারাএে গিঞাছে দয়ানন্দের কুমার।
উঠিলা সে কথা তবে নৃপতির কানে।
সরল-হৃদয় রাজা সত্য বলি মানে॥
কেহ কহে বোধ হয় কোন কপালিআ।
পালাইঞা গেছে সেই বালকে লইঞা॥
কেহ কহে এতক্ষণ হঞা গেছে বলি।
কেহ কহে কিম্বা কেহ মারিয়াছে ফেলি॥
গহনা তাহার অঙ্গে ছিলা বহু জানি।
এই হেতু অসম্ভব নহে প্রাণহানি॥
শিশুর জননী যত শয্যা-ঘরে গিঞা।
আছে কি না আছে শিশু দেখে পরীক্ষিঞা॥
চিন্তায় আকুল সবে কেহ না ঘুমান।
এই রূপে নিশি তবে হইল অবসান॥

(ক্রমশঃ)

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লখা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সুধার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে সুধা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল।]

(১০)

এই কলিকাতা! এ যে একটা সম্পূর্ণ নূতন পৃথিবী! নয়ান-জোড়ের সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ভিতর তাহারা সেই গোনা কয়টি মানুষ, আবার আরও কত দূরে তেঁতুলডাঙার গ্রামে তাহাদেরই আজন্ম-পরিচিত আর কয়েকটি মাত্র মানুষ! আর এখানে এ কি? মাগো, এ যে গুনিয়া শেষ করা যায় না। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিবার পর গঙ্গার পোল পার হইয়া এত পথ আসিতে যতগুলা মানুষের অবিশ্রাম স্রোত দেখা গেল সুধা সারা জীবন ধরিয়াও এতগুলা মানুষ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ তাহার এত কাছে ছিল, অথচ তাহার জীবনের সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোনও পরিচয় সে পায় নাই, ভাবিতেই বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে। আর শুধু কি মানুষ? যত না মানুষ, তার দুগুণ যেন বাড়ী। সারা পৃথিবীতেই এত যে বাড়ী থাকিতে পারে তাহা সুধার ধারণা ছিল না।

ষ্টেশন হইতে একটা ভাড়াটে গাড়ীর মাথায় বাক্স বিছানা ঝুড়ি ঝোড়া চাপাইয়া পাড়ি দিতে হইল—সেই প্রায় খালের ধারে। কলিকাতা শহরের এক মোড় হইতে আর এক মোড় একদিনেই পার,—সুধাদের নবজাগ্রত বিস্ময় এত বড় ক্ষেত্রে যেন দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিল। একে ত গাড়ীটা ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া অর্দ্ধেক জিনিষ চোখে পড়ে না, তাহাতে ভিতরেও বালতি কুঁজো হাঁড়ি-কুঁড়ির ভীড়ে নিরঙ্কুশ হইয়া বসা যায় না; শিবুর উত্তেজিত মন এত রকম বাধা ও বন্ধন মানিয়া চলিতে চাহিতেছিল না। সে বলিল, "মা, আমি গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে হাঁটি। দু-দিক্ ত দেখতে পাচ্ছি না। বড় তাড়াতাড়ি পথ পার হয়ে যাচ্ছে।"

মা বলিলেন, "গাড়ী থেকে একবার নামলে মানুষের তোড়ে কোথায় তলিয়ে যাবি, তোকে যে আর খুঁজেই পাব না রে! তার চেয়ে আজ গাড়ীতেই চল্, তার পর অন্য দিন হেঁটে দেখিস এখন, কলকাতা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

শিবু চঞ্চল হইয়া বলিল, "না, আজকেই দেখব। অন্য দিন ত অনেক পরে হবে।"

সে দরজা খুলিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে আর কি? শিবুর চাঞ্চল্যের ছোঁয়াচ যেন ছোট খোকার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গেল। ঘড় ঘড় করিয়া সারি সারি ট্রাম গাড়ী ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাইয়া ছুটিতেছে দেখিয়া সে শিশি-বোতল বোঝাই বালতির ভিতরেই দুই পা নামাইয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া নাচ সুরু করিয়া দিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "পাগলারা সব ক্ষেপে গেছে।"

মহামায়া বলিলেন, "ক্ষেপবে না? সভ্য জগৎটা ত তুমি ওদের এতদিন দেখতে দাও নি। আধমরা গরুর পাল

নেংটিপরা সাঁওতালের ভীড় ছাড়া আর ত কিছু ওদের দেখা অভ্যাস নেই।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "সে ত ভালই হয়েছে। জন্মাবধি এই গদ্য পৃথিবী দেখা থাকলে এর ভিতর কোনও আনন্দের খোরাক খুঁজে বার করা শক্ত হত।"

গাড়ী হইতে নামিতে না পাইয়া শিবু প্রশ্নের সাহায্যেই তাহার কৌতূহলটা মিটাইবার চেষ্টা সুরু করিল। রাস্তার এ-মোড় হইতে ও-মোড় পর্য্যন্ত বাসা বাড়ী দেখিয়া সে বলিল, "মা, এখানে সব বাড়ী এমন এক সঙ্গে জোড়া দেওয়া কেন? বাগান নেই, মাঠ নেই, একটা পুকুরও নেই। লোকে চান করে না, বাসন মাজে না?"

মা বলিলেন, "সবই করে, বাসায় চল্, দেখতে পাবি। ঘরের ভিতর পুকুর তালাবন্ধ আছে।"

রাস্তার ধারে সারি সারি দোকান ঘরে চেনা অচেনা কত যে অসংখ্য জিনিষ তাহার ঠিক নাই। খাওয়া পরা আর শোওয়া, মানুষের জীবনের এই ত সামান্য তিনটি উদ্দেশ্য, তাহার জন্য এমন অজস্র দ্রব্যসম্ভারের কি প্রয়োজন সুধা ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন করিয়া বোকা বনিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কাবুলীদের দোকানে স্তূপাকারে মেওয়া ও ফল, দিল্লীওয়ালার দোকানে জরির জুতা ও জরির টুপি, খেলনার দোকানে ঠিক মানুষের মত বড় বড় খোকা পুতুল, বাজনার দোকানে বড় বড় গ্রামোফোনের চোঙা, ফুটপাথের উপর নানারঙের কাচের বাসন ও অচেনা পরিচ্ছদ, এগুলি সত্যই মানুষের জীবন-যাত্রায় কোনও সাহায্য করে, না তামাসা করিয়া কেহ সাজাইয়া রাখিয়াছে বোঝা শক্ত। মেওয়া দেখা সুধার অভ্যাস নাই, ফলও সে যা দেখিয়াছে তাহা ত তাহারা গাছ হইতেই পাড়িয়া খায়, তাহার কোনটারই এমন চেহারা নয়; গ্রামোফোনের চোঙার কাছাকাছি কোনও জিনিষের সঙ্গেও সুধাশিবুর কখনও পরিচয়ই হয় নাই। মাংসের দোকানে ছালছাড়ানো আস্ত জীবদেহ দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া সুধার রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে ভবিষ্যৎ জীবনে সে কখনও মাংসের দোকানের সম্মুখে চোখ খুলিত না। কাচের বাসন দেখিয়া শিবু ত চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা দেখ, দেখ, কাচের আচার বাটি বানিয়েছে, থালা বানিয়েছে। ওতে কি কেউ খায় নাকি?"

মা বলিলেন, "সাহেবরা খায়! তোদের মত পাড়া-গেঁয়েরা খায় না।"

কাঁসা পিতলের বাসন, তক্তাপোষে বিছানা মাদুর ও কাপড় গামছার উপরে মানুষের যে আর কিছুর কেন প্রয়োজন হয় ভাবিয়া সুধা নিজের মনের কাছে কোনও সদুত্তর পাইতেছিল না। নিজেকে অজ্ঞ ভাবিতে তাহার আত্মসম্মান খুব যে ক্ষুণ্ণ হইল তাহা নয়, তবু নগরবাসীদের মস্তিষ্কের উপরে তাহার শ্রদ্ধা একটু কমিয়া গেল এই অনর্থক প্রয়োজন সৃষ্টির বিপুল বাহিনী দেখিয়া।

রাস্তাজোড়া নিরেট বাড়ীর মাঝে মাঝে ফাটলের মত সরু সরু গলি। সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "এর ভিতর দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় বাবা? ওদিক্‌টা ত দেখা যায় না।"

শিবু বলিল, "জান না? একে বলে সুড়ঙ্গ। আমার বইয়ে ত আছে।"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "না, একে সুড়ঙ্গ বলে না, একে বলে গলি।"

ক্রমে বাড়ীর উচ্চতা ও ঠাসাঠাসি একটু কমিয়া আসিল। মাঝে মাঝে দুই-চারিটা পোড়ো জমি ও জীর্ণ খোলার বস্তি দেখা যায়। আকাশ গাছপালা সবই এখন কিছু কিছু চোখে পড়ে। এ আর একেবারে চট মোড়া বড়বাজারের রূপ নয়।

এইখানেই একটা গলির মুখে গাড়ীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। সুধা ও শিবু উদ্‌গ্রীব হইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। প্রকাণ্ড একটা লাল রঙের বাড়ী, একদিকে বড় রাস্তা, একদিকে গলি। বাগান উঠান নাই বটে, কিন্তু রাস্তার উপরেই প্রতি তলায় বড় বড় বারান্দা, সেখানে বসিলে সব পথটা দেখা যায়। সামনেই তিন ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, ফুটপাথের থেকে উঠিয়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় শেষ হইয়াছে। এমন পালিশ-করা পাথর শিবু কখনও দেখে নাই, শুধু এই কারণেই বাড়ীটা তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়া গেল। গাড়ী হইতে প্রায় লাফাইয়া পড়িয়া সে বারান্দাটায় চড়িয়া দাঁড়াইল। দরজাটায় সজোরে ধাক্কা দিল, বেশ নক্সাকাটা দরজা কিন্তু কেহ খুলিয়া দিল না। মহামায়া ডাকিয়া

বলিলেন, "ওরে বোকা, পরের দরজা ঠেঙিয়ে ভাঙিস্ না।"

শিবু মা'র কথায় নিরাশ হইয়া প্রশ্নের সুরে বলিল, "কেন, এটা ত আমাদের বাড়ী?"

মহামায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যে লাখ টাকা দিয়ে কিনেছ।"

গলির দিক্ দিয়া পৈতা গলায় একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান ন্যাড়ামাথা বাহির করিয়া আসিয়া বলিল, "এই দিকে বাবু, এই দিকে। ভাড়া-ঘর এধারে।"

গলির দরজা খুলিয়া গেল; একেবারে চৌকাট হইতেই সোজা দোতলায় উঠিবার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, দরজায় দুমিনিট অপেক্ষা করিবার জন্যও এক হাত স্থান নাই। এ-সিঁড়ির বাঁক আরম্ভ হইবার মুখেই একদিকে রান্নাঘর ও অপর দিকে পায়খানা, তাহারই পাশে খাবার ঘর। একটুও স্থানের অপব্যয় নাই, মানুষের শুচিবায়ু-গ্রস্ত হইবার কোনও অবকাশ নাই। সামনের কালোপাড়-দেওয়া শ্বেতপাথরের বারান্দা দেখিয়া শিবু যেমন খুশী হইয়াছিল, এই অন্ধকার খাঁচা দেখিয়া তাহার মন তেমনই মুষড়িয়া গেল। মাথার উপরের ছাদ পর্য্যন্ত এত নীচু যে লম্বা মানুষ হাত তুলিয়া দাঁড়াইলে ছাদে হাত ঠেকিয়া যায়। সুধা বিস্মিত চোখে ছাদের দিকে তাকাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চাহিল। চন্দ্রকান্ত ছোট খোকাকে মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ছাদে ঠেকাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা ভগ্নাংশের সিঁড়ির অঙ্ক শিখেছ ত? নীচে একতলা, তারপর সিঁড়ি ভেঙে দেড়তলা, তার পর সিঁড়ি ভেঙে দোতলা, বুঝলে।"

দেড়তলা হইতে সিঁড়িটা গোল থামের মত সোজা দোতলা ছাড়াইয়া একেবারে তিনতলায় গিয়া একটুখানি চাতালের উপর শেষ হইয়াছে। সিঁড়ির গায়ে দুই পাশেই মাঝে মাঝে দরজা, কিন্তু সেগুলির গায়ে সযত্নে পেরেক মারা। বুঝা যায় এই সিঁড়ি দিয়া এই সব পথে ঢোকা নিষিদ্ধ। তিনতলায় দুইখানি মাত্র ঘর আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ভিক্ষান্নের মত একটুখানি খোলা ছাদ। ছাদে দাঁড়াইলে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল দিকেই ঘর দেখা যায়, কিন্তু সে ঘরগুলির অধিবাসী স্বতন্ত্র। ঘরে ঘরে জানালার কাছে ছোট বড় নানা মাপের মানুষের কুতূহলী দৃষ্টি দেখিয়া শিবু মহামায়ার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল, "এটা কাদের বাড়ী মা? এত মানুষ চারধারে। এদের সঙ্গে আমরা থাকব কি ক'রে?"

মহামায়া বলিলেন, "ও সব আলাদা আলাদা বাসা রে, কলকাতায় এইরকমই হয়।"

সুধা ও শিবু ছাদের আলিশার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া বুড়া আঙুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের এই উপর নীচের চারখানা ঘরে যদিও দৃষ্টি আশে পাশের সকলেরই পড়ে, তবু সশরীরে উপস্থিত হইবার নিষ্কণ্টক পথ কাহারও নাই। বোঝা গেল, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন এলাকা। এ বাড়ীর কর্ত্তা শ্বেত পাথরে মোড়া অংশ নিজে রাখিয়া খিড়কির সিঁড়ি দিয়া কিছু অংশ ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আশে পাশের অনেক বাড়ীতেই সেই রকম বন্দোবস্ত। সুতরাং ভাড়াটে অংশগুলি সব পরস্পরের খুব গায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তার উপর খিড়কির দিক্ বলিয়া বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটে সকলেরই শৌচাগারের ভীড় এই দিকে বেশী।

বাহিরের নূতন জগৎটা যতক্ষণ দেখিতেছিল ততক্ষণ তাহার অভিনবত্বে বিস্ময়ের খোরাক বেশী ছিল বলিয়াই তাহাতে শিবুর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু গৃহের আবেষ্টনে বিস্ময় বেদনারই কারণ হইয়া উঠিল। বাহিরে যেমন অপরিচয়েই আনন্দ, ঘরের ভিতরে তেমনই পরিচিতের স্পর্শেই শান্তি ও বিশ্রাম। যে-গৃহকে সুধারা আজন্ম বাড়ী বলিয়া জানে তাহাকে এই বিস্ময়লোকের ভিতর কোথায়ও এক বিন্দু খুঁজিয়া না পাইয়া দুইজনেরই মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। দিনের পর দিন ইহারই ভিতর তাহারা কাটাইবে কি করিয়া?

কিন্তু শিবু সহজে দমিবার পাত্র নয় বলিয়া ছোট্ট চাতালের উপর স্তূপীকৃত বিছানার গাদায় বসিয়া পড়িয়াই গান ধরিয়া দিল,

"দস্তি কলহেতার শহর, অষ্ট পহর
চলতি আছে টেরাম গাড়ী।
নামিয়ে গাড়ীর থনে ইষ্টিশানে, মনে মনে আমেজ করি,
আইলাম কি গণি মিঞার রংমহালে
ডাহার জিলায় বর্শাল ছাড়ি।"

মহামায়া শ্রান্ত দেহখানি একটা তক্তাপোষের উপর ঢালিয়া দিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি থাকলে এরই ভিতর একটা শৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারতেন। আমি ত একেবারে কাজের বার। সুধা, দেখ্ দেখি মা, বাচ্চাটাকে অন্ততঃ একটু কাগজ টাগজ জ্বেলে দুধটুকু গিলিয়ে দিতে পারিস্ কিনা। এর পর আবার দুধ পাব কিনা তাই বা কে জানে?"

একটা মেলিন্‌স্ ফুডের বোতলে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ ক্রমাগত গাড়ীর নাড়া পাইয়া পাইয়া প্রায় ঘোল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মাখন-ভাসা দুধটা বাল্‌তির ভিতর হইতে বাহির করিয়া সুধা বলিল, "এটা কি ভাল আছে মা? খোকনের যদি অসুখ করে এটা খেয়ে!"

মহামায়া খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তবে দেখ্ যদি টিনের বাক্সে ফুড্ টুড্ কিছু থাকে। আমার ত বাছা পা দুটো এমন অবশ হয়ে গেছে যে টেনেও তুলতে পারছি না।"

টিনের বাক্স খুঁজিতে হইল না। সুধাদের কথাবার্ত্তা পিছন হইতে শুনিতে শুনিতে যে প্রসন্নমূর্ত্তি ভদ্রলোক উঠিতে-ছিলেন তিনি বলিলেন, "থাক্ থাক্ খুকী, আমি টাট্‌কা দুধ এনেছি। ছাতাটা খুঁজতে খুঁজতে এত দেরী হয়ে গেল যে ষ্টেশনে আর হাজিরা দিতে পারি নি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "ছাতি-হারানোর পর্ব্ব আর আপনার এ-জীবনে মিটল না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "নূতন বাড়ীতে উনুন টুনুন কিছু আছে কি খুকী? দুধটা ত জ্বাল দেওয়া হয় নি!"

শিবু মাঝখান হইতে ফোড়ন দিল, "দিদির নাম ত খুকী নয়, ও সুধা।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বাঃ, দিব্যি ত মিষ্টি নামটি তোমার, আমার সঙ্গে মিলও আছে, আমার একটুখানি বাঁকিয়ে সুধীন্দ্র। আর কাজেও আমি তোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, ফুড্ তৈরি করতে পারি না মনে করছ? আমি ভাতও রাঁধতে পারি। একদিন তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।"

সুধা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু নীরবে এমন করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে সেও রাজি হইল না, বলিল, "ওঃ, ভারি ত, ভাত ডাল মাছের ঝোল, কুলের অম্বল, সবই আমি রাঁধতে পারি। আপনি মাকে জিগ্‌গেষ করুন।"

মহামায়া বলিলেন, "তা ও সত্যিই বলেছে। আমি ত অকর্ম্মার একশেষ, মেয়ে কিন্তু আমার খুব কাজের। ছেলেটাকে ত ওই মানুষ করলে।"

শিবু বিচক্ষণ বিচারকের মত মুখ করিয়া বলিল, "মেয়ে মানুষরা ত সবাই রান্না করে, কিন্তু বাবুরা ত আর করে না। বাবা ত কিচ্ছু রাঁধতে পারেন না, খালি খান।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "সত্যি, এমন অনধিকারচর্চ্চা আমার করা উচিত নয়, তবে শিবুও বিবর্ত্তনের কল্যাণে এ বিষয়ে পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে হয়েছে তা বলতে পারি না। সুতরাং জয়টীকাটা সুধীনবাবুরই প্রাপ্য।"

সুধা বলিল, "দুধের বাসনটা দিন, আমি কাগজ জ্বেলে গরম ক'রে ফেলি একপোয়া, নইলে খোকা ভীষণ চেঁচাবে।"

সুধীনবাবু বলিলেন, "আগুন জ্বালতে গিয়ে কাপড়ে যেন ধরিয়ে বোসো না, সাবধান!"

সুধা হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন, আমি কি কচি খুকী!"

শিবু বলিল, "দিদি বারো পূরে তেরোয় পা দিয়েছে, আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, খোকনের চেয়ে সাড়ে-ন' বছরের।"

সুধীন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুমি ত দেখছি খুব ভাল আঁক কষতে পার, না খোকা?"

শিবু বলিল, "খুব ভাল পারি না, দিদিই বেশী ভাল পারে, তবে আমি মিশ্র যোগ বিয়োগ শিখেছি, আর ইস্কুলে ভর্ত্তি হলে আরও অনেক শিখে ফেলব। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ আমি দিদির চেয়ে ভাল করতে পারি।

'রে রে বক নিশাচর আয় রে সত্বর।
এত বলি ডাকে ভীম বীর বৃকোদর।'

আপনি মুখস্থ বলতে পারেন?"

সুধীন্দ্রবাবু ভীত মুখ করিয়া বলিলেন, "নাঃ, ও সব বিদ্যে আমার নেই। তবে খাওয়ার পরীক্ষা যদি নাও ত বৃকোদরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমিও পারি।"

সুধা একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তাহলে শিবুর সঙ্গেই আপনার নামের মিল বেশী, ও এত বেশী গেলে যে পিসিমা ওকে ভীমসেন বলেন।"

শিবু বলিল, "সে বাপু, আমি খাবই। আমি বিধবা হলে মোটেই পিসিমার মত একাদশী করব না।"

সুধীন্দ্রবাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "এইবার শিবু-বাবু ঠ'কে গেছ, পুরুষ মানুষে কি বিধবা হয় ?"

পরাজয়ের লজ্জায় শিবুর সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মহামায়া বলিলেন, "ও ডেঁপো ছেলেটাকে আপনি আর আস্কারা দেবেন না। আমার ঘর-সংসারের ব্যবস্থা কি করলেন তাই আগে বলুন। আপনার উপরই ত আমার সব ভরসা। আমি ত কুটো ভাঙতেও পারি না, লোক না হলে খেটে খেটে মেয়েটার জিভ বেরিয়ে পড়বে।"

সুধীন্দ্রবাবু একটু লজ্জিত স্বরে বলিলেন, "লোক ঠিকই তৈরি আছে, আমি খবর দিতে একটু দেরী ক'রে ফেলে-ছিলাম তাই এখন এসে উঠতে পারল না। ভোর বেলা ঠিক আসবে। আর সন্ধ্যে বেলা আমার বাড়ী থেকে আপনাদের জন্যে যৎসামান্য কিছু খাবার আসবে। ইতিমধ্যে সুধার সাহায্য পেলে বাকি কাজগুলো আমি ক'রে দিতে পারি।"

সুধাও যে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না তাহা বুঝাইবার জন্য ডুরে কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া বিছানার গাদার উপর দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দড়ির গিঁট খুলিতে লাগিল। বিছানার পুলিন্দার ভিতর হইতে বিছানা-পদবাচ্য নয় এমন বহুৎ জিনিষ বাহির হইয়া পড়িল। ছাতা লাঠি, ঝাঁটা, তোয়ালে, ধুতি, শাড়ী, যাহা কিছুই সঙ্কীর্ণ আয়তনের আধারে ঠাঁই পায় নাই, সবই নির্ব্বিচারে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীর মত এখানে একাসনে বসিয়া পড়িয়াছে। সেইগুলিকে বাছাই করিয়া সুধা বিছানাগুলাকে ঝাড়িয়া তক্তাপোষের উপরে তুলিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "রন্ধনবিদ্যায় আমার অপটুতা সর্ব্বজনবিদিত হলেও জল তোলায় আমার খ্যাতি আছে। তোমাদের শৃঙ্খলিতা গঙ্গাদেবীর কারাগৃহটি কোথায় ব'লে দাও, জল আমি সবটাই তুলে আনি।"

শিবু বলিল, "আমি ওকাজ করতে পারি," বলিয়াই বাল্‌তির গর্ভ হইতে বাসনকোশন সব মেঝেয় নামাইয়া সে জলপাত্র যোগাড় করিতে লাগিল।

একটা শূন্যগর্ভ বালতিকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে গিয়া ছোট খোকা সেটাকে নিজের মাথার উপরই উপুড় করিয়া দিল। মহামায়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ছেলেটাকে একটা খাটের খুরোর সঙ্গে বেঁধে রেখে বাপু, তোমরা কাজকর্ম্ম কর, নইলে গড়িয়ে ও ত সদর রাস্তায় গিয়ে পড়বে।"

বালতির ভিতরের অন্ধ কারাগার হইতে খোকন কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমা তুপি খুলে দাও।"

সুধীন্দ্রবাবুর সাহায্যে সেদিনকার মত আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা হইয়া গেল। তিনি বিদায় লইবার সময় সংসারচক্রের আবর্ত্তেনে যতখানি সহায়তা তাঁহার পক্ষে করা সম্ভব সবই করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধু-পরিবারকে আশ্বস্ত করিয়া গেলেন।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাইয়া পিসিমার কঠিন কোমল মুখখানির কথাই বার বার সুধার মনে পড়িতেছিল। মৃগাঙ্ক দাদাকে একলা ভাত বাড়িয়া দিয়া পিসিমা হয়ত আজ জলও না খাইয়া মেঝের উপরই শুইয়া পড়িয়াছেন। হয়ত শূন্যপ্রায় বাড়ীতে বিনিদ্র চক্ষে সুধারই মত রাত্রির প্রহর গুনিতেছেন।

ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। অপরিচিত আবেষ্টন অন্ধকার আকাশের অতি ক্ষীণ তারার আলোকে আরও অপরিচিত অনন্ত রহস্যময় মনে হইতেছে। সুধা কি পিসিমার ঘরের মাচার উপর আজ বিছানা করিয়া ঘুমাইয়াছিল, তাহার পর একলা পাইয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্য, চীন রাজকুমারী বেদুরার মত ঘুমন্ত সুধাকে শয্যা সমেত আকাশপথে উড়াইয়া আনিয়াছে ? অর্দ্ধ ঘুমে অর্দ্ধ জাগরণে সমস্ত পৃথিবীর বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল রূপ দেখিতে দেখিতে সুধা এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে ? পূর্ব্ব দিকের আকাশের গায়ে আকাশস্পর্শী একটি স্তম্ভের মুখ হইতে ঘন কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়া প্রকাণ্ড অস্পষ্ট সরীসৃপের মত বাঁকিয়া বাঁকিয়া উর্দ্ধপথে কোথায় গিয়া মিলাইয়া যাইতেছে ! এখনই হয়ত আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতই স্পষ্ট রূপ ধরিয়া সুধাকে আবার পিসিমার কোলের কাছে লইয়া গিয়া নামাইয়া দিবে, অথবা এ তাহার বিদায়-

ছবি, হয়ত তাহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুধাকে রাত্রি-শেষে উঠিয়া নূতন জগতে নূতন পথ, নূতন বন্ধনের সন্ধানে ঘুরিতে হইবে।

(১১)

সারি সারি তেল-কলের ধূমোদ্গারী চিম্‌নীর পাশে ধূম্র-পঙ্কিল আকাশের নীচের এই খাঁচার মত বাড়ীটিতে নূতন করিয়া সংসার সুরু হইল। চিম্‌নীর গায়ে মাঝে মাঝে দুই-চারিটি তাল ও নারিকেল গাছ দেখা যায়, আর কুলি ব্যারাকের একটা পাকা বাড়ীর সাম্‌নে একটা পুকুরে অষ্ট প্রহর মজুরদের ছেলেরা স্নান করে ও ঝাঁপাই জোড়ে। এই দুইটি জিনিষেই পুরাতন পৃথিবীর একটুখানি আমেজ লাগিয়া আছে, নহিলে ইহাকে পাতালপুরী কি নাগলোক বলিলেও সুধার অবিশ্বাস হইত না। বাসুকীর মাথার ঠিক উপরেই বোধ হয় এই কলিকাতা শহর, তাই সারাদিনরাত্রিই ঘর বাড়ী এমন থর থর করিয়া কাঁপে! পথে অহরহ যে ভারী ভারী গাড়ীগুলা চলে তাহারাই যে মাতা ধরিত্রীর বুকে এমন শিহরণ তুলে তাহা বুঝিতে সুধার কিছু দিন সময় লাগিয়াছিল।

জনবিরল নয়ানজোড়ে যেটুকুও বা মানুষের সঙ্গ পাওয়া যাইত, এখানে তাহার সিকিও পাওয়া যায় না। উর্ম্মিমুখর বেলাভূমিতে বসিয়া নিঃসঙ্গ মানুষ সারাদিন সমুদ্রের বিচিত্র রাগিণী শুনিলেও যেমন তাহার ভাষা বুঝে না, এ অনেকটা সেই রকম। ভোর হইতে কত বিচিত্র শব্দতরঙ্গই যে কানের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় তাহার ঠিক নাই, কিন্তু এ বিশাল নগরীর অষ্টপ্রহরের ভাষা বুঝিতে সময় লাগে। গলির ভিতরে বাড়ী, রাজপথের জীবনলীলা চোখে পড়ে না, কিন্তু ধ্বনি জানাইয়া দেয় একের পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের পটক্ষেপ হইতেছে। ভোরবেলা ঘুম চোখ হইতে ছাড়িবার আগেই তৈলহীন রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি ও এক বোঝা বাসন আছড়ানোর মত ধাতব আর্ত্তনাদে সুখস্বপ্নের শেষ রেশটুকু মিলাইয়া যায়; তার পর নিকটে শোনা যায় পিচকারীর জলের ঝর্ঝর শব্দ আর দূর হইতে কানে আসে সুদীর্ঘ অনুনাসিক সুরে কত বাঁশির আকাশ-কাঁপানো ডাক। মহামায়া বাঁশির শব্দেই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিতেন "ঐগো, তোমাদের শ্যামের বাঁশি বাজল।"

সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া রাজপথের অগণ্য বিচিত্র যানবাহন তাহাদের বিচিত্র ভাষায় সশঙ্কিত পথিককুলকে সতর্ক করিতে করিতে চলিয়াছে। কেহ ভারী গুরুগম্ভীর গলায় থাকিয়া থাকিয়া বলে "ঢং ঢং", কেহ একটানা ছন্দে গাহিয়া চলিয়াছে "ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্", কেহ ক্ষীণ মৃদুতালে একটি ঘুঙুর বাজাইয়া চলিয়াছে "টুংটাং, টুংটাং," কেহ বড় মানুষের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের মত একবার তীব্র গর্জ্জন করিয়া ঝড়ের বেগে চলিয়া যাইতেছে, কেহ চপল বালকের মত অর্দ্ধেক ডাক অসমাপ্ত রাখিয়াই দৌড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের চলার হ্রস্ব ও দীর্ঘ তাল, তাহাদের বাণীর তীব্র ও মধুর স্বর মনে নানা ছবি জাগাইয়া তুলে কিন্তু সে তুরঙ্গগামিনী বাষ্পবাহিনীদের ত চোখে দেখা যায় না।

গলিতে রমণীর সুতীব্র কণ্ঠ ডাকিয়া বলে, "মা-আ-টি লিবি গো-ও," কিন্তু পৃথিবীতে মাটির মত সুলভ জিনিষকে এমন করিয়া হাঁকিয়া বেড়াইবার কি প্রয়োজন আছে শহরে নবাগতা সুধা বুঝে না। পুরুষের কণ্ঠ বলে, "কাপ্‌ড়াওয়ালা—আ," "বডি-জামা-সেমিজ" "জয়নগরের মোয়া।" অন্ন-বস্ত্রের কথা না বুঝিয়া উপায় নাই, বুঝিতেই হয়। হঠাৎ শুনা যায় শিশুকণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতেছে, "নথিং, নট্ কিচ্ছু;" তাহারা যে পৃথিবীর অনিত্যতার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছে না এ কথা বুঝা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু তবু প্রকৃত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলা আশেপাশের নানা বাড়ী হইতেই গানের সুর ভাসিয়া আসে। মেসের ছেলেরা গায়, "যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে দয়া করে কুটীরে আমারি।" বাড়ীওয়ালার বাড়ী হইতে কলের সুর আসে,

"আহা, জাগি পোহাইল বিভাবরী,
অতি ক্লান্ত নয়ন তব, সুন্দরী।"

গলির ওপারের বাড়ীর মেয়েরা ওস্তাদজীর সহিত গলা মিলাইয়া গায়, "আজু শ্যাম মোহলীন বাঁশরি বাজাওয়ে কে?" সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজের ছড় ঝঙ্কার দিয়া উঠে। গান শুনিয়া শিবুর দিল খুলিয়া যায়, সেও গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে চড়িয়া দুই হাতে ট্যাঙ্ক পিটাইয়া মেসের ছেলেদের ভঙ্গীতে গাহিতে সুরু করিয়া দেয়,

"যদি পরাণে না জাগে সেই আকুল পিয়াসা,
পায়ে ধরি, ভাল বেসো না।"

মহামায়া রাগ করিয়া বলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আর গান খুঁজে পাস্ না? তোর বাবা যে রোজ সকালে গান করেন তার একটা শিখতে পারলি না, সবার আগে ওই মেসের ছেলেদের গানগুলো মাথায় ঢুকল!"

শিবু বলে, "ওদের গান ভেঙাতে আছে, বাবার গান ভেঙাতে নেই।"

সুধার কানে মহানগরীর বাণী দিনরাত্রি আসিতেছে, কিন্তু সে বাণীর সহিত তাহার বাণীর আদান-প্রদান নাই।

মহামায়া হাঁটিতে চলিতে কষ্ট পান, তাই পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করা হয় নাই, পাড়ার মেয়েরাও কেবল সুধার মত ছেলেমানুষকে দেখিয়া বেশী আসিবার আগ্রহ দেখায় না। সুধা গৃহিণীদের সঙ্গে কথা বলিতে ত লজ্জাই পায়; কিশোরীদেরও পাউডার-শোভিত মুখ, চওড়া রঙীন ফিতার ফাঁস বাঁধা বিনুনি এবং ফাঁপানো এলো খোঁপার পারিপাট্য দেখিয়া কাছে যাইতে ভরসা হয় না। মহামায়া বলেন বটে, "হ্যারে, ইস্কুলে টিস্কুলে ভর্ত্তি হবি, এইসব মেয়েদের একটু জিগেস করিস্, কোথায় কেমন পড়ায়-টড়ায়?"

সুধা বলে, "সে সব আমি পারব না, তোমরা যেখানে হয় ভর্ত্তি ক'রে দিও।"

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মেয়েকে ফিরিঙ্গি ইস্কুলে দেবে নাকি গো, খুব কায়দাদুরস্ত ইংরিজী বলতে পারবে! বাড়ীওয়ালার মেয়েরা ত যায়ই, সেই সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

মহামায়া বলিয়াছিলেন, "না বাপু, আমার গরীবের অত ঘোড়া-রোগে কাজ নেই। গোছা গোছা টাকা মাইনে, পোষাক, গাড়ী ব'লে গুনবে কোথা থেকে? তুমি একটু ইস্কুলের পর পড়িও টড়িও, তাহলেই যা সাদা-মাটা শিখবে তাইতেই আমাদের গেরস্তর ঘর চ'লে যাবে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "কিন্তু যে গেরস্তর বাড়ী যাবে তার যদি মন না ওঠে?"

মহামায়া বলিলেন, "না ওঠে নিজের ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে, তাই ব'লে ঋণ-কর্জ্জ ক'রে আমি এখন থেকে পরের মন যোগাতে পারব না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "তবে ত তুমি ভারি বাঙালীর মেয়ে! মেয়ে জন্মাবার দিন থেকে বেয়াই জামাইয়ের মন বুঝে যদি না চললে তবে কলিযুগে জন্মালে কি করতে?"

মহামায়া বলিলেন, "অত গোলামী আমার দ্বারা হবে না বাপু; আমার মেয়ে আমার থাকবে, কারুর গরজ পড়ে ত সে আপনার গরজেই নিতে আসবে।"

চন্দ্রকান্তের আয় কম, মহামায়ার নজরও সেকেলে, কাজেই মেয়েকে সাধারণ দেশী ইস্কুলেই দেওয়া ঠিক হইল। তবে এই কয়টা মাস বাড়ীতে ইস্কুলের মত গড়িয়া পিটিয়া লইয়া একেবারে ইংরেজী বৎসরের গোড়াতেই ছেলেমেয়ে দুইজনকে স্কুলে দেওয়া হইবে। সাত-আট মাসে মহামায়ার চিকিৎসাও একটু অগ্রসর হইতে পারিবে। কচি ছেলেটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া সুধা যদি সারাদিনের মত বিদ্যাচর্চ্চা করিতে চলিয়া যায় তাহা হইলে চিকিৎসকের কথামত ত মহামায়া একচুলও চলিতে পারিবেন না। এই ত চার হাত মাচার মত বাড়ী আর এই গড়ানে সিঁড়ি, ছেলে একবার গড়াইতে সুরু করিলে মনুষ্যাকৃতি আর থাকিবে না। তা ছাড়া এক পা ত এখানে সোজা বাড়াইবার জো নাই, নাওয়া, খাওয়া, জল তোলা, ফাইফরমাস সব কাজেতেই কেবল সিঁড়ি আর সিঁড়ি। এই ক'টা মাসে যদি ভগবান একটু মুখ তুলিয়া চাহেন তখন না-হয় নিজেই কোনও রকমে সিঁড়ি ভাঙা যাইবে। এখন অন্ধের হাতের নড়ি কাড়িয়া লওয়ার মত সুধাকে সরাইলে মহামায়া ত একেবারে অচল।

এখানে আসিয়া সুধা শিবুর সে শৈশব-স্বপ্ন ঘুচিয়া গিয়াছে। পুরুষ জাতি বলিয়া যে ভিন্ন জাতি আছে, তাহাদের খেলাধূলাও যে স্ত্রীজাতির খেলাধূলা হইতে ভিন্ন, শিবু কলিকাতায় আসিয়া অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। দিদির সঙ্গে কাল্পনিক মহাসমুদ্র হইতে কাল্পনিক মুক্তা প্রবাল সংগ্রহে আর তাহার উৎসাহ নাই; গলির ভিতরেই পাড়ার ছেলেদের অতি বাস্তব একটা সাইকেল হইতে বার দশেক আছাড় খাইয়া হাঁটু ও কনুই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া একান্ত নিজস্ব একটা সাইকেল সংগ্রহ করিবার জন্য সে দিবারাত্রি মার পিছনে লাগিয়াই আছে। অবসর সময়ে হাইজম্প লং-জম্প প্রভৃতি তাহার যাবতীয় নবার্জ্জিত বিদ্যায় সে যে পাড়ার কাহারও অপেক্ষা ছোট নয় তাহাই

মহামায়াকে বুঝাইতে গিয়া দিদির সঙ্গে খেলাধূলার তাহার আর সময়ই হয় না।

মহামায়া বলেন, "বাপু, ছেলেটাকে তুমি ভাঙা বছরেই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দাও, হাই-জম্প ক'রে ক'রে ত আমার বাক্স পেটরা সব গুঁড়িয়ে গেল, তার উপর আবার সুধীন-বাবু একটা তালের মত ফুটবল কিনে দিয়ে একেবারে সোনায় সোহাগা হয়েছে। পরের দরজা জানালা কাচ ভেঙে যে নির্ম্মূল কচ্ছে, তার দাম দেব কোথা থেকে?"

চন্দ্রকান্ত বলেন, "নিতে ত পারি আমাদেরই ইস্কুলে; কিন্তু পাছে হেড্‌মাষ্টারের ছেলের নমুনা দে'খে ইস্কুল সুদ্ধ বিগ্‌ড়ে যায় তাই সাহস হয় না।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে তুমি একটা ছাতুখোর পালোয়ান রেখে দাও, সকালে উঠেই সাত শ' বার কান ধরিয়ে 'উঠ্‌ বোস' করাবে, তাহলে আর ছেলের এত ধিঙ্গীপনা করবার জোর থাকবে না।"

শিবু বলিল, "ডনবৈঠক ত? তা করলে ত আমার আরও জোর বাড়বে। আজই রাখ না পালোয়ান।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে তোকে একটা ঘানি গাছে যুতে দেব, আমার পয়সাও রোজগার হবে, জিনিষও নষ্ট হবে না।"

শিবু বলিল, "আচ্ছা, তাই দিও, কিন্তু এখানে ঘানিগাছ বসাবার ত জায়গা নেই, তাহলে আবার নয়ানজোড়ে ফিরে যেতে হবে।"

বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-পরা নূতন নূতন ডাক্তার আসিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে তাহাদের দুই-তিনটা করিয়া চামড়ার ও ষ্টিলের বড় বড় বাক্স। একঘণ্টা ধরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহারা মহামায়াকে পরীক্ষা করে, যাইবার সময় প্রতিদিন সাবান গরম জল দিয়া হাত ধুইয়া পকেটে এক মুঠা টাকা পূরিয়া অনেকগুলা দুর্ব্বোধ্য কথা বলিয়া ও এক টুকরা সাদা কাগজে ওষুধ লিখিয়া হাস্যমুখে ব্যস্ত দ্রুত গতিতে গাড়ীতে গিয়া উঠে, কিন্তু মহামায়ার মুখ ক্রমশঃই শীর্ণ বিষণ্ণ হইয়া আসে। একজন চিকিৎসকের কথামত দুই-এক সপ্তাহ বিছানায় শুইয়া থাকিয়া তিন-চার বোতল ঔষধ শেষ করিয়াও যখন মহামায়ার কোনও বাহ্য উন্নতি দেখা যায় না, তখন চন্দ্রকান্ত ক্লিষ্ট মুখে আরও একজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া আসেন। এবারও সেই বড় বড় বাক্স, সেই হাত ধোয়া, টাকা গোনা, ঔষধ লেখা, বন্দিনী মহামায়াকে আরও বন্দীকরণ, কিন্তু কিছুই হয় না, অবশ অঙ্গ স্ববশে আসে না।

মাথায় কড়া ইস্ত্রী করা সাদা রুমাল বাঁধিয়া সুশুভ্র বিলাতী পোষাক-পরা নর্স দিন কতক আনাগোনা করিয়া সাদা এনামেল-করা গামলা, ডুস, রবারব্যাগ, স্পঞ্জ, তোয়ালেতে ঘর ভরাইয়া দিল, ক্ষুদ্র রান্নাঘরে মাস খানেক খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে গরম জলের আয়োজনই বেশী হইল, তবু মহামায়ার দুর্ব্বল অঙ্গে রক্তের জোয়ার ফিরিয়া আসিল না। কালো মোটা হিন্দুস্থানী দাই চোখে দড়ি বাঁধা চশমা ও গায়ে পেট বাহির-করা জামা পরিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যহ মহামায়াকে তৈল স্নান করাইল, ঘরের মেঝে মাদুর ও বালিশ তৈল-পঙ্কিল হইয়া উঠিল কিন্তু সেও মহামায়ার পদক্ষেপ অবাধ করিতে পারিল না। একখানি ঘরের এক-খানি মাত্র তক্তার উপর তাঁহার ওঠা-বসা, ঐ টুকুতেই তাঁহার অধিকার ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল।

ছোট খোকা আসিয়া হাত ধরিয়া টানে, "মা, পা পা, চল।" মা খোকাকে টানিয়া বিছানায় তুলিয়া লন। খোকার চঞ্চল দেহের সতেজ রক্তস্রোত তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না, সে কোল ছাড়িয়া হুড় মুড় করিয়া মাটিতে নামিয়া পড়ে। মহামায়া বিছানা হইতেই তাহার জামার পিছনটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করেন, "সুধা, সুধা, ধর্‌ দস্যুটাকে, আমায় সুদ্ধ নইলে টেনে ফে'লে দেবে।"

সুধা ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে লইয়া যায়। মা'র ঘরে ডাক্তার নর্সের ভীড়, এদিকে ইস্কুলের বেলা বহিয়া যায়, ঠিকা ঝি উঁচু ঝুঁটি বাঁধিয়া লাল গামছা হাতে করিয়া বলে, "দিদিমণি, বাজারের পয়সা দাও না গা, বাবুর আপিসের বেলা হয়ে গেল, উনুনে এতগুলো কয়লা পুড়ে খাক হয়ে যাবে, বামুন-দি বকে ভূত ঝাড়া ক'রে দেবে।"

পয়সা ত সুধার কাছে থাকে না, নয়ানজোড়ের মত ধানের কারবারও নাই যে যাহাকে তাহাকে এক পাই ধান ঢালিয়া দিয়া মাছটা দুধটা যোগাড় হইবে। সে গিয়া দরজার কাছে দাঁড়ায়। মহামায়া বুঝিতে পারেন কিসের প্রয়োজন,

শয্যা হইতেই চঞ্চল হইয়া বলেন, "বাক্সটা ওরই হাতে বার করে দাও না গা, যা পারে ওই দেবে থোবে।"

নীলের উপর সোনালী লাইন-কাটা হাত-বাক্সটা বাহির করিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলেন, "মা মণি, এবার তুমি মা, আমরা ছেলে, খাওয়া পরার ব্যবস্থা যা হয় করো।"

সুধা ঝিকে ভয়ে ভয়ে বলে, "কত দিতে হবে?" কিসের যে কত দাম সে ত কিছু জানে না।

ঝি হাত নাড়িয়া বলে, "টাকা একটা ফে'লে দাও না, যা ফিরবে তা ত আর আমি খেয়ে ফেলব না? হিসেব বুঝে নিও এখন। একটা পয়সাও যদি গরমিল হয়, তখন আমার গলায় গামছা দিয়ে আদায় ক'রো।" ঠিকা রাঁধুনী এক গাল পান-দোক্তার রসে মুখ ভর্ত্তি করিয়া অল্প হাঁ করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় বলে, "দিদিমণি, যাহোক একটা কিছু কুটে কেটে দাও না গা, সুক্তুনি কি ঝাল ঝোল কিছু ততক্ষণ চড়াই।"

সুধা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসে। ঝুড়ি ত শূন্য। আলু আর পেঁয়াজ ছাড়া কিছু নাই। সুধা কুটিয়া দিয়া বলে, "এইটে তত ক্ষণ পোস্ত দিয়ে রাঁধ।"

রাঁধুনী ঝঙ্কার দিয়া উঠে, "হ্যাঁ, ন'টায় ভাত দেব, আবার ব'সে ব'সে পোস্ত বাঁটব, এত আমার গতরে কুলোবে না। ও সব ছুটির দিনে হবে'খন। আজ অমনি ভাজাভুজি ক'রে দি, বাবুকে আপিসে বেরোতে হবে ত!"

সুধা ভীতভাবে বলে, "আচ্ছা, আমি পোস্তটুকু বেঁটে দিচ্ছি, তুমি শুধু ভাজা দিয়ে বাবাকে ভাত দিও না। একটুখানি কেবল খোকাকে ধর।" রাঁধুনী মুখটা ভার করিয়া বলিল, "এমন অনাছিষ্টি দেখি নি মা, আমি বামুনের মেয়ে, ছেলের ধাই হওয়া কি আমার কাজ? দাও, পোস্তটা আজ আমিই বেঁটে নি, কাল থেকে ঝি মাগীকে বাজারে যাবার আগে বাটাঘসা সব ক'রে যেতে বলবে। উনি নবাবের নাতনী ফর্‌ফর্‌ ক'রে বাজার করতে চললেন, আর আমি মরি এখানে হাত পা ছেঁচে।"

চন্দ্রকান্ত তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া ইস্কুলে যাইবার সময় বলিয়া যান, "মামণি, তোমার মাকে দেখো। আর পিসিমাকে একটা চিঠি লিখতে ভুলো না।"

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যান, সুধা খোকাকে কোলে করিয়া জানালা হইতে দেখায়।

ঝি রাঁধুনীর তবু সয় না, বলে, "দিদিমণি, নেয়েখেয়ে নাও নাগা, আমাদেরও ত মানুষের পেট, বাড়ী গিয়ে রেঁধে বেড়ে তবে ত খাব। এইখেনে এগারটা বাজিয়ে দিলে তোমার পেটে হাত বুলিয়ে কি আমাদের পেট ভরবে?" সুধা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে; সে ইহাদের ভয় করে। ইহারা যেন ঠিক বন্য জন্তু, কখন কোন্ দিক্ দিয়া কি খুঁৎ ধরিয়া যে আক্রমণ করিবে তাহার ঠিক নাই। করুণা ঝির মত মমতা ইহাদের কাছে আশা করা যায় না, কিন্তু আর একটু কম প্রখরা হইলে কি চলিত না? সুধার অবস্থা বুঝিয়া মহামায়া মাঝে মাঝে বলেন, "হ্যাঁগা, তোমরা সারাক্ষণ ছেলেমানুষের পিছনে টিক টিক কর কেন বল ত? তোমরা যেন মুনিব, ওই যেন ঝি!"

ঝি একহাত জিভ কাটিয়া বলে, "অমন কথা মুখে এনো-না মা, কচি ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে তুলতে হবে ত, তাই বলি, নইলে কথা কিসের? আমাদের ছোট লোকের গলা, মিষ্টি কথাও ক্যার ক্যার করে।"

সুধাকে বলে, "দিদিমণি, মা'র কাছে লাগিয়েছিলে আমাদের নামে? এই কলকেতা শহরে চোদ্দ বছর গতর খাটাচ্ছি, কেউ বলতে পারবে না যে ননীর মা কারুর এক আধলা চুরি করেছে কি কাউকে গাল মন্দ করেছে। তোমাদের সংসারের মাথা নেই, তাই পাঁচ রকম কথ কইতে হয়, সেটা কি আমার দোষ বাছা?"

সুধা তর্ক করিতে ভয় পায়। দোষ যাহারই হউক, ননীর মা আর বামুনদি যদি সপ্তমে গলা তুলিয়া সকল দোষের জন্য সুধাকেই আসামী স্থির করিয়া দেয়, সুধার ক্ষীণ কণ্ঠের আপত্তি সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে না। তা ছাড়া হাতা-বেড়ি ঝাঁটা বালতি আছাড় দিয়া তাহারা যদি সমস্বরে বলে, "দাও, আমাদের হিসেব মিটিয়ে দাও," তাহা হইলে সুধা এ সংসার ঠেলিবে কি করিয়া? বামুনদির অগ্নি-বর্ষিণী দৃষ্টি আর ননীর মা'র অমৃত-নিঃস্যন্দিনী বাণী বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু খোকনের মুখে দুধ না উঠিলে, মা'র স্নানের জল না জুটিলে, শিবুর পেটে ভাত না পড়িলে সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া? কাজকে সে ভয় পায় না। কিন্তু এত কাজ একলা কি করা যায়? খোকনকে কোলে করিয়া বসিতে হইলেই ত পৃথিবীর সব কাজ বন্ধ? তবু ত তাহারই

বিক্রমপুর-তালতলার পুল

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

চিত্রাধিকারী শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাত

মধ্যে হপ্তায় এক দিন ননীর মা'র কামাই আছে; সেদিন শিবুর জিম্মায় খোকাকে দিয়া পোড়া বাসন মাজিতে সুধার হাতে কড়া পড়িয়া যায়। বামুনদি ব্রাহ্মণ-কন্যা, বাসন মাজিলে তাঁহার সম্মান থাকে না, বড় জোর বাজারটুকু তিনি করিতে পারেন।

নয়ানজোড়ের সেই সুধা এই সামান্য কয়টা মাসে এত ঘর-সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিল কি করিয়া, মনে করিয়া সে আপনি বিস্মিত হইয়া উঠে। পিসিমা যদি হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া পড়েন তাহা হইলে সুধার রকম-সকম দেখিয়া তাহাকে হয়ত চিনিতেই পারিবেন না। শিবুটা যে ছেলেমানুষ সেই ছেলেমানুষই থাকিয়া গেল। কিন্তু সুধার যেন সাত-আট মাসে সাত-আট বৎসর বয়স বাড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ বাবা একথা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, "সুধার ঐ কাঁচা মনে রং ধরতে অনেক বছর লাগবে।"

সন্ধ্যায় খোকার চঞ্চল হাত পা যখন ঘুমের কোলে এলাইয়া পড়ে, ঝি-রাঁধুনীর কাংসকণ্ঠমুখর গৃহ একটু নীরব হইয়া আসে, তখন চন্দ্রকান্ত গৃহে ফিরিয়া দেখেন দিনের খেলার শেষে হয়ত শিবু দিদির সঙ্গে সুর করিয়া পড়িতেছে,

"ওরে তোরা কি জানিস কেউ,
জলে উঠে কেন এত ঢেউ,
তারা দিবস রজনী নাচে,
তারা চলেছে কাহার কাছে।"

নয়ত তাঁহারই মুখে শোনা মেঘদূতের শ্লোকে স্বরচিত সুর যোজনা করিয়া দুইজনে আবৃত্তি করিতেছে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। অর্থ তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে না কিন্তু পদলালিত্য ও ধ্বনির ঝঙ্কার তাহাদের সমস্ত মনটা মাতাইয়া তুলিয়াছে। সুধা দুলিয়া দুলিয়া বলিত, শিবু কথার তালে তালে তুড়ি দিয়া নাচিত।

ক্রমশঃ

আলোচনা

বাংলা বানান

শ্রীরাজশেখর বসু

গত মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়েছেন—বিশ্ববিদ্যালয়-কৃত বানানের নিয়মে হ-ধাতু আর শু-ধাতুর অনুজ্ঞায় 'হয়ো, শুয়ো' রূপ বিহিত হয়েছে, অথচ খা-ধাতু আর দি-ধাতুর বেলায় য় বাদ দিয়ে 'খেও, দিও' করা হয়েছে। এই অসংগতির কারণ আমি যেমন বুঝেছি তা নিবেদন করছি।

'করিআ' আর 'করিয়া'-র বর্ণগত উচ্চারণভেদ অতি অল্প। উচ্চারণ বিশেষ করবার জন্যই কালক্রমে আ স্থানে য় হয়েছে এমন মনে হয় না। প্রাচীন 'মোঅ' আধুনিক 'মোয়' হওয়ায় উচ্চারণের কিছুমাত্র সুবিধা হয় নি। বোধ হয় অ লেখার চেয়ে য় লেখা সহজ সেজন্যই স্থানে-অস্থানে য় এসে পড়েছে।

'হয়ে', শুয়ো' বানানে য়-এর প্রয়োজন আছে, য় বাদ দিয়ে 'হও, শুও' লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসে না। কিন্তু 'খেয়ে', দিয়ে' না লিখে 'খেও, দিও' লিখলে য়-এর অভাব টের পাওয়া যায় না। অনেকে 'খেয়ো, দিয়ো, করিয়ো' লেখেন, কিন্তু 'খেও, দিও, করিও' প্রভৃতি বানানও বহুপ্রচলিত। শেষোক্ত বানানগুলি অপেক্ষাকৃত সরল, উচ্চারণের বিরোধী নয়, অনভ্যস্তও নয়, অতএব মেনে নিলে দোষ কি? অনাবশ্যক বর্ণ যেখানে যতটুকু বাদ দিতে পারা যায় ততটুকুই লাভ।

'করিয়, খাইয়'-তে য় অনাবশ্যক. 'মোয়া, খাওয়া-'তে একবারেই ভুল। এই রকম শব্দে য় স্থানে অ চালাতে পারলে বানান সরল ও শুদ্ধ হয়। কিন্তু অভ্যাস এতই প্রবল যে যুক্তি হেরে যায়। অতএব রফা করা ভিন্ন উপায় নেই। যথা - (১) যদি উচ্চারণের জন্য আবশ্যক হয় তবে য় থাকবে, যেমন 'হয়ো, শুয়ে'। (২) যেখানে কায়েম হয়ে বসেছে সেখানে অনাবশ্যক বা ভুল হলেও য় আপাতত থাকবে, যেমন 'হইয়, হওয়'। (৩) যেখানে য় এখনও সর্বসম্মত হয় নি সেখানে তাকে আর প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত, যেমন 'দিয়ে' করিয়ে' না লিখে 'দিও, করিও'। (৪) নবাগত বিদেশী শব্দে যার বানান এখনও খুব পাকা হয় নি— য়-এর অপপ্রয়োগ যথাসাধ্য বর্জনীয়, যেমন 'সোডাওয়াটার' না লিখে 'সোডাওআটার'।

আমরা যদি ভবিষ্যতে আর একটু সংস্কারমুক্ত হতে পারি তবে হয়ত অ-বর্ণের একটা সুলেখ্য ছাঁদ প্রচলিত হবে, তখন 'মোঅ, খাওঅ' লিখতে কষ্ট হবে না, আর য়-ঘটিত অসংগতিও দূর হবে।

মহাশ্বর-বেলুরের সুন্দর কেশব মন্দির

সুন্দর কেশব

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

১

বাসন্তিকা দেবী শক্তির প্রতীক, চতুর্ভুজা মাতৃমূর্ত্তি—জৈনগণের উপাস্য।

সঙ্কপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের সাল ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁহার গৃহে দেবী বাসন্তিকা প্রতিষ্ঠিত। কুলদেবী, নিত্য তাঁহার পূজা হয়।

একদিন সাল দেবীর পূজায় বসিয়াছেন, জৈন যতি তাঁহার অনুষ্ঠানে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিতেছেন—অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জ্জনে উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেবীপূজায় এ কি বিঘ্ন! আত্মরক্ষারও যে উপায় নাই; জৈনগণ অহিংসাবাদী, দেবীর পূজায় পশুবলির বিধান তাঁহাদের নাই, সুতরাং মন্দিরে পশুবলির কোন অস্ত্রও নাই। দণ্ডধারী যতি সালর হস্তে তাঁহার দণ্ড প্রদান করিয়া আঘাত করিতে আদেশ করিলেন—পয় সাল; আঘাত কর, সাল। লোকে বলে, এক আঘাতেই শার্দ্দূলের ভবলীলা শেষ হইল। কিন্তু জৈন ভক্ত জীবহত্যা করিয়াছেন, এক জৈন যতি তাহার সহায়ক—এ কল্পনাও জৈনগণের পক্ষে অসম্ভব, তাই তাঁহারা বলেন যে, দণ্ডাহত ব্যাঘ্র পলায়ন করিল।

বীর্য্যবানে পূজাদান কৃতজ্ঞতার বিধান, সালকে বীরত্বের মর্য্যাদা প্রদান করিতে সঙ্কপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহের কৃতজ্ঞ অধিবাসীবৃন্দ পশ্চাৎপদ হইল না।

কিন্তু দক্ষিণা গ্রহণে সালর অধিকার আছে কি? এ শার্দ্দূল-দ্বন্দ্বে তাঁহার কৃতিত্ব কি? তাঁহার হস্ত আঘাত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই আঘাতের মূল্য কি? শক্তিময়ী বাসন্তিকা দেবীর কৃপা না হইলে কি আঘাত সফল হইত? যতির মন্ত্রপূত দণ্ড, ইহাতে শক্তি আবির্ভূতা না হইলে—সামান্য দণ্ডের ক্ষমতা কতটুকু?—সাল উপলক্ষ্য মাত্র।

সাল যতির পদতলে সমস্ত অর্থ স্থাপন করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—কৃতজ্ঞ জনগণের স্বেচ্ছাদত্ত বীরপূজার

অর্ঘ্য উপেক্ষা করিও না, গ্রহণ করিয়া গণদাস হও, গণের রক্ষায় এ অর্থ নিয়োজিত কর, সৈন্য সংগ্রহ কর।

যতির উপদেশ শিরোধার্য্য, সাল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। পৌরজন পুনরায় তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল, তাঁহাকে প্রধান বলিয়া নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে সালর প্রভাব বাড়িল, তাঁহার অধিকারও বিস্তৃতি

মন্দিরে নারীমূর্ত্তি

লাভ করিল। অল্পকালমধ্যেই সাল এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেন। সক্ষপুর বড় ক্ষুদ্র—ইহার অনতিদূরে দ্বারসমুদ্রে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। নরশার্দ্দূল-দ্বন্দ্ব হইল তাঁহার কুলচিহ্ন। যতির আদেশ "পয় সাল"—তাহা হইতে এই নবীন রাজবংশের নাম হইল পয়সাল বংশ। জনগণের মুখে এই নামের রূপান্তর ঘটিল; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বংশ হয়সাল বংশ নামে বিখ্যাত।

জনশ্রুতি ঐরূপ।

২

বিত্তিদেব রাজা সালর বংশধর, তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া হইলেন বৈষ্ণব। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে

মন্দিরে নারীমূর্ত্তি

তিনি নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—মুকুন্দপদারবিন্দবন্দনা-বিনোদন; ইতিহাসে তিনি বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে খ্যাত।

বিত্তিদেব জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন কেন? জৈনগণ বলেন, ইহা রাণী লক্ষ্মীদেবীর ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার ফল! বিত্তিদেব স্বয়ং জৈন হইলেও রাণী লক্ষ্মীদেবী ছিলেন হিন্দু। জৈনধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মন প্রসন্ন ছিল না। রাজা তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করুন, এ আকাঙ্ক্ষা রাণীর মনে জাগিল।

সুন্দর কেশব মন্দির-গাত্রের কারুকার্য্য

জৈনধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব রাজার মনে জাগ্রত করিবার তিনি প্রয়াস পাইলেন। রাজাকে বলিলেন, জৈন শ্রমণগণ আপনাকে অবজ্ঞা করেন। আপনি দেশের রাজা, কিন্তু শ্রমণগণের অস্পৃশ্য।

সত্যই কি তাই? দেশের রাজা, ধর্ম্মের রক্ষক, তিনি অস্পৃশ্য! একদিন পরীক্ষা হইল। রাণীর কথাই সত্য, শ্রমণগণ রাজার স্পৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না।

শ্রমণগণ বলিলেন—কোন প্রকার অঙ্গহানি যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার স্পর্শে ভোজ্যবস্তু অশুচি হয়, শ্রমণগণের তাহা গ্রহণ করিতে নাই—জৈনধর্ম্মের অনুশাসনে তাহা নিষিদ্ধ। রাজা অঙ্গহীন, সমরক্ষেত্রে অস্ত্রাঘাতে তাঁহার এক অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়াছে, সুতরাং—

রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। দেশের ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্য, শরণাগত আর্ত্তজনের সাহায্যের জন্য, রাজ্য-বিস্তারের জন্য রণতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে হয়, শত্রু করে অস্ত্রের আঘাত—সে ত বীরত্বের পুরস্কার, তাহার জন্য ঘৃণা? হিন্দুগণ ত কখনও এরূপ করেন না, ক্ষত্রিয়দেহে অস্ত্রলেখায় বীরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাজা জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

জৈনগণ যাহাই বলুন না কেন, সকলে এ-কাহিনী বিশ্বাস করেন না। অনেকে বলেন যে, জৈন শ্রমণগণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ নহে, বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াই রাজা জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করেন, আর ইহার মূলে ছিল শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রভাব।

রাজার কন্যা অসুস্থ হইলেন। লোকে বলিল যে, তিনি ভূতাশ্রিত হইয়াছেন। কন্যার আরোগ্যের জন্য তিনি জৈন শ্রমণগণকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন রাজা শ্রীরামানুজাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি রাজকুমারীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিলেন। কৃতজ্ঞ রাজার উপর শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রভাবের এই প্রথম রেখাপাত। তারপর হইল জৈন শ্রমণগণের সহিত শ্রীরামানুজাচার্য্যের ধর্ম্মবিষয়ে এক মহা বিতর্ক-সমর। প্রকাশ্য সভায় অষ্টাদশ দিবস এই বিতর্ক চলিল। অবশেষে শ্রীরামানুজাচার্য্য হইলেন জয়ী, শ্রমণগণ হইলেন পরাজিত।

ইহার পরই রাজা বিত্তিদেব শ্রীরামানুজাচার্য্যদেবকে গুরুত্বে বরণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৩

হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, যে, মানবের প্রেমে ভগবান মাঝে মাঝে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যের ধূলায় নামিয়া আসেন। কিন্তু সকল সময় তিনি একই মূর্ত্তি ধারণ করেন না। তিনি যখন যে-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন, ভক্ত হিন্দু সেই মূর্ত্তির প্রতীক পূজা করেন। এমনই একটি প্রতীক-মূর্ত্তি ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দান করিলেন। ভক্ত নৃপতি চন্দ্রদ্রোণ-পর্ব্বতে গহ্বরে তাহা স্থাপন করিলেন। ভগবান বুঝি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, বুঝি-বা ইহাকে তাচ্ছিল্য করা মনে করিলেন— তিনি বিষ্ণুবর্দ্ধনের নিদ্রাভিভূত নয়নে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিলেন—লোকালয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে স্থাপিত কর।

কি দৈবাদেশ! হয়সাল নৃপতি গুরু রামানুজাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহার নিকট এই অপূর্ব্ব স্বপ্নকাহিনী বিবৃত করিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার! গুরুও স্বপ্নে ঐরূপ নির্দ্দেশ [illegible]িয়াছেন।

আর সন্দেহের অবকাশ নাই। রাজা কালবিলম্ব করিলেন না, তিনি চন্দ্রদ্রোণ-পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় এক সন্ন্যাসীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই সহায়তায় রাজা বিগ্রহকে পর্ব্বত হইতে সমভূমিতে আনয়ন করিলেন।

মন্দির কোথায় নির্ম্মিত হইবে? কেন, রাজধানী দ্বারসমুদ্রে। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ। তিনি পুনরায় নিদ্রাভিভূত রাজার নয়নে উপস্থিত হইলেন।

ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ সমগ্র ভারতের যাবতীয় পবিত্র নদ-নদী-হ্রদ-সরোবর হইতে জল আনিয়া কমণ্ডলুতে সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রদ্রোণ পর্ব্বতে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় ঐ কমণ্ডলু হইতে যে বারি পতিত হইয়াছিল— পবিত্র বদরী নদী তাহার পূত প্রবাহ। এই বদরী হেমবতী নদীতে গিয়া মিলিয়াছে। হেমবতী শিবসোহাগিনী হৈমবতীরই সলিল-রূপ। এই বদরী-হেমবতী-সঙ্গমের অনতিদূরে, বদরীতীরে, মাতৃভক্ত গরুড়ের অমৃতকলস হইতে এক বিন্দু জল পতিত হইয়াছিল।

মন্দির-গাত্রের কারুকার্য্য

ভগবান আদেশ করিলেন—এই পবিত্র স্থানে আমায় স্থাপিত কর।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—এইবার রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, অমরলোকের স্থপতি।

মন্দির নির্ম্মিত হইল, মহাসমারোহে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। এই স্থানের নাম বেলাপুর বা বেলুহুর, বর্ত্তমানে বেলুর।

সুন্দর কেশব

বিগ্রহের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ, মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচন, পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ—ইহার কোনটিকেই মানবকল্পনা-প্রসূত বলিয়া ভক্তগণ বিশ্বাস করেন না।

৪

অপূর্ব্ব মন্দির, স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষ! প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তৃত সমতল আয়তন। তন্মধ্যে উচ্চ ভিত্তিভূমি—নক্ষত্রাকার। তদুপরি, ভিত্তিভূমির সহিত সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নক্ষত্রাকারে এই মন্দির নির্ম্মিত। নক্ষত্র চিরভাস্বর, তাই কি এই পরিকল্পনা?

মন্দির পূর্ব্বদ্বারী। ভূমি হইতে ভিত্তি ও ভিত্তি হইতে মন্দিরতোরণ পর্য্যন্ত দুই শ্রেণী সোপান। সোপানপার্শ্বে হয়সাল নৃপতির কুলচিহ্ন। তবে, সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। রাজা সাল ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন না, যুদ্ধ করিতেছেন এক কেশরীর সহিত। সিংহকে লোকে পশুরাজ বলে। রাজায় রাজায় যুদ্ধই শোভন, সমযোগ্য বীর সনে সদা রণ ক্ষত্রিয়ের সাধ। ব্যাঘ্র হিংস্র, বলবান হইলেও তাহার রাজ-মর্য্যাদা নাই—তাই বুঝি এ পরিবর্ত্তন।

প্রতি সোপানপার্শ্বে প্রস্তরগঠিত রথচন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের নিম্নে হস্তিযূথ—যেন করীশিরেই রথচন্দ্রাতপ দণ্ডায়মান।

মন্দিরের তোরণ অতি উচ্চ, দুই পার্শ্বে দুই স্তম্ভ, একটির পাদদেশে মদন ও অপরটির পাদদেশে রতি—যেন দুই প্রহরী। প্রেমের, সৌন্দর্য্যের, স্থির-যৌবনের প্রতিমা, মন্দিরের দেবতার যোগ্য দ্বাররক্ষী। স্তম্ভের শিরোভাগে একটি পৌরাণিক দৃশ্য—ভগবান নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করিতেছেন। তন্নিম্নে নারায়ণের বাহন গরুড়, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মকর।

দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে নানা দৃশ্য খোদিত। দক্ষিণপার্শ্বে একটি ফলকে রাজসভার দৃশ্য; সভার মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসিয়া রাজা ও রাণী—নিশ্চয়ই বিষ্ণুবর্দ্ধন ও লক্ষ্মী-দেবী। রাজার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে বিকশিত কুসুম—রাজার শৌর্য্যের ও উদারতার দ্যোতক। তাঁহাদের চারি পার্শ্বে পারিষদ, পুরোহিত, শাস্ত্রালোচনাপরায়ণ পণ্ডিতগণ, আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারীবৃন্দ ও রক্ষীবর্গ। রাজসভায় শাস্ত্রালোচনার সময় রাণীর স্থান রাজার পার্শ্বেই—অন্তঃপুরের রুদ্ধ অচলায়তনে নহে। এই ফলকের নিম্নেই অপর ফলকে সিংহযূথ চিত্রিত, কোন সিংহ উদগ্র, আক্রমণোন্মুখ, কোনটি বা নিতম্বনির্ভরে উপবিষ্ট। সিংহ-পৃষ্ঠে বীর্য্যবান সৈনিক। স্বতন্ত্র ফলকে হইলেও এই চিত্র রাজ-সভা-দৃশ্যেরই অন্তর্গত। শক্তিমান হয়সাল নৃপতি সত্যসত্যই কেশরীকে তাঁহার সৈন্যগণের বাহনে পরিণত করিতে

।াবিয়াছিলেন এরূপ মনে কবিবার কারণ নাই। হিংস্র পশু মনে বংশের প্রতিষ্ঠাতা সালব সফলতা এবং হয়সাল ।পতিগণেব পবাক্রমেব পবিচযেব জন্যই এই চিত্র।

এই বাজসভা-দৃশ্যেব উর্দ্ধে এক সুশোভিত ফলকে ধ্যস্থলে নাবায়ণ, উভয় পার্শ্বে চামববাজকগণ। এক পার্শ্বে ।রুড, অপব পার্শ্বে হনুমান, দুই ভক্তশ্রেষ্ঠ সাবক সম্ভ্রমভবে ।ণ্ডায়মান।

দ্বাবেব বাম পার্শ্বেও অনুরূপ তিনটি ফলকে তিনটি চিত্র—নিম্নে সেই সিংহবাহিনী, মধ্যস্থলে সেই বাজসভা, ভবে বাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন নহেন, বোধহয় তাহাব পুত্র নবসিংহ। উর্দ্ধ ভাগে নাবায়ণ—এবাব নব-সিংহরূপ। বীর্য্যবান বাজা ।াবায়ণেব এই রূপেবই অনুবক্ত ছিলেন, তাই এই নাম ।হণ কবিয়াছিলেন—এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

এই ত্রিফলকেব সমবায় উর্দ্ধে নাবায়ণ, মধ্যে বাজা, ।িম্নে প্রহবী সৈনিক—একটি সম্পূর্ণ চিত্র। এই চিত্রেব ।ব একটি স্তম্ভ, তারপব তিনফলকে বিভক্ত অনুরূপ আব একটি চিত্র। এইরূপে দ্বাবেব উভয় পার্শ্বে পাঁচটি কবিয়া দশটি চিত্র। ইহা ব্যতীত পাঁচটি কবিয়া দশটি ।ানা মুদ্রা-চিত্র। এ ক্ষেত্রেও পব একটি স্তম্ভ চিত্রগুলিব ।াতন্ত্র্য বক্ষা কবিয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীবগাত্রে ।র্ব্বশুদ্ধ বিংশতি স্তম্ভ। স্তম্ভেব শিবশোভা বিশেষ উল্লেখ-।োগ্য। দুইটিতে শক্তিব আধাব দুর্গামূর্ত্তি, অপব অষ্টাদশটিতে এক একটি নাবীমূর্ত্তি—নাবীজীবনেব নানা কার্য্যেব ।্যোতক। কোন নাবী দর্পণহস্তে প্রসাধনে বত, কোন নাবী ।া দোলিখেলায় মত্ত, কেহ বা বিহঙ্গমকে লক্ষ্য কবিয়া তীব ।ুঁড়িতেছেন। নাবী যেএকান্তই অবলা নহেন, শিকাব ও ।ৃগয়া উভয় ক্রীড়াতেই সমান দক্ষতাব সহিত হস্তচালনা কবিতে সক্ষম, ভাবতবাসীব নিকট মূর্ত্তিগুলি তাহাই ।বিতেছে।

এই পূর্ব্বদ্বাবই মন্দিবেব প্রধান দ্বাব, মধ্য তোবণ।

৫

দক্ষিণ ও উত্তব পার্শ্ব দূব হইতে দেখিতে একই রূপ ও পূর্ব্ব দিকেব ন্যায়—অঙ্গন হইতে ভিত্তিভূমি, ভিত্তিভূমি হইতে মন্দিবেব পাদদেশ, সেই সোপানশ্রেণী।

কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইলে প্রাচীবগাত্রেব চিত্রাবলীব স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক চিত্রেব বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

উত্তব দ্বাব 'স্বর্গদ্বাব' ও দক্ষিণ দ্বাব 'শুক্রদ্বাব' নামে অভিহিত। চিবতুষাবধবল হিমালয় দেবগণেব প্রিয় আবাসভূমি, তাই কি হিমালয়াভিমুখী দ্বাব ঐ নামে পবিচিত? দক্ষিণে অনার্য্য দানবগণেব বাস, দানবগুরুব নামে দক্ষিণ দ্বাবেব নামকবণ কি ইহাবই ইঙ্গিত? এই সব দ্বাবেব বক্ষী নন্দন ও বতি নহেন, প্রকৃত দ্বাবপাল।

সিংহনিনাদ স্তম্ভ সাব

প্রাচীবগাত্রে, উদ্যানস্তম্ভে নানা মূর্ত্তি খোদিত কি শোভাব আকব? তৎসমুদয় প্রাচীন ভাবতেব ভাবতবাসীব বীতিনীতি, আচাব-ব্যবহাব, পোষাক পবিচ্ছদ—এ সকল সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দেয় না? বাজসভায় অথবা যুদ্ধক্রীড়াভূমিতে বাজা ও বাণীব একত্র সমাবেশ কি একান্তই নিবর্থক? সাধাবণতঃ পত্নীব স্থান পতিব বাম পার্শ্বে—বাজসভায় বাজাব দক্ষিণ পার্শ্বে বাণীব অবস্থিতি কি শিল্পীব খেয়াল

মাত্র?—সে যুগের নারী-মর্য্যাদা সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিতও কি ইহাতে নাই?

নারী-জীবনের কত চিত্রই না প্রদর্শিত হইয়াছে! কোথাও দেখি এক নারী বিচিত্র ভঙ্গিমায় আপনার রূপমাধুরী প্রকাশ করিতে ব্যস্ত, কোথাও বা নারী চিত্রলেখনে রত। এক নারী বসনমধ্যে জ্যেষ্ঠি দর্শনে ব্যাকুল হইয়া বসন উন্মোচন পূর্ব্বক আপনাকে ঐ ভয়াবহ জীব হইতে মুক্ত করিতে ব্যস্ত, অপর এক নারী বসন হইতে বৃশ্চিক ভূমিতে নিপাতিত করিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু নারীহৃদয়ের ভয়-প্রবণতার এই চিত্র প্রদর্শন করিয়াই শিল্পী ক্ষান্ত হন নাই। এক নারী পুরুষোচিত বেশে তীর হস্তে দণ্ডায়মান, এক নারী এক বিহঙ্গমকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছেন, অপর এক নারী মৃগয়া হইতে ফিরিতেছেন, তাহার পশ্চাতে অনুচরের স্কন্ধে দণ্ডে বিলম্বমান তাহার শিকার, নিহত মৃগ ও সারস। এ সকল কি শিল্পীর কল্পনামাত্র—সে যুগের নারীজীবনের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই?

ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট হইতে দীনতম ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকল ভারতবাসীর চিত্রে উত্তরাঙ্গ অনাবৃত দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। আধুনিক কোটের অনুরূপ আজানুলম্বিত গাত্রাবরণ আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। গাত্রাবরণের উপর এক কটিবন্ধ—আধুনিক পুলিশের বা সৈনিকের পোষাক।

৬

অর্দ্ধনারীশ্বর—ভগবানের রূপ-কল্পনায় হিন্দু মনোবৃত্তির বিচিত্র বিকাশ! ভগবান কি শুধু পুরুষ? শুধু নারী? এ বিভেদ-জ্ঞান হিন্দু ভক্তের মনে জাগে না—একই আধারে ভগবান পুরুষ ও নারী।

দ্বিহস্তপরিমিত উচ্চ বেদীর উপর এই বিগ্রহ স্থাপিত। সখিপরিবৃত এই মূর্ত্তি প্রায় একটি মানুষের সমান উচ্চ। চতুর্ভুজ—উর্দ্ধোত্থিত দুই করে শঙ্খ ও চক্র, নিম্ন দুই করে গদা ও পদ্ম। বদনমণ্ডলের একাংশে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য, অপরাংশে নারীজনোচিত কোমলতা; বক্ষের একাংশ প্রশস্ত, অপর অংশ সুঠাম ও উন্নত।

৭

ভগবানের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ভক্ত তাঁহার বিশেষ নামকরণ করিয়া থাকেন—ভক্ত বিষ্ণুবর্দ্ধনও তাহাই করিলেন। নারায়ণের কৃপায় তিনি আজ সৌভাগ্যবান, তাই তাঁহার নাম দিলেন—বিজয়-নারায়ণ। কিন্তু এ বিজয় কিসের? ইহা কি রাজার সামরিক শক্তিরই জয়দর্প, না, জৈন-ধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-ঘোষণা?

হয়সাল-সাম্রাজ্য আজ অতীত গৌরবের একটা সুখস্মৃতি মাত্র। এই মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণিপাত করিয়া হয়সাল নৃপতি আর রণযাত্রা করেন না, জৈনধর্ম্ম বড় কি বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়—হয়সাল-রাজসভায় আজ আর সে-বিতর্ক উঠে না। মন্দিরের দেবতাও আজ আর বিজয়-নারায়ণ নামে অভিহিত নহেন।

আজ তিনি মনোহর সুন্দর-কেশব।
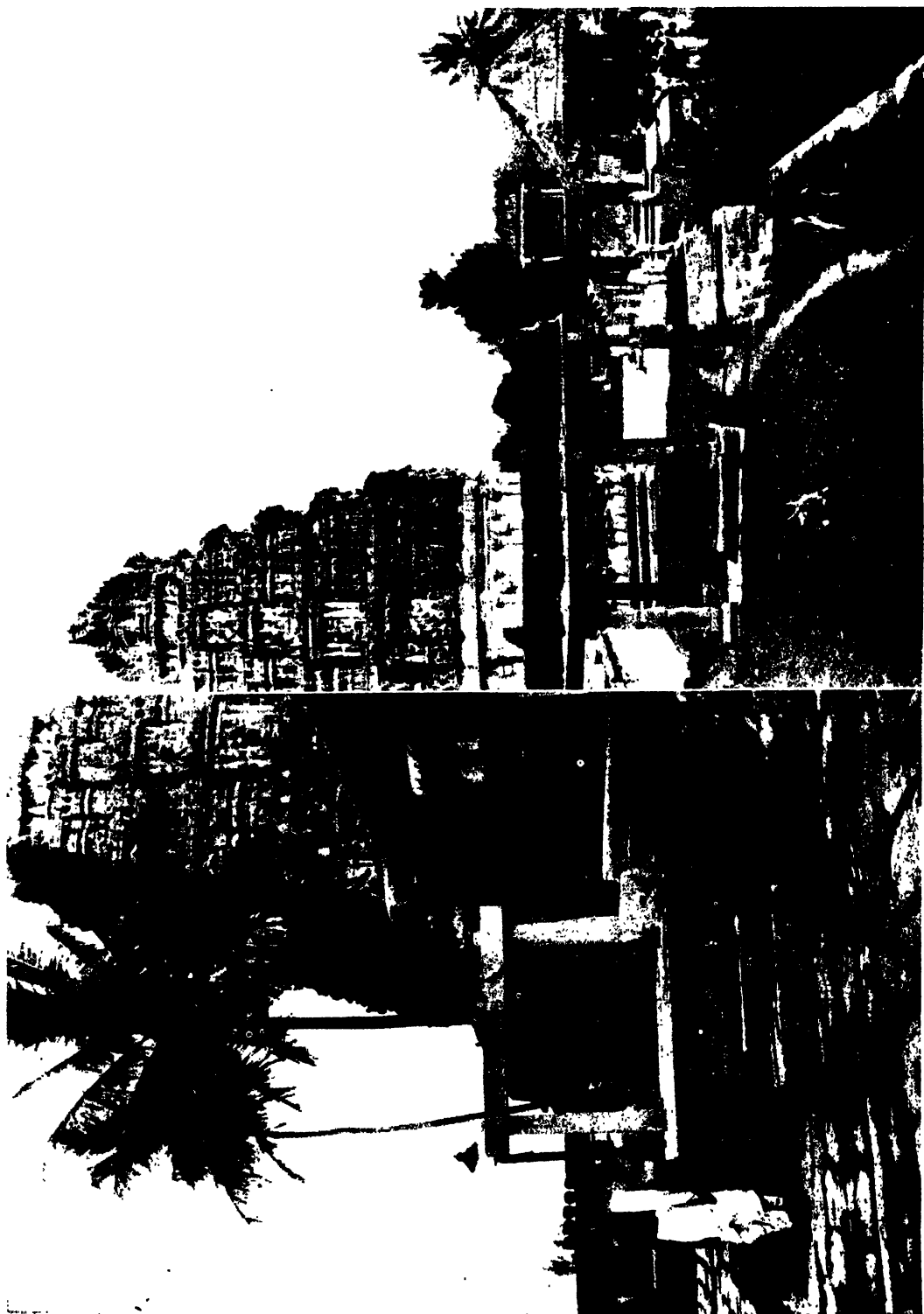
বেলুরের মন্দিরাবলী; সন্নিকটে অমৃতসরোবর

মহীশূর-বেলুরের মন্দিরের দৃশ্য

মন্দিরের কেন্দ্র-গৃহের একটি অংশ

মনি র সোপানপ্র সিংহনিধনরত সালর মূর্ত্তি

প্রবঞ্চনা
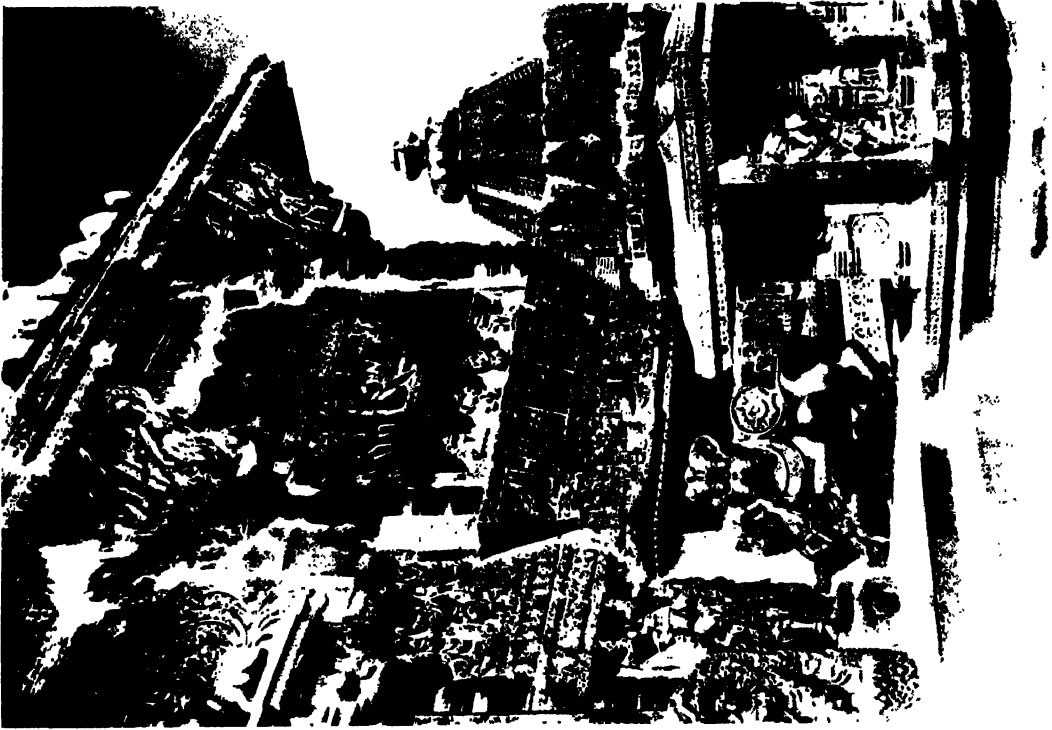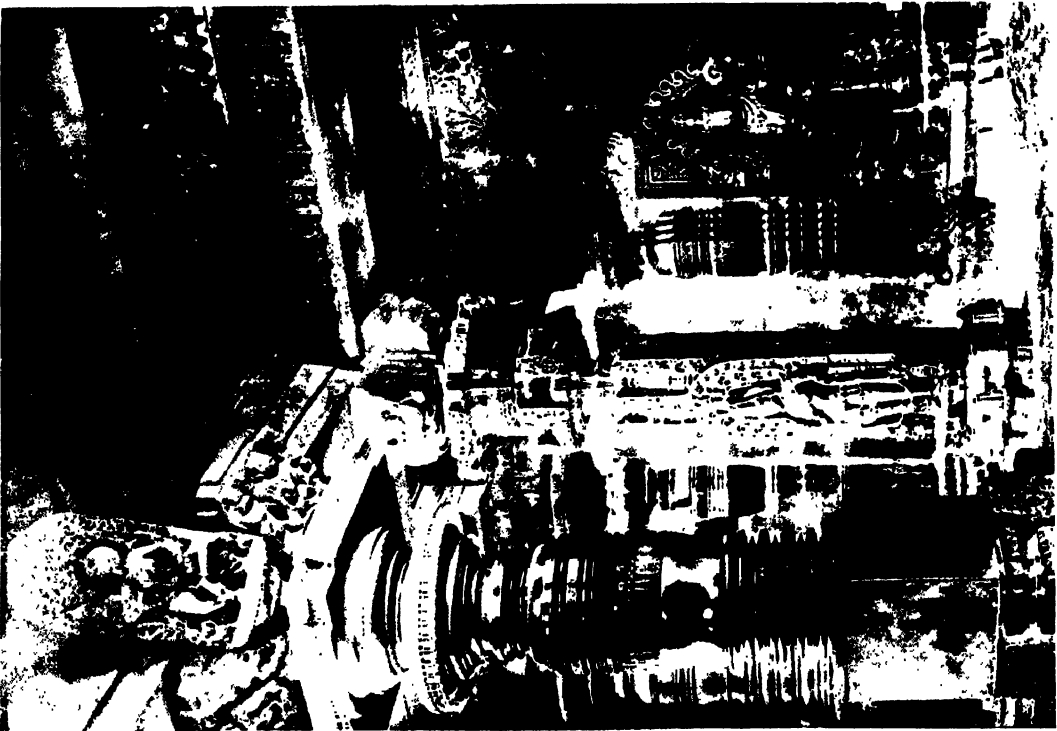
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

প্রজাপতি-সংহিতার আধুনিকতম সংস্করণে লেখা হইয়াছে,—প্রয়োজন বুঝিলে মেয়ে অসাবধান হইয়া হাতের রুমালটি ফেলিয়া দিবে; ছেলে সেটি সাবধানে তুলিয়া ধরিয়া দাসত্ব-গৌরবের অভিনয় করিয়া বলিবে—"আপনার রুমালটা…"

মেয়ে সেটি গ্রহণ করিয়া বলিবে—"থ্যাঙ্কস্", অর্থাৎ ধন্যবাদ। ছেলে প্রবল কুণ্ঠার সহিত বলিবে, "নীড্ নট্ মেন্‌শ্যন", অর্থাৎ উল্লেখ ক'রে লজ্জা দেবেন না।

ইহার পর দু-জনে না-চাহিবার চেষ্টা করিয়া আর একবার সলজ্জ ভাবে চাহিয়া ফেলিবে।

অতঃপর সংহিতাকার নিজেই কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়া স্থানকালপাত্র হিসাবে ব্যবস্থা করিবেন।

বিমলেন্দু কলিকাতার একটি কলেজে তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ছাত্র। একদিন কলেজের প্রাঙ্গণে ঐ শ্রেণীর নবাগতা ছাত্রী অর্চ্চনা রায়ের রুমালটি কুড়াইয়া দিবার তাহার একটু সুযোগ ঘটিয়া গেল। বিমলেন্দু ছেলেটি বুদ্ধিমান, বুঝিল দুর্যোগের মত সুযোগও কখনও একা আসে না। সে তর্কে-তর্কে রহিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আরও তিনটি অনুরূপ সুযোগ দৈব অথবা তাহার পুরুষকারের বলে ঘটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধন্যবাদাদির পরও সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কিছু অতিরিক্ত আলাপ হইল।

বিমল প্রশ্ন করিল—"আপনার কোন্ ইয়ার ক্লাস?"

জানা জিনিষ লইয়া এ-রকম অজ্ঞ সাজিতে গেলে মনের কথাটি বড়ই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অর্চ্চনা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু লজ্জিত হইয়া মুখটি ঘুরাইয়া লইল। তখন বিমলেন্দুও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"ও, ঠিক ত! আপনাকে আমাদের থার্ড ইয়ারেই কোন কোন ক্লাসে যেন দু-একবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে…"

কথাটাকে একটু টানিয়া সত্য রূপ দেওয়া যায়। যত ক্ষণ ক্লাস চলে প্রতি মিনিটে বিমলেন্দু অর্চ্চনাকে দু-একবার দেখে। ব্যাপারটা অর্চ্চনার এমন কিছু অবিদিতও নয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মিথ্যার প্রতিবাদ করা ত দূরের কথা, সামান্য অবিশ্বাসের ভাবও দেখাইল না।

বিমল দু'টা সিঁড়ি উঠিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"আপনার রোল নম্বর?"

অর্চ্চনা উত্তর করিল—"সাতাশী।" সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও করিল—"আপনার?"

বিমলেন্দুর দুই আঙুলে-ধরা নোটবুকটা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"অষ্টআশী।"

অর্চ্চনা সুধু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ও!"—তাহার এ অসামান্য কথাটি যেন মোটে জানাই ছিল না।

মিথ্যাকে আমরা প্রবন্ধ-বক্তৃতাতে যতই লাঞ্ছনা করি না কেন, এ-সব ক্ষেত্রে কার্য্য অগ্রসর করিয়া দিতে অমন বস্তু আর নাই। দিব্য একটি নির্ব্বিঘ্ন প্রচ্ছন্নতার আড়াল দিয়া যেন দর্পণে উভয় উভয়ের মনটি দেখিয়া লইল।

তাহার পরদিন বিমলেন্দুর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের জন্য আবার দু-জনের হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হইয়া গেল। বিমল নমস্কার করিয়া বলিল—"আজ দেখছি যে আপনারও বড্ড লেট হয়ে গেল, আমি ভাবলাম বুঝি আমার একারই দেরী হ'ল।"

অর্চ্চনা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ, দেখুন না; একটা মাড়োয়ারী ম্যারেজ প্রসেশ্যনের জন্যে গাড়ীটা আট্‌কা পড়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে নিরুপায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—সে যে কি বিড়ম্বনা…"

বিমল বলিল—"সে আর বলতে?… আমারও খানিকটা দেরী হয়ে গেল। পনের মিনিট দেরী, প্রফেসার গুপ্ত নিশ্চয় প্রেজেন্ট করবেন না; যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় আপনাকে দেখে কতকটা ভরসা হ'ল।"

অর্চ্চনা উঠিতে উঠিতেই একটু সলজ্জ হাসির সহিত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল। বিমলেন্দু একটু হাসিয়া বলিল—"মানে, তিনি লেডি-ষ্টুডেণ্টের অসম্মান করতে পারবেন না ত? ··· তার পরেই আমার রোল নম্বর—প্রেজেণ্ট না ক'রে উপায় থাকবে না।"

অর্চ্চনা এই ফন্দির জন্ম মুখ ঘুরাইয়া হাসিতে গিয়া একটু দুলিয়া উঠিল। আরও দুইটা সিঁড়ি উঠিয়া কিন্তু সে রাঙা মুখটা গম্ভীর করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিমল মুখ তুলিয়া চাহিতে, বলিল—"তাঁর দয়ার সুবিধা নেওয়া হবে, তার চেয়ে একটা পার্সেণ্টেজ হারান ভাল। এ-পিরিয়ডটা কমনরুমে গিয়ে বসতে যাচ্ছি। আপনি ত ক্লাসে গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন,—আপনাদের—স্কলারদের ত আবার এ্যাটেন্‌ডেন্স নিয়ে কড়াকড়ি অনেক···"

বিমলেন্দু সে-কথার উত্তর না দিয়া, অর্চ্চনার চেয়েও মুখটা গম্ভীর করিয়া অতি-বড় ধার্ম্মিকের মত বলিল—"ঠিক বলেছেন,—তাঁর প্রিন্সিপলটা ভাঙান আমাদের উচিত হবে না। না, চলুন, আমিও তা হ'লে কমনরুমে গিয়ে বসি।"

এইরূপে প্রফেসার গুপ্তের প্রতি অন্যায় করিয়া ফেলিবার ভয়ে দুইজনে নামিয়া কমনরুমে গিয়া বসিল।

অবশ্য কমনরুমে বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হইল না। কারণ উভয়েই, প্রফেসার গুপ্ত সেই পিরিয়ডে যে-বইখানি পড়াইতেছেন সেইটি খুলিয়া বসিল। বিমলেন্দু দশ-বারো বার খুব সন্তর্পণে দৃষ্টি বাঁকাইয়া দেখিল, অর্চ্চনা প্রচণ্ড মনোযোগের সহিত পাঠে নিরত। অর্চ্চনাও পাঁচ ছয় বার চকিতের জন্ম বই হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, বিমলেন্দু বইয়ের সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিলেও চলে। কেউ কাহারও ব্যাঘাত করিল না। সত্যই ত, তাহারা গুপ্ত-সাহেবের প্রিন্সিপল ভাঙিবে না বলিয়া না-হয় ক্লাসে যায় নাই, তাহা বলিয়া পড়ায় ফাঁকি দেওয়া ত তাদের উদ্দেশ্য নয়।

সুধু, পিরিয়ড শেষ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতে বিমলের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। যেন কত যুগের জন্যই না বিদায় লইতেছে এই ভাবে একটি নমস্কার করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা, তা হ'লে আসি, মিস্ রায়। আপনার ত ছুটি এ-পিরিয়ডে?"

অর্চ্চনা বলিল—"হ্যাঁ, এর পরের পিরিয়ডে আমার হিষ্ট্রি।"

টেবিলের উপর বই-খাতার তাড়াটা ঠুকিতে ঠুকিতে বিমল বলিল—"আমার এ-পিরিয়ডে ফিলসফি।···ভাবছি ছেড়ে দেব; ছেড়ে দিয়ে হিষ্ট্রিই নেব।"

হঠাৎ ফিলসফির উপর এত বিরাগ কেন, আর হিষ্ট্রির উপরই বা এত টান কিসের, সে-সম্বন্ধে কিছু বলিল না।

অর্চ্চনাও অবশ্য জিজ্ঞাসা করিল না।

২

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

বিমলেন্দু এবং অর্চ্চনা একটি বেঞ্চের দুই প্রান্তে বসিয়া আছে; মাঝখানে দুই জনের বই।

কলেজের বেঞ্চ নয়।···বেঞ্চের সামনেই একটু দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারা গোল হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে একটি হলদে ফুলের মাঝারি-গোছের গাছ, তাহার ঘন ছায়াটা জলের গায়ে তুলি বুলাইতেছে। কিনারা হইতে হাত-দুয়েক পরেই গুটিকতক রাঙা কহ্লারের গুচ্ছ,—দুইটি ফুটিয়া পরস্পরের পাপড়িতে জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ওপারের বেঞ্চে একটা পশ্চিমা, বোধ হয় মালী, দিবানিদ্রা সারিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিল।

আজ কলেজে কি-একটা কারণে হঠাৎ ছুটি হইয়া গেছে, ইহারা দুই জনে বাসায় ফেরে নাই এখনও।

বিমলেন্দু বলিল—"তোমার মধ্যে আমার যা সবচেয়ে ভাল লাগে অর্চ্চনা, তা তোমার এই বিদ্রোহ। তোমায় বুঝতে দিই নি—মেয়ে-কলেজ ছেড়ে তুমি যে-দিন আমাদের কলেজের ফটক পেরিয়েছ সেই দিন আমি তোমায় আমার মনের মধ্যেও শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা ক'রে নিয়েছি।"

অন্য রকম কথা হইতেছিল।—প্রফেসরদের পড়ানো—শেলী, কীট্‌স্, হুইট্‌ম্যান, রবীন্দ্রনাথ—আই-এর চেয়ে বি-এ-তে বিমলেন্দুর আরও ভাল রেজাল্ট করিবার সম্ভাবনা ···এর মধ্যে একটু বিরতি দিয়া হঠাৎ বীররসের অবতারণায় অর্চ্চনা একটু যেন লজ্জিত হইয়া গেল।

বিমলেন্দুর ভাবের ঘোর লাগিয়াছে, একটু থামিয়া

বলিল—"আসল কথা হচ্ছে, তোমার এ-এ্যাটিটিউড্‌টুকু আমার জীবন-স্বপ্নের সঙ্গে বড় মিলে গেছে।—যা-কিছু পুরাতন, যুগজীর্ণ—ব্যক্তিগত রুচিতে, সামাজিক আচারে বা ধর্ম্মের ছদ্মনামে—সে-সমস্তর বিরুদ্ধেই আমার অভিযান, আমি সে-সমস্তকেই ঘা দেব। এ-অভিযানের পথে যারা আমার সঙ্গী, আমার কমরেড, তাদের ওপর যে আমার কত শ্রদ্ধা, তা প্রকাশ ক'রে বলবার ভাষা নেই, অর্চ্চনা।"

শেষ পর্য্যন্ত অর্চ্চনাকেও কথাগুলা স্পর্শ না-করিয়া পারিল না; মেয়ে হইলেও, এই যুগের মেয়ে ত—এই যুগের অগ্রণী মেয়ে? বলিল—"আমি বিদ্রোহের কথা বলতে পারি না বিমলবাবু, তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থাতে আমার মন সায় দিল না; কলেজের মধ্যেও যেন মোগল-হারেমের রুদ্ধ হাওয়ার গুমটে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম; আমার জীবন-দেবতা আমায় এই পথ দেখিয়ে দিলেন, আমি পা বাড়াতে দ্বিধা করলাম না। আমি বিদ্রোহী কিনা জানি না, তবে আমি যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ঠেলে আপনাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ালাম, এটা করলাম আমি চিরদিনের বঞ্চিত, সমগ্র নারীর অভিযোগ হিসেবেই .."

বলিতে বলিতে মুখটা তাহার দীপ্ত হইয়া উঠিল।

এ-ভাবটা কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—হইবার কি কথা? ফাল্গুনের হাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন একটা চৈতীর হল্কা বহিয়া যায় এও সেই রকম।

একটু পরে আবার অর্চ্চনার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল। একটু যেন অভিমানের সুরে অনুযোগ করিল—"আপনারা আমাদের কতই না বঞ্চিত করছেন দেখুন ত!—এই চমৎকার নীল আকাশ, মুক্ত হাওয়া, জল-স্থলের এই কত রকম সৌন্দর্য্য, চারিদিকের কত বিচিত্র জীবন,··· পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের নালিস কি ···

বিমলেন্দু হঠাৎ বাধা দিয়া প্রতি-অনুযোগের স্বরে বলিল—"আমি বঞ্চিত করেছি অর্চ্চনা?"

অর্চ্চনা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল; বলিল—"না, আপনার কথা বলছি না; আপনি ত আমায় এর সন্ধান দিয়েই এলেন, আমি বলছি সাধারণ স্ত্রীজাতি আর পুরুষের কথা। ভাবুন ত আমাদের মেয়েরা কতটা বঞ্চিত থাকে!"

বিমল বলিল—"তাঁরা ইচ্ছে করেও থাকেন অনেকটা।"

"কেন?

"ধর, তুমি ত রোজ এখানে একবার ক'রে আসতে পার; কই, আসবে?"

অর্চ্চনা একটু হাসিয়া বলিল—"কলেজ কামাই হবে যে।"

বিমল বলিল—"আমি পারি,—যদি এ-রকম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য পাই অর্চ্চনা। বরং কলেজে ব'সেই আমার মনে হয় আমি এখান থেকে কামাই ক'রছি।"

'পরিপূর্ণ' কথাটার উপর জোর দিল এবং পরে বলিল—"তোমরা বাঁধন ভালবাস অর্চ্চনা; হাজার সৌন্দর্য্যের জন্যও বাঁধন কাটাতে নারাজ।"

আর একটু পরে সামনের পুষ্পস্তবকের উপর নজর রাখিয়া বলিল—"বোধ হয় তোমরা নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ ব'লে সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত থাক।"

অর্চ্চনা মুখ ঘুরাইয়া লইল, তেমন ভাবেই প্রশ্ন করিল—"সবাই কি?"

—তাহার উদ্দেশ্য ছিল বলা—"সবাই কি সন্তুষ্ট থাকে?"

বিমলেন্দুর মনের সুর আরও উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা; চোখাচোখি না-থাকায় সাহসের সহিত বলিল—"অন্তত তুমি ত নিশ্চয়।"—তাহার অর্থ ছিল—"তুমি ত নিজের মধ্যেই নিজে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ।"

অর্চ্চনা বইগুলা কোলে তুলিয়া লইল; বিমলেন্দুর কথাটাকে নিজের মনোগত প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া একটু হাসিয়' বলিল—"আপনি ভুল বলছেন বিমলবাবু।"

বিমল একটু জেদের সহিত বলিল—"না, বলছি না ভুল, অর্চ্চনা; কোথায় তোমার অপূর্ণতা, বল—কিসে?"

অর্চ্চনা নিজের ভ্রমটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়া, বিমলের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া বলিতে পারিল—"কোথাকার কথা যে কোথায় এসে পড়ল!······উঠবেন না?—আমার গাড়ী বোধ হয় কলেজে এসে গেছে এতক্ষণ।"

৩

বিমলেন্দু ডাকিল—"রুচি!"

নূতন কাহাকেও ডাকিল না, সে আজকাল অর্চ্চনাকে

এই ভাবে ডাকিতেছে ; এ-শ্রেণীর লোককে যদি অমৃত দেওয়া হয় ত সেটাকেও ক্ষীর করিয়া লইয়া ছাড়িবে।

সেই জলের ধারের জায়গাটি। শেষের দিকের দুইটি পিরিয়ডে ছুটি ছিল, সব-শেষের পিরিয়ডে প্রফেসার বোস হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন।

আজ ছয় দিন পরে ; কিন্তু এই ছয় দিনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অর্চ্চনা হইয়াছে রুচি। রুচি প্রবল হইলে বিমলেন্দু কখনও 'অরুচি' বলিয়াও ডাকিয়া ফেলিতেছে। বিমল দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া ইতিহাস লইয়াছে, আজ এখানে আসার ইতিহাসটুকুও এই ব্যাপারটির সহিত জড়িত। অর্চ্চনার নিকট হইতে পুরাতন নোটগুলি টুকিয়া লইবে, তাই দুইজনে এই নিরিবিলিটুকু আশ্রয় করিয়াছে।

অর্চ্চনা নোটের পাতা উল্টানর মাঝে থামিয়া উত্তর করিল—"কি ?"

বিমলেন্দু প্রত্যুত্তর কিছু দিল না। জড়াজড়ি করিয়া যে রাঙা কহ্লার দুইটি ছিল তাহারা আর নাই ; সেই শূন্যতাটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল।

অর্চ্চনা নোটের পাতা আরও খানিকটা এদিক-ওদিক উল্টাইল। তাহার পর মৌনতার অস্বস্তিটা কাটাইবার জন্যই বোধ হয় প্রশ্ন করিল—"গ্রীষ্মের ছুটির আগে যে-সোশ্যাল পার্টি হবে তাতে আপনি কোন পার্ট নিলেন না কেন বিমল বাবু ? অত ক'রে বললে সবাই......"

বিমল ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমিও একথা জিজ্ঞাসা ক'রে তবে জানবে রুচি ?"

অর্চ্চনা একটু চিন্তা করিল,—আবার নোটের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতেই তাহার পর একটা পাতা আঙুল দিয়া মুড়িয়া ধরিয়া বলিল—"বুঝলাম না।"

"বিচ্ছেদটা কি একটা উৎসব রুচি ?"

অর্চ্চনা প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তাহার পর কথাটার অর্থ তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিল, সে মুখ ফিরাইয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই ত, এই গ্রীষ্মাবকাশের দীর্ঘ তিনটা মাস আর যাহার কাছেই উৎসব সূচিত করুক—অন্ততঃ এ-কলেজের দুইটি প্রাণীর কাছে যে করে না, তা হাতে কি কোন সন্দেহ আছে ?......ওদের সবার সামনে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন—সেই মিলনকেই ওরা আমন্ত্রণ করিতেছে এই উৎসবের দ্বারা। ওরা যে নাম দিয়াছে 'বিদায়-অভিনন্দন' ওটা ভুল—ওদের বিদায়ে দুঃখ নাই বলিয়াই এটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে-দুজনের পক্ষে এ-বিদায় সত্যই বিদায়—এই অবকাশ যাহাদের মধ্যে শতাবধি দিনব্যাপী শতযুগের দাহন আনিবে তাহাদের কি উৎসবের অবসর আছে ? ..অর্চ্চনার আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, এদিকটা ভাবে নাই কেন এবং যে এই ভাবনায়ই মুহ্যমান, তাহার সামনে একটু অপ্রতিভ হইল।

সেদিন দু-জনে বাহিরে-বাহিরে কথা আর বেশী কিছু হইল না, তবে দু-জনের মনের মধ্যে যে-সমস্ত কথা নিঃশব্দে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল সে-সব একই প্রকৃতির।

কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইয়া গেল। জলের ও-ধারটায় সবুজ ঘাসের উপর দু-একটি করিয়া সাহেবদের ছেলেমেয়ে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল, তাহাদের 'আয়া' আর 'বয়'-রা মোড়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছে। দু-জনে উঠিল। কথার অভাব হইয়া পড়িয়াছে আজ, অথচ উঠিবার সময় যে দীর্ঘশ্বাসটুকু পড়িল সেটাকে ঢাকিতে কিছু বলিতেই হয় যেন।

অর্চ্চনা সামনের একটি কহ্লারের কুঁড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা, কলেজ যখন খুলবে তখনও এ-সব ফুটতে থাকবে ?"

বিমল বলিল—"কি জানি রুচি ? তিন মাস একটা যুগ যে।"

সে-রাত্রে অর্চ্চনার নিদ্রা হইল না। কিন্তু সে ত আর কালিদাসের যুগের মেয়ে নয় যে, বিরহের সূচনাতে শৃঙ্গার পরিবর্ত্তন করিয়া বীণার তার বাঁধিতে বসিয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়া ছোট ভাই প্রবীরকে ডাকিয়া বলিল—"বীরু, তোমার বইগুলো নিয়ে এস ত ; যে-রকম অমনোযোগী হ'য়ে উঠছ দিন দিন......"

প্রবীর ছেলেটি ভাল, ইংরেজী পড়া বেশ ভালই দিল। ইতিহাস আনিতে বলা হইল ; বেশ সন্তোষজনক উত্তরই দিল। অর্চ্চনা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"মুখস্থ

করবার গুলো ত একরকম চালিয়ে দিলে, অঙ্ক নিয়ে এস ত দেখি।"

সহজ অঙ্কে আটকাইবে না বুঝিয়া, বেশ বাছা বাছা গোটাকতক অঙ্ক দিল। তাহাতে বেশ মনের মত ফল পাওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে ভাইয়ের উপর খুশী হইয়া অর্চ্চনা প্রকাশ্যে রাগতভাবে বলিল—"আমি জানি কিনা,—দেখছি এদিকে বেশ গা ঢেলে দিয়েছ।"

অভিভাবক ঠাকুরদাদা। নামজাদা উকিল ছিলেন। লোকে বলে বড় পাকা মাথা। ছিল বোধ হয় এক সময়, এখন সেটি সম্পূর্ণরূপে নাতনীর হাতে সমর্পণ করিয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিতেছেন। গঙ্গাস্নান, কালীঘাট, ও ভাইটামিন আর পরমায়ুতত্ত্বে আলোচনায় অবসরটা বিভক্ত।

অর্চ্চনা বলিল—"ঠাকুরদা', বীরুর অবস্থা দেখেছ?—অঙ্কেতে ও ডাহা ফেল করবে; এই সামার-ভেকেশ্যানের পরেই ওদের পরীক্ষা, মাস তিনেকও নেই। নিজের মোটেই সময় নেই যে দেখি; কি যে হবে......"—বড়ই চিন্তান্বিত ভাবটা।

বীরুর ডাক পড়িল। আসিলে ঠাকুরদাদা বলিলেন—"অঙ্কটা ঠিক তৈরি নেই শুনছি। তুমি রোজ রাত্তিরে আমার কাছে এসে ব'সো ত এরিথ্‌মেটিকটা নিয়ে।"

অর্চ্চনা একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল—"হ্যাঁ, তুমি আবার ঐ কর। একে ভাল ঘুম হয় না রাত্তিরে; তার ওপর আবার ওর সঙ্গে ব'কে ব'কে···আমি বলছিলাম একটা না-হয় টিউটর রেখে দাও না।"

টিউটর সম্বন্ধে ঠাকুরদাদার চিরকালই আপত্তি; বলেন, ও ত বাজারের নোটের সামিল—শুধু হাত-পা আছে, চ'লে বেড়ায় এই যা তফাৎ। কাল পর্য্যন্ত অর্চ্চনারও এই মত ছিল। গত রাত্রি হইতে বদলাইয়াছে। বলিল—"বরাবর না হয়, অন্ততঃ তিন মাসের জন্য একটু সামলে দিক্ তার পর......"

ঠাকুরদাদা চিন্তিতভাবে বলিলেন—"টিউটর?···তা তুমি যখন বলছ···নিজে মেক্‌-আপ্‌ ক'রে নিতে পারবে না বীরু তুমি? সেই হ'ত ভাল—আত্মচেষ্টা···"

বীরু উৎসাহভরে উত্তর দেওয়ার আগেই অর্চ্চনা বলিল—"না, পারবে না।"—এমন জোরের সহিত বলিল যে বীরু চুপ করিয়া রহিল।

"তা হ'লে দেখ···তোমাদের মাষ্টার কেউ রাজী হবেন বীরু?"—তিন মাসের জন্যে?—জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবে আজকে?"

বীরু উত্তর দিবার আগেই অর্চ্চনা আবার জোর দিয়া বলিল—"না না, হবে না রাজী; স্কুলের মাষ্টারদের বাঁধা টুইশ্যন থাকে।"

বীরু আবার চুপ করিয়া গেল। ঠাকুরদাদা বলিলেন—"হয়েছে!—তোমাদের কলেজের কোন ছেলে পাওয়া যাবে না? জিজ্ঞাসা করে দেখো না, সামনে তিন মাসের ছুটি পড়ে রয়েছে।"

"তুমি কথাগুলো একটু ভেবে বল ত ঠাকুরদা'। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাব,—আমার সেখানে কার সঙ্গে জানা-শোনা?"

"তবে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে? দাঁড়াও, আমি না-হয় দেখি দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে।"

ঠাকুরদাদার হাতে গেলেই ত বেহাত হইল! কলেজে এতটা অপরিচয়ের ভাবটা দেখান ভাল হইল না। একটু চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা বলিল—"রোসো ঠাকুরদা', এক কাজ করা যাবে, একটা বিজ্ঞাপনের মত লিখে পিওনকে দিয়ে আমাদের কলেজের নোটিস-বোর্ডে টাঙিয়ে দেব'খন। যারা চায় তোমার সঙ্গে দেখা করুক, তুমি বেছে নিও।"

"তুমিও থাকবে ত?"

"না, আমার দ্বারা হবে না।"

"থাকলে ভাল হ'ত। লোক বাছা একটু শক্ত কিনা।"

৪

লোক বাছা একটুও শক্ত হইল না, কারণ অত বড় কলেজের মধ্য হইতে একটিমাত্র ছেলে আসিয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিল। তিনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ছেলেটি বারান্দায় উঠিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল—এই কি উমেশবাবুর বাড়ী? তাঁর সঙ্গে—মানে, তিনি···"

"···আমিই উমেশবাবু, কি দরকার আপনার?"

"আমাদের কলেজের নোটিস্-বোর্ডে একটা এডভার-টাইজমেণ্ট···"

ঠাকুরদাদা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, আমার চাই একটি টিউটর। কোন্ ইয়ারে পড়েন আপনি ?"

ছেলেটি একটি ঢোক গিলিয়া বলিল—"থার্ড ইয়ারে।"

বেশ ছেলেটি।—দীর্ঘ, সবল চেহারা; শাদা, ছিমছাম পরিচ্ছদ; মুখে বেশ একটি বুদ্ধির দ্যুতি। একটা আবেদন লইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোথাও একটুও হীনতার ভাব নাই, বরং একটু সলজ্জ বলিতে পারা যায়।

বৃদ্ধের ভাল লাগিল, বলিলেন—"বসুন, বসুন ঐ চেয়ারটায়। থার্ড ইয়ারে পড়েন। তা হ'লে ত আমাদের অর্চ্চনার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়।"

ছেলেটি অজ্ঞের মত একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল মাত্র, যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে।

"চেনেন না ? ক'টি ফিমেল ষ্টুডেণ্ট থার্ড ইয়ারে ?"

ছেলেটি ভ্রূ দুইটি একটু তুলিয়া বলিল—"ও, মিস্ রায়ের কথা বলছেন ? তিনি কি এই বাড়ীতেই···"

"আমার নাতনী কিনা। এই ত ছিল একটু আগে।.. অর্চ্চু!"

প্রবীর আসিয়া বলিল—"দিদি এইমাত্র গাড়ীতে ক'রে বেরিয়ে গেল।"

"কোথায় গেল হঠাৎ ?···যাক্, আলাপ হবেই। হ্যাঁ, কলেজে আর আলাপ হবে কি ক'রে ?—অত সময় ত পাওয়া যায় না।···এই ছেলেটি আপনার ছাত্র। তোমার মাষ্টার মশাই, বীরু; প্রণাম কর।···কি নাম আপনার ?"

"বিমলেন্দু দত্ত।"

"থার্ড ইয়ার—বি-এসসি ?"

"আজ্ঞে না, আর্টস্।"

"কি কি সাব্জেক্ট নিয়েছেন ?···আর সাব্জেক্টের জন্যে ত ভারি বাধা ?—ছাত্র আপনার মোটে ফিফ্‌থ্ ক্লাসে ত পড়ে।"

"ম্যাথেমেটিক্স আর হিষ্ট্রি।"

"অর্চ্চুরও ত এই কম্বিনেশ্যন!"

বিমলেন্দু চোখ তুলিয়া সামনের গাছটার ডগায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি-একটা দেখিতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলেন—"দেখ এ-যুগ আর সে-যুগ!—শ্যামবাজারের মেয়ে-স্কুল খুলল; —মাইলখানেক পথ ঘুরে কলেজে গেছি—একটু পাশ দিয়ে যাবার লোভে। আর এরা এক ক্লাসে পড়ে—এক কম্বিনেশ্যন—নাম পর্য্যন্ত জানে না!—ভালই।" এ-যুগের এ-বেচারীরা একটু লাজুক বেশী। মেয়েরা যতই বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহারা ততই যেন সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছে।

অথচ শরীরের চর্চ্চাও করে সব পূর্ব্বের চেয়ে বেশী; পুরুষালি ভাব আছে,—ইঞ্চি-ইঞ্চি করিয়া সযত্নে বুকের ছাতি বাড়ায়—চওড়া ছাতি চিতাইয়া দাঁড়ায়। এই ছেলেটি ওদেরই টাইপ। বেশ ভাল লাগিতেছিল বিমলেন্দুকে। নূতন পরিচয় হিসাবে কথাবার্ত্তা একটু বেশীই হইল বরং,—টুইশ্যনের পরিধির বাহিরেও গড়াইয়া গেল।

"অনার্স নেওয়া হয়েছে ?···অর্চ্চু নিলে না, মেয়েছেলের অতটা দরকারও নেই।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাথেমেটিক্স।"

"হুঁ; ম্যাথেমেটিক্সে। আর অনার্স!—হাই এডুকেশ্যনের যা অবস্থা! প'ড়ে লোক ক'রবে কি।· আপনার উদ্দেশ্যটা কি ? ঠিক করেছেন কিছু ?"

"দেখি, কম্‌পিটিটিভ্ এগজামিনেশ্যন দেওয়ার ইচ্ছে আছে কোন-একটা।"

বিমলেন্দুর আর যাহাই দোষ থাক, আত্মশ্লাঘাটা নাই। কথাটা নিজের কানেই একটু গালভরা শুনাইল বলিয়া জুড়িয়া দিল, "কোন রকম ব্যাকিং-এর জোর নেই কিনা যে এমনি চাকরি-বাকরি কোথাও পেতে পারব···"

বাঃ, বেশ ছেলে, ঠাকুরদাদার উত্তরোত্তর এর সাহচর্য্যটি বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছিল—প্রজাপতি কি অবতীর্ণ হইলেন বৃদ্ধের মধ্যে ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু একটু কুণ্ঠাও হইতেছিল। অবশেষে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ষ্টুডেণ্ট-কেরিয়ার ভাল হ'লে ও-দিকেই চেষ্টা করা ভাল।"

মুখের দিকে একটু সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন; কিন্তু কোন

র না পাইয়া সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ক, আই-এ-তে কোন প্লেস্ ছিল ?"

বিমল একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করিল—"আজ্ঞে না, প্লেস্ কোন ছিল না, তবে…"

একটু থামিয়া বলিল—"ম্যাট্রিকে একটা ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, আই-এ-তেও পাচ্ছি একটা স্কলারশিপ, তবে ঠিক প্লেস্ থাকা বলা যায় না।" বলিয়া মাথা একটু নীচু করিল।

"বড় আনন্দ হ'ল শুনে। অল্-ইণ্ডিয়া কম্পিটিশ্যনে যাবেন। ওদিকে আমাদের বাঙালীর ছেলেরা বেশী এগচ্ছে না; ঠিক হচ্ছে না এটা।…বীরু, তোমার মাষ্টারমশাইকে চা'টা এনে দাও…অল্-ইণ্ডিয়াতেই দেবেন। কই, আমরা তিন-চার জেনেরেশ্যনে যে-জায়গাটা হাসিল করলাম বাঙালী জাতটার জন্যে, আপনারা তা রাখতে পারছেন কই ?"

বিমলেন্দু লজ্জিতভাবে কহিল—"আজ্ঞে, অপবাদটা আপনাদের দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নয়, তবে কারণ ত একটা নয়—জানেনই ত ?"

"তা হোক, তবু আপনাদের মত ভাল ছেলেদের এ-বিষয়ে জাতের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। না, চেষ্টা করতে হবে; আমি আপনার রেজাল্ট ওয়াচ করতে থাকব।"

হাসিয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয় ভাবছেন—আমি করতে এলাম মাষ্টারি, আমার উপর এ আবার কোত্থেকে এক মাষ্টার জুটে গেল রে বাবা! কি জানেন? ব'সে ব'সে কাগজে দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা প'ড়ে বড় দমে যেতে হয়। বুড়ো হয়ে আর বেশী ঘোরা-ফেরা, সভা-সমিতি চলে না যে এ নিয়ে একটু চর্চ্চা ক'রব; তাই একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে—ইয়ং ম্যান্ কাউকে কাছে পেলেই…"

বীরু চা-জলখাবার লইয়া আসিল। অনেকরকম কথা হইল; নানান রকম খবর রাখে ছেলেটি, আর যাহা বলে—নিতান্ত ভাসা-ভাসা নয়। ওঠার সময় ঠাকুরদাদা বলিলেন—"তা হ'লে আপনি পড়াতে আরম্ভ করে দিন যত শীঘ্র পারেন। ছাত্র আপনার অঙ্কে একটু কাঁচা, ঐদিকটা একটু একটু ক'রে হেল্প ক'রে যাবেন। আমি আবার বেশী কোচিং পছন্দ করি না। হ্যাঁ, টারমসের কথা…"

এমন সময় বাড়ীর গাড়ীটা ফটক পার হইয়া গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে অর্চ্চনা।

সে ভাবিয়াছিল, এতক্ষণে বিমলেন্দু নিশ্চয় চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাহাকে ঠাকুরদাদার সহিত বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সঙ্কোচে—দু-জনের নিকটই সঙ্কোচে—গাড়ী হইতে নামিতে পা উঠিতেছিল না। কিন্তু তখন তাহার আর ফিরিবার পথ নাই।

ঠাকুরদাদা উৎফুল্ল ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"এই-যে অর্চ্চু ও এসেছে। নেমে এস। ইনিই বীরুর টিউশ্যনের জন্য এসেছেন।…কোথায় ঘুরছিলে অর্চ্চু তুমি ?—এত সকালেও ঘেমে উঠেছ, মুখখানা রাঙা হ'য়ে গেছে!…চেন বোধ হয় এঁকে? তোমাদের ক্লাসেই পড়েন।…কি-যে বেশ নামটি বললেন আপনার ?"

নিজের নাম বলা যে অবস্থাবিশেষে এত শক্ত বিমলের তাহা জানা ছিল না। গলার কাছের এলোমেলো অক্ষর-গুলা কোন রকমে গুছাইয়া বলিল—"বিম্—বিমলেন্—দু।"

হাতের রুমালটা কপালের ঘামের উপর চাপিয়া অর্চ্চনা-অজ্ঞের মত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল,—একটু পূর্ব্বে বিমল নিজে যেমন দাঁড়াইয়াছিল,—কোনমতেই মনে পড়িতেছে না নামটা।

কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভবানীচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সহিত পুনর্মুদ্রিত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত রাজীবলোচনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহিত পুনর্মুদ্রিত। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১ ও ২। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ১৩৪৩। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য এক টাকা মাত্র।

বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে, গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্ত্তি। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর গর্ব্ব করিবার যে ন্যায্য অধিকার আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া এই সাহিত্যের কোনও সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঠিকই লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান কালের অপরাপর ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির কথা দূরে থাক, অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন বিদেশী ভাষাতেও এইরূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও ঐশ্বর্য্যশালী গদ্য-ভঙ্গি ও সাহিত্য নাই, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" এই গদ্য-সাহিত্যের গঠনের যুগ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ। সেই যুগের যে-সকল রচনা বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে, তাহা আধুনিক সময়ে একান্ত দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্য তাহাদের সহিত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় নাই বলিলেও চলে। গর্ব্ব করিবার বিষয় হইলেও, এই সকল রচনার উদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণ সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত কেহই বিশেষ যত্ন করেন নাই। শুধু দুষ্প্রাপ্য নহে, হয়ত কিছু দিন পরে এই রচনাগুলি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। উল্লিখিত 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকের প্রথম সংস্করণের মাত্র দুইটি কাপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পুস্তকের প্রথম সংস্করণের কেবল একটি মাত্র কাপি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। অথচ এক সময়ে এই দুইটি রচনাই বাঙ্গালা গদ্য-রচনার অন্যতম পথ-প্রদর্শক হিসাবে যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের এই রচনাগুলির নিখুঁত পুনর্মুদ্রণ স্বল্পমূল্যে প্রচারের সংকল্প করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্যসেবী বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এ-পর্য্যন্ত দুই মাসের মধ্যে এই গ্রন্থমালায় উল্লিখিত দুইটি পুস্তক ছাপা হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে আরও ১৩ খানি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে এই যুগের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য রচনা ক্রমশঃ বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই অধিগম্য হইবে।

এই যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গত যুগের সাহিত্য ও ইতিহাসের যে-সকল উপকরণ প্রতিদিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুরাগ ও পরিশ্রম বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজেও সুলভ নহে। সেই অনুরাগ ও পরিশ্রমের ফলে, গত যুগের বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য-প্রচেষ্টার সহিত আজ বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় লাভ ঘটিতেছে, তাহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

রাজীবলোচনের রচনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আনুকূল্যে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। পাদরী উইলিয়াম কেরীর অধীনে তিনি উক্ত কলেজে বাঙ্গালা বিভাগের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, এবং কেরী সাহেবের উৎসাহে এই পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই যুগের সাহিত্য-রচনার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা রাজীবলোচনের রচনার যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকের খুব বেশী মূল্য না থাকিলেও, সেই যুগের রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। প্রথমে রামমোহন রায়ের 'সম্বাদকৌমুদী' পত্রিকার সম্পাদন করিয়া, পরে তাঁহার সহিত সহমরণ-নিবারণ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তিনি রামমোহনের পক্ষ ত্যাগ করেন। উক্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যে "ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিয়াছিল, তাহার অগ্রণী ও সম্পাদক হইয়াছিলেন ভবানীচরণ। তিনি কলুটোলায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের মুখপত্রস্বরূপ 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ টীকা-টিপ্পনী সমেত পুঁথির আকারে তুলট কাগজে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। কেবল রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে অথবা স্থিতিশীল সমাজ-সংরক্ষক হিসাবে নহে, গ্রন্থকার সুলেখক ও সাংবাদিক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ইতিহাসে ভবানীচরণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ভবানীচরণের রচিত বা সম্পাদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়' এবং (প্রমথনাথ শর্ম্মা—এই ছদ্মনামে লিখিত) 'নববাবু বিলাস' সেই যুগের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল উল্লিখিত হইবে। প্রথম গ্রন্থখানি বর্ত্তমান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; দ্বিতীয়-খানিরও পুনর্মুদ্রণের সংকল্প রহিয়াছে। পুনর্মুদ্রিত পুস্তকের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রবাবু এই বিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থকারের ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর যতটুকু পরিচয় অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই সংস্করণের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়—প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কলিকাতার রীতিবর্ণন এবং তদুপলক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী সমাজের যে চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কেবল রস-রচনা হিসাবে নহে, ঐতিহাসিক আলেখ্য হিসাবেও মূল্যবান। ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচনায় ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম পেঁচার নক্সা'র অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক।

মুক্তি

তরুণী

গ্রামবাসিগণ

পার্ব্বত্য রমণী

আর একটি কথা। পুনর্মুদ্রিত পুস্তক যাহাতে নির্ভুল হয়, তাহার জন্য যথেষ্ট যত্ন করা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রথম সংস্করণের পত্র সংখ্যাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের ছাপার নমুনা ও টাইটেল পেজের প্রতিলিপিও মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রী সুশীলকুমার দে

জাপানে-পারস্যে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই গ্রন্থের 'জাপানে' অংশটি পূর্ব্বে 'জাপান-যাত্রী' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল। 'পারস্যে' অংশ সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত। এবারে প্রথম ইহা গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে।

১৯৩২ সালে পারস্যরাজের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ যখন সত্তর বৎসর বয়সে বায়ুযানে পারস্য যাত্রা করেন তখন বাংলা দেশে সকলে তাঁহার পথের ভ্রমণ ও পারস্য ভ্রমণের কথা শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রে এই কাহিনীর আশায় অনেকে চাহিয়া থাকিতেন। যাঁহারা গল্প শুনিতে চান তাঁহাদের আশা না মিটিলেও পারস্যকে দেখিয়া কবির রবি এবং প্রবন্ধগুলিতে এসিয়া ও ইউরোপের মানব জাতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর চিন্তাধারার বহু পরিচয় দিয়াছেন। পারস্য-বিষয়ক তথ্যও ইহাতে অনেক আছে। বাংলায় পারস্যের কথা বেশী নাই। সুতরাং বইখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ছন্দ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

১৩২১ সাল হইতে ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত ২১ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে একত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রবন্ধের সংখ্যা সাত-আটটির বেশী নয়, কয়েকখানি পত্রও তাহার উপর আছে। ইহাতে পদ্য ছন্দ ও গদ্য ছন্দ দুই বিষয়েরই আলোচনা আছে। বাংলা দেশে ছন্দের জাল বুনিতে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবিযশপ্রার্থীরা সকলে তাঁহার এই বইখানির সমাদর করিবেন আশা করা যায়। যাঁহাদের যশোলিপ্সা নাই, রসপিপাসা আছে, তাঁহারাও ইহার আদর করিবেন নিশ্চয়।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ লিখিত। উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

"রামকৃষ্ণ পরমহংস যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য" তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর মুখে শোনা কুড়িটি ছোট ছোট গল্প এই বইখানিতে আছে। গল্পগুলি শিশুদের আনন্দের সঙ্গে পড়িতে ও বড়কে পড়িয়া শুনাইতে দেখিয়াছি। গল্পগুলি নীতিমূলক ও চিত্তাকর্ষক। গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, ভাষা শক্ত নয়। বইখানিতে সাতখানি বড় ছবি ও অনেকগুলি ছোট ছবি আছে।

শ্রীশান্তা দেবী

শিল্পী শ্রীমতী অমৃত শেরগিল

চিরকাল রসপিপাসুদের মনে আনন্দ সঞ্চার করবে, চিত্ত-বৃত্তির ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবে, শিল্পের কোন ক্ষেত্রে এমন উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি নারীপ্রকৃতির পক্ষে একেবারেই সম্ভব কিনা, সে বিরোধসঙ্কুল আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সহজ সৌন্দর্য্যবোধ নারীচিত্তের অঙ্গাঙ্গী, সেই সৌন্দর্য্যবোধ ব্যয়িত হয় সাধারণত তাদের পরিবেশকে রমণীয়, দৈনন্দিন কর্ম্মকে মধুর ক'রে তুলতে, তারাই ত গৃহদীপ, অমর্ত্ত্য শ্রীর প্রতিরূপ মর্ত্ত্যলোকে। নারীর এই সহজ শ্রীজ্ঞানই পরিব্যাপ্ত হয় নানা ব্যবহারিক কারুকর্ম্মে, অলঙ্করণে. আমাদের দেশেও মেয়েদের নিপুণ হাত অনেক কাল অপরূপ কারুরচনায় পটু ছিল, এখনও সে-দক্ষতার চিহ্ন সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় নি।

চিরন্তন মহিমার যোগ্য হোন বা না-হোন, আধুনিক যুগে মেয়েরা চিত্র ও মূর্ত্তি-রচনায় পুরুষের সমান স্থান অর্জ্জন করতে ব্রতী। বিদেশে শ্রীমতী লরা নাইট চিত্রশিল্পীরূপে বিশেষ সম্মান অর্জ্জন করেছেন। আমাদের দেশেও শ্রীমতী সুনয়নী দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী ও অনেক তরুণী শিল্পীর রচনায় আমাদের শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে —বারান্তরে সে-কথা আলোচ্য। ভারতবর্ষের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সম্প্রতি যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন

ভারতমাতা

ভিখারী

শ্রীমতী অমৃত শেরগিল

সেই শ্রীমতী অমৃত শেরগিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে আলোচ্য।

পঞ্জাবের এক সমৃদ্ধ ও অভিজাত পরিবারে ১৯১৩ সালে শ্রীমতী শেরগিলের জন্ম। উত্তরজীবনে যাঁরা শিল্পীরূপে বিখ্যাত হয়েছেন, সাধারণত বাল্যেই তাঁদের শিল্পানুরাগ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়; শ্রীমতী শেরগিলের বেলাও তার ব্যত্যয় হয় নি। চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৯২৪ সালে তাঁর পিতামাতা তাঁকে ফ্লোরেন্সে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর কাছে নীরস মনে হয়েছিল, তাই অল্পদিন পরেই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সালে শ্রীমতী শেরগিল শিল্পশিক্ষার জন্য পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন ও প্যারিসে গিয়ে গ্রাঁ শোমিয়ের প্রতিষ্ঠানে পিয়ের ভাইয়াঁর শিক্ষাধীনে কিছুকাল থাকেন এবং পরে বিখ্যাত শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একোল দে বোজার-এ অধ্যাপক লুসিয়া সিমোঁর কাছে তিনবৎসর শিক্ষালাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষার্থী। এইখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি ক্রমান্বয় তিন বৎসর চিত্র-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩২ সালে প্যারিসে গ্রাঁ সালোতে শ্রীমতী শেরগিলের "মূর্ত্তি" চিত্র প্রদর্শিত হয় ও শিল্প-সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পর বৎসর তাঁর "তরুণী" চিত্র প্রদর্শিত হ'লে তিনি গ্রাঁ সালোর সদস্যপদে মনোনীত হন—এই পদে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কলা-প্রতিষ্ঠানেও তিনি চিত্র প্রদর্শন করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে শিল্পচর্চ্চা করছেন।

শ্রীমতী শেরগিলের যে-চিত্রগুলি মুদ্রিত হ'ল তার মধ্যে তাঁর চিত্রকলার ক্রমপরিণতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। "মূর্ত্তি" ও "তরুণী" চিত্র, অঙ্কনরীতি, বিষয়বস্তু ও ভাবে, সম্পূর্ণই বিদেশী; তাঁর অন্যান্য চিত্রে তাঁর স্বকীয়তা পরিস্ফুট। ভারতবর্ষের জীবনের নানা দৃশ্যই বর্ত্তমানে তাঁর চি[illegible] উপজীব্য। ভারতবর্ষের দুঃখদৈন্যের রূপটিই [illegible] আধুনিক চিত্রে বিশেষ ক'রে পরিস্ফুট হয়ে উঠে[illegible] সমৃদ্ধির মধ্যে পালিত হয়েও শ্রীমতী শেরগি[illegible] নারীচিত্তকে দেশের এই দৈন্যপীড়িত রূপটি বি[illegible] ভাবে স্পর্শ করেছে। অঙ্কনপদ্ধতি যে-দেশেরই হে[illegible] তার ভাববস্তুর সঙ্গে যদি দেশের হৃদয়ের স্পর্শ না [illegible] তা হ'লে যে কোন শিল্পসাধনাই সার্থক হ'তে পারে না, [illegible] তিনি জানেন এবং তাই জ্ঞানতই তিনি চিত্রপটে দে[illegible] বেদনাময় করুণ দিকটাকেই রূপায়িত করে তুলবার [illegible] নিয়েছেন।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৭

পর দিন সঙ্গে লোক লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। এই নির্জ্জন বনস্পতিহীন দেশে, কোসী নদীর ক্ষীণধারা ধারা চারিদিকের মৃত্তিকাময় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বহিতেছিল। স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত গৃহ ও গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গেল, কোন-কোনটার বাহিরের দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। মনে হয়, পর্ব্বকালে এই উপত্যকায় বিস্তৃত লোকবসতি ছিল, নদীর ধারাও নিশ্চয় এখন অপেক্ষা অনেক পুষ্ট ছিল, নহিলে এত ক্ষেতের সেচ চলিত কি প্রকারে? আগের গ্রামে শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্ব বৎসর এই থোঙলার পথে দুইজন যাত্রীকে কাহারা খুন করিয়াছিল। ভোটদেশে মানুষের প্রাণের মূল্য কুকুরের অপেক্ষাও কম, রাজদণ্ডের ভয়েও লোকের প্রাণরক্ষা হয় না। সুমতি-প্রজ্ঞ এ-বিষয়ে বিস্তর মন্তব্য করিলেন।

উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতেছিল, এইভাবে আমরা গিরিসঙ্কটের নীচে লঙসেতে (বিশ্রামের স্থল) পৌঁছিলাম। সেখানে পাহাড়ের ওপার হইতে আসিয়া কতকগুলি লোক চা প্রস্তুত করিতেছিল। পথচলার কালে ভোটদেশে ভাথী (হাত-পাখা ও কলা জাতীয় বাতাস করিবার উপায়) অত্যাবশ্যক জিনিষ, ইহার সাহায্য ব্যতীত ভিজা ঘুঁটে ইত্যাদি দ্বারা আগুন জ্বালানো অসম্ভব। আমাদের ভাথী ...ল না, সুতরাং আমরা অন্য আগন্তুকদের চায়ের সঙ্গে ...াদের চা মিশাইয়া দিলাম। ঘোড়াগুলিকে চরিতে ...য়া দেওয়া হইল এবং আমরা চা ও গল্পে জমিয়া গেলাম, ...ঙ লা (গিরিসঙ্কট) এখন তুষারশূন্য। লোকগুলির ...বর্ণ পুরাণো তামার মত, তিব্বতের উচ্চঘাটপথে ...র সময় শরীরের যে-অংশ অনাবৃত থাকে তাহা ঐরূপ ...খা হয় এবং সেই রং প্রায় দেড় সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। ...শার ঘোড়ার পিঠে যাত্রারম্ভ করা গেল, এবার চড়াই খুব বেশী নহে কিংবা অন্যের পিঠে থাকার দরুণ তত বেশী মনে হয় নাই। ঘাটের পথ ক্রমই সরু হইতে থাকিল, শেষে নদীর ধার মাত্র রহিল যাহারও স্থানে স্থানে—কোথাও বা অনেকখানি—পুরাণো বরফের স্তরে ঢাকা ছিল। পথ নদীর এপার-ওপার হইয়া শেষে দক্ষিণ পার্শ্বের পর্ব্বতের গায়ে গোলকধাঁধার চক্রের মত বক্রভাবে উপরে চলিল। ঘোড়াগুলি মাঝে মাঝে নিজে নিজেই থাইতেছিল, কারণ এত উপরে হাওয়ার স্তর অত্যন্ত পাতলা। শেষে অদূরে কালো সাদা পীতাভ কাপড়ের পতাকা দেখা গেল, বুঝিলাম লার শিখর নিকটেই। ভোটদেশে প্রত্যেক লা কোন দেবতার স্থান, সুতরাং দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য লার শিখরের কাছে লোকে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়ে। আমরাও নামিলাম এবং সুমতি-প্রজ্ঞ ও অন্য ভোটিয়েরা 'শো শো শো' বলিয়া দেবতার জয়ধ্বনি করিলেন। শিখর হইতে সুদূর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত হিমাচ্ছাদিত হিমালয়ের পর্ব্বতমালা দেখা গেল। অন্যদিকেও পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সেগুলি তুষারমণ্ডিত নহে, তবে উপত্যকার আশেপাশে স্থলে স্থলে বরফ ছিল। আমার ঘোড়াটি ছিল অলস, তাহাকে প্রহার করা আমার দ্বারা হইল না, সুতরাং আমি সকলের পিছনে পড়িলাম। পথে লোকজন নাই, মাঝে মাঝে আশেপাশের বসতি হইতে পথের ঠিকানা লইতে লইতে, অন্যদের প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পরে আমি লঙ্কোর পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার দেরী হওয়ায় সুমতি-প্রজ্ঞ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন।

লঙ্কোর ডিঙরীর বিশাল উপত্যকার শিরোভাগস্থিত ছোট গ্রাম। এখানকার গুম্বা (বিহার) এককালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, 'তঞ্জুরে'র কিয়দংশ এখানেই সংস্কৃত হইতে ভুটিয়া ভাষায় অনুবাদিত হয়। (বৌদ্ধ ত্রিপিটকের তিব্বতী অনুবাদের নাম 'কঞ্জুর' এবং তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং ঐ

আমাদের সামনে চা ও সত্তুর পাত্র রাখা হইল, আমার সত্তুতে রুচি ছিল না, কেবল চা পান করিলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া দেখিলাম শেকর্ গুম্বার জায়গীরের আয়ব্যয় হিসাব চলিয়াছে। মুনিম-মহাশয় হাড় ও প্রস্তরখণ্ড গুনিয়া রাখিতেছেন এবং পুনর্ব্বার গুনিয়া সেগুলি পৃথক পৃথক পাত্রে সাজাইতেছেন। তাঁহার এই হিসাবের ধরণ আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকিতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐরূপ হিসাবের প্রণালী শিখিতে বেশ কিছুদিন লাগে, সন্দেহ নাই।

চা-পানের পর আমরা দ্বিতলে ভিক্ষু নম্-সের নিকট গেলাম। তিনি পরম আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আজ বিশেষ পূজায় ব্যস্ত ছিলেন, পূজাকক্ষ মূর্ত্তিতে ও তোমা-য় (সত্তু ও মাখনের নানাবর্ণ বলিপিণ্ড) সুসজ্জিত ছিল। তিনি আবার চা পান করিতে অনুরোধ করায় সুন্দর গঙ্গা-যমুনা (তাম্রের উপর রৌপ্য) থালের উপর আসল চীনা পেয়ালায় চা আসিল এবং আমরা গ্রহণ করিলাম।

আমার কক্ষে কঞ্জুরের পুস্তকাগার ছিল, সেখানকার এক প্রাচীন হস্তলিখিত কঞ্জুর আমি খুলিয়া দেখিতেছিলাম। এই মহামূল্য গ্রন্থ শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহার এক-এক ওজন খণ্ডের দশ সেরের অধিক। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "তোমাকে যদি এই পুস্তক দেওয়া হয়, তবে তুমি কি ইহা লইয়া যাইবে?" আমি বলিলাম, "অতি আনন্দের সহিত।"

সুমতি-প্রজ্ঞ প্রথম দিনই বলিয়াছিলেন যে, এই গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং সেইজন্য আমাকে দুই-এক দিন থাকিতে হইবে। পরদিন সেই কাজে তিনি বাহির হইলেন, আমি পুস্তক দেখা ও অল্পস্বল্প পড়ায় ব্যস্ত হইলাম। দ্বিপ্রহরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজই যাত্রা করিতে হইবে, সুতরাং সেই দিন ৮ই জুন দ্বিপ্রহরের পর আমরা দুই মাইল দূরে তিঙ্‌রীর মুখে চলিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, পুরানো জোঙ-পোন (জিলাধীশ) তাঁহার পরিচিত, সুতরাং তাঁহার গৃহেই থাকিবেন। আমি ইহাতে বাধা দিতে তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় কিসের? এখানে কেহই তোমায় গ্য-গর-পা (ভারতীয়) বলিয়া চিনিবে না।" তিঙ্‌রী পর্ব্বতমালা হইতে বিচ্যুত একটি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর একটি প্রাচীন কেল্লা বে-মেরামত অবস্থায় আছে যাহাতে এখনও কিছু সৈন্য থাকে। এই পর্ব্বতমূলেই তিঙ্‌রী গ্রাম, গ্রামের আয়তন কুতী অপেক্ষা অধিক। এখানে নেপালী দোকান-পাট নাই, তবে পূর্ব্বেকার চীনাদের সন্তানেরা এখনও কেহ কেহ এখানেই আছে। পুরানো জোঙ-পোনের গৃহ গ্রামের এক প্রান্তে, আমরা সেখানেই গেলাম। তিনি সুমতি-প্রজ্ঞকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার পিঠের বোঝা নামাইলেন, পরে তাঁহার চাকরেরা আমার বোঝাও নামাইয়া লইল। সেই অঙ্গনেই গালিচা বিছানো হইল, সঙ্গে সঙ্গে গরম চায়ের পাত্র ও ছুরি সুদ্ধ শুকানো মাংসও হাজির হইল। আমার সম্বন্ধে জোঙ-পোন মহাশয় কেবলমাত্র এই প্রশ্ন করিলেন, "ইনি ত লদা-পা (লদাখ-বাসী) না?" এই বলিয়া তিনি নিজের হাতে শুকানো মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। আমি সে মাংস খাইতে অসম্মত হওয়ায় সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "ও সবে মাত্র দেশ থেকে এসেছে, লদাখে সিদ্ধ না করিয়া (অর্থাৎ না রাঁধিয়া) মাংস খাওয়া হয় না।" মাংস খাওয়া শেষ হইতে হইতে নূতন জোঙ-পোন মহাশয় আসিলেন এবং তাঁহার জন্য রূপার পাত্রে মদ আনা হইল। আমার সম্বন্ধে কি করিয়া সন্দেহ হইতে পারিত যে আমি সেই ভারতীয়দের দলে যাঁহাদের অনেক বন্ধুবান্ধব ভোটিয়দের আতিথ্যের অসদ্ব্যবহার এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদের নিকট তিব্বতের গুপ্ত রাজনৈতিক ব্যাপার সকল ব্যক্ত করিয়াছিল? যে কারণে এখন ভোটিয়দের সর্ব্বদাই তাহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ভূমির অধিবাসীদের সম্বন্ধে আশঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

আমাদের গৃহস্বামী বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পেয়ালার পর পেয়ালা চলিতে লাগিল। লোকে বলে, "কারণ"ই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্নীসহ বীণা বাজাইতে বাজাইতে মিত্রগোষ্ঠীমিলনে চলিলেন, চাকরদের উপর আমাদের ভোজন শয়নের ব্যবস্থা করার আদেশ হইল। আমার শয়নস্থল পাকশালাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল, সেখানকার তত্ত্বাবধান এক অনীর (ভিক্ষুণী) উপর অর্পিত ছিল। ভোটদেশে পরিবারের সকল ভাই মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করাই প্রথা, এই জন্য সকল স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্ভব নহে এবং অবিবাহিতাদের মধ্যে অনেকে চুল কাটাইয়া অনী হইয়া, হয় মঠে আশ্রয় লয়, নয় ঘরে থাকিয়া যায়। আমাদের এই অনী সাক্ষাৎ মহাকালী ছিল, শরীরের উপর এত পুরু কাল কাজলের স্তর ইহার পূর্ব্বেও আমি কাহারও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই। ঐ কালো মুখমণ্ডলে চক্ষুর শ্বেত পরিবেষ্টিত রক্তাভ দৃশ্য বর্ণনার অতীত। দেখিলাম থুক্‌পা-পাকের সময় হাতায় করিয়া নিজের হাতে তাহা ঢালিয়া সে লবণ পরীক্ষার জন্য চাখিয়া দেখিল, এবং তাহার পরই পরনের চোগায় হাত মুছিল! এইমাত্র রক্ষা যে, তিব্বতে ভোজনসামগ্রীর দেওয়া-নেওয়া বা তৈয়ারী করা সবই হাতা-চামচে চলে, হাতে ছোঁওয়ার ব্যাপার খুবই কম।

থুক্‌পা-চা পানভোজনে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তত ক্ষণ গৃহস্বামী বীণা বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া আমাদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ কথায়-কথায় লাসা যাইতে বলায় তিনি বলিলেন "কি করি, চাম (চাম-কুশোক=উচ্চশ্রেণীর মহিলা) যাইতে রাজী নহেন।" পরে কিন্তু আমি লাসায় থাকিতে থাকিতেই এই

দম্পতি ভোটীয় নববর্ষের সময় লাসায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা ছিলেন সাধারণ পরিচ্ছদে, কেননা লাসায় অনেকেই রাজপুরুষের লোলুপদৃষ্টির ভয়ে নিজ অবস্থার কম চালে থাকেন —এবং আমি ছিলাম লাল রেশমে মোড়া পোস্তিন (বহুমূল্য পশমযুক্ত চর্ম্মের পোষাক) ও বুট পরিহিত। পরস্পরকে চিনিবার পর তিনি আমাকে লদাখী বলিয়া সম্বোধন করায় আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলি এবং তাহার আতিথ্যের জন্য বহু ধন্যবাদ দিই। এই ভূতপূর্ব্ব জোঙপোন মহাশয় অনেক খচ্চরের মালিক এবং সেগুলির সাহায্যে কুতী ও লাসার মধ্যে মাল সরবরাহের ব্যাপারে নিযুক্ত। পরদিন আমরা যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি আমাদের আরও দু-চার দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা রাজী না-হওয়ায় তিনি পাথেয় রূপে চা, সত্তু, মাংস চর্ব্বি ও মাখন ইত্যাদি দিলেন। ভারবাহী পাওয়া গেল না, সুতরাং প্রাতরাশের পর বোঝা নিজের পিঠে বাঁধিয়া রওয়ানা হইতে হইল; রক্ষা এই যে পথে চড়াই ছিল না।

আমরা ফুঙ নদীর দক্ষিণ কিনারা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে চলিতেছিলাম, সেদিকে আশপাশের পাহাড়গুলি খুবই ছোট ছোট। কয়েক ঘণ্টা চলিবার পর নদীর বামদিকে শিব্-রী'র পাহাড় দেখা গেল। তিব্বতের অধিকাংশ পাহাড় মাটিতে ঢাকা, কিন্তু এই পাহাড় প্রস্তরময়, এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কিম্বদন্তী আছে যে, এই পাহাড় গ্যা-গর (ভারত) দেশীয়, এবং সেইজন্য ইহা লোকচক্ষুতে অতি পবিত্র। এখন ইহার পরিক্রমার সময়, সুতরাং অনেক যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া পরিক্রমা করিতেছে। এখানকার পরিক্রমায় (পথে) চিত্রকূটের মত স্থানে স্থানে অনেক মন্দির আছে। আমরা আটটায় যাত্রারম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহরে গ্রামে পৌঁছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ চা-পানের যোগাড় করিলাম। একে তো পথশ্রান্ত ছিলাম তাহার উপরন্তু চা-পানে ও গল্পে অনেক দেরী হইয়া গেল এবং ইহাও শুনিলাম যে পরের গ্রাম বহু দূর। এই কারণে আমরা সেখানেই থাকা স্থির করিলাম কিন্তু সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামী জানাইল যে তাহার ঘরে স্থানের অভাব। সে গ্রামের মধ্যে অন্য এক বাড়ীতে আমাদের পাঠাইয়া দিল, সেখানে মাত্র দুইটি কক্ষ। একটিতে এক ভিখারী রোগশয্যায় পড়িয়াছিল, সুতরাং অন্যটিতে আমরা আশ্রয় লইলাম। অন্ধকার হইবার মুখে সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, "আমাদের এখানে থাকা ভাল নয়; এ-গ্রাম চোরে ভর্ত্তি, সুতরাং রাত্রে টাকাকড়ির লোভে আমাদের উপর আক্রমণ হইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব যে এই কারণেই আমাদের এখানে চালান করা হইয়াছে। আমি এ-কথায় আপত্তি না করিয়া সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে গিয়া গ্রামের মধ্যে এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় লইলাম। সেই গৃহে আরও দুইজন অতিথি ছিলেন। তাঁহারা শিব্-রী পরিক্রমা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছিলেন। এবার খুব ভীড়, তাঁহাদের কাছে এই কথা শুনিয়া সুমতি-প্রজ্ঞের মনও পরিক্রমার জন্য উন্মুখ হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "এইবার সোজা লাসায় চলুন, সামনের বৎসরে আমরা দুইজনেই নিশ্চিন্তমনে পরিক্রমা করিতে আসিব।" সেই সঙ্গে আমি আগন্তুকদের একজনকে কিছু পয়সা দিয়া বলিলাম যে তাহা যেন আমাদের তরফে শিব্-রী রেন্-পো-সে-কে নিবেদন করা হয়। এই গ্রামে একটি অতি সুন্দর পিত্তলের বজ্রযোগিনী মূর্ত্তি দেখিলাম, শুনিলাম ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, যখন লোকে চারি দিকে পলাইতেছিল, এই গ্রামবাসী কোন ভোটীয় সিপাহী ইহা লুট করিয়া আনে। বস্তুতঃ ঐ যুদ্ধে ইংরেজের সেনা অপেক্ষা ভোটীয় সেনাই বেশী লুটপাট করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া হইয়া আমরা দশটার সময় সম্মুখস্থ গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে প্রথম যে-গৃহে গেলাম তাহা সুমতি-প্রজ্ঞের পছন্দ না-হওয়ায় তাহার পরিচিত লোকের ঘরে যাইতে হইল। এই গ্রামে অনেক বড় বড় কুকুর ছিল এবং যেখানে আমরা আশ্রয় লইলাম সেখানে এক বিশালকায় কালো কুকুর দ্বারে বাঁধা ছিল। আমাদের সঙ্গে এক বালক আগে আগে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল তাহার পর সুমতি-প্রজ্ঞ এবং শেষে আমি ছিলাম। আমাদের দেখিবামাত্র কুকুরটা ডাকাডাকি ও লাফালাফি আরম্ভ করিল, কাছে যাইতে সে ঝটকা দিয়া শিকল ছিঁড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুমতি-প্রজ্ঞ অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল, ইতিমধ্যে বাড়ীর লোকজন আসিয়া পড়ায় তিনি রক্ষা পাইলেন। শিকল ছিঁড়িয়াছে দেখিয়া বালক ও আমি বাহিরে পলায়ন করিলাম, পরে ঘরের লোকজন আসিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল। আমাদের পলায়নে সুমতি-প্রজ্ঞ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন বটে—এবং বিরক্ত হওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল—কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল যে তিনি চৌদ্দ বৎসর ভোটদেশে থাকায় কুকুর সম্বন্ধে নির্ভয়তা পাইয়াছেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, দেহের অনুপাতে কুকুরের সাহস বা তেজ হয় না।

গোয়ালিয়রের নবাভিষিক্ত মহারাজা জিয়াজী রাও শিন্দে

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক কলিকাতা আশুতোষ হলে "পরিশোধ" নৃত্যাভিনয়ে অভিনয়মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ
[শ্রীরামনারায়ণ সিং কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র ও তাঁহার সৌজন্যে মুদ্রিত]

শ্যামা : "কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি···এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে ?"

বজ্রসেন : "অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে নই আমি নই চোর।"
[শ্রীরামনারায়ণ সিং কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র ও তাঁহার সৌজন্যে মুদ্রিত]

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত "লেখন"

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধলেখা এবং দেশের দাবী মেটাবার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্ব-লেখন (autograph) দেবার যে দাবী আসে প্রতিদিন, তাকে নেহাৎ ছোট ব'লে উপেক্ষা করা চলে না। শুধু স্বাক্ষর দিয়ে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, সেই সঙ্গে কবিতাও চাই দু-চার লাইন। এই দুরন্ত দাবীর ফলে কত ছোট ছোট কবিতা যে রচিত হয়েছে, তার কোন হিসেবই নেই। তার মধ্যে মাত্র কতকগুলি "লেখন" নামক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। "লেখনে"র ভূমিকায় কবি বলেছেন—

"পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তার পরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলো জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে কেন, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে।"

এই "দ্রুতলিখিত ভাব"গুলি বাংলা-সাহিত্যে পরম উপভোগ্য বস্তু হিসাবে চিরকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকবে।

বড় বড় ঘটনার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব্যাপারে অনেক সময়েই লোকের চরিত্র বেশী প্রস্ফুট হয়। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সামান্যকে সামান্য ব'লে তুচ্ছ করা যায় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই কথাটি প্রযোজ্য। কবির নিজের ভাষায় বলতে গেলে, "স্বল্প সেও স্বল্প নয় বড়োকে ফেলে ছেয়ে"। রসসৃষ্টির জন্য সব সময়ই যে বৃহৎ আয়োজন করতে হয়, এমন নয়, ইতস্তত-ছড়ানো টুকরো লেখাতে "দ্রুতলিখিত ভাবে"র ভিতর দিয়েও কবি আপনার সুস্পষ্ট পরিচয় রেখে যান। রবীন্দ্রনাথের ছোট লেখাগুলি পড়লেই এর সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই ছোট ছোট কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য এদের এত ভাল লাগে। এখানে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কথার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ভাববিস্তারের সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। সকল রকম বাহুল্য অলঙ্কার আড়ম্বরের লোভ পরিপূর্ণভাবে বর্জন ক'রে অত্যন্ত সংক্ষেপে শুধু মর্ম্মগত রসটি দেওয়া চাই। এইরূপ বন্ধনের মধ্যে লেখককে সফল হ'তে হ'লে তাঁর অত্যন্ত পাকা হাত, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং গভীর অনুভূতি থাকা চাই, নতুবা রচনাগুলি শুষ্ক তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা। রবীন্দ্রনাথের লেখনগুলি যে এই পর্য্যায়ে পড়ে না, সে-কথা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না, হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে, কবিতাগুলির মধ্যে একটি অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা আছে। কথা তার সীমাকে অত্যন্ত সহজে ছাড়িয়ে গেছে, পড়লেই মনে হয় যে, যা বলা হয়েছে, আসলে যেন বলা হ'ল তার চেয়ে অনেক বেশী।

মিলন নিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নাই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

তিন লাইনের ছোট একটি কবিতা, কিন্তু এর গুটিকয়েক কথা আমাদের মনে যে-ছবি এঁকে দেয়, তার সৌন্দর্য্য এবং অন্তর্লীন ভাবাবেগের যেন আর শেষ নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে আজ পর্য্যন্ত কত জায়গায় কত লোকের অটোগ্রাফের খাতায় এই ধরণের কত ছোট ছোট কবিতা যে লিখে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সে-গুলিকে একত্র সংগ্রহ করতে পারলে নিঃসন্দেহ সকলেরই উপভোগ্য হ'ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "লেখন" প্রকাশ ছাড়া এরূপ প্রচেষ্টা আর কখনও হয় নি। সম্প্রতি এই জাতীয় তাঁর কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, পাঠকবর্গকে তারই পরিচয় দিতে চাই।

খ্যাতনামা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ও লেখন সংগ্রহ ক'রে অটোগ্রাফের খাতা বোঝাই করা ইদানীং একটা নেশা ও সংস্কারগত অভ্যাসের মত অনেকের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে।

কথার মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের এই দীন প্রার্থনা যে কবিচিত্তকে স্পর্শ করেছে, তার পরিচয় পাই অনেক জায়গায়—

নামাবলীর খাতা তোমার বচন জড়ো করে,
স্বাক্ষরিতের কোন্ পরিচয় থাকে তাদের মাঝে।
অলস হাওয়ায় অশোক ফুলের পাপড়ি ধূলায় ঝরে,
তাই কুড়িয়ে লাগাও কেন সাজি ভরার কাজে।

শুধু অক্ষর ডোরে
নাম কি রাখিবি ধ'রে,
নামজাদা হব খাতার পাতায়,
কে রবে সে আশা ক'রে?

বাজে কথার মুষ্টিদানের লাগি
কেন সবার দ্বারে বেড়াও মাগি।

লেখা আসে দলে দলে, বসে তার মেলা
কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ করে খেলা।
আখরেতে বাসা বাঁধে ভাষা দিয়ে গাঁথা।
যে লেখে সে কোথা থাকে পড়ে থাকে খাতা।

বাজে কথার ঝুলি,
যতই কেন ভর্ত্তি কর
ধূলিতে হয় ধূলি।

রেখে দেবার নয় যা তারে রাখো
তা নিয়ে মিছে আমারে কেন ডাকো।
খাতার পাতে আমার নাম ধরে
বাঁধিতে চাও ক্ষীণ স্মরণ-ডোরে।

এই খাতাখানা নামের ভিড়ের মাঝে
পাতে অঞ্জলি অক্ষর ভিক্ষার
এ নিরর্থক সঞ্চয়নের কাজে
জমা করিতেছে কেন এত ধিক্কার!

নানা লোকের নানা নামের
নানা লেখার মধ্যে
আমার লেখার কবর দিলেম
দুই লাইনের পদ্যে।

খাতার পাতায় নামের বিষম ভিড়,
সেথা কোথা পাবো নামের নিভৃত নীড়।

হেমন্তের শুষ্কপাতা
বসন্তে কি দেয়না উড়ায়ে
ঝরে-পড়া বাক্য যত
রাখিবে কি খাতায় কুড়ায়ে?

ব্যর্থ আবর্জ্জনার তরে
লোভ রাখিতে নাই
তুচ্ছ যাহা তাহার ভিড়ে
সত্য না পায় ঠাঁই।

কথা কুড়িয়ে খাতার পাতা ভরা
সত্য নিয়ে এ শুধু খেলা করা।

নিতেছ কুড়িয়ে যা'-তা',
কথার আবর্জ্জনায় কেবলি
ভরিয়ে তুলিছ খাতা,
এ কেমন খেলা হোলো,
বুদ্বুদগুলো জড়ো ক'রে ক'রে
ফেনা উঁচু ক'রে তোলো।

জীবনপথের তরুণ যাত্রী যখন এসে কাছে দাঁড়ায়, তখন কবির মনে পড়ে যায়, আজ তিনি জীবনের সায়াহ্নে উপনীত, এই মাটির বাসার ভিৎ তাঁর ভাঙ্‌ছে, সেতারে যে সুর ধরেছিলেন, আজ তা থেমেছে শমে এসে—

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিৎ,
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার জিৎ।

তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি শমে এসে।
চক্ররেখা পূর্ণ হোলো
আরম্ভে আর শেষে।

এই লেখনগুলি যারা দাবী করে, তাদের নাম বা নামের অর্থ থেকে কতকগুলির উৎপত্তি—

হৃদয়ে লতায়ে আছে
নীরব মি ন তি
ফুটাক পূজার ফুলে
করুণ বিনতি।

নিরুদ্যম অবকাশ শূন্য শুধু
শা ন্তি তাহা নয়,
যে কর্ম্মে রয়েছে সত্য
তাহাতে শান্তির পরিচয়।

জীবন-দেবতা তব হে গৌ রী, তোমার দেহে মনে
আপন পূজার ফুল আপনি ফুটাক সযতনে।
মাধুর্য্যে সৌরভে তারি দিবারাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি, এই আমি আশীর্ব্বাদ করি।

র্ষণ হ'ল বটে শ্রান্ত
পাণ্ডুর কৃশ মেঘ ক্লান্ত,
বন ছেড়ে মনে এল নী প -রেণু-গন্ধ
অধিকার ক'রে নিল কবিতার ছন্দ।

আপনারে নি বে দ ন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্ত্তি লভে।

মাধবী নিজেরে দেয় রূপে, গন্ধে, বর্ণ-মহিমায়,
নিজেরে-সুন্দর ক'রে পায়।

রবির প্রথম স্বাক্ষর-করা বাণী
পূর্ব্ব গগনে অ রু ণ দিয়াছে আনি।
সোনার আভাসে তরুণ প্রাণের আশা
প্রভাত আকাশে প্রকাশিল তার ভাষা।

তপনের অরুণ সারথি
শুভ্র দীপ্তি-পারাবারে
লুপ্ত করে আপনারে
শেষ করি উষার আ র তি।

যা পায় সকলি জমা করে,
প্রাণে এ লী লা রাত্রিদিনি
কালের তাণ্ডবলীলাভরে
সমলি শূন্যেতে হয় লীন।

শা ন্তা, তুমি শান্তি নাশের ভয় দেখালে মোরে,
সই-করা নাম করবে আদায় ঝগড়া করার জোরে?
এই তো দেখি বঁটি হাতে শিউলিতলায় যাওয়া
আপনি যে ফুল ঝরিয়ে দিল শরৎপ্রাতের হাওয়া।

শান্তা নামক উপরিউক্ত মেয়েটি কবিকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছিল যে, অটোগ্রাফ না দিলে সে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করবে। শান্তিপ্রিয় ভীরু কবির বশ্যতা-স্বীকারের কাহিনী চিরকালের মত মুদ্রিত হয়ে রইল শান্তা নামক বাংলা দেশের একটি মেয়ের খাতায়।

কৌতুকচ্ছলে লেখা একটি ছোট্ট কবিতা—

নাম কারো লেখা নাই অজানা খাতায়,
মোর নাম লিখিলাম তাহারি পাতায়।

আশীর্ব্বাদী কবিতাগুলির যে মহান্ গাম্ভীর্য্য এবং গভীরতা, তা অতুলনীয়—

অনিত্যের যত আবর্জ্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হ'তে প্রতিক্ষণে করিয়ো মার্জ্জনা ।

জীবনে তব প্রভাত এল নব অরুণ-কান্তি,
তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক শিশিরে ধোওয়া শান্তি ।
মাধুরী তব মধ্যদিনে শক্তিরূপ ধরি
কর্ম্মপটু কল্যাণের করুক দূর ক্লান্তি ।

জ্বালো নবজীবনের নির্ম্মল দীপিকা,
মর্ত্যের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা ।
আঁধার গহনে রচো আলোকের বীথিকা,
কল-কোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা ।

ভজন-মন্দিরে তব পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে কোরো না অপমান ।
যে ঈশ্বরে ভক্তি কর হে সাধক, মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ ।

বাহিরের আশীর্ব্বাদ কি আনিব আমি
অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিন্ অন্তর্য্যামী
পথিকের কথাগুলি
লভিবে পথের ধূলি
জবন করিবে পূর্ণ জীবনের স্বামী ।

জন্মদিনে লিখে দিয়েছিলেন দু-জনকে—
জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য,
রূপ মহিমায় হোলো মহীয়ান সূর্য্য তারার তুল্য ।
দূর আকাশের পথ যে আলোক এনেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখে তোমারে বেঁধেছে সখ্যে,
দূর যুগ হ'তে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানী তোমার দিবস-রাত্রি ।

জন্মদিনে রহিল নাম লেখা,
মৃত্যুপটে রবে কি তার রেখা ?

কবিতার অর্ঘ্য পেয়ে উৎসারিত হয়েছিল দুটি কবিতা—
আমার আপন ভালো লাগায়
রচি আমার গান,
তুমি দিলে তোমার আপন
ভালো লাগার দান ।
মোর আনন্দ এমনি ক'রে
নিলে আঁচল পেতে
তোমার আনন্দেতে ।

সঙ্গীতের বাণীপথে
ছন্দে গাঁথা তব নমস্কৃতি
জাগাল অন্তরে মোর
প্রেমরসে অভিষিক্ত গীতি ।
বসন্তে কোকিল গাহে
অলক্ষিত কোন্ তরুশাখে
দূর অরণ্যের পিক
সেই সুরে তারে ফিরে ডাকে ।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে, তার আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের বিচিত্র প্রকাশকে যে অন্তরের সঙ্গে কত ভালবাসেন, তার অজস্র প্রমাণ "স্বর্গ হইতে বিদায়" প্রভৃতি বড় বড় কবিতাতে আছে, কিন্তু এখানেও সে পরিচয়ের অভাব নেই—

সময় আসন্ন হোলে
আমি যাব চলে,
হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তের আনন্দের আশা রাখিলাম,
আমি হেথা নাই থাকিলাম ।

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
স্বর্গের হারে আঁকা,
আমি ভালবাসি মাটির ধরায়
প্রজাপতিটির পাখা।

প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তাবোধ কবি রবীন্দ্রনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টিতে যা অতি-সাধারণ একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাকে তিনি এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন যে, মনে হয়, তার মর্ম্মকথা, তার অন্তর্নিহিত রহস্য সব ধরা পড়ে গেল। প্রকৃতির গোপন কক্ষে যে-সব রসের খেলা চলছে, তিনি ইসারায় তার ইঙ্গিতটুকু দিয়ে যান—

হাসিমুখে শুকতারা লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী আঁধারের শেষপাতে।

কহিল তারা জ্বালিব আলোখানি
আঁধার দূর হবে না-হবে,
সে আমি নাহি জানি।

এগুলি ছাড়া মনুষ্যজীবনের নানা গভীর তত্ত্ব অত্যন্ত সহজে দু-চার লাইনে ফুটিয়ে তোলার দৃষ্টান্তও আছে—

বাহির হ'তে বহিয়া আনি সুখের উপাদান,
আপনা মাঝে আনন্দের আপনি সমাধান।

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
সুখ-অবসানে আসে
সম্ভোগের সীমা,
দুঃখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

The darkness which conceals
brother's face
Conceals one's own true self.

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

কি পাই কি জমা করি
কি দেবে, কে দেবে,
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চলে ত যেতেই হবে,
কি যে দিয়ে যাব,
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবো।

যা রাখি আমার তরে, মিছে তারে রাখি,
আমিও র'ব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু র'বে
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।

আজ গড়ি খেলাঘর কাল তারে ভুলি,
ধূলিতে যে লীলা তারে মুছে দেয় ধূলি।

জীবন সঞ্চয় করে যা তাহার শ্রেয়
মরণেরে পার হবে এই সে পাথেয়।

লেখনগুলির ব্যঞ্জনা-শক্তির কথা পূর্ব্বে বলেছি। এখানে তার একটি অতুলনীয় নিদর্শন রয়েছে—

দিল ফাঁকি,
তবু রাখি আশা,
গেল পাখী,
তবু বাকি বাসা।

কবির চির-নবীন অন্তরে বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা কোন দিন ছায়াপাত করতে পারে নি। কিন্তু এই "নবীন" যে ধ্রুব, প্রশান্ত এবং সংযত, ক্ষণস্থায়ী "নূতনে"র উন্মাদনা তাতে নেই, একটি ছোট্ট কবিতাতে তা পরিস্ফুট হয়েছে—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্ত্তমান সেই ত নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের চির-সুধা তৃপ্তি করে পুরা।

রূপে ও অরূপে গাঁথা এই ভুবনের আঙিনায় যেখানে ছবি ও গানের নিত্য কানাকানি চলছে, কবি সেখানে বসে আছেন কোন্ ধ্যানে মগ্ন হয়ে, ছন্দের সঙ্গীতে তিনি কোন্ গোপন কথাটি ঝঙ্কৃত ক'রে তুলতে চান, তার আভাস পাই আমরা কয়েকটি কবিতায়—

রূপে ও অরূপে গাঁথা এ ভুবন খানি
ভাবে তারে সুর দেয়, সত্য দেয় বাণী।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা নিত্য কানাকানি।

আকাশে বাতাসে ভাসে, অতলের নির্জ্জনে নির্ব্বাকে
গুপ্ত রহে, পাই নাকো ছুঁতে,
ছন্দের সঙ্গীতে তারে ধরিবারে কবি ব'সে থাকে
ধরা যাহা দেয় না কিছুতে।

ক্লান্ত মোর লেখনীর এই শেষ আশা
নীরবের ধ্যানে তার ডুবে যাবে ভাষা।

বহিয়া কথার ভার চলেছি কোথায়,
পথে পথে খ'সে পড়ে হেথায় হোথায়.
পথিকেরা কিছু কিছু লয় তাহা তুলি
বাকি কত পড়ে থাকে, লয় তাহা ধূলি

প্রকাশ যখন সফলতায় সার্থক, তখন তা সহজেই আমাদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার প্রারম্ভ থাকে ক্ষীণ, অসম্পূর্ কিন্তু পূর্ণতার জন্য যে অশান্ত ক্রন্দন তার বুকে গোপে উচ্ছ্বসিত, কবি তাকে আপন মনে অনুভব করতে চান, যদি আমাদের মনোযোগ সহজে সেদিকে যায় না। ধরণীর আন ও প্রাণের উৎস সঞ্চিত আছে সূর্য্যালোকে, রবির আশীর্ব্বা কুঁড়িকে ফোটায় ফুলে, অঙ্কুরকে উদ্ঘাটিত করে বনস্পতিরূপে কবি রবীন্দ্রনাথও কি তাঁর আকাশের মিতার মত আপ অসীম অনুভূতির আলোক ও জীবনীশক্তি দিয়ে মানুষে প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তার উদ্ভিন্ন শতদলে বিকশি ক'রে তুলতে চান ?

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্ব্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্ব্বাদ আনে।

ফুলের কলিকা প্রভাত-রবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রি দিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন
সে তুষার নির্ঝরিণী রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।

কল্লোল-মুখর দিন ধায় রাত্রিপানে
উচ্ছল নির্ঝর চলে সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল পেতে চায় ফল
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে চলিছে চঞ্চল।

খেয়াল হ'লে কবি যে আবার অন্যের কবিতা অনুবাদ করতেও বসেন, তার দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করা যাক—

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।"

নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন,
লক্ষ্মী যবে আসুন বা যথেচ্ছা ছাড়ুন,
মৃত্যু চেপে ধরে যদি অথবা পাসরে
ন্যায্য পথ হতে ধীর এক পা না সরে।

একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ—

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

[রবীন্দ্রনাথের এইরূপ লেখন-সংগ্রহ যাঁহাদের নিকট আছে তাঁহারা আমাদের নিকট তাহা পাঠাইলে উহা সাগ্রহে প্রবাসীতে মুদ্রিত হইবে—প্রবাসীর সম্পাদক]

সুচাঁদ ডাক্তারের বিভূতি

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

ডাক্তার সুচাঁদ অধিকারী খাসা লোক, খাসা ডাক্তার; যেমন তাঁর রোগলক্ষণজ্ঞান, তেমনই তাঁর হাতযশ; তার উপর, মিষ্টমুখে কথা বলা তাঁর এমনই স্বভাবগত রুচি যে, মানুষ তৃপ্ত না হইয়া পারে না—এই গুণের জন্যই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিলেই রোগ-যন্ত্রণার মাঝেও খানিক আরাম পায়। তবে ভিজিট তাঁর চার টাকা—গোঁফ পাকিতেই এবং টাক পড়িতেই তিনি ভিজিট বাড়াইয়া ডবল করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাকে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ করিবার পূর্ব্বে ঐ মত লোকের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হইবার হেতুটা জানান ।

পুনর্ব্বসু সোমের বাবা জন্মেজয় সোম সন্ধ্যার পর হঠাৎ শয্যাগ্রহণ করিলেন। সেদিন অক্ষয়তৃতীয়া—অত্যন্ত শুভ-দিন। কয়েক স্থানে তাঁর শুভ হালখাতার নিমন্ত্রণ ছিল। টানাটানির সংসারে ধারকর্জ্জ হয়ই—হাত পাতিয়া নগদ না পাইলে, কাপড়ের দোকানে, বাসনের দোকানে, গহনার দোকানে হয়ই। লাল রঙের পোষ্টকার্ডে ছাপান নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া জন্মেজয় রং দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন না, খাতার বাকির পরিমাণের যে-উল্লেখ কালো কালিতে করা ছিল সেই দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু হালখাতার নিমন্ত্রণ পাইলে দোকানে উপস্থিত হইয়া কিছু দিতেই হইবে—ইহাই পদ্ধতি, এবং দেনাদারের ধর্ম্মান্তর্গত কর্ত্তব্য। সুতরাং পুঁজির ভিতর হইতে তিনটি টাকা—পুঁজির বৃহৎ একটা অংশ—তুলিয়া লইয়া জন্মেজয় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রওনা হইলেন··· দোকানে বসিয়া বিস্তর সদালাপ মুখে করিলেন এবং কানে শুনিলেন; হাসিলেনও; অবশেষে কিছু জলযোগও করিলেন—

এবং সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ক্লান্ত ভাবে বলিলেন,—শরীরটা ভাল নেই; আমি শুলাম। রাত্রে কিছু খাব না।

জন্মেজয়ের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—একটু দুধ?

—উঁ হুঁ। বলিয়া জন্মেজয় গিয়া শয়ন করিলেন।

নূতন নয়। অসুস্থ মানুষের মত অকস্মাৎ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িতে তিনি যেমন অভ্যস্ত, "ভাল আছি" বলিয়া পরক্ষণেই উঠিয়া পড়িতেও তিনি তেমনই প্রস্তুত।

কাজেই আজ, অক্ষয়তৃতীয়ার সন্ধ্যায়, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলে ব্যস্ত হইবার কারণ কেহ দেখিলেন না।

কিন্তু পূর্ব্বের অসুস্থতার মত তাঁর আজকার অসুস্থতা কাল্পনিক ত নয়ই, অল্পস্থায়ীও নয়—সকালবেলা তাহা জানা গেল, এবং জানিবামাত্র নিঃসন্দেহ হইতে হইল। দেখা গেল, তিনি জ্বরে বেহুঁস হইয়া আছেন।

চিকিৎসার জন্য ব্যস্ততার সহিত ডাকা হইল কবিরাজ মহাশয়কে। ব্যস্ততা যতই থাক্, সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িবে কবিরাজ মহাশয়কেই—কারণ, তিনি সস্তা। দরকারী জিনিষ সস্তায় যেখানে পাওয়া যায়, সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে দৌড়ানই যাহাদের পক্ষে সঙ্গত, জন্মেজয় সগোষ্ঠী তাহাদেরই একজন।

একটি টাকা দিলেই কবিরাজ মহাশয় সন্তুষ্ট হইবেন। অর্থাৎ ডাক্তারীর জাঁক আর চাকচিক্যের তুলনায় তাঁহাকে খাটো করিয়া তুলিয়া লোকে তাঁহাকে উহাতেই সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা দিয়াছে। ভিজিট এবং তখনকার মত ঔষধের মূল্য, এই দুইয়ের বাবদ একটি টাকাই তাঁহার প্রাপ্য।

কিন্তু তাই বলিয়া, অর্থাৎ সস্তা এবং অল্পেই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য বলিয়া মহীতোষ কবিরাজ বিজ্ঞ কম নন্। ...সাদা কাপড় লাগান ছাতাটা চালে টাঙাইয়া তিনি রোগীর কাছে গেলেন, এবং রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—বাতজ পক্ষাবাত। কঠিন রোগ। এখন প্রবল জ্বর রয়েছে—এই জ্বর হ্রাস পাওয়ার সময় সাবধান। স্নায়ুমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে। তবে ওষুধ আমি দিচ্ছি। ভয় কাটলেও কাটতে পারে এ-যাত্রা। ...বলিয়া সুচিন্তিত ঔষধ দিয়া এবং ভিজিট ও ঔষধের মূল্য বাবদ একটি টাকা লইয়া তিনি নিদারুণ নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

খলে মাড়িয়া ঔষধ রোগীর মুখে দেওয়া হইল—রোগী তাহা গলাধঃকরণ করিলেন; কিন্তু কবিরাজের উক্তি যে অত্যুক্তি নয়, আশা যে তিনি দেন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিয়া জন্মেজয়ের আপনার লোকগুলি কত যে ভয় পাইল তাহা বলিবার নয়।

মা বলিলেন,—এই ত কবরেজ দেখে গেল। একটা দিন দেখবি নে?

—যা বল তাই করি।

—আমি বলি দেখ একটা দিন। কবরেজী ওষুধ ত একেবারেই মিথ্যে নয়!...ডাক্তারের যে খরচ ঢের! বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজেদের অপ্রচুর অবস্থাটা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়া সংজ্ঞাহীন স্বামীর দিকে চাহিয়া নিষ্পলক হইয়া রহিলেন...অতঃপর বক্তব্য আর কিছু আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

কিন্তু ডাক্তারকেই ডাকিতে হইল।

মধ্যাহ্নে জন্মেজয় চোখ খুলিলেন; সচেতন দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওষুধ দিচ্ছ নাকি?

গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, জবাব দিলেন গৃহিণীই—মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, ঔষধ দেওয়া হইতেছে।

জন্মেজয় বলিলেন,—আর দিও না...হরিনাম শুনাও।—বলিয়া কিসের জন্য যেন উৎসুক হইয়া তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—পুনর্ব্বসু কাঁদিয়া বাহির হইয়া গেল, রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিলেন।

জন্মেজয় আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; বলিলেন,—আমার শিয়রে ব'সে কে রে?

—আমি।

—অমলা?

—হ্যাঁ, বাবা।

—আর পাখা করিস্ নে। হরিনাম শোনা।

অমলা পাখা বন্ধ করিয়া তার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কেমন বোধ করছ?

জন্মেজয়ের কোন অঙ্গ সাড়া দিল না—প্রশ্নটি তিনি শুনিতেই পান নাই বোধ হয়।

কিন্তু জন্মেজয়কে এই অপরিণত সময়ে হরিনাম কেহ শুনাইল না; পুনর্ব্বসু খরচের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া

সুচাঁদ ডাক্তারের উদ্দেশে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

মাকে বলিয়া গেল,—ডাক্তার আনতে চল্লাম, মা।

তখন বেলা সাড়ে বারটা।

সুচাঁদ ডাক্তারের গোঁফ পাকিলেও এবং টাক পড়িলেও অসুবিধা কিছুই হয় নাই, কারণ দাঁত পড়েও নাই, নড়েও নাই। সেই সুযোগে জনৈক বদান্য রোগী প্রদত্ত উপঢৌকন কচি পাঁঠাটির মাংস আজ দ্বিপ্রহরে তিনি খাইয়াছেন।··· খাইয়া খানিক আগে উপরে উঠিয়াছেন, তার পর শুইয়াছেন, তার পর ডান পাশে ফিরিয়া টানিয়া টানিয়া কলিকাটিতে আর কিছুই রাখেন নাই—শেষ করিয়াছেন; তার পর সট্‌কাটি নামাইয়া রাখিয়াছেন···এইবার বাঁ পাশে ফিরিবেন, নিদ্রা কর্ষণ সুরু হইয়াছে, এমন সময় পুনর্ব্বসুর ডাকে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল···

বলিলেন,—কি?

—আমি পুনর্ব্বসু। একবার শুনুন ডাক্তার বাবু।

পুনর্ব্বসুর কণ্ঠস্বরে যেন প্রণতি ধ্বনিত হইল।

—যাই। বলিয়া সুচাঁদ জানালায় আসিলেন; বলিলেন,—কি খবর?

—বাবার ভারি অসুখ। আসুন একবার।

কিন্তু সুচাঁদের অভিজ্ঞতা বহুধা ব্যাপ্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওষুধ মোটেই পড়ে নি?

—কবরেজ মশায়কে ডেকেছিলাম। তিনি ওষুধ দিয়েছেন।

—তবে আর কি! তাই আপাততঃ দাও গিয়ে। আমি ঠিক্ সাড়ে তিনটেয় যাব। একেবারে কঠিন কিছু ত নয়!

পুনর্ব্বসুর মনে হইল, বোধ হয় সে ভুল করিল, কিন্তু তার মনে হইল, সুচাঁদ যেন বলিতে চান্, তেমন কঠিন কিছু হইলে কবিরাজ প্রভৃতি হিজিবিজি ব্যাপার না করিয়া একেবারে তাঁহারই কাছে সে আসিত।

পুনর্ব্বসুর একটু অভিমান জন্মিল—কথা কহিল না। বিপদ তার নিজেরই বলিয়া সম্ভবতঃ তার মনে হইল, ভয়-ত্রাতা ও জীবনদাতা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, রোগার্ত্তের আহ্বানে সেই দিকে এবং তখনই অভয় লইয়া আত্মহারার মত ছোটা···

কিন্তু সুচাঁদ ধীরে সুস্থে বলিলেন,—এই খেয়ে উঠলাম; আর রোদে রোদে বড় ঘুরেছি আজ। কিছু ভেবো না; তোমার বাবাকে আমি মরতে দেব না। বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—সাড়ে তিনটেয় ঠিক্ যাব।

—গাড়ী আনি?

—না না···

পুনর্ব্বসু পুনরায় কাতরোক্তি করিল; বলিল,—সাড়ে তিনটার আগেই যদি যেতে পারেন তবে বড় উপকার হয়। তিনি বেঁহুস হ'য়ে আছেন—জ্বর খুব।

সুচাঁদ তেমনি মিষ্ট মুখে কহিলেন,—যাব, যাব, তাই যাব। সব দেখব গিয়ে। আমারও ত গরজ আছে!

পুনর্ব্বসু অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া ফিরিয়া আসিল···

রোগীকে কবিরাজী ঔষধই দেওয়া হইল···এবং দেখিতে দেখিতে সুচাঁদের 'সাড়ে তিনটে' কখন বাজিয়া গেল···

পুনর্ব্বসু আবার ছুটিল—

সুচাঁদ দিব্য খালি গায়ে তাঁর ফুলবাগিচার বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন···পুনর্ব্বসুর দিকে প্রশান্ত চক্ষু দুটি তুলিয়া বলিলেন,—আমি তৈরি হে। একটু ব'সো। চা-টা খেয়ে নিই। খাবে এক কাপ?

—আজ্ঞে না।

—আমি খেয়ে নিই। দু-মিনিট।···চল বসি গে—বলিয়া সুচাঁদ বেড়ার ধার হইতে পুনর্ব্বসুকে লইয়া আসিয়া চেয়ারে বসাইলেন; বলিলেন,—চা তৈরি হচ্ছে—এল ব'লে। চা-টা না খেয়ে বেরুলে আমার মনে হয় রুগী-টুগী সব মিথ্যে —এমনই খাপছাড়া লাগে। আর, যার-তার হাতের চা আম কিছুতেই খেতে পারি নে; মনে হয় ঠিক যত্ন নিয়ে তৈরি করা হয় না···এনেছিস? রাখ্।

ভৃত্য টেবিলের চায়ের কাপ এবং জলখাবারের ডিস্ নামাইয়া দিল—সুচাঁদ কাঁচাগোল্লা ভাঙিয়া মুখে দিলেন···

পুনর্ব্বসুর মনে হইতে লাগিল, ইহলোক আর পরলোকের মাঝখানে, একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, স্বচ্ছ অন্ধকারে

তাহারা দু-জনা বসিয়া আছে—সে নড়িতে অশক্ত; দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি মাংসময় প্রেতাত্মার মত যেন অভিশাপ-মুক্ত হইতে অনভ্যস্ত মুদ্রায় অজ্ঞাতের আরাধনায় বসিয়াছে···

অর্থাৎ নিজেকে একান্ত নিরুপায় এবং আহাররত সুচাঁদকে তার বিশ্রী মনে হইতে লাগিল।

তা হোক্, সুচাঁদের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সহজে পরিপাক হইবে বলিয়া সুচাঁদ প্রতিটি গ্রাস বত্রিশ বার চিবাইয়া কাঁচাগোল্লা ক'টি শেষ করিলেন—তার পর মুখ ধুইয়া ফেলিয়া চায়ের কাপ তুলিয়া লইলেন, এবং কতবার যে গলাখাঁকারি দিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

চুমুক দিয়া দিয়া অল্পে অল্পে চা-পান চলিতে লাগিল··· এবং পুনর্ব্বসুর মনে হইতে লাগিল, সময় চলিতেছে না, চা শেষ হইবে না···তাহার পিতা মুমূর্ষু।

কিন্তু অসম্ভব কল্পনা করিলে চলিবে কেন? সুচাঁদের চা-পান অচিরেই শেষ হইল।

সুচাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

বলিলেন,—একটুখানি একা ব'স; আমি চট ক'রে বাড়ীর ভেতর থেকে কাপড় বদ্‌লে জামাটা প'রে আসি। ভদ্রলোক ত! তেমনই সেজে বেরুতে হবে।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি উঠানে নামিলেন···

পুনর্ব্বসু বলিল,—যে-আজ্ঞে।

সুচাঁদ অন্তঃপুরে অদৃশ্য হইতেই পুনর্ব্বসু উঠিয়া দাঁড়াইল—হঠাৎ যেন সে ছিটকাইয়া উঠিল। সময়কে এত দীর্ঘ, মানুষকে এমন অসহ্য, আর নিজেকে এমন ক্ষিপ্ত আগে কখনও তার মনে হয় নাই···সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় টানে টানে যেন ছিঁড়িয়া যাইতে যাইতে তার বৃথাই মনে হইতে লাগিল, এই যন্ত্রণার স্মৃতি চিরজীবী হইয়া রহিল, এবং এই অবহেলার প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

পুনর্ব্বসু স্তব্ধ হইয়া একই স্থানে খালি দাঁড়াইয়াই ছিল···

"এখনও ঢের রোদ রয়েছে।"—বলিয়া সুচাঁদ কাপড় বদলাইয়া এবং জামা পরিয়া, অর্থাৎ ভদ্রলোক সাজিয়া, বাহির হইলেন।

বেলা তখন সাড়ে তিনটের পর প্রায় পাঁচটা।

পথে পরিচিত লোকের কাছে কুশল-বার্ত্তা দিতে দিতে এবং লোকের কুশল-বার্ত্তা লইতে লইতে সুচাঁদ পুনর্ব্বসুর সমভিব্যাহারে রোগী জন্মেজয়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন··· পথের শেষ তথা আলাপের শেষ আছেই।

সুচাঁদ জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্র করিয়া রোগ পরীক্ষা করিলেন—আশা দিলেন—চার টাকা ভিজিট লইলেন এবং চারখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন···

সুচাঁদ কিন্তু ধন্য ডাক্তার।

প্রতি দাগ দেড়-আনা হিসাবে দাম দিয়া তিনি শিশিতে যোল দাগ ঔষধ আনিয়া পুনর্ব্বসু পিতাকে সেবন করাইয়াছে···সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবার জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা সুচাঁদ করিয়াছিলেন তাহাও যথাসাধ্য মালিশ করা হইয়াছে—

এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলে সকালবেলা দেখা গেল, রোগীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে—একেবারে অসাড় নির্জ্জীবতা তেমন নাই; দু-চারিটি কথা কহিতেছেন; এমন কি, খানিক পথ্য ও ডালিমের রস পান করিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ের উত্তাপ কমে নাই বলিয়াই রাজলক্ষ্মী অনুমান করিলেন—গায়ে হাত দিয়া তাহাই মনে হইতেছে।

সমস্ত দিনটা ভাল ভাবেই কাটিল···সন্ধ্যার পর হঠাৎ দু-চারিটি কথা ভুল বলিলেও সে ঘোরটা কাটিয়া যাইতে বিলম্ব হইল না।

কিন্তু সঙ্কট উপস্থিত হইল ভোরের দিকে। রাজলক্ষ্মীর আতঙ্কের অবধি ছিল না—দুরন্ত হৃৎকম্প লইয়া তিনি স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন; ভয়ে ভয়ে পা ছুঁইয়াও পরীক্ষা করিতেছিলেন, ঠাণ্ডা না গরম!···ভোরের দিকে স্বামীর গায়ে হাত দিয়া তিনি চম্‌কিয়া উঠিলেন; মনে হইল পা ঠাণ্ডা। গায়ের উত্তাপ ঢের কম।

রাত্রি তখন পৌনে চারটে—গ্রীষ্মের রাত্রি প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই।

পুনর্ব্বসুকে মা শুইতে পাঠাইয়াছিলেন; তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন···

পা ঠাণ্ডা শুনিয়া সে উৰ্দ্ধশ্বাসে সুচাঁদের কাছে ছুটিল।

প্রথমবার সুচাঁদের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি; এইবার দ্বিতীয়বার পাইব, কিন্তু বিলম্ব আছে।

সুচাঁদের বাড়ীটা একটু দূরে—

পুনর্ব্বসু দৌড়াইয়া যখন সেখানে পৌঁছিল তখন উষার আলোক ফুটিয়াছে; কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে, সুচাঁদ তখন ঘুমাইয়া নাই—অত ভোরেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি এদিকেও খুব সাবধানী আর নিষ্ঠাবান।

এক ডাকেই সাড়া দিয়া সুচাঁদ দ্বিতলের শয়ন-প্রকোষ্ঠ হইতে জানিতে চাহিলেন,—কে?

—আমি পুনর্ব্বসু। শীগগির আসুন ত একবার। বাবার অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না। পা যেন ঠাণ্ডা মনে হ'ল।—বলিয়া পুনর্ব্বসু হাঁপাইতে লাগিল।

সুচাঁদ জানালায় আসিলেন; বলিলেন,—শুনলাম। চল যাচ্ছি। মুখে একটু জল নিয়েই যাচ্ছি, চল। ভোরও ত হয়ে এল।···আধ ঘণ্টা অন্তর দু'বার লাল ওষুধটা দাও গিয়ে; তা করতেই আমি পৌঁছে যাব।

দাঁড়াইয়া সাধ্যসাধনা করার সময় পুনর্ব্বসুর নাই। "যে—আজ্ঞে"—বলিয়া সে চলিয়া আসিল।

কিন্তু লাল রঙের ঔষধে রোগীর অবস্থান্তর ঘটিল না, একই ভাবে রহিল···

উহারাই বুদ্ধি করিয়া গরম জল বোতলে পুরিয়া হাতে পায়ে সেঁক দিতে লাগিল·· এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিল—সূর্য্যোদয় কখন হইয়াছে তার ঠিক নাই—মুখে একটু জল নিতে ত এত বিলম্ব হইবার কথা নয়!

পুনর্ব্বসুকে তার মা আবার পাঠাইলেন···

এবার সুচাঁদ অন্তঃপুরে নাই; দেখা গেল, এবার 'ডিস্পেন্সারী রুম' আলো করিয়া তিনি বসিয়া আছেন—এমন সঙ্গত সুশোভন পরিবেশে পুনর্ব্বসু আগে কখনও কাহাকেও দেখে নাই। সুচাঁদ বুড়ো মানুষ; ঘর আলো করিয়া বসিয়া থাকিলেও তাঁর নিজস্ব দীপ্তি থাকা সম্ভব নয়—আছে তাঁর নাৎনীর, এবং তাহাকেই কোলে করিয়া চাঁদ বসিয়া আছেন বলিয়া, পুনর্ব্বসু অনুভব করিল সেই জন্যই, ঘর আলোকিত হইয়াছে···

খুকু দাদুর কোলে এলাইয়া পড়িয়া নানান্ আলাপ করিতেছে—

পুনর্ব্বসু যাইয়া দরজায় দাঁড়াইতেই সুচাঁদ সহসা ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—এই উঠেছি, দাদা। এই মেয়েটি কত যে বাজে গল্প করছে তার ঠিক্ নেই—কিছুতেই অঙ্ক ছেড়ে নামবে না!—বলিয়া সুচাঁদ খানিক হাসিলেন—তাহার দরুণ তাঁহাকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইল ·

তারপর খুকুর দিকে মুখ নামাইয়া তিনি সানুনয়ে বলিলেন,—নামো, খুকু! কত রুগী তেড়ে আসছে দেখছ না! এত এত টাকা আন্‌ব; সব তোমায় দেব। আর আঙুর কিনে' আনব। আর সেই মাতালের পুতুলটা! মনে আছে ত? চাবি দিলে কেমন ঘাড় নেড়ে নেড়ে সে মাতালের মত করে! তোমার জন্যে নিশ্চয় কিনে আনব, যত দামই হোক।

খুকু কান পাতিয়া প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি শুনিল; কিন্তু উত্তর দিল বিদ্রোহীর মত; বলিল,—নামব না, তোমার সঙ্গে যাব; আঙুর কিনে সেই দোকানে বসেই খাব আর, পুতুল আমি নিজে কিনব।

সুচাঁদ হতাশ হইয়া বলিলেন,—দেখলে হে অদ্ভুত আব্‌দার মেয়েটার?···তুমি যাও, সেঁক দাও গে। আমি উঠেছি···

সুচাঁদের মুখের কথা শেষ না হইতেই পুনর্ব্বসু প্রস্থানোদ্যত হইল।

—কেমন?

মা বলিলেন,—তেমনি। একবার চোখ মেলেছিলেন; বললেন, ভাল আছি। ডাক্তার আসছে?

—হ্যাঁ।

কিন্তু কই ডাক্তার? আরও তিন কোয়ার্টার গেল··· ভাগনে দেবব্রতকে পুনর্ব্বসু ছুটাইয়া দিল—সে খবর পাঠাইল এবং বলিল যে, ডাক্তারবাবু বাহির হইয়াছেন···

ডাক্তারবাবু বাহির হইয়াছেন শুনিয়াও আর দেরি করা চলিল না—মুহূর্ত্তের বিলম্বে সর্ব্বনাশ কত দ্রুত আর কত অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে তাহা ঈশ্বরই জানেন।

দ্বিতীয় অবলম্বন কবিরাজ—

—তার সর্ব্বাঙ্গ তখন দৌর্ব্বল্যে কাঁপিতেছে···

কবিরাজ নির্ব্বিবাদে পুনর্ব্বসুর কথাগুলি শুনিলেন, তার পর ভ্রূভঙ্গী করিলেন, এবং তার পর বলিলেন,—শেষ সময়ে আমায় দিয়ে আর কি কাজ, বাবা? বেশী টাকার আর গুণধাম ডাক্তারকেই ডাক—দেখ যদি সে পারে।

কবিরাজ মহাশয় কথা বলেন বেশী। পূর্ব্বোক্ত কথার পর না থামিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন,—আয়ুর্ব্বেদকে তুচ্ছ করেই ছারেখারে গেলে। ঋষিকৃত ব্যবস্থা আর ঔষধ তোমাদের মনঃপূত হ'ল না, হ'ল গিয়ে বিলিতী বিষ! তবে, এই তিনটি বড়ি দিচ্ছি, একটি টাকা দাম; দামটা নগদই চাই।—বলিয়া বড়ি দিলেন।

নগদ দামে ঋষিকৃত ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত ঔষধ অর্থাৎ তিনটি বড়ি লইয়া পুনর্ব্বসু চলিয়া আসিল। কিন্তু তার অন্তর্য্যামী জানিলেন, আশা নাই।

দেবব্রত খবর আনিয়াছিল, সুচাঁদ ডাক্তার রওনা হইয়াছেন। রওনা তিনি হইয়াছেন—কথাটা মিথ্যা নয়; নাৎনী খুকুকে অঙ্কভ্রষ্ট করিয়া এবং কাঁদাইয়াই তিনি বাহির হইয়াছেন···

ডাক্তার সুচাঁদ অধিকারী কেবল পেশাদার ডাক্তার ন'ন—তিনি জনসাধারণের সুহৃৎ ও অকৃত্রিম বন্ধু, অকপট হিতৈষী; তার উপর তিনি সদালাপী; তার উপর তিনি গৃহস্থ; এবং তার উপরেও তিনি পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক; এবং তারও উপরে তিনি সর্ব্বদাই অকাতরচিত্ত।

তিনি অকাতর চিত্তে বাহির হইয়াছেন—লক্ষ্য রোগীর বাড়ী, কিন্তু পথে দেখা হইল পীতবাস পোদ্দারের সঙ্গে। পীতবাসের "বিশুদ্ধ ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের দোকান" আছে। —দেখা পাইতেই পীতবাস সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গেল···বলিল,—দোকানে একটু পায়ের ধুলো পড়বে না, ডাক্তারবাবু? উত্তম মিহি পুরনো চাল এসেছে। আপনার নাম ক'রে দু-বস্তা সরিয়ে রেখেছি। অনেক খদ্দেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি; বলি, ডাক্তারবাবুকে না শুধিয়ে ছাড়ছি নে।

—ভাল বটে ত?

হইল, বলিল,—আপনার সঙ্গে তঞ্চকী!···নিজের মুখে কি আর বলব, ডাক্তারবাবু! দোকানদারের কথা দাঁড়ায় কখনও? দয়া ক'রে স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।

—দরকার ত ছিল হে। চল, দেখিগে। বলিয়া সুচাঁদ পীতবাসের দোকানে গিয়া উঠিলেন, এবং পীতবাসের অনুরোধে জুতা খুলিয়া বসিলেনও।

পীতবাস চালের রূপে গুণে যেন দিশেহারা হইয়া চাল দেখাইল; চাল মিহি এবং পুরাতন বটে—সুচাঁদ পছন্দ করিলেন···তার পর দর লইয়া যে কষাকষি হইল তাহা তুচ্ছ; পীতবাস দু-আনা কমেই রাজি হইল, এবং ক্ষতিস্বীকারের কারণও সে প্রকাশ করিল; বলিল,···ওতেই দিলাম, ডাক্তারবাবু। ডাক্তারকে হাতে রাখতে হবে ত! আপনার হাতেই আয়ু। বলিয়া ধন্য হইয়া হাসিতে লাগিল।··· বলিল,—আমারই লোক দিয়ে আস্‌বে।

চাউল ক্রয়ের ব্যাপারটা চুকাইয়া সুচাঁদ এইবার উঠিবেন; উঠিতে তিনি যাইতেছেন, কিন্তু এমন সময় তাঁর চোখে পড়িল রামকমল ভাণ্ডারী—ক্ষুর নরুণ আয়না চিরুণী প্রভৃতির হাতবাক্স লইয়া সে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে···

সুচাঁদের হাত আপনি উঠিয়া গণ্ড স্পর্শ এবং ঘর্ষণ করিল—তিনি অনুভব করিলেন যে, দাড়ি বাড়িয়াছে।

পীতবাস তাহা দেখিল—

আয়ুপ্রদ ডাক্তার বাবুকে সুলভে চাউল বিক্রয় করা ছাড়া অন্য উপায়েও সে তুষ্ট করিতে চাহে; কাজেই প্রয়োজনের বেশী চীৎকার করিয়া সে রামকমলকে ডাকিয়া দিল···এবং রামকমল প্রয়োজনের বেশী যত্ন লইয়া সম্ভ্রান্ত ডাক্তারবাবুর উদ্‌বৃত্ত শ্মশ্রু মোচন করিয়া দিল—তাহাতে সে সময় নিল অনেকটা। ক্ষুরে অত শান আর দাড়িতে অত জল দিবার দরকার ছিল না।

অতঃপর বিশুদ্ধ ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের দোকানে সুচাঁদের আর না বসিলেও চলিত—তাঁর নিজের কাজ শেষ হইয়াছে; কিন্তু ওদিক্‌কার হরিসাধন মজুমদার আর যাই হোক্ অকৃতজ্ঞ নহে—

ডাক্তার বাবু নিকটেই পীতবাসের দোকানে বসিয়া আছেন শুনিয়া পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাইতে সে আধ মাইল

রাস্তা ছুটিয়া আসিল। হরিসাধনের জামাই লোকনাথের কঠিন রোগ হইয়াছিল। লোকনাথ কলিকাতায় থাকে—রোগ জন্মিয়াছিল কলিকাতাতেই; কিন্তু কলিকাতার ডাক্তারগুলি এমন অর্ব্বাচীন যে, রোগ চিনিতেই পারে নাই—চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া ত অনেক দূরের কথা; অথচ—হরিসাধন রাগ করিয়া বলে—পেন্টুলান পরার সখটুকু আছে!

সুচাঁদের প্রতি হরিসাধনের পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধা অশেষ, বিশ্বাসও অগাধ···

সে জামাইয়ের বাপ মায়ের নিষেধ কর্ণপাত না করিয়া এমন কি তাদের অপমান করিয়াই, জামাইকে এখানে আনিয়া সুচাঁদের হাতে সমর্পণ করিল—

বলা বাহুল্য, সুচাঁদ তাহার মুখরক্ষা করিয়াছেন, এবং কলিকাতার যাবতীয় পেন্টুলান-পরা চিকিৎসকের মুখে চুণ-কালি লেপন করিয়া দিয়াছেন—অর্থাৎ লোকনাথ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া গত পরশ্ব অন্নপথ্য করিয়াছে।

কাজেই হরিসাধন দৌড়াইয়া আসিয়া সুচাঁদের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল; কিন্তু সুচাঁদের পায়ে আদৌ ধুলা না-থাকায় হরিসাধনের চুলে ধুলা লাগিল না···

সুচাঁদ প্রফুল্লকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন,—জামাই কেমন আছে?

হরিসাধন গদগদ হইয়াই আসিয়াছিল; আরও গদগদ হইয়া বলিল,—ভাল আছে। ভাগ্যে আপনার হাতে দিয়েছিলাম—আমার মেয়েটির শাঁখা-সিঁদুর বজায় থাক্‌ল।

হরিসাধনকে বিচলিত দেখিয়া সুচাঁদ বলিলেন,—সে-কথা যাক্। রোগের মূল ছিল পেটে, মাথায় নয়। পেটের চিকিৎসায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদ খুব সক্ষম।—বলিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদ এবং এ্যালোপ্যাথিকে মিশ্রিত করিয়া এমন অনেক গূঢ় কথা বলিতে লাগিলেন যা, না বলিলেও চলিত; এবং যাহা শুনিয়া পীতবাস, রামকমল এবং হরিসাধন প্রভৃতি একটা অজ্ঞাত জিনিষের অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত পরিচয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তার পর সুচাঁদ বলিলেন,—আচ্ছা, উঠি এখন। রুগীর বাড়ী যেতে একটু তাড়া আছে।

পীতবাস বলিলেন,—ও, তবে ত উঠ্‌তেই হয়। কি আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।

সুচাঁদ এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া একটু হাসিলেন, তার প উঠিয়া রওনা হইলেন।···

খানিক এদিকেই পূর্ব্বকথিত এবং প্রতিশ্রুত আঙুরে দোকান। সুচাঁদ সেই দোকানে দাঁড়াইলেন···এক বাক্স আঙুরের ভিতর হইতে সন্তর্পণে একটি আঙুর তুলিয় লইয়া তিনি মুখে নিক্ষেপ করিলেন···মিষ্ট কিম্বা কষায় কিম্ব টক্ তাহা ঠিক করিতে না পারায় আর একটি বাক্স লইয়া তাহারও একটি চাখিয়া দেখিলেন—মিষ্ট লাগিল···আঙুরের সেই বাক্সটি তিনি দরদস্তুর পূর্ব্বক ক্রয় করিলেন···

দোকানীর চিন্তাকুল প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইলেন, আঙুরের প্রয়োজন গৃহস্থ কোনও রোগীর জন্য নহে।—আঙুরের বাক্স আনিবেন বলিয়া খুকুকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন আসিয়াছেন! সুতরাং আঙুর লইতেছেন।

আঙুর কেনা হইল—

সেই আঙুরের বাক্স হাতে করিয়া এবং আপামর বহু লোকের শরীরগত সুখ-সুবিধার তল্লাস লইতে লইতে যখন সুচাঁদ পুনর্ব্বসুর বাবাকে দেখিতে পুনর্ব্বসুদের বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন তখন বেলা প্রায় এগারটা।

সুচাঁদের লাল রঙের ঔষধে এবং কবিরাজের বটিকায়, ঋষি-নির্দ্দিষ্ট নগদ বটিকায়, ফল হয় নাই; কাজেই সুচাঁদ যখন জন্মেজয়কে দেখিতে আসিলেন তখন বাঁশ কাটিয়া আর দড়ি পাকাইয়া মাচা প্রস্তুতের কার্য্য দ্রুতবেগে এবং অন্তঃপুরে ক্রন্দন নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে···

সুচাঁদ থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন—

পুনর্ব্বসু তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিষণ্ণ মুখে অগ্রসর হইয়া গেল—

সুচাঁদও বিমর্ষ মুখে তাঁর কর্ত্তব্য করিলেন; বলিলেন,—ঘট্‌বে বলেই যে-সব ব্যাপার একটা চূড়ান্ত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় ধার্য্য হয়েই আছে, মৃত্যুই তার মধ্যে সব চাইতে অনিবার্য্য—তা ত জান।···আচ্ছা, এখন আসি। বলিয়া তিনি যেমন নির্ব্বিকারভাবে আসিয়াছিলেন ঠিক তেমনি নির্ব্বিকারভাবে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সুচাঁদের ঐ কথায় এবং তাঁর যাওয়া দেখিয়া পুনর্ব্বসুর চোখে বেশী করিয়া জল আসিল—তাহার মনে হইল, সবাই যা জানে তাহারই কৃত্রিম পুনরুক্তি করিয়া লোকটা যেন ধাপ্পা দিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ ছেলেকে করিতেই হইবে। পুনর্ব্বসু পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন, এবং তদ্দণ্ডে ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞাতি ও বন্ধু ভোজনের আয়োজন করিয়াছে—আয়োজন অল্পস্বল্প; বড় জোর দেড়-শ লোক। তাহাতেই তাহাকে ঋণ করিতে হইল।

নিমন্ত্রিতের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়াছে—ব্রাহ্মণের মারফৎ নিমন্ত্রণ প্রেরিতও হইয়াছে :

পুনর্ব্বসু সোমের পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও বন্ধু ভোজনে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল—সাড়ে ন'টায় ভোজ—দয়া করিয়া ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ডাক্তার সুচাঁদ অধিকারীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ; ব্রাহ্মণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে নিমন্ত্রণ তাঁর প্রাপ্য।

সাড়ে ন'টায় ভোজ—

সাড়ে ন'টা কি গরমের দিনে বেশী রাত্রি ? তা নয়। কিন্তু তার বেশী দেরী হইলে নিমন্ত্রিত সজ্জনবর্গ বিরক্ত হইতে পারেন—তাঁহারা বিরক্ত হইলে বিষম লজ্জার কারণ হইবে। পুনর্ব্বসু তাই তাড়াতাড়ি করিতেছে।··নিমন্ত্রিত-গণ শুভাগমন করিয়া বসিবার স্থান এবং আসনের অভাবে পাছে দাঁড়াইয়া থাকেন এই ভয়ে সে সন্ধ্যা না-লাগিতেই বৈঠকখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন কবিল ; তার পর লম্বা-চওড়া সতরঞ্চি এবং তার উপর লম্বা চওড়া চাদর বিছাইয়া দিল, এবং তার উপর কয়েকটা তাকিয়া-বালিশ রাখিয়া দিল—আলস্যভরে গা ছাড়িয়া দিয়া নিমন্ত্রিতগণ আরাম উপভোগ করিবেন—কারণ, নিমন্ত্রিত অতিথি নারায়ণতুল্য পূজ্য।

সাড়ে ন'টা বাজিতে এখনও ঢের দেরী—পুনর্ব্বসুর দেয়াল-ঘড়িতে এখন মাত্র সাতটা পঁয়ত্রিশ।

এইবার আলোর ব্যবস্থা—

চাহিয়া-আনা সুবৃহৎ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়া দিয়া পুনর্ব্বসু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—অনেক আগেই এদিক্‌কার বন্দোবস্তটা সমাধা হইয়াছে ···

এখন লুচি-তরকারির দিক্‌টা এক বার তদারক করা দরকার—ভাবিয়া সেই উদ্দেশ্যে ঘরের বাহির হইতে চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়াই পুনর্ব্বসু চমৎকৃত হইয়া গেল···সুচাঁদ অধিকারী তাঁর সেই নাতনীটির হাত ধরিয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন—মূর্ত্তি খুব সৌম্য—খুকু বেশ সাজিয়া আসিয়াছে ; দেখিয়াই পুনর্ব্বসু অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া যেন সম্মুখে বিস্তৃত সুখের সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, অর্থাৎ বলিল,—আসুন আসুন। খুকি, কেমন আছ ?

খুকী কথা কহিল না—

পুনর্ব্বসুই পুনর্ব্বার বলিল,—ভেতরে এসে বসুন ডাক্তার বাবু। আজ কি সৌভাগ্য আমার !

অতিশয় সুষ্ঠু সহৃদয়তার সহিত হাসিয়া সুচাঁদ সৌভাগ্যের কথার প্রতিবাদ করিলেন ; বলিলেন,—সৌভাগ্য কি হে ! এ যে কর্ত্তব্যের ফাঁদ ; ধরা দিতেই হবে। পরস্পরের ডাকে যে লৌকিকতা রক্ষা না করে তাকে কি অসামাজিক বলা হবে না ? কর্ত্তব্যের দায়ই হচ্ছে সবার উপর অনিবার্য্য।

কি যে সবার উপর অনিবার্য্য নয় তাহা ধারণা করিতে না পারিয়াও পুনর্ব্বসু কৃতার্থ হইয়া বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুচাঁদ বলিলেন,—ভদ্রলোকের নেমন্তন্ন আর আদালতের সমন একই রকম—হাজির আমায় হতেই হবে। না-আসাটাই অস্বাভাবিক।···একটু আগেই এলাম। এসেই নেহাৎ খেতে বসা ভাল দেখায় না।···দেরী আছে বুঝি ?

পুনর্ব্বসু বলিল,—অল্পই। ওরে, পাখা দে ; ব্রাহ্মণের হুঁকো আন্ ; আর ভেতর থেকে পান নিয়ে আয় এক ডিস।

তন্ত্র ও বাঙালী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অনেকের ধারণা—তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত বাংলা দেশের সম্বন্ধ যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভারতের অন্য কোন প্রদেশের সহিত সেরূপ নহে। বাংলা দেশেই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি—এই দেশেই এই শাস্ত্রের আচার পরিপুষ্টি লাভ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বীভৎস ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল—বাংলার বাহিরে তান্ত্রিক উপাসনার প্রচলন থাকিলেও তাহা অতি বিরল ও নগণ্য—এইরূপ মতবাদ দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলার তথা বাঙালীর গৌরবখ্যাপনের উদ্দেশ্যই যে এই মতবাদের মূল কারণ তাহা বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, বিকৃত তন্ত্রশাস্ত্রের বীভৎসতা ও কদর্যতার কলঙ্কের বোঝা বাঙালীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অন্য প্রদেশ বাঙালীর দিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া থাকেন। বাঙালীও অস্বীকার্য সত্য বোধে এই দুরপনেয় কলঙ্কের ভার নিরুপায় ভাবে অপ্রতিবাদে সহ্য করিয়া থাকে।

আমি প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে তন্ত্রের বিকৃত আচারই ইহার মূল ও মুখ্য আদর্শ নহে—ইহার গূঢ় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রহস্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।* এই কারণেই বাংলার এবং বাংলার বাহিরের অনেক তান্ত্রিক সাধকের পুণ্যস্মৃতি আজ পর্যন্ত নানাস্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইয়া থাকে।† তান্ত্রিক ধর্ম তথা তান্ত্রিক সাধকের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই আদর্শ ভাল হউক বা মন্দ হউক, এই ধর্ম (মায় ইহার বিকৃত ও বীভৎস আচার) যে কেবল বাংলা দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে—ভারতের সর্বত্রই যে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশের ন্যায় (অথবা তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে) প্রচলিত রহিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। অবশ্য ইহা দেখাইবার জন্য কষ্ট-কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না—প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মূল তন্ত্রগুলির মধ্যে কোন্ খানির কত অংশ কবে কোন্ দেশে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোন কোন তন্ত্রের অংশবিশেষে বাংলা ভাষার বা বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন থাকিলেও তাহা হইতে সমস্ত গ্রন্থখানির বঙ্গীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এমন হইতে পারে, এই সব অংশবিশেষ কালক্রমে বাংলা দেশে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে কেবল এই ব্যাপার হইতেই এমন কথাও বলা চলে না যে এই সকল গ্রন্থ ও ইহাদের মধ্যে প্রতিপাদিত আচারাদি কেবল বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিল। কোন্ গ্রন্থ কোন্ দেশে প্রচলিত বা কোন্ দেশে অপ্রচলিত তাহা জানিবার উপায় দুইটি। প্রথমতঃ, সেই সেই গ্রন্থ কোন্ কোন্ দেশে ও কোন্ কোন্ অক্ষরে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করা। এইরূপ অনুসন্ধান বর্তমানকালে বিশেষ কঠিন নহে। ভারতের নানা প্রদেশের পুথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে সেগুলির উপযোগিতা অতুলনীয়। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—নিবন্ধগ্রন্থের আলোচনা। বিভিন্ন প্রদেশে নানা সময় মূল তন্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে নানা বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বহু নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কোনও গ্রন্থে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত মূলতন্ত্রের নাম আলোচনা করিলেই বুঝা যায় সেই গ্রন্থের রচয়িতার দেশে কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এক এক প্রদেশের নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে উদ্ধৃত মূল-তন্ত্রের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে সেই সেই প্রদেশে প্রামাণিক বলিয়া পরিচিত মূলতন্ত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নানা প্রদেশে প্রচলিত সমস্ত নিবন্ধগ্রন্থে—অন্ততঃ প্রচলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে—উদ্ধৃত এইরূপ মূল-তন্ত্রের তালিকা প্রস্তুত হইলে তন্ত্রগুলির ব্যাপকতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ধারণা করা সম্ভবপর হইবে—

* প্রবাসী—১৩৪১, শ্রাবণ, পৃঃ ৫৫৮-৫৭২।

† 'বাংলার শাক্ত সাধক'—দেশ (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৩)।

তন্ত্রনামের দোহাই দিয়া যে সমস্ত অর্বাচীন ও তন্ত্রমতবিরোধী গ্রন্থ কালক্রমে প্রচলিত হইয়াছে সেগুলি এই উপায়ে ধরা পড়িবে। অবশ্য, নিবন্ধগুলি প্রকাশিত না হইলে এইরূপ তালিকা প্রণয়ন করা কষ্টকর। তবে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবলম্বনে এই তালিকা প্রস্তুত করিলেও অনেক মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত নানা প্রদেশের সে সমস্ত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় কোন প্রদেশেই তন্ত্র, আগম বা মন্ত্রশাস্ত্রের পুথির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাঞ্জোর পর্যন্ত যে সমস্ত স্থানের (অযোধ্যা, কাশী, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা প্রভৃতি) পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সর্বত্রই স্থানীয় বা স্থানান্তরের অক্ষরে লিখিত প্রাচীন অপ্রাচীন বহু তন্ত্রের পুথি পাওয়া যায়। এই সকল পুথি নাগরী, বাংলা, উড়িয়া, শারদা, নেওয়ারী, দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লিপিতে লিখিত। উত্তর-ভারতের নানা স্থান হইতে এশিয়াটিক সোসাইটীতে যে সহস্রাধিক তন্ত্রের পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যেই 'গ্রন্থ'-ব্যতীত অন্য সমস্ত লিপির পুথিই পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির অক্ষর বেশ প্রাচীন এবং অপরগুলির অক্ষর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কয়েকখানি অতি প্রাচীন পুথিও ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

এই পুথিগুলিই বাংলার বাহিরে তন্ত্রচর্চার একমাত্র প্রমাণ নহে। বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে যুগে যুগে নানা তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সারা ভারতে পরিচিত ও আদৃত। কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত, দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর রায়, লক্ষ্মণ দেশিক ও রাঘব ভট্ট প্রভৃতির নাম ও গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের তান্ত্রিকসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রপঞ্চসার ও লক্ষ্মণ দেশিকের শারদাতিলক আজ পর্যন্ত সমস্ত ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান নিয়মিত করিতেছে—ইহাদের নির্দেশ অনুসারেই তান্ত্রিক কৃত্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই দুইখানিকেই বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করা হয়। সকল প্রদেশেই ইহাদের পুথি পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতবর্গ ইহাদের নানা টীকাটিপ্পনী রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে ইহাদের প্রচারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বাংলা দেশকে কেবল অন্য দেশের গ্রন্থের উপরই নির্ভর করিতে হইত না বা হয় না। বাংলার নিজস্ব গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার সর্বপ্রসিদ্ধ—বাংলার বাহিরে সুদূর নেপাল পর্যন্ত ইহার আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটীতে ইহার যে কয়খানি পুথি আছে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নেপালে প্রচলিত নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত। বাংলার বাহিরের অক্ষরে লিখিত এইরূপ আরও কয়েকখানি বঙ্গীয় নিবন্ধগ্রন্থের পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উড়িয়া অক্ষরে লিখিত পূর্ণানন্দের তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী ও গ্রন্থাক্ষরে লিখিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের শ্যামাসপর্যাবিধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত ষট্‌চক্রনিরূপণ ত নিখিল ভারতপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের অন্যতম।

সুপ্রসিদ্ধ এই সকল গ্রন্থ ছাড়া এমন আরও বহু গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে যাহাদের প্রসিদ্ধি মাত্র কোনও স্থানবিশেষের বা সমাজবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শত শত এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নেপালের মহারাজ প্রতাপ সিংহ কৃত বিশাল গ্রন্থ পুরশ্চর্যার্ণব, নেপালের মহারাজ ভূপালেন্দ্রের মন্ত্রী নবমী সিংহকৃত তন্ত্রচিন্তামণি, দাক্ষিণাত্যের শ্রীনিবাস ভট্টকৃত শিবার্চনচন্দ্রিকা, শ্রীনিবাসের পৌত্র জনার্দন কৃত শিবার্চনচন্দ্রিকার মন্ত্র-চন্দ্রিকা নামক সার সংগ্রহ, বোম্বাই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্মার্ত কমলাকর কৃত মন্ত্রকমলাকর ও শান্তি রত্নাকর, অহিচ্ছত্রের মহীধর কৃত সুপরিচিত মন্ত্রমহোদধি, মিথিলার নরসিংহ ঠক্কুর কৃত তারাভক্তিসুধার্ণব, উড়িষ্যার লক্ষ্মীধর কৃত শৈবকল্পদ্রুম, দামোদর সূরিকৃত তন্ত্রচিন্তামণি ও যন্ত্রচিন্তামণি, বাঘেল বংশের মহারাজকুমার জেত্র সিংহ কৃত ভৈরবার্চা-পারিজাত, বুন্দেল বংশের রাজা দেবীসিংহের অনুরোধে তাঁহার গুরুপুত্র শিবানন্দ গোস্বামী রচিত সিংহ-সিদ্ধান্তবিন্দু, শ্রীচক্রের আদর্শে নির্মিত শ্রীবিদ্যানগরের রাজা লক্ষ্মণ দেশিকের বিরোধী প্রৌঢ়দেবের পুত্রের অনুরোধে প্রগল্‌ভাচার্যের শিষ্য কর্তৃক রচিত বিদ্যার্ণবতন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থকারের মধ্যে অনেকে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে নানারূপ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া তান্ত্রিক

বাগ্‌দত্তা
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

উপাসনার রহস্য সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক বংশের একজনের একখানি গ্রন্থই হয়ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্য গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ অবস্থায় অপ্রকাশিত পুথির আকারে কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারে বা ব্যক্তিবিশেষের গৃহ-কোণে লোকচক্ষুর অন্তরালে অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শারদাতিলক নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা লক্ষ্মণ দেশিকের স্বল্প পরিচিত তারাপ্রদীপ ও শারদাতিলকের প্রখ্যাত টীকাকার রাঘব ভট্টের কালীতত্ত্ব এবং তাঁহার পৌত্র বৈদ্যনাথ কৃত ভুবনেশীকল্পলতা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বাংলার বাহিরে তন্ত্রের প্রচলন প্রতিপাদন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—তাই ইচ্ছা করিয়াই এস্থলে বাংলা দেশের কোন গ্রন্থের নাম করা হইল না। কেবল এই কথা বলা দরকার যে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বাংলা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে এবং বর্তমানে অপ্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে।

এই সকল গ্রন্থ ও বিশেষ করিয়া নানা তান্ত্রিক কৃত্যের ছোট ছোট পদ্ধতির পুথি হইতে বিভিন্ন প্রদেশের তান্ত্রিক আচারের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকটিত হয়। বাংলার তান্ত্রিক সমাজে বা তন্ত্র-গ্রন্থে যে সমস্ত অনুষ্ঠান ও দেবতার উপাসনার প্রচলন বা উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অনুষ্ঠান ও বেশী দেবতার নিয়মিত উপাসনার উল্লেখ বাংলার বাহিরের তন্ত্র-গ্রন্থে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বাংলায় কেবল কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, শিব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দেবতার তান্ত্রিক উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাংলার বাহিরে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার বহু বিভিন্ন রূপের উপাসকের উল্লেখ আছে। কোনও বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতা-বিশেষের সাময়িক পূজা অবশ্য বাংলা দেশেও অপ্রচলিত বা নিষিদ্ধ নহে। তবে, বগলামুখী, চণ্ডী, গায়ত্রী, রাজ্ঞী, কুব্জিকা, বটুকভৈরব, গণেশ, পরমহংস, কাশ্মীরে প্রচলিত সারিকা প্রভৃতি দেবতার নিয়মিত উপাসনার বিধান—এই সকল দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইষ্টদেবতারূপে ইঁহাদিগকে পূজা করিবার প্রথা বাংলা দেশে নাই, বাংলার বাহিরে আছে—এশিয়াটিক সোসাইটী, মান্দ্রাজ ওরিয়েন্টেল লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানের তান্ত্রিক পুথি আলোচনা করিলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বামাচারের বীভৎস অনুষ্ঠান এবং মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি আপাততঃ ঘৃণ্য কৃত্যও কেবল বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—বাংলার বাহিরেও এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে। বামাচারের মত খণ্ডন করিয়া কাশীনাথ নামক এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—তাহার প্রতিবাদকল্পে বামাচার-সিদ্ধান্তসংগ্রহ নাম দিয়া একখানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের একখানি পুথি মান্দ্রাজ ওরিয়েন্টেল লাইব্রেরীতে আছে। পঞ্চ মকার সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া মদ্যপ্রয়োগ ও মদ্যের পাত্রবন্দনা সম্বন্ধে, বিস্তৃত বিধান অবঙ্গীয় একাধিক পুথির মধ্যে যেমন পাওয়া যায়, বাংলা দেশে তেমন দেখা যায় কি না সন্দেহ।

বস্তুতঃ, তন্ত্র-শাস্ত্রের উৎপত্তি যেখানেই হউক না কেন কয়েক শত বৎসর যাবৎ ইহা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত রহিয়াছে। বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও বিরলপ্রচার হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রত-পূজাই আজকাল অনেক স্থলে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের বৈদিক উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারের ন্যায় তান্ত্রিক দীক্ষার ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাদির ব্যবস্থা আছে। এই দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে কোনরূপ তান্ত্রিক উপাসনায় কাহারও অধিকার হয় না। আবার দীক্ষা গ্রহণ না করাও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কেবল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকই যে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণে অধিকারী তাহা নহে, আচণ্ডাল পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে—এবং তথাকথিত নীচ বর্ণের মধ্যেও কেহ কেহ এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাদির ন্যায় নিত্য সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সারা ভারতবর্ষে এই এক নিয়ম। তবে কে কোন্ দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত, কে কোন্ দেবতার উপাসক তাহা প্রকাশ করিবার বিধান তন্ত্র-শাস্ত্রে নাই। সম্প্রদায়ের লোক ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর সকলেরই নিকট ইহা অজ্ঞাত। তবে মোটামুটি ভাবে আমরা কাহাকেও শৈব, কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাকেও শাক্ত বলিয়া জানি। ইঁহারা কেহই কোন প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহেন—সারা ভারতবর্ষে

ইঁহারা ছড়াইয়া রহিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইঁহাদের উপাসিত দেবতার মন্দির ও তীর্থস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার বাহিরে যে সমস্ত শাক্তদেবতার মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—গয়ার গয়েশ্বরী ও মঙ্গলাগৌরী, পাঞ্জাবের কাঙ্গড়া দেবী, গৌরীকুণ্ডের দশভুজা, চিন্তাপূর্ণীর ছিন্নমস্তা, নেপালের গুহ্যেশ্বরী, বোম্বাইর পার্বতীশৈলের পার্বতী, মহালক্ষ্মীর মহালক্ষ্মী, বোম্বাইনগরের অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবী, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী, উজ্জয়িনীর সমীপবর্ত্তী ইটদ্বীপের পাষাণময়ী কালী, হরিদ্বারের মায়াদেবী ও চণ্ডী, কাশ্মীরের ক্ষীর ভবানী এবং মানস সরোবরের ভীষণাকৃতি দশভুজা। বাংলার প্রসিদ্ধ শক্তি মন্দির-গুলিতে অনেক অবাঙালী শাক্তকে বসিয়া পূজা ও জপ-তপ করিতে দেখা যায়। তবে বাংলার বাহিরে মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা দেবতার যন্ত্র নামক তান্ত্রিক প্রতীকের পূজাই বেশী প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। অনেকের ঘরেই শক্তি বা অন্য দেবতার যন্ত্র সাদরে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। শাক্ত উৎসব বাংলা দেশেও যেমন আছে বাংলার বাহিরেও সেইরূপ। বাংলার দুর্গোৎসব বঙ্গের বাহিরে নবরাত্র একই শক্তিপূজা উপলক্ষ্য করিয়া।

মাতা-পুত্র

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর রামকান্ত রায় তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করিয়া তিন পুত্রকে দান করিবার পর, এবং ১৮০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রামকান্ত রায়ের পরলোকগমনের পর, জগমোহন এবং রামমোহন দুই ভাইএর স্ত্রী-পুত্রগণ মাতা তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। দুই ভাইই আপন আপন তহবিল হইতে সমান অংশে এই একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভরণপোষণের ব্যয়ভার এবং ঐ বাড়ীতে তারিণী দেবীর অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক দেব-সেবার ব্যয়ভার বহন করিতেন। যত দিন রামমোহন রায় বিদেশে চাকরি করিতেছিলেন তত দিন বোধ হয় তিনি বিনা ওজরে তারিণী দেবীর দেবসেবার ব্যয়ভার আংশিক রূপে বহন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি পৌত্তলিকতা দমন করিতে এবং ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্বয়ং পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান, অর্থাৎ লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীর নিত্য-নৈমিত্তিক দেবসেবার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না।

কলিকাতা আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য রামমোহন রায় "বেদান্তগ্রন্থ", "বেদান্তসার" এবং সানুবাদ উপনিষৎ মুদ্রিত এবং বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, অনুষ্ঠানের জন্য "আত্মীয় সভা" স্থাপন করিলেন। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" নামক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে—

> ১৭৩৭ শকে (১৮১৫—১৮১৬ সালে) রাজা মানিকতলার উদ্যান-গৃহে আত্মীয় সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার মঠীতলার বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মানিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।
>
> সায়াহ্নকালে আত্মীয় সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন ও গোবিন্দমালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তথায় সময় সময় উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং বদনমোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা রূপ পরম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন।

১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের "মিশনরী রেজিষ্টার"

নামক পত্রিকায় আত্মীয় সভার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

তিনি (রামমোহন রায়) তাঁহার ধর্ম্মমত অনেক দূর প্রচার করিয়াছেন, এবং অনেক উচ্চ বর্ণের হিন্দু তাঁহার সহিত যোগ দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মত সমর্থন করেন। ইঁহারা আপনাদের দলকে সভা বলেন এবং কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করেন। তন্মধ্যে একটি নিয়ম, যিনি মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করিবেন না, তিনি এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। এই সভার একজন সভ্য মুখের কথায় মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করিয়া থাকিলেও, বাড়ীতে অনেক দেবমূর্ত্তি রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার দুইটি বড় মন্দির আছে। সভা তাঁহাকে এইরূপ আচরণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন ; কারণ দেবসেবার জন্য দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত কিছু জমী তাঁহার আছে। এই সকল দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিলে এই জমী তাঁহার হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে। কেহ কেহ বলেন, রামমোহনের শিষ্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ শত ; এবং ইহাও কথিত হয় যে এই দল শীঘ্র এত প্রবল হইবার আশা করা যায় যে রামমোহন রায় তাঁহার মত প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ফলে জাতিচ্যুত হইবেন। এত দিন তিনি জাতি ত্যাগ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে যাঁহাদিগকে তিনি শীঘ্র স্বমতাবলম্বী করিবার ভরসা করেন তাঁহাদের সহিত মিলনের বাধা হইবে। ব্রাহ্মণগণ দুইবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক থাকায় কৃতকার্য্য হয় নাই। লোকে এই কথাও বলে যে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত (baptized) হইয়া অনেক বন্ধু সঙ্গে লইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিতে ইচ্ছা করেন। সেখানে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনও একটি বিশ্ববিদ্যাবিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য।*

এই লেখক মনে করিয়াছিলেন, রামমোহন রায় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আত্মীয় সভায় তদনুরূপ উপাসনা হয়। কিন্তু তিনি আর যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এই লেখক মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আত্মীয় সভার যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। ১৮১৫ সালের শেষ ভাগে, বা ১৮১৬ সালের প্রথম ভাগে, প্রকাশিত বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদের (*Abridgment of Vedant*-এর) মুখবন্ধে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সদসৎ বিচার বুদ্ধির এবং অকপট মনোবৃত্তির নির্দ্দেশ অনুসারে এই পথ গ্রহণ করায় আমি আমার কতিপয় আত্মীয়স্বজনের বিরক্তির এবং নিন্দার ভাজন হইয়াছি। ইঁহাদের কুসংস্কার প্রবল, বর্ত্তমানে প্রচলিত পূজা পার্ব্বণের সহিত ইঁহাদের সাংসারিক সুবিধা জড়িত আছে।†

এই উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়, ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় পুস্তক-পুস্তিকায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজেও মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিয়াছিলেন। লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে রামমোহন রায়ের নামে সঙ্কল্প করিয়া এবং তাঁহার ব্যয়ে নিত্য মূর্ত্তি পূজা হইত। সুতরাং রামমোহন রায় যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তখন লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে অন্তর্দ্রোহের সূত্রপাত হইল। এই অন্তর্দ্রোহের এক পক্ষ হইলেন বাড়ীর কর্ত্রীমাতা, আর এক পক্ষ ধর্ম্মসংস্কারকামী পুত্র।

কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীর নিজ অর্দ্ধাংশ তিনি ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করিলেন। রঘুনাথপুর গ্রামে তাঁহার খরিদা পত্তনী কৃষ্ণনগরে তালুকের মধ্যে এক চাপে বার বিঘা জমী ছিল। এই জমী প্রজার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া তিনি কতকাংশে বাগান করিলেন, এবং কতকাংশে নূতন পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। ১৮১৬ সালের শেষ ভাগে এই বাড়ী বাসের উপযোগী হইয়াছিল, এবং ১৮১৭ সালের মাঘ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) মাসে রামমোহন রায়ের পরিবারবর্গ লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরের এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ী ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের পক্ষের সাক্ষী বেচারাম সেন বলিয়াছেন (১৬ প্রশ্নের উত্তর)—

লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ছাড়িয়া রঘুনাথপুরের বাড়ী যাওয়ার অব্যবহিত কারণ, মাতা তারিণী দেবীর সহিত রামমোহন রায়ের বিরোধ। সেই সময় সাক্ষী (বেচারাম সেন) বিবাদী রামমোহন রায়ের চাকরী করিতেছিল এবং সেই সূত্রে কি অবস্থায় এবং কি কারণে রামমোহন রায় লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়াছিল।*

মূল জবানবন্দীতে (examination-in-chief) চতুর্দ্দশ প্রশ্নের উত্তরে বেচারাম সেন বলিয়াছেন, তারিণী দেবীর দেবসেবার জন্য জগমোহন এবং রামমোহন উভয়ে কতক জমীজমা (certain lands) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (were set apart)। এই সকল সম্পত্তির আয় হইতে তারিণী দেবী দেবসেবা নির্ব্বাহ করিতেন। ১২১৮ সনে (১৮১২ সালে) জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে ১২২৩

* Mary Carpenter, *Last Days of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1915, pp. 31-32.

† By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahmin, have exposed myself to the complaining and reproaches of some of my relatives, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depend on the present system.

* Saith that his immediate cause of removal was a dispute which he had with his mother Tarreny Dabi saith he this deponent was at that time living in the service of the defendant Rammohun Roy by which means he became acquainted with the circumstance of the removal of the said Rammohun Roy and the cause thereof.

সন (১৮১৬ সালের শেষ) পর্য্যন্তও এইরূপে উৎপন্ন এজমালি তহবিল হইতেই তারিণী দেবীর ভরণ-পোষণ এবং দেবসেবা চলিত। রামমোহন রায় দেবসেবার খরচ বন্ধ করিয়া দেওয়াতেই বোধ হয় মাতাপুত্রে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাদের সমসময়ে তিনি সপরিবারে রঘুনাথপুরের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বেচারাম সেনের এই কয়টি কথায় মাতা-পুত্রের বিবাদের সন্তোষজনক বিবরণ পাওয়া যায় না। আত্মীয় সভা স্থাপনের সমসময়ে সম্ভবতঃ রামমোহন রায় দেবসেবার খরচ বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বেচারাম সেনের কথা অনুসারে মনে হয়, ১৮১৬ সালের শেষ পর্য্যন্তও তিনি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন নাই। রামমোহন রায়ের পরিবার রঘুনাথপুরে উঠিয়া গেলে, এবং তিনি দেবসেবার টাকা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে, মাতা-পুত্রের বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বেচারাম সেন রামমোহন রায়ের বাড়ী মোকামে মোহরের-গিরি করিত। জেরার উত্তরে বেচারাম বলিয়াছেন—

Saith that he was discharged from the said service on the third of Agraun in the year one thousand two hundred and twenty four owing to this deponent having sided with the Complainant Govindapersaud Roy in a matter regarding their caste in which they differed but that he was not discharged for any misconduct in service saith that about four or five days after he was discharged from the service of the defendant he entered the service of the complainant.

১২২৪ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ (১৮১৭ সালের ১৭ই নবেম্বর) সে উক্ত চাকরি (রামমোহন রায়ের দপ্তরে মোহরেরগিরি) হইতে বরখাস্ত হইয়াছিল। কারণ জাতি সম্বন্ধে বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের সহিত (রামমোহন রায়ের) যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এই সাক্ষী (বেচারাম সেন) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। সে কোন অন্যায় আচরণের জন্য পদচ্যুত হইয়াছিল না। বিবাদীর চাকরি হইতে পদচ্যুতির ৪।৫ দিন পরেই সে বাদীর চাকরি লইয়াছিল।

জাতি সম্বন্ধে বিবাদ অর্থ অবশ্য দলাদলি। গোবিন্দ-প্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের সহিত দলাদলি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে একঘরো করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের রঘুনাথপুরের বাড়ীতে অন্যান্য হিন্দুর বাড়ীর মত দেবসেবা হইত না, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিত না। বোধ হয় এই অপরাধই দলাদলির উপলক্ষ হইয়াছিল। গোবিন্দ-প্রসাদ রায় গ্রামে খুড়াকে একঘরো করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, এবং কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের একুইটি বিভাগে খুড়ার নামে ১৮১৭ সালের ২৩শে জুন এক গুরুতর মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার আর্জ্জির মূল কথা পূর্ব্ব-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দ-প্রসাদ রায় তাঁহার আর্জ্জিতে লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা জগমোহন রায়ের মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ছিল ১৫ বৎসর বা ঐরূপ (an infant of the age of fifteen years or thereabout)। সুতরাং দলাদলির এবং মোকদ্দমা রুজু করিবার সময় গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বয়স হইয়াছিল মাত্র ২০ বৎসর। এইরূপ অপরিণতবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে রামমোহন রায়ের মত প্রবল এবং প্রভাবশালী খুড়ার সঙ্গে স্বেচ্ছায় এমন বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না। লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন তাঁহার মাতামহী তারিণী দেবী। তারিণী দেবীর অনুমতি এবং সহায়তা ব্যতীত গোবিন্দপ্রসাদ রায় কখনই এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। রামমোহন রায় স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায় তারিণী দেবীকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষী মান্য করিয়াছিলেন। তারিণী দেবী জবানবন্দী দিতে আসিলে তাঁহাকে জেরা করিবার জন্য রামমোহন রায় ১৮১৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে কতকগুলি প্রশ্ন (interrogatories) দাখিল করিয়াছিলন। তন্মধ্যে একাদশ প্রশ্নটি এই—

Eleventh interrogatory—Have you not had serious disputes and differences with your Son the Defendant Rammohun Roy on account of his religious opinions and have not instigated and prevailed on your grandson the complainant to institute the present suit against the defendant, as a measure of revenge, because the said defendant hath refused to practice the rites and ceremonies of the Hindu Religion in the manner in which you wish the same to be practiced or performed ? Have not you and the complainant and other members of your family estranged yourself and themselves from all intercourse with the Defendant on account of his religious opinions and writings ? Have you not repeatedly declared that you desire the ruin of the defendant and that there will not only be no sin but that it will be mreitorious to effect the temporal ruin of the Defendant, provided he shall not resume or follow the religious usages and worship of his forefathers ? Have you not publicly declared that it will not be sinful to take away the life of a Hindoo who forsakes the idolatry and ceremonies of worship, usually practiced by

persons of that religion ? Has not the Defendant in fact refused to practice the rites and ceremonies of the Hindoo religion in respect to the worship of Idols ? Have not you, and the complainant and others of defendant's relations had several meetings and conversations on this subject and declare solemnly on your oath, whether you do not know and believe that the present suit would not have been instituted if the Defendant had not acted in religious matters contrary to your wishes and entreaties and differently from the practices of his ancestors ? Do you not in your conscience believe that you will be justified in giving false testimony and in doing everything in your power to effect the ruin of the defendant and to enable the complainant to succeed in the present suit, inasmuch as the defendant has refused to continue the worship of Idols ? Did you not since the commencement of this suit make a personal application to the defendant at his house in Simulea in Calcutta for the grant of a piece of land that the profits thereof might be applied towards the worship of an idol and did not the defendant offer you a large sum of money to be distributed in charity to the poor, but refuse to contribute in any manner to the encouragment of the worship of idols ? Were you not on that occasion exceedingly displeased with the defendant and did you not then express your displeasure and threaten the defendant for having refused to comply with your request ? Declare &c.

ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া আপনার সহিত আপনার পুত্র, এই মোকদ্দমার বিবাদী, রামমোহন রায়ের গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল কি না ? যে রীতিতে আপনি বিবাদীকে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-পর্ব্ব অনুষ্ঠান করিতে বলেন সেই রীতিতে সে তাহা অনুষ্ঠান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনি আপনার পৌত্র বাদী (গোবিন্দপ্রসাদকে) এই মোকদ্দমা রুজু করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন কি না ? ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের এবং রচনাবলীর জন্য আপনি, এই মোকদ্দমার বাদী, এবং আপনার পরিবারে অন্যান্য সকলে, বিবাদীর সহিত সকল প্রকার আহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন কি না ? বিবাদী যদি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়াকাণ্ড এবং পূজা-পর্ব্ব অনুষ্ঠান না করে তবে আপনি বিবাদীর সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, এই কথা, এবং বিবাদীর সর্ব্বনাশ করিলে শুধু পাপ হইবে না বরং পুণ্য হইবে, এই কথা আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন কি না ? আপনি কি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নাই যে, যে হিন্দু হিন্দুগণের দ্বারা বরাবর আচরিত মূর্ত্তি পূজা পরিত্যাগ করে তাঁহাকে হত্যা করিলে পাপ হইবে না ? বিবাদী কি প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধীয় হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অস্বীকার করে নাই ? আপনার মোকদ্দমার বাদীর (গোবিন্দপ্রসাদের) এবং বিবাদীর অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে কি এই বিষয় লইয়া অনেক বৈঠক এবং কথাবার্ত্তা হয় নাই ? আপনি শপথ করিয়া বলুন, আপনি জানেন কি না এবং বিশ্বাস করেন কি না, বিবাদী যদি ধর্ম্ম বিষয়ে আপনার অভিপ্রায়ের এবং অনুরোধ-উপরোধের বিরুদ্ধে কার্য্য না করিত এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আচারের অন্যথা না করিত, তবে এই মোকদ্দমা রুজু হইত না ? আপনি কি মনে মনে বিশ্বাস করেন না যে, যেহেতু বিবাদী মূর্ত্তিপূজা চালাইতে অস্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং বিবাদীকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য এবং বাদীকে এই মোকদ্দমায় জয়ী করিবার জন্য আপনার মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করা ন্যায়সঙ্গত ? এই মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার পর আপনি কি বিবাদীর সিমলার বাড়ীতে স্বয়ং আসিয়া মূর্ত্তি পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিবাদীকে একখণ্ড জমী দান করিতে অনুরোধ করেন নাই ? বিবাদী কি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য আপনাকে অনেক টাকা দিতে চাহে নাই, কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিবার জন্য কোন প্রকার দান করিতে কি সে অস্বীকৃত হয় নাই ? সেই ঘটনার সময় আপনি কি বিবাদীর প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন না, এবং বিবাদী আপনার অনুরোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া আপনি কি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন না, এবং বিবাদীকে কি ভয় দেখাইয়াছিলেন না ?

ইংরেজী বেদান্তসারের মুখবন্ধে এবং বেচারাম সেনের জবানবন্দীতে যে বিবাদের আভাস পাওয়া যায়, এখানে রামমোহন রায় নিজে তাহা প্রশ্নাকারে খোলাসা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগের তুল্য অপরাধ নাই। এই অপরাধে পিতামাতা পুত্রকে "ত্যাজ্যপুত্র" (disinherit) করিতেন। রামমোহন রায়কে আর "ত্যাজ্যপুত্র" করিবার উপায় ছিল না। তারিণী দেবী স্বধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে তাহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য পৌত্র গোবিন্দপ্রসাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের একুইটি বিভাগে এই মোকদ্দমা রুজু করাইয়াছিলেন।

মাতা-পুত্রের এই বিরোধের সংবাদ সেকালে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, এবং ইউরোপীয় সমাজেও পৌঁছিয়াছিল। কলিকাতার টাইম্‌স্ পত্রের সম্পাদক মসিয়ে দাকোস্তা (D'Costa) ১৮১৮ সালের ৮ই নবেম্বর লিখিয়াছিলেন—

সকলেই জানে, রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার (ধর্ম্ম এবং সমাজ) সংস্কারের সকল উদ্যোগের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রবাদের সত্যতা সপ্রমাণ করে। তাঁহারা কেহই, এমন কি তাঁহার স্ত্রীও, তাঁহার সহিত কলিকাতা আসিতে চাহেন না। এই নিমিত্ত তাঁহারা বর্দ্ধমানে (তৎকালে হুগলী জেলায়) যেখানে বাস করেন সেখানে রামমোহন রায় কদাচিৎ গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তাঁহার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পৌত্তলিকত ধ্বংসের চেষ্টায় রামমোহন রায় যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহার ধর্ম্মান্ধ মাতাও অবিরত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সেইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন।*

রামমোহন রায় যদি ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের শিক্ষার ভার পাইতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমার সকল ইংরেজী কাগজপত্রেই গোবিন্দপ্রসাদের বাংলা দস্তখৎ দেখা যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে গোবিন্দপ্রসাদ ইংরেজী জানিতেন না। রামমোহন রায়ের পক্ষে গোবিন্দপ্রসাদের শিক্ষার ভার নিজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা, এবং তারিণী দেবীর পক্ষে তাহাতে আপত্তি করা, দুইই স্বাভাবিক। সুতরাং দাকোস্তার এই সংবাদ অবিশ্বাস করা যায় না। মাতা-পুত্র উভয়ের মত বিভিন্ন হইলেও, মন একই রূপ উপাদানে গঠিত ছিল। উভয়ের মনেরই প্রধান অঙ্গ ছিল, গভীর বিশ্বাস এবং বজ্রদৃঢ় সংকল্প। এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মাতা-পুত্রের মধ্যে যখন ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন সেই বিরোধ যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

উপরে উদ্ধৃত তারিণী দেবীর জেরার একাদশ প্রশ্নের শেষ ভাগ পাঠ করিলে দেখা যায়, মোকদ্দমা রুজু হইবার পর তারিণী দেবীর মন একটু নরম হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কলিকাতায় সিমলার বাড়ীতে আসিয়া রামমোহনকে বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, তুমি নিজে মূর্ত্তি পূজা না-ই বা করিলে; তুমি দেবসেবার জন্য কিছু সম্পত্তি দান কর।" মোসলমান নবাব এবং বাদসাহগণ ফরমান সম্পাদন করিয়া এইরূপ অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মাতার এই প্রার্থনায় রামমোহনের মন গলিল না। তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য অনেক টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু মূর্ত্তিপূজার জন্য সূচ্যগ্র ভূমি দিতে সম্মত হইলেন না। সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা চলিতে লাগিল।

এই যুগে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করা বহু ব্যয়সাধ্য এবং সর্ব্বস্বান্তকর ছিল। ১৮২৯ সালের ৩১শে অক্টোবরের (১২৩৬ সালের ১৬ই কার্ত্তিকের) "সমাচার দর্পণে" লিখিত হইয়াছে—

গত সোমবার ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্ত্তমান টর্ম্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিম কোর্টে বিচারহওনার্থ কেবল পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে টর্ম্মের আরম্ভকালে বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না। হিন্দু লোকেরা এখন ভুক্তভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিম কোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা করণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিম কোর্টে অমুকের দুই তিনটা এক্‌টির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতেন আমাদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন না।*

সুপ্রিম কোর্টের একুইটীতে মোকদ্দমা করিয়া এক পক্ষে গোবিন্দপ্রসাদ রায় এবং তারিণী দেবী, এবং অপর পক্ষে রামমোহন রায়, যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। দুই বৎসর মোকদ্দমা চালাইবার পর, ১৮১৯ সালের ২৪শে আগষ্ট, গোবিন্দপ্রসাদ রায় কোর্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা তখন এমন কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে পপার (দরিদ্র) রূপে মোকদ্দমা করিতে না দিলে তিনি আর মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেছেন না। এই আবেদনের সমর্থনে গোবিন্দপ্রসাদ রায় ঐ তারিখে এফিডেবিট করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায্য দেনা পরিশোধ করিবার পর তাঁহার একশত আর্কট টাকা মূল্যের সম্পত্তি, পরিধানের কাপড়-চোপড় এবং বিছানাপত্র ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।† কোর্ট প্রথমতঃ গোবিন্দপ্রসাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাহাকে পপার রূপে (অর্থাৎ সরকারী ব্যয়ে) মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তারপর রামমোহন রায় যখন সাক্ষীসাবুদ দিয়া দেখাইলেন যে তখনও গোবিন্দপ্রসাদের বার হাজার টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি এবং ১৬৯০৲ টাকা কর্জ্জ লাগান আছে তখন কোর্ট সেই অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। ইহার পর গোবিন্দপ্রসাদের এটর্ণি এবং ব্যারিষ্টার আর কোর্টে উপস্থিত হয় নাই, এবং শুনানীর দিন সওয়াল জবাব করে নাই। হয়ত তখন

---

* It is known that every member of his family verifies the proverb, by opposing with greatest vehemence all his projects of reform. None of them, not even his wife, would accompany him to Calcutta; in consequence of which he rarely visits them in Bordouan, where they reside. They have disputed with him even the superintendence of the education of his nephews; and his fanatical mother shows as much ardour in her incessant opposition to him, as he displays in his attempts to destroy the idolatory of the Hindoos." Mary Carpenter, *op. cit.* p. 54.

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা", প্রথম খণ্ড, ১১৫ পৃঃ (সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত)।

† Saith that he this Deponent is not after payment of all his just Debts worth the sum of one hundred Arcot Rupees in the world save and except the wearing apparel and bedding of him the Deponent.

গোবিন্দপ্রসাদের এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের হস্তে ব্যারিষ্টারের ফি দিবার উপযোগী নগদ টাকা ছিল না। আমরা মোকদ্দমার বিবরণে দেখিতে পাইব, সওয়াল-জবাবে গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের ব্যারিষ্টারের কিছু বলিবারও ছিল না। এই মোকদ্দমায় গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে তারিণী দেবীকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে হাজির করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সপিনা জারি করা হইয়াছিল। তারিণী দেবী জবানবন্দী দিতে উপস্থিত হইবেন এই আশঙ্কায় রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে জেরার প্রশ্নও দাখিল করা হইয়াছিল এই কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তারিণী দেবী জবানবন্দী দিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহার কারণ কি? আবার কি তাঁহার মন নরম হইয়াছিল? কিন্তু এইরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। তারিণী দেবীর সাক্ষ্য না দিবার এক কারণ হইতে পারে, তিনি শপথ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার কঠিন মন যে তখনও নরম হয় নাই তাহার প্রমাণ, গোবিন্দ প্রসাদের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার এক বৎসর তিন মাস পরে, তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী ১৮২১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে সুপ্রিম কোর্টের একুইটীতে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আর একটি মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। তারিণী দেবীর অনুমতি ব্যতীত এই মোকদ্দমা রুজু করা হইতে পারিত না। গোবিন্দপ্রসাদ রায় দাবী করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের অধিকৃত গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বর নামক দুই তালুকে তাঁহার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ। গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গা দেবী নিজের খরিদা সম্পত্তি বলিয়া এই দুইখানি তালুকের ষোল আনাই দাবী করিয়াছিলেন। ১৮২১ সালের ৩০শে নবেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দুর্গা দেবীর দাবী ডিসমিস্ করিয়াছিলেন। তারপর তারিণী দেবীর এবং তাঁহার অনুগত দুর্গা দেবী এবং গোবিন্দ-প্রসাদের আর কোন মোকদ্দমা করিয়া রামমোহন রায়ের কতক সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবার উপায় ছিল না। এই দুইটি মোকদ্দমার ফলে গোবিন্দপ্রসাদ বোধ হয় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং এখন চাকরীর জন্য খুড়ার শরণাগত হওয়া ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। ১৮২১ সালে ডিগবী সাহেব বর্দ্ধমানের কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮২২ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে বোর্ড অব্ রেভিনিউর সেক্রেটারীর বরাবরে লিখিত একখানি চিঠিতে ডিগবী সাহেব লিখিতেছেন, তিনি গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে আবগারী মহালের তহশীলদার মনোনীত করিয়াছেন, এবং দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাঁহার জামীন হইতে সম্মত হইয়াছেন। সুতরাং খুড়া ভাইপোর মিলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু মাতা-পুত্রের পুনর্ম্মিলন কখনও ঘটিয়াছিল কি? ডাক্তার কার্পেণ্টারের লিখিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ বিষয়ে এই বিবরণ আছে—

"রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। স্বার্থপর মন্ত্রণাদাতৃগণের পরামর্শানুসারে তাঁহার মাতা তাঁহার ঘোরতর শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগে তাঁহার মাতা সুবুদ্ধিমতী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাবে তিনি পুত্রের ঘোরতর শত্রুগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন কিন্তু মাতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। স্নেহোজ্জ্বল নয়নে তিনি (রামমোহন) আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি (মাতা) জানিতেন রামমোহনের মতই সত্য, তিনি পৌত্তলিক আচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারেন নাই। শেষবার জগন্নাথ তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "রামমোহন, তোমার কথাই সত্য। আমি অবলা নারী। এই সকল আচার-অনুষ্ঠান আমাকে শান্তি দান করে; এই বৃদ্ধ বয়সে আমি ইহা-দিগকে ত্যাগ করিতে পারি না।" জগন্নাথ তীর্থে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া তারিণী দেবী এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন। (জগন্নাথ যাত্রাকালে) তিনি কোন পরিচারিকা সঙ্গে লইতে সম্মত হয়েন নাই। পথে তাঁহার আহারের বা আরামের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাও করিতে দেন নাই। জগন্নাথে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীমন্দিরে ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই খানে (জগন্নাথে) তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল (তদধিক না হউক প্রায় একবৎসর কাল) অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইদানীং আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মাতা (উভয়ের মধ্যে) যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বর যে এক অদ্বিতীয়, এবং হিন্দু কুসংস্কার যে বিফল, এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।"*

এই বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমায় যে ক্ষতি হইয়াছিল তজ্জন্য রামমোহন রায় যত না দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমত যে তাঁহার মাতাকে বেদনা দিয়াছিল তজ্জন্য তিনি দুঃখিত ছিলেন ততোধিক। মাতার জেরার জন্য রামমোহন রায় যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার মনের বিরক্তির

* Mary Carpontor, *op. cit*, pp. 9-10. অনুবাদ ঠিক শব্দানুগত নহে, ভাবানুগত।

যে-পরিচয় পাওয়া যায়, কালে তাহা লোপ পাইয়াছিল, এবং মাতার প্রতি স্বাভাবিক মমতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পাঁচ বৎসরব্যাপী দলাদলির এবং বহুব্যয়সাধ্য মোকদ্দমার পর তারিণী দেবী অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রামমোহনকে তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করা অসাধ্য; সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ আত্মপ্রকাশের অবকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুত্রের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংসর্গে বাস করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বরাবরই মাতুল রামমোহন রায়ের অনুগত ছিলেন। গুরুদাস এবং রামমোহন রায়ের জ্যেঠতত ভাই রামতনু রায়—এই দুইজনে বোধ হয় রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন সুপ্রিম কোর্টের একুইটী বিভাগে গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন, ১৮১৮ সালের ২৭শে আগষ্ট, রামমোহন রায় নিজপক্ষের সাক্ষীদিগের জন্য প্রশ্নমালা (interrogatories) দাখিল করিয়াছিলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে এই সকল সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করিয়া হলপ করান হইয়াছিল। প্রশ্নমালার সঙ্গেই হলপের বিবরণ আছে। এই বিবরণে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রামতনু রায়, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় এই চারিজন সাক্ষীর প্রত্যেকের সম্বন্ধে এই মন্তব্য লিখিত আছে—

> This witness was not sworn in the ordinary way but in the manner declared by him to be the most binding on his conscience and admitted to be so by the Court Pundit by whom the oath was administered.

এই সাক্ষীকে প্রচলিত রীতিতে হলপ করান হয় নাই, কিন্তু যে রীতির হলপ তাঁহার বিবেককে একান্ত বশীভূত করিতে পারিবে বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন সেই রীতিতে তাঁহাকে হলপ করান হইয়াছিল।

কোর্টের যে পণ্ডিত হলপ করাইয়াছিলেন তিনি ইহা মানিয়া লইয়াছিলেন।

গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমার নথীতে রামমোহন রায়ের জবাব (answer of the defendant) পাওয়া যায় না। দুর্গা দেবী বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমায় রামমোহন রায় ১৮২১ সালের ৩ই সেপ্টেম্বর যে জবাব দাখিল করিয়াছিলেন তাহার শেষভাগে লিখিত আছে—

> This answer was taken and the abovenamed Defendant Rammuhun Roy was duly sworn to the truth thereof according to his faith this 3rd day of September 1821.
>
> The Defendant in addition to the ordinary mode of swearing for a person of his caste and condition held in his Hands at the time the Vedant.

অর্থাৎ রামমোহন রায় জবাব দাখিল করার সময় নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে হলপ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তখন তাঁহার হাতে "বেদান্ত" ছিল।

যে ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে রামমোহন রায় স্বয়ং হলপ করিয়াছিলেন, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রামতনু রায় প্রভৃতিও বোধ হয় তদনুসারে হলপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দুর্গা দেবীর মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইবার পর গোবিন্দপ্রসাদও খুড়ার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তারিণী দেবী তখন চিরতরে লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীর দেবসেবা ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ যাত্রা করিলেন। তিনি সঙ্গে কোন পরিচারিকা লইলেন না, এবং বোধ হয়, পুত্রকে পথের সুবিধার জন্য কোন ব্যবস্থাও করিতে দিলেন না। প্রায় ভিখারিণীর বেশে জগন্নাথ গিয়া, মন্দিরে ঝাড়ু দেওয়ার ব্রত পালন করিয়া, বৎসরেক পরে তিনি বৈষ্ণবের সেই মহাতীর্থক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার মাতা তারিণী দেবীর বিরোধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

পূর্ব্ব পরিচয়

ধনী জমিদার শচীন্দ্রনাথ প্রয়াগে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলায় তার সুন্দরী পত্নী কমলা ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে বহু অনুসন্ধানের পর হতাশ-ভগ্নচিত্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লণ্ডনে পৌঁছেই জ্বরে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে। লণ্ডনে পালিত পিতৃহীন চাকুরীজীবী পার্ব্বতী অক্লান্ত সেবায় তাকে সুস্থ করে এবং বিবাহিত না জেনে তাকে ভালবাসে। পরে শচীন্দ্রের অনুরোধে পার্ব্বতী ভারতবর্ষে ফিরে কমলার স্মৃতিকল্পে এক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুরী।

এদিকে বৎসরের পর বৎসর নারীপ্রতিষ্ঠানের চক্রে আবর্ত্তিত কার্য্যপরম্পরায় পার্ব্বতীর মন এক এক সময় শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তবু তার অন্তর্নিহিত প্রেমের মোহে শচীন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে দূরে যেতে পারে না। শচীন্দ্রের অন্তরে কমলার স্মৃতি ক্রমে নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে, তবু স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠতায় অভ্যস্ত তার চিত্ত পার্ব্বতীর প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রেমের প্রভাবকে জোর ক'রে অস্বীকার করে অথচ পার্ব্বতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সূত্রে তার আকর্ষণ বেড়ে চলে। এই দ্বন্দ্বের আন্দোলনে তার চিত্ত দোলায়মান।

প্রয়াগ থেকে মাতাল উপেন্দ্রনাথ কমলাকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এনে তার বাড়ীতে বন্ধ করে এবং অত্যাচারে একদা পাশের বাড়ীতে নন্দলাল ও তার স্ত্রী মালতীর আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে পড়ে। কঠিন পীড়ায় সমস্ত নামের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। নন্দ কমলের রূপে আকৃষ্ট। কমলা এই দুর্দ্দৈব থেকে মালতী ও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এক হাসপাতালে নার্সের কাজ শিখতে যায়। সেখানে ডাক্তার নিখিলনাথের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করে। এদিকে স্নেহময়ী সরলা মালতী কমলার পুত্র অজয়কে তার নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের সব স্নেহটুকু উজাড় ক'রে ভালবেসেছে— এ বাড়ীতে কমলাকে নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোৎস্না।

নিখিলনাথ জনহিতব্রতী। একদা বিপ্লবী মেয়ে সীমার আহ্বানে শ্রীরামপুরে গিয়ে তার পূর্ব্ব নায়ক সত্যবানকে এক পোড়ো বাড়ীতে মৃতকল্প অবস্থায় দেখে। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে তার অসাধারণ ব'লে মনে হয়। সত্যবানের মুখে পুলিসের গুলিতে তাদের দলের সকলের মৃত্যু, নিজে আহত অবস্থায় সীমার সাহায্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বনে জঙ্গলে, পরিত্যক্ত কুটীরে পালিয়ে বেড়ানোর ইতিহাস, সীমার বীরত্ব এবং দেশপ্রীতির কথা শুনে এবং নিজের চোখে তার শ্রান্তিহীন একনিষ্ঠতা দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হয়।

বিপ্লবের আগুনে এতগুলি মহামূল্য প্রাণকে বিসর্জ্জন দেওয়ায় মৃত্যুকালে অনুতপ্ত সত্যবান সীমাকে এই আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে নিখিলনাথকে বলে।

নন্দলাল হাসপাতালে আত্মীয় হিসাবে কমলার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যায় এবং তার বিকৃতচিত্তের আক্রোশে একদা নিখিলনাথ সম্বন্ধে কমলাকে অপমান করে এবং তারই সঙ্কোচে কিছুদিন তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

মালতীর বহু সাধ্য সাধনার পর মালতীর সঙ্গে সে কমলের হাসপাতালে গেল।

কমলা দুশ্চিন্তায় মাথার যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে পড়েছিল।

সত্যবানের মৃত্যু। পথ দেখিয়ে নিখিলকে নিয়ে সীমার পলায়ন এবং নিখিলের অনুনয় সত্ত্বেও কঠিন সুরে নিখিলকে ষ্টেশনের পথ দেখিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে সীমার বনের মধ্যে প্রবেশ।

শচীন্দ্র মনে মনে বহু তোলপাড়ার পর, পার্ব্বতীর প্রতি করুণাতেই বোধ করি, তার প্রতি তার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের প্রেম নিবেদনের চেষ্টায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে উদ্যত হ'ল কিন্তু পার্ব্বতীর সামনে সে চপলতা করতে মনে বাধা পেয়ে নিবৃত্ত হ'ল।

৩৭

খাওয়া-দাওয়ার পর লঞ্চে ফিরে যাবার পথে পার্ব্বতী তাকে বললে, "আপনি কেন আজ এত বিচলিত হয়েছেন? আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে এ-রকম মন নিয়ে কোন কিছু ভেবে স্থির করবেন না। তাতে ফল ভাল হয় না। নিজেকে সম্পূর্ণ বোঝবার অবসর বা অবস্থা মানুষের তখন থাকে না, যখন—"

শচীন্দ্রের মন আবার কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে লেগে গেল, "দেখ, যে-কথা আজ আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি সে-কথা আজকের বিচলিত মন নিয়ে আমি ভাবি নি। আমি অনেক দিন থেকেই যা নিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করছি তাকেই তোমার কাছে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে ঠিকমত পারি নি, কিন্তু জানি সে তুমি একরকম ক'রে বুঝে নিয়েছ।"

পার্ব্বতী বাধা দিয়ে বললে, "বুঝেছি বলেই আপনাকে প্রশ্রয় দিতে আমার বেধেছে। আপনি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে চিন্তা করবার অবসর নিন। আমি আমার প্রতি আপনার করুণার অবকাশে আপনার চিরদিনের দুঃখের কারণ ঘটতে দেব না। তা ছাড়া আমার পক্ষেও—" বলে সে থেমে গেল।

পার্ব্বতীর কথাগুলির মধ্যে আহত অভিমানের নীরসতা এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল যে শচীন্দ্রের অভিমানকে তা আঘাত না ক'রে পারল না। তবু একটু শুষ্ক পরিহাসের হাসি মুখের উপর টেনে এনে সে বললে, "দুঃখের কারণই ত এতদিন ছিল, নিজের প্রতি নিষ্করুণ ছিলুম ব'লে। আজ তারই প্রতিকার করতে চাইছি। এখন করুণাটা তোমার উপর, না, আমার নিজের, তাই আজ পরখ ক'রে দেখতে চাই। নইলে দেখছ না—"

পার্ব্বতী স্পষ্টই দেখলে যে শচীন্দ্রের চিত্ত আজ তার কথা গভীর ভাবে গ্রহণ করবার অবস্থায় নেই। সে আজ সকল কথাকেই লঘুতার স্পর্শে আপাত মনোরম ক'রে তুলতে চায়; এবং যে-প্রেম একপ্রকার নিবেদন করাই হ'য়ে গেছে তাকে মন্থর-ভাবে কথাটাকে আপাতত চাপা দিয়ে বিদায় নিয়ে যাওয়া তার অভিপ্রায়। সে শচীন্দ্রের কথা অসমাপ্ত রেখে তাকে বাধা দিয়ে বললে, "আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি। দিনে দিনে তিলে তিলে যাঁর স্মৃতি আপনার সমস্ত জীবন সমগ্র অস্তিত্বকে পূর্ণ করেছে, সার্থক করেছে, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানেই তার মহা অবসান ঘটল এমন মিথ্যা কথা আপনি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না; আমাকেও না।"

শেষ কথাগুলিতে শচীন্দ্রকে যেন কশাঘাত করলে। সে চুপ ক'রে চলতে লাগল। নিজের বাচালতা ও লঘুতায় নিজেকে এমন মূল্যহীন করাতে নিজের উপর তার বিরক্তির আর সীমা রইল না। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে মনে আজকের সমস্ত ঘটনা সে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখলে এবং নিজের প্রেম যে সে সুস্পষ্ট ক'রে নিবেদন করে নি এই কথা তার অভিমানমূঢ় চিত্তে যেন কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করলে। পার্ব্বতীর উক্তির সূত্রে যেন সে আপাতমুক্তির পথ খুঁজে পেল। সে নিজেকে এই ব'লে বোঝাল যে, পার্ব্বতীর কথাই ঠিক। সত্যিই পার্ব্বতীর দুঃখদৈন্যপূর্ণ বঞ্চিত জীবনের প্রতি করুণাতেই তার এই 'রজ্জুভ্রম'। হয়ত কৃতজ্ঞতাকেই সে প্রেম বলে মনে করছে। হয়ত পার্ব্বতীর গুণের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতিত্বকে সে প্রেম বলে ভুল করেছে। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সে দেখলে, সে তার নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখার চেষ্টায় তিলে তিলে পলে পলে নিজের সমস্ত বিত্ত সমস্ত শক্তি সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ ক'রে চলেছে। দেখলে যে এই দীর্ঘ চার-পাচ বৎসরের মধ্যে এ-ভিন্ন তার অন্য কাজ ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না; এই প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। সে আরও দেখলে, এই নারী—যার প্রতি আকর্ষণকে সে আজ প্রেম বলে কল্পনা করছে—এই নারীও সেই বৃহৎযজ্ঞের সমিধ মাত্র; দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচে সে তাকে এই যজ্ঞে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। যে-স্মৃতি এত বৃহৎ হয়ে তার সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোত রূপে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে তাকে তার জীবন থেকে বাদ দেবে কোন্ উপায়ে?

এমনি ক'রে নিজেকে বুঝিয়ে বিদায় নিয়ে সে লঞ্চে গিয়ে উঠল।

পার্ব্বতীর দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করার মত মন তার স্বচ্ছ ছিল না। চিন্তা সে সূক্ষ্মভাবেই করত, কিন্তু সে-চিন্তা ছিল একদেশদর্শী। পার্ব্বতীর মনের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলে তার চিরবিধুর চিত্তের শান্তি এবং শ্রান্ত নয়নের নিদ্রা হরণ ক'রে নিয়ে তাকে তার শূন্য গৃহে এবং শুষ্ক কর্ম্মক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়ে গেল, শচীন্দ্রের আত্মপ্রতারিত আত্মকেন্দ্রানুগ চিত্তে তার খবর পৌঁছল না। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা না ক'রে নিতান্ত সহজ ভাবে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ-কথা তার কাছে অস্পষ্ট থাকত না যে, চার বৎসর পূর্ব্বে তার পত্নীকে স্মরণ ক'রে যে-উদ্যোগ সে আরম্ভ ক'রেছিল তার পত্নী সেই বিপুল আয়োজনের অন্তরালে একদিন নিশ্চিহ্ন-সমাধি লাভ করেছে। কত দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়েছে, কমলা তার মনের স্মৃতিপটে ছায়াপাত মাত্র করে নি; কমলাপুরী হয়েছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টির প্রত্যেক বর্গইঞ্চি তার চিত্তে পার্ব্বতীর জীবন্ত প্রত্যক্ষতায় পরিপূর্ণ।

নিজের গৃহকোটরের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে একটা অসীম শূন্যতা একটা অপূর্ব্বানুভূত রিক্ততা পার্ব্বতীর সমস্ত বুকের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠল। শয়নকক্ষের তপ্ত আবেষ্টন পার্ব্বতীর কাছে মৃত্যুপারের নিশ্বাসনিরোধী সমাধিগহ্বরের মত মনে হ'তে লাগল। দ্রুতপদে বারান্দায় বেরিয়ে সে

শচীন্দ্রের পরিত্যক্ত তার নিত্য আশ্রয়দাত্রী আরামকেদারাটির ক্রোড়ে এসে এলিয়ে পড়ল।

শচীন্দ্রের সাগ্রহ আত্মনিবেদনের উচ্ছ্বাসকে রূঢ় আঘাতে সংযত ক'রে তার নিজেরই উন্মুখ বুভুক্ষিত চিত্তকে যে সে বঞ্চিত করেছে সে-কথা তার মনে এল না। ঐ যে বিরহ-বিধুর বৃহৎশিশু নিতান্ত নির্ভরপরায়ণ হৃদয়টিকে নিয়ে একান্ত ব্যাকুল বিশ্বাসে এসে তার হৃদয়-বাতায়নে তার স্নেহের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা ক'রে বড় আশায় তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল মূঢ় অনাথের মত শচীন্দ্রের সেই মুখের ভাবখানা পার্ব্বতীর প্রেমার্ত্ত চিত্তকে পীড়িত করতে লাগল। তার নিজের আচরণ তার কাছে অহঙ্কারপ্রসূত কৃত্রিম আত্মসম্মানের অভিনয় বলে মনে হ'ল। শচীন্দ্রের গভীর স্নেহের বাস্তব স্পর্শ যেন সে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করলে। তার অনুতপ্ত চিত্ত মনে মনে শচীন্দ্রের ব্যথিত মূর্ত্তিকে কল্পনায় তার কাছে টেনে নিয়ে স্নেহে সমাদরে তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে যেন বারম্বার সান্ত্বনা দিতে লাগল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি বাধা মানতে চাইল না এবং মনে মনে সে সংকল্প করলে যে এমন বেদনাপীড়িত চিত্তে শচীন্দ্রকে সে বিদায় নিয়ে যেতে দেবে না। ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে হাসিমুখেই সে শচীন্দ্রকে বিদায় দিয়ে আসবে; জানিয়ে আসবে যে তার মনের তিক্ততা দূর হ'য়ে গেছে, তার মনে আর কোন সংশয় নেই।

ভোরের দিকে চেয়ারের উপরেই তার ক্লান্ত মাথাটা হেলিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালের রোদের রূঢ় আঘাতে চোখ মেলে যখন তার ঘুম ভাঙল, লঞ্চ তখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছে। মনটা তার অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হ'য়ে গেল, কিন্তু কাল রজনীর অনুতাপের তীব্রতা তার মনের মধ্যে যেন স্থান পেল না। শচীন্দ্রের প্রতি তার আচরণের রুক্ষতা তার মনে বেদনার সঞ্চার করলেও তার গোপনতম চিত্তের নিভৃতে যেন একটা অনুমোদনের সুর তার ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

পার্ব্বতী নিজেকে এই অলস কল্পনাময় ভাবরাজ্যের অবসাদ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে তার দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের নীরন্ধ্র অনবসরের মধ্যে টেনে নিয়ে উপস্থিত করলে। মনে মনে বললে, "না, শান্তিপূর্ণ রসোত্তপ্ত গৃহবিলাস আমার জন্য নয়; আমৃত্যু এই সমাধিগহ্বরে বসে মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারের ব্রত আমার। দুর্ব্বল হ'লে আমার চলবে না।"

ভোরবেলা লঞ্চ ছেড়ে যাবার সময় শচীন্দ্রের অভ্যাসমত সে লঞ্চের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে শুকতারা তখন ম্লান হয়েছে, আকাশ উজ্জ্বল হ'তে দেরী নেই। আসন্ন আলোকোচ্ছ্বাসের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছতিমিরাবরণে জলস্থল আকাশের উপর যেন একটা অসাড়তার মোহ। গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী ঘাটটুকু যখন ছাড়িয়ে গেল তখন শচীন্দ্রের মনটা হঠাৎ বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। কালকের বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিদারণ-রেখা প'ড়ে গিয়েছে। সেই কথাটাই সে তার মনের মধ্যে সারা রাত একটা চাপা স্বপ্নের মত যেঁতে বসেছিল, এতক্ষণ সে কথা মনে হয় নি। প্রতিবারকার বিদায়ের মধ্যে আগামী বারের মিলনের আশা নিয়ে তারা দূরে যায়। তার সঞ্জীবনীশক্তি তাদের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টাকে প্রাণে, আনন্দে, সৌন্দর্য্যে একে অন্যের কাছে আরও মধুরতর নিকটতর ক'রে তোলে। পার্ব্বতীর শেষ কথার কোন উপযুক্ত প্রত্যুত্তর সে দেয় নি; অথচ তার ব্যবহারে পার্ব্বতীকে আঘাত করেছে অল্প নয়। বিদায়-মুহূর্ত্তে পার্ব্বতীর বেদনাবিবর্ণ মুখ, এবং হাত না বাড়িয়ে 'গুড্ বাই' বলার ভঙ্গীটা স্মরণ ক'রে তার মনটা পীড়িত হ'তে লাগল। এতক্ষণে নিজের আচরণের বিসদৃশতা অনুভব সে করতে পারলে। বুঝতে পারলে যে, উচ্ছ্বাসের আবেগে পার্ব্বতীকে প্রেম-নিবেদন করাও চলে না, আত্মরক্ষার্থে সাধু সাজাও তার কাছে নিষ্প্রয়োজন। আর যাই হোক, পার্ব্বতীর সঙ্গে আচরণে লঘুতা চলবে না। পার্ব্বতীর সমাজ নেই, কোন মিথ্যা আচারের আবরণ তার আবশ্যক করে না। তার সঙ্গে ব্যবহারে খাঁটি হওয়া চাই। সেই শক্তি মনের মধ্যে তাকে পেতেই হবে—তা সে পার্ব্বতীকে গ্রহণ করার দিক থেকেই হোক বা তাকে প্রত্যাখ্যানেই হোক। এখনই লঞ্চ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্ব্বতীর কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে তার মনটা যেন সুস্থ হয় এমনি তার মনে হ'তে লাগল।

নদীর তীরে তীরে গ্রামের ঘাটে তখন ভোরের জাগরণ সুরু হয়েছে। সেই সহজ সরল স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার অনাময় শান্তি তার মনকে অকারণে ব্যথিত ক'রে তুললে। বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্ত জলরাশি বিদীর্ণ ক'রে লঞ্চ তখন পূর্ণ বেগে

ছুটে চলেছে। একান্ত অসহায় বন্দীভাবে শচীন্দ্র সেই বিধূনিত ফেনপুঞ্জের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

৩৮

নিখিলনাথ কিছু দিন কমলের কোন সংবাদ নিতে পারে নি। তার চিত্ত সীমার চিন্তায় এমন নিবিষ্ট ছিল যে নিতান্ত অবশ্যকর্ত্তব্য ছাড়া সে হাসপাতালের আর কারও সংবাদ নেবার অবসর পায় নি। আজ কমলের পীড়ার সংবাদে সে নিজের এই আবিষ্টতা প্রথম লক্ষ্য করলে এবং লজ্জিত হয়ে তাকে দেখতে গেল। মনোযোগ দিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করলে এবং নার্স বিন্দুকে ডেকে মাথায় বরফ দিতে উপদেশ দিয়ে, একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দিয়ে সে চলে গেল।

কিছুদিন যাবৎ নিখিলের নিজের মনও বিশেষ চিন্তা ও উদ্বেগে পীড়িত ছিল। সেই যে অন্ধকার আকাশের তলে সীমাকে সে অসীম বিশ্বের অন্তরালে কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে, তার পর এই ক-মাস অতীত হতে চলল বহু অনু-সন্ধানেও সে তার সংবাদ পায় নি।

যে নিবিড় স্পর্শটুকু সীমা তার কোমল করপল্লবের আকর্ষণে তার অন্তরের মধ্যে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত ক'রে দিয়ে গেল, সে তার অন্তরের সুপ্ত প্রেমের রক্তকমলকোরককে শতদলে পরিণত করেছে। সে যে সত্যবানের হাতের দান এ-কথা তার কাছে বাহ্য মাত্র, সে যে সীমার হাতের সুদৃঢ় প্রত্যাখ্যান এই কথাটাই তার পুরুষের চিত্তকে অধিকতর মথিত করেছে। নারীহৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের যে স্বাভাবিক চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম তারই ব্যত্যয়ে আজ তার চিত্ত এই দুরন্ত মেয়েটির প্রতি উদ্বিগ্ন আগ্রহে প্রধাবিত; সর্ব্বনাশের ঝোড়ো হাওয়ায় ছিন্ন-পাল ভগ্নতরী নিয়ে যে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিল, হায় রে, তাকে কোন্ মৃত্যুহীন প্রেমের জীবনতরীর সাহায্যে সে ফিরিয়ে আনবে?

নিখিল চ'লে যাবার পর বিন্দুকে আলোটা নিবিয়ে দিতে অনুরোধ ক'রে, কমল চুপ ক'রে পড়ে রইল। রাজ্যের খামখেয়ালী চিন্তা পঙ্গপালের মত তার সমস্ত সংজ্ঞারাজ্য জুড়ে অকারণ চাঞ্চল্যে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। তার ঘুম কোথায় ছুটে গেল এবং গভীর রাত্রিতে এক সময়ে অত্যন্ত অকারণে তার নিজের মস্তিষ্কের দ্রুত প্রবাহিত রক্তস্রোতের উত্তেজনায় সে বিছানা থেকে নেমে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ পায়ের শব্দে জেগে বিন্দু উঠে বললে, "ওমা, ওকি ভাই, কি চাই? আমাকে ডাক্‌লে না কেন? যাও, শোও গে, আমি দিচ্ছি। কি চাই বল ত?"

কমল তৎক্ষণাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পারলে যে চিন্তার উত্তেজনায় সে উঠে পড়েছিল; এবং কোন প্রকার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ সহসা সংগ্রহ করতে না পেরে তাড়াতাড়ি বললে, "দু-একটা বিস্কুট কি একটু মিশ্রী যদি দাও, একটু জল খাব। হঠাৎ কেমন খিদে পেয়ে গেছে, মনে হচ্ছে।" কথাটা সত্য নয় এবং কমলের পক্ষে আহারের চেষ্টা তখন প্রায় অত্যাচারের সামিল, তবু তাকে বিন্দুর সযত্নসংগৃহীত সেই কণ্ঠরোধকারী শুষ্ক বিস্কুটখণ্ড জলের সাহায্যে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করতেই হ'ল,—এবং নিজের এই অবস্থা স্মরণ ক'রে এত কষ্টেও তার হাসি এল।

বিন্দু বললে, "যাক্, তবু দু-দিন পরে মুখে একটু হাসি ফুটল। যা মুখ করেই ছিলে। মাথাটা একটু কমেছে, না?"

কমল বললে, "হ্যাঁ ভাই, মিছিমিছি তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। যাও শোও গে, আর কিছু দরকার হবে না। দরকার মত ওটুকু আস্তে আস্তে খাব'খন।"

জ্যোৎস্না কতকটা সুস্থ বোধ করছে কল্পনা ক'রে বিন্দু আবার স্বস্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

চিন্তার কূল পাওয়া যায় না। নন্দলালের অনুতাপ-বিড়ম্বিত পত্র তাকে কোন সান্ত্বনার পথ দেখায় না। এখনও কিছুদিন হাসপাতালের শিক্ষাকালের অবশিষ্ট আছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে এই সময়টুকু তার কোনক্রমে অতিবাহিত করা ছাড়া উপায় নেই। তার সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং তার নিজের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্বাধীনতার পথ এ ছাড়া সে কিছু চিন্তা ক'রে উঠতে পারে না। তা ছাড়া মালতীর সম্বন্ধে তার কর্ত্তব্য অত্যন্ত জটিল। যে-স্নেহের আবেষ্টনে সে তার সন্তানকে পুত্রাধিক স্নেহে বেঁধে রেখেছে তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করবার মত নিষ্ঠুরতা চিন্তা করতে তার করুণায় শুধু নয়, তার কৃতজ্ঞতায় বাধে। অথচ কোন প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র রক্ষা ক'রে নন্দলালের বিভ্রান্ত চিত্তের প্রবল উন্মুখীনতা থেকে সে যে কেমন ক'রে নিজের শান্তি

এবং মালতীর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করবে তার উপায় সে খুঁজে পায় না।

চিন্তায় শ্রান্ত হয়ে অনেক রাত্রে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরবেলার দিকে অত্যন্ত একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর ভেঙে জেগে উঠে দেখলে যে ঘুমের মধ্যে কান্নায় তার বালিশ ভিজে গেছে। বহুকাল পরে সে স্বপ্নের মধ্যে তার স্বামীকে দেখেছে। সে স্বপ্ন স্পষ্ট নয়। নিতান্তই এলো-মেলো। জেগে উঠে সব কথা সে পরিষ্কার মনেও আনতে পারে না—তবু সেই অর্দ্ধস্পষ্ট স্বপ্নের স্মৃতিতে তার মন যেন বস্তুজগতের স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। কি যে তার অর্থ তাও সে বুঝতে পারে না, তবু কেন তার বুক ভেঙে কান্না উথলে উঠতে চায় তা সে বোঝাবেই বা কাকে। জীবনে সুখের দিন যার কাছে স্বপ্নের মত হয়ে এসেছে, তার কাছে জীবনের মূল্য এমন কি থাকতে পারে যার অভাবে স্বপ্নের দুরাশা তাকে দুঃখ দিতে পারে! তবু যে কান্না কেন রোধ করা যায় না, তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তার স্বামীর যে-মুখটা প্রাণপণ চেষ্টাতেও সেই প্রদোষান্ধকার ভেদ ক'রে সে স্পষ্ট দেখতে পায় নি, অথচ যার অসহায় বেদনার ছবি তার চোখের উপরে সুস্পষ্ট ভাসছে সেই রূপবিহীন অপরূপ মুখখানা তার অন্তরের এতদিনকার সঞ্চিত প্রেমার্ত্ত বিরহকে যেন সজীব ক'রে তুলেছে।

৩৯

সেদিন শনিবার। কমল দুপুরের দিকে অনেকটা সুস্থ বোধ করছিল। কাজে অকারণে অনুপস্থিত হওয়া তার স্বভাবের মধ্যে ছিল না। নিখিলনাথ হাসপাতাল পরিদর্শনের অবসরে তাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কি, আপনি আজই কাজে এলেন যে? একটু বিশ্রাম নেওয়াই আপনার উচিত ছিল। মাথার যন্ত্রণাটা গিয়েছে ত?"

মাথার যন্ত্রণা কম হ'লেও তখনও ছিল। কিন্তু সে কথা না ব'লে সে হেসে বললে, "আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। আমরা দুঃখী মানুষ, নিজেদের নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আমাদের দুঃখও কমে না; তার চেয়ে কাজকর্ম্মের মধ্যে অনেকটা শান্তিতে থাকি।"

অপরাহ্ণের দিকে কমল ঘরে ফিরে শুয়ে পড়েছিল অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ ক'রে। শুয়ে শুয়ে সে তার সুপ্ত মস্তিষ্ককে প্রাণপণ চেষ্টায় জাগ্রত করবার চেষ্টা করছিল যদি কোনমতে কাল রাত্রের দেখা স্বপ্নের সূত্রে তার স্বামী বা দেশের কোন নাম স্মরণে আনতে পারে। চিন্তায় চিন্তায় সে অধিকতর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল—তবু কোন ক্ষীণতম রশ্মিও সে সেই বিস্মৃতির অন্ধকারে দেখতে পেল না। নিখিল-নাথকে কি উপায়ে সাহায্য করার সূত্র সে জোগাবে, যদি তার স্মৃতিকে সে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারে?

চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল নানা চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে মালতী খোকাকে নিয়ে। "ও কি দিদি, শুয়ে যে? এ কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার? মা গো, চোখ গর্ত্তে ঢুকে গেছে যে—অসুখ করেছে?"

মালতী হেসে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর খোকাকে কোলে টেনে নিয়ে বললে, "না তেমন কিছু না, আজ দিন কয়েক একটু মাথার অসুখ করছিল। তা এখন কমে গেছে।" বলে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বললে, "উঃ, কতদিন দেখি নি তোমাকে ভাই! সে ব্লাউসটা পেয়েছিলে ত? এখানে ঠিকমত সুতো পাই না, তার ওপর কাজের চাপ, কোনরকমে একটা ক'রে দিলাম। এখনও ভাল ক'রে শিখতেই পারি নি।"

"চমৎকার হয়েছে। ওদের বাড়ীর বউ ত বলছিল সায়েব-বাড়ীও অমনতর হয় না।"

"হ্যাঁ, ওর চেয়ে কত ভাল ভাল হয়! খোকন ত সেদিন তোমার নিন্দে ক'রেছিলাম ব'লে কোমর বেঁধে লেগে গেল তার মাসীর গুণবর্ণনায়। এদিকে কিন্তু আবার তোমার অত্যাচারের সব নালিশও চলছিল তার আগে,—'খালি খালি দুধ খাওয়ায়, ভগ্লুর সঙ্গে রাস্তায় যেতে দেয় না।' আর আমি যেই বলেছি 'মাসি ভারি দুষ্টু, না রে?' আর যাবি কোথায়!"

মালতী তৎক্ষণাৎ খোকনকে কোলে টেনে একটা মস্ত চুমু দিয়ে বললে, "তা ভাই সত্যি, চাকর-বাকরের সঙ্গে আমার যেতে দিতে ভয় করে। এই সেদিন পুঁটির মা বলছিল কার খোকাকে সেদিন তাদের পুরনো চাকরে ভুলিয়ে নে গিয়ে না কি গয়নার লোভে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। মা গো শুনে আমি ত ভয়েই মরি। তা ভাই

দিই নে ব'লে তোমার ভগ্নীপতি বকাবকি করে। তা করুক গে, ওদের কি এসব বুদ্ধি আছে? এদিকে নিজের ভয় কিন্তু সাড়ে ষোল আনা। রাত্তিরে একখানা টেলিগেরাপ আসুক দিকি নি; অমনি ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে'খন। ভয়ে মাথার জানলা খুলে শোবে না—না কি খোঁচা মারবে। দেখ দিকি ভাই কাণ্ড!"

গলা টেপার কথায় কমলের মনটাও ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল; কিন্তু নন্দলালের কথা শুনে হেসে বললে, "ব্যবসায়ী মানুষ কি না—তাই চোরের ভয়।"

"ছাই ব্যবসা, ব্যবসা-ব্যবসা ক'রে রাত্তির-দিন নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করলে। না কি বাড়ী হবে, মোটর হবে। ঝাঁটা মার অমন বাড়ীর মুখে। আগে প্রাণে বাঁচবে তা'পরত বাড়ী-গাড়ী? কদ্দিন থেকে বল্‌ছি যে জোছনাদিকে একটু নিয়ে এস, তা সময়ই হয় না। বলে 'তুমি না গেলে সে আসবে কেন?' তা ভাই, সাতরাজ্যি ঠেকিয়ে আমার নিঃশ্বেস ফেলতে অবসর কই। খোকার দুধটা পর্য্যন্ত কেউ ঠিকমত জ্বাল দিতে পারে না। যে-দিকটা না দেখবে সে দিকটাই ছিষ্টি নষ্ট ক'রে বসে থাকবে। তা আমি না এলে কি আর হয় না? তা ও কিছুতে শুনবে না। ওরও আবার সময় হয় না। কত ক'রে ব'লে কয়ে আজ নিয়ে এসেছি।"

"ওমা এতক্ষণ বল নি কেন ভাই? একটু চা-টা ক'রে পাঠিয়ে দি।"

"না না, সেসব কিছু করতে হবে না। তোমার যা চেহারা হয়েছে! এখন চল দিকিন্ বাড়ী গিয়ে যত খুশী চা খাইও'খন।"

"না ভাই, এখন আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। সামনেই পরীক্ষা—একে ত ক'দিন পড়াশুনা কিছুই করতে পারি নি। তাতে এখন সময় নষ্ট করলে সব দিক নষ্ট হবে।"

এসব কথা মালতী শুনতে চায় না। পরীক্ষার মূল্য তার কাছে কিছুই নেই। জ্যোৎস্নার শরীর খারাপ, তাকে রেখে সে যেতে কিছুতেই রাজি নয়। কমল মহা বিপদে পড়ে গেল। নন্দলালের গৃহে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয়ে প্রবেশ করতে চায় না। সেখানে নন্দলালের অব্যাহত গতি। নন্দলালের প্রতি রূঢ় আচরণ ক'রে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে তার স্বভাবে বাধে। যদিও এ-কথা তার বিশ্বাস ছিল যে স্বভাবভীরু নন্দ তার গৃহে তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে কোন প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি সহসা করতে ভরসা পাবে না, তবু ইচ্ছাপূর্ব্বক সে বিপদের সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলতে রাজী নয়। কিন্তু এসব কথা মালতীকে সে বোঝাবে কেমন ক'রে। ঐ যে স্নেহশীলা নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত সরলা স্ত্রীলোকটি নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের বিপদকে আহ্বান করছে, তাকে তার বিপদের বার্ত্তা জানিয়ে তার জীবনের সুখশান্তি সে হরণ করতে পারবে না।

অনেক তর্ক-বিতর্ক অনুনয়-অনুযোগের পর কমলা বললে, "আচ্ছা, দেখি ভাই যদি ছুটি পাই। নিখিলবাবুর অনুমতি না নিয়ে ত যাবার জো নেই। হাসপাতালের কাজে ক্ষতি হয় কি না।"

মালতী বললে, "কি ভাই হাঁসপাতালের কাজ? মানুষ ম'লেও কি কাজ করতে হবে না কি? এ যে আপিসের বাড়া হ'ল! না না ও সব হবে না। আমি এখুনি তোমার ভগ্নী-পতিকে গিয়ে বলছি—ও সব ঠিক ক'রে দেবে'খন।"

কমল ব্যস্ত হয়ে বললে, "না ভাই, তার দরকার নেই। আমি দেখছি কি করতে পারি। ওঁকে মিছামিছি আর কষ্ট দিও না।"

মালতী কিছুতেই শুনলে না। সে বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল।

কমল হতাশ হয়ে ভাবলে, "দেখা যাক্ অদৃষ্টে আবার কি আছে?" কিন্তু তবু তার মনটা শান্ত রইল না। সে জোর করে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলে যে নন্দলালের অনুতাপ নিশ্চয় আন্তরিক। যে-নন্দলাল তাকে তার নিদারুণ দুর্দ্দশা থেকে উদ্ধার ক'রে তার আজকের ভদ্র অবস্থায় এনে উপস্থিত করেছে তার প্রতি এই রকম অভদ্রোচিত মনোভাব পোষণ করার দরুণ সে নিজেকে নিন্দা করলে। কিন্তু মনের অস্বস্তি তার মনে কাঁটা হয়ে রইল।

মালতী বাইরের ঘরের দরজায় গিয়ে দেখলে যে একজন সায়েবমত লোকের সঙ্গে তার স্বামী কথাবার্ত্তা কইছেন। মালতী এসে অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় নন্দর নজরে পড়ে গেল এবং সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললে, "কি, যাবে বাড়ী?" সে ইচ্ছে ক'রেই জ্যোৎস্নার কথা জিজ্ঞেস করলে

না। মালতী বললে, "যাব কি করে? জ্যোৎস্নাদির শরীরটা ভারী খারাপ হয়েছে। তা যেতে বলছি ত বলে, নিখিলবাবু ছুটি না দিলে যেতে পারবে না। তুমি একটু ব'লে কয়ে ছুটি ক'রে নাও না। নিখিলবাবুকে কি পাওয়া যাবে না?"

নিখিলনাথের নামে নন্দর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সে বললে, "পাওয়া যাবে না কেন? ঐ ত এসে জ্যোৎস্নার জন্যে ব'সে আছে।" মালতীর মনে নন্দর ঐ উগ্র মন্তব্যের কটু রসটুকু গিয়ে পৌঁছল না। যেটুকুর জন্যে সে সম্প্রতি ব্যাকুল, তার বাইরে তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া খুব তীক্ষ্ণ থাকে না। সে অনুনয় করে বললে, "তবে বল না গো একটু; দু-দিন ছুটি কি আর দেবে না? ওর শরীরটা খারাপ, দু-দিন একটু বাড়ী গিয়ে ঘুরে আসুক। একটু বলে দেখ না?"

জ্যোৎস্নাকে বাড়ী নিয়ে যাবার আগ্রহ নন্দরও কিছু কম হওয়ার কথা নয়—সুতরাং নিখিলের প্রতি মনে মনে উত্তপ্ত হ'লেও সে অগত্যা গিয়ে জ্যোৎস্নার বাড়ী যাওয়ার দরবার নিখিলকে জানালে।

নিখিলনাথ বললে, "হ্যাঁ, তা বেশ, দু-দিন বাড়ী গেলে ওঁর মনটাও প্রফুল্ল হবে।"

মালতী দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। ছুটির পরোয়ানা পেয়েই সে ছুটে উপরে জ্যোৎস্নার নিকট গিয়ে হাসতে হাসতে সব জানালে। বললে, "উঃ, ভারী মান বাড়ানো হচ্ছিল। উনি চলে গেলে হাসপাতালে একেবারে তালাচাবি পড়বে।"

কমল আর কিছু বললে না। তার নিজের অদৃষ্ট যে কখনই সুপ্রসন্ন থাকে না, এই তার আর একটা প্রমাণ মাত্র মনে ক'রে ক্ষুণ্ণমনে প্রস্তুত হ'তে লাগল। নিখিলনাথ এসেছেন অথচ তাঁর সঙ্গে যে তার বড় দরকার ছিল, তা সম্প্রতি তাকে মুলতুবী রেখেই যেতে হ'ল। মনটা তার ভার হয়ে রইল এবং ক্ষণে ক্ষণে তার চক্ষু সজল হয়ে উঠতে চাইল, নিজের অদৃষ্টের উপর অভিমানে।

গাড়ীতে তুলে দিয়ে কমলের দিকে নন্দর চাইতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগলে। একই গাড়ীর মধ্যে মুখোমুখী হয়ে বসে যাওয়ার চিন্তাটা তার কাছে রুচিরোচন বোধ হ'ল না। সে মালতীর দিকে চেয়ে বললে, "আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমরা যাও; আমার ফিরতে সন্ধ্যে হবে।"

কমল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে নন্দলাল তার সঙ্গে একত্র এক গাড়ীতে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছে। তাতে একটু স্বস্তিও অনুভব করলে। একবার ভাবলে যে সে অনুরোধ করে। কিন্তু নিজেকে কিছুতেই প্রস্তুত ক'রে উঠতে পারলে না। শুধু সঙ্কোচ নয়, তার একটু আশঙ্কাও ছিল মনে, যে এই অনুরোধে নন্দকে সে তার চিঠিসম্পর্কে ভুল বুঝতে সাহায্য করবে এবং নন্দর স্পর্দ্ধার পথ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হবে।

মালতী বললে, "দেখ কাণ্ড, এখন আবার কোথায় যাবে? এই ত বললে যে আজ বিকেলে তোমার কোন কাজ থাকবে না। জানি নে বাপু, যত নেই কাজ যুটিয়ে নেওয়া।"

অন্য পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে নন্দ মালতীর ব্যগ্রতার কোনো সুবিধে নিতে ভরসা পেল না। আর কথা কাটাকাটি না ক'রে সে গাড়োয়ানকে বাড়ী যেতে হুকুম করলে। কমল মনে মনে খুবই লজ্জা পেতে লাগল তবু মুখ ফুটে কথা বলতে পারলে না।

মালতী আবার প্রসন্ন চিত্তে তার সঙ্গে গল্প সুরু করে দিলে। বেশীর ভাগই খোকার কথা—ঘর-সংসারের কথা। "নতুন বাড়ীটায় একটু জমি আছে। তা ভাই একটা গরু কেনার কথা বলেছি, বলে যে গন্ধ হবে। হ্যাঙ্গাম। পারি নে বাপু, গয়লার সঙ্গে রোজ লড়াই করে। পয়সা দিয়ে কতকগুলো জল গেলা।"

গল্পের বিষয় এক জায়গায় আবদ্ধ নয়। গরুর কথা শেষ না-হতেই খোকার নতুন মাষ্টারের গল্প—(যোগাযোগ কোথায় তা কে জানে!)—মাষ্টারের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে; খোকা তার কি মজার নকল করে—বাড়ী গেলে শোনাব-'খন। এই রকম নানা কথা বলতে বলতে বলে, "ও কি ভাই, চুপ ক'রে রইলে যে? মাথার কষ্ট হচ্ছে বুঝি?" ব'লে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

কমল তাড়াতাড়ি বলে, "না, না, তুমি গল্প করছ, তাই শুনছি।" মালতী আবার উৎসাহে গল্প সুরু করে—"আজকাল খোকা সব খায়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলের মন থেকে উদ্বেগ যেতে চায় না। নন্দ এবার কেমন ব্যবহার করবে তাই ভাবে। ভাবে, বাড়ীতে মালতীর সামনে সাহস করবে না। আবার ভাবে,

অকারণেই হয়ত এসব ভাবছে। হাসপাতালে কাল তার জায়গায় সরোজিনী যাবে। বড় চঞ্চল। সেই মাড়োয়ারীর ছেলেটাকে হয়ত তেমন সাবধানে যত্ন করবে না। কি সুন্দর ছেলেটা, আহা তার মা কাঁদছিল। চলে আসা ভাল হয় নি। নিখিলবাবু ত ছুটি না দিলেই পারতেন, আমার বুঝি আর পড়ার ক্ষতি হয় না! নিখিলবাবু ত এসেছিলেন; একটাও কথা বলা হ'ল না তাঁর সঙ্গে। কিছু দরকারে এসেছিলেন কি? আজ কিছুদিন তাঁকে কি রকম অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। রোগা হয়ে গেছেন। কেবল যত রাজ্যের কাজ ঘাড় পেতে নিলে কি মানুষের সয়? আচ্ছা, ওঁর কিসের ভাবনা? সরোজিনী বলছিল, ক্ষিতীশ গুপ্ত না কি বলেছে মাস কয়েক আগে কে একজন মেয়ের সঙ্গে বিকেলে বেরিয়ে গিয়ে মাঝরাত্রে ফিরেছেন। দারোয়ান না কি বলেছে 'সায়েব গাড়ী নিয়ে যায় নি।' ক্ষিতীশ গুপ্তটা ভারি বদ। ওঁকে হিংসে করে নিশ্চয়। সরোজিনীর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ওই বাঁদরটার সঙ্গে যত আড্ডা। ডাক্তারের কত জরুরী কাজ থাকে। তোদের অত মাথাব্যথা কেন? আচ্ছা, মেয়েটি কে? হঠাৎ সচেতন হয়ে শোনে মালতী গল্প ক'রে চলেছে, "ওঁর ভাই ঐ কি একরকম হয়েছে। ব্যবসা ব্যবসা ক'রে মাথাটা গেল। রাত্রে ঘুম নেই। এক-এক দিন জেগে দেখি, উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। আগের চেয়ে রাগও বেড়েছে। আমি বলি এমন টাকা দিয়ে হবে কি?" ইত্যাদি। কমল ভাবে যেখানেই যাবে, সে একটা অশান্তির সৃষ্টি করবে। এমন জীবন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে আর নরক কি হ'তে পারে?

গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় থামল। (ক্রমশঃ)

বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

প্রশস্ত পালঙ্কের উপর শুভ্র চাদর পাতা, আর তারই উপর এসে পড়েছে শুভ্রতর চন্দ্রকিরণ। হিরণ ও রমেশ আধ-শোয়া অবস্থায় চাঁদের দিকেই তাকিয়ে আছে,—শরতের হাল্কা মেঘে এই গেল ঢেকে, আবার ঐ মুখ দেখিয়েছে ওখানে।

"কি সুন্দর!" রমেশ বললে।

হিরণ চুপ করে রইল। একটু আগেই রমেশ গ্রামোফোনে কয়েকটা রেকর্ড চালিয়েছে, তারই একটা গানের রেশ হিরণের কানে এখনও ঝঙ্কার দিচ্ছে, "আলো ছায়া দোলা—আলো ছায়া দোলা।" তারই তালে তালে হাল্কা মেঘ চাঁদকে নিয়ে নৃত্যে মেতেছে ঐ! হিরণকে নিরুত্তর দেখে রমেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "কি ভাবছ হিরণ? তুমি রোজ এই রকম বসে বসে কি ভাব বল ত?"

হিরণ একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলে, "আমার জীবনটার কথা ভাবছি।"

রমেশ উৎসাহভরে বললে "হ্যাঁ, তোমার জীবনটাও আজকের এই জ্যোৎস্নার মত সুন্দর।"

"ছ্যাৎ, তা কেন!"

"তবে কি?"

হিরণ আবার চুপ ক'রে রইল একটু গম্ভীর হয়ে। তাদের বাংলোখানার অদূরে শোণ নদীর উদাস-মন্থর স্রোত চলেছে চাঁদের ছবি বুকে ক'রে কখনও দোলাচ্ছে ছবিকে, কখনও ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—ছবি ভেঙে চুরমার। আকাশের চাঁদ ও জলের চাঁদ, দুটোকেই দেখছে হিরণ অলস দৃষ্টিতে।

"বললে না?" হিরণের একখানি হাত তুলে নিয়ে রমেশ জিজ্ঞাসা করলে। হিরণ তার হাতটা ছাড়াবার একটু চেষ্টা করলে কিন্তু শক্ত মুঠোর বিরুদ্ধে বেশী জোর না ক'রে বললে, "আচ্ছা, তুমি যে এই বিদেশ থেকে হঠাৎ গিয়ে আমাকে বিয়ে ক'রে আনলে, একটুও ভয় করল না তোমার?"

"ভয়! বিয়েতে আবার ভয় কি?"

শুষ্ক হাসির সঙ্গে হিরণ জবাব দিলে, "বিয়েতেই ত সব চেয়ে বেশী ভয়।"

একটু থেমে আবার বললে, "আচ্ছা, আমার যে আগেই একটা বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তার খবর রাখ?" বিস্ময়মুগ্ধ রমেশের মুঠো হঠাৎ শিথিল হয়ে যাওয়াতে হিরণের হাতখানি পড়ল খসে। হিরণ ফিক্ করে একটু না হেসে পারলে না। বললে, "এই না 'ভয় কি' বলে আস্ফালন করছিলে!"

রমেশ আবার ভরসা পেয়ে দুই বাহুতে হিরণকে বেষ্টন ক'রে বললে, "কেন তামাসা কর হিরু?"

হিরণ আবার গম্ভীর হয়ে বললে, "আমার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল শুনে আঁৎকে ওঠ, আর তুমি ত দিব্যি দ্বিতীয় বার আমায় বিয়ে ক'রে নিয়ে এলে!"

রমেশ অপ্রস্তুত হয়ে হিরণকে ছেড়ে দিয়ে বললে, "আমার প্রথম পক্ষের কথা সকলেই জানে—আমি লুকোই নি ত, আর তুমি হঠাৎ এখন বললে কিনা—"

হিরণ জবাব দিলে, "আর আমার প্রথম পক্ষের কথা কেউ জানে না—তাই আমিও লুকিয়ে রাখবার সুযোগ পেয়েছি? না?

"ফের তামাসা?"

"তামাসা নয়, সত্যি।"

মেয়ের বিয়ে ঠিক হতে যত দেরি হয়ে যায়, বাড়ীর লোকেদের কথাবার্ত্তায় বিবাহের জল্পনা যতই বেশী করে চলতে থাকে, মেয়ের মনের মধ্যে ভাবী সংসারের বিচিত্র কল্পনা ততই প্রবলতর হয়ে ওঠে। তরুণীর উর্ব্বর মনের উপর অলক্ষ্য ও প্রত্যক্ষ বিবাহ-প্রস্তাবনার সলিলসেচনে অঙ্কুরোদ্গত সুখকল্পনা একটি বিশিষ্ট আকারে শিশুবৃক্ষরূপে পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। হিরণের আশা ছিল, কোনও একটি তরুণ চিত্তের প্রথম প্রণয়-আহ্বানে তার যৌবন-সায়র উথলে উঠবে, নারীহৃদয়ানভিজ্ঞ তরুণ হৃদয়ের প্রথম স্পর্শ সারা দেহমনে শিহরণ জাগিয়ে তুলবে। সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! তার পর স্বামীর ঘর। পূর্ব্বে যা হয়ত ছিল নিতান্ত বিশৃঙ্খল—রাশি রাশি জিনিষ-পত্র আসবাব-পোষাক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—সবই তার নিপুণ হস্তের স্পর্শে সুবিন্যস্ত হয়ে উঠবে। গৃহসংলগ্ন পতিত জমি হয়ত থাকবে বন্যগুল্মে আচ্ছাদিত, তাকে সে সুন্দর উদ্যানে রূপান্তরিত করবে। একা স্বামী নয়,—তার উচ্ছ্বসিত প্রেমপ্রীতি উপচে পড়বে পূর্ণ-গৃহ স্বামীর আত্মীয়পরিজনের উপর।

সে-সুখকল্পনার ইমারৎ পরবর্ত্তী প্রচণ্ড বাস্তবের আঘাতে বিধ্বস্ত। কিন্তু এ-বাস্তবকে হিরণ সত্য বলে নিতে পারলে না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সেই যে কল্পনার কুমারকে সে মন সমর্পণ করেছিল সে ত এই বিপত্নীক রমেশ হতে পারে না। তার কল্পনার প্রিয়তমাকে সে যা দান করেছে, সেই হয়েছে তার চিত্তদান। তার পর যে এই বিবাহ এ অতি মিথ্যা,—প্রতারণা। এ গৃহ, এ গৃহস্থালী পূর্ব্ব হতেই আর এক নারীর করস্পর্শে নিয়ন্ত্রিত, গৃহস্বামীর হৃদয়ে যে-নারী বিরাজ ক'রে গেছে একদিন। এখানে হিরণকে আহ্বান করা শুধু ত গৌরবদানের অভাব নয়, অপমান।

রমেশের কাছে হিরণ সংক্ষেপে কিছু কিছু বলে এই কল্পনা-বাস্তবের প্রচণ্ড বিপর্য্যয়-ব্যথা, রমেশ সান্ত্বনা দিতে যায়, কিন্তু কোন ফল হয় না।

হঠাৎ হিরণ বললে, "এক বার তোমায় না বলেছিলাম অঞ্জলিকে কিছু দিনের জন্যে আমাদের এখানে এনে রাখতে, তার কি হ'ল?"

অঞ্জলি রমেশের পূর্ব্ব পক্ষের শ্যালিকা। রমেশের মনে হ'ল—"কি ছেলেমানুষ এই হিরণ", প্রকাশ্যে বললে, "অঞ্জলি আর এখানে আসবে কেন হিরণ?"

"কেন আসবে না?" হিরণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে।

রমেশ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। হিরণই আবার বলতে থাকে, "তার দিদি থাকতে আসতে পারত আর এখনও ত আমি তার দিদি হয়েই এসেছি এখানে, বোনকে আমি আনতে পারি না?"

রমেশ এবার জবাব দেয়, "সত্যি ত তুমি তার দিদি নও, তার দিদির জায়গায় তোমায় চোখে দেখলে তার চোখে যে জল আসবে তা বোঝ না? তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কিছু আছে?"

"তোমার তো একটুও কষ্ট হয় নি বরং আনন্দই হয়েছে দেখছি তোমার স্ত্রীর জায়গায় আমায় এনে বসাতে।"

২

হিরণ তার জেদ ছাড়ে না। রমেশকে একখানা গয়না গড়িয়ে আনতে হ'ল। রমেশ অগত্যা বললে, "যদি গয়নাটা পাঠাবেই, বাড়ীর ঠিকানায় না পাঠিয়ে অঞ্জলির স্কুলের ঠিকানায় পাঠাও।"

"কেন ?"

"বাড়ীতে পাঠালে শ্বশুরমশাই জিনিষটা পিয়নের কাছ থেকে নেবেনই না, ফিরিয়ে দেবেন। আর স্কুলে পাঠালে অঞ্জলি নিয়েও নিতে পারে। ও তখন থাকবে স্কুলে কিনা দুপুরে যখন পার্শেল নিয়ে যায় পিয়ন।"

স্কুলের ঠিকানাতেই উপহার গেল। সঙ্গে হিরণ লিখে দিলে, আমায় হয়ত তুমি চিনবে না, আমি তোমার দিদি হই, বোনকে আদর ক'রে এক খানা গয়না পাঠালাম, প'রো। আর তোমায় একবার আসতে হবে আমাদের কাছে, সুবিধা হ'লেই তার ব্যবস্থা করব।

"আচ্ছা, তুমি যে বললে অঞ্জলির বাবা গয়না ফিরিয়ে দেবেন—কেন বল ত ?" দিন তিনেক পরে রমেশকে ভাত বেড়ে দিয়ে হিরণ জিজ্ঞাসা করলে। রমেশ সংক্ষেপে জবাব দিলে, "আমি আবার বিয়ে করেছি বলে।"

" 'আবার-বিয়েকে' তিনি খুব ঘৃণা করেন ?"

রমেশ বলে ফেললে, "তা করবেন বই কি—কিন্তু যাক্ ও-সব কথা, তুমি খেতে বসবে না ?"

"না, আমি একটু পরে বসব। আচ্ছা, অঞ্জলি জিনিষ ফেরাবে না ত ?"

"তা কি ক'রে বলি। তোমার যে কি-এক খেয়াল। এ-খেয়াল কেন হ'ল !"

হিরণ কথা না ব'লে চুপ করে রইল।

'কেন হ'ল !'—সাগর-ধেয়ানী শান্ত প্রবাহিণী হঠাৎ প্রক্ষিপ্ত প্রপাতে পরিণত হলে প্রতিহত বারিরাশি আবর্ত্ত সৃষ্টি করবেই, নিকটকে দূরে নিক্ষেপ করতে চাইবে, দূরকে অজানাকে প্রবল টানে গ্রহণ করতে হাত বাড়াবে। খণ্ড প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ডসৃষ্টির তাণ্ডবলীলা !

বিকালে রমেশ আপিস হতে ফিরতেই হিরণ বললে, "অঞ্জলি পার্শেলটা ফেরায় নি, এই দেখ তার সই-করা রসিদ এসেছে।"

"দেখি" বলে হাত বাড়িয়ে রমেশ রসিদটা নিয়ে অঞ্জলির সইটার উপর অনেক ক্ষণ তাকিয়ে রইল। হিরণ বললে, "কি হ'ল ? অত কি দেখছ অবাক হয়ে ?"

"দেখছি অঞ্জলির হাতের লেখা এক বছরেই অনেক বদলে গেছে !"

হিরণ তার রসনা-ছিলায় একটা শাণিত শর-সংযোজনের উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে দেউড়ীর সামনে একখানা গাড়ী এসে থামল এবং একটি অল্পবয়স্কা বিধবা নেমে এল। হিরণ রমেশকে জিজ্ঞাসা করলে "কে গো ?"

রমেশ মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললে, "কি জানি—চিনতে ত পারছি নে !"

মেয়েটি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে কাছে এসে হিরণকে প্রণাম করে বললে, "আমি অঞ্জলি, দিদি।"

হিরণ রমেশের দিকে তাকিয়ে বললে, "তবে যে তুমি বলছ চিনতে পারছ না !"

রমেশ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, হাতের লেখা না-হয় বদলেছে, চেহারা সুদ্ধ কি বদলাতে পারে !

৩

স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ মেয়েটিকে নিয়ে বড় মুস্কিলেই পড়েছে। আজ সাত দিন তার মামাতো ভাই এসে তাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে বোর্ডিঙে থাকবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ক'রে গেছে, অথচ টাকা দেবার কথা ছিল তার পরদিনই এসে, কিন্তু আর দেখা নেই। যে-বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে গেছে, সেখানে লোক গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছে যে, সে-বাড়ী ছেড়ে সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। মেয়েটিও জানে না। কাজেই তার উপরই উৎপীড়ন সুরু হয়েছে, বলা হচ্ছে তাকে যে, সে অন্য কোন আত্মীয়ের কাছে চলে যাক্। কিন্তু তার আর কোনও আত্মীয় আছে বলে তার জানা নেই। ছোট থাকতেই পিতৃমাতৃহীন সে। মামা তাকে পালন ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই আবার মামার কাছে ফিরে আসে বিধবা হয়ে। কিন্তু কপাল এমন যে মামাও আর বেশী দিন রইলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরই দাদা ও বৌদি দু-জনেই তার ওখানে থাকাটা ভার বোধ

করতে লাগল। এবং তার পরই এই স্কুলে চালান দেওয়া। এই ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তার।

সে-দিন ভোর হ'তেই সে ভাবছে, এমন কপাল নিয়েও মানুষ জন্মায়। তার শেষ এই আশা হয়েছিল যে এই স্কুলটায় কিছু লেখাপড়া আর কিছু হাতের কাজ শিখে নিজের সংস্থান সে নিজে কোন রকমে ক'রে নিতে পারবে। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা! কাল যে রকম কড়া ক'রে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেছেন—তার ইচ্ছা হচ্ছে যে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, যেদিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলে যায়।

স্কুল বসতে ক্লাসে গিয়ে ডেস্কের উপর মাথা লুকিয়ে প্রথম ঘণ্টা দিলে কাটিয়ে। দ্বিতীয় ঘণ্টার প্রারম্ভে আপিস-ঘরে তার ডাক পড়ল। সেখানে যেতেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী একটা পোষ্টকার্ড ও ইন্‌সিওর-পার্শেল তার হাতে দিয়ে বললেন, "এ তোমার ?"

সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা প'ড়ে মনে মনে অবাক হ'ল কিন্তু প্রকাশ্যে বললে, "হ্যাঁ।"

সই করে পার্শেলটা নিয়ে চলে গেল একেবারে নিজের ঘরে। গিয়েই সেটাকে খুলে দেখলে এক ছড়া সোনার হার। চিঠিটা আবার পড়লে, একবার না, বার বার। অবাক কাণ্ড! তার যে এমন স্নেহময়ী দিদি একজন জগতে আছে তা ত জানা ছিল না। এমন সুধামাখা চিঠি ও সোনার হার! পিতৃ- ও মাতৃ- কুলের ডালপালার নিকট দূর আত্মীয় খুঁজে কিছুই ঠাহর করতে পারলে না। যাই হোক্, এটা ঠিক যে এই যে দিদি তার, সে অনেক কাল তার কোনও খবরই রাখে না। বিদেশে অনেক দিন আছে নিশ্চয়। নইলে তাকে হার পাঠায় এতদিন পরে? তার যে কপাল পুড়েছে সে খবর দিদির কাছে যায় নি। হার গলায় ঝোলাবার কি আর দিন আছে তার? দিদির প্রেরিত হার তার কাছে আজ অর্থহীন, কিন্তু তার যে সস্নেহ আহ্বান তার কাছে যাবার জন্যে সেইটেই তাকে নাড়া দিলে। আজ যখন পৃথিবীর সকলে তার প্রতি বিমুখ, এই দুর্দ্দিনে দিদির আশ্রয় তাকে প্রলুব্ধ করে তুললে। তীব্র সঙ্কটের সঙ্গে যদি একটা অদম্য আশা জড়িত হবার সুযোগ পায়, তবে দুয়ে মিলে দুর্ব্বল ও অর্ব্বাচীনকেও কোথা হতে প্রবল শক্তি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এনে সহায়রূপে প্রদান করে। কি ক'রে একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে, সেকরার দোকানে হারছড়া বাঁধা রেখে টাকা ধার করলে, তার পর ষ্টেশনে এসে ঠিক গাড়ীতে চড়ে একেবারে ঠিক 'দিদি'র বাড়ীতে গিয়ে হাজির—সে-সব বর্ণনা করতে গেলে আলাদা একটা গল্প হয়ে ওঠে।

৪

যে অঞ্জলি রায়ের উদ্দেশ্যে হারছড়া প্রেরিত হয়েছিল শিক্ষয়িত্রী তাকেই প্রথমে ডেকে পোষ্টকার্ড ও পার্শেলটা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বলেছিল, "এ-সব আমার না।"

সে মনে করেছিল, ঐটুকু বলাতে জিনিষটা প্রেরিকার কাছেই ফেরৎ যাবে। কিন্তু তার জানা ছিল না যে আর একজন অঞ্জলি রায় কয়েকদিন আগে তার নীচের ক্লাসে এসে ভর্ত্তি হয়েছে এবং বোর্ডিঙে আছে। শিক্ষয়িত্রী তখন এই নূতন অঞ্জলি রায়কে ডাকেন।

তার পর যখন তার পলায়নবার্ত্তা প্রচারিত হয়ে গেল, পুরাতন অঞ্জলি এসে বললে, তারই ছিল পার্শেলটা—তার গ্রহণ করবার ইচ্ছা ছিল না তাই অমন ক'রে বলেছিল। স্কুল হ'তে তৎক্ষণাৎ চিঠি গেল হিরণের কাছে এই মর্ম্মে যে, তাঁর প্রেরিত পার্শেল ভুল মেয়ে সই করে নিয়ে পালিয়েছে এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেই পুলিসে খবর দেওয়া হবে। কিন্তু হিরণ তার উত্তরে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাল যে ভুল মেয়ে পার্শেল নেয় নি—তার বোনই পার্শেল পেয়েছে এবং সে-বোন এখন তারই কাছে আছে—সুতরাং কারুর কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনার কারণ নেই।

হিরণ ভাবলে এই হ'ল ভাল, তার ভালবাসার ভাণ্ড উজাড় ক'রে দেবার একটি পাত্র ভগবান জুটিয়ে দিলেন, যে সত্যিই ভালবাসার ভিখারী। স্বামীর হৃদয়রঞ্জন করবার প্রবৃত্তি জাগে নি তার, গৃহস্থালীতে মন বসে নি, বাগান সাজানোর কাজে সে নিজেকে নিযুক্ত করে নি, আজ একাধারে এই বিধবা দুঃখিনীর উপর সব সাধ মেটাবার একটা উগ্র আগ্রহ এসে ভর করলে। এমনভাবে করলে যে সমাজের সংস্কার ভেঙে তাকে কুমারীর বেশে সজ্জিত করে তুললে। একজন আশ্রয় ও ভালবাসা পেয়ে খুশী, অপরে দিয়ে খুশী।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রমেশের এক পুরাতন বন্ধু এসে হাজির, কি গোপন কথা কইতে। বাইরের

ঘরে রমেশ তার কাছে যেতেই হিরণ গিয়ে দরজায় কান পেতে রইল—কি এত গোপন কথা! যা শুনলে তাতে হিরণের অন্তরে নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। রমেশের এই বন্ধু অবিনাশের সঙ্গে রমেশের শ্যালিকা অঞ্জলির বিবাহ-প্রস্তাব এসেছে। অবিনাশ অঞ্জলির সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নিতে এসেছে। দুই বন্ধুর মধ্যে দিব্যি যখন রসালাপ জমে উঠেছে হিরণ আর স্থির থাকতে পারলে না। প্রলয়ঙ্কর খেয়াল মেয়েদের মনে গজিয়ে উঠতে বোধ হয় পলকের বেশী সময় লাগে না। চট্ ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে নমস্কার ক'রে সে অবিনাশকে বললে, "এই যে, আপনি কখন এলেন ?"

অবিনাশ কোন কথা বলবার আগে রমেশ সোৎসাহে বলে উঠল, "অবিনাশের যে বিয়ে ঠিক হচ্ছে অঞ্জলির সঙ্গে।"

"তাই নাকি ? শুনছি। তুমি একবার অঞ্জলির কাছে যাও ত ভেতরে, আমি অবিনাশ বাবুর কাছ থেকেই শুনি সুখবরের ব্যাপারটা।"

রমেশ ভিতরে চলে গেল এবং অবিনাশ অবাক হয়ে হিরণের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। হিরণ হাসি চাপতে না পেরে বললে, "অঞ্জলি যে এখন আমাদের এখানেই আছে তা বুঝি উনি বলেন নি আপনাকে এতক্ষণ ? আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।" বলেই হিরণও চলে গেল। ভিতরে গিয়েই রমেশকে গ্রেপ্তার ক'রে আড়ালে নিয়ে হিরণ বলতে লাগল এক বিপুল ষড়যন্ত্রের কথা। তার প্রস্তাবনার মর্ম্ম এই যে, অবিনাশের সঙ্গে এই বিধবা অঞ্জলির বিয়ে দিতে হবে, তার প্রধান যুক্তি—অবিনাশ বিপত্নীক এবং হিরণ বিধবা। আশ্চর্য্য প্রকাশ করলে—রমেশ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে বলে না অঞ্জলির পিতা বিরক্ত ছিলেন, এখন আবার নিজের মেয়েকেই কি ক'রে একজন বিপত্নীকের হাতে সঁপে দিতে উদ্যত!

মন্ত্রপড়ার মত সমস্ত বিধান রমেশকে পড়িয়ে দিয়ে হিরণ বললে, "এইবার যাও, অবিনাশ বাবু অনেকক্ষণ একলা বসে আছেন। অঞ্জলির ভার সম্পূর্ণ আমার উপর রইল। তুমি ও-দিকটা সামলিয়ো।"

রমেশ অবিনাশের সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ কথা কয়বার প হিরণ ও তার পিছনে অঞ্জলি, দু-জনে দুই হাতে কিছু জলযোগের আয়োজন নিয়ে এসে হাজির।

"এর নাম অঞ্জলি রায়, অবিনাশ বাবু," হিরণ বললে। অবিনাশ এতটা ভাবে নি। স্বপ্ন দেখছে কিনা সন্দেহ হ'ল।

* * *

অবিনাশের কাছে যখন রহস্য উদ্ঘাটন করা হ'ল তখন তার মনটা এই অঞ্জলিতে এতটা ঝুঁকেছে যে এ-বিবাহে আর আপত্তির কারণ রইল না।

অবিনাশের সঙ্গে দ্বিতীয়-অঞ্জলির বিয়ে হয়ে যাবার কিছু দিন পরে প্রথম-অঞ্জলির এক চিঠি এল হিরণের নামে।—

শ্রীচরণকমলেষু

দিদি, যখন আপনার স্নেহোপহার ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তখন জানতাম না আপনার মূল্য। আপনাকে সত্যিই চিনি নি তখন। *** আজ কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা আপনার পায়ে লুটোতে চাইছে কিন্তু লজ্জায় তা পারছি না। আমার জীবনের কত বড় দুর্ভাগ্যকে যে আপনি দূর করলেন তা আপনি যেমন বোঝেন আমিও তেমনি বুঝতে পারছি। আমায় ক্ষমা ক'রে আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার স্নেহের বোন
অঞ্জলি

হিরণ চিঠিখানাকে একবার পড়ে শেষ করেছে,—চোখের কোলের সঞ্চিত অশ্রুকে মুছে আবার পড়তে যাবে, এমন সময় রমেশ এসে পড়তেই সে ওখানাকে দুমড়ে মুড়ে ফেললে।

"কার চিঠি দেখি ?" রমেশ জিজ্ঞাসা করলে।

"দেখতে হবে না।" সাফ জবাব।

হিরণের মুঠোর ফাঁক দিয়ে দু-চারটে অক্ষর দেখতে পাচ্ছিল রমেশ। বললে, "কার জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা আবার লেখা রয়েছে ?"

হিরণ দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, "মেয়েদের ব্যথা মেয়েরাই বোঝে—তোমরা কেউ-ই তা বোঝ না, তোমাদের শুনেও কাজ নেই।"

সঙ্কুচিত নারী-হস্তাক্ষর পুরুষের দৃষ্টি এড়াতে হিরণের মুঠোর ঘোমটায় আর একটু মুখ ঢাকল।

কালিম্পঙ থেকে গ্যাণ্টক

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

এবার এপ্রিল মাসে য়ুনিভার্সিটির দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হওয়া মাত্র হাঁফ ছেড়ে লক্ষ্ণৌ থেকে পাড়ি দিলাম বাংলার পানে; প্রকৃত উদ্দেশ্য, দিন কয়েক আত্মীয়বন্ধুদের কাছে থেকে, হিমালয় ও আসামের যে-সব প্রান্তে পূর্ব্বে যাওয়া হয় নি সেগুলি এবার দেখে আসব। বহরমপুরে গিয়ে স্থির করে ফেললাম আগে কালিম্পঙ যেতে হবে, কারণ সেখান থেকে সিকিম যাওয়াও সহজ। দার্জ্জিলিঙ পূর্ব্বেই দেখা হয়েছে, তা ছাড়া আজকাল সেখানে যেতে হ'লে আবার পাসের হাঙ্গামা আছে। সেই জন্য দার্জ্জিলিঙ যাওয়ার কথা মনেও আসে নি। তখন কিন্তু জানতাম না যে, কালিম্পঙ যেতে হ'লেও পুলিসের পাস লাগে, জানা থাকলে লক্ষ্ণৌ থেকেই পাস জোগাড় ক'রে নিয়ে যেতে পারতাম। বিশেষ ভাবনায় পড়া গেল। দেখলাম, পাসের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে কয়েক দিন বৃথা বিলম্ব হয়।

ইতিমধ্যে শুনলাম বহরমপুরের পুলিস সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি ভদ্র লোক। ভাবলাম, তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি একবার দেখা করেই আসি, দেখি তিনি কি বলেন। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট মহাশয়ের বাড়ী গেলাম সকালে। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর যখন চলে এলাম তখন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তৃপ্তি যত না হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম শ্রদ্ধাস্পদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত একজন অমায়িক ও সহৃদয় পুলিস-অফিসারের সহিত আলাপ ক'রে।

পাস পেয়ে পর দিন সকালেই যাত্রা করলাম। রাত্রে রাণাঘাটে দার্জ্জিলিঙ-মেল ধরে ভোরে যখন শিলিগুড়ি পৌছালাম তখন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণক্লান্ত আকাশ, আর পাহাড়ে ঠাণ্ডা বাতাস জানিয়ে দিলে যে, সমতল ভূমির তাপাধিক্য হতে এবার নিষ্কৃতি পাব। প্লাটফরমেই আমার পাস দেখাতে হ'ল। দেখলাম, পুলিস-কর্ম্মচারীদের খুব কড়া নজর, পাস না দেখিয়ে বাঙালী ছেলেদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব। যাক্, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে যখন ষ্টেশনের বহির্ভাগে এলাম তখন দেখি কালিম্পঙগামী সব ট্যাক্সিগুলিই ভর্ত্তি। মহা মুস্কিল, তখন ছোট লাইনের ট্রেন ছাড়-ছাড়, ট্রেনে যাওয়াও আর সম্ভব নয়।

তল্পিতল্পা নিয়ে এক রকম হতাশ হয়েই দাঁড়িয়ে আছি, ইতিমধ্যে এক ট্যাক্সিওয়ালা ডাকলে, "বাবুজী, ইধার আইয়ে, ফ্রাণ্ট্ সিট্ খালি হ্যায়, ছা রূপেয়া দেনা।" কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ীর ভিতর তিনটি সুবেশা নেপালী মহিলা। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি, তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবে হিন্দীতে আমাকে বললেন, "আমরা গোটা ট্যাক্সিই রিজার্ভ করেছিলাম, তবে আমাদের একজন সঙ্গীর যাওয়া হ'ল না, আপনি আসতে পারেন এই গাড়ীতে, ট্যাক্সিওয়ালা ছ'টাকা চাইছে, আপনি পাঁচ টাকাই দেবেন, বুঝলেন?" "না" বলবার কোন কারণ ছিল না, তাই চট্ ক'রে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

গাড়ী চলল দ্রুতবেগে পিচ-ঢালা রাস্তার উপর দিয়ে অনেক দূর। দু-পাশে নিবিড় শালবন, সমস্ত সরকারী সম্পত্তি। মাঝে মাঝে কাঠবোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে। মহিলারা কলস্বরে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন, তাঁদের উচ্চ হাসি নির্জ্জন পথের নীরবতাকে যেন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছিল। অজানা অচেনা মনোহর পার্ব্বত্য পথ দিয়ে চলেছি, সাথী অনাত্মীয়া তিনটি পাহাড়ী মেয়ে—সুন্দরী, রসিকা, আলাপনীয়া। মনে হচ্ছিল, তিনটি পর্ব্বত তনয়া আমার মত নিঃসঙ্গ পান্থকে যেন হিমাচলের বুকে সাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্যই আজ আবির্ভূতা।

কয়েক মাইল সমতল পথ অতিক্রম ক'রে আমরা চড়াইয়ের মুখে যখন এসে পৌছালাম তখন অদূরে খরস্রোতা তিস্তা নদীর উপত্যকা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমাদের ডান দিকে এঁকে-বেঁকে ফেনোর্ম্মিমালাসজ্জিতা তিস্তা প্রচণ্ডবেগে ছুটেছে, অজস্র উপলরাজি তার গতি রোধ ক'রে

উঠতে পারছে না, পাশ দিয়ে মানুষের তৈরি রাস্তা নদীর সাথে সাথে যেন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চার দিকে ঘননিবিড় ঝিল্লীমুখরিত অরণ্যানী, অদূরে হিমালয়ের উন্নত মস্তক যেন নীচের ক্ষুদ্র মানুষের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সিভোক যেখানে এসে তিস্তায় মিশেছে সেখান থেকে কালিম্পঙের প্রায় সমস্ত পথটাই তিস্তার পাশ দিয়ে গিয়েছে। পাহাড় নদী ও বন, এই তিনের সংমিশ্রণে যে-অপরূপ নৈসর্গিক ঐকতানের সমারোহ দেখলাম তা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায়।

মোটরে ব'সে শুধু মনে হচ্ছিল, ট্রেনে গেলেই ভাল হ'ত, কারণ রেলপথ নদীর একেবারে কাছ দিয়ে পাতা হয়েছে, মোটরের রাস্তা অনেকটা উঁচুতে। ট্রেন থেকে নদী আরও ভাল ক'রে দেখা যায়। তবে দুঃখের বিষয়, রেল কালিম্পঙ অবধি নেই, এর শেষ ষ্টেশন গিয়েল-খোলা থেকে আবার অনেকটা মোটরে যেতেই হয়, সে-জন্য, এবং ট্রেনে গেলে অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়, সে-জন্যও, সাধারণতঃ লোকে মোটরেই যাওয়া-আসা করে।

তিস্তা ও রিয়াং নদীর সংযোগ স্থল—এ-প্রান্তের বিশিষ্ট বাণিজ্য- ও রেল- কেন্দ্র। রিয়াং থেকে বৈদ্যুতিক রজ্জুপথ সোজা কালিম্পঙ অবধি গিয়েছে, ভারী মাল এতে খুব তাড়াতাড়ি ও সস্তায় পাঠানো যায়। আর এর দ্বারা এ-দেশের গরীব কুলি-মজুর গাড়োয়ানদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। আমার এক সহযাত্রিণী বললেন, "ইংরেজ এই রজ্জু-পথ গরীবের রুটি মারবার জন্যই এনেছে, তাদের সর্ব্বনাশ হোক্।"

তিস্তা ব্রিজ অবধি রাস্তা চড়াই বেশী নয়। নদীবক্ষের কাছ দিয়ে যেতে হয় ব'লে, দু-দিকেই সুউচ্চ পর্ব্বত মনে হয় যেন বিরাট প্রাচীরের মত পথকে আগলাচ্ছে।

পর্ব্বতগাত্রে রৌদ্রছায়ার খেলা সব সময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেশীর ভাগই সংরক্ষিত সরকারী বন দেখা গেল, কোথাও কোথাও পাহাড়ীরা জঙ্গল কেটে পাহাড়ের গায়ে কি বিস্ময়জনক ধৈর্য্য ও কৌশলের সহিত চাষ করছে ও প্রকৃতির সহিত অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তা দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। অনুকূল আবেষ্টনে এই সব প্রপীড়িত পাহাড়ীরা মাটি থেকে সোনা ফলাতে পারত, তা বুঝতে দেরী লাগে না। কত মজুর, চাষা, গাড়োয়ান পথে যেতে যেতে দেখলাম, কারুর মুখ দেখলে মনে হয় না এদের অভাব কি মর্ম্মান্তিক! সকলের মুখেই একটা অবর্ণনীয় উৎসাহ দেখেছি। তারা সানন্দে ও কৌতূহলপরবশ হয়ে প্রত্যেক নবাগতকে নিরীক্ষণ করে শিশুজনোচিত উৎসাহের সহিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ত মোটর দেখলেই ছুটে আসে, আর এমন সরল গাম্ভীর্য্যের সহিত সেলাম করে যে, দেখে না হেসে পারা যায় না। বয়স্ক যারা টুপি পরে তারাও অতি ভদ্রতার সহিত ইংরেজী কায়দায় টুপি তুলে সেলাম করে। একটা সিগারেট উপহার পেলে এরা ধন্য হয়ে যায়। ভীষণ সিগারেটপ্রিয় এরা।

তিস্তা-ব্রিজে এসে গাড়ী দাঁড় করিয়ে বিহারী ড্রাইভার চায়ের দোকানে ঢুকল—তখন বাধ্য হয়েই নেমে পড়লাম। সহযাত্রিণীরাও চায়ের দোকানে গেলেন। অন্যমনস্ক হয়ে ফেরো-কংক্রীটের তৈরি সুবৃহৎ ব্রিজের অসাধারণ গঠন দেখছি, ইতিমধ্যে কানে এল, "আপনার পাস দেখাবেন ত।" ফিরে দেখি, এখানকার পুলিস-ইন্স্পেকটার মহাশয় আমার পাশে দাঁড়িয়ে। পাসের উপর দস্তখত ক'রে আমার কালিম্পঙ যাওয়ার উদ্দেশ্য, সেখানকার ঠিকানা প্রভৃতি সব তাড়াতাড়ি জেনে নিলেন। লোকটি কিন্তু অতি ভদ্র। তিস্তা-ব্রিজের কাছে ছোট একটি বাজার এবং পল্লী আছে, অদূরে সরকারী কর্ম্মচারীদের কয়েকটি সুদৃশ্য বাংলো দেখলাম। এখান থেকে একটি সরু মোটরের পথ ঘুম হয়ে দার্জ্জিলিঙ গেছে—আর একটি বেশ বড় রাস্তা গ্যাংটক অবধি তৈরি হয়েছে; তৃতীয় পথ এখান থেকে উপরে উঠেছে কালিম্পঙ পর্য্যন্ত। পথের প্রকৃত চড়াই এইখানেই আরম্ভ হয়। এক-এক জায়গায় রাস্তা এমনই খাড়া উঠেছে যে, নীচের খাদের দিকে তাকাতে রীতিমত ভয় হয়। ড্রাইভার বললে, "মাঝে মাঝে মোটর-দুর্ঘটনা যে হয় না, তা নয়।"

দূর হতে কালিম্পঙ পাহাড়ের আকৃতি ও ছোট-বড় বাগানবাড়ীগুলি বেশ সুন্দর লাগে। মোটর প্রথমে বাজারে গিয়ে থামল একটি প্রকাণ্ড মুদীখানার সুমুখে; বুঝলাম, সঙ্গিনীরা দোকানীর আত্মীয়া। তাঁরা হাসিমুখে বিদায় নিলেন—অল্পক্ষণের আলাপ, তবু মনে হচ্ছিল যেন কত দিনের

চেনা। তার পর ড্রাইভার আমাকে "হিল-ভিউ" হোটেলে এনে নামিয়ে দিলে। এইখানেই থাকব বলে আগেই স্বত্বাধিকারী মিষ্টার ব্যানার্জ্জিকে (অর্থাৎ বাঁড়ুজ্যে-মশায়কে) লিখেছিলাম; হোটেলটির অবস্থান ভারি সুন্দর, প্রশস্ত হাতা, চারদিকে অজস্র ফুল ও ফলের গাছ, নিম্নে সুবিশাল উপত্যকা, আর দূরে উচ্চ গিরিচূড়া। হাতার ভিতর এসেই দেখলুম একটি তরুণবয়স্ক ভদ্রলোক বাগানের গাছপালা পরিদর্শনে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন, আলাপে বুঝলাম ইনিই হোটেলের মালিক। দুঃখের সহিত তিনি জানালেন যে কোন ভাল কামরা এখন খালি নেই, তা নইলে তিনি কখনও আমাকে ফেরাতে চাইতেন না। ফিরে আসছি, তখন হঠাৎ কি ভেবে তিনি বললেন, "দেখুন, আপনাকে এই দুপুরে ফিরে যেতে দেব না, আসুন, দোতলায়, একটি ঘর আমার বাবার জন্য রিজার্ভ করা আছে, তিনি কোন্ দিন আসবেন ঠিক নেই, আপনি আপাততঃ সেই ঘরটি নিন।" আমি যেন বর্ত্তে গেলাম।

বাঁড়ুজ্যে-মশায় অতি চমৎকার আমুদে লোক, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। উচ্চশিক্ষা পেয়ে দিন-কতক চাকরী করেছিলেন, কিন্তু চাকরীর হীনতা ইনি বরদাস্ত করতে পারেন নি ব'লেই কালিম্পঙে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করছেন সপরিবারে। অতিথিদের প্রতি তাঁর ব্যবহার সরল ও অকপট। তাঁর হোটেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, অন্য হোটেলের মত এখানে খাওয়া-দাওয়ার শ্রেণী-বিভাগ নেই। হোটেলের সুশৃঙ্খল পরিচালনে যে গার্হস্থ্য আড়ম্বরহীনতা ও সামঞ্জস্য দেখে তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম, তা অনেকাংশে বন্দ্যোপাধ্যায়-জায়ার সুগৃহিণীপণার জন্যই সম্ভব হয়েছে, তা এখানে না বললে সত্য গোপন করা হবে।

কালিম্পঙ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এইবার বলব। এটি ছোট্ট অথচ সুন্দর জায়গা; কিন্তু এর জীবনশূন্য, নিস্তেজ ও নীরস ভাবটা প্রথম প্রথম বড়ই চোখে ঠেকে। কোথাও কোনরূপ কোলাহল বা জনতা দেখা যায় না, বাজারটি পর্য্যন্ত শান্ত। সপ্তাহে দু-দিন মাত্র এক প্রশস্ত ময়দানে হাট বসে, তখন সকলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ফলমূল আনাজ ইত্যাদি কিনে রাখে। হাটের দিন কিন্তু নিকটবর্ত্তী আড্ডাসমূহ হ'তে বহু পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষের সমাগম হয়। তখনকার দৃশ্য বিচিত্র ও মনে রাখবার মত। শহরের মিউনিসিপালিটি নেই ব'লেই বোধ হয় এখনও পথঘাটে আলোর কোন ব্যবস্থা নেই, সন্ধ্যার পর টর্চ্চ না নিয়ে বেরলে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়, কারণ বাজারটুকু ছাড়া আর সব জায়গাই অন্ধকারময়। আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত নেই—সিনেমা-থিয়েটারও নেই। বাঙালীদের জন্য একটি ছোট পাঠাগার আছে শুনেছিলাম। বৈদ্যুতিক আলোক সরবরাহের এখনও ব্যবস্থা হয় নি, তবে বোধ হয় শীঘ্রই হবে। জলের কল আছে ও এখানকার জল বেশ ভালই। সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত জলাশয় হতে সর্ব্বত্র নলদ্বারা জল দেওয়া হয়, জলও পাওয়া যায় প্রচুর, জলের ট্যাক্সও শুনলাম বেশী নয়। এখানকার বাজারে কয়েকটি বাঙালীর দোকান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিরও বাজারে প্রাধান্য নেই।

এখানকার বিশেষত্ব কয়েকটি খুব ভাল লাগল। বাজার ছাড়া আর কোন জায়গাই ঘিঞ্জি বা নোংরা নয়। সমস্ত ছোটবড় বাংলোর চার পাশে প্রশস্ত বাগান আছে, তা ছাড়া রাস্তাগুলিও বেশ ফাঁকা, বড় ও পরিষ্কার। স্বাস্থ্যান্বেষীর পক্ষে এটি আদর্শ স্থান, এর তুলনায় অন্ততঃ দার্জ্জিলিঙ বহুগুণ ঘিঞ্জি ও অপরিষ্কার। এখান থেকে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গগুলি দার্জ্জিলিঙের চেয়ে ভালরূপে ও দিনের বেলায় অনেক ক্ষণ দেখা যায়, কারণ এখানে কুয়াশার আতিশয্য নেই। দার্জ্জিলিঙ শিলঙ প্রভৃতির চেয়ে এখানে অল্প খরচায় থাকা যায়। শিলঙের মত প্রত্যেক রাস্তায় এখানে মোটরে যাওয়াও চলে, এ-সুবিধা দার্জ্জিলিং, মসুরী, সিমলা প্রভৃতি স্থানে নেই।

দর্শনীয় স্থানের ভিতর এখানকার চৌরাস্তা উল্লেখযোগ্য। চারটি পিচ-ঢালা রাস্তার সংযোগস্থল এটি, একে শহরের কেন্দ্র-স্থান বলা যায়। সকালে সন্ধ্যায় এখানে জনসমাগম হয়, তবে বলে রাখা উচিত যে, অন্যান্য পার্ব্বত্য শহরের জনপ্রিয় 'ম্যালে'র সহিত এর তুলনা করা চলে না। কালিম্পঙের চৌরাস্তা নিতান্ত সাদাসিধা হিন্দুস্থানী ধরণের, এখানে বিলাতী দোকান বা হোটেলও নেই—সাহেবসুবাদের ভিড়ও তাই হয় না। বাঙালী মহিলারাও এখানে সন্ধ্যায় বায়ুসেবন করেন না। তবে চৌরাস্তার উপর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

ছোট কিন্তু ভারি সুদৃশ্য একটি স্মৃতিমন্দির আছে, অনেকটা তিব্বতীয় রীতিতে গঠিত, মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তিটি অতি সুন্দর।

কালিম্পঙের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে ডক্টর গ্রেহাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনাথ ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েদের আশ্রম। শহরের অনেক উঁচুতে অনেকটা জায়গা সরকার এই আশ্রমের জন্য দিয়েছেন। এখানে ছেলেমেয়েদের ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের থাকবার জন্য অনেকগুলি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়েছে, স্কুল, গির্জ্জা, খেলার মাঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি সবই আছে। আশ্রমের নিজস্ব আধুনিক ধরণের গোশালা, চাষের জমি ও বাগান দেখবার জিনিষ। ছেলেদের পালা করে সেখানে কাজ করতে হয়, যাতে তারা স্বাবলম্বী ও শ্রমশীল হ'তে পারে। আশ্রম বাজার থেকে যথেষ্ট দূরে, তাই ট্যাক্সি ক'রে এক দিন সকালে গেলাম। পথে কয়েকটি বৌদ্ধ-'গুম্ফা' বা মঠ দেখলাম, সবই আধুনিক ও বৈশিষ্ট্যহীন, লামাদের দেখেও বিশেষ শ্রদ্ধা হ'ল না। ডক্টর গ্রেহামের আশ্রমে যেতে হ'লে কালিম্পঙের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ে উঠতে হয়—উপর থেকে নীচের শহর ও দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যসঙ্কুল উপত্যকার দৃশ্য ভারি মনোরম লাগে। আশ্রমের গির্জ্জাগুলির গঠনসৌন্দর্য্য চিত্তাকর্ষক, আগন্তুকদের ভিতরে গিয়ে দেখতে দেওয়া হয়। এই আশ্রমটির বিস্ময়জনক প্রসার ও পৃথিবীজোড়া খ্যাতি সম্ভব হয়েছে ঋষিতুল্য প্রতিষ্ঠাতার অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের জন্য। শুনলাম অর্থাভাবে অনাথ শিশুদের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে কম, তবু এখনও পাঁচ শ-র বেশী ছেলেমেয়ে এখানে আছে।

গ্যাংটক দেখবার ইচ্ছা গোড়া থেকেই ছিল, তবে একা যেতে মন চাইছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ সঙ্গী জোগাড় হতে কিন্তু বিলম্ব হয় নি। হোটেলে আরও দু-জন আমারই মত সিকিম দেখবার জন্য সমুৎসুক ছিলেন। আমার প্রস্তাবে তাঁরা সানন্দে যেতে রাজি হলেন। একজন পার্শী ভদ্রলোক, মিষ্টার দেশাই, সিঙ্গার সেলাই কল কোম্পানীর স্থানীয় হিসাবপরীক্ষক; আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক বাঙালী, দত্ত-মহাশয়, তিনি কলগেট-পামঅলিভ সোপ কোম্পানীর ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি। দুজনেই বেশ অমায়িক লোক, তাই তাঁদের মত সঙ্গী পাওয়ায় গ্যাংটক-যাত্রা খুবই প্রীতিকর হয়েছিল। একটি বাঙালী ট্যাক্সি-চালকের গাড়ী যাতায়াতের জন্য ঠিক করা হ'ল। আমরা সকালে জলযোগ করে বেরিয়ে পড়লাম। বাঁড়ুজ্যে-মশায় সঙ্গে দিয়ে দিলেন দুপুরে খাওয়ার প্রচুর লুচি, তরকারী, ডিম ইত্যাদি এজন্য তাঁকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানালাম। তিনি ও তাঁর ছেলে ও মেয়ে ডাকঘর অবধি আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ছেলেটি ত কেঁদেই অস্থির, সে গোঁ ধরল আমাদের সঙ্গে যাবেই। অনেক কষ্টে তাকে বাঁড়ুজ্যে-মশায় ভুলিয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

তিস্তা-ব্রিজ অবধি ঢালু পথে নেমে এসে আমরা গ্যাংটকের পথ ধরলাম। একদিকে কলস্বনা তিস্তা ভীমবেগে প্রধাবিতা, আর জলের প্রায় পাশাপাশি পথ গিয়েছে নিবিড় অরণ্যানীর গা ঘেঁসে, দু-দিকে গগনচুম্বী শ্বাপদসঙ্কুল শৈলরাজি—মাঝে মাঝে ছোট-বড় ঝরণা পথের তলা বেয়ে তিস্তায় এসে মিশছে। কত রকম যে অপরিচিত গাছপালা ও উদ্ভিদ দেখা গেল তা আমার মত অবৈজ্ঞানিকের বোঝা অসম্ভব। হিমালয়ের এ দিকটা সত্যই অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। বনবিহঙ্গের কলকাকলি, তিস্তার উচ্চ নিনাদ, ও পর্ব্বতের মৌন গাম্ভীর্য্য—সব মিলে মনকে যেন প্রতিমুহূর্ত্তে সমাহিত ক'রে দেয়। শিলিগুড়ি থেকে আসবার সময়ে তিস্তার এত কাছ দিয়ে যাই নি, গ্যাংটকের পথ তাই আরও সুন্দর লাগল।

বেলা দশটা নাগাদ রংপু-ব্রিজ পৌঁছালাম—এইখানে ব্রিটিশ-ভারতের সীমানা। রংপু নদীর ওপারে সিকিম-রাজ্যের আরম্ভ। রংপু-ব্রিজের ধারে সরকারী পুলিসের ঘাঁটি আছে, এইখানে পুলিস আমাদের পাস দেখতে চাইলে। বড় মুস্কিলে পড়লাম—আগে থেকে একেবারেই জানা ছিল না যে, সিকিম যেতে হ'লে বাঙালীদের পাস নিতে হয়, তাই পাসের কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নি। মিঃ দেশাই ত নিজের কার্ডে লিখে দিলেন যে তিনি পার্শী বলে তাঁর পাস রাখার দরকার হয় নি। দত্ত-মহাশয় ও আমি অবশেষে বুদ্ধি ক'রে আমাদের কালিম্পঙ আসার অনুমতিপত্র দেখিয়ে কোনরূপে রেহাই পেলাম। নদীর ওপারে রংপু পল্লী, সেখানে সিকিম পুলিস এক প্রকাণ্ড খাতা এনে হাজির করল—আমরা নাম-ধাম, যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখে দিলাম।

খাতায় বাঙালীর নাম খুবই অল্প চোখে পড়ল, পাঁচ-সাতটির বেশী নয়।

রংপু-র বাজার বেশ বড়, এখানে মিঃ দেশাই কোম্পানীর কাজে খানিকক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমরা দু-জন রংপু-র ধারে গিয়ে স্বচ্ছ জলে মুখ-হাত ধুয়ে বাজার ঘুরে এলাম।

রংপু-র পর রাস্তা ভাল নয়—স্থানে স্থানে মেরামত চলছে দেখলাম। এক জায়গায় একেবারে নদীর ধারে পাহাড় ধসে পড়ায় অতিকষ্টে মোটর নিয়ে যেতে হ'ল। পথে এক দল কালো পোষাক-পরা পাহাড়ী দেখলাম, নানান ধরণের বাজনা নিয়ে চলেছে। কৌতূহল হওয়ায় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাস' করলাম। তারা ত আনন্দের সহিত আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে। শুনলাম তারা সিকিমের দরিদ্র প্রজা, রাজদর্শনের জন্য গ্যাংটক যাচ্ছে, মহারাজার স্বমুখে গানবাজনা ক'রে তাদের রাজভক্তি জানাবে। দত্ত-মশায় তাদের বাজনা বাজাতে অনুরোধ করাতে তারা

ডক্টর গ্রেহাম-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের এক দিক

তৎক্ষণাৎ তাদের বড় বড় ভেঁপুতে এমন জোরে ফুঁ দিলে যে আমাদের কানে তালা লাগবার উপক্রম হ'ল। তাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও বাজনার যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে আমরা বিদায় নিলাম।

তার পর গাড়ী সিংটাম নদীর ধারে সিংটাম-বাজারে এসে থামল। প্রকাণ্ড বাজার, এখানে ডাকঘর, হাসপাতাল সবই আছে। এ-অঞ্চলে সিংটাম বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী, তবে বাজারে মাড়োয়ারীদেরই প্রাধান্য চোখে পড়ল। সিংটামের পর কমলালেবুর বাগান দেখা গেল। গাছে তখন খুব ছোট ছোট ফল ধরেছে। সিকিম থেকে কমলালেবু প্রচুর রপ্তানী হয়,

কালিম্পঙের চৌরাস্তা

সেজন্য এর চাষ এ-দেশে খুব বেশী হয়। সিংটাম নদীর ধার দিয়ে অনেক দূর পথ গেছে, তিস্তার মত রমণীয় না হ'লেও মন্দ নয়। বেলা বারোটা নাগাদ গ্যাংটক পৌছানো গেল।

গ্যাংটকে কোথায় বিশ্রাম করব ভাবছি, এমন সময় মিঃ দেশাই বললেন, ডাকবাংলোই ভাল। সেখানেই যাওয়া হ'ল। ডাকবাংলোটি অতি সুন্দর, চারি ধারে মনোহর উদ্যান, অজস্র গোলাপ, আর কত রকমের ফুল। মন তৃপ্তিতে ভ'রে গেল। ভুটিয়া চৌকিদারও বেশ ভদ্র, আমাদের খুব খাতির করলে, অবশ্য পুরস্কার পাওয়ার আশায়। সেখানে আমরা আরামে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করলাম, গেলাস প্লেট চামচ প্রভৃতি সবই চৌকিদার দিলে। বিশ্রামের পর বেরনো গেল। প্রথমে স্থির হ'ল ডাকঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে হবে, কারণ এখানকার নামাঙ্কিত চিঠি পেয়ে আত্মীয়বন্ধুগণ নিশ্চয় চমৎকৃত হবেন। ছোট ডাকঘর, পোষ্টমাষ্টারটি তরুণ সিকিমী,

খুবই ভদ্র—দোয়াত কলম কাগজ প্রভৃতি সবই আমাদের দিলেন ও ডাকঘরের ভিতর আমাদের সাদরে বসালেন। অল্পদিন হ'ল খবরের কাগজে পড়েছিলাম, এভারেষ্ট-যাত্রীদের অনেকগুলি চিঠি চুরি যাওয়ায় এই পোষ্টমাষ্টারটিকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। এখানে বলা দরকার যে, গ্যাণ্টক পোষ্ট-অফিস অবধি মোটরে ডাক যায়, সেখান থেকে তিব্বতের চিঠিপত্র পায়ে-হাঁটা পথে পাঠানো হয়, কাজেই কেমন ক'রে যে এভারেষ্ট-যাত্রীদের চিঠি অন্তহিত হ'ল তা দুর্ব্বোধ্য নয়। আমরা অবশ্য দূর হতে ডাকঘরের এক কোণে এভারেষ্ট-যাত্রীদের স্তূপীকৃত চিঠি দেখেছিলাম, সবগুলিতেই বিমান-ডাকের ছাপ ছিল।

তিস্তা-ব্রিজ

ডাকঘর থেকে আমরা রাজপ্রাসাদ অভিমুখে গেলাম। পথে টাউন-হল ও একটি সুন্দর সরকারী পার্ক দেখা গেল। রাজ-প্রাসাদ দেখে কিন্তু নিরাশ হলাম—মোটেই জাঁকালো নয়, সাধারণ বড়লোকের বাড়ী যেমন হয়ে থাকে, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। অবশ্য ভিতরে আমরা যেতে পারি নি, কারণ মহারাজা তখন প্রাসাদে ছিলেন। প্রাসাদের খুব কাছে গ্যাণ্টকের প্রসিদ্ধ কাষ্ঠনির্ম্মিত গুম্ফা দেখলাম। এটি বিশাল ত্রিতল অট্টালিকা, তিব্বতীয় আকারে প্রস্তুত। প্রধান লামার সহিত দেখা হ'ল না, তিনি তখন তিব্বতে; অন্যান্য লামারা আনন্দের সহিত আমাদের সমস্ত গুম্ফাটি দেখালেন, এমন কি, আমরা প্রধান লামার শয়ন-কক্ষ অবধি বাদ দিই নি। শয়নকক্ষে কিন্তু সস্তা বিলাতী পর্দ্দা ও বিলাতী ধরণের আসবাব চতুর্দ্দিকের তিব্বতীয় আবেষ্টনের ভিতর ভারি খাপছাড়া ও দৃষ্টিকটু লাগল। সভামণ্ডপের সমস্ত দেয়ালে বুদ্ধের জীবনী চিত্রিত হয়েছে, সবই তিব্বতীয় ও কতকটা জাপানী রীতিতে আঁকা। এর অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য ও অঙ্কন-কৌশল দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। যাঁরা দার্জ্জিলিঙ গেছেন তাঁরা ঘুমের প্রকাণ্ড গুম্ফা দেখেছেন কিন্তু গ্যাণ্টকের গুম্ফা তার চাইতে ঢের বড় ও সুন্দর।

এখানকার স্কুলে জন-কয়েক বাঙালী শিক্ষক আছেন শুনে আমরা আগ্রহের সহিত স্কুল দেখতে গেলাম। স্কুলটি বেশ বড় ও অনেক ছেলে পড়ে মনে হ'ল। হেডমাষ্টার ইংরেজ, অন্যান্য শিক্ষক এদেশীয়, তার মধ্যে মাত্র তিন জন বাঙালী। তাঁদের মধ্যে দু-জনের সহিত দেখাশুনা হয়েছিল, তাঁরা বললেন, বাঙালী শিক্ষক আর নেওয়া হয় না। তাঁরা অনেক পূর্ব্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন বলেই টিকে আছেন, তাঁরা কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলে আর এখানে বাঙালীর পক্ষে চাকরি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। স্কুল দেখে আমরা বাজারে এলাম। বাজার খুব বড় নয়, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সর্ব্বত্র যা দেখেছি এখানেও সেই মাড়োয়ারী-প্রাধান্য লক্ষ্য করলাম। বাজারের উপরেই একটি মেয়েদের স্কুল দেখা গেল। তখন একটি ইংরেজ-মহিলা মেয়েদের নাচ শেখাচ্ছিলেন। অনেকগুলি বড় বড় মেয়ে তালে তালে ঘুরে ঘুরে এক সঙ্গে পা ফেলছে কত ভঙ্গীতে, মনে হ'ল সেটা য়ুরোপীয় গ্রাম্য নৃত্য। রেসিডেণ্ট-সাহেবের বাসস্থানও দেখা গেল। গ্যাণ্টকের সর্ব্বোচ্চ শিখরে তাঁর জন্য এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী নির্ম্মিত হয়েছে; এটি রাজপ্রাসাদের চাইতেও সুশ্রী।

বৈকালে আমরা কালিম্পঙ-অভিমুখে ফিরলাম। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ঝিল্লীমুখরিত পাহাড় ও বনের ম্লানায়মান শ্যামলিমা নীরবে দেখতে দেখতে যখন রংপু পৌছালাম, তখন মিঃ দেশাই বললেন, তাঁকে একটি সেলাইর কল এইখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। মোটর একটি কুটীরের সুমুখে দাঁড়াল, মিঃ দেশাইয়ের নেপালী সহকারী ডাক দিতেই একটি ম্লানমুখী পাহাড়ী তরুণী বেরিয়ে এল। দু-জনে নেপালী ভাষায় কি কথা হ'ল বুঝলাম না। মিঃ

দেশাই রুক্ষভাবে সহকারীকে ইংরেজীতে বললেন, "বৃথা দেরী ক'র না, কলটি নিয়ে এস।" ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। মিঃ দেশাই যা বললেন তা শুনে মেয়েটির জন্ম ভারি দুঃখ হ'ল। ওর স্বামী কিস্তিবন্দী ক'রে কলটি নিয়েছিল, কিন্তু দু-এক মাস কিস্তির টাকা দেওয়ার পর কয়েক মাস কিছুই দেয় নি, যা উপার্জ্জন করে, মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। স্ত্রীপুত্রকে অর্দ্ধেকদিন আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। কলটি গেলে তাও জোটা অসম্ভব। রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। ভ্রমণের সমস্ত আনন্দ যেন মুছে গিয়েছিল মেয়েটির কান্না দেখে।

কালিম্পঙের গুম্ফা

গ্যাংটক থেকে হিমালয়ের দৃশ্য

কালিম্পঙ হ'তে ফেরবার আগে একদিন এক মাড়োয়ারীর লোমের গুদাম দেখতে গেলাম। এখানে ঐরূপ সবসুদ্ধ গোটা দশেক গুদাম আছে। তার মধ্যে দুই-একটি বাদে সব গুলিই মাড়োয়ারীদের। লোমের আমদানি-রপ্তানি কালিম্পঙের প্রধান বাণিজ্য। তিব্বতের মেষ-লোম এখানে পরিষ্কৃত হয়ে বৈদ্যুতিক রজ্জুপথে রিয়াং অবধি পাঠানো হয়। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে বেশীর ভাগই আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়। শুনলাম প্রায় দু-লক্ষ মণ লোম প্রতি বৎসর এখান থেকে মাড়োয়ারীরা রপ্তানি করে। এই ব্যবসা সম্পূর্ণ তাদের করতলগত এবং এ থেকে তারা বিস্তর পয়সা রোজগার ক'রে থাকে। তাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়। দেখে দুঃখ হ'ল যে বাঙালী এই সব কাজ করতে অপারক। লোমের গুদাম দেখে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই পেলাম। শতাধিক পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ কি দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত লোম বাছাই করছে, দেখে অবাক হতে হয়। দিনমজুরী কিন্তু চার-পাঁচ আনার বেশী নয়। লোম রঙ অনুসারে সাধারণতঃ চার ভাগে পরিষ্কৃত হয়—ধূসর, সাধারণ শুভ্র, অতি শুভ্র ও কৃষ্ণ। তার পর কলে ওজন-হিসাবে গাঁটবন্দী হয়। একটি বড় গুদাম করতে হ'লে অন্তত এক লক্ষ টাকা মূলধন আবশ্যক শুনলাম। কাজেই মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই ব্যবসায়ে হাত দেওয়া কঠিন। বাঁড়ুজ্যে- মশায় বলেছিলেন, তিনি অনেক বাঙালী ও বড়লোককে এই লাভজনক কাজে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর চেষ্টা এখনও সফল হয় নি।

মণিপুর যাব ঠিক করেছিলাম ব'লে কালিম্পঙে দিন-কয়েকের বেশী থাকতে পারি নি, কিন্তু যে ক-দিন ছিলাম বাঁড়ুজ্যে-মশায়ের সৌজন্য ও অতিথি-সৎকারে ত্রুটি খুঁজে

ডক্টর গ্রেগাম-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের একটি অট্টালিকা

পাই নি। আসবার দিন দত্ত-মশায় সঙ্গী হলেন। ট্যাক্সি ক'রে দুপুরে আমরা শিলিগুড়ির দিকে রওনা হলাম। চেনা পথে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মনটা উন্মনা হয়ে ছিল। আসবার সময় সাগ্রহে ও বিস্ময়ের সহিত যা দেখেছি, বিদায়কালে সেগুলি যেন নিষ্প্রভ ও বৈচিত্র্যহীন লাগল। মানুষের মনটাই এমন নিত্য-নূতনের প্রয়াসী।

দূরের বন্ধু

শ্রীরাধারাণী দেবী

আকাশ ধরারে বাহু-বন্ধনে রেখেছে ঘিরে
তবুও ধরণী তারি বিচ্ছেদে কাঁদিয়া ফিরে।
পরশে পৃথিবী গগন-চরণ দিগন্তরে,
ভাসে তা কেবল দূর-পথিকের নয়ন'পরে।

কাছের পান্থ ভাবে,—দু-জনার বিরহ কেন ?—
ধরা ও আকাশে মহা ব্যবধান রয়েছে যেন !

দোঁহে দোঁহা হতে সুদূর,—ওদের তাই এ-লীলা !
সাগরে মরুতে প্রান্তরে দূরে—গোপনে মিলা।

নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে বঙ্গমহিলাদের সভা

বঙ্গে যে বহুসংখ্যক নারী পৈশাচিকভাবে নিগৃহীত হইতেছেন, তাহার প্রতিরোধকল্পে কি করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনার নিমিত্ত, শ্রীমতী মোহিনী দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী কিরণ বসু, শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর আহ্বানে, গত ১৯শে আশ্বিন কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটির হলে বাঙালী মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমতী সরলাবালা সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি বলেন :

বাংলা দেশে নারীর উপর যেরূপ অত্যাচার চলিতেছে, অন্য দেশে এইরূপ হইলে তথাকার লোকেরা পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী জাতি, বিশেষভাবে বাংলার নারীরা, একেবারে নিশ্চল। বাংলা দেশ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। খোদ গোবিন্দপুরে একটি নারীর উপর যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা কি বাংলার নারীজাতির কলঙ্ক ও অপমান নহে ?

আজকাল দেশাত্মবোধ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বৃদ্ধি পাওয়াও উচিত ; সুতরাং পল্লীগ্রামের নারীদের উপর অত্যাচারে যদি বাংলার নারীদের প্রাণ কাঁদিয়া না উঠে এবং এইরূপ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যদি তাহারা বদ্ধপরিকর না হয়, তাহ হইলে নারীজাতির পক্ষে অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি আছে! দিনের পর দিন যখন এইরূপ হইতেছে, তখন দেশের নারীদের এই বিষয় সচেতন হওয়া উচিত এবং অন্তরের সহিত এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

ইহার পর এই সভায় নিম্নমুদ্রিত চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা দেশে যেরূপ দিনের পর দিন অসহায় নারীদিগের উপর দারুণ পৈশাচিক অত্যাচার হইতেছে, তাহার জন্য গবর্মেণ্টের বিশেষভাবে কঠোরতর শাস্তির বিধান করা উচিত এবং যেখানে দলবদ্ধভাবে অত্যাচার হয়, সেখানে যে যে গ্রামের লোকের দ্বারা এইরূপ অত্যাচার সংঘটিত হয়, সেই সেই গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা (পিউনিটিভ ট্যাক্স) ধার্য্য করা হউক এবং পুলিস যাহাতে এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণের জন্য বিশেষ সতর্কভাবে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করে, সেজন্য তাহাদের উপর সরকারের বিশেষ আদেশ দেওয় উচিত। অপর পক্ষে এই সভা গ্রামে গ্রামে যাহাতে নারীদের রক্ষার জন্য রক্ষিদল সংগঠিত হয়, সেজন্যও দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছে।

(২) খোদ গোবিন্দপুরে আমাদেরই একটি ভগ্নী, বাংলা মায়ের এক দুর্ভাগিনী কন্যা, বর্ষীয়সী ও বহু সন্তানের জননী কুসুমকুমারীর উপর যে অমানুষিক, নির্লজ্জ ও পৈশাচিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেরূপ দুঃসাহসের সহিত প্রকাশ্যভাবে দলবদ্ধ হইয়া এই অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া প্রত্যেক নরনারীই স্তম্ভিত হইবেন। এই মোকদ্দমায় অপরাধীগণের প্রতি যে-দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অপরাধের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইয়াছে। এজন্য এই সভা আশা করিতেছে যে, গবর্মেণ্ট ইহার বিরুদ্ধে আপীল করিয়া অত্যাচারীদের যথোচিত দণ্ডবিধানের দ্বারা বাংলার নারীগণের মান-সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হউন।

(৩) বাংলা দেশের প্রত্যেক রমণী তাঁহাদের ভগ্নীগণের উপর যে সকল অত্যাচার হইতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া, কলিকাতায় ও মফস্বলে, পল্লীতে পল্লীতে, ইহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা ও আন্দোলন আরম্ভ করিবেন এবং যদবধি না এই অত্যাচার নিবারিত হয়, তদবধি দৃঢ়ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে থাকিবেন। এই সভা বাংলা দেশের ভগিনীগণের নিকট সনির্ব্বন্ধভাবে ইহাই অনুরোধ করিতেছে।

(৪) জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত নারী মাত্রেই নারী, এবং যাহারা অত্যাচার করে তাহারা অত্যাচারী ; সুতরাং এস্থলে সম্প্রদায় বা জাতির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং আমরা এই সভায় নারীগণের পক্ষ হইতে দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি যে, নারীর উপর অত্যাচারী কর্ত্তৃক অত্যাচার-ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোনমতেই সঙ্গত নহে।

যাঁহারা এই প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করেন ও সমর্থন করেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও বক্তৃতার কোন কোন অংশের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন :

আজ ১৫ বৎসর হ'ল এই পাপ বৃদ্ধি হওয়ায় এই পাপ দূর করবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এই পাপ দূর করবার জন্যে বাঙালীকেই বদ্ধপরিকর হ'তে হবে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যুবকগণের দ্বারা রক্ষীর দল সংগঠন ক'রে দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার দমন করবার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা আর রক্ষা নেই, কেহই আর নিরাপদে বাস করতে পারবে না। বাংলার পল্লীতে আমাদের ভগিনীদের মধ্যে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কোন্ দিন কোন্ পরিবারের মেয়ে, বধূ, মা'র সর্ব্বনাশ হবে, তার কিছুই ঠিক নাই। এই অরাজক অবস্থার প্রতিবিধান না করলে আর রক্ষা নেই। গত ১৫ বৎসর গবর্মেণ্টেরই গণনা অনুসারে দেখা যায়, দশ হাজারেরও বেশী নারী নিগৃহীত হয়েছে। গবর্মেণ্ট তার দমনের জন্য কি করেছেন? এতদিন ত কিছুই করেন নি, এ-বৎসর মাত্র বেত্রাঘাত-দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। গবর্মেণ্ট ঠগীর অত্যাচার নিবারণ করেছেন, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ বন্ধ করেছেন। আর নারীর উপর

এই অত্যাচার নিবারণ করবার কি তাঁদের উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য নেই? দেশে সন্ত্রাসনবাদ দমনের জন্তে গবর্মেণ্ট অর্ডিনান্স, নির্ব্বাসন, সংশোধিত ফৌজদারী আইন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেছেন। বাংলার নারীদিগকে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে আপনার গৃহপরিবারে বাস করতে সমর্থ করবার জন্যে গবর্মেণ্টের যে কর্ত্তব্য আছে তা কবে সাধন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হবেন? আমাদের মনে হয়, যেখানে এরূপ নির্য্যাতন হয় সেখানে পিউনিটিভ পুলিস স্থাপন করা উচিত।

নারীনির্য্যাতনের যে-সব ভয়াবহ পৈশাচিক নারকীয় ঘটনা ঘটছে, ভাষা নেই যে তার পৈশাচিকতা ভাল করে বলি; ভাষা নেই যে মনের অব্যক্ত ক্ষোভ, রোষ প্রকাশ করে বলি। শিশুদের বুকে লাথি মেরে তাদের অজ্ঞান ক'রে মাকে তাদের কোল থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা, এই সব নারকীয় কাহিনীর কথা সকলেই আমরা জানি; কিন্তু আমরা দিব্য আরামে আহার বিহার ক'রে, নারী সমিতির মীটিং ক'রে বেড়াই। কেন যে পাগল হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে যাই না এই সব পৈশাচিক ঘৃণ্য ঘটনা দমন করবার ব্যবস্থা করতে, তা জানি না। কেন ছুটি না দেশের লোককে এ বিষয়ে সচেতন করতে? মন একেবারে অসাড়, জড় হয়ে পড়েছে তাই বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাই। কিংবা হয়ত ভাবি ওসব ত ঐ পাড়াগাঁয়েই হয়, আমাদের তাতে মাথা ঘামাবার কি দরকার? এই যদি আমাদের মনোভাব হয়, তবে ধ্বংস অনিবার্য্য।

শ্রীমতী শান্তা দেবী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, এবং শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় ইহার পোষকতা করিয়া বলেন, প্রত্যেক নারীর কাছে একটি ছোরা থাকা আবশ্যক।

বঙ্গের কংগ্রেসদলভুক্ত পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে বড় এবং কারাগারের অভিজ্ঞতাশালিনী শ্রীমতী মোহিনী দেবী দ্বিতীয় প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন, এবং নিখিলভারত নারীসম্মেলনের সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত ইহার সমর্থন করেন।

শ্রীমতী রমা দেবী কর্ত্তৃক তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। তিনি বলেন:

একদিন ভারতের ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অসামান্যা রূপসী চিতোরের রাণী পদ্মিনী তাঁর রূপের নেশাকে ধিক্কার দিয়ে অগ্নিশিখায় রূপকে ছারখার করে ফেলেছিলেন, পাছে পরের হাতে দেহকে বিকিয়ে দিতে হয়। তাঁরই সঙ্গে বহু নারী দিলে আপনাকে বিসর্জ্জন আত্মসম্মানকে বাঁচিয়ে রাখতে।

আমরা নিজেদের শিক্ষিত এবং সভ্য বলে গর্ব্ব ক'রে থাকি; শুধু গর্ব্ব করা নয় সেই সঙ্গে তারই দোহাই দিয়ে সমাজের বুকের উপর নানা ভাবে বিচরণ করি। কিন্তু সত্যই কি আমরা কোনও মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করবার মতন নিজেকে এবং সমাজকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছি? বলতে লজ্জা এবং ঘৃণায় মাথা নত হয়ে যায় যে আজও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারীকে আশ্রয় খুঁজতে হয়, নিবেদন জানাতে হয় সভ্য সমাজের দ্বারে গিয়ে, তবু প্রতিকার হয় না।

ভারতের নারীজাতির মহাসম্মিলনীর বৈঠকে দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা ধনী মহিলারা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নারীহরণের প্রতিবাদ করা তাঁরা যুক্তিসঙ্গত বা বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন নি। বাংলার ঘরের সামান্যা শিক্ষিতা হিন্দু রমণী বাংলার নির্য্যাতিতা নারীদের করুণ কাহিনী বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্মুখে প্রতিকারের আশায়। ভারতের মহাসম্মিলনীর যাঁরা সভ্যা, তাঁহারা অধিকাংশ ধনী-ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাঁরা দীন দরিদ্র অসহায়দের খোঁজ রাখেন খুব কমই। কাজেই এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্যের যথার্থ সার্থকতা হওয়া সম্ভব নয়, যতদিন না তাঁরা ঐ অসহায় দীনদুঃখীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ মেটাতে সমর্থা হবেন।

আরও আশ্চর্য্য মনে হয়, এত বড় পাশবিকতা ঘটা সত্ত্বেও আজ বাংলায় বা ভারতের মুসলমান শিক্ষিত সমাজে এমন নারী অথবা পুরুষ নেই কি, যাঁরা এর প্রতিকারের জন্য প্রতিবাদ অথবা চেষ্টা করতে পারেন? যদি থাকেন, তবে আজ তাঁরা নীরব কেন? নারীর আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থে জাতিভেদ, দ্বেষ, হিংসা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বাংলায় পাশবিক আচরণের আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবক আমায় বলেছিলেন, "হিন্দুর অত্যাচার মুসলমান অপেক্ষা অনেক বেশী।" তাঁর এই ধারণা ভুল হলেও আমি এই কথা বলতে আজ বাধ্য হচ্ছি যে, সংখ্যার তুলনা না ক'রে যদি আমরা কার্য্যটির পানে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব যে, হিন্দু-মুসলমানে কিছু আসে যায় না। যে কার্য্য ঘটে যাচ্ছে তা গর্হিত এবং অন্যায় কিনা, সেই দেখে বিচার করাটাই কর্ত্তব্য বলে মনে করি। হিন্দুই করুক বা মুসলমানই করুক, কার্য্যটি যে অত্যন্ত জঘন্য এবং নীচতার পরিচায়ক সে-বিষয় কোন সমাজই আজ, আশা করি, অস্বীকার করবেন না, এবং এই পাপ-প্রবৃত্তির নেশা দিনের পর দিন যে নিম্ন গতির দিকে চলেছে, তাও শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়, আশা করি, বিবেচনা ক'রে দেখবেন। অন্যায়কে অন্যায় ব'লে মেনে নেওয়ার মধ্যে লজ্জার কারণ থাকে না, বরং তাকে না-মানাটাই কাপুরুষতার চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্ত্রীলোকের প্রতি এই যে ঘোরতর অত্যাচার, এরই প্রতিবাদস্বরূপ আজ আমরা এইখানে উপস্থিত হয়েছি, রাগ- বা বিদ্বেষ- বশে মিলিত হই নি। মিলিত হয়েছি নিজেদের আত্মমর্য্যাদা ইজ্জত রক্ষার অভিপ্রায়ে, মিলিত হয়েছি অসম্ভব আঘাত ও বেদনায় জর্জ্জরিত হয়ে।

যে শাসকের একচ্ছত্র শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আজ আমরা নারীরা বাস করছি, সেই শাসকের নিকট দাবী করতে এসেছি সুবিচার এবং সতর্কতার সুদৃষ্টি যার সাহায্যে নারীজাতি তাদের আত্মসম্মান ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে রেখে শান্তিতে বাস করতে পারে।

আর চাই শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সচেতন মনোভাব। তাঁরা আজ ভুলুন তাঁদের আত্মাভিমান, ভুলে যান তাঁদের জাত্যভিমান। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর নারীর ইজ্জত ও আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাঁদের শক্তি নিয়োগ করুন। তবেই তাঁদের সৎশিক্ষার মহত্ত্ব ও সার্থকতা।

আজ নারীদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ, তাঁরা এই কার্যে সহায়তা করতে অগ্রসর হোন, সাড়া দিন, যদি আজ তাঁরা এই ব্যথা নিজেদের অন্তরে অনুভব ক'রে থাকেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি শ্রীমতী কুমুদিনী বসু কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেন:

আজ আমরা এখানে যে-কাজের জন্যে সমবেত হয়েছি, অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এর অনেক পূর্ব্বেই আমাদের সে-কাজ করা উচিত ছিল। মানুষের তখনই সব চাইতে বড় বিপদ এসে যায়,

যখন সে আত্মবিস্মৃত হয়। বিশ্ববিস্মৃত হ'লেও বরং কোন মতে চললেও চলতে পারে, কিন্তু আত্মবিস্মৃতের এ-সংসারে টিকে থাকা অসম্ভব! আমাদের এদেশের মেয়েদের এখন সেই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা ভুলতে ভুলতে ভুলেই গেছি যে, যে-কোন নারীর অপমানে অত্যাচারে অবিচারে আমাদের প্রত্যেকেরই অংশ আছে, এর সঙ্গে আমাদের প্রতি জনেরই মান-মর্য্যাদা জড়ানো। না, আমরা তা ভাবি না। যেমন বাড়ীতে একটা কঠিন যন্ত্রণাকর রোগে যদি কেউ বৎসরের পর বৎসর ধরে ভুগতে থাকে, তার যন্ত্রণা জ্বালা সর্ব্বদা চোখে দেখে বাড়ীর ছোট ছেলেটির সূক্ষ্ম মন কঠিন হয়ে ওঠে। সদাসর্ব্বদাই নারীধর্ষণের দুঃসম্বাদ পেতে পেতে তেমনই আমাদের অতি-অভ্যস্ততার ফলে আমাদের মনের কাছে থেকে এর ভয়াবহতা অনেক দূরে চলে গেছে। এমনই হয়। হীনতার আবেষ্টনে বহুদিন থাকতে থাকতে মানুষের মনের সমুদয় সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্রমশ তাকে হীন ক'রে দেয়। একদিন যে মশা মারতে পারত না, সঙ্গদোষে একদিন হয়ত সে অনায়াসে নররক্তপাত করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের অবস্থাও অনেকটা তাই হয়েছে। যে দেশের স্বামী পত্নীহরণকারীকে দণ্ড দেবার জন্য দণ্ডকারণ্য থেকে বেরিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-পর্ব্বত নদনদী অতিক্রম ক'রে অত্যাচারীর সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বীপনিবাসে পৌঁছে তাঁকে উচ্ছেদ ক'রে ছেড়েছিলেন, সেই দেশের স্বামীপুত্র বাপ-ভাইরা আজ জড়পুত্তলিকা হয়ে মা-বোন-মেয়ের নিকৃষ্ট লাঞ্ছনা সহিষ্ণুতার সঙ্গেই সহ্য ক'রে যাচ্ছেন! তাঁদের ঘরের মা-বোন-মেয়েরাও বেশ সহজভাবেই তা সমর্থন ক'রে চলেছেন। কোন গোলমালই নেই! মা-বোনেরা যদি জিদ করেন, পুরুষরা কি এতখানি কাপুরুষ হয়ে থাকতে পারে? পশুমাংসলোলুপ কসাইয়ের চাইতেও অধম নারীমাংসলোলুপ কি তা হ'লে নিশ্চিন্ত চিত্তে এমন করে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিতে পারত? গবর্ন্মেণ্ট না হয় বিদেশী গবর্ন্মেণ্টই, তাই ব'লে কি এমন ঢিলে হাতে এদের জন্য শিথিল দণ্ড ধারণ ক'রে অর্দ্ধনিশ্চেষ্ট থাকতে পারতেন? যাদের বিপদ, তাদেরই এখন থেকে অবহিত হ'তে হবে। তা না হ'লে সত্যকার কাজ হবে না। গবর্ন্মেণ্টকে বিশেষভাবে এজন্য অনুরোধ চারিদিক দিয়েই জানাতে হবে। পল্লীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, মেয়েদের মানসিক উন্নতি ও দৈহিক বলাধান যাতে হয়, তার জন্য গ্রামে গ্রামে সুব্যবস্থা করবার আয়োজন মেয়েদের খুব চেষ্টা ক'রেই করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা নরনারী উভয় পক্ষেরই যাতে হয়, শহরের স্কুলকলেজে তার ব্যবস্থা এবং গ্রামে গ্রামে তার বন্দোবস্ত সঙ্ঘবদ্ধ নারীদের পক্ষ থেকেই করতে হবে। আর সবার উপর এই নারীসঙ্ঘকে হিন্দুমুসলমান শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত পরিবার থেকে মহিলাদের সমভাবে গঠিত ক'রে তুলতে হবে। কাউন্সিলে পর্য্যন্ত জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক বলেছেন, "নারী-ধর্ষণ ব্যাপারটাকে হিন্দুরা হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের আলোতে বড় ক'রে দেখছেন, আসলে এটা এত বড় কিছু নয়!" এ কি অদ্ভুত মনোভাব? কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক, তাঁর ধর্ম্মমত তাঁর স্রষ্টাপুরুষকে যে নাম দিয়েই ডাকতে শেখাক, এমন কথা ভাবতে পারলেন কি করে? অথচ সরকারী হিসাবে পাওয়া যায়, ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা মুসলমান নারীদের মধ্যে বেশী! অতএব হিন্দু মুসলমান বলে নয়, মোটের উপর এদেশের আবহাওয়াই দূষিত হয়ে গেছে! গায়ের চামড়া হয়ে গেছে মোটা। মেয়েদের দুর্দ্দশায় প্রাণ কাঁদে না, গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে না। নিজেদের পরম কর্ত্তব্যটাকে চরম ব্যবস্থায় নরম ক'রে ফেলে শিক্ষিত মুসলমান নেতারা নিশ্চিন্ত হলেন, আর হিন্দুরা হয়ত ভাবলেন, "এই পথ ধরে আবার হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ-বহ্নি যদি ঊর্দ্ধশিখ হয়! যেতে দাও!" চমৎকার সমন্বয়! এখন যাদের বিপদ, সেই হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের একচিত্ত হয়ে ভাবতে হবে, কঃ পন্থাঃ? শুধু ভাবলে হবে না, ভেবে উপায় নির্দ্ধারণ করতেও হবে। আমার মনে হয়, আমাদের সামনে এই সমস্যাটিই সর্ব্বপ্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে। মুসলমান শিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে একটি সম্মিলিত মহিলা-সঙ্ঘ তৈরি করা এবং একযোগে পল্লীগ্রামে গিয়ে মেয়েদের ভিতর আত্ম-রক্ষার জন্য দৈহিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপদেশ প্রদান, স্কুল বা পাঠশালা সংস্থাপন ইত্যাদি যথার্থ জনহিতকর কাজ হাতে কলমে করা। শুধু শহরের হলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেই হবে না, কাগজে লিখলেও না। তবে, এ-দুটির আবশ্যকতাও নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র এই চতুর্থ প্রস্তাবটির সমর্থন এবং শ্রীমতী বিভাবতী মুখোপাধ্যায় ইহার পোষকতা করেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :

গবর্ন্মেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন দ্বারা কোন ফল হইবে না এবং এইরূপ আবেদন-নিবেদন তিনি পছন্দও করেন না। বাংলা দেশে এই নারীনির্য্যাতনের মূলে রহিয়াছে পুরুষের কাপুরুষতা ও নারীর ভীরুতা। যত দিন পুরুষের কাপুরুষতা ও নারীর ভীরুতা দূর না হইবে, তত দিন এই নারীনির্য্যাতনের কোন প্রতিকার হইবে না। নারীদের নিজেদের বীর হইতে হইবে, এবং সন্তান, স্বামী ও ভাইদের বীর করিতে হইবে। বাঙালী নারীদের কর্ত্তব্য হইতেছে সাহসের সাধনা করা। পৌরুষ কথাটি শুধু পুরুষের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নহে, নারীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সভার উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার কার্য্যবিবরণ জানিতে পারি নাই। পূজার ছুটি শেষ হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

মহিলাদের এই কনফারেন্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্ত্তিক সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছিল। আবশ্যক বোধে বিস্তৃততর বৃত্তান্ত দেওয়া হইল।

—

নিখিল-ভারত নারীসম্মেলন

নারীরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী আগামী ডিসেম্বর মাসে একটি নিখিল-ভারত নারীসম্মেলনের উদ্যোগ করিতেছেন। কুচবিহারের রাজমাতা ইন্দিরা মহারাণী তাহার সভানেত্রী হইবেন, কাগজে এইরূপ দেখিলাম।

—

নিখিল-বঙ্গ মহিলাকর্ম্মীসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ

গত ২৫শে ও ২৬শে আশ্বিন কলিকাতার আলবার্ট হলে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ প্রমুখ মহিলাদের উদ্যোগে নিখিল-বঙ্গ মহিলাকর্ম্মীসম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীমতী মোহিনী দেবী অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ সম্মেলনের সভানেত্রীর কর্ত্তব্য যথাযথরূপে সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় মানবসভ্যতা ও নারীদের সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত

শ্রীমতী মোহিনী দেবী

হইয়াছে তাঁহার বক্তব্য মূলতঃ তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য মহিলাসম্মেলনে তাঁহার সমুদয় বক্তৃতাটির অনুলেখন দিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা যথাযথ অনুলিখিত হয়ও নাই। শেষের দিকে তিনি বলেন :

প্রজারা যাতে আপনাদের হীন অবস্থা বুঝতে না পারে এবং প্রতিবাদ না করে—সেজন্য একেশ্বর রাজারা যেমন প্রজাকে জ্ঞান দিতে কুণ্ঠিত হয়, তেমনি একেশ্বর আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যই পুরুষেরা নারীদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করে এসেছে এবং মূঢ়তার জগদ্দল পাথর মেয়েদের উপর চাপিয়েছে। এতে পুরুষেরা ঠকেছে। কারণ, আজ যে আমরা দেশকে উন্নতির পথে, সামনের দিকে টানতে চাচ্ছি, তা বাধা দিচ্ছে এই মূঢ়তা ও অজ্ঞতা আমাদের মেয়েদের মধ্যে। এ পুরুষেরই কৃতকর্ম্মের ফল।

নারীদের জগদ্ব্যাপী জাগরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

একটা সৌভাগ্যের কথা এই যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসেছে। প্রাচ্য মহাদেশের সর্ব্বত্র এই জাগরণ দেখা দিয়েছে। সকলেই বুঝতে পারছে যে, মেয়েদের পিছনে ফেলে রেখে সমগ্র দেশের ক্ষতি হয়েছে। দেখেছি পারস্যে রাজশাসনের নূতন আইন হয়েছে—যাতে মেয়েরা শিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভ ক'রে নিজেদের গৌরবময় স্থান অধিকার করে। জাপানে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমানভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছে। সেখানকার বীরাঙ্গনাদের কীর্ত্তি দেখলে পুলকিত হ'তে হয়। চীনের মেয়েরা দেশকে বাঁচাবার জন্য ঘরের গণ্ডী পেরিয়ে এসেছে। মা যেমন সন্তানকে বাঁচাবার জন্য বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেই রকম মেয়েরা যখনই দেখেছে যে তাদের ভাই পুত্র সন্তান বিপন্ন তখনই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে রণাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হয় নি। স্পেনে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোক। এ-কথা বললে ভুল হবে যে, তা-হ'লে কি তারা নারীধর্ম্ম পরিত্যাগ করে পুরুষের চিত্তবৃত্তি ধার করে কাজ চালাচ্ছে? ধারে কোন বড় কাজ চলে না। মেয়েদের মেয়েই থাকতে হবে—এটা বিধাতার বিধান। কিন্তু এ-কথাও বলা ভুল ও অশ্রদ্ধেয় যে মেয়েরা কেবল গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।

শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ

সভ্যতা জিনিষটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। সেই কাজে নারীদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ

যে নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়ে পুরুষের সভ্যতা রক্তপথে চলেছে, সেটা আজ টলমল করে উঠেছে। পাশ্চাত্য দেশ, যেখানে এই সভ্যতার বড় কেন্দ্র, সেখানে এই বিনাশের শক্তি এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে, আজ বড় বড় মনীষীরা সন্দেহ করছেন যে, বর্ত্তমান সভ্যতা বিনাশের পথে চলেছে—তার কারণ কি? কারণ এই সভ্যতা একপেশে, এর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। এটা পুরুষের, নারীর স্থান এতে নেই। এই যে নিষ্ঠুরতার উপরে গড়া পুরুষের সভ্যতা, এ টিঁকতে পারে না। আজকের দিনে তার হিসাব-নিকাশের পালা পড়েছে। আর ঠিক এই সময় মেয়েরা বাইরে এসেছে। যদি সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে না যায়—যদি এ টিঁকে থাকে, তবে এখন থেকেই মেয়েদের দায়িত্ব সুরু হ'ল। মেয়ে আর পুরুষে মিলে যে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠবে তাতে বাঁচবার মন্ত্র দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষের চিত্তবৃত্তির এবং নারীর হৃদয়বৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে—তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা। তার উদ্যোগ হয়েছে এতদিনে। মেয়েরা এতদিন তাদের দীনতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। সেই মেয়েরা এখন যদি বলে যে, সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টিতে তাদের কাজ করতে হবে—তবে তাদের তা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে। তাদের অজ্ঞতা, অন্ধকার দূর করতে হবে। যেখানে অজ্ঞতা—সেখানে তোমাদের অর্ঘ্য দিও না। আজকের দিনে তোমাদের জাগতে হবে। শক্তিকে দীপ্ত, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে; কেননা নূতন যুগ এসেছে। এ-কথা আর বলতে পারবে না যে, তোমরা বোকা, মূঢ়, মূর্খ, অকেজো। একথা বলতে লজ্জা কোরো যে তোমরা, ভারতের নারীরা অবনত। জগতের আহ্বান তোমাদের এসেছে। যুগসঞ্চিত সমস্ত আবর্জ্জনা তোমাদের তুচ্ছ করতে হবে এবং জ্ঞানের বুদ্ধির দীপ্তিতে তোমাদের উজ্জ্বল হ'তে হবে। যদি তোমরা যোগ্য হও, দেখবে আর কেউ কখনও তোমাদের অপমান ও অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

—

শ্রীমতী মোহিনী দেবীর অভিভাষণ

মহিলা কর্ম্মী সম্মেলনে তাঁহার প্রাণস্পর্শী অভিভাষণে নানা কথার মধ্যে শ্রীমতী মোহিনী দেবী অন্য কোন কোন দেশের নারীদের কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন:

বিগত সত্যাগ্রহে ভারতের নারীবৃন্দও তাঁদের কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ ও প্রাণশক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন সে ত আপনাদের অবিদিত নেই। আপনাদের নিকটে আমার এই নিবেদন যে বাংলা দেশের এই প্রাণশক্তিকে কর্ম্মপথে অগ্রসর করে দিতে সাহায্য করুন। আমাদের সমগ্র সঙ্ঘশক্তিতে যদি দলবদ্ধ হয়ে আমরা দাঁড়াই তাহলে এমন কোন্ ক্ষমতা আছে যে আমাদের বাধা দিতে সমর্থ? আমাদের অত্যাচারের প্রতিকারে আমরা অসহায়, আমাদের নিগ্রহ দূর করতে আমরা অপারগ? আজ সমস্ত কুটীরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যতদূর সাধ্য বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন না করলে এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে না।

আমাদের কর্ত্তব্যের কথা বলতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কত অসহায় নারীর নিগ্রহের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। এ আমাদের বড় লজ্জা, বড় বেদনা। কেন আমরা এর প্রতিকারহীন কলঙ্কের কালিমা বয়ে বেড়াই? দুর্ব্বৃত্ত সকল দেশে সকল যুগেই অত্যাচারের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, সবলের স্বেচ্ছাচারিতায় দুর্ব্বল লাঞ্ছনা ভোগ করে কিন্তু বাংলা দেশের নারীরা তাদের অবলা নাম সার্থক করতে যেমন শোচনীয় নিগ্রহ সহ্য করেন, এমনটি আর জগতের কোথাও দেখা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের সংবাদপত্র এ কাহিনীতে ভরপুর। কিন্তু আমাদের সেদিকে কি দৃষ্টি আছে? খোর্দগোবিন্দপুরের ঘটনার পুনরভিনয়ের আশঙ্কা আমাদের নেই? সুতরাং এর আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা 'অবলা উদ্ধার' করতে 'নারীরক্ষা সমিতি' গঠন করেন, তাঁদের গুণ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করে বাঙ্গলা দেশের নারীশক্তিকে এ কথা জানাই যে, এর হীনতার দায় হতে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করুন, নিজেদের আত্মরক্ষার পথ নিজেরাই বের করুন, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এনে পরিবারের আবহাওয়া বদল করে, নারীর দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রসারে দুর্ব্বৃত্ত দলন করুন, যাতে নারীনিগ্রহ আর সমস্যা না হয়ে থাকে। ভুলবেন না যে, নারীনিগ্রহকারীর জাতি নেই, ধর্ম্ম নেই। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, সে নরপশু। তাদের হাত হতে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হলে নিজেদেরই বলসঞ্চয় করতে হবে।

—

শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষের অভিভাষণ

মহিলা কর্ম্মী সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী নির্ম্মলনলিনী ঘোষ তাঁহার সারগর্ভ ও মননশীলতাপরিচায়ক অভিভাষণের গোড়ার দিকে বলেন:

আমাদের সম্মুখে আজ বহু সমস্যা জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সকল সমস্যাকে যদি এড়িয়ে চলি, আমাদের আচরণে ভীরুতা প্রকাশ পাবে। কত যে দুঃখ আমাদের চারিদিকে জমে উঠেছে দিনে দিনে, তার অন্ত নেই। এদেশে এমন মানুষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রয়েছে, যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, মাথা গুঁজবার পর্য্যাপ্ত স্থানটুকু পর্য্যন্ত নেই। জীবন তাদের কাছে দুর্ব্বহ অভিশাপ। মৃত্যু তাদের কাছে অসহনীয় দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রাম আজ ত সাত লক্ষ শ্মশানের সামিল। সেই শ্মশানে অবর্ণনীয় যাতনার মধ্যে যারা জীবন যাপন করে, মানুষের চাইতে কঙ্কালের সঙ্গেই তাদের সাদৃশ্য বেশী।

'কাল কি খাব'—এই দুশ্চিন্তা অগণিত মানুষের মনের উপরে জগদ্দল পাথরের মত অহরহ চেপে আছে। রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভাগা বেকারের দল অবসন্ন দেহ আর বিষণ্ণ চিত্ত নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; খেতে না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ চুরি ক'রে জেলে যাচ্ছে, নয় ত পতিতাদের দলে নাম লেখাচ্ছে।

দুঃখের শেষ এইখানেই নয়। আমাদের জীবনের গতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত। এক সঙ্গে মিলে সভাসমিতি করা বিপজ্জনক—একশ চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে বুনো মহিষের মত শিং উঁচিয়ে। মনের কথা মুখ ফুটে বলতে গেলে আইন চোখ রাঙায়, কলমের আগায় লিখতে গেলে জরিমানা দিতে হয়, বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কারা-প্রাকার শুধু আমাদের দেহকে আটকে রাখবার জন্যে তৈরি হয় নি; আমাদের মনকে বেঁধে রাখবার জন্যে প্রাচীরের অভাব নেই। কর্ত্তারা যতটুকু ইচ্ছা করেন শুধু ততটুকু খোরাক সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের মনের আঙিনায় এসে পৌঁছতে পারে। যা কর্ত্তাদের অভিপ্রেত নয়, তা জানবার কোন অধিকার নেই আমাদের। গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দেখিয়ে পুলিস যখন আমাদের ছেলেমেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর বিনা বিচারে তাদের আটক করে রাখে, নালিশ জানাবার কোন স্থান খুঁজে পাই না। আমাদের অবস্থা ক্রীতদাসের মতই শোচনীয়। আমরা বেঁচে নেই, টিঁকে আছি।

আমাদের পরাধীনতা কেবল রাজনীতির আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের অর্থহীন নিয়ম-কানুনগুলিও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। আজ কোটি কোটি নরনারায়ণ সমাজে অস্পৃশ্য হয়ে আছে। সাধারণের কূপ তারা ছুঁতে পায় না, মন্দিরের দরজা তাদের মুখের উপরে বন্ধ হয়ে যায়, ইস্কুলে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়তে গেলে বর্ণ-হিন্দুরা আপত্তি জানায়।

যে অর্থহীন বিধিনিষেধ অস্পৃশ্যতার আধিপত্যকে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সেই বিধিনিষেধের জন্যই অবরোধ-প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। পর্দার অন্তরালে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাদের যাপন করতে হয় বৈচিত্র্যহীন কাজের মধ্যে—খাওয়ার পরে রাঁধা, আর রাঁধার পরে খাওয়া ছাড়া যাদের অন্য কর্ম্ম নেই, বৃহত্তর জগতের বিশাল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে যাপন করে বন্দিনীর অভিশপ্ত জীবন, তাদের দুর্ভাগ্য সত্যই অপরিসীম।

এই যে জগৎ-জোড়া দুঃখ—যার মূলে রয়েছে মানুষের দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতাপ্রিয়তা আর উৎকট অর্থলোভ—এই দুঃখের অবসান ঘটানো একেবারেই অসম্ভব নয়। মানুষের হৃদয়হীনতা পৃথিবীকে নরক ক'রে তুলেছে। মানুষেরই ভালবাসা তাকে স্বর্গ ক'রে তুলবে। মানুষের ভীরুতার উপরেই অন্যায় দাঁড়িয়ে আছে; মানুষেরই দুর্জ্জয় সাহস তার অবসান ঘটাবে।

কিন্তু কেবল পুরুষকে দিয়ে এই নূতন জগৎ সৃষ্টির কোন আশা নেই।

—

বঙ্গে মহিলাদের কর্ত্তব্য

বঙ্গে পুরুষদের কর্ত্তব্যের যেমন অন্ত নাই, মহিলাদের কর্ত্তব্যেরও তেমনই অন্ত নাই। মহিলারা নানা প্রকারে দেখাইয়াছেন, যে, সাহসের অভাবে যে তাঁহারা কোন কাজ করিতে অসমর্থ এমন অপবাদ তাঁহাদের সকলকে দেওয়া চলে না। এই জন্য আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, বঙ্গনারীগণ সকলেই ভীরু এরূপ ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ তাহা বলিতেছি না, আশা করি মহিলারা তাহা বিশ্বাস করিবেন। আমাদের বক্তব্য, আপাততঃ কিছু কাল মহিলারা রাষ্ট্রনীতিঘটিত কাজ পুরুষদের হাতে রাখিয়া দিন। মহিলারা এখন কিছু কাল বালিকাদের ও নারীদের অজ্ঞতা দূর করিবার এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

বঙ্গের নারীগণকে এরূপ অনুরোধ করিবার কারণ ইহা নহে, যে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বা জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আবশ্যক অন্যান্য সার্ব্বজনিক কার্য্যের ক্ষেত্রে পুরুষেরা একাই এখন যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বা কখনও করিতে পারিবেন। পুরুষেরা একা এখন তাহা করিতেছেন না এবং কখনও করিতে পারিবেন না। নারীদের সাহায্য আবশ্যক হইবে। কিন্তু নারীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা অতি অল্প হইতেছে। মহিলারা নিজে এই কাজে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ না করিলে নারীসমাজের অজ্ঞতা দূর হইবে না, এবং অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তিও বাড়িবে না। তাঁহাদের অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন না।

আমরা ইহা জানি ও বুঝি, যে, কোন দেশেই রাষ্ট্রশক্তি সকল বয়সের সকল পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অকপট সমর্থক না হইলে এবং এরূপ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট রাজস্ব ব্যয় না করিলে, সে দেশে কি পুরুষদের কি স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা যায় না এবং ইহাও সত্য, যে, কোন দেশের গবন্মেণ্ট স্বজাতীয় না হইলে এবং সেই দেশের অধিবাসীরা স্বশাসক না হইলে, সেখানে রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষা-বিস্তারে উল্লিখিত ভাবে আনুকূল্য করে না। কিন্তু আমাদের দেশে কবে জাতীয় গবন্মেণ্ট স্থাপিত হইবে, কবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না। আমাদের নিজের চেষ্টায় যতটা হয়, ততটা আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কি পুরুষ-সমাজে কি নারীসমাজে, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা স্বরাজলাভের চেষ্টা যেরূপে যতটা সাফল্যলাভের সম্ভাবনার সহিত হইতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

এরূপ বলিবার অর্থ ইহা নহে, যে, সকলে আগে মহাবিদ্বান হউন, তার পর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী হইবেন। ইহা আমরা জানি, যে, নিরক্ষর বা পুস্তকগত বিদ্যায় অতি অল্প অধিকারী কোন কোন লোকও রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু এসব ব্যতিক্রমস্থল ছাড়িয়া দিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, অন্ততঃ সাধারণ লিখনপঠনের ক্ষমতা এবং ভূগোল, ইতিহাস ও হিসাবের সাধারণ জ্ঞান সকলের থাকিলে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে চেষ্টার সাফল্য অধিক হইবার সম্ভাবনা।

রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্যই জ্ঞানের আবশ্যক এমন নয়। জীবনের সকল রকম কাজের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন—গৃহস্থালীর কাজের জন্যও দরকার।

শিক্ষিতা মহিলারা বিশেষ করিয়া নারীশিক্ষার বিস্তারে মনোযোগী হইলে, আরও এই একটি সুবিধা হয়,

যে, প্রত্যেক অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিতে পারেন ; পুরুষেরা তাহা পারেন না।

—

জাপানে শিক্ষার অবস্থা

জাপানের পরদেশলোলুপতা কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সমর্থন করেন না। কিন্তু তাহা হইলেও জাপানের পরাক্রমে সকলে বিস্মিত। পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও জাপানের কৃতিত্ব সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। জাপানের পরাক্রমের ও শিল্পবাণিজ্যে কৃতিত্বের একটি প্রধান কারণ তথাকার শিক্ষাপ্রণালী ও সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। নিতান্ত শিশু ও হাবা ভিন্ন জাপানে সবাই লিখিতে পড়িতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা-লাভ করিবার বয়সের যত বালকবালিকা জাপানে আছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন, অর্থাৎ হাজারকরা ৯৯৫ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে। আর ভারতবর্ষে ? বঙ্গে ?

৬৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা (কম্পাল্‌সারি প্রাইমারী এডুকেশ্যন) প্রবর্ত্তিত হয়।

বাংলা দেশে কোম্পানীর রাজত্বের গোড়ার দিকে, যখন গবন্মে´ণ্ট শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করেন নাই সেই সময়ে সাধারণ লেখাপড়ার জ্ঞান এখনকার চেয়ে শতকরা অধিক লোকের ছিল। মোটামুটি এক শত বৎসর আগেকার এডাম সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট হইতে ইহা জানা যায়।

গবর্ন্মেণ্ট শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইবার আগে যদি দেশের লোকে সাধারণ লিখনপঠনক্ষমত্বের বিস্তার এখনকার চেয়ে বেশী করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন কেন শিক্ষার বিস্তার করিতে পারিবেন না ?

—

নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসম্মেলন

গত ২৬শে আশ্বিন কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। কলিকাতার ও মফস্বলের প্রায় ছয় শত ছাত্রপ্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

ইহার অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রী শ্রীমতী অনিলা দাসগুপ্তা তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন,

> ছাত্রছাত্রীগণের কার্য্যাবলীর রাজনৈতিক দিকটা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। চারিদিকে অর্ডিন্যান্স, সাক্ষ্য-আইন, নিষেধাত্মক আদেশ প্রভৃতির ছড়াছড়ি। পরিশেষে জনরক্ষা আইনের আকস্মিক আবির্ভাব আমাদিগকে মুহ্যমান করিয়াছে। অনেকে বলেন, রাজনীতি আলোচনা ছাত্রবৃন্দের উচিত নহে ; কিন্তু যেখানে ছাত্রছাত্রীবৃন্দের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও রোধ করিবার জন্য এত বিধিনিষেধের ছড়াছড়ি সেখানে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি বর্জ্জন করা সম্ভব নহে। ছাত্রছাত্রীদের ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে ; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের রাজনীতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন ও অধিকার আছে। ছাত্রছাত্রীগণকে রাজনীতি আলোচনা করিতেই হইবে এবং যাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে হইবে

ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির আলোচনা করা অবশ্যই উচিত।

> জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ভার ছাত্রসমাজের গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

এখন যাঁহারা স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ভার, তাঁহারা প্রস্তুত হইবার পর, গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাঁহারা প্রস্তুত হইবার পর, তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি। প্রাপ্তবয়স্ক যে-সকল লোক ছাত্র নহেন, তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যে-ভাবে ব্যাপৃত হন এবং তাহাতে যতটা সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন, ছাত্রছাত্রীদের সেই ভাবে উহাতে ব্যাপৃত হওয়ার ও তাহাতে ততটা সময় ও শক্তি নিয়োগ করার আমরা সমর্থন করি না।

অনন্যকর্ম্মা রাজনৈতিক কর্ম্মী কতকগুলি সব দেশেই থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে তাহা অধিকতর আবশ্যক। ছাত্রছাত্রীরা পঠদ্দশায় অবশ্য এইরূপ অনন্যকর্ম্মা রাজনৈতিক কর্ম্মী হইতে পারেন না ; কারণ তখন জ্ঞানার্জ্জন ও চরিত্রগঠন তাঁহাদের প্রধান কাজ। রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা রাজনৈতিক কর্ম্মী নহেন, ছাত্রছাত্রীরা তাঁহাদের মত কতক সময় রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ও কাজে দিতে পারেন। এই সব কর্ম্মীদের মধ্যে বণিক ব্যারিষ্টার উকিল ডাক্তার কৃষিজীবী পণ্যশিল্পী শ্রমিক প্রভৃতি যেমন নিজের নিজের বৃত্তির কাজ করেন এবং তাহার উপর রাজনৈতিক কাজও করেন, ছাত্রছাত্রীরাও সেইরূপ নিজেদের

জ্ঞানার্জ্জনের কাজ সম্পূর্ণরূপে করিয়া অবশিষ্ট সময় ও শক্তি রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় এবং রাজনৈতিক কাজে দিতে পারেন—শুধু দিতে পারেন না, দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। না দিলে ছাত্রাবস্থার পরে তাঁহারা ভবিষ্যতে পৌরজানপদ সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য (সমুদয় সিভিক ও পলিটিকাল কর্ত্তব্য) সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়া না-থাকায় তাহা করিতে পারিবেন না।

শ্রীমতী অনিলা দাসগুপ্তা তাঁহার অভিভাষণে বলেন, যে, সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যেক প্রগতিকামী ছাত্রছাত্রীর একান্ত পরিত্যজ্য। ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের গোঁড়ামিপ্রসূত ঝগড়াবিবাদ হিংসাদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণ ছাত্রছাত্রীদের এবং তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরও বর্জ্জনীয়। আর এক রকমের দলাদলিও ছাত্রছাত্রীদের বর্জ্জনীয়। তাহা রাজনৈতিক দলাদলি। ইহার মানে এ নয়, যে, তাহাদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত থাকিবে না। তাহা থাকা অনিবার্য্য। কিন্তু তাহাদের বয়সে মনটা প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের চেয়েও বেশী মুক্ত প্রশস্ত ও উদার থাকা আবশ্যক। নতুবা তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে সত্যের উপলব্ধি ও অনুভব করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের সব মতই ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত, উহার প্রত্যেক নেতার সব মত ও কাজই ভাল বা মন্দ, কিংবা উদারনৈতিক দলের ও তাহার প্রত্যেক নেতার সব মত ও কাজ ভাল বা মন্দ— ছাত্রছাত্রীদের মনের ভাব এরূপ হওয়া উচিত নহে।

ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে যাঁহারা অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের পক্ষসমর্থক অবৈতনিক ও বেতনভোগী কর্ম্মীদের মনের ভাব বিশেষ করিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে। এইজন্য নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বঘটিত কাজে ছাত্রছাত্রীদিগকে নিযুক্ত করা ও তাঁহাদের তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত।

—

ছাত্রসম্মেলনে শরৎচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসম্মেলনে সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন,

দারিদ্র্য নিরক্ষরতা প্রভৃতি চিরন্তন সমস্যার তিনি আলোচনা করিতে চাহেন না। কারণ, জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সব সমস্যার সমাধান হইবে না।

প্রত্যেক বৃহৎ সভায় প্রত্যেক নেতার অভিভাষণে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার আলোচনা একান্ত আবশ্যক নহে। কিন্তু জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে দারিদ্র্য সমস্যার ও নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহা তাঁহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার যথেষ্ট কারণ মনে করি না। জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এগুলির সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না, ইহা সত্য। কিন্তু কিছু সমাধান ত হইতে পারে? জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধায় ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে কালযাপন করিবে, এবং ক্ষুধিত ও নিরক্ষর অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। মানবিক শক্তিতে যতটা সম্ভব আমরা দেশের ততটা ভাগ্যনিয়ন্তা হইবার আগেও দেশের কিছু দারিদ্র্য দূর নিশ্চয়ই করিতে পারি। তাহা সত্য না হইলে, বর্ত্তমান স্বদেশী প্রচেষ্টাটা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে করিতে হয়, নানাবিধ কারখানা ও কুটীরশিল্পের বর্ত্তমান আয়োজনেরও কোন সার্থকতা থাকে না; কারণ দেশে এখনও জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

দেশে জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা আমরাও একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। যতটা মনে পড়ে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার আগে হইতে এই লেখক তাহা আবশ্যক মনে করিত। কিন্তু আমরা ইহাও মনে করি, যে, মানবজীবনের অন্য সব দিকে প্রগতির জন্য যেমন নিরক্ষরতা দূর করা আবশ্যক, দেশে জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত প্রচেষ্টার জন্যও তেমনই উহা আবশ্যক।

এবং নিরক্ষরতাদূরীকরণ-কার্য্যে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাহাদের অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণপরিচয় হইয়াছে, এরূপ অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা পর্য্যন্ত নিরক্ষরতাদূরীকরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। তাহারা তাহা করিলে যে সুফল লব্ধ হয়, তাহা আমরা সাক্ষাৎভাবে অবগত আছি। তবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, রাজনীতির আলোচনায় ও রাজনৈতিক কাজে যে উত্তেজনা-উন্মাদনা আছে, নিরক্ষতাদূরীকরণের কাজে তাহা নাই। কিন্তু তথাপি ইহা একান্ত আবশ্যক কাজ। মানুষ যেমন কেবল চাটনী খাইয়া সুস্থ সবল হইতে ও থাকিতে পারে না, তেমনি কেবল উত্তেজনা-উন্মাদনার

খোরাকে সুস্থসবল জাতি গঠিত হইতে পারে না। রাজনৈতিক আলোচনা ও কাজ কেবল উত্তেজনা-উন্মাদনাময়, কিংবা উহা বিন্দুমাত্রও অনাবশ্যক, এরূপ বলা বা ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। জাতীয় গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেও যে নিরক্ষরতাদূরীকরণচেষ্টা একান্ত আবশ্যক, আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন,

যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা আশু দেশের সম্মুখে উপস্থিত, সেইগুলি সর্ব্ব-ভারতীয় হইলেও, বাংলার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী গবর্মেণ্ট এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, কারণ উহার চেষ্টায় কোন সত্য সহানুভূতি নাই। কিন্তু উহাতে হতাশ হইবার কিছুই নাই। কারণ বাংলার জাতীয়তায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে; এবং এই বিশ্বাস বাংলার যুবশক্তির উপর তাঁহার যে বিশ্বাস তাহা হইতেই উদ্ভূত। বস্তুত দীর্ঘনিশ্বাস ও অনুতাপের দ্বারা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধি উপশম করা যাইবে না। একমাত্র দেশের যুবকরাই এই সব সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ। যুবকদেরই কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে, মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে, সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া দেশকে পরিচালিত করিতে হইবে।

আমরা আজ রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করিতে চলিয়াছি। কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে; কংগ্রেস বর্ত্তমানে আমাদের কার্য্যকলাপে এক শুভ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা বাংলার যুবকদেরই কাজ। কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কি কি আয়ুধে সন্নদ্ধ হইতে হইবে, বাংলার যুবককুল তাহাও অবগত আছে। আপনারা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন। অহিংস সৈনিকের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদীর ব্যাটন, বুলেট ও সঙ্গীনের সম্মুখীন হইতে হইলে যে সমস্ত মানসিক ও নৈতিক গুণ প্রয়োজন, সেই সমস্ত গুণ আপনারা অনুশীলন করুন। অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের প্রয়োজনের তাড়া ও ভবিষ্যতের আশা আপনাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিবে।

বসু মহাশয় যে ছাত্রছাত্রীদিগকে অহিংস সংগ্রামের সৈনিক হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন, তাহার জন্য আবশ্যক সমস্ত মানসিক ও নৈতিক গুণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন, এই উপদেশ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

ইহা সন্তোষের বিষয় যে বঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা জানেন বুঝেন, যে, তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহাদের সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবের চতুর্থ অংশে বলা হইয়াছে, যে, একটি নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসমিতি গঠন করিতে হইবে যাহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রদিগকে পৌরজানপদ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা ("to prepare the students for citizenship")।

বসু মহাশয় বলিয়াছেন, "একমাত্র দেশের যুবকেরাই এই সব সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ," "কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা বাংলার যুবকদেরই কাজ।" যাহারা এই সব সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ, কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করা যাহাদের কর্ত্তব্য, যুবকেরা তাহাদের অন্তর্গত নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু যত দায় যুবকদেরই এবং একমাত্র যুবকেরাই সব কিছু করিতে সমর্থ, ইহা আমরা মনে করি না। প্রৌঢ়দের ও বৃদ্ধদেরও কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে, এবং কিছু কাজ করিবার, পরামর্শ দিবার ও পরিচালনার ভার লইবার শক্তিও তাহাদের আছে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যুবত্ব সম্পূর্ণরূপে বয়সের উপর নির্ভর করে না। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ যুবক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার চিরতারুণ্যশালী উদ্যমশীল বৃদ্ধও দুই-চারি জন থাকিতে পারে।

বসু মহাশয় সম্ভবতঃ যুবত্ব ও ছাত্রত্ব সম্পূর্ণ সমার্থক রূপে প্রয়োগ করেন নাই। কারণ, তিনি যুবকদিগকে যে ভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন, ছাত্রাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদিগকে সে ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে তাহারা নামে মাত্র ছাত্রছাত্রী থাকে। প্রস্তুতির প্রয়োজন তাঁহার অভিভাষণে ও সম্মেলনের একটি অভিভাষণে স্বীকৃত হইয়াছে।

শান্তির সময়ে অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন অস্বীকৃত হইবে না। বিপ্লবে ও সশস্ত্র সংগ্রামেও যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাহা চীনে ও স্পেনে প্রমাণিত হইতেছে।

চীনের যুবকেরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অতি-মানব সাহস, দুঃখসহিষ্ণুতা ও পৌরুষের সহিত জাপানের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। এই সব গুণে তাহারা জাপানীদের চেয়ে বিন্দুমাত্রও নিকৃষ্ট নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জাপানী সৈন্যদের মত তাহাদের যুদ্ধশিক্ষা না-থাকায়, এবং চীনের যুদ্ধায়োজন জাপানের সমান না-হওয়ায় চীনকে পরাস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু হারিয়া হারিয়া চীন যুদ্ধ শিখিতেছে, যুদ্ধের আয়োজনও করিতেছে। অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা না ঘটিতে পারে।

স্পেনে এখন যাহারা বিদ্রোহী তাহারা সরকারী সুশিক্ষিত সেনানায়ক ও সুশিক্ষিত সাধারণ সৈনিক ছিল। এখন যাহারা স্পেনের গবর্মেণ্টের সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক, তাহারা

যুদ্ধবিদ্যায় তেমন শিক্ষা পায় নাই। বিদ্রোহীদের জয়ী হইয়া চলিবার ইহা একটি কারণ। অন্য কারণ, তাহারা ইটালী, জার্মেণী ও পোর্টুগ্যালের সাহায্য পাইতেছে।

বিনাবিচারে বন্দী করা সম্বন্ধে শরৎবাবু বলেন,

দেশের বহু যুবক-যুবতী আজ বিনা বিচারে আটক, এইরূপ অবস্থায় দেশবাসী কি করিয়া পীড়নমূলক আইনগুলির কথা ভুলিয়া যাইতে পারে? এই সমস্ত আইন,—এই সমস্ত বেআইনী আইন,—শুধু দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেশবাসীকে এই সব আইনের প্রতিরোধ করিতে হইবে; তত দিনই এই প্রতিরোধ-কার্য্য চালাইতে হইবে, যত দিন না দেশের লোক যে আচরণকে অপরাধজনক বলিয়া মনে না করেন, গবর্ন্মেণ্টও তাহাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবেন না।

ইহা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বলা বাহুল্য আমরা তাহার সমর্থন করি। অনেক আগে হইতে আমরা ঐরূপ কথা বলিয়া আসিতেছি।

বেকার-সমস্যার সম্বন্ধে তিনি বলেন,

এই সমস্যা শিক্ষিতদের মধ্যে যেরূপ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে অশিক্ষিতদের মধ্যেও সেইরূপ। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট এই সমস্যা সমাধানের জন্য আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন? শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, ভারতগবর্ন্মেণ্ট বেকারদের জন্য আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। সম্প্রতি বাংলা গবর্ন্মেণ্ট ৫৮ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। এই সমস্ত লোক অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মালের কণ্ট্রাক্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা তদ্দরুণ অগ্রিম মূল্যও পাইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়—এই সমস্ত ফ্যাক্টরী দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের কত সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু বাংলা গবর্ন্মেণ্ট এতদিন শুধু উদাসীনতায় ও অবহেলায় কাটাইয়াছেন। শ্রীযুত বসু বলেন যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর দুঃখকষ্টই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতালাভ না-হওয়া পর্য্যন্ত দেশের আর্থিক উন্নতি করা সম্ভব নয় —ম্যাজিনির এই বাণী যেন যুব-সম্প্রদায় স্মরণ রাখে।

এই বাণীর সত্যতা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরস্পরসাপেক্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ কোন মননশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টা যাঁহারা চালাইবেন, তাঁহাদিগকেও কার্য্যক্ষম থাকিবার মত গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে হইবে। বেকার অবস্থায় অবসাদ আসে, কেহ কেহ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। (যদিও তাহা করা কাহারও উচিত নয়)। অতএব স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা চালাইতে হইবে, এবং কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টাও করিতে হইবে।

—

রাজবন্দীর আত্মহত্যা

এক মাসের মধ্যে নবজীবন ঘোষ ও সন্তোষ গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করিলেন। দেওলীতে এবং বিনা বিচারে বন্দী আটক রাখিবার অন্য শিবিরে আগে আরও আত্মহত্যা হইয়াছে। ঠিক কি কি কারণে বন্দীরা আত্মহত্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। কিন্তু এই অনুমান সত্য মনে করা যাইতে পারে, যে, বন্দীদের কারাজীবন কখন শেষ হইবে, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয় না-থাকায় নৈরাশ্য তাঁহাদিগকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছে, এবং এই নৈরাশ্য একটি কারণ।

গবর্ন্মেণ্ট বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের হাতে এই সব বন্দীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। তাঁহাদের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিনা বিচারে বন্দীদিগকে দোষী মনে করিতে পারি না। কিন্তু যদি তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

এই সকল বন্দী যাহা করিয়াছে বলা হয়, সেইরূপ কাজের জন্য অন্য অনেক লোকের আদালতে প্রকাশ্য বিচার ও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। যাহারা বিনাবিচারে বন্দী তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ আছে তাহা অপেক্ষা, যাহারা বিচারান্তে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নিশ্চয়ই বলবত্তর। কারণ, যাহাদের বিরুদ্ধে বলবত্তর প্রমাণ আছে, পুলিস তাহাদিগকে আদালতে বিচারার্থ আনে, যাহাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রবল প্রমাণ নাই কিংবা সন্দেহ ব্যতীত কোন প্রমাণই নাই, তাহাদিগকে বিনাবিচারে বন্দী করা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অপরাধের প্রবল প্রমাণ যাহাদের বিরুদ্ধে আছে তাহাদের শাস্তি হইতেছে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাস, কিন্তু যাহাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ নাই তাহাদের শাস্তি হইতেছে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাস; অর্থাৎ গুরুতর অপরাধে লঘুতর দণ্ড, এবং লঘুতর অপরাধে গুরুতর দণ্ড। ইহা কি ন্যায়সঙ্গত?

সরকারপক্ষের লোকেরা বলিতে পারেন, বিনাবিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা আবার রাজদ্রোহ বা রাজদ্রোহের চক্রান্ত করিবে; সেই জন্য

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু যাহারা বিচারান্তে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট কাল কারাবাসের পর খালাস পাইবার পরে যে আবার বেআইনী কিছু করিবে না তাহার কি গ্যারাণ্টি আছে? বলা যাইতে পারে, তাহারা জেলে কষ্ট পাইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আর আইন ভঙ্গ করিবে না। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দীরাও ত আটক থাকা কালে বহু দুঃখ ভোগ করে; তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে সেই সব দুঃখের স্মৃতি তাহাদিগকে আইন ভঙ্গ হইতে কেন নিবৃত্ত রাখিবে না? এবং যে-কেহ আইন ভঙ্গ করিবে, তাহাকে দণ্ড দিবার পথ ত খোলাই আছে।

অতএব বিনাবিচারে যাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া খুবই উচিত।

উচ্চতর ও উচ্চতম সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেকে বলিয়া থাকেন, কে বলে কাহাকেও বিনা বিচারে বন্দী করা হইয়াছে? এক এক জন জজ বা দুজন জজ একত্র অনেক বন্দীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখিয়াছেন, তাহারা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদিগকে আটক করা হইয়াছে। এখানে দুটি প্রশ্ন উঠে। আদালতে প্রকাশ্য বিচার হইলে উভয় পক্ষের উকীল-ব্যারিষ্টারদের দ্বারা সাক্ষ্য ও প্রমাণ সব পরীক্ষিত হয়। এইরূপ সাহায্য পান বলিয়া জজেরা ঠিক বিচার করিতে পারেন। তাহাতেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম হয়। সুতরাং এক জন বা দুজন জজ উকীল-ব্যারিষ্টারদের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণগুলা দেখিলেই তাহাতে সুবিচার হইতে পারে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে, বিনাবিচারে বন্দী প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে নথী এইরূপে জজদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে বা হয় কি? কোন কোন অত্যুচ্চ রাজপুরুষ বলিয়াছেন, আমি যদৃচ্ছাক্রমে কোন কোন নথী দেখিয়াছি, এবং তাহাতে বন্দীদের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। হাজার লোকের মধ্যে কয়েক জনের নাড়ী টিপিয়া জ্বরের লক্ষণ যদিই বা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাকী সকলের বা অধিকাংশের জ্বর হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি?

—

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এক সময় এলাহাবাদের গবর্ন্মেণ্ট কলেজ মিওর সেণ্ট্রাল কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তাহার পর তিনি স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। গবর্ন্মেণ্টের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কিছুকাল কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। গত ২১শে আশ্বিন ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক জন বিখ্যাত থিয়সফিষ্ট ছিলেন, মিসেস এনী বেসাণ্টের সহযোগিতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যদি তিনি নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা আত্মচরিত লিখিয়া গিয়া থাকেন এবং যদি তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহা বহুতথ্যপূর্ণ ও পাঠযোগ্য হইবে। তিনি বিদ্বান ও মিষ্টালাপী ছিলেন।

—

ছাত্রসমাজ ও স্বাজাতিক প্রচেষ্টা

য়ুনাইটেড প্রেস নিম্নমুদ্রিত সংবাদ দিয়াছেন।

চিত্তুর, ৭ই নবেম্বর।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত জি এস এন আচার্য্য মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, স্বাজাতিক প্রচেষ্টায় ছাত্রেরা কি ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারে? তাহার উত্তরে মহাত্মাজী লিখিয়াছেন:—

"পাঠে কোন ব্যাঘাত না জন্মাইয়া ছাত্রেরা দরিদ্রনারায়ণের জন্য ও তাহাদের নামে দিনে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া অনায়াসেই সুতা কাটিতে পারে এবং এই ভাবে যত নগণ্যই হউক না কেন, দেশের সম্পদ কিছু বাড়াইতে পারে, এবং এতদ্ব্যতীত, যাহাদের শিক্ষার সহিত কোন পরিচয় নাই এবং সারা বৎসরে যাহারা জানে না যে পেট ভরিয়া খাওয়া কাহাকে বলে, সেই লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সহিত ছাত্রেরা জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে।"

দরিদ্র জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করা এবং তাহাদের দারিদ্র্য দূর করা, ছাত্রদের জন্য মহাত্মাজী এই দুটি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং এই কর্ত্তব্য পালন তাহারা তাহাদের জ্ঞানলাভ চেষ্টার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া করিবে, মহাত্মাজীর অভিপ্রায় এইরূপ, ইহা বুঝা যাইতেছে।

—

আণ্ডামানে রাজনৈতিক বন্দী

গবর্ণর-জেনার‍্যালের শাসনপরিষদের অন্যতম সভ্য সর্ হেনরী ক্রেকের মতে আণ্ডামান দ্বীপ রাজনৈতিক কয়েদীদের স্বর্গ। "স্বর্গলাভ" তাহাদের সেখান হইতে কাহারও কাহারও হইতেছে বটে, কিন্তু দ্বীপটা যে তাহাদের পক্ষে ভূস্বর্গ নহে, তাহা ভারত-গবর্ন্মেণ্টের মনোনীত দুজন দর্শকের কথায়

প্রমাণিত হইতেছে। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট দুই বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও দুই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থাপক সভার দুজন সদস্যকে আণ্ডামান দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। সর্ মোহম্মদ য়ামিন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য তথাকার বাসগৃহ ও অন্যবিধ ব্যবস্থার ভাল দিকটা যথাসম্ভব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হয়, যে, আণ্ডামানের রাজনৈতিক জেল ভূস্বর্গ নহে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাহারা সবাই দেশে ফিরিয়া আসিতে চায়। অবশ্য সব জায়গার রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব বন্দীই মুক্তি চায়। কিন্তু আণ্ডামানের রাজনৈতিক বন্দীরা যে দেশে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহা খালাস পাইয়া দেশে আসার কথা নহে। তাহারা বন্দী অবস্থাটা দেশেই কাটাইতে চায়, আণ্ডামানে নহে। সেখানে তাহারা স্বর্গসুখ পাইলে, দেশের জেলের নরকভোগ কেন করিতে চাহিবে?

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করার জন্য যাহারা দণ্ডিত হইয়া আণ্ডামানে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদের চালচলন কথাবার্ত্তায় সর্ মোহম্মদ য়ামিনের চমক লাগিয়াছে। তাঁহার মতে,

"They were well-dignified, well-mannered, well-disciplined and talked only on points. They put forward only one demand; that was repatriation."

তাৎপর্য্য। তাহারা আত্মসংভ্রমশালী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত। তাহারা কেবল প্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছিল। তাহারা কেবল একটি দাবী উপস্থিত করিয়াছিল; তাহা দেশে পুনঃপ্রেরিত হওয়া।

রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও অন্যান্য অভাব-অভিযোগ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। দৈহিক খাদ্যের অবস্থার চেয়ে মানসিক খাদ্যের একান্ত অযথেষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় দর্শক রায়জাদা হংসরাজ মহাশয়ের কয়েকটি বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করিব।

"The health of the political prisoners compared unfavorably with that of ordinary convicts. Out of 316 politicals, 75 have lost five pounds in weight. They suffer from influenza, cold and bronchitis ..... There is also scarcity of water."

"Among the 316 political prisoners in the Andamans, there were only five interviews with relatives during the last five years. Practically there are no interviews, no change in the environment, no new faces, no exercises, no recreation. In fact the prisoners appear more to be buried alive in the little jail compound."

তাৎপর্য্য। অন্য বন্দীদের সঙ্গে তুলনায় রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্য খারাপ। ৩১৬ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ৭৫ জনের প্রত্যেকের আড়াই সের ওজন কমিয়াছে। তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দ্দি ও ব্রঙ্কাইটিসে ভোগে। ... জলের দুষ্প্রাপ্যতাও আছে।

৩১৬ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সহিত কেবল ৫টি সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কার্য্যতঃ, কোন সাক্ষাৎকার নাই, পরিবেষ্টনে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কোন নূতন মুখ তথায় দৃষ্ট হয় না, কোন ব্যায়াম নাই, অবসর-বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ, বন্দীরা জেলের ছোট হাতার মধ্যে জীয়ন্তে সমাধিপ্রোথিত বলিয়াই মনে হয়।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য

কার্সিয়ঙে অবরুদ্ধ অবস্থায় সুভাষবাবুর স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে। মুক্ত অবস্থায় তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা চিকিৎসার যেরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন, সম্ভবতঃ তাহা হইতেছে না। যেরূপ ব্যবস্থা হইলেও, আরোগ্যলাভের যে একটি প্রধান উপায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, তাহা অবরুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া না-দিলে তাঁহার পক্ষে স্বাস্থ্যলাভ দুর্ঘট।

—

সুভাষবাবুকে কংগ্রেস-সভাপতি করিবার প্রস্তাব

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত খারে প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হউক। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া না-দিলে তিনি সভাপতির কাজ করিতে পারিবেন না বটে; তথাপি তাঁহার নির্ব্বাচন দ্বারা বুঝা যাইবে, দেশের লোক তাঁহাকে কিরূপ বিশ্বাস করে ও সম্মানার্হ মনে করে। তিনি এইরূপ সম্মানের উপযুক্ত। এই সম্মান অনেক আগেই তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল।

—

ভারতমাতা-মন্দির উদ্ঘাটন

কাশীতে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্তের উৎসাহ, উদ্যোগ ও ব্যয়ে ভারতমাতা-মন্দির উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহা নূতন রকমের প্রতিষ্ঠান। ইহাতে ভারতবর্ষকে জননীরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার কোন মূর্ত্তি বা চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,

হইয়াছে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতিষ্ঠা। এই মানচিত্র মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত, সমতলভূমিতে রক্ষিত। ইহা হইতে অন্য মানচিত্রের মত ভারতবর্ষের আকৃতি বুঝা যায়, এবং পাহাড়পর্ব্বত নদনদী প্রভৃতি কোথায় কোথায় আছে তাহা জানা যায়। অধিকন্তু ইহা উচ্চাবচত্বজ্ঞাপক; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বত, পর্ব্বতশৃঙ্গ, অধিত্যক, উপত্যকা, সমতলভূমি, নদীগর্ভ, প্রভৃতির আপেক্ষিক উচ্চতা ও নিম্নতা ইহা হইতে জানা যায়। ইহা নির্ম্মাণ করাইতে গুপ্ত মহাশয় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন, এবং যে অট্টালিকাটির মধ্যে ইহা রাখা হইয়াছে, তাহার নির্ম্মাণের ব্যয় সমেত তাঁহার এক লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।
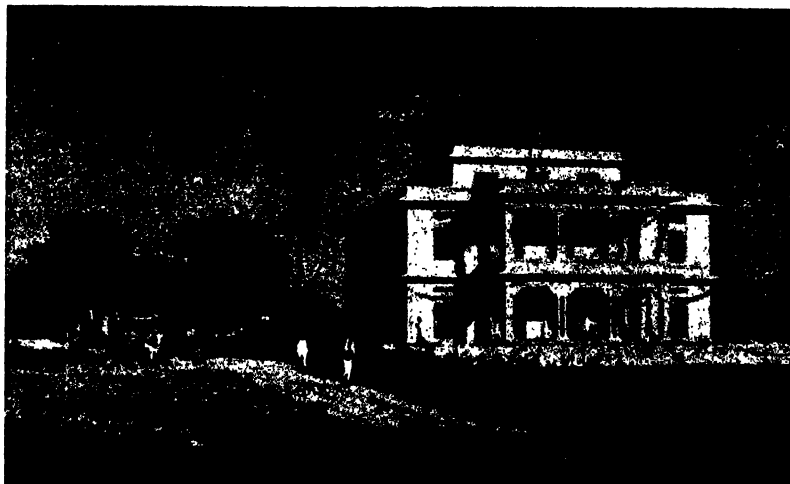
ভারতমাতা মন্দির

ভারতবর্ষের মর্ম্মর মানচিত্র

মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ও উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধী পৌরোহিত্য করেন। অন্যান্য বহু কংগ্রেস-নেতা ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু, পারসী, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের নিজ নিজ শাস্ত্র হইতে বচন আবৃত্তি করেন। এখানে সকল ধর্ম্মেরই লোক আসিতে এবং নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুসারে ভগবদুপাসনা ও প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের এই মর্ম্মর মানচিত্র এই দেশের বিশালতা, প্রাচীনতা, ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য দর্শকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে। নানা স্থানের সহিত তৎসমুদয়ের ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত। সেই সকল পূর্ব্বকথা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মানচিত্রটি দেখিলে মনে পড়িবে।

লাহোরে হরিজন কন্‌ফারেন্স

লাহোরে নিখিলভারত হরিজন কনফারেন্স স্থির করিয়াছেন, যে, হরিজনরা হিন্দুই থাকিবেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিবার নিমিত্ত যে দেশব্যাপী চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা প্রীত; কিন্তু হিন্দু সমাজসংস্কারের মন্থর গতিতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট। এই

মহাত্মা গান্ধী মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন

অসন্তোষ ভিত্তিহীন নহে। জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার দাসত্ব হইতে আপনাদিগকে যথাসম্ভব মুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা হিন্দুদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহাদের স্বদেশবাসীদের পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারেন।

—

স্পেনে যুদ্ধের অবস্থা

স্পেনে বিদ্রোহীরা রাজধানী মাদ্রিদে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য অনেক শহর ও প্রদেশ এখনও তথাকার গবর্ন্মেণ্টের হাতে আছে। যুদ্ধের অবসান এখনও হয় নাই, হইবে না।

বর্ত্তমানে স্পেনের বিদ্রোহীরা পোর্টুগ্যাল, জার্মেণী ও ইটালীর সাহায্য পাইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি তাহারা জয়ী হয়, তাহা হইলে ইউরোপে ইটালী, জার্মেণী, স্পেন ও পোর্টুগ্যাল এই চারিটি প্রদেশ ফাসিষ্ট হইবে। রাশিয়া আছে বৃহৎ সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক দলের অন্তর্গত

শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত
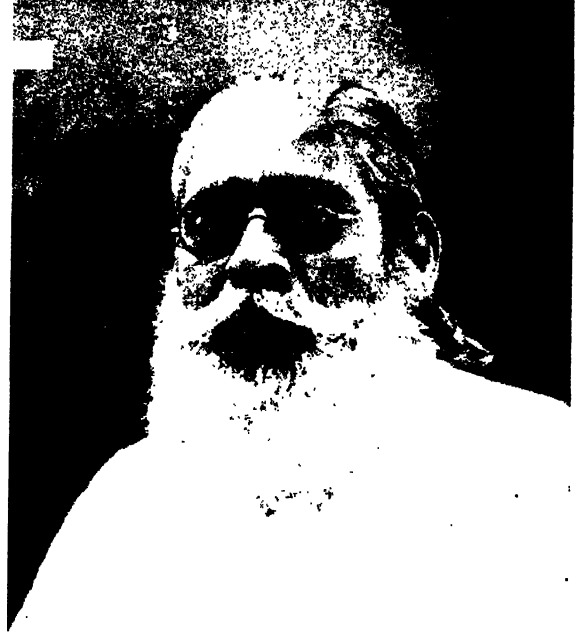
কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দল। ফ্রান্স কতকটা সমাজতান্ত্রিক। ব্রিটেন ঠিক কোন দলের নহে। এখানে ফাসিষ্ট আছে, সোশ্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টও আছে; কিন্তু সকলের চেয়ে বড় দল এখন টোরিদের—যারা এখন তথাকার গবর্ন্মেণ্ট নামধেয়।

ইউরোপে একটা খুব বড় যুদ্ধ আসন্ন মনে হইতেছে, তাহাতে ব্রিটেন কোন্ দলে যাইবেন, সে বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান নানা জনে করিতেছেন।

—

চলন্ত চিত্রপ্রদর্শনী

লক্ষ্ণৌ কলাবিদ্যালয়ে (লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে) শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তথাকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রাঙ্কণনৈপুণ্য প্রবাসীর পাঠকগণ অবগত আছেন। তাঁহার কয়েকটি চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি ভারতীয় চিত্রকলার সহিত ভারতবর্ষের নানা নগরের লোকদিগের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করিবার নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ কলাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের অঙ্কিত মোট তেষট্টিখানি ছবির

চলন্ত প্রদর্শনীর একখানি চিত্র

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

চলন্ত প্রদর্শনীর অপর একখানি চিত্র

চলন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। এলাহাবাদ, নাগপুর ও বোম্বাইয়ে ছবিগুলি দেখান হইয়াছে; হায়দরাবাদেও এই চিত্রপ্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। যেখানে যেখানে ছবিগুলি দেখান হইয়াছে, তথায় অনেক ছবি সংবাদপত্রের ও দর্শকদের প্রশংসা পাইয়াছে। রামেশ্বরবাবুর সংগ্রহে অসিতকুমার হালদার, বীরেশ্বর সেন, ললিতমোহন সেন, বি এন জিজ্জা, প্রণয়রঞ্জন রায়, এইচ এল মেঢ়, কিরণময় ধর, এস সি ঢোল, রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এস সেনরায়, বি দয়াল, বি পি মিট্টল, সুখবীর সিং, তারাদাস সিংহ, এস এন নৌটিয়াল, আর সি দুবে, জাফর হুসেন, ভবানীচরণ গুই, পি এন ভার্গব, পি বাঁড়ুজ্যে, ঈশ্বর দাস, ভি বি নাগর এবং এস আর বৈশের আঁকা ছবি আছে। কয়েকটির ক্ষুদ্র প্রতিলিপি আমরা দিতেছি।

—

আজমীরে নিখিল-ভারত সংগীত কন্‌ফারেন্স

গত অক্টোবর মাসে আজমীরে নিখিল-ভারত সংগীত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ সংগীতবিশারদ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বাংলা দেশ হইতে সঙ্গীত সম্মিলনীর [illegible]

সঙ্গীত সম্মিলনী ঐকতানবাদক দল

সম্মুখ হইতে প্রথম সারি : অমিয় ভট্টাচার্য্য, সুধীর চক্রবর্ত্তী, ধ্রুব চক্রবর্ত্তী। দ্বিতীয় সারি : কণিকা মিত্র, মাধবী দাস, অরুন্ধতী সেন। তৃতীয় সারি : আরতি দাস, রেণুকা মোদক। চতুর্থ সারি : গীতশ্রী গীতা দাস, গীতশ্রী ঈভা গুহ। পঞ্চম সারি : অন্নপূর্ণা সেন, মন্দিরা গুপ্ত, বেলা দাস। ষষ্ঠ সারি : অসীম দাস, অরুণা সেন, অণিমা বসু, বুলবুল রায়। শেষ সারি : বি এম গণ, মিহির ভট্টাচার্য্য, রাখাল মজুমদার।

প্রমদা চৌধুরীর নেত্রীত্বে উহার ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী কন্‌ফারেন্সে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গীতশ্রী শ্রীমতী ঈভা গুহ, গীতশ্রী শ্রীমতী গীতা দাস এবং শ্রীমতী আরতি দাস কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত অমিয়-কান্তি ভট্টাচার্য্যের সেতার বাদন, শ্রীমতী রেণুকা মোদকের নৃত্য এবং শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে ঐকতান বাদকদলের যন্ত্রসংগীতে দক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী অমলা নন্দী প্রভৃতিও কন্‌ফারেন্সে গিয়াছিলেন।

—

চীন ও জাপান

জাপান চীনের কাছে কয়েকটি দাবী পাঠাইয়াছে। সে গুলি ঠিক্ কি এখনও প্রকাশ পায় নাই। অনেকে মনে করেন, দাবীগুলির মানে জাপানকে চীনের আরও কয়েকটি প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বলা। কিন্তু চীন যুদ্ধের জন্য আগেকার চেয়ে অধিক প্রস্তুত। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে বিস্তর সৈন্য মজুত রাখিয়াছে এবং ব্লাডিবষ্টকে এরোপ্লেনও পাঠাইয়াছে অনেক। চীন এই সকলের সাহায্য পাইবে। চীনের নিজের এরোপ্লেনের সংখ্যাও এখন কম নয়। সুতরাং জাপান এখন কিছু চাহিলেই পাইবে মনে হয় না। যুদ্ধ বাধিতে পারে।

—

প্যালেষ্টাইনের অবস্থা

প্যালেষ্টানেই আরবদের বিদ্রোহের এবং বৃহৎ ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু অশান্তি এখনও আছে। তদুপরি আরব উচ্চতর কমিটি ব্রিটিশ রয়্যাল কমিশ্যনকে বয়কট করিয়াছে এই কারণে,যে, ব্রিটেন প্যালেষ্টাইনে বাহির হইতে ইহুদীদের আগমন এখনও বন্ধ করে নাই।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাঁচীতে হইবে। মূল সভাপতি এবং বিভাগীয় সভাপতিদিগের নাম অন্যত্র দৃষ্ট হইবে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল, এম-এল-সি, মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সহযোগিতায় এই অধিবেশনের সমুদয় বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের আশা আছে।

শরৎচন্দ্র রায় ভারতবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ। ছোটনাগপুরের কয়েকটি প্রধান আদিম জাতির সম্বন্ধে ইংরেজীতে তিনি যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের বাহিরেও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। বাংলাভাষাতেও তিনি প্রবাসীতে নৃতত্ত্ববিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ছোটনাগপুরের আদিম জাতিরা তাঁহাকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া মনে করে। তাঁহার নেতৃত্বে অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতি যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে এবং নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া সুবিদিত।

রাঁচী স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ছোটনাগপুরের দ্রষ্টব্য অনেক জিনিষ আছে। সংস্কৃতির ও স্বদেশহিতৈষণার অনুরাগী ব্যক্তিদের পক্ষে রাঁচী প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ ও গ্রন্থকার পরলোকগত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাসস্থান বলিয়া দ্রষ্টব্য। রাঁচির ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় শিক্ষানুরাগীদিগের দ্রষ্টব্য। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৈঠকখানা নৃতত্ত্বের মিউজিয়াম বলিলেও চলে।

বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মিলন-সাধনের প্রতিষ্ঠান এই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। আগে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে যে বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইত, কয়েক বৎসর তাহা আর না হওয়ায় এখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনই বাঙালী সাহিত্যিকদিগের সম্মিলিত হইবার একমাত্র সভা।

—

বঙ্গে জবাহরলাল

শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধিনায়ক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর যে উৎসাহপূর্ণ ও বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকৃত দেশভক্তকে বাঙালী কিরূপ ভালবাসে তাহা বুঝা যায়, এবং কংগ্রেসের স্থানও বাঙালীর হৃদয়ে কিরূপ তাহাও বুঝা যায়। এই সম্বর্দ্ধনার অনেকটা সাময়িক উচ্ছ্বাস হইলেও, ইহার স্থায়ী প্রভাবও কার্য্যক্ষেত্রে অনুভূত হইবে, আশা করা যায়। স্বদেশসেবকের প্রকৃত সম্বর্দ্ধনা দেশের উন্নতির জন্য তাঁহারই মত লাগিয়া যাওয়া। তাঁহার সকল মত আমরা গ্রহণ না-করিতে পারি, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীও সর্ব্বাংশে আমরা অনুসরণ না-করিতে পারি, তথাপি যথাশক্তি তাঁহার মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও আত্মোৎসৃষ্ট হইবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ও জবাহরলালের কথোপকথন

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত জবাহরলালের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথন হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ও য়্যাড্‌ভান্সের ছবি দুটিতে জবাহরলালকে শ্রোতারূপে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস-অধিনায়কের কি কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বৃথা কৌতূহল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্ব্বসাধারণ উপকৃতও হইতেন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তি দেখাসাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিতও সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর সহিত এইসব সাক্ষাৎকারের ও কথোপ-কথনের বৃত্তান্ত ও অনুলেখন রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন লিখিয়া রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।

—

কলিকাতায় জবাহরলালের বক্তৃতা

জবাহরলাল যত জায়গায় যাইতেছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অনেক বক্তৃতা করিতে হইতেছে। কলিকাতাতেও অনেক

শ্রীনিকেতনে সাঁওতাল ব্রতীবালকগণ কর্ত্তৃক পণ্ডিত জবাহরলালের অভ্যর্থনা

শ্রীনিকেতনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুকে মাল্যচন্দনদান

বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। কোন একটি বক্তৃতাতেই কেহ নিজের সব মত প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ, কোন বক্তৃতাই এনসাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষ নহে। সুতরাং কোন বক্তৃতায় যাহা বলিতে বাকী থাকে, তাহা বক্তার মত বটে কিনা, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইলে তাঁহার অন্য সব বক্তৃতাও পড়া আবশ্যক। এই জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রধান প্রধান বক্তৃতা তাঁহাদের দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক

নিখিল-বঙ্গ মহিলা কর্ম্মীদের প্রতি জবাহরলাল

অন্য অনেক সভা সমিতির মত নিখিল-বঙ্গ মহিলা কর্ম্মী-সংঘ কলিকাতায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহাদের অভিনন্দনপত্রের উত্তরে পণ্ডিতজী যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশের তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি।

দেশের উন্নতি যদি করিতে হয় তবে প্রথমে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিকে বাদ দিয়া কখনই দেশের উন্নতি হইতে পারে না। দেশের কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই সমান অংশ দিতে হইবে। নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই আমাদের প্রধান কার্য্য। মেয়েরা যদি লেখাপড়া না শেখে, তবে তাহারা কখনও সন্তানকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারে না।

নারীদের শিক্ষিত করিয়া তোলাকে পণ্ডিতজী অবশ্যকর্ত্তব্য ও প্রধান কাজ বলিয়াছেন, ইহা শিক্ষিতা মহিলারা লক্ষ্য করিবেন।

স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায় নারীদের কৃতিত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,

আজ দেশের সম্মুখে সকলের চেয়ে বড় কথা স্বাধীনতা অর্জ্জন। সুখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়াছেন; ফলে দেশের লোকের মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারা নিজেদের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছে;

বিনাবিচারে যাহারা অবরুদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন,

বাংলার শতসহস্র যুবক আজ বিনাবিচারে অবরুদ্ধ। ইহাতে যাহারা বেশী কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহারা স্ত্রীলোক; কারণ আজ যাহারা

অবরুদ্ধ এবং নির্য্যাতিত, তাহারা তাহাদের স্বামী, ভ্রাতা অথবা পুত্র। ইহার জন্য হায় হায় করিয়া লাভ নাই, আপনাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের এ অবস্থা দূর করিতেই হইবে। সেজন্য আপনারা অন্তরের সহিত এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করুন।

কলিকাতায় মহিলাদিগের সভায় পণ্ডিত জবাহরলাল; তাঁহার দক্ষিণে যথাক্রমে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ

বঙ্গে কেবল যে পুরুষেরা বিনাবিচারে বন্দীকৃত হইয়াছে তাহা নয়। বহুসংখ্যক পুরুষ অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প নারীদেরও বন্দীদশা ঘটিয়াছে।

পরদা-প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুব্যবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন,

আর একটি কাজ আপনাদিগকে করিতে হইবে। তাহা হইতেছে—পরদা-প্রথা, সামাজিক কুব্যবস্থা ও শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করা। যত দিন না আপনারা এই সমস্ত বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারেন তত দিন আপনাদের পূর্ণতা আসিবে না। আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। আইন অমান্য করিবার আন্দোলনে হাজার হাজার নারী পরদার বাহিরে আসিয়া পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সংগঠনশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্ত্রীজাতির নিকট আমার অনুরোধ তাহারা যেন আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হন। যদিও পরদা-প্রথা এখনও আছে, কিন্তু আর বেশী দিন তাহা থাকিতে পারে না। স্ত্রীস্বাধীনতার সংগ্রাম আপনাদিগকে একাই করিতে হইবে, ইহাতে আপনারা পুরুষের কোন সাহায্য পাইবেন না। পুরুষেরা এই কার্য্যে হয়ত বাধা দিবে, কারণ এই সমাজ পুরুষের সমাজ। সুতরাং দুইটি কাজ আপনাদের সম্মুখে আছে, এক স্বরাজ এবং দ্বিতীয় স্ত্রীস্বাধীনতা। তার পর, যারা গরীব, যারা বেকার যারা শ্রমিক—তাহাদের প্রতিও আপনাদের কর্ত্তব্য আছে। আমি নিখিল-বঙ্গ মহিলা কর্ম্মী সঙ্ঘকে এই কার্য্যের জন্য আহ্বান করিতেছি।

পরদা-প্রথাও বিশেষ করিয়া নারীদের পক্ষে অনিষ্টকর ও অসুবিধাজনক। অন্যান্য কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীরা বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান পুরুষসমাজের, অন্ততঃ অধিকাংশের, সাহায্য পাইবেন না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য তাঁহারা পাইবেন। ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীস্বাধীনতার এই সংগ্রাম আইন অমান্য করিবার আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতে নানা কুৎসা ও অন্যবিধ উৎপীড়নের মধ্য দিয়া করিয়া আসিতেছে।

বিনাবিচারে অবরোধ এবং মানসিক ক্ষতি ও অবসাদ

পণ্ডিতজী তাঁহার কলিকাতার একটি বক্তৃতায় বঙ্গের শত শত ব্যক্তিকে বিনাবিচারে বন্দী করার ফলে বঙ্গের যে মানসিক অবসাদ ও ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অতীব সত্য কথা। অবরুদ্ধ যুবক ও তরুণীরা স্বাধীন থাকিলে দেশের মানসিক সম্পদ বাড়াইতে পারিতেন, তাঁহাদের দ্বারা মননশীলতা ও মনস্বিতা অগ্রসর হইত। ইহা যে বাধা পাইয়াছে, তাহাই বঙ্গের মনোরাজ্যের একমাত্র ক্ষতি নহে। বঙ্গের কেবল কতকগুলি মানুষের দেহই (এবং মনও) যে অবরুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত হইয়াছে, তাহা নহে। বঙ্গের সকল পুরুষের ও নারীর মনের পায়ে বেড়ি ও হাতে হাতকড়ি লাগান হইয়াছে। আমরা ভয়ে ভয়ে কথা বলি, ভয়ে ভয়ে চলি—যে গোয়েন্দা নয় তাকেও গোয়েন্দা মনে করি। ভয়ে ভয়ে খবরের কাগজে লিখি, বহি লিখি, ব্যক্তিগত চিঠি লিখি (কারণ, কাহার কোন্ চিঠি যে ডাকঘরে খোলা হইবে না, তাহা কেহ জানে না); সুতরাং আমরা ভয়ে ভয়ে চিন্তা করি, কল্পনা করি। চিন্তা ও কল্পনার ডানা বাঁধা বা কাটা পড়িয়াছে।

প্রত্যেক দেশেরই উদীয়মান পুরুষসমাজ ও নারীসমাজ তাহার প্রধান সম্পদ। কারণ, এই উঠ্‌তি বয়সের ছেলেরা ও মেয়েরা বয়োবৃদ্ধদের চেয়ে সাহসী, শক্তিমান, আশাশীল,

উৎসাহশীল এবং বাঁচিবেও অধিকতর বৎসর। অধিকন্তু, যেমন রাত্রির অবসানের পূর্ব্বে ঘরের আঁধারের মধ্যেও মায়ের কোলের শিশুরা আলোর সন্ধান পাইয়া কাকলি করিয়া উঠে, তেমনি সুস্থ প্রকৃতির যুবজন জগতে নব উষার আবির্ভাব বৃদ্ধদের চেয়ে আগে অনুভব করিতে পারে। কিন্তু মুক্তির বার্ত্তা কেবল তারাই পায়, যারা স্বয়ং মুক্ত। বঙ্গে যুবসমাজের কয়েক সহস্রের দেহমন পিঞ্জরাবদ্ধ, অবশিষ্টদের মন ভয়ে আড়ষ্ট ও শৃঙ্খলিত—কারণ যুবজনই বিশেষ সন্দেহভাজন।

তথাপি আশা করি, আমাদের যুবজন মানবাত্মার আশ্চর্য্য স্থিতিস্থাপকতার গুণে তাহাদের মনের উপরের চাপটাকে পরাস্ত করিতে পারিবে।

—

লাহোরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন

লাহোরে হিন্দুমহাসভার যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, করবীর পীঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ডক্টর কুর্ত্তকোটি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি আদি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির একটির প্রধান আচার্য্য ও সন্ন্যাসী। হিন্দুর নানা শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার পাশ্চাত্য দর্শন আদিরও জ্ঞান আছে। তিনি জ্ঞানবান্ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। সেই জন্য তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে-সকল উদার মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত তাঁহার সকল মতের আলোচনা সংক্ষেপে হইতে পারে না, এবং তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে আমরা একমতও নহি।

বিশাল হিন্দুসমাজে নানা জনের নানা মত। এই সমাজের যে সকল লোক পরমত-অসহিষ্ণু তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, শঙ্করাচার্য্যের মত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এক জন সুপণ্ডিত হিন্দু কিরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যদি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন না-করেন, তাহা হইলে তিনি অস্পৃশ্যদিগের হিন্দু সমাজের স্বতন্ত্র একটি শাখা প্রতিষ্ঠাতেও রাজী, তাহারা শিখ হইলেও তিনি রাজী; এবং জৈন বৌদ্ধ শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই তিনি হিন্দু মনে করেন। লাহোরের শিখদের শ্রীগুরুসিংহ সভা তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া উপলক্ষ্যে আপনাদিগকে বিশাল হিন্দু সমাজের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন।

আচার্য্য কুর্ত্তকোটি হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করেন। খ্রীষ্টিয়ানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরাণের মত হিন্দু মতের বিশেষ করিয়া কোন একটি শাস্ত্র নাই, কোন ক্রীড নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্ম যিশু খ্রীষ্টকে, মুসলমানদের ধর্ম্ম মোহম্মদকে যে স্থান দেয়, হিন্দুদের ধর্ম্ম বিশেষ কোন একজন মানুষকে সে স্থান দেয় না—হিন্দু ধর্ম্ম পৌরুষেয় নহে, ইহা অপৌরুষেয়। এই জন্য ইহা সনাতন ধর্ম্ম। মহাত্মা গান্ধীও কতকটা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার কতকগুলি কথায় ভারতীয় স্বাজাতিকেরা (অর্থাৎ ন্যাশন্যালিষ্টরা) সায় দিতে পারিবেন না। বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া সেইগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"Hindusthan is primarily for the Hindus, who live for the preservation and development of Aryan culture and Hindu *dharma*."

"In Hindusthan the national race, religion and language ought to be that of the Hindus."

"The religion, race and language of the majority community of a State (of Hindus in Hindusthan) shall be the national religion, race and language in every part and in every province of the State, even if the majority community in the State happens to be in a minority in a particular province."

তাৎপর্য্য। "হিন্দুস্থান প্রধানতঃ (মুখ্যতঃ, আদৌ) হিন্দুদের জন্য, আর্য্যসংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা ও বিকাশের নিমিত্ত যাহারা জীবন ধারণ করে।"

"হিন্দুস্থানে হিন্দুদের রেস্ ('জাতি') ধর্ম্ম ও ভাষাই জাতীয় রেস, ধর্ম্ম ও ভাষা হওয়া উচিত।"

"কোনও রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশে ও প্রদেশে সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সম্প্রদায়ের (হিন্দুস্থানে হিন্দুদের) ধর্ম্ম, রেস্ ও ভাষা সেই রাষ্ট্রের ধর্ম্ম, রেস্ ও ভাষা হওয়া উচিত—সেই রাষ্ট্রের কোনও প্রদেশে ঐ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইলেও সেখানেও।"

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কোন ধর্ম্ম নাই। আগে কোন কোন রাষ্ট্রের এক একটা ধর্ম্ম ছিল বটে। যেমন ব্রিটেনে ও আয়ার্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইংলণ্ডীয় শাখা রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম (state religion) ছিল, তুরস্কে ইস্লাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম ছিল। এখন কিন্তু ব্রিটেনের বা তুরস্কের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম নাই। রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্ম্মমত ও সব ধর্ম্মমতের লোক সমান, এবং রাষ্ট্র সকলেরই জন্য।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে "আর্য্য" বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র রেস্ নাই। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অবিমিশ্র "আর্য্য" সংস্কৃতি নহে, যদিও প্রধানতঃ ইহা ভারতীয়। ইহার মধ্যে দ্রাবিড় এবং অন্য "অনার্য্য" সংস্কৃতি মিশিয়াছে ও মিশিতেছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে সব হিন্দু এক রেসের নহে, হিন্দু সম্প্রদায়ে নানা রেসের মিশ্রণ হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে কোনও সভ্য দেশে কোন অবিমিশ্র রেস্ আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি বলা হয়, হিন্দুদের ভাষাই ভারতবর্ষ-রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া উচিত, তাহা হইলে হিন্দুদের

কলিকাতায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনায় শোভাযাত্রা [ভারত ফটোটাইপ

শ্রীনিকেতনে পণ্ডিত জবাহরলাল ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন

শ্রীনিকেতনে জবাহরলাল
বাম হইতে : শ্রীসুচেতা কৃপালনী, জবাহরলাল, শ্রীকালীমোহন ঘোষ, শ্রীনন্দিতা কৃপালনী, আচার্য্য কৃপালনী

গুজরাট সাহিত্যসম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী ও আবদুল গফুর খাঁ

মাদ্রাজের নিকটে মাম্বালমে জবাহরলাল নেহেরু হিন্দী প্রচার সভার নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বারোন্মোচন করিতেছেন

সেই ভাষাটি কোন্ ভাষা? ভারতীয় হিন্দুরা প্রদেশভেদে হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা, তেলুগু, পাঞ্জাবী, তামিল, মরাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, সিন্ধী, মলয়ালম, কন্নাড, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। ইহাদের মধ্যে সবগুলি "আর্য্য" ভাষাও নহে—দ্রাবিড় ভাষাও কয়েকটি আছে। হিন্দী-উর্দ্দুকে হিন্দুস্থানী নাম দিয়া যদি ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করা হয়, তাহা হইলেও উহা ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও মানসিক আদানপ্রদানের ভাষা হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাগুলি লোপ পাইবে না—সেগুলিই সেই সেই প্রদেশে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। হিন্দী বা উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী অবিমিশ্র "আর্য্য" ভাষাও নহে।

আচার্য্য কুর্ত্তকোটি তাঁহার অভিভাষণে অবশ্য এ-কথাও বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষ-রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র হইলেও এখানে সংখ্যালঘুসম্প্রদায়গুলির সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তৎসমুদয় লীগ অব্ নেশুন্সের সংখ্যা-লঘুসম্প্রদায়সমূহবিষয়ক ব্যবস্থা অনুসারে সংরক্ষিত হইবে।

হিন্দুদের একটি বিশেষত্ব আমরা স্বীকার করি, এবং সেই বিশেষত্ব অনুসারে তাহারা ঠিক্ যে অর্থে ভারতবর্ষীয় ও ভারতভক্ত, অ-হিন্দু কোন সম্প্রদায় সে অর্থে ভারতবর্ষীয় ও ভারতভক্ত নহে। এই বিশেষত্বটি এই যে, হিন্দুরা কেবল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী বলিয়াই ভারতীয় নহে, তাহারা ধর্ম্মে এবং সংস্কৃতিতেও ভারতীয়। ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদের ভক্তি ও আনুগত্য (অর্থাৎ লয়্যাল্টি) কেবল রাষ্ট্রীয়, বা অর্থনৈতিক (অর্থাৎ জীবিকার বা গ্রাসাচ্ছাদনের), নহে, তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ভাষাসম্বন্ধীয় এবং সাংস্কৃতিকও (culturalও) বটে। তাহাদের ধর্ম্ম ভারতবর্ষজাত, ভাষা মূলতঃ ভারতীয় এবং সংস্কৃতি ভারতীয়। তাহাদের প্রাচীন (classical) ও "পবিত্র" ভাষা ভারতীয়। অ-হিন্দু ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়-গুলি সম্বন্ধে এই সব মন্তব্য খাটে না। তথাপি রাষ্ট্রের চক্ষে সকলেই সমান।

এই সাম্যটি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে মানিতে হইবে, তেমনই সংখ্যালঘু অ-হিন্দুদিগকেও মানিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আপনাদের ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারেন এবং তাহা মনে করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অ-হিন্দু কাহারও ইহা মনে করা উচিত নয়, যে, "যেহেতু আমার ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব, আমার মত অনুসারে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হইবে।" এরূপ দাবী অসঙ্গত, অন্যায় ও অযৌক্তিক। কোনও ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রনিয়ন্তার এরূপ দাবী মানা উচিত নয়। ইহা এখন কেহ মানিলেও ইহা টিকিবে না।

বর্ত্তমান ব্রিটিশনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র হিন্দুকে অ-হিন্দুর নিম্নস্থানীয় করিয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দু ইহা মনে মনে ও কথায় মানিতেছে না, কার্য্যতও এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা টিকিতে পারে না।

আচার্য্য কুর্ত্তকোটি ও তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিরা যে ভাবে হিন্দুদের নেতৃত্ব, প্রাধান্য বা প্রমুখতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা সমীচীন নহে।

হিন্দুরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী। দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষে, সার্ব্বজনিক হিতসাধনে এবং লোকহিত-ব্রততায় তাঁহারা যদি অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় না হন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ হিন্দু ভারতবর্ষই হইবে ও থাকিবে। কোনও সাম্রাজ্যিক বা জাগতিক শক্তি তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

হিন্দু মহাসভার লাহোর অধিবেশনের দুটি ঘটনা দুঃখকর। একটি সভাপতির অভিভাষণের কোন কোন অংশের সহিত মতের মিল না-থাকায় কতকগুলি প্রধান হিন্দুর প্রতিবাদ ও সভাস্থল ত্যাগ; দ্বিতীয়টি, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের পণ্ডিত রাধাকান্ত মালবীয় প্রভৃতি প্রতিনিধিদিগকে প্রতিনিধি বলিয়া গণনা না-করা এবং তজ্জনিত হাঙ্গামা।

—

গোয়ালিয়রে নূতন মহারাজার অভিষেক

গোয়ালিয়র রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজা জিয়াজী রাও শিন্দে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাঁহার অভিষেক উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে তিনি প্রজাদের জন্য প্রধানতঃ যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তাহার তালিকা দিতেছি।

(১) গ্রামসমূহের উন্নতির জন্য এক কোটি টাকা দান।

(২) কৃষিজীবীদের দেয় ৬০ লক্ষ টাকা খাজনা মাফ।

(৩) ভাল বৃষ ও বীজ কিনিবার জন্য কৃষকদিগকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দান।

(৪) মহারাজাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের দেয় এক বৎসরের তন্‌কা মাফ।

(৫) তাহারা চারি বৎসরের মধ্যে রাজ্যকে তাহাদের বক্রী দেয় শোধ করিলে সুদ লাগিবে না।

(৬) গোয়ালিয়র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলবন্ত কোঠী নামক প্রাসাদ দান।

(৭) শিবপুরী ও মোরেনা নগর দুটির জন্য জল-সরবরাহের কারখানার ব্যবস্থা মঞ্জুর।

(৮) উজ্জয়িনী, শাজাপুর, মাণ্ডসার, শিবপুরী ও মোরেনার জন্য পয়ঃপ্রণালীর পরিকল্পনা মঞ্জুর। শিক্ষা প্রজাবর্গের সকলের অধিগম্য করা হইবে।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মাধব রাও শিন্দে গোয়ালিয়র রাজ্যে জলসেচনের ব্যবস্থার জন্য তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা, এক কোটি বাট লক্ষ রেলওয়ের জন্য, তিন কোটি নব্বই লক্ষ সরকারী রাস্তা ও ইমারতের জন্য, এবং কৃষক ও কৃষির সাধারণ উন্নতির জন্য সাতাইশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজ্যের ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের উন্নতির জন্যও বিস্তর টাকা খরচ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র গোয়ালিয়রে জলসেচন ব্যবস্থার জন্য তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সহিত বৃহৎ বঙ্গের সামান্য জলসেচন ব্যয় দুঃখের সহিত তুলনীয়।

—

হরিজনদিগকে ধর্ম্মান্তর লওয়াইবার চেষ্টা

লাহোরে নিখিলভারত হরিজন কনফারেন্সে হরিজন প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুই থাকিবেন, হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাঁহারা ত্যাগ করিবেন না; কিন্তু তাঁহারা হিন্দুসমাজের দ্রুত সংস্কার চান। অন্যদিকে, সংবাদ রটিয়াছে, ব্রিটেন হইতে খ্রীষ্টিয়ান পাদরীরা আসিতেছেন এবং মিশর হইতে মুসলমান মৌলবীরা আসিতেছেন হরিজনদিগকে যথাক্রমে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান করিবার জন্য। পরে অবশ্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে আদেশের প্রায় সমান বিজ্ঞপ্তি পাইয়া মিশরের মুসলমান মিশন ভারতবর্ষ আসা বন্ধ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক কারণে যিনি যে ধর্ম্মেই থাকুন বা যে ধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করুন, তাহাতে অন্যের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হরিজনদিগকে যে-যে যুক্তি ও প্রভাব দ্বারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার চেষ্টা হইবে, অতীতে যদ্দ্বারা তাহাদিগকে অহিন্দু করা হইয়াছে, তাহা বহু পরিমাণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

হরিজন-প্রতিনিধিরা হিন্দুত্ব ছাড়িবেন না বলিয়াছেন বটে, কিন্তু হরিজনদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, শিক্ষার সুযোগের অভাব, চিকিৎসার সুযোগের অভাব, এবং সামাজিক লাঞ্ছনা এত অধিক যে, তাহাদের নেতারা যাহাই বলুন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বিশেষ সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা ও সমাজহিতৈষিতার সহিত হরিজন সমস্যাসমূহের সমাধানে মনোযোগী না হইলে বহু হরিজনকে ধর্ম্মান্তরে লইয়া যাওয়া খুব কঠিন হইবে না। যে পরিমাণে হরিজনেরা অ-হিন্দু হইবে, সেই পরিমাণে শুধু যে হিন্দুসমাজ হীনবল হইবে তাহা নহে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বাজাতিকতার বাস্তবিক ও সম্ভাব্য সমর্থকদিগের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে।

—

বোম্বাইয়ে "ধর্ম্ম"গুণ্ডামি

গুণ্ডামির সহিত ধর্ম্ম শব্দটির একত্র প্রয়োগ শোচনীয় ও লজ্জাকর। কিন্তু অনেক লোক গুণ্ডামি ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায় না বলিয়া তাহা করিতে হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে হিন্দুদের মারুতির মন্দির ও ভজনমণ্ডপ এবং তাহার নিকট মুসলমানদের মসজিদ অন্ততঃ এক শত বৎসর হইতে আছে। উভয়ের সান্নিধ্য এতদিন হিন্দুমুসলমানের বিরোধের কারণ হয় নাই; অথচ হিন্দুরা হিন্দু ছিল, মুসলমানেরা মুসলমানই ছিল। সম্প্রতি এই সান্নিধ্য রক্তপাতের কারণ হইয়াছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটির ইতিহাস এইরূপ।

যে অঞ্চলে মন্দিরটি ও মসজিদটি আছে, সেখানে রাস্তার উন্নতির জন্য মিউনিসিপালিটির কিছু জায়গার দরকার হয়। মসজিদের কর্ত্তৃপক্ষ জায়গা দিতে নারাজ হন। মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ এই সর্ত্তে পুরাতন সভামণ্ডপের জায়গাটা দিতে রাজী হন যে ভগ্ন এই মণ্ডপের পরিবর্ত্তে মন্দিরের অন্য দিকে মিউনিসিপালিটি একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন। মিউনিসিপালিটি এই সর্ত্তে রাজী হইয়া প্রাচীন মণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া জায়গাটি নিজেদের কাজে লাগান। পরে যখন সর্ত্ত অনুসারে নূতন মণ্ডপটি নির্ম্মাণ করিয়া দিবার কথা হয়, তখন মিউনিসিপালিটির মুসলমান সভ্যেরা তাহার বিরোধিতা করেন।

মসজিদের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, হিন্দুদের ভজনমণ্ডপ নির্ম্মিত হইলে তথাকার ভজনে তাঁহাদের নামাজের ব্যাঘাত হইবে (গত এক শত বৎসর কিন্তু ব্যাঘাত হয় নাই!)। তাহাতে হিন্দুরা নামাজের সময় বাদ দিয়া অন্য সময়ে ভজন করিবার প্রস্তাব করেন। মুসলমানদের তাহাতেও মত হয় নাই, ভজনমণ্ডপ তাঁহারা হইতেই দিবেন না। অতঃপর মিউনিসিপালিটি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য পুলিস মোতায়েন করিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। তার পর উভয় পক্ষের মধ্যে দাঙ্গা, গুপ্তহত্যা, অতর্কিত হত্যা, গৃহদাহ, দোকানপাট লুট ইত্যাদি চলিতে থাকে। তাহা প্রায় দমিত হইয়াছে, মণ্ডপও নির্ম্মিত হইয়াছে, এখন মুসলমানদের দাবী এই, যে, ভজনের সময়টা নামাজের সময়টা বাদ দিয়া নির্দ্ধারিত হউক!

হিন্দুরা ও খ্রীষ্টিয়ানেরা কিন্তু কখনও বলেন না, যে, তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনা সন্ধ্যা আরতি উপাসনার সময় বাদ দিয়া মুসলমানদের নামাজের আজান দেওয়া হউক এবং মুসলমানদের মহরমের ঢাকের বাদ্য বাজান হউক।

—

দেশী নৃপতিদের ফেডারেশ্যনে যোগদানে দ্বিধা

দেশী রাজ্যগুলির নৃপতিরা এখন অনেকে ফেডারেশ্যনে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইতস্ততঃ করিয়া, বিলম্ব করিয়া কি লাভ? ফেডারেশ্যনে ত ঢুকিতেই হইবে? অর্থাৎ কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। অপর অনেকে বুঝিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ব্রিটিশ ভারতের

লোকদিগকে স্বরাজ দিতে চান না—যাহাতে দিতে না-হয় তাহা দেশী রাজাদের দ্বারা করাইতে চান।

দেশী রাজারা এমন সব সর্ত্তের প্রস্তাব করিতেছেন, যাহা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট গ্রহণ করিলে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে পুরা স্বৈর নৃপতি থাকিবেন, অথচ ব্রিটিশ ভারতের কাজে মোড়লী করিতে পারিবেন। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদিগকে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কোন চূড়ান্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক; দেশী রাজারাও নিজেদের প্রজাদিগকে কোন চূড়ান্ত অধিকার দিতে চান না। এ-বিষয়ে উভয় পক্ষের বেশ মিল আছে। অধিকন্তু দেশী রাজারা এ পর্য্যন্ত যতটা ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তার বেশী কিছু ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক।

—

বাঙালীর নির্ম্মিত মুদ্রণযন্ত্র ও অন্যান্য কল

হাবড়ায় শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের কারখানায় ট্রেডল মুদ্রণযন্ত্র, ওজনের ছোট ও বড় কল, পাট বুনিবার তাঁত প্রস্তুত হইতেছে, এবং বিক্রয়ও হইতেছে। আশা করি, তিনি কাপড় বুনিবার তাঁত এবং ছাপাখানার বড় বড় যন্ত্রও নির্ম্মাণ করাইতে পারিবেন।

—

মিঃ জিন্নার আস্পর্দ্ধা

নানা অজুহাতে মিঃ জিন্না তাঁহার দলের কমিটি হইতে বঙ্গের মুসলমানদের অন্যতম নেতা মৌলবী ফজলুল হকের নাম কাটিয়া দিয়াছেন। বাঙালী মুসলমানেরা অন্য যে কোন প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকও অনেক আছেন। অথচ তাঁহারা অন্য প্রদেশের মুসলমানদের মুরুব্বিয়ানা চান ও সহ্য করেন। তাহাতেই শেষোক্তদের ঔদ্ধত্য ও আস্পর্দ্ধা বাড়ে।

—

ময়মনসিংহে কাপড়ের কল

ময়মনসিংহে একটি কাপড়ের কল স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গে আরও অনেক কাপড়ের কলের আবশ্যক।

বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় বেশ ভাল তূলা উৎপন্ন হইতে পারে; তথায় কাপড়ের কলও হওয়া উচিত।

—

রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস

লীগ অব নেশুন্সে প্রতিনিধির বদলে আবশ্যকমত কাজ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস জেনিভা গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছেন, ভারতবর্ষকে লীগকে অত্যন্ত বেশী টাকা দিতে হয়, লীগের কৌন্সিলে কোন ভারতীয় নাই, কোন উচ্চ পদে ভারতীয় নাই, যে অল্পসংখ্যক ভারতীয় লীগে চাকরী করেন, তাঁহাদের বেতন কম, ভারতবর্ষ স্বশাসক দেশ নহে, ইত্যাদি। এসব কথা সত্য কিন্তু নূতন নয়। এগুলির বিশেষত্ব কেবল এই যে, একজন গবর্ন্মেণ্ট-মনোনীত ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিতেছেন।

—

কংগ্রেস ও বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন

প্রথমে বাংলা, পরে পঞ্জাব ও তৎপরে মধ্যপ্রদেশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ভারতশাসন আইন বর্জ্জন আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারেন। পণ্ডিত জবাহরলালের কলিকাতা আগমনের পর বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি যে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও মস্তকবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা প্রদর্শন প্রণালী অনুসারে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন কংগ্রেসের পক্ষে বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

—

ভারতশাসনের নববিধানে ব্যয়বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের উচ্চতম, উচ্চতর ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা যত বেতন পায়, ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী ধনশালী কোন দেশেও সেইরূপ কর্ম্মচারীরা তত বেতন পায় না। তাহার উপর এইসব কর্ম্মচারীদের নানাবিধ ভাতা আছে। ভারত-শাসনের নববিধানে ব্যয় আরও বাড়িবে। শুধু বঙ্গেই নানা কর্ম্মচারীর নানাবিধ ভাতা প্রভৃতিতে বার্ষিক ৬,৩৭,৩০০ টাকা খরচ বাড়িবে! প্রাদেশিক হাইকোর্ট-গুলিরও উপরে যে ফেডার‍্যাল কোর্ট হইবে, তাহার প্রধান বিচারপতি মাসিক ৭০০০৲ ও অন্য বিচারপতিরা মাসিক ৫৫০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। ইহাঁদের পেন্সানআদির বরাদ্দও খুব দরাজ রকমের।

ভারতবর্ষের হিমালয় জগতে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। সুতরাং আর সবও সর্ব্বাধিক না হইলে মানানসই হয় না। সেইজন্য ভারতবর্ষ দারিদ্র্যে দিগ্বিজয়ী, বিদেশী কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দানে সর্ব্বাভিভাবী, এবং দারিদ্র্যের দারুণ্য ও বেতনের উত্তুঙ্গতার বৈসাদৃশ্যও হিমালয়বৎ।

—

বোম্বাইয়ে আবার দাঙ্গা ও রক্তারক্তি

বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ কলিকাতা হইতে দূরে লিখিত। আজ ২৬শে কার্ত্তিক লেখা শেষ করিবার পর কলিকাতা হইতে দৈনিক কাগজ পাইয়া তাহাতে

দেখিলাম, বোম্বাইয়ে আবার দাঙ্গা ও রক্তারক্তি আরম্ভ হইয়াছে। গ: ীর পরিতাপের বিষয়।

—

চাকরীর বৃহত্তম দাঁও ভারতে !

অক্সফোর্ডের ছাত্রদিগকে সেদিন লর্ড হালিফাক্স (ভূতপূর্ব্ব লর্ড আরুইন) বলিয়াছেন, "There is no bigger job to wo·k for an Englishman anywhere than in India।" অর্থাৎ ইংরেজের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় চাকরীর দাঁও ভারতবর্ষে। ভারতীয়ের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় দাঁও কোথায়? বিদেশে ত নয়ই, স্বদেশেও নয়। ভারতে ইংরেজাধিকৃত প্রত্যেক চাকরীর জন্য কিরূপ যোগ্যতা আবশ্যক আমরা জানি না। সুতরাং সব চাকরীর কথা বলিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, এদেশে ইংরেজাধিকৃত অধিকাংশ চাকরী ভারতীয়েরা উত্তমরূপে করিতে পারে। সুতরাং লর্ড সাহেবের কথার মানে এই, যে, বিদেশগুলির মধ্যে তত্তৎদেশের লোকদিগকে বঞ্চিত রাখিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ ভারতবর্ষে।

—

বিশেষজ্ঞের আমদানী

মোটা মোটা বেতনে কত বিশেষজ্ঞের আমদানী যে ভারতে হইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? এই বিশেষজ্ঞদের ব্রিটিশ হওয়া চাই। যে-সব বিষয়ে ব্রিটেন শ্রেষ্ঠ নহে, যেমন কৃষিকার্য্যে, তাহার বিশেষজ্ঞও ব্রিটিশ হওয়া চাই। যদি তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে কাজ হইত, তাহা হইলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তা প্রায়ই হয় না।

—

বঙ্গে বাঁশের উন্নতির চেষ্টা

বঙ্গে কি প্রকারে বাঁশের উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় সম্বন্ধে সরকারী অনুসন্ধান হইতেছে। বাঁশ নানা কাজে লাগে। আরও অনেক কাজে লাগিতে পারে। জাপানীরা খুব সস্তা ও খুব সুন্দর নানারকম নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ বাঁশ হইতে প্রস্তুত করে। বঙ্গেও সেইরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দেশে ও বিদেশে তৎসমুদয়ের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। —

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

গত কার্ত্তিক মাসের গোড়ায় বৃন্দাবন যাইবার পথে শোন ঈষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেশনে হঠাৎ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মত সাহিত্যিক ও অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে টেলিগ্রাফ ও বসুমতীর সম্পাদকতা করিতেন। তাঁহার সৌজন্যের জন্য তাঁহার সহিত কথোপকথন সুখকর হইত।

—

অচল হিমাচল চলেন !

সুইজার্ল্যাণ্ডের অধ্যাপক হাইম্ (Prof. Hyme) নামক একজন ভূতত্ত্ববিৎ ভারতভ্রমণে আসিয়াছেন। তিনি বহু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ও প্রায় এক হাজার ফটোগ্রাফ লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া হিমালয় সমতলের দিকে আসিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত কুড়ি মাইল নামিয়াছেন! —

আমেরিকার দেশপতি নির্ব্বাচন

দেশপতি রুসভেল্ট পুনর্ব্বার খুব বেশী ভোটে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দেশপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে দেশের শাসনযন্ত্রের সংস্কার সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্য দেশের অধিকাংশ লোক তাঁহার পক্ষে। এই কারণে, ধনিক শ্রেণী সুশৃঙ্খল ও দলবদ্ধ ভাবে তাঁহার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—

সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজা

এ-বৎসর সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক স্থানে হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে দুর্গার পূজা আগে ব্রাহ্মণরাই করিতেন এবং অঞ্জলিদানও কয়েকটি জাতের লোকেরাই করিতেন। এখন যে নানাস্থানে হিন্দুসমাজের সকল জা'তই উভয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিতেছেন, সাম্যবোধবিস্তারের এই বাহ্যপ্রকাশ সুলক্ষণ।

—

বিজয়া

অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন, পরদারাপহারী রাবণ পরাজিত ও নিহত হইবার পর রামচন্দ্র যে শক্তিপূজা করিয়াছিলেন, বিজয়ার অনুষ্ঠান সেই জয়োৎসব সমাপনের স্মারক। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের নারীহরণ দমন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিজয়ার উৎসব করেন কিনা আত্মপরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারিবেন।

বিজয়ার একটি নিপুণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে আগমনী ও বিজয়া একটি রূপকের আরম্ভ ও শেষ। আগমনী মানবাত্মায় ঐশী শক্তির স্ফুরণ এবং বিজয়া মানবমনের কুপ্রবৃত্তির উপর ঐ শক্তির জয়লাভ সূচনা করে। যাঁহারা এই ব্যাখ্যা সত্য মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে আগমনী ও বিজয়া সার্থক হইয়াছে কিনা, তাঁহারা তাহা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন।

—

জার্ম্মাণীর রণসজ্জা—নূরেমবর্গে ট্যাঙ্ক-শোভাযাত্রা
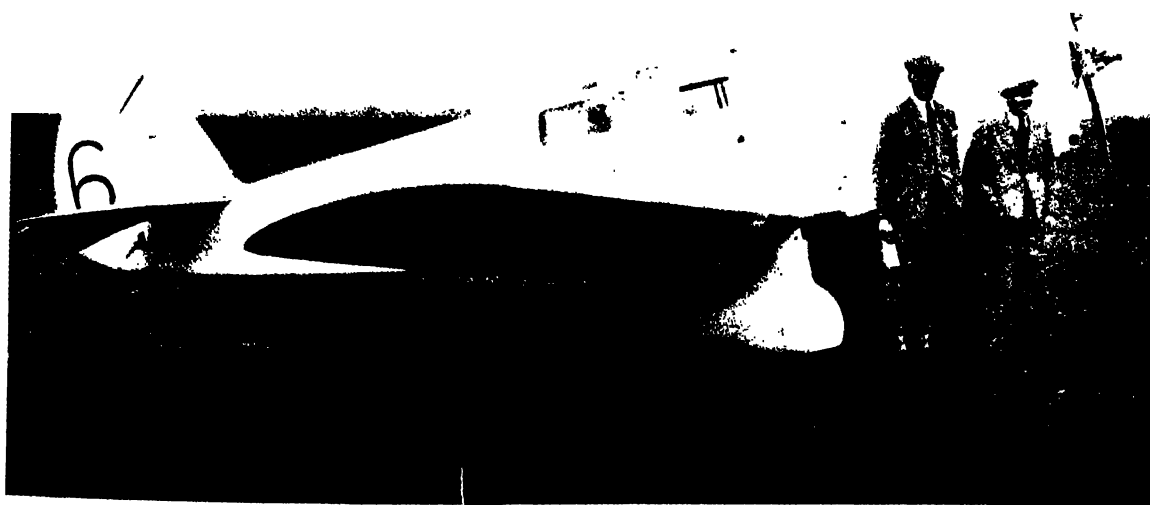
লণ্ডন-জোহনেসবার্গ বিমান-প্রতিযোগিতায় দশ হাজার পাউণ্ডের পুরস্কার বিজেতা সি. ডব্লু. স্কট ও তাঁহার সঙ্গী।
ইঁহারা ৫২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪৮.২ সেকেণ্ডে ৬১৫৪ মাইল পাড়ি দিয়াছিলেন।

৭১ দিনের বন্দীদশার পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক স্পেনের বিদ্রোহীদের মুক্তি
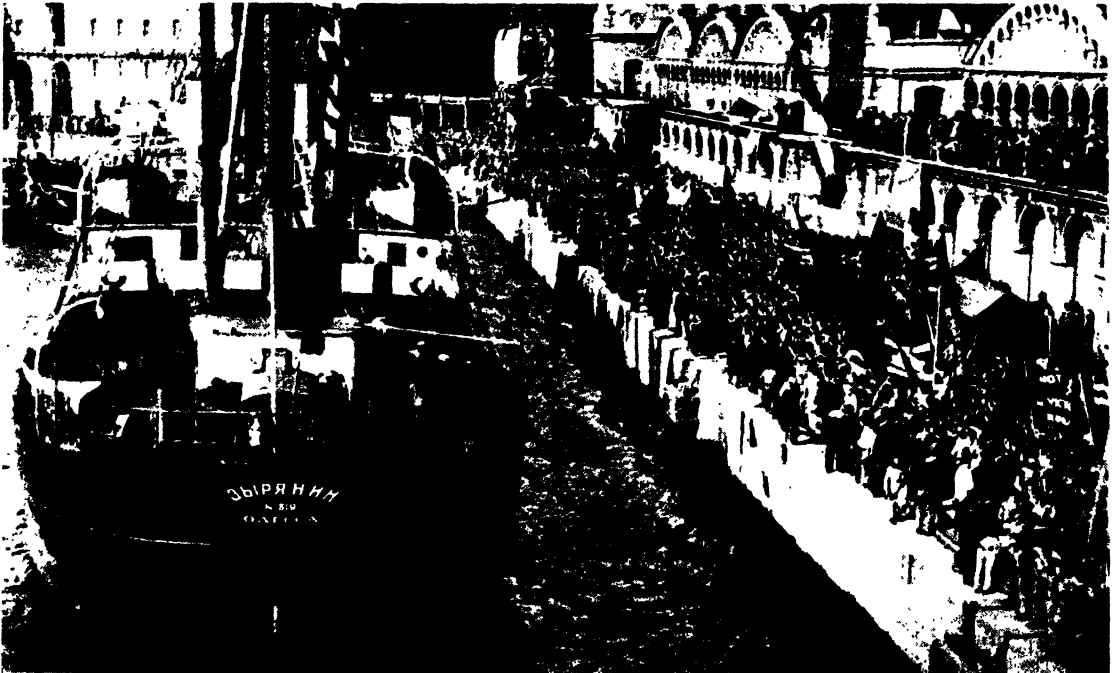
রাশিয়া হইতে স্পেন-সরকারের সাহায্যের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের আমদানি

বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ। সোডার বোতল ও প্রস্তরখণ্ডে রাজপথ সমাকীর্ণ।

লণ্ডনে ফাসিষ্ট ও তাহার বিরোধী দলে দাঙ্গা।

উপরে : প্যারিসে কম্যুনিষ্ট-ফাসিষ্ট সংঘর্ষ

নীচে : লণ্ডনে ফাসিষ্ট শোভাযাত্রার প্রতিবাদের ফলে কলহের দৃশ্য

বাংলা

বঙ্গের একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান

প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রায় ৩০।৩৫ লক্ষ টাকার ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম আমদানি হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত, এই সকল সরঞ্জাম এ দেশে প্রস্তুত হইবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি 'ট্রপিকো-সেন্সিটাইজিং কর্পোরেশন' কলিকাতায় পি৪৫২ রাসবিহারী এভিনিউতে এই সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়াছেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে দেশবাসীর সমর্থনযোগ্য। সম্প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কলিকাতা কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক প্রদর্শনীগৃহে ইঁহাদের প্রস্তুত ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় লাইব্রেরী সমিতি

গত ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গৃহে বঙ্গীয় লাইব্রেরী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় বঙ্গে পুস্তকাগারের প্রসার ও বৃদ্ধির আবশ্যকতার কথা আলোচনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজুল হক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, গ্রামের পুস্তকাগারের উপযোগী পুস্তক-নির্ব্বাচনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বড়োদা-রাজ্যে সকলেই বিনামূল্যে পুস্তকাগারের সদ্ব্যবহার করিতে পারে। কলিকাতায় এইরূপ

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক প্রদর্শনীগৃহে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু 'ট্রপিকো-সেন্সিটাইজিং কর্পোরেশন'-কর্ত্তৃক প্রস্তুত ফটোগ্রাফের সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করিতেছেন।

বঙ্গীয় লাইব্রেরী-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে এইরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেশ ও বিদেশে কৃতী বাঙালী

বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীঅরবিন্দ সিংহ পেন্ট, বার্ণিশ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনস্থ বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার রায় চন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ সিংহ

মহাশয়ের পৌত্র ডক্টর কুমারকৃষ্ণ মিত্র সম্প্রতি বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে তিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন ও ঐ সকল পরীক্ষায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল বৎসরের পরীক্ষার্থীদের অপেক্ষা অধিক নম্বর পান। '৯৩৩ সালে লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব টেক্নলজিতে যোগদান করেন ও তিন বৎসর গবেষণান্তে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

মধ্যপ্রদেশের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী দৈনিক পত্র 'নাগপুর মেল'-এর প্রবর্ত্তক শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অব টেক্নলজি হইতে মুদ্রণতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম-এসসি পরীক্ষায় জৈব রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

ডক্টর অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাধিকামোহন বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯৩৩ সালে বিদেশ যাত্রা করেন এবং শেফিল্ডে ও লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব টেক্নলজিতে ফুয়েল টেক্নলজি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অতঃপর তিনি জার্ম্মেণীতে হানোভার টেক্নিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ও ডিপ্লোমা লাভ করেন। ভারতবর্ষের কয়লা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীসুপ্রসন্ন সেন শ্রীগিরিজানাথ সেন

যুক্ত-প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বাহাদুর মহাশয় সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ডাকবিভাগের আন্তর্জাতিক মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষে মিশরে তিনি ভারতসরকারের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিয়াছিলেন। স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় তিনি এই উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছিলেন।

জার্ম্মেণীর ডয়টশে অ্যাকাডেমি হইতে আশুতোষ-মুখোপাধ্যায়-বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীসুপ্রসন্ন সেন এম-এসসি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ছাত্র। তিনি ভারতীয় আবহতত্ত্ববিভাগে এক জন প্রধান পর্য্যবেক্ষক ছিলেন।

ডাঃ গিরিজানাথ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত ১৯৩২ সালে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩৫ সালে উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ বিদেশ গমন করেন এবং এম্-আর-সি-পি ও এম্-আর-সি-এস্ উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি এফ-আর-সি-এস্ উপাধিও লাভ করিয়াছেন। ডাঃ সেন জয়পুর-প্রবাসী সংসারচন্দ্র সেন সি-আই-ই এম্-ভি-ও মহাশয়ের পৌত্র ও অবিনাশচন্দ্র সেন সি-আই-ই মহাশয়ের পুত্র।

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী

টাটা আয়রণ ও ষ্টীল ওয়ার্কসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ঘোষ-মহাশয় বহু ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিট্যুটের সদস্য ও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ (ইংরাজী ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ডিসেম্বর) রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইবে।

নিম্নলিখিত মনীষিগণ বিভিন্ন বিভাগের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন :— মূল ও সাহিত্য -- রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট। শিক্ষা-পাঠাগার ও সাংবাদিকী—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সম্পাদক। ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ ও নৃতত্ব—শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)। অর্থনীতি ও সমাজতত্ব--শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)।

সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু (বারাণসী)। মহিলা বিভাগ—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। বিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র (সায়ান্স কলেজ কলিকাতা)। দর্শন —ডাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত (পাটনা কলেজ) শিল্প—(নাম পরে বিজ্ঞাপিত হইবে)।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রবাসী এবং মাতৃভূমির বাঙালীগণের একটি মহামিলনের ক্ষেত্র। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বাঙালীর শুভাগমন প্রার্থনীয়। প্রত্যেককে পৃথক পত্র দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া অভ্যর্থনা সমিতি সংবাদপত্রের মারফৎ বাংলার ও বাংলার বাহিরের প্রত্যেক বাঙ্গালীকে রাঁচি অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছেন। সম্মেলনের প্রথানুসারে প্রতিনিধি-গণের চাঁদা পাঁচ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। ছাত্র-প্রতিনিধি-গণের চাঁদা তিন টাকা মাত্র। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি করিবেন। মহিলা প্রতি-নিধিগণকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না। প্রতিনিধিগণ বিছানা প্রভৃতি সঙ্গে আনিবেন। প্রতিনিধিগণের নাম ঠিকানা ও দেয় চাঁদা যত শীঘ্র সম্ভব সম্মেলনের কার্য্যালয়ে পাঠান প্রয়োজন।

সম্মেলনে পঠনীয় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং প্রবাসী বাঙালীগণের হিতকর প্রস্তাবাদি আগামী ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে সম্মেলনের কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য বহির্ভূত।

যথা সময়ে সংবাদ পাইলে প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনার জন্য রেল বা বাস ষ্টেসনে স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত থাকিবেন। প্রতিনিধিগণ যে ট্রেণে বা বাসে রাঁচি পৌঁছিবেন তাহা অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়ে জ্ঞাপন করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্মেলন সংক্রান্ত আর কিছু তথ্য জানিতে হইলে অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়ে পত্র লিখিতে হইবে। ইতি—

শ্রীকালীশরণ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী

শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিলাভ করিয়া ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। ম্যাঞ্চেষ্টার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ডক্টর কেনার, এফ-আর-এস-এর অধীনে ভারতীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ১৯৩৪ সালে পিএইচ-ডি উপাধিলাভ করেন। অতঃপর ১৯৩৫ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ডক্টর রবিন্সন, এফ-আর-এস-এর অধীনে ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষাসমাপনান্তে বেঙ্গল কেমিক্যালের বায়োকেমিক্যাল লেবরেটরীতে ভাইটামিন সম্বন্ধে গবেষণায় ব্রতী হন। তৎপর তিনি জার্ম্মানী গিয়া গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগে গবেষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেওঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশতবার্ষিকী উৎসব

গত ২৯শে অক্টোবর হইতে ৩রা নভেম্বর পর্য্যন্ত দেওঘরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে সপ্তশতী হোম, শোভাযাত্রা, ছাত্রগণের নানাবিধ ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদি প্রদর্শন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রম অভ্যুত্থান নামক ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎসবের শেষ দিনে প্রায় দুই হাজার দরিদ্রনারায়ণের অন্নাদির দ্বারা সেবা করিয়া উৎসবের কার্য্য সমাধা হয়।

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্ত্তিকের প্রবাসীতে "সংস্কৃত সাহিত্যের পাখী ও তাহার নামতালিকা" প্রবন্ধে ২০ পৃষ্ঠায় বামস্তম্ভের তৃতীয় লাইনে "প্রকৃতপক্ষে হলায়ুধে 'আটি' শব্দ পাওয়া যায় 'আটি' নহে" স্থলে "প্রকৃতপক্ষে হলায়ুধে 'আটি' শব্দ পাওয়া যায় 'আটি' নহে" হইবে।

গত কার্ত্তিকমাসের প্রবাসীর ১৭৮ পৃষ্ঠায় "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন: চতুর্দ্দশ অধিবেশন" শীর্ষক বিবরণীতে সঙ্গীত-বিভাগের সভাপতির নাম ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ নামটি শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু হইবে।

গত মাসে বোয়েনোস আইরাসে পি ই এন্ কংগ্রেসের বৃত্তান্ত প্রকাশ উপলক্ষ্যে উদ্ধৃত কয়েকটি বাক্যকে আমরা স্পেনিশ লিখিয়াছিলাম; অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন, তাহা পোর্টুগীজ। এই ভ্রম সংশোধনের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কুণাল ও কাঞ্চনা

শ্রীচিন্তামণি কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
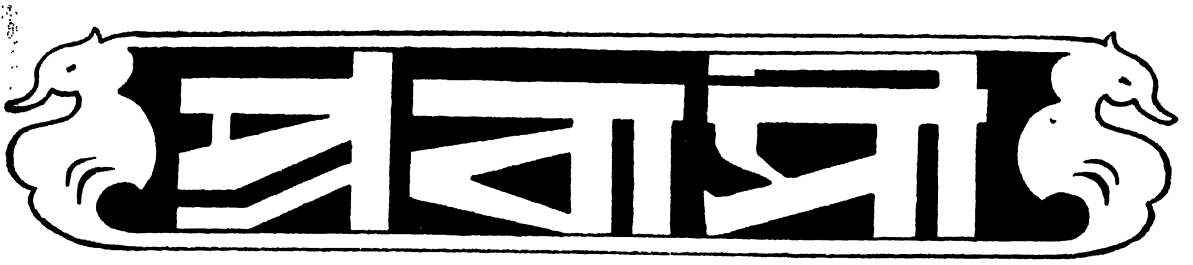
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৪৩

৩য় সংখ্যা

ভাইদ্বিতীয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকলের শেষ ভাই
সাত ভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল
দৈবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি সনে
করেছিল মন্ত্রণ
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদী
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
নাৎনীর rank-এ,
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদে thank-এ।

এল তিথি দ্বিতীয়া,
ভাই গেল জিতিয়া,
ধরিল পারুল-দিদি
হাতা বেড়ি খুন্তি,
নিরামিষে আমিষে
রেঁধে, গেল ঘামি' সে,
ঝুড়ি ভ'রে জমা হ'ল
ভোজ্য অগুন্তি।

বড়ো থালা কাংসের
মৎস্য ও মাংসের
কানায় কানায় বোঝা
হয়ে গেল পূর্ণ।
সুঘ্রাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল স্রোতে
লেগে গেল ঘূর্ণো।

জমে গেল জনতা,
মহা তার ঘনতা,
ভাই-ভাগ্যের সবে
হ'তে চায় অংশী।
নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয়
বহু ভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি'।

চোখ রেখে ঘণ্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, দিদি মোর,
কেহ বলে,—বোন গো,
দেশেতে না থাক্ যশ,
কলমে না থাক্ রস,

ভাইফোঁটা দ্বিতীয়া

রসনা তো রস: বোঝে
করিয়ো স্মরণ গো
দিদিটির হাস্য
করিল যা ভাষ্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ,
ভয় হ'ল মিথ্যে,
আশা হ'ল চিত্তে,
নির্ভাবনায় ব'সে
করিলাম ভক্ষণ।
লিখেছিনু কবিতা
সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি
এ কি মিছে বকুনি?
আজ তার মর্ম্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এ দেশেই টান ধরে
ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব,
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে,
যা রয়েছি তাই হয়ে,
সোরগোল পড়ে যাবে
হুলু আর শঙ্খে,

জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা
ধুতি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।

বোনটার ধ'রে চুল
টেনে তার দেব দুল,
খেলার পুতুল তা'র
পায়ে দেব দলিয়া।

শোক তা'র কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,
রাক্ষুসি ব'লে তা'র
কান দেবে মলিয়া।

বড়ো হ'লে, নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই
আঁখি হবে সিক্ত।

ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাৎ অতিরিক্ত॥

ভাইদ্বিতীয়া
১৩৪৩

বাংলা বানান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধ্বনিসঙ্গত বানান এক আছে সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়। আর কোন ভাষায় আছে কিম্বা ছিল কি না জানি নে। ইংরেজি ভাষায় যে নেই অনেক দুঃখে তার আমরা পরিচয় পেয়েছি। আজও তার এলেকায় ক্ষণে ক্ষণে কলম হুঁচট খেয়ে থমকে যায়। বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি। বানানের জোরেই বাংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চায়। এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান। আভিজাত্যের ভান ক'রে বানান আপন স্বধর্ম্ম লঙ্ঘনের চেষ্টা করাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটা পরম দুঃখকর হয়েছে। যে রাস্তা রেল-পাতা রাস্তা, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় যদি বুক ফুলিয়ে জেদ ক'রে বলি আমার গোরুর গাড়িটা রেলগাড়িই, তা হ'লে পথযাত্রাটা অচল না হ'তে পারে, কিন্তু সুবিধাজনক হয় না। শিশুদের পড়ানোয় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বাংলা পাঠশিক্ষার প্রবেশ-পথ কি রকম দুর্গম। এক যানের রাস্তায় আর-এক যানকে চালাবার দুশ্চেষ্টাবশত সেটা ঘটেছে। বাঙালী শিশুপালের দুঃখ নিবৃত্তি চিন্তায় অনেকবার কোনো ক জন বানান-সংস্কারক কেমাল পাশার অভ্যুদয় কামনা রেছি। দূরে যাবারই বা দরকার কি, সেকালের প্রাকৃত াষার কাত্যায়নকে পেলেও চ'লে যেত।

একদা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রাকৃতজনের বাংলা ভাষাকে বজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। সেই অবজ্ঞার অপমান :খ আজও দেশের লোকের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। দের সাহিত্যভাষার বানানে তার পরিচয় পাই। াংলা ভাষাকে যে হরিজন পংক্তিতে বসানো চলে না তার াণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা থষ্ট হয় নি। বর্ণপ্রলেপের যোগে সবর্ণত্ব প্রমাণ ক'রে । চেষ্টা ক্রমাগতই চলছে। ইংরেজ ও বাঙালী মূলত একই আর্যবংশোদ্ভব ব'লে যাঁরা যথেষ্ট সান্ত্বনা পান নি তাঁরা হ্যাটকোট প'রে যথাসম্ভব চাক্ষুষ বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন এমন উদাহরণ আমাদের দেশে দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যের বানানে সেই চাক্ষুষ ভেদ ঘোচাবার চেষ্টা যে প্রবল তার হাস্যকর দৃষ্টান্ত দেখা যায় সম্প্রতি কানপুর শব্দে মূর্দ্ধণ্য ণয়ের আরোপ থেকে। ভয় হচ্চে কখন কানাই-এর মাথায় মূর্দ্ধণ্য ণ সঙিনের খোঁচা মারে।

বাংলা ভাষা উচ্চারণকালে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ধ্বনির ভেদ ঘোচানো অসম্ভব কিন্তু লেখবার সময় অক্ষরের মধ্যে চোখের ভেদ ঘোচানো সহজ। অর্থাৎ লিখব এক পড়ব আর, বাল্যকাল থেকে দণ্ডপ্রয়োগের জোরে এই কৃচ্ছ্রসাধন সাহিত্যিক সমাজপতিরা অনায়াসেই চালাতে পেরেছেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত জানতেন এই সংবাদটা ঘোষণা করবার জন্যে তাঁদের চিঠিপত্র প্রভৃতিতে বাংলা শব্দে বানানের বিপর্যয় ঘটানো আবশ্যক বোধ করেন নি। কেবল ষত্ব ণত্ব নয় হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁরা মাতৃভাষার কৌলীন্য লক্ষণ সাবধানে বজায় রাখতেন না। আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবী ক'রে থাকি কৃত্রিম দলিলের জোরে। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-বিকার ঘটে নি এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্লভ। "জল" বা "ফল", "সৌন্দর্য্য" বা "অরুণ" যে তৎসম শব্দ সেটা কেবল অক্ষর সাজানো থেকেই চোখে ঠেকে, ওটা কিন্তু বাঙালীর হ্যাটকোটপরা সাহেবিয়ই সমতুল্য।

উচ্চারণের বৈষম্য সত্ত্বেও শব্দের পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা করা বানানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকে বলেন। আধুনিক ক্ষাত্রবংশীয়রা ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করেছে তবু দেহাবরণে ক্ষাত্রইতিহাস রক্ষার জন্যে বর্ম প'রে বেড়ানো তাদের কর্তব্য এ উপদেশ নিশ্চয়ই পালনীয় নয়। দেহাবরণে বর্তমান ইতিহাসকে উপেক্ষা ক'রে প্রাচীন ইতিহাসকেই বহন করতে চেষ্টা করার দ্বারা অনুপযোগিতাকে

সর্ব্বাঙ্গে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু এ সকল তর্ক সঙ্গত হোক অসঙ্গত হোক কোনো কাজে লাগবে না। কৃত্রিম বানান একবার চ'লে গেলে তার পরে আচারের দোহাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে। যাকে আমরা সাধুভাষা ব'লে থাকি সেই ভাষার বানান একেবারে পাকা হয়ে গেছে। কেবল দন্ত্য ন-য়ের স্থলে মূর্দ্ধণ্য ণ-য়ের প্রভাব একটা আকস্মিক ও আধুনিক সংক্রামকতারূপে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সেটারও মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন, এখন থেকে কর্ণওয়ালিসের কর্ণে মূর্দ্ধণ্য ণ-য়ের খোঁচা নিষিদ্ধ।

প্রাকৃত বাংলা আমাদের সাহিত্যে অল্প দিন হ'ল অধিকার বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। তার বানান এখনো আছে কাঁচা। এখনি ঠিক করবার সময়, এর বানান উচ্চারণ-ঘেঁসা হবে, অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান ঘেঁসা।

যেমনি হোক্, কোনো কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা একটা কোনো আদর্শ স্থির ক'রে দেওয়া দরকার। তার পরে বিনা বিতর্কে সেটাকে গ্রহণ ক'রে স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজ ক'রে দিয়েছেন--ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত ক'রে রাখা অনাবশ্যক।

বাংলা ক্রিয়াপদে য়-র যোগে স্বরবর্ণ প্রয়োগ প্রচলিত হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিসভা কোথাও বা য় রক্ষা করেছেন কোথাও বা করেন নি। সে স্থলে সর্ব্বত্রই য়-রক্ষার আমি পক্ষপাতী এই কথা আমি জানিয়েছিলেম। আমার মতে এক্ষেত্রে বানানভেদের প্রয়োজন নেই বলেছি বটে, কিন্তু বিদ্রোহ করতে চাই নে। যেটা স্থির হয়েছে সেটাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি তবু চিরাভ্যাসকে বর্জন করবার পূর্বে তার তরফের আবেদন জানাবার ঝোঁক সামলাতে পারি নি। এইবার কথাটাকে শেষ ক'রে দেব।

ই-কারের পরে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগম হয় তখন উভয়ে মিলে য় ধ্বনির উদ্ভব হয় এটা জানা কথা। সেই নিয়ম অনুসারে একদা খায়্যা পায়্যা প্রভৃতি বানান প্রচলিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই কেতাবী সাধু-বাংলায় হইয়া করিয়া প্রভৃতি বানানের উৎপত্তি। ওটা অনবধানবশত হয় নি এইটে আমার বক্তব্য।

হয় ক্রিয়াপদে হও বানান চলে নি। এখানে হয়-এর "য়" একটি লুপ্ত এ-কার বহন করছে। ব্যাকরণ বিধি অনুসারে হএ বানান চলতে পারত। চলে নি যে, তার কারণ বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে শব্দের শেষবর্ণ যদি স্বরবর্ণ হয় তবে দীর্ঘস্বর হ'লেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। হ্রস্ব এ এবং য়-র উচ্চারণে ভেদ নেই। এই অন্ত্য এ স্বরবর্ণের উচ্চারণকে যদি দীর্ঘ করতে হ'ত তাহ'লে য় যোগ করা অনিবার্য হ'ত। তাহ'লে লিখতে হ'ত হয়ে, হএ লিখে হয়ে উচ্চারণ চলে না।

তেমনি খাও শব্দের ও হ্রস্বস্বর, কিন্তু খেও শব্দের ও হ্রস্ব নয়—সেই জন্যে দীর্ঘ ওকারের আশ্রয় স্বরূপে য়-র প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এ তর্কও অবান্তর। আসল কথাটা এই যে ই-কারের পরবর্ত্তী স্বরবর্ণের যোগে য়-র উদ্ভব স্বরসন্ধির নিয়মানুযায়ী। বেআইন বেআড়া বেআক্কেল বানান সুসঙ্গত কারণ এ-কারের সঙ্গে অন্য স্বরবর্ণের মিলনে ঘটক দরকার করে না। বানান অনুসারে খেও এবং খেয়ো উচ্চারণের ভেদ নেই এ কথা মানা শক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার খেয়ো (খাইয়ো) শব্দের মাঝখানে একটা লুপ্ত ই-কার আছে। কিন্তু উচ্চারণে তার প্রভাব লুপ্ত হয় নি। লুপ্ত ই-কার অন্যত্রও উচ্চারণ-মহলে আপন প্রভাব রক্ষা ক'রে থাকে সে কথার আলোচনা আমার বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে পূর্বেই করেছি।

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরানো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে এখানে কি? চল চল, জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভাল জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্ত্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়।

গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন।

বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মশায় বাড়ী আছেন?

ভিতর হইতে খানিক ক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তার পর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিক ক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে। আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তপোষের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশী হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ত্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নীচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড় ও উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশী। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এমন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরণের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে

ত হয় না; আপনার হ'ল কেমন ক'রে, এরকম ত দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিন মনে ছিল এই জন্য যে আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্ত্তার কোন অবকাশ নাই।

তার পর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্ত্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্তবড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্ত্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন আগে কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মনিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক সাধারণ হাত-দেখা গণকের মত মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার সেখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছু দিন তন্ত্রসাধনা করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে সুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ীর ভীড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে সুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সা দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল, ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ ত সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ত্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারী প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মত গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য করে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিৎ হয়ে একমনে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই

চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নীচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভাল ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা ত যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তাহা ত কোন দিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—চল বেলেঘাটাতে এক জন বড় সাধু এসেছেন। দেখা করে আসি। খুব ভাল তান্ত্রিক শুনেছি। তারানাথের স্বভাবই ভাল সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম তিনি আমাকে যে কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর ত বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ লোকটা নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও ত অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে এক জন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও ত একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর গোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজম্, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর তত ক্ষণ কার্য্যকরী হইতে পারে, যত ক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও ত আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য্য হয়ে পড়লে, তবুও ত সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্র এক ধরণের যাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক্ ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও জিনিষের চর্চ্চা যে না করেছি তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। এক জনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরণের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরণের তন্ত্রচর্চ্চার শক্তি, ব্ল্যাক্ ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নাম-করা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভাল করে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস

দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবিলাম—চন্দ্রদর্শনের মত নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম কি ধরণের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মত। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ীর পিছনে পেয়ারাতলায় বসে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল। নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা আমার কপালের মাঝখানের ঠিক সামনে, খুব স্থির, মিনিট খানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে এক দিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

এক দিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু ত কতই দেখি। চুপ করে আছি, সাধুবাবাজী জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ী কোথায়?

আমি বললাম—বাঁকুড়া জেলায়, মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তার পর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তার পর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান? আমাদের গ্রামে সান্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ীঘর, দরজায় হাতী বাঁধা থাকতে শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্যালের নাম ত কখন শুনি নি। সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু। তুমি জানবে কি করে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে ত?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্ কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবে পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্যালদেরই কোন্ পূর্ব্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা জানেন অনেক দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ-পিতামহের মুখে দেখা যায় তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না। তার পর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস কেন? ধর্ম্মকর্ম্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ী ফিরে যা, সংসারধর্ম্ম করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস নি, ছাড়তে পারবিও নি। তুই ছেলেমানুষ, নির্ব্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয় নি। যা বাড়ী যা। মা বাপের মনে কষ্ট দিস নে।

কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্?

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন

লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি একটা শক্তি আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্ন্যালদের বাড়ীর ছেলেছোকরার দল ত কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক সরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব সখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড়ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি [illegible]্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। [illegible]তঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে [illegible]ায়া জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত [illegible]। বড় বড় কিস্তী চলতো। কোন্ নৌকা একবার ওই [illegible]রের নীচের ঘাটে মারা পড়ে বলে ওর নাম লা-ভাঙার [illegible]ঘাট।

প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল ত, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হল? বইটই লিখছ না কি?

ওদের কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি সন্ন্যাসী নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরুই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারের শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার ওপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি—

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জ্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্ত্তি দেখে, কি জানি মারবে টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পর দিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তার পর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখ, আমায় যেন বলছে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্নটপ্ন সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমূর্ত্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই ত আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিল খিল করে হেসে উঠ্ল। বললে—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে আমি বুঝলাম তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মত—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যেন উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে এসে বিরক্ত করিস বল ত? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার। বল্ কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্যে বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি সাধুসন্ন্যাসীরা যা চাওয়া যায় এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য্য বলে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্ত্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা ক্ষীরের বরফি—

আমি ত অবাক্। ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মত খিল্ খিল্ ক'রে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ ত দেখছি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েচে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে-খেলি রাবড়ি মর্ত্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছ শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষরাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার বিছানায় শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস নে। আসিস আজ, রাগ করে না ছিঃ—

এখনও পর্য্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্ত্তি ভারী প্রসন্ন। বললে—আবার এসেছিস দেখছি। আচ্ছা নাছোড়-বান্দা ত তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে?

দিনে অপমান ক'রে বিদেয় করে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল। গলা টিপে মেরে ফেল। তার পর আমার মৃতদেহের ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম বলে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ করে বিকট চীৎকার করে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চালভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্য্যন্ত এম্‌নি মড়ার ওপর বসে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা ত মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন। একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত করে ভেঙিয়ে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে। ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এপথে এসেছিস কেন রে ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর পরে হৌসে চাক্‌রি কর্‌ গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা ত ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এত দিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে ওকে বিদুষী বলে সন্দেহ হয়।

সেই দিন থেকে কিন্তু পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগাল দিয়েছি কিছু মনে করিস নে। ভালই হয়েছে তুই সাধনা করতে চাস নি। ও সব নিম্ন তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশী। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ মরে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভাল-মন্দ দুই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মত পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও বলে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরণের কথা।

—এক ধরণের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মত মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশী। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশী হয় ব'লে যাদের বেশী দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভাল, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস নে তাই রাগ করিস।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম —তুমি তাহলে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্ব্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশী ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেঁসে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আর আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বললে বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যার পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বট-তলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটী ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই ত! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই ত! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে। সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢলে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভাল ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস ব'স।

বললাম—তুমি ও-রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না। তোমায় যখন মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই

তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগগির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। তত দিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা বলে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? বসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছলাম না কোন কালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে বসে ধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হলাম াগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই রব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। ার সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম াগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে— কটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের ধ্য অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো ামগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের । বেধে আছে। কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। লের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে খে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি আমার জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে নও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। মাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা ন তুলে ফেলি।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর বসে তোকে সাধনা করতে —ভয় পাবি নে ত? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে চীৎকার করে উঠলাম। র মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই লী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন ৎ নেই।

পাগলী বললে — চেঁচিয়ে মরছিস কেন, ও আপদ? আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে, । পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের ক ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে সন্ধ্যা থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যার পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জ্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিকবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক ত কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একা টাটকা মড়ার ওপর বসে সে শেয়ালের ডাকে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নীচে নদীজল থেকে দলে দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভাল করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চার পাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখী, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মত।

এক মুহূর্ত্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি! পাখী!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষও হয় নি।—পরক্ষণেই আমার চার পাশে মেয়ে-গলায় কারা খল্ খল্ হেসে উঠল।

হাসির শব্দ আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখী নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই এক যোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারিদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে চাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে নিকটে, ডাইনে বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পিছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ-শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেবো ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের ত শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি...বললাম—আমার মহা সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন · আমার জীবন ধন্য হ'ল... মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি ত জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন বলে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। আমি যখন দেখা দিয়েছি, তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা...তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর করে বললাম—সাধনা করে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।...যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস্ করছ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোন নি তন্ত্রে? পাষণ্ডদলনের জন্যে ওই পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম তবে আমি কি খুবই পাবও?

বালিকা খিল খিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে... অত ভয় কিসের! আমি না তোকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি? তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম বলে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এই সময় যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্ব্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাৎ নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস কি?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখে প্রকাশ ক'রেই বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও না কি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেঁড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য সুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন ঝাঁড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মত, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্ত্তি নারী উন্মাদিনীর মত আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারি পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মত রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল, তার নীচে চিল শকুনি উড়েছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের ডাক ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকী সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মত দুই চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত সে কি ভীষণ ক্রূর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সেই শবটা চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন করে মেরে ফেলেছে বলে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি! এই শ্মশানে ৫৬ বছর··· কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী বসে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে···সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিম্ ঝিম্ করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুমি ষোড়শীকে চেন না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা। তুই তার জানিস কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্ত্তি পিশাচীর মত চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না, তার পরেই মনে পড়ল পাগলীর কথাও কি একটা তাঁর সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভাল। শেষকালে যে বিকটমূর্ত্তি মেয়ে দেখেছিস তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তার পরে সে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে বসে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায় এখন যে সারারাত সাধনা করে আসন ছেড়ে এলি? এই ত সবে সন্ধে—!

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ভাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক,—সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মত বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিষ নেই, তোর কর্ম্ম নয় তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোন দিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম—একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি ত অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাভামরী, ত্রিপুরা এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্মশক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্ব্বজন্মও এমনি কেটেছে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব বকে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশী দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ ৪০ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোন দিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না সে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝব? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস, চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকী। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

বর্ষারাত্রির অন্ধকারে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বর্ষারাত্রির সঘন ঝিল্লীরণিত অন্ধকারে
অনেক দিন আগেকার পুরনো কথা মনে পড়ে।
মনে পড়ে—একটি তন্দ্রাজড়িত নিবিড় মিলন-প্রতীক্ষা—
বাইরের সীমাহীন নির্জ্জনতায় দুটি প্রাণীর
দুর্ল্লভ মনোবিনিময়ের অবসর।
আজ বর্ষারাত্রির সব কিছুকে ছাপিয়ে
সেই সুন্দর মুহূর্ত্তগুলি
অনেক দিনের ওপার থেকে মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।
মনে হয়, যা হারিয়ে যায়
তাকে পাওয়ার মত আনন্দ আর কি?
জীবনের সান্দ্র বিরহনিশার মধ্যে
এই চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি
একটি সার্থক মিলন-অনুভূতি ঘনিয়ে আনে।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

১৮১৭ সালের প্রথম ভাগে (২৭শে জানুয়ারী) রামমোহন রায় সপরিবারে লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথ-পুরের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পাঁচ মাস পরে, জুন মাসের ২৩শে তারিখে, তাঁহার ভাইপো গোবিন্দ-প্রসাদ রায় স্বয়ং বাদী হইয়া এবং খুড়া রামমোহন রায়কে প্রতিবাদী করিয়া সুপ্রিম কোর্টের একুইটী বিভাগে পাঁচ লক্ষ টাকার তায়দাদে একটি মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। বাদী গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে আর্জ্জি (Bill of Complaint) দাখিল করিয়াছিলেন কৌন্সিল (ব্যারিষ্টার) ফার্গুসন্ সাহেব (R. Cutlar Fergusson) এবং তাঁহার সহকারী ছিলেন এটর্ণি স্কট (Wm. Scott) সাহেব। গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির মর্ম্ম এই—

লাঙ্গুড়পাড়া নিবাসী মৃত রামকান্তরায়ের তিন স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা স্ত্রী, অনেক দিন হয় পরলোকগতা সুভদ্রা দেবী, নিঃসন্তানা ছিলেন। মধ্যমা স্ত্রী তারিণী দেবীর দুই পুত্র ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাদীর পিতা মৃত জগমোহন রায়, এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদী রামমোহন রায়। রামকান্ত রায়ের কনিষ্ঠা স্ত্রী রামমণি দেবীর একমাত্র পুত্র, এবং রামকান্ত রায়ের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, রামলোচন রায়। বাংলা ১২০৩ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণে (খ্রীষ্টীয় ১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বরে) সম্পাদিত বাংলা ভাষায় লিখিত একখানি দলীলের দ্বারা রামকান্ত রায় তাঁহার কতক স্থাবর সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাঁটোয়ারা অনুসারে জগমোহন, রামমোহন এবং রামলোচন নিজ নিজ হিস্বা দখল করিয়াছিলেন। রামকান্ত রায় কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচন রায়কে রাধানগরের পৈত্রিক বাড়ীর নিজ অংশ দান করিয়াছিলেন, এবং জগমোহন ও রামমোহনকে লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী দান করিয়াছিলেন। বাঁটোয়ারার পর রামলোচন রায় পৃথক হইয়া গিয়া রাধানগরের বাড়ীর নিজ অংশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঁটোয়ারার অব্যবহিত বা অল্পকাল পরেই (immediately or shortly after) রামকান্ত রায়, এবং তাহার অপর দুই পুত্র, জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায়, পুনরায় একত্রিত হইয়াছিলেন (re-united), হিন্দু পরিবারের মত একত্রবাস করিয়াছিলেন (lived together as an Hindoo family), এবং বাংলা ১২১০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে (খ্রীষ্টীয় ১৮০৩ সালের মে-জুন মাসে) রামকান্ত রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে, আহার সম্বন্ধে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে একত্র এবং অবিভক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাংলা ১২১৮ সনের চৈত্র মাসে (খ্রীষ্টীয় ১৮১২ সালের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে) জগমোহন রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় অবিভক্ত একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের মত একত্র বাস করিয়াছিলেন। বাঁটোয়োরার পর রামকান্ত রায় নিজের এবং জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই তিন জনের এজমালি তহবিলের টাকা দিয়া বিনামায় গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর নামক দুইখানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। খরিদের সময় হইতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই দুই খানি তালুক রামকান্ত রায়, জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই তিন জনের এজমালি সম্পত্তি (joint property) ছিল। রামলোচন রায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের সহিত পুনরায় মিলিত না-হওয়ায় এজমালি সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকারী ছিলেন না।* রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় একযোগে রামকান্ত রায়ের স্থাবর অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির সহিত তৎকালে রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামীকৃত গোবিন্দপুর

* রামলোচন রায় ১২১৬ সনের পৌষ মাসে (১৮০৯ সনের ডিসেম্বর অথবা ১৮১০ সালের জানুয়ারী মাসে) পরলোকগমন করিয়াছিলেন। রামলোচন রায়ের একমাত্র পুত্র হরগোবিন্দ রায় ১২২০ সনের ভাদ্র মাসে (১৮১৩ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে) পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

এবং রামেশ্বরপুর তালুকের তাঁহার অংশেরও মালিক হইয়াছিলেন। সদর জমা বাদে এই দুই তালুকের বার্ষিক মুনাফা ছিল প্রায় ১৫০০০৲ টাকা। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরে জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই দুইখানি তালুক ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বিনামায় কালেক্টরীতে নামজারি করাইয়াছিলেন। রামকান্ত রায় জীবদ্দশায় এজমালি তহবিল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর রামমোহন রায় এইরূপ অনেক খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাননীয় এণ্ড্রু রামজে (Andrew Ramsay) সাহেবের নিকট হইতে আসল ১১০০০৲ এবং সুদ এবং টমাস উডফোর্ড (Thomas Woodforde) সাহেবের নিকট হইতে আসল ৬০০০৲ এবং সুদ আদায় করিয়াছিলেন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এজমালি তহবিলের টাকা হইতে নিম্নলিখিত পত্তনী তালুকগুলি খরিদ করিয়াছিলেন—

(ক) বর্দ্ধমান জেলার জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর তালুক। রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ। মূল্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

(খ) উক্ত জেলার এবং উক্ত পরগণার অন্তর্গত বীরলোক তালুক। রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ। মূল্য প্রায় ষাট্ হাজার টাকা।

(গ) উক্ত জেলার বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত লাঙ্গুড়পাড়া তালুক। রামলোচন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ।

(ঘ) উক্ত জেলার ভুরস্থট পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর তালুক। মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

এজমালি তহবিলের টাকা হইতে জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় জাহানাবাদ পরগণার রঘুনাথপুর মৌজার অন্তর্গত এজমালি প্রায় ষোল বিঘা জমীর উপর বাগান এবং বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই বাগান বাড়ীর মূল্য প্রায় নয় হাজার টাকা।

জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় জাহানাবাদ পরগণার কৃষ্ণনগর মৌজার মধ্যে প্রায় তিন শত বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমী খরিদ করিয়াছিলেন। মূল্য প্রায় ছয় হাজার টাকা।

জগমোহন রায়ের জীবদ্দশায় জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় উভয়ে একত্র এই সকল সম্পত্তির ভোগ-দখলকার ছিলেন। এই সকল সম্পত্তির মুনাফার টাকার দ্বারা উভয়ে এজমালি সম্পত্তি অনেক বাড়াইয়াছিলেন। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর সময় এজমালি সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছিল পাঁচ লক্ষ টাকা বা ততোধিক। তন্মধ্যে নগদ আশি হাজার টাকা ছিল। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, দুই ভাইয়ের স্থাবর অস্থাবর এজমালি সকল সম্পত্তির নিজের এবং তৎকালে প্রায় পনর বৎসর বয়স্ক বাদী গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষ হইতে রামমোহন রায় দখলকার ছিলেন। এই সকল সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র এবং জমাখরচাদি তখন রামমোহন রায়ের হস্তগত হইয়াছিল। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্প কাল পরে রামমোহন রায় এজমালি তহবিলের টাকার দ্বারা বিশ হাজার টাকা বা এইরূপ মূল্যে কলিকাতার অন্তর্গত চৌরঙ্গীতে এক-খানি দোতলা বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন, এবং তের হাজার টাকা বা এইরূপ মূল্যে কলিকাতার অন্তর্গত সিমলায় একখানি দোতালা বাগান-বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাংলা ১২২৩ সনের ১৬ই মাঘ পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টীয় ১৮১৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত) বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের সহিত লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে অভিন্ন হিন্দু পরিবারের মত (as an undivided Hindoo family) বাস করিয়াছেন। এই সময়ে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে বাদী আবিষ্কার করিয়াছেন যে রামমোহন রায় বাদীকে এজমালি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা নিজ নামে কবালা করাইয়া লইয়া বর্দ্ধমান জেলার কালেক্টরীতে নিজ নাম জারি করিয়াছেন। বাদী এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিবার পরে প্রতিবাদী রামমোহন রায়কে স্থাবর সম্পত্তির বাদীর প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া দিতে এবং অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব করিয়া বাদীর প্রাপ্য অংশ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় বাদীর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সুতরাং বাদী এক্ষুইটী আদালতের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, আদালত এজমালি স্থাবর সম্পত্তির বাঁটোয়ারা সম্পাদন করিয়া বাদীকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন; অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করিয়া বাদী-প্রতিবাদীর দেনাপাওনা মিটাইয়া দিন; এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সকল দলীল-দস্তাবেজ আনাইয়া আদালতে গচ্ছিত রাখুন।

বাদীর আর্জ্জি দাখিল হওয়ার তিন মাস পরে, ১৮১৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর, রামমোহন রায় তাঁহার জবাব দাখিল করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের পক্ষে এটর্ণি ছিলেন বেঞ্জামিন টার্ণার (B. Turner) এবং ব্যারিষ্টার ছিলেন কম্পটন (H. Compton) সাহেব।* ১৮১৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী বাদীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর জবানবন্দীর জন্য প্রশ্নমালা দাখিল করা হইয়াছিল, এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাদীর দুইজন সাক্ষী, বেচারাম সেন এবং কৃষ্ণমোহন ধারার নামে সপিনা (subpoena) বাহির হইয়াছিল। বাদীপক্ষের এই দুইজন সাক্ষী ১৮১৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কোর্টে হাজির হইয়া হলপ করিয়াছিল (sworn)। তার পর ৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে বেচারাম সেন এবং কৃষ্ণমোহন ধারাকে জেরা করিবার জন্য প্রশ্নমালা দাখিল করা হইয়াছিল। ২৬শে এবং ২৮শে মার্চ্চ বেচারাম সেনের মূল জবানবন্দী হইয়াছিল এবং ৯ই এপ্রিল জেরা হইয়াছিল। বেচারাম সেন বাদী গোবিন্দ-প্রসাদের পক্ষে প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী। সুতরাং তাহার জবানবন্দী কতকটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা অবশ্যক। জবানবন্দীর সময় বেচারাম সেনের বয়স ছিল প্রায় ৫০ বৎসর। সে আদৌ রাজীবলোচন রায়ের দপ্তরের মোহরের চাকরি করিত এবং রাজীবলোচন রায়ের কর্ম্মচারিগণের এবং লোকজনের সঙ্গে লাঙুড়পাড়ায় রামকান্ত রায়ের বাড়ীতে বাস করিত। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পর হইতেই সাক্ষী ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছিল। মূল জবানবন্দীতে বেচারাম সেন নিজের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলে নাই। জেরায় তাহাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—

তুমি বাদীর (গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের) কি প্রকার কাজ বা চাকরি কর এবং তজ্জন্য কি পারিতোষিক পাও ?

এই মোকদ্দমার সমর্থনে কাগজপত্র এবং সাক্ষী জোগাড় করিবার জন্য বাদী কি তোমাকে বর্দ্ধমানে পাঠায় নাই, অথবা তুমি কি বাদীর সঙ্গে বর্দ্ধমানে যাও নাই ?

তুমি কি বাদীর সঙ্গে পুনঃ পুনঃ তাহার সলিসিটরের আফিসে এবং কুমার* সিংহ চৌধুরীর বাড়ীতে যাও নাই ?

তুমি কি কুমার সিংহ চৌধুরীর নিকট হইতে বাদীর দাবীর সমর্থনে কাগজপত্র সংগ্রহ কর নাই ?

তুমি কি বাদী এবং কৃষ্ণমোহন ধারার সঙ্গে সর্ব্বদা সাক্ষী এবং প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়াও না ?

কুমারসিংহ চৌধুরী কি কলিকাতার একজন বদমায়েস নহে ? মোকদ্দমার দালাল এবং সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমার পরিচালক বলিয়া কি তাহার বদনাম নাই ? এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তুমি কি তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহ নাই ?

তুমি কত বৎসর মাসিক কত বেতনে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের মোহরের কার্য্য করিয়াছ ?

১২২৩ সালের চৈত্র মাসে (১৮১৭ সালের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে) তুমি কি কোন অপরাধের জন্য এই চাকরি হইতে বরখাস্ত হও নাই ? কি কারণে তুমি প্রতিবাদীর চাকরি ছাড়িয়াছিলে ?

প্রতিবাদীর চাকরি ত্যাগের অনতিকাল পরেই কি তুমি বাদীর চাকরি গ্রহণ কর নাই, এবং এই মোকদ্দমা পরিচালনে সহায়তা করিবার কোন প্রস্তাব কর নাই ? কেবল এই মোকদ্দমা পরিচালনের জন্যই কি তোমাকে চাকরিতে রাখা হয় নাই ?

তুমি যখন প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের চাকরি গ্রহণ কর, তখন কি সদ্ভাবে কাজকর্ম্ম করিবে এইরূপ অঙ্গীকার

---

* মোকদ্দমার নথীতে রামমোহন রায়ের মূল জবাব পাওয়া যায় না। জজদিগের ডিক্রীতে এই জবাবের সারাংশ নিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ বাদীর সাক্ষী প্রমাণ আলোচনা করিয়া পরে বিবাদীর জবাব ও সাক্ষী প্রমাণের কথা উত্থাপন করিব।

*রামমোহন রায়ের জেরার প্রশ্নে এই ব্যক্তির নাম বানান করা হইয়াছে Umer Sing এবং বেচারাম সেনের জেরা সাক্ষ্যে বানান আছে Comar Sing।

করিয়া প্রতিবাদীর বরাবরে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দাও নাই? সেই কবুলিয়ৎখানি এখন কোথায় আছে?

জেরার উত্তরে বেচারাম সেন বলিয়াছে, সে ৫৲ মাসিক বেতনে ১২১৫ সন হইতে ১২২৩ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত (১৮১৭ সালের ১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত) রামমোহন রায়ের দপ্তরে মোহরেরগিরি করিয়াছে। জাতি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বাদী গোবিন্দপ্রসাদের সহিত প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের যে মতভেদ অর্থাৎ দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সে বাদীর পক্ষ সমর্থন করায় ১২২৪ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। চাকরি লইবার সময় সদ্ভাবে কাজ করিতে অঙ্গীকার করিয়া সে প্রতিবাদীকে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছিল। রামমোহন রায় বেচারাম সেনের এই কবুলিয়ৎ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করিয়াছিলেন, এবং মোকদ্দমার নথীর মধ্যে এখনও তাহা আছে। এই কবুলিয়তের পাঠ যতদূর উদ্ধার করিতে পারিয়াছি সেকালের দলীলের নমুনাস্বরূপ তাহা এখানে উদ্ধৃত করিব—

"মহামহিম শ্রীযুত রামমোহনরায় মহাশয়
বরাবরেষু

(স্বা) শ্রীবেচারাম সেন
সাং কৃষ্ণনগর
পং জাহানাবাদ

লিখিতং শ্রীবেচারাম সেন

কস্য কবুলাতি পত্রমিদং সন ১২২১ সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে জাহানাবাদ তরফ কৃষ্ণনগর ও গয়রহ মহাশয়ের পত্তনি তালুক ও নিজ···তরফ মজকুরের ডিহির মুহুরের গিরি কার্য্য আমাকে মোকরর করিলেন···খুসীতে মোকরর হইলাম ডিহি মোকামবর উক্ত হাজের থাকীয়া সকল কার্য্যের আনজাম (আঞ্জাম) দিব মহাশয় ডিহির কাগজপত্র জখন জাহা তলব করিবেন তৎখনাত মহাশয় বরাবর দাখিল করিয়া দিব বে আইন কোন কার্য্য করিব না জদি বে আইনী কোন কার্য্য করি তাহাতে কেহ আদালতে আমার নামে নালিষ করে তাহার জবাব দেহি আমার জির্ম্মা (জিম্মা) এবং আদালতের খরচ পত্র যাহা হইবেক তাহা আমি নিজ আদায়ে দিব সরকারের সহিত এলাখা নাই মহাশয়ের হুকুম শেত্তায় কোন কার্য্য করি সে মনঞ্জর (মঞ্জুর) নহে মাহে আনা মাফেক বরার্দ্দ পাইব আমার চাকরির মাল জামেন রাধানগর সাকিনের শ্রীমথুরমোহন বসো কে দিব এতদার্থে আপনা খুসীতে চাকরি কবুল করিয়া কবুলাতি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২১ বার শও একুইষ সাল তা ১০ পৌষ

ইসাদি

শ্রীরামহরি মিত্র — সাং রাধানগর
শ্রীছনিরাম মিত্র — সাং রাধানগর
শ্রীমদনমোহন বশো — সাং রাধানগর, পং জাহানাবাদ

বেচারাম সেন যে জেরার উত্তরে বলিয়াছে ১২১৫ সনে সে রামমোহন রায়ের দপ্তরের মোহরের নিযুক্ত হইয়াছিল এই কথা ভুল। কবুলিয়তে দেখা যায় তাহার এই পদে নিয়োগের প্রকৃত তারিখ ১২২১ সনের ১০ পৌষ (১৮১৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর)।* চাকরি হইতে বরখাস্তের তারিখ সম্বন্ধে বেচারাম সেনের উক্তির মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে। সে একবার বলিয়াছে, ১২২৩ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সে চাকরি করিয়াছে, এবং আবার বলিয়াছে, ১২২৪ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ সে পদচ্যুত হইয়াছিল। জেরার প্রশ্নমালায় বেচারাম সেনের বরখাস্তের তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১২২৩ সনের চৈত্র (১৮১৭ সালের মার্চ্চ-এপ্রিল)। এই তারিখই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামমোহন রায়ের পরিবার লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ছাড়িয়া রঘুনাথপুরের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিল ১৮১৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী। তার পরই সম্ভবতঃ মাতা-পুত্রের বিবাদ ঘনীভূত হইয়াছিল, এবং দলাদলি আরম্ভ হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের পরিবার লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী থাকিতে দলাদলির অবকাশ ছিল না। সুতরাং ১৮১৭ সালের জানুয়ারী মাসের পরে দলাদলির এবং বেচারাম সেনের বরখাস্তের সম্ভাবনা। মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ দলাদলি আরম্ভ হইয়াছিল এবং বেচারাম সেনের চাকরি গিয়াছিল।

চাকরি যাওয়ার চার-পাঁচ দিন পরেই বেচারাম গোবিন্দ

*বেচারাম সেন বোধ হয় রামমোহন রায়ের চাকরি লইবার পূর্ব্বে রাজীবলোচন রায়ের চাকুরি করিত।

প্রসাদের চাকরি লইয়াছিল। জেরার উত্তরে বেচারাম সেন বলিয়াছে, চাকরি লইয়া সে গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে মোকদ্দমা চালাইবার সহায়তা করিবার প্রস্তাব করে নাই, এবং এখনও তাহাকে কেবল মোকদ্দমা চালাইবার জন্য চাকরিতে রাখা হয় নাই। গোবিন্দপ্রসাদ রায় তাহাকে সংবাদ বহন, জিনিষপত্র খরিদ, খাজানা আদায় প্রভৃতি নানা প্রকার সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করে। সে কলিকাতায় বাদী গোবিন্দপ্রসাদের বাসায় থাকে এবং তাহার সঙ্গে বর্দ্ধমানে গিয়াছে। এই মোকদ্দমার কাগজপত্র এবং প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বেচারাম সেন বর্দ্ধমানে গিয়াছিল, এবং বাদীর সহিত সে পুনঃপুনঃ সলিসিটরের অফিসে যায়। সে বাদীর সহিত কখনও কুমারসিংহ চৌধুরীর বাড়ী যায় নাই, এবং কুমারসিংহ চৌধুরীর নিকট হইতে বাদীর দাবীর সমর্থনের জন্য কোন কাগজপত্রও সে পায় নাই। কুমারসিংহ চৌধুরী তাহার স্বজাতীয় বলিয়া সাক্ষী (বেচারাম সেন) তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, কিন্তু কোন বিশেষ কাজে তাহার নিকট যায় না। সে শুনিয়াছে কুমারসিংহ চৌধুরী দুষ্ট লোক, এবং সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করার জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছে। বাদীর এবং কৃষ্ণমোহন ধারার সঙ্গে সে কখনও টাকা দিয়া সাক্ষী প্রমাণ জোগাড় করিতে যায় নাই।

বেচারাম সেনের জেরার প্রশ্ন ও উত্তর হইতে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আনীত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই মোকদ্দমার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিল কুমারসিংহ চৌধুরী নামক একজন দাগী মোকদ্দমার দালাল এবং মোকদ্দমার প্রধান তদ্বিরকারক ছিল কৃষ্ণমোহন ধারা। গোবিন্দপ্রসাদ কৃষ্ণমোহন ধারাকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন যে সাক্ষী দিতে হাজির হইয়া হলপ করিয়াছিল এই কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জেরার প্রশ্নে দেখা যায়, কৃষ্ণমোহন ধারা আদৌ জগমোহন রায়ের, এবং পরে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের, সরকারের এবং খিদ্‌মদ্‌গারের কাজ করিত।

মূল জবানবন্দীতে বাদীর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বেচারাম সেন বলিয়াছে, "সে জানে, বাঁটোয়ারার পর রামকান্ত রায় তাঁহার তিন পুত্র হইতে পৃথক এবং বিভক্ত ছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরাবরই পৃথক্ এবং বিভক্ত ছিলেন। ...সাক্ষী বলে বাঁটোয়ারার বৎসর অর্থাৎ ১২০৩ সন হইতে ১২২৩ সন পর্য্যন্ত প্রতিবাদী রামমোহন রায় এবং জগমোহন রায়, এবং জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রতিবাদী এবং বাদী গোবিন্দ প্রসাদ রায় আহার সম্বন্ধে অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সম্পত্তি বরাবরই পৃথক ছিল। বর্ত্তমানে সাক্ষী (বেচারাম সেন) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার খাতাপত্র দেখিয়া এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াছে।"

বেচারাম সেনের এই উক্তিতে বাদী গোবিন্দপ্রসাদের দাবীর মূল উৎপাটিত হইয়াছে। আর্জ্জিতে বাদী পিতৃস্বত্বে উত্তরাধিকারীসূত্রে যে সকল তালুকের অর্দ্ধাংশ দাবী করিয়াছেন, বেচারাম সেন মূল জবানবন্দীতে বলিয়াছে, সে যতদূর জানে, সেই সকল তালুক রামমোহন রায়ের নিজের টাকায় খরিদ করা হইয়াছিল এবং তাঁহার নিজেরই দখলে আছে। জগমোহন রায়ের সম্পত্তি যে বরাবরই পৃথক, তিনি যে পৃথক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন, পৃথক কারবার করিয়াছেন, তাঁহার লেনা-দেনা যে বরাবর পৃথক ছিল বেচারাম সেন এই সকল কথাও তাহার জবানবন্দীতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে।

এখানে দেখা যাইবে, বেচারাম সেনের জবানবন্দী বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জ্জির বিরোধী এবং প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের অনুকূল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন, রামমোহন রায় অথবা তাঁহার পরম হিতৈষী রাজীবলোচন রায় বেচারাম সেনকে হাত করিয়াছিল বলিয়া সে এইরূপ বিপরীত কথা বলিয়াছিল। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। বাদী গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির মোসাবিদায় খুব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারসিংহ চৌধুরীর মোকদ্দমা সাজাইবার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবতঃ তাহারই উপদেশ মত আর্জ্জি লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বাদীপক্ষ আর্জ্জির অনুকূলে একখানি কবালা বা পাট্টা-কবুলিয়ৎ বা খত-খাতা বা অন্য কোন প্রকার এক টুকরা কাগজও দাখিল করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। এইরূপ কাগজপত্রের অভাবে বেচারাম সেনের পক্ষে বাদীর দাবী সমর্থন করা সাধ্য ছিল না। কৃষ্ণমোহন ধারার পক্ষেও বাদীর দাবী সমর্থন করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই বোধ হয় তাহার জবানবন্দী করান হইয়াছিল না। বেচারাম সেনের জবানবন্দীর পর একবৎসর কাল বাদী পক্ষ অন্য কোন সাক্ষী তলব দেয়

নাই। ১৮১৮ সালের সেপ্টম্বর মাস হইতে প্রতিবাদীর সাক্ষীগণের জবানবন্দী আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮১৯ সালের মে মাসে শেষ হইয়াছিল। বাদীপক্ষ প্রতিবাদীর সাক্ষীগণের জেরার প্রশ্নমালা দাখিল করিয়াছিল না, সুতরাং জেরাও করে নাই।

১৮১৮ সালের ১লা অক্টোবর বাদীপক্ষ আরও নয়জন সাক্ষীর নামে সপিনা বাহির করিয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে, ১৮১৯ সালের ১১ই জুন বাদী এফিডেবিট করিল, সে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই সকল সাক্ষীকে হাজির এবং জবানবন্দী করাইতে পারে নাই। বাদী আরও বলিল, হীরারাম চট্টোপাধ্যায়, বিপ্রদাস রায়, সভাচন্দ্র রায় এবং তারিণী দেবী বিশেষ দরকারী সাক্ষী (material witnesses)। ইঁহাদের জবানবন্দী না হইলে সে নিরাপদে এই মোকদ্দমার সওয়াল জবাবের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন না (he cannot safely proceed to a hearing in this suit)। এই চারি জন সাক্ষী বাদীর, বাদীর পিতার, এবং পিতামহের পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারের সহিত (with the family affairs and transactions) সুপরিচিত। আর এক মাস সময় পাইলে বাদী এই সকল সাক্ষীকে হাজির করিয়া জবানবন্দী করাইতে পারিবে। সুতরাং তাহাকে আর এক মাসের সময় দেওয়া হউক।

১৮১৭ সালের ২৩শে জুন মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল, এবং দুই বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল। আর অধিককাল বিলম্ব করা কোর্টের অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি কোর্ট বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে এক মাসের অবকাশ দিলেন। ১৮১৯ সালের ১২ই জুন বাদী পক্ষ ১৭ জন সাক্ষীর নামে সাপিনা বাহির করিল। এই ১৭ জন সাক্ষীর মধ্যে অভয়চরণ দত্ত, কৃষ্ণপ্রসাদ পণ্ডিত, রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুরুপ্রসাদ পণ্ডিত এই পাচ জন মাত্র ৯ই জুলাই কোর্টে হাজির হইয়া হলপ করিয়াছিল। প্রার্থিত মিয়াদের এক মাস অন্তে, ১৮১৯ সালের ১৩ই জুলাই, বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়, রামধন মুখোপাধ্যায় এবং মটুক সরদার এই তিনজনে মিলিয়া আর এক এফিডেবিট করিল। গোবিন্দপ্রসাদ রায় পূর্ব্ব এফিডেবিটের মত এই এফিডেবিটে বলিল, হীরারাম চট্টোপাধ্যায়, বিপ্রদাস রায়, সভাচন্দ্র রায়, তারিণী দেবী, নবকিশোর রায়, নিমাই রায়, রামধন ডিগ্রী, রঘুবীর ডিগ্রী এবং পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী এই নয় জন এই মোকদ্দমার দরকারী সাক্ষী। ইঁহারা সকল অবস্থা অবগত আছেন। ইঁহাদের জবানবন্দী না হইলে বাদী এই মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। সুতরাং ইঁহাদিগকে হাজির করিবার জন্য আরও দুই মাস সময় দেওয়া হউক। কোর্ট এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করিলেন।

রামধন মুখোপাধ্যায় সপিনা জারি করিবার জন্য লাঙ্গুড়পাড়া অঞ্চলে গিয়াছিল। সে তাহার এফিডেবিটে বলিয়াছে, বাদীর অনুরোধে মটুক সরদারকে লইয়া সে কলিকাতা হইতে সপিনা জারি করিতে গিয়াছিল। সে প্রথম গিয়াছিল কৃষ্ণনগর। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইল, সপিনা এড়াইবার জন্য অনেক সাক্ষী পলায়ন করিয়াছে। সেখানে কেবল অভয়চরণ দত্তের উপর সে সপিনা জারি করিতে সমর্থ হইল। ২৬শে জুন কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া রামধন ডিগ্রীর উপর সপিনা জারি করিবার জন্য সে খোটালপাড়া গিয়াছিল। রামধন ডিগ্রী তখন খোটালপাড়ায় তাহার রেশমের কুঠীতে (his silk factoryতে) ছিল না। তার পরদিন সে খোটালপাড়া হইতে জয়পাড়া-কৃষ্ণনগর গিয়া রামধন ডিগ্রী এবং রঘুবীর ডিগ্রীর সাক্ষাৎ পাইল এবং তাহাদের উপর সপিনা জারি করিল। তখন এই দুই ব্যক্তি কাটি শালের (?) লাঠি দিয়া রামধন মুখোপাধ্যায়কে এবং মটুক সরদারকে খুব মারপিট করিয়াছিল, এবং রঘুবীর ডিগ্রী সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে হুকুম দিয়াছিল, মূল সপিনা কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেল। মূল সপিনা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মটুক সরদার ছেঁড়া সপিনা কুড়াইয়া আনিয়াছিল। এখনও তাহা মোকদ্দমার নথীর মধ্যে দেখা যায়।

১৮১৯ সনের জুন মাসের সপিনা পাইয়া যে পাঁচজন সাক্ষী হাজির হইয়াছিল তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভয়চরণ দত্ত এই তিন জনের জবানবন্দী করা হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীর পুরোহিত ছিল এবং জবানবন্দীর সময় তাহার বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। মূল জবানবন্দীতে, দ্বিতীয়

প্রশ্নের উত্তরে, সে বলিয়াছে, রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় বা তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালে এই পরিবারের বৈষয়িক বিধি-ব্যবস্থা (affairs and concerns) জানিবার তাহার বিশেষ কোন উপায় ছিল না এবং সে জানেও না। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছে, বাঁটোয়ারার পরে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া (on what terms) যে রামমোহন রায় এবং জগমোহন একত্র বাস করিত তাহা সাক্ষী জানে না। এই সকল পক্ষের কাহারও পুনরায় মিলিত হইবার কথা সে কখনও শোনে নাই (saith that he never heard of any reunion between any of the parties)।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রামে পৌরোহিত্য করিত। জবানবন্দীর সময় তাহার বয়স ছিল ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মূল জবানবন্দীতে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, রামচন্দ্রও বলিয়াছে, রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালে রায়-পরিবারের আভ্যন্তরীণ বৈষয়িক অবস্থা (affairs and concerns) জানিবার তাহার কোন উপায় এবং সুযোগ ছিল না (he had not the means and opportunity) এবং সে জানেও না। তথাপি রামচন্দ্র বাদীর পক্ষ টানিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছে, সে শুনিয়াছে যে প্রথমতঃ রাজীবলোচন রায় কৃষ্ণনগর এবং বীরলোক নামক দুইখানি পত্তনী তালুক খরিদ করিয়াছিল, এবং তাহার দুই-তিন বৎসর পরে রামমোহন রায় রাজীবলোচন রায়ের নিকট হইতে এই ইখানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রামচন্দ্র ন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছে, সে জানে, জগমোহন রায়ের বিদ্দশায় কৃষ্ণনগর এবং বীরলোক তালুক এই পরিবারের রা (by the family) খরিদ করা হইয়াছিল, ং সাধারণতঃ লোকে মনে করিত (generally sidered) এই দুইখানি তালুক জগমোহন রায় এবং মোহন রায় এই উভয়ের এজমালি সম্পত্তি (joint perty)। কিন্তু জেরার উত্তরে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় াসা করিয়া বলিয়াছে, সে বাদী-প্রতিবাদীর এবং দের পিতার বা ভ্রাতার বিষয়কর্ম্ম, কারবার বা সম্পত্তি ৎ কিছু জানে না (he is not acquainted with the concerns dealings transactions or the property)।

জবানবন্দী দেওয়ার সময় বাদীর অপর সাক্ষী অভয়চরণ দত্তের বয়স ছিল প্রায় ৭২ বৎসর। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (up to within ten years of his death) অভয়চরণ দত্ত দশ বৎসরের অধিককাল রামকান্ত রায়ের চাকরি করিয়াছিল। অভয়চরণ সাধারণভাবে বলিয়াছে, বাঁটোয়ারার পূর্ব্বে রামকান্ত রায় পুত্রগণের সহিত যেমন একান্নে একত্রে বাস করিতেন, বাঁটোয়ারার পরেও তাঁহার পরিবার লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে একান্নে একত্র বাস করিত। অভয়চরণ দত্তকে বোধ হয় জেরা করা হইয়াছিল না। মোকদ্দমার নথীতে তাহার প্রদত্ত জেরার উত্তর পাওয়া যায় না। মূল জবানবন্দীতে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে অভয়চরণ বলিয়াছে—

সে জানে না, কিন্তু সে শুনিয়াছে যে রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় গঙ্গাধর ঘোষ এবং রামতনু রায় গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিল। কিন্তু কখন অথবা কোথায় অথবা কিরূপে (at what sale) অথবা কাহার টাকায় অথবা কাহার নিমিত্ত (on whose account) যে এই দুইখানি তালুক খরিদ করা হইয়াছিল তাহা সাক্ষী শোনে নাই অথবা অন্য উপায়ে জানিতে পারে নাই।"

"ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলিয়াছে যে সে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের মাতার নিকট হইতে শুনিয়াছে, রামতনু রায় এবং গঙ্গাধর ঘোষ গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিল।... সাক্ষী বলে যে প্রতিবাদীর মাতা বলিয়াছিলেন যে তিনি অনুমান করেন উহা বেনামী খরিদ। সাক্ষী বলে যে এই আলাপের এবং এই সংবাদ পাওয়ার দুই-তিন মাস পরে (পুনরায়) প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের মাতা সাক্ষীকে বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় রামতনু রায়ের এবং গঙ্গাধর ঘোষের নিকট হইতে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিলেন।"

রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভয়চরণ দত্ত বাদীপক্ষের এই তিন জন সাক্ষীর কাহারও জবানবন্দী প্রকৃতপ্রস্তাবে বাদীর অনুকূল নহে। ১০ই জুলাইয়ের এফিডেবিট প্রার্থিত দুই মাস সময়ের মধ্যে

অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাদী আর কোন সাক্ষী হাজির করিতে পারিল না। সুতরাং ১৫ই সেপ্টেম্বর সে আবার প্রার্থনা করিল তারিণী দেবী, জগন্নাথ মজুমদার, রাধানাথ চৌধুরী এবং রামনিধি পাল এই চারি জন দরকারী সাক্ষীকে (material witnesses) হাজির এবং জবানবন্দী করাইবার জন্য আরও পনর দিন সময় দেওয়া হউক। এই তৃতীয় বারের চেষ্টার ফলেও বাদীপক্ষ কোন দরকারী সাক্ষী হাজির করিতে পারিল না। চতুর্থবার সময়চাহিতে সাহস করিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য, বাদী গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের সাক্ষীরা জবানবন্দী দিল না কেন, এবং যে কয়জন জবানবন্দী দিল তাহারাও বাদীর দাবী সমর্থন করিল না কেন। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হইতে পারে, প্রতিবাদী রামমোহন রায় বাদীর মানিত সকল সাক্ষীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বশীকরণ অসম্ভব। আমরা কাগজ পত্রে দেখিতে পাইব, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় এবং সভাচন্দ্র রায় জগমোহন রায়ের হিতকারী ছিলেন এবং সকল অবস্থাই জানিতেন। ইহাদের মত সাক্ষীকে বশীভূত করা সহজ নহে। অন্যান্য সাক্ষী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, তখন দলাদলি চলিতেছিল, এবং বাদী পক্ষ নিজের দলের লোকই সাক্ষী মানিয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষে এককালে বেদলের এতগুলি লোককে বশীভূত করা সম্ভব মনে হয় না। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ও দরকারী সাক্ষীগণকে হাজির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাই। যে সাক্ষী সপিনা পাইয়া হাজির না হয়, তাহাকে হাজির করিবার জন্য মাল ক্রোক করিবার নিয়ম ছিল। ১৮১৯ সালের ১৭ই জুন সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রার সার্টিফিকেট দাখিল করিয়াছিলেন যে রামতনু রায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, তারিণী দেবী, বিপ্রপ্রসাদ রায়, এবং সভাচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মাল ক্রোকের পরোয়ানা বাহির করা হয় নাই। অন্য কোন সাক্ষীর বিরুদ্ধে যে ক্রোকের পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ নাই। যথাযোগ্য তদ্বিরের অভাবই সাক্ষীগণের গরহাজিরের প্রধান কারণ। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মানিত সাক্ষীগণের জবানবন্দী না দেওয়ার আর এক কারণ হইতে পারে, বেচারাম সেন প্রভৃতি বাদীর যে চারিজন সাক্ষী জবানবন্দী দিয়াছিল তাহাদের মত বাদীর অন্যান্য সাক্ষী ও বাদীর দাবী সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল না; অর্থাৎ তাহারা মনে করিত, বাদীর দাবী সমর্থন করিতে গেলে মিথ্যা কথা বলিতে হয়; তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিল না।

বাদীর মাতামহী তারিণী দেবীও সাক্ষী দিলেন না। তাঁহাকে জেরার জন্য দাখিল করা প্রশ্নে রামমোহন রায়ের পক্ষে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তিনিই বাদীর দ্বারা মোকদ্দমা করাইয়াছেন।* তবে তিনি কেন সাক্ষী দিতে সম্মত হইলেন না? এদেশে এখনও অনেক হিন্দুর সংস্কার আছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের উপার্জ্জিত এবং নিজ নামে খরিদ-করা সম্পত্তির অংশ ঐ পরিবারভুক্ত অন্যান্যেরও প্রাপ্য। সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, স্বধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে শাস্তি দিবার জন্য, তারিণী দেবী এই মোকদ্দমা করাইয়াছিলেন। কিন্তু মোকদ্দমার আর্জ্জিতে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যদি তারিণী দেবী আর্জ্জির কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেন, এবং তদনুসারে সাক্ষ্য দেওয়াইতে চাহিতেন, তবে তিনি বাদীর সাক্ষী অভয়চরণ দত্তকে বলিতেন না, "রামমোহন রায় রামতনু রায়ের এবং গঙ্গাধর ঘোষের নিকট হইতে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিলেন"; তিনি বলিতেন, "তাঁহার স্বামী রামকান্ত রায় এই দুইখানি তালুক পুত্র রামমোহন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ করিয়াছিলেন।" পূর্ব্বোক্ত বেচারাম সেনের জেরার প্রশ্নে দেখা যায়, প্রতিবাদী পক্ষ মনে করিত, এই মোকদ্দমায় বাদীপক্ষের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিল কুমারসিংহ চৌধুরী। এক শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানশূন্য দুষ্ট স্বভাব মোকদ্দমার দালাল আছে, যাহাদের ব্যবসাই হইতেছে কোন প্রকারে মামলা বাধাইয়া দিয়া টাকা উপায় করা। কুমারসিংহ চৌধুরী বা আর কোন দালাল গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির মোসাবিদার উপদেষ্টা ছিল। গোবিন্দপ্রসাদ যাহাদিগকে সাক্ষী মান্য করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বোধ হয় আর্জ্জির মূল কথা বুঝিতে পারিত না, এবং আদালতে হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস ছিল না। তাহারা আসিয়া সাক্ষ্য দিল না। গোবিন্দপ্রসাদের দাবী প্রমাণিত হইল না। তাহার যে কয়জন সাক্ষী জবানবন্দী দিতে দাঁড়াইল, তাহারাও বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিল।

* প্রবাসী, ১৩৪৩, অগ্রহায়ণ, ২৬৬ পৃঃ।

প্রস্থিতা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈশবের লীলানন্দে জীবনসিন্ধুর বালুতটে
যাহারে লভিয়াছিনু একদিন একান্ত নিকটে,—
স্বপ্নসহচরী মোর,—আজিকার কর্ম্ম-কলরোলে
আমারে ভুলায়ে রেখে সে কখন কোথা গেল চলে
পারি নি জানিতে ; মোর আজন্মের আত্মার আত্মীয়া
আমার নর্ম্মের সঙ্গী,—আমার মর্ম্মের চিরপ্রিয়া,
আমার সুখের সাথী—আমার ব্যথার ব্যথী মিতা,—
ছেড়ে গেছে অকরুণা সখী মোর আমার কবিতা।

পারে যারা যাবে বলি খেয়াঘাটে হয়েছিল জড়
তারা মোরে দিল ডাক। আপনার মনে হ'ল বড়,
বিজ্ঞ বলি হ'ল মনে। বাঁশি ফেলি দ্রুত এনু ছুটে।
অসংশয় দৃঢ়পদে দেখিলাম তরণীতে উঠে
সম্মুখে জলিছে জল তরল অনলে তরঙ্গিয়া!
সাথে ছিল কি না ছিল সাথী মোর দেখি নি ফিরিয়া।
যাত্রা ক্রমে হ'ল সুরু ; যাত্রীদল পুছে পরস্পরে
এ উহার পরিচয়। কেহ বা কহিল গর্ব্বভরে
ওপারের রাজপুরে চলেছে সে নৃপতির ডাকে।
কারো বাণিজ্যের কড়ি খোয়া গেছে দুর্দ্দিনে বিপাকে
উদ্ধার করিবে তারে ওপারের পণ্যবীথিকায়।
কারো হাতে খর খড়্গ—কারো মুণ্ড মণ্ডিত শিখায়,—
কারো বা খনিত্র করে, কারো শস্ত্র,—কারো শাস্ত্ররাজি ;
সবাই চলেছে কাজে। অপ্রস্তুত অকাজের কাজী,—
অকস্মাৎ হ'ল মনে,—আমি কেন ইহাদের মাঝে?
আমি কোথা কি করিব? পরিচয় জিজ্ঞাসিলে লাজে
পিছে ফিরে চাহিলাম ; অশ্রুভারে পূর্ণ হ'ল আঁখি
সে নাই,—সে আসে নাই। "মিথ্যাবাদী—দিতে চাস ফাঁকি"
পাটনী গর্জ্জিয়া উঠে, "এখনি পারের কড়ি দেখা।"

দেখালেম শূন্য হস্ত,—কহিলাম, "আসিয়াছি একা,
তোমরা ডাকিয়াছিলে,—আসিয়াছি, করি নি সংশয় ;
পিছনে এসেছি ফেলে মোর অর্থ, মোর পরিচয়।"
কেহ বা ধিক্কার দিল,—কেহ বা পুছিল ব্যঙ্গ হাসি,
"কি তুমি শিখেছ কাজ?" "আমি কবি।" "কোথা তব বাঁশি?
কণ্ঠে তব গান কই?" কহিলাম তিতি অশ্রুনীরে,
"বাঁশি আসিয়াছি ফেলে যাত্রাপথে দূর সিন্ধুতীরে ;
ছড়ায়ে এসেছি গান গিরিমল্লিকার বনে বনে
তালতমালের কুঞ্জে ; সহসা আসিতে অন্যমনে
সব আসিয়াছি ভুলে,—উপলবিছানো উপকূলে
আজন্ম-বান্ধবী মোর কবিতারে আসিয়াছি ভুলে।"
শত কণ্ঠে অট্টহাসি,—শত চক্ষে জাগিল সন্দেহ,
হেন অসম্ভব কথা বুঝি কভু কহে নাই কেহ।

তার পর গেছে চলি, দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি কত,
নিত্য নব অপমান সহিয়া চলেছি ভাগ্যহত
সুদূর দিগন্তে চাহি সীমাহীন মহাসিন্ধুজলে
আন্দোলিত তরীবক্ষে। অন্ধকার দিগঙ্গনতলে
আজি ঝঞ্ঝা জাগিয়াছে তিমির-নিবিড় পুঞ্জমেঘে ;
উন্মত্ত প্রলয়বায়ু গর্জ্জিয়া ছুটেছে অন্ধবেগে,—
নাচিছে উত্তাল উর্ম্মি,—তারি মাঝে ডুবে তরীখানি।
সবাই লেগেছে কাজে ; কি করিব আমি নাহি জানি।
দেহে মোর শক্তি নাই,—এ দুর্দ্দিনে হব কর্ণধার ;
কণ্ঠে মোর মন্ত্র নাই—কত দূরে কোথা আছে পার
তাহার সন্ধান দিব, শুনাইব আশার রাগিণী।
তরঙ্গে তরঙ্গে আজি হুঙ্কারিছে হিংসার নাগিনী,
হাতে মোর বাঁশি নাই! সাথে মোর সাথী নাই মিতা ;
অসময়ে ছেড়ে গেছে অভিমানী আমার কবিতা।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৪০

নন্দের বাড়ী গিয়ে কমলের অসুখের কিছুই উপশম হ'ল না। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে, গল্পগাছা করবার চেষ্টা ক'রে সে শ্রান্ত হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মালতী জিজ্ঞেস করাতে বললে, "একটু শুয়ে নি। আমায় ডেকো না, আজ আর কিছু খাব না।"

মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি। ওমা, এতক্ষণ বল নি কেন ভাই? ইস্, চোখ দুটো যে লাল হয়ে উঠেছে! চল, বিছানা করে শুইয়ে দিই গে। একটু বরফ দেবে মাথায়?"

কমল লজ্জিত হয়ে বললে, "না না, তেমন কিছুই না। একটু ঘুমলেই সেরে যাবে।"

মালতী শোনে না। তাকে জোর ক'রে খালি খাট থেকে উঠিয়ে পাশের ঘরে বিছানা ক'রে শুইয়ে দেয়। বিরক্ত হয়ে বলে, "দেখ দিকি নি ভাই, উনি এই সময় কোথায় গেলেন। একজন ডাক্তার ডাকা উচিত। ভগলুকে বরং একবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দি, নিখিল বাবুকে ডেকে নিয়ে আসুক।" কমল ব্যস্ত হয়ে বলে, "না না, ও কিছুই নয়। একটু ঘুমলেই সব সেরে যাবে, দেখো। ও রকম আমার রোজ হয়।"

সন্ধ্যার খানিকটা পরে নন্দলাল বাড়ী ফিরল। কিন্তু বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহলে যেতে তার পা উঠল না। সেইখানে ব'সেই সে উপায় চিন্তা করতে লাগল যে, কমলের বিরূপতা বাঁচিয়ে কেমন ক'রে তার কাছে নিজেকে নিয়ে উপস্থিত করবে। নিতান্ত কিছুই ঘটে নি এমনই ভাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু যেখানে সত্যিই কিছু ঘটেছে সেখানে সে-ভাবটা বজায় রাখা তার পক্ষে দুরূহ।

এমন সময় মালতী এসে জ্যোৎস্নার পীড়ার সংবাদ দিলে। অসুখের সংবাদে আত্মীয়ের যেমন উদ্বিগ্ন হবার কথা, নন্দর মুখে ঠিক সে-রকম উদ্বেগের ভাব দেখা গেল না। একটা আশা, কেন এবং কিসের তা কে জানে, গোপনে গোপনে তার মন থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়ে দিতে লাগল। কিসের এই আশা? জ্যোৎস্নার কাছে এই অসুখের সূত্রে আত্মীয়ের স্বাভাবিক হৃদ্যতা নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারার সুযোগ হবে এবং মাঝখানের এই কয় দিনের গ্লানিটা বিনা চেষ্টায় দূর হ'য়ে যেতে পারবে এই ভেবে? না, এই সুযোগে জ্যোৎস্নার বিমুখ চিত্তকে অনুকূল করবার সুযোগ পেতে পারে এই ভেবে, কে জানে? কিন্তু তার পীড়ার সংবাদে যে সে অতিমাত্র বিচলিত হয়ে পড়ল এমন বোধ হ'ল না। বললে, "ভগলুকে দিয়ে বরফ আনিয়ে মাথায় আইস-ব্যাগ দাও; আমি যাচ্ছি একটু কাজ সেরে।" ব'লে অকারণে একখানা মোটা খাতা খুলে মনোযোগের সঙ্গে পাতা ওল্টাতে লেগে গেল।

মালতী বললে, "তোমার খাতাটা একটু রাখ ত। দিন রাত ঐ নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জো হ'ল। একটা ডাক্তার-টাক্তার ডাকা দরকার না কি?"

এখনই অন্দরে গিয়ে জ্যোৎস্নার কাছে তার ব্যাকুল চিত্তের উদ্বেগ প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রবল হ'লেও, মালতীর কাছে সে একরকম উপেক্ষার সুরেই বললে, "হ্যাঃ, একটু কি মাথা ধরেছে, তাই আবার ডাক্তার ডাক। তোমাদের যত বাড়াবাড়ি।"

"বাড়াবাড়ি আবার কি? অসুখ করলে লোকে ডাক্তার ডাকে। সে কাৎর্‌বার মেয়ে নয়, তাই চুপ ক'রে পড়ে আছে। আমার অমনটা হ'লে আমি ত চেঁচিয়েই বাড়ী মাথায় করতুম। তা যা হয় কর, আমি চললুম।"

নিতান্ত অগত্যার ভাবে নন্দ উঠে বাড়ীর ভিতর গেল।

একটা মটকার চাদরে আবক্ষ আবৃত হয়ে কমল শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে নিদ্রিত ব'লেই মনে হয়। কেবল তার আকুঞ্চিত ললাটে যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট। মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাসে সেই আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার উষ্ণ বাষ্পকে যেন নিষ্কৃতি দিচ্ছে।

নন্দ মালতীকে কানে-কানে জিজ্ঞেস করলে, "জর আছে নাকি ?" ইচ্ছাসত্ত্বেও কপালে হাত দিয়ে সহজ ভাবে সে রোগীকে পরীক্ষা করতে ইতস্তত করছিল।

মালতী বললে, "জানি নে। তুমি দেখ না কপালে হাত দিয়ে।"

নন্দ নিতান্ত কর্ত্তব্যের খাতিরেই পা টিপে কাছে গিয়ে তার কপাল স্পর্শ করলে। কমল চোখ চেয়ে নন্দকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে বসল। মালতীর দিকে চেয়ে বললে, "কেন ভাই মিছে ব্যস্ত হচ্ছ। ও আমার কিছুই নয়। অমন প্রায়ই হয়। একটু ঘুমলেই সেরে যাবে ত বললাম। মিছিমিছি তুমি বড় ব্যস্ত হও।"

মালতী গোলমাল ক'রে বলতে লাগল "না, কিছু নয়। রগের শির ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো লাল জবাফুলের মত হয়েছে—কিছু নয়। কিছু নয় ত, কিছু নয়। তুমি চুপ ক'রে শোও ত। আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলে কেন ? এখন আমাদের এখানে এসেছ, আমরা যা বলব তাই শুনতে হবে। কিছু নয় নয় ক'রে চেহারা কি হয়েছে দেখতে পাও ?"

নন্দ এর মধ্যে কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। কেমন ক'রে সে নিজের অনুতপ্ত ভাব প্রকাশ ক'রে তার সেবা করবার সুযোগ লাভ করবে তাও ভেবে উঠতে পারল না। এটুকু সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে তার উপস্থিতি জ্যোৎস্নার কাছে স্বস্তিকর নয়। সুতরাং অগত্যা সে যথাসম্ভব সহজ গলায় আইস-ব্যাগ দেবার উপদেশ দিয়ে মনে মনে রুষ্ট হয়েই বেরিয়ে বৈঠকখানায় চলে গেল।

জ্যোৎস্নাকে যে সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না, তা তার অজানা ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না যে তার প্রত্যেকটি নিরাপদ গতিবিধি সম্বন্ধেও এতটা সজাগ থাকবে এতে তার বিরক্তির সীমা রইল না। পুরুষ-অভিভাবকবিহীন একটা স্ত্রীলোক যে সম্পূর্ণ পুরুষ-সম্পর্কশূন্য চিত্তে চিরকাল অতিবাহিত করতে পারে, এ তার ধারণার মধ্যে আসেই না। এ সে বিশ্বাসই করতে পারে না। তবে কে ? কে তার মনকে এমন ক'রে আবদ্ধ করেছে যে সে তার বিপুল অন্ধকারময় ভবিষ্যতের বিরুদ্ধেও এমন ক'রে তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে ? বিশেষতঃ তার সঙ্গে প্রেমের এই গোপন বিনিময়ে যখন তাকে কোন পরিবর্ত্তন বা বিপর্য্যয় কিংবা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার করতেও হচ্ছে না। তার সন্তানকে সে এতদিন সন্তান-নির্ব্বিশেষেই পালন ক'রে এসেছে; এবং চিরদিন তার স্নেহের আশ্রয়ে থেকে নিরাময় নিঃসঙ্কোচেই তাকে মানুষ ক'রে তুলতে পারবে। বরং তখন মনের দিক থেকে তার দাবীই জন্মাবে—এখনকার মত নিয়ত তাকে পরান্নভোজীর অবনতি অনুভব করতে হবে না। তবে কেন তার এই বিরুদ্ধতা ? কেন, কেন, কেন,—ভাবতে গিয়ে নিখিলনাথ সম্বন্ধে সন্দেহ তার ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হ'তে লাগল। সে মনে মনে বললে "নাঃ, এমনই ক'রে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিতে পারব না। একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। তা নইলে ডাক্তারকে একবার দেখে নেব।"

সেদিন রাত্রে কমলের মাথার যন্ত্রণা খুবই বেড়ে উঠ্‌ল। সে মনে মনে বহুবার নিখিলনাথের কথা ভাবলে। কিন্তু নন্দলালের সেদিনকার কুৎসিত ইঙ্গিতের পর সে নিখিল-নাথের কথা উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। নিজেই সে নিজের চিকিৎসার দু-একটা মামুলি ওষুধ ও ব্যবস্থার কথা বলে শ্রান্ত হয়ে পড়ে রইল।

সমস্ত দিন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট পোহানর পর রাত্রে মালতী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। তবু সে প্রথম রাত্রিটা প্রাণপণে রোগীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলে। কমলের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সে পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। কিন্তু তার পরিশ্রান্ত চোখ ঢুলে এল; এবং দু-একবার যখন শ্রান্ত হাতের পাখাটা ঘুমের ঢুল খেয়ে রোগীর গায়ের উপর পড়তে সুরু হ'ল তখন সে বুঝলে যে খানিকটা না ঘুমিয়ে নিলে আর বসা চলে না।

মাঝে মাঝে বরফ ভেঙে আইস-ব্যাগটা ভ'রে দেবার উদ্দেশ্যে নন্দলাল ঘরে এসে রোগীর সংবাদ নিচ্ছিল। মালতী তার কানে-কানে বললে, "তুমি একটু পাখাটা ধর, আমি খানিকটা না গড়িয়ে নিয়ে যেন পারছি না।"

নন্দলাল বিনা বাক্যব্যয়ে পাখাটা তার হাত থেকে নিয়ে মালতীকে পাশের ঘরে শুতে পাঠিয়ে দিলে।

ঘর নিস্তব্ধ, নিঝুম। টেবিলের উপর শেজের বাতিটা নীল কাগজ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এই

দুটি ব্যক্তিকে যেন আড়াল ক'রে সমস্ত বাড়ীতে সুপ্তির পর্দ্দা টানা। কমল বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিল কিংবা যন্ত্রণাতেই তার চেতনা খানিকটা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। নন্দলাল এক হাতে ব্যাগটা ধরে অন্য হাতে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করছে। আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কমলের মুখের দিকে। ঐ একটুখানি অসহায় স্ত্রীলোক, কি তার শক্তি তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তবু তাকে আয়ত্ত করা এত কঠিন! " তার সমস্ত শক্তি কেন যে এমন অসহায় হয়ে পড়ে, কেন যে তার পুরুষের অকুণ্ঠিত বল অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারে না, তাই ভেবেই সে অবাক হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সে যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। তার মন তার দেহকে জাগিয়ে তুলছে কোন উপায়ে ওর নাগাল পাবার জন্যে। তবু কোন রকম অভদ্র আচরণ করতেও যেন তার হাত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছে। এখনই কোন একটা রূঢ় আঘাতে আবার সে তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে না ধূলিসাৎ করে। তা ছাড়া মালতী পাশের ঘরে।

কপালের চুলগুলো বরফের জলে ভিজে উঠেছে। সে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে আস্তে আস্তে মুছে নিলে। কমল চুপ ক'রেই পড়ে রইল। এই সেবার একাগ্রতার ইতিহাসটুকু বুঝি তার কাছে গোপনই রইল। নিখিলনাথ কি তার মত ক'রে ওর কথা ভাবতে পারে? তার কাছে ওর মূল্য কতটুকু? একটা নার্সের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ করা ছাড়া তার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কি দারুণ দুর্দ্দৈব থেকে সে ওকে রক্ষা করেছে সে কথা কি ওর একবারও মনে হয় না? আজ সে কার জোরে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে? তার অপরাধ কি? ভালবাসা কি অপরাধ? জ্যোৎস্নাকে সে ভালবাসে। ভালবাসেই ত। আজ তার এই যন্ত্রণার সময় সে যে নিদ্রাহীন রাত্রি তার সেবায় নিজেকে একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত করেছে, এ কি শুধু সে আশ্রিত ব'লে? কখনই না; সে তাকে ভালবাসে। তার আজকের যন্ত্রণা একটু উপশম করতে পারলেও সে তৃপ্তি পাবে। মাথার যন্ত্রণার বড় কষ্ট। তার নিজের একবার হয়েছিল—রগ-দুটো যেন ফেটে পড়ছিল সেদিন। মাথাটা একটু টিপলে বোধ হয় একটু আরাম হ'ত। একটু টিপে দিলে ক্ষতি কি? কিন্তু যদি জেগে ওঠে, যদি বিরক্ত হয়। কই, চুল মুছে দেবার সময় ত কিছু বলে নি। দিই না। একবারের সাফল্যে নন্দর মনের জড়তা এবং ভীরুতা অনেকটা দূর হয়ে তাকে দ্বিতীয়বার অগ্রসর হওয়ায় যেন সাহস দিলে। সে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে কপাল এবং রগটা ধীরে ধীরে ডলে দিতে লাগল।

কমল ঘুমোয় নি। কতকটা যন্ত্রণার জন্যেও বটে এবং কতকটা ওষুধের আবেশেও বটে, সে আচ্ছন্নের মত প'ড়ে ছিল। বাহ্য ব্যাপারে তার মস্তিষ্ক চালনা করবার মত ক্ষমতা তার ছিল না; তাই কপালের জলটুকু মুছে নেবার সময় সে বড় একটা খেয়াল করে নি। মালতী যে বিশ্রাম করতে গিয়েছে এ-কথার ঠিকমত ধারণা তার ছিল না। তাই সে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। কারও সেবা সহজে গ্রহণ করা যদিও তার স্বভাববিরুদ্ধ তবুও আজ সেবাটাও তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক এবং কাম্য বোধ হচ্ছিল। সে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে মালতীর সেবা ভেবেই এই স্নেহের অত্যাচারটুক উপভোগ করছিল।

নন্দলালের হাতের প্রথম স্পর্শেই সে সচেতন হয়ে তার বোধশক্তিকে সচেতন ক'রে তুললে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তার বিশ্বাসই হয় নি যে নন্দলাল সহসা এ-প্রকার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে। তার সেবাদক্ষ মনে এ-কথাটাও জাগল যে, রোগীর প্রতি স্বাভাবিক করুণায়ও ত নন্দলাল এইটুকু করতে পারে। একজন মানুষকে কেন সে এমন কুৎসিত রূপ দেবার চেষ্টা করছে? এ কি প্রবৃত্তি তার! নন্দলালের অনুতাপ যে সত্যিই আন্তরিক এই রকম কল্পনা ক'রে সে এই সেবা সহ্য করবার সঙ্কল্প মনে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অন্তর তার কোনমতেই সায় দিতে চাইল না। নিজের সঙ্গে এই রকম বোঝাপড়া করতে তার যেটুকু বিলম্ব হ'ল নন্দলালের লোভাতুর চিত্তে তা অনেকখানি আশার সঞ্চার করলে। কমল কিন্তু চোখ খুলতে বা জাগরণের কোন লক্ষণ প্রকাশ করতে পারল না। সজ্ঞানে সহজ ভাবে নন্দলালের দুঃসাহসকে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে, নন্দলালের মনে এই স্পর্দ্ধার উদ্রেক করতে তার শীলতায় বাধা পেতে লাগল। সে কাঠ হয়ে প'ড়ে রইল। নিজের

এবং নন্দর সঙ্গে সে যে এই প্রতারণাটুকু করলে সেইটাই তার বিপদ ডেকে আনলে। দুর্ব্বৃত্তকে দমন করতে হ'লে তার প্রশ্রয় পাবার উপায়টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা বুদ্ধির কাজ। ভুলে তার সাহসকে দুঃসাহসে এবং আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্দ্ধায় পরিণত ক'রে নিতে সাহায্যই করা হয়। অল্পক্ষণ পরে গভীর পরিতাপের সঙ্গে তার ভুল সে বুঝতে পারলে।

নন্দলালের অঙ্গুলির গতিভঙ্গীতে তার দুশ্চেষ্টার আভাস অনুভব ক'রে তার সমস্ত সত্তা যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ওর হাত যেন প্রকাণ্ড ক্লেদাক্ত মাকড়সার মত তার সমস্ত দেহটাকে কণ্টকিত ক'রে তুলছে—সে যেন জাল বুনছে তার সমস্ত অদৃষ্টের চতুর্দ্দিকে। তার সমস্ত দেহটা বিদ্রোহ করে উঠতে চাচ্ছে। তীব্র বিদ্বেষের অনুভূতিতে তার যন্ত্রণা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা এঞ্জিনের মত আছাড় খাচ্ছে—মাথার মধ্যে রক্ত চলছে রেলের চাকার আবর্ত্তনের গতিতে। সমস্ত চেতনা সংহত হয়ে স্পর্শানুভূতি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে, এবং সেই অনুভূতি তার সমস্ত দেহকে গৌণ ক'রে ললাটক্ষেত্রে নন্দলালের অঙ্গুলির মন্থর কম্পিত গতিবিধি অনুসরণ ক'রে ফিরছে।

সহসা তার কপালের উপর একটা ভয়াবহ উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব ক'রে সে আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে দেখলে—তার মুখের অত্যন্ত নিকটে একটা মুখ—নন্দলালের মুখ,—তার লোভাতুর নেত্রের ক্ষুধার্ত্ত সেই দৃষ্টি। অকস্মাৎ তার মনে হ'ল, ও যেন একটা লোলুপ নেকড়ে বাঘ, তেমনই নির্ম্মম, তেমনই বীভৎস, তেমনই ভয়ঙ্কর। এই আতঙ্কের চমক খেয়ে সে নিজের অজ্ঞাতে "ও মা গো" বলে চেঁচিয়ে উঠে দুই হাতে নিজের মুখমণ্ডল আবৃত ক'রে ফেললে।

কতক ভয়ে কতক বাসনার আবেগে নন্দলাল এক হাতে তার মুখ চেপে ধরলে এবং সহসা এক মুহূর্ত্তে তার মুখের উপর পড়ল।

এই দুর্দ্দান্ত বিভীষিকার দুঃসহ ক্লেদসিক্ত সরীসৃপটার কবল থেকে বিপুল বলে সে যে কেমন ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তা তার মনে নেই। দেহ তার বেতসপত্রের মত কম্পিত হচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে; ঘরের বাইরে যাবার জন্যে ছুটে সে দরজার দিকে গেল।

দুশ্চিন্তার জন্যই হোক বা তার স্বামীকে সেবা থেকে মুক্তি দেবার ইচ্ছাতেই হোক, মালতীর সে-রাত্রে নিদ্রা গাঢ় হয় নি। কমলের প্রথম আওয়াজেই সে উঠে পড়ে ছুটে এই ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, এবং সমস্ত দৃশ্যটি যেন তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ ঘটনা বলে বিশ্বাস হ'তে চাইল না। তার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। ঐ দুর্দ্দান্ত রক্তমাংসলোলুপ জানোয়ারটা যে তার স্বামী, তা যেন সে ধারণার মধ্যে আনতে পারছে না। সে আবার ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মেঝের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তার কাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত সুখ-সম্পদ, ঐশ্বর্য্য-সংসার, সব নিঃস্ব হয়ে গেল।

মালতীকে দেখেই নন্দলালের মনটা এক নিমেষে শিকারের প্রবৃত্তি থেকে ভয়ের অন্ধকার গুহায় গিয়ে প্রবেশ করলে। ভীরু নন্দলালের চিত্তে পৌরুষের প্রবলতা বলে কোন বস্তু ছিল না। নিজের শক্তিতে সমাজ এমন কি মালতীর ঘৃণার বিরুদ্ধে যে সে নিজের বাসনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিয়ে বিদ্রোহ ক'রে দাঁড়াবে, এমন মেরুদণ্ডের শক্তি তার নেই। সমস্ত দিকের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে বিক্ষুব্ধ না ক'রে গোপনে যেটুকু উপভোগ করা যায় সেইটুকুর উপরেই তার লোভ। সমস্ত নিরাময় সংসারযাত্রায় একটা ঘোরতর বিপ্লবের সম্ভাবনায় সে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কি করলে এর আশু প্রতীকার করা যায় তার কোন যুক্তি তার উত্তেজিত মস্তিষ্কে যেন প্রবেশ করতে চাইল না; এবং অকস্মাৎ যেন দিশাহারা হয়েই সে ছুটে কমলের পায়ের কাছে পড়ে দুই হাতে তার পা চেপে ধ'রে রোদনোন্মুখ কম্পিত স্বরে বলতে লাগল "আমায় ক্ষমা কর। আমি নিতান্ত পাষণ্ড—আমি পশু। পশু ব'লেই আমাকে ক্ষমা কর। কোন পাপ তোমায় স্পর্শ করে নি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।" নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় কমলের তখন শ্বাস রোধ হবার মত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে-যন্ত্রণার চেয়েও এই লোকটার ঘৃণিত ক্ষমাভিক্ষার নির্লজ্জ দুঃসাহস তার অসহ্য বোধ হ'তে লাগল। কোন রকমে সে ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল; এবং ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিরাশ্রয় সমুদ্রের মধ্যে এক খণ্ড কাঠের টুকরো নিমজ্জমান লোকে যেমন করে জড়িয়ে ধরে, পাশের ঘরে ছুটে

গিয়ে সে অজয়কে তেমনই ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে "মা, মাগো" বলতে বলতে উদ্বেল হয়ে কাঁদতে লাগল।

এত আঘাতের মধ্যেও যে মালতী তার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে আবার উৎকর্ণ হয়ে তার কথা শুনতে পারে, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। দুঃখের নিরতিশয় বেদনার পীড়ন সত্ত্বেও সে তার স্বামীর কথার আওয়াজে হাতের উপর ভর দিয়ে অল্প উঁচু হয়ে শুনতে লাগল, "আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। কোন পাপ" ইত্যাদি।

প্রথমবার পাশের ঘরে ঢুকে নন্দকে দুষ্ক্রিয়োন্মুখ দেখে স্বভাবতই তার মন কমল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার স্বামীর এই শেষ কথাগুলোতে সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে কমল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এবং আপনিই তার মনের বেদনা অনেকটা যেন লঘু হয়ে এল। তার একমাত্রকে যে অন্যে গ্রাস ক'রে নেয় নি, স্ত্রীলোকের পক্ষে তা নিতান্ত অল্প সান্ত্বনার কারণ নয়। তা ছাড়া মালতী ইংরেজী-সাহিত্যচারী আধুনিকদের সূক্ষ্ম দাম্পত্য-তত্ত্বে অভিজ্ঞা নয়। অতএব পুরুষের স্ত্রীর প্রতি পাল্টা কর্ত্তব্যনীতির বিচার সম্বন্ধে তার মতামত নিদারুণ রকমের কঠিন ছিল না। যেখানে তার দুর্লঙ্ঘ্য অভিমান নিয়ে দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে একাকিনী জীবন যাপন করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত ছিল, সেখানে সে মাত্র ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রইল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কমলের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে, তার অভিশপ্ত দুঃখময় জীবনের প্রতি করুণায়, মালতীর স্বভাবপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ চিত্তের এই ক্রোধের উত্তাপ কখন্ এক সময় শান্ত হয়ে এল। সে ধীরে ধীরে উঠে কমলের পাশে গিয়ে বসল এবং বোধ করি এক রকম স্বামীর অপরাধেই অনুতপ্ত হয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে নীরবে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

৪১

সত্যবানের মৃত্যুতে সীমার মন নৃশংস ভবিতব্যতার নিষ্ঠুরতার উপর অসহায় আক্রোশে আহত বৃশ্চিকের অন্ধ পুচ্ছের মত উদ্যত হয়ে ছিল; প্রতিহিংসার মূঢ় উত্তেজনায় তার চিত্ত পরিপূর্ণ; তবু নিখিলনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করলে তখন সেই প্রথম তার নিজেকে সত্যই নিরাশ্রয় নিঃসহায় ব'লে মনে হ'তে লাগল। তার দাদার আকর্ষণে সে যে-দলের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই একে একে নিজের নিজের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন ক'রে চলে গেল। মুমূর্ষু সত্যবানও তার আশ্রয়স্বরূপ ছিল। শুধু তার বুদ্ধি বা পরিচালনা-শক্তির জন্য নয়—সত্যবানের মৃতকল্প দেহটাকে রক্ষা ক'রে বেড়ানোর অচিন্ত্য বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও যেন তার অসহায় নির্জ্জিত দেশের আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার সমান—এই কাজটি তার মনকে তার অস্তিত্বকে অল্প আশ্রয় দেয় নি। আর আজ! সে সর্ব্বহারার মত—সহায়হীন সম্বলশূন্য, আশ্রয় মাত্র তার অন্তরের অনির্ব্বাণ দেশপ্রীতি। তারও স্পষ্ট রূপ তার ভাই তার সঙ্গীদের মৃত্যুর রূপে ঢাকা প'ড়ে, জাগিয়ে রেখেছে তার হৃদয়ে একটা জ্বালাময় জিঘাংসা মাত্র। তার না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে সংযম।

নিখিলনাথকে নক্ষত্রখচিত শুভ্র আকাশের তলে যে একাকী পরিত্যাগ করে চলে এসেছে, প্রদোষান্ধকারে স্নাত দিগন্তবিস্তৃত মহাপ্রান্তরের কূলে পরিত্যক্ত সেই একক নিখিলনাথের নিঃসঙ্গতা তার নিঃসহায় চিত্তে একটা অবোধ বেদনার মত ধীরে ধীরে তার অজ্ঞাতে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ধরলে। নিখিলনাথের সতেজ উন্নত মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তির অন্তরালে যে করুণামণ্ডিত ব্যাকুল অন্তরাত্মাকে তার বিদায়ের মুহূর্ত্তে সীমা অপমানের আঘাত করে এসেছে, নিখিলনাথের সেই স্নেহকরুণ মুখশ্রী এই বনানীর নিবিড় অন্ধকার পটে তার অনুতপ্ত মনের সামনে ভেসে উঠল। তার অকারণ রূঢ়তার জন্যে অনুতপ্ত চিত্তে সে নিজেকে তিরস্কার করলে।

তবু ত তাকে থামলে চলবে না। পূর্ণ ক'রে তুলতে হবে তার দাদার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে, সত্যবানের দুর্জ্জয় সাধনাকে। কিন্তু কি সেই সাধনার প্রকৃতি তা সে জানে না—তার বাইরের বহিরূপ সে দেখেছে মাত্র এবং সেই রূপেই তার তরুণ হৃদয় প্রদীপ্ত। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে তীব্র, কিন্তু স্বাধীনতার রূপ তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই তার দাদা এবং তার সঙ্গীদের মৃত্যুতে যে প্রতিহিংসার আগুন তার চিত্তে বহ্নিমান হয়েছিল, দেশ এবং স্বাধীনতার

প্রতীক স্বরূপ তাকেই সে অন্তরে মেনে নিলে এবং তার সহায়হীন অস্তিত্বের সমস্ত উপচীয়মান অবসাদকে দৃঢ়বলে দূর ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল আপন কর্ত্তব্যে। তার চিত্তে সংশয়মাত্র রইল না যে, সে দেশেরই মঙ্গলের জন্য দেশেরই মুক্তির জন্য তার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করতে চলেছে। প্রতিহিংসাই যে তাকে তার এই দারুণ পন্থায় দেশোদ্ধারে অনুপ্রেরণা দান করছে, নিজেকে এমন করে বোঝবার ধৈর্য্য তার ছিল না। অনাহারে অনিদ্রায় অসহায় নিরাশ্রয়ভাবে ঘুরে ঘুরে সীমা অবশেষে কলকাতায় নিজের কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে প'ড়ে কতবার সে নিখিলনাথের কথা ভেবেছে। সামান্য আহার-সংস্থানের জন্য যখন তাকে ছদ্মবেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে, তখন কতবার ভেবেছে সে নিখিলনাথের কথা; কিন্তু যাকে সে নিজের উদ্ধত ধৃষ্টতায় উপহাস ক'রে চলে এসেছে, দীনা ভিখারিণীর মত তার কাছে যেতে সীমা বারংবার সঙ্কোচে বাধা পেয়েছে। তবু এই অদর্শনের মধ্যেও নিজের অন্তরলোকে নিখিলনাথ চিন্তার মধ্যে দিয়ে তার নিকটে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চার-পাঁচ মাস পরের কথা। এখন অনিন্দিতা দেবীর "নারীভবনে" তাকে সীমা বলে কেউ জানে না। তার চতুর্দ্দিকে এই কয়মাসেই অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়েছে। অধিকাংশই কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী। সীমার পূর্ব্বপরিচিত রঙ্গলালের সাহায্যে সে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

রঙ্গলাল ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। পূর্ব্বে সে তাদের দলের বাইরের সীমান্তপ্রদেশে পরিচিত ছিল। তখনও সীমা এই দলে প্রবেশ করে নি। তার দাদার সঙ্গে রঙ্গলালের পরিচয়ের সূত্রে বরাহনগরে সে তাদের বাড়ীতে যাতায়াত করত। তখন রঙ্গলালের কাজই ছিল সীমাকে আতঙ্ক-পন্থায় অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করা। তার নিজের মা ও বাবার মৃত্যুতে একদিন অকস্মাৎ তার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় এবং বহুদিন সীমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি।

সীমা তাকে অনেক কষ্টে আবিষ্কার করলে এবং রঙ্গলাল সীমার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রূপে দেশের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহে লেগে গেল।

সীমা এই সকল কাজের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকত না। নানা স্থান পরিবর্ত্তনের পর সম্প্রতি তার নিজের আস্তানা ছিল দমদমের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে। এই আস্তানাটি মাত্র চার-পাঁচ জন ব্যতীত অন্য সকলের অপরিজ্ঞাত ও অনধিগম্য ছিল। অধিকাংশ তরুণ কর্ম্মীর সঙ্গে সীমার কোন পরিচয় ছিল না এবং সীমা বা তার সঙ্গীদের কোন সন্ধান তাদের দেওয়া হ'ত না।

নারীভবন-সংক্রান্ত একটি বিদ্যালয়ে সে নিয়মিত অধ্যাপনা করত এবং সেখানে খাতায় নাম লিখিয়ে অনিন্দিতা দেবী "অষ্টেন্‌সিব্‌ল মীন্‌স্ অব্ লাইভলিহুডের" ব্যবস্থা করতেন। একমাত্র এই নারীভবন-পরিচালনাতেই তার হাত ছিল; এবং এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তার মূল কর্ম্ম-প্রবাহের সে কোন যোগ রাখে নি।

এমনি ক'রে তাদের কাজের ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হ'তে লাগল অর্থের প্রয়োজনও তেমনই বেড়ে চলল। এই অর্থের অনটনের সূত্রে একদা বহুকাল পরে সে নিজেকে অনিন্দিতা দেবীর ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিখিলনাথের হাসপাতালের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দরোয়ান এবারে তাকে লম্বা একটা সেলাম জানিয়ে তৎক্ষণাৎ নিখিলনাথের কক্ষে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দরোয়ান যে তার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাকে চিন্‌তে পেরেছে, এতে সীমার মনটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

৪২

নিখিলনাথ যা শুনলে তাতে মোটামুটি কতকটা সন্তুষ্ট এবং অনেকটা পরিমাণে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, "আমার সাধ্যমত অর্থসাহায্য করতে আমি নিশ্চয়ই ত্রুটি করব না। মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য তোমার এই উদ্যম যাতে সফল হ'তে পারে তা করতেও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

সীমা মনের কথাটা চেপে রেখে বললে "মানুষের কল্যাণের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই ডাক্তারবাবু, আমি দেশের স্বাধীনতা চাই; তা বই আর কিছুতে আমার আবশ্যক নেই।" নিখিলনাথ একটু হেসে বললে, "বেশ ত, যাদের জন্য

স্বাধীনতা কামনা করছ তারাও ত মানুষ। তাদের কল্যাণ সাধন করলেই মানুষের কল্যাণ হ'ল বই কি ?"

সীমার মনে নিখিলকে প্রতারণা করে তার অর্থ নিতে বাধছিল। সে একটু ঝাঁজ দিয়ে বললে, "আপনি কি মনে করেন এইসব লোকের আপাত-দুর্গতি আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে ? কতকগুলো মানুষকে চিরদাসত্বের মধ্যে আরামে রাখায় কোন পৌরুষ আছে কি ? আমি অন্য উদ্দেশ্যে এসব করেছি।"

নিখিলনাথ তার মুখের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু হয়ে চাইলে। চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সীমা বললে, "এই ভিজে কাঠিগুলোর যেটার মধ্যে এতটুকু স্ফুলিঙ্গ জীবিত আছে তাকেই আমি জ্বালিয়ে তুলতে চাই।"

তার পর নিখিলনাথের মুখের দিকে চেয়ে তার ভাবখানা দেখে একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি জানি আমি যা করতে যাচ্ছি আপনি তা পছন্দ করবেন না। তবু এ-ব্রত আমাকে সাধন করতেই হবে—নইলে আমার নিস্তার নেই। মৃতকল্প লোকগুলোকে নিশ্চিন্তে মরতে দিয়ে তাদের হিতসাধন করবার পরিহাস করা শুধু কাপুরুষতা নয়—নিষ্ঠুরতা।"

নিখিলনাথ স্তম্ভিত হয়ে চুপ ক'রে রইল। সত্যবানের শেষ অনুরোধ তার কানে এসে বাজতে লাগল, "ওকে তুই দাবানল থেকে বাঁচা।" কিন্তু কি ক'রে! কি ক'রে এই আগুন নেবাবে ? কোন উপায় যেন সে ভেবে উঠতে পারে না। এইটুকু তার বুঝতে দেরী হয় নি যে কোন সুকুমার প্রলোভনে সে সীমাকে ফেরাতে পারবে না। তবে সে কি করবে ?

নিখিল থেমে থেমে বললে, "আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার ঐ নিদারুণ পন্থা ছেড়ে দিয়ে জনসেবা—"

"সেই জন্যেই ত এগুলোর দরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া দেশে যেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে এতটুকু প্রাণ বা মনুষ্যত্ব আছে তাদের নিরাপদে আহ্বান ক'রে একত্র করবার আর কি উপায় আছে বলুন ত ? এই সেবার আহ্বানেই সেই জ্যান্ত ছেলেমেয়েগুলোকে সহজেই এক জায়গায় পাব, তাই ত এত সব কাণ্ডকারখানা। নইলে দেশের মানুষ-গুলোর মধ্যে প্রাণের আগুন যখন নিবে এল, তখন সাড়ম্বরে জনহিত করবার মত সখ আমার নেই।"

এতক্ষণ নিখিল মনে মনে যে আশা তার অন্ধকারের মধ্যে দূরতম নক্ষত্রের আলোকের মত পোষণ করেছিল তাও যেন সহসা নিবে গেল। সে কি করবে ? কেমন ক'রে সে সীমাকে বাঁচাবে ? এমন ভয়ানক কাজে সে তাকে কেমন ক'রে সাহায্য করবে! তা সে কিছুতেই পারবে না। তবু তাকে তার নিঃসঙ্গ সর্বনাশের বেড়াজালের মধ্যে সে কেমন ক'রেই বা পরিত্যাগ করবে ?

নিখিলের মুখ দেখে তার মনের কথাটা অনুভব ক'রে সীমা একটু লজ্জিত হ'ল। সেই সঙ্কোচটাকে জোর ক'রে তাড়াবার জন্যে সীমা হেসে বললে, "আপনাকে সব স্পষ্ট ক'রে খুলে বললাম, আপনি এখন আপনার নীতিবিদ্যালয়ের উপদেশমালা বের করতে পারেন।" বলে নিজের মনকে চাপা দেবার জন্যে, যেন কি একটা রসিকতা করেছে এইভাবে জোর করে হাসতে লাগল।

নিখিল প্রথমে তাকে সত্যবানের কথা বলে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলে। বললে, "সত্যদা অনেক মিনতি ক'রে তোমাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত হ'তে বলে গেছেন। সেই মৃত মহাত্মাকে কি তোমার অসম্মান করা উচিত ?"

"মৃত মহাত্মার জীবন্ত অবস্থায় তাঁর কাছে যে দীক্ষা পেয়েছি তার চেয়ে বড় আমার কাছে কিছু নেই। মৃত্যুর দরজা থেকে তিনি যা বলে গেছেন, তাতে জীবিতের রসদ জোগানো যাবে না।"

"তিনি বলে গেছেন 'প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়, প্রাণ নিলে নয়'—এটা জীবিতের জন্যেই, মৃতের জন্যে বলেন নি।"

"মানুষ হত্যা করার সখ আমার নেই। আজ কোন মন্ত্রে এই হীনতা থেকে আমাদের মুক্তি দিন, কাল দেখবেন তুলসীর মালা হাতে ক'রে সাত্ত্বিক হয়েছি। এ সবই আপনি আমার চেয়েও ভাল ক'রে বোঝেন ; তবে কেন একজন মহৎ লোকের মৃত্যুসময়ের বিপর্য্যস্ত মনের কথা ব'লে তাঁকে ছোট করছেন ?"

নিখিল দেখলে যে সত্যবানের কথা ব'লে তাকে নিরস্ত

করবার চেষ্টা করা বৃথা। সত্যবানের অনেক দিনের শিক্ষা সীমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে; সত্যবানের মৃত্যু-কালীন একদিনের উক্তি তাকে উৎপাটন করবে তার সম্ভাবনা কম। তখন সে তর্ক সুরু করলে; বললে, "এমনি ক'রে একটা দুটো পাঁচটা খুন ক'রে দেশকে মুক্তি দান করবে, এর চেয়ে বাতুলের কথা কিছু হ'তে পারে না। ওতে শুধু দেশের লোককেই বিপর্য্যস্ত ক'রে তাদের দুঃখের উপরে দুর্দ্দশার কারণ ঘটানো ছাড়া আর কোন উপকার হবে না।"

"একটা দেশের উপর লড়াই চললে এর চেয়ে অনেক দুঃখদুর্দ্দশা সে-দেশের লোককে ভোগ করতে হয়। সুতরাং আপাত-দুঃখটাকেই বড় ক'রে দেখবার কোন আবশ্যক নেই। ভয়েতে সব কিছু মেনে নেবার নিদারুণ উদ্বেগহীনতা থেকে তাদের নির্ভয়ে মাথা তুলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার তেজ দিতে চাই আমরা।"

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি একটা নৈতিক বল। সেটাকে একটা পশুশক্তির মত করে জাগাতে গেলে সেই নৈতিক বলেরই মহামৃত্যু ঘটাবে। কুকুরকে মারলে সে তেড়ে আসে কামড়াতে। আরও জোরে মারতে পারলে সে পালায়—কারণ, পশুশক্তি সে-ক্ষেত্রে যে মারে তার বেশী; কারণ, পশুত্বের উপরের যে কথা, যা দিয়ে সে মার খেয়েও নিজেকে অন্যায়ের কাছে হার মান্‌তে দেবে না, কুকুরের তা নেই। তার শক্তির সীমা ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু নৈতিক বলের ত কোন সীমা নেই, তাই তাকে ক্রুশে বিদ্ধ ক'রে মারলেও সে জয়লাভ করে; তাকে মশাল ক'রে পুড়িয়ে মারলেও সে মরে না, হাতীর পায়ের তলায় ফেললেও না। নিতান্ত উত্তেজিত না-হয়ে এই কথাটা যদি ভেবে দেখ যে একটা মৃতকল্প ঘোড়াকে চাবুক মারলেই তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না, তাহ'লে এই কোটি কোটি দুর্ব্বল, নিরন্ন মূঢ় ভাইবোনদের সম্বন্ধে তোমার করুণা হবে। সত্যদা বলেছিলেন যে 'হাজার বছরের চাপে যার শিরদাঁড়া নুয়ে পড়েছে তার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আসবে কোথেকে? সেই বাঁকা শিরদাঁড়াটার রীতিমত চিকিৎসা চাই আগে, তা নইলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে'। ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে একথা যদি ভুলে যাই, তবে ক্রোধের বিলাসে নরহত্যার পাপেই লিপ্ত হ'তে হবে, আর কিছু হবে না।"

সীমা চুপ করে থাকে। তার মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুনে নিখিলনাথের কথাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে উত্তেজিত হয়ে নিখিলনাথকে "বিলাতী মোহগ্রস্ত" বলে খোঁচা দেয়। নিখিলনাথ চুপ ক'রে শোনে। ও কথার কোন জবাব দেয় না; তবু সীমার অশ্রদ্ধায় তার মন ব্যথায় ভরে ওঠে। সীমা ক্রুদ্ধ মনে ভাবে, এমনি ক'রে ভাবতে গিয়ে চিরকাল আমরা কাপুরুষ হয়ে রইলাম। স্বাধীনতার মুখ আমরা কোনকালেই দেখতে পাব না। চিরকালটা যে তার জীবিতকালেই মাত্র সীমাবদ্ধ নয়, তা তার মন মানতে চায় না। ভাবতে চায় যে, এমন বিপ্লব উপস্থিত করবে যে যার ঝড়ে দেশের সমস্ত দুঃখ দৈন্য হীনতা একদিনে উড়ে যাবে এবং নিজ হাতে নিজেদের সুখসম্পদ স্বাধীনতার রাজপ্রাসাদ আলাদীনের প্রদীপের মত এনে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার উত্তেজিত মনের এই নাটকীয় কল্পনাকে সে মনে মনে দেশহিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে এক প্রকার তৃপ্তি পায়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উত্তেজনার বিলাসে তার মনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত জটিল দুরূহ শান্ত বিচারশীল পন্থাকে স্থির হয়ে চিন্তা করবার ধৈর্য্য তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। শান্ত ধীরতাকে সে কাপুরুষতা ব'লে মনে মনে ঘৃণা করতে থাকে। তবু একলা ব'সে ব'সে নিখিলের প্রতি নিজের উত্তপ্ত চিত্তের দুর্বাক্যের কথা স্মরণ ক'রে সে লজ্জিত হয়।

নিখিলনাথের সমস্ত শান্ত অনুপক্রুত ধারাবাহিক জীবনযাত্রায় দেশের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা তার উত্তেজিত চিত্তে যেন প্রহসন ব'লে মনে হয়। সীমা চায় সে-ক্ষেত্র থেকে তাকে সবলে উৎপাটন ক'রে দুর্দ্দম মৃত্যুপথযাত্রার দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তি দিতে। নিখিলনাথকে সে ফিরে পেতে চায় তার কর্ম্মপ্রেরণার সঙ্গীরূপে; বুদ্ধির উপর যে আলোকসম্পাত করবে, হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চার করবে, নিজের প্রাণের অমিত প্রাচুর্য্যে দুর্লঙ্ঘ্য বিপত্তিকে যে ধূলিসাৎ ক'রে দেবে। নিখিলনাথের শান্ত ধীরতাকে সে উদাসীনতা বলে মনে ক'রে তীব্র আঘাতে তাকে চেতিয়ে তুলতে চায়—কিন্তু তাতে দিনের পর দিন অশান্তি তার বেড়ে চলে। (ক্রমশঃ)

ভারতে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌ডি, বার-এট্‌-ল

ভারত পল্লী-প্রধান ও পল্লী-প্রাণ। পূর্ব্বে ভারতের পল্লী-গুলির যে শ্রী-সম্পদ ভারতকে "সোনার ভারত" নামে পরিচিত করিয়াছিল তাহার বহুলাংশই এক্ষণে নষ্ট হইয়াছে। আজ যে ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশার ব্যাপার এত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে পল্লীগুলির প্রতি লোক- ও জনমতের ঔদাসীন্য ও ইহার উন্নয়নে নিশ্চেষ্টতা। এই ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার ফল বহুকাল হইতে সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত হইয়া এক্ষণে এক বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহা যে এক ভয়াবহ ব্যাপার তাহা এক দিকে দেশের লোক যেমন এক্ষণে বুঝিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষও তাহা বুঝিতেছেন, এবং ইহা নিবারণে যে উভয়েরই এক প্রধান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে তাহাও তাঁহাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পল্লী-উন্নয়নের কথা ও তাহা বিধানের চেষ্টা এক দিকে যেরূপ দেশের নেতাদের আদর্শ হইয়াছে, অপর দিকে গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষও তাহাতে অবহিত হইয়াছেন। ইহা যে দেশের পক্ষে পরম কল্যাণের বিষয় সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য।

যদিও ব্রিটিশ শাসনাধীনে কতকগুলি সহর প্রভৃতির উদ্ভব হইয়া অনেক ভারতীয়ের এক অভূতপূর্ব্ব ভাগ্যোন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা পল্লীগুলির উন্নয়ন সাধিত বা তাহার সাধনকার্য্যে যদি সহায়তা না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য ভারতকে শ্রী-সম্পদশালী বলা যায় না, এবং কালে বা পরিণামে পল্লীবাসীদের এই চরম দুরবস্থা যেমন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের অবস্থাকে অভিভূত করিতে পারে, তেমনি অপর দিকে ইহা ভারতের সুখ-সমৃদ্ধির পথেও বাধা বা কণ্টক-স্বরূপ হইতে পারে। এক্ষণে ভারতে যে অর্থনৈতিক সমস্যা বা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দেশের নেতারা ও গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষও ইহার যাথার্থ্য বেশ অনুভব করিতেছেন বলা যায়। সেই জন্য সকলেরই দৃষ্টি এক্ষণে এই দিকে এত পতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে ভারতে এক্ষণে কি কার্য্য হইতেছে তাহার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যদিও ভারতে রাজনীতিক আন্দোলন উদ্ভবের প্রারম্ভ হইতেই দেশের নেতাদের ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতে রাজকর্ত্তৃপক্ষেরও প্রজা প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতির দিকে দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি যে-ভাবে এই দিকে কি দেশের নেতাদের, কি রাজ-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহার এক বৈশিষ্ট্য আছে বলা যায়। কি ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে, কি গভর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসননীতিতে এক্ষণে রায়ত প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতি বা এক কথায় পল্লী-উন্নয়নের প্রতি যে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে দেখা যায় তাহার স্থান শীর্ষে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এবং এ-কথা উল্লেখ করিলে উপযুক্তই হইবে যে, এ-বিষয়ে বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতারা অগ্রণী হইয়া যে জনমত জাগ্রত করিতে সমর্থ হন তাহাতে এক দিকে যেমন দেশের নেতা প্রভৃতিরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষও এ-বিষয়ে অধিকতর অবহিত হইয়াছেন। এক্ষণে কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ভারতের পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য কিরূপ চলিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমে কংগ্রেসের প্রচেষ্টার কথা ধরা যাক। গত কয়েক বৎসর হইতে কংগ্রেস ভারতের পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে যাহা করিয়াছেন তাহার বিষয় অল্পবিস্তর অনেকেই অবগত আছেন। কংগ্রেসের ন্যায় দেশের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দিকে অধিকতর দৃষ্টি ন্যস্ত করা যে এক অতি উপযুক্ত ও প্রশংসনীয় কার্য্য সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য। মহাত্মা গান্ধী কিছু কাল পূর্ব্বে যে তিলক স্বরাজ ফণ্ড তুলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উক্ত কার্য্য সাধনার্থ মজুত রাখায় কংগ্রেসের এ-বিষয়ে অধিক কার্য্য করিবার

সুযোগ ও সঙ্গতি হয়। কিন্তু অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাজনৈতিক ব্যাপারেই অধিকতর ন্যস্ত থাকায় এ-বিষয়ে যতটা কার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল বা লোকে আশা করিয়াছিল তাহা হয় নাই। পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে কংগ্রেসের কার্য্য যে যথেষ্ট বা আশানুরূপ হয় নাই তাহার প্রমাণ পরে গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইতেই বেশ পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি যখন রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যেই নিয়োজিত করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার উক্ত গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। তিনি ইহার জন্য ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক অর্থও সংগ্রহ করিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা দেশ হইতে যে প্রায় লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল সে-কথা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে। এই সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় হইয়াছে বর্ধা (Wardha) সহরে। শেঠ যমুনালাল বাজাজ ইহার জন্য একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ও ৪৫ বিঘা জমী এক কালে দান করিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশে এই সঙ্ঘের কার্য্য খাদি-প্রতিষ্ঠান মারফতই চলিতেছে। উক্ত গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, উক্ত সঙ্ঘ এক্ষণে প্রধানতঃ গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার্য্য দানের ব্যবস্থাতে মনোযোগী হইয়াছেন। ইহার দ্বারা কুটীর-শিল্পেরও প্রকারান্তরে সাহায্য করা হইবে। সঙ্ঘ গুড় প্রস্তুত, নারিকেল-ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত, কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত, চামড়া কষ করিয়া তাহা হইতে জুতা তৈরি করা, সয়া শিমের চাষ, প্রভৃতি কার্য্যে লোককে উৎসাহ দান করিতেছেন। এই সঙ্ঘের কার্য্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিরূপ চলিতেছে তাহার বিষয় আলোচনা না করিয়া আমাদের বাংলা দেশে ইহা কিরূপ চলিতেছে তাহার বিষয় দুই-চারি কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। প্রবাসীর গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যায় খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে এ-বিষয়ের খবর পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। বাংলা দেশে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি কি করিতেছেন তাহার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রতিষ্ঠানটি যে-ভাবে কতকগুলি গ্রামকে কোন কোন বিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে ও কুটীর-শিল্প প্রভৃতির উন্নয়নে মনোযোগী হইয়াছেন তাহা উপযুক্ত ও প্রশংসনীয়ই হইয়াছে।

উপরে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে কংগ্রেসের প্রচেষ্টার কথা বলা হইল, এক্ষণে উক্ত কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টার কথা সংক্ষেপে কিছু বলিব, কারণ এক্ষণে সকলেই দেখিতেছেন যে কর্ত্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। অবশ্য এ-কথা বলিলে ভুল হইবে যে, পূর্ব্বে এ-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কোনও চেষ্টা ছিল না, কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে রায়ত প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই অবাহত ছিলেন। তবে এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে এ-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যতটা মনোযোগ বা চেষ্টা ছিল তাহাপেক্ষা এক্ষণে তাহা অনেক গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ বর্দ্ধিত হইবার কারণও আছে। আমি গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতের পল্লীগুলির দুঃখ-দুর্দ্দশা বা শ্রীহীনতার জন্য ভারতীয় জনমতের ঔদাসীন্যও দায়ী। এ-কথা কেবল ভারতের পক্ষে নহে, স্বাধীন দেশের পক্ষেও সত্য, জনমতই জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রক্ষাকর্ত্তা। এবং বলা যায় যে এক্ষণে কংগ্রেস সেই জনমত দেশে জাগ্রত করিয়া রাজকর্ত্তৃপক্ষকে দেশের এই গঠনমূলক কার্য্যে অধিকতর অবহিত করিয়াছেন। তার পর আর একটি কথাও আছে। অনেক ভারতীয়ের এত দিন মনোভাব ছিল যে, লোকের সকল অভাব-অভিযোগ নিবারণ করা বা তাহার উপায় অবলম্বন করার কর্ত্তব্য প্রধানতঃ গভর্ণমেণ্টেরই, ইহা ভ্রান্ত। এমন কি ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশেও দেখা যায় যে, জনহিতকর অধিকাংশ কার্য্য বা ব্যাপারে লোকেরাই প্রথম অগ্রণী হন, এবং গভর্ণমেণ্ট পরে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। কাজেই আমাদের দেশেও যে অনুরূপ উদ্যোগের বিশেষ আবশ্যকতা আছে সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, কংগ্রেস এক্ষণে দেশের এরূপ এক গঠনমূলক কার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেশীয় পক্ষে যে এই কর্ত্তব্যের

অবহেলা দূর করিয়া এক উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছেন তাহার বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইঁহাদের উদ্ভাবিত স্কীম্ বা উপায় কোন কোন ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া কার্য্যকরী করিতেও প্রস্তুত। তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই। হয়ত কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন যে, দেশবন্ধু দাশ তাঁহার জীবিতকালে বাংলার গ্রামগুলি হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে স্কীম্ প্রস্তুত করেন, বাংলা গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ তাহা উপযুক্ত বোধে গ্রহণ করিয়া যে বহুল অর্থ প্রতি বৎসর এই নিমিত্ত ব্যয় করিয়া থাকেন ও তাহার জন্য দেশবন্ধুর প্রতি নিজেদের ঋণ স্বীকারও করিয়া থাকেন, তাহা হইতেই উক্ত বাক্যের যাথার্থ্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, এ-বিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া এক্ষণে পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বাংলা-গভর্ণমেণ্টের কার্য্য কোন্ পথে ও কি ভাবে উদ্ভূত হইয়া চলিতেছে তাহার বিষয় কিছু বলা যাক।

সকলেই অবগত আছেন যে পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে এক্ষণে ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির যে ব্যাপক ও অধিকতর চেষ্টা চলিতেছে তাহা সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্র-গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে প্রায় দুই কোটী টাকা নিজ তহবিল হইতে দান করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। এই দান হইতে বাংলার ভাগ্যে মোট ৩৪ লক্ষ টাকা পড়িয়াছে। ভারতের কেন্দ্র-গভর্ণমেণ্টের এই দান মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষিত হওয়ায় অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, কংগ্রেসের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে অবহিত হইয়াছেন, ইত্যাদি। যাহা হউক, এখানে এই রাজনীতিক প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে বাস্তবিক কংগ্রেসের এই জনহিতকর কার্য্য যদি গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত কর্ম্মে অধিকতর অবহিত করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে গভর্ণমেণ্টের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই এবং এ-বিষয়ে কংগ্রেসের নিকট নিজেদের ঋণ স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। তবে এই ধারণা লোকের মনে হইলে বোধ হয় খুবই দুঃখের কারণ হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট উক্ত কর্ম্মের দ্বারা কংগ্রেসের কার্য্যকে নষ্ট করিতে চাহেন, কারণ ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে ও যেখানে লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশাও অতি প্রবল, সেখানে কোনও এক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিশেষ কিছু হওয়া কখনও সম্ভব নহে। এক দিকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে তাঁহাদের অর্থ ও সামর্থ্যই এই কার্য্যে যথেষ্ট তাহা যেমন ভ্রান্ত, সেইরূপ অপর দিকে যদি কংগ্রেসের বা দেশের লোক মনে করেন যে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের চেষ্টাই এ-বিষয়ে যথেষ্ট, তাহাও সেইরূপ ভ্রান্ত। বাস্তবিক কেবল দেশের মঙ্গলের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া যদি উভয়ে এক-যোগে কার্য্য করেন তবে ত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমই হয়, আর তাহা না হইলেও যদি উভয়ের লক্ষ্য একমাত্র দেশের হিতের প্রতি নিহিত থাকে তাহা হইলেও শুভফল অধিকতর প্রসূত হয়। বাস্তবিক উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি যদি প্রধানভাবে একমাত্র দেশের মঙ্গলের উপরই ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে পরস্পরের উপর এই ব্যাপার লইয়া সন্দেহের কারণ থাকে না ও তাহা দেশের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলেরই কারণ হয়।

পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে ভারতের চারি দিকে এক্ষণে যে ব্যাপক উদ্যম চলিতেছে তাহার সকলগুলির বিষয় আলোচনা না করিয়া বাংলা দেশে যে কার্য্য হইতেছে সংক্ষেপে তাহার মূল ভাব ও বিষয় আলোচনা করিলে গভর্ণমেণ্টের নীতির ও কার্য্যের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত বৎসর বাংলা-গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্র-গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট হইতে যে ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন তাহা পল্লী-উন্নয়নের নানা ব্যাপারে কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার বিবরণ গভর্ণমেণ্ট-প্রকাশিত নানা রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়, এবং তাহা পাঠকবর্গেরও নিকট অবিদিত নহে। কেন্দ্র-গভর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়া বাংলা-গভর্ণমেণ্ট উহা ব্যয়ের যে স্কীম্ করেন তাহা গত বৎসর জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হয় ও তাহা লইয়া কাউন্সিলেও আলোচনা হয়। পল্লী-উন্নয়নের কোন্ কোন্ ব্যাপার ব্যপদেশে গবর্ণমেণ্ট কত টাকা ব্যয় করিতে চাহেন তাহার একটি তালিকাও প্রকাশিত হয়, যাহার বিষয় পাঠকবর্গের এখনও স্মরণ থাকিতে পারে। এই তালিকায় দেখা যায় পল্লীগুলির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি নানা ব্যাপারের উন্নতিসাধনকল্পে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য নিবদ্ধ হয়, এবং ইহার জন্য উক্ত প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কি কি ভাবে উক্ত অর্থ নানা ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণই সংবাদপত্রাদিতে

প্রকাশিত হওয়ায় তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এই বৎসর বাংলা-গভর্ণমেণ্ট পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য যে আরও ১৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন তাহার ব্যয়ের সম্পূর্ণ স্কীম্ এখনও প্রকাশিত না হইলেও ইহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে এই অর্থ যথেষ্ট না-হওয়ায় উহা অনেকগুলি ব্যাপারে ব্যয়িত হওয়া অপেক্ষা কয়েকটি বাছা বাছা নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে, যাহাতে ইহার দ্বারা সেই সেই ব্যাপারে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে। এই বিষয়ে জনসাধারণ ও দেশের নেতাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য—কর্ত্তৃপক্ষকে জানান কোন্ কোন্ বিষয়ে পল্লীগুলির অভাব-অভিযোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও যাহা নিবারণের আবশ্যকতাও সর্ব্বাগ্রে। সুখের বিষয় এই যে, জনসাধারণ এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা-কর্ম্মচারীদের সহিত এ-বিষয়ে সহযোগ করিতেছেন।

এ-কথা সকলেই অনুভব করেন বা বুঝেন যে, বাংলার ন্যায় এক বিশাল দেশে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উক্ত অর্থ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য অল্প বা অযথেষ্ট। এ-কথা যেমন জনসাধারণ অনুভব করেন, তেমনই গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষও তাহা অবগত আছেন। এবং এইরূপ অর্থদান যখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি বৎসর পাইবার আশা নাই তখন কেবল অর্থের দ্বারা উক্ত কার্য্য যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কত অল্প। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা হইতেছে পল্লীবাসীদের স্ব-স্ব গ্রামের উন্নতি বা সংস্কারকার্য্যে স্বতঃপ্রণোদিত ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া ব্রতী হইবার জন্য প্রেরণা দান বা উদ্বোধন। জেলা কর্ম্মচারীরা স্ব-স্ব জেলার প্রধান প্রধান লোকদের সহিত মিলিত হইয়া খাল-পুষ্করিণী খনন, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতির ন্যায় কার্য্য নিজেরা স্বহস্তে করিয়া পল্লীবাসীদের প্রেরণা দান বা উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। তাহার উপর যাহাতে পল্লী-বাসীদের উদ্যম এ-বিষয়ে অধিকতর প্রাণবান্ ও গতিশীল হয় তাহার জন্য পুরস্কার প্রদান করিয়া এক প্রতিযোগিতাও স্থাপন করিয়াছেন। ইহা "আদর্শ গ্রাম প্রতিযোগিতা" নামে বিদিত। এই উপায়ের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষ বাংলার বিভিন্ন জেলায় কিরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারও বিবরণ সংবাদপত্রগুলিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হওয়ায় এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাস্তবিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের এই নূতন উপায়ের দ্বারা পল্লীবাসীরা নিজেদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া যে অপরের অপেক্ষা না রাখিয়াই স্ব-স্ব পল্লীর যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারিবে সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য, এবং যিনি এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাঁহাকেও সমূহ প্রশংসা দান করিতে হইবে। এক্ষণে দেশের অন্য যাঁহারা পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের পল্লীবাসীদের স্বকর্ত্তব্যবোধে উক্তরূপ উদ্বুদ্ধ করার উপায়টি বিশেষ অনুকরণীয়। অর্থের সাহায্য অপেক্ষা ইহার দ্বারাই পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য বহুল পরিমাণে অধিকতর সম্ভব হইবে।

যাহা হউক, উপসংহারে আমরা বলিতে চাহি যে, যখন একেবারে অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্ভব নহে, তখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই হউন্ বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই হউন্ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য অধিক অর্থ মজুত রাখিবার কর্ত্তব্যটি ভুলিবেন না, এবং তাঁহাদের উচ্চ কর্ম্মচারীরা এক্ষণে যেভাবে পল্লীবাসীদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিতেছেন তাহা হইতেও নিবৃত্ত হইবেন না। কারণ, যে কারণেই হউক, গভর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তার যেভাবে লাঘব ঘটিয়াছে তাহা দূর করিবার উপরিউক্ত কর্ম্মই প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। লোকেরা যদি দেখেন ও বুঝেন যে রাজকর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিকই তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এক্ষণে দেশীয় লোক অপেক্ষা অধিকতর উন্মুখ ও আগ্রহশীল তাহা হইলে ইহার দ্বারা সহজেই তাঁহারা যেরূপ জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে পারিবেন, তেমনি অপর দিকে দেশীয় নেতাদেরও প্রশংসাভাজন হইতে পারিবেন।

বাউল-পরিবার
শ্রীমৈত্রী শুক্লা

অসাধারণ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কলিকাতার উপকণ্ঠে একখানি ছোট একতলা বাড়ী। জরাজীর্ণ, বার্দ্ধক্যের অবসাদে মুহ্যমান। সংস্কার অভাবে স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া গিয়াছে। বাহির হইতেই গৃহস্বামীর ঔদাসীন্য চোখে পড়ে। ভাঙাচোরা ইটের ফাঁকে ছোট-মাঝারি বহুবিধ জানা-অজানা গাছ জন্মিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখ ভাগেই একখানি বাগান; কিন্তু অযত্নে, অনাদরে সেখানে কাঁটা-শাক দেখা দিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। গোটা-কয়েক পেঁপেগাছও দেখা যায়।

সময় রাত্রি প্রায় এগারটা। একটি শীর্ণকায়া স্ত্রীলোক পলকহীন চোখে বাহিরের রুগ্ন রাস্তার প্রতি চাহিয়া আছে। চোখে মুখে আশঙ্কামিশ্রিত ব্যাকুল ভাব। চেহারা এক সময় ভালই ছিল, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে ছিল একটি স্নিগ্ধ কমনীয় ভাব। কিন্তু রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মাংসের একান্ত অভাব দেখা দিয়াছে তার দেহে। কপালের শিরাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট, গায়ের রং সাদা—চক্ষু কোটরে কিন্তু অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে সন্তধৃত বন্যপশুর ন্যায় হিংস্র। মেজাজ খিটখিটে—একটুতেই চটিয়া উঠে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও ঘটিয়াছে পরিবর্ত্তন।

সারা বাড়ীতে মানুষ মাত্র দু-জনা—স্বামী এবং স্ত্রী। সুশান্ত ও রাণী। ছেলেপিলে নাই। হইবার আশাও দেখা যায় না। বয়স গড়াইয়া গিয়াছে। যদিও এ-বয়সে হয়, কিন্তু রাণী তাহা স্বীকার করে না। তা ছাড়া ওর মতে তাদের ঘরে শিশুসন্তানের আবির্ভাব না-হওয়াই মঙ্গলজনক।

সুশান্ত নিয়মিত আপিস করে একটা সওদাগরী কোম্পানীতে। বেতন সামান্য, কোন রকমে কায়ক্লেশে নিজের মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিবার মত। নিরিবিলি লোক—আপিস এবং বাড়ী এই দুই হইল তার দুনিয়ার সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা। কথা সে অত্যন্ত কম বলে—চলাফেরা হইতে আরম্ভ করিয়া তার কথা বলা পর্য্যন্ত রুটিন-বাঁধা। এর এতটুকু ব্যতিক্রম আজ দু-বছরের মধ্যে রাণীর চোখে পড়ে নাই।

রাণী অশান্ত চরণে এ-ঘর ও-ঘর করিতেছিল।...সেই কোন্ সন্ধ্যারাতে সে রান্নাবান্না করিয়া বসিয়া আছে, আর আজই কিনা তাঁর যত রাজ্যের কাজ দেখা দিয়াছে। আশ্চর্য্য লোক যাহা হউক!—এমন লোক লইয়া মানুষের সংসার চলে কি করিয়া?

দীর্ঘ দুটি বছরের একঘেয়ে ইতিহাস রাণীর চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। চিন্তাধারা তার অন্য পথ ধরিয়া চলে। কলিকাতা শহর...রাণী ভাবে...প্রতি মুহূর্ত্তে কত রকম বিপদের...কথাটা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়া দেখিতে গিয়া সে বারম্বার শিহরিয়া ওঠে। তার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তের দাপাদাপি সুরু হয়।

জ্যোৎস্না রাত। ও-পাশের বড় পেঁপেগাছটার ছায়া আসিয়া আঙিনায় পড়িয়াছে। সেই দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই রাণী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু সুশান্ত আসিল না। রাণী ভাবে, ফিরিয়া আসিলে বেশ শক্ত দু-কথা শুনাইয়া দিবে। মরণ তার নাই, নইলে এ-রোগেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে! কপালে এমন দুর্ভোগ না থাকিলে...বাহিরে ডাক শোনা গেল,—শুনছ, দরজাটা খুলে দাও না।

রাণী যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল এমনই ভাবে মুখ করিয়া উঠিল,—আজকের রাতে আর না ফিরলেই পারতে! কিন্তু দরজা খুলিয়া দিয়াই সে বদলাইয়া গেল। বলিল, আচ্ছা বাড়ীতে যে একটা রোগা লোক প'ড়ে রয়েছে সেকথা কি একবারও ভেবে দেখতে হয় না? একে ভুগছি রোগের জ্বালায় তার ওপর আবার জোটাচ্ছ নানা উপসর্গ। আমার কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম—মেয়েমানুষ—কিন্তু এমনি অনিয়মে নিজের শরীর টিকবে কি ক'রে শুনি? এ সাধারণ কথাটা তুমি বোঝ না কেন?

এ-প্রশ্নের পাণ্টা উত্তর ইচ্ছা করিলে সুশান্ত অনায়াসে

দিতে পারিত, কিন্তু সে সেদিক দিয়া গেল না বরং কথাটা তার এক প্রকার মানিয়াই লইল এবং ধীরে ধীরে কপাটটা অর্গলরুদ্ধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, রাত একটু বেশী হয়ে গেছে। কি করি, সুপ্রিয় কিছুতেই ছাড়লে না।

রাণী নির্লিপ্ত গলায় কহিল, তাও কি কখনও হয়! থাক না বাড়ীতে একটা রুগ্না স্ত্রী! একটু থামিয়া সে পুনশ্চ কহিল, নাও, এবারে খেয়েদেয়ে আমায় রেহাই দেবার ব্যবস্থা কর। কত আর বইব এ রোগা শরীর নিয়ে।

সুশান্ত ভীত কণ্ঠে কহিল, কোন কথাই তুমি শুনবে না তা আমি কি করব। ঠিকে ঝি একটা রেখে দিলাম—তুলে দিলে। কারণ দেখালে, দু-জনার দু-খানা বাসন বইত নয়। রোগা শরীর নিয়ে খেটে মরবে অথচ আমার প্রত্যেক কাজে জোর ক'রে দেবে বাধা। তোমার এই খামখেয়ালীর জন্যই ত এত কষ্ট পাচ্ছ।

রাণী ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল, রাত দুপুরে বড় যে উপদেশ দিচ্ছ দেখছি, কিন্তু, জিজ্ঞেস করি, সব দিকে দৃষ্টি আছে তোমার? যার কিছুই বোঝ না তা নিয়ে জ্বালাতন ক'রো না।—আমার ঘুম পেয়েছে।

সুশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, তোমার রাতের ওষুধটা খেয়েছ? উত্তরে রাণী মাথা নাড়িল, কহিল, ওষুধ খেয়ে যখন কোন কিছুই হচ্ছে না তখন অনর্থক আর শরীরের ওপর এ জুলুম কেন? আচ্ছা তুমিই বল না, এ রোগে ডাক্তার-বদ্যিই বা কি ক'রবে আর ওষুধ খেয়েই বা কি হবে? তার চেয়ে কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

সুশান্ত কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। রাণী পুনশ্চ কহিল, দিনরাত তোমায় বলছি কিন্তু আমার কথায় কান ত দেবেই না বরং আরও বেশী ক'রে করবে মাখামাখি। এতে যে নিজেরই ক্ষতি করছ এ সহজ কথাটাও তুমি স্বীকার করবে না।

একটা উত্তরের আশায় রাণী উৎকর্ণ হইয়া ওঠে। সুশান্ত নীরব, রাণীর এই উক্তির মধ্যে সে এক বিন্দুও সত্য খুঁজিয়া পায় না। বোঝে সে যে ইহা তার মুখের কথা মাত্র। স্বামীকে একটু বাজাইয়া দেখিবার উৎকট ইচ্ছা মাত্র।

সুশান্ত বহুবার চেষ্টা করিয়াছে তাকে রাঁচি পাঠাইতে। ওখানে রাণীর এক ভাই পাগলা-গারদের ডাক্তার। কিন্তু সে কোনমতেই রাজি হয় নাই। ওর মতে রাঁচির আবহাওয়ায় তার শরীর কিছুতেই জোড়া লাগিবে না বরং ভাঙিয়া পড়িবে। মানুষের প্রকাশ্য অবহেলা সে বরদাস্ত করিতে পারিবে না। তার মনে অশান্তির সৃষ্টি করিবে যাহা বায়ুপরিবর্ত্তনের পক্ষে মোটেই অনুকূল হইবে না। তার চেয়ে যে-কটা দিন সে বাঁচিয়া থাকিবে অন্যত্র এক পা নড়িবে না। এ যেন তার প্রতিজ্ঞা। ওর দুর্ব্বলতা যে কোথায় সুশান্তর তাহা অজ্ঞাত নহে, তাই চেষ্টা করিয়াই সে নীরব থাকে, পাছে অজানিত ভাবে কোন আঘাত করিয়া বসে এই আশঙ্কায়।

সুশান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে আমার চলে কি ক'রে রাণী? কত বড় অপদার্থ যে আমি তা কি তোমার জানতে বাকী আছে? তবুও বার-বার ঐ এক কথা শোনাবে।

রাণী নীরব।

সুশান্ত পুনশ্চ কহিল, কতগুলো বাজে চিন্তা ক'রে তুমিও মিছে কষ্ট পাও, আমায়ও দুঃখ দাও। মোট কথা, তোমার অন্যত্র যাওয়াটা আমি চাই নে। কিন্তু এ-বিষয় আলোচনা করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে। তার চেয়ে তুমি খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে নাও।

বিস্মিত কণ্ঠে রাণী প্রশ্ন করিল, আর তুমি?

তার বিস্ময়ে সুশান্ত লজ্জিত হইল, সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল, আমার তেমন খিদে নেই···তা ছাড়া সুপ্রিয় কিছুতেই ছাড়লে না।

রাণী কিছু সময় নীরবে কি ভাবিল। কহিল, যা খুশী করো, আমি কেন মিছে ভাবতে যাই।···আর তাই ত ভাবি, আজকাল খেতে ব'সে আর হাত চলে না কেন! আমার রান্নায় সত্যি যদি তোমার অরুচি ধরে থাকে তা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেই হয়—আর হেঁসেলে যাব না। আমারও হাড় জুড়বে তোমারও হয়ত দুটো ভাল খাওয়া জুটবে।

সুশান্ত বিস্মিত হইল না। এমনই বৃথা তিরস্কার আজকাল প্রায়ই তাহাকে শুনিতে হয়। ওর মনের বিকৃত চিন্তাধারা আজকাল এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছে। এই উপায়েই রাণী আজকাল তাহাকে ব্যথা দেয়। কোন দিক

দিয়া স্বামীর সামান্য ত্রুটিও তার অসহ্য। রাণীর ব্যবহারে সুশান্ত কখনও প্রতিবাদ করে না বরং পাশ কাটাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতেও অব্যাহতি নাই। মুখের উপর সোজা ভাষায় রাণী বলিয়া ওঠে, দেহে তার দুরারোগ্য ব্যাধি আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই তার এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য···।

নিজের কথা রাণী সব সময় ভাবে। তার সঙ্গ যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই পরিত্যাজ্য এ-কথাও সে ভাল করিয়া অনুভব করে। তথাপি সে মনের দুর্ব্বলতা গোপন রাখিতে পারে না। স্বামীর নিকট হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিতে রাণী চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তার আত্মা সায় দেয় নাই। মৃত্যু তার অবধারিত···সে আসিতেছে দ্রুত···রাণীর কানে সে ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে···সে মরিয়া হইয়া ওঠে··· ভুলিয়া যায় নিজের কথা, সুশান্তর কথা···তার সঙ্কল্পের কথা।

রাণী মুখ তুলিয়া সুশান্তর প্রতি চাহিল। কহিল, কাল শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ডেকে দাও নি তাই উঠতে হ'ল বেলা। সকালে আপিস করতে গেলে দুটি ভাতে ভাত খেয়ে, ভাবলুম, আমাকে দিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত যথেষ্টই পাচ্ছ। ও-বাড়ীর চাকরকে ব'লে-ক'য়ে একটু মাংস আনালাম কিন্তু যার জন্যে এত ভাবনা তিনি এলেন বন্ধুবাড়ী থেকে ভূরিভোজন ক'রে। রাণী লঘুপদে প্রস্থান করিল।

সুশান্ত এ-অভিযোগেরও কোন উত্তর দিল না। বন্ধুর সহিত আজই তার দেখা হইবে,—সেও না খাওয়াইয়া ছাড়িবে না,—আর এমন দিনেই কিনা রাণীর খেয়াল হইবে তাকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার, এ-সংবাদ সে পূর্ব্বে পায় নাই। সে ভবিষ্যৎদর্শী নহে কিন্তু রাণী যখন রাঁধা-ভাতে জল ঢালিয়া মিনিট-কয়েকের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল তখন আর সুশান্ত চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, অসুখ অনেকেরই হয় কিন্তু তাইতেই যে এমন পাগল হ'তে হবে তার কোন মানে নেই। এই যে না-খেয়ে শুয়ে পড়লে এতে দুঃখ কি শুধু আমিই পাব, না কষ্ট তোমারও হবে?

রাণী মুখ করিয়া উঠিল, যাও যাও, তোমাকে আর বেশী মায়া দেখাতে হবে না। কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিও, হেঁসেলে আমি আর যাচ্ছি নে। এ-সব পাগল নিয়ে তোমার চলবে না। রাণী পাশ ফিরিয়া শুইল। অনেক সাধ্যসাধনায়ও আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু প্রাতঃকালে উঠিয়াই রাণী নবোদ্যমে লাগিয়া গেল সাংসারিক কাজে। অথচ সুশান্ত সারারাত ঘুমাইতে পারে নাই। একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুক্ষণ তাহাকে পীড়া দিয়াছে। গত রাত্রের ঘটনার জন্য সে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিয়াছে। কি এমন অন্যায় হইত একটা মিথ্যা বলিলে। স্ত্রী-দত্ত আহার্য্য কিছু সময় নাড়াচাড়া করিয়া শারীরিক অসুস্থতার নিদর্শনে না-হয় উঠিয়া পড়িত। সুশান্ত নিষ্পলক চোখে চাহিয়া থাকে, দেখে, কেমন করিয়া দুখানি ক্ষীণ দুর্ব্বল হাতে রাণী পরম আগ্রহে স্বামীর ভোজের ব্যবস্থা করিতেছে। কি অদ্ভুত তার তৃষ্ণা, তার মনের খেয়াল। একটি বেলা নিজে হাতে রাঁধিয়া সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে না পারিলে প্রবল অভিমান তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সুশান্ত বাধা দেয় নাই। স্ত্রীর কোন কাজে বাধা দিয়া তার আত্মতৃপ্তির ব্যাঘাত সে ঘটাইবে না। তাই সে নির্লিপ্ত··· তাই সে অনাসক্ত।

শহরের নির্জ্জন প্রান্তে অসহায় অনাথ বাড়ীখানিতে এই যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম এক সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া স্বতন্ত্র গতিতে অগ্রসর হইতেছে, এ খবর কজনা রাখে? অথচ প্রতিদিন দু-বেলা ঠিক এমনি করিয়াই চলিয়া আসিতেছে আজ দীর্ঘ দুটি বছর ধরিয়া। এমনই হাসি-অশ্রু, মান,-অভিমানের একটি উদাস আবহাওয়ার সহিত সুশান্ত নিজেকে চমৎকার মানাইয়া লইয়াছে। বিরক্তি নাই, অবসাদ নাই। দম-দেওয়া ঘড়ির ন্যায় ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ সে পরিত্যাগ করিয়াছে—কি জানি স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধির বীজাণু যদি তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। কেন সে অপর দু-জনা সুস্থ সবল মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে যাইবে?

রাণীকে সে শ্রদ্ধা করে—ভালবাসে। সাধারণের কাছে সে বাতিল হইয়া গেলেও সুশান্তর কাছে সে পরিপূর্ণ নারী—তার সহধর্ম্মিণী। আহা, বেচারা রাণী! ঐ ক্ষীণ

অসমর্থ দেহ লইয়াও তাহার সম্বন্ধে কতখানি সচেতন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন বোঝে না। ওর আন্তরিকতার কোন মূল্যই তাহারা দিতে চায় না। রাণীকে তাহারা পাগল আখ্যা দিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহাকেও তাহার অবিবেচনাপূর্ণ বিচারবুদ্ধি দেখিয়া। রাণীকে নাকি তাহার ত্যাগ করাই উচিত—তাহাকে না হইলেও অন্ততঃ তাহার সংসর্গ। কিন্তু সুশান্ত সে-কথায় কান দেয় নাই। তাহাকে কেমন নেশায় পাইয়াছে।

রাণী শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সুশান্ত তাহা টের পাইল কিন্তু তাহাকে না দেখা গেল ব্যস্ত হইতে, না কোনপ্রকার নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে। নীরবে হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া সে উপবেশন করিল। যেন এমনি একটি ঘটনার সহিত তাহার জীবনের কোথাও সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। সুশান্ত নির্ব্বাক, সংসারে তাহার বন্ধন নাই তাই সে এমন উদার, তাই সে নিজের সম্বন্ধেও এমন চেতনাহীন। এই ত জীবন, তাহার যৌবন-স্বপ্নের একটি স্থূল পরিণতি। আত্মীয়স্বজন একে একে প্রায় সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্ষয়-রোগগ্রস্তা স্ত্রী লইয়া বসবাস করিবার জন্য আজ সে সকলের কাছেই অপরাধী।

সুশান্ত পরম স্নেহে স্ত্রীর কপালের উপর একখানি হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আবার জ্বর দেখা দিয়েছে?

কণ্ঠস্বরে নাকি তার হতাশার সুর, অন্ততঃ রাণীর তাহাই মনে হইল। সে হাসিল বড় করুণ হাসি। কহিল, জ্বর ত আজ আমার দশ-বারো দিন থেকেই দেখা দিয়েছে।

সুশান্ত শান্ত কণ্ঠে কহিল, অথচ আমায় এক দিনের জন্যেও তা জানাও নি—জানান দরকারও মনে কর নি!

রাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, জানিয়েই বা কি হ'ত? মিছে তোমায় ব্যস্ত ক'রে তোলা বইত নয়!

সুশান্ত ঈষৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

রাণী তাহাই লক্ষ্য করিল এবং করিয়াই কহিল, মিছে তুমি আমার ওপর রাগ করছ। সুশান্তর একখানি হাত সে নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। উভয়ে নীরব।

অনেকখানি রক্তবমনের ফলে রাণী আজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কথা বলিতে তার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না কিন্তু তথাপি সে কহিল, আমার এত কাছে তুমি আর এস না।

সুশান্ত বিস্মিত হইল। রাণীর মুখে আজ নূতন সুর।

রাণী পুনশ্চ কহিল, আমি বড় স্বার্থপর, শুধু নিজের কথাই ভাবতে শিখেছি কিন্তু এবারে বোধ হয় আর বাঁচব না। রাণীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুশান্ত ধীরে ধীরে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রাণী নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

ভাঙা মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ দেখা দিয়াছে। দূরে কতকগুলি কুকুর একসঙ্গে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। রিক্‌শ গাড়ীর শব্দ হইল, ঠং। সন্ধ্যার পরে এ-রাস্তায় গাড়ীঘোড়া বড়-একটা চলে না।

রাণী ডাকিল, সুশান্ত ঝুঁকিয়া পড়িল। বলিল, থাক কথা ক'য়ো না। রাণী মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, কেন কথা না বলবার কি হ'য়েছে আমার? একদিনেই আর কিছু মরছি নে। তুমিও যেমন, মরণ কি ছেলেখেলা? কালকেই হয়ত দেখবে যেমনকার তেমনি। আবহাওয়াটাকে সে একটু হাল্কা করিয়া লইতে চায়। সুশান্ত কথা কহিল না।

—তুমি কি রাগ করলে নাকি? রাণী কহিল, বেশ ত কথা না-হয় আর বলব না, কিন্তু না খেয়ে দেয়ে এমনি ক'রে ব'সে থাকলে চুপ ক'রেই বা মানুষ থাকে কি ক'রে? দুটি ভাতে-ভাত সেদ্ধ ক'রে নিলে হ'ত না? ক্লান্তিতে তার দু-চোখ বুজিয়া আসিল।

এমনি করিয়াই সুশান্তর দৈনন্দিন জীবন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। অনভিজ্ঞ হাতে নিজেকে রাঁধিয়া খাইতে হয়। স্ত্রীর পথ্যের ব্যবস্থাও সে নিজ হাতেই করে। একদিন মাত্র সে ডাক্তার ডাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর্থিক অনটন পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। অন্তর গুমরাইয়া ওঠে ভাষাহীন আবেগে, কিন্তু চোখের সম্মুখে এমনি করিয়া বিনা চিকিৎসায় রাণী ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—ইহাও অসহ্য। সুশান্ত মরিয়া হইয়া ওঠে। ভবিষ্যতের চিন্তা সে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলে।

সাত পুরুষের বাস্তুভিটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। অন্ততঃ প্রাণ ভরিয়া সে কিছুদিন মৃত্যুর সহিত লড়াই করিতে পারিবে। খানকয়েক ভাঙাচোরা ইটের স্তূপের পরিবর্তে আত্মার তৃপ্তিসাধনা কি বড় কম কথা!

দিনকয়েক ধরিয়া জীবন-মৃত্যু লইয়া চলিল প্রচণ্ড সংগ্রাম, কিন্তু মৃত্যু যাহার ললাটে আঁকিয়া দিয়াছে তাহার বিজয়বার্ত্তা, মানুষের চেষ্টা তার কি করিতে পারে!

সুশান্ত ভাবে তাহার বিগত জীবনের প্রত্যেকটি চঞ্চল মুহূর্ত্তের জীবন্ত ইতিহাসের কথা। রাণীকে সে বিবাহ করিয়াছে পনর বছর পূর্ব্বে। ছোট্ট মেয়েটি লাল চেলি পরিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুকের মধ্যে তাহার আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। তার পরে বিবাহ···বিদায়··· সবগুলি অনুষ্ঠানই সমাপ্ত হইল। তখন কে জানিত, এই কটা সামান্য গোনা বছরের মধ্যেই আবার নূতন করিয়া বিদায়ের বাঁশী বাজিয়া উঠিবে।

রাণীর চোখের দৃষ্টি এক সময় অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল। স্বামীর দেহে যেন কুৎসিত অকালবার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দিয়াছে। স্বামীকে এত কুৎসিত সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই। সে শিহরিয়া ওঠে, মৃদুকণ্ঠে বলে—দেহের গতি দিন দিন কি হচ্ছে তোমার। আমি স্বার্থপর, কোন দিকে না হয় আমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু নিজের ভাল যে অবুঝ সেও বোঝে।

সুশান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

রাণী পুনশ্চ বলে, আমার পাগলামিকে প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত হয় নি।

—তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, আমি আসছি। সুশান্ত চলিয়া গেল।

রাণী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে—চোখের কোণ বাহিয়া তাহার জলের ধারা নামিয়া আসে। হয়ত তাহারই অবিবেচনা এবং অন্যায় জেদের জন্য স্বামীর দেহ দিন দিন এমন শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। হয়ত তাহার কালব্যাধির কথাটা ভাবিতে গিয়াও রাণী বারংবার শিহরিয়া ওঠে, অথচ দুশ্চিন্তার তাহার অবধি নাই।

দিনকয়েক পরে—

সুশান্তর বাল্যবন্ধু শুভ্রাংশু আসিয়া উপস্থিত। বড় চাকুরে—বছর-কয়েক ধরিয়া নয়াদিল্লীতে আছে। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে ভগ্নীর বিবাহ দিতে। সুশান্তর নিকট আসিবার ইহাই একমাত্র কারণ। বাহিরের ঘরে সুশান্ত চুপচাপ বসিয়া ছিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ, দুশ্চিন্তার কালো দাগ চোখের নীচে সুস্পষ্ট। সহসা শুভ্রাংশুর উচ্চ কণ্ঠের আহ্বানে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। শুভ্রাংশু কহিল, বাড়ীখানাকে রীতিমত এক আশ্রম গড়ে তুলেছ যে শান্ত। সামনের অমন বাগানখানা,—অবশিষ্ট রয়েছে কতকগুলো আগাছা।

সুশান্ত ম্লান হাসিল। কহিল, ব'স শুভ্রাংশু।

শুভ্রাংশু আসন গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ কহিল, তোমার নিজের শরীর ত তেমন সুবিধে ঠেকছে না। অসুখবিসুখ যাচ্ছে নাকি? বৌ কোথায়? ছেলেপিলে কাউকে দেখছি নে ত?

ইহার উত্তরেও সুশান্ত হাসিল। শুভ্রাংশু বরাবরই একটু বেশী কথা বলে।

—হাসছ? শুভ্রাংশু জিজ্ঞাসা করিল।

—না হেসে কি করি? সুশান্ত কহিল, ছেলেপিলে ছিল কবে যে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করছ? আর তোমার বৌদি আছেন ওঘরে—শয্যাশায়ী। কিন্তু এসব কথা পরে হবে'খন—তুমি এ-সময় হঠাৎ কলকাতায়? ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে ত? মিণ্টু কত বড় হয়েছে?

শুভ্রাংশু উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই জন্যেই আসা, এ-মাসে মিণ্টুর বিয়ে। চল বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। সময় একেবারে নেই বললেও চলে।

—একটু বসবে না? এখনই উঠবে? সুশান্ত কহিল।

শুভ্রাংশু কহিল, বাধ্য হয়েই উঠতে হচ্ছে, নইলে আজ কত বছর পরে দেখা সে আমি ভুলে গেছি মনে কর? মাসখানেকের ছুটি নিয়েছি, এর পরে ঢের সময় পাওয়া যাবে। শুভ্রাংশু এক প্রকার জোর করিয়া সুশান্তর হাত ধরিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

স্বামীর সহিত শুভ্রাংশুকে দেখিয়া রাণী শায়িত অবস্থায় মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিল।

শুভ্রাংশু মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছেন যে আপনি। আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে এলুম যে, মিণ্টুর বিয়েতে আপনাকে ধরে নিয়ে যাব—দিনকয়েক আগের মত হৈ হৈ করব, আর এই সময় আপনি—একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, তাছাড়া আপনার রান্নার আমি এক জন কত বড় ভক্ত ছিলাম তা নিশ্চয় আপনি ভোলেন নি, সেদিক থেকেও এক প্রচণ্ড লোকসানের মধ্যে পড়ে গেলাম। কিন্তু অসুখটা কি? বলিয়া শুভ্রাংশু সুশান্তর প্রতি মুখ ফিরাইল।

—ওঘরে চল—সুশান্ত কহিল। রাণীর মুখে ম্লান ক্ষীণ হাসি।

পাছে রাণীর সুমুখেই শুভ্রাংশু একটা কাণ্ড করিয়া বসে এই আশঙ্কায় সুশান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়াও শুভ্রাংশু একই প্রশ্ন করিল।

নির্লিপ্ত গলায় সুশান্ত কহিল, যক্ষ্মা।

যক্ষ্মা! শুভ্রাংশু চমকিত হইল। বলিল, অথচ একে নিয়ে এমন সহজ ভাবে মাখামাখি করছ? কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠালেও ত পারতে?

—ইচ্ছে করলেই পারতাম না—পয়সার অভাব, তা ছাড়া তোমার বৌদির অন্যত্র যাবার ইচ্ছে নেই। ওর মতে আমার তাতে অসুবিধের শেষ থাকবে না—সুশান্ত কহিল।

—তার মানে? উনি ত একেবারেই বাতিল হয়ে গেছেন। ওঁর সংসর্গও যে প্রত্যেক মানুষের কাছে দুষ্ট। শুভ্রাংশু ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল।

সুশান্ত ম্লান হইয়া উঠিল। একটু আস্তে কথা বল শুভ্র, রাণী শুনতে পাবে। একটু থামিয়া একটু হাসিয়া সে পুনরায় কহিল, আমার কথা আলাদা, সাত-আট দিন পূর্ব্বেও আমি ওরই হাতের রান্না খেয়েছি।

শুভ্রাংশু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, খুব বাহাদুরি করেছ—এ যে কতবড় ছোঁয়াচে রোগ তা বুঝবার মত বয়স এবং অভিজ্ঞতা তোমার নিশ্চয় হয়েছে।

সুশান্ত শান্ত সংযত কণ্ঠে কহিল, সে কি আমি বুঝি না, কিন্তু তবুও দেখ, সকলেই আমায় উপদেশ দিতে আসে। তোমাদের মত সূক্ষ্ম বিচার-লিপ্সা যদি আমার না-থাকে তা বলে আমায় অবিচার ক'রো না। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ যে সকলেই আমায় ভুল করে—তারা বোঝে না যে ওকে সামান্য অবহেলা করতেও আমি কত বেশী ব্যথা পাই।

একটু থামিয়া সুশান্ত কহিল, রাণীর কথা তুমি ছেড়ে দাও শুভ্র—মরণের যাত্রী, কটা দিন আর বেঁচে আছে। আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনে তোমার বৌদির কোন অস্তিত্বই ছিল না। মনে কর আজও কেউ নেই—কেবল তুমি আর আমি মুখোমুখি ব'সে গল্প করছি। রাণীকে নিয়ে অনর্থক তোমরা ব্যস্ত হয়ো না—এ আমার অনুরোধ।

অত্যধিক উত্তেজিত কণ্ঠে শুভ্রাংশু কহিল, বিয়ে শুধু তুমিই কর নি—আমরাও করেছি।

সুশান্ত নীরব।

শুভ্রাংশু অপেক্ষাকৃত সংযত কণ্ঠে কহিল, না-হয় মেনে নিলাম সকলেই অন্যায় করছে, কিন্তু এর থেকে এক সময় তুমি নিজেও যে আক্রান্ত হ'তে পার সে-কথা একবার ভেবে দেখেছ কি?

সুশান্ত উদাসীন চোখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিল, আমি সুবিধেবাদী নই। তা ছাড়া ভেবে দেখেই বা লাভ কি?

শুভ্রাংশু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সুশান্ত বলিয়া চলিল, যাকে তোমরা এড়িয়ে চল আমি তাকে কোল দিয়েছি। আমার স্ত্রীর ব্যাধি আমাকেও আক্রমণ করেছে।

শুভ্রাংশু ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়া উঠিল, স্ত্রীর কালব্যাধিটাও তোমার আধাআধি ভাগ ক'রে না নিলে চলত না এমনি পত্নীভক্তি!

—তুমি ঠাট্টা করছ শুভ্র, কিন্তু আমার মত অবস্থায় পড়লে বোধ হয় প্রত্যেক মানুষই এ-কাজ ক'রে থাকে। রাণীর জন্যে আমি যা করেছি এবং করছি তা মোটেই বেশী নয়। সবাই ওকে ত্যাগ করেছে—তুমিও যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ। আমি তোমাকে দোষ দিই না, কিন্তু যে ওর দেহের চাইতে অন্তরের সমাদর করতে চায়, তাকে অন্তত তোমাদের উপহাসের সীমার বাইরে সরিয়ে রেখো।

শুভ্রাংশু বারেকের তরে একবার তার হাত-ঘড়ির উপর

দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, বারোটার মধ্যে আমায় স্থকুমারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজকে আমি চললাম শান্ত— সময়মত দেখা হবে। অনাবশ্যক কৈফিয়ৎ!

স্থশান্ত বুঝিল যে পুনরায় দেখা করিবার মত সময় আর তার হইবে না।

শুভ্রাংশু ত্রস্তপদে প্রস্থান করিল। ভগ্নীর বিবাহে নিমন্ত্রণ করিতে পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া গেল। তার প্রস্থান-পথের প্রতি ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া স্থশান্ত নিজের মনে কথা কহিয়া উঠিল, একটি মুহূর্ত্ত দেরি করতে পারলে না! সাংসারিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি এতই সচেতন! ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করছে, ওর আর দোষ কি?

ইতিমধ্যে কোন্ অবসরে যে রাণী দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া আসিয়া তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহা স্থশান্ত টের পায় নাই, কিন্তু সহসা সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে লাফাইয়া উঠিল, একি! তুমি! তুমি কখন উঠে এলে?

রাণী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—মুখ দিয়া তার একটি কথাও ফুটিল না। দুই চোখে নীরব ভর্ৎসনা।

স্থশান্ত উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিতেই রাণীর মাথাটা তার কাঁধের উপর হেলিয়া পড়িল।

স্থশান্ত বুঝিল, এই নীরবতার অন্তরালে কতখানি তৃপ্তির কান্না সে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

অত্যন্ত সাবধানে স্থশান্ত রাণীর হাল্কা দেহটি কোলে তুলিয়া লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

আর শুভ্রাংশু এতক্ষণে ফাঁকা রাস্তায় পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এই দূষিত আবহাওয়া হইতে নিজেকে এত সহজে মুক্ত করিতে পারিয়া।

সাঁতারের কথা

'ক্রল' বা দ্রুন্-পাড়ি

শ্রীশান্তি পাল

আজকাল সব দেশেই সন্তরণকারীরা 'ক্রল' বা দ্রুন্-পাড়িকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকেন, কারণ এই ধরণের পাড়িতে অতি শীঘ্র দ্রুতগতি লাভ করা যায়। এই 'ক্রল' বা দ্রুন্-পাড়ি নানা শ্রেণীর, যথা আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, চার-পদী (Four beats) ও ছয়-পদী (six beats) ইত্যাদি। কে বা কাহারা এই সকল দ্রুন্-পাড়ির আবিষ্কার করিয়াছেন এস্থলে আমি তাহার আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ইহাদের সাধারণ নিয়ম ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ব্যাখ্যা করিব।

সাঁতারের প্রচলন কোন বিশেষ দেশে আবদ্ধ নহে। সাঁতারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পৃথিবীর সকল দেশেই মোটা-মুটি এক ধরণের, দেশভেদে বিশেষত্ব কিছু যে না থাকিতে পারে এমন নহে, কিন্তু মূলতঃ সাধারণ রীতি এক এবং অভিন্ন।

এই সকল আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি দ্রুন্-পাড়ির মধ্যে কোন্ শ্রেণীর দ্রুন্-পাড়ি ভাল, সে-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমেরিকান দ্রুন্-পাড়িতে বেশী দ্রুতগতি লাভ করা যায়। কারণ এই পদ্ধতিতে হাত-পা পরিচালনার মধ্যে কোন মিল বা সম্বন্ধ নাই। পদদ্বয়ের গতি সর্ব্বদা দ্রুত থাকাতে শরীর জলের উপরই ভাসিয়া থাকে এবং সাঁতারু অতি সহজেই অগ্রসর হইতে পারেন। আবার কেহ কেহ বলেন অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলে হাত ও পায়ের গতি মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া যাওয়ায় সন্তরণকারীর শরীর জলের সমতল রেখার সামান্য নিম্নে নামিয়া যায় এবং গতিবেগও সামান্য প্রতিহত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে নষ্টশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে এবং সাঁতারু তাহাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিয়াও ক্লান্তিবোধ করেন না। অন্যপক্ষে কেহ কেহ উক্ত দুই প্রকার সন্তরণ-কৌশলের মাঝামাঝি ব্যবস্থা,

অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলের হাতের পাড়ি ও আমেরিকান ক্রলের পায়ের কৌশল একযোগে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। মোট কথা, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্টতম বা কোন্‌টিতে বেশী ফল লাভ হয় তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

আমার বিবেচনায় সাঁতারু নিজের দেহের গঠন অনুযায়ী পাড়ি নির্ব্বাচন করিবেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, দুই জন সাঁতারুর মধ্যে সাঁতারের বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকিয়া যায়। ইহার কারণ দৈহিক গঠনের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

যাহাদের হাতের শক্তি বেশী ও পা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাঁহারা হাতের গতিবেগ বাড়াইয়া ও পায়ের গতিবেগ কমাইয়া পাড়ি অভ্যাস কবিলেই ভাল ফল পাইবেন। এইরূপ স্থলে চার-পদী বা ছয়-পদী ডুন্-পাড়ি অবলম্বন করাই সমীচীন, কারণ এই সকল পাড়িতে পায়েব চারিটি বা ছয়টি আঘাত হাতেব পাড়িব সহিত এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে, যাহাতে এইরূপ চারিটি বা ছয়টি পায়ের আঘাত দিতে সাঁতারুর বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় না, পরন্তু যাঁহাদের পায়ের শক্তি বেশী ও হাতের শক্তি অপেক্ষাকৃত কম তাঁহারা আমেরিকান বা অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলের কৌশলগুলি অভ্যাস করিলেই সুফল পাইবেন।
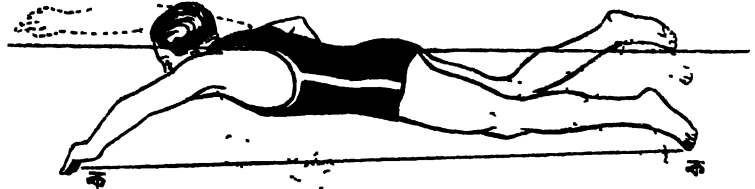
আমেরিকান ক্রল

আজকাল যত রকম আধুনিক ডুন্-পাড়ি প্রচলিত আছে তাহাব মধ্যে আমেরিকান ডুন্-পাড়িই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। এই পাড়ি শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থী প্রথমতঃ ১ নং চিত্রানুযায়ী দেহকে জলের উপর ঋজুভাবে ভাসাইয়া মাথার অর্দ্ধাংশ সম্মুখে ডুবাইয়া হাতের কনুই দুইটি ঈষৎ বাঁকাইয়া স্কন্ধনিক্ষেপের সহিত চক্রাকারে মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া একই ভঙ্গীতে পরিবর্ত্তিত ভাবে হাত দুইটি পেটের তলদেশ দিয়া উরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত সজোরে টানিবেন। প্রতি পাড়ি শেষ করিয়া হাত দুইটি জল হইতে সম্পূর্ণ ভাবে উপরে উঠাইয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই পাড়িতে সাঁতার কাটিবার সময় সন্তরণকারী দেহকে হেলাইবেন না, দেহ জলের উপর যথাসম্ভব সমান্তরাল ভাবে অর্থাৎ যাহাতে মাথা, নিতম্ব ও গুল্‌ফদ্বয় সহজভাবে জলপৃষ্ঠের এক ইঞ্চি উপরে থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। কেবলমাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য হাত-পাড়ির সহিত মাথা সামান্য ঘুরাইতে হইবে।

এই পাড়িতে হাত ও পায়ের কোন মিল নাই, অর্থাৎ ১ নং চিত্র অনুযায়ী বাম হস্তের সহিত বাম পদ (ক—ক) এবং দক্ষিণ হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া সাঁতার কাটিতে হইবে। কেবলমাত্র জানুদ্বয় সামান্য ভাঙিয়া জঙ্ঘা শক্ত রাখিয়া পা দুইটি ৬-৮ ইঞ্চি ব্যবধানে সোজা ও পরিবর্ত্তিত রূপে উপর-নীচ করিয়া সাঁতারু নিজের সুবিধামত এমনভাবে জলে আঘাত করিবেন যাহাতে পদদ্বয়ের ক্রিয়াদ্বারা স্বাভাবিক অগ্রগতি লাভ হয়। আমেরিকান্ ডুন্-পাড়ির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গতিবেগ মুহূর্ত্তের জন্যও হ্রাস হয় না, কারণ পদদ্বয় অনবরত উপর নীচে পরিচালনার জন্য দেহ ডুবিয়া যায় না।

১। আমেরিকান 'ক্রল'

অল্প দূর অর্থাৎ ৫০ হইতে ৪০০ মিটার পথ পর্য্যন্ত সাঁতারের প্রতিযোগিতায় এই পাড়ি বিশেষ সাহায্যকারী হয়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে সাঁতারু নিজের ক্ষমতানুযায়ী প্রথমেই এক দমে ৩০ হইতে ৪০ মিটার পর্য্যন্ত যাইবেন, পরে প্রতি ৩ কিংবা ৪ মিটার অন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মাথা ঘুরাইয়া দম লইতে পারিলেই ভাল হয়।

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রল

অষ্ট্রেলিয়ান্ ডুন্-পাড়ি শিক্ষাকালে শিক্ষার্থী "প্রাথমিক শিক্ষার" নিয়মাবলম্বনে অর্থাৎ (২ নং চিত্রানুযায়ী ক—ক) দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ এবং বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ

পুকুর-ঘাটে
শ্রীশান্তিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পদ মিলাইয়া অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের টান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম পদের কাজ শেষ করিয়া এবং বাম হস্তের টান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পদের কাজ শেষ করিয়া পরিবর্ত্তিত রূপে পাড়ি শেষ করিবেন। হাত-পাড়ি দিবার সময় হাত দুইটি দেহের কত ইঞ্চি পার্শ্ব দিয়া টানিতে হইবে তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন, কারণ ইহা নির্ভর করে সাঁতারুর দেহের গঠনের উপর, আর দেহের গঠন সব সাঁতারুর যখন এক নয় তখন এ-সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লিপিবদ্ধ করা যায় না। তবে যত দূর সম্ভব হাত দুইটি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থী তাঁহার সুবিধামত পেটের তলদেশ দিয়া টানিবেন। ইহাই অষ্ট্রেলিয়ান ফ্রন্‌-পাড়ির বিশেষত্ব। অষ্ট্রেলিয়ান ফ্রন্‌-পাড়িতে দেহ একটু গড়াইয়া ডুবিয়া যায় এবং গতিবেগও সামান্য প্রতিহত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না বরং নষ্টশক্তি পুনরায় লাভ করা যায়। এই ধরণের সাঁতারে হাত-পাড়ি ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রণালীর জন্য সাঁতারু নিজের সুবিধামত আমেরিকান ফ্রন্‌-পাড়ির শেষোক্ত নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন।
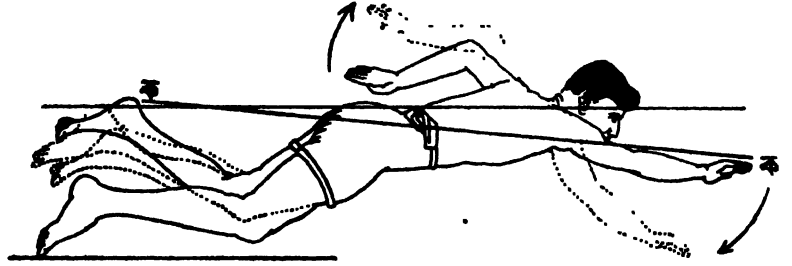
সিক্স-বিট্‌স্ ক্রল বা ছয়-পদী ফ্রন্‌-পাড়ি

এই আধুনিক ছয়-পদী ফ্রন্‌-পাড়ি অনেকটা অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলের উন্নত সংস্করণ এবং আমার মনে হয় যে এই পাড়ির
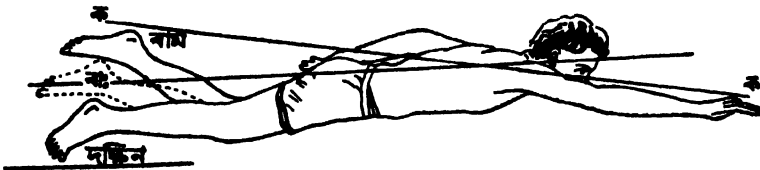
৩। সিক্স-বিট্‌স্ 'ক্রল' বা ছয়-পদী ফ্রন্‌

ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সাঁতারুগণ জগতের সন্তরণ-ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন। আর সন্তরণের সময় সীমা ভঙ্গ করাও এই পাড়ির সাহায্যে সম্ভবপর বলিয়া আমার ধারণা।

আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলে দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ ও বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া সাঁতার কাটিতে হয়। কিন্তু ছয়-পদী ফ্রনের বিশেষত্ব এই যে সাঁতারু নিজের সুবিধানুযায়ী প্রথমে দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ অথবা বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া সাঁতার আরম্ভ করিবেন এবং প্রতি হাতের টানের সঙ্গে পায়ের আরও

২। অষ্ট্রেলিয়ান 'ক্রল'

দুইটি ছোট ছোট আঘাত দিবেন। আরও স্পষ্ট ও বিশদ করিয়া বলিতেছি—যদি প্রথমে দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদের মিল রাখিয়া সাঁতার আরম্ভ করা হয় (৩ নং চিত্র ক—ক) তাহা হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দক্ষিণ হস্তের টান শেষ করিয়া বাম হস্তের টান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ ও বাম পদের দুইটি অতিরিক্ত ও মৃদু আঘাত পড়ে। এই নিয়মে বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া সাঁতার আরম্ভ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাম হস্তের টান শেষ করিয়া দক্ষিণ হস্তের টান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাম ও দক্ষিণ পদের দুইটি অতিরিক্ত ও মৃদু আঘাত পড়ে। স্মরণ রাখিবেন, যেন পায়ের আঘাত দিবার সময় কোন ক্রমেই জানুদ্বয় না ভাঙ্গিয়া যায়। জানু দুইটি সহজ ভাবে ভাসাইয়া রাখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে গুল্‌ফদ্বয় যেন সর্ব্বদাই অন্তত চারি ইঞ্চি জলের নীচে থাকে। কেবলমাত্র উভয় হস্তের পাড়ি সুরু করিবার সময় পায়ের প্রথম আঘাত দুইটি একটু জোরে করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পদদ্বয় পরিচালনার সময় যাহাতে অযথা দেহের শক্তি ক্ষয়

করা না হয় এবং যথাসম্ভব সহজ ও সরলভাবে পদদ্বয় পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষার্থী প্রথমতঃ সাঁতারের সময় ৩ নং চিত্রানুযায়ী দেহকে যথাসম্ভব ঋজুভাবে জলপৃষ্ঠে ভাসাইবেন। এই পাড়ির বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষার্থীকে হস্তদ্বয় স্কন্ধের সহিত প্রায় সমকোণ রাখিয়া অথচ হস্ত-পরিচালনার সময় পূর্ব্বোক্ত আমেরিকান ক্রলের ন্যায় মাথার উপর দিয়া না ঘুরাইয়া স্কন্ধ-নিক্ষেপের সহিত সহজভাবে সোজাসুজি জলে নিক্ষেপ করিতে এবং জলের ভিতর হাত দুইটি আমেরিকান ক্রলের ন্যায় পেটের তলদেশ দিয়া উরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত টানিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে সাঁতার কাটিবার সময় প্রতি হাত-পাড়িতে দেহ কিঞ্চিৎ গড়াইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে গতিবেগ প্রতিহত হয় না।

পাড়ি

হস্ত	...	...	পদ
দক্ষিণ	...	...	বাম, দক্ষিণ ও বাম
বাম	...	...	দক্ষিণ, বাম ও দক্ষিণ

ডবল ওভার-আর্ম বা দোহাতি-পাড়ি

এই পাড়ি শিখিবার সময় শিক্ষার্থী পূর্ব্বোক্ত প্রাথমিক বা অষ্ট্রেলিয়ান ক্রল্-পাড়ির নিয়ম অনুসরণ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত পাড়ি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহাতে জঙ্ঘা হইতে পদদ্বয় বাইশ হইতে পঁচিশ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জলপৃষ্ঠের নিম্নে থাকিবে এবং পদদ্বয়ের ক্রিয়ার সময় জানু ভাঙিয়া ছোট কাঁচি-পাড়ির ভঙ্গীতে জলের নিম্নে পরিবর্ত্তিতরূপে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। এই দোহাতি-পাড়িতে সাঁতার কাটিবার সময় সন্তরণকারী হাত দুইটি স্কন্ধের সহিত জোরে নিক্ষেপ করিয়া দেহকে উভয় দিকে কিঞ্চিৎ গড়াইয়া
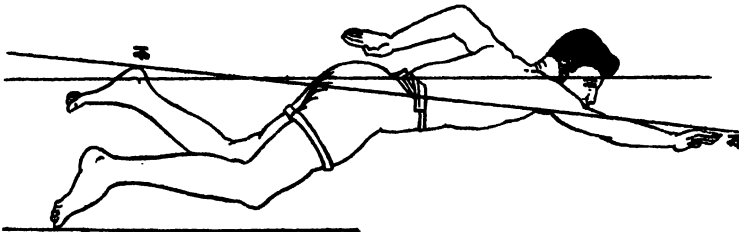
৪। 'ডবল ওভার-আর্ম' বা দোহাতি পাড়ি

লইয়া যাইবেন। স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে এই পাড়িই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়।

৫। ঝম্পোত্তোগ : প্রথম ভঙ্গী

৬। ঝম্পোত্তোগ : দ্বিতীয় ভঙ্গী

ঝম্পোত্তোগ (ষ্টার্ট)
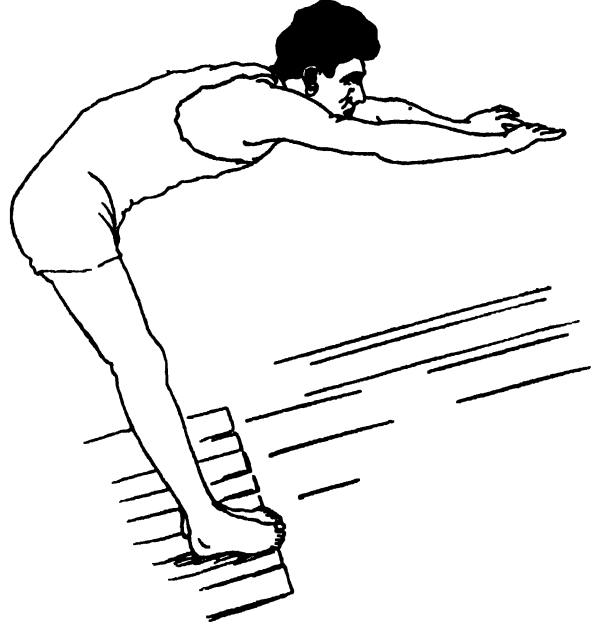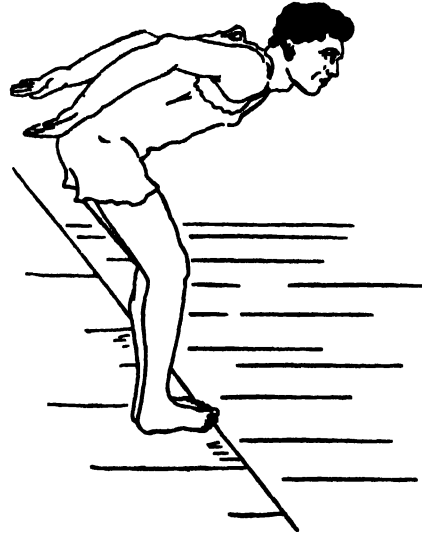
ঝম্পোত্তোগের সময় প্রতিযোগী সর্ব্বদাই সঙ্কেতকারীর দিকে লক্ষ্য রাখিবেন এবং সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেতকারীর

৭। ঝম্পোদ্যোগ : তৃতীয় ভঙ্গী

হাতের পিস্তলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মঞ্চের প্রান্ত ভাগে ১ নং চিত্রানুযায়ী পদদ্বয় যুক্ত করিয়া এবং আঙুলে ভর দিয়া চিবুকের সোজাসুজি দুই হাত সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া মনে মনে ১, ২, ৩ বলিবেন। প্রতিযোগী ইহা অবশ্যই মনে রাখিবেন যে, ২ এবং ৩ গুণিবার অবকাশে হাতের ভঙ্গী ২ নং
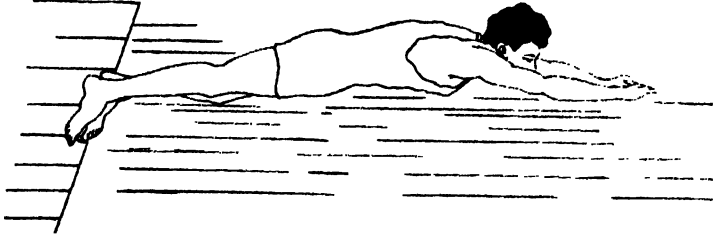
চিত্রানুযায়ী করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের শব্দের এক-চতুর্থাংশ সেকেণ্ডের পূর্ব্বেই ৩ নং চিত্রানুসারে জলপৃষ্ঠের উপর দিয়া দেহকে গড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে ঝম্পপ্রদান করিতে হইবে, পিস্তলের আওয়াজ যেন জলস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রুত হয়। এই ঝম্পোদ্যোগ-প্রণালী কিছু দিন দশ-পনর বার করিয়া অভ্যাস করা উচিত। তাহা হইলে প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষ কষ্টভোগ করিতে এবং বেগ পাইতে হয় না। অল্প দূরত্বের প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে এই ঝম্পোদ্যোগের কৌশলের উপর।

আমাদের খাদ্য

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনীলরতন ধর

ফরাসী-বিপ্লবের কিছু পূর্ব্বে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক জন বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক আণ্টোয়ান লাভোয়াসিয়ে বলিয়াছিলেন, জীবন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। তাঁহার কথা স্মরণ করিলে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তিনি রসায়নশাস্ত্র ও দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক। তিনি বলেন, আমরা যাহা আহার করি, দেহাভ্যন্তরে তাহা বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত সম্মিলিত হইয়া যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃজন হয়, তাহার উপর জীবের জীবন নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়া হইতে জীবদেহে উত্তাপ ও শক্তি সমুৎপন্ন হয়।

সকলেই জানেন যে রেলের ইঞ্জিন চালাইতে কয়লা পোড়াইতে হয়, মোটরচালনের জন্য পেট্রোলের আবশ্যক হয়, উত্তাপ সমুৎপন্ন করিতে কয়লা বা এই জাতীয় পদার্থের দাহন প্রয়োজন। এই দহনকার্য্য কয়লার সহিত বায়বীয় অক্সিজেনের সংমিশ্রণে সম্পন্ন হয়। বাতাস না হইলে কয়লা বা পেট্রোল পোড়ান যায় না।

আমাদের খাদ্যে কয়লা-জাতীয় পদার্থ (কার্ব্বন) বর্ত্তমান। চিনি, ভাত, গুড়, ডিম প্রভৃতিতে সলফিউরিক এসিড যোগ করিলে সহজেই কয়লা (কার্ব্বন) পাওয়া যায়। এই কার্ব্বন বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দেহের উত্তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। আভ্যন্তরীণ এই দহন-প্রক্রিয়া (অক্সিডেশন) কয়লা বা অন্যবিধ অগ্নি ও পেট্রোল ইত্যাদির দহনের অনুরূপ। কারণ উভয় স্থলেই উত্তাপ ও শক্তি এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই আভ্যন্তরীণ দহন-প্রক্রিয়ার উপর জীবনীশক্তি নির্ভর করে। জীবের জন্ম হইতেই এই ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, ইহার অবসানেই জীবনের অবসান।

আমাদের খাদ্য নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(ক) কার্ব্বোহাইড্রেট—ভাত, আলু, চিনি, রুটি প্রভৃতি।
(খ) প্রোটিন—ডাল, ছোলা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম।
(গ) ফ্যাট—ঘি, তেল, মাখন, ননী, দুধ।
(ঘ) নুন (salt)—লৌহ ও চূর্ণবিশিষ্ট পদার্থ।
(ঙ) জল
(চ) ভিটামিন বা জীবপ্রাণ।

প্রতিদিনের খাদ্য সমষ্টির পরিমাপ :—

পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক জন স্বাস্থ্যবান্ লোকের প্রত্যহ ২৫০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরী (calories) বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। কার্ব্বোহাইড্রেট—(আলু, চিনি, ভাত ইত্যাদি) তিন পোয়া হইতে এক সের; প্রোটিন—(মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি) ২½ ছটাক; (৪০০—৫০০ ক্যালরী); ফ্যাট—(ঘি, তেল ইত্যাদি) ১½ ছটাক, ৬০০ কালরী আহার্য্য হইতে উপরিউক্ত পরিমাণ ক্যালরী সমুৎপন্ন হয়।

কার্ব্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট হইতে দেহে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, প্রোটিন বা নাইট্রোজেন বিশিষ্ট পদার্থ হইতে আংশিক ভাবে উত্তাপ সৃষ্টি হয় ও দেহের ক্ষয় পূরণ করে।

জীবদেহে শতকরা ৬০ ভাগ জলীয় পদার্থ বর্ত্তমান। এই কারণে আহার্য্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। বার্দ্ধক্যে শরীরের জলীয় ভাগ হ্রাস হইলেও কোন সময়েই ৫৭।৫৮ ভাগের কম হয় না।

খাদ্যে লৌহ-জাতীয় পদার্থের বর্ত্তমানতা হেতু বায়বীয় অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়তা হয়। শাকে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় এবং অল্প পরিমাণে লৌহসংশ্লিষ্ট পদার্থ থাকায়, ইহা আমাদের একটি দৈনিক আহার্য্যবস্তু হওয়া আবশ্যক।

দুধ এবং ইহা হইতে প্রস্তুত ছানা, পনীর, দই, ঘোল প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে অতি উপাদেয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ও উপকারী খাদ্য-উপাদান ও অত্যাবশ্যক খাদ্য—কার্ব্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যোন্নতিকর ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' বর্ত্তমান। ভিটামিন খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদনে (অক্সিডেশনে) সহায়তা করে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

টোমাটোতে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং লেবুর মধ্যে ভিটামিন 'সি' থাকায় ও অন্যান্য যে-সকল ফলে ভিটামিন 'সি' আছে এই সমুদয় ফল আহারে স্বাস্থ্য সম্বর্দ্ধনের প্রচুর সহায়তা করে। রন্ধনের সময় উত্তাপে ভিটামিন 'সি'র গুণ বিনষ্ট হয়, সেজন্য ইহা রন্ধন না করিয়াই আহার করা শ্রেয়ঃ। ইংরেজী একটি প্রবচন—'an apple a day keeps the doctor away' অর্থাৎ দিনে একটি আপেল আহার করিলে চিকিৎসককে দূরে রাখা যায় কথাটি এখন a tomato a day keeps the doctor away হওয়া উচিত।

বিজ্ঞানের মতে মাখন ও বিশুদ্ধ ঘৃতে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' এবং ডিমে ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'ডি' থাকায় অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত। কাশীতে ও কলিকাতায় দেখা গিয়াছে যে যে-সকল পরিবারে ডিম ও হাত-রুটি খাওয়া হয়, সেই সব পরিবারে বেরিবেরি হয় নাই। এ-বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ছোলা ও গমে যখন অঙ্কুরোদগম হয়, তাহাতে ভিটামিন 'বি' থাকায় আহার করিলে বেরিবেরি রোগ হইতে নিস্তারলাভের সম্ভাবনা আছে। চাউলে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন 'বি' থাকে, কিন্তু ইহা গমের প্রোটিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া খাদ্য-হিসাবে প্রয়োজনীয়।

দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত ছানা পনীর জাতীয় সামগ্রী, শাক, কিছু মাখন এবং ঘি, রুটি ও ভাত, টোমাটো, লেবু এবং সম্ভব হইলে ডিম ও টাটকা ফল আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের তালিকা-ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিশক্তির পরিচালনার জন্য উৎকৃষ্ট প্রোটিন (জৈব প্রোটিন) দুধ ও ডিমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছোলা, মটর, গম ও ডাল ইত্যাদির প্রোটিন জৈব প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে কোনও জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহার খাদ্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। লেখকের মতে যে জাতির খাদ্যে সহজপাচ্য ও ভাল প্রোটিনের অভাব, সে-জাতির বুদ্ধির প্রখরতা ক্রমশই অবনতির দিকে যায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তাহার ফলাফলে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জৈব প্রোটিন, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হইতে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটিন-জগতে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন,

যেস্থলে জৈব প্রোটিন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কয়েক প্রকার প্রোটিনের পুষ্টিকারিতার কিছু অনুমান পাওয়া যায়ঃ—

দুধ, মাছ, মাংস	১০০
চাউল	৮৮
আলু	৭৯
মটর-জাতীয়	৫৬
গম	৪০
ভুট্টা	৩০

তাহা হইলে এই তালিকা হইতেও ইহাই প্রমাণিত হইল যে জৈব প্রোটিন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা উপকারী। কাজে কাজেই জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে তাহার খাদ্যের তালিকায় কোন-না কোন প্রকার জৈব প্রোটিনের স্থান ও ব্যবস্থা থাকার একান্ত আবশ্যক, অথচ দরিদ্রপ্রধান দেশে ইহা তেমন সম্ভবপর নহে, কারণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মূল্য জৈব প্রোটিন অপেক্ষা কম। ভারতও দরিদ্র-প্রধান দেশ, সেজন্য ভারতের অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জৈব প্রোটিন তাহাদের দৈনিক খাদ্যতালিকাভুক্ত করিতে পারে। এই জৈব প্রোটিনের অভাব তাহারা অতিরিক্ত পরিমাণ চাল, ডাল, মটর ইত্যাদি খাইয়া পূরণ করে।

উপরিলিখিত তালিকা হইতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে চাউলের প্রোটিন মটর বা ডাল জাতীয় প্রোটিন অপেক্ষা উপকারী। অনুসন্ধানে দেখা যায়, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আহারী যাহারা চাউলের উপরেই বেশী নির্ভর করে তাহাদের বুদ্ধির প্রখরতা, যাহারা কেবলমাত্র গম, ডাল বা মটরের উপর প্রোটিনের জন্য নির্ভর করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ইহাও দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে বংশানুক্রমে পুষ্টিকর জৈব প্রোটিন আহারের অভাবে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী, যে-সকল গুণ জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করে—উন্নতির পথে অগ্রসর করে— যথা, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যমশীলতা, কর্ম্মকুশলতা, পরিশ্রমশীলতা, দৈহিক বল ইত্যাদি যাবতীয় গুণ ক্রমশ হারাইয়া ফেলিতেছে। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য জাতীয় খাদ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করা।

আজকাল মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের দৃষ্টান্তে, বহুদিন-ব্যাপী উপবাস পালন সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। লেখকের সহিত কয়েক জন সহকর্ম্মীর গবেষণার ফলে, উপবাসের সময় এবং বহুমূত্র রোগে কেবলমাত্র সোডা-বাইকার্ব্বনেট পানীয়ের সহিত ব্যবহার অপেক্ষা, সোডা-টারট্রেট, সোডাসাইট্রেট এবং সোডাবাইকার্ব্বনেট ব্যবহার অধিক ফলপ্রদ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উপবাসের সময় দেহের অভ্যন্তরের ফ্যাট এবং পরে মাংসপেশী দগ্ধ হয়— পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দেহের ভিতরের দহনকার্য্য জীবনের শেষ অবধি চলে। সেজন্য সময়ে সময়ে একাধিক দিনের উপবাস উপকারজনক হইলেও একাদিক্রমে বহুদিনের উপবাসে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

সূর্য্যরশ্মি যেমন অক্সিজেন দহনে (অক্সিডেশনে) খাদ্যের সম্বন্ধে সহায়তা করে, সেইরূপ ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়াও অক্সিডেশনে সহায়তা করে। সেই জন্য উষ্ণ প্রদেশসকল, নাতিউষ্ণ প্রদেশসকল অপেক্ষা বহুবিধ রোগ হইতে রক্ষা পায়।

রিকেট, পার্নিসাস্ এনিমিয়া, সর্দ্দি, হাম, ক্যানসার প্রভৃতি রোগের হার, ইউরোপ ও আমেরিকা অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক অল্প।

সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে খাদ্যবস্তুর উপযুক্তরূপ অক্সিডেশনের সুফলই এই রোগাল্পতার কারণ। সুতরাং জগতের প্রায় সকল দেশেই যে সূর্য্যদেব দেবতারূপে আরাধিত হইয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।
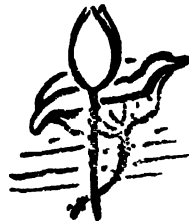
অভাবিত

আধুনিক গদ্যকাব্যের স্পর্শক্রামকতায় অভিভূত হয়ে একখানা গদ্যকাব্য রচনা করেছিলুম। দুঃসাহসে ভর ক'রে কবির সম্মুখে সেটা যখন নিবেদন করলাম তিনি আমার স্পর্দ্ধা ক্ষমা ক'রে সেটাকে পদ্যায়িত করে দিলেন। নিজের নামেই চালাবার লোভ ছিল, যথাকালে সুবুদ্ধি মনে উদয় হ'ল, ভাবলাম চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। তাই সমগ্র ইতিহাস সমেত জিনিষটা লোকসমক্ষে প্রকাশ করা গেল।—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

এখনই, এই মুহূর্ত্তেই বুঝে পেলাম সব।
আর তো কোনো অপেক্ষা নেই।
সামনে রাত্রির নৈঃশব্দ্য-পাথার,
আকাশে জ্বলে তারা,
শূন্য পথ,
মাঠের শেষে বনশ্রেণীর কালো রেখা প্রসারিত।
—যেন ওড়ার মুখে ডানামেলা মস্ত একটা বাদুড়॥

অনেক আগেই ভেবেছি,—
অনেক আছে বাধা, বিশৃঙ্খলা-ই বা কত!
নাই যত্ন, নাই আয়োজন, কেবলই ত্রুটি।
আর কিছু কি হবে?
কিন্তু হ'ল তো,—
যা ভাবি নি তাই—
হ'ল এক মুহূর্ত্তেই
মন ভ'রে, ডুবায়ে দিয়ে মন,
জাগছে শুধু একটিমাত্র শান্ত মধুর সবল চেতনা—
"তুমি আছ"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনি এই মুহূর্ত্তেই বুঝে পেলাম সব,
থামিয়া গেল জীবনের সকল কলরব।
সামনে রাতি রয়েছে সীমাহারা,
নৈঃশব্দ্যের বক্ষ জুড়ে আকাশে জ্বলে তারা,
সকল পথ করিয়া গ্রাস শূন্য অবারিত,
মাঠের শেষে ঘন বনের কালিমা প্রসারিত।
ওড়ার মুখে মেলিয়া ডানা বাদুড় যেন জাগে

ভেবেছি কিছু আগে,
অনেক বাধা, বিশৃঙ্খলা অনেক গেছে জুটি—
অনেক আছে আয়োজনের ত্রুটি,—
তবুও দেখ, ভাবি নি যেই কথা—
মুহূর্ত্তের মন্ত্রবলে এখনি ঘটিল তা,—
ডুবিল মন, ডুবিয়া গেল সকল বেদনা,
রয়েছে শুধু একটি চেতনা
পূর্ণ করি আমার মনোভূমি
একাকী আছ তুমি॥

ব্রহ্মে বাঙালীর মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা

শ্রীসুবিমল চৌধুরী

পূর্ব্বে বাংলায় মাতৃভাষার প্রতি বাঙালীদের যেমন অবজ্ঞার ভাব দেখা যাইত, এখনও ব্রহ্মে বাংলা ভাষার প্রতি সেইরূপ অবহেলার ভাব বহুস্থলে পরিলক্ষিত হয়। যে-সকল বাঙালী ছাত্র ব্রহ্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন। মাতৃভাষা শিক্ষা যে শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, উহার চর্চ্চা যে মানুষ মাত্রেরই করা উচিত, তাহা তাঁহাদের কেহবা স্বীকার করেন না, কেহবা জানিয়াও উদাসীন, কেহবা অনুকূল ব্যবস্থার অভাবে অগ্রসর হইতে পারেন না। অবশ্য শেষোক্ত কারণটি এইরূপ উদাসীনতার কৈফিয়ৎ মাত্র। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয় এবং ব্রহ্মে এমন কোন প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই যাহা বাঙালীর মাতৃভাষা শিক্ষার ও চর্চ্চার ব্যাঘাত করে। স্কুলে কলেজে বাংলা না পড়িলেও ঘরে পড়িবার কোন বাধা নাই, কিন্তু সাধারণতঃ এ-বিষয়ে বাঙালীদের অনুরাগ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য্য হইলেও বাংলা জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের শিক্ষা অংশতঃ অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এখানকার ছাত্রগণ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনেক সময় ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। বঙ্গসাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, পৃথিবীর উন্নত ভাষাসমূহের মধ্যে যে বঙ্গভাষাও অন্যতম, ভাব ও ভাষার দিক দিয়া বাংলা যে ভারতের একটি সর্ব্ববাদিসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাষা যে বাংলা—এই সব শুনিলেও তাঁহারা উহার বড়-একটা ধার ধারেন না। হিন্দী ও উর্দ্দু ভারতে বহুল প্রচারিত বলিয়া ঐ সকল ভাষাকে অনেকে সুনজরে দেখিয়া থাকেন। মাতৃভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকাতেই বাংলা সম্বন্ধে এইরূপ ভুল ধারণা। ছাইপাঁশ বাংলা পড়িয়া কোন লাভ নাই, তাহা অপেক্ষা বরং ইংরেজী পড়িলে ইংরেজী-জ্ঞানও হইল এবং পরীক্ষার ব্যাপারেও সুবিধা হইবে—এইরূপ অনেকের ধারণা। কেবল বিজাতীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিলেই হয় না, মাতৃভাষায়ও দখল থাকা আবশ্যক। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ কোন দিন বিজাতীয় ভাষায় সাহিত্য-জগতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই—পরীক্ষা পাসই ছাত্রজীবনের একমাত্র কাম্য নয়—মাতৃভাষার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য—এই সকল বিষয়ের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বর্ম্মী কিংবা ইংরেজী—যে সকল ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে, তৎপ্রতি অধিক মনোযোগ থাকা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তজ্জন্য বাংলাকে অবহেলা করাও উচিত নয়।

ছাত্রদের এইরূপ অবহেলা ও ভুল ধারণা পোষণের জন্য অভিভাবকেরাও কতক অংশে দায়ী। ব্রহ্মের অধিকাংশ বাঙালী অভিভাবকই ছেলেদের বাংলা শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা বাংলা ভাষা শিখাইবার প্রয়োজনীয়তাকে মোটেই প্রাধান্য দেন না। সুবিধামত ছেলেকে কোন সরকারী কিংবা এ্যাংলো-ভার্নাকুলার হাই-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল; সেই স্কুলে হয়ত বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা নাই, সুতরাং বাংলা পড়া স্থগিত রাখা হইল, অথবা আর পড়াই হইল না। গৃহে স্বতন্ত্রভাবে পড়িবার ও পড়াইবার উৎসাহ অনেকেরই নাই। মাঝে মাঝে দেখা যায় অনেক ছেলে অল্পবয়সে বাংলায় কথা বলিতে জানে না। যে-স্থানে যে-জাতীয় সঙ্গী পায় সেইরূপ ভাষাতেই কথা বলিতে শিখে। অভিভাবকগণের এই বিষয়ে সতর্ক ও যত্নবান হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, অনেক সময় বাঙালীর ছেলের বিজাতীয় ভাষায় বিদ্যারম্ভ করান হইয়া থাকে। স্কুলে পড়িবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া হয়ত উর্দ্দুতে পাঠারম্ভ করান হইল। স্কুলে উর্দ্দু পড়া আরম্ভ করিল এবং বেশ উন্নতিও করিল। দুই-এক বৎসর পরে পিতা কিংবা অভিভাবক স্থানান্তরিত হইয়া অন্য

জায়গায় আসিলেন। অতঃপর ছেলেকেও কর্ম্মস্থলে কোন একটা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেই স্কুলে উর্দ্দু পড়ান হয় না—সুতরাং উর্দ্দু ছাড়িয়া অন্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতে কোনটাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। হয়ত বা উর্দ্দু ছাড়াইয়া বাংলা ধরান হইল, চতুর্থ মানের ছাত্র 'অ আ ক খ' আরম্ভ করিল। ইহাতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই অসুবিধা। আবার এমন অভিভাবক আছেন যাঁহারা উৎসাহী ছাত্রের মাতৃভাষা শিক্ষার ও চর্চ্চার আগ্রহকে সুনজরে দেখেন না। বাংলা পড়িয়া কোন লাভ নাই, এই মনোভাব। সময় সময় এইরূপও দেখা যায় যে, ইংরেজী যে-কোন রকমের বই পড়িলেও কোন আপত্তি হয় না, কিন্তু বাংলা কোন ভাল বই পড়িতে বসিলেও আপত্তি হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি অভিভাবকগণের এইরূপ অবহেলার ও যত্নহীনতার ফলে ছাত্রেরাও তৎপ্রতি উদাসীন।

তার পর স্কুল-কলেজের দিক দিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলির কথা। কলেজে বাংলা পড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই। সমগ্র ব্রহ্মের স্কুলগুলির সংখ্যার অনুপাতে ভারতীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা অতি অল্প। বাঙালী কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুল মাত্র একটি—রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমী। কেবল এই স্কুলেই নিয়মিত বাংলা পড়ান হয়। বাকী ভারতীয় অধিকাংশ স্কুলগুলিতেই বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা নাই। গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলসমূহে ত মোটেই নাই। পরন্তু বর্ম্মী লইয়া হাই-স্কুল ফাইন্যাল পাস না করিলে এখানকার কলেজে ভর্ত্তি হওয়া কঠিন। বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্রগণকে বাদ দিলে ব্রহ্মের প্রায় সব বাঙালী ছাত্রই কেবল বর্ম্মী লইয়া পাস করেন। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র উর্দ্দু, হিন্দী কিংবা বাংলা লইয়া পাস করেন। অবশ্য অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে বাংলা অনায়াসেই পড়া যায় এবং উহাতে পরীক্ষাও দেওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই তাহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। যে-দেশে থাকিতে হইবে সেই দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু তজ্জন্য মাতৃভাষাকে ভুলিলে চলিবে কেন?

মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ অবহেলার ফলে বর্ত্তমানে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য বাংলা জানেন, কেহবা একেবারেই জানেন না। ভাল বাংলা-জানা ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। অন্যান্য বিষয়ে কৃতী হইলেও তাহারা মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্কুলের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেঙ্গল একাডেমী ভিন্ন অন্য কোন স্কুলে ভাল করিয়া বাংলা পড়ান হয় না। দুই-একটি স্কুলে পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিলেও বাংলা পড়িবার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ খুব কমই দেখা যায়। ফলে ব্রহ্মের শতকরা ৭৫ জন বাঙালী ছাত্রই বাংলায় অনভিজ্ঞ। এমন অনেক ছাত্র আছেন যাঁহারা বাংলায় কথা বলিতে জানেন কিন্তু অক্ষর চিনেন না। কেহ কেহ নাম দস্তখত করিতে ও ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া পড়িতে পারেন। কেহ সামান্য লিখিতে ও পড়িতে জানেন, কেহবা চলনসই বাংলা জানেন। শুদ্ধ করিয়া মোটামুটি লিখিতে পড়িতে পারেন, এমন ছাত্রের সংখ্যা খুব কম। বাংলা ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকাতে বাংলা দেশের ভাবধারার সহিতও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। মাতৃভাষার সম্বন্ধে অমূলক ধারণা পোষণের মূলেও এই অনভিজ্ঞতা। যদি বাংলা দেশে কোন আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখিতে হয় তবে ইংরেজীতে লিখিতে হইবে। সেই আত্মীয়ের ইংরেজী জানা না থাকিলে হয়ত আবার এক জন অনুবাদকের সন্ধান করিতে হইবে। মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা এবং তাহার ফলে অজ্ঞতা দেশে ও জাতির পক্ষে কখনও মঙ্গলকর নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে এমন কোন প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই যাহা বাংলা শিক্ষার চর্চ্চার ব্যাঘাত ও অসুবিধা জন্মাইতে পারে, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু নূতন নিয়ম হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালের পর হইতে যাঁহারা বাংলা লইয়া পাস করিতে চান তাঁহাদিগকে বাংলা এবং বর্ত্তমানের উপযোগী বর্ম্মীতে পরীক্ষা দিতে হইবে। ব্রহ্মদেশে থাকিতে হইলে বর্ম্মী জানা আবশ্যক এবং উহা আবশ্যিক করা ভালই হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মভাষা শিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় মাতৃভাষা শিক্ষাও সেইরূপ সমভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং বাংলা শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা কোনক্রমেই হারান উচিত নহে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিদ্যালয়াদিতে বাংলা শিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের গৃহে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা ও চর্চ্চা করা উচিত। অন্তত যাহাতে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে ও

বলিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—সময় নাই কিংবা সুবিধা নাই, এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। ইচ্ছা থাকিলে সহজেই সময় ও সুবিধা করিয়া লইতে পারা যায়। বিশেষত নিজের মাতৃভাষা, সর্ব্বপ্রথমে যাহা শেখা ও

ব্রহ্মদেশে বাঙালী ছাত্রেরা যাহাতে মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে মন দেন এবং অভিভাবকেরাও এই বিষয়ে মনোযোগী হন, তজ্জন্য দেশবাসী ও ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

স্বরলিপি

গান

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু
বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশথ পল্লবে অশান্ত হিল্লোল
সমীর-চঞ্চল দিগঞ্চলে।
নদীর কল্লোল, বনের মর্ম্মর
বাদল-উচ্ছল নির্ঝর ঝর্ঝর
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে,
শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিল রাগিণী।
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধ মদিরা
অজস্র লুঠিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া,
ভয়ার্ত্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া,
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব
মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি— শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

II সা সা -া রা । রা -পা -মা -পা I মজ্ঞা জ্ঞা -া রসা । সা রা -জ্ঞা রা I
আঁ ধা o র অ ম্ o ব রে০ o o oo প্র চ ন্ ড

I সা -রা -া ণ্া । সা -া -া -া I সা -রা -ন্া -া । সজ্ঞা জ্ঞা -া -জ্ঞা I
ড ম্ o ব রু o o o o o o o আঁ ধা o র

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -রা । সা রা -জ্ঞা রা I সা -রা ণ্া সা । সমা মা -পা পা
অ ম্ ব রে প্র চ ন্ ড ড ম্ ব রু বা জি o ল

I পা -মা -ণা ধা । (ধ)পা -া -া -া I -া -ধা পা -া । মা -পা ০ পা I
গ ম্ ০ ভী র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বা জি ০ ল

I (প)র্সা র্সা ধা পা । পা মা -া পা I মা -জ্ঞা -রা -সা । সা সা -া -রা I
গ ম্ ভী র গ র ০ জ নে ০ ০ ০ আঁ ধা ০ র

I সা -রা -জ্ঞা রা । সা -া -া -া I মা পা পা পা । পা -মা -ণা ধা I
অ ম্ ০ ব রে ০ ০ ০ অ শ ত্ থ প ০ ল্ ল

I পা -া -া -া । -া -ধা -মা -া I মা পা পা পা । র্সা র্সা মা পা I
বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ শা ন্ ত হি ল্ লো ল

I মা পা পা পা । পা -র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা -ণা ণা I
অ শ ত্ থ প ল্ ল বে অ শা ন্ ত হি ল্ লো ল

I ধা -ধা -ণা ণা । ণা ণা ধা -পা I মা পা -ধা (ধ)পা । (ধ)জ্ঞা -া -রা -সা I
স মী ০ র চ ন্ চ ল দি গ ঙ্ গ নে ০ ০ ০

I সা সা -া রা । সা -রা -জ্ঞা রা I সা -া -া -া । -া -া -া -া II
আঁ ধা ০ র অ ম্ ০ ব রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা -া পা । (প)ণা -পা না না I না না -র্সা র্সা । (র্স)র্রা -না র্সা র্সা I
ন দী ০ র ক ল্ লো ল ব নে ০ র ম র্ ম র

I পা -র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা -না র্সা । র্সা -র্রা র্রা র্জ্ঞা I
বা দ ০ ল উ চ্ ছ ল নি র্ঝ ০ র ঝ র্ ঝ র

I র্রা র্রা -া -র্সা । র্সা -না -া না I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
ন দী ০ র ক ল্ ০ লো ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা -র্রা র্সা । র্সা ণা -ণা -ধা I -পা -া -া -া । পা ধা মা -া I
ধ্ব নি ০ ত র ঙ্ ০ গি ল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I (ধ)র্সা র্সা -া র্সা । -ণা ণা ণা ণা I ধা ধা -া -ণা । ধা ধা পা পা I
ধ্ব নি ০ ত র ঙ্ গি ল নি বি ০ ড় স ঙ্ গী তে

I মা পা -া পা । পা মা ণা ধা I মা জ্ঞা -া -া । -া -া মা -া I
শ্রা ব ০ ণ স ০ ০ ন্যা সী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা -া পা । পা পা পা ধা I মা পা -া মা । (ম)জ্ঞা -া রা সা I
শ্রা ব ০ ণ স ন্ ন্যা সী র চি ০ ল রা ০ গি ণী

I সা সা -া -রা । সা -রা -জ্ঞা রা I (র)সা -া -া -া । -া -া -া -া II
আঁ ধা ০ র অ ০ ম্ ব রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা -ণা -ণা I ণধা ণা -ণা ণা । ধা ধা পা -া I
ক দ ম্ ব কু ন্ জে র সু০ গ ন্ ধ ম দি রা ০

I মা পা -ণা ণা । ধা ধা পা ধা I মা পা পা মা । জ্ঞা রা সা -া I
অ জ স্ র লু ঠি ছে ০ দু র ন্ ত ঝ টি কা ০

I না না না না । না -া না -র্সা I র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
ত ড়ি ৎ শি খা ০ ছু ০ টে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না না না না । না -া না না I না না -সা সা । র্সর্রা র্সনা র্সা র্সা I
ত ড়ি ৎ শি খা ০ ছু টে দি গ ন্ ত স০ ন্ ধি য়া

I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা -র্রা -র্সা র্রা I র্রা র্জ্ঞা -া -া -া । -া - -া -া I
ভ য়া র্ ত্ত যা ০ ০ মি নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্মা র্মা । র্মর্জ্ঞা -া র্রা র্সা I র্সা র্সণা -র্রা র্সা । র্সা -ণা ণা ণা I
ভ য়া র্ ত যা ০ মি নী উ ঠি০ ০ ছে ক্র ন্ দি য়া

I ণা ণধা র্সা র্সা । ণা ণা ণা ণা I ণা ধা -র্সা ণা । ণধা -া পা পা I
না চি ০ ছে যে ন কো ন্ প্র ম ত্ ত দা ০ ন ব

I র্সা র্সা -া র্সা । ণা ণা ধা পা I মা পা -া পা । মা মা জ্ঞা -রসা I
মে ঘে ০ র দু র্ গে র দু য়া ০ র হা নি য়া ০০

I সা সা -া রা । সা -রা -জ্ঞা রা I সা -া -া -া II II
আঁ ধা ০ র অ ম্ ০ ব রে ০ ০ ০

তারা

শ্রীমণীশ ঘটক

রাবণে যুঝিবে বানরসৈন্য লয়ে
এত ছলাকলা, তাই এত আয়োজন?
বলী সে বালীর সবল বাহুর ভয়ে
দেশত্যাগ করি বাঁচিয়াছে দশানন!

সুগ্রীব নহে চতুর তোমার মত,
ভ্রাতৃবিরোধে মাতিল মিতার তরে
কিন্তু সে বীর, শৌর্য্য-সমুন্নত,
তাহার রমণী রাক্ষসে নাহি হরে!

নরের ইতর আমরা বানর জাতি,
মোরা মানি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
আমাদের তরে পৃথক শাস্ত্র পাতি,
স্বামীহন্তায় হয়েছি স্বয়ম্বরা!

হায় নররূপী নারায়ণ, বসুধার
হরিতে কি এলে আদিম পুরুষকার?

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সুধার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে সুধা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নূতনত্বের ভিতর সুধা কোন আশ্রয় পাইল না। পীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নূতন নূতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত।

১৩

বার বৎসর মাত্র বয়সে পল্লীমাতার নিরাড়ম্বর ক্রোড় হইতে সুধা যখন মহানগরীর সমারোহের মাঝখানে আসিয়া পড়িল, তখনই তাহার মনের গঠনের ছাঁচ সম্পূর্ণ ঢালাই হইয়া গিয়াছে। পল্লীজননীর শ্যামস্নিগ্ধ শান্তশ্রী তাহার মনে যে চির নবীনতার রং ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে পল্লীর প্রাচুর্য্য ছিল, কিন্তু নগরীর সমারোহ ছিল না। ধরণী যেমন করিয়া বুক পাতিয়া বর্ষাধারাকে গ্রহণ করিয়া আপনার শ্যামলতায় সজলতায় নীরবে তাহাকে নব রূপ দান করে, আকাশকে সপ্রেম স্নিগ্ধ হাস্যে অভিনন্দিত করে, সুধার মনও তেমনই করিয়া মানুষের স্নেহপ্রীতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া নীরব মমতা ও গভীর সরস অনুরাগে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। গ্রহণ ও দান দুইই তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু লৌকিক দেনা-পাওনার নাগরিক প্রথা সম্বন্ধে চেতনা তাহার দ্রুত সজাগ হইয়া উঠিল না। বৃষ্টি-ধারা ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইয়া তাহার হৃদয়কে নবপ্রাণে বিকশিত করিয়া তোলে, কিন্তু তখন সে বারিধারাকে আর মাপিয়া ওজন করিয়া এই শ্যামলতার ভিতর চিনিয়া লওয়া যায় না। কলের জল পাইপের এক দিকে যেমন রূপে যে মাপে ঢোকে তেমনই মাপে ওজনে অন্য পাত্রে গিয়া ধরা দেয়। নাগরিক সভ্যতাও যেন সেই রকম—যেখানে টাকা পাইয়াছ ওজন করিয়া জিনিষ দিবে, ভদ্রতা পাইয়াছ ওজন করিয়া বন্ধুত্ব দিবে। এই ওজন-করা ব্যবসায়িক ভদ্রতার আদবকায়দা সম্বন্ধে সুধার সঙ্কোচ ও অজ্ঞতা চিরকালই রহিয়া গেল। তাহাকে হয়ত মূঢ়তাও বলা চলে। কারণ ইহারই জন্য নাগরিক সভ্যতায় বিচক্ষণ মানুষকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া চিরকালই সে একটু পিছনে থাকিত।

শিবু তাহার পাড়াপ্রতিবাসী ইস্কুলের সহপাঠী সকলের সঙ্গেই হৃদ্যতা করিতে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া প্রমাণ করিতে যখন ব্যস্ত, সুধা তখন যেন ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার সমবয়সী মানুষ যে তাহার চোখে কম পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু কাহারও সহিতই সে আপনা হইতে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পারিত না। যাহাকে তাহার ভাল লাগিত তাহাকে সে দূর হইতেই আন্তরিক মমতা ও নিষ্ঠার সহিত ভালবাসিত, পৃথিবীর হৃদয়জাত বনস্পতির মত তাহার শিকড়ও যেমন গভীর ও বিস্তৃত হইত, তাহার বহিঃপ্রকাশও তেমনই শ্যামস্নিগ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাতে দুরন্ত গতির চাঞ্চল্য আসিত না।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে চন্দ্রকান্ত একদিন গাড়ীভাড়া করিয়া সুধাকে মেয়ে-ইস্কুলে ভর্ত্তি করিতে চলিলেন।

স্কুল-বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড সবুজ ঘাসের ময়দান, পাশ দিয়া রাঙা সুরকির পথে সারি সারি ঝুমকোজবার গাছ, দুই-একটা টগর গন্ধরাজও আছে। দেখিলে নয়নজোড়ের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর ও রাঙা ধূলার পথ মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু চারিধারে হাস্যমুখর লীলাচঞ্চল বালিকার সকৌতুক দৃষ্টিপাতে সুধার মানবভীতি সজাগ হইয়া উঠিল, সে আর বাহিরের দিকে না তাকাইয়া ঘরের মেঝেতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিল। হাই-হিল জুতার খট্ খট্ শব্দ করিয়া ব্যস্ত ভাবে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ভয়ে সুধার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শিষ্টাচার মতে তাহার কি কর্ত্তব্য সুধা যেটুকু জানিত তাহাও কেমন যেন ভুলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, সুধা নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একবার খালি মুখ তুলিয়া দেখিয়া লইল শিক্ষয়িত্রীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দুগ্ধশুভ্র ফরাসডাঙ্গার শাড়ী ও তাঁহার ঝকঝকে সোনার চশমার অন্তরালে তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি। নিশ্চয় সুধাকে খুব কঠোর পরীক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড় লইতে হইবে। মানুষটাকে দেখিয়াই খুব কড়া মনে হইতেছে। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাংলা ইংরিজী অঙ্ক কত দূর পড়েছ?"

সভয়ে সুধা বলিল "সীতার বনবাস, মেঘদূত"...আর বলিতে হইল না। শিক্ষয়িত্রীর কঠোর মুখে হাসি দেখা দিল, "তুমি এতটুকু মেয়ে মেঘদূত পড়? তবে টোলে ভর্ত্তি হলে ত পারতে!"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "মেঘদূত ওর মুখস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ভুল হয়েছে, ইংরেজী বেশী পড়ানো হয় নি।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "তাতে আর কি? ও ত ছেলে-মানুষ, শিখে নেবে এখন। ওকে থার্ড ক্লাসে বসিয়ে দি গিয়ে। কি বলেন আপনি?"

এই পরীক্ষা! সুধার ধড়ে প্রাণ আসিল। শিক্ষয়িত্রীর হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। এই জনারণ্যের ভিতর সুধা নির্ব্বাসিতা সীতার মত একলা পড়িয়া রহিল। শিক্ষয়িত্রী তাহাকে যেখানে লইয়া বসাইয়া দিলেন ক্লাসের ঠিক সেইখানটিতে সুধা নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া রহিল। ভাল করিয়া কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলও না, পাছে চোখে চোখ পড়িলেই কেহ কোন প্রশ্ন করিয়া বসে। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতেছিলেন, তিনি সুধার সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিবার জন্য বলিলেন, "বল দেখি—'জ্যোৎস্না তুষার মলিনা সীতেব চাতপশ্যামা' মানে কি?"

সুধা মানে বলিতেই পণ্ডিত মহাশয় মেয়েদের বলিলেন, "দেখ, তোমরা যেন সব নূতন মেয়ের কাছে হেরে যেও না।"

মেয়েরা বিস্ময় ও কৌতূহলে দৃষ্টি পূর্ণ করিয়া সুধার মুখের দিকে তাকাইল, সুধা কিন্তু মুখ তুলিল না।

স্নেহলতা বলিয়া একটি খ্রীষ্টিয়ান মেয়ে পিছনের বেঞ্চে বসিয়াছিল। সে সুধার সঙ্কোচ বুঝিয়া আপনি উঠিয়া আসিয়া সুধার কাছে বসিয়া ভাব করিতে সুরু করিল। ক্লাসের ভিতর বেশী গল্প করা চলে না, কাজেই সে সুধার খাতায় বাংলা ইংরেজী সমস্ত বইয়ের নাম, প্রত্যেক বারের প্রত্যেক ঘণ্টার রুটিন একে একে টুকিয়া দিতে লাগিল।

টিফিনের ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া পড়িতেই মেয়েরা যে যাহার প্রিয় বন্ধুকে লইয়া বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। স্নেহলতা সুধাকে সঙ্গে লইয়া মুসলমান বাক্সওয়ালার নিকট হইতে চকোলেট কিনিয়া খাওয়াইল। সুধার জীবনে চকোলেটের স্বাদ গ্রহণ এই প্রথম। রঙটা ত বেশ সুন্দর পাটালি গুড়ের মত, কিন্তু স্বাদগন্ধ ঠিক যেন পোড়া তামাক। কিন্তু স্নেহলতা ভালবাসিয়া দিতেছে—কি করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়? মুখটা যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া সে সমস্ত চকোলেটটা এক সঙ্গে গিলিয়া ফেলিল। স্নেহলতা কিন্তু চালাক মেয়ে, সে সুধার মুহূর্ত্তে গলাধঃকরণ দেখিয়া আসল ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল "ওমা, নেসল্স্ চকোলেট তোমার ভাল লাগল না! প্রথম দিনে কারুরই ভাল লাগে না, যদি না আমাদের মত আজন্ম খাওয়া যায়। আচ্ছা, তুমি 'গোয়াভা চিজ' খেয়ে দেখ, নিশ্চয় বেশ লাগ্‌বে।"

সুধা আপত্তি করিবার আগেই স্নেহলতা পাতলা কাগজে জড়ানো লাল টুকটুকে 'চিজ' তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। "ওমা, এ ত পেয়ারা", বলিয়া সুধা খুশী হইয়া সাগ্রহে সবটা খাইয়া ফেলিল।' কিন্তু প্রতিদানে কিছু ত দেওয়া তাহারও

উচিত। সুধা বলিল, "কাল আমি পিসীমার তৈরি আমসত্ব এনে তোমাকে খাওয়াব, দেখো কেমন চমৎকার!"

স্নেহলতা হাসিয়া বলিল, "সে হবে এখন। তোমার ত বই কেনা হয় নি, চল খাতায় লিখে দি, কালকের বইয়ের কতখানি পড়া।"

পড়া লিখিতে লিখিতে স্নেহলতা বলিল, "সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের পড়াটা একটু যত্ন করে ক'রে রেখো, ভাই, উনি বড্ড রাগী মানুষ, শেষে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে না বলেন।"

সুধা অজ্ঞের মত বলিল, "বেঞ্চির উপর দাঁড়ালে কি হয়?"

স্নেহলতা সুধাকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "একবার দাঁড়িয়ে দেখো না কি হয়! তুমি একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে।"

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আর কি পড়া আছে বল।"

স্নেহলতা বলিল, "পণ্ডিতমশায় ভাল মানুষ, বই না পেলে তাঁর পড়াটা দুই-এক দিন বাদ গেলেও তিনি নূতন মেয়েকে কিছু বলবেন না। তাছাড়া তুমি ত ভাই নিজেই মস্ত পণ্ডিত, না-পড়া জিনিষও বলতে পার। যাই হোক্ পণ্ডিতমশায়কে কিন্তু বেশী প্রশ্ন করো না, যা বলবেন চুপ করে শুনো। প্রশ্ন করলেই উনি ভাবেন ওঁকে বুঝি ঠাট্টা করা হচ্ছে।"

স্নেহলতা সুধার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবার নানা চেষ্টাই করিল। কিন্তু এই চেষ্টা-করা বন্ধুত্বের ভিতর আন্তরিকতার কি একটা অভাব অথবা ভিন্ন তন্ত্রীর সুর সুধার মনের গতিকে বাধা দিত। সে স্নেহলতাকে একেবারে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। ইস্কুলে প্রত্যেক মেয়েরই এক-একটি বিশেষ বন্ধু ছিল, স্নেহলতার ইচ্ছা ছিল তাহার এই বিশেষ বন্ধুত্বের কোঠায় সে সুধাকে ফেলে। কিন্তু সুধা যে তেমন ভাবে সাড়া দেয় না ইহাতে স্নেহলতা রাগ করিয়া কতবার বলিত, "তুমি ভাই আমাকে দু-চক্ষে দেখ্‌তে পার না। কার দিকে তোমার মন বল না? উপর ক্লাসের বড় মেয়েদের এডমায়ারার হতে চাও বুঝি? ওসব ন্যাকামী দেখ্‌লে আমার গা জ্বালা করে। ইস্কুলে এসে লেখাপড়া শেখবার আগেই ঐ বিদ্যেটি সকলের শেখা হয়ে যায়।"

সুধা লজ্জিত হইয়া বলিত, "কি যে তুমি আবলতাবল বক! আমার কারুর সঙ্গে আলাপই নেই, ত ন্যাকামী করব কোত্থেকে? তোমাকেই ত কেবল আমি চিনি। ক্লাসের মেয়েদের এখনও ভাল করে চেনা হয় নি।"

বাল্যবন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন সুধার জীবনে তখনও ঘটে নাই। তাহার প্রায় একমাত্র খেলার সাথীই ছিল ছোট ভাই শিবু। কিন্তু একে ত সে ভাই, তাহাতে শৈশবের বয়সের মাপে অনেকটাই ছোট, সেই জন্য সুধা তাহাকে ঠিক বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে কোন দিন পারে নাই। শিবুর প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল গভীর বাৎসল্যমিশ্রিত। সে যে তাহার ক্ষুদ্র ভাইটির মস্ত বড় দিদি এই কথাটাই ছিল তাহার ভালবাসার ভিতর সকলের চেয়ে বড়। নারীজন্মের প্রথম পর্ব্বেই বাৎসল্যরসের মমতাস্নিগ্ধ ধারা তাহার জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল এই ছোট ভাইটিকে অবলম্বন করিয়া। অথচ সুধার মনে প্রবল একটা বন্ধুপ্রীতি তখনও উথলিয়া কূলপ্লাবিত করিয়া ছুটিবার জন্য থম্ থম্ করিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদের মত কোন্ বন্ধুর আকর্ষণ তাহার এই প্রীতির সাগর উচ্ছ্বসিত করিয়া জোয়ারের মত টানিয়া লইয়া যাইবে এই-টুকুর প্রত্যাশাতেই যেন সে বসিয়া ছিল।

এমনই দিনে দেখা দিল হৈমন্তী। স্কুলের টিফিনের ছুটির সময় একটা মস্ত মোটর গাড়ী করিয়া গাড়ীবারান্দায় কাহারা যেন আসিয়া নামিল। সব মেয়েরা তখন স্কুল-বাড়ীর ময়দানে খেলা করিতে ব্যস্ত। স্নেহলতা আজ পড়া তৈয়ারী করিয়া আনে নাই বলিয়া ছুটির সময় প্রাণপণে ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিতেছে। সুধা একলা একলা গাড়ীবারান্দার ধারের চওড়া বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল। গাড়ীটা দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। খাকি পোষাক-পরা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় হিন্দুস্থানী দরোয়ান গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিবার আগেই একটি গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি শ্যামাঙ্গী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। সুধা মেয়েটিকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। কলিকাতার আধুনিক স্কুলের মেয়ে সুধা এক মুহূর্ত্তে যেন জাতিস্মর হইয়া কোন সুদূর অতীত যুগে চলিয়া গেল। এই ত তাহার বহুকালের পথ-চাওয়া বন্ধু! ইহারই জন্য ত সে

জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিল। কত যুগ ধরিয়া কত ভ্রান্ত পথে পথে ঘুরিয়া আজ আবার দুইজনে দেখা! সুধা দেখিয়াই চিনিয়াছে! আয়ত কালো চোখের কি স্নেহ-মাখা গভীর অতলস্পর্শ দৃষ্টি! বহুযুগের স্নেহ সঞ্চিত না হইলে দৃষ্টিতে এমন অমৃত কি উথলিয়া উঠে? মেয়েটিও যেন সুধার মুখের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া গেল। যেন সে কি একটা আকস্মিক আবিষ্কার করিয়াছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

সুধা যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "সুধা।"

তিনি আবার সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কার মেয়ে বল ত! তোমাকে এখানে কেমন যেন নূতন নূতন দেখাচ্ছে।"

সুধা বলিল, "আমার বাবার নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত মিশ্র।"

স্মিতহাস্যে ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওঃ তুমি ত দেখ্‌ছি মস্ত লোকের মেয়ে। ওরকম পণ্ডিত আজকালকার দিনে দেখা যায় না। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই বটে, কিন্তু তাঁকে আমি দেখেছি, তাঁর আশ্চর্য্য গলার গানও শুনেছি। এই দেখ, আমারও একটি মেয়ে আছে হৈমন্তী, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে দিই। এই ইস্কুলেই ত পড়বে।"

হৈমন্তী হাসিমুখে আসিয়া অতি পুরাতন বন্ধুর মত সুধার হাত চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সুধা কেমন যেন সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া গেল। অমন পদ্মের পাপড়ির মত ধূলিলেশশূন্য পেলব সুন্দর বেশভূষা যাহার, অমন সুদীর্ঘ মৃণালের মত গ্রীবা, অমন গভীর অতলস্পর্শী দৃষ্টি যাহার, যাহার মুখের উদাস ভঙ্গীটুকু, যাহার অতি লঘুক্ষিপ্র গতি, আর পালকের মত হাল্কা চুলের রাশ দেখিলে তাহাকে সাধারণ পৃথিবীর মানুষ মনে করিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় যেন কোন দামী বিলাতী উপকথার বইয়ের পরীর ছবি হঠাৎ মানুষ হইয়া বইএর পাতা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে এই স্বদেশী মিলের মোটা শাড়ী ও ধুলিধূসরিত চটিপরা সুধাকে এমন অসঙ্কোচে কাছে টানিয়া লইল কি করিয়া? সুধার চটির ধূলা চুলের নারিকেল তেল হৈমন্তীর গায়ে লাগিয়া যদি একটুও তাহার বেশভূষার সৌন্দর্য্যের হানি করে তাহা হইলে এমন শিল্পসৃষ্টিটিতে যে খুঁৎ হইয়া যাইবে।

কিন্তু হৈমন্তী যেন সুধার মধ্যে কি পাইল। সে সুধার মোটা কাপড় পাড়াগেঁয়ে সাজসজ্জা কিছুই দেখিতে পাইল না। সে সুধার লজ্জাজড়িত চোখের ভিতর আপনার গভীর দৃষ্টি নামাইয়া যেন কোন পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ের সূত্র খুঁজিতে লাগিল। যেন বলিতে লাগিল, "আমাকে তুমি ঠিক চিনেছ ত?"

ভদ্রলোক হৈমন্তীকে হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "চল হেম্, আগে ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে তার পর নূতন বন্ধুর সঙ্গে গল্প আলাপ ক'রো এখন।"

হৈমন্তী বাবার কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিল বলিয়া মনে হইল না। সে বাবার সঙ্গে কোন রকমে চলিল বটে, কিন্তু সুধাকে প্রায় জড়াইয়া টানিতে টানিতে। সঙ্কুচিত সুধা চোখ নামাইয়া একেবারে নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

হৈমন্তী হঠাৎ আবদারের সুরে বলিল, "বাবা, সুধাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ইস্কুল থেকে ওকে চুরি করে নিয়ে পালাবে, ওর মা বাবা যে পুলিসে খবর দেবেন শেষে।"

হৈমন্তী ঠাট্টায় দমিবার মেয়ে নয়। সে বলিল, "হ্যাঁ বাবা, নিয়ে যেতেই হবে। তুমি ত এখুনি আমাকে নিয়ে ফিরে যাবে, তাহলে ভাব করব কখন?"

বাবা বলিলেন, "কেন, কাল থেকে রোজ স্কুলে আসবে সে কথা কি ভুলে গেলে? তখন যত খুশী ভাব ক'রো।"

হৈমন্তী তাহার মৃণাল গ্রীবা বাঁকাইয়া পিতার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ইস্কুলের পড়ার মধ্যে যেন কতই গল্প করবার সময় থাকে! যাও!"

ক্লাসের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়েরা যে যাহা করিতেছিল এক মুহূর্ত্তে বন্ধ করিয়া ছুটিয়া ক্লাসে চলিয়া গেল। অন্য মেয়েদের মত সুধাও ব্যস্ত ভাবে দৌড়িয়া পলাইল। হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বিদায় লইতেও কেমন লজ্জা করিল। হৈমন্তী এক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সুধার পলায়ন দেখিয়া পিতার সঙ্গে আপিস-কামরায় চলিয়া গেল।

* * *

সুধাদের স্কুলে একটা বড় ঘরেই চারিকোণে চারিটি ক্লাস। পরদিন ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয় সুধাদের ক্লাসে

ব্যাকরণকৌমুদী খুলিয়া তদ্ধিত প্রত্যয় পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, হঠাৎ খট্‌খট্‌ করিয়া জোরালো পায়ের আওয়াজ সুপরিচিত ছন্দে বাজিয়া উঠিল। সুধা ফিরিয়া দেখিল হৈমন্তীকে সঙ্গে করিয়া হেড্‌ মিষ্ট্রেস ঘরে আসিতেছেন। আনন্দে সুধার বুকটা দুলিয়া উঠিল। কাল হইতে সে হৈমন্তীর আশাপথ চাহিয়া আছে। এইবার সশরীরে হৈমন্তী তাহাদের ক্লাসে আসিয়া বসিবে। কিন্তু একটু দুঃখও হইল। যদি বেঞ্চিগুলা আর একটু পরিষ্কার চক্‌চকে হইত, যদি মেয়েরা হৈমন্তীকে অভ্যর্থনা করিবার আর একটু উপযুক্ত হইত।

সুধাকে হতাশ করিয়া হৈমন্তী তাহাদের নীচের ক্লাসে গিয়া বসিল। ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও নিদারুণ বিরক্তিকে অবহেলা করিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে তাকাইল। স্নেহলতার ঠোঁটদুটি কথা বলিবার জন্য উদগ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে কথা ফুটিল না। যাহার মনে যত কথা ভীড় করিয়া আসিয়াছে, ক্লাস শেষ না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহার একটিও প্রকাশ করিবার উপায় নাই। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসের শেষে ব্যাকরণকৌমুদী হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপুষ্ট শিখাটি ক্লাসের দিকে ফিরাইতেই স্নেহলতার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল "নূতন মেয়েটি কি রোগা ভাই? রঙটাও বেশ কালো!"

এক মুহূর্ত্তের ত পরিচয় তবু এতটুকু নিন্দা যেন সুধার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া উঠিল। মনীষা বলিয়া উঠিল, "ফিটফাট বেশ ফিরিঙ্গির মত, কিন্তু কি চোখ বাবা! যেন গিলে খেতে আসছে।"

সুধা ভাবিল, "হায় অন্ধ! চোখ কাকে বলে তাও কি তোমরা জান না? ঐ অতল কালো চোখের রূপ, ঐ মৃণাল গ্রীবা, ঐ পদ্মকুঁড়ির মত মুখ, কিছু তোমাদের চোখে পড়ল না, শুধু কালো রঙটুকু দেখতে পেলে?"

কিন্তু সুধা বাক্‌পটু ছিল না; তা ছাড়া মুখের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত কথায় তাহার এই দৈবলব্ধ প্রিয় বন্ধুর প্রশংসা করা কিংবা নিন্দা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা দুই যেন তাহার কাছে দেবতার নির্ম্মাল্য লইয়া পুতুলখেলার মত মনে হইতেছিল। সে আলোচনায় যোগ দিল না, কেবল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, হৈমন্তীর শ্যামশ্রীর অন্তরালে পূজার প্রদীপের মত যে প্রাণটি জ্বলিতেছে, তাহার নিষ্কম্প দীপ্তি যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহা কেন সুধা ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। সুধা কবিতা কখনও লেখে নাই, কিন্তু কবিতার হাওয়াতেই তাহার প্রাণবায়ু আজন্ম নিশ্বাস লইয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল একটি ছন্দে লয়ে সুরে সুসম্পূর্ণ গীতিকবিতা যেন তাহার বাণীরূপ হারাইয়া অকস্মাৎ কায়াগ্রহণ করিয়াছে হৈমন্তীর মধ্যে। তাহার হাঁটাচলা কথাবলা প্রতি অঙ্গ চালনার ভিতর এই যে আশ্চর্য্য সুষমা ইহা কবিতা ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নহে।

সঙ্গিনীরা সুধাকে আলোচনায় যোগ দিতে না দেখিয়া বিস্ময় ও কৌতুহল দেখাইতেছিল, কিন্তু সুধা কি তাহার মনের অনুভূতিকে এমন করিয়া মুখে প্রকাশ করিতে পারে? করিলেও এই অন্ধেরা তাহাকে পাগল বলিবে।

ছুটির পর হৈমন্তী দৌড়িয়া আসিয়া দুই হাতে সুধার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ভাই, আমাদের গাড়ীতে যেতে হবে।"

প্রশ্ন নয় একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট আদেশ। সুধা বলিল, "তুমি কোন্‌ বাসে যাবে তা ত জানি না। আমার বাড়ী যদি তার পথে না পড়ে?"

হৈমন্তী সুধাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "না গো না, বাসে না। আমাকে নিতে বাবা গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তাতে আমরা দুজন যাব, কেমন?"

সুধা সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিল, "আচ্ছা যাব, কিন্তু তোমার ফিরতে দেরী হয়ে যাবে না?"

প্রথম দিনেই বন্ধুকে অসুবিধায় ফেলিতে সুধার আপত্তি ছিল। সে নিজের সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য অপরকে এতটুকু অসুবিধায় ফেলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত। তা ছাড়া যদিও সুধা এক দিনেই হৈমন্তীর প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হইয়াছিল যে পাইলে তাহাকে অষ্টপ্রহরই ধরিয়া রাখিত, তবু তাহার নিজের সকল দিকের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে এমন একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তাহাকে লইয়া কেহ বাড়াবাড়ি করিলে সে কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত না।

বয়সে হয়ত হৈমন্তীই চার-পাঁচ মাসের ছোট হইবে, কিন্তু

সুধার সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই সে যেন সুধাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে করে।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, "দু-চার মিনিট দেরী হ'লেই কি আমি খিদেয় ককিয়ে মরে যাব? আমাকে তোমার মতন অমন কচি মেয়ে পাও নি!" বলিয়া সে সুধার দুইটি গাল সজোরে টিপিয়া দিল।

সুধা অগত্যা হার মানিয়া হৈমন্তীর সঙ্গেই যাইতে রাজি হইল। বই গুছাইতে ক্লাসে যাইতেই মনীষা বলিল, "এত তাড়াহুড়ো কিসের? যাবে ত সেই ৫টায় সেকেণ্ড বাসে। চল না মাঠে একটু ঘুরে আসি।"

সুধা বলিল, "আমি যে হৈমন্তীর গাড়ীতে যাচ্ছি।"

মনীষা বলিল, "চালাক মেয়ে বাবা! বড়মানুষের মেয়ে দেখেই অমনি পিছনে ছুটতে সুরু করে দিয়েছ? তবু যদি এক ক্লাসে পড়ত।"

অপমানে সুধার কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল। তবু হৈমন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিতে অথবা তাহার বন্ধুত্ব লইয়া হাটের ভিতর অসভ্যের মত ঝগড়া করিতে সুধার মানসিক আভিজাত্য অস্বীকার করিল। সে নীরবেই চলিয়া যায় দেখিয়া স্নেহলতাও বলিল, "আমাদের ভাই একেবারে ভুলে যেও না, হাজার হোক আমরা ত পুরনো বন্ধু।"

সুধা তাড়াতাড়ি বই লইয়া পলাইল। গাড়ীর ভিতর সুধা ও হৈমন্তী পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া হাত ধরাধরি করিয়া বসিল। তাহাদের হাতের স্পর্শের ভিতর দিয়াই যেন মনের সমস্ত প্রীতি উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছিল, যেন শব্দহীন কি একটা বাণী-বিনিময় অনুক্ষণ চলিতেছিল, কথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। একটি দিনের মাত্র পরিচয়, তবু সুধা ও হৈমন্তী দুইজনেই এই স্পর্শের ভিতর দিয়া বুঝিতেছিল যে কথা বলিয়া পরস্পরের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করিবার যে বৃথা চেষ্টা মানুষ করে, কোন একটা দৈব আশীর্ব্বাদে তাহারা তাহার উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। কথার আবরণ অতিক্রম করিয়া তাহাদের হৃদয় পরস্পরকে চিনিয়া লইয়াছে।

সুধা বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিল। হৈমন্তী ড্রাইভারকে বলিল, "গাড়ীটা একটু আস্তে চালিও, নয়ত কখন ভুলে বাড়ী ছাড়িয়ে চলে যাব।"

পথে যেখানে ঘরবাড়ীর ভিড় একটু কমিয়াছে সেইখানে পরিচিত গলিটুকুর কাছে আসিতেই সুধা বলিল, "এই যে এই গলিতে আমাদের বাড়ী।"

এতবড় একখানা গাড়ী হইতে এই সরু গলির মধ্যে নামিতে সুধার মনে কোন সঙ্কোচই আসিল না, কারণ অর্থের আড়ম্বরের কাছে মাথা নীচু করার শিক্ষা জীবনে তাহার হয় নাই। কিন্তু তবু তাহার মনে হইয়াছিল হৈমন্তী নিশ্চয়ই এই রকম ঘরবাড়ী দেখিতে অভ্যস্ত নয়, হয়ত সুধার এই রকম জায়গায় বাড়ী দেখিয়া হৈমন্তী বিস্মিত হইতে পারে।

কিন্তু হৈমন্তীর আনন্দিত মুখে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সুধাকে নামিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াই সে বলিল, "ড্রাইভার, গাড়ীটা একটু খানি রাখ, আমি একবারটি বাড়ীটা দেখে আসি।"

সুধার বাড়ীর এত নিকট হইতে বাড়ী না দেখিয়া সে কি করিয়া ফিরিয়া যাইবে? ড্রাইভার মনিব-কন্যার কথার উপর কথা বলিতে সাহস করে না, তবু একেবারে নূতন বাড়ীতে গলির মধ্যে হৈমন্তীকে নামিতে দেখিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "বহুৎ দেরী হো যায়েগা বাবা, সাহব গুস্‌সা করেঙ্গে।"

হৈমন্তী "আমি এখখুনি আসব" বলিয়া প্রায় সুধার সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া পড়িল। অগত্যা বেচারী ড্রাইভার নীরবে পথের ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গাড়ীটা দাঁড় করাইয়া সিটের উপর পা দুইটা উর্দ্ধমুখী করিয়া একটু ঘুমাইয়া লওয়া যায় কিনা তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

সুধাদের গলি হইতে খাড়া মইয়ের মত সিঁড়িটি অতিক্রম করিয়া তাহারা দেখিল ঝি ননীর মা পিছনের কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া একবোঝা বাসন লইয়া আসিতেছে। দিদিমণির সঙ্গে এমন মেম সাহেবের মত ফিটফাট মেয়েটিকে দেখিয়া ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার উৎসাহে কখন তাহার হাতের বাঁধন আলগা হইয়া একখানা থালা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া ভাঙিল সে লক্ষ্যই করে নাই। বাসন ভাঙার শব্দে চমকিয়া সুধার মা উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "শেষ করলে না কি গা সব ক'খানা বাসন?"

"মোটে একখানা ভেঙেছে" বলিতে বলিতে সুধা দুইফুট চওড়া খাড়া অককার সিঁড়ি দিয়া হৈমন্তীকে লইয়া তিনতলায় উঠিতে লাগিল। শিবু সবেমাত্র ইস্কুল হইতে ফিরিয়া রান্না-

ঘরে কি কি খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহাই তদারক করিতে উপর হইতে নাচিয়া নাচিয়া নামিতেছিল, হঠাৎ দিদির সঙ্গে অপরিচিত একটি মেয়ে দেখিয়া এক এক লাফে দুই সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া একেবারে চারতলার ছাদে চলিয়া গেল।

শিবু এখন অনেকটা বড় হইয়াছে, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে তাহার এগারো বৎসর পূর্ণ হইবে, লম্বাতেও সে প্রায় দিদির সমান হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তাহার অপরিচিত মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মিয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার দিকে যে রকম অবজ্ঞাভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাতে তাহাদের ত্রিসীমানায় না থাকাই উচিত। তাহার মস্ত অপরাধ যে সে খোকনের মত গাল-ফোলা নয় এবং আধ আধ কথা বলে না। ওঃ ভারি ত! নাইবা তাহারা উহার সঙ্গে কথা বলিল, শিবুর বন্ধুর অভাব নাই, সে চায় না মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে।

মা ছোট ঘরের ভিতর একটা তক্তাপোষের উপর খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, ছেলেকে হুড়মুড় করিয়া ছাদে পলাইতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু চট্ করিয়া উঠিয়া খবর লইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, একটা পা প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

সুধা বড় ঘরে টেবিলের উপর বই কয়খানা রাখিয়া হৈমন্তীকে লইয়া ছুটিয়া ছোট ঘর খানায় মা'র কাছে গেল। মা একটু ভিতরে বসিয়াছিলেন, না হইলে সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময়ই তাহাদের দেখিতে পাইতেন। ছোট্ট ঘর, তাহাতে অসংখ্য জিনিষপত্র। বাহিরের পরিচিত লোকজন বিশেষত মেয়েরা উপরেই দেখা করিতে আসেন, বড় ঘরখানাতেই তাঁহাদের বসাইতে হয়। কাজেই কাপড়ের আলনা, শীত-কালের জন্য তোলা লেপ-তোষক, ভাঁড়ারের আলমারী, কাপড়ের দেরাজ, এমন কি তরকারির ঝুড়ি বঁটি পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছে এই ঘরে। মহামায়া ত দেড়তলায় গিয়া তরকারি কুটিয়া দিয়া আসিতে পারেন না, সুধাও এখন থাকে সারাদিন ইস্কুলে। এত জিনিষেরই মধ্যে একখানা তক্তা-পোষে দিনে মহামায়ার কাজের আসন, রাত্রে বিছানা পাতিয়া চন্দ্রকান্ত ঘুমান। মহামায়া দিনের কাজের শেষে রাত্রেও এই একই আসনে শুইবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ঘরখানায় আলোহাওয়া বেশী এবং দিনান্তে একটু স্থান পরিবর্ত্তনও হয় বলিয়া চন্দ্রকান্ত অসুস্থ স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা মা'র কাছে থাকিতেই চায়, তাছাড়া বড় ঘরে বেশী লোকের সংকুলানও হয় বলিয়া তাহারা তিন জনেও এই ঘরে আশ্রয় লইয়াছে।

সুধার সহিত সুবেশা অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখিয়া মহামায়ার দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মানুষের মুখের সামনে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পাছে অভদ্রতা হয় বলিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। সুধা পরিচয় দিবার আগেই হৈমন্তী মহামায়াকে প্রণাম করিতে মাথা নামাইল। ব্যস্ত হইয়া সুধা সহাস্যে বলিল, "মা, এই আমার বন্ধু হৈমন্তী।"

তার পর হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ক'রে চিনলে ভাই, আমার মাকে?"

হৈমন্তী বলিল, "আমি মুখ দেখেই চিনতে পেরেছি।" বলিয়া মা ও মেয়ের দুই জনের মুখের উপর সে একবার সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

সুধা বিস্মিত সুরে বলিল, "কি যে বল ভাই! মা কি আশ্চর্য্য সুন্দর দেখ্‌ছ না?"

হৈমন্তী হাসিয়া সুধার দুইটা হাত ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো, দেখ্‌ছি বই কি!"

তার পর সুধাকে একবার বাহিরে টানিয়া লইয়া তাহার দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টি হানিয়া তাহার গাল দুটি টিপিয়া বলিল, "তুমিও আশ্চর্য্য সুন্দর। কিন্তু তুমি সেকথা জান না।"

সুধা একটু লজ্জা পাইয়া মুখ নামাইল।

হৈমন্তী সুধার কপালে একটি সস্নেহ চুম্বন দিয়া তাহাকে একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া "আজ আসি" বলিয়া সেদিনের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

১৪

হৈমন্তীকে আবিষ্কার করিবার পর সুধার জীবনে যেন একটা নূতন আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিল, জীবনের একটা নূতন অর্থ দেখা দিল।

যৌবনের সূচনার পূর্ব্বেই জীবনে একটা অতৃপ্তি এবং বিশ্বস্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে মস্ত একটা অভিযোগ লইয়া একদল

মানুষ সংসার-পথে চলে। তাহারা পৃথিবীতে কাহার কাহার কাছে অবিচার, কাহার কাছে অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং কাহার কাছে কি কি দুঃখ ও মনোবেদনা পাইয়াছে তাহারই হিসাব সযত্নে রাখে, অন্য দিকটা অবশ্যপ্রাপ্য মনে করিয়া সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। সুধা কিন্তু সেই দলে জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার বাল্য ও শৈশব কালের সমস্ত সম্বন্ধই আনন্দের সম্বন্ধ। মাতা পিতা, দুই ভাই, পিসিমা, মাসিমা, বহুদিনের অদেখা দাদামশায়, এমন কি করুণা ঝি প্রভৃতি যে কয়টি মানুষকে লইয়া তাহার সুনির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র জগৎ গঠিত, তাহাদের সকলের দানের ভাণ্ডার হইতে নিত্য কি পরিমাণ আনন্দ সে মধুমক্ষিকার মত কণা কণা করিয়া আপনার অন্তরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে ইহাই ছিল তাহার যৌবন জাগরণের পথে সকলের চেয়ে বড় হিসাব। সেই জন্যই খাঁটি হিসাবীর মত নিজের দেনাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া আনন্দে সেবা করিতে সে ভালবাসিত। আপনার প্রিয়জনের শ্রেষ্ঠতা ও অতুলনীয়তা সম্বন্ধে তাহার মনে যে গৌরবময় ধারণা ছিল সেইটা ছিল তাহার জীবনের আনন্দের একটা মস্ত খোরাক। এই আনন্দলোকে এবং সুন্দরী পৃথিবীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যলোকে সংসারের তুচ্ছতা ও অর্থহীন অতৃপ্তির উপরে তাহার মনটা সর্ব্বদা বিচরণ করিত বলিয়া পার্থিব কোন অভাব কি অবিচার সম্বন্ধে যৌবন জাগরণের মুখে তাহার মনে কোন অভিযোগের সৃষ্টি হয় নাই। মৃত্যু কি বিচ্ছেদের যতটুকু পরিচয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সে পাইয়াছিল তাহাতে বেদনার অন্তঃসলিলা ধারা অনুরাগের মূলকেই আরও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, মৃত্যু ও বিচ্ছেদকে অযৌক্তিক বলিয়া জীবনে বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই।

কিন্তু তাহার এই আত্মীয়গোষ্ঠী-পরিবৃত ক্ষুদ্র জগৎটা ছিল অত্যন্ত অভ্যস্ত, জন্ম হইতেই ইহার সহিত তাহার নাড়ীর সম্বন্ধ, তাই এই লোকের আনন্দটাও ছিল প্রতিদিনের প্রাণবায়ু ও অন্নজলের মত সুপরিচিত।

অকস্মাৎ হৈমন্তীর আবির্ভাব হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হইতে। সে নিজেই যে শুধু অদেখা ও অপরিচিত ছিল তাহা নয়, সে আসিয়াছিল এমন একটা আবেষ্টনের ভিতর হইতে যাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে সুধার কোনই পরিচয় ছিল না। চোখে চোখ পড়িতেই এই দুইটি ভিন্ন লোকের মানুষের মনে একই তন্ত্রীর সুর এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিতে সুধা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। ইহা তাহার জীবনে একটি অপূর্ব্ব অভিনব আবিষ্কার। সুমিষ্ট ফুলের সৌরভ যেমন অদৃশ্য থাকিয়াও বাতাসের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে অণুতে অণুতে ছড়াইয়া যায়, তেমনই হৈমন্তীর আবির্ভাবের আনন্দ সুধার জীবনের সকল কাজ ও সকল সেবার মধ্যে অদৃশ্যরূপে নূতনতর প্রেরণা লইয়া ছড়াইয়া পড়িল। বেলুনের গ্যাসে ভার মুক্ত হইয়া তাহা যেমন ঊর্দ্ধে আকাশলোকে উড়িয়া যায় সুধাও তেমনই এই আনন্দের প্রাচুর্য্যে ভার মুক্ত হইয়া সংসারের উপরের সৌন্দর্য্যলোকে পাখীর মত উড়িতে লাগিল।

চন্দ্রকান্ত একেবারে শেষরাত্রের হাল্‌কা অন্ধকারের মধ্যেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ছাদের চিলে-কোঠার ঘরে পূর্ব্বমুখী আসনে বসিয়া একতারা লইয়া গান করিতেন—

> "কর তাঁর নাম গান
> যত দিন রহে দেহে প্রাণ"

ঘুমের ভিতরেই বাবার মধুর কণ্ঠে—

> "যাঁর হে মহিমা জলন্ত জ্যোতি
> জগৎ করে হে আলো"

শুনিয়া প্রায় প্রতি উষায় সুধা চোখ মেলিয়া দেখিত সূর্য্যের নবীন জ্যোতিরেখায় পূর্ব্ব গগন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সুধাও তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, খোকনের ঘুম ভাঙিবার আগে তাহার ইস্কুলের অঙ্ক ও লেখাগুলি অন্তত সারিয়া রাখিতে হইবে, না হইলে সে স্কলার ও ইরেজার লইয়া ডাণ্ডাগুলি খেলিতে এবং কম্পাস লইয়া সারা বাড়ীতে পৃথিবী আঁকিতে লাগিয়া যাইবে। এদিকে ঝি রাঁধুনী আসিয়া পড়িলেই রান্নাঘরেও একবার না ছুটিলে চলিবে না, মা উপরে বসিয়া ভাঁড়ার বাহির ও তরকারি কোটার কাজটা না-হয় করিয়া দিবেন, কিন্তু খোকার দুধটা ফুটাইয়া আনা, শিবুর লুচিটা চটপট বেলিয়া দেওয়া, বাবার ভাতটা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া দেওয়া এসব হুড়াহুড়ির কাজ নীচে আসিয়া মা ত করিতে পারিবেন না। শিবু ডাল ভাত খাইয়া স্কুলে যাইতে চায় না, তার জন্য রোজ লুচি চাই, সেটা তবু মাছভাজা দিয়াই বেশ গরম গরম খাইয়া লওয়া চলে।

সুধা যদি ঝি রাঁধুনীর পিছনে না লাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে ন'টার মধ্যে ডাল ভাত, লুচি, দুধ আবার ভাজাভুজি এত আর হইয়া উঠিত না। ঘণ্টাখানিক ত কাজ নিশ্চয়ই পিছাইয়া যাইত। কিন্তু সুধারও ন'টায় না হোক্ সাড়ে ন'টায় বাস আসে। বাড়ীর কাজ চলে না বলিয়া সে দ্বিতীয় বাসে যাওয়া আসার ব্যবস্থাই করিয়া লইয়াছে। বিকালে বাড়ী ফিরিতে দেরী হইত বটে, কিন্তু সকালে বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়। তাহাতেই আর সকলের কাজটা সারিয়া দিয়া সে স্নান খাওয়া সারিয়া লইতে পারে।

চারতলার সিঁড়ির নীচে তিনতলার বড় ঘরের পাশে স্নানের জন্য ছোট একটা চিল্‌তে ঘর ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কল নাই, কে অত জল টানিয়া তুলিবে? মা'কে না দিলে নয়, তাঁহারই জলটা শুধু ননীর মা পৌছাইয়া দিত। সুধারা স্নান করিতে যাইত দেড়তলার রান্নাঘরের পাশের কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটা অন্ধকার কোটরে। কোন সময় কয়লা ঘুঁটে রাখিবার জন্য হয়ত বাড়ীওয়ালা এটা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কলতলাটা পাড়াসুদ্ধ লোক দেখিতে পায় বলিয়া সুধারা ইহাকেই স্নানের ঘর করিয়াছে। ঘরের দরজা বন্ধ করিলেই চোখে আর কিছু দেখা যাইত না। কিন্তু বালতির ভিতর কলের জলের শব্দটাই মনকে আনন্দে নাচাইয়া তুলিত। স্কুলে মেয়েদের মুখে শোনা রবিবাবুর নূতন গান,

"তোমারই ঝর্ণা তলার নির্জ্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্‌খানে।"

মনে পড়িয়া যাইত। জলধারার সহিত তাহার অশিক্ষিত কণ্ঠ মিলাইয়া সুধা গান ধরিয়া দিত। মনে থাকিত না যে অন্ধকার আরসোলাপূর্ণ বায়ুহীন একটা খোপের ভিতর সে কোনপ্রকারে স্নানটা সারিয়া লইতে আসিয়াছে। মা অনেক দূর তিনতলার ছাদের আলিসা হইতে ঝুঁকিয়া বলিতেন, "ওরে, তাড়াতাড়ি কর, ইস্কুলের গাড়ী তোকে ফেলে যাবে যে।"

শিবু ভাতের থালা বাড়া হইয়াছে শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিত, "দাঁড়াও! দিদির কবিত্ব আগে শেষ হোক, তবে ত ইস্কুল যাবে।"

ভিজা কাপড় হাতে করিয়া উপরে আসিতে আসিতে সুধা বলিত, "কবিতা কে লেখে রে, তুই না আমি?" কিন্তু মনের ভিতর তাহার এ-তর্কের জোর থাকিত না। শিবু বলিত, "আমি বোকা-সোকা মানুষ, যা খুশী তাই লিখি, যে-সে দেখে, তোমার মত সমস্ত কবিত্বের জাহাজ এক-জনের জন্যে বোঝাই ক'রে ত রাখি না।"

সুধা সে-কথার জবাব দিত না। বাসনের পিঁড়ির উপর হইতে একটা থালা তুলিয়া রান্নাঘরে নামাইয়া দিয়া বলিত, "বামুনদি, চট্ ক'রে ভাতটা বাড়, মাছভাজা আর ডাল হলেই হবে, আমি চুলটা আঁচড়ে আসছি।"

দ্রুতপদে সুধা উপরে উঠিয়া গেল, চুল আঁচড়াইয়া বঙ্গ-লক্ষ্মী মিলের কালাপেড়ে মোটা কাপড়খানা বোম্বাই ধরণে ঘুরাইয়া পরিতে পরিতে ও গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,

"রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে।"

বাল্যলীলাভূমিতে প্রত্যহ দেখা শৈলমালার অন্তরালে অস্তমান সূর্য্যের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল, জীবনের নবলব্ধ আনন্দ যেন সেই অস্তরাগের রং আরও রহস্যময় করিয়া তুলিতেছিল। স্কুলের পোষাক করিবার সময় হৈমন্তীর কোঁকড়া চুলের মোটা বিনুনীর তলায় চওড়া কাল রেশমী ফিতার জোড়া ফাঁস, তাহার সাদা মসলিনের ফাঁপা হাতের জামা, তাহার সাদা খড়কে-ডুরে শান্তিপুরে ফুলপেড়ে শাড়ী, তাহার মুক্তাখচিত 'এইচ' লেখা ছ-আঙুল লম্বা ব্রোচ, তাহার সাদা লেসের মোজা ও সাদা ক্যানভাসের হিল-দেওয়া জুতা সুধার মনের ভিতর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কি সুন্দর হৈমন্তীকে দেখায় এই পোষাকটিতে! কিন্তু সুধা তাহা নকল করিয়া সং সাজিতে এবং হৈমন্তীর পোষাকের অমর্য্যাদা করিতে চাহে না। সুধাকে অমন হাল্কা পরীর মত পোষাকে মোটেই মানায় না। তাহার এই বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা শাড়ী, মোটা ছিটের জামা ও বিবর্ণ চটিই বেশ ভাল। আঁচলটা কোমরে গুঁজিয়া একটা ষ্টীলের সেফটিপিন কাঁধে লাগাইয়া সে খাইতে চলিয়া গেল। অধিকাংশ দিন আঁচলে চাবি ঝুলাইয়াই সে স্কুলে চলিয়া যায়।

খোকন পাতের কাছে আসিয়া বলিল, "দিদি ভাই, আমাকে এতটুকু মাছ!" তাহার তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র ঠেকাইয়া সে মাছের পরিমাণ বুঝাইয়া দিল।

সুধা তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া তাহার ছোট হাতখানিতে আধখানা মাছভাজা তুলিয়া দিল। মহামায়া এই সময়টা স্নান ইত্যাদি সারিয়া একবার সিঁড়ি ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামেন। সুধা চলিয়া যাইবে, তাহার খাওয়াটাও দেখা হইবে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বিকালের কাজও কিছু আগাইয়া দেওয়া যাইবে। নিজের খাওয়ার পর সেই যে তিনি উপরে যান ত আর নীচে নামেন না। মহামায়া সুধার দান দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একখানা মাছ তাও আবার আধখানা ওকে দিলি, সারাদিন সেই পাঁচটা পর্য্যন্ত দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকবি কি করে? যা না মেয়ে, তাঁর লোকের সামনে হাঁ করে খেতেও লজ্জা করে, পাছে তারা দাঁত দেখে ফেলে। ও ননীর মা, এক ভাঁড় দই এনে দে ত বাছা তোর দিদিমণিকে। এই খেয়ে কি ন-টা পাঁচটা চলে কখনও?"

সুধা শরীরবিজ্ঞান কি ডাক্তারী পড়ে নাই এবং লোভ জিনিষটা স্বভাবতই তাহার কম ছিল। কাজেই খাওয়া জিনিষটায় মানুষের কি প্রয়োজন সে বুঝিত না। ক্ষুধা ত ডাল ভাত খাইলেই মিটে, তবে আবার মাছ না হইলে হইবে না, দই না হইলে চলিবে না করিবার কি প্রয়োজন? মা দই না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না, কিন্তু তাহার জন্য ত আবার দশ মিনিট হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা চাই। উঠিয়া পড়িলে এতক্ষণে কাপড়ের সেলাইটা শেষ করা চলিত। মাঝখানে ক'ঘণ্টা খাওয়া হইবে না তাহাতে এমন কি চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে? মানুষ ত জানোয়ার নয় যে অষ্টপ্রহর জাবর কাটিতে হইবে।

ক্রমশঃ

মায়া

শ্রীসুপ্রভা দেবী

আসিতে তরণী বাহি নদীর নীরে
ঢেউগুলি উছলিয়া ভাঙিল তীরে;
হেরিনু শ্রাবণ-নিশি সজল করিছে দিশি,
কথাহীন কানাকানি বাতাস ঘিরে,
আসিতে তরণী বাহি নদীর নীরে।

আজিকে দিবস কোথা এলেম ফেলি,
কোথায় উড়িয়া গেল পাখাটি মেলি!
কোথায় প্রভাতবেলা অরুণ আলোক-মেলা,
অনেক কুমুদবনে মরাল-কেলি;
সারাটি দিবস কোথা এলেম ফেলি!

কখন গ্রামের পথে গোখুর-ধূলি
উড়ায়ে গোধূলি এল, গিয়েছি ভুলি;
তখন ভেবেছি মনে নিরালে অলস ক্ষণে,
বিজন মরমদ্বার আধেক খুলি
কেহ কি হেরিবে মম স্বপনগুলি?

দিবস ফুরায়ে যায়, ফুরায় হাসি,
এবার ঘিরিয়া আসে আঁধার রাশি;
হৃদয়-বাসনারাজি ছড়ায়ে এলেম আজি
ফেলিনু পথের বাঁকে পথের বাঁশী;
এবার ঘিরিয়া রবে আঁধার রাশি।

বারেক চাহিনু দূর আকাশমাঝে,
জলদ-অলক পাশে তারকা রাজে;
যেমন বনানী-ফাঁকে চকিত আলেয়া জাগে,
ক্ষণিক বিজলী ঝলি লুকায় লাজে,
তেমনি একাকী তারা আকাশ মাঝে।

আজিকে মরমে লয় জীবন ভরি
যে বাঁশী বাজিল মন উদাস করি,
যে-মায়ামৃগের টানে চলেছি সমুখ পানে,
চলেছি দিবস রাতি ভাসায়ে তরী,
সে-মায়া দিয়েছে ধরা জীবন ভরি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৬। মূল্য ২॥০ ও ৩, টাকা।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন নৈরাশ্য জন্মিয়া গিয়াছে যে নিজের লেখা ছাড়া অন্য লেখা পড়া ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম এমন সময়ে মোহিতবাবুর আধুনিক বাংলা সাহিত্য নামে সমালোচনা-গ্রন্থ হাতে পড়িল। ব্রিটিশপ্রভাবোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ চিন্তাপূর্ণ ধারাবাহিক রচনা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। বাঙালীর সমালোচনার মধ্যপন্থা নাই, তাহাতে হয় 'চমৎকার আহা মরি মরি'র সুমেরু, নয় ব্যক্তিগত গালাগালির কুমেরু; প্রকৃত সমালোচক মধ্যপন্থার পথিক, মোহিতবাবু সেই মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :—

আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, শরৎচন্দ্র ও আধুনিক সাহিত্যের ভাষা।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উপরে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাব এত গভীর ও ব্যাপক যে অপরিণামদর্শীর দৃষ্টিতে ইহা সর্ব্বতোভাবে অ-বাঙালী। কিন্তু লেখকের কৌশলী দৃষ্টি ইহার ভিত্তিতে পূর্ণ বাঙালীয়ানাকে আবিষ্কার করিয়াছে। এই সাহিত্যের মূলে জাতীয় ভিত্তি ছিল বলিয়াই তাহা বৈদেশিক প্রভাবের গরলকে নীলকণ্ঠের মত অতি সহজে ধারণ করিতে পারিয়াছিল; এবং ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সাহিত্যের "দেহ ও প্রাণধর্ম্ম দেশেরই, বাহির হইতে আসিয়াছিল কেবল সঞ্জীবনী ভাব প্রেরণা। অতএব আজ সাহিত্য ও ভাষার এই আদর্শসঙ্কটের দিনে, জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি—এক কথায় তাহার স্বধর্ম্ম, এই নব্য সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।"

এই প্রয়োজন হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থের রচনাগুলির উদ্ভব। লেখক বাংলায় এই পুনরুজ্জীবন-পর্ব্বের দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের পুনরুজ্জীবন-পর্ব্বের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার অঙ্গহীনতা ধরা পড়িবে।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল তাহা উভয়মুখী ছিল—বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী। বহির্লোকে ড্রেক ও র‍্যালে, অন্তর্লোকে শেক্সপীয়র ও স্পেন্সর ইংলণ্ডের বাণীর বনিয়াদ রচনা করিয়াছিল। স্পেনের নৌবহর ধ্বংসের মূলে ছিল ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুশাসনকে অস্বীকৃতি। ড্রেক পারসমুদ্রে যে নব দিগন্তের অনুসন্ধান করিতেছিল তাহার দোসর ছিল শেক্সপীয়রের অন্তর্ম্মুখী অনুসন্ধিৎসায় আর র‍্যালে সাত-সমুদ্র-তের-নদীর পারে যে স্বর্ণপুরীর সন্ধান কোনদিন পায় নাই লণ্ডনে বসিয়া শেক্সপীয়র তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল—মানুষের দুস্তর হৃদয়সমুদ্রের পরপারে।

এই জাতীয় জাগরণ উভয়মুখী ছিল বলিয়াই তাহা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে পারিয়াছিল এবং উত্তরকালে ইংলণ্ডকে এমন গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে বাঙালীর পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত একপেশে ও অঙ্গহীন। ইংরেজের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য-পত্তনে, রাষ্ট্রশৃঙ্খলায়, আইন-প্রণয়নে ও সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য আদর্শের বিস্তারে বাঙালী শান্তি ও সাম্য অনুভব করিয়াছিল। এই শান্তি ও সাম্য যে-পরিমাণে তাহার ভাবলোকে মুক্তির আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিল বহির্লোকে সে তুলনায় কিছুই দিতে পারে নাই। বাঙালী আর্ম্মাডা ধ্বংস করে নাই, রাজ্য বিস্তার করে নাই, উপনিবেশ স্থাপন করে নাই—কেবল সাহিত্য রচনা করিয়াছিল। পশ্চিমের এই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার সুপ্ত বাঙালী ধর্ম্ম—চৈতন্যদেবের সময় হইতে যাহা সুপ্ত ছিল—জাগিয়া উঠিয়া আর একবার, বোধ হয় শেষবার, আপন অস্তিত্বকে অনুভব করিয়াছিল। মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বাহ্য আড়ম্বর, ভাষার ঐশ্বর্য্য, ভঙ্গী বৈদেশিক প্রভাবকে যতই উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করুক না কেন, তাহার "দেহ ও প্রাণধর্ম্ম" দেশেরই। সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ এই যে তাহাতে তৎকাল ও সর্ব্বকালের, অর্থাৎ তথ্য ও সত্যের সমন্বয় ঘটিয়া থাকে। চিরকালের সত্য তৎকালের রথে আরোহণ করিয়া দেখা দেন। মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মহত্ত্বের বাহন এই বাঙালীত্ব। এ বাঙালীত্ব এতই শক্তিমান যে বিশ্ববোধের বিশাল গিরি গোবর্দ্ধন অনায়াসে ধারণ করিতে সমর্থ। ইঁহাদের রচিত সাহিত্য বিশিষ্ট হইয়াও বিশ্বজনীন। ইহা বাঙালীর রচিত বিশ্বসাহিত্য। সেই জন্য লেখক মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন : —"পশ্চিমের প্রবল প্রভাব··· যাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই একেবারে গুমরিয়া উঠিল; ··· ··· হোমার, ভার্জ্জিল, ট্যাসোর কাব্য-গৌরব বিফল হইল—বীর বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙ্গালী বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। ··· ইহাই হইল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। ··· মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতি কাব্য।" লেখক বলিতেছেন, মধুসূদন, বিদেশের ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া অচিন্ত্য সমুদ্রের দিকে তরণী চালনা করিয়াছিলেন কিন্তু "সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"

লেখক এই গ্রন্থে মেজর ও মাইনর দুই শ্রেণীর লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই জাতীয় চৈতন্য আছে, কিন্তু মেজর লেখকদের রচনায় সব সময়ে তাহা চোখে পড়ে না; শিল্পের ইন্দ্রজালে তাহা আচ্ছন্ন। মাইনর লেখকদের রচনায় শিল্পের ইন্দ্রজাল তেমন দৃঢ়পিনদ্ধ না হওয়াতে জাতীয় চৈতন্য বেশ সহজে ধরা পড়ে। মেজর লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে মাইনর লেখকদের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার ইহাই প্রধান কারণ।

লেখক বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্গতির ও অধঃপতনের মূলে এই জাতীয় চেতনার তিরোভাব। সেইজন্য সাজসরঞ্জাম, বাহ্য আড়ম্বর সত্ত্বেও যেন ইহা প্রাণহীন। একদিন বাঙালী যে গাণ্ডীবকে যুদ্ধজয়ের জন্য অনায়াসে ব্যবহার করিয়াছিল, প্রাণদেবতার অভাবে আজ তাহাকে তুলিবার সাধ্যও তাহার নাই।

বাংলা সাহিত্য আজ জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন; ইহার মূল জাতির নাড়ীর সঙ্গে আর বদ্ধ নহে, তাহার একমাত্র যোগ শিল্পীর অত্যুগ্র আত্মার সঙ্গে। শিল্পীর আত্মা ও জাতির আত্মার মধ্যে আজ আর সামঞ্জস্য নাই—এই বিশ্ববিহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা (আত্মবিলাস) বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালী জাতির অধঃপতনের মূলে। জাতিকে বাদ দিয়া আন্তর্জাতিকতাকে, অপরকে বাদ দিয়া আত্মকে, বিশিষ্টকে বাদ দিয়া নির্ব্বিশেষকেই বাঙালী সাধনার পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। বাংলা সাহিত্য প্রলয় পাদক্ষেপে যে নিয়তির দিকে চলিয়াছে, বিহারীলালের "সারদামঙ্গল" সর্ব্বপ্রথমে সেই দিকেই যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল ভারতীয় ভাবসাধনার সঙ্গে যুক্ত-আত্ম ছিলেন বলিয়া বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য লেখক মাইকেল-বঙ্কিম-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মধ্যে দেখিয়াছেন, তাহা শেষ বারের জন্য ধরা পড়িয়াছে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যে। তার পর হইতে কাব্য ক্রমে জীবন-নিরপেক্ষ (বাস্তব-নিরপেক্ষ) হইয়া পড়িয়াছে, বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য এখন ভিন্ন পথের পথিক।

লেখকের সব মত স্বীকার করিতে পারি না, প্রয়োজনও নাই, এ-সব বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান গুণ লেখকের রচনায় আছে—পাঠকের চিত্তকে নাড়া দিবার শক্তি। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে পাঠকের মন আন্দোলিত হইতে হইতে অগ্রসর হইতে থাকে; আবার রচনার প্রৌঢ়ত্বের জন্য মাঝেমাঝে থামিয়া চিন্তা করিতে হয়। আরাম-চেয়ারে বসিয়া এ-বই পাঠ করিবার নয়; ইহা লইয়া চিন্তা করিতে হইবে, আলোচনা করিতে হইবে ও অবসর-কালে ধ্যান করিতে হইবে। নবন্যাসবিলাসী বাঙালী জাতির মধ্যে এখনও যে এই রকম গ্রন্থ লিখিত হয়, ইহাতেই মনে হয় বাঙালীর হয়ত এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু বাঙালীকে জানি, তাহার দ্বারা এ গ্রন্থ আদৃত হওয়া অসম্ভব, কাজেই সে অনুরোধ করিব না। মোহিতবাবু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, আবার তিনি সমালোচনা-সাহিত্যেরও প্রধান পথপ্রদর্শক।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাঙ্গালীর সার্কাস—শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রণীত। পাবলিসিটি ষ্টুডিও; ৩৬৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹। পৃঃ ৮৫ ১৭ খানি চিত্র।

বইখানিতে বাঙালীর সার্কাসের, এবং বিশেষ করিয়া বোসেস সার্কাসের ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বসু ভিন্ন কৃষ্ণলাল বসাক, শ্যামাকান্ত, ভীম ভবানী প্রভৃতি অনেকের কথাও ইহা হইতে জানা যায়। বাঙালীর সার্কাস প্রচেষ্টার মধ্যে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি বিদেশী সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবু বাঙালী খেলোয়াড়-গণের মধ্যে তাঁহার নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

বইখানি মোটের উপর বেশ ভাল হইয়াছে। ইহার ছবিগুলি ভাল, প্রচ্ছদপটখানি সুন্দর। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ছলনাময়ী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬১। মূল্য দুই টাকা।

দশটি ছোট গল্প লইয়া বইখানি। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার সজীবতায় এবং প্লটের মৌলিকতায় সমস্ত গল্পগুলিই অতিশয় চিত্তাকর্ষক। একটি দুর্লভ জিনিষ এই বইখানিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে; তাহা কয়েকটি গল্পের রুদ্র রস। বাংলা লেখকদের মধ্যে যাঁহারা এ-রস লইয়া কারবার করেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়; যে-কয়জন আছেন তাঁহাদের মধ্যে তারাশঙ্করবাবুর স্থান খুব উচ্চে। করুণ রসেও তিনি তেমনই কৃতী; তাহা ভিন্ন "রঙীন চশমা" "মুখুজ্জে-মশায়" গল্প দুইটির মধ্য দিয়া যে একটি হাস্যরসের ধারা বহিয়াছে তাহাও খুব উপভোগ্য।

ছোট গল্পের পাঠক স্বভাবতই একটু বিচিত্রতা আশা করেন, এই বইখানিতে তিনি পুরাপুরিই তাহা পাইবেন একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

ছাপার কিছু কিছু ত্রুটি আছে। কাগজ বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী—শ্রীকালী-কৃষ্ণানন্দ গিরি-কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ২ নং গৌর লাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মের স্বরূপ কি, তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, সম্প্রদায়গত ভাবে তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত কি, তাঁহার সাধনপ্রণালী কিরূপ, তাঁহার প্রকৃত গুরু কে—এই সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য গিরি মহাশয় এবং রামকৃষ্ণ মঠের কয়েক জন সন্ন্যাসী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষের সহিত সংবাদপত্রের মারফৎ বা ব্যক্তি-গতভাবে যে-সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল সেইগুলি এই পুস্তিকায় সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি এই আলোচনা হইতে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তথাপি এ জাতীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইহা ঐতিহাসিক ও ভক্ত উভয়েরই উপকারে আসিবে।

আনন্দগীতা—শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বর্দ্ধমান। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, শ্যামবাজার, বর্দ্ধমান পোঃ। দক্ষিণা এক টাকা।

মূলতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্করণ বিশেষের ভূমিকারূপে কল্পিত এই পুস্তিকায় গীত তথা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য অতি সংক্ষেপে ও যথাসম্ভব সরল ভাষায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনচ্ছলে 'সাধনা ও মুক্তি', 'জীবন্মুক্তি' এবং 'সৃষ্টিলীলা' নামক তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা কি হাস্যজনক আচারাদি বা পরস্পর-বিরোধ আপাততঃ অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু এই ধারণা যে অনেকাংশে অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্ত আলোচ্য গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রেরই অভিমত যে অল্প-বিস্তর একরূপ তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অল্পের মধ্যে গীতার মূল রহস্য যাঁহারা বুঝিতে চান—আচার্যদিগের গম্ভীর গ্রন্থরাজি আলোচনা করিবার অবসর বা অধিকার যাঁহাদের নাই তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। বাহ্য দৃষ্টিশক্তিহীন গ্রন্থকারের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

প্রেমানন্দ ১ম ভাগ—শ্রীওঁকারেশ্বরানন্দ লিখিত এবং ১০।১, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪৯। মূল্য ৸৹ আনা।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনৈক সাক্ষাৎ-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ। স্বামীজী ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। এই জীবন-কথা ও উপদেশগুলি পড়িতে পড়িতে তাঁহার শান্ত মধুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। রামকৃষ্ণদেবের

ভক্তমণ্ডলী ও ধর্ম্মপিপাসু পাঠক-পাঠিকার নিকট বইখানি আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

শ্যামলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲।

কুড়িটি গদ্য কবিতার সংগ্রহ। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ ভঙ্গীতে রচিত বলিয়া সকল কবিতাগুলির ভিতর গঠনগত একটি একতা ও সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাস্তবিক কবিতাগুলির ভাবসম্পদ বিচিত্র। এক একটি কবিতা মানুষের মনকে এক একটি পৃথক সুরে বাজাইয়া তুলে।

'চিরযাত্রী' বলিতেছে সেই, "সাধক রণযাত্রীদের কথা, যাদের চিরযাত্রা অনাগত কালের দিকে, যাদের যুদ্ধ হয় নি শেষ, নিত্য কালের দুন্দুভির শব্দে চিত্ত যাদের উদাস, তুচ্ছ যাদের ধনমান, মৃত্যু যাদের প্রিয়।"

'তেঁতুলের ফুলে' শুনি বর্ষাকালে আকাশে ক্রুদ্ধ মুনির মত মাথা তুলে আকাশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মহারণ্যের প্রতিনিধি শাখার শাখায় প্রতিবাদ তুলে ভৎ'সনা করেছে, বসন্তের দিনে সেই প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবনমদিরতার কথা', তেঁতুল শাখার কোণে লাজুক একটি মঞ্জরীর আবির্ভাবের কথা।

'মিলভাঙায়' কবি স্মরণ করেছেন মাথনদীতে সারি গান গাইবার সময় কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে যে এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিল ঠেলে, কাঁচা জীবনের পেলব রূপটি নিয়ে হৃদয়ের প্রথম বিস্ময় যে এনেছিল, সেই প্রথম সাথীকে। 'অমৃতে' দেখি ভারতের নারীর এক নূতন রূপ।

'বঞ্চিত' সুন্দর একটি ছোট গল্প তার সমগ্ররূপ নিয়ে গদ্য কবিতায় বাঁধা পড়েছে।

বইখানি উপহার দিবার মত সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাইয়ে সুসজ্জিত।

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় মূল্য ৸০

এটি একটি ক্ষুদ্র রূপক নাটিকা। তাসের দেশের মানুষেরা বাঁচিয়াও নাই, মরিয়াও নাই। 'এ যেন কাব্যের কথা থেকে তার ছন্দটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহারা সবাই চ্যাপ্টা, পেটে-পিঠে এক চলে, একটুও এগোয় না। এই সব ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি, তিরি, রুইতনী, চিঁড়েতনীর দেশে সমুদ্রপথে ভাঙা তরীতে রাজপুত্র আসিয়া পড়িয়াছেন। রাজপুত্রের আগমনে হরতনী চিঁড়েতনীদের তাসের দেহে নূতন প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের কণ্ঠে গান ফুটিয়াছে, তাসের বন্ধন ছাড়িয়া তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন।

নাটিকাটিতে কবির অনেকগুলি পুরাতন সুন্দর গানকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাসবংশীয়দিগের অপূর্ব্ব সাজসজ্জা অভিনয়মঞ্চে কলিকাতায় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনও ভুলিবেন না। শুধু বইখানি পড়িলে যতটুকু বোঝা যায়, অভিনয় দেখিলে মনে তাহার দশ গুণ ছাপ পড়ে। বিদ্যালয় প্রভৃতিতে বইখানি অভিনীত হইলে খুব লোক-চিত্তহারী হইবে।

শারদোৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ। মূল্য ১৲।

বাংলা ১৩১৫ সালে এই নাটকটি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়। সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনবার 'ঋণশোধ' 'ঋতু-উৎসব' ইত্যাদি রূপেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

বালক উপনন্দের ঋণশোধের ক্ষুদ্র কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া রচিত এই শারদোৎসব নাটিকাটি তাহার সঙ্গীতভাণ্ডারের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত। 'রাজা' ও 'শারদোৎসবের' ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আধুনিক নাট্য অভিনয়ের যুগের প্রথম সূচনা হয়। "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ" "আমার নয়নভুলানো এলে" ইত্যাদি গানের সঙ্গেই প্রথম নৃত্য ও অভিনয়ভঙ্গী নূতন পথে চলিতে আরম্ভ হয়। আজ তাহা 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতির ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব রূপে দেখা দিয়াছে।

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া",
"আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।"

প্রভৃতি গান বাংলা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শারদোৎসব বিদ্যালয়ে অভিনীত হইবার পক্ষে আদর্শ নাটিকা। ইহার পুঁথির মত আকারে ও সুদৃশ্য মলাটে ইহা উপহার দিবার পক্ষেও সম্পূর্ণ উপযুক্ত রূপ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ। মূল্য ১৲।

ইহার গোড়াতে আছে, চলিত ভাষায় কবির আদিতম গদ্য রচনা "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র"—গ্রন্থাকারে যাহার প্রথম প্রকাশ ১২৮৮ সালে। আমরা শিশুকালে হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে ইউরোপ-প্রবাসীর পত্র পড়িয়া যে প্রচুর হাস্যরস ও আনন্দ সংগ্রহ করিতাম তাহা এখনও মনে আছে। তখন বোধশক্তি সামান্যই ছিল, রসগ্রাহিতাও প্রচুর ছিল না। কিন্তু কিশোরবয়স্ক কবির লেখনীর ভিতর শিশুর মনকে আকর্ষণ করিবার আশ্চর্য্য একটা শক্তি ছিল নিশ্চয়ই, যাহা এই সকল বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছিল। এতকাল পরে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' পড়িয়া শৈশবের সেই আনন্দ তেমন করিয়া যে অনুভব করিতে পারিতেছি না, তাহার একটা কারণ 'য়ুরোপ' এখন আমাদের বড় বেশী জানা, তাছাড়া পার্থিব সকল জ্ঞানবৃদ্ধিতেই মানুষের প্রথম বিস্ময়ের মাধুর্য্য কমিয়া আসে এবং ৫৫ বৎসর আগেকার ইউরোপ হইতে এখনকার ইউরোপ অনেক দিকে স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা কারণও মনের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারে, জানি না তাহা সত্য কি না। শীতের রাত্রে পথ ভুলিয়া বিলম্বে উৎসব-সভায় পৌঁছিয়া কবিকে যে অনাহারে সকরুণ বেহাগ রাগিণীর আলাপ করিতে হইয়াছিল, এই জাতীয় গল্পগুলি ছেলেবেলায় আমাদের খুব আনন্দের খোরাক জোগাইত। সেই সব গল্পের অভাব দেখিয়া মনে হয় কিশোর কবির লেখনীর উপর আজিকার প্রবীণ কবির লেখনীর একটা শাসন যেন অলক্ষ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন্তব্য সমেত পূর্ব্বকালে ইহা যেরূপ ছিল, পুনর্মুদ্রণের সময় তাহাই থাকিলে পত্রগুলির সাহিত্যরস অক্ষুণ্ণ থাকিত বলিয়াই মনে হয়। 'বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ' যে এই চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে আছে তাহা কবি স্বয়ং উল্লেখ না করিলেও পাঠকবর্গের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার ইংলণ্ডের এই সরস ও জীবন্ত ছবিগুলি চলতি কথায় যেমন ফুটিয়াছে, পুঁথির ভাষায় তেমন যে ফুটিত না তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীশান্তা দেবী

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা একটি উন্নত, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন জীবনের কাহিনী। উপন্যাসের মত মনোরম অথচ পবিত্র এই বিবরণ পড়িতে পড়িতে চিত্ত আনন্দে ও তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়। লেখক অতি সহজ ভাষায় ও সরল ভাবে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তবে, স্থানে স্থানে অকারণে ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; আর 'গরমী কাল' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ একটু প্রাদেশিকভাবাপন্ন। ছাপার দোষে 'হাসি' প্রায়শঃই 'হাঁসি' হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এসব নগণ্য ত্রুটি সহজেই উপেক্ষা করা যায়। বইখানা মোটের উপর আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মধ্যাহ্ন-বিলাস

বিজ্ঞ

[ফোটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী

পশুরাজ-গৃহ : চিড়িয়াখানা

ময়দানের দ্বিপ্রহর

ফোটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী

দিবাস্বপ্ন

ফোটো

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ফোটোগ্রাফির প্রথম আবিষ্কার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঠিক এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই এক শত বৎসরের মধ্যে ইহার যে উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অল্প বিস্তর সকলেই কিছু কিছু জানি। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর হইল হ্যাণ্ড-ক্যামেরার সাইজ এবং ঐ সঙ্গে ছবির সাইজ সম্বন্ধে ব্যবহারের দিক দিয়া বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন

ফোটো: শ্রীপরিমল গোস্বামী

কলিকাতার দৃশ্য

ফোটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী

কলিকাতার দৃশ্য

তাহার যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মাত্র চারি-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও হাণ্ড-ক্যামেরা যত বড় হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন, সে ধারণা এখন আর নাই। এত দিন ৩¼ × ২¼ ইঞ্চি ছবি যে ক্যামেরায় তোলা যায় হাণ্ড-ক্যামেরার মধ্যে তাহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাইজ। অবশ্য 'ভেষ্ট-পকেট' ক্যামেরাও প্রস্তুত হইত কিন্তু তাহা জনপ্রিয় ছিল না। ¼ সাইজ, ৯ × ১২ সেন্টিমিটার বা পোষ্টকার্ড সাইজ ক্যামেরা যত বিক্রী হইত, 'ভেষ্ট-পকেট' সাইজ তাহার এক-চতুর্থাংশও বিক্রী হইত কিনা সন্দেহ। 'ভেষ্ট-পকেট' ছবির আকার ২½ × ১⅝ ইঞ্চি। কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এন্‌সাইন ক্যাটালগে টিকা-ওয়াচ্ ক্যামেরার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি—তাহাতে ডাকটিকিট সাইজের ছবি তোলা যাইত। কিন্তু সে ক্যামেরা আদৌ বিক্রী হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে লোকে অত্যন্ত ছোট সাইজ ক্যামেরা ও ছোট সাইজ ছবির ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন রীতির ফোটোগ্রাফির নাম হইয়াছে মিনিয়েচার

ফোটো: শ্রীপরিমল গোস্বামী কলিকাতার দৃশ্য

ফোটোগ্রাফি। ইহার জন্য বহুপ্রকার মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাকৃতি ক্যামেরাও প্রস্তুত হইয়াছে। বাংলায় এই ক্যামেরাকে 'মিনি'-ক্যামেরা বলিলে ভুল হইবে না। এই মিনিয়েচার ক্যামেরা এবং তাহার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম যাহাতে একেবারে নিখুঁত হয় এবং অল্প খরচে যাহাতে বেশী ছবি বেশী সহজে তোলা যায় তাহার জন্য ক্যামেরা প্রস্তুতকারকগণ যেন তাঁহাদের সকল নৈপুণ্য ইহাতে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তাহার ফল ফলিয়াছে অতি আশ্চর্য্য। মিনিয়েচার ক্যামেরার এই উন্নতিতে যেখানে যত বড় সাইজের হ্যাণ্ড-ক্যামেরা ছিল তাহার অধিকাংশ সস্তা দামে বিক্রী হইবার জন্য বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

মিনিয়েচার ক্যামেরার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাইজ এখন ৩½ × ২½ ইঞ্চি। এই সাইজটিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনপ্রিয় সাইজগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছিল। এখন যে সাইজ সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তাহার পরিমাণ ২¼ × ২¼ ইঞ্চি হইতে ৩৬ × ২৪ মিলিমিটার। এই শেষোক্ত সাইজের ক্যামেরা যতগুলি এদেশে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে লাইকা এবং কণ্ট্যাক্স সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট। কণ্ট্যাক্স ক্যামেরার আরও

একটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহার নাম কণ্টাফ্লেক্স। ছবির সাইজ ১১/২×১ ইঞ্চি। ক্যামেরার মূল্য ৮৪৮৲ টাকা হইতে ১১৪৮৲টাকা পর্য্যন্ত। ক্যামেরায় যে-সব সুবিধা আছে তাহার তুলনায় মূল্য বেশী নহে। ক্যামেরা ছোট বলিয়াই এই মূল্যে বহু প্রকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা ইহাতে করা সম্ভব হইয়াছে। সাইজ বড় হইলে মূল্য দশ-বারো হাজার টাকারও বেশী হইত। কোডাক ৩·৫ লেন্স-যুক্ত একটি মিনিয়েচার ক্যামেরা বাহির করিয়াছেন। ক্যামেরাটির নাম রেটিনা, দাম ১০৫৲ টাকা। ইহা ছাড়া, কোডাকের আরও দুইটি নূতন ক্যামেরা আছে। একটির নাম সিক্স-২০ ডুয়ো, অপরটির নাম ভোলেণ্ডা নং ৪৮। ছবির সাইজ যথাক্রমে ২১/৪×১৫/৮ ও ১৫/৮×১১/৪ ইঞ্চি, মূল্য যথাক্রমে ১১২৲ টাকা ও ১৫৫৲ টাকা। কণ্ট্যাক্স ক্যামেরার মূল্য ৪১৩৲ টাকা হইতে ১০৪৩৲ টাকা। সুবিধার তারতম্য অনুসারে মূল্যের তারতম্য। এই মূল্য প্রায়ই কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

মিনিয়েচার ক্যামেরায় সস্তায় যে-সকল সুবিধা পাওয়া যায় বড় ক্যামেরায় তাহা পাইতে গেলে তাহা আর কাহারও কিনিবার সাধ্য থাকিত না। ইহা ছাড়া, বড় ক্যামেরা এত বড় হইয়া উঠিত যে তাহা ব্যবহার করাও দুঃসাধ্য হইত। সেই জন্যই মিনিয়েচার ক্যামেরা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যে-সকল সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে-সকল ব্যবস্থাও অল্পদিনের আবিষ্কার। একটি সুবিধা—দ্রুত ফোকাস্ ঠিক করিয়া ছবি তোলা যায়। ইতিপূর্ব্বে রিফ্লেক্স ক্যামেরা ছাড়া অন্য কোন হ্যাণ্ড-ক্যামেরায় এ সুবিধা ছিল না। তখন দূরত্ব আন্দাজ করিয়া লইতে হইত, কিংবা পৃথক দূরত্বপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্য লইতে হইত। কিন্তু লাইকা এবং কণ্ট্যাক্স ক্যামেরার সঙ্গে দূরত্বপরিমাপক যন্ত্র এরূপভাবে বসান আছে যে ভিউ-ফাইণ্ডারে তাকাইলে একই সঙ্গে, কতটা স্থান ছবিতে উঠিতেছে এবং সে স্থান কত দূরে আছে তাহা মুহূর্ত্তে স্থির করা যায়। বড় অ্যাপারচারযুক্ত লেন্সে দূরত্বের সঠিক মাপ অত্যাবশ্যক। মাপ ঠিক না হইলে ছবি তোলা ব্যর্থ হইয়া যায়। সস্তাদামের ফিক্স্‌ট্-ফোকাস্ ক্যামেরায় অবশ্য ইহা প্রয়োজন হয় না। কণ্টাফ্লেক্স রিফ্লেক্স-ক্যামেরা, সুতরাং দূরত্বপরিমাপক যন্ত্র ইহাতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহাতে অন্য আর একটি সুবিধা যোগ করা হইয়াছে।

লাইকা, কণ্ট্যাক্স বা কণ্টাফ্লেক্স ক্যামেরায় সিনেমা-ফিল্ম ব্যবহার করিতে হয়। এই সব ক্যামেরায় ব্যবহারের জন্য পৃথক দৈর্ঘ্যের ফিল্ম পাওয়া যায়, তাহাতে ৩৬ খানা ছবি হয়। ৩৬ খানা ছবি শেষ হইলে তবে তাহা বাহির করা যায়। কিন্তু কণ্টাফ্লেক্স ক্যামেরায় অ্যাডাপ্‌টার লাগাইয়া একখানি করিয়া ছবি তুলিবার ব্যবস্থাও আছে। ইহা ছাড়া এই ক্যামেরার সঙ্গে ফোটো ইলেক্‌ট্রিক এক্সপোজার-মিটার লাগানো আছে। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক্সপোজার মিটার। ছবিতে কতটা উঠিতেছে, তাহা কত দূরে আছে, এবং তাহার জন্য কত এক্সপোজার দিতে হইবে এই তিনটিই একসঙ্গে নির্ভুলভাবে জানিতে পারা যায়।

মিনিয়েচার ক্যামেরা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সস্তা দামের বক্স-ক্যামেরাতেও ছোট ছবি লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাজারে অনেক প্রকার সস্তা মিনিয়েচার ক্যামেরা বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে নর্টন (মূল্য ২।০) ও সিদা (মূল্য ৫৲) প্রভৃতি কিছু কিছু চলিতেছে। বক্সটেঙ্গর ক্যামেরায় ১৫/৮×১১/৪ ইঞ্চি ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছোট একক-লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরার মধ্যে এক্‌জাক্টা ক্যামেরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহার ছবি ভেষ্ট-পকেট সাইজের। ইহা ছাড়া, ২১/৪×২১/৪ ইঞ্চি ছবি তুলিবার জন্য দুইটি লেন্সযুক্ত রিফ্লেক্স ক্যামেরা বাজারে অনেকগুলি আছে। তন্মধ্যে রোলাইফ্লেক্স, রোলাইকর্ড, ইকোফ্লেক্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যতগুলি ছবি দেওয়া গেল তাহার সবগুলিই ইকোফ্লেক্স ক্যামেরায় (মূল্য ১৩৩৲) তোলা। মূল ছবি প্রত্যেকটিই সমচতুর্ভুজ—২১/৪×২১/৪ ইঞ্চি। আবশ্যক মত অংশ লইয়া এনলার্জ করা হইয়াছে। ইকোফ্লেক্স নূতন মডেলে যে-সকল সুবিধা আছে কম দামের রিফ্লেক্স ক্যামেরার মধ্যে তাহাতেই চিড়িয়াখানার ছবি তোলা আমার কাছে খুব সহজ মনে হইয়াছে। রিফ্লেক্সের কিছু সুবিধাযুক্ত, অথচ রিফ্লেক্স নয় এমন একটি ক্যামেরা এদেশে খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। ক্যামেরাটির নাম ব্রিলিয়্যাণ্ট। দাম ২৭৲ টাকা হইতে।

এই ছবিগুলি তুলিতে আমি প্যানাটমিক ও স্যুপার-প্যান নামক দুইটি ফাইনগ্রেন প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম ব্যবহার করিয়াছি। স্যুপারপ্যানের দ্রুতত্ব প্যানাটমিক হইতে একটু বেশী। এই দুই প্রকার ফিল্ম হইতেই বড় আকারের এন্লার্জমেন্ট করিতে কোন অসুবিধা হয় না। ইহা ছাড়া, আরও অনেক প্রকার ফিল্ম পাওয়া যায়—রুচি ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহার চাহিদা।

যে রাসায়নিক পদার্থে ফিল্ম আবৃত থাকে তাহার দানা বা গ্রেন অতি সূক্ষ্ম না হইলে এই সব ক্যামেরায় তাহা ব্যবহার করা চলিত না। কারণ ইহার প্রত্যেকটি ছবিই বড় করিতে হয়। গ্রেন সূক্ষ্ম না হইলে বড়-করা ছবি সুদৃশ্য হয় না। অথচ এই জিনিষটাই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসম্ভব ছিল। তখন ফিল্মের স্পীড বা দ্রুতত্ব বেশী করিতে গেলেই সূক্ষ্ম গ্রেন রাখা সম্ভব হইত না। মিনিয়েচার ফোটোগ্রাফির যুগে ইহা সম্ভব হইয়াছে। এখন আর ফোটোগ্রাফি বিশেষ সময়ের মুখাপেক্ষী নহে, একটি উৎকৃষ্ট মিনিয়েচার ক্যামেরা হাতে থাকিলে যে-কোন সময়ে, যে-কোন আলোতেই স্ন্যাপ্ লইতে পারা যায়। ফোটোগ্রাফির এই নবপর্য্যায়ে ফোটোশিল্পী অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। বহুপ্রকার জটিল ব্যবস্থা দ্বারা ফোটোগ্রাফি অত্যন্ত সরল হইয়া আসিয়াছে। এখন আর কিছুই অনুমান করিতে হয় না; শিল্পীর মনের মধ্যে যদি ছবি রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তাহার আর কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় না; অতি অল্প আয়াসেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।*

* এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত তিনখানি কলিকাতার দৃশ্যের ব্লক ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ব্রতচারীর গান

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

চন্দ্র সূর্য্য তারার আলো
যার মাটিতে প্রাণ জাগালো
সেই বসুধার বুকে সোনার বঙ্গভূমি রাজে,
সেজে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা কুশী গঙ্গাধারার সাজে;—
এই ভূমির অনন্ত দানের বিশ্বেতে দীপালি,
দিব- সন্ততি এই স্বর্ণভূমির সুধন্য বাঙালী
মোরা সুধন্য বাঙালী
মোরা সুধন্য বাঙালী॥

রূপ-নারায়ণ মেঘনা ফেণী
করতোয়া আর ত্রিবেণী
এই ভূমিকেই সিক্ত ক'রে ধায় সাগরের পানে—
এই ভূমি বিধৌত প্রবল দামোদরের বানে।
এই ভূমির… …

হিমাচলের শিখর-স্রোতের
মানস-সরের সুদূর ব্রতের
এই ভূমিতেই হয় অতুলন মিলন পরিণতি;
এই ভূমিতেই বয় অনুপম পদ্মা মধুমতী।
এই ভূমির… …

যুগে যুগে সংগ্রামে ধায়
রায়-বেঁশে আর ঢালী হেথায়;
হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিলন-নির্ঝরিণী
জাগায় এই ভূমিতেই বাংলা ভাষায় মধুর প্রতিধ্বনি।
এই ভূমির ··

কীটপতঙ্গের আত্মরক্ষার কৌশল

'মথ'-জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রজাপতির পদে পদে শত্রু। এই জাতীয় পতঙ্গেরা সাধারণত এক ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ডানার রং কালচে সাদা। পৃষ্ঠদেশে ধূসর রঙের কতকগুলি ফোঁটা আছে। চড়াই, টুনটুনি ও বুলবুলি পাখীরা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই ধরিয়া খায়। ইহারা এই প্রজাপতির ক্যাটারপিলার বা শুককীটদিগকেও অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে। এই সব শত্রুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শুককীট ও প্রজাপতি উভয়েই অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের শুককীটগুলি লম্বা গোলাকার কাঠির মত। শরীরের উভয় প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; কিন্তু মধ্যস্থলে কিছুই নাই। ইহারা জোঁকের মত গাছপালার উপর হাঁটিয়া বেড়ায় এবং গাছের পাতা খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের সন্ধানে পাখীরা অনবরত গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। পাখীদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ইহারা যখন যে-গাছে থাকে সেই গাছের মত গায়ের রং বদলাইয়া ঠিক বোঁটা বা কর্ত্তিত শাখা-প্রশাখার মত আটকাইয়া থাকে। পাখীরা তো দূরের কথা, বিশেষ ভাবে না দেখিলে মানুষেরই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। সাধারণত ইহারা ধূসর বা ফিকে নীল রংই ধারণ করে। গুটি বাঁধিবার কিছু দিন পূর্ব্বে গায়ের রং লাল হইতে দেখা যায়। গুটি বাঁধিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শরীর সঙ্কুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রং বদলাইয়া সবুজ হইয়া যায়। তার পর চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাহিরের চর্ম্মাবরণ পরিত্যাগ করিয়া ধানের মত আকৃতিবিশিষ্ট উজ্জ্বল বাদামী রঙের গুটিতে পরিণত হয় এবং পাতার গায়ে আটকাইয়া থাকে। প্রায় দশ-পনর দিন গুটিকাবস্থায় কাটাইবার পর প্রজাপতি বাহিরে আসে। এই প্রজাপতিরা শত্রুর ভয়ে তাহাদের শরীরের অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় ছোট ছোট চিত্রিত পাতার উপর ডানা মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রজাপতির গায়ের ফোঁটা ও পাতার বর্ণ-বৈচিত্র্য সকলের দৃষ্টিবিভ্রম উৎপন্ন করে।

সবুজ রঙের বড় বড় এক প্রকার ক্যাটারপিলার বা শুককীট কপি, বেগুন প্রভৃতি গাছে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি স্থাপিত অঙ্গুরীর মত গায়ে অসংখ্য ভাঁজ। তাহার উপর দিয়া তির্য্যক্‌ভাবে অঙ্কিত কতকগুলি হলদে ডোরা আছে, আকৃতি অতি ভয়ানক, দেখিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। পশ্চাদ্দেশে অদ্ভুত একটি পুচ্ছ আছে। পাখীরা ইহাদের ভীষণ শত্রু। গায়ের রংই ইহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে। ইহারা কপি, বেগুন প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া থাকে। অনবরত খাওয়া ছাড়া ইহাদের আর কোন কাজ নাই। এক দিনে একটি গাছ সম্পূর্ণরূপে উজাড় করিয়া ফেলিতে পারে। গুটি বাঁধিবার

উপরের চিত্র: উপরে, সবুজ রঙের বেগুনপাতার ক্যাটারপিলারের গুটী
নীচে, গুটী কাটিয়া মথ-জাতীয় প্রজাপতিটি বাহির হইয়াছে
বামে, কাঠির মত ক্যাটরপিলারের প্রজাপতি

নীচের চিত্র: বেগুনপাতার মথ-জাতীয় প্রজাপতির ক্যাটারপিলার।
পাতার রঙের সহিত গায়ের রঙ মিলিয়া থাকে।

সময় হইলেই খাওয়া বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকে। প্রায় ৩।৩½ ইঞ্চি লম্বা এত বড় পোকাটা চোখের সামনে পাতার উপর বসিয়া থাকিলেও সহসা নজরে পড়ে না। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে হঠাৎ খোলস বদলাইয়া উভয় দিক ছুঁচলো খুব বড় একটা কুলবিচির মত গুটী বাঁধিয়া ফেলে। গুটীর চকচকে রং কালো। কিছুদিন নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিবার পর গুটী ফাটিয়া বিচিত্র বর্ণের প্রকাণ্ড 'মথ'-জাতীয় পতঙ্গ বাহির হইয়া আসে।

রাজ-কাঁকড়া

আমাদের দেশে বিবিধ প্রকারের বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট 'জিফোসুরা' গণভুক্ত রাজ-কাঁকড়া নামে এক প্রকার লম্বা লেজবিশিষ্ট সামুদ্রিক কাঁকড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাঁকড়া মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু জমির সার অথবা গৃহপালিত পাখী ও শূকর প্রভৃতির খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর মোহানায় সমুদ্রের ধারে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কাঁকড়াদের দাঁড়া-সমেত পায়ের সংখ্যা দশটি কিন্তু ইহাদের ছয় জোড়া পা এবং প্রত্যেক পা-ই দাঁড়ায় পরিণত হইয়াছে। মুখের
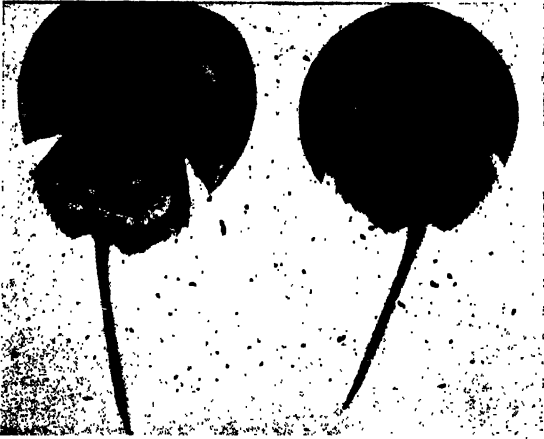
রাজকাঁকড়া
বুকের দিক উপরের দিক

সম্মুখ ভাগের দাঁড়াজোড়াটি সব চেয়ে ছোট, তাহার পরের দুই জোড়া বেঁটে, কিন্তু খুব মোটা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী; অবশিষ্ট তিন জোড়ার প্রত্যেকটি ক্রমশ একটার চেয়ে অপরটা বড় হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বশেষ দাঁড়ায় খুব ছোট সাঁড়াশী ও কয়েকটি করিয়া পাখনা আছে, এতদ্ব্যতীত সমস্ত পায়েই দাঁড়া রহিয়াছে। খোলের নীচে পিছনের দিকে কাগজের ভাঁজের মত অর্দ্ধগোলাকৃতি ছয় খানি পাতলা পাখনা আছে তার পিছনেই পাঁচ-ছয় ইঞ্চিলম্বা লেজ খোলার সঙ্গে কব্জার মত আঁটা রহিয়াছে, লেজটা বাদ দিলে ইহাকে একটা কচ্ছপের মতই দেখায়; অধিকন্তু একটা কলমের হাতলের মত শক্ত লেজ থাকার ফলে কাঁকড়ার সঙ্গে ইহার কিছুই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না তথাপি ইহারা সত্যিকারের কাঁকড়া এবং কাঁকড়ার সেরা বলিয়া রাজ-কাঁকড়া নামে অভিহিত। কাঁকড়া-জগতে ইহারাই বোধ হয় আদি জীব। চিৎ করিয়া ফেলিলে খোলাটা বাটির মত নিম্নপৃষ্ঠ ঠিক সারেঙ্গের খোলের মত দেখিতে। খোলাটা সম্মুখে ও পিছনে দুই ভাগে বিভক্ত। পিছনের খোলার ধারে বারটি তীক্ষ্ণ নখর আছে। সেগুলি লেজের দিকে বাঁকানো, সম্মুখের খোলার পৃষ্ঠদেশে পিছনের দিকে দুই ধারে দুইটি চোখ আছে। ইহারা সামুদ্রিক পোকামাকড় ধরিয়া খায় এবং বালি অথবা কর্দ্দমের ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাস করে। মে, জুন জুলাই মাসে ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। এই সময়ে জোয়ারের সঙ্গে কাঁকড়া-গুলি অগভীর জলে আসিয়া পড়ে। স্ত্রী-কাঁকড়াদের পিঠের উপর পুং-কাঁকড়াদিগকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। বেঙের মত বাহিরে ইহাদের ডিম্বনিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ডিমগুলি বালিতে পুঁতিয়া রাখে। রৌদ্রের উত্তাপে উপযুক্ত সময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। শিশু-অবস্থায় ইহাদের লেজ থাকে না। পরিণত বয়সে ক্রমশ লেজ গজাইয়া থাকে। লেজের একটা মাত্র উপযোগিতা দেখা যায়। যখন বালির উপরে কোন রকমে উল্টাইয়া পড়ে তখন লেজটাকে 'লিভারের' মত ঠেকা দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া থাকে। এমনই ইহাদের দেহের গঠন যে, একবার চিৎ হইয়া পড়িলে লেজ না থাকিলে ইহারা কিছুতেই উপুড় হইতে পারিত না।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন চীনের রূপকথা

সকল প্রাচীন দেশের ন্যায় চীনও রূপকথায় সমৃদ্ধ। তাহার দুইটি সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত হইল। চিত্রগুলি শ্রীমতী জানেট সিউয়াল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

পরিত্যক্তা বধূ: সুদূর অতীতের কথা এক নিঃসম্বল বিদ্যার্থী গ্রাম হইতে পরীক্ষার্থীরূপে শহরে আসিয়াছে। ঘটনাক্রমে সে এক অপরূপ লাবণ্যবতী অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত ও তাহার রূপে মুগ্ধ হইল। অভিনেত্রী এই কিশোর বিদ্যার্থীকে বিবাহ করিতে সম্মত, কিন্তু তাহার ভাগ্যবিধাতা প্রভুকে অর্থমূল্য প্রদান না করিলে অভিনেত্রীর অব্যাহতির কোনও উপায় নাই। অবশেষে আর এক জন গুণগ্রাহীর নিকট ঋণ করিয়া অভিনেত্রীর মূল্য পরিশোধ হইল। তার পর নবদম্পতী তরণীতে স্বগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ইতিমধ্যে যুবকের মনে সংশয় জাগিয়াছে তাহার পিতামাতা এই অভিনেত্রীকে বধূরূপে গৃহে বরণ করিয়া লইবে কিনা। দ্বিধা-ব্যাকুলচিত্তে অবশেষে যুবক নবপরিণীতা পত্নীর নিকট চিরবিদায় লইবার সংকল্প করিল এবং আর একটি তরণীতে এক ধনীর নিকট সুন্দরী ভার্য্যাকে বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইল,—বিদায়বিধুরার

সমুদ্রতলের মৎস্যবাহনে পরিত্যক্তা বধূ

অশ্রুকাতর কোনও আবেদন নিষ্ঠুর যুবককে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

স্বামীবিরহে বিষাদময়ী প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিল। কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিল না, এক অতিকায় সমুদ্র-মৎস্য তাহাকে বহন করিয়া সাগরতলের রাজপুরীতে লইয়া গেল; সেখানে একাকিনী অশ্রুমুখী নির্জ্জনে আপনার দুঃখে আপনি মোচন করে।

একদা স্বপ্নে আবার প্রিয়ের সহিত তাহার মিলন হইয়াছিল।

রূপসীর অভিসার : বহুপূর্ব্বে এক সৌম্যদর্শন বিদ্যার্থী একদিন পথিমধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসীর সাক্ষাৎলাভ করেন। রূপসী সাদর সম্ভাষণে বিদ্যার্থীকে বেণুকুঞ্জে আমন্ত্রণ করিল; সঙ্গীত ও কাব্যালোচনায় দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

ক্রমশ বিদ্যার্থী এই রমণীর প্রেমে আকৃষ্ট হইল, এবং বেণুকুঞ্জে প্রত্যহ তাহাদের সন্ধ্যা কাটিতে লাগিল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সুন্দরী জানাইল, তাহাদের মিলন-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, আর কোন দিন তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না। এই বলিয়া সে বিদ্যার্থীকে একটি মনোরম কৌটা প্রেমনিদর্শনরূপে উপহার দিল।

অকস্মাৎ এই বিদায়গ্রহণে হতবুদ্ধি যুবক পর দিন সায়ংকালে পুনরায় কুঞ্জদ্বারে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু কোথায় বা সে কুঞ্জ, কোথায় তাহার সুন্দরী অধিষ্ঠাত্রী!

বহু দিন পরে যুবক এক বিচারপতিকে তাহার প্রেয়সীর স্মৃতিবিজড়িত মনোরম কৌটাটি প্রদর্শন করিয়া সবিস্ময়ে জানিল, তাহার মানস-প্রতিমা প্রকৃতপক্ষে এক অপদেবতা!

বেণুকুঞ্জের রূপসী

অতীত কালে সে-ই ছিল রূপবিলাসী এক চীন-সম্রাটের রাজসভা-শোভিকা।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

বাঁশী

শ্রীঅলোক রায়

ঝড়ের হাওয়ায় যেমন করিয়া উৎসবরাত্রির দীপগুলি সহসা একসঙ্গে নিবিয়া যায়, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে তেমনই করিয়া মেয়েদের শয়নকক্ষের আলোগুলি একসঙ্গে এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল।

সিঁড়িতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদধ্বনি ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল, এবং তাহার পরই ভারী দরজার শব্দ হওয়াতে বোঝা গেল, তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

দোতলায় মেয়েরা থাকে, পাশাপাশি দশ-বারটা ঘর। সম্মুখে উঁচু রেলিং-দেওয়া কাঠের লম্বা বারাণ্ডা। বারাণ্ডায় দাঁড়াইলেই নদীটা দেখা যায়—কেবল একটি প্রশস্ত রাজ-পথের ব্যবধান।

নদীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে একেবারে ডান পাশের শেষে যে ঘরটা, তাহাতে থাকে একটি পাহাড়ী মেয়ে।

আলো সে নিবাইয়া দিয়াছে অনেক ক্ষণ, এখন আর তাই তাহার আলো নিবাইতে হইল না, গায়ের কাপড়টা টানিয়া সে কেবল একবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঝরণার ন্যায় চঞ্চল মেয়েটির স্বভাব, এখানে আসিয়া এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী এবং নিয়মকানুনের ভিতর পড়িয়া প্রাণটা তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এখানে সে নবাগতা, এবং নূতন আসিলে যাহা হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ কারণে-অকারণে পোড়া চোখ-দুইটাতে কেবল জল আসিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

দিনে সকলের চোখের সম্মুখে সে কোন রকমে আত্ম-সংবরণ করিয়া চলে, কিন্তু রাত্রে নিভৃতে শয্যায় শুইয়া শিয়রের উপাধান ভিজিতে থাকে। আজও তাহার ঘুম আসে নাই—নিস্তব্ধ নিশীথে মনটা তাহার মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় পাখা মেলিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরটির পানে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সফলং * বৃক্ষের যে-শাখাটা তাহাদের জানালার একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই পত্রান্তরালে আপনাকে লুকাইয়া জানালার ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায় ছোট একটি ঘর। এক পাশে চিমনি জ্বলিতেছে—তাহারই আলোতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মা তাহার পিতার মোজা রিপু করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা কাগজ-কলম লইয়া কি হিসাব করিতেছেন। অদূরে বইটা সুমুখে খুলিয়া রাখিয়া তাহার ছোট ভাইটি চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ের ভৎর্সনা শুনিয়া চোখ-দুইটাকে যথাসাধ্য টানিয়া টানিয়া খুলিয়া একটা লাইনই পুনঃপুনঃ পড়িয়া যাইতেছে। তাহাদের পশ্চাতে দ্বারের অন্তরালে বসিয়া তাহার বোনটি সোসাং-ফল খাইতেছে; মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে কেহ তাহাকে দেখিতেছে কিনা, এবং তাহার পর নিশ্চিন্ত মনে খাইতে খাইতে ভাবিতেছে, কি উপায়ে পিতামাতাকে না জানাইয়া ইহার কিছু অংশ দিদির নিকট পাঠানো যাইতে পারে।

তাহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া নীচের পড়িবার কক্ষের বড় ঘড়িটায় ঢং-ঢং করিয়া এগারটা বাজিল।

সময় হইল নাকি তাহার আসিবার? কিন্তু এত রাত করিয়া বাজায় কেন ও? কত দিন ত ঘুমাইয়া পড়ে, শুনিতেই পায় না মোটে। বড় ভাল লাগে তাহার বাঁশী শুনিতে, ভাইটির কথা মনে পড়িয়া যায়। কি ভালই না বাসে ও বাঁশী বাজাইতে! কত দিন স্কুল ফাঁকি দিয়া সে ঐ পাইনগাছটার তলায় দিদিকে ডাকিয়া আনিয়া বাঁশী শুনাইয়াছে। মনে হয় রাত্রের অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া তাহার ভাইটি যেন আসে তাহাকে দেখিতে, ঐখানে ঐ বালুচরে ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া ভাইটি আসিয়া বাঁশী বাজায়—বুঝি বা প্রবাসী বোনটির চোখে ঘুম আনিবার জন্যই। চিমনির আলোতে ভাইটির মুখ দেখা যায়—একেবারে স্পষ্ট।

* খাসিয়াদের প্রিয় এক প্রকার ফল।

তাহার পরের ঘরটিতে থাকে ফ্লোরিন। মা তাহার যুক্তপ্রদেশের মেয়ে, পিতা মাদ্রাজের খ্রীষ্টিয়ান। পিতামাতা থাকেন অনেক দূরে, মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, মেয়ে কিরূপ অধ্যয়ন করিতেছে সে-বিষয়ে অনুসন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

অতএব ফ্লোরিন দুইবার আই-এ পরীক্ষার পর এইবার 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' নীতির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি ছেলের সঙ্গে তাহার অসম্ভব ভাব হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাকে না পাইলে যে সাহারা মরুভূমি এবং তাহার জীবনে কোন প্রভেদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, অনেক অশ্রুবিসর্জ্জনের পর এই সত্য কথাটি সহপাঠিনীদের নিকট স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু পরম দুঃখের কথা এই যে সহপাঠিনীদের দিক হইতে ইহাতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের আভাস পাওয়া যায় নাই। তাহারা কেবল স্মরণ করিতে চাহিয়াছে, ফ্লোরিনের জীবন এইবার লইয়া কয় বার সাহারাতে পরিণত হইল।

লাইট জ্বালাইয়া সে একখানা পত্র লিখিতেছিল। সহসা অরসিক সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ততোধিক রসবিহীন কণ্ঠস্বর কানে আসিল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে লাইট নিবাইয়া শুইয়া পড়িল, এবং অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানাকে কি ভাবে শেষ করা যায় সে-বিষয়ে ভাবিতে লাগিল। বড়ই ইচ্ছা করিতে-ছিল উপসংহারে একটা কবিতা লিখিবে, কিন্তু সেইখানেই যত গণ্ডগোল। কবিতা-টবিতা আবার তাহার মোটেই পড়া নাই, অথচ টমাস প্রতিটি পত্রে কতকগুলি করিয়া কবিতা লেখে। অতএব না লিখিলেও নয়, ভাবিবে, দুইবার ফেল করিয়াছে তাই···নাঃ! লেখা তাহার চাই-ই।

শয্যা ত্যাগ করিয়া ফ্লোরিন উঠিল। টর্চ্চ জ্বালাইয়া সে কবিতার বই খুলিয়া বসিল। হ্যাঁ, কবিতা একটা তাহার চাই! এমন একটা কবিতা চাই যাহাতে চার-পাঁচ লাইনের ভিতর থাকিবে খানিকটা আকাশ—আকাশে যদি চাঁদ এবং তারা পাওয়া যায় তবে ত কথাই নাই—কিছু বসন্ত-বাতাস, কিছু ফুলের নাম এবং পরিশেষে কিছু বিরহের ব্যাকুলতা। কিন্তু এতগুলির সম্মেলন কি বুদ্ধি করিয়া কোন কবি এত অল্প লাইনের ভিতর ঘটাইতে পারিয়াছেন? অথচ ইহার বেশী বড় কবিতা লিখিবার উপায় নাই—টমাস ভাবিবে, বই দেখিয়া লিখিয়াছে।

কিন্তু সেইখানেই যত বিঘ্ন। আকাশ পাইলেও ফুল পাওয়া যায় না, এবং অনেক কষ্টে আকাশ-বাতাস-ফুলকে চার লাইনের ভিতর আটক করিতে পারিলেও বিরহের ব্যাকুলতার আর স্থান হয় না। ভগবান্, আজিকার এই এক রাত্রির জন্য তুমি আমাকে কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা দাও।

টর্চ্চের ব্যাটারি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কবিতার সন্ধান মিলে নাই। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, অর্চ্চনা বেশ ভাল কবিতা লিখিতে পারে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিল; কাল অর্চ্চনাকে যে কোন প্রকারে হাত করিতে হইবে।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ঘড়িটা উচ্চশব্দে জানাইয়া দিল, এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্লান্তদেহে ফ্লোরিন শুইয়া পড়িল। আচ্ছা, সেই লোকটা না এই সময়েই বাঁশী বাজায়? মেয়েরা কাল বলিতেছিল, এগারটার পর আসে; ঘুমাইয়া না পড়িলেই হয়। খুব ভাল লাগে তাহার বাঁশী, টমাস যদি পারিত অমন করিয়া বাজাইতে!

·

তাহার পরের ঘরটিতে একটি মেয়ে মোমবাতি জ্বালাইয়া মাফ্‌লার বুনিতেছে। চোখ দুইটি রহিয়াছে মাফলারের উপর একেবারে স্থির, কিন্তু মনের ভিতর চলচ্চিত্রের ছবির ন্যায় চিন্তার পর চিন্তা উঁকি দিতেছে।

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের উপর রাগ হয় কি সাধে? কেন বাপু? এত কি ডিসিপ্লিন তোমার? কাল ত মোটে শেষ হইল পরীক্ষা, আজ রাত্রিটা কোথায় একটু খুশীমত কাজ করিবে,—নাঃ! ঠিক সাড়ে দশটার সময় লাইট নিবানো চাই। বেশ করিয়াছে সে! তুমি ত নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছ, আর এদিকে যে সে মোমবাতি জ্বালাইয়া কেমন তোমার আদেশ মানিয়া চলিতেছে—সন্ধান পাও তুমি তাহার?

মাফলারটা কিন্তু শেষ করাই চাই। আচ্ছা, বাবা কি অবাক হইয়া যাইবেন! মা ত ভাবিয়াই পাইবেন

না, এত পড়াশুনার ভিতর কি করিয়া সে এত বড় মাফলারটা শেষ করিয়া ফেলিল।

বাহিরে শান্ত নদীর বক্ষে তরঙ্গের সুপ্তি ভাঙাইয়া একটা ষ্টীমার চলিয়া গেল। মেয়েটি এতক্ষণ পরে একবার সেই দিকে চাহিল। বেশী লোক নাই ডেকে। কেবল, একেবারে রেলিঙের ধারে বসিয়া কে এক জন একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে জাহাজটা দূরে চলিয়া গেল, জাহাজের লাল নীল আলোগুলি নদীর জলে পড়িয়া রামধনুর ন্যায় বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে,—দূরের পাহাড়টার অন্তরালে ষ্টীমারের শেষ আলোটা বিলীন হইয়া গেল।

মেয়েটি পুনরায় হাতের মাফলারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। মা-বাবাও ত আসিবেন কাল ঐ রকম ষ্টীমার করিয়া। ষ্টেশনে সে নিশ্চয়ই যাইবে।

ও কি! এগারটা বাজিয়া গেল ইহার মধ্যে! মাফলারটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অবশিষ্টটুকু কাল অনায়াসে শেষ করিয়া ফেলা যাইবে—ঘুমও আসিতেছে চোখে। কিন্তু এত শীঘ্র ঘুমাইলে ত চলিবে না। বড় প্রখর না তোমার দৃষ্টি? বারটা পর্য্যন্ত আজ মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিবে সে। এত কড়া মেজাজ, অন্যায় অত্যাচার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের, সব সহিয়া চলিয়াছে মেয়েরা; হইত ছেলেদের হোষ্টেল, এত দিনে কিছু শিক্ষা দিয়া ছাড়িত।

দ্বারে করাঘাত হইল, মৃদু কিন্তু অধীর। অপরিসীম বিস্ময় এবং ভয়ে মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটির চেতনাশক্তি যেন লোপ পাইল, কিন্তু পরক্ষণেই বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া ফুঁ দিয়া যেই মোমবাতি নিবাইতে যাইবে, অমনি দ্বারের বাহিরে মৃদু করুণ একটি কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"শান্তা, দোরটা খুলে দে ভাই।"

স্বস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস লইয়া শান্তা দ্বার খুলিল, এবং পরমুহূর্ত্তে অঙ্গের চাদর এবং উপাধান সহ একটি মেয়ে একেবারে হুড়মুড় করিয়া শান্তার গায়ে পড়িয়া গেল। ত্রস্তে পতন সংবরণ করিয়া আগন্তুকার পানে চাহিতেই শান্তা দেখিল মেয়েটির ললাটে স্বেদবিন্দু এবং তাহার সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

শান্তা প্রশ্ন করিল,—"ও কি রে! অমন হি হি ক'রে কাঁপছিস কেন? নেয়ে এলি নাকি এত রাতে?"

অতি কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করিয়া শান্তার কানের অতি নিকটে মুখ লইয়া মেয়েটি কহিল, "তোকে আমি সত্যি বলছি শান্তা! আমার ঘরের কাছের সেই গাছটা থেকে একেবারে স্পষ্ট কে যেন আমার নাম ধ'রে ডাকলে, একবার নয় ভাই, তিন-তিন বার।"

শান্তার মুখের ভাবে বুঝা গেল না যে ইহাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইয়াছে। বরং একটু যেন বিরক্ত হইয়াই কহিল, "আচ্ছা, পৃথিবীর যত ভূতপেত্নী কি তোর ঘরের কাছে গিয়ে বাসা বাঁধল রে? আজ তোর নাম ধ'রে ডাকবে, কাল খড়ম পায়ে দিয়ে তোর দোরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, পরশু তোর জানালার পরদা ফাঁক ক'রে তোকে দেখবার জন্যে উঁকি মারবে—নাঃ! তুই একেবারে হোপলেস্।"

কণ্ঠে করুণ মিনতি ভরিয়া মেয়েটি কহিল, "তোরা বিশ্বেস করিস নে ভাই, কিন্তু এতক্ষণ সত্যি আমার যে কি হচ্ছিল সে শুধু আমিই জানি। লেপের তলায় একেবারে ঘেমে উঠেছি, তবু মুখ বার করতে পারি নি। একটা আঙুল বাইরে ছিল, একেবারে ঠাণ্ডা যেন বরফ, তবু যে লেপের ভেতরে ঢোকাব, সে সাহসও আমার হচ্ছিল না ভাই। তা তুই যাই বলিস শান্তা, আজ আমি কিছুতেই ও-ঘরে শুতে পারব না।"

অতঃপর দুই জনে মিলিয়া শয্যা রচনা করিল; শান্তা পুনরায় মাফলারে মনোনিবেশ করিল, এবং অপর মেয়েটি শুইয়া পড়িল।

"শান্তা!"

"কি!"

"সেই বাঁশীটা এই রকম সময়েই ত বাজে, না রে?"

শান্তা মৃদু হাসিল—"ভূতের ভয়েও বাঁশীর কথা ভুলিস নি দেখছি?"

মেয়েটি একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিল—"না! বাঁশী শুনলে আর আমার ভয় করে না, মনে হয় কোন দেবতা স্বর্গ থেকে আমায় অভয়বাণী পাঠাচ্ছেন।

শান্তার পরের কক্ষে যে থাকে, লাইট নিবাইয়া শুইয়া শুইয়া আপন মনে সে হাসিতেছে। মাঝে মাঝে একটু জোরে

শব্দ হইয়া গেলেই সে আঁচল দিয়া মুখ টিপিয়া ধরে। কিন্তু তবু কি যে হইয়াছে, তাহার হাসি আর থামিতে চাহে না।

না বাপু! ছেলেদের কলেজে পড়া আর তাহার চলিবে না। এত হাসাইতে পারে ওরা, অথচ হাসিতে পারিবে না, প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই সেদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল, সকলেই মোটা কোট কিংবা চাদর জড়াইয়া আসিয়াছে। আর এক জন আসিলেন একটি লেপ গায় দিয়া।

প্রফেসর হাঁকিলেন—"গেট আউট।"

ও বলিল,—"বড্ড যে শীত স্যর, লেপ না গায় দিলে চলে না।" আচ্ছা, এই রকম নাকি দেখিয়াছে কেউ কোনও দিন? আবার প্রফেসর যখন প্রশ্ন করিলেন, "কি নাম?" এক গাল হাসিয়া সজারুর কাঁটার ন্যায় অপরূপ কেশসহ মস্তক দুলাইয়া কহিলেন—"গদাধর"।

ইহার পরেও নাকি কেহ না হাসিয়া থাকিতে পারে? চোখের সুমুখে এই চিড়িয়াখানা দেখিয়াও?

মেয়েরা বলে এই রকম হাসা অন্যায়! কিন্তু কি করিবে সে? না, ছেলেদের কলেজে পড়া আর কিছুতেই হইবে না তাহার, মাকে সে লিখিয়া দিবে, কলিকাতার কোন মেয়েদের কলেজে ভর্ত্তি না হইলে তাহার চলিবে না।

একদৃষ্টে প্রফেসারের মুখের পানে চাহিয়া থাকাই কি সোজা কথা? ঘাড় একেবারে ব্যথা হইয়া যায় না!

নীচের কক্ষ হইতে ঘড়িটা বাজিয়া উঠিল এক, দুই, তিন, চার···এগারটা বাজিয়া ঘড়িটা চুপ করিল।

ঠিক এগারটার সময়ই না আসিবে তাহারা? মেয়েদের কথায় যদি আর কোনদিন বিশ্বাস করে সে। তাহাকে জাগিয়া থাকিতে বলিয়া তাহারা বোধ হয় এতক্ষণ আরামে নিদ্রা যাইতেছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া মেয়েটি উঠিল। তাহার পর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া অপর মেয়েদের কক্ষের প্রতি চাহিল। সমস্ত হোষ্টেলটা সম্পূর্ণ নীরব, বাইরে একটা বাতাস জোরে বহিয়া যাওয়াতে বৃক্ষের কতকগুলি শুষ্ক পত্র ঝরিয়া পড়িল—তাহার পর পুনরায় নিবিড় নীরবতা।

মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল—একটি মেয়ে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল, এবং তাহার অল্পক্ষণ পরেই আরও চার-পাঁচটা কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া চার-পাঁচটি মেয়ে এই মেয়েটির শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। কাহারও পাদুকার মৃদু শব্দ হইতেই, অপরে অধরে আঙুল চাপিয়া সতর্ক করিল। একটি মেয়ের অসম্ভব হাসি পাইতেছে, মুখের ভিতর অঞ্চল চাপা দিয়া অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিতে করিতে টলিয়া টলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার পর একসঙ্গে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন এবং উত্তরের আদান-প্রদান চলিল।

"এগারটা বেজে গেল না? হ্যাঁ, আর আধ-ঘণ্টাখানেক পরেই আসবে দেখিস্।"

"আমার কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে ভাই, যদি কোন রকমে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানতে পারেন।"

"তোর যেন সব তাতেই ভয়, কেন, কি এমন খারাপ কাজ করছি আমরা?"

"সত্যিই ত একটা শুধু সন্দেহভঞ্জন, বারাণ্ডায় দাঁড়ালেই ত দেখা যাবে, কতক ক্ষণেরই বা ব্যাপার!"

"আচ্ছা, চিত্রা-দিকে ডাকলে হ'ত না? যা বুদ্ধি ওর, যদিই বা কোন কিছু হয়, ও ঠিক আমাদের সব্বাইকে বাঁচিয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ রাখো তোমার চিত্রা-দি। যা কুম্ভকর্ণ, ন'টা বাজতে-না-বাজতেই ত দিয়েছেন ঘুম, বাড়ীতে আগুন লাগলেও ওকে ওঠানো যাবে না।"

"আর কি নীরস ভাই, সেদিন বল্‌ছিলুম, এত চমৎকার বাঁশী, একদিন একটু জেগে শোন, একেবারে চারমুণ্ড্ হয়ে যাবে। তা বল্‌লে, হ্যাঃ! রাত জেগে রইব আমি বাঁশী শোনবার জন্যে—পাগল নাকি তোরা?"

"আমার কিন্তু না দেখলেই চলবে না, এমন চমৎকার বাঁশী আমি জীবনে শুনি নি কোন দিন, শুনবও না হয়ত। সত্যি ভারি রহস্যময় মনে হয় ওকে।"

"কিন্তু যদি সেই খারাপ লোকটাই হয়?"

"কি যে বলিস রেবা! ও হ'লে এত রাত ক'রে আসত এদিকে, আমাদের চোখের আড়াল হয়ে? আমরা জেগে

থাকতে-থাকতেই পঞ্চাশ বার চোখের সুমুখে ঘুরে বেড়াত, পাছে আমরা ওকে দেখতে না পাই।"

"কিন্তু জান, কাল সন্ধ্যেবেলা যখন আমরা সবাই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তোমরা ত সেই উঁচু টিপিটার উপর ব'সে রইলে, আমি পা ধোবার জন্যে একেবারে জলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি সেই রকম বাঁশীর সুর, অনেক দূরে সেই যে ছোট একটা দ্বীপের মত জায়গা সেইখানে ব'সে কে বাজাচ্ছে। কত চেষ্টা করলুম দেখতে—শুধু গায়ের নীল জামাটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। তার পর যখন হোষ্টেলে ফিরে আসছি, দেখি হন্ হন্ ক'রে সাইকেলে চেপে সেই খারাপ লোকটা চলেছে, গায়ে একটা নীল জামা! এত মন খারাপ হয়ে গেল আমার!"

"কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি ও নয়। সেদিন আমার সেই দাদার বাড়ীতে গিয়েছিলুম না? দুপুরে ঘুমিয়ে আছি, এক সময় ঘুম ভেঙে গেল, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, হঠাৎ শুনি সেই অদ্ভুত সুরটা বাজছে—ঠিক সেই সুরটা, তেমনি এক-একবার কানে কানে কথা বলার মত ধীরে, আবার সেই রকম গভীর উত্তেজনায় কেঁপে-ওঠা কণ্ঠস্বরের মত জোরে; মনে হ'ল, একটু দূরের একটা বাড়ীতে কে বাজাচ্ছে। আমার দাদা বাড়ী ছিলেন না, সন্ধ্যেবেলা ফিরতে জিজ্ঞেস করলুম, ও-বাড়ীতে কেউ বাজায় নাকি। তা, দাদা বললেন, ও-বাড়ীতে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক পেন্সন্ নিয়ে এসেছেন, কারো সঙ্গে মেশেন না, হয়ত জানেন বাজাতে, ওঁরা কিন্তু কোনদিন শোনেন নি।"

নীচের ঘড়িটাতে ঢং করিয়া একটা শব্দ হইল।

"সাড়ে এগারটা বেজে গেল না? সত্যি চিত্রা-দিকে ডাকলেই ভাল হ'ত; কি স্তব্ধ রাত্রি দেখছিস ত, মনে হয় কানে কানে কথা বললেও যেন দূর থেকে শুনে ফেলবে, তোরা নয় থাক্, আমিই ওকে ডেকে আনি, কেমন?" বলিয়া কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রশ্নকারিণী ধীর মৃদুপদে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আর একবার বৃক্ষের পত্রে পত্রে কম্পন জাগাইয়া একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল। একটা নিশাচর পক্ষী অদ্ভুত শব্দে এই শব্দহীন রাত্রির দুয়ারে আঘাত করিয়া দূরে উড়িয়া গেল।

সকলেই যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে প্রতি ক্ষণে, বহু দূর হইতে বুঝি কে আসিতেছে।

সহসা দূরে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত বংশীবাদকের বাঁশীতে পরিচিত সুরটি বাজিয়া উঠিল, অতি করুণ উদাস।

সমগ্র বিশ্বের বিরহী আত্মার যুগযুগান্তরের বিরহবেদনা বুঝি আজিকার নীরব রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাহসিত তটিনীর তরঙ্গায়িত বক্ষের উপর দিয়া বিস্তীর্ণ বালুচরের উদাস প্রশান্তি পার হইয়া, দিগন্তের শ্যাম বনানীর গভীরতা অতিক্রম করিয়া, সুদূর নক্ষত্রালোকে যেন কে অভিসারে চলিয়াছে।

শুনিয়া শুনিয়াও আর তৃপ্তি হয় না। চোখের জলের ন্যায় করুণ, কিন্তু তেমনই সুন্দর। প্রত্যেকেরই মনে হয়, এত দিনের জীবনের নানা কর্ম্ম এবং ব্যস্ততার ভিতরে কি যেন সে চাহিয়া আসিয়াছে, এবং কি যেন পায় নাই। সকল আনন্দ-কোলাহলের ভিতরে তাহারই অজ্ঞাতে যে অকৃতার্থ কামনার বেদনা অব্যক্ত রহিয়াছিল, আজ এই নিভৃত নিশীথে বাঁশীর সুর সেই বেদনারই প্রকাশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

পাহাড়ী মেয়েটির অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। জানালার গরাদে মাথাটি রাখিয়া সে নদীর পানে চাহিয়া রহিয়াছে। বড় ভাল লাগিতেছে তাহার—বড় সুন্দর সুর। ভাইটির কথা পুনঃপুনঃ মনে পড়িয়া যাইতেছে, চিমনির আলোতে বসিয়া সে বাজাইতেছে। প্রবাসী বোনটির কথা কি মনে পড়ে না তাহার? বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে প্রশংসাবাক্য শুনিবার আশায় ভুল করিয়া একবারও কি সে পিছন পানে চাহিয়া ফেলে না?

ফ্লোরিনের কবিতা স্মরণে আনিবার ব্যর্থ প্রয়াস থামিয়া গিয়াছে। নাঃ! পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া বাঁশী শিখিলেই ভাল করিত সে। লজিকের সিলজিসম্ অপেক্ষা অনেক সহজ হইত নিশ্চয়ই।

মাফলার বোনা সমাপ্ত করিয়া শান্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বারের পর্দ্দাটা ভাল করিয়া সরাইয়া দিয়াছে, দূরে বংশী-

বাদকের অস্পষ্ট বসিবার ভঙ্গীটি চোখে পড়ে—জলের একান্ত নিকটে বসিয়া কে ঐ যাদুকর মূক রাত্রির মুখে বাণী ফুটাইল? শয্যায় শুইয়া বাঁশী শুনিতে শুনিতে আজ ঘুমাইয়া পড়িবে। প্রতিটি রাত্রি যে দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় নামিয়া আসিতেছে, সে ত তোমারই জন্য!

আজিকার রাত্রিতে কাহারও চোখেই বুঝি ঘুম নাই, কেবল আপন কক্ষে চিত্রা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল ললাটে একটি হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে সে ডাকিল—"চিত্রা-দি!"

চকিতে চিত্রা উঠিয়া বসিল, কেশপ্রসাধন হয় নাই আজ। এলোখোপা খুলিয়া দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি পিঠ ঢাকিয়া শুভ্র শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। জানালার ভিতর দিয়া মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক একটা বৃক্ষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ড খণ্ড হইয়া আসিয়া পড়িল তাহার ললাটের কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে, দীর্ঘ ঘন আঁখিপল্লবে, নিদ্রালস দুটি চোখের তারায়।

চিত্রা প্রশ্ন করিল, "এত রাতে হঠাৎ কি মনে ক'রে?" কিন্তু তাহার মুখের ভাবে মনে হইল না যে সে বিশেষ চমকিত হইয়াছে।

অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া মেয়েটি তাহার আসিবার কারণ জানাইল। ঈষৎ হাসিয়া চিত্রা কহিল, "তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম বুঝি ডাকাত-টাকাতই পড়ল তোমাদের ঘরে।"

মেয়েটিও মৃদু হাসিল, এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিত্রার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখখানা লইয়া কহিল, "আহা! কি আমার হিতার্থিনী গো! ডাকাত যদিই বা আসে, তবে তোমায়ই প্রথম ডাকাতি ক'রে নিয়ে যাবে, তা জান?"

কপট ভয়ের ভঙ্গী করিয়া চিত্রা কহিল, "তাই নাকি? ভাগ্যিস আসে নি"—বলিয়া সে এলোচুলগুলি হাতে জড়াইয়া মোটা চাদরটা বেশ করিয়া টানিয়া লইয়া শুইবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি কহিল, "ও কি! চিত্রাদি, শুচ্ছ যে বড়? লক্ষ্মীটি চল না ভাই, কত দিন থেকে ভাবছি দেখব, একবার দেখে একটু সন্দেহ মেটানো বইত কিছু নয়।"

চিত্রা উঠিয়া বসিল, এবং গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু এর পরিণাম কি হবে জান? মেয়েদের হোষ্টেলের কাছে এসে যে বাঁশী বাজায়, সে আর যাই হোক ভাল লোক নয়। একটা খেয়ালের বশে তোমরা বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াবে, যাবার পথে উপর দিকে চাইলেই ও তোমাদের দেখতে পাবে, হয়ত একটা কিছু মধুর সম্ভাষণ ক'রে বসবে। নীচে থেকে মেমসাহেব দৌড়ে আসবেন। তার পর? রাত দুপুরে বিছানা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছ তোমরা, আর তোমাদের ঠিক নীচে পথের উপর দাঁড়িয়ে..., বুড়ো মেম যে এই বিংশ শতাব্দীর জুলিয়েটদের কি রকম সম্বর্দ্ধনা করবেন, তা ত বলে দিতে..."

বাধা দিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে মেয়েটি কহিল, "না চিত্রাদি, তোমার যাবার মতলব নেই ব'লেই তুমি যত মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ। কিন্তু আমি তোমায় ঠিক বললাম, রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে আপনাকে লুকিয়ে যে এমন ক'রে বাঁশী বাজায়—খারাপ লোক সে নয়, অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই তার ভিতর কিছু আছে। এত আশ্চর্য্য ক্ষমতা ওর, অথচ কাউকে জানতে দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। তাই দেখতে ইচ্ছে করে, ভগবান ওকে কেমন ক'রে গড়েছেন।"

চিত্রা ম্লান হাসি হাসিল। কহিল, "মনে ত কতই হ'তে পারে। কিন্তু জগৎটা ত স্বপ্ন দিয়ে তৈরি নয় সুলেখা; এর বাস্তবের সুর এমন কঠিন, এমন তীব্র, যে এক মুহূর্ত্তে সকল রহস্যের জাল ছিঁড়ে যায়। এই ধর, আমারও ত মনে হ'তে পারে সাধারণ মানুষ সে নয়, গভীর রাত্রির নীরবতারই যেন সে প্রাণ! শুব্ধ বিরাট আকাশের মত প্রশান্ত তার রূপ, যে ক্ষীণ চন্দ্রালোক নদীর বুকে পড়ে জলছে—এ যেন তারই অঙ্গ। দিনের কোলাহলে যে-কথা শোনা যায় না, প্রকৃতির সেই কথাটাই তার বাঁশীর সুর। কিন্তু এ-সব ত কিছুই সত্যি নয়। রাত্রির এ অন্ধকারের যবনিকা তুলে ধর, দেখবে কোন মাধুর্য্য নেই; চোখ দুটো তার জলছে নিষ্ঠুর জয়ের উল্লাসে; মুখে তার তীক্ষ্ণ অবহেলার হাসি; সর্ব্বাঙ্গে তার উদ্ধত অহঙ্কার। হাজার হাজার মানুষ তাকে পাবার জন্যে কাঁদছে, কিন্তু পাষাণের মত অবিচলিত সে—জয়ের গৌরবে হাসছে।" চিত্রা থামিল, ক্ষীণালোকে সুলেখার মুখে বিস্ময়ের আভাস পাইয়া সে নিজের উত্তেজনায় অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

এ কি করিতেছিল সে! মুহূর্তের উত্তেজনায় এত কথা কহিয়া ফেলিল সে কি করিয়া? জীবনের যে-অংশটা মৃত্যুর ন্যায় গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, আজ এত কাল পরে তাহারই উপর আলোকপাত করিতে গেল সে কোন্ বুদ্ধিতে?

পরিহাসের বাতাসে স্থলেখার অন্তর হইতে সন্দেহের মেঘকে উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হাসিয়া চিত্রা কহিল, "বাজে ব'কে অনেক দেরি করিয়ে দিলুম। ওদিকে যে 'রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে'।"

স্থলেখা কিন্তু হাসিল না। চিত্রার কম্পিত কণ্ঠস্বর যে কল্পিত চিত্রখানি তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল তাহা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না, তাহারি কেমন ভয় করিতে লাগিল। একটা কথাও না কহিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নদীর জলের একান্ত নিকটে বংশীবাদকের হাতে বাঁশী বাজিয়া চলিয়াছে। শুক্লাচতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো নদীর বুকে পড়িয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। যত দূর দৃষ্টি যায় নীরব প্রকৃতি মূর্চ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে—কাহার অভিসার ব্যর্থ হইল আজ?

সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় ধীরে ধীরে ঘুম নামিয়া আসিয়াছে সকলের চোখের পাতায়, বাহিরে জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ ঘুম।

ভ'ইটির কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন চোখের পাতা নামিয়া আসিয়াছে, পাহাড়ী মেয়েটি নিজেই সে-কথা জানে না।

টমাসের পত্রখানা মনে মনে আর শেষ করিতে পারে নাই ফ্লোরিন।

শান্তার অধর-কোণে একটা তৃপ্তির হাসি, মাফলার-বোনা শেষ হইয়া গিয়াছে।

অপর কক্ষে পাঁচ-ছয় জন মেয়ে খাটের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি করিয়া চেয়ার জোড়া দিয়া শয্যা বাড়াইয়া পরস্পরের অতি নিকটে সরিয়া আসিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। নীচের ঘড়িতে যে বারটা বাজিয়া গিয়াছে অনেক ক্ষণ, আর কিছু পরেই তাহাদের অতি নিকটের রাজপথ দিয়া সেই বংশীবাদক চলিয়া যাইবে, পথের আলোটা পড়িবে তাহার অঙ্গে, বারাণ্ডায় একবার আসিলেই সকল সন্দেহ এবং কৌতূহলের অবসান হইতে পারে—সে-কথা ভাবিবার আর সময় নাই। সমস্ত হোটেলটা বুঝি সুপ্তির পথ বাহিয়া স্বপ্নপুরীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কেবল অন্ধকারের বুক চিরিয়া মৃদু জ্যোৎস্নালোকে মূর্ত্তিমতী স্বপ্নের ন্যায় একটি তন্বী দেহ নিদ্রাহীন চোখে রাজপথের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

এত দিন পরে কেন তুমি আসিলে অনাহূত পথিক? চিত্রা তোমাকে চাহে নাই, কোন দুঃখ নাই তাহার, কোন হারানোর বেদনা তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনের কোন মুহূর্ত্তকে বিষাক্ত করিয়া দেয় নাই। তবে কেন এ অযাচিত আগমন?

চিত্রা ভোলে নাই। অনাহারক্লিষ্টা, দুঃখজর্জ্জরিতা মুমূর্ষু মাতার মুখখানি চিত্রা এখনও দেখিতে পাইতেছে, অপমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব পিতার কঠিন গর্ব্বিত দৃষ্টি এখনও চিত্রার মুখের পানে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সে-অপমান ভুলিবার নয়। পিতার নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ পুত্রবধূকে যে ত্যাগ করিতে পারে, বিবাহের পণস্বরূপ তাহার দরিদ্র পিতার সমস্ত বুকের রক্ত শুষিয়া লইয়াও যাহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না—তাহার পুত্রকে সে ক্ষমা করিতে পারিবে না। দুঃখ? কিসের দুঃখ তাহার? কাপুরুষের ন্যায় নিজের স্ত্রীকে পিতার হস্তে অপমানিত হইতে দেখিয়াও যে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে পারে, চিত্রা তাহাকে ক্ষমা করিবে না। চিত্রার চোখের জলেও এক দিন তাহার পাষাণ-হৃদয় বিচলিত হয় নাই—কাহাকে সে ক্ষমা করিবে? কোন দুঃখ নাই তাহার জীবনে। গর্ব্ব করিয়া সেদিন তুমি চাও নাই চিত্রার পানে—আজ চিত্রার গর্ব্ব করিবার দিন। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় সমস্ত অতীতকে সে শান্ত তৃপ্ত মনে বিদায় দিয়াছে। তবে এই সুদীর্ঘ দিবস পরে কেন এ ব্যর্থ আহ্বান?

আজ মনে পড়ে, কত দিন পূর্ব্বে, কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গিয়াছে চিত্রার—ঐ বাঁশী শুনিয়া। এক জন বাঁশী শুনাইয়া তৃপ্ত, আর এক জন শুনিয়া কৃতার্থ। সে-

সুরে তখন ছিল অপূর্ব্ব উন্মাদনা, প্রথম প্রিয়স্পর্শের ন্যায় অননুভূতপূর্ব্ব পুলক।

কে ভাবিয়াছিল তখন যে সকলই স্বপ্ন? বাস্তবের আঘাতে একদিন চিত্রার চোখে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

বাঁশী থামিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ চন্দ্রালোকে যাহার বসিবার ভঙ্গীটি কেবল অস্পষ্ট চোখে পড়িতেছিল, এখন রাজপথের আলোকে তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। চিত্রা চমকাইয়া উঠিল। এত কৃশ ত সে ছিল না? মাথার দীর্ঘ চুলগুলা এলোমেলো ভাবে বাতাসে উড়িতেছে, দীর্ঘ নাকটাই কেবল চোখে পড়ে সমস্ত মুখে। তবে যে চিত্রা শুনিয়াছিল এখনও সে ··কিন্তু কেন? ইচ্ছা করিলেই ত সুখী হইতে পারিতে। কবে কোন্ অবহেলিতা চিত্রা দুইটা চোখে করুণ মিনতি ভরিয়া তোমার পানে চাহিয়াছে—সে প্রশ্ন ত সমাজ কোনদিনই করিবে না। বাঙালীর গৃহে অন্নের অভাব হইতে পারে, হইতে পারে বস্ত্রের, কিন্তু দুর্ভাগা অরক্ষণীয়া কন্যার অভাব হয় না। তবে আবার সাধ করিয়া এ-বেশ কেন?

বেশ আছে চিত্রা। মন দিয়া পড়াশুনা করে; হাসিয়া গান গাহিয়া, অপূর্ব্ব দিনগুলি তাহার কাটিতেছে—বন্ধন-বিহীন মুক্ত জীবন।

কিন্তু বড় দুর্ব্বল দেখাইতেছে তাহাকে। হয়ত কোন অসুখ করিয়াছিল! এমন গৃহহীন, ভাগ্যহীনের ন্যায় দেখাইল কেন তাহাকে?

কিন্তু এ কি করিতেছে চিত্রা। সমস্ত সম্বন্ধ যাহার সহিত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—তাহারই কথা ভাবিয়া মরিতেছে সে, এত রাত্রে; সুখনিদ্রা ত্যাগ করিয়া! কি বুদ্ধিহীনা সে। চিত্রার হাসি পাইতেছে। হাঁা, হাসিবারই কথা বটে।

কিন্তু তবু কেন চিত্রা হাসিতে পারে না? সমস্ত জীবনটার উপর একটা তীব্র বিদ্রূপ হানিয়া কেন সে একবার প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না?

বংশীবাদক চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখের রাজপথের সীমান্তে কখন্ তাহার ছায়া বিলীন হইয়া গিয়াছে—চিত্রা তাহা জানিতেও পারে নাই।

কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে একটি ষ্টীমার চলিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি তটভূমিতে আঘাত করিয়া ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। এক খণ্ড শুভ্র মেঘ ধীরে ধীরে একবার চাঁদটাকে লুকাইয়া ফেলিতেছে—পুনরায় আপনাকে বিভক্ত করিয়া তাহার বাহির হইবার পথ করিয়া দিতেছে।

সেই দিকে চাহিয়া চিত্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—কি ভাবিতেছে তা সেই জানে।

কৃষ্ণ-গোলাপ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

কালো রং, ক্ষীণদেহ, রূপহীনা বলিতেও পার,
অন্তর্গূঢ় বেদনার ম্লানছায়া কোমল অধরে,
নয়নে শীতাংশু দীপ্তি, যৌবনের হিয়া মুগ্ধ করে
কুৎসিতা শ্রীহীনা ব'লে হয়ত বা চোখে লাগে কারো!
প্রেমের মাধুর্য্য রূপ মর্ম্মে জেগে তবু আছে তারো
সে রূপের আত্মহত্যা প্রতিদিন চলে মর্ত্ত্য'পরে
রূপস্রষ্টা দিয়েছে কি যত ব্যঙ্গ শুধু তার তরে?
জীবনের ভালবাসা জানে মুগ্ধ হৃদয় তাহারও।

জানে সবি জানে, শুধু সৃষ্টিরাতে অবশ-তুলিকা
শ্রমক্লান্ত মহাশিল্পী পারে নাই বর্ণবিশ্লেষণে
তাই সে হয় নি দৃপ্ত গরবিণী রক্ত শিমুলিকা
কৃষ্ণ-গোলাপের মত ফুটিয়াছে স্রষ্টার কাননে
গন্ধ আছে বর্ণ নাই সেই ক্ষুদ্র কলঙ্কের টীকা
গৌরবের দীপ্তি ম্লান করিয়াছে বিষণ্ণ আননে!

করম-নৃত্য

রাঁচির কথা

শ্রীনীরদকুমার রায়

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে অনেকে রাঁচিতে সমাগত হইবেন। তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে রাঁচির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য মালভূমির উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২২০০ ফুট উচ্চে রাঁচি শহর অবস্থিত।

অধুনা বহু স্বাস্থ্যান্বেষী ও প্রমোদ-ভ্রমণেচ্ছু নরনারী এবং অনেক বিশিষ্ট কৃতী ব্যক্তি প্রতি বৎসর রাঁচি আসিয়া অল্পবিস্তর কিছুদিন বাস করিয়া যান। পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ বসু ও রাখালদাস হালদার—ইঁহারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় সর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার জামাতা ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, সর আলী ইমাম, পাইকপাড়ার রাজা প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং বাংলার অনেক জমিদার ও অবসর-প্রাপ্ত উচ্চ কর্ম্মচারিগণ (রায় বাহাদুর ভূপালচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য) এখানে নিজ নিজ শৈলাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিহার গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাসও এইখানে। বিহার সেক্রেটারিয়েটের ক্যাম্প আপিস এখানে বৎসরে প্রায় সাত মাস থাকে, এবং বিহার একাউন্টেণ্ট-জেনারেলের বিশাল আপিস ও কয়েকটি ছোট ছোট প্রাদেশিক আপিস এইখানে অবস্থিত। এই সকল কারণে রাঁচি শহরের গুরুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে।

১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচি নগরের সূত্রপাত হয়—যখন ইংরেজদের অধীনে এই অঞ্চলটি দক্ষিণ-পশ্চিম এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্যাপ্‌টেন উইলকিন্‌সন্‌ কিষণপুর গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ও কার্য্যালয় (এখন যেখানে সদর থানা) নির্দ্দিষ্ট করেন। ঐ নামের অন্যান্য স্থানের সহিত ভ্রমের সম্ভাবনা থাকাতে কয়েক বৎসর পরে পাহাড়ীতলার নিকটস্থ একটি গ্রামের নামে এই কর্ম্মস্থানের রাঁচি নাম দেওয়া হয়। এই গ্রামটিকে এখনও পুরাণী রাঁচি বলা হয়।

রাঁচি লেক বা বড়্‌কা তলাও প্রায় ১৬৫ বিঘা জমি জুড়িয়া আছে। লেফ্‌টেনাণ্ট আউস্‌লী ইহা খনন করান।

জর্ম্মান:মিশনের গীর্জ্জা। উপরের দিকে সিপাহী যুদ্ধের সময়ের একটি গোলার চিহ্ন দেখা যাইতেছে

রাঁচি পাহাড়টি সুন্দর মন্দিরাকৃতি, প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। লেফ্‌টেনাণ্ট আউস্‌লী ইহার শীর্ষে একটি ক্ষুদ্র হাওয়াখানা নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার উপরে ক্রুশ সংলগ্ন করিয়া দেন। এই ক্রুশ থাকা সত্ত্বেও এখন এই ঘরটি এই দেশীয় লোকদের 'দেও-অস্থান' রূপে বলি ও পূজার মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। রাঁচি লেকের পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে দেখিলে লেক ও তাহার অপর পার্শ্বে রাঁচি পাহাড়ের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়।

চুটিয়ার মন্দির এখানকার অন্যতম প্রাচীন অট্টালিকা। ছোটনাগপুরের রাজা রঘুনাথের বাঙালী গুরু ব্রহ্মচারী হরিনাথ ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করান। জগন্নাথপুরে জগন্নাথদেবের মন্দিরও ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই অর্থে নির্ম্মিত হয়; ইহা শহর হইতে ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি শৈলের উপর অবস্থিত।

রাঁচিতে তিনটি বড় বড় খ্রীষ্টিয়ান মিশনের বাস। ইহাদের মধ্যে লুথারীয় (জর্ম্মান) মিশন প্রথমে (১৮৪৫ খ্রীঃ) রাঁচি আসিয়া নিজেদের চেষ্টায় গীর্জ্জাটি নির্ম্মাণ করেন। ইহার গায়ে সিপাহী-বিদ্রোহের লড়াইয়ের চিহ্ন এখনও আছে। য়্যাংলিকান ও রোমান ক্যাথলিক মিশন দুইটি পরে আসে। এই তিন মিশনের চেষ্টার ফলে ছোটনাগপুরের মধ্যে এ-পর্য্যন্ত প্রায় চার লক্ষ ওরাওঁ মুণ্ডা ও খাড়িয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে। প্রত্যেক মিশনের স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে।

রাঁচি শহর হইতে চারি মাইল উত্তরে কাঁকে নামক স্থানে অবস্থিত বিশাল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসালয় এবং সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান, তিন-চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে নামকুমের পশুবীজ-সংরক্ষণাগার ও লাক্ষা-বিষয়ক গবেষণা-মন্দির দর্শনযোগ্য। শহর হইতে ১৭ মাইল পশ্চিমে ইট্‌কী গ্রামের নিকট যক্ষ্মারোগীদের একটি স্বাস্থ্যনিবাস আছে।

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় শহরের এক প্রান্তে রেলষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-

বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী-আচারের একটি দৃশ্য

একটি পার্ব্বত্য নদী

মাছ ধরিতেছে

ওরাওঁদিগের নৃত্যের একটি দৃশ্য

ওরাওঁদিগের সমর-নৃত্য

... ঝরণা হইতে জল সংগ্রহ করিতেছে ...

ও চিত্রশিল্পানুরাগের স্মৃতিমন্দিরস্বরূপ বাঙালীর তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

রেল বা মোটর যানে এখন যে-কোন দিক হইতে রাঁচি গমনাগমন সহজসাধ্য হইয়াছে।

রাঁচি শহরের মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বস্তু বা দৃশ্য অধিক না থাকিলেও এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আগন্তুকের মনোমুগ্ধকর।

চুটুপালু ঘাট রাঁচি হইতে হাজারিবাগের রাস্তায় ২০ মাইল দূরে পর্ব্বতের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্থানটি হইতে নিম্নে হাজারিবাগের উপত্যকা ছবির মত দেখায় ও দূরে পরেশনাথ পর্ব্বতের গম্ভীর দৃশ্য দেখা যায়। এখান হইতে রাস্তাটি তিন মাইলের মধ্যে ৭০০ ফুট নামিয়া গিয়াছে।

রাঁচি-চক্রধরপুর রাস্তাটিও সিংহভূম জেলার মধ্যে বান্দগাঁও হইতে টেবোর অপর পার পর্য্যন্ত চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়া সর্পিল গতিতে নামিয়া গিয়াছে।

সিম্‌ডেগা রাঁচি জেলার পশ্চিম প্রান্তে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬০০ ফুট উচ্চ একটি বিস্তৃত মালভূমির উপরে সুরম্য দৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত। রাঁচি হইতে গুম্‌লা, পালকোট ও কোলেবীরা হইয়া সিম্‌ডেগা যাওয়া যায়। গুম্‌লা হইতে

প্রতিষ্ঠান। ইহা বাঙালীর গৌরব, দানবীর, শিক্ষাভিভাবক স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পুণ্য কীর্ত্তি, এবং কয়েক জন আশ্রমশিক্ষা-প্রবর্ত্তনপ্রয়াসী ত্যাগী মনস্বীর দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের ফল। ধর্ম্মে কর্ম্মে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, আচার-ব্যবহারে ছেলেরা যাহাতে দৃঢ়চরিত্র মানুষ হইয়া উঠে—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই বিদ্যালয়ের বাটী ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যান মহারাজারই দান। মহারাজার দেহান্তের পর হইতে উপযুক্ত আনুকূল্যের অভাবে ইহার পূর্ব্বের সমৃদ্ধ ও সতেজ অবস্থা এখন আর নাই। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মোরাবাদী পাহাড়ের গায়ে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাসগৃহ এবং পাহাড়ের শীর্ষদেশে তাঁহার নির্ম্মিত উপাসনা-মন্দির লোকান্তরিত গৃহস্বামীর সদাশয়তা, ঔদার্য্য, সদালাপিত্ব, উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সৌজন্য এবং সঙ্গীত

একটি প্রাচীন মন্দির

পালকোটের দৃশ্য বেশ চিত্তাকর্ষক এবং পালকোট হইতে কোলেবীরা যাইতে নূতন পার্ব্বত্য পথটি নিরতিশয় মনোমুগ্ধকর ঝরণাবহুল জঙ্গলের দৃশ্যের মধ্য দিয়া বিসর্পিত হইয়া গিয়াছে।

হুন্‌ড্রু ঘাঘ্‌ সুবর্ণরেখা নদীর বিখ্যাত জলপ্রপাত—রাঁচি হইতে প্রায় ২৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, রাঁচি ও হাজারিবাগের সীমানায়। পুরুলিয়া রাস্তা দিয়া গিয়া আন্‌গড়া হইতে কাঁচা রাস্তায় ১২ মাইলের পর একটি নদী পার হইয়া মাইল-খানেক হাঁটিয়া যাইতে হয়। ১৯২১-২২ সাল পর্য্যন্ত ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় ছিল। কর্ণেল ডাল্টন ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অধুনা প্রপাতের উপর কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাঁই পড়িয়া যাওয়াতে প্রপাতটি অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে। ইহা ৩২০ ফুট উচ্চ পাহাড় হইতে ভীষণ গর্জ্জনে নীচে পতিত হইয়া সমতল উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রপাতের উপর হইতে নীচে সুবর্ণরেখার বঙ্কিম গতি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

গৌতমধারা (জোন্‌হা-প্রপাত) রাঁচি হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে—পুরুলিয়া-রাস্তা ছাড়িয়া জোন্‌হা ষ্টেশন পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রপাতটি ১২০ ফুট উচ্চ। নদীটি নীচে পড়িয়া দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থ খাতের গম্ভীর মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

ডুমারগড়ী প্রপাত—উপরিউক্ত নদীটি আরও পাঁচ মাইল গিয়া পাহাড়ের উপর হইতে ১৫০ ফুট নীচে পাথরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটু মোড় ফিরিয়া আরও ৫০ ফুট নীচে গভীর জঙ্গলময় প্রদেশে পড়িতেছে। এই প্রপাতের কাছাকাছি ৪০০ ফুট খুব খাড়া উৎরাই অতিক্রম করিতে হয়।

দাস্‌সম্‌ ঘাঘ্‌—কাঁচি নদীর প্রপাত—রাঁচি হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে বুণ্ডুর রাস্তা দিয়া ১৮ মাইলের পর কাঁচা রাস্তায় ৬ মাইল গিয়া কাজুরী গ্রাম বা কুজ্‌রামে যাইতে হয়। সেখান হইতে হাঁটিয়া কাঁচি নদী পার হইয়া দুই মাইল গেলে প্রপাতের পার্শ্বে উপস্থিত হওয়া যায়। পাহাড়ের নীচে নামিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলে, পর্ব্বত অরণ্য ও নদীর সমবায়ে এক মহান্‌ দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এইরূপ দৃশ্যের মধ্যে নদীটি দুইবার পাহাড় হইতে পড়িতেছে। প্রথম প্রপাতটি ১০০ ফুট নীচে পড়িতেছে এবং উচ্ছ্বসিত জলরাশি দ্বিতীয় বার পাহাড়ের গা বাহিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে ৫০।৬০ ফুট নীচে। দাস্‌সম্‌ অর্থে ঘোড়া। নদীর প্রথম প্রপাত হইতে দ্বিতীয় প্রপাত পর্য্যন্ত শৈলপৃষ্ঠের সহিত অশ্বপৃষ্ঠের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াই বোধ হয় প্রত্যেকটির এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

একটি ওরাওঁ রমণী

সদ্‌নী ঘাঘ্‌ রাঁচি জেলার পশ্চিম প্রান্তে শঙ্খ নদী রাজাডেরার পার্ব্বত্য মালভূমি হইতে বরওয়ের সমতল ভূমিতে পতিত হইতেছে। এই প্রপাতের দৃশ্যও অতি সুন্দর।

ইহা ছাড়া কারো নদীর সিংহভূমে প্রবেশমুখে পেরুয়াঁ ঘাঘ্‌ এবং কোলেবীরা অঞ্চলের পেরুয়াঁ ঘাঘ্‌ও দর্শনযোগ্য। এই প্রপাতগুলির আশেপাশে বহু পারাবতের বাস থাকাতে ইহারা ঐ নাম পাইয়াছে (পেরুয়াঁ= পায়রা; ঘাঘ্‌=প্রপাত)।

রাজরোপ্পার প্রপাতসঙ্গম ও ছিন্নমস্তার মন্দির রাঁচি জেলার সীমানার নিকটে হাজারিবাগ জেলার মধ্যে। রাঁচি হইতে রামগড়, এবং রামগড় হইতে পূর্ব্বমুখে গোলা হইয়া

বীরশাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে

যাইতে হয়। রাঁচি হইতে ৫২ মাইল রাস্তা। নির্জ্জন অরণ্যাবৃত পর্ব্বতময় প্রদেশে ছিন্নমস্তা দেবীর এক পুরাতন মন্দিরের পদধৌত করিয়া ভেড়া নদী ৩০ ফুট নীচে দামোদর নদের গিরিখাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। দামোদর এখানে নিজ স্রোতোবেগে পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া এক সংকীর্ণ গভীর খাতের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গিরি ও বনানীর মহান্ গম্ভীর মূর্ত্তির বক্ষে দামোদর নদ ও ভেড়া নদীর এই যে উদ্দাম মিলনাবেগে, ইহা এক অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভাবিন্যাস; দর্শকের মনে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দাবেশের সঞ্চার করে।

রাঁচির আদিম অধিবাসীদের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন এই জেলার তামাড় অঞ্চলে সোপাহাতু থানার এলাকায় অবস্থিত চোকাহাতু গ্রামে মুণ্ডাদের বিশাল সমাধিক্ষেত্র। ইহা ২৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া আছে, এবং ইহাতে ৭০০০ সমাধিপ্রস্তর আছে।

পুরাতন ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে রাঁচি জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দোইসানগরের (অধুনা 'নগর' নামে পরিচিত) নওরতন-রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষই প্রধান। ইহা গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত পঞ্চতল-গৃহ ছিল; ইহার প্রত্যেক তলে নয়টি করিয়া কক্ষ ছিল। মন্দির-পরিবেষ্টিত, বিচিত্র কারুকার্য্যমণ্ডিত এই রাজপুরীটিই ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজাদের অতীত গৌরব ও স্থাপত্য-কৌশলের একমাত্র নিদর্শন। চুটিয়ার মন্দির এবং জগন্নাথপুরের শৈলমন্দিরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রাঁচির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ওরাওঁ এবং মুণ্ডা। ইহা ভিন্ন কতকগুলি অনার্য্য এবং মিশ্রিত জাতিও আছে।

মুণ্ডারাই অতিপ্রাচীন কালে প্রথমে এ-অঞ্চলে আসিয়া বাস করে। ভূমির অধিকার ও গ্রামশাসন সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবস্থা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল। ওরাওঁরা পরে আসিয়া অনেকাংশে তাহাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

রাঁচি শহরের দশ মাইল উত্তরে পিঠৌবিয়ার নিকট সুতিয়াম্বে গ্রাম ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজাদের আদি-পুরুষ ফণীমুকুট রায়ের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। সেখানে এখনও প্রতি ভাদ্র মাসে 'ইন্দ' পর্ব্বদিনে ফণীমুকুটের পালক-পিতা 'মাদ্রা মুণ্ডা'র সম্মানার্থ এক বিশাল ছত্র উত্তোলন করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুতিয়াম্বেতে একটি রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে।

কালক্রমে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও রাজপুতানা হইতে আগত এবং রাজবংশী রাজাদের অনুগ্রহলাভে সমর্থ ব্যক্তিদের ও রাজকর্ম্মচারীদের নানা প্রকার অত্যাচারও উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া এই শান্তিপ্রিয় মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি অধিবাসিগণ মাঝে মাঝে দলবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি প্রধান ঘটনা, ১৮৩১-৩২ সালের কোল উপপ্লব এবং ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বীরশা হাঙ্গামা। বীরশার বাস ছিল তামাড় অঞ্চলে। সে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিল এবং চাঁইবাসা ইংরেজী মিশন বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিল। তাহার জ্ঞাতি-ভাইদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-কৌশলে সে সহস্র সহস্র মুণ্ডা ওরাওঁ চাষীদিগকে দলবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। পরে কৌশলে ধৃত হইয়া রাঁচির জেল হাজতে কলেরায় সে মারা যায়। বুদ্ধিবলে ওরাওঁ মুণ্ডাদের উপর সে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মিশ্রণে সে একেশ্বরবাদী সদাচার-উপদেশী এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। মুণ্ডাদের মধ্যে সে 'বীরশা ভগবান' নামে পরিচিত। মুণ্ডারা তাহাদের ছেলেদের 'বীরশা' নাম রাখিতে খুব ভালবাসে।

রাঁচি জেলার মালভূমিগুলির উচ্চাবচ পর্ব্বত ও উপত্যকা, মধ্যে মধ্যে অসংখ্য স্বচ্ছসলিলা কলনাদিনী স্রোত-স্বতীর উন্মাদ গতি ও মনোমুগ্ধকর প্রপাতগুলি, স্নিগ্ধশ্যাম বনানী এবং অরণ্যমধ্যবিসর্পী ঘাটপথসকল এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে চিরশোভাময় করিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু মানবমনকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে। আর এখানকার মুক্তনির্ম্মলবায়ুসেবিতা প্রকৃতিমাতার বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় অঙ্কে যাহারা চিরলালিত হইতেছে, মুণ্ডা ওরাওঁ প্রভৃতি সেই কৃষ্ণবর্ণ দেহসৌষ্ঠবযুক্ত আদিম নরনারীগণের সরল অনাড়ম্বর আনন্দময় জীবনযাত্রা ও বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতাভিমানী মানবের অনুধাবনযোগ্য। ইহাদের সরল ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যবোধ, ভাবুকতা ও আত্মসম্মানজ্ঞান, জটিল কৃত্রিমতার আলোকমুগ্ধ জ্ঞানাভিমানী নরনারীর শ্রদ্ধা ও শিক্ষার বস্তু।
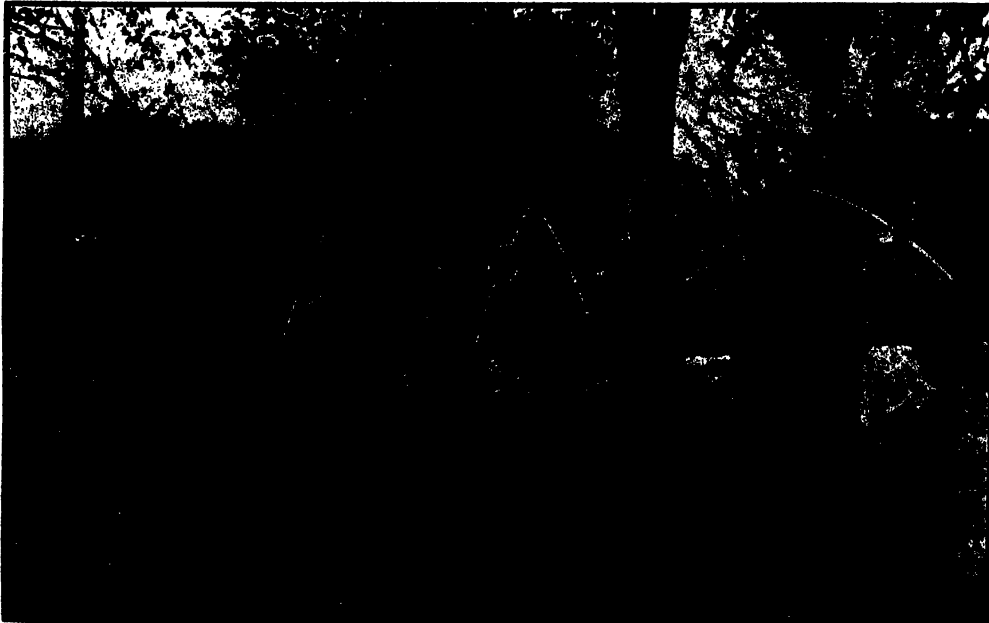
কয়েকটি ওরাওঁ শিকারে চলিয়াছে

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যৌবনের চিত্রাঙ্গদা—কবির যৌবন, পাঠকের, লেখকের এবং সভ্যতার যৌবন। মোহমদিরতার আবিলতা, বর্ণ-প্রচুরতার দৃপ্তগরিমা, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ব্রতভঙ্গে প্রেমের জয়ঘোষণা; পৌরুষে নারীত্ব ও নারীত্বে পৌরুষের প্রকাশ; সংযত কামনার ভদ্র পরিশেষ, বীর্য্যবানের দোষক্ষয়, ক্ষাত্র-ধর্ম্মের মাধুর্য্য অর্জ্জন; কবিপ্রতিভার সর্ব্বতোমুখী উন্মেষ। চিত্রাঙ্গদা কাব্য আমাদের যৌবনাভিলাষের সর্ব্বাঙ্গীন ইষ্ট-সিদ্ধি।

সেই চিত্রাঙ্গদা বহু বৎসর পরে অভিনীত হ'ল। ইতিমধ্যে কবিপ্রতিভার ও পাঠকের মনে কত না বিবর্ত্তন ঘটেছে। মোহ আজ বিদূরিত, বর্ণরাজি শুভ্রতায় সঙ্কলিত, ছন্দ বশীভূত ও বিচিত্র, গরিমা মহিমায় পরিণত। কামনার রক্তিম আবরণ উন্মুক্ত ক'রে অন্তরের সত্য পূর্ণ ও শান্ত জ্যোতিতে বিকাশ পায়, মোহাবেশমুক্ত চিত্ত সহজ সত্যের নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্যে প্রদীপ্ত হয়। তারই আলো পড়ে দর্শকের মনে। যে-মন নিতান্ত দুর্ব্বল, যে-মন অর্জ্জুনের ক্ষাত্রবীর্য্য গ্রহণ করতে পারে না, কেবল তার সুমধুর প্রেম-নিবেদনেই সান্ত্বনা পায়। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বীর্য্যবানের জন্য। সে যেন রবীন্দ্র-প্রতিভারই প্রতিরূপ। তার নির্দ্দেশ সার্ব্বজনীন। অতএব চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের রূপপরিবর্ত্তনে আমাদের আগ্রহ বিবর্ত্তনশীল মন ও রুচির নিদর্শন। চিত্রাঙ্গদা এখন নৃত্যনাট্য। যৌবনের চিত্রাঙ্গদার সম্ভার ছিল শব্দের ও ধ্বনির। তার আদর্শ কাব্য-আবৃত্তির। নূতন চিত্রাঙ্গদার শব্দ, বাক্যধ্বনি গৌণ। মুখ্য ভাষা তার নৃত্য। মধ্যে আছে সঙ্গীত। সঙ্গীতও নূতন প্রকারের; নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার সঙ্গীত প্রধানতঃ নৃত্যেরই উপযোগী।

চিত্রাঙ্গদা—"আমি তোমারে করিব নিবেদন আমার হৃদয় প্রাণ মন।"
অর্জ্জুন—"ক্ষমা করো আমায়, বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে, ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।"
[শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তুত কাঠখোদাই চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজন্যে মুদ্রিত]

মন মুখরিত হয় ভাষায় ও গানে। সাধারণতঃ, ভাষা ও সঙ্গীত ভিন্ন স্তরের প্রকাশ, অবশ্য একই মনের। কিন্তু মুখরা যখন মূক হয় তখন অঙ্গসঞ্চালনেই সে-মন নিজকে ব্যক্ত করে। নৃত্যকলা মূকের ভাষা, অক্ষর তার প্রতি অঙ্গের মুদ্রায়, বাক্য তার দৈহিক সঙ্গতিতে, ছন্দ তার দেহের হিল্লোলে। নৃত্যকলা নীরব কবির কায়িক কবিতা। তার প্রাণস্পন্দন সর্ব্বপ্রকার কলার পিছনকার মৌলিক [illegible]

চিত্রাঙ্গদার প্রতি মদন : "আমি দিনু বর কটাক্ষে র'বে তব পঞ্চম শর মম পঞ্চম শর..."

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রস্তুত রঙীন কাঠখোদাই চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজন্যে মুদ্রিত]

অর্জ্জুন : "কাহারে হেরিলাম ; সে কি সত্য, সে কি মায়া, সে কি কায়া, সে কি সুবর্ণ কিরণে রঞ্জিত ছায়া।"

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রস্তুত কাঠখোদাই চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজন্যে মুদ্রিত]

কথা তারই সরব সহভাবী, যৌথ-পরিবারভুক্ত আশ্রিত আত্মীয়। তাই, নটীর পূজার নটীর মতন, সকল আভরণ ঘুচিয়ে দেবার পর নৃত্যকলা আপন অস্তিত্ব অর্জ্জন করে। তখনই বাক্য হয় সংযত, সুরও হয় নৃত্যের অনুকূল। এ পন্থা চিরপরিচিত—বাক্যের তাৎপর্য্যকে অবদমিত করবার পরই যেমন সুরের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল।

বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে তার প্রত্যেকটি রচনা রাগিণীর সামান্ত গুণের অধিকারী হয়েও স্বকীয়। অর্থাৎ কোন রচনাই তাঁর 'আলাপ' নয়। ভৈরবীর আলাপে আদি স্বরস্থাপনা থেকে তান কর্ত্তব, ধুন চৌধুন সকল প্রকার বিবর্ত্তনের স্থান আছে, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার বদলে আছে নানা রকমের গান, যার প্রত্যেকটি ভৈরবী কিংবা তৎসংলগ্ন কোন সুরের আশ্রিত, তবু যেটি আপন অস্তিত্বে বিশেষ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কোনটির সম্বন্ধে বলা চলে না যে সেটি ভৈরবীর গান, তার সম্বন্ধে বলা চলে যে এই গানটিতে ভৈরবী রয়েছে। তবু কোন রচনাই সুরে বসান কবিতা নয়, কোন কবিতাই সুরে বসাবার জন্য লেখা হয় নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব উদ্ভূত হয় সুর ও কথার অদ্ভুত যোগাযোগে। সেই জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে অন্যের পংক্তিতে বসান যায় না, তাকে নিয়ে যথেচ্ছাচারও চলে না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য এতই জীবন্ত যে তাকে নৃত্যের ভাষায় অনুবাদ করলে তার ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে। আর্টেরও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন নিতান্তই ভয়াবহ। অনুবাদ যতই সুষ্ঠু হোক না কেন তার মূল্য মৌলিক-সৃষ্টি অপেক্ষা কম। (কবি নিজেই এই তত্ত্বটি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তাঁর চিত্রে, যেখানে স্বধর্ম্মাচরণে নিধনপ্রাপ্তির সংবাদে সান্ত্বনা পাই পরধর্ম্মের আশ্রয়ত্যাগের সাহসিকতা লক্ষ্য করে। তাঁর কোন চিত্রই অনুবাদ নয়, রঙে গল্প বলা নয়।) আজ গত কয়েক বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ নৃত্যকলার নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনে যত্নবান হয়েছেন। তাঁদের সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। যা দেখেছি তাই থেকে আমার মনে করা নিতান্ত সহজ হয়েছে যে সে-পদ্ধতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের (ও রবীন্দ্র-নাট্যের) আশ্রয়ে বিকশিত ও তার বৈশিষ্ট্যেই পরিপুষ্ট। তার মধ্যে সুকুমারত্বের ও কৃতিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। তবু আমার বিশ্বাস যে পূর্ব্ব-চিত্রাঙ্গদা যুগের অভিনয়ে বিশুদ্ধ নৃত্যকলার বীজ থাকলেও সেটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পূর্ব্বলিখিত বৈশিষ্ট্যের জন্য গুপ্ত ছিল। 'তপতী' কিংবা 'নটীর পূজা'র নৃত্যের যা অনুকরণ দেখেছি তাকে 'ভাও-বাৎলান' ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেই স্বাধীন নৃত্যকলার সর্ব্বপ্রথম উন্মেষ হ'ল। কবিকে আশ্বাস দিতে পারি—চিত্রাঙ্গদার অনুকরণ হবে না, প্রবাসী বাঙালীরাও ভয় পাবেন অভিনয় করতে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উৎকর্ষ ও বিশেষ-ভাবাত্মকতা ভিন্ন তাল-বৈচিত্র্যের অভাবও নৃত্যশিল্পের স্বাধীন জীবনযাত্রায় বিপত্তি বাধিয়েছে। "রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেতালা"—এই মন্তব্যের কোন অর্থ নেই—কারণ তাল গায়কের কণ্ঠে। কিন্তু স্বরলিপিতে প্রকাশিত রচনায় তালের বৈচিত্র্য কম কি বেশী ধরা পড়ে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপিতে অল্পসংখ্যক তালের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, বড় দশকুশী পঞ্চম সোয়ারীর প্রত্যাশা কেউ করে না, ধামার আড়াচৌতালের বাঁটোয়ারাও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যে-সঙ্গীত গায়কের ও গানের মেজাজের সাহচর্য্যে সার্থক হয়, তার গায়ন-পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাঁটোয়ারার সুযোগ নেই। সে-সঙ্গীত যদি আবার নাট্যোপযোগী হয়, তখন অবসর থাকে কেবল লয়ের—অর্থাৎ মাত্রাভাগ ও তালের পিছনকার মূলগত ছন্দের। এই আদিম ছন্দ শ্বাসপ্রশ্বাস ও গানের 'মেজাজের' দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব এক হিসেবে সূক্ষ্ম বাঁটোয়ারার অভাবের জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে এবং সেই সঙ্গীতের আশ্রিত নৃত্যকলাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তবু স্বাধীন নৃত্যকলার অভিব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে তালের বৈচিত্র্য নিতান্তই বাঞ্ছনীয় এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকীর তাল-ভঙ্গ অত্যন্ত অমার্জ্জনীয়। সামান্য ত্রিতালীতে শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের আমি ভুল পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছি—কিন্তু চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর পদক্ষেপ নির্ভুল ছিল। কেবল তাই নয়, ঝাঁপতালের মত গম্ভীর

তালে (যখন সঙ্গীত ও বাক্য স্তব্ধ হয়েছে তখনও, অর্থাৎ নিরালম্ব নৃত্যেও) আড়ির কাজ লক্ষ্য করেছি। আরও কতটা তালের উন্নতি নৃত্যনাট্যে সম্ভব এই বিচারের স্থান অন্যত্র—কিন্তু উন্নতি যে হয়েছে এবং সে উন্নতি যে ভব্যতার সীমা অতিক্রম ক'রে আড়ম্বরে পরিণত হয় নি এইটুকুই আমার বক্তব্য।

অন্য ভাবে বলা চলে, স্বতন্ত্র নৃত্যকলার উদ্ভাবনের জন্য দুটি সর্তরক্ষার প্রয়োজন ছিল ; প্রথমত উৎকৃষ্ট এবং কোন বিশেষ ভাবাশ্রিত সঙ্গীত-রচনার আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি, এবং দ্বিতীয়ত, তালের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি। সঙ্গীত হিসেবে কোন রচনা যে-পরিমাণে উৎকৃষ্ট হবে সেই পরিমাণে সেই রচনা নৃত্যকলার স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জনে বাধা দেবে। কাব্যের বেলাও তাই, গূঢ় ভাবব্যঞ্জক কিংবা সূক্ষ্ম অর্থবাহী কবিতা নৃত্যের অনুপযোগী। চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ সঙ্গীত (সবগুলি নয়, কারণ সেগুলি চিত্রাঙ্গদার জন্য লেখা হয় নি) নৃত্যের নিতান্ত অনুকূল। তার মধ্যে ছড়া, আবৃত্তি থেকে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বর্ত্তমান, কিন্তু মোটের উপর সঙ্গীতের ধারাটি নৃত্যলীলাকে সমর্থন করে, ফুটতে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। (মোটের উপর অর্থে গড়পড়তা নয়, সমগ্রতার অনুভূতি উল্লেখ করছি।) সঙ্গীতের এই আত্মসংযম না থাকলে চিত্রাঙ্গদা পুনরাবৃত্তি হ'ত। নূতন সৃষ্টির জন্য অতি সংযমের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

চিত্রাঙ্গদাকে কেবল নৃত্যের দিক থেকে দেখলেও অন্যায় করা হবে। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য—অর্থাৎ সাধারণ নাটকের কথিত ভাষার পরিবর্ত্তে নৃত্যনাট্যের ভাষা হ'ল নৃত্য। এ-নৃত্য দেহের মূক-অভিনয় নয়, সঙ্গীতমুখর নৃত্য। নৃত্যনাট্য অবশ্য নাট্য, তার মধ্যে গল্প আছে, সে-গল্পের নাটকীয় গুণাবলী আছে, যেগুলি নৃত্যোপযোগী সঙ্গীতেরই ইঙ্গিতে পরিস্ফুট হচ্ছে। (সঙ্গীতের আশ্রয়ে নয়, আভাসে।) কারণ, নাটকটি অন্য কারুর নাটক নয়, রবীন্দ্রনাথের। 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরোধ মানসিক, এবং তার অভিব্যক্তিও তাই। 'বিসর্জ্জন' ও সামাজিক দু-তিন খানি নাটক ছাড়া রবীন্দ্র-নাট্যের প্রতিভাই হ'ল সাঙ্গীতিক। মোহ-মুক্তি যে-নাট্যের সঙ্কটময় পরিশেষ, সে-নাট্যের গল্পাংশ হৃদয়গ্রাহী হলেও তাকে ঐ ভাবে দৈহিক অনুবাদ কিংবা অভিনয় করা যায় না যেমন সম্ভব 'রাজহংসের মৃত্যু' কিংবা 'দুঃশাসনের রক্তপান'কে। চিত্রাঙ্গদা-নাট্যের অবাকগোচর বিশেষত্বটুকু তার আঙ্গিককে রক্ষা করেছে, বিদেশী অপেরার ভাবপ্রবণতা এবং কথাকলির দৈহিক ও জৈবিক অভিনয় থেকে। প্রমাণ, গল্প দেখা ও বোঝা ছাড়া নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে অন্য একটি আনন্দের উপকরণ ছিল। সেই জন্য সব সময় গল্পাংশ পরিস্ফুট না হলেও না-বোঝার ব্যাকুলতা আমাকে ব্যথিত করে নি। সঙ্গীত ও নৃত্যের মীড়ে আমার গল্পানুসরণ প্রবৃত্তি রুদ্ধ হয়। সেটা আক্ষেপের বিষয় হয় নি।

তবু চিত্রাঙ্গদা নাট্য—তার পাত্র-পাত্রী একাধিক, তার গতি একমুখী হলেও একটানা নয়, তাতে জোয়ার-ভাঁটা আছে, খালবিলের জল এসে তাতে পড়ছে। সেই জন্য সমবেত-নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েছেন। লক্ষ্ণৌয়ের কালকা-বৃন্দাদীনের প্রবর্ত্তিত এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত নৃত্য-পদ্ধতিতে (যাকে ভুল করে দরবারী, ক্লাসিকাল বলা হয়, কিন্তু যেটি নিতান্তই রোমাণ্টিক এবং ঠুংরীর আশ্রিত) নাটকীয় গুণ যা আছে, তা প্রকট হয় মাত্র এক জন নর্ত্তকেরই নৃত্যে। তিনিই কখনও কৃষ্ণ, কখনও রাধা, কখনও বা গোপিনী। তিনিই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় গল্প বলেন। দেশী নৃত্যে কিন্তু বহুর স্থান আছে। নাটক যখন বহুনিষ্ঠ তখন কবি দেশী নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করতে বাধ্য। গ্রহণ অবশ্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনুকরণ কিংবা চমক লাগাবার জন্য নয়। এই বহুর ব্যবহার নিতান্তই দায়িত্বপূর্ণ। সংখ্যাধিক্য এককের ও স্বকীয়তার সর্ব্বনাশ ঘটাতে সদাই তৎপর। তাই সাবধানতার বিশেষ আবশ্যক। প্রয়োগকুশল শিল্পীর হাতে বহুর অস্তিত্ব এককের, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করে। তখন পাত্র-পাত্রী তরফের এবং নায়ক-নায়িকা জুড়ীর তারের কাজ করে। মূল ঐক্যের সঙ্গে ঐ প্রকার সম্বন্ধ যদি না থাকে তবে পাত্র-পাত্রী কেবল ভিড়ই জমায়। ভিড়ের এক ভিড়-করা ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা নেই, তার মধ্য থেকে স্বতঃই কোন সম্বন্ধ উদ্গারিত হয় না, বরঞ্চ, এককে নীচু স্তরেই নামায়। কিন্তু নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে বিরোধ ও বিবর্ত্তন দেখান যদি উদ্দেশ্য হয়, এবং সেই সঙ্গে অন্য পাত্র-পাত্রী অবতারণা করবার প্রয়োজন যদি

থাকে, তবে তাদের ব্যবহারকে গ্রথিত করতেই হবে। সেই জন্য গ্রথিত করবার পর সূক্ষ্মতা যদি না রক্ষিত হয়, তবু বিশেষ ক্ষতি হয় না। যেমন, একক নৃত্যে তালের সূক্ষ্ম বিভাগ ও আড়ম্বরের সুযোগ থাকলেও সমবেত কিংবা পুঞ্জ-নৃত্যে বাঁটোয়ারা, বিসম, অনাঘাতের স্থান সঙ্কীর্ণ; যেমন খেয়ালে তানের অবসর যথেষ্ট থাকলেও কোরাসে ছায়ানট কিংবা দেশে বন্দেমাতরম্ গানটি অচল ও অশ্রাব্য। কোরাসে শ্রুতি কিংবা তান কিংবা তালের বাহাদুরী অশোভন। অবশ্য, মনে রাখতে হবে বহু এখানে এককেরই আশ্রিত, একক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সে যেন এককের চার পাশে জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছে, আরও মনে রাখতে হবে নিরালম্বতা শুদ্ধতার আরোহণ-পথ। দেশী নৃত্যের মধ্যে বোধ হয় মণিপুরী নৃত্যেই বহু তার যথার্থ স্থান পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা নিজে মণিপুরের রাজকন্যা এই কারণটি যথার্থ নয়।

বলা বাহুল্য, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা নায়ক-নায়িকা, তাঁরা ভিন্ন দেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যা। চিত্রাঙ্গদার দেশে মণিপুরে অর্জ্জুন এসেছেন একাকী, দেশভ্রমণের পরিশেষে। [য]ুবতী চিত্রাঙ্গদা যুবকের মতনই প্রতিপালিত (তিনিই [ভ]ারতের প্রথম সাফ্রাজেট) তাঁর এই অদ্ভুত শিক্ষাদীক্ষার [ই]তিহাস সখীগণই বিবৃতি করতে পারেন। তদ্ভিন্ন অর্জ্জুনের [অ]ন্য পরিচর, গ্রামবাসিগণও আছে, আর আছেন মদন। [অ]র্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ব্যবহারই নাটকের প্রধান অধিশ্রয়ণ। [ত]াদের ব্যবহারের প্রতিফলন হবে মদন ব্যতীত নাট্যমঞ্চস্থ [অ]ন্যান্য ব্যক্তির উপর। কখনও বা তারাই সেই মূল [ব্য]বহারের, সেই সম্বন্ধের অভিব্যক্তির সাতত্য বজায় [রা]খবে, সময় সময় তারাই হবে প্রতিবাদ-স্বরূপ। মূল স্বর [হ]তে হবে তাদের আধারে—মূল স্বর ও নৃত্য পরিপুষ্ট হবে [তা]দেরই সমর্থনে, কিংবা বৈপরীত্যে। চিত্রাঙ্গদায় সমবেত [নৃত্য]কে নানারূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবু যদি বিবর্ত্তনের ধারা শিথিল হয়, ছন্দ হয় ছিন্ন-[ভিন্ন], তবে মদনের আশীর্ব্বাদে এবং কবির আবৃত্তিতে [ধ]ারা আবার বইবে। এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা, এই বন্ধন-[সূত্র]ের আঙ্গিকটি আমাদের নিতান্তই পরিচিত। কৈবল্যই হিন্দু সভ্যতার বন্ধনী হয়, তবে নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার [স]ম্যকে পুরাতন সংস্কৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ভাবতে পারি। সেই ভূমিকায় সমবেত নৃত্যের স্থান নিরূপণ করলে দেখা যাবে যে নৃত্যাভিনয়টি সত্যই বিপ্লবাত্মক। পুঞ্জ-নৃত্য বোধ হয় ধ্রুবপদী নয়—শাস্ত্রেও তার আঙ্গিক নির্ণীত হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। (এখানে আমার ও অন্যান্য জনসাধারণের অজ্ঞানতাকে তথ্য হিসেবে ধরলে বোঝা যাবে যে সংস্কৃতি যখন বিচ্ছিন্ন, যখন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সকলেই অচেতন, তখন তাকে ভিত্তি ক'রে নূতন ইমারৎ গড়া চলে না। অতএব এই কারণেও মার্গ-নৃত্যের পুনরাবৃত্তি এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব—স্রষ্টাকে দেশী নৃত্যের দ্বারস্থ হতেই হবে। দেশের মাটি থেকে রস আহরণ করা কবির পরিচিত পন্থা। মার্গ-সঙ্গীতে তিনি বাউল ভাটিয়াল মিশিয়ে নূতন জাতি সৃষ্টি করেছেন। নৃত্যেও তাই। পার্থক্য অবশ্য আছে এবং যতটুকু পার্থক্য ততটুকু তাঁর কৃতিত্ব। মার্গ কিংবা ধ্রুবপদী সঙ্গীত আমাদের কাছে জীবন্ত, আমাদের সংস্কারগত অন্ততঃ আংশিক ভাবে। মার্গ কিংবা ধ্রুবপদী নৃত্যরূপ কি আমরা জানি না। বলী-নৃত্যকে মৌলিক বলব? তাও কি আমাদের সংস্কারগত? সর্ব্বপ্রকার বাইজী-নৃত্য যে ধ্রুব নয়, সে-বিষয়ে সকলেই আমরা নিঃসন্দেহ। তবু দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের নানা রূপের মধ্যে খানিকটা ধ্রুব-পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে অনুমান করা অন্যায় নয়। সে রূপও আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু দক্ষিণী জনসাধারণের, গ্রামবাসীর অপরিচিত নয়। অতএব পণ্ডিতের দল যাই বলুন না কেন, নৃত্যনাট্যের স্বকীয় প্রয়োজনের জন্য পুঞ্জ-নৃত্যকে গ্রহণ যদি করতেই হয় তবে দেশী ও গ্রাম্য-নৃত্যকে বরণ করাই সার্থক। তবেই বিপ্লব সংসাধিত হবে। দেশী-নৃত্যের মধ্যে দুটির প্রতিষ্ঠা আছে—মণিপুরী ও মালাবারী কথাকলির। আর একটি প্রতিপত্তি সমগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত, কালকা-বৃন্দার পদ্ধতি। শেষেরটি পুরোপুরি ধ্রুব না হলেও তাকে তার পরিব্যাপ্তির জন্য বাদ দেওয়া যায় না। এই তিনটির অদ্ভুত সংমিশ্রণ চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যের বিশ্লেষণের ফলে চোখে পড়ে। অনুপাত অবশ্য বিভিন্ন এবং সঙ্কলনটাই কৃতিত্ব মনে রাখতে হবে।

কালকা-বৃন্দার নৃত্য-রূপ কি রকম ছিল তার সাক্ষ্য দিতে পারব না। তবে তাঁদের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র এবং একাধিক শিষ্য-শিষ্যার নৃত্য দেখে বলতে পারি যে তাঁদের প্রবর্ত্তিত

নৃত্যকলার মূলকথাটি শান্তিনিকেতনী এবং চিত্রাঙ্গদার নৃত্যে পরিত্যক্ত হয় নি। (অবশ্য গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরাও পুরাতন মুদ্রা প্রভৃতি নৃত্যকলার ভাবার উত্তরাধিকারী, এবং শান্তিনিকেতনী নৃত্যে মুদ্রা আছে, যদিও সব মুদ্রা শাস্ত্রোক্ত হয়ত নয়)। লক্ষ্ণৌয়ের পদ্ধতির প্রধান কথা 'পায়ের কাজ' নয়—লোকে যাকে 'পায়ের কাজ' বলে সেটি তাল-বাঁটোয়ারার বোলের পুনরাবৃত্তি। সেটুকু চমকপ্রদ নিশ্চয়, কিন্তু যাঁরা লক্ষ্ণৌয়ের নৃত্যকে নূতন ব'লে শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা পায়ে বাঁয়াতবলা বাজানকেই মহৎ সৃষ্টি ভাবতে পারবেন না। কেবল তাই নয়, 'ভাও-বাৎলানা'র অদ্ভুত কৃতিত্ব স্বীকার করেও লক্ষ্ণৌ-নৃত্যকলাপদ্ধতির নূতনত্বের অন্য দাবী পেশ করাই সঙ্গত। ভাও-বাৎলান ভাবের এক প্রকার না-হয় দশ প্রকার ব্যাখ্যা কিংবা সমর্থন। কিন্তু তবুও ব্যাখ্যা ও সমর্থন নৃত্যের আশ্রয়দাতা সেই সঙ্গীতের পদটিরই। অর্থাৎ তখনও নৃত্য স্বাধীন হয় নি। আমার মতে উত্তর-ভারতের প্রচলিত নৃত্যের মূলকথাটি হ'ল নর্ত্তকের বিশেষতঃ রেখায়িত ঢেউগুলির সমঞ্জস সাধনের ইঙ্গিত। তবু কিন্তু তার প্রেরণা সঙ্গীতের তালের। দেহ তখনও নিজের ভাবের তাগিদে রেখায়িত হচ্ছে না, সেই জন্য দেহজ কিংবা আত্মজ নৃত্য-তরঙ্গের ছন্দের সঙ্গে সাঙ্গিতিক তাল মানের বিরোধ সম্ভব। সত্যসত্যই যে বিরোধ বাধে নিজে দেখেছি।

পূর্ব্বকথিত রেখায়িত তরঙ্গ দক্ষিণী কিংবা বলী-নৃত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক নয়—অন্ততঃ ঐ প্রকার উন্নতি দক্ষিণে প্রত্যাশা করি না। দক্ষিণে পায়ের কাজ কিংবা 'ভাও-বাতানা' সামান্য আছে, কিন্তু সে নৃত্যের ধর্ম্মই ভিন্ন অর্থাৎ অভিনয়। উদয়শঙ্কর যাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেন তাঁর, গোপীনাথের, ভালাঠোলের শিক্ষাপ্রাপ্ত দলের, বালা-সরস্বতী এবং আরও দু-তিন জন প্রথিতযশা নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য দেখে মনে হয়েছে যে ও-অঞ্চলের নৃত্য এখনও অভিনয়ের সংজ্ঞায় পড়ে এবং সে-অভিনয় দেহের উপরিভাগের প্রতি অঙ্গে যেমন সূক্ষ্ম, ভাব-ব্যঞ্জনাও আর্টের দিক থেকে তেমনই স্থূল। উৎকৃষ্ট বলী-নৃত্যাভিনয় আমি দেখি নি, তবু যা দেখেছি তাতে মনে হয় যে সেটিও অভিনয়মূলক, যদিও বর্ত্তমান বলী দেশের অভিনয়ের প্রকৃতি অন্ততঃ বর্ত্তমান উত্তর-ভারতীয় অভিনয়ের প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। বলী ও দক্ষিণী নৃত্যের আঙ্গিক রেখার লীলা নয়, দৈহিক প্লেনের সমন্বয়সাধন। উত্তর-ভারতীয় নর্ত্তক যতই মঞ্চের উপর ঘুরে বেড়ান না কেন, একটি মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর দেহের যে-কোন একটি প্লেনেই থাকেন। তাঁর ব্যতিরেক ক্ষণস্থায়ী, তাঁর ভারসাম্য মাধ্যা-কর্ষণের রেখাশ্রিত প্লেনেরই মধ্যে। তাই 'পায়ের কাজ' অর্থাৎ বোলের পুনরাবৃত্তি ঐ নৃত্যের চমক যোগায় না। 'পায়ের কাজ' একই প্লেনে উত্থান ও পতন। তাণ্ডব-নৃত্যের কিংবা দীপলক্ষ্মীর মূর্ত্তি যিনি দেখেছেন তিনিই দক্ষিণী নৃত্যের প্লেনভাঙার মর্ম্ম বুঝবেন।

মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই পরিচয় যৎসামান্য। মণিপুর হয়ত বাংলার বাইরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে বলেই। তথাপি মণিপুরী নৃত্য যতটা দেখেছি তাতে তার ভব্যতা ও কবিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। তার সাজসজ্জা, সঙ্গীত এবং গতির মধ্যে যে সংযম আছে তার তুলনা আমি কোথাও পাই নি। নেহাৎ মোটামুটি বলা যায় দক্ষিণী ও বলী নৃত্য ভাস্কর্য্য, লক্ষ্ণৌয়ের অর্থাৎ বাইজীর নৃত্য সঙ্গীত, এবং মণিপুরী নৃত্য কবিত্বধর্ম্মী। মণিপুরী নৃত্যের অন্য বিশেষত্ব তার সমবেত নৃত্যে। সাঁওতালী নৃত্যেও ঐ গুণটি বর্ত্তমান কিন্তু তার গতিটাও সমবেত অর্থাৎ একই গতিতে অন্ততঃ একটি দল (পুরুষের কিংবা স্ত্রীর) বাঁধা। মণিপুরীতে প্রত্যেকের গতি আছে, এবং সেই প্রত্যেকের গতি মিলে ছক্ তৈরি হচ্ছে, যে-ছকটি আবার নূতন ছকের সঙ্গে কখনও মিশে যাচ্ছে, কখনও বা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মণিপুরী নাচ দেখলে আমার ক্যালিডস্কোপ কিংবা পার্সিয়ান কার্পেটের কথা মনে পড়ে। তার সমগ্রতার অনুভূতি বিশেষের মুখ চেয়ে থাকে না।

শান্তিনিকেতনের নৃত্যের আঙ্গিক প্রথমে ছিল রেখাশ্রিত—অবশ্য, তার মধ্যে রঙের খেলাও ছিল। তাকে চিত্রধর্ম্মীও বলা যায়। মণিপুরের কাব্যনিষ্ঠ ভদ্রতার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত নৃত্যের যোগ নিতান্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়-পদ্ধতির পক্ষে ঐ প্রকার আঙ্গিকই যথেষ্ট। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নাটকটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তার গল্পাংশ অপেক্ষাকৃত জটিল, তার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও বেশী অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদায় অভিনয়ের সুযোগ বেশী।

তার নৃত্য রেখার লীলায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। এখানে দক্ষিণী নৃত্যাভিনয় এবং মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক আরও বেশী ক'রে গ্রহণ করতে হবে। দক্ষিণী অভিনয় স্থূল, কিন্তু তার প্লেন-ভাঙাটা নূতন ও জটিল, চিত্রাঙ্গদা নাটকটির প্রকৃতিরই অনুযায়ী। সমবেত নৃত্যে মণিপুরী, ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে পুরুষ-নৃত্যে দক্ষিণী, এবং মহিলা-নৃত্যে উত্তর-ভারতীয় আঙ্গিক নৃত্য-নাট্যে তাই গৃহীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

গৃহীত অর্থে সমন্বিত। সমন্বয়টিই আসল কথা। সমগ্র-ভাবে দেখলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এই সমন্বয়কে। যে-সৃষ্টিতে এত ভিন্ন ধরণের নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি চারু-কলার সমাবেশ হয়েছে তাকে সৃষ্টি বলতেই হয়। দেশের মন যদি জাগ্রত ও সৃষ্টিমুখী হয় তবেই তার মহত্ত্ব উপলব্ধি সম্ভব।

বিশুদ্ধ নৃত্যের দিক থেকে বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদায় নৃত্যকলা মুক্তিলাভ করেছে। যোগশাস্ত্রে বলে কানই নাকি যোগীর পরম শত্রু। অন্ততঃ বিশুদ্ধ নৃত্যকলা উপভোগের বেলা ত বটেই। সঙ্গীত-ভিন্ন নৃত্যের অস্তিত্বে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভ্যাস ভাঙার দুঃসাহসিক কাজেই ব্রতী হয়েছেন। চিত্রাঙ্গদা-অভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীত শুব্ধ হয়, মাত্র তাল চলে—নৃত্য তখন পুরুষের। দুটি বার সঙ্গীতের এই রকম বিরাম অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। কেন সঙ্গীত শুব্ধ হয় আমাদের বিচার্য্য। প্রথমত কথা থেকে নিষ্কৃতি পেলে সঙ্গীতের অধীনে আসতেই হয়, সঙ্গীত অর্থে বিশুদ্ধ সুর (রাগিণী নয়)। আমাদের সুর-গুলিতে আরোহী-অবরোহী ভিন্ন অন্য 'ভুজ' নেই, অর্থাৎ গায়ন-পদ্ধতি একই প্লেনে চলে। (যন্ত্রবাদনে দুটি ভুজ আছে।) সেই জন্য নৃত্যে যখন দুইয়ের অধিক প্লেনে দেহকে ভাঙবার প্রয়োজন হয় তখন তার সমর্থন হিন্দুস্থানী গায়ন ও বাদন পদ্ধতিতে পাওয়া শক্ত। নৃত্য-নাট্যের জন্য হয় বিদেশী হার্ম্মনির সাহায্য গ্রহণ আর না-হয় চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে সঙ্গীতকে থামান, এই দুটি পথ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। আজকালকার থিয়েটার ও সিনেমা সঙ্গীতে প্রথমটি অবলম্বিত ঠিক না হলেও তারই দিকে ঝোঁক পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্বেচ্ছায় 'ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট' হ'তে চান না। অতএব, দ্বিতীয়ত, সঙ্গীত নীরব হ'তে বাধ্য। নীরব, কিন্তু তার প্রাণস্পন্দন চলছে। স্পন্দনের ছন্দের মতন তখন আঘাত চলেছে, কিন্তু সে-আঘাতে বাঁটোয়ারা নেই। জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিক্ষণের সুষুপ্তিতে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ নয়, তবে তার ক্রিয়া নিতান্তই সরল। নাট্যের জটিলতা এই সরল আঘাতে পরিণত হ'ল। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেল নৃত্য-কলার শুদ্ধতা অর্জ্জনের অনুচ্চারিত ইঙ্গিত।

এতক্ষণ আমি নৃত্যের স্বরাজসাধনের বিবরণ দিলাম। স্বরাজ পাবার পর আন্তর্জাতিক মিলনই প্রকৃত মিলন। তখনই হয় বন্ধুত্ব—কারণ তখন কাউকেই অন্যের অধীনে থাকতে হয় না। শুদ্ধ নৃত্যকলার উদ্ভাবনা অর্থে সঙ্গীতকে পদানত করা নয়। সব জ্ঞানে, সব কলাবিদ্যার উৎকর্ষের ইতিহাসেই দুটি গতি আছে, ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধি, এবং শুদ্ধির পর সমানে সমানে, পরিত্যক্তের সঙ্গে পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধতায় আরোহণ ক'রে সম্বন্ধে অবরোহণ করেছেন—তাই চারুকলার সমন্বয় চিত্রাঙ্গদায় সর্ব্বাঙ্গীন হয়েছে। কোন কলার প্রতি অশ্রদ্ধা সূচিত হয় নি।

চিত্রকলার ব্যবহার কত সুচারু হয়েছে বোঝাতে পারব না। তবে রঙের অর্থাৎ সাজসজ্জার ও দৃশ্যপটের অবস্থান অত্যন্ত সুসমঞ্জস হয়েছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেছেন। শুনেছি, সেজন্য কবি প্রতিমা দেবী ও সুরেন্দ্র কর মহাশয়ের কাছে ঋণী। আমি নৃত্যনাট্যে গানের 'ব্যবহার' একটু বিচার করব। বলা বাহুল্য, ব্যবহার অর্থে সম্পত্তির ব্যবহার নয়।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, ভুললে চলবে না। যেখানে নাট্য সঙ্গীতাধীন সেখানে নাটকীয় গতি রুদ্ধ হয়। আবেগ যায় থেমে যখন শ্রোতৃবৃন্দ নৃত্যরত নায়ক-নায়িকার মুখে গান শোনে। পুরাতন কালে যাত্রায় তাই হ'ত। ত্রুটি রক্ষার জন্য অন্য এক দল গায়ক-গায়িকাকে রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করবার রীতি আছে। এই রীতিটাও প্রাচীন। কিন্তু বাংলা যাত্রায় তার ফল হ'ত বিপরীত। কথাকলি, বলী, এমন কি আধুনিক উদয়শঙ্করের নৃত্যের ফল কিন্তু শুভ হয়েছে। 'মায়ার খেলা', কিংবা 'বাল্মীকি-প্রতিভায়' রীতিটির সাক্ষাৎ পাই না। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ আবার সেটি অবলম্বন করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় তার চরম বিকাশ।

পাত্রপাত্রী ভিন্ন অন্য একটি গায়ক-গায়িকার দলকে রঙ্গমঞ্চের পিছনে কিংবা কোণে রাখলে, এবং তাদের সঙ্গীতকে অবদমিত করলে নাটকীয় গতিরক্ষার সুবিধা হয়। তাঁরা হবেন পটভূমি, তাঁদের সঙ্গীত হবে ভূমিকা, এবং বিচ্ছিন্ন ব্যবহারের সূত্র। (কবি নিজেই রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকেন—সূত্রধর হিসেবে। তাঁর আবৃত্তিও ঐ রীতির চূড়ান্ত নির্দ্দেশ।) অবশ্য, ভূমিকাটুকু থাকলেই যথেষ্ট হ'ল না। কথাকলিতে সাঙ্গীতিক ভূমিকাটি স্থির—গল্পাংশ তাই প্রধান নটের (কিংবা নটীর) অভিনয় ও সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়। মাত্র একটি অর্দ্ধ-উচ্চারিত একটানা সুর (drone) থাকে (তার অবশ্যক উত্থান পতন প্রভৃতি বিবর্ত্তন আছে, কিন্তু যৎসামান্য)। কথাকলি (ও বলী নৃত্যেও) গল্পাংশ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের পরিচিত ঘটনা ব'লে শ্রোতাদের ব'লে দেবার প্রয়োজনই থাকে না। যেখানে পূর্ব্বপরিচয় সেখানে ঘটকালিটা উপরন্ত। অভিনেতা ও শ্রোতার মন পূর্ব্ব থেকেই সংযুক্ত। তখন ঐ একঘেয়ে সুরই (দক্ষিণীদের ভাষায়) 'শ্রুতির' কাজ করে। বলা বাহুল্য চিত্রাঙ্গদা-অর্জ্জুনের গল্পটি আমাদের জনসাধারণের সুপরিচিত নয়।

উদয়শঙ্করের নৃত্যাভিনয়ে সঙ্গীতের ব্যবহার আর একটু ভিন্ন ধরণের, যদিও সেই ব্যবহারের জাতি দক্ষিণী। তাঁর নৃত্যে আছে মোহন অভিব্যক্তি এবং তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাঁর দলের সঙ্গীতাচার্য্যগণ যে সেই বিবর্ত্তনশীল নৃত্যের উপযোগী সাঙ্গীতিক অভিব্যক্তি দেখাবেন সে আর বিচিত্র কি? তথাপি, দুটি গতির মিল নেই, দুটির প্রকাশ সমান্তরাল রেখায় চলে। সঙ্গীত-নৃত্যের অপরূপ সৃষ্টি হয় না। হয় দুটির, সঙ্গীতের এবং নৃত্যের। নৃত্যের যখন অপরূপ সৃষ্টি হয় তখন নাটকীয় গতি নৃত্যের সাহায্যে সবল হয়ে ওঠে; যখন নৃত্য শিথিল হয়, তখন নাটকীয় গতি আর থাকে না। (সাধারণতঃ উদয়শঙ্করের ব্যক্তিগত কৃতিত্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠায়, তাঁর প্রযোজনাশিল্পের জন্য এই দুর্ব্বলতাটুকু ধরা পড়ে না—কিন্তু দুর্ব্বলতাটি তাঁর পদ্ধতির অন্তর্নিহিত।) যেখানে সঙ্গীত উৎকর্ষ লাভ করে, অত্যন্ত কম ক্ষেত্রে, সেখানে সঙ্গীত উদয়শঙ্করের নৃত্যের অনুকরণ করে। অবশ্য তারই নিজের ভাষায় অনুকরণ, সেই জন্য সমান্তরালতার উল্লেখ করেছি। ধরা যাক, উদয়শঙ্কর শিবের নৃত্যাভিনয় করছেন—শিবের সঙ্গে ভৈঁরোর একটা সংস্কারগত যোগ আছে—পিছন থেকে ভৈঁরো বেজে উঠল—উদয়শঙ্কর নৃত্য সুরু করলেন—তার নানা রূপ ব্যক্ত করলেন—পিছনের কন্‌সার্টে ভৈঁরোর ধূন-চৌধূন চলল। দুটিই ভাল লাগছে আমাদের, কিন্তু কান ও চোখকে পৃথক করা শ্রোতার অসাধ্য—ছেদ পড়ে গেল মনঃসংযোগে, সেই ফাঁকে দীর্ঘ হয়ে ঝুলে পড়ল অভিনয়ের সূত্রটি। 'শিব-পার্ব্বতীর দ্বন্দ্বে' এই দোষটি বর্ত্তমান ছিল।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতের 'ব্যবহার' অর্থাৎ সঙ্গীত ও নৃত্যের সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রকারের নয়, মিশ্রণের। সে মিশ্রণের অনুপাত যথার্থ; কারণ সেখানে নৃত্য স্বাধীন, সঙ্গীতের ব্যবহারও তাই সশ্রদ্ধ। সেই জন্য সমগ্র সৃষ্টির দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য আরও বেশী সার্থক মনে হয়। এমন মূর্খ কেউ নেই যে উদয়শঙ্কর কিংবা তিমিরবরণের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যে-কোন ছাত্রছাত্রীর তুলনা সম্ভব মনে করে। তুলনা চলে উদয়শঙ্করের ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার। রবীন্দ্রনাথের ধারণা সর্ব্বতোমুখী, তাই তাঁর সৃষ্টিকে কোন একটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্য বলতে ইচ্ছা হয়—যেখানে মন্দিরের অঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, যার মধ্যকার ভাস্কর্য্য স্থাপত্যের অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভাস্কর্য্যের অনুরূপ, যার পূজারী ও উপাসকের গঠন, আচার, ব্যবহার, গতি নিতান্তই সুসদৃশ, যার নৃত্যগীত মন্দিরের ধর্ম্মানুকূল। রবীন্দ্রনাথকে এক জন উচ্চশ্রেণীর স্থপতি বলতে ইচ্ছা হয়।

সমগ্রতার দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের আলোচনা করলাম। স্থলবিশেষে ত্রুটি আছে—কিন্তু মূল সম্বন্ধে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করি নি। বিশেষের আলোচনা আমার সাধ্যাতীত। বিশ্লেষণের ফলে যদি সমন্বয়-উপলব্ধির ত্রুটি ঘটে থাকে, তবে আমার ভাষাকেই যেন পাঠকবৃন্দ দোষী করেন।

উত্তর-আমেরিকা

(ওয়াল্ট্ হুইট্‌মান্ স্মরণে)

শ্রীকালিদাস নাগ

খুঁজে পেতে হবে
অসীম ধনরত্নের খনি, অনন্ত রহস্যের আড়ৎ ভারত।
ক্ষেপিয়ে তুলেছে নতুন ইউরোপের নতুন মানুষকে
ছুটছে দিকে দিকে কলম্বাস্ ভেস্‌পিউসি আরও কত
ডানপিটে বোম্বেটের দল।
রাস্তা কোথায়? পথ বার করা চাই।
ভাসে ডোবে মরে—তবু ভয় নেই
রাস্তা বেরিয়ে যায় রোখের জোরে।
ডাঙায় লাগে তরী, যেখানে ঠেকে বলে ইণ্ডিয়া!
কেঁচো খুঁড়তে বেরোয় সাপ
পুরান দেশ খুঁজ্‌তে মিলে যায় অকস্মাতের দান—
আন্‌কোরা নতুন মায়া-পুরী
নিছক খালি নয়, অনেক মানুষে ভরা,
মায়ারাজ্যের শেষ নৃপতি মণ্টেজুমা
রক্তবন্যায় শেষ করে দেয় সেকেলে ইতিহাস
লাল মানুষ দিয়ে যায়, সাদা মানুষের হাতে,
টাট্‌কা রক্তের দলিল
নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে পুরান রক্তের সারে।
বিরাট পাহাড়, নদী, বন প্রান্তর
মুষ্টিমেয় মানুষের কবলে,
কে কাটে জঙ্গল? কে করে চাষ? চাই মজুর, চাই দাস
কাফ্রিগ্রাম লুটে কালো মানুষের ঘর ভেঙে আনা হয়
জাহাজ ভর্ত্তি দাসদাসী—জন্মের মত কেনা।
অর্দ্ধেক মরে, অর্দ্ধেক বাঁচে, কাজ ত চলে যায়?
খোঁড়া হয় খনি, ওঠে সোনা রূপো কত কী—
ফলে ওঠে সবুজ ক্ষেত, কালো মানুষের রক্তে উর্ব্বর,
গর্জ্জে ওঠে কলকারখানা কোঠা বাড়ী,
আকাশ ভেদ করে ওঠে সৌধচূড়া
তাজ্জব ব্যাপার—অত্যুক্তির স্বর্গরাজ্য!
সব চেয়ে বড় সব চেয়ে ছোট
সব চেয়ে দামী সব চেয়ে ঝুটোর দেশ!
গুরুচণ্ডালী ভাষা গড়ে তুল্‌ছে
নতুন গদ্য নতুন পদ্য
বল্‌তে পারে চল্‌তে পারে যার যেমন খুশী
সবার রাস্তা খোলা
প্রথম কবি গেয়ে ওঠে 'খোলা পথের গান'।

খোঁড়া হয়েছে সুয়েজ খাল, পূবে পশ্চিমে মেলাতে,
হুইট্‌মানের গলায় নতুন সুর: 'রাস্তা বাত্‌লাও—
ভারতের সড়ক'।

চার শতাব্দী আগে খোঁজ পড়েছিল এই সড়কের
খোঁজ মিলেছে কি?
আজ ত দেখি শুধু ভারত নয়,
চীনে জাপানী তুর্কী ইরাণীতে ভরা আমেরিকা,
শাদা দেশের বুকে গড়ে তুল্‌ছে নতুন জাত লক্ষ লক্ষ
কালো মানুষ,
সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে নতুন জাতিভেদ, নতুন ছুৎমার্গ
'তফাৎ যাও কালা আদ্‌মি!'
তারই মধ্যে ডাক পড়ে কালাদের, মরতে হবে যখন,
বিরাট সাগর দুটো হবে মেলাতে
কাটতে হবে পানামা খাল, মরতে মরতে,
'যো হুকুম হুজুর' কালা মজুরের এক কথা।
সাগরে সাগরে দেশে দেশে হ'ল ত যোগ
মানুষে মানুষে যোগটা দাঁড়াল কোথায়?
জেতা হলেই মান্‌তে হবে তার সব দাবী সব অন্যায়
অবিচার?
চা আর টিকিট আইনের যুগে উড়িয়েছিলে আমেরিকা
ন্যায্য দাবীর ঝাণ্ডা—
তোমার ওয়াশিংটন জেফারসনের দল
জয়ডঙ্কা বাজিয়েছিল সাম্য স্বাধীনতার,
চম্‌কে উঠেছিল সারা ইউরোপ
তোমার ঘরানা ইংরেজও বুঝেছিল, জেগেছে নতুন জাত
গাইছে নতুন সুর গড়ছে নতুন রাষ্ট্র, নতুন মানুষ।

থোরো এমারসনের রচনায় মিতালি করেছ ভারতের সঙ্গে
ভারতের এক স্পর্শ বরেছিল তোমার প্রাণ,
তাই ত লিনকনের যুগে তুলেছিলে বড় প্রশ্ন
অনেক রক্তপাত অনেক ক্ষতি সয়েও সত্য রক্ষা
করেছিলে তুমি—
চামড়ার রঙ যাই হোক, মানুষ যখন, দাস থাকবে
নাক আর।
তাই হুইট্‌মানের গলায় বেজেছিল মহামানবের উদাত্ত
সঙ্গীত।

তার পর অর্দ্ধশতাব্দী হ'ল পার—কতটা এগিয়েছ
আমেরিকা ?
তোমার হাতে মুক্ত, তোমার দুঃখসুখের সাথী নিগ্রো
একসঙ্গে পায় না খেতে পড়তে খেলতে,
তাকে লিঞ্চ্ করতে আইনে বাধলেও মানুষে বাধা দেয় না!
বিশ্বধর্ম্মাধিকরণে বসছে তোমার নেতারা
বিশ্বপ্রেম প্রচার করছে অনেক লোক
বিশ্বমৈত্রীর জন্যে ঢাল্‌ছ অনেক ধন, তারিফ করি
তোমায়,
কিন্তু ঘরের ভিতর মানুষ যদি হয় লাঞ্ছিত নিষ্পিষ্ট
সাম্য যদি হয় মিথ্যা, আইন পারবে না সাম্‌লাতে
তোমার সমাজ

কুরুক্ষেত্র বাধ্‌বে আবার
রক্তে ভাসবে সোনার দেশ
শাদার স্বর্গ থেকে যাবে অলীক স্বপ্ন
সব মানুষ নিয়ে মাটির ধরাকে মন্দির না করলে।

দক্ষিণ-আমেরিকা

(রিকার্দো গিরালদেস্ স্মরণে)

শ্রীকালিদাস নাগ

সুন্দরী তরুণীর মত দাঁড়িয়ে আছ ললিত ভঙ্গীতে
লাতিন আমেরিকা,
একদিকে প্রশান্ত সাগর অন্যদিকে অশান্ত অতলান্তিক
ঝাঁপিয়ে পড়ছে আলিঙ্গন করতে তোমায়
পূব পশ্চিমের অভাবিত মিলন হবে নাকি তোমার বুকে ?
বিরাট পাম্‌পা-প্রান্তর আঁচলের মত বিছিয়ে দিয়েছ ডাইনে
বাঁয়ে
পুরান পৃথিবীর বাছ-পড়া উদ্‌বৃত্ত তাড়িত মানুষদের আশ্রয়
দেবে বলে ?
অজ্ঞাত যুগে এসেছিল পূব-সাগর বেয়ে লাল মানুষ
তাদের রক্তে তোমার মাটি হয়েছে উর্ব্বর
তোমার বরবপু নব তেজে তরঙ্গিত।
পুরান মানুষের পাল মরতে মরতে নিয়েছে আশ্রয়
পাহাড়ে জঙ্গলে পারাগোয়াই ব্রাজিলের ভিতরে
ভুলে গেছে তাদেরই প্রাচীন পেরু গড়েছিল আদিম সভ্যতা।

মরা মানুষের সাজ শিল্প পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—
যাদুঘর ভরে।
উত্তুঙ্গ আন্দিস্ হয়ত আজও সাক্ষী দেবে
সেই অতীত বিস্মৃত আমেরিকার ;—
তল্‌তেক্ আজ্‌তেক্ ইন্‌কা—কত বিচিত্র সভ্যতা হয়েছিল
গড়া,
সুদূর মেক্‌সিকো থেকে পেরু সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত
পিরামিডে মন্দিরে ফুটেছে বিলুপ্ত মানুষের বিস্মৃত কারু শিল্প
যে জন্তু তা'রা করেছিল শিকার
ঘটে পটে এঁকে গেছে তার আশ্চর্য্য প্রতিকৃতি
প্রিয়তমার গলায় পরিয়েছিল বিচিত্র হার
স্বর্ণমণিতে ঝল্‌মল্ করে আজও যাদুঘরের তাকে।
কোথায় প্রেমিক কোথায় প্রিয়তমা !
দুর্ব্বল পেলব প্রাণ পরাস্ত হয় প্রচণ্ড শক্তিমানের কাছে
কাব্‌রাল্ মাঘেলান্ পিজারোর প্রতাপ
নতুন করে গড়েছে এই দেশ
বিলুপ্তপ্রায় পুরান মানুষের কণ্ঠ প্রায় শোনাই যায় না।

জেতাদের ইতিহাস জাগিয়ে রেখেছ দু'টি মধুর ভাষায়
তুমি লাতিনা !
মরাল গ্রীবা বাঁকিয়ে কখন বল হিস্পানী কখন পর্ত্তুগী—
দুই মিঠে লাগে ;
ঠোঁটের আগে গানের মতন বাজে তোমার আলাপ
গা-ভাসান্ দিয়ে উজিয়ে চলেছি—
ব্রাজিল-সড়কের ভিড় বেয়ে
রাস্তায় রাস্তায় বিচিত্র রূপের চিত্রশালা
নরনারীর মুখে—অবাক হয়ে চাই—
শাদা কালো লাল মানুষ মিলেছে মিশেছে
এগিয়ে চলেছে হাত ধরে
নাই ব্যবধান নাই ঘৃণা উদার ব্রাজিলের বুকে
সারা জগতের মানুষ—বিশেষ করে' শাদা জগতের রঙচরান
মানুষ

হয়ত একদিন আসবে দেখতে শিখতে
অচ্ছুৎমার্গী ব্রাজিলের অবদান
সমান অধিকার, অসীম সম্ভাব্যতা।

হিস্পানী ভাষায় আলাপ করছ আবার দেখি, লাতিনা!
কালো চুলে পরেছ ফুল
কাজল-হারা চোখে কালো বিদ্যুৎ
বেদুইন প্রেমের প্রচণ্ডতা হয়ত এনেছ বয়ে উষ্ণ রক্তের মধ্যে।
খোলা সবুজ মাঠে কচি ঘাসের জাজিম পাতা,
গেঁয়ো গায়েন ধরে মেঠো গান
জাগিয়ে তোলে তোমার পায়ে নাচের পরে নাচ
ভুলিয়ে দেয় পূব-পশ্চিমের প্রভেদ।
সাদাসিধে গাঁয়ের মানুষ দেখায় ঘোড়া দেখায় বাছুর গরু,
খাওয়ায় প্রচুর দুধ ক্ষীর, 'দুল্‌চে দে লেইচি'
আমার দেশের গরুচোর আর ননীচোরের কথা
শোনাই যদি, অবাক হয়ে বলে
'এ যেন ঠিক আমাদেরই 'গাউচো' ভায়া
গিরালদেসের নিপুণ পটে আঁকা।'

আসে ফেরার পালা
টিকিট-পত্র বাক্স-প্যাটরা ওলট পালট চলে
পূবের মানুষ ফিরছে শেষে পূবের দিকে
জেটি থেকে সিটি মারে জাহাজ
বিদায় নিতে বন্ধু-জনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাই
এই বিদেশে দুচার দিনের চেনাশোনার শেষে
লুকিয়ে ঝরে বাঁধনহারা চোখের জল।
সন্দেহ হয়—মানুষ বোধ হয় সব দেশেতেই এক
জাতির দর্পে শক্তি-মোহে বন্দী মানুষ
একটু মুক্তি পেলে
সহজ হয়ে মিল্‌তে ছুটে আসে;
এই কথাটাই আজ—
বারে বারে জাগে কেন? জানি না ত
আর্জাস্তিনা!
বোধ হয় আছে ভাবী-কালের সঙ্কেত
উদাস করা তোমার দিগন্তের উদার বুকে।

অপরিবর্ত্তনীয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুমন্ত্র কত দিন পরে গ্রামে ফিরছে। যেখানে জীবনের প্রভাব কেটে গেছে কত কি স্বপ্নজাল বুনে, সেখানে আজ দীর্ঘ বারো বছর পরে।

রাঙা সরু পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। দু-পাশে কোথাও মেহেদীর বেড়া, কোথাও আম জাম কাঁঠাল বট বা অশথ গাছের ঠেলাঠেলি, কোথাও বা ঘেঁটু শেয়ালকাঁটার ঝোপ-ঝাপ। অপরাহ্নের মৃদু অস্পষ্টতা পথে এসে নেমেছে।

পশ্চিম আকাশের বর্ণচ্ছটা তার মনে বুঝি রং ধরিয়ে দিল। এ পথে চলতে কত কথাই তার মনে জাগছে আজ; সে ভাবছে, গ্রামখানা কত ছোট হয়ে গেছে এ ক-বছরে। গাছগুলো ত তেমন সরল ভাবে [illegible] শাখাপ্রশাখা মেলে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে নেই, ওগুলো অমন ঝুঁকে পড়ল কেন? ঐ সেই কাঁকন-দীঘি, সাঁতার দিয়ে দীঘিটা পার হ'তে হাত-পা অবশ হয়ে পড়ত তখন, ওর কালো স্বচ্ছ জলে নীল আকাশের ছায়া প'ড়ে পাতালরাজ্যের রাজকন্যাদের নীলকান্তমণির প্রাসাদের কথা তাকে মনে করিয়ে দিত, —এখন ওর পরিসর কত সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

কত বড়, কি বিরাট দেখাত ঐ বটগাছটা তখন। ঝুরিগুলো ছায়াধূসর গোধূলির আলোয় যেন কয়েকটা কালো কালো সরলরেখা। এখন ওগুলো মাটির বুকে নেমে গিয়ে রস শুষে নিচ্ছে—বাতাসের দোলাতেও নিশ্চল। তখন ওরা শিশু ছিল—ব্যগ্র আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলে হালকা হাওয়ায় সহজ চাঞ্চল্যে নেচে উঠত মানবশিশুদের সঙ্গে লুকোচুরি-খেলার ছলে। আজ এরা মাটির মধ্যে শেকড় চালিয়ে দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে অনমনীয় ভঙ্গীতে। ঝড়-বাদলে এদের এখন নাড়া দিতে পারে না। এদের শিশুবৃত্তি ঘুচে গেছে।

এই নিঃসঙ্গ সরু পথটা, তখন এটার অপর প্রান্তের সীমারেখা লুপ্ত ছিল ওর মনে। এর বাঁকে বাঁকে কত লুকানো রাজ্যের সন্ধানে মন তার ফিরত শৈশবে। বনফুলের

মৃদু সুরভি মনে হ'ত যেন এই পথেরই অঙ্গসৌরভ। সকাল-সন্ধ্যের আবছায়ায় এ পথের জনশূন্যতা অদৃশ্য জগতের ছায়ায় উঠত ভরে।

পুরনো বসতবাড়ীটায় চুণ-বালি খসে গিয়ে হয়ত বার্দ্ধক্য এসে গেছে। চার-পাশে আগাছার জঙ্গল নিবিড় হয়ে গেছে এত দিনে, হয়ত চেনাই যাবে না। বাড়ীটার দোতলায় একটা ছোট্ট ঘর ছিল—সেটা ছিল তার পড়ার কুঠুরি। সেখানে ব'সে কত দিন ও রাত কত ভাবনায় তলিয়ে গেছে তার মন। সে ভাবনার ছোঁয়াচ এখনও হয়ত লেগে আছে ঘরের দেয়ালগুলোয়, সবুজ শ্যাওলার মত।

মিত্তির-পুকুরের ঘাটটা শেষে আঘাটায় পরিণত হয়েছে! ওর ধাপগুলো ভেঙে গেছে একেবারে। ওইখানে ব'সে ব'সে বন্ধুদের সঙ্গে কত রাজ্যের কত কথা কয়েছে সে। এখন তারা কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে কে জানে! ফুটবলের হার-জিত, সেক্‌রাপাড়ায় আগুন নেবানো, মুচিপাড়ার কলেরা ও বসন্ত, লাঠিখেলায় গোরাচাঁদের নিপুণতা ··ইত্যাদি কত কি গম্ভীর আলোচনায় ঘাটের আশপাশের হাওয়া যখন ভারী ও গমগমে হয়ে উঠত তখন পুকুরের জ'লো হাওয়া মৃদু শীতল নিঃশ্বাসে সে ভাবটা দিত হালকা ক'রে।

সুমন্ত্র ভাবছে, সব বদ্‌লে গেছে। মাত্র কয়েকটা বৎসরের ব্যবধানে এ কি পরিবর্ত্তন? তার মনের মায়া-বুলানো পুরনো স্মৃতির সঙ্গে সব কিছু আজ ঠিক মিলছে না যেন। গ্রামখানার যে-ছবি তার চিত্তভূমিকায় ভাগ্যবিধাতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার শৈশবস্বর্গে, তার মধ্যে ছিল বিশাল উদারতা, সংকীর্ণ স্বল্পতার ধারণা তাতে ত ছিল না।

এখানে আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্থিরই ছিল না যে সে এখানে আসবে। তবু এসে যে এত সব পরিবর্ত্তন সে দেখতে পাবে তা মনে হয় নি। কালের রথযাত্রায় তার পুরনো ভাবনা-বেদনার কল্পনাস্বপ্নের কুসুম গিয়েছে পিষ্ট হয়ে।

গ্রামখানা যেন শবরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল, কবে তার প্রিয়বল্লভ রামচন্দ্র আসবে, যখন শেষে দয়িতের দেখা মিলল, তখন শুকিয়ে ঝরে গেছে তার বিকশিত যৌবন।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করার পর থেকে সুমন্ত্রকে সরকারী কাজে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে অনেক দিন ধ'রে। আজ সহসা ট্রেন থেকে এই ষ্টেশনে নেমে পড়তে কেন তার অকারণ একটা ভাবপ্রবণ কৌতূহল হ'ল, তা সে নিজেই জানে না। এত কাছে এসে পড়েছে, আর একবার এই পুরাতন লীলানিকেতনের সংবাদ না নিয়ে ফিরতে তার ইচ্ছে হ'ল না। মাত্র ঘণ্টা দুই কি তিন, তার পরই ত আবার এই গতিশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে চলা; ক্ষতি কি?

পথে নিপু সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুমন্ত্রকে সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। তার পর খবর দিতে ছুটল আর সবাইকে।

নিপু ছেলেবেলায় ভারী ঝগড়াঝাঁটি করত। এখনও ওর ঠোঁটের তলায়, ভ্রুর ওপরে দস্যিপনার দাগ মেলায় নি। কয়েকটা বছর, আর একটি গৃহিণী, তাকে কিন্তু এখন বেশ সভ্যভব্য ক'রে তুলেছে। ছোট একটুখানি জমিদারী তদারক করে, আর অবসর-সময়ে তাসপাশার আড্ডা বসায় বাড়ীতে।

ছোট্ট তরুর সঙ্গে তাহ'লে নিপুর বিয়ে হয়েছে?—সুমন্ত্র মনে মনে খুশী হয়ে বললে, বেশ! তরু শ্যামল চারাগাছটির মত ছিল ছোট, চিকণ ঢলঢলে ছিল মুখখানা। ঠোঁট দুটি পুরন্ত, লক্ষ্মীমন্ত। হাসি আর কান্নায় তার চোখের রংটাও যেন বদলে যেত। মুখে ছিল না ভাষা, চোখেই কথা কইত। কেমন একটা ভালমানুষি ভাব ছিল তার চোখে মুখে, যেন তার অতি বড় মিথ্যে কথাটাও অবিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হ'ত না। সুমন্ত্রের এক সময়ে ওকে ভারী ভাল লাগত। বারো বছর আগেকার ঐ তরুকে।

সময়ের অতিপাতে সে-তরুর এখন ভিন্ন রূপ। সে এখন কথা কয় যেন গ্রামোফোনের মত। যত ক্ষণ কিছু বলবার থাকে, তত ক্ষণ ত বকেই, বলবার কিছু না-থাকলেও বিরাম নেই। বুদ্ধির চাষ নেই মগজে, কাজেই বোঝে কম, আবার যা বোঝে না তা নিয়ে করে তর্ক আর বাধায় গোল। তনুদেহের সে সূক্ষ্ম সীমারেখা নেই, অতিমেদভারে চাঞ্চল্য তার মরে গেছে অকালে।···

পরিচিতের দল প্রায় সকলেই এসে জুটল নিপুর বাড়ীতে। ভানু, অনু, দীপু, হেমা ইত্যাদি দু-চার জন বাল্য সখা ও সখীদের দেখে মনে হ'ল যেন এরা ভিন্ন জগতের লোক। ওরা কেউ বাবা, কেউ মা,—কঠোর কর্ত্তব্য ক'রে ওদের মুখ কি গম্ভীর হয়ে গেছে! তারই শুধু ভবঘুরে-বৃত্তি ঘুচল না, চোখে তার লাগল না সংসারের মায়াঘোর।

গাঁয়ের ছেলেবুড়ো অনেক এল খবর পেয়ে। শুনেছে গাঁয়ের ছেলেটি কোথাকার হাকিম হয়েছে, তাই তাদের ঔৎসুক্য জেগেছে। কিন্তু ঐ-সব মুখের সঙ্গে সুমন্ত্রের যেন স্পষ্ট পরিচয় নেই। ঘুমন্ত স্মৃতির মধ্যে খুঁজতে লাগল সে ওদের পুরনো চেহারাগুলো।

সবাইকে ডেকে নিপু বললে, "ও নিমাই খুড়ো, ও নানু দাদা, জান ত আমাদের সুমন এক জন ডাকসাইটে হাকিম। কত দিন পরে দেখা, আমি কিন্তু মুদীপাড়ার রাস্তায় ওকে দেখেই চিনতে পারলাম। কেমন? নয় রে সুমন? তুই কিন্তু বিশেষ বদলে যাস নি, শুধু সাহেবদের মত একটু ঢ্যাঙা আর ফরসা হয়েছিস। বেশ আছিস, না রে সুমন?"

তার ওপর সকলের প্রসন্ন দৃষ্টি—সুমন্ত্র মৃদু হাসলে। বললে, "তাই মনে হচ্ছে নাকি ?"

পিঠ থাবড়ে দিয়ে নিপু হেসে বললে, "হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তাই ত। আচ্ছা, সুমন, এদিকে তাকা ত, এদের সবাইকে চিনতে পারছিস ?"

সুমন্ত্র সেদিকে তাকাল, দেখল, ওরা ব'সে ব'সে হাসছে মৃদু চাপা হাসি। বাঁ-দিকে ওই যে বেঁটে ফর্সা লোকটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে, ওই ত হেমা ? স্কুলে ধারাল ছেলে ব'লে হেমাঙ্গের খ্যাতি ছিল। এখন কি করছে কে জানে ? একখানা অপরিচ্ছন্ন শাড়ী প'রে, গিন্নিবান্নির মত চেহারা, উনি কে ? সুমন্ত্রের মনে ওদের যে চিত্র ছিল তা কি ক্রমে মুছে যাচ্ছে ? না, ওরাই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভেসে ভেসে কোন্ দূরে গেছে যেখানে তার দৃষ্টি আজ ব্যাহত ?

"অমুকে চিনতে পারছ, সুমনদা ?" ব'লে তরু নূতন ক'রে সকলের পরিচয় দেবার জন্যে এগিয়ে এল।

"নিশ্চয়ই পেরেছি, কি বলছিস তরু! তা আর পারি নি ?" সুমন্ত্র মিথ্যে ব'লে ফেলল ধরা পড়ার লজ্জায়।

"কই, দেখাও দেখি, ভাই!" ব'লে তরু সুমন্ত্রের পাশে এসে দাঁড়াল।

সুমন্ত্র যেন প্রথমটা দিশেহারা হয়ে গেল। একটি স্বল্পকেশা, শীর্ণা বিধবা মেয়ে তার দিকে এগিয়ে এসে হেসে ফেল্‌ল, "ছিঃ সুমনদা, আমায় ভুলে গেলে ভাই ? বরাত আমার।"

"সত্যি, ভুলি নি রে অনু, প্রথমটা বুঝতে পারছিলাম না ঠিক্, তার পর···" ওর দিকে চেয়ে চেয়ে সুমন্ত্রের চোখে ভেসে উঠল অনুপমার কিশোরী মূর্ত্তিটি। সত্যি সে ভোলে নি একেবারে। পাঠশালার ছেলেমেয়েদের ওই যে ছিল সর্দ্দারণী। গেছো মেয়ে বলত ওকে সবাই। একবার সুমন্ত্রকে ও বেত খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। দেখতে খুব সুন্দরী না হোক, ওর মুখে চোখে একটা জলজলে ভাব তখন ছিল—যেটা এখন নিবে গেছে সংসারের দুঃখ তাপে। কত কথাই মনে মনে সুমন্ত্র ভাবছিল। ওদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

ওদের সঙ্গে মন খুলে সে আলাপ করতে পারে না। কেমন যেন একটা অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব। অনুদার, সঙ্কীর্ণ মন তার। ওরা ত বেশ সহজ, সরল ; সে কেন নিজেকে এমন গুটিয়ে নেয় ? এত দিন পরে গাঁয়ে ওরা বাস ক'রে আসছে, গাঁয়ের অন্তঃপ্রকৃতি যেন ওদের অস্থিমজ্জায় আশ্রয় নিয়েছে। বাইরের জগৎ ওদের কাছে হয়েছে বিলুপ্ত—ওদের দৃষ্টিতে তাই রোমন্থনকারী গ্রাম্য গাভীর শ্রান্ত ক্লান্ত চোখের আভাস ধরা পড়ে। ওদের দোষ কি তাতে ? ওদের যৌবন-চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে গেছে, ওরা যেন জীবনের দুর্গম পথে আর এগোতে পাচ্ছে না।

পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম,—সুমন্ত্র ভাল ক'রে আজ উপলব্ধি করছে।

কত কথাই ওরা কয়ে চলেছে। তার জটিলতা থেকে তরুর একটি কথা মুক্তি পেয়ে সুমন্ত্রের কানে বাজল।

"দেবীর কি হ'ল, বল ত! এল না যে বড় ? নিধুরামকে দিয়ে খবর পাঠালুম।"

"দেবী ?"—অজ্ঞাতসারে সুমন্ত্রের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

নিপুর স্ত্রী তরু ওর অন্যমনস্ক ভাব দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। মাংসল মুখের স্থূল হাসি ধীরে ধীরে সাম্‌লে সে তার পর বললে, "বেশ, সুমনদা, কত কথাই আমরা বলাবলি করলাম, কিছু শোন নি ত ? দেবী, দেবী, মনে নেই বুঝি ? হাসছ যে, বুঝেছি। হ্যাঁ, দেবী এই গাঁয়েই থাকে—ওই একটেরে। ওর স্বামী পাশের ঐ মালঞ্চ-গাঁয়ের জমিদারী পেয়েছে, মামার বাড়ীর বিষয়। ওরা শহরেও যায় মাঝে মাঝে বেড়াতে। কেমন দুটি ফুট্‌ফুটে ছেলে হয়েছে, ভারী চঞ্চল আর সুন্দর। ওকে দেখতে তোমার ইচ্ছে হয় না, সুমনদা! বিয়ের পর ও কত কান্নাই কাঁদল!

দেবযানীকে সুমন্ত্র ভোলে নি, কোন দিন পারবেও না। এত কাছে এখানে থাকে ও, তবু দেখা হ'ল না।

ওদের কথা চলেছে। সুমন্ত্র মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছে ; হাসছে, মাথা নাড়ছে, যন্ত্রের মত সব শুনছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে সে চলে গেছে, অন্য জগতে, যে-জগতে আছে, একসঙ্গে বসন্তের লঘু বাতাস ও শরতের সোনালী আলো।

একটা নাম যেন যাদুমন্ত্রে তাকে পুরনো দিনের সৌরভ এনে দিলে।

দেবযানীদের বাড়ীটা ছিল তখন স্বচ্ছতোয়া পিয়ালী নদীর ধারে। নদীটার পাশে পাশে যে রাঙা মাটির পথটা চ'লে গিয়েছে গাঁয়ের স্কুলের দিকে, সেই দিক দিয়ে সুমন্ত্র বই হাতে চলছিল শরৎকালের এক প্রসন্ন প্রভাতে। বাড়ীর বাইরের দিকে একটা ফুলের বাগান। সেখানে ভিজে এলোচুলে কিশোরী দেবযানী পিয়ালীর স্বচ্ছ জলের দিকে চেয়ে আনমনাভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিন তাকে দেখে সুমন্ত্রের মনে হয়েছিল, মেয়েটি যেন পদ্মগন্ধি। সূর্য্যের সোনালী আলোয় সেদিন তার কুন্তলদল পদ্মদলের মত ঝলমল করেছিল অপূর্ব্ব দীপ্তিতে।

তার আগেও সুমন্ত্র তাকে কতবার দেখেছে, কত কথা বলেছে। কিন্তু ঐ এক পরম শুভক্ষণে ওকে অমন সুন্দর কেন দেখাল, তার কারণ সুমন্ত্র খুঁজে পায় নি। ফুলের কুঁড়ির মত কি ক'রে এক রাত্রে মেয়েরা ফুটে ওঠে, এটা তার কাছে একটা চিরন্তন রহস্য।

দেবযানীর বাবা সুরথবাবু শেষ-বয়সে তাঁর মাতৃহারা কন্যাটিকে নিয়ে এই গাঁয়ের শান্তস্নিগ্ধ অঞ্চলে বাস করবার জন্যে এসেছিলেন শহর থেকে। বাড়ীটা তাই করেছিলেন গাঁয়ের এক সীমান্তে, লোকালয় থেকে একটু দূরে। ভদ্রলোক বড়ই অমায়িক-প্রকৃতি, কাজেকর্ম্মে সবাইকে তিনি বাড়ীতে ডাক দিতেন।

সেদিন তাঁর বাড়ীতে কি একটা উৎসব বা ক্রিয়াকাণ্ড। বহু লোকের সমাগম হয়েছে। গাঁয়ের সকলেই ত এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে, শহর থেকেও বহু ভদ্রলোকের আগমন হয়েছে। সুমন্ত্রও এসেছিল কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে। নিমন্ত্রণ রাখতে এসে দেখল কর্ম্মবাড়ীর কাজের ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলা নেই—তখনই নিজে কাজে নামল যেন ঘরেরই লোক। ভদ্রলোকদের আদর-অভ্যর্থনা, তাঁদের আহারের ব্যবস্থা, সব কাজেই ও গেল এগিয়ে। যে কোন সমস্যা আসে, সুরথবাবু হাঁকেন, সুমন; অগাধ বিশ্বাস তাঁর ওর ওপর।

কাজকর্ম্ম চুকল একটু রাত্রে। কর্ম্ম-অন্তে ক্লান্ত শরীরে দোতলার খোলা ছাদে একটু বাতাস পাবার জন্যে সুমন্ত্র বারান্দা পেরিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ চোখে পড়ল, বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে কারা দু-জন হাসছে আর গল্প করছে, দেবযানী, আর সুরথবাবুর কোন আত্মীয় এক যুবক। সুমন সেখানে আর দাঁড়াল না,—দ্রুতপদে চলে গেল ছাদের দিকে, যেখান থেকে পিয়ালী নদীর জ'লো বাতাসটা চোখে-মুখে এসে লাগে। উদাস চোখে, ভারাক্রান্ত মনে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ সেখানে সে জানে না। কামিনীফুলের ঝাড় থেকে তীব্র একটা গন্ধ এসে তাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

"সুমনদা, তোমার খাওয়া হয় নি ত? খাবে এস।"—দেবযানী এসে ডাকল।

সুমন্ত্র নির্ব্বাক, নিরুত্তর। পিছনে যে দেবযানী এসে কখন দাঁড়িয়েছে তা সে জানতে পারে নি প্রথম, জানতেও যখন পারল তখন চোখ ফেরাল না সেদিকে। অহেতুক দুর্জ্জয় অভিমানে তার বুক যেন তোলপাড় করছিল।

"সুমনদা, আমার ওপর রাগ করেছ?" ধীরে ধীরে দেবযানী এসে তার হাত ধরল। শিউরে উঠে বোবার মত চাইল সুমন্ত্র ওর দিকে নিষ্পলক অর্থহীন চোখে।

"কেন? কি করেছি আমি? বল না, বলবে না?" দেবযানীর ঠোঁট শুকিয়ে গেল, চোখ দুটো অশ্রুর আভাসে ঝাপসা হয়ে এল।

"কি হয়েছে? হয় নি ত কিছুই। একটু ফাঁকা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালুম এই ত সবে।"

"বুঝেছি, চল, খেতে হবে না বুঝি?...কি বোকা তুমি সুমনদা, একটুতেই রাগ কর"—সূক্ষ্ম পরিহাসে চটুল, বুদ্ধির আভায় দীপ্ত একটা কটাক্ষ পাত ক'রে দেবযানী সুমন্ত্রের হাত ধরে টানল—সুমন্ত্র তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেলল। হাসির হাওয়ায় তার মুখের কালো মেঘ গেল স'রে।...

তার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

আর এক দিনের কথা। সেদিন বিকেলের দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। অপরাহ্ণের মৃদু রক্তাভ আলোয় পৃথিবীর বুকে যেন ক্ষণিক স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে। মেঘ আকাশের কোণে কোণে জমে আছে তখনও। বর্ষণ-সম্ভাবনায় মন্থর মেঘের ওপরে সেই আলো এসে পড়াতে আকাশের মুখটাকে যেন মৃত পাণ্ডুর ব'লে বোধ হচ্ছে। আলোটা ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে আকাশের গায়ে গেল মিলিয়ে। আবার ঝুপঝাপ বৃষ্টি সুরু হ'ল। বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবযানী আকাশের ভাবটা লক্ষ্য করছিল। সুমন্ত্র এল ভিজে ভিজে।

"ভিজেছ ত খুব, আচ্ছা ছেলে যা হোক, ভিজে আসতে কে বলেছিল? শোন এদিকে!"

এগিয়ে এসে দেবযানী হাত দিয়ে সুমন্ত্রের জামাটা পরীক্ষা করল — "ছেড়ে ফেল এগুলো।"

"না, না, ভিজি নি মোটেই, ব্যস্ত হয়ো না; আর ভিজলেই বা...কাকাবাবু কোথায়?"

"ঘরে ব'সে আলো জেলে পড়ছেন।"

"চল ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, আমি ত কাল যাচ্ছি!"

"হ্যাঁ, যাই, দাঁড়াও না একটু এখানে।"

দু-জনে নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ জুড়ে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। রাস্তাঘাট বুঝি ডুবে যায়। অন্ধকারও চার দিক ছেয়ে ফেলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠাহর করা যায় না। কোথাও একটু আলোর রেখামাত্র নেই। কতক্ষণ কেটে গেল, কেউ কথা কইল না। দেবযানী গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে সুরু করল—

> কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
> বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো...

নদীর বুকে আকাশটা কি আজ ভেঙে পড়বে? খালি ঝুপঝাপ ঝুপঝাপ—অবিরাম জলধারার পতনধ্বনি, সেই সঙ্গে ভেকের কলরব। অদূর মন্দির থেকে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ক্ষীণ হয়ে কানে বাজছিল।

"কাল যাব, দিবু।"—সুমন্ত্র প্রথম কথা কইল।

"কত দিন থাকবে সেখানে?"

"কি জানি!"

"আমার জন্তে তুমি একটুও ভাববে না, আমি জানি।"

"জান? তবে ত ভালই হ'ল!"

"তোমার কি বল না? শহরের কত নতুন মানুষ, নতুন জিনিষের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার প্রতিদিন। হয়ত কত নতুন মেয়ে…"

"তাদের দিকে…আমি?…কি বলছ তুমি?"

"না, না, আর বলব না, রাগ করলে?"—দেবযানী সুমন্ত্রের কাছে এসে দাঁড়াল; নখ দিয়ে তার পাঞ্জাবীর বোতামটা খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে বললে, "সত্যি, রাগ করলে?"

সুমন্ত্র কথা কইল না। দেবযানীর দিকে শুধু একবার চাইল। অন্ধকার ভেদ ক'রে মেয়েটির চোখ দুটি যেন জল-জল করছে। চোখে ওর ভরা-গাঙের মত বর্ষার জল ছাপিয়ে আসছে। মৃদু মৃদু আঁখিপল্লব কাঁপছে।…

সে দৃশ্য ত আজও সুমন্ত্র ভুলতে পারল না।

সুমন্ত্র গেল, কিন্তু আর ফিরল না। জীবনের জোয়ার তাকে বয়ে নিয়ে গেল দূরে, আরও দূরে।…

কত দিন, কত রাত কেটে গেছে তার পর। সময় যেন হাল্‌কা পাখায় উড়ে গেছে অনন্তে। এখনও মনে হয় যেন সেদিনকার কথা।

দিবাস্বপ্ন দেখছিল সুমন্ত্র এতক্ষণ।

ওকে দেখতে যারা এসেছিল, তাদের অনেকেই চলে গেছে ইতিমধ্যে। আলাপ-আলোচনাও এসেছিল স্তিমিত হয়ে। সহসা যেন নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে এমন ভাবে চেয়ে সুমন্ত্র দাঁড়াল। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, "দেখ, ভাই নিপুদা, এখন চলি, আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে; সাড়ে আটটার ট্রেন না ধরলেই নয়। সাড়ে আটটা ত বাজে।"

"বা রে! দেবীর সঙ্গে দেখা করবে না?" তরু বললে।

"না, ভাই, থাক; কাজ আছে দরকারী। আসি, মনে কিছু ক'রো না যেন।"

তরু, অনু, ভানু তাকে প্রণাম করতে আসছিল; ওদের অবসর না দিয়েই, পিছন ফিরল সুমন্ত্র, ছুটে চলল সে ষ্টেশনের পথে।

রাস্তা দিয়ে চলেছে সে, অন্ধকারে। ভাবছে, দেবযানী না এসে, না দেখা দিয়ে ভালই করেছে। যৌবনের যে অতুলনীয় ছবি আঁকা আছে তার মর্ম্মপটে, তাকে সে দেবে না মলিন হ'তে কোনক্রমে। থাক তা অক্ষয় হয়ে সকল দৃষ্টির অন্তরালে, গোপন মর্ম্মকোষে। জগৎ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে; গ্রামটা বদলে গেছে কত রকমে, সবাই বদলে গেছে এখানকার। কিন্তু দেবযানী? অন্য সবাইকার মত সুমন্ত্র ওকে অতিক্রান্তযৌবনার বেশে চায় না দেখতে। এখনও যে সেই দেবীমূর্ত্তি পুষ্পিত কেশভার শিরে, যৌবনের রক্তরাগ-রঞ্জিত দেহে, হরিণের মত তৃষ্ণার্ত্ত চোখ দুটি মেলে মনের মন্দিরকে আলোকিত ক'রে বিরাজ করছে অপরিবর্ত্তনীয় রূপে!

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৮

চা-পান ও আহারাদির পালা শেষ হইলে আমাদের যাত্রারম্ভের আয়োজন। গৃহস্বামী ছিলেন না, স্বামিনী তিন-চার সের সত্তু দিতে চাহিলে সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে তাহা বাঁধিয়া লইতে বলিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল না যে আমার ঐ হাল্কা বোঝা বহিতেই অবস্থা কিরূপ কাহিল, সুতরাং তাঁহার বোঝা ভারী হওয়ায় আমারটাও সেইরূপ দাঁড় করাইতে চাহিলেন। সত্তুর আশা শেষ পর্য্যন্ত ছাড়িতেই হইল, এবং তাহাতে তিনি চটিলেনও বিলক্ষণ, কিন্তু উপায় কি? যাহা হউক, রওয়ানা হওয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চা-কোরের নিকট পৌঁছান গেল। চা-কোর রাজবংশ এক কালে নিশ্চয়ই প্রবল প্রভাবশালী ছিল, নিকটস্থ পর্ব্বতের উপরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের প্রস্তরপ্রাচীর এবং দুর্গের ভগ্নাবশেষ তাহার সাক্ষীরূপে এখনও দণ্ডায়মান। কেল্লায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভাঙা মাটির দেওয়াল দেখা গেল, শুনিলাম আগে এইখানে চীন সৈন্যাবাস ছিল। তখন এই দিকে কড়া পাহারা ছিল, বিনা আজ্ঞাপত্রে কেহই সীমা পার হইতে পারিত না। চা-কোর গ্রামের কয়েকটি গৃহও তাহার অবস্থার ক্রমাবনতির পরিচয় দেয়। এখানে সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত ব্যক্তি ত ঘরে ছিলেন না, তবে অনেক বলা-কওয়ার পর আমরা থাকিবার অনুমতি পাইলাম। সন্ধ্যার পর অল্প অল্প শিলাবৃষ্টির পর সজোরে বর্ষণ আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে বাহিরের অঙ্গন জলে ভরিয়া গেল এবং মাটির ছাদ দিয়া যেখানে-সেখানে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধা গৃহস্বামিনী ফিরিল। সুমতি-প্রজ্ঞ তাহাকে চিনিতেন এবং আমার উপর চটিয়া থাকায় তাহার নিকট আমার নিন্দাবাদ শুরু করিলেন। আমি তাহাতে কিছু মনে করিলাম না, কেন না আমি জানিতাম তাঁহার মনটা ছিল সাদা।

এগারই জুন প্রাতে আমরা আবার চলিতে লাগিলাম এবং কিছু দূর পূর্ব্বমুখে যাইবার পর ফুঙ্ নদী পার হইলাম। নদীর স্রোত বিস্তৃত এবং তাহাতে জলও ছিল জঙ্ঘাপ্রমাণ গভীর। জল এতই শীতল যে মনে হইতেছিল পা বুঝি কাটিয়া যায়। অতিকষ্টে নদী পার হইয়া মেষপালকদের আড্ডায় গিয়া চা-পান করিলাম। আগেই বলিয়াছি এদিকে আমাকে বোঝা বহিয়া চলিতে হইতেছিল, উপরন্তু অন্য খাদ্যের অভাবে সত্তু খাওয়ায়—সত্তুতে আমার স্বভাবতই রুচি নাই—শরীরও দুর্ব্বল ছিল। পথে আর একবার চা খাইলাম। এখন আমি কেবল মনের জোরে পথ চলিতেছিলাম, পথে কয়েকটি ছোট গিরিসঙ্কট (লা) ছিল, দ্বিতীয়টি পার হইতে আমার আর শক্তি রহিল না। কতকগুলি অন্য লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কোর হইতে শে-কর্ জোঙে যাইতেছিল, তাহাদের একজন আমার বোঝা লওয়াতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম। আমার খালি হাতে চলিবার সামর্থ্যের অভাব ছিল না। পাহাড় হইতে নামিয়া একটি ছোট নদী পার হইয়া শুনিলাম সামনের ছোট পাহাড়ের ওপারেই শে-কর্ জোঙ্। পথে কিছুক্ষণ এক জায়গায় বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলাম। বেলা তিন-চারটার সময় শে-কর্ পৌঁছিলাম।

লঙ্কোরের লোকজন শে-কর্ গ্রামে যেখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিল, আমরাও সেখানেই রহিলাম। শে-কর্ গুম্বায় সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক ভিক্ষু ছিলেন, কিন্তু সুমতি-প্রজ্ঞ সেখানে যাইলেন না। আমার পা কাটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিবার সামর্থ্য ছিল না, সেইজন্য টশী-ল্হুন্‌পো পর্য্যন্ত ঘোড়া ভাড়ার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই চেষ্টায় এগারই হইতে চৌদ্দই জুনের দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কিছু ব্যবস্থা করা গেল না। প্রথম দিনই আমরা শে-কর্ মঠের অবতারী লামার নিবাস দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরটি সুন্দর মূর্ত্তিরাজি ও চিত্রপটে

সুসজ্জিত। লামা গৃহে ছিলেন না, তাঁহার গৃহ রাজপ্রাসাদ বলিলেই হয়। প্রাসাদের সম্মুখে সফেদার বাগান, এবং বাগান ফুলগাছের টবে সাজানো। তেরই জুন গুম্বা দেখিতে গেলাম। গুম্বা পাহাড়ের নিম্ন হইতে শিখর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট মঠ, তাহাতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত ভিক্ষু বাস করেন। ইহার মন্দির বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যময় দীপের আলোকে উদ্ভাসিত। এখানকার প্রধান পণ্ডিতের (কু-শোক্ থেম্বো) সঙ্গে—যদিও সুমতি-প্রজ্ঞের ইচ্ছা ছিল না—দেখা করিতে গেলাম, তিনি চীন সীমান্তের খাম প্রদেশের লোক এবং লাসার সেরা গুম্বায় শিক্ষিত। প্রথমে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তার পর তন্ত্র ও বিনয় সম্বন্ধে আলাপ হইল, আমি বলিলাম, "যেখানে বিনয় মদ্যপান, জীবহিংসা, স্ত্রী-সংসর্গ আদি বর্জ্জন করে, সেখানে তন্ত্রমতে ঐ সকল বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এইরূপ বিবাদী মত কিরূপে একত্রে চলিতে পারে ?"

লামা বলিলেন, "ইহার অর্থ, ভিন্ন অবস্থার লোকের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। যেমন রোগীর জন্য বৈদ্য অনেক খাদ্যকে কুপথ্য বলেন, কিন্তু রোগ উপশমের পর ঐ লোকই সেই খাদ্য ভোজনে উপকার পায়, তেমনি বিনয় সাধারণ লোকের জন্য ব্যবস্থা এবং তন্ত্র (বজ্রযান) তাঁহাদের জন্য যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন।"

পণ্ডিত মহাশয় আমাদের যাত্রার বাধার ব্যাপার শুনিয়া লাসা-যাত্রী এক ব্যাপারীকে ডাকাইয়া আমাদিগকে তাহার সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিলেন এবং আমাদের মোটঘাট লইয়া গুম্বায় চলিয়া আসিতে বলিলেন। পরদিন সেই ব্যবস্থানুসারে আমরা গুম্বায় আসিলে পর শুনিলাম সে সওদাগর চলিয়া গিয়াছে। নিকটস্থ এক খচ্চরওয়ালার কাছে গিয়া ভাড়ার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনও কিছু ঠিক হইল না, শেষে সুমতি-প্রজ্ঞ লঙ্কোরের এক ভিক্ষুকে (ঢাবা) বিনা-পয়সায় লাসা তীর্থ দর্শনের লোভ দেখাইয়া আমাদের সঙ্গে যাইতে রাজী করাইলেন।

১৪ই জুন দ্বিপ্রহরে ভিক্ষুর স্কন্ধে আমার বোঝা চাপাইয়া যাত্রা সুরু করিলাম। পথ একটি নদী পার হইয়া বামদিকে নিম্নাভিমুখী হইয়া অন্য এক নদীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিল। এই উপত্যকা বেশ প্রশস্ত, নদীর কিনারে ছোট ছোট বৃক্ষ, এখানে সেখানে ক্ষেতে বিঘৎপ্রমাণ যব ও গমের চারায় জলের সেচ—এই সব দেখিতে দেখিতে চারটা নাগাদ যে-রা গ্রামে পৌছান গেল। এখানকার এক ধনী গৃহস্বামীকে সুমতি-প্রজ্ঞ চিনিতেন, তাহার ঘর গ্রামের বাহিরে ছিল। সেখানে গেলে দেখা গেল গৃহের চারি কোণে চারটি বিশাল দেহ কালো কুকুর মোটা শিকলে বাঁধা রহিয়াছে। দূর হইতে ডাকাডাকি করিতে একজন লোক বাহিরে আসিয়া দ্বারস্থ কুকুরটিকে তাহার কাপড়ে ঢাকিয়া চাপিয়া ধরিলে আমাদের ভিতরে যাওয়া সম্ভব হইল। ভিতরে গিয়া লঙ্কোরের সেই লোকটি কাঁদিতে লাগিল, "আমার মায়ের আমি এক ছেলে, এই ভয়ানক কুকুর আমায় খেয়ে ফেল্লে মা না খেয়ে মরে যাবে।" তাকে সুমতি-প্রজ্ঞ ধমকাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা দেখিয়া তাহাকে যাইতে দিতে বলিলাম। বেলা অনেক দূর অগ্রসর, সুতরাং সে তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া প্রস্থান করিল। আমরা গৃহস্বামীর সঙ্গে ঘরের ভিতরের অংশে গিয়া চা-পানের উদ্যোগ করিবার সময় দেখিলাম যে সে সুমতি-প্রজ্ঞের ছয়-সাত সের সত্তুর থলিটিও লইয়া গিয়াছে। সুমতি-প্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ সে লোকের পিছনে ছুটিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, "ছেড়ে দিন, যা গিয়েছে গিয়েছে।"

সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন "তুমি সেদিন সত্ত নিতে দাও নি, আজ এটার সম্বন্ধেও আবার ঐ রকম কথাবার্ত্তা বলছ !"

আমি বলিলাম, "সে গিয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক, তাকে ধরতে ধরতে সে শে-কর্ পৌছে যাবে। আপনি সেখানে পৌছাবার আগেই রাত্রি হয়ে যাবে।" গৃহস্বামী আমাদের বাদানুবাদের কারণ শুনিয়া পাঁচ-ছয় সের সত্তু আনিয়া ধরিলেন, আমি তাহা দেখিয়া বলিলাম "এই নিন, যতটা গিয়েছে ততটা এসে গেল।" সত্তু দিবার পর তিনি একটু ঠাণ্ডা হইলেন। সেই ঘরে এক দরজী কাপড় সেলাই করিতেছিল, জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম যে শে-করের থেম্বো যে গ্রামের মোড়লের নামে ঘোড়া ঠিক করার জন্য চিঠি দিয়াছেন, এ সেই গ্রামের লোক। গৃহস্বামীর কথায় বুঝিলাম ঘোড়া বা মুটিয়া কোনটারই ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং শেষে আমি স্থির করিলাম সেই দিনই ঐ দরজীর সহিত তাহার গ্রামে যাইব। সূর্য্যাস্তের মুখে আমরা

রওয়ানা হইলাম, দরজী আগ্রহের সহিত আমার মোট নিজে তুলিয়া লইল। কিছু রাত্রি হইলে গন্তব্য গ্রামে পৌছিলাম এবং দরজী মুখিয়ার (মোড়ল) ঘর দেখাইয়া দিলে তাহাকে চিঠি দিলাম। সে চিঠি পড়িয়া বলিল, "এখন ত ঘোড়া নাই। কাল আপনার সঙ্গে লোক দিয়া লো-লো গ্রামে পাঠাইয়া দিব, সেখানে ঘোড়া পাওয়া যাবে।"

পরদিন অতি-প্রত্যুষে লোকের ঘাড়ে মোট দিয়া রওয়ানা হইয়া আটটায় লো-লো পৌছিলাম। বিশ-পাঁচশ ঘরের গ্রাম, কিন্তু ঘরগুলি সবই কাঠের অভাবে নিতান্ত ছোট। ঐ রকম ছোট একটি ঘরে আমাদের লইয়া মুখিয়ার লোক গৃহস্বামীকে মোড়লের অনুরোধ শুনাইল। চা-পান ইত্যাদির পর সে বলিল, "ঘোড়া পাওয়া যাইবে এবং ল্যাসে-জোঙ পর্য্যন্ত ভাড়া আঠার টঙ্কা।" এখানকার হিসাবে ভাড়া অধিক হইলেও আমি দিতে স্বীকার করায় সে তখনই ঘোড়া চরাইবার প্রান্তরে চলিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল যে এখন ল্যাসেতে বড় গরম, সেইজন্য ঘোড়ার মালিক অতদূর না গিয়া "চাসা-লা" পার করিয়া এক দিনের পথের এদিকে পর্য্যন্ত যাইবে। আমি তাহার ভাড়া এক কথায় স্বীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া ঘোড়া লইতে রাজী হইলাম না। লোকটি প্রথমে সৈনিক ছিল। তিব্বতে ছোট ভাই পৃথক বিবাহ করিতে পারে না, এ তাহা করায় অন্য ভাইয়েরা তাহাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় সে নূতন একটি ছোট ঘর বাঁধিয়া গৃহস্থালী করিতেছে। আমার কাজে ছুটাছুটি করার দরুণ তাহাকে কিছু পয়সা দিতে সে খুবই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময়ে খবর পাইলাম যে শে-কর্ হইতে ল্যাসে-জোঙ যাত্রী একদল ৭টি গাধা লইয়া এখানে আসিয়াছে। সুমতি-প্রজ্ঞ দরদস্তর করিয়া পাচ টঙ্কায় (প্রায় আট আনা) আমাদের মাল-পত্র ল্যাসে-জোঙ পর্য্যন্ত পৌছাইবার ভাড়া ঠিক করিলেন। গাধাওয়ালা সওয়ারীর জন্য একটি বড় গাধা ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু খালি হাতে হাঁটিতে আমার কোনও ভয় ছিল না, সুতরাং তাহা লইলাম না। রাত্রে আমরা দুইজন মালপত্র লইয়া গাধাওয়ালার আড্ডায় চলিয়া গেলাম।

১৬ই জুন রাত্রি থাকিতেই গাধার দল চলিতে লাগিল। গাধাতে লাসার জন্য নেপালী চাউল বোঝাই ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে নেপালী সওদাগরের রক্ষীরা দুই হাত লম্বা তলোয়ার বাঁধিয়া চলিয়াছিল। আমরা চড়াই পথে চলিয়াছিলাম। বেলা দশটায় খাওয়া-দাওয়ার জন্য থামা হইল এবং সে সময় গাধা-গুলিকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা চলিল, আমি ততক্ষণ চারিদিকে তুষার-দেশের মুষিকের দৌড়াদৌড়ি দেখিতে লাগিলাম। এই জীবগুলি আমাদের দেশের ক্ষেতের মুষিকের সমান বড়, কিন্তু ইহাদের লেজ নাই ও শরীর অতি নরম লোমে আবৃত। প্রাতরাশের পর গাধাগুলিকে ভিজান মটর কচ্‌লাইয়া খাইতে দেওয়া হইল এবং তাহার পর আবার চলা সুরু হইল। আমার হাত খালি, সুতরাং ষোল হাজার ফুট উচ্চেও চলিতে কষ্ট ছিল না, এবং সেইজন্য আমি সর্ব্বপ্রথমে পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। আমরা সেই প্রথম নদীর পাড়ে পাড়ে চলিয়াছি, এখানে নদী পর্ব্বত ছেদ করিয়া গিয়াছে, তবে নদীর পাশে পথ নাই বলিয়া আমাদের পর্ব্বতবাহুর উপরে উঠিতে হইল। ইহার পর উৎরাই আরম্ভ হইল, পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে চমরীর দল চরিতেছে দেখিলাম। আরও নীচে পথ নদীর পাটে নামিল, নদীর ওপারে হরিণের পাল জল খাইতেছিল, আমাদের দেখিয়াই ছুটিয়া পাহাড়ের উপরে পলাইল। কিছু দূর পরে স্লেটের পাহাড় দেখা গেল যাহার নীচের নরম মাটিতে কেরোসিন তেলের গন্ধ পাইলাম। এইরূপে চারটার সময় বক্‌চা গ্রামে পৌছান গেল। গ্রাম বলিতে সাত-আট ঘর এবং ঘর বলিতে পাথরের স্তূপ মাত্র। গ্রামের লোকের জীবিকার উপায় ভেড়া ছাগল ও চমরী, কেননা এত উচ্চে শস্য জন্মায় না। সুমতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে কিছু চা ছিল, তাহা একটি ঘরে গিয়া প্রস্তুত করাইয়া খানিকটা আমরা পান করিলাম, বাকিটা সঙ্গীদের জন্যও রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে গাধার দলও পৌছিল।

১৭ই জুন রাত্রি থাকিতেই আমরা বক্‌চা ছাড়িয়া চলিলাম। প্রথমে দলের সর্দ্দার ঘণ্টা বাজাইয়া যাইতেছিল, তাহার পিছনে অন্য সকলে। উপরে পাহাড় ক্রমেই ছোট ও অধিত্যকা চওড়া হইতেছিল। পথের পাশে কোথাও কোথাও হিমশিলার স্তূপ পড়িয়াছিল, স্থানে স্থানে ভেড়া

শে-কর—ল্যসে'-জোঙের দৃশ্যাবলী
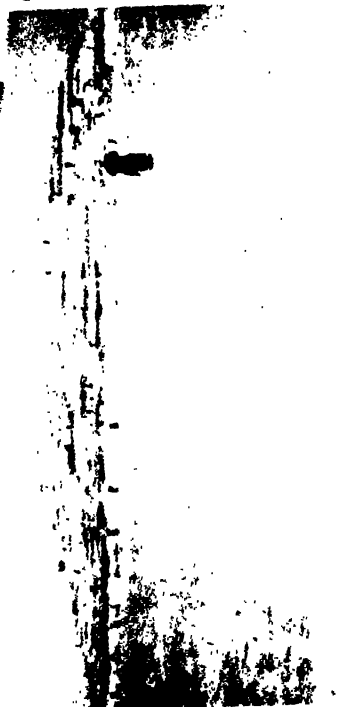
চমরীর গোঠ ছিল, সেখানে কাল কাল তাম্বুর ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। দশটার সময় আমরা ছোট ছোট পাহাড়ে-ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌছিলাম সেখানে ঐরূপ কাল তাম্বু অনেক দেখা গেল। ঐ স্থানের বাম দিকে কিছু দূরে লৌহের প্রস্তরপূর্ণ পাহাড় ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা চা পানের জন্য বসিলাম, চায়ের পেয়ালায় নিজ নিজ থলির ভিতর হইতে মাখন ও সত্তু দিয়া পান ভোজনের ব্যাপার এক সঙ্গেই শেষ হইল। এইবার উপত্যকা ছাড়িয়া পাহাড় চড়াইয়ের পালা আরম্ভ হইল, সুমতি-প্রজ্ঞ পিছাইয়া গেলেন, আমি সমানে আগে চলিলাম। যদিও চাসা-লা আঠার হাজার ফুট উচ্চে স্থিত, আমার উপরের ঘাটে পৌছাইতে কষ্ট হয় নাই, ঘাট পার হইয়া নীচে আসিয়া তবে শুইয়া বিশ্রাম করিলাম। অনেক ক্ষণ পরে সুমতি-প্রজ্ঞ আসিয়া পৌছিলেন, গাধার দল আরও পিছনে পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চলিতে আরম্ভ করিলাম। চাসা-লার উৎরাই কঠিন এবং কয়েক মাইল লম্বা, চলিতে চলিতে দেখিলাম কোন কোন পাহাড়ের নীচে বরফ জমিয়া আছে, আশপাশের সবুজ ঘাসে চমরীর দল চরিতেছে। বেলা দুইটার সময় আমরা জিগ-চেব গ্রামে পৌছাইলাম, গাধার পাল আরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে আসিল। এই গ্রামের প্রধান পেশা যাত্রীদের থাকিবার স্থান ইত্যাদি দেওয়া, সঙ্গে অল্প-বিস্তর পশুপালনও আছে। রাত্রে এখানেই বাস করা গেল।

১৮ই জুন ভোর রাত্রে আবার রওয়ানা হইলাম। এবার উৎরাই যে কঠিন শুধু তাহা নহে, উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়িতে লাগিল। প্রভাতের আলোর সঙ্গে পথের পাশে জঙ্গলী-গোলাপের ঝোপ দেখা গেল। সাতটা নাগাদ চা পান করিয়া আর এক ঘণ্টা চলিবার পর ব্রহ্মপুত্রের সৈকত দেখা যাইতে লাগিল। দশটার সময় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে পৌছাইলাম, নদের বেলাভূমি অতি বিস্তৃত, স্থানে স্থানে বৃক্ষপূর্ণ বাগান রহিয়াছে এবং বাকী অন্য প্রায় সকল স্থানেই শস্যের ক্ষেত ও বৃক্ষ লাগান যাইতে পারে কিন্তু বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে। একটার সময় আমাদের দল খ-চৌং গ্রামে উপস্থিত হইল। ইহা গাধাওয়ালার গ্রাম, সুতরাং আজ তাহারা ওখানে থাকাই স্থির করিল।

সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমি এক বৃদ্ধার ঘরে আশ্রয় লইলাম। চা-পানের পর সুমতি-প্রজ্ঞ গ্রামে বেড়াইবার জন্য ঘরের অঙ্গনের দরজার বাহিরে যাইবামাত্র, চারটা বৃহৎ কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। আমি চীৎকার ও কুকুরের ডাক শুনিয়া দেওয়ালের কাছে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম ছাতা-হাতে সুমতি-প্রজ্ঞ একেবারে কুকুরের মুখে পড়িয়া আছেন। আমি কুকুর তাড়াইবার জন্য পাথর ছুঁড়িতে কুকুরের দল সরোষে সেই পাথরের টুকরার পিছনে ছুটিতে লাগিল। সুমতি-প্রজ্ঞ সেই অবসরে ঘরে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইলেন। সেই গ্রামে থাকিতে তিনি আর বাহিরে যাইবার নাম করিলেন না।

১৯শে জুন মালপত্র বাঁধিয়া গাধাওয়ালার জিম্মা করিয়া আমরা ল্যর্সে-জোঙ চলিলাম। এই নদীতটে গ্রাম অনেক এবং সেচকার্য্যের জন্য বড় বড় নালীও আছে। এইরূপ এক নালী পার হইয়া আমরা একটি ছোট নদীর পারে উপস্থিত হইলাম, সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন উহা স-ক্যাগুম্বা হইতে প্রবাহিত হইতেছে। বেলা নয়-দশটার সময় ল্যর্সে পৌছিয়া আমরা প্রথমে গুম্বায় যাইলাম। পথে সকলেই আমায় লদাখী বলায় আমিও এখন নিজেকে লদাখী বলিতাম। গুম্বায় চা-পানের পর আমি নদীর ধারে, গাধার দল যেখানে আসিবে সেখানে, যাইবার প্রস্তাব করায় সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন "এখন এখানেই অপেক্ষা করি, পরে যাইয়া মালপত্র আনিব।" তাঁহার ইচ্ছা কিছুক্ষণ এখানে থাকা। আমার মন যাইতে উৎসুক, সুতরাং অনেক কথায় বুঝিলাম "ক্বা" (চামড়ার নৌকা) শীগর্চী চলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে দুই-এক দিন লাগিবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর সুমতি-প্রজ্ঞ ঘাটে চলিলেন; সেখানে দেখিলাম দুইজন সওদাগর মাল-পত্র লইয়া ক্বা-র প্রতীক্ষায় আছেন, তাঁহারাও বলিলেন নৌকা আসিতে দুই-তিন দিন লাগিবে। গুম্বায় কয়েক জায়গায় কুকুর ছাড়া আছে দেখিয়া আমি সেখানে থাকিতে চাহিলাম না, কিন্তু সুমতি-প্রজ্ঞ সেখানেই থাকিবার আগ্রহ দেখাইলেন। শেষে স্থির হইল আমি ঐ সওদাগরদের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় থাকিব এবং সুমতি-প্রজ্ঞ থাকিবেন গুম্বায়।

ল্যর্সে-জোঙ হইতে শীগর্চী পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রে চামড়ার

নৌকা চলে। এই নৌকা য়াকের চামড়া জুড়িয়া কাঠের কাঠামোতে আঁটিয়া প্রস্তুত করা হয়, ইহারই নাম "ক্য" এবং ইহার এক-একটিতে ত্রিশ-চল্লিশ মণ মাল আঁটে। আমার তিনজন সওদাগর সঙ্গীর মধ্যে একজন টশী-ল্যুন্পোর ঢাবা (ভিক্ষু বা সাধু), অন্যজন লাসার সেরা মঠের ঢাবা এবং তৃতীয় জন লাসার গৃহস্থ ছিল। ভোট দেশের সাধু দুই প্রকার—প্রথম যাঁহারা মঠে থাকিয়া পূজা-পাঠ করেন, দ্বিতীয় যাঁহারা ব্যাপার-ব্যবসায় ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন দৃঢ় সীমা নাই, এক শ্রেণীর লোক যখন ও যত দিনের জন্য ইচ্ছা অন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। সওদাগর ঢাবাদের পরিচ্ছদ সাধারণ গৃহস্থদেরই মত, কেবলমাত্র মস্তক মুণ্ডিত। ইহারা যথেচ্ছা মদ্যপান ও স্ত্রী-সংসর্গ করে এবং জীবহত্যাও মাঝে মাঝে করে। আমার সঙ্গী ঢাবা দুইজন খম্-পা (খাম দেশবাসী) এবং গৃহস্থ লাসা-পা (লাসানিবাসী) ছিল; ইহাদের মধ্যে টশী-ল্যুন্পোর ঢাবা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দলের নেতা ছিল এবং সেরার ঢাবা সেই লোকই যাহার সঙ্গে শে-কর্ মঠের খেম্বো আমাদের লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় আঠারো-বিশ নৌকা-বোঝাই মাল ইহাদের সঙ্গে ছিল, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ চাউল, বাকী অংশের মধ্যে লৌহ-পিত্তলের বাসন এবং পেয়ালা ইত্যাদি তৈয়ারী করার কাঠও ছিল। চারিদিকে মালপত্রের স্তূপ করিয়া দেওয়াল করা হইয়াছিল, মধ্যে চামরীর লোমের ছোলদারী তাম্বু, আগুন জ্বালাইবার স্থান এবং শয়ন ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের বাহিরে নদীর তীরে এরূপ মালপত্র লইয়া থাকা বিপজ্জনক, কিন্তু সওদাগরদের নিকট ভোটীয় কৃপাণ ও তরবারী ছিল, উপরন্তু ভোটীয় চোরও ঢাবাকে ভয় করিয়া চলে।

দিনের বেলায় ইহারা মালপত্র মেরামত, নৌকা জোড়ার কাঠ সংগ্রহ—এখানে নদীতটে ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত গাছ আছে—এই সবে ব্যস্ত থাকিত। প্রতিরাত্রেই নেতা গ্রামে শুইতে যাইত এবং কোন কোন দিন অন্য দুইজনের একজনকে সঙ্গে লইয়া যাইত, ফলে আমি ও অন্য একজন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকিতাম। ভোটদেশে লজ্জাভয় অত্যন্ত কম, স্মৃতরাং স্ত্রী-পুরুষের অনুচিত বা অবৈধ সম্বন্ধ প্রকাশ্যভাবেই থাকে। পথে চলিতে চলিতেও লোকে আশ-পাশের বসতিতে সেইরূপ সম্বন্ধের স্মযোগ পায়, কেননা সাধারণ কুমারী ও মুণ্ডিত মস্তক অনীতে অনেক প্রভেদ—অর্থাৎ কুমারীর ব্রহ্মচর্য্যের কোনও বালাই নাই। আমি ইহা বলিতেছি না যে ভোটদেশে অন্য দেশ অপেক্ষা ব্যভিচার অত্যন্ত অধিক; বস্তুতপক্ষে যদি গুপ্ত ও প্রকাশ্য ব্যভিচার সকলই একত্রে দেখা যায়, তবে আমার ধারণায় বোধ হয়, সকল দেশের অবস্থাই প্রায় কাছাকাছি আসে। যাহা হউক, নেতা ঢাবা ত ব্যবসায় সম্পর্কে এই পথে ক্রমাগত যাতায়াত করে এবং এরূপ অবস্থায় এদেশে প্রায় প্রতি বসতিতেই কোন না-কোন স্ত্রীলোক জুটিয়া যায়, স্মৃতরাং উহারও সেই ব্যবস্থাই ছিল। প্রতিদিন চামড়ার মট্কায় ভরা ছঙ (ভোটীয় কাঁচা মদ্য) গ্রাম হইতে আসিত এবং ইহারা তাহা জলের মত পান করিত। অবসরকালে নদীতে বঁড়শী ফেলিয়া মাছ ধরার চেষ্টাও চলিত, কিন্তু মাছ-ধরায় সফল হইতে কোন দিন দেখি নাই।

১৯ হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত এই ভাবে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় কাটিয়া গেল। দুই-তিন দিনের স্থলে এত দেরী হওয়ার কারণ শুনিলাম নৌকা যাইবার সময় যায় জলে এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতের মুখে দুই দিনেই শীগর্চী পৌঁছায়, কিন্তু ফিরিয়া আসে গাধার পৃষ্ঠে—চামড়া ও কাঠ পৃথক বোঝাই হইয়া।

(ক্রমশঃ)
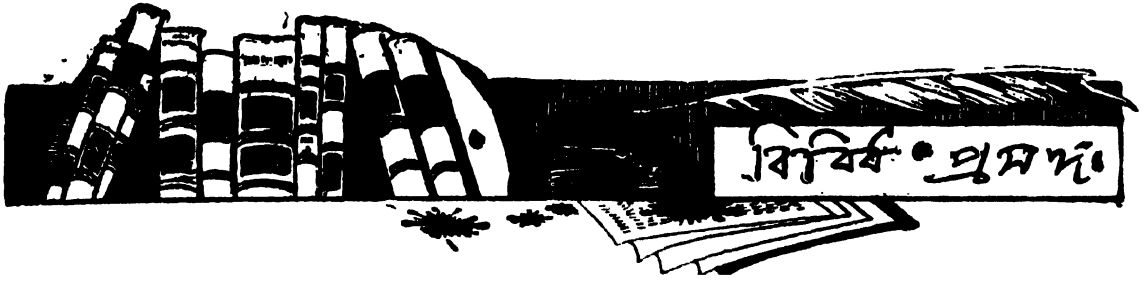
কৃষ্ণকুমার মিত্র

কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বয়স মৃত্যুকালে পঁচাশি বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ সোজা ছিল, দৃঢ় ছিল ; মনও তাঁহার দৃঢ় ছিল। যে-দিন অসুস্থ বোধ করিবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সে-দিনও তিনি প্রাতে গোলদীঘিতে তাঁহার নিয়মিত: প্রাত্যহিক পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। যে শনিবারে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার দু-দিন আগেকার "সঞ্জীবনী"র জন্যও তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্য আদি লিখিয়াছিলেন। এরূপ কর্ম্মিষ্ঠ মানুষের মৃত্যু পঁচাশি বৎসর বয়সে হওয়াতেও অকাল-মৃত্যু বলিয়া মনে হইতেছে।

বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমি বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজেই অধিক সময় পড়িয়াছিলাম, অল্পকাল সিটি কলেজে পড়িয়া সেখান হইতে বি-এ ও পরে এম-এ পাস করি। আমি যখন ছাত্র, কৃষ্ণকুমার বাবু তখন সিটি কলেজ ও স্কুলের ইতিহাসের অধ্যাপক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পরে আমিও সিটি কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলাম। এই প্রকারে ছাত্ররূপে এবং কনিষ্ঠ সহকর্ম্মী রূপে তাঁহাকে অর্দ্ধশতাব্দী কাল দেখিয়া আসিয়াছি ও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। তাঁহার সহিত রাজনৈতিক মতভেদ শেষের দিকে কিছু হইয়াছিল এবং সামাজিক কেবল একটি বিষয়ে (নারীদের অভিনয় ও নৃত্য বিষয়ে) মতভেদও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিচলিত হয় নাই, বিন্দু-মাত্রও হ্রাস পায় নাই। আমার প্রতি তাঁহার প্রীতিও কমে নাই। সামাজিক উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে মতভেদও আংশিক মাত্র। তিনি নারীদের দ্বারা অভিনয় ও নৃত্য মাত্রেরই বিরোধী ছিলেন ; আমার মত এই, যে, নারীদের অভিনয় ও নৃত্য এরূপ হইতে পারে, এবং দেখিয়াছিও, যাহা নির্দ্দোষ, সুরুচিসঙ্গত ও আবশ্যক। কিন্তু মিত্র মহাশয় এ-বিষয়ে যাহা লিখিতেন তাহা নিশ্চয় উচ্চ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, এবং বহু স্থলেই নারীনৃত্য সম্বন্ধে তাহা ঠিক্ বলিয়া আমি মনে করি।

বঙ্গভঙ্গ-সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সময় গবর্মেণ্ট হুকুম করেন, যে, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবেন না। সেই জন্য, রাজনীতির সংস্রব না ছাড়িয়া তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন।
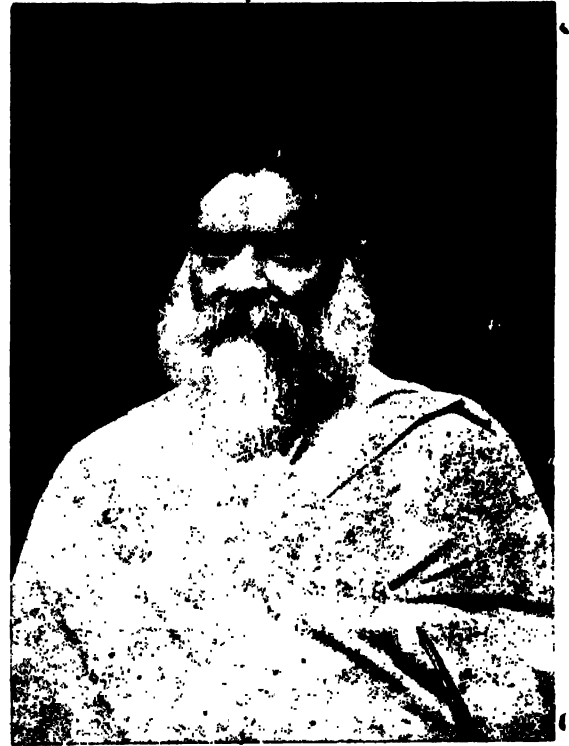
কৃষ্ণকুমার মিত্র (প্রৌঢ় বয়সে)

সুনীতি ও সুরুচির প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক দৃষ্টি আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাঁহার পরিচ্ছদেও ইহা লক্ষিত হইত। সেকালে শিক্ষক

ও অধ্যাপকেরা প্রায়ই ধুতি পরিয়া স্কুল কলেজে আসিতেন না, পাজামা এবং চাপকানচোগা বা কোট পরিয়া আসিতেন। কৃষ্ণকুমার বাবু এক প্রকার কোট পরিতেন যাহা সম্পূর্ণ সুরুচিসঙ্গত। তিনি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে এই এক প্রকার ধারণা আছে, যে, ধার্ম্মিক মানুষের দেহ কাপড়চোপড় চুল দাড়ি প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, বরং যে যত অপরিচ্ছন্ন সে তত ধার্ম্মিক। কৃষ্ণকুমার বাবু সে-রকমের ধার্ম্মিক ছিলেন না। তাঁহার বেশে পরিচ্ছন্নতা ছিল, কিন্তু বিলাসবিভ্রম বিন্দুমাত্রও ছিল না।

তাঁহার ধর্ম্ম কেবল মতের ধর্ম্ম ছিল না। তাহা ছিল গভীর এবং তাহা তাঁহার সমুদয় চিন্তা বাক্য ও কার্য্যকে নিয়মিত করিত, সমগ্র জীবনকে অনুপ্রাণিত করিত। এই সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, দৃঢ়চিত্ত, নির্ভীক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ছাত্র এবং অনেক সঙ্গী ও সহকর্ম্মী উপকৃত হইয়াছেন।

ধর্ম্মকে তিনি জীবনে সকলের উপরে স্থান দিতেন—মতে দিতেন, আচরণেও দিতেন। তিনি আযৌবন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহার অন্যতম আচার্য্য ও নেতা এবং মৃত্যুকালে তাহার সভাপতি ছিলেন। ধর্ম্মমতের ভিন্নতার জন্য কেহ তাঁহার বিরাগভাজন হইত না।

দেশের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর বলিয়া তিনি মনে করিতেন, কেহ এরূপ কোন কথা বলিলে, বহি লিখিলে বা কাজ করিলে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাহার নিন্দা করিতেন। অপ্রসিদ্ধ বা প্রসিদ্ধ, নিজ সম্প্রদায়ের লোক বা অন্য সম্প্রদায়ের লোক, অপরিচিত বা পরিচিত, কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। এরূপ ব্যবহার দ্বারা বিরাগভাজন হইবার ভয় তাঁহার ছিল না।

কোন মানুষের সম্বন্ধে একবার তাঁহার ভাল ধারণা জন্মিলে তাহা টলিত না, তাহা টলান দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। রাজনৈতিক সামাজিক ও অন্যবিধ মত সম্বন্ধেও তাঁহার এই প্রকার দৃঢ় স্থিতিশীলতা ছিল। মত গঠন অবশ্য তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়াই করিতেন।

চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও কালীশঙ্কর শুকুল এবং অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়দিগের সহযোগিতায় "সঞ্জীবনী" স্থাপন করেন, এবং এই দীর্ঘ কাল তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। "সঞ্জীবনী"র কৃতিত্ব নানা বিষয়ে। তাহা আজকালকার যুবকদের এবং অনেক প্রৌঢ়েরও জানা না থাকিতে পারে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইতে উৎপন্ন বিদেশী বর্জ্জনের ও স্বদেশী গ্রহণের সপক্ষে আন্দোলনে কৃষ্ণকুমার বাবু অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ও নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন তিনি অসাধারণ কর্ম্মিষ্ঠতা উদ্যোগিতা বাগ্মিতা ও সাহসের সহিত চালাইয়াছিলেন এবং এই জন্যই অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি অন্য কয়েক জনের সহিত তিনি বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হন। এই আন্দোলনে "সঞ্জীবনী" তাঁহার প্রধান মুখপত্র ছিল। যে গবর্ন্মেণ্ট বিনা বিচারে তাঁহার নির্দ্দোষ স্বামীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার সাধ্বী পত্নী কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের দ্বারা বহু বিলম্বে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করার ভ্রম স্বীকৃত হইয়াছিল।

আসামের চা-বাগানসকলে চুক্তিবদ্ধ কুলিদের উপর সেকালে বড় অত্যাচার হইত, বহু কুলি-নারীর সতীত্ব নষ্ট হইত। এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে "সঞ্জীবনী" দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে রামকুমার বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি "সঞ্জীবনীর" প্রধান সহায় ছিলেন।

আফিঙের দ্বারা দেশের খুব অনিষ্ট হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। "সঞ্জীবনী" ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। অনেকটা তাহার ফলে আফিং কমিশন নিযুক্ত হয় এবং কৃষ্ণকুমার বাবু তাহাতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন ও অন্য প্রকারেও কমিশনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

রেলে নারীযাত্রীদের উপর অত্যাচার এখন যে একেবারেই হয় না, তাহা নহে। আগে কিন্তু আরও বেশী হইত। "সঞ্জীবনী" এই প্রকার অত্যাচার দমনের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার কিছু সুফলও হইয়াছিল।

আগে ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গীদের হাতে দেশী লোকদের অপমান, প্রহার ও কখন কখন মৃত্যু এখনকার চেয়ে বেশী হইত। ইহার বিরুদ্ধেও "সঞ্জীবনী" বরাবর লড়িয়াছেন। দেশী লোকদের এই প্রকার দুর্গতি

কিছু কমিবার অন্য একটি কারণ সাক্ষাৎপ্রতিকারপরায়ণ যুবকদের কার্য্যের প্রভাব।

কৃষ্ণকুমার বাবুই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এখনও স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন প্রচারে "সঞ্জীবনী" কোন খবরের কাগজের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে।

বঙ্গে বাঙালীর স্থান ও গৌরব রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষে বাঙালীর স্বোপার্জ্জিত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, কৃষ্ণকুমার বাবু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী "নিজ বাসভূমে", বঙ্গে, "পরবাসী" হইবে, এ চিন্তা তাঁহার ও তাঁহার "সঞ্জীবনী"র পক্ষে অসহ্য ছিল।

তিনি পৌরুষের, শক্তিমত্তার ও অপরের প্রাণরক্ষার্থ আত্মোৎসর্গের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। 'শক্তিমান বাঙালী' ও 'পুণ্যকীর্ত্তি' শীর্ষক সংবাদ ও মন্তব্য "সঞ্জীবনী"তে প্রায়ই বাহির হইতে দেখিয়াছি। ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ সালে কলিকাতায় মিউজিয়ামের সম্মুখে গড়ের মাঠে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়। তাহার প্রধান উদ্যোক্তা জুবার্ট সাহেবের পুত্রকে এক দিন দর্শকদিগের মাথায় ও পিঠে লাঠি দিয়া টোকা মারিতে দেখিয়া কৃষ্ণকুমার বাবু জুবার্টকে ছেলেকে শাসন করিতে বলেন। জুবার্ট অহাতে কান না দেওয়ায় মিত্র মহাশয় স্বয়ং নিজের বাহুবল প্রয়োগ করেন। বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি নিষিদ্ধ হয় এবং যাহা বলপূর্ব্বক পুলিস ভাঙিয়া দেয়, তাহাতে কৃষ্ণকুমার বাবুর দৃঢ়তা ও সাহস বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুবিদিত।

কৃষ্ণকুমার মিত্র (অন্তিম শয্যায়)

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নারীকুলের পরম সহায় ছিলেন কৃষ্ণকুমার বাবু ও "সঞ্জীবনী"। সহবাস সম্মতি আইন আন্দোলনের সময় এবং বরাবর বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। অধুনা গত ৭।৮ বৎসর হইতে অন্তঃপুরে ও ঘরের বাহিরে নারীদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রধানতঃ কৃষ্ণকুমার বাবুর চেষ্টায় নারীরক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীদের প্রতি অত্যাচার দমনে এই

সমিতির ও "সঞ্জীবনী"র অবিরাম চেষ্টা অনতিক্রান্ত। এই জন্য আজ তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে তাঁহার সন্তানেরাই পিতৃহীন হইয়াছেন তাহা নহে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বঙ্গের অগণিত বালিকা ও অন্য নারী আজ পিতৃহীন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্থান অধিকার করিবার লোক দেখিতে পাইতেছি না।

দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছায়, যেমন করিয়া হউক বাহ্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য উৎপাদন ও রক্ষার মোহে পড়িয়া অনেক নেতা ও তাঁহাদের অনুচরেরা নারীরক্ষা-কর্ম্মে অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ইহা ভ্রম। মুসলমানেরা যে মনে করেন, যে, নারীরক্ষা একটা সাম্প্রদায়িক ছল, তাহাও ভ্রম। নারীর মর্য্যাদা রক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি টিকিতে পারে না—পরাধীন জাতি টিকিতে পারে না, স্বাধীন জাতিও টিকিতে পারে না; যে-দেশে নারীর মান ইজ্জৎ সতীত্ব নিরাপদ নহে, তাহা স্বাধীন হইতে পারে এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র। অতএব, স্বাধীনতাকামীদের কার্য্য অপেক্ষা নারীরক্ষাপ্রয়াসী পুরুষপ্রবরের কার্য্য লঘুতর বা কম আবশ্যক নহে। ইহা সভ্য সমাজের ভিত্তি রক্ষার নিমিত্ত মূলগত কার্য্য।

ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, যে, কৃষ্ণকুমার মিত্র স্বাধীনতাকামী ছিলেন না—নিশ্চয়ই ছিলেন। সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা অর্দ্ধশতাব্দীর উপর তাঁহার পতাকা ছিল। তিনি মনে করিতেন, উদারনৈতিকদিগের পন্থা অবলম্বন দ্বারা ডোমীনিয়নত্বের পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কংগ্রেসের মত ইহার বিপরীত। আমার মত ঠিক কোন দলের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু মতের অমিল কোনও অকপট স্বদেশ-হিতৈষীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি হারাইবার কারণ হওয়া উচিত নয়।

কৃষ্ণকুমার বাবু নিজের মত পূর্ব্বাপর ঠিক রাখিয়াছেন। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিকমতিবিশিষ্ট লোক কংগ্রেসের মতে সায় দেওয়ায় ও সাবেক উদারনৈতিক মত লোকের অপ্রিয় হওয়ায় "সঞ্জীবনী"র এককালে যে আর্থিক অবস্থা ছিল তাহা নাই, কিন্তু কাগজের কাটতি কমিবার ভয়ে বা গ্রাহক বাড়াইবার নিমিত্ত কৃষ্ণকুমার বাবু কপটতা করেন নাই। অনেক উচ্চপদস্থ সম্রান্ত ও ধনী লোক তাঁহাকে খাতির করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি নিজের সুবিধার জন্য কাজে লাগান নাই, তাহার দ্বারা অন্য অনেকের উপকার করিয়াছেন।

সম্মান লাভ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। তাঁহাকে সম্মানিত করিবার কোন চেষ্টায় তিনি কখনও সম্মতি দেন নাই। আতিথেয়তা, বাক্‌সংযম, আশ্রিতবাৎসল্য এবং সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের লক্ষণ ছিল।

তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব ও মোহম্মদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দুটি প্রধান। আগ্রা জেলে নির্ব্বাসনকাল যাপন সময়ে তিনি শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা ও উপদেশে শ্রোতাগণ সেই অধ্যয়নের কিছু ফলভাগী হইতেন, কিন্তু বোধ হয় তিনি এ-বিষয়ে কোন পুস্তক লিখিয়া যান নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি, যে, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দেবী তাঁহার কথিত "আত্মচরিত" কয়েকটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ১৯১০ সালে তাঁহার কারাগার হইতে মুক্তিলাভের সময় পর্য্যন্ত। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে এক জন সত্যনিষ্ঠ পুরুষের কথিত বঙ্গের বহু বৎসরের ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যাইবে। কারণ, শুনিলাম ইহাতে তিনি নিজের জীবন অল্পই বিবৃত করিয়াছেন।

—

কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্বন্ধে জলধর সেন

গত বিশে অগ্রহায়ণ 'রবিবাসর' সমিতির অধিবেশনে সভাপতি রায় বাহাদুর জলধর সেন বলেন :—

কৃষ্ণকুমার বাঙ্গালার, শুধু বাঙ্গালার কেন ভারতের সংবাদপত্রসেবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণতম ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে ৫৩ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া "সঞ্জীবনী" পত্রিকার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার দুর্নীতির বিশেষ বিরোধী এবং নারী-রক্ষা সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মত দেশপ্রেমিক শুধু এদেশে কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই বিরল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথম "বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের" প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার মত আর এক জনও এইরূপ তেজস্বী, নির্ভীক, অকলঙ্ক-চরিত্র, দেশভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে জানিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। বাঙ্গালার এক অতি উজ্জ্বল রত্নকে আমরা হারাইলাম।

—

ব্যবস্থাপক সভাসমূহের আগামী নির্ব্বাচন

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। এখন ভোটারদিগকে ভাবিতে হইতেছে তাঁহারা কাহাকে ভোট দিবেন। কাহাকে ভোট দেওয়া উচিত স্থির করা সহজ নহে। সাধারণতঃ যিনি যে দলের লোক সেই

দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে অনুরোধ উপরোধে ভোট দেওয়া হইয়া থাকে। তাহা ভিন্ন, বাধ্যবাধকতা থাকায় কিংবা কোন প্রকার উৎকোচ পাওয়ায় ভোট দেওয়া যে হয়ই না, এমন বলা যায় না।

নানা কারণে আমরা আগেকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্ব্বাচনে একবারও ভোট দিই নাই, আগামী কোন নির্ব্বাচনেও ভোট দিব না। কোন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার চেষ্টা এ-পর্য্যন্ত করি নাই, ভবিষ্যতেও করিব না। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়ার বিরোধী আমরা নহি, সদস্য-নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়ার বিরোধীও নহি। আমাদের মতে ভোট কিরূপ লোককে দেওয়া উচিত, সে-বিষয়ে কিছু বলিব।

—

নারীনিগ্রহ দমনে উৎসাহী লোককেই ভোট দিবেন

শুধু বঙ্গে নহে, ভারতবর্ষের অন্য অনেক প্রদেশে নারীদের প্রতি অত্যাচারমূলক অপরাধের প্রাদুর্ভাব অনেক বৎসর হইল দেখা যাইতেছে। যেখানে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই, সেখানেও এরূপ অপরাধ নিতান্ত কম হয় না। ইহার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ পুরুষজাতীয় দুর্বৃত্ত লোকদের পাশবিক প্রবৃত্তি। তদ্ভিন্ন নারীহরণ ও নারীবিক্রয় লাভজনক ব্যবসা বলিয়াও অনেক দুরাত্মা এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে। এইরূপ অপরাধ দমন নারীকুলের নিরাপত্তার জন্য আবশ্যক, সমাজ রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক, আমরা সকলেই মাতার সন্তান বলিয়া আবশ্যক। ইহা নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহার মধ্যে এখন কেবল আইনের দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহার কথাই বিবেচনা করিতেছি। বর্ত্তমানে এই উদ্দেশ্যে যে যে আইন প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহারও যথোচিত ব্যবহার সব বিচারক করেন না। যে প্রকার নারীনিগ্রহ অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড হইতে পারে, তাহাতেও এ-পর্য্যন্ত কেবল দু-বার বিচারকেরা বেত্রাঘাত দণ্ড দিয়াছেন। অতএব এই দণ্ডের ব্যবস্থা ব্যাপকতর করা উচিত এবং বিচারকেরা যাহাতে তদনুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাহার জন্য আন্দোলন করা উচিত। তদ্ভিন্ন, অন্য প্রকার দণ্ড—কারারোধ দণ্ড ও জরিমানা—কঠোরতর করা উচিত। যাহারা অপহৃতা নারীকে লুকাইয়া রাখিবার বা নানা স্থানে লইয়া যাইবার সাহায্য করে, তাহাদেরও সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। দলবদ্ধভাবে নারীধর্ষণ ও তদ্বিধ ঘোরতর দৌরাত্ম্যের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধে এই প্রকার বন্দোবস্ত আবশ্যক। শাসন-বিভাগকেও এই প্রকার অপরাধ দমনে অধিক অবহিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। যে-জেলায় ও মহকুমায় নারীনিগ্রহ অপরাধে অপরাধীরা ধৃত ও দণ্ডিত কম হয়, তথাকার পুলিস কর্ম্মচারীদের অকৃতিত্বের জন্য পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি স্থগিত রাখা বা বন্ধ রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। অপহৃতা নারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীর পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে চান, নারীনিগ্রহ দমন ও নিবারণ করিবার জন্য উল্লিখিত বা তদ্বিধ অন্য প্রকার ব্যবস্থা করাইতে সচেষ্ট হইবেন, তাঁহাদের এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা চাই। ভোটারদের দেখা চাই, তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের ম্যানিফেষ্টোতে করিয়াছেন কি না। না-করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাইতে হইবে, প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর লইতে হইবে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যপদপ্রার্থীর নিকট হইতে এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি লওয়া দরকার। বঙ্গের দুটি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দু। ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী উত্তর হইতে জানা যায়, নিগৃহীতাদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা অধিক। যাহা হউক, কোন সম্প্রদায়ের একটি নারীও যদি নিগৃহীতা না হইতেন, তাহা হইলেও নারীনিগ্রহ দমনে তৎপর হওয়া সেই সম্প্রদায়ের লোকদেরও কর্ত্তব্য হইত।

আগামী নির্ব্বাচনে নারী-ভোটারদের সংখ্যা আগেকার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তাঁহারা কাহাকেও ভোট দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে ভুলিবেন না, যে, তিনি নারী-নিগ্রহ দমনের জন্য কি করিবেন। যিনি কিছু করিবেন না, তাঁহাকে ভোট দেওয়া উচিত নয়।

—

সদস্যপদপ্রার্থীদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য

দুঃখের বিষয়, নূতন ভারতশাসন আইনে "ভারতীয়" বলিয়া কোন জীব নাই; ভোটাররা হিন্দু বা অবনত তপশীলভুক্ত জাতি, বা মুসলমান বা শিখ বা খ্রীষ্টিয়ান বা আদিম জাতি বা শ্রমিক বা জমিদার বা ব্যবসাদার ইত্যাদি। আইন-কর্ত্তারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে মহাজাতি (নেশ্যন) নাই, থাকার বা গড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই, কেহই সমগ্রভারতীয় মহাজাতির এক জন নহে, সমগ্র মহাজাতির কল্যাণসাধন ও স্বার্থসংরক্ষণে কেহ ব্যাপৃত নহে, কাহারও ব্যাপৃত হওয়ার প্রয়োজনও নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের লোকদিগকে কতকগুলা অসংহত অসংবদ্ধ পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর সমষ্টি বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আইনকর্ত্তারা যাহাই ভাবুন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ভারতবর্ষের লোকদিগকে সাধারণ একটি রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত স্বার্থের কথা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। আমরা একাধিক বার পৃথিবীর বহু স্বশাসক দেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণ করিয়াছি যে, স্বশাসন-অধিকার যে-সব দেশের আছে তথাকার দরিদ্রতম ও অনুন্নততম শ্রেণীর লোকদের অবস্থাও ভারতবর্ষের রাজানুগৃহীততম সম্প্রদায়ের অবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভাল। অতএব আমরা যে ধর্ম্মসম্প্রদায় বা যে-শ্রেণীরই লোক হই না কেন, স্বশাসনের অধিকার লাভ করা আমাদের সাধারণ ও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখন বিচার্য্য,

কিরূপ স্বশাসন-অধিকার চাই

ভারতবর্ষে যে-সকল বড় ছোট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দল আছে, তাহারা সকলেই যে ভারতীয় কোন প্রকার রাষ্ট্রনীতিকেই আপনাদের মতসমষ্টিতে বা কার্য্য-প্রণালীতে প্রধান স্থান দিয়া থাকে, এমন নয়। কিন্তু কেহই রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়া কাজ করে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত দু-রকম মত আছে।

কংগ্রেসের ও কংগ্রেসপন্থীদের মত এই যে, ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এশিয়ায় জাপান যেরূপ স্বাধীন, ভারতবর্ষকে সেইরূপ স্বাধীন হইতে হইবে। এশিয়াতে অন্য স্বাধীন দেশ আরও কয়েকটি আছে। জাপান তন্মধ্যে প্রবলতম বলিয়া জাপানেরই নাম করিলাম। ইউরোপ ও আমেরিকার সব দেশই স্বাধীন—দু-একটা প্রায়-স্বাধীন। কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চান তাহার কারণ ইহা নহে যে স্বাধীনতা লাভ সকলের চেয়ে সহজ। কংগ্রেসপন্থীরা জানেন পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কিন্তু যাহাকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করেন, কঠিন বলিয়াই তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে চান না। এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী তথা-কথিত গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি "স্বাধীনতার সারাংশ" (substance of independence) পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন ও গ্রহণ করিবেন। ইহাতে তখন কংগ্রেস-দলভুক্ত কেহ আপত্তি করেন নাই। "স্বাধীনতার সারাংশ" পাইলে কংগ্রেসের বামবর্গীয়েরা সকলে সন্তুষ্ট হইবেন কি না বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ (Indian National Liberal Federation) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির মত অধিকার লাভ করিতে চান। এরূপ অধিকারকে স্বাধীনতার সারাংশ বলা যাইতে পারে। এই অধিকার কি প্রকার?

ডোমীনিয়নগুলির আভ্যন্তরিক কোন ব্যাপারে ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সামরিক অসামরিক সমুদয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহাদের চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব আছে। তাহাদের গবর্ণর-জেনার‍্যালকে আগে ব্রিটেনের রাজা ব্রিটেনের মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে নিযুক্ত করিতে এবং কেবল ব্রিটেনের কোন নাগরিকই গবর্ণর-জেনার‍্যাল নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ইম্পীরিয়্যাল কন্‌ফারেন্সের এবং ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার আইনের ফলে এখন ব্রিটেনের রাজা কোন ডোমীনিয়নের গবর্ণর-জেনার‍্যাল নিযুক্ত করিতে হইলে তাহারই মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে তথাকার কোন নাগরিককে নিযুক্ত করেন। ডোমীনিয়নগুলি স্বেচ্ছায় কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু অসামরিক কথাবার্ত্তা চালাইতে এবং চুক্তি-সন্ধি প্রভৃতি করিতে পারে। ব্রিটেন কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিলেই ধরিয়া লওয়া হয়, যে, ভারতবর্ষেরও সেই দেশের

মাদ্রিদ

বিদেশীয় সাংবাদিকগণ মাদ্রিদের উপকণ্ঠ হইতে বিদ্রোহীগণের মাদ্রিদ আক্রমণ লক্ষ্য করিতেছেন
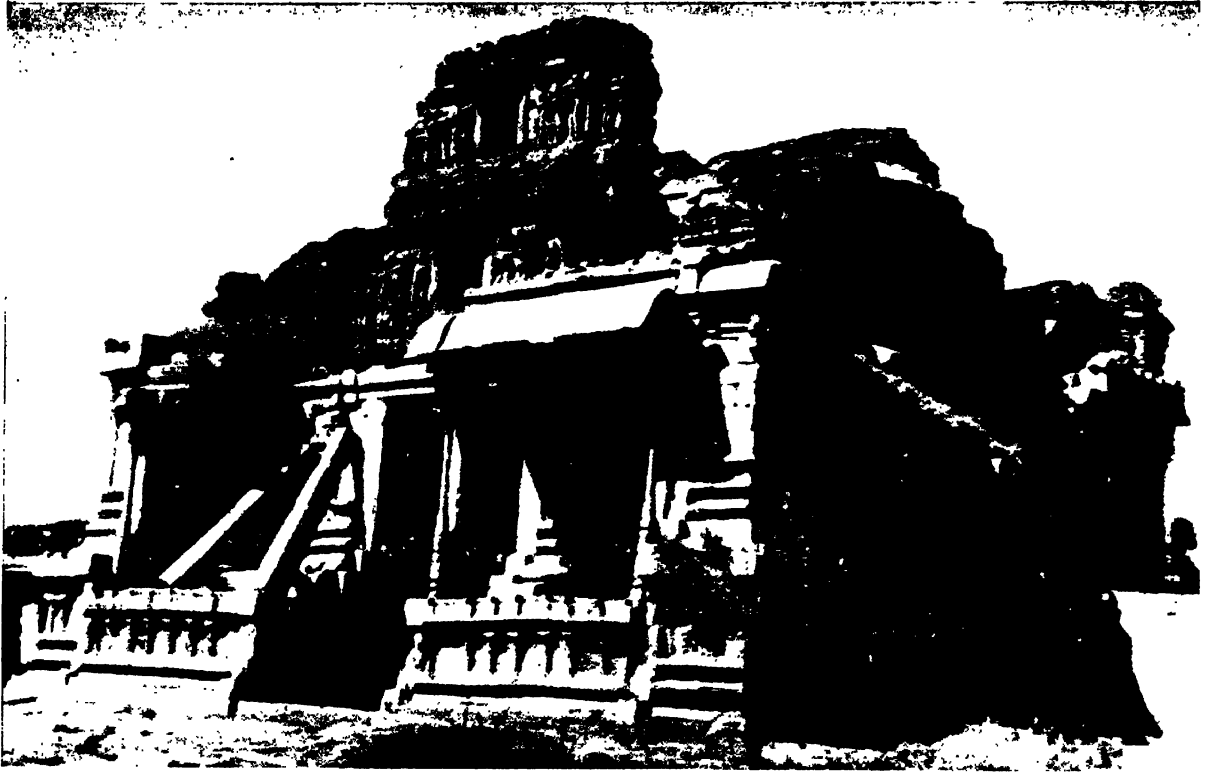
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ষট্‌শাতাব্দিকী ; কৃষ্ণ মন্দির
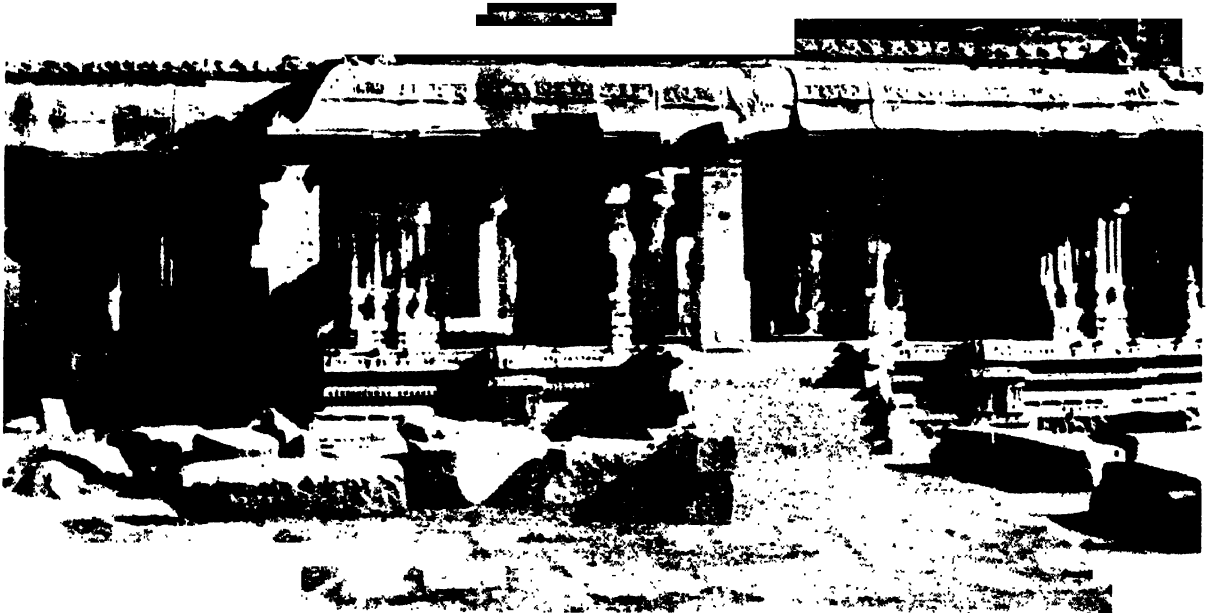
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ষট্‌শাতাব্দিকী ; বিঠোবা মন্দির

সহিত যুদ্ধের অবস্থা ঘটিয়াছে এবং ভারতীয় সৈন্য আজিও তাহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ব্রিটেন কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিলে কোন ডোমীনিয়নের তাহাতে যোগ দেওয়া না-দেওয়া সেই ডোমীনিয়নের স্বেচ্ছাধীন। যে কোন বা সমুদয় ডোমীনিয়ন নিরপেক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিতে পারে না।

নিজ নিজ বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের এবং নিজ নিজ জাহাজ চালান প্রভৃতি কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ডোমীনিয়নগুলি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শুল্কস্থাপন প্রভৃতি করিতে পারে ও করে।

এই প্রকারে দেখা যাইতেছে, যে, ডোমীনিয়নগুলি প্রায় স্বাধীন, যদিও সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। ভারতবর্ষও ডোমীনিয়নত্ব লাভ করিলে প্রায় স্বাধীন হইবে। এই জন্য যদিও ব্রিটেনের একাধিক রাজা এবং বহু মন্ত্রী ও গবর্ণর-জেনারাল ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তথাপি নূতন ভারতশাসন আইন প্রণয়ন ও পাস করিবার সময় তাহাতে ডোমীনিয়ন কথাটা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই এবং ঐ আইন বস্তুতঃ স্বশাসনের ঠিক্ বিপরীত দিকে গিয়াছে। উহাতে স্বশাসনের কঙ্কাল আছে কিন্তু প্রাণটা নাই—প্রাণটা টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে ডোমীনিয়নত্ব লাভ ও পূর্ণ স্বরাজ লাভ প্রায় সমান কঠিন। বোধ হয় পূর্ণ স্বরাজ লাভ অল্প পরিমাণে অধিক কঠিন।

যাঁহারা ডোমীনিয়নত্ব চান ও যাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চান, ভারতবর্ষীয় এই উভয় দলের লোককেই আমরা স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) বলিয়া গণনা করি। কিন্তু যাঁহারা নূতন ভারতশাসন আইনেই সন্তুষ্ট, তাঁহাদিগকে স্বাজাতিক মনে করি না।

এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে; কেন্দ্রীয়, ফেডারাল বা সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উভয় কক্ষের সদস্যনির্ব্বাচন পরে হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্যেরাই তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন বলিয়া এখন যে সদস্যনির্ব্বাচন হইতে যাইতেছে তাহা সমগ্রভারতীয় সদস্যনির্ব্বাচনেরই প্রথম ধাপ। অতএব এখন হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যে-সকল প্রার্থী পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে কিংবা ডোমীনিয়নত্বের পক্ষে, কেবল তাঁহাদিগকেই ভোট দেওয়া উচিত। নূতন ভারত-শাসন আইনেই যাঁহারা সন্তুষ্ট এরূপ লোকদিগকে ভোট দেওয়া অনুচিত।

বঙ্গে মুসলমানেরা বলিবেন, "যে-সব মুসলমান প্রার্থী মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থরক্ষা করিবেন না তাঁহাদিগকে আমরা ভোট দিব না।" এ-বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন। মুসলমানদিগকে খুশি করা নূতন ভারতশাসন আইনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা এরূপ রাখা হইয়াছে যে তাঁহাদিগকে রাজী না-করিয়া কেহ কিছু করিতে পারিবে না—অবশ্য গবর্ণর পারিবেন।

কিন্তু মুসলমানেরা ইহাও বুঝিয়া রাখুন, যে, দেশ ডোমীনিয়নত্ব কিংবা পূর্ণস্বাধীনতা না পাইলে মুসলমান বা হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ান কোন সম্প্রদায়েরই জনসাধারণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বা আর্থিক বা অন্যবিধ উন্নতি স্বশাসক দেশসমূহের দরিদ্রতম শ্রেণীসকলেরও সমান হইবে না—কেবল 'অভিজাত', 'সম্ভ্রান্ত', অনুগ্রহজীবী কতকগুলি লোকের সুবিধা হইবে।

বাঙালী হিন্দুরা অনেকে, হিন্দুসম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষায় মনোযোগী হইবেন, এরূপ সদস্য চাহিবেন। কিন্তু হিন্দু সদস্যের সংখ্যা এত কম রাখা হইয়াছে, যে, তাঁহারা সকলে সম্পূর্ণ একমত হইলেও কেবল নিজেদের ভোটের জোরে কিছুই করিতে পারিবেন না। গবর্ণরের দয়া হইলে তিনি কিছু করিবেন। কিন্তু দয়ার ভিখারী হওয়া মনুষ্যত্বের বিপরীত। অতএব, নূতন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা বা মন্ত্রীদের দ্বারা, হিন্দুর ইষ্টসাধন ত দূরের কথা, হিন্দুর অনিষ্ট নিবারণের আশাও কোন হিন্দু যেন না করেন। তাহা হইলেও, হিন্দু-হিতৈষী সদস্যপদপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া হিন্দু ভোটারদের কর্ত্তব্য। আগেই বলিয়াছি, যিনি ভারতবর্ষের জন্য অন্ততঃ ডোমীনিয়নত্ব না চান এরূপ কাহাকেও ভোট দেওয়া উচিত নয়—তিনি যে ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন।

—

ডোমীনিয়নত্ব ও পূর্ণ স্বরাজ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সব দেশ ডোমীনিয়ন, দক্ষিণ-আফ্রিকা ছাড়া অন্যত্র তাহাদের অধিকাংশ লোক ইউরোপীয়, কোথাও কোথাও অধিকাংশই ইংরেজ, এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও প্রভুত্ব যাহাদের তাহারা ইউরোপীয় বুঅর ও ইংরেজ। ডোমীনিয়নগুলির ভাষা প্রধানতঃ ইংরেজী এবং ধর্ম্মও প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। সুতরাং ব্রিটেনের লোকদের সহিত তাহাদের নানা রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ডোমীনিয়নত্ব লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা ইউরোপীয় নহে, ইংরেজ নহে; ভারতবর্ষের ভাষা ইউরোপীয় নহে; ধর্ম্মও প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নহে। সুতরাং ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের স্বাভাবিক কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। অতএব, ভারতবর্ষ শুধু ডোমীনিয়নত্বে সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

অবশ্য ডোমীনিয়নত্ব স্বাধীনতার সারাংশ বটে এবং ডোমীনিয়নত্ব লব্ধ হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আয়ারল্যাণ্ড ডোমীনিয়নত্ব পাইয়া পূর্ণস্বাধীন সাধারণতন্ত্র হইতে যাইতেছে। তাহাতে ব্রিটেন বাধা দিতে গেলে অসুবিধায় পড়িবে, বিপন্ন হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা একাধিক বার এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছে, যে,

ব্রিটেন তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাইবার চেষ্টা করিলে সে ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবে।

আগে বলিয়াছি, ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষ যদি একটা ডোমীনিয়ন হয়, তাহা হইলে ব্রিটেনের সহিত তাহাকে যে বাধ্যবাধকতা বা সম্পর্ক রাখিতে হইবে, অন্য সব স্বাধীন দেশের সহিত তাহার সেরূপ সম্পর্ক না রাখিবার কোন স্বাভাবিক কারণ নাই। ব্রিটেনের যতগুলি ডোমীনিয়ন আছে, তাহার প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ব্রিটেনের চেয়ে কম। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ব্রিটেনের সাত গুণ। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের ডোমীনিয়ন হওয়া সাজিবে না।

এ সমস্তই অবশ্য ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের কথা উঠিয়াছে, তখন ভবিষ্যতের কথাই বলিতে হইবে। তাহা অদূর ভবিষ্যৎ, দূর ভবিষ্যৎ বা সুদূর ভবিষ্যৎ হইতে পারে। একমাত্র পূর্ণ স্বরাজকেই আমরা লক্ষ্যস্থল বলিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে পারি।

—

স্বাজাতিকতা ও অন্তর্জাতিকতা

এ-কথা ঠিক, যে, যেমন কোন দেশের কোন মানুষই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে না, তাহাকে অন্যদের উপর নির্ভর করিতেই হয়, তেমনি কোন দেশের লোকই সম্পূর্ণরূপে অন্যদেশনিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই জন্য পৃথিবীর সব দেশের পক্ষে পরস্পরনির্ভরশীলতা খুব বড় আদর্শ। কিন্তু যাহাদের প্রকৃত জাতীয়ত্ব জন্মিয়াছে, যাহারা স্বাধীন হইয়াছে, তাহারাই আত্মসম্মানের সহিত অপর জাতিদের সঙ্গে প্রকৃত পরস্পরনির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। পরস্পরনির্ভরশীলতার অর্থ ইহা নহে, যে, একটা জাতি অন্য একটা জাতির আদেশ মানিয়া চলিবে কিন্তু অন্য সেই জাতিটা নিজের ইচ্ছামত চলিবে।

কেহ কেহ পরস্পরনির্ভরশীলতার (ইণ্টারডিপেণ্ডেন্সের) দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, ইহা যখন বড় আদর্শ তখন ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু সম্বন্ধটা ত পরস্পরনির্ভরশীলতা নয়। ভারতবর্ষকে যেমন ব্রিটেনের কথা শুনিতে হয়, ব্রিটেনকে ত তেমন ভারতবর্ষের কথা মানিতে হয় না। ভারতবর্ষ ডোমীনিয়ন হইলে অবশ্য উভয় দেশের মধ্যে, সম্পূর্ণ না হইলেও, বহু পরিমাণে প্রকৃত পরস্পরনির্ভরশীলতা জন্মিবে।

কিন্তু তাহার পরের কথাও কিছু আছে। ভারতবর্ষ শুধু ব্রিটে[illegible]ই কেন পরস্পরনির্ভরশীল হইবে? অন্য স্বাধীন দে[illegible] দোষ করিল? তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ পরস্পরনি[illegible] কেন না-হইবে? সব সময়ে সব দেশের সঙ্গে সব দেশের পরস্পরনির্ভরশীলতা জন্মিতে বা থাকিতে না পারে বটে; কিন্তু স্বাধীনতার একটি অর্থই এই, যে, স্বাধীন দেশ অন্য যে কোন দেশের সহিতই আবশ্যকমত সম্পর্ক স্থাপনে অধিকারী।

অতএব, স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজ্‌মের) পূর্ণ বিকাশ স্বাধীনতালাভে, এবং স্বাধীনতা লব্ধ হইলে তবে জাতিসমূহ পরস্পরনির্ভরশীল হইতে পারে। তখন অন্তর্জাতিকতার (ইণ্টারন্যাশন্যালিজ্‌মের) বাস্তব রূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের স্বাজাতিকতা এবং ইউরোপের বহু জাতির ও জাপানের স্বাজাতিকতায় প্রভেদ আছে। আমরা স্বাধীন হইয়া স্বাজাতিকতার বাস্তব রূপ উপলব্ধি করিতে চাহিতেছি, অন্য কোন দেশকে আমাদের অধীন করিয়া তাহাদের স্বাজাতিকতা নষ্ট করিতে চাহিতেছি না। ইউরোপের অনেক দেশ কিন্তু অন্য অনেক দেশে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের স্বাজাতিকতা নষ্ট করিয়াছে। এখনও তাহাদের অনেকের এই চেষ্টা থামে নাই। জাপানের স্বাজাতিকতাও ইউরোপের স্বাজাতিকতার মত।

যে স্বাজাতিকতার সহিত অন্তর্জাতিকতার বিরোধ নাই, বরং যাহা ব্যতিরেকে প্রকৃত অন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হইতে পারে না, আমরা সেই স্বাজাতিকতার পক্ষপাতী।

—

খাদ্যের ঘাটতি ও জলসেচনের প্রয়োজন

গবর্ণর-জেনার‍্যাল লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষে সকলের যথেষ্ট খাদ্য পাওয়ার প্রয়োজন জানাইয়াছেন এবং যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত জলসেচনের যথেষ্ট বন্দোবস্ত দরকার বলিয়াছেন। ঠিক্ কথা।

এ-পর্য্যন্ত কিন্তু বঙ্গে জলসেচনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক হইয়া আছে। পঞ্জাব সিন্ধু প্রভৃতি বহু প্রদেশে জলসেচনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বঙ্গে তাহার তুলনায় কিছুই হয় নাই। যে-সকল প্রদেশে এ-যাবৎ জলসেচনের কৃত্রিম খাল প্রভৃতির জন্য বহু কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, তাহাদের নিজের অত খরচ করিবার টাকা প্রাদেশিক তহবিলে কখনও ছিল না, ভারত-গবর্মেণ্টের টাকাতেই তাহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত-গবর্মেণ্ট টাকা পান প্রদেশগুলিতে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে। বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হয় এবং বঙ্গের প্রাদেশিক তহবিলকে বঞ্চিত করা হয় সকলের চেয়ে বেশী ও ভারত-গবর্মেণ্ট বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে শতকরা সকলের চেয়ে বেশী টাকা লইয়া থাকেন। ইহা মেস্টন য়্যাওয়ার্ডেরও আগে হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং যে-সকল প্রদেশে

ভারত-গবর্ন্মেন্টের টাকায় জলসেচনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিক অনেকটা বঙ্গের রাজস্ব হইতেই সুবিধা পাইয়াছে। অথচ বাংলা দেশ সেই সুবিধা পায় নাই।

বঙ্গের পক্ষে আরও অসুবিধার কথা এই, যে, অতঃপর জলসেচন একটা প্রাদেশিক বিষয় ও বিভাগ হইবে, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ইহার জন্য কিছু করিবেন না, এবং নূতন বন্দোবস্তে বাংলা দেশ প্রায় পূর্ব্ববৎ নিজের রাজস্ব হইতে বহুপরিমাণে বঞ্চিত হইতে থাকিবে।

অর্থাৎ জলসেচন যখন ভারত-গবর্ন্মেন্টের এলাকাভুক্ত ছিল তখন, ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বঙ্গের টাকা খুব লইতেন বটে, কিন্তু বঙ্গে জলসেচনের জন্য বিশেষ কিছু করিতেন না, করেন নাই; এবং অতঃপর যখন জলসেচন প্রাদেশিক বিষয় হইল, তখন ত ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বঙ্গের জন্য কিছু করিবেনই না এবং বঙ্গের প্রাদেশিক তহবিলেও বেশী কিছু টাকা থাকিবে না!

এখন বাঙালীরা বাংলা-সরকারকে ক্রমাগত খোঁচা দিয়া যা পারেন করান, এবং নিজেদের বেসরকারী চেষ্টায় যাহা সম্ভব করুন; যেমন বীরভূমে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় করা হইয়াছে। (অগ্রহায়ণ সংখ্যার জন্য লিখিত)

—

রঁাচীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন রঁাচীতে হইবে, তাহা আমাদের কাগজে ও অন্যত্র পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, যে, তাহা নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
সভাপতি, মূল সম্মেলন ও সাহিত্য-বিভাগ

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র
সভাপতি, বিজ্ঞান-বিভাগ

২৬শে ডিসেম্বর রাত্রে সম্মেলনের পরিচালক-সমিতির সভা।

২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১১টা হইতে ৩টা—সভাপতি বরণ, অভ্যর্থনা-সমিতির ও মূল সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্য বিভাগের অধিবেশন। সন্ধ্যা ৫॥টা হইতে সঙ্গীত-বিভাগের অধিবেশন, পরে সঙ্গীতের বৈঠক।

২৮শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় রামানন্দ-সম্বর্দ্ধনা। বেলা ১১টায় শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিকী বিভাগের অধিবেশন। ২॥টায় অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধিবেশন। বেলা ১১টায় শিল্প বিভাগের অধিবেশন।

শ্রীঅনুরূপা দেবী
সভানেত্রী, মহিলা-বিভাগ

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি—শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিকী বিভাগ

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি—ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ ও নৃতত্ত্ব বিভাগ

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত
সভাপতি, দর্শন-বিভাগ

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগ

৩টা হইতে ৫টায় ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদিগের নৃত্য। সন্ধ্যা ৬টায় বিজ্ঞান বিভাগের অধিবেশন। রাত্রি ৮টায় ছোঃ নৃত্য। আহারাদির পর বিষয়নির্ব্বাচনী-সমিতির অধিবেশন।

২৯শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় দর্শন-বিভাগের অধিবেশন। বেলা ১২।।টায় ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ ও নৃতত্ত্ব বিভাগের অধিবেশন। ২টায় মহিলা-বিভাগের অধিবেশন। সন্ধ্যা ৫টায় মূল সভার অধিবেশন। রাত্রে আমোদ-প্রমোদ।

অভ্যর্থনাসমিতি জানাইয়াছেন, সম্মেলনে পঠনীয় প্রবন্ধ এবং বিবেচ্য প্রস্তাবাদি ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায়ের নামে, হিন্দু ডাক-

শ্রীশিবেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি সঙ্গীত-বিভাগ

ডাঃ রাধারমণ চৌধুরী
প্রধান কর্ম্মসচিব

ঘর, রাঁচী, ঠিকানায়, পাঠাইতে হইবে। প্রতিনিধি-নিবাস
-২৬শে ডিসেম্বর সকাল হইতে ৩০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত

অভ্যর্থনাসমিতির কর্ম্মপরিচালকগণ।

বামদিক হইতে, দণ্ডায়মান—শ্রীলালমোহন ধর চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক ; শ্রীনলিনীকুমার চৌধুরী, সহঃ সম্পাদক ; শ্রীতারকনাথ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ ; শ্রীনারায়ণ গুপ্ত সম্পাদক—প্রচার-বিভাগ, শ্রীশশিভূষণ ঘোষ সম্পাদক—সাহিত্য-বিভাগ ; শ্রীফণীন্দ্রনাথ আয়কত, সম্পাদক—সভামণ্ডপ-বিভাগ ; শ্রীকালীশরণ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক ; শ্রীকৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক—স্বেচ্ছাসেবক-বিভাগ
উপবিষ্ট—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ, সম্পাদক—প্রদর্শনী-বিভাগ ; শ্রীমধুসূদন সরকার সহঃ সম্পাদক, প্রদর্শনী-বিভাগ ; শ্রীঅবনীমোহ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক ; রায় বাহাদুর শ্রীশরৎ চন্দ্র রায় সভাপতি, অভ্যর্থনাসমিতি ; শ্রীশান্তশীলা রায়, সম্পাদিকা, মহিলা-বিভাগ ; রায় বাহাদুর শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি ; শ্রীনন্দকুমার ঘোষ সহকারী সভাপতি।

খোলা থাকিবে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাঁচীতে শীত খুব বেশী। অতএব প্রতিনিধিগণের ও দর্শকবর্গের যথোপযুক্ত শীতবস্ত্র এবং রাত্রির জন্য বিছানা ও লেপ কম্বল যথেষ্ট লইয়া যাওয়া আবশ্যক।

অভ্যর্থনাসমিতি খবরের কাগজে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে রাঁচী যাইবার পথ বিস্তারিত ভাবে ছাপাইয়া দিয়াছেন।

সাধারণ সভাপতির, মহিলা-বিভাগের সভানেত্রীর, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সভাপতির নাম আগেই অনেক খবরের কাগজে ও প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। শিল্প-বিভাগের কথা আগে জানাইতে পারা যায় নাই। তাহার পরিচালক হইবেন শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়ের ফোটোগ্রাফ আমরা আগেই প্রকাশিত করিয়াছি। এবার অন্য কর্ম্মীদের ফোটোগ্রাফও মুদ্রিত হইল।

সাধারণ সভাপতির, মহিলা-বিভাগের সভানেত্রীর, এবং বিভাগীয় সভাপতিগণের ছবিও দিলাম। কেবল শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় মহাশয়ের ছবি দিতে পারিলাম না।

রাঁচী সম্বন্ধে অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম। এবার তাহার ও তাহার সন্নিহিত স্থান-সমূহের সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

বৎসরান্তে বহুদূরের বহু পরিচিত ব্যক্তির দর্শনলাভ ও তাঁহাদের সংস্পর্শে আসা আনন্দদায়ক। যাঁহাদের সহিত আগে পরিচয় ছিল না তাঁহাদের সহিত পরিচয় ও সংস্পর্শও সুখকর। বাঙালী জাতির যিনি যেখানেই থাকুন, সকলের সহিতই যে আমাদের আত্মীয়তা আছে হৃদয়ের যোগ আছে, যে-প্রতিষ্ঠান তাহা স্মরণ করাইয়া দেয় তাহার গৌরব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহার অধিবেশনে যে অনেক সুলিখিত সুচিন্তিত অভিভাষণ পঠিত হয়, অন্য ভাল প্রবন্ধও পঠিত হয়, তাহা সুবিদিত।

অধিবেশনের সহিত চিত্তবিনোদনের নানা সুব্যবস্থাও থাকে।

অন্তিম শয্যায় ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

—

ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের ৪৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় আমরা ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। সাংবাদিকদিগের মধ্য হইতে এক জন প্রতিভাশালী লেখকের তিরোধান হইয়াছে। তিনি ১৩ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন; ১৪ই প্রাতে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে নানা প্রকার সারবান্ প্রবন্ধ লিখিতেন, গল্প লিখিবার শক্তিও তাঁহার ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণাতে তাঁহার অনুরাগ ছিল। গবেষণামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। লেখাতে তাঁহার উৎসাহ ছিল, লিখিতে ভাল লাগিত বলিয়া, লেখার দ্বারা দেশের লোক-দের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া, দেশের হিত হইবে বলিয়া—অর্থলাভের সম্ভাবনা বা আশা তাঁহার উৎসাহের কারণ ছিল না। তিনি মিতবাক্, নম্র ও সাতিশয় শিষ্টাচার-সম্পন্ন ছিলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। এই সকল গুণে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সহকর্ম্মীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের এক জন বিশিষ্ট সেবক হইতে পারিতেন।

—

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনী

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন গত ৪৬ বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। এবার ইহার ষট্‌চত্বারিংশ অধিবেশন পূজার ছুটিতে টাঙ্গাইলে হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে এই সম্মিলনীর কোন গুরুত্ব আছে কিনা তাহা স্থির করিবার ভার তাঁহাদের উপর—আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের লোক। কিন্তু দুটি কারণে টাঙ্গাইলের অধিবেশনটির

টাঙ্গাইলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র

টাঙ্গাইলে কৃষ্ণকুমার মিত্র। বাম পার্শ্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

বিশেষত্ব ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য লোকদের নিকটও আছে, ইহা বলা আবশ্যক মনে করি।

ইহার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মদের চেয়ে সংখ্যায় বহু শতগুণ অধিক স্বদেশবাসীর সেবা, রাজনীতি, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, মাদকতা নিবারণ, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, সুনীতি সংরক্ষণ, অবনত জাতিসমূহের উন্নতিসাধন, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দান, নারীরক্ষা প্রভৃতি কার্য্যক্ষেত্রে করিয়া গিয়াছেন। সার্ব্বজনিক কার্য্যে বৃহৎ সভাস্থলে এই কর্ম্মবীরের শেষ আবির্ভাব টাঙ্গাইলে হইয়াছিল, ইহা স্মরণীয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানাধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশী নানা পণ্যশিল্পের কারখানার এক জন প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া সুবিদিত, দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদের অন্যতম প্রধান সহায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানে, এক দিকে চরখা ও খদ্দরের এবং অন্য দিকে স্বদেশী কাপড়ের কলের কার্য্যতঃ সমর্থক তিনি, দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদাতা, এবং তাহাদেরই মত দীনভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহক তিনি। বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব আছে। টাঙ্গাইলেই তিনি প্রথম, অন্যান্য কথার মধ্যে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপযোগিতার কথা বলিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্যা একটি নহে, অনেক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অসদ্ভাব ও বিরোধ তন্মধ্যে অন্যতম। সে-বিষয়ে আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন:—

হিন্দুতে মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, এবং জাতিতে জাতিতে, যদুবংশ-ধ্বংসের ন্যায় যেরূপ আত্মঘাতী মহা-যুদ্ধের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষ-বহ্নির ধূমায়মান শিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করতঃ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিম ঘাটে আরব-সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ,—

"এক জাতি, এক ভগবান
এক দেশ, এক মন প্রাণ",

এই আদর্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত সহস্র বৎসরেও সম্ভব হইবে না।

প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী মানুষেরই ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আছে। আচার্য্য রায় তাঁহার মত অনুসারে উপায় বলিয়াছেন।

আর একটি সমস্যা হিন্দু অবনত জাতিদের অবস্থা এবং তাহাদের অসন্তোষ। আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণের একাধিক স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

যুগপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের অবনত শ্রেণীর দুর্দ্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন—

"যদি কারুর আমাদের চেয়ে নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা ভরসা নাই—সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু?—এ কি অত্যাচার! আমেরিকার সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎ মান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেণ্ট হইবারও আশা রাখে। আর, আমাদের দেশে? Once a cobbler, ever and always a cobbler—মুচির ছেলে ছাপ্পান্ন পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তাহার আর কোনও উচ্চ আশা নাই—থাকিতে পারে না। কারণ, এদেশে মুচির ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।"

পাঞ্জাবের ভাঙ্গী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—

হিন্দু পড়্ হে পোথিয়া, মুছলমান কোরা, চুড়া নীচ প্লীচীয়া না জিমিন না আস্মা।

হিন্দুর পুঁথি আছে, মুসলমানদের কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য চুড়াদের স্বর্গও নাই, মর্ত্ত্যও নাই—তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন করিতেই আসিয়াছে।

হায় আমরা কি মানুষ!—ঐ যে হাড়ী, ডোম, বাগ্দী, চামার, মালী, মাইঠ্যাল, তোমার বাড়ীর আশেপাশে চারিদিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্য তোমরা এই যুগযুগান্তর ধরিয়া কি ক'রেছ ব'লতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, কাছে আস্তে দাও না—দূর দূর কর। জাপানী কুকুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়ে বেড়াও—আর সুশ্রী সবল হৃষ্টপুষ্ট নাদুস্-নুদুস্ মুচির ছেলেটি যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে, তবে জাত গেল ধর্ম্ম গেল বলিয়া হুঙ্কার দিয়া ওঠ!

এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্ম্মী! কে আছ বীর! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃতধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও।

বাঙ্গলার নিগৃহীত, এবং নিপীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে আজ সঙ্গীত উঠুক,—

> "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়।
> তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়!
> হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে,
> নবীন আশার খড়্গ তোমারি হাতে,
> জীর্ণ আবেশে, কাটো সুকঠোর ঘাতে,
> বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।"

—

"নিখিল-ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন"

বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে সেই দেশের বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলন হইবে, ইহা সুসংবাদ। আমরা দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন রেঙ্গুন গিয়াছিলাম, তখন সেখানকার কাহারও কাহারও কাছে এইরূপ সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম; প্রবাসীতেও হয়ত লিখিয়াছিলাম। এখন যে সম্মেলন হইতে যাইতেছে তাহা অবশ্য আমাদের সেই প্রস্তাবের ফল নহে। কথাটা তুলিলাম আমাদের আনন্দের একটা কারণ জানাইবার জন্য। আমাদের এত দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে যাইতেছে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধিবেশনটির প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত বিনয়শরণ কাহালী তাঁহার নিমন্ত্রণপত্রে লিখিয়াছেন,

আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ হইতে ব্রহ্মদেশ ভারত-সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মবিচ্ছেদের পূর্ব্বেই রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রহ্মের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকা হইতে বাংলা ভাষা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশে বাংলা সাহিত্য চর্চ্চা ও বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই সম্মিলনের অধিবেশনে ব্রহ্মদেশে একটি স্থায়ী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা এবং এখানে একটি বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিব।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ
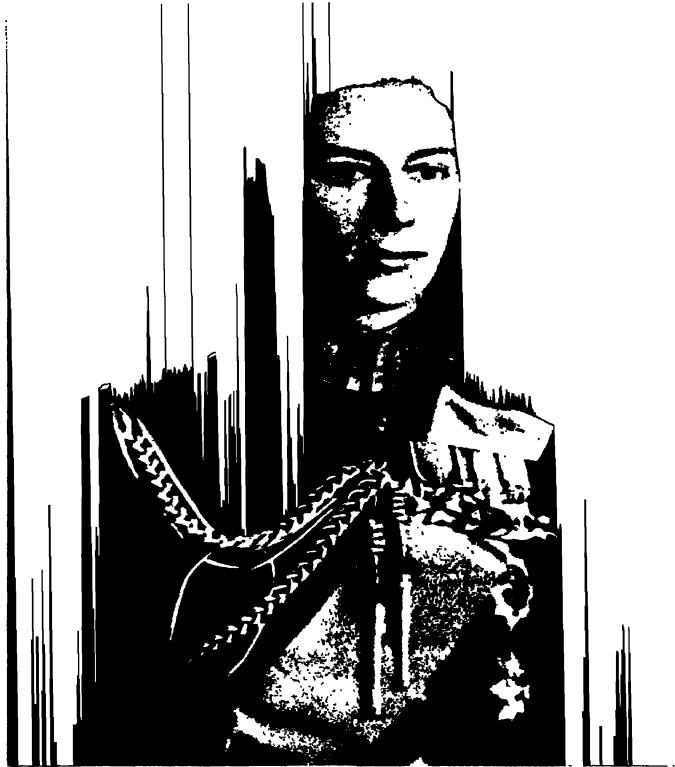
রাজকুমারী এলিজাবেথ ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ

রাজমাতা মেরী ও ভূতপূর্ব্ব রাজা এডোয়ার্ড
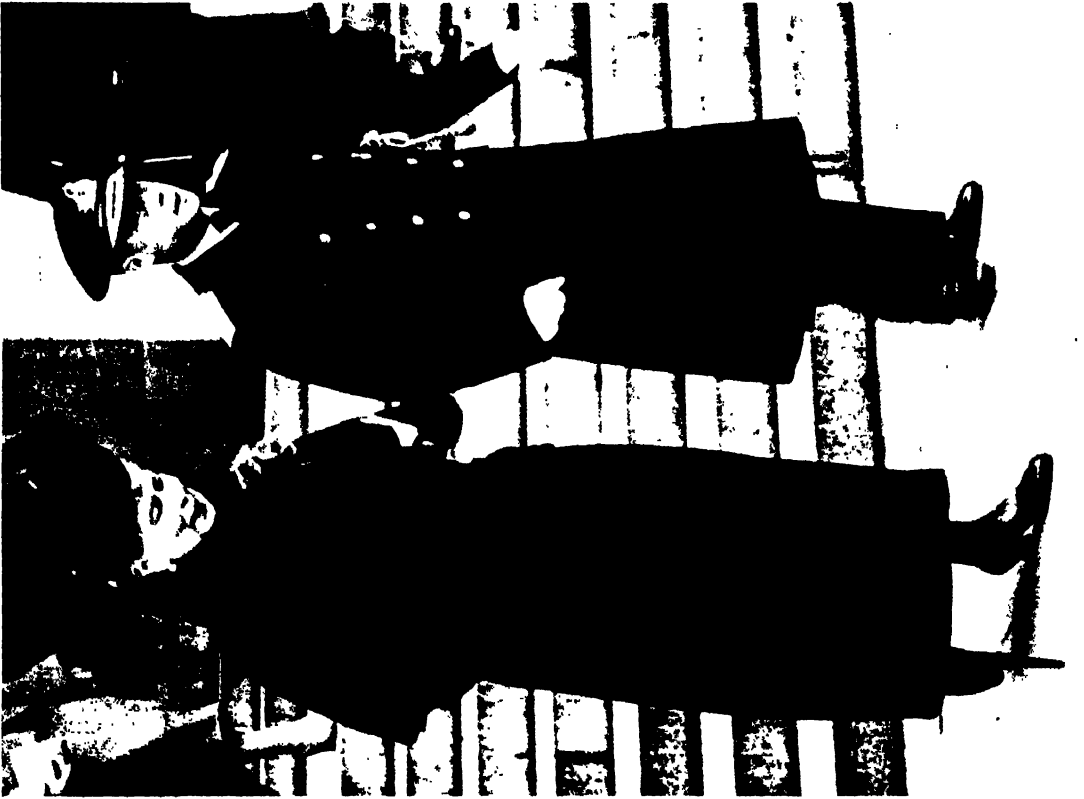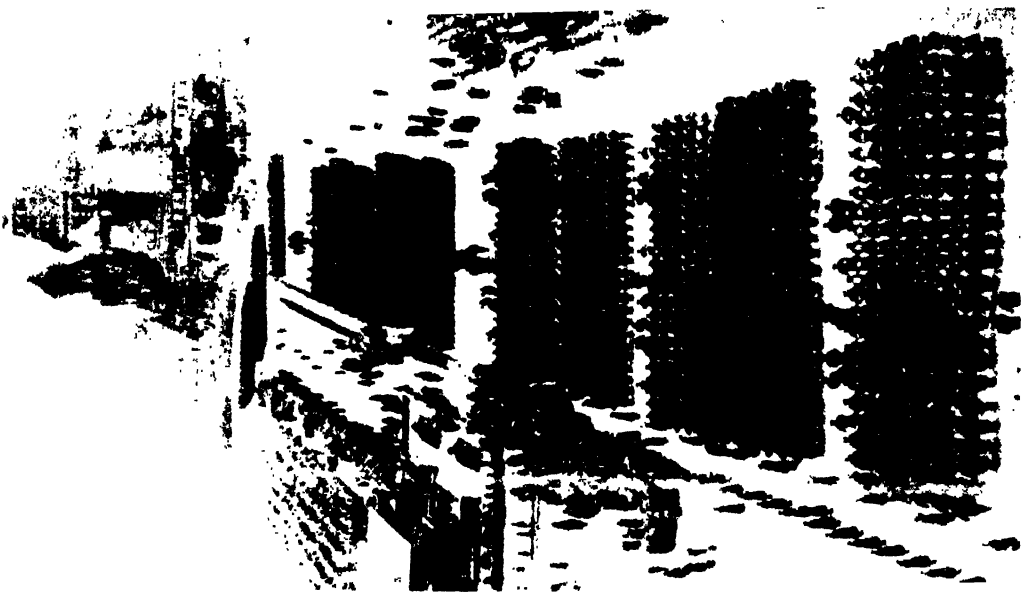
রাশিয়ার বিদ্রোহ-বার্ষিকীতে মস্কোতে 'রেড আর্মি'

উপরে : রাশিয়ার সমর-প্রস্তুতি। বলশেভিক বিদ্রোহের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মস্কোতে 'রেড আর্মি'র কুচকাওয়াজ

নীচে : রাশিয়ার বিদ্রোহ-বার্ষিকীতে স্পেনের প্রতিনিধিগণের শোভাযাত্রা
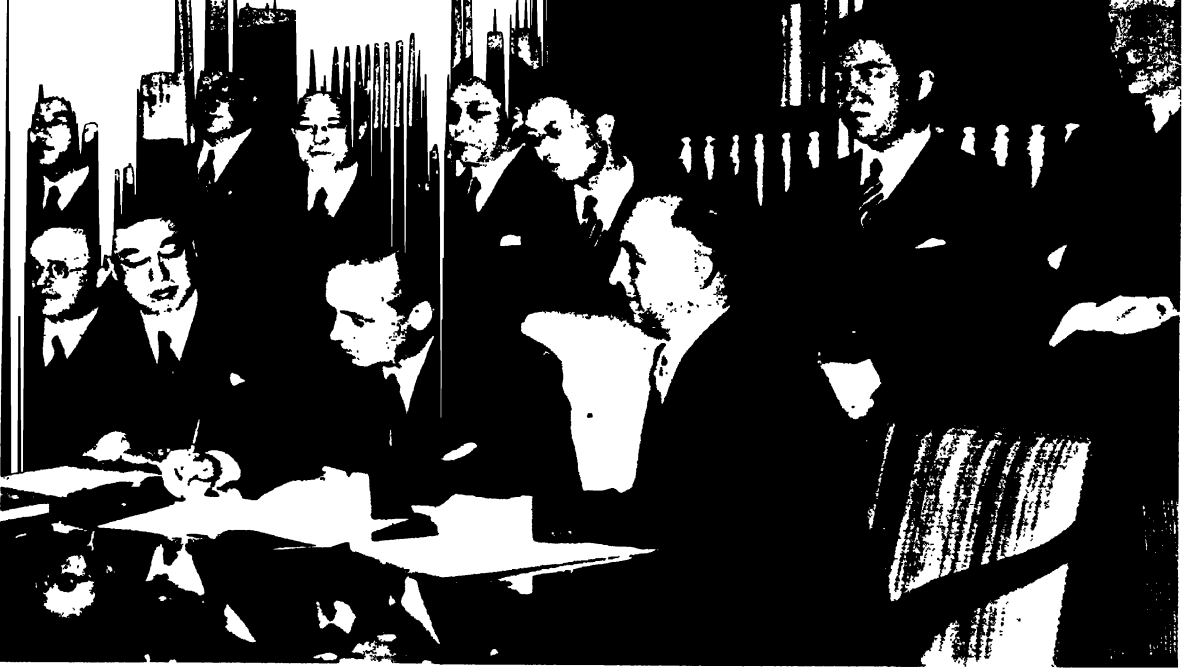
বার্লিনে জাপ-জর্ম্মন চুক্তির স্বাক্ষর। জর্ম্মন প্রতিনিধি রিবেনট্রপ চুক্তিপত্রে সহি করিতেছেন
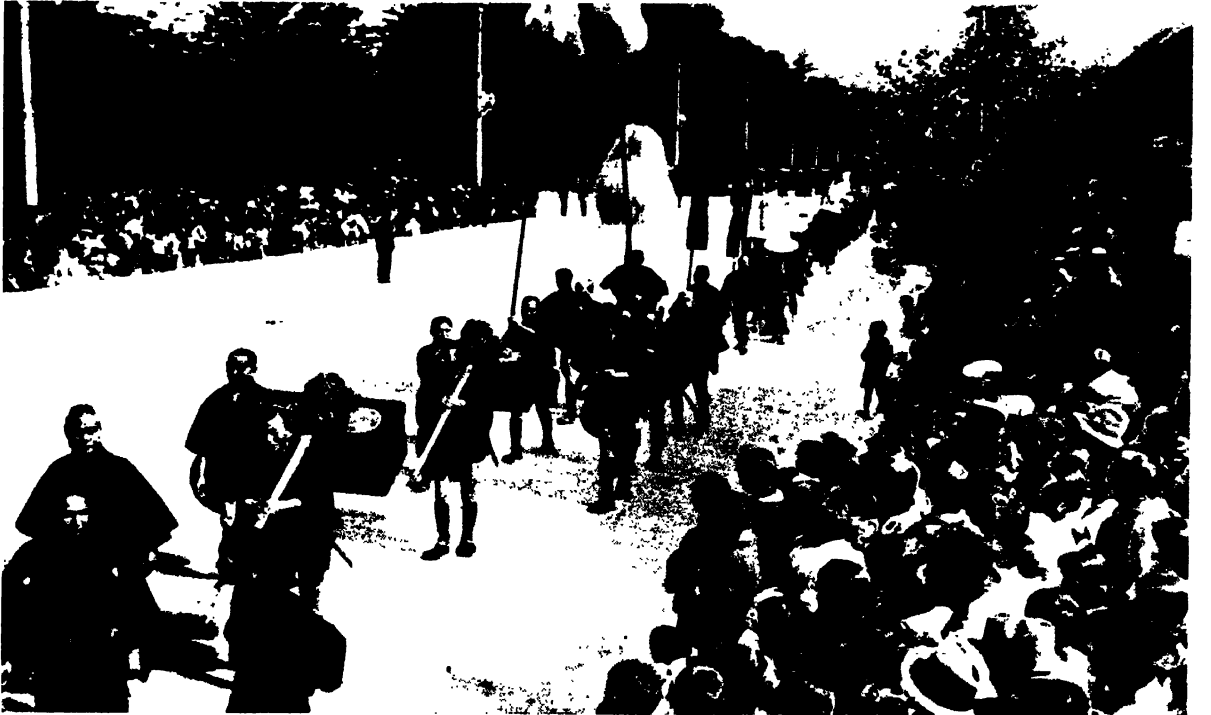
জাপানের একটি শোভাযাত্রা

আমরা প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ইতিপূর্ব্বে "ব্রহ্মে বাঙালীর মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়াছি। তাহা সময়োচিত বিবেচিত হইতে পারে।

অভ্যর্থনা-সমিতি যে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে,

> আগামী ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ পর্য্যন্ত পর্য্যাবিত নিখিল বঙ্গ প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের রেঙ্গুনে অধিবেশন হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ ডি লিট (লণ্ডন) মহাশয় সম্মিলনে মূল সভাপতিত্ব করিবেন। সাহিত্য ও কলা, দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান ও সংগীত এই কয় শাখায় সম্মিলনের পৃথক পৃথক অধিবেশন হইবে। প্রতিনিধিগণের আনন্দবিধানের জন্য অভিনয় ও নৃত্য গীতোৎসবের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সম্মিলনের প্রতি শাখা অধিবেশনে পাঁচটি করিয়া প্রবন্ধ পঠিত হইবে। শাখা অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য প্রবন্ধ প্রেরিত হইলে তাহা রেঙ্গুনে গৃহীত হইবে। পঠিতব্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার শাখা-সভাপতিগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। যাহাতে এই সম্মিলন সাময়িক চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে এক স্থায়ী সাহিত্য-সম্মিলন গঠনের কল্প। মূল অধিবেশনে প্রস্তাবিত হইবে এবং আশা করা যায় যে বাঙ্গালী জনসাধারণ এই প্রস্তাবটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যাবত্তার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। পাণ্ডিত্যের উপর আবার তাঁহার বহুদেশ সম্বন্ধে ভ্রমণলব্ধ সাক্ষাৎ-জ্ঞান আছে। ব্রহ্মের মূল অধিবাসীরা এবং সেই সেই দেশে প্রবাসী বিদেশীরা নিজ নিজ মাতৃভাষার চর্চ্চা এবং নিজ নিজ দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের চর্চ্চা কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে তাহা তিনি বলিতে পারিবেন।

আমরা ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের এই চেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য আশা করিতেছি। সম্মেলনের সকল দিনের অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দৈনিকপত্রসমূহে প্রেরণের বন্দোবস্ত অভ্যর্থনা-সমিতি সহজেই করিতে পারিবেন।

—

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়

৭ই পৌষ ও তাহার পরবর্ত্তী দিবসের উৎসবের পর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা এক পক্ষ কাল ছুটি পান। তখন তাঁহারা অনেকে দল বাঁধিয়া দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হন। তাহাতে আনন্দ স্বাস্থ্য ও দৈহিক দৃঢ়তা লাভ হয় এবং দেশ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান জন্মে।

এই ছুটির পর বিদ্যালয়-বিভাগে যতগুলি নূতন ছাত্রছাত্রীর জায়গা হইতে পারে, বাছিয়া তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হয়। আমরা প্রায় প্রতি বৎসরই এই সুযোগের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকি, এবারও করিতেছি। যাঁহারা নিয়মাবলী জানিতে চান, তাঁহারা শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিবেন।

—

ঢাকেশ্বরী মিলের বস্ত্রদান

এ বৎসর বাংলা দেশের অনেক জেলায় অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। নিরন্ন লোকদের বেদনা যে অন্নাভাব ঘটিয়াছিল তাহা নহে। দারিদ্র্যবশতঃ তাহারা আবশ্যকমত বস্ত্রও কিনিতে পারে নাই। এখন শীত পড়িয়াছে। অনেকে এখনও বস্ত্রের অভাব অনুভব করিতেছেন। কোন কোন কাপড়ের মিল নিরন্ন লোকদিগকে অনেক কাপড় দিয়া থাকে। বর্ত্তমান বৎসর লক্ষ্মী মিল বাঁকুড়া সম্মিলনীকে কাপড় দিয়া তাহার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন জানি, কেননা বাঁকুড়া সম্মিলনীর সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে। কিন্তু অন্য সব মিলের খবর জানিতাম না। সম্প্রতি ঢাকেশ্বরী মিলের কর্ম্মকর্তার চিঠিখানা পাইয়া প্রীত হইয়াছি, কিন্তু উহা এত দিন যে ছাপিবার জায়গা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই মিল দুর্ভিক্ষ-নিবারণে ব্যাপৃত যে-সকল সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কাপড় দিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ৩৩। এই মিল মোট ২১৭৭½ জোড়া ধুতি ও শাড়ী দান করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার ডিরেক্টরদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

—

রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ

রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টম এডোয়ার্ড নাম লইয়া সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তিনি অবিবাহিত অবস্থাতে রাজা হন। বিবাহ করিবেন কিনা, করিলে কাহাকে করিবেন, এ-বিষয়ে অনেক কল্পনা-জল্পনা চলিতে থাকে। কিন্তু ঠিক্ কোন খবর বিলাতী কাগজগুলাতে প্রকাশিত হয় নাই। কয়েক মাস হইতে কিন্তু আমেরিকান অনেক কাগজে মিসেস সিমসন নাম্নী এক আমেরিকান নারীর সহিত রাজা এডোয়ার্ডের অধিক ঘনিষ্ঠতার নানা বিস্তারিত সংবাদ ও আখ্যান মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। শেষে বিলাতী কাগজেও ঐরূপ খবর বাহির হয়।

মিসেস্ সিমসনের সহিত তাঁহার প্রথম স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে—কাহার দোষে জানি না। তাহার পর তিনি আবার বিবাহ করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে তিনি মিসেস্ সিমসন নামে পরিচিত। কিছু দিন পূর্ব্বে এই দ্বিতীয় স্বামীর সহিতও এই আমেরিকান নারীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আদালতে বিচারের বৃত্তান্ত হইতে মনে হয়, মিঃ

সিমসন দোষী। এই বিবাহবিচ্ছেদের তারিখ হইতে ছয় মাস কাল মিসেস্ সিমসন নির্দোষ জীবন যাপন করিলে ইহা কায়েম হইবে এবং তিনি তখন আবার বিবাহ করিতে পারিবেন। ইহাতেও বাধা জন্মিতে পারে।

রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানান (—কখন্, জানি না), এবং মিসেস্ সিমসন তাহাতে রাজী হন।

বিবাহিতা নারীর সহিত অষ্টম এডোয়ার্ডের যেরূপ ঘনিষ্ঠতার কথা কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। তাহাই পরোক্ষ ভাবে মিসেস্ সিমসনের দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদের কারণ কিনা, জানি না।

দুইবার বিচ্ছিন্নবিবাহা যে-নারীর দুই পূর্ব্বস্বামী জীবিত, তাঁহার সহিত কোন পুরুষের - বিশেষতঃ কোন রাজার — বিবাহ যাহাদের ভাল লাগে না, এমন লোক পাশ্চাত্য দেশ-সমূহেও অনেক আছে; হিন্দুভারতে ত বিস্তর আছেই। এরূপ বিবাহকে আদর্শ বিবাহ হয় ত কোন দেশের লোকেই মনে করে না। কিন্তু কোন্ বিবাহটি আদর্শ বিবাহ কোন্টি নয়, তাহার বিচার এখন অপ্রাসঙ্গিক।

ইংলণ্ডের রাজার সহিত এরূপ নারীর বিবাহ অবৈধ হইত, তাহা কেহই বলে নাই। তাঁহার পক্ষে ইহা দুর্নীতির কাজও হইত না। কিন্তু তথাকার অভিজাত ও "ভদ্র" সমাজ এরূপ নারীকে রাণী বলিয়া অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহা বৈধ ও স্বাভাবিক। ব্রিটেনের রাজা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইংলণ্ডীয় শাখার রক্ষক ও শিরোমণি ("Defender of the Faith"), অথচ ইহার একটি মত অনুসারে বিচ্ছিন্নবিবাহা নারী ও তাহার নূতন স্বামী ইহার কম্যুনিয়ন নামক ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে না। রাজা এডোয়ার্ড আনুষ্ঠানিক ধার্ম্মিক ছিলেন না। ইংলণ্ডীয়-খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মের পুরোহিতেরাও এই জন্য তাঁহাকে পছন্দ করিত না। এবং তিনিও ঐ ধর্ম্মের রক্ষক হওয়া বোধ হয় পছন্দ করিতেন না, কারণ তাঁহার সিংহাসনত্যাগ-ঘোষণায় তিনি নিজের অন্যতম উপাধি "ধর্ম্মরক্ষক" ("Defender of the Faith") ব্যবহার করেন নাই। অন্য দিকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের সহিত, শ্রমিক কৃষক প্রভৃতির সহিত, ঐ রাজার ঘনিষ্ঠতা ছিল ও বাড়িতেছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহে কোন আপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কোন সংবাদ রটে নাই। এই সব কারণে এরূপ কথাও উঠিয়াছে, যে, ইংলণ্ডের স্থিতিশীল স্থাণুবৎ নেতারা ও পুরোহিতগণ রাজার শ্রমিক-কৃষকপ্রেমে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার সিংহাসনত্যাগ ঘটাইয়াছে।

মর্গ্যান্যাটিক বিবাহ নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট "বামাচার" বিবাহের কথা অষ্টম এডোয়ার্ড তুলিয়াছিলেন। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী মত দেন নাই। না দিবারই কথা। তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন। এরূপ বিবাহ বৈধ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন সন্তানগণ পিতার উপাধি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। সুতরাং এরূপ বিবাহ দ্বারা বিবাহিতা নারী ও তাঁহার সন্তানবর্গকে অপমানই করা হয়।

সব দিক্ দিয়া অবস্থা এই প্রকার দাঁড়ায় যে, অষ্টম এডোয়ার্ড হয় মিসেস্ সিমসনকে ত্যাগ করুন, নতুবা সিংহাসন ত্যাগ করুন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পিতা পঞ্চম জর্জের নির্দিষ্ট তাঁহাদের রাজবংশের "উইণ্ডসর" নাম অনুসারে মিঃ উইণ্ডসর নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মিসেস্ সিমসনও ইতি-পূর্ব্বেই প্রকাশ্যভাবে জানাইয়াছিলেন, যে, তিনি সরিয়া পড়িলে যদি সঙ্কট অবস্থার অবসান হয়, তাহা হইলে তিনি সরিয়া পড়িতে, অর্থাৎ রাজাকে বিবাহ-প্রতিশ্রুতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে, রাজী আছেন।

ইংলণ্ডের রাজা কাহাকে বিবাহ করিবেন বা না-করিবেন, সে-বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার অধিকার ইংলণ্ডের মন্ত্রীদের, পার্লেমেণ্টের ও জনসাধারণের আছে, ডোমীনিয়ন-গুলিরও আছে। ভারতবর্ষ পরাধীন বিদেশ। ভারতবর্ষের মত কেহ জানিতে চায় নাই, জানিতে চাহিবার কথা নয়, জানিতে না-চাওয়ায় ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্রও অগৌরব হয় নাই। বরং গায়ে পড়িয়া কিছু বলিতে যাওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মাবমাননা ও অনধিকারচর্চ্চা হইত।

তবে বিদেশী খুব বড় এক জন সম্রাট যেমন মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত, ভারতবর্ষের লোক আমরাও তেমনই মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। এক জন মানুষের আচরণ সম্বন্ধে অন্য এক জন মানুষের ভদ্রভাবে মতপ্রকাশ অনুচিত নহে। সেই জন্য আমরা অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিব।

এক কথায় বলি, তিনি মিসেস্ সিমসনকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বা সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া যে সিংহাসন ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন, ইহা মানুষের মত কাজ, পুরুষের মত কাজ, হইয়াছে। যে-পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করিবার কথা দিয়া কথা রাখে না সে অমানুষ সে কাপুরুষ—সেই নারী কুমারী, বিধবা বা বিচ্ছিন্ন-বিবাহা, যাহাই হউন। এই কাজটির দ্বারা অষ্টম এডোয়ার্ড সিংহাসন হারাইলেন কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন।

মিসেস্ সিমসনও যে সরিয়া পড়িতে রাজী ছিলেন, তাহাও প্রশংসনীয়।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি, মিসেস্ সিমসনের বিবাহিত অবস্থাতেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা এডোয়ার্ড না করিলে ভাল করিতেন।

শুধু ইংলণ্ডে নয়, অন্য অনেক দেশেও, পুরুষদের, বিশেষ করিয়া 'সম্ভ্রান্ত' লোকদের, এবং আরও বিশেষ করিয়া রাজারাজড়াদের, দুর্নীতি সমাজ সহ্য করে, ধর্ম্মধ্বজী পাদরী পুরোহিতেরা সহ্য করে। রাজা এডোয়ার্ডের যদি বহু স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সম্পর্ক থাকিত, যদি তিনি মিসেস্ সিমসনকে মর্গ্যান্যাটিক রকমে বিবাহ করিতেন, এবং তদুপরি যদি তিনি কোন রাজবংশীয়া বা অভিজাতবংশীয়া কোন নারীকে "পোষাকী" রাণী করিতেন, তবে তাহা ইংলণ্ডে বোধ হয় সহিয়া যাইত। কেবল মিসেস্ সিমসনকে রাণী করাটা সহিবে না, এই রকম ভাব বিলাতে খুব বেশী প্রকাশ পাইল! ইহাতে ব্রিটিশ উচ্চশ্রেণীসমূহের প্রতি মনটা শ্রদ্ধায় ভরপুর হইতেছে না।

—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় বোর্ড

বঙ্গে বাঙালীর স্থান রক্ষার, বঙ্গে বাঙালীর প্রাধান্য রক্ষার চেষ্টা করিলেই অন্য প্রদেশের অনেক লোক মনে করে ও বলে বাঙালীর প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বড় বেশী। এই সব লোককে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, বঙ্গেও যদি বাঙালীদের স্থান ও প্রাধান্য না থাকিবে, তাহা হইলে কোথায় থাকিবে? কোথাও থাকিবে না? সত্য বটে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকই ভারতীয় এবং সকলেরই সর্ব্বত্র যোগ্যতা অনুসারে স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকেরা তথায় পুরুষানুক্রমে বাসিন্দা বাঙালীরও প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের সহিত পছন্দ করেন কি? যাহা হউক, এ-বিষয়ে তর্ক না করিয়া যাহা বলিতে যাইতেছিলাম বলি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বঙ্গের লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন ও মনোনয়ন দুই-ই হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচিতদের মধ্যে দু-জন বাঙালী আছেন—শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি। অন্য নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের নাম শ্রীযুক্ত ব্রিজমোহন বিড়লা, সর্ বদরীদাস গোয়েঙ্কা ও মিঃ ওয়ার্ডলী। ব্যাঙ্কের কাজ ও ব্যবসা ইঁহারা বুঝেন না, এরূপ কেহ বলে নাই। বিড়লা মহাশয় সকলের চেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছিলেন—সম্ভবতঃ তাঁহার প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে বাঙালী অংশীদারদের ভোটই বেশী ছিল। তিনি তাঁহার কতক ভোট মিঃ ওয়ার্ডলীকে দেওয়ায় এই ইংরেজটি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি যদি এই ভোটগুলি ইংরেজকে না-দিয়া বাঙালী ডাঃ এম্ এম্ রায়কে দিতেন, অন্ততঃ যদি ইংরেজকে দিতে নিবৃত্ত থাকিতেন এবং ডাঃ রায় বা অন্য কাহাকেও না-ও দিতেন, তাহা হইলেও ডাঃ রায় নির্ব্বাচিত হইতেন; এবং বোর্ডের ৫ জন বাঙালী সদস্যের মধ্যে তিন জন হইতেন বাঙালী। কিন্তু বিড়লাজী বঙ্গে বাঙালীর বিস্তর ভোট পাইয়াও ইংরেজপ্রীতিতে অভিভূত হইয়া পড়েন। ইহাতে অনেক বাঙালী দুঃখিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষা করিতে জানে না পারে না, অপরের নিকট হইতে ন্যায়পরায়ণতার আশা তাহাদের করা উচিত নয়—অনুগ্রহ চাওয়া ত উচিত নহেই।

—

"ইণ্ডিয়ানা"

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-সব ভাল সাময়িক পত্র বাহির হয়, তাহার কোনটির কোন সংখ্যায় কোন পৃষ্ঠায় কি বিষয়ে কি লেখা থাকে, তাহার বিষয়ানুক্রমিক ও বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট বা সূচী একটি আমেরিকান সাময়িক পত্রে বহু বৎসর পূর্ব্বে (বোধ হয় গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে) আমরা পাইতাম। তাহাতে মডার্ন রিভিয়ুর নির্ঘণ্টও কিছু কিছু থাকিত। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় এরূপ নির্ঘণ্ট-পত্র এখনও আছে। জেরুসালেম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত একটি হিব্রু সাময়িক পত্রে এইরূপ নির্ঘণ্ট থাকে।

এরূপ নির্ঘণ্ট আবশ্যক—নানা বিষয়ে গবেষকদের ইহা খুব কাজে লাগে। সন্তোষের বিষয় বারাণসী হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ "ইণ্ডিয়ানা" নাম দিয়া এরূপ একটি নির্ঘণ্ট-পত্রিকা প্রতি মাসে বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "ডন" ("The Dawn") নামক যে বিখ্যাত মাসিক পত্র ছিল, তাহার কার্য্যপরিচালকরূপে ইনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। "ইণ্ডিয়ানা"তে ভারতবর্ষে প্রকাশিত ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, উর্দু, মরাঠী, কন্নাড়, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার বহু সাময়িক পত্রের নির্ঘণ্ট থাকিবে। ইহার প্রকাশককে সমুদয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

—

"চণ্ডীদাস-চরিত"

"চণ্ডীদাস-চরিত" প্রবাসীতে যে ভাবে বাহির করা হইতেছিল, তাহাতে সম্পূর্ণ হইতে ন্যূনকল্পে আড়াই বৎসর লাগিত। তাহা পাঠকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক নহে এবং গ্রন্থটিও তাহাতে যথোচিত মনোযোগ পাইত না। এই জন্য আমরা ইহার মাসিক ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করিলাম। যাহাতে ইহা আদ্যোপান্ত পুস্তকাকারে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা আমরা করিব।

—

নবদ্বীপ ও বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়

নবদ্বীপ বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। তাহাতেই আমাদের নবদ্বীপদর্শন ঘটায়, ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের

প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ এখন আর নাই। তথাপি দিবাভাগের কয়েক ঘণ্টায়, নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যতটুকু সময় পাইয়াছিলাম, তাহাতে নগরটি দেখিয়া নিরুৎসাহ হই নাই। আমাদের তাহাতে এই ধারণা হইয়াছে, যে, নবদ্বীপ পশ্চিম-বঙ্গের অন্য কোন কোন পুরাতন নগরের মত ক্ষয়িষ্ণু নহে। এখানকার উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও তাহার লাইব্রেরী এবং সাধারণ লাইব্রেরী ছোট একটি নগরের পক্ষে প্রশংসার যোগ্য। অপর একটি উচ্চ-বিদ্যালয় দেখিলাম, তাহার পরিচালকেরা উত্তম কাজ করিতেছেন। বিখ্যাত টোলগুলি দেখিবার সময় পাই নাই। কেবল সার্ব্বজনিক টোলটির ভিতর গিয়াছিলাম। যে-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে সভক্তি হরিনাম ও ভক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেখানে অন্ততঃ একটি টোলে সংস্কৃত বিদ্যার দ্বার সকল জাতির নিকট উন্মুক্ত দেখিয়া প্রীত হইলাম। টোলে ব্রাহ্মণেরা শুধু সংস্কৃত শিখিলে তাঁহাদের পৌরোহিত্য যজনযাজন চলে, বৈদ্যরা শিখিলে আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া কবিরাজ হওয়া চলে; কিন্তু অন্য জাতির লোকদের টোলে ইহা শিখিয়া উপার্জ্জনের সামান্য কোন উপায়ও হয় বলিয়া অবগত নহি। তাহা সত্ত্বেও যে অন্য জাতীয় বিদ্যার্থীরা সার্ব্বজনিক টোলে ইহা শিখিতেছেন, ইহা জ্ঞানানুরাগের একটি দৃষ্টান্ত। এই টোলের অধ্যাপক মহাশয় ও বিদ্যার্থীরা প্রশংসাভাজন। নবদ্বীপের সারস্বত মন্দিরে যেরূপ আন্তরিক আগ্রহের সহিত কয়েকটি কুটীরশিল্প ও অন্যান্য কিছু উপার্জ্জনের উপায় শিখান হইতেছে, তাহাতে অনেকে উপকৃত হইতেছেন।

বাল্যকালে আমরা বাংলা বিদ্যালয়ে যে তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত উৎকৃষ্ট ভূগোলের পুস্তক পড়িয়াছিলাম, নবদ্বীপে তাঁহার বাসভবন দেখিয়া প্রীত হইলাম, বাল্যকালের অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল।

আর যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা লেখা হইল না।

যে বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়টির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ গিয়াছিলাম, সাত বৎসর পূর্ব্বে তাহা একটি ছোট পাঠশালা ছিল। পরিচালকদিগের আগ্রহে ও শিক্ষকগণের ত্যাগে তাহা এখন একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার ছাত্রীদের বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত আবৃত্তি ও অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। তিনটি ভাষার উচ্চারণই আমাদের ভাল মনে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি গান গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ একটি চিত্র যেরূপ দ্রুত অঙ্কিত হইল, তাহা নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ছাত্রীদের সেলাইয়ের কাজগুলিও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। ইহাদের শিখিবার ও আত্মপ্রকাশ করিবার বেশ উৎসাহ আছে।

তাহারা নিজেদের একটি সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতেছে। তাহারা প্রতি অমাবস্যায় 'দীপালী' নাম দিয়া একটি হাতে-লেখা মাসিক পত্র প্রকাশ করে। সেদিন তাহারা একটি সভা আহ্বান করে, এবং অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের সম্মুখে তাহাদের নির্ব্বাচিত রচনা পাঠ করে এবং সারা মাসের শেখা গান ও যন্ত্রসঙ্গীত করে, এবং হাতের কাজও সেদিন দেখান হয়। তাহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। নিজেদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তনের ভার অনেকটা তাহারাই লইয়াছে। বিদ্যালয়কে তাহারা নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং এই মাসে একটি সমবায়প্রণালীমূলক দোকান খুলিবে। এই বিদ্যালয়ের সার্থকতা তাহাদের মধ্য দিয়াই এই ভাবে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়।

এই বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পাস করানর জন্য বৎসরের পাঠ্যতালিকা বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছে। গত ১৯৩৫ সাল হইতে এই পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ছাত্রীরা ভাল করিয়া পাস করিতেছে। ইহাতে বালিকাদের অনাবশ্যক সময় নষ্ট করিতে হয় না। মেয়েদের বোধ এবং গ্রহণ করিবার মত সহজ বুদ্ধি ছেলেদের অপেক্ষা একটু অল্প বয়সে জাগ্রত হয়। সেই জন্য তাহারা সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য জিনিষ অল্প সময়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার কৃতকার্য্যতার ইহ একটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

—

আয়ুর্বেদের গুণের বঙ্গে সরকারী স্বীকৃতি

অন্যান্য কোন কোন প্রদেশে গবর্মেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই আয়ুর্বেদের গুণ স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গে এখন স্বীকৃত হইতে চলিল। মনোনীত কয়েক জন কবিরাজকে লইয়া গবর্মেণ্টের অনুমোদিত একটি আয়ুর্বেদের ফ্যাকাল্টি বা চিকিৎসক-সমিতি গঠিত হইবে, কবিরাজদিগের নাম রেজিষ্টরী করা হইবে, পরে শিক্ষা ও পরীক্ষাও নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

গবর্মেণ্টের এইরূপ কার্য্য সন্তোষজনক।

আয়ুর্বেদ ত গবর্মেণ্টের "জানিত" চিকিৎসাপ্রণালী হইল। এখন যাঁহারা কবিরাজী করেন তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য স্মরণ করিতে হইবে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা গোড়া হইতেই গবর্মেণ্টের অনুমোদন ও সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে, যে, গবর্মেণ্ট এই চিকিৎসাপ্রণালী সর্ব্বাংশে অভ্রান্ত ও অব্যর্থ মনে করেন, বা এরূপ মনে করেন, যে, ইহার কোন সংশোধন ও উন্নতি, কিংবা ইহাতে কোন সংযোজন হইতে পারে না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও তাহা মনে করেন না। তাঁহাদের অনেকে নানা দিক দিয়া নানা প্রকার গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার ফলে ভ্রম নিরাকৃত হইতেছে, নূতন চিকিৎসাপ্রণালী ও নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত ও প্রযুক্ত হইতেছে। এই উন্নতিশীলতা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অনেক স্থলে সাফল্যের ও আদরের একটি কারণ। অবশ্য ইহা সর্ব্বত্র ফলপ্রদ নহে,

সর্ব্বজনানুমতও নহে। কিন্তু ইহার ফলোপধায়কতা বাড়াইবার চেষ্টা অবিরাম চলিতেছে।

আয়ুর্বেদেরও সব কিছু অভ্রান্ত মানিয়া লইলে চলিবে না। ইহাকেও ক্রমোন্নতিশীল করিতে হইবে। কোনও ভ্রম নির্দ্ধারিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মেজর বামনদাস বসু প্রণীত ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্ল্যাণ্টস্ ("ঔষধের জন্য ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিজ্জসমূহ") নামক বৃহৎ মূল্যবান্ সচিত্র গ্রন্থ প্রত্যেক উন্নতিকামী চিকিৎসকের ও প্রত্যেক চিকিৎসা-শিক্ষালয়ের লাইব্রেরীতে রাখা ও ব্যবহার করা আবশ্যক।

—

তিন জন অন্তরীনের আত্মহত্যা

পরে পরে তিন জন অন্তরীনের আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—যদিও ইহাই বাঞ্ছনীয় যে অন্তরীনেরা খুব দৃঢ়চিত্ত ও আশাশীল হইবেন এবং ভবিষ্যতে দেশের সেবা করিবার ইচ্ছায় বাঁচিয়া থাকিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইবেন। কিন্তু আমরা ত তাঁহাদের সব দুঃখ জানি না; সুতরাং উপদেশ দিতেছি না, কেবল হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ করিতেছি।

অন্তরীনদের আত্মহত্যা ও সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন অনুসন্ধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। জানুয়ারী মাসে গবর্ণ্মেণ্ট এক শত অন্তরীনকে খালাস দিবেন। ইহারা কোন-না-কোন বৃত্তি শিখিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষিত শিল্প ও কৃষিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। ইহা ভাল।

বিনাবিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিবার প্রথার বিরুদ্ধে বহুবার আমরা আমাদের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা নাই।

গবর্ণ্মেণ্ট সকল অন্তরীনকে একসঙ্গে এক সময়ে খালাস দিবেন না। বোধ হয়, তাঁহারা এক এক বারে কতকগুলি লোককে শিল্প ও কৃষি শিখাইয়া ছাড়িয়া দিতে চান। এই প্রকারে যদি বৎসরে এক শত জনও খালাস পায়, তাহা হইলেও দু-হাজার অন্তরীনের খালাস পাইতে কুড়ি বৎসর লাগিবে। তাহার পূর্ব্বে নূতন নূতন লোককে যে "অন্তরীন" করা হইবে না, গবর্ণ্মেণ্ট এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। বস্তুতঃ কোন কোন পুলিসের লোকের দ্বারা নির্দ্দোষ লোকের বাড়ীতে রিভলভার বন্দুক গোপনে রাখিয়া দেওয়া এখনও চলিতেছে। সুতরাং বিনা বিচারে কাহারও কাহারও বন্দীকৃত হইবার সম্ভাবনা লোপ পায় নাই।

এ অবস্থায় দেশে অসন্তোষ লাগিয়াই থাকিবে।

—

কংগ্রেসের কাজ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাইয়ে সম্প্রতি যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। নেতারা কতক আলোচনা কমিটির অফিশ্যাল কাজ হিসাবে করিয়াছেন, কতক বা ঘরোয়া ভাবে করিয়াছেন।

আলোচনার একটি বিষয় ছিল, দেশের জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের যোগস্থাপন। ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের লোকদের অধিকাংশ নিরক্ষর বলিয়া এই যোগস্থাপন কঠিন কাজ। তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিতে সময় লাগিবে। কিন্তু ধৈর্য্য না হারাইয়া এই গোড়ার কাজটিতে এখনই বিশেষ করিয়া মন না দিলে নিরক্ষর জনসাধারণের সহিত শিক্ষিত নেতাদের যোগস্থাপন সুদূরপরাহত থাকিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে অবশ্য বক্তৃতা ম্যাজিকলণ্ঠন ও সিনেমার দ্বারা কাজ চলিতে থাকুক।

আর একটি আলোচ্য বিষয় ছিল, স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) সব দলের সহিত কংগ্রেসের একযোগে কাজ করা। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা বহুবার আমাদের ইংরেজী ও বাংলা কাগজে লিখিয়াছি। বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতেও, ৭১৭-৭১৮ পৃষ্ঠায় "মেকিং কমন্ কজ্" শীর্ষক নোটটি এই বিষয়ে লিখিয়াছি।

ইউরোপের অবস্থা যেরূপ তাহাতে ব্রিটেনের একটা বড় যুদ্ধে জড়িত ও ব্যাপৃত হইবার খুব সম্ভাবনা ঘটিতেছে। এরূপ যুদ্ধ ঘটিলে তাহাকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, কেমন করিয়া ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইতে পারা যায়, নেতারা তাহার আলোচনাও করিয়াছিলেন এবং উপায় চিন্তা করিতেছেন।

—

জাপানীদের ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারচেষ্টা

দিল্লীতে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জাপানী কন্সাল তাঁহার বক্তৃতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রবল জাতির রণসজ্জা ও পরস্পরের প্রতি হিংসাদ্বেষের নিন্দা করেন এবং বলেন, এই প্রকার আচরণ ও মনোভাবের প্রতিকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা। অথচ জাপান রণসজ্জায় এবং চীন প্রভৃতি দেশের প্রতি শত্রুতাচরণে কাহারও চেয়ে কম যান না। যাহা হউক, এখন এ-বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিব না। ভারতে জাপানীদের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার চেষ্টার কথাই বলি।

সারনাথে যে নূতন বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গাত্র চিত্রিত করিবার ভার যাহাতে ভারতীয় চিত্রকরেরা পান

তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও আমি স্বয়ং পরলোকগত অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহোদয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, তাঁহার নিজের কোন টাকা নাই। নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে কেবল খাদ্য ও রঙের ব্যয় লইয়া কাজটি করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এক জন ইংরেজ বৌদ্ধ এই কাজের জন্য অনেক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। তিনি জাপানী বৌদ্ধ চিত্রকরদের দ্বারা এই কাজটি করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। জাপানী গবর্ন্মেণ্টও সাহায্য করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠায় জাপানী কন্সালের সহযোগিতা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। আর কোথাও জাপানীরা এইরূপ কাজ করিতেছেন কিনা জানিতাম না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন,

"দেখিলাম অনেক গ্রামে জাপানীরা বিনা পয়সায় বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত গ্রামেই গুজব যে সেই সব স্থানেও হইবে। এইরূপ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জাপানীদের এই দূর দেশে বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণে নিশ্চিত কোন গূঢ় রহস্য রহিয়াছে।"

গূঢ় রহস্য থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। পাশ্চাত্য নানা দেশের খ্রীষ্টিয়ানেরা ভারতবর্ষে গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করে ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করে। সুতরাং জাপানীরা বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিলে ও তদ্দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিলে তাহাতে আপত্তি করা চলে না। কেবল ইহা মনে রাখা আবশ্যক, যে, ইউরোপীয় অনেক দেশের খ্রীষ্টিয়ানদের কোন কোন পরদেশ জয় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যে, তাহা প্রথমে বাইবেল, পরে (মদের) বোতল এবং শেষে বুলেট (গুলি) দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। জাপান কি সেইরূপ কোন নীতির অনুসরণ করিবে? (অগ্রহায়ণ সংখ্যার জন্য লিখিত।)

—

"বৃহৎ বঙ্গ"

'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগের জন্য এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এক জন সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে মুদ্রিত করিতে না পারায় এখানেই দিতেছি। কারণ, তাহাতে পৌষ মাসে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে কি হইবে তাহার উল্লেখ থাকায় মাঘ সংখ্যার জন্য তাহা রাখা সঙ্গত হইবে না।

বৃহৎ বঙ্গ—রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্ (অন্), কবিশেখর প্রণীত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৯৪১)। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১২১৫ পৃষ্ঠা। চিত্র-সংখ্যা ৩০৪।

বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস যেমন একালের রাজনৈতিক সীমা ছাড়াইয়া বিরাট এশিয় মহাদেশের নানা সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়াছে, তেমনি "বৃহৎ-বঙ্গ" ভারতেতিহাসের পটভূমিকায় বহু বর্ণ ও বিচিত্র শিক্ষ-দীক্ষার সমন্বয়ের উদার ও উজ্জ্বল চিত্র। এ ছবি জাতীয় অবনতির ও আত্মবিস্মৃতির যুগে চাপা পড়িয়া যায়, যেমন চাপা পড়ে ইলোরা মন্দির-গাত্রের অপূর্ব্ব লেপ-চিত্র ধোঁয়া কালী অথবা চূণকামের জঘন্য প্রলেপে। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক দীনেশচন্দ্রের একাগ্র দৃষ্টি আধুনিক কদর্য্য প্রলেপ ভেদ করিয়া বাংলার ঐতিহাসিক গৌরবচিত্র উদ্ধার করিয়াছে। ইহার পিছনে কত দিন কত বিনিদ্র রাত্রের চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও প্রাণপাত পরিশ্রম রহিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই আভাসে বুঝিবেন। অকপট বিনয়ে গ্রন্থকার তাঁহার 'ভুলত্রুটির' কথা তুলিয়াছেন ও স্বীকার করিয়াছেন যে, "ইতিহাস রচনায় ইহাই আমার হাতে-খড়ি"। ব্যক্তিগত ভাবে এ কথা না বলিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির তরফেও গ্রন্থকার বলিতে পারিতেন, "বৃহৎ-বঙ্গের" ইতিহাস রচনায় ইহাই হাতে খড়ি। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া এই জীবনসন্ধ্যায় যে তিনি তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন, সেজন্য সমগ্র বাঙালী জাতি ও অনাগত যুগের বাঙালী ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। তিন শতের অধিক চিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া বাঙালীর জাতীয় কারুশিল্পের আভাস দিয়া এবং বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে তিনি একটি নূতন তাৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্লক-গুলি সব সময় মূল শিল্পবস্তুর উপযুক্ত হয় নাই, তবু শুধু শাব্দিক ইতিহাস না লিখিয়া রেখা ও রঙের ব্যঞ্জনায় আমাদের গ্রামের নিরক্ষর ও নীরব অথচ শাশ্বত ঐতিহাসিক গোষ্ঠী কুমার ছুতার, তাঁতি ও পটুয়াদের প্রতি যে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন, ইহা সত্যই প্রশংসার্হ। নানা রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে তথাকথিত উচ্চ জাতি ও সম্প্রদায়গুলি যখন বিপর্য্যস্ত, তখনও অজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, অনাহার-পীড়িত বাংলার গ্রাম্য কারুশিল্পী—হিন্দু মুসলমান জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে—দারিদ্র্যকে সুন্দর ও আর্থিক দৈন্যকে পারমার্থিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছে। সেই আউল, বাউল, বৈরাগী, কথক, যাত্রাওয়ালা, পটুয়াদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম, এই কথাটি গ্রন্থকার স্মরণ করাইয়াছেন। ইহা এ গ্রন্থের একটি মৌলিকত্ব। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্বাদশ বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া রামরাম বসু ও রামমোহন রায়ের যুগ পর্য্যন্ত বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এই "বৃহৎ বঙ্গ" সূচিত হইয়াছে। এক জন লেখকের পক্ষে এ কাজ প্রায় অসাধ্য; প্রত্যেক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের জন্য একাধিক ঐতিহাসিক গবেষণা করিবেন, ইহা আশা করিয়াই গ্রন্থকার এই অষ্টাদশ পর্ব্ব (ও প্রাদেশিক ইতিহাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদ সম্বলিত) বৃহৎ বঙ্গ মহাভারত সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। ত্রিপুরা, মণিপুর, কোচবিহার, শ্রীহট্ট, মেদিনীপুর, বন-বিষ্ণুপুর, সুন্দরবন প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, কি বিরাট কাজ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং একা দীনেশচন্দ্র তাহার উদ্বোধন করিয়া বাঙালী জাতির কি উপকার করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙালী সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি আদৃত হইবেন, কিন্তু উক্ত সম্মেলনের তথা বাংলার প্রত্যেক সাহিত্যপরিষৎ ও গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য প্রবীণ গ্রন্থকারকে সাহায্য করা ও তাঁহার গ্রন্থ প্রচার করা। এই বৃহৎ বঙ্গ অবলম্বন করিয়া নানা জেলায় গবেষণা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠুক এবং রীতিমত ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ সুরু হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং ইহাতেই দীনেশচন্দ্রকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হইবে।

ক. ন.

শ্রীমতী বেরিল মার্কহাম
বিমানযোগে আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ প্রথম রমণী
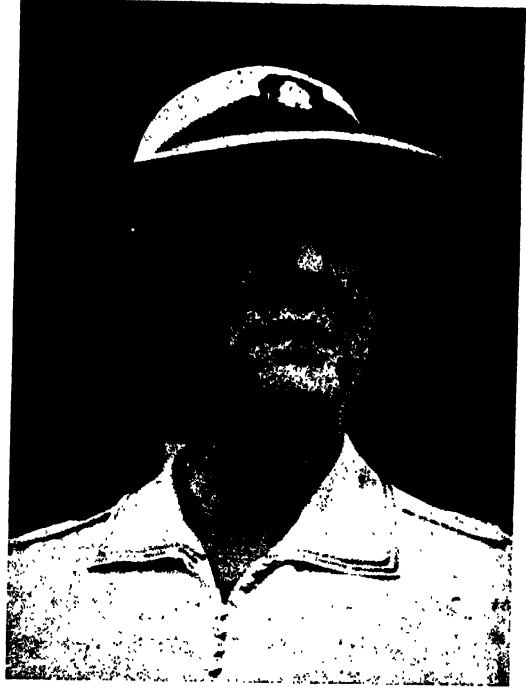
ভারত-ভ্রমণে 'স্যালভেশন আর্মি'র নেত্রী শ্রীমতী ইভাঞ্জেলিন বুথ

শ্রীরামনারায়ণ সিং

কুমিল্লা প্রদর্শনীতে কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়
বাম হইতে: শ্রীসুধা সেন শ্রীরেণুকা রায় শ্রীমতী ঘোষ, শ্রীমতী চক্রবর্তী, শ্রীমতী বিশ্বাস। দণ্ডায়মান: শ্রীসত্যভূষণ দত্ত, সম্পাদক, কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয় ও একজন শিল্প-শিক্ষক

চৌষট্টি শিল্পকলার একটি

ভালো ছবির আবেদন হৃদয়ে গভীর ভাবে গিয়ে পৌছোয়। যারা তার মর্ম্ম বোঝে তেমন সমঝদারকে সে ছবি অসীম আনন্দ দেয়। ছবি গান, কবিতা,—এগুলি একই ধরণের আনন্দের উৎস। অবশ্য শিল্প-সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীকে আনন্দ দেওয়ার দুর্লভ প্রতিভা খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু সাধারণ অনেক কাজও ত সুন্দর ও শোভন ভাবে করা যেতে পারে! নিখুঁত ভাবে উপাদেয় চা তৈরী করাও একটি চারুকলা;—আমাদের দেশে উৎপন্ন চায়ের তেমন উপাদেয় একটি পেয়ালা পান ক'রেও অশেষ আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা

IK. 34.

বিদেশ

ইঙ্গ-মিশর চুক্তি

সম্প্রতি ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা মিশর কিছু বেশী সুবিধা পাইলেও ইহা মিশরবাসীগণকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ যে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়া জগলুল, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা, বৈদেশিক সৈন্যবলের সম্পূর্ণ অপসারণ, দেশের সর্ব্বপ্রকার শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; এই চুক্তির ফলে তাহাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। সম্পাদিত চুক্তির ফলে মিশর হইতে সৈন্য অপসৃত হইবে। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন, যে মিশর হইতে ব্রিটিশ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইবে; কেবল কায়রো ও মিশরের অভ্যন্তরে আর ব্রিটিশ সৈন্য থাকিবে না এই পর্য্যন্ত। সুয়েজ-খালের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে ব্রিটেন মোটেই প্রস্তুত নহে কারণ অদূর ভবিষ্যতে যদি ইউরোপে যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এই খালের ভিতর দিয়া ব্রিটেনের জাহাজাদি যাতায়াতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। শত্রুপক্ষীয় জাহাজাদির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যেও তাহার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। এই সকল কারণে সুয়েজ-খালের কর্তৃত্ব ব্রিটেন স্বহস্তে রাখিয়াছে এবং এই চুক্তির বিধান এইরূপ যে, আরও বিশ বৎসর সুয়েজ রক্ষার সকল ব্যবস্থা ব্রিটেন করিবে এবং তথায় সৈন্যবাহিনী রাখিবে। যদি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পরে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী সুয়েজ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে এ-স্থান হইতেও সৈন্যবাহিনী অপসৃত হইবে। কিন্তু বিশ বৎসর পরেও মিশর সরকার সুয়েজ রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ কি না সে বিচার কে করিবে? এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে, যদি ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় ও সমস্যার সমাধান না হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে মধ্যস্থ মানা হইবে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘই ইহার বিচার করিয়া দিবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে মিশরের তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিবার বিশেষ কিছু কারণ নাই।

এই চুক্তির অপর একটি ধারাতে বলা হইয়াছে যে ব্রিটেন মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবে ও তাহাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইতে সাহায্য করিবে। মিশর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইয়া কি লাভ আশা করে তাহা আমরা জানি না; তবে এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলে ব্রিটেনের দলবৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়।

এই চুক্তির দ্বারা সুদান সমস্যার কিছুই সমাধান হয় নাই।

যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া নাহাস পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। মিশরবাসীগণও সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই এবং কোন কোন চরমপন্থী দল নাহাস পাশার প্রতিও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

বিদেশে বাঙালী চিকিৎসক

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এ. এন্. মুখার্জ্জি, এম্. ডি. (ইউ. এস্ এ.) আন্তর্জ্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে গত জুলাই মাসে গ্লাসগো যাত্রা করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনের সভ্যরূপেও মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য রাজকীয় অনুমোদনের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি উক্ত সম্মিলনে ও লণ্ডনের ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটিতে আলোচনা করেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আধুনিকতম উন্নতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য তিনি ইউরোপে—লণ্ডন, বার্লিন, ড্রেস্‌ডেন, ভিয়েনা হল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের ও ইডেনের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন।

বাংলা

পরলোকে অধ্যাপক ডাঃ ননীলাল পান

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীরবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রায় ননীলাল পান বাহাদুর বিগত ৬ই কার্ত্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—মেডিকেল কলেজের কোন পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই।

চিকিৎসা এবং শিক্ষাদান ব্যতীত, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক মৌলিক গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গবেষণার জন্য স্বুবর্ণ-পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। তিনি বহুবৎসর যাবৎ কলিকাতা, পাটনা ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যা ও শরীরবিজ্ঞানের পরীক্ষক ছিলেন।

সন্তরণপটু কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়

দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় সন্তরণে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। কলিকাতা সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের গত দ্বাদশবার্ষিক প্রতিযোগিতার তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও ৫০ মিটার সন্তরণে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন।

মোটরচালন পটু শ্রীরামনারায়ণ সিংহ

বেঙ্গল অটোমবিল এসোসিয়েনের উদ্যোগে গত ২২শে অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত কলিকাতা হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত মোটর-চালন-প্রতিযোগিতায় কলিকাতার শ্রীরামনারায়ণ সিংহ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এ. এ. বি. চ্যালেঞ্জ শিল্ড ব্রেকওয়েল কাপ, ভীডন চ্যালেঞ্জ কাপ প্রভৃতি বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ এ. এন. মুখার্জ্জি

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার শিক্ষক শ্রীশান্তি পাল

রায় ননীলাল পান বাহাদুর

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপরিষদে বাঙালী

ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা নিবাসী এডভোকেট শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস অধিক সংখ্যক ভোটে ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি এইবার লইয়া তিনবার এই সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শিল্প-প্রদর্শনী

নিখিল ভারত-নারীসম্মিলনীর কুমিল্লা-শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিগত ২১শে হইতে ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কুমিল্লা টাউন হলে একটি শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। কুমিল্লার ভদ্রমহিলাদের বিশেষতঃ শ্রীরেণুকা রায়ের চেষ্টায় সম্মিলনী ও প্রদর্শনী সফল হয়।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫ হদো-গায়া বিশ্রামস্থান
চিত্রকর হিরোশিগে
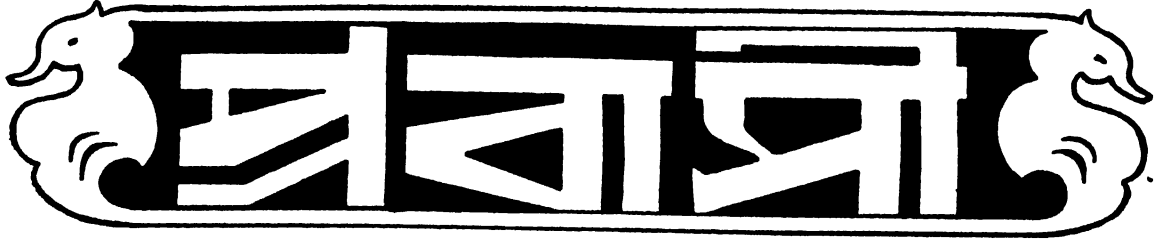
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪৩

৪র্থ সংখ্যা

পুপুদিদির জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ
হারিয়ে গেল কোথা,
পথ ভুলে' সে পেরিয়েছিল
মরা নদীর সোঁতা।
হায়, বুড়োমির পাঁচিল তা'রে
আড়াল করল আজ,
জানি নে কোন্ লুকিয়ে-ফেরা
বয়স-চোরার কাজ।
হঠাৎ তোমার জন্মদিনের
আঘাত লাগল দ্বারে,
ডাক দিল সে দূর সেকালের
ক্ষ্যাপা বালকটারে।
ছেলে মানুষ আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে
হঠাৎ গেল থামি'।
বললে, শোনো ওগো কিশোরিকা,
"রবীন্দ্র" নাম কুষ্ঠিতে যার লিখা,
নামটা সত্য, সত্য শুধু
তারিখটা মাত্তর,

তাই ব'লে তো বয়সখানা
নয় কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার
জগৎটা তার কাঁচা,
বাঁধে নি তায় খেতাব-লাভের
বিষয়-লোভের খাঁচা।
মনটাতে তার সবুজ রঙে
সোনার বরণ মেশা ;
বক্ষে রসের তরঙ্গ তার
চক্ষে রূপের নেশা।
ফাগুন-দিনের হাওয়ার ক্ষ্যাপামি যে
পরাণে তার স্বপন বোনে
রঙীন মায়ার বীজে।
ভরসা যদি মেলে
তোমার লীলার আঙিনাতে
ফিরবে হেসে খেলে।
এই ভুবনের ভোরবেলাকার গান
পূর্ণ ক'রে রেখেছে তার প্রাণ।
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি
করবে সুমধুর ॥

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩
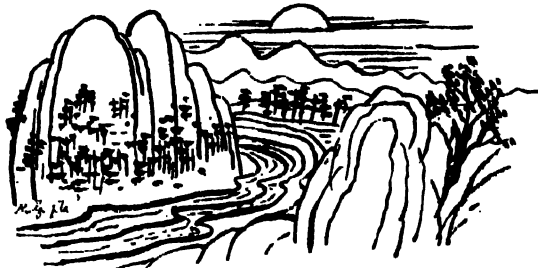
ব্যাঙ্কের কথা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

আর্থিক জগতে ব্যাঙ্কের একাধিপত্য

বর্ত্তমান যুগে আর্থিক জগতের ভারকেন্দ্র প্রত্যেক দেশের বিশাল ব্যাঙ্কগুলিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে কার্নেগি, রথ্‌স্চাইল্ড, রক্‌ফেলার, ফোর্ড বা নিজাম যতই ধনী হউন না কেন, বর্ত্তমান দুনিয়ার প্রকৃত অধিপতি এই ব্যাঙ্কগুলিই। কারণ বিশাল সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজের সম্পদও ইহাদের নিকট আজ তুচ্ছ। পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া ইহারাই দুনিয়াটাকে আজ মুঠার মধ্যে রাখিয়া পরিচালনা করিতেছে।

অর্থ পদার্থটিকে আমরা সকলেই ভালরূপে চিনি ও জানি। কিন্তু ইহা কোথা হইতে কি ভাবে আসে এবং কোথা দিয়া কি ভাবে সরিয়া পড়ে, তাহা আমাদের অনেকেরই বুদ্ধির অগম্য। আমাদের অতিযত্নে সঞ্চিত অর্থপুঁটুলি ভাঁটার টানে অকস্মাৎ আমাদের হাতছাড়া হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার কোথা হইতে জোয়ার আসিয়া আমাদের শূন্য তহবিলকে ভরিয়া দেয়। বিনা-কারণে এক দিন আমাদের যে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও জমিজমার মূল্য কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার এক দিন ফাঁপিয়া উঠিয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়া আমরা ইহার ফলমাত্রই শুধু ভোগ করি; কিন্তু কারণ কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। অর্থের এই রহস্যময় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা জানিতে চাই, বর্ত্তমান জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জ্জাতিক কাজ-কারবারের জটিল ও কুটিল পথে যদি প্রবেশলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমে আধুনিক ব্যাঙ্কের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে। রহস্যময় আর্থিক জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটনের ইহাই সহজ পন্থা।

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এক দিনে হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সর্ব্ব বিষয়ে যেমন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছে, প্রয়োজনের তাগিদে ব্যাঙ্কগুলিও তেমনই ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহাদের শৈশব অবস্থার কথা প্রথমতঃ আলোচনা করা যাক্। আমাদের কাজ-কারবার যখন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত এবং আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের আধিপত্যই যখন প্রবল, তখন সেই দেশের ইতিহাস আলোচনা করাই বিধেয়।

ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ও নোটের সৃষ্টি

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্বর্ণকারগণ প্রথমতঃ নিজেদের মূল্যবান গহনাপত্র ও হীরা-জহরতের সহিত অপরের ধনসম্পদও গচ্ছিত রাখিতে সুরু করে। দস্যু-তস্করের হাত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য ইহাদিগকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইত। সেই জন্যই জনসাধারণও তাহাদের ধনরত্ন নিরাপদে রাখিবার জন্য এই সব স্বর্ণকারের আশ্রয় গ্রহণ করিত। আমাদের দেশে অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ধনী জমিদার, মহাজন, সাহুকারের নিকটে আজ পর্য্যন্ত অনেকে নিজেদের ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিয়া থাকে। ইংরেজ স্বর্ণকার দেখিতে পাইল যে, প্রয়োজনের সময়ে অনেকেই তাহার নিকট টাকা ধার করিতে আসে; অথচ যাহারা অর্থ বা স্বর্ণরৌপ্য গচ্ছিত রাখে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহারা উহা ফেরত চাহে না। এইরূপ সুযোগ দেখিয়া স্বর্ণকারগণ তাহাদের নিকট গচ্ছিত অর্থ অপরকে সুদ লইয়া ধার দিতে আরম্ভ করে। যাহারা টাকা আমানত রাখিত, প্রথম অবস্থায় তাহারা কোনরূপ সুদ পাইত না। ক্রমে এই সব আমানতী টাকার জন্য অল্প হারে সুদ দেওয়া আরম্ভ হয়। ইহাই ব্যাঙ্কের প্রথম সূত্রপাত। সময়ে ইহাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়িলে, ইহারা নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে

প্রমিসরি নোট (I promise to pay on demand) প্রচলন করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের প্রচলিত প্রমিসরি নোটে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলেই উহা গ্রহণ করিতে থাকে এবং এই সব নোট সাধারণের হাতে স্বর্ণ- বা রৌপ্য- মুদ্রার স্থায় চলিতে সুরু করে। প্রয়োজনমত নোটের বিনিময়ে নগদ মুদ্রা পাইতে কোনরূপ বাধা না-হওয়ায় এইরূপ নোটের প্রচলন সহজেই বিস্তার লাভ করে এবং এই ভাবেই ব্যাঙ্ক ও নোটের সৃষ্টি হয়। পরের ধনরত্ন গচ্ছিত রাখা, উহা পুনরায় অপরকে সুদে ধার দেওয়া, নগদ টাকার বিনিময়ে নোট প্রচলন—ইহাই তখনকার স্বর্ণকার-ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজ ছিল। আমরা নিম্নে উহাদের হিসাবের একটি নমুনা দিতেছি—

ব্যাঙ্কের দেনা :		ব্যাঙ্কের সংস্থান :	
‘ক’-এর নিকট আমানত বাবদ	১,০০০৲	নগদ তহবিল (স্বর্ণ ও মুদ্রা)	১,০০০৲
সর্ব্বসাধারণের নিকট নোট বাবদ	—৯,০০০৲	‘ক,’ ‘খ,’ ‘গ,’ ‘ঘ’-এর নিকট দাদন	—৯,০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

স্বর্ণকার যখন দেখিতে পাইল, তাহার প্রচলিত নোটগুলি অবলীলাক্রমে দশের মধ্যে চলিয়াছে এবং উহার বিনিময়ে নগদ অর্থ বেশী লোকে চাহিতেছে না, তখন তাহার সাহস ক্রমেই বাড়িয়া যায় এবং পূর্ব্বে যেখানে সে নগদ ১০০০৲ টাকা হাতে রাখিয়া ৯,০০০৲ টাকার নোট প্রচলন করিতে সাহসী হইয়াছিল, সেখানে সে দুঃসাহস করিয়া আরও অধিক টাকার নোট ধার দিতে আরম্ভ করে। যৎসামান্ত ব্যয়ে নোট ছাপাইয়া তাহা সুদে খাটাইয়া লাভবান হইবার লোভ ইহাদিগকে এমনই পাইয়া বসিল যে, সামান্ত নগদ অর্থ পুঁজি লইয়া ইহারা অত্যন্ত অধিক পরিমাণ নোট সৃষ্টি করিতে সুরু করিল। সকলে সমস্ত নোট এককালীন উপস্থিত না করিলেও যে পরিমাণ নোট উপস্থিত হইতে লাগিল তাহার টাকাও ইহারা দিতে পারিল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহাদের অনেককে দরজা বন্ধ করিতে হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারিগণের গচ্ছিত অর্থও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই অবস্থা দেখিয়া ১৮৪৪ সালে নূতন আইন করিয়া, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যতীত আর সকল ব্যাঙ্কের হাত হইতে নোট প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশে আইন দ্বারা নোট প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং কয়েকটি দেশ ভিন্ন (ইহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান) আর সব দেশেই ব্যবসাদারী যৌথ ব্যাঙ্কের হাত হইতে নোট প্রচলনের অধিকার অপসারিত করা হইয়াছে।

চেকের সৃষ্টি

নোট সৃষ্টির ক্ষমতা এই সব ব্যাঙ্কের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই নোটের পরিবর্ত্তে ইহারা অর্থোপার্জ্জনের আর একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল এবং গচ্ছিত টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক আমানতকারীকে একখানা করিয়া পাস-বই ও চেক-বই দিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক চেক-বইয়ে ২৫।৫০।১০০ কিংবা ততোধিক চেক থাকে। আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত বই হইতে এক-একখানা চেক লইয়া তাহা যথাযথ পূরণ করিয়া পাওনাদারকে দিয়া থাকে। যাহাকে টাকা দিতে হইবে তাহার নাম ও যত টাকা দিতে হইবে তাহার সংখ্যা পূরণ করিয়া আমানতকারীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হয়। তাহার স্বাক্ষরের নমুনা পূর্ব্বাহ্ণেই ব্যাঙ্কে রাখা হইয়া থাকে। যাঁহার নামে চেক দেওয়া হয়, তিনি এই চেক ব্যাঙ্কে দিয়া নগদ টাকা লইতে পারেন, কিংবা নিজ নামে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা করিয়া দিতে পারেন। মাসে একবার পাস-বইখানা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিলেই কত টাকা জমা ও কত টাকা খরচ হইল এবং কত টাকা উদ্বৃত্ত (balance) রহিল তাহা হিসাবে তুলিয়া দেওয়া হয়। আজকাল পাস-বইও পাঠাইতে হয় না—ব্যাঙ্ক হইতেই প্রতিমাসে হিসাব ডাকযোগে পাওয়া যায়। চেক-দাতা ও চেক-গ্রহীতা উভয়ের হিসাব যদি একই ব্যাঙ্কে থাকে, তাহা হইলে টাকাটা এক জনের হিসাবে খরচ ও অপরের হিসাবে শুধু জমা করিয়া লইলেই চলে ; ব্যাঙ্ককে নগদ কোন টাকা দিতে হয় না এবং সেই জন্ত ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের কোনরূপ নড়চড়ও হয় না। কিন্তু যদি চেক-গ্রহীতার হিসাব অন্ত ব্যাঙ্কে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্ক চেক-দাতার ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া

আনিয়া নিজ গ্রাহকের হিসাবে জমা করিয়া লয়। চেকের টাকা নগদ না তুলিয়া কিংবা নিজের হিসাবে জমা না দিয়া চেকের পৃষ্ঠে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও চেক-গ্রহীতা তাহার দেনা মিটাইবার জন্ত দিতে পারেন এবং এই ভাবে একই চেক বিভিন্ন হাত ঘুরিয়া সর্বশেষ ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-হিসাবে জমা হইতে পারে। রাম শ্যামের নামে যে-চেক দিবেন, শ্যাম তাহা ভাঙাইয়া নগদ টাকা না লইয়া কিংবা নিজ ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা না দিয়া, নিজের দেনার জন্ত উহা যদুকে দিতে পারেন, যদু আবার উহা হরিকে দিতে পারেন—এ ভাবে বহু হাত ঘুরিয়া গৌরের নিকট পৌছিলে, তিনি উহা নিজ ব্যাঙ্ক-হিসাবে জমা করিয়া লইতে পারেন।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন চেকের দরুন নগদ টাকার আদান-প্রদান না হইয়া পরস্পরের দেনাপাওনা মিটিয়া গিয়া যে ব্যাঙ্কের দেনা দাঁড়ায় তাহাকে অতিরিক্ত টাকাটা শুধু নগদ দিলেই চলে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাক্। 'ক' নামক ব্যাঙ্কের নিকট যদি 'খ' নামক ব্যাঙ্কের পাঁচখানা চেকের দরুন মোট পাঁচ হাজার টাকা পাওনা হয়; পক্ষান্তরে 'খ' নামক ব্যাঙ্কের নিকট যদি 'ক' নামক ব্যাঙ্কের ছ-খানা চেকের দরুন মোট ছয় হাজার টাকা প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে 'ক' ব্যাঙ্ককে নগদ ১০০০৲ টাকা মাত্র 'খ' ব্যাঙ্কের দিলেই চলিবে—যদিও উভয় ব্যাঙ্ককে ১১,০০০৲ টাকারই জমাখরচ করিতে হইবে। 'ক' ব্যাঙ্কে উহার গ্রাহকদের নামে জমা ৬,০০০৲ টাকা ও খরচ ৫,০০০৲ টাকা এবং 'খ' ব্যাঙ্কে খরচ ৬,০০০৲ টাকা ও জমা ৫,০০০৲ টাকা পড়িবে। পরিণামে 'ক' ব্যাঙ্কের আমানত মোটের উপর ১,০০০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং 'খ' ব্যাঙ্কের আমানত ১,০০০৲ টাকা হ্রাস পাইবে। এই হাজার টাকাটাই 'খ' ব্যাঙ্কের নগদ দিতে হইবে 'ক' ব্যাঙ্ককে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চেক প্রবর্ত্তনের ফলে মোট ১১,০০০৲ টাকার দেনাপাওনার জন্ত ব্যাঙ্কের নগদ মাত্র ১,০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইতেছে।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে খুব অল্প ক্ষেত্রেই চেকের বিনিময়ে নগদ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। দৈনন্দিন হাট-বাজার করা, ট্রাম-বাসের ভাড়া দেওয়া, বায়োস্কোপ-থিয়েটারের টিকিট কেনা প্রভৃতি খুচরা ব্যয় ভিন্ন অধিকাংশ কাজকর্ম চেক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যেও নগদ টাকার লেনদেন বেশী করিতে হয় না, পরস্পরের দেনাপাওনা ওয়াবাদ গিয়া যাহার যাহা দেনা দাঁড়ায় শুধু ঐ টাকাটা নগদ দিলেই চলে।* সেই জন্তই নোট-প্রচলনের অধিকার রহিত হইয়া গেলেও নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে চেক ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়া ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। নোটের প্রচলন থাকা কালে ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাবের একটি নমুনা আমরা দিয়াছি। চেক প্রবর্ত্তিত হইবার পর উহাদের হিসাব কি ভাবে রাখা হইত তাহার একটি নমুনা আমরা দিতেছি—

ব্যাঙ্কের দেনা :		ব্যাঙ্কের সংস্থান :	
আমানত বাবদ	—১০,০০০৲	নগদ তহবিল (স্বর্ণ ও মুদ্রা)-	১,০০০৲
		'ক', 'খ' 'গ' 'ঘ'-এর নিকট দাদন	—৯,০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

পূর্ব্ব হিসাব ও এই হিসাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বে যেখানে নোটের দরুন ব্যাঙ্কের ৯০০০৲ টাকার দায়িত্ব ছিল, এখন সেখানে আমানতের জন্য তাহাকে ৯০০০৲ টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাহার দেনা বা দায়িত্ব সমানই রহিয়াছে, শুধু যে-দেনা ছিল নোটের অধিকারীর নিকট, সেই দেনা দাঁড়াইয়াছে এখন আমানতকারীর নিকট।

এখানে কাহারও মনে একটু খটকা বাধিতে পারে। কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন, পূর্ব্বে ১০০০৲ টাকার আমানত সম্বল করিয়া ৯,০০০৲। ১০,০০০৲ টাকা নোটে দাদন করিতে পারা যাইত। এক্ষণে নয় হাজার টাকা দাদন করিতে হইলে প্রথমেই পুরাপুরি নয় হাজার টাকা নগদ আমানত পাওয়া আবশ্যক। এটি ভুল ধারণা; কারণ প্রত্যেক দাদন বা ধার (credit) একটি নূতন আমানত সৃষ্টি করে, এই নীতিটি এখানে আমাদের ভুলিলে চলিবে না। 'ক' নামক ব্যাঙ্ক যদি 'খ' নামক ব্যক্তিকে এক লক্ষ টাকা ধার দেয় তাহা হইলে

* বড় বড় নগরে এই কাজ করিবার জন্ত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে; ইহাকে ক্লিয়ারিং হাউস বলা হয়। সেখানে প্রত্যহ সকল ব্যাঙ্কের চেক জড়ো হয় এবং প্রত্যেকের দেনাপাওনা ওয়াবাদ অন্তে সাব্যস্ত হয়। কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এই কাজ করিত। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া করে।

ইহার অর্থ এই নহে যে 'খ' নোটে ও মুদ্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে। আধুনিক কালে ঋণ করিয়া কেহই নগদ অর্থ নিজ গৃহে লইয়া যায় না। সেই অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্কেই আমানতী হিসাব খোলা হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যাঙ্ক যত টাকা ঋণ দান করে প্রায় সেই টাকাই ডিপোজিট হিসাবে ফিরিয়া পায় এবং এইরূপে ঋণের টাকা ও আমানতী টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে ব্যাঙ্কের হিসাবে দেনার ঘরে যে ১০,০০০ টাকা আমানত দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে এক হাজার টাকাই প্রকৃত ক্যাশ আমানত, বাকী নয় হাজার টাকা শুধু 'পেপার' আমানত; যে-টাকাটা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ'-কে ধার দেওয়া হইয়াছে (পাস-বই ও চেক-বই মূলে), তাহাই আমানতরূপে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা পড়িয়াছে। ধারও যেমন নগদ দেওয়া হয় নাই, তেমনই আমানতের টাকাও নগদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যেমন নোটের বেলা তেমনই চেকের বেলায়ও ব্যাঙ্ক নগদ মাত্র হাজার টাকা সম্বল করিয়া স্বচ্ছন্দে নয় দশ হাজার টাকা দাদন করিতে পারিতেছে। এখানে কথা উঠিতে পারে, আমি যে টাকা ধার করিব, তাহার সমস্তটাই যে ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিব তাহার নিশ্চয়তা কি? ঠিক কথা। কিন্তু আমি যেমন আমার প্রয়োজনমত চেক দ্বারা টাকা তুলিয়া লইয়া আমার পাওনাদারকে দিব এবং তিনি উহা তাঁহার ব্যাঙ্কে জমা দিবেন, তেমনই আবার অপরের দেওয়া অন্য ব্যাঙ্কের চেকও ত আমার ব্যাঙ্কে আসিয়া জমা হইবে। সুতরাং হরেদরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চেকেরই আদান-প্রদান হইবে বেশী, নগদ টাকার প্রয়োজন অতি সামান্যই হইবে।

ক্যাশ তহবিল ও দাদন

অবশ্য এখানে একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান সময়ে নগদ টাকার ব্যবহার ও প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে উঠিয়া যায় নাই। দশ হাজার টাকা আমানতের জন্য হয়ত এক হাজার টাকার অধিক ক্যাশ তহবিল আবশ্যক হয় না। কিন্তু বিশ হাজার টাকা আমানত স্থলে, অন্ততঃ দুই হাজার টাকার নগদ দাবী মিটাইবার প্রয়োজনও ব্যাঙ্কের হইবে না, এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। সেই জন্য নগদ তহবিলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ইচ্ছামত ধার দিয়া আমানত বৃদ্ধি করা মোটেই নিরাপদ নহে। তাহা করিতে গেলে, নগদ তহবিলের অনুপাতে অত্যধিক নোট সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্কগুলি যেমন এক কালে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে। তাই, কি পরিমাণ নগদ তহবিল রাখিয়া কত টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাঙ্কগুলি তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ গচ্ছিত অর্থের এক-দশমাংশ নগদ তহবিলে রাখিয়া নয়-দশমাংশ ধার দিয়া থাকে। অর্থাৎ আমানত যদি দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে নগদ এক হাজার টাকা হাতে রাখিয়া নয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক ধার দিতে পারে। ভাষান্তরে মাত্র এক হাজার টাকার ক্যাশ আমানত সম্বল করিয়া ব্যাঙ্ক নয় হাজার টাকা দাদন দিতে ও নূতন আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় আমানতের এক-দশমাংশের অধিক টাকা তুলিয়া লওয়া হয় না, বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাদের এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে। কিন্তু কোন কারণে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারিগণের আস্থা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। সেই জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া, প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ককে তাড়াতাড়ি নগদ তহবিল বাড়াইতে হয় এবং তজ্জন্য নূতন ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে কিংবা পুরাতন ধারের টাকা অবিলম্বে আদায় করিয়া লইতে হয়। ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ টাকা ধার দিবে তাহা শুধু তাহার নগদ তহবিলের উপরই নির্ভর করে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এবং যাহারা টাকা ধার করিবে তাহাদের অবস্থা ও যোগ্যতা—এই সবের উপরও নির্ভর করে।

কেন্দ্রীয় বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছার উপর। অধুনা প্রত্যেক দেশে একটি করিয়া সরকারী বা আধা-সরকারী 'সেণ্ট্রাল' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিরাট

সরকারী তহবিল ইহাতেই রাখা হয় এবং ইহা হইতেই খরচ করা হয়। গবর্ন্মেন্টের যখন ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহার ব্যবস্থাও ইহারাই করিয়া থাকে। ইহারাই দেশের মুদ্রা ও নোট সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং দেশের স্বর্ণ-তহবিলও ইহাদের নিকটই সঞ্চিত ও গচ্ছিত থাকে। এই ব্যাঙ্ক গবর্ন্মেন্টের সহযোগিতায় পরিচালিত হইলেও যৌথ কারবারের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং গবর্ন্মেন্টের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। রাজনৈতিক দলাদলি, ঝড়-ঝাপটার বাহিরে থাকিয়া দেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলাই ইহাদের মুখ্য কর্ম্ম ও মূল নীতি। বিলাতের এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"। আমাদের দেশে এই প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল। দেশবাসীর বহুদিনের আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া" নামে এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পণ্যমূল্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক অবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়ান-কমান নীতি এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্থ বলিতে মুদ্রা বা নোটই শুধু বুঝায় না; ধার বা 'ক্রেডিট' মূলে যে বিরাট কাজকর্ম্ম আজ দুনিয়ায় চলিয়াছে, তাহাও অর্থেরই সামিল। মুদ্রা ও নোট যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করে, তেমনি 'ক্রেডিট' সৃষ্টি করিয়া থাকে প্রধানতঃ ব্যবসাদারী যৌথ ব্যাঙ্কগুলি। এই ক্রেডিট বা দাদনের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাক্ষাৎ সম্পর্ক তেমন না থাকিলেও, গৌণ প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত ক্রেডিট বা দাদন দ্বারা নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজেদেরও বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এক ধার হইতে কোম্পানীর কাগজ, ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে সুরু করিবে এবং তখন এই সব সিকিউরিটি ক্রয় করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আরম্ভ করিবে। বিপদ দেখিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির তখন দাদন কমান ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিবে না। ফলে ক্রেডিট মূলে বাজারে যে অতিরিক্ত অর্থের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা প্রতিহত হইবে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট দ্বারা যথোচিত অর্থ সৃষ্টি করিতে না পারায় পণ্যমূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড অমনই কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটি খরিদ করিতে আরম্ভ করিবে। ইহার ফলে বাজারে নূতন অর্থের আমদানী হইয়া উহা যৌথ ব্যাঙ্কগুলির আমানত হিসাবে স্থান লাভ করিবে এবং উহাদের নগদ তহবিল বৃদ্ধি করিবে। তখন দাদন দিবার পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির আর কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট-সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র হইলেও, এই বিষয়ে ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বা কর্ত্তৃত্ব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। মুক্ত নহে বলিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

যৌথ ব্যাঙ্ক ও তাহার কর্ম্মতালিকা

প্রত্যেক ব্যবসায়েরই দুইটি দিক আছে। একটি তাহার দেনার দিক, আর একটি তাহার আয় বা সংস্থানের দিক। ইতিপূর্ব্বে আমরা ব্যাঙ্কের প্রাথমিক যুগের দেনাপাওনার একটি সহজ হিসাব দিয়াছি। এক্ষণে ষোলটি প্রধান বিলাতী ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাব দিতেছি। উহা হইতে ইহাদের সম্মিলিত অর্থবল ও দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৬টি বিলাতী যৌথ ব্যাঙ্কের সমষ্টিগত হিসাব
(১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

দেনা	পাউণ্ড	সংস্থান	পাউণ্ড
মূলধন (নগদ প্রাপ্ত)	৮০০ লক্ষ	নগদ তহবিল (ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে গচ্ছিত টাকা সহ)	২, ৭০ লক্ষ
রিজার্ভ	৫৫০ লক্ষ	শেয়ার মার্কেটে স্বল্প-মেয়াদী দাদন	১,৭৯০ লক্ষ
অদত্ত লভ্যাংশ	৫০ লক্ষ	বিল বা হুণ্ডী খরিদ	৩,৮৯০ লক্ষ
জামিন	৯৬০ লক্ষ	কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঋণ দান	৭,৯৯০ লক্ষ
আমানত	২০,৬৪০ লক্ষ	কোম্পানীর কাগজ ও সিকিউরিটি খরিদ	৫,২০০ লক্ষ
		জামিনের সিকিউরিটি	৯৬০ লক্ষ
		ব্যাঙ্ক-গৃহ ও অন্যান্য সম্পত্তি	৫০০ লক্ষ
মোট	২৩,০০০ লক্ষ	মোট	২৩,০০০ লক্ষ

প্রথমতঃ দেনার দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। অদত্ত লভ্যাংশ (unclaimed dividend) বাদ দিলে, এই সব ব্যাঙ্কের দেনা প্রধানতঃ চারি প্রকারের।

১। যে-সব অংশীদারের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক তাহার মূলধন জোগাড় করিয়াছে, তাহাদের নিকট ঐ মূলধনের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক দায়ী।

২। ব্যাঙ্ক তাহার কারবারের লাভ হইতে যে টাকার রিজার্ভ তহবিল করিয়াছে তাহার জন্য সে দায়ী। এই দায় অবশ্য তাহার নিজের নিকটেই।

৩। তৎপর তাহার প্রধান দেনা আমানত-কারিগণের নিকট। তাহার কারবারের পুঁজির বড় অংশই তাহাদের নিকট হইতে আসিয়াছে।

৪। এতদ্ব্যতীত তাহার আরও একটি দেনা আছে। ইহাকে আমরা সম্ভাব্য দেনা (contingent liability) বলিতে পারি। এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তি বা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করে এবং কোন ব্যাঙ্ক যদি তাহার জন্য জামিন হয়, তাহা হইলে টাকা পরিশোধের দায় প্রধানতঃ দেনদারের হইলেও, তিনি পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে ব্যাঙ্ককেই ঐ টাকা পূরণ করিতে হইবে। এই ত গেল দেনার দিক। ব্যাঙ্কের সংস্থান বা পাওনার দিক সম্বন্ধে এই বার সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

১। তহবিলের একটা অংশ চলতি প্রয়োজনের জন্য ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা নিজের নিকটে রাখিতে হয়। আমানতকারি-গণের দৈনন্দিন নগদ টাকার দাবী মিটাইবার জন্যই হাতের কাছে এই টাকাটা রাখা প্রয়োজন। ইহার একটা অংশ চাহিবামাত্র দিবার সর্ত্তে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে বিনা সুদে গচ্ছিত থাকে। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের কোনরূপ আয় হয় না।

২। শেয়ারের বাজারে (stock-exchange) শেয়ার কেনাবেচা করিয়া শেয়ারের দালালগণ বহু টাকা উপায় করে। এই কাজের জন্য যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয় দালালগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে কিংবা শেয়ার বন্ধক রাখিয়া উহা ব্যাঙ্ক হইতে অল্প দিনের মেয়াদে ধার করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের পক্ষে এই প্রকার দাদনের সুবিধা এই যে, প্রয়োজনমত টাকাটা সুদ সহ অল্প দিনের মধ্যে ঘুরিয়া আসে এবং পুনরায় উহা ঐরূপে ব্যবহার করা চলে।

৩। আধুনিক কালে লক্ষ লক্ষ টাকার কৃষি- ও শিল্প- দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দেশবিদেশে চালান হইয়া থাকে। ইহার মূল্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, অথচ মূল্যের টাকাটা সত্বর পাওয়া না গেলে ব্যবসায়ীর বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যবিক্রেতা তাহার মূল্যের বিল ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকাটা অগ্রিম পাইতে পারে। বিলের সত্যতা ক্রেতাকে কিংবা তাহার পক্ষে কোন নামকরা ব্যাঙ্ককে বিলের উপর স্বাক্ষর করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এই টাকা সাধারণতঃ ৩ মাস মধ্যে ক্রেতাকে শোধ করিতে হয়; ৬ মাসের অনূর্দ্ধকাল মধ্যে ইহা অবশ্য দেয়। প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য বর্ত্তমান যুগে এই ভাবে ব্যাঙ্কের মারফতে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ব্যাঙ্কগুলি এই সব বিল বা হুণ্ডী ক্রয়বিক্রয়ের কাজ করিয়া বেশ একটা মোটা টাকা লাভ করিয়া থাকে। বিল বা হুণ্ডী বহু প্রকারের আছে; তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

৪। অনেক ব্যাঙ্ক, বিশেষতঃ জার্ম্মান ব্যাঙ্ক, দেশের কৃষি- ও শিল্প- প্রতিষ্ঠানের মূলধনও জোগাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার দিক হইতে এইরূপ নূতন প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরিদ নিরাপদ নহে মনে করিয়া বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি এই জাতীয় কাজে টাকা খাটান পছন্দ করে না। তৎপরিবর্ত্তে ব্যবসায়জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কারবারকে, এমন কি ব্যক্তি-বিশেষকে চলতি প্রয়োজনের জন্য অল্পদিনের মেয়াদে ইহারা ঋণদান করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার জন্য কল-কারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তি জামিন লওয়া হয়। বিলাতী ব্যাঙ্কের বিরাট আমানতী টাকার অর্দ্ধেকেরও অধিক কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দাদন দেওয়া হইত। ব্যবসা মন্দা সুরু হওয়ার পর এইরূপ দাদনের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মোট দাদনের প্রায় অর্দ্ধেক এই বাবদে খাটিতেছে। অতি সামান্য সুদে (বার্ষিক শতকরা ৫৲।৬৲ টাকা) এরূপ বিরাট অর্থভাণ্ডারের আনুকূল্য লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই শিল্পে ও বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ আজ এতটা বড় হইতে পারিয়াছে।

৫। কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল বণ্ড,* সুপ্রতি-ষ্ঠিত যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইবার অন্যতম উপায়। টাকার বাজারে এই সব সিকিউরিটির বেশ চাহিদা আছে। প্রয়োজন হইলে অতি সহজে এইগুলি শেয়ার মার্কেটে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করা চলে।

* টাকার প্রয়োজন হইলে বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি তাহাদের আয় জামিন রাখিয়া যে দলিলমূলে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে "মিউনিসিপ্যাল বণ্ড" বলে।

বর্ত্তমান কালে মানুষের বিষয়-সম্পত্তির একটা প্রধান অংশই এই সব Gilt-edged security।

৬। এতদ্ব্যতীত নিজেদের জন্য বড় বড় আপিস-গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যাঙ্কের টাকার একটা অংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার একাংশ নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া অপরাংশ অন্যান্য ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হয়। এই উপায়ে ভাড়া বাবদ নিজেদের জন্য বহু অর্থ ত বাঁচিয়া যায়ই অধিকন্তু অন্যের নিকট হইতে বেশ একটা স্থায়ী আয়ও হয়। কলিকাতায় লালদীঘির চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক-গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহা উপলব্ধি

এই বার বিলাতী ব্যাঙ্কগুলির আমানতের শতকরা কত টাকা কি বাবদ খাটিতেছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

	নগদ তহবিল (ব্যাঙ্ক অ. ইংলণ্ডে গচ্ছিত টাকা সহ)	শেয়ার মার্কেটে অল্পদিনের মেয়াদে দাদন	বিল বা হুণ্ডী খরিদ	কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার খরিদ	কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দাদন
১৯২৫	১১·		১৩·৬	১৭·২	৫১।
১৯২৮		৭·৮	১৪·৭	১৪·২	৫৩·৫ = ১০
১৯৩০ (মে পর্য্যন্ত)		৫·৪	১৭·৮	২৭·১	৩৯·৯ = ১০

প্রণতি
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

নৃত্য
শ্রীপ্রভাত নি

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সুধার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে সুধা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নূতনত্বের ভিতর সুধা কোন আশ্রয় পাইল না। পীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নূতন নূতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত সুধাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার কিছুদিন পরে একটি নবাগতা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ সুধার বন্ধুপ্রীতি উথলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন। স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল।]

১৫

স্কুলে পৌঁছিয়াই সবার আগে মনে হয় হৈমন্তী আজ তাহার আগে আসিয়াছে কি? যদি হৈমন্তী আগে আসে তাহা হইলে স্কুল-বাড়ীতে পা দিয়াই তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা দেখা যায়। হৈমন্তী হাসে ছেলেমানুষের মত খিল্ খিল্ করিয়া নয়। কি শান্ত স্নিগ্ধ স্মিত হাস্যটুকু তাহার; সে হাসির শব্দ নাই, আলো আছে।

কিন্তু সব দিন হৈমন্তীকে কাছে পাওয়া শক্ত। একে ত সে পড়ে অন্য ক্লাসে, তাহার উপর মাসে তিন-চার বার জ্বর হওয়া তাহার যেন একটা বাঁধা নিয়ম। হঠাৎ এক-এক দিন ক্লাসে গিয়া ছোট্ট একখানি নীল খামে ছোট একটুখানি চিঠি পাওয়া যায়, "সুধা, আমার একটু জ্বর হয়েছে, আজ আর স্কুলে যেতে পারলাম না।"

সুধার মনটা মুষড়িয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা আনন্দও হয় যে ইস্কুলের মেয়েদের বিদ্রূপভরা হাসির আড়ালে আজিকার দিনটা অন্ততঃ হৈমন্তীর সঙ্গে তাহার দেখা হইবে। দেখা হইত সন্ধ্যার পরে, কারণ হৈমন্তীর নিয়ম ছিল, জ্বর হইলেই সন্ধ্যার পর সে সুধাকে আনিতে গাড়ী পাঠাইয়া দিত। হৈমন্তীর জ্বরে তাহার আনন্দ করিবার কিছু কারণ যে থাকিতে পারে, ইহাতে সুধার মন নিজেকে অপরাধী ভাবিত।

হৈমন্তীদের বাড়ীতে শয়নকক্ষগুলির দক্ষিণ দিকে দোতলায় পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী প্রকাণ্ড একটা বারান্দা ছিল। তাহার মোটা মোটা জোড়া থামের মাঝখানে উপরের খড়খড়ি হইতে নীচের রেলিং পর্য্যন্ত লোহার জাল দিয়া আগাগোড়া ঘিরিয়া কাক পক্ষী ও চোর-ডাকাতের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করা হইয়াছিল। এই বারান্দাতেই লোহার একটা খাটে পুরু গদি পাতিয়া, চওড়া হেমষ্টীচ্-করা শুভ্র ওয়াড় পরানো আশমানী রেশমের জোড়া বালিশে রুক্ষ তৈলহীন মাথাটি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া হৈমন্তী শুইত।

বাড়ী ফিরিয়া কোন রকমে একটু লুচি তরকারি খাইয়া সুধা ছুটিয়া আসিয়াছে হৈমন্তীর জ্বর বলিয়া। আজ স্কুলের বাসেই ফিরিতে হইয়াছে, তাই দেরীও হইয়াছে যথেষ্ট। সুধা খাটের পাশের বেতের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া হৈমন্তীর জ্বরতপ্ত মসৃণ কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, শীর্ণ নরম হাতের মুঠা-দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু বেশী কথা বলিল না। হৈমন্তী তাহার দীর্ঘায়ত চোখের দৃষ্টি দিয়া সুধার আপাদমস্তকে যেন একটি স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিল। তাহার বর্ণহীন পেলব দুটি ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, একটু থামিয়া হৈমন্তী বলিল, "তুমি এসেছ?"

ঐ ঈষৎ কম্পন আর ঐ দুটি মাত্র কথায় সুধা যেন তাহার সমস্ত অকথিত বাণী আনন্দ-সঙ্গীতের মত শুনিতে পাইল। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল হৈমন্তীর তরুণ চোখের গভীর দৃষ্টি, তাহার মৃণাল গ্রীবার সস্নেহভঙ্গীটুকুও যেন হইয়া উঠিল ভাষাময়। এমনই নীরবেই ফুটিয়া উঠিত তাহাদের নিষ্কলঙ্ক কিশোর জীবনের প্রথম বন্ধুপ্রীতির অম্লান কুসুম। এক মুহূর্ত্তে বলা হইয়া যাইত এক যুগের কথা।

পৃথিবীর হাটে চল্‌তি সাধারণ কথাগুলা সম্বন্ধে সুধার অবজ্ঞা থাকিলেও সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি ভাই, রোজ রোজ এমন ক'রে জ্বর ক'রো না, শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে কি হবে ভাব ত!"

হৈমন্তী সুধার মুখের দিকে চাহিয়া উদাসীন ভাবে বলিল, "কি আর হবে? তোমরা কত এগিয়ে পাসটাস ক'রে যাবে, আমি প'ড়ে থাকব!"

সুধা ব্যথিত হইয়া ভাবিল, হৈমন্তী তাহার কথার অর্থ কিছুই বুঝিল না। তুচ্ছ ভাষার ক্ষমতা কি সামান্য। সুধার মনের গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত যে উৎকণ্ঠা, যে নিদারুণ দুশ্চিন্তার কথা সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, তাহার মুখের কথায় ত তাহার সহস্রাংশের একাংশও প্রকাশ হইল না।

সুধা হৈমন্তীর দুই হাত সজোরে চাপিয়া বলিল, "না, ওসব বাজে কথা নয়। তুমি আর জ্বর করতে পাবে না, পাবে না, কক্ষনো পাবে না।

হৈমন্তী খুশী হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার হুকুম পালন করতে চেষ্টা করব।"

তারপর নীরবে কিছুক্ষণ ক্ষান্তবর্ষণ আষাঢ়ের আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ, দেখ, পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে দেখ। আকাশ ভ'রে রঙের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য্য শিল্পী সে, যে এই বিরাট আকাশের গায়ে প্রতি সন্ধ্যায় নূতন নূতন রঙের এমন অপূর্ব্ব সমারোহ করে। আমি এ রূপসাগরের কূল খুঁজে পাই না। মানুষের তুলিতে এ রূপ ফোটে না, মানুষের ভাষাতেও এর নাম নেই।"

হৈমন্তী কথা বলিতে বলিতে যেন তন্ময় হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া যাইত। সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা তাহাকে যেন মায়াবীর বাঁশির সুরের মত ভুলাইয়া এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাইত। সুধা মুগ্ধ হইয়া আকাশের সৌন্দর্য্যসম্ভারের দিকে চাহিত, কিন্তু ততোধিক মুগ্ধ হইত হৈমন্তীকে দেখিয়া। ভাবিত, না জানি হৈমন্তী তাহা অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ লোকের মানুষ, কত গভীর করিয়া এই পৃথিবীর বিচিত্র রসানুভূতি তাহার হৃদয়ে জাগে। গন্ধর্ব্বলোকবাসিনীদের মত পৃথিবীর স্থূলতা তাহাকে কোথাও যেন স্পর্শ করে না।

হৈমন্তীর ধ্যান হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তুমিও কিন্তু ঐ আকাশের মত সুন্দর, অমনি নিত্য নূতন রূপের ছায়া তোমার মুখে পড়ে। তোমার মনে কিসের খনি আছে বল ত?"

সুধা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "কি যে তুমি বল!"

আর বেশী কথা তাহার যোগাইল না, মনে মনে ভাবিল, "হৈমন্তী পাগল। আমি ভারি ত একটা মানুষ! একটা কথা বলতেও ভাল ক'রে পারি না। আমাকে ও কি-না মনে করে!"

হৈমন্তী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "এই বারান্দায় ব'সে রবিবাবুর 'বলাকা' পড়তে আর জ্বর হ'লে এই আকাশের দিকে চেয়ে চুপটি ক'রে শুয়ে থাকতে ভারি ভাল লাগে। বৃষ্টি না এলে এখান থেকে কেউ আমায় নাড়াতে পারে না। তুমি যদি রোজ এখানে আসতে ত দেখতে যে সকাল-সন্ধ্যা সবই এখানে কেমন সুন্দর হয়।"

পথের ধারে এক সারি দীর্ঘ ঋজু দেবদারু গাছ ও দুই-একটা বৃহৎ ছত্রাকার কৃষ্ণচূড়া গাছ বর্ষার জলে ঘন পত্র-সম্ভারে ঝলমল করিতেছিল। তাহাদের স্নিগ্ধ শ্যাম রূপে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সুধা ভাবিল, সুন্দর বটে! কিন্তু নয়ানজোড়ের বর্ষার ঘনঘটা, নীল আকাশের গায়ে জটাজুট-ময়ী রণরঙ্গিণী ভৈরবীর উন্মত্ত বাহিনীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘ, দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকে সবুজের কত স্তর, ক্ষেতের কচি ধানের অঙ্কুরে তরঙ্গ-হিল্লোলের মত বাতাসের খেলা, পাথরের বাঁকে বাঁকে নূপুর বাজাইয়া জলস্রোতের নৃত্য, হৈমন্তী ত দেখে নাই, দেখিলে পাগল হইয়া যাইত।

সুধা বলিল, "তোমাকে ভাই, একবারটি নয়ানজোড়ে নিয়ে যাব, দেখবে সত্যিকারের পৃথিবী কি!"

হৈমন্তী যেন ছেলেমানুষ সুধাকে ঠাট্টা করার সুরে বলিল, "তার মানে আমার এই পৃথিবীটা কিছু নয় বলতে

চাও ত! আমার এই দক্ষিণের বারান্দায় আলাদিনের প্রদীপ আছে, দু-দিন থাকলে দেখতে পেতে।"

সুধা কিছু বলিল না। সূর্য্যাস্তের শেষ আলোটুকু মিলাইয়া অন্ধকারের পূর্ব্ব সূচনা দেখা দিল। সোনালী মেঘ ক্রমে ক্রোধে কালো হইয়া কেশর ফুলাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় সুধা বাড়ী যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "ঝড় বৃষ্টি এসে পড়লে মাকে বড় ছুটোছুটি করতে হবে, আমি আসি ভাই আজ।"

হৈমন্তীর স্বাস্থ্যহীনতায় ব্যথিত ও তাহার মনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সুধা যখন বাড়ী ফিরিল তখন বাড়ী নীরব। চন্দ্রকান্ত নূতন একজন জার্ম্মান চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, যদি তাঁহাকে দেখাইলে মহামায়ার কিছু উপকার হয়। শিবু মাঠে মোহনবাগানের খেলা দেখার পর তাহার টিউটরের বাড়ীতে পড়িতে গিয়াছে। বাড়ীতে খোকন ছাড়া মহামায়ার আর কোনও অভিভাবক নাই বলিয়া বামুনদি বাসায় যাইতে পায় নাই। সুধার পায়ের শব্দ পাইয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি যাই ভাল মানুষের মেয়ে, তাই আমারই অদেষ্টে যত দুর্ভোগ। ননীর মা দু-ঘটি জল তুলে আর ঘরে দু-ঘা ঝাঁটা পিটিয়ে কোমর দুলিয়ে চ'লে গেল, আর আমি ছিষ্টির রান্না সেরেও এই গুমোট ঘরে ব'সে আছি। কি করি বল, মা'কে ত আর একলা ফে'লে যেতে পারি না।"

সুধা যেন লজ্জিত হইয়া তাহাকেও কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, "আজ হ'ল ব'লে কি রোজই তোমার দেরী হবে? আজ আমি বড় আটকা প'ড়ে গিয়াছিলাম কিনা! আচ্ছা আর একটুও দেরী হবে না। তুমি এখন যাও।"

বামুনদির কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া মহামায়া সুধা আসিয়াছে বুঝিয়া সিঁড়ির মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ও সুধা, উপরে এসে দে'খে যা, তোর পিসি তোর জন্তে কি শাড়ী পাঠিয়েছে। তুই বড় মেয়ে, সংসারের গিন্নি, মা তোর খোঁড়া, তোর জন্তে কিছু করতে পারে না, উল্টে তোরই সেবা নেয়। কিন্তু পিসি সেই পাড়াগাঁ থেকেও ঠিক বছর বছর কাপড় পাঠায়, তার কখনও ভুল হয় না।"

মহামায়া তাহার সেই ছোট ঘরের তক্তাতেই আবার দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া গিয়া বসিলেন। তক্তার উপর হিসাবের খেরো-মোড়া খাতা, ছোট একটা পানের ডিবা, ও সংসার-খরচের ক্যাস বাক্স। সুধা উপরে আসিয়া দেখিল, মা'র কোলের উপর গোলাপী রঙের একখানা জরির পাড়ের শাড়ী। পিসিমা পাড়াগাঁয়ে বসিয়াও ত সুন্দর জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মহামায়া বলিলেন, "কাল রথযাত্রার মেলাতে ঠাকুরঝি মৃগাঙ্ককে শহরে পাঠিয়েছিলেন নিশ্চয়। ব্যাপারীরা এই সময় কাপড়চোপড় বাসন কিছু কিছু আনে। ঠাকুরঝি আর কিছু না কিনে টাকা ক'টা তোর জন্তেই খরচ ক'রে ব'সে আছেন। কাপড়খানা পরে একবার আসিস এ-ঘরে।"

সুধা কাপড়খানা হাতে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সামান্ত পাঁচ-ছ' টাকার কাপড়, কিন্তু সুধার কাছে তাহাই অমূল্য। চিরকালই সে সাদাসিধা কাপড় পরে, জরির পাড়ের শাড়ী তাহার বয়সে এই সে প্রথম পাইল। কাপড়-খানা সযত্নে খুলিয়া সন্তর্পণে পরিয়া কি মনে করিয়া কপালে একটি সিন্দুরটিপ পরিবার জন্ত সে আয়নার কাছে গেল। টিপটা পরিয়া ইচ্ছা করিল আয়নার ভিতর নিজের মুখের ছায়াটা একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে। ছায়ার দিকে তাকাইয়া সে নিজেই ভাবিয়া বিস্মিত হইল যে ইতিপূর্ব্বে এরূপ ইচ্ছা তাহার বিশেষ কখনও হয় নাই কেন। তাহার বয়সে মেয়েরা, এমন কি ছেলেরাও নিজেদের অল্পবিস্তর যা সৌন্দর্য্যের পুঁজি আছে, তাহা ষোল আনা হিসাব করিয়া রাখে। কিন্তু সে কেন এমন অচেতন উদাসীন? হয়ত বিধাতা তাহাকে শৈশব হইতেই ঐখানে বঞ্চিত করিয়াছিলেন বলিয়া ওকথা সে বেশী ভাবে নাই। হৈমন্তী তাহাকে হঠাৎ সজাগ করিয়া দিয়াছে।

তখন রাত্রি হইয়াছে। এক পশলা বৃষ্টির পর জলভার-মুক্ত মেঘগুলি যেন ক্লান্ত হইয়া দিগন্তের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলকণাধৌত সপ্তমীর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সুধার গোলাপী-শাড়ী জড়ানো সুঠাম দেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার নিটোল স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ দেহযষ্টির উপরের সুকুমার মুখখানির ছায়া তাহার নিজের চোখেই অকস্মাৎ ভারি সুন্দর লাগিল। বাড়ীতে ছেলেবেলা হইতে প্রায় সকলের কাছেই সে নাম পাইয়াছে কালো মেয়ে।

কিন্তু এমন সর্ব্বগ্লানিমুক্ত রক্তাভ শ্যামসুন্দর মুখশ্রী সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। বিধাতা তাহাকে অটুট স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন, তাহারই দীপ্তি যেন তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে হাল্কা মেঘের আড়ালের অষ্টমীর জ্যোৎস্নার মত জ্বলিতেছে। পীতাভ রঙীন কাগজের ফানুসের ভিতর মোমবাতির মৃদু আলো জ্বালিয়া দিলে তাহা যেমন জ্বল্ জ্বল্ করে, তাহার রেখালেশহীন উজ্জ্বল তরুণ মুখও যেন তেমনই দীপ্যমান। সুধার বিশ্বাস হইতেছিল না যে এই দর্পণের সুন্দর ছায়াটি তাহারই আজন্ম-পরিচিত সুধার ছায়া। সে ত এমন ছিল না ; একখানা শাড়ীর রঙে কুৎসিত মানুষ কি হঠাৎ এতটা সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে ? অথবা হয়ত সে সুন্দর ছিল, কিন্তু হৈমন্তীর আবিষ্কারের পূর্ব্বে সে তাহা জানিতে পারে নাই। মনটা তাহার অকারণ খুশীতে ভরিয়া উঠিল। কোন এক অদৃশ্য শিল্পী যে তাহার বয়ঃসন্ধিকালে নূতন তুলিকাপাতে তাহাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন তাহা সুধা বুঝিতে পারে নাই।

সুধার মনে পড়িল, কলিকাতায় আসিবার বছরখানিক আগে পিসিমা একদিন মাকে বলিতেছিলেন, "কেমন বউ, আমার কথা ঠিক হবে না বলেছিলে, এখন দেখছ ত ? সুধা নাকি তোমার কালো কুচ্ছিৎ হবে ? আর দুটো বছর যাক্, তখন দে'খে নিও জাতসাপের বাচ্ছা জাতসাপ হয় কিনা।"

মা নিশ্চয়ই পিসিমার চেয়ে সুধাকে কম ভালবাসেন না, কিন্তু পিসিমার কথাতে মা নিজের জেদ ছাড়িলেন না। তিনি মৃদু একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি আর বলেছি যে ও সাঁওতাল হবে ? ভদ্র বাঙালীর মেয়ে ঘসামাজা হবে বই কি ! তবে শিবুতে ওতে চিরকালই তফাৎ থাকবে এ আমি নিশ্চয় বলছি।"

হৈমবতী রাগ করিয়া বলিলেন, "মুখে তুমি মান না, কিন্তু বউ, তোমার রঙের জাঁক আছে। তোমার চেয়ে একটু নীরেস ব'লে ওকে তুমি উঁচু নজরে কোনদিন দেখলেই না।"

হৈমবতী ও মহামায়ার এই সব কথা লইয়া সুধা কোন দিন মাথা ঘামায় নাই। মনে মনে সে মহামায়ার কথাই সত্য বলিয়া জানিত। পিসিমার পক্ষপাতে মনটা তাহার যে মোটেই খুশী হইত না তাহা নয়, কিন্তু সেটা যে নিতান্তই পিসিমার পক্ষপাত এ ধারণাটাও তাহার পাকা ছিল।

আজ সুধার ধারণা বদ্‌লাইয়া গেল। পিসিমা সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, না হইলে হৈমন্তীই বা তাহাকে আকাশের মত সুন্দর বলিবে কেন, সে নিজেই বা কেন দর্পণে নিজমুখ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইবে ? মা'র উপর একটু-খানি অভিমান হইল, মা নিজে অপূর্ব্ব সুন্দরী, তাই শিবুর গৌরবর্ণের উপর তাঁহার নজর বেশী, সুধার কিছু সুন্দর তিনি খুঁজিয়া পান না। অবশ্য, মা'র উপর বেশী অভিমান সুধা করিতে পারিত না, তাহা হইলে আবার নিজেকেই মস্ত অপরাধী মনে হয়। মানুষ কি দর্পণ, যে যাহাই বলুক না কেন, এ-কথা সুধা ভোলে নাই যে তাহার মায়ের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। তাঁহার রূপ-বিচারের মাপকাঠি ত বড় হইবেই। কিন্তু তবু আজ যাহা সে আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নয়, আজিকার মত তাহার চোখে তাহাও অপূর্ব্বই !

১৬

শীতের হাওয়া দিয়াছে। সুধা ও শিবু পূজার ছুটিতে মৃগাঙ্ক-দাদার সঙ্গে হৈমবতীর নিকট গিয়াছিল, বিশ-বাইশদিন থাকিয়া ছুটি শেষ হইবার আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ানজোড়ের ধানের ক্ষেত সোনায় সোনা হইয়া উঠিয়াছে। সুধাদের ভিতর-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান গোবর দিয়া নিকাইয়া করুণা ঝি সেখানে ধান মাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গরু ও মহিষের গাড়ীতে বোঝাই রাশি রাশি ধান আনিয়া লখা মাঝি ও ডুমকা সাঁওতাল উঠানে ঢালিতেছে। হৈমবতী ভয়ানক ব্যস্ত। কুলি-কামিনদের ধান দিয়া পয়সা দিয়া যে যেমন চাহে ধানকাটার বেতন শোধ করিতে হইতেছে, আবার তাহার হিসাবও রাখিতে হইবে। সুধা সাহায্য করিতে গেলে তিনি যেন আজকাল কেমন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। "না বাছা, তোমরা লেখাপড়া ফে'লে এর ভিতর কেন ? এ সব গেঁয়ো চাষা-ভূষোর কাজ কি তোমাদের সাজে ?" তিন বছর আগে যে-সব সাঁওতাল মেয়েরা ঘরের লোকের মত সুধার সঙ্গে গল্পগুজব করিত তাহারাও এখন একটু দূর হইতে তাকায়।

সুধা ক্ষুণ্ণ হইত বটে, কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিত, তাহারও মন আজ আর নয়ানজোড়ের ধানের ক্ষেতের ভিতর নাই। কলিকাতার বাঁধানো রাজপথের ধারে হৈমন্তীদের বারান্দায় হৈমন্তীকে ঘিরিয়াই তাহার মনটি ঘুরিয়া বেড়াইত। শীতের সন্ধ্যা সকাল সকাল কালো হইয়া নামিলে পিসিমা যখন পশ্চিমদিকের দরজা-জানালাগুলা ভেজাইয়া একলা-ঘরের বহুদিন-সঞ্চিত দুঃখের কথা বলিতে বসিতেন এবং নিজের বুড়ো হাড় ক'খানার জন্য একটুখানি বিশ্রাম ভিক্ষা করিতেন, শুধু তখনই সুধার মনে হইত, এমন করিয়া পিসিমাকে একলা ফেলিয়া সকলে চলিয়া না গেলেই ভাল হইত। মৃগাঙ্ক-দাদা বাহিরে বাহিরে ধান চাল আর খাজানা আদায় করিয়া বেড়ায়, পিসিমা তাহাই মাপেন আর মরাইয়ে তোলেন। যদি সুধা এখানে থাকিত তাহা হইলে পিসিমার জীবন-যাত্রার ধারায় আর-একটুখানি সরসতা ও আর-একটুখানি বৈচিত্র্য হয়ত দেখা যাইত। কিন্তু হায়, তাহাদের আজ সকলেরই জীবনের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া আনা যাইবে না। একলা ধান চাল মাপিয়াই পিসিমার শেষ কয়টা দিন কাটানো ছাড়া গতি নাই।

কতকটা যেন মায়া বাড়াইবার ভয়েই সুধা এবার ছুটি শেষ হইবার আগেই কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে। নহিলে কোথা হইতে একটা টাট্টু ঘোড়া জুটাইয়া শিবুকে বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইবার খেলায় মৃগাঙ্ক-দাদা বেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

বহুকাল পরে সুরধুনী রুগ্ন বোন মহামায়াকে দেখিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভরসাতেই খোকাকে কলিকাতায় রাখিয়া সুধা পিসিমার কাছে যাইতে পারিয়াছিল। না হইলে মা ও খোকাকে ফেলিয়া একদিনের জন্যও তাহার কোথাও যাইবার উপায় নাই। এই একটি চির-রুগ্না মা ও একটি শিশু ভাই যেন তাহার দুই পায়ের বেড়ি। তাহারই উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই তাঁহাদের জন্য তাহার এই বন্দীদশায় ছিল সুধার আনন্দ ও গৌরব।

সুরধুনীকে সুধা খুবই ভালবাসিত, কিন্তু তাঁহার কাছে মামার বাড়ীর গল্প শুনিবার আশায় বাঁধা পড়িলে আর পিসিমার কাছে যাওয়া হয় না। সুতরাং এই বিচ্ছেদের ত্যাগটুকু তাহাকে স্বীকার করিতেই হইয়াছিল। ফিরিয়া যখন আসিল তার পরদিনই সুরধুনীও দেশে ফিরিয়া গেলেন। একটা মাত্র দিনের দেখাশুনা তাহাতেও সুরধুনী সুধার সঙ্গে বেশী ছেলেমানুষী গল্প করিলেন না। হাসিয়া দুই-তিন বার বলিলেন, "ষেটের কোলে সুধা এবার ডাগরটি হয়েছে, মায়া এবার চন্দরকে সজাগ ক'রে দিস্, নইলে পণ্ডিতমানুষের কি আর হুঁস হবে ?"

মহামায়া বলিলেন, "উনি বলেন পড়াশুনো সাঙ্গ না হ'লে বিয়ে দেবেন না।"

সুরধুনী বলিলেন, "স্বামীই মেয়েমানুষের জপতপ ধ্যান ধারণা, এই পড়াশুনোতেই যদি ভালছেলে পছন্দ করে, তবে আর কার জন্যে বেশী পড়াশুনো করবে ? ও কি আর আপিস আদালত করতে যাবে ?" হৈমবতীও আসিবার সময় সুধাকে বলিয়াছিলেন বটে, "লেখাপড়া ত খুব করাচ্ছে তোমার বাপ, কিন্তু যেমন এদিকে করাবে, ওদিকেও সেই মত হিসেব ক'রে না আনতে পারলে যে মান থাকবে না, সে সব কি হুঁস আছে ? আর ত কচিটি নেই, এবার এসব কথাও ত ভাবতে হবে ?"

সুধা যে বড় হইয়াছে, মাসি পিসি সকলের মুখেই এখন সেই কথা। পিসিমা হুঁসিয়ার মানুষ, তিনি আবার সুধাকে কত বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। "তোর মা রোগা মানুষ, ঘর থেকে ত বেরোয় না, বাইরে যেতে আসতে আর যার তার সঙ্গে হট্ হট্ ক'রে বেড়াবি না। বাপের সঙ্গে যাবি, শিবুকেও সঙ্গে নিস্। পুরুষ ছেলের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করিস না, তাদের সঙ্গে এক আসনেও কখ্খনো বসবি না।"

সুধার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিশেষ নাই। তাহাদের পরিবারের সকলের বন্ধু সুধীন্দ্র-বাবুই এক এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেন, তাঁহার সঙ্গে তাহাদের সকলেরই বেশ ভাব। অন্য কেহ সমবয়স্ক বন্ধু তাহার থাকিলে আপত্তি ছিল না, কারণ স্ত্রীসমাজে পুরুষেরা যে এমন অপাঙ্‌ক্তেয় সুধার তাহা ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল না। পিসিমার কাছে এবার সে শিখিয়াছে যে বড় হইলে পুরুষজাতিকে সর্ব্বদা সাত হাত তফাতে রাখিয়া চলিতে হয়। এমন কি সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বঘটে সকলকে মুখ দেখিতেও দেওয়া উচিত নয়। কয়েকটা মাত্র

বৎসরের ব্যবধান ঘটিয়া তাহার জীবনে এমন সকল পরিবর্ত্তন কেন আসিবে তাহা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। কেনই বা পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষ হইতে তাহাকে দূরে দূরে থাকিতে হইবে এবং কেনই বা বিশেষ একটি মানুষের জন্তই তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা সব মাপিয়া রাখিতে হইবে তাহাও বুঝা শক্ত। সে এতকাল পিতামাতার কাছে ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে শিখিয়াছে, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষা তাহার নিজের এবং দশ জনের আনন্দ ও উন্নতির জন্ত, তবে আজ তাহার বেলা মাসিমা পিসিমারা সব নূতন নিয়ম প্রচার করিতেছেন কেন? স্ত্রীলোকেরা কি ঠিক মনুষ্যজাতির মধ্যে গণ্য নয়? একটুখানি নীচে বোধ হয় তাহাদের আসন! কিন্তু কেন?

যাইবার সময় সুধা সুরধুনীকে বলিল, "মাসিমা, আবার তুমি কবে আসবে?"

মাসিমা বলিলেন, "তোমার বর দেখতে আসতেই ত হবে মা। সে আমাদের কত আদরের জিনিষ!"

আবার সেই সব কথা! সুধার জন্ত আর মাসিমা আসিবেন না। সুধা এখন আর সে সুধা নাই।

ছুটি প্রায় কাটিয়া আসিতেছে। কিন্তু নয়ানজোড়ে চলিয়া যাওয়ার জন্ত বাড়ীর কাজকর্ম্ম অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে। পিসিমা-মাসিমাদের নূতন প্রসঙ্গের কথা ভুলিয়া এইবার সুধাকে সেই-সব দিকে মন দিতে হইবে। তাহার উপর হৈমন্তীর ডাকও আছে। প্রায় মাস-খানিক দেখা-শুনা নাই, হৈমন্তী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ছুটি থাকিতে থাকিতেই বড় রকম, একটা উৎসব কি চড়ুই-ভাতের আয়োজন করিয়া সে এতদিনের অদর্শনের দুঃখটা একটু ভুলিতে চায়। সুধার ত এত আয়োজন করিবার ক্ষমতা নাই, সে আর কি করিবে? হৈমন্তীকে ডাকিয়া এক দিন নিজের হাতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। হৈমন্তী নূতন গুড়ের পায়েস খাইতে ভালবাসে। সুধা নয়ানজোড় হইতে পিসিমার কাছে চাহিয়া নূতন গুড়ের 'নবাত' আনিয়াছে, তাই দিয়া পায়েস রাঁধিবে। আর একটা বিদ্যাও সে পিসিমার কাছে শিখিয়া আসিয়াছে— বিব্‌নি-খোঁপা বাঁধা। হৈমন্তীর ঐ রেশমের মত নরম কুঞ্চিত কাল চুলগুলি দিয়া কেমন খোঁপা হয় সুধা দেখিবে। হৈমন্তীও ত বড় হইয়াছে, এখন জোড়া ফাঁস দেওয়া বিনুনি না ঝুলাইয়া তাহার মৃণালের মত গ্রীবাটি বাহির করিয়া খোঁপা বাঁধিলে গ্রীক দেবীমূর্ত্তির মত সুন্দর দেখাইবে।

সুরধুনী চলিয়া যাইবার পর সংসারের তোলা বিছানা-কাপড় রোদে দিতে দিতে সুধা এই-সব সাত-পাঁচ ভাবিতেছিল। অন্তান্ত বছর ভাদ্র মাসেই সমস্ত কাপড়-চোপড় রোদে দিয়া ছ'মাসের মত ঝাড়িয়া তোলা হয়, এবার আর তাহা হইয়া উঠে নাই। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে পাঁজিতে ভাদ্র আশ্বিন বলিয়া দুইটা মাস আছে। সেই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে বৃষ্টি নামিয়াছিল, একেবারে শেষ হইল কার্ত্তিকের গোড়ায় আসিয়া। অবিশ্রাম জলে সারা ভারতবর্ষটাই যেন তলাইয়া যাইবার যোগাড়। কলিকাতার লোকে সুদ্ধ দু-বেলা ভাবিতেছে, এই বুঝি গঙ্গার জলে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া শহর ডুবিয়া যায়। ইহার ভিতর ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে ঘরের ভিতরকার বিছানা-কাপড়ই শুষ্ক রাখা দায় ত বাহিরে দিবে কি? সূর্য্যদেব ত মেঘের ঘেরা-টোপ তুলিয়া পৃথিবীর মুখ দেখিতেই পান না।

দক্ষিণের বারাণ্ডার দরজার কাছে তক্তাপোষটা টানিয়া মহামায়া বসিয়াছেন একটু হাওয়া পাইবার আশাতে। সুধা ছোট ছাদে ঝুলানো লোহার তারে গরম ও রেশমের কাপড়গুলি শুকাইতে দিতেছিল। লেপগুলাও আলিসার উপর মেলিয়া দিয়াছে। মহামায়া বলিলেন, "শিবুর হাতে কাপড় পড়লে ভালমন্দ ত কিছু বিচার করে না, তার কাছে চটও যা আর কিংখাবও তা। কাপড়গুলোকে একটু দুঠাই ক'রে রাখিস্ বাছা! তসরের পাঞ্জাবী, সিল্কের শার্ট সব ঘেঁটে গোবর ক'রে রেখেছে, সেগুলো শুধু রোদে দিলে ত হবে না, শালকরকে ডাকিয়ে একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সারা শীত ওসব গায়ে উঠ্‌বে না, আকাচা তুলে রাখ্‌লে যে-কাপড়ের সঙ্গে তুলবে তাও পোকায় কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে রেখে দেবে।"

সুধা বলিল, "আচ্ছা, আমাদের তিনজনের কাপড় রোদে দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে রাখি। ওই দুই মূর্ত্তিমানের জিনিষ না-হয় কেচে তোলা যাবে। বাবার ত দুখানা এণ্ডি আর গরদের চাদর, ও ত রোদেও না দিলে চলে। সারা

বছর গায়ে দিলেও ময়লা হ'ত না বোধ হয়। শালখানা শীতের শেষে কাচিয়ে রাখতে হয়, তাই গত বছর কাচিয়েছিলাম। না কাচালেও কেউ বিশ্বাস করত না যে সারা শীতের ব্যবহার। কি ক'রে যে বাবা পারেন ?"

মহামায়া সুধার সিল্কের ব্লাউসে হুক টাঁকিতে টাঁকিতে বলিলেন, "যার ভাল হয় তার সবই ভাল। আমি ত বাপু দিবারাত্রি রাজসিংহাসনে ব'সে আছি, তবু অমন ক'রে জিনিষ রাখতে পারি কই ? গায়ের থেকে জামা কাপড় নামিয়ে পাট না ক'রে উনি কখনও আলনায় পর্য্যন্ত রাখেন না।"

পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী তালপাতায় বোনা ব্যাগে করিয়া উলকাঁটা লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, দুপুরবেলা পাড়াপড়শীর বাড়ী একবার তাঁহার যাওয়া চাই। প্রথম প্রথম মহামায়ার কাছে পাড়ার গিন্নিরা বড় আসিতেন না, কিন্তু হঠাৎ যখন মণ্ডলগৃহিণী একবার আবিষ্কার করিয়া বসিলেন যে মহামায়া মানুষটা বেশ গল্পে, তখন প্রত্যহ তাঁহার কাছে একবার করিয়া হাজিরা দেওয়া মণ্ডলগৃহিণীর বাঁধা নিয়ম হইয়া উঠিল। কারণ এই মানুষটিকে বাড়ীতে আসিয়া অনুপস্থিত কখনও দেখা যাইবে না তাহা সকলেই জানিতেন।

সুধা তালপাতার ব্যাগের দিকে তাকাইয়াই ভীত স্বরে বলিল, "ও মাসিমা, আপনার ছেলেরা যে সব কলেজে পড়া সুরু ক'রে দিল, আপনি আবার উল বুনছেন কার জন্যে ?"

মণ্ডলগৃহিণী বলিলেন, "ওর কি আর জন্যে টন্যে আছে মা ? হাতটা নাড়লে মনে সান্ত্বনা হয় যে একটা কাজ করছি ; তার পর জমা ক'রে রাখলে একে তাকে দিতে কত কাজে লেগে যায়। লোকলৌকুতাও ত আছে ! ঐ দেখ না, তোমার মাও ত টুকটাক ক'রে হাত চালাচ্ছেন।"

হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "টুকটাক নয় ভাই, চট্‌পট্‌ মেয়ের ব্লাউস তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবে, ছুটোছুটির কাজগুলো আমার ও সেরে ফেলছে, আমি ওর হাল্কা কাজগুলো ক'রে দি।"

নূতন একটা গল্পের গন্ধ পাইয়া মণ্ডলগৃহিণী উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি ? কার সঙ্গে যাচ্ছে গো ?"

মহামায়া বলিলেন, "ওই ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই যাবে আমাদের সুধীন-বাবু আছেন, ছোটর সঙ্গে ছোট আবার বড়র সঙ্গে বড়। তিনিই নিয়ে যাবেন, তবে যোগাড় যাগাড় করছে রণেন পালিতের মেয়ে হৈমন্তী। সুধাকে যে ভয়ানক ভালবাসে। ওকে ছাড়া এক পা কোথাও যেতে চায় না।"

মণ্ডলগৃহিণী বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভালবাসা ভালই, তবে মেয়ে না ভালবেসে ছেলে ভালবাসলেই বেশী কাজ হত। বড়মানুষের প্রথম ছেলে ! আমাদের ক্রীশ্চান ঘর হ'লে লুফে নিত, তোমাদের আবার বামুনের জাত এই যা।"

মহামায়া ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষের সামনে কি যে ছাইভস্ম বকছ ভাই, তার ঠিক নেই। মা-মাসির সম্পর্কও কি ভুলে গেলে ?"

মণ্ডলগৃহিণী সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "সুধা বড় হয়েছে, এখন আর ঘরে-তৈরি জামা কাপড় পরিয়ে বাইরে পাঠিও না, ভাই। দরজি ডাকিয়ে মাপসই সব কাপড়চোপড় করাবে। যেখানে বাইরের পাঁচটা লোক আসে সেখানে দশ জনে দে'খে ভাল বলে এমন ক'রে ত মেয়েকে পাঠানো উচিত ? মেয়েছেলেকে শুধু লেখাপড়া শেখালেই মানুষ হয় না, আরও অনেক জিনিষ শেখানো চাই।" এই বলিয়া তিনি মহামায়ার দিকে চোখ টিপিয়া একটা ইসারা করিলেন—অর্থাৎ কাহার কখন সুনজরে এ-বয়সের মেয়েরা লাগিয়া যায় তাহার ত ঠিক নাই, মনোহরণ-বিদ্যার প্রথম ধাপ যে প্রসাধন, সে কথা এখন আর ভুলিয়া থাকা চলে না।

মহামায়া ইসারা বুঝিয়াও গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে গেলে গায়ে গরীবের মার্কা অত স্পষ্ট ক'রে না মেরে যাওয়াই ভাল। সমানে সমানে মিশতে পারলেই মানুষের মান থাকে। তবে আমি ত জেলখানার কয়েদী, ঘরের বাইরের পৃথিবীটা কতদিন চোখে দেখি নি, কাজেই কোন্‌খানে যে কি বেমানান হচ্ছে সব সময় বুঝতে পারি নে। মেয়েটাও বেশী সৌখীন নজর নিয়ে জন্মায় নি, ওই বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় প'রেই ত ক'বছর এখানে কাটিয়ে দিল। একটা হাবড়া হাটের কাপড় তাও ওকে সেধে পরাতে হয়। শুনছিস ত সুধা, পিসি ত পুজোতেও

তোকে নূতন জরি পেড়ে নীলাম্বরী দিয়েছেন, ঐখানাই প'রে যাস্। জামাটা ঘরে তৈরি হলেও সিল্কের ত বটে, ওই পরলেই বেশ চলবে।"

উঠিতে বসিতে বড় হইয়াছে শুনিতে আর সুধার ভাল লাগে না। মানুষের শৈশব কি এতই ক্ষণস্থায়ী? আর বড়-হওয়া কি মানুষের একটা অপরাধ? বড় হইলে সকল বিষয়ে এত ভয়ে ভয়ে আটঘাট বাঁধিয়া চলিতে হইবে কেন? আরও আশ্চর্য্য যে মৃগাঙ্ক-দাদা যে সুধার চেয়ে আট বছরের বড় তাহাকে কেহ কোনদিন বড় হওয়ার জন্য পঁচিশ রকম নিয়ম পালন করিতে বলে না। মণ্ডলগিন্নির ছেলেরা কলেজে পড়ে, তাহারাও বড় হওয়ার কোন দায়িত্ব বহন করে এমন ত তাহাদের মায়ের কথায় মনে হয় না। তবে সুধা অকস্মাৎ দুই-তিন বছরে সকলকে ডিঙাইয়া এত বড় কি করিয়া হইয়া গেল?

শৈশবের অর্দ্ধসুপ্তি হইতে জীবনে একটা নূতন জাগরণের মধ্যে যে সে বাড়িয়া উঠিতেছে ইহা সুধা নিজে একেবারেই অনুভব করে নাই, এমন নহে। উষার উন্মেষ যেমন অন্ধকারের বুকের ভিতর হইতেই কোনও আকস্মিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করিয়া এক এক পরদা করিয়া দেখা দিতে থাকে, তাহার দেহমনও তেমনই পাপড়ির পর পাপড়ি বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিকাশ ভয়ের নয়, আনন্দের। সেখানে সতর্ক প্রহরীর মত কেহ চীৎকার করিয়া বলে নাই, 'সাবধান বড় হইয়াছ।' সেখানে কে যেন শেষ রাত্রের মধুর স্বপ্নের ভিতর গান গাহিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইতেছে, "দেখ, এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ, কাল যার কোলে অকস্মাৎ এসে পড়েছ মনে হয়েছিল, আজ অনুভব করছ না কি তোমার দেহমনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুমি তার সঙ্গে জন্ম জন্ম বাঁধা?" কার এ বাণী সুধা বুঝিত না, কিন্তু আনন্দ-শিহরণের সহিত সে অনুভব করিত সৃষ্টির সহিত জন্মজন্মান্তরের তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধন। সবটা এখনও তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠে নাই, কিন্তু প্রতি দিনই যেন ধরিত্রীমাতা একটু একটু করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া রহস্যমধুর কণ্ঠে কানে কানে বলিয়া দিতেন, "আমার বিশ্ব-সৃষ্টির শতদলে তুমি একটি পাপড়ি, তোমাকে বাদ দিলে তা অসম্পূর্ণ হবে। এ সৃষ্টি-লীলায় তোমার পালা এল বলে, তার জন্য প্রস্তুত হও।"

সুধা বুঝিত না, জানিত না, কিন্তু আপনা হইতেই তাহার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, জগতে একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে। তাহাকে তাহার জন্য পূজারিণীর মত নিষ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। হয়ত লোকের চক্ষে সৃষ্টিতে তাহার পালা অতি সামান্যই মনে হইবে, কিন্তু তবু নিজের কাছে তাহাকে সেইটুকু নিঁখুৎ করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জীবনে যে-সকল দুঃখ-বেদনা সে পায় নাই, যে আনন্দও সে জানে নাই, গানের সুরে কবিতার ছন্দে তাহা যখন কানের কাছে বাজিয়া উঠিত, আনন্দ ও বেদনার গভীর অনুভূতিতে বুকের তারগুলা কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত, "এ বেদনার তীব্র আঘাত, এ সুখের নিবিড় স্পর্শ আমার যে বহু-পরিচিত। কবে মনে নাই, কিন্তু ইহাকে আমি একদিন বুকের ভিতর করিয়া বহন করিয়াছি।" সুধা পৃথিবীর রূপ-রসগন্ধকে যেন দুই হাতে আপনার বলিয়া কাছে টানিয়া লইতে লাগিল। ইহাকে সে দিন দিন যত চিনিতেছে ততই আরও চিনিতে চায়। মনে হয়, বহু-পুরাতন পরিচয়ের উপর শৈশবের সুষুপ্তি একটা আবরণ টানিয়া দিয়াছিল, আজ তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে।

নিজের সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য তাহার ছিল তাহা যেন ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে। নিজেকেও সে আগের চেয়ে বেশী ভালবাসিতে শিখিয়াছে। তাই প্রসাধনেও তাহার নজর এখন আগের চেয়ে একটুখানি বেশী হইয়াছে। সখ নামক অজানা জিনিষটা তাহার মনের ভিতর ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে রূপের সৌন্দর্য্যের সুষমা, তাহার মাঝখানে সে একটা শ্রীহীন আবর্জ্জনার মত মানুষের চক্ষুপীড়া ঘটাইতে চাহে না। তাহার জন্য সৌন্দর্য্যের রাগিণীতে যেন হঠাৎ বেসুর না বাজিয়া উঠে।

অবশ্য, হৈমন্তীর সমান পর্য্যায়ে সে উঠিতে রাজি নয়। ময়ূরের পেখমে যে বর্ণচ্ছটা মানায়, ঘুঘু পাখীর স্বল্প পালকে কি তাহা খোলে? হৈমন্তীর মত নির্দ্দোষ নিখুঁৎ উজ্জ্বল সাজসজ্জা তাহার অঙ্গে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে। ততটুকু সাজপোষাকই তাহার পক্ষে ভাল যাহাতে লোকে তাহাকে অদ্ভুত কিছু একটা না মনে করে। কিন্তু লোকে আসিয়া তাহার সাজপোষাক তারিফ করিবে

ভাবিতেও সুধার ভয় হয়। সুশোভন কি অশোভন কোনও ভাবেই মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা বিষয়ে তাহার একটা সঙ্কোচ ছিল।

মণ্ডলগৃহিণীর কৌতূহল তখনও মিটে নাই, সদুপদেশ দিবার ইচ্ছাও তেমনই ছিল। তিনি বলিলেন, "গিন্নিবান্নি ত সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না দেখছি, শুধু একপাল মেয়ে নিয়েই সুধীন-বাবু যাবেন, না ছেলেছোকরাও থাকবে?"

মহামায়া বলিলেন, "ছেলেরাও কেউ কেউ আছে শুনেছি। তবে সবই ওদের চিরকালের চেনাশুনো। আমরা এখানে বেশী দিনের ত মানুষ নয়, আমাদের কাছে একটু নূতন বটে।"

মণ্ডলগৃহিণী কি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমার ছেলেদের ও সব বালাই নেই। তারা ক্রিকেট, ফুটবল আর হকি নিয়েই মেতে আছে। মা ছাড়া কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম না আজ পর্য্যন্ত। বড়টা উনিশ বছরের হ'ল, এখনও মা না হ'লে খাবে না ঘুমোবে না, যতক্ষণ বাড়ী থাকে আমারই পিছন পিছন ঘোরে। মেয়ে তোমার সব বোঝে-সোঝে ত? একলা ত দিব্যি ছেড়ে দিচ্ছ?"

মহামায়া বলিলেন, "তোমার এক কথা ভাই! এত জানবার বোঝবার কি আছে? দল বেঁধে পাঁচজনের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, তারা ত কেউ বাঘ ভাল্লুক নয় যে ওকে খেয়ে ফেলবে!"

মণ্ডলগৃহিণী বলিলেন, "থাক্, আমার অত কথায় কাজ কি? তোমার ছাগল তুমি যেদিক দিয়ে খুশী কাট!"

মণ্ডলগৃহিণী ব্যাগ গুছাইয়া বাড়ী চলিয়া গেলে সুধা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতেছিল, পৃথিবীটা সুন্দর, কিন্তু তাহার তলায় তলায় কি যেন কি একটা রহস্যের ধারা বহিয়া যাইতেছে। কেউ ইঙ্গিত করে কালো কুৎসিত ভয়ঙ্কর কি একটা রহস্য পৃথিবীর সুন্দর মুখোসের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে, কখন না জানি উপরের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কেউ বা গানের সুরের ভিতর দিয়া বলে, এই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে আরও কত অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি রহস্যগভীর গোপন অন্ধকারের তলায় রহিয়াছে, মাঝে মাঝে শুধু নিমেষের মত তাহা দেখা যায়।

সুধার মনটাও বলে, পৃথিবী রহস্যময়ী। একবার তার অন্তরালের অন্ধকার তমিস্রার স্রোত বুকে ভয়ের কাঁপন আনিয়া দেয়, আবার তার চকিতের দেখা সোনালী আলোর স্রোত বলে, মিথ্যা ও অন্ধকার, মিথ্যা ভয় ভাবনা। তখন ইচ্ছা করে, চোখ বুজিয়া ছুটিয়া চলিতে ঐ না-দেখা রহস্যপুরীর আনন্দের সন্ধানে।

ক্রমশঃ

তুমি ভালবাসো নীল

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

তুমি ভালবাসো নীল, ভালবাসো প্রিয়ার মতন ;
গোলাপী-কোমল তনু ঘেরি তুমি পর নীল শাড়ী,
অপরাজিতার মত সুমসৃণ সুনীলিমা তারি,—
সে নীলের স্নিগ্ধ কান্তি কলাপীর কামনার ধন।

কাজল কালির মত নীলা রাত্রি ভালবাসো তুমি,
ভালবাসো আকাশের সীমাহীন প্রশান্ত নীলিমা,
ভালবাসো সমুদ্রের সুবিশাল ঘন কাজলিমা,
ভালবাসো অরণ্যের ছায়াঘন নীলা বনভূমি।

আমিও তোমারি মত সবচেয়ে নীল ভালবাসি,
যে নীল তোমার তনু জড়ায়েছে স্নেহ-আলিঙ্গনে,
যে নীল নয়ন-কোণে কাঁপিতেছে প্রণয়-অঞ্জনে,
যে নীল কিশোরী-মনে লক্ষ রূপে উঠিছে উদ্ভাসি।

আমি কেন পাই নাই আকাশের নীলিমার কণা?
সুনীল সাগরে কেন হই নাই সলিল-কুমার?
বনরাজি কেন হায় হ'ল নাকো নিলয় আমার?
রজনীর কাজলিমা কেন মোরে ঘিরে রহিল না?

তুমি যদি ভালবাসো আকাশের সাগরের নীল
কেন তার এক কণা মোর মাঝে দিল না নিখিল?

কৃষিকার্য্য-পরিচালনার আধুনিক প্রণালী

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এস্‌সি

জলসেচনের ও জলনিকাশের ব্যবস্থা

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধনের জন্য জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল রক্ষা করা আবশ্যক। বিভিন্ন মৃত্তিকার ছিদ্রের প্রকৃতি-বিশেষে জলধারণশক্তিও বিভিন্ন। যে মৃত্তিকার দানা বড়—যেমন বেলেমাটি—তাহার ছিদ্রও তত বেশী বড়। এইরূপ মৃত্তিকার জলশোষণশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু জলধারণশক্তি অত্যন্ত কম, কারণ স্থূল ছিদ্রের ভিতর দিয়া জল অতি সহজেই উপরের স্তর হইতে নীচের স্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকার দানাগুলি যদি খুব ছোট হয়—যেমন এঁটেল মাটি—তবে তাহার জলশোষণ করিবার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু জলধারণ করিবার শক্তি খুব বেশী থাকে। মৃত্তিকায় সঞ্চিত জলের কতক অংশ বাষ্প হইয়া উপরে চলিয়া যায় এবং এই জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বেলেমাটির মধ্যস্থিত জলরাশি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু এঁটেল মাটির ছিদ্র ছোট বলিয়া উহা হইতে বাষ্পের আকারে জলশোষণ অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ।

মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জল কৈশিক আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা (capillarity) উদ্ভিদের মূলের সন্নিকটে উপস্থিত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা মূলদ্বারা নিজের আবশ্যকমত গ্রহণ করে। এইরূপে গৃহীত জলরাশির কিয়দংশ উদ্ভিদের শরীর হইতে বাষ্পাকারে উদ্গত হয়। মৃত্তিকা ছোট ছোট দানাযুক্ত হইয়া চূর্ণিত অবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে কৈশিক আকর্ষণশক্তি বিশেষ প্রবল থাকে এবং এই জন্যই কর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্রের বড় বড় ঢেলাগুলিকে ছোট ছোট দানার আকারে পরিণত করিতে পারিলে উদ্ভিদ অতি সহজেই পুষ্টিলাভ করে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক উদ্ভিদ তাহার মূলের প্রসার অনুযায়ী মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর হইতে জল আকর্ষণ করে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনের জন্য জমিতে কি পরিমাণে জলসেচন করা দরকার, তাহা উদ্ভিদের এবং জমির প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে নানা দেশে প্রচুর গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। ক্ষেত্রে যে পরিমাণের কম জল থাকিলে উদ্ভিদের মূল তাহা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে উদ্ভিদের বিশীর্ণ-সীমা (wilting point) বলে। পক্ষান্তরে যে পরিমাণের অতিরিক্ত জল ক্ষেত্র ধারণ করিতে পারে না, তাহাকে ক্ষেত্র-জল (field capacity) বলে। ক্ষেত্রে সেচিত জলরাশি সকল সময়েই এই দুই পরিমাণের মধ্যে নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। কারণ মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জলের পরিমাণ বিশীর্ণ-সীমার কম হইলে উদ্ভিদের মূল তাহা গ্রহণ করিতে পারে না এবং ক্ষেত্র-জলের অধিক হইলে ঐ জলের কতকাংশ পয়ঃপ্রণালীযোগে ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং কতকাংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হইলে শস্যোৎপাদনের জন্য কি পরিমাণ জল দরকার, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা থাকা
যে কি বিপুল পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান হইল।*

বিবিধ শস্য	এক মণ শুষ্ক পদার্থ উৎপাদন করিতে কয় মণ জলের প্রয়োজন
যব	৪৬
জই	৫.৪
ভুট্টা	২৭:
মটরকলাই	৪৭৭
আল	৩.৫

জমিতে জলসেচন করার সময়ে দেখা দরকার যাহাতে অনেকটা জল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে না যায়, কারণ তাহাতে জলের স্রোতে জমির মূল্যবান্ সারপদার্থগুলি জমি হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। ফলতঃ, সেচনকালে জল

* F. H. King প্রণীত *Irrigation and Drainage* (Ed. 1913) গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।
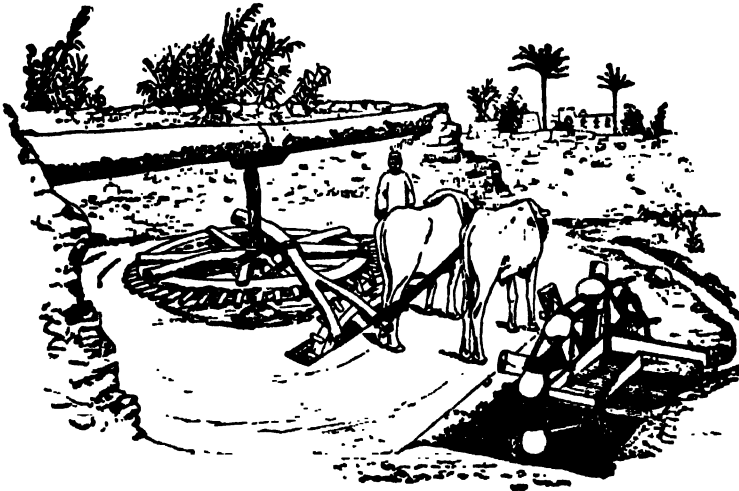
পার্শিয়ান হুইলের সাহায্যে কূয়া হইতে জল তোলা হইতেছে

এরূপ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া দরকার যাহাতে নালার দুই পার্শ্বের ও তলার মাটি জলের সহিত প্রবাহিত না হয়, এবং নালার জল খুব পরিষ্কারভাবে প্রবাহিত হইতে পারে। তা ছাড়া জলসেচনের সময়ে জল যাহাতে ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমানভাবে প্রবাহিত হইতে পারে এবং জমির কোথাও জমা হইয়া না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

সাধারণতঃ বৃষ্টির জল উদ্ভিদগণের জীবনধারণোপযোগী জল সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য মোটের উপর বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিত এবং এই জন্যই প্রাচীন কালের কৃষিগ্রন্থসমূহে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে বৃষ্টির সময় ও বৃষ্টিবারির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বহুবিধ বিধি বর্ণিত হইয়াছে। মহামুনি পরাশর-প্রণীত কৃষিসংগ্রহে উক্ত আছে :—

বৃষ্টিমূলা কৃষিঃ সর্ব্বা কৃষিমূলঞ্চ জীবনম্।
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন বৃষ্টিজ্ঞানং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ বৃষ্টিই কৃষিকার্য্যের মূল, আর জীবনও কৃষিমূলক, অতএব প্রথমে যত্নের সহিত বৃষ্টিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে।*

সাধারণতঃ পৃথিবীর যে-অঞ্চলে যে-পরিমাণ বৃষ্টি হয়, সেই অঞ্চলে ফসলের প্রকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। নিম্নব্রহ্মে গড়ে বার্ষিক ১২৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; সেখানকার প্রধান ফসল ধান। রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১ হইতে ৬ ইঞ্চির মধ্যে; সেখানকার প্রধান ফসল জোয়ার। পৃথিবীর যে-সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম, সে সকল স্থানে বৃষ্টির জল যাহাতে শস্যের উপকারে আসিতে পারে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মাটির জলীয় ভাগ সংরক্ষণ করার উপায় সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচুর গবেষণা হইতেছে। যে-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে জল ধরিয়া রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় জমি সমতল করা। বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য অনেক স্থলে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বেশী পরিমাণ জমিতে জলসরবরাহ করা হয়। এই উপায়ে অনেক জায়গায় সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে সাঙ্কর্য্য বা অন্য কোনও পদ্ধতির সাহায্যে এমন শ্রেণীর উদ্ভিদের সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা, যাহাতে উদ্ভিদ নিতান্ত অল্প বৃষ্টিপাতের মধ্যেও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এ যাবৎ এ-সম্বন্ধে যে-সকল গবেষণা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে কোনও বিশেষ অবস্থার উপযোগী করিয়া উদ্ভিদের উৎপত্তি করা অসম্ভব নহে।

* কৃষিসংগ্রহ, ১৩২২ সাল, পৃষ্ঠা ২-৩, মহামুনি পরাশর-প্রণীত ও শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত। এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বৃষ্টিপাতের উপরে বিবিধ গ্রহ, নক্ষত্র ও লগ্নের প্রভাব সম্বন্ধে মহামুনি পরাশর যে-সকল বিধি এবং অন্যান্য তত্ত্ব 'কৃষি-সংগ্রহ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের তৎকালীন কৃষিপ্রণালী বিশেষ উন্নত ছিল। বস্তুতঃ আধুনিক ভারতীয় কৃষিপ্রণালী সেই পুরাকালের প্রণালী হইতে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পরাশর মুনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা সঠিক জ্ঞাত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে পণ্ডিতপ্রবর ফ্রান্সিস্ বুকানন্ বহুপ্রকার প্রমাণ আলোচনা করিয়া পরাশর মুনির পুত্র এবং চতুর্ব্বেদের জন্মদাতা ব্যাস মুনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বুকানন্ লিখিয়াছেন :—"Vyasa, the son of Parasara, the supposed author of the Vedas, having lived in the age before Jarasandha, King of Magadha, 48 reigns before Chandragupta, should have lived about 1250 years before Christ."—Genealogies of the Hindus, Extracted from their Sacred Writings: By Francis Buchanan and afterwards Hamilton, Edinburgh, 1819, p. 16.

অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় হইতেছে জলাশয়, কূপ অথবা নালা খনন করিয়া জমিতে জল সরবরাহ করা। আকাশের জল অনেক সময়ে অনিশ্চিত হইলেও মাটির নীচের জল ও বড়-বড় নদীর জল প্রায় সকল সময়েই সুনিশ্চিত। এই উপায়কে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি জলাশয় কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন করার পদ্ধতি বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেক জায়গায় কূপ বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিবার জন্য বলদ অথবা এঞ্জিন-পরিচালিত পার্শিয়ান হুইল (Persian wheel) ব্যবহৃত হয়। পার্শিয়ান হুইলের চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৫।১৬ হাত নিম্ন হইতে অনায়াসে জল উত্তোলন করা যাইতে পারে। একটি বড় চাকার উপরে কতকগুলি পাত্র জল পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে এবং চাকা ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রগুলি জলপূর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চাকার গা বাহিয়া উপরে আসে এবং উপরে জল ঢালিয়া দিয়া নিম্নমুখে জলের নীচে চলিয়া যায়। জল তুলিবার জন্য আজকাল বহুবিধ নলকূপ এবং পাম্পও ব্যবহৃত হয়। জমিতে জল সরবরাহের জন্য নদীর উপরে বিশাল বাঁধ বাঁধা এবং সুদীর্ঘ খাল কাটা আধুনিক যুগে সম্ভব হইয়াছে।

কৃষিকার্য্যের জন্য আধুনিক জলরক্ষার প্রণালীগুলি আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে আমেরিকায় জলসেচন-প্রণালী বিশেষ প্রচলিত ছিল না। মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিগণ কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট ক্ষেত্রে জল-সেচন করিত। সেই সময়ে যে-সকল ইউরোপীয় অধিবাসী আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা আমেরিকার যে-সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইত, সেই সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেন। কাজেই তাঁহারা প্রথমে জমিতে ফসল জন্মাইতে জলের অভাব বোধ করেন নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মর্ম্মন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতা ব্রাইহাম ইয়ং এক দল উৎসাহী কর্ম্মীর সহিত আমেরিকার সুদূর পশ্চিম অংশে গ্রেট্ সল্ট লেকের উপত্যকায়, যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প সেইখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা সেই বৎসরই ঐ স্থানে আলুর চাষ করেন এবং লাঙ্গলের সাহায্যে নালা কাটিয়া নিকটবর্ত্তী শহরের খাল হইতে তাঁহাদের

ব্রাইহাম ইয়ং (১৮০১ ১৮৭৭)
আমেরিকার আধুনিক জলসেচন প্রণালীর সংস্থাপক

ক্ষেত্রে জল আনয়ন করেন। বাস্তবিক এই সময় হইতেই কৃষিকার্য্যে আমেরিকার আধুনিক জলসেচন-প্রণালীর প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল। আজকাল অনুর্ব্বর স্থানে বহুদূরব্যাপী নালা কাটিয়া এবং স্থানে স্থানে জলরোধের জন্য বাঁধ বাঁধিয়া সহস্র সহস্র একর জমিতে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে।

নদীতে বাঁধ বাঁধিবার পদ্ধতি খুব সহজ। জলসেচনের জন্য যতখানি জল আবশ্যক সেই অনুযায়ী নদীর জলের গতি রোধ করিবার জন্য নদীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট গভীরতা পর্য্যন্ত সুদৃঢ় দ্বার (gate) নামাইয়া দেওয়া হয়। স্রোতে বাধা পাইয়া নদী-পৃষ্ঠ (level of river) উপরে উঠিয়া আসে এবং বিশাল বাঁধের সাহায্যে নদীর সেই অতিরিক্ত জলরাশি রক্ষা

সারি সারি নালী কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন-প্রণালী

করিয়া পরে খালের সাহায্যে ইচ্ছামত স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী জলসেচন করা সম্ভব। কৃষক এইরূপ একটি প্রধান খাল হইতে তাহার চাষের জমিতে সারি সারি নালীর মধ্য দিয়া আবশ্যকমত জল চালনা করিয়া লয়। পার্শ্ববর্ত্তী চিত্র হইতে এই প্রণালীর খানিকটা আভাস পাওয়া যাইবে। প্রয়োজন-অনুসারে ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করার নিমিত্ত জলের পরিমাণ মাপিবার বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশেই জলসেচনের সাহায্যে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত জমির বিস্তৃতির জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে, কারণ পৃথিবীতে অনুর্ব্বর জমির অন্ত নাই। অনেক স্থলে উপযুক্ত জল পাইলে শস্য উৎপন্ন হইবার কোনই বাধা থাকে না। ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি ও পঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সুবিস্তৃত জমিতে উপযুক্ত জলসেচনের দ্বারা নানাবিধ শস্যোৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশের সুক্কুরের জলরোধের বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাঁধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে প্রায় ৫৩০০০০০ একর অনুর্ব্বর জমিতে জলসেচন করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে কতখানি জমিতে জলসেচন দ্বারা শস্যোৎপাদন করা হইতেছে তাহার একটা মোটামুটি আভাস নিম্নের তালিকায় দেখান হইল। এই তালিকাটি ১৯২৭-২৮ সালের ভারত-গবর্ন্মেণ্টের জলসেচন সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

প্রদেশ	কত একর জমিতে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট জল সেচন করিয়াছিলেন	চাষে ব্যবহৃত শতকরা
মান্দ্রাজ	৭,১৯১,০০০	১৮·৬৫
বোম্বাই	৪১১,০০০	১·৬
সিন্ধুপ্রদেশ	৩,৩৫৩,০০০	৭৬·৮
বঙ্গদেশ	১০২,০০০	·৪
যুক্তপ্রদেশ	২,৩৩৩,০০০	৫·৫
পঞ্জাব	১০,৩৮১,০০০	৩৫·২
ব্রহ্মদেশ	১,৯৪০,০০০	১০·৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৯৪১,০০০	৩·২
মধ্যপ্রদেশ	৪১৫,০০০	২·০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ	৩৯২,০০০	১৫·৩
[illegible]না	৩১,০০০	৬·৫
[illegible]চিস্তান	২৪,০০০	৬.৩

জমিতে জলসেচন করা যেমন প্রয়োজন, জলনিকাশের আবশ্যকতা তাহা অপেক্ষা কম নহে। আবশ্যক জল জমির উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে জমির নিম্নস্থ ক্ষার উপরে উঠে; ইহাতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যায় এবং এই অবস্থা স্থায়ী হইলে জমি কিছুকাল পরে অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ভিদের শিকড়ে বায়ু চলাচল করা আবশ্যক। জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে বায়ু-চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে বহুবিধ জৈব ও অজৈব দ্রবীভূত পদার্থ মাটির উপরিভাগে ও নিম্ন স্তরে জমা হয় এবং অনেক সময়েই উহা উদ্ভিদের পুষ্টিলাভের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত আরও একটি ভাবিবার বিষয় এই যে, জলসেচনের দ্বারা জমির নিম্ন স্তরকে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিলে ক্ষেত্রের নিকটস্থ অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপের ইহা একটি প্রধান কারণ।

ক্ষেত্র হইতে দুই প্রকারে জল নিষ্কাশন করা সম্ভব। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে মাটির নিম্নস্থ ড্রেনের সাহায্যে জমির অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, অবস্থাবিশেষে অনেকে মাটির উপরে নালী কাটিয়া ক্ষেত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া পছন্দ করে। আজকাল শেষোক্ত প্রণালী জলনিকাশের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও অন্যান্য অনেক দেশের বহু লক্ষ একর

জলা জমি হইতে জলনিকাশ করিয়া ক্রমে ঐ সকল অঞ্চলকে বাসোপযোগী ও শস্যোৎপাদনের অনুকূল করা হইয়াছে। ঐ সকল উদ্যমের সাফল্যের মূল কারণ জনসাধারণ দ্বারা গঠিত বিবিধ সমবায়-সমিতির অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়। আমেরিকায় ও ক্যানাডাতে ১০০,০০০ বর্গমাইলের অধিক বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থান হইতে জল বাহির করিয়া ভাল ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়তেছে তাহাতে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উর্ব্বর ও বাসোপযোগী জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের বাংলা দেশে নীচু জমি ও বিলের অভাব নাই। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিলে এই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ধর্ম্মমত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

জগতের প্রায় সর্ব্বত্র বিজ্ঞানব্রতীদের ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতগৌরব বিজ্ঞান-গতপ্রাণ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের ভগবদ্ভক্তি বিষয়েও দেশের লোকে সন্দেহ প্রকাশ করিত। অনেকে তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী এবং কেহ কেহ নাস্তিক বলিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, ডাক্তার সরকার একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তিনি কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নাই, বরং অনন্তশক্তি জগৎস্রষ্টার অপার মহিমায় অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াই পড়িয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল যখন কলেজের ছাত্র, সেই সময় তাঁহার অভিভাবক কনিষ্ঠ মাতুল মহাশয় তাঁহাকে পাদরি মিল্‌নার (Rev. Milner) প্রণীত "টুর রাউণ্ড দি ক্রিয়েশান" (Tour Round the Creation) নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিতে দেন। ইহাতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচিত ছিল। মহেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যয়ন-স্পৃহার সহিত পুস্তকখানি পাঠ ও আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কৌতূহল বর্দ্ধিত ও জ্ঞানলালসা উদ্দীপিত হইতে লাগিল। সৃষ্ট পদার্থের বহুত্ব ও বিশালত্ব এবং জগৎস্রষ্টার অনুপম শক্তি ও কৌশল চিন্তা করিয়া তাঁহার তরুণ-হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। পুস্তকখানির একস্থলে সূর্য্য সম্বন্ধে সর্ উইলিয়াম হার্শেলের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিত ছিল যে, "আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমনই এই গ্রহ-উপগ্রহসম্বলিত সৌরজগৎ অন্য কোন বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও হয়ত অপর কোন মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।" মহেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—"যখন আমি এই অংশটি পাঠ করিলাম, তখন আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। আমার মনে হইলে, জগতত্ত্বের একটি গূঢ় রহস্য আমার নিকট সহসা প্রকাশিত হইল। সূর্য্য যদি বৃহত্তর সূর্য্যের এবং তাহাও যদি তদপেক্ষা আরও বৃহৎ কোন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তবে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়ত সেই অনন্ত শক্তি, মহামহিমময় জগৎস্রষ্টার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আমি নির্ব্বাক হইলাম এবং মনের সেই অবস্থায় নগ্নপদে ও নগ্নগাত্রে মাতুল মহাশয়দিগের গৃহ হইতে নেবুতলার গীর্জ্জা পর্য্যন্ত অনবরত

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

পাদচারণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সে অবস্থায় দেখিলে লোকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। সেই দিন হইতে বিজ্ঞানের প্রতি আমার যে অনুরাগ এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎস্রষ্টার মহিমা অবগত হইবার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা একদিনের জন্যও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।"

ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানকে জীবনের সাথী করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান আলোচনার ফলে তিনি যতই বহির্জগতের গূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিতেন, ততই তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তিনি বলিতেন, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ একই সুনিয়মে পরিচালিত।

ডাক্তার সরকার একেশ্বরবাদী ছিলেন, সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধী মত কখনও গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। সেই জন্যই তিনি দেশের এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "সাকার বা পৌত্তলিক উপাসনার দ্বারা পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।" তিনি চিরকাল সত্যের পূজক ছিলেন, পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সেই জন্য তিনি তাহার বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র চিন্ময় ঈশ্বরেরই তিনি উপাসক ছিলেন, কিন্তু এজন্য বাহ্যিক আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না।

হজরত মহম্মদ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, ডাক্তার সরকার তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। খ্রীষ্টয়ানগণের সহিত একমত না হইলেও তিনি যিশু খ্রীষ্টকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া মনে করিতেন। বাইবেল তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, তিনি বাইবেলের বহু সংস্করণ ক্রয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

এদেশে মানুষের পূজা বড়ই প্রবল ভাবে বিদ্যমান, ডাক্তার সরকার মনুষ্য-পূজার বড়ই বিরোধী ছিলেন। তিনি সৃষ্টিকে পূজা না করিয়া স্রষ্টাকেই পূজা করিতেন। জগৎ মিথ্যা কি সত্য, জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রভৃতি যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কখনও হয় নাই এবং কখনও হইবার সম্ভাবনা নাই, এই সকল বিষয় লইয়া যাঁহারা নিষ্ফল তর্ক করিতেন, তাঁহাদিগের উপর ডাক্তার সরকার বড়ই বিরক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, তর্কে জগৎকে মিথ্যা বলিতেছি অথচ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাসে সমস্ত কার্য্য করিতেছি, ইহাতে নিজের জীবনে কেবল অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র; এরূপ অমূলক কল্পনায় মানুষ দিন দিন হীনশক্তি, অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই কারণে তিনি মধ্যে মধ্যে নিষ্ফল দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দর্শনপ্রণেতা ঋষিগণের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাহা নহে। তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বহুদর্শিতার প্রতি ডাক্তার সরকার সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

ডাক্তার সরকারের ধর্ম্মমত অনেকটা উদার প্রকৃতির ছিল, কিন্তু কখনও তিনি পারিবারিক ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিন্দুভাবেই তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। গীতা তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। রামায়ণ মহাভারত বড় ভালবাসিতেন। তিনি পরিণত বয়সে বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলা পথের ধারে রামায়ণ গান শুনিতে

শুনিতে এত তন্ময় হইয়া যাইতাম যে, ঘরে আসিয়া এক এক দিন প্রহার খাইতাম। এখনও রামায়ণ মহাভারত শুনিলে যে সুখ পাই, অন্য কোন পুস্তকে তাহা পাই না।" কীর্ত্তনও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।

'বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি'? প্রশ্ন করায়, ভগবদ্ভক্ত ডাক্তার সরকার উত্তর দিয়াছিলেন—"বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ, দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগৎ যে একই সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্যই জড়বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। জগতত্ত্ব এবং তাহা হইতে সেই জগৎ-স্রষ্টাকে অবগত হওয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।"

ডাক্তার সরকার ধর্ম্মালোচনা শুনিয়া সাধারণের মত কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তিনি অনেক সময় সাক্ষাৎ করিতেন এবং ধর্ম্মালোচনায় রত হইতেন। একদা জনৈক ভক্ত পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু, আপনার উপদেশ শুনিয়া সকলেই রোদন করেন, কিন্তু ডাক্তার সরকার কখনও একবিন্দু অশ্রু ফেলেন না?" উত্তরে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ছোট হ্রদে হস্তী নামিলে জল তোলপাড় করে, কিন্তু সমুদ্রে নামিলে কিছুই হয় না।" ডাক্তার সরকারের হৃদয় সাগরের ন্যায়ই বিশাল ছিল।

বাহিরে সাধারণতঃ উচ্ছ্বাসবিহীন হইলেও, কখন কখন প্রচলিত ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণেই ডাক্তার সরকারের ভক্ত-হৃদয় আলোড়িত হইতে দেখা যাইত। পথে ভিখারীর কণ্ঠে—

'হরি তোমার মাতৃরূপ
সর্ব্বরূপ সার,
বদনভরা মা কথাটির
তুল্য কথা নাইরে আর।'

এই গানটি শুনিলে, শৈশবে মাতৃহারা ডাক্তার সরকারের চক্ষু বৃদ্ধবয়সেও জলে ভরিয়া উঠিত। জীবনপ্রভাতে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া, গায়ক যখন গাহিত—

'হরি, দুঃখ দাও যে জনারে
তার কেউ দেখে না মুখ ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ
দুঃখের উপর দুঃখ দাও হে বারে বারে।'

শুনিয়া, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না, তাঁহার গণ্ড বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। গিরিশচন্দ্রের "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" গানটিও বার ব[ার] শুনিতে তিনি আগ্রহান্বিত হইতেন।

ডাক্তার সরকার বলিতেন, "ভগবানকে ভয় করি[লে] আর কাহাকেও ভয় করিবার দরকার হয় না, ভয় ক[রা] উচিতও নয়।" শিশুকাল হইতেই পরমেশ্বরে তাঁহার অ[টল] বিশ্বাস ছিল, সকল সঙ্কটে, সকল সংগ্রামের মধ্যেই তি[নি] ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করিতেন। এমন ভগবদ্ভ[ক্ত] লোককেও ধর্ম্মসম্বন্ধে কত কথা সহিতে হইয়াছে।

ডাক্তার সরকারের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া[য়] তাঁহার ভবনে একটি জন্মতিথি উৎসব ও সুহৃৎ-সম্মিলনী বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। ডাক্তার সরকার সে সম[য়] পীড়িত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এই উৎসবে তাঁহা[র] দীর্ঘজীবন ও রোগযন্ত্রণা উপশমের জন্য সকলে প্রার্থ[না] করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা ও ধর্ম্মসঙ্গীত গী[ত] হইয়াছিল। সেদিন উত্তরে ভগবদ্ভক্ত ডাক্তার সরকা[র] সজলনেত্রে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদের কিয়দং[শ] এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"প্রত্যেক জ্ঞান বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ-রক্ষণের জ[ন্য] প্রতি মুহূর্তে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; যে জীবনের জ[ন্য] সে তাঁহার নিকট ঋণী। যখন আমরা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দশায় উপস্থি[ত] হই, তখনই তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য এবং শেষ দশা উপনীত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কখনই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে কর[া] উচিত নহে। তাঁহার অনুজ্ঞায় আমি সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধার[ণ] করিয়া আছি এবং তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য আমার ক্ষুদ্রত[ম] যত্নকেও তিনি শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এ সকলের জন্য বাক্য কিংব[া] চিন্তা দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতা সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম তাহা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। আমার স্বদেশবাসী ও সহ যোগীদিগের জন্য যদি কিছুমাত্র উপকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকি উহা কেবল তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, যে আশীর্ব্বাদ সম্পদে, বিপদে, সুস্থতায় রোগে সমভাবে অনুভব করিয়াছি—বরং বিপদে ও রোগে অধিকতররূপে পাইয়াছি। তাঁহার অনুশাসনদণ্ডে আমি তাঁহার অনন্ত কৃপার বিকা[শ] অনুভব করিয়াছি। স্বকীয় পাপসমূহ এবং তাহা সত্ত্বেও তিনি আমাকে কি প্রকারে জীবিত রাখিয়াছেন, ইহা যখন স্মরণ করি তখনই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। এই সকলের প্রতিদানে (যদি এরূপ চিন্তা সমনুজ্ঞেয় হয়) যাহা কিছু আমি করিতে পারি তাহা কেবল তাঁহার ইচ্ছা পালনের জন্য শক্তি প্রার্থনা এবং আরও প্রার্থনা যেন সেই ভগব[ৎ] ইচ্ছা তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ হয়।

"আমার এক প্রকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনারা যে এরূপ ঘটনা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি এই ঘটনা, সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তাকে এবং মৎপ্রতি ও তাঁহার সৃষ্ট প্রাণি সমূহের প্রতি যে অনন্ত কৃপা যাহা প্রায়ই আমরা ভুলিয়া থাকি, আমা[র] হৃদয়ে তাহা জাগরুক করিয়া দিতেছে।"

উপরিউক্ত ঘটনার চারি মাসের মধ্যেই শ্রীভগবান তাঁহার ভক্ত সন্তানকে নিজ শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিতেই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার রচিত—

১। "কি ব'লে তোমারে ডাকিব। (ভাবি তাই)
আদি নাই, অন্ত নাই, কি নাম তোমারে দিব। (বল)"

২। "যা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার,
কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়।"

৩। "জীবন ফুরায়ে এলে, তবু ভ্রম ঘুচিল না।"

৪। "ভয় কোরো না রে মন, দেখে শমন আগমন,
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু, তারে কর আলিঙ্গন।"

প্রভৃতি প্রত্যেক গানে ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত ভক্ত-হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘটনাচক্র

"বনফুল"

১

শ্রীমতী উষা সেন আধুনিক মহিলা।

অর্থাৎ বি-এ পাস করিয়াছেন, ট্রামে, বাসে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই নানা দোকান ঘুরিয়া পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক বেহায়াপনা বা লজ্জা কোনটাই নাই। সাহিত্যে অনুরাগ আছে। কোন্ লেখক ভাল, কোন্ লেখক মন্দ সে-বিষয়ে নিজের একটা স্পষ্ট মতামত আছে। চেহারা? সুন্দরী না হইলেও মোটের উপর সুশ্রী বলা চলে। আধুনিক বেশবাসে সজ্জিতা হইয়া তিনি যখন পথেঘাটে বিচরণ করেন তখন অধিকাংশ দর্শকই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সংক্ষেপে, শ্রীমতী উষা—বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।

একটি বিষয়ে শ্রীমতী কিন্তু সাবেক-পন্থী। তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং সে বিবাহও আধুনিক রীতি ও রুচি অনুযায়ী হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য অন্নদা সেন—উষা সেনের বাবা। অন্নদা বাবু ভদ্রলোক, সনাতন মতাবলম্বী। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কন্যা মণীন্দ্রমোহন নামক একটি সহপাঠী কৈবর্ত্ত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে তখন তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছর-তিনেক হইল ডাক্তারী পাস করিয়া কলিকাতার রোগী-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল—কার্য্যে পরিণত হইল না। একটি প্রতিজ্ঞা কিন্তু উষা সেন মনে মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই "—জর্জেট শাড়ী জীবনে আর কখনও পরিব না।" মণীন্দ্রমোহন জর্জেট শাড়ী অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ভবিষ্যতে উষাকে ঐরূপ একটি শাড়ী কিনিয়াও দিবেন কথা ছিল—কিন্তু ব্রজবিহারীর অভ্যাগমে তাহা আর হইল না। সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং উষা সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে জর্জেট শাড়ী জীবনে তিনি আর ছুঁইবেন না।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি—দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। শেষ-কালে এ প্রতিজ্ঞাও টিকে নাই। কি করিয়া ইহা ঘটিল তাহা লইয়াই এই গল্প।

২

পারুল-দিদি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

পারুল মৈত্র উষা সেনের এক বছরের 'সিনিয়র', অথচ

এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ-বিন্যাস প্রসাধন সম্বন্ধে তিনি উদাসিনী নহেন। এই বেশ-বিন্যাসের কল্যাণে তাঁহাকে উষার অপেক্ষা ছোটই দেখায়। নানা কথার পর তিনি বলিলেন, "এইবার উঠি ভাই, একটু মার্কেটে যেতে হবে।"

"মার্কেটে কেন?"

পারুল-দিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "একখানা শাড়ী কেনার ইচ্ছে আছে। শুনেছি না কি জর্জেট শাড়ীগুলো আজকাল খুব সুন্দর উঠেছে।"

"তাই না কি?"

পারুল-দিদি চলিয়া গেলেন।

জর্জেট শাড়ীর কথায় উষার মণীন্দ্রমোহনকে মনে পড়িল। একটু দুঃখবোধও হইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই দুঃখ হইল যে মণিকে না-পাওয়ার দুঃখের তীব্রতাটা যেন কমিয়া গিয়াছে। কই, মণির কথা আর ত সে তেমন করিয়া ভাবে না। দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে মণির কোন খবরই সে ত রাখে না আর! এখন সে মিসেস গুপ্ত এবং এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ব্রজবিহারীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সে একান্ত ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মন অতীতের স্মৃতির ধ্যান করিতেছে না। স্পন্দনশীল বর্ত্তমানকে লইয়া সে ব্যস্ত। ব্রজবিহারী খারাপ লোক নয়, উষাকে খুশী করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই, তদুপরি সে উষার স্বামী। সুতরাং তিলে তিলে সে উষার হৃদয় জয় করিয়াছে।

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া উষা একটু আনমনা হইয়া পড়িল। মনে মনে অনর্থক একবার আবৃত্তি করিল—'তাকে আমি ভালবাসি। এখনও বাসি— জর্জেট আমি জীবনে কখনও পরব না—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।'

* * *

এই প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার সহোদরা ভগিনী সন্ধ্যা সেন। এখন অবশ্য সন্ধ্যা দাস। সন্ধ্যার স্বামী মিষ্টার দাস ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বলা বাহুল্য, ডেপুটি বাবুটি সদ্য-পাস-করা ডাক্তার ব্রজবিহারী অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জনক্ষম। এই জন্যও বটে এবং পিঠাপিঠি বলিয়াও বটে উষার মনে একটু ঈর্ষ্যা ছিল। এখন অবশ্য দু-জনেই বড় হইয়াছে, চুলোচুলি খামচাখামচি করিয়া ঝগড়া চলে না। বরঞ্চ মুখে দুই জনেই দুই জনের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। ইহাদের পাল্লা চলে এখন নীরবে—গহনা-কাপড়ের মারফৎ। উষা যদি সৌখীন দুল ক্রয় করিয়া কর্ণযুগল অলঙ্কৃত করিলেন সন্ধ্যা অমনি সৌখীনতর দুল দুলাইয়া উষাকে সৌখীনতমের সন্ধানে উতলা করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা যদি কোন ছলে উষাকে জানাইলেন যে তাঁহার স্যাণ্ডাল জোড়াটার পাঁচ টাকা দাম, উষাকে অমনি জানাইতে হইল—"হ্যাঁ, ওরকম স্যাণ্ডালগুলো বেশ,—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু ওঁর কিছুতেই ওরকম ষ্ট্র্যাপ্-দেওয়া পছন্দ হয় না। নিজে পছন্দ ক'রে কিনে এনেছেন দেখ না—সাড়ে ছ-টাকা দিয়ে!. আঙুলগুলো এমন চেপে ধরে—বিচ্ছিরি!"

সুতরাং এই সন্ধ্যাই যখন উপর্য্যুপরি দুই দিন দুই বিভিন্ন প্রকার জর্জেট পরিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া গেল তখন উষা দেবী বেশ একটু বিচলিত হইলেন। জর্জেট কিন্তু তিনি পরিবেন না। মনে মনে কহিলেন, "আহা ভারি ত জর্জেটের দাম! প্রতিজ্ঞা না করলে এত দিন আমি কবে কিনতাম!"

* * *

তৃতীয় বোমা হানিলেন বান্ধবী ছায়া।

ছায়া সিনেমায় যাইবে—উষাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পরিয়া আসিয়াছে একখানা জর্জেট শাড়ী। সুন্দর সাদা রঙের জর্জেটখানা—সুন্দর কাজ-করা। উষা দেবী তাঁহার মুর্শিদাবাদীখানি সযত্নে পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেই ছায়া প্রশ্ন করিলেন, "ওটা পরলি কেন এই গরমে! জর্জেট নেই তোর?"

"না।"

"আজকাল জর্জেটটার খুব চলন হয়েছে—কিনলেই পারিস একখানা। দামও ত বেশী নয়—আমার এইখানার দাম এগার টাকা—"

"মোটে?" অতর্কিতে উষার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল!

মণীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটের সম্মুখে নানা বর্ণের কয়েকখানা জর্জেট শাড়ী আসিয়া পড়াতে পটখানা বেশ একটু

আব্ছা হইয়া গেল। উষা কেমন যেন আনমনেই সিনেমাটা দেখিতে লাগিলেন। সিনেমার গল্পও একটা করুণ ব্যর্থ প্রণয়-কাহিনী। এই গল্পের নায়িকাও যাঁহাকে প্রথম জীবনে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাকে পান নাই এবং যাঁহাকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভালবাসিতেছিলেন। ইহাই জীবনের অদ্ভুত ট্রাজেডি। 'ইন্টারভাল' হইল—ইন্টারভালে উষা লক্ষ্য করিলেন যে মহিলা-দর্শকদের মধ্যে আরও দুই-এক জন জর্জেট শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিজের মনেই তিনি নিজেকে বলিলেন, "আর এক জনকে বিয়েই যখন করতে পেরেছি তখন আর জর্জেট শাড়ী পরতে কি! জীবনে কতবার কত প্রতিজ্ঞাই ত করেছি—সব কি আর পালন করেছি—না, পালন করা সম্ভব! যাক্, তবু জর্জেট আমি কিনছি না—"

* * *

কয়েকটি দারুণ বোমার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়াও উষা দেবীর প্রতিজ্ঞা-দুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই। কোনরূপে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সেদিন 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিতে গিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই জর্জেট শাড়ী! উষাকে জব্দ করিবার জন্যই যেন সকলে দল বাঁধিয়া জর্জেট পরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি বোধ হয় একাই কাশ্মীরী শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলে তাঁহার এই জর্জেট-বিহীন আবির্ভাব লইয়া মনে মনে হাসাহাসি করিতেছে।

* * *

শেষ বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইল একটি মোটর হইতে।

হঠাৎ সেদিন বিকালে উষা দেবী লক্ষ্য করিলেন যে একটি মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মোটরে বসিয়া একটি জর্জেট-পরিহিতা তরুণী। সুন্দরী। দ্বিতলের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া উষা লক্ষ্য করিলেন যে মোটরটি দাঁড়াইতেই একমুখ হাসি লইয়া স্বামী ডিসপেন্সারী হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া যুবতীটির পাশে বসিলেন—মোটর চলিয়া গেল। কে এ মেয়েটি? রোগিণী? চেহারা দেখিয়া মনে ত হয় না! উষা দেবীর দোষ দেওয়া যায় না—এ অবস্থায় কৌতূহল অদম্য হইয়া ওঠাই

স্বামী ফিরিতেই উষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকেলে যে-মেয়েটি তোমাকে এসে নিয়ে গেল—কে ও?

"হাসপাতালের এক জন নার্স। ডক্টর বিশ্বাস আমাদের আজ একটা টি-পার্টি দিলেন কি না—! সুষি অর্থাৎ ও নার্সটি বেশ মেয়ে!"

"মেয়েটি দেখতে বেশ। জর্জেট পরে বেশ মানিয়েছিল কিনে দাও না আমাকে একখানা জর্জেট"—উষা বলিয়া ফেলিল!

"বেশ ত! দাম কত?"

"কত আর হবে! আজকাল সস্তাই হয়েছে শুনেছি দশ-পনর টাকা হ'লেই হয়। ছায়া সেদিন প'রে এসেছিল একখানা, বললে এগার টাকা দাম। তাড়াতাড়ি নেই এখন—"

"আচ্ছা দেখি! আমার এক রোগীর কাছে ষোলটা টাকা বাকী আছে। কাল 'বিল' পাঠাব। টাকাটা যদি পাই কিনে দেব।"

৩

ঠিক তাহার পর দিন সকালে বান্ধবী ছায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। গোপনীয় কিছু বলিবার ছিল। মুখচোখ রহস্যময় করিয়া কানে কানে কহিলেন, "মণিবাবু কলকাতায় এসেছেন আজ কদিন হ'ল। আমি জানতাম না। মালতী তার এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছে। দেখা করবি না কি? ঠিকানা জোগাড় করেছি—এই নে। আমার কাজ আছে ভাই—বসতে পারব না। যা না, দেখা ক'রে আয়। দেখা করতে আর দোষ কি?"

ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মণি আসিয়াছে। কলেজের অর্দ্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভীতু মানুষটি—শান্ত নিরীহ, নিরহঙ্কার। মণীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। —নাঃ, জর্জেট শাড়ী আর সে কিনিবে না! স্বামী আসিলেই বারণ করিয়া দিতে হইবে।...মণিবাবুর সহিত

একবার দেখা করিতে হইবে বইকি ! হরিশ মুখার্জ্জির রোড কতটুকুই বা দূর !

* * *

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই উষা দেবী বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীটা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু ভিতরে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই।

"আপনি আমাকে খবর দিলেন না কেন ?"

"আপনার ঠিকানা ত আমার জানা ছিল না। সেই যে আপনি কলেজ থেকে চলে গেলেন, আর ত কোন খবর দেন নি আমাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলাম— আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায়, কার সঙ্গে—কিছুই ত জানি না—" বলিয়া মণিবাবু একটু হাসিলেন। এমন সময়ে—"কেমন আছেন আজকে আপনি" বলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার ব্রজবিহারী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন !

"এ কি, তুমি এখানে !"

উষা দেবীও কম বিস্মিত হন নাই।

"আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তুমিই এঁর চিকিৎসা করছ না কি ?"

* * *

একটু পরেই ব্রজবিহারী বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে একটা কাগজের বাক্স দেখাইয়া বলিলেন—"ওই নাও তোমার শাড়ী। এই ভদ্রলোকের কাছেই টাকা বাকী ছিল। ভাগ্যে আজ দিয়ে দিলেন তাই তোমার কাছে মানটা থাকল। দেখ ত রংটা পছন্দ হয় কি না—" বলিয়া ব্রজবিহারী নিজেই প্যাকেটটা খুলিতে লাগিলেন।

উষার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না।

পিতা-পুত্র

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

মোকদ্দমা চলিলে বাদীর দাবী প্রমাণিত হইবে না এই ভরসায় প্রতিবাদী নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জ্জির জবাবে প্রতিবাদী রামমোহন রায় বাঁটোয়ারার পর পিতা রামকান্ত রায়ের এবং অগ্রজ জগমোহন রায়ের সহিত পুনরায় সকল বিষয়ে একত্রিত হওয়ার কথা এবং পিতার মৃত্যুর পর বরাবর জগমোহন রায়ের সহিত এইরূপ একত্র থাকার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন, লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে মাতা তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে জগমোহন রায়ের এবং তাঁহার স্ত্রীপরিবার একত্র একান্নবর্ত্তী ছিল, এবং দুই ভাই আপন আপন স্বতন্ত্র তহবীল হইতে সমান অংশে তারিণী দেবীর সংসারের সকল খরচ বহন করিতেন। একান্নবর্ত্তিতা হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ অন্যান্য বিষয়ে অভিন্নতা সূচিত করে। সুতরাং ১৭৯৭ সাল হইতে পিতার এবং অগ্রজের সহিত বৈষয়িক ব্যাপারে যে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন কোর্টে ইহা প্রমাণ করা রামমোহন রায়ের প্রধান কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়াছিল।

তিন পক্ষের এই বৈষয়িক স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে কোর্টে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, ইতিহাসের পক্ষে যথেষ্ট নহে। "রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতের উপাদান" নামক প্রবন্ধে আমরা মোকদ্দমার নথী-বহির্ভূত সরকারী চিঠি-পত্র হইতে কিছু কিছু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি।* এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর আমার সুযোগ্য সহযোগী শ্রীযুক্ত ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার এবং আমি আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। তথাপি এযাবৎ সংগৃহীত সরকারী কাগজ-

* প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৩৩, ৮৪০ পৃঃ।

পত্রে রামকান্ত রায়ের এবং জগমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে যে সকল উপকরণ আছে তাহার উল্লেখ না করিলে গৃহবিবাদের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া এই প্রস্তাবে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

উপরিউক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, ১১৯৮ সনে (১৭৯১ সালে) রামকান্ত রায় যখন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১০২৯৭০৷৷৵০ বার্ষিক জমায় ৯ বৎসরের মিয়াদে ভুরস্থুটপরগণা ইজারা লইয়াছিলেন, তখন জগমোহন রায় পিতার জামীন হইয়াছিলেন।† রামকান্ত রায় গোয়ালাভূম (Guallaboom) বা গোপভূম নামক আরও একখানি খাস মহাল ৫১৯৩১৷৴৯৷৷ জমায় ইজারা রাখিতেন।‡ এই দুই মহালের মোট বার্ষিক জমা ছিল ১৫৪৯০২৷৴৯৷৷ (একলক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত দুই টাকা পাঁচ আনা সাড়ে নয় গণ্ডা), এবং এই দুইখানি মহালের জমা পরিশোধের জন্যই জগমোহন রায় জামীন ছিলেন। তখন যদি জগমোহন রায়ের কোন স্বতন্ত্র সম্পত্তি না থাকিত তবে সরকার কখনই তাঁহাকে জামীন স্বীকার করিতেন না।

রামকান্ত রায় তাঁহার বণ্টনপত্রে হরিরামপুর তালুক জগমোহন রায়কে দান করিয়াছিলেন। হরিরামপুরের মোট আয় ছিল ২৯৮৬৯৸১২৷৷, এবং সদর জমা ছিল ২৫৮৮৩৸৴১৷৷ গণ্ডা, অর্থাৎ সদর জমা বাদে মালিকের টিকিত প্রায় চারি হাজার টাকা। এই চারি হাজার টাকা হইতে যেমন প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের খরচ বাদ যাইত, তেমনি সেকালে নজর সেলামি বাজে জমা বাবৎ কিছু টাকা আদায় হইত। রামমোহন রায়ের পক্ষের সাক্ষী রামতনু রায় তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে হরিরামপুর মহাল হইতে জগমোহন রায়ের বার্ষিক প্রায় চারি হাজার টাকা মুনাফা হইত। রামকান্ত রায় তাঁহার আর দুই পুত্র, রামমোহন রায় এবং রামলোচন রায়কে এত আয়ের কোন তালুক দান করিতে পারেন নাই। এইরূপ অসমান বাঁটোয়ারার কারণ কি? হরিরামপুর রামকান্ত রায়ের খরিদা সম্পত্তি নহে। ১৭৯৪ সালের ১০ই জুলাই চিতুয়া পরগণার অন্তর্গত তরফ হরিকৃষ্ণপুর, তরফ হরিরামপুর এবং তরফ গদাই ঘাটা বাকী রাজস্বের জন্য কলিকাতায় রেভিনিউ বোর্ডের আপিসে নীলাম হইয়াছিল। তখন জগমোহন রায় ৯৯৭০৲ মূল্যে নিজ নামে হরিরামপুর খরিদ করিয়াছিলেন।* জগমোহন রায় হয়ত স্বোপার্জ্জিত অর্থে হরিরামপুর খরিদ করিয়াছিলেন, এবং রামকান্ত রায় তাঁহাকে নামতঃ হরিরামপুর দান করিয়া কার্য্যতঃ এই তালুকের উপর নিজের এবং নিজের অন্য ওয়ারিশগণের দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। জগমোহন রায়কে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা বাঁটোয়ারার এক কারণ হইতে পারে।

বাঁটোয়ারার অব্যবহিত পরে জগমোহন রায় আরও তিন খানি বড় তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১২০৩ সনের (১৭৯৬-৯৭ সালের) বাকী রাজস্বের জন্য নিম্নোক্ত তিন খানি তালুক নীলামে উঠিয়াছিল, এবং নীলামে বিক্রীত না হইয়া ১২০৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নোক্ত খরিদদারগণের নিকট আপোসে বিক্রীত হইয়াছিল—

তালুক	খরিদদার	সদর জমা	মূল্য
হুদ্দা রসিকপুর	রামনিধি ঘোষ	৪৩৩৬৸১৭	১৪০০০৲
হুদ্দা পুরাণ গাঙ্গ	স্বরূপচাঁদ রায়	১৪৯৪৷৶৯৷৷	১৭০০০৲
হুদ্দা পুরুলিয়া (তরফ বর্দার অন্তর্গত)	রামচন্দ্র সেন	২২২৫৲	৫০০০৲
		৮০৫৬৶৬৷৷	৩৬০০০৲

তার পর জগমোহন রায় রেজেষ্টারীকৃত কবালার দ্বারা এই তিন খানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ সালে তিনি রেভিনিউ বোর্ডের নিকট নামজারী এবং মূল পরগণা হইতে এই তিন খানি তালুক পৃথক করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দরখাস্তে জগমোহন রায় বলিয়াছেন, বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর রবার্ট আয়ার্ল্যাণ্ডের (Mr. Robert Irelandএর) মৃত্যুর পর এবং কালেক্টরীর আমলাদিগের চাতুরী বশতঃ (the trick of the amlahs) দরখাস্তকারীকে তালুক তিন খানিতে দখল দেওয়া হয় নাই (have not obtained

† Board of Revenue, Proceedings, 2 May 1791, No. 29.

‡ Burdwan Records, Vol. 47, No. 329. ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর কাগজপত্র অনুসন্ধান করিতেছেন। বর্দ্ধমান মহাফেজ খানার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং রেকর্ড-কিপার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

* Burdwan Records, Vol. 21, No 11, p 46.

† Burdwan Records, Vol. 46. No, 157.

possession)। এই দরখাস্ত সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বর্দ্ধমানের কালেক্টর (Ynyr Burges) তাঁহার ১৭৯৯ সালের ১৩ই মে তারিখের চিঠিতে লিখিয়াছেন—

The Mehals in question are well known to have been purchased by the Late Ranny, in the names of the parties above-mentioned, and as Jugmohun is the son of Ramcaunt Roy who possessed the uncontrolled management of the Ranny's affairs, there are grounds to suppose that this private sale to his son is entirely an act of his own, and that the parties who signed the Cowlah, had never further interest in the lands, than permitting them to be purchased and stand in their names till the transfer by private sale to Jugmohun.*

এই চিঠিতে উল্লিখিত পরলোকগতা রাণী (Late Ranny) বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী। রামকান্ত রায় এই মহারাণীর এষ্টেটের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ১২০৫ সনে (১৭৯৮-৯৯ সালে) মহারাণী বিষ্ণুকুমারী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই তিন খানি মহালের জন্য বিষ্ণুকুমারীর ওয়ারিশরূপে মহারাজ তেজচাঁদ ১৭৯৯ সালের ১৩ই জুলাই (১২০৬ সনের ৩১শে আষাঢ়) বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতে রামকান্ত রায়ের এবং জগমোহন রায়ের বিরুদ্ধে স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালতে জগমোহন রায়ের হার হইয়াছিল; প্রোভিন্সিয়াল আপিল আদালতে জিত হইয়াছিল; কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতে আবার হার হইয়াছিল। ১৮০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সদর দেওয়ানী আদালতে, দ্বিতীয় আপিল নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই, রামকান্ত রায় পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত জগমোহন রায়ের উপর তিন কোর্টের মোকদ্দমা খরচ এবং যে কয় বৎসর মহাল তাঁহার দখলে ছিল সেই কয় বৎসরের মুনাফার টাকা ডিক্রী দিয়াছিল।† যদি ১২০৫ সালে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু না হইত তবে হুদা রসিকপুরাদি তালুক লইয়া মহারাজ তেজচাঁদ মোকদ্দমা করিবার সুযোগ পাইতেন না; তালুক তিন খানি জগমোহন রায়েরই থাকিয়া যাইত, এবং তাঁহার একারই থাকিয়া যাইত।

উপরে উক্ত হইয়াছে, রামকান্ত রায় দেড় লক্ষ টাকার কিছু অধিক জমায় বর্দ্ধমান জেলার দুইখানি খাস মহাল ইজারা রাখিতেন। ১২০৬ সনের এই দেড় লক্ষ টাকা. জমার মধ্যে ২৮৫১৵০ বাকী পড়িয়া ছিল, এবং এই সময় উভয় তালুকের ইজারার মিয়াদও ফুরাইয়াছিল। এই জন্য রামকান্ত রায়কে ১৮০০ সালের মে মাস হইতে বর্দ্ধমানের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার জামীনে জগমোহন রায়কে ১৮০১ সালের জুন মাসে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। আবার হরিরামপুরের ১২০৭ সনের সদর জমার মধ্যে ৬৭৪৯৵১॥ বাকী পড়িয়াছিল।* ৯ই মে তারিখে এই বাকী রাজস্বের জন্য বর্দ্ধমানের কালেক্টরীতে হরিরামপুর নীলামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। নীলাম আরম্ভ হইলে ২১০০৲ একুশ শত টাকার বেশী মূল্য কেহ দিতে চাহিল না। তখন বর্দ্ধমানের কালেক্টরের প্রস্তাব অনুসারে মহালখানি পরে নীলাম করা স্থির হইল। হরিরামপুর মহালের নীলাম মকুব রাখিবার জন্য জগমোহন রায় ১৮০১ সালের ১৩ই মে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। এই দরখাস্ত সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের কালেক্টর তাঁহার ১৮০১ সালের ১৫ই মের চিঠিতে বোর্ডকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জগমোহন রায়ের এবং রামকান্ত রায়ের তৎকালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়—

P. 4. With respect to Harreerampore the property of Jugomohun Roy, I deem it my duty to state that on the 13th instant the proprietor presented a petition to me, stating that the Boro crops, from which he expected to have received a sum nearly adequate to discharging the arrears due to Government, had been utterly destroyed by storms of hail which happened in the months of Chyte and Bysack, and praying that Government would for the present be pleased to receive from him Sicca Rupees 3,000 in part of the arrears, and permit him to discharge the residue being 6300.8.12. by instalments during five months.

P. 5. It is to be observed that this Talook was proposed for sale in discharge of arrears due from it account the past year, and of arrears account 1206 due from Ramcaunt Roy, farmer of Bhoorsut &c., and father of the Talookdar, who was his security. It being well known that Ramcaunt Rai, who is a man of property, could, if inclined, immediately discharge the arrears due on account of his Farm, and also the amount due from his son's Estate, and as the present representation of the alleged calamity, which I imagine must be exaggerated, was not received until several days after the Lands have been put up to sale, I do not conceive that prayer of the petitioner is worthy of much consideration. It appearing however that a report was received from the Sezawul under date the 6th instant,

* Burdwan Records, Vol. 47, No. 28.

† Sudder Dewany Select Reports, Vol. I, p. 257.

* Board of Revenue O.C., 15th May, 1801, Separate H.

stating that the Boro crops had been damaged, I have therefore directed him to ascertain as far as practicabl the extent of the damage sustained, and the result of his enquiries when received shall be submitted to the Board. Supposing however that the calamity in question has actually befallen the Estate, as 2851.6 of the arrears (exclusive of interest) is due on account of the Farm of Bhoorseet &c., for 1206, the Talookdar who was the Farmer's security, has not the smallest claim to have his lands exempted from sale, on account of damage sustained in the end of 1207, and the commencement of 1208, especially as from the small sum offered for the Lands on the 9th instant, it cannot be expected that they will produce a sum more than adequate to the discharge of the arrears due account the Farm.*

১৮০০ সালে রামকান্ত রায় এবং জগমোহন রায় এই পিতা-পুত্রের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। মূল চিঠি পাঠ না করিলে এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নয় মনে করিয়া মূল ইংরেজী চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম। ১২০৭ সালের চৈত্র মাসের এবং তৎপরবর্ত্তী বৈশাখ মাসের ঝড়ে যে বোরো ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এই কথা কালেক্টর সাহেব অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, এবং পরিণামে তাহা করাও হইয়াছিল না। জগমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের এবং পুত্রের দেনা অকাতরে পরিশোধ করিতে পারেন, এই ধারণা কর্ত্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং যত দিন না রামকান্ত রায় উভয়ের দেনা পরিশোধ করেন তত দিন উভয়কে কারাগারে আবদ্ধ রাখাই ছিল সরকারের নীতি।

১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে হরিরামপুর তালুক দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছিল। সোমনগর মৌজা বর্দ্ধমান জেলার সামিল, এবং অবশিষ্ট অংশ মেদিনীপুর জেলার সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।† ১৮০১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সোমনগর মৌজা ২৮৪১৵০ মূল্যে নীলাম হইয়াছিল। ইহার এক সপ্তাহ পরে, ১লা অক্টোবর, রামকান্ত রায় তাঁহার দেনার কতক টাকা কলেক্টরীতে দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। এই টাকার সহিত জামীন জগমোহন রায়ের সোমনগর মৌজার মূল্যের টাকার কতকটা যোগ করিয়া লইয়া রামকান্ত রায়ের দেনা সুদ আসল সমেত ৩৩৩৮৵৫ ওয়াশীল দেওয়া হইয়াছিল, এবং রামকান্ত রায়কে জেল হইতে মুক্তি দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এত দিন প্রকৃতপ্রস্তাবে জগমোহন রায় পিতার দেনার জন্য বর্দ্ধমানের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পিতার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জামীন পুত্রের মুক্তি হইল না; হরিরামপুরের বাকী রাজস্বের জন্য তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইল।‡ ১৮০১ সালের শেষ ভাগে জগমোহন রায়কে বর্দ্ধমানের দেওয়ানী জেল হইতে মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে বদলী করা হইয়াছিল।

জগমোহন রায় সারা ১৮০২ সাল জেলে কাটাইবার পর, যাহারা বাকী রাজস্বের জন্য মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ ছিল তাহাদের সম্বন্ধে রেভিনিউ বোর্ড রিপোর্ট চাহিলে, মেদিনীপুরের কালেক্টর ১৮০৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহার সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেন—

This defaulter is the son of Ramkaunt Roy who farmed some very profitable Mehals in Burdwan during the period of the decenniel settlement and is said to be worth near two lacs of Rupees—I understand that the Raja of Burdwan has a considerable claim upon this man, for which the defaulter, his son, became his security, and that he some time ago obtained a decree against them in the Dewanny Adawlut of Burdwan—It is supposed that, in order to prevent the sale of the lands held by the defaulter in Chitwa in satisfaction of this decree, he purposely fell in arrear last year, that he is determined to remain in jail until he can bring the Rajah of Burdwan to some sort of adjustment of his demand against him and his father, and that, as soon as he can effect this, he will pay this balance and not before. Under these circumstances I conclude that the Board will judge it proper that he should remain in jail until he may make good the whole of his balance.*

এই কৈফিয়তে উল্লিখিত লাভজনক পরগণা অবশ্য ভুরসুট এবং গোপভূম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দুইখানি পরগণা রামকান্ত রায় ১৫৪৯০২৷৴৯॥ জমায় ইজারা লইয়াছিলেন। এই দুইখানি মহালের বাবৎ তাঁহার নিজের আয়ও বোধ হয় প্রায় ২৫০০০৲ ছিল। তার উপর হুজুরী-দস্তুরী নজর সেলামী ইত্যাদি ছিল। রামকান্ত রায়ের নিকট ভুরসুট নয় বৎসর কাল (১১৯৮ হইতে ১২০৬ সন) ইজারা ছিল, এবং গোপভূম হয়ত আরও অধিককাল ইজারা ছিল।

* Board of Revenue, Proceedings, 18th May, 1801, No. 56.

† Board of Revenue, O.C., Mis. 21st August, 1801, No. 35.

‡ Burdwan Records, Vol. 51.

* Board of Revenue, Mis. Proceedings, 14th January, 1803, No. 8.

১৭৯১ সনের মে মাসে (১১৯৮ সনের গোড়ায়) যখন ভুরস্থট পরগণা রামকান্ত রায়কে ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন এই সঙ্গে আরও তিন খানি খাসমহাল আর তিন জন প্রার্থীকে ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের কালেক্টর (L. Mercer) বোর্ডের নিকট তাঁহার ১৭৯১ সালের ১লা মে তারিখের চিঠিতে রামকান্ত রায় এবং আর তিন জন প্রার্থী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

Four of the most responsible men of the District. "এই জেলার সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মধ্যে চারিজন।"†

পূর্ব্বে বড় বড় খাসমহাল ইজারা লইয়া এবং নিয়মমত সদর জমা পরিশোধ করিয়াই অবশ্য রামকন্ত রায় এই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ একজন ইজারাদারকে যে জেলার লোক ধনী মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। তাঁহার মত ধনী ব্যক্তি কেন ৫৬ হাজার টাকা দিয়া পুত্রকে কারামুক্ত করেন না তাহা লোক বুঝিতে পারিত না। কাজেই সন্দেহ করিত, বর্দ্ধমানের রাজা পাছে হরিরামপুর তালুক ক্রোক করিয়া পাওনা আদায় করে এই জন্য জগমোহন রায় মহালের রাজস্ব বাকী ফেলিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। এই সন্দেহের কারণ স্বরূপ কালেক্টর সাহেব উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠিতে বলিতেছেন—

আমি জানিতে পারিয়াছি এই লোকের (রামকান্ত রায়ের) নিকট বর্দ্ধমানের রাজার অনেক টাকা পাওনা আছে, এবং এই দেনার জন্য সরকারী রাজস্বের দেনাদার তাঁহার পুত্র (জগমোহন রায়) জামিন আছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতে পিতা পুত্রের উপর টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন। লোকে অনুমান করে (it is supposed), চিতুয়া পরগণায় জগমোহন রায়ের যে তালুক (হরিরামপুর) আছে তাহা যাহাতে বর্দ্ধমানের রাজার ডিক্রীর টাকার জন্য নীলাম হইতে না পারে (to prevent the sale of the lands) এইজন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক সদর খাজনা বাকী ফেলিয়াছেন। তিনি (জগমোহন রায়) সঙ্কল্প করিয়াছেন, যত দিন না বর্দ্ধমানের রাজার সহিত তাঁহার দাবী সম্বন্ধে একটা রফা করিতে পারেন ততদিন তিনি জেলে থাকিবেন। যে মুহূর্ত্তে এই রফা হইবে তৎক্ষণাৎ তিনি (জগমোহন রায়) বাকী রাজস্ব শোধ করিবেন, তাহার পূর্ব্বে করিবেন না।

কালেক্টর সাহেব যে লৌকিক অনুমান এখানে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রটি এই, হরিরামপুর তালুক নীলাম হইতে রক্ষা করাই যদি জগমোহন রায়ের উদ্দেশ্য হইত তবে তিনি তজ্জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাকী রাজস্বের জন্যই এই তালুক নীলাম হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই তালুকের এক মৌজা, সোমনগর, নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল, এবং বাকী অংশ যে নীলামে বিক্রয় হয় নাই তাহার কারণ সরকারের আশঙ্কা। সরকার নীলামে উপযুক্ত মূল্য পাইবার আশা করেন নাই বলিয়া তালুকের বাকী অংশ নীলামে উঠান নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ১৮০১ সালের ৯ই মে যখন সমস্ত হরিরামপুর তালুক নীলামে উঠান হইয়াছিল, তখন উহার জন্য কেহ ২১০০৲ টাকার বেশী মূল্য দিতে চাহে নাই। সে যাহাই হউক, এই লৌকিক গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কালেক্টর সাহেব ১৮০৩ সালে বোর্ডকে সুপারিশ করিয়া পাঠাইলেন, যত দিন না বাকী টাকা আদায় হয়, তত দিন জগমোহন রায়কে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হউক। বোর্ড এই সুপারিশ মঞ্জুর করিলেন।

তারপর ১৮০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অথবা মার্চ্চ মাসের গোড়ায় জগমোহন রায় এই মর্ম্মে এক আবেদন করিলেন, তাঁহার আর কোন প্রকার সম্পত্তি নাই। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানের রাজার নিকট অনেক টাকা ধারে (very much in debt)। বর্দ্ধমানের রাজা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে রামকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে পাওনা টাকার জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী করিয়া কিছুদিন তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং তার পর বর্দ্ধমানের জেলে বদলী করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য বশতঃ কিছুই আদায় করিতে পারে নাই। সুতরাং আবেদনকারী (জগমোহন রায়) প্রার্থনা করিতেছেন যে তাহার নিকট হইতে নগদ ৫০০৲ টাকা লইয়া, এবং বাকী টাকা আদায় করিবার জন্য ছয় বৎসরের কিস্তিবন্দীর অনুমতি দিয়া তাহাকে খালাস দেওয়া হউক। মেদিনীপুরের কলেক্টর (Mr. T. H. Ernst.) জগমোহন রায়ের আবেদনের নকল সহ বর্দ্ধমানের কালেক্টারের নিকট ১৮০৩ সালের ২৫শে মার্চ্চ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। এই চিঠির উত্তরে কালেক্টর (W. Parker.) ৩০শে মার্চ্চ লিখিয়া পাঠাইলেন.

† Board of Revenue, Proceedings, 2nd May, 1791, No. 29.

জগমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় এখন বর্দ্ধমানে উপস্থিত নাই। আমি তাঁহার অপর পুত্র রামলোচন রায়কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, এবং তাঁহার সহিত এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিয়াছি। সে বলিল, দেড় বৎসর পূর্ব্বে জেল হইতে খালাস পাইয়া তিনি (রামকান্ত রায়) বর্দ্ধমানের রাজাকে মাত্র ৫০০৲ দিতে পারিয়াছেন, এবং তাঁহার দেয় ৮০০০০৲ আশি হাজার টাকা পরিশোধ করিবার জন্য এগার বৎসরের কিস্তিবন্দী করিয়াছেন। রামকান্ত রায়ের নিকট বর্দ্ধমানের রাজার বার্ষিক এক লক্ষ টাকা জমার একখানি মহাল ইজারা আছে। এই মহালের মুনাফার উপর সমস্ত পরিবারের জীবিকা নির্ভর করিতেছে। এই মহালের মুনাফার টাকা ভিন্ন অন্য কোন তহবীল হইতে এই দেনা পরিশোধ করিবার উপায় নাই। জগমোহন রায় তাঁহার আবেদনে যে সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সর্ত্ত যাহাতে প্রতিপালিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা (রামকান্ত রায় এবং রামলোচন রায়) একযোগে জামীন হইতে রাজি আছেন। তাঁহারা আর কিছু করিতে পারেন না বা স্বতন্ত্র জামীনও দিতে পারেন না। তার পর বর্দ্ধমানের কালেক্টর লিখিয়াছেন, আমি যাহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি তাহারা সকলে এক বাক্যে বলিয়াছে, এই পরিবার এক সময় ধনী ছিল, কিন্তু এখন নিঃস্ব এবং অবস্থা অতি শোচনীয়।

এই চিঠি পাইয়া ১৮০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরের কালেক্টর বোর্ডকে লিখিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় যদি জগমোহন রায় ১০০০৲ নগদ দিতে পারে, যদি বাকী টাকা মাসিক ১৫০৲ হারে দিয়া পরিশোধ করিতে সক্ষম হয়, এবং তাঁহার পিতা ও ভাই (রামলোচন) যদি এই জন্য জামীন হয়, তবে তাহাকে খালাস দেওয়া যাইতে পারে। মেদিনীপুরের অস্থায়ী কালেক্টর আর্ণষ্ট সাহেব এই সময় ৫৫৭৮৶১॥ গণ্ডা জগমোহন রায়ের দেনা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১১২০৲ তশ্রুপ করিয়াছিল ক্রোকদার মীর কুদ্রৎ-উল্লা। জগমোহন রায় হরিরামপুরের ১২০৭ সনের সদর খাজনার মধ্যে কতক টাকা বাকী ফেলিলে, ১২০৮ সনের গোড়ায় সরকার তাঁহার মহল কাড়িয়া লইয়া মীর কুদ্রৎ-উল্লা নামক এক ব্যক্তিকে ক্রোক সাজোয়াল (সরকার পক্ষের অস্থায়ী তহশীলদার) নিযুক্ত করিয়া মহালের খাজনা আদায় করিতে পাঠাইয়াছিলেন। মীর কুদ্রৎ-উল্লা ১১২০৲ আদায় করিয়া নিজে ভাজিয়াছিল। সরকার তাহাকে গেরেফ্‌তার করিয়া আনিয়া জেলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালেক্টর সাহেব কুদ্রৎ-উল্লার এই ১১২০৲ দেনা হতভাগ্য জগমোহনের ঘাড়ে চাপাইলেন। তাই তখন তাঁহার মোট দেনা দাঁড়াইল ৫৫৭৮৶১॥ গণ্ডা। ১৭ই মে তারিখের উত্তরে বোর্ড উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাইতে রাজি হইলেন না, এবং জগমোহন রায়ের সহিত সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি দিলেন।* ইহার অব্যবহিত পরেই, ১৮০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, রামকান্ত রায় পরলোকগমন করিলেন।

জগমোহন রায়ের কারামুক্তির কাহিনীর বাকী অংশ বর্ণনা করিবার আগে আমরা রামকান্ত রায়ের আর্থিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিব। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, রামকান্ত রায় মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর এষ্টেটের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ১২০৫ সনে (১৮৯৮ সালে) বিষ্ণুকুমারী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরবৎসরই (১৭৯৯ সালের ১৩ই জুলাই) মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহারাজ তেজচাঁদ পিতা-পুত্রের নামে তিন খানি মহালের জন্য স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তেজচাঁদ স্বত্বের মোকদ্দমা রুজু করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। রামকান্ত রায়ের সহিত তাঁহার অনেক দিন হইতেই বিরোধ ছিল। বর্দ্ধমানের জজের ১৭৯৬ সালের ১১ই জুলাই তারিখের একখানি চিঠিতে ১৭৮০-৮১ সালে মহারাজ তেজচাঁদ বাদী এবং রামকান্ত রায় প্রতিবাদী এইরূপ একটি মোকদ্দমার উল্লেখ আছে।† এই চিঠিতে দেখা যায়, এই সময়েও (১৭৯৬ সালে) মহারাজা তেজচাঁদ বাদী হইয়া জজ কোর্টে রামকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। এই সময় মহারাণী বিষ্ণুকুমারী জীবিত ছিলেন। ১৭৯৮ সালে মহারাণীর মৃত্যু রামকান্ত রায়ের এবং জগমোহন রায়ের সর্ব্বনাশের সূচনা

* Board of Revenue, Mis. 30th September, 1803, No. 23.

† Burdwan Records, Vol. 25, p. 95.

জগমোহন রায়ের একরার-পত্র

পারয়াছিল। বর্দ্ধমানের কালেক্টর (Mr Y. Burges) ১৭৯৯ সালের ১৪ই নভেম্বর বোর্ডকে লিখিতেছেন—

Ram Caunt Roy, who holds the Farm of the Pergunnah Boorsoot and Guallaboom under the security of his son, having with him absconded, to avoid the operation of some Decrees passed against him in the Adawlut, I beg leave to suggest the expediency of attaching the Pergunnah, for although the Revenue have been hitherto paid up regularly, there is no saying, as this is the last year of the Farmer's lease whether from the above circumstance, the person left in charge by Ram Caunt Roy may not embezzle and misappropriate the Revenues, to guard against which, I am induced to propose the above measure being adopted immediately, for if it is delayed, till after the month of Poos, little, if any assets can be expected from the Pergunnah.

The Jumma of the Pergunnah farmed to Ramcaunt Roy payable to Government is Sa. Rs. 154902.5.9.2 of which sum there has been paid to the end of Cautie (Kartik) 74,419.*

১৭৯৯ সালের ১৪ই নবেম্বর বাংলা ১২০৬ সনের ১লা অগ্রহায়ণ। ইহার পর রামকান্ত রায়ের দুইখানি পরগণার ইজারার মিয়াদের মাত্র বাকী ছিল পাঁচ মাস। বিগত সাত মাসে মোট জমা ১৫৪৯০২।/৯॥ মধ্যে ৭৬৪১৯৲ পরিশোধ করা হইয়াছিল। এখনও বাকী ছিল ৭৮৪৮৩।/১॥ গণ্ডা। বোর্ড তখনই রামকান্ত রায়ের ইজারা মহাল ক্রোক করিতে সম্মত হইলেন না। রামকান্ত রায় বাকী পাঁচ মাসের মধ্যে সমস্ত বাকী জমা পরিশোধ করিতে পারিলেন না, ২৮৫১।৵ বাকী রহিল। ইহার অর্থ, ১২০৬ সনে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা জমার মহাল হইতে কিছুই তাঁহার মুনাফা হইল না, তার উপর দেনা থাকিল ২৮৫১৲। রামকান্ত রায় বোধ হয় সঞ্চয়কারী ছিলেন না। সুতরাং এক বৎসরের মুনাফার টাকা না পাওয়াতে তাহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইল। ১২০৬ সনে রামকান্ত রায়ের এইরূপ ক্ষতির মূল বর্দ্ধমানের রাজার সহিত মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ততা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে (৫৯৪ পৃঃ), রামলোচন রায় ১৮০৩ সালের এপ্রিল মাসে বর্দ্ধমানের কালেক্টরকে বলিয়াছিলেন, বর্দ্ধমানের রাজার রামকান্ত রায়ের নিকট ৮০০০০৲ আশি হাজার টাকা পাওনা আছে। এই অঙ্কে বোধ হয় ভুলে একটা শূন্য বেশী পড়িয়াছে। ১৮২৩ সালের ১৬ই জুন মহারাজ তেজচাঁদ কলিকাতা প্রাদেশিক আপিল আদালতে রামমোহন রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের নামে ১৫০০২৲ পনের হাজার দুই টাকা দাবীতে নালিশ করিয়াছিলেন। আর্জ্জিতে লিখিত হইয়াছিল, রামমোহন রায়ের পিতা এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের পিতামহ, রাধানগর নিবাসী রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানের জমীদারীর অনেক অংশ ইজারা লইয়াছিলেন। পরগণা বুলিয়া এবং বাগড়ির জমার মধ্যে তাহার নিকট ৭০৫১৲ বাকী পড়িয়াছিল। এই টাকা এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিয়া তিনি ১২০৪ সনের ১৫ই আশ্বিন (১৮৯৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর) কিস্তিবন্দী করিয়াছিলেন। এই কিস্তিবন্দীর খতে বর্দ্ধমানের জজ এবং রেজিষ্টার এবং হুগলীর রুস (Mr. C. Bruce) সাহেব স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই টাকা পরিশোধ না করিয়া রামকান্ত রায় ১৮০৩ সালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারী রামমোহন রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের নিকট সুদ সমেত ১৫০০২৲ দাবী করা যাইতেছে। রামলোচন রায় বর্দ্ধমানের কালেক্টরের নিকট অবশ্য এই দেনার কথাই বলিয়াছিলেন, এবং মোটের উপর ৮০০০৲ আট হাজার টাকার কথা বলিয়াছিলেন। ভুলে তাহাই ৮০০০০৲ টাকার আকার ধারণ করিয়াছে। এই দেনা সত্ত্বেও রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানের রাজার নিকট এক লক্ষ টাকা বার্ষিক জমার একখানি মহাল ইজারা পাইয়াছিলেন। এক লক্ষ টাকার মহালে তাঁহার আয় অন্ততঃ ১৫০০০৲ হইত, এবং তহশীল খরচ বাদে তাঁহার অন্ততঃ ৫০০০৲ টাকা মুনাফা টিকিত। রামকান্ত রায় বাঁচিয়া থাকিলে অন্য মহালও ইজারা লইতে পারিতেন এবং জগমোহন রায়ের জন্য সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন। মহালের খাজনা আদায় ওয়াশীল কার্য্যে জগমোহন পিতার সহযোগী ছিলেন। সুতরাং রামকান্ত রায়ের মৃত্যু কারাবদ্ধ জগমোহন রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। তার পর হুদা রসিকপুরাদি মহাল সম্বন্ধে সদর দেওয়ানী আদালতে ১৮০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় আপিলে হার হওয়ায় তাঁহার সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল।

এই সেপ্টেম্বর মাসেই জগমোহন রায় পুনরায় আবেদন করিলেন, তাঁহাকে খালাস দিলে তিনি নগদ হাজার টাকা দিবেন এবং মাসিক ১০০৲ হারে বাকী ৩৪৫৮৲ চৌত্রিশ মাসে পরিশোধ করিবেন। এই কিস্তিবন্দীর জামীন স্বরূপ তিনি

* Burdwan Records, Vol. 47, No. 329.

দুই জনের নাম করিলেন—বৈমাত্রেয় ভাই রামলোচন রায়, এবং পরগণা গোপভূমের অন্তর্গত দায়সা গ্রাম নিবাসী সভাচন্দ্র রায়। রেভিনিউ বোর্ড এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।* এই দুই ব্যক্তি জামীন হইতে প্রস্তুত আছে কিনা অনুসন্ধান করিবার জন্য মেদিনীপুরের কালেক্টর (R. Shubrick) বর্দ্ধমানের কালেক্টরকে চিঠি লিখিলেন। বর্দ্ধমানের কালেক্টর (G. Webb) ১৮০৩ সালের ১৭ই অক্টোবর উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, রামলোচন রায় বর্দ্ধমান জেলায় নাই এবং সভাচন্দ্র রায় জামীন হইতে রাজি নহে।†

সভাচন্দ্র রায়কে এবং রামলোচন রায়কে জামীন হইতে সম্মত করিবার জন্য ১৮০৪ সালের অক্টোবর মাসে জগমোহন রায় আবার চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিখানি মোকদ্দমার নথীর মধ্যে আছে। চিঠিখানির পাঠ যতটা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা এই—

পোষ্টাবর ও পরম কল্যাণায়
শ্রীযুত হিরারাম চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত জগন্নাথ মজুমদারজী
দাদা কল্যাণবরেষু

শ্রীজগমোহন শর্ম্মণ.

নমস্কার ও পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ: আমি কেলকটারি কাছারিতে তরফ হরিরামপুরের বাকী এক হাজার টাকা নগদ বাদে ১৪৫৮।৯।। চৌদ্দশ শত আঠার সাড়ে উনিশ গণ্ডায় কীস্তিবন্দী চৌবিশ মাসের করিয়া শ্রীযুক্ত রামলোচন রায় ভায়া ও শ্রীযুক্ত সভাচন্দ্র রায়ের মাল জামিনের একরার করিয়াছি রায় দিগগের এতরায়ের নিমিত্ত আপনার কৃতাংশের (ক্রীতাংশের) জমি কৃষ্ণনগর দিগরের এবং পুষ্করণি ও খরিদা আয়মা - দিগরের মাতবর রাখিলাম করার মত টাকা আদায় না করি রায় মজকুরের এ জমি দিগর আপন একতিয়ারে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিবেন এই খত মতন লিখিয়া দিয়া আপনারা দুই জনায় সাক্ষী হইবেন আপনি খত যে লিখিয়া দিবেন তাহা আমার মনজুর ইষ্টাম্প কাগজে আমি দস্তখত করিয়া পাঠাইতেছি কুশলমিতি তা ৭ই কার্ত্তিক

এই চিঠি খানিতে তারিখ দেওয়া আছে, সনটি দেওয়া নাই। সন হইবে ১২১১ এবং খ্রীষ্টাব্দের তারিখ, ১৮০৪ সালের ২১ অক্টোবর। এবার সভাচন্দ্র এবং রামলোচন জামীন হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই হীরারাম চট্টোপাধ্যায় এবং সভাচন্দ্র রায়কে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের পক্ষ হইতে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল এই কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে।‡ ইহারা কেন যে জবানবন্দী দেন নাই, এমন কি সপিনাও গ্রহণ করেন নাই, এই চিঠি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায় গোবিন্দপ্রসাদের দাবী সমর্থন করিতে হইলে এই চিঠিখানি এবং জগমোহন রায়ের কারামুক্তি সম্বন্ধীয় সকল কথা ইহাদিগকে অস্বীকার করিতে হইত। জগমোহন রায় নগদ টাকাটা হাওলাত লইলেন রামমোহন রায়ের নিকট হইতে। তাঁহার ১২১১ সনের ৩রা ফাল্গুনের অর্থাৎ ১৮০৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক হাজার টাকার হাওলাত রসিদপত্র পূর্ব্বেই সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।+ এই হাজার টাকা এবং জামীননামা দাখিল করিবার পর জগমোহন রায় খালাস পাইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেল হইতে খালাস পাইয়া জগমোহন রায় ৭ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। বর্দ্ধমানের এবং হুগলীর আদালতে রামকান্ত রায়ের কয়েকটি পাওনা টাকার ডিক্রী ছিল। জগমোহন রায় জেল হইতে খালাস পাইয়া আসিয়া এই সকল টাকা ওয়াশীল করিলেন। ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে, জগমোহন রায় এইরূপে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে রামকিশোর রায়ের নিকট হইতে প্রায় হাজার টাকা, এবং বিনোদরাম সমদ্দারের নিকট হইতে ৪।৫ শত টাকা। বেচারাম সেন প্রভৃতি অন্যান্য সাক্ষী রামকান্ত রায়ের অন্যান্য খাতকের নাম করিয়াছেন। রামকান্ত রায়ের আর দুই পুত্র, রামমোহন এবং রামলোচন রায়, পিতার ওয়ারিশ রূপে এই সকল ডিক্রীর টাকার অংশ দাবী করেন নাই।‡

মোকদ্দমার নথীর মধ্যে জগমোহন রায়ের দস্তখতী একখানি মূল একরারনামা আছে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। নিম্নোদ্ধৃত এই একরার নামা পাঠ করিলে জগমোহন রায়

* Board of Revenue, Procs. 30th Sept., 1803 No. 23

† Board of Revenue, Proceedings, 27th January, 1804, No. 4 (Enclosure).

‡ প্রবাসী, ১৩৪৩, পৌষ, ৩৪৪ পৃঃ।

+ প্রবাসী, ১৩৪৩, আশ্বিন, ৮৫০ পৃঃ।

‡ বাটোয়ারার পর রামলোচন রায় ও নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। ১৮০৫ সালের ১০ই আগষ্টের একখানি চিঠিতে বর্দ্ধমানের অস্থায়ী কালেক্টর জর্জ ওবেব (George Webb) লিখিতেছেন, "By the records of my office it appears that 1535 Biggahs and 5 cottas of rent free Lands stands in the name of Ramlochan Roy one of the securities tendered by Jugmohun Roy." Burdwan Records, Vol. 65, No. 33,

মুক্তিলাভ করিয়া কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার আভাস পাওয়া যায়—

"শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন রায়

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীজগমোহন রায় কস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আয়মা কাবিলপুরের আয়মা বন্দকী আমার দস্তখতি খত দরুণ জে দেনা আছে এবং ইস্তক সন ১২১৫ সালে নাং (নাগায়ৎ) সন ১২১৭ সাল তোমার তালুক তরফ বিরলোকের মধ্যে যে কএক মহাল লাঙ্গুড়পাড়ার সামিল তহসীল ছিল আর সন ১২১৬ সাল নাগাইত তরফ কৃষ্ণনগর ইজারার মাল গুজারির বাকী হিসাবে বই (?) জে হইবেক এবং ঐ কৃষ্ণনগর তোমার তালুক গাই আমের সন ১২১৭ সালের হিসাব বই (?) যে দেনা হইবেক তাহা আমী নিজে হইতে বিনা ওজরে দিব এতদার্থে একরার লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ সাল তারিখ ১১ আশার।"*

বেচারাম সেন জেরার উত্তরে বলিয়াছে, ১২০৫ সনে (১৭৯৮–৯৯ সালে) জগমোহন রায় ১২০০৲ টাকা মূল্যে (কাবিলপুরে) ৪০০ শত বিঘা আয়মা জমী খরিদ করিয়াছিলেন। বেচারাম সেন আরও বলিয়াছে, জগমোহন রায় এই আয়মা জমী ১৬০০৲ টাকা ধার লইয়া রাজীবলোচন রায়ের নিকট রেহাণ রাখিয়াছিলেন। এই ১৬০০৲ টাকার মধ্যে রাজীবলোচন রায় ১২০০৲ নগদ দিয়াছিলেন, এবং বাকী ৪০০৲ টাকা নগদ না দিয়া জগমোহন রায় যে রামমোহন রায়ের নিকট ৪০০৲ ধারিতেন তাহা ওয়াশীল দিয়াছিলেন। বেচারাম সেন আরও বলিয়াছে, এই রেহাণী খত লেখার সময় সে উপস্থিত ছিল, কিন্তু খতে সাক্ষী হয় নাই। বেচারাম সেন উপরে উদ্ধৃত এক্‌রার পত্রও স্বীকার করিয়াছে, এবং বলিয়াছে, ১২১৫ হইতে ১২১৮ সনের মধ্যে নায়েব জগন্নাথ মজুমদারের অনুপস্থিতে জগমোহন রায় কৃষ্ণনগর এবং বীরলোক তালুকের তহশীলদারী করিয়াছিলেন। উপরে উদ্ধৃত একরার পত্র সম্পাদনের দশ মাস পরে, ১২১৮ সনের চৈত্র (১৮১২ সালের মার্চ্চ-এপ্রিল) মাসে জগমোহন রায় পরলোকগমনক রিয়াছিলেন। হরিরামপুরের বাকী খাজানার মধ্যে নগদ ১০০০৲ এক হাজার টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩৩৫৮৲ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য কারামুক্তির সময় তিনি মাসিক ১৫০৲ টাকা হারে কিস্তিবন্দী করিয়া আসিয়াছিলেন। কারামুক্তির পর সাত বৎসরের মধ্যে জগমোহন রায় এই দেনার এক কিস্তির টাকাও পরিশোধ করিতে পারেন নাই।

* ১৮১১ সালের ২৪শে জুন।

সরকারী চিঠিপত্র, জগমোহন রায়ের দস্তখতী চিঠিপত্র, এবং অন্যান্য দলিল সপ্রমাণ করে, বাঁটোয়ারার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকান্ত রায় এবং জগমোহন রায় বিষয়-সম্পত্তি এবং দেনা-পাওনা সম্বন্ধে রামমোহন রায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। তারিণী দেবীর গোঁড়ামি এবং অভিমান, গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের অনভিজ্ঞতা, এবং কুলোকের কুপরামর্শ এই সর্ব্বনাশকারী অমূলক মোকদ্দমার মূল।

মেঘ, চিল, কৃষ্ণচূড়া

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বড় বড় কালো মেঘ অসংখ্য-সে,
দৈত্যদলের মতো কোমর ক'ষে
ঐ ছুটে চলে আজ আকাশ জুড়ি'
কে আগে যাবে-যে তাই কী হুড়াহুড়ি!
দেখা-না-দেখাতে মিশি' মেঘেরি তলে
অতি ছোট দুটি চিল উড়িয়া চলে।

ছোট তারা তবু চায় হারাতে মেঘে
কৌতুকে পুলকিত চলার বেগে।

কৃষ্ণচূড়ায় মেলি' পুষ্প-আঁখি
সুদূরে দিগাঙ্গনা দেখিছে তা' কি!

কুটীরশিল্পে কলুর ঘানি

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

যে-সকল দ্রব্য কুটীরে কুটীরে উৎপন্ন হইতে পারে, কলকারখানার সহযোগে সেগুলি অল্প খরচায় উৎপন্ন করিয়া বেচিতে গেলে সস্তার জন্যই তাহার কাটতি হয়। কলওয়ালার রোজগার হয় এবং কলের সম্পর্কিত অন্য কতক লোকেরও ভাল রোজগারের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অপর দিকে ঘরে ঘরে অনেক লোক কর্ম্মহীন হইয়া বেকার বনে ও সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। যেখানে জনসাধারণ কাজ করিতে ইচ্ছা করিলেও কাজ পায় না এবং কাজ না-পাওয়ার জন্য অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পায় সেখানে কুটীরে কুটীরে মানুষের হাতের শ্রমে গড়া জিনিষকে কলের সস্তা জিনিষের তুলনায় অধিক মূল্য বলিয়া ত্যাগ করায় সমাজ আত্মঘাতী হয়। একটা কথা ভুল হইলেও শাসক-সম্প্রদায় অনেক দিন হইল শিখাইয়া আসিতেছেন যে ভারতবর্ষ "কৃষি-প্রধান দেশ"। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তাহা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, হিসাব কষিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ "কৃষি ও শিল্প প্রধান" দেশ ছিল এবং ইংরেজের শাসনকালে ভারতবর্ষ নিরন্ন ও শিল্পহীন হইয়াছে এবং শিল্প নষ্ট হওয়ায় প্রতি বৎসরই কতক লোক জমির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে।

আজ যেমন, তেমনই পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের লোকের শিল্পজাত দ্রব্যের শত প্রয়োজন ছিল। ছুতার, কামার, কুমার, সেকরা, তাঁতি, জোলা, কলু, সুতা-কাটুনী, ধান-ভানুনী, চামার, মুচি, রংরেজ – ইহাদের সকলেরই কাজ ছিল। ইহারা এবং ইহাদের মত আরও শত শত শিল্পে নিযুক্ত লোক সমাজের নানা প্রয়োজন জোগাইয়া বাঁচিত ও সমাজকে জীবিত রাখিত। ছুতারের কাজ কমিয়া গিয়াছে। জল- ও স্থল-পথের জন্য যান প্রস্তুত করা তাহাদের বড় কাজ ছিল—

দেউলা গ্রামের চলতি ঘানি—খাদি-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে

দেউলা গ্রামের পরিত্যক্ত ঘানি—বৎসরাধিক কাল এই ঘানি বন্ধ রহিয়াছে

দেউলা গ্রামের নারিকেল-বাগান
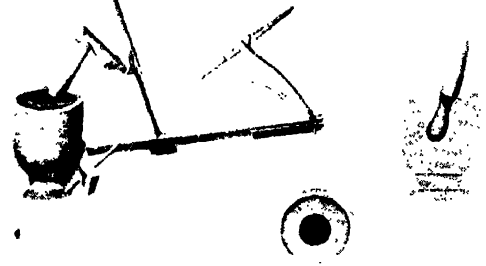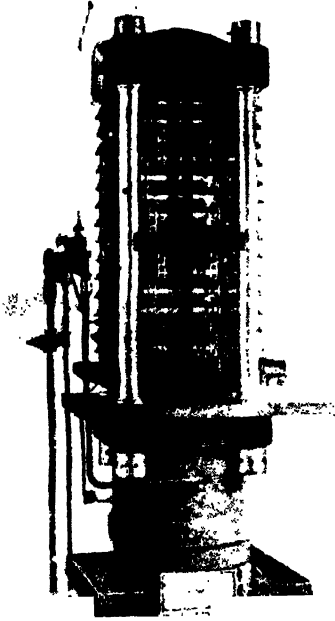
বাঙ্গালোরের ঘানি (১৮০০)

[ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (১৮০৭) হইতে গৃহীত চিত্র
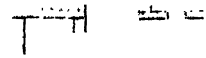
মালাবারের লৌহগলান চুল্লী (১৮০০)

[ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে গৃহীত চি
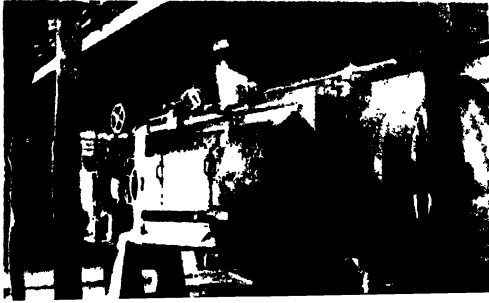
এক্সপেলার অয়েল-মিল

সে কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কামারের কাজও আজ অনেক কম। কৃষির যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত আজ বিদেশী বা দেশী কারখানায় এমন সস্তায় উৎপন্ন হইতেছে যে গ্রাম্য কামারের প্রস্তুত অনেক জিনিষ আর চলে না। কামারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। কামারের জন্য লোহা প্রস্তুত করার কাজও দেশেই হইত। বিদেশ হইতে লোহা আসিত না, এ-দেশ হইতে কুটীরজাত লোহা বিদেশে যাইত,—যদিও আজ ইহা স্বপ্নবৎ মনে হয়।

তাঁতি-জোলা ত মরিয়াই গিয়াছে। কটন মিলগুলা তাহাদের কাজ করিতেছে। যদিবা অল্পসংখ্যক তাঁতি কোন রকমে বাঁচিয়া আছে, তথাপি যে-কলের সুতা তাহারা বু সেই কলই আবার তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। কল যদি নিজ কা লাভ করিতে পারে—অর্থাৎ দেশের সমস্ত কাপড় কল বুনিবে এই সাধনায় সার্থক হয়, তবে অবশ্য তাঁতিরা নির্ম্মূ হইবে। কলের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটীরের একটা হার হইয়া আসিতেছে। ধানভানার কাজ কল দিয়া করা ফলে অনেক স্থানে ঘরে ঘরে ঢেঁকি বসিয়া আছে। সুত যাহারা কাটিত, যাহারা হাতে-কাটা সুতায় এক কালে সা

ভারতের স্ত্রীপুরুষের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জোগাইয়া আসিয়াছে, কল আজ তাহাদের কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে খাদির জন্য চেষ্টা চলিতেছে, কিছু সুতা কাটান হইতেছে। যে-সূর্য্য নিবিয়া গিয়াছিল তাহার চিহ্নস্বরূপ একটা মাটির প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে মাত্র। একবার একটা শিল্প লুপ্ত হইলে প্রতিকূল জন-মনোভাবের ভিতর তাহাকে পুনরায় দাঁড় করান যে কত কঠিন তাহা খাদিতেই দেখা যাইতেছে।

আজ বিশেষ করিয়া একটা শিল্পের কথা বলিব যাহা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ঘানির কথা বলিতেছি। তেল রান্নার জন্য চাই, গায়ে মাথার জন্য চাই। 'তেলে জলে বাঙালীর শরীর' কথাটা সত্য। গৃহশিল্প হিসাবে কলুরা আবহমান কাল ঘানি হইতে তেল প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কলওয়ালা কলুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে কেন। তাহারা কলুর ঘানিখানা, যেমনটি ঠিক তেমনই লয়—গরুর বদলে এঞ্জিন জুড়িয়া দেয়। কাঠের জাট ফেলিয়া লোহার জাট বসায়। এঞ্জিন দ্বারা গরুর কাজ করাইয়া কতকটা সস্তায় তেল হয়—কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় না। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘানি চলে। শহরে কল বসাইয়া সে তেল দূরে দূরে জোগাইয়া ঘানিকে পরাজয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কলের তেল শহরের সীমানাতেই প্রায় বদ্ধ থাকে। কিন্তু কলওয়ালা ব্যবসার প্রসার চাহে। সমস্ত ঘানিই কলের ঘানি হউক—সবটা তেল কলওয়ালাই দিবে, এই ত কলওয়ালার কাম্য। কিন্তু যেখানে কুটীরশিল্প হিসাবে ঘানি চলে সেখানে কলের তেল সস্তায় পৌঁছান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন কল গ্রাম্য ঘানির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তেলে ভেজাল দিতে আরম্ভ করে। লোকে সস্তা চায়, খাঁটি ভেজাল বিচার করে না। কলের তেল নিকৃষ্ট হইলেও সস্তা বলিয়া মাত্র শহরের লোকে কিনিত, কিন্তু ভেজাল দেওয়ায় গ্রামেও প্রবেশ করিয়া ঘানিকে পরাজিত করিতে লাগিল। একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট করিব।

অতীত কালের শিল্প-প্রধান গ্রাম

কলিকাতার জনসংখ্যা যখন বাড়িতে থাকে তখন নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে নূতন নূতন ঘানি বসিতে থাকে। আজ কলিকাতা হাওড়া মিলিয়া লোকসংখ্যা বারো লক্ষ এই বারো লক্ষ লোকের তেল জোগাইতে বারো হাজার গ্রাম্য ঘানি ত দরকার। প্রতি শত লোকে একখানা ঘানি ধরিয়া লইতেছি। দশ-বার হাজার ঘানি কলিকাতার উপকণ্ঠে কোনও দিন বসিয়া গিয়াছিল এ-কথা মনে করার হেতু নাই। কলিকাতায় কলের ঘানি বহু বর্ষ হইতে চলিতেছে, তথাপি কলের ঘানির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য ঘানিও যে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল কলুর বা কলু-প্রধান গ্রাম কলিকাতার কাছাকাছি অনেক আছে। এত তেল সে-সকল গ্রামে উৎপন্ন হইতে পারে যে সে-গ্রামের বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোক কোনও মতেই তাহা ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদের প্রধান কাজ ছিল কলিকাতার তেল জোগান।

দেউলে নামে এমনই একটি গ্রাম দেখিতে গেলাম। গ্রামে চল্লিশখানা ঘানি ছিল, যদিও লোক চল্লিশ ঘর হইবে না। কলু ভিন্ন অন্য জাতের লোক, নাপিত ধোপা চামার সামান্য কয় ঘর মাত্র গ্রামে আছে। আজিকার দিনে চল্লিশখানার মধ্যে মাত্র ছয়-সাতখানা ঘানি চলিতেছে—তাহাও নিয়মিত চলে না। নিকটেই একটা বড় রকম হাট আছে। তেল ও খইল এই হাটে বরাবর খুব উঠিত। তেল যাইত শহরে আর খইল লাগিত গরুর জন্য ও চাষের জন্য গ্রামের কাজে। কলুদের অবস্থা এককালে খুব ভালই ছিল। কাহারও কাহারও প্রাচীর-দেওয়া পাকা বাড়ী আছে। জমিজমা মন্দ ছিল না। এ সমস্তই ঘানি হইতে হইয়াছিল। এখন কিন্তু গ্রামখানি নিরানন্দ ও অবসাদগ্রস্ত, কোনও জীবন নাই। প্রতিপদে অলসতার ও দারিদ্র্যের ছাপ চোখে পড়ে। গ্রামে প্রবেশ করা মাত্রই এক দল বালক-বালিকা আমাদের সঙ্গ লইল। আমাদের মধ্যে কিছুই বিশেষত্ব ছিল না, তবে আমরা যে গ্রাম্য লোক নহি, শহর হইতে কিছু দেখিতে আসিয়াছি তাহা ছোট ছেলেও বুঝিতে পারে। আমরা যত গলি গলি ঘুরিতে লাগিলাম ছেলেপুলের সংখ্যা তত বাড়িতে লাগিল। গণিয়া দেখি যে পঁচিশটি সঙ্গ লইয়াছে। যে-বাড়ীতে ঘানির খোঁজ করিতে যাই ছেলেরা সে-বাড়ীর প্রাঙ্গণ ভরিয়া ফেলে, ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, ঘরে ঘানি দেখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যায়। ঘানি-ঘর অনেকগুলি

দেখি অন্ধকার, ঘানিও বন্ধ আছে। তখন বেলা সাড়ে চারটা, বর্ষা কাল, তথাপি আলো জালাইয়া ঘরের ঘানি দেখিতে হয়। ঘানি আমরা দেখি, ছেলেরা আমাদিগকে দেখে, নিজেরা বলাবলি করে, তাহার পরে কোন্ বাড়ী যাইব সে-জল্পনা করে—আমাদের পূর্ব্বেই ত তাহাদের পৌঁছিয়া থাকা চাই।

ঘানি দেখিলাম। সুন্দর নিপুণ ভাবে তৈরি যন্ত্র। অযত্নে পড়িয়া আছে। সর্ব্বত্রই এক কথা। তেল-বিক্রয়ে আর পোষায় না, সেই জন্য ঘানি বন্ধ। "ঐ যে কয়খানা চলিতেছে?" কি করিয়া চলিতেছে সে-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরাও তত ক্ষণ তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু ঘানি অপেক্ষা এই ছেলের দল আমার মন অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। গ্রামে আমাকে যাইতে হয়। এমন গ্রামে দুর্ভিক্ষ বা বন্যার সাহায্য দিতে গিয়াছি যেখানে বিদেশী ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা হয়ত তিন জন এক দলে। পথে দেখা পাইয়া ছেলেমেয়েরা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইয়াছে। বুনো জানোয়ার দেখিলে যে-অবস্থা হয় তাহাদের সেই অবস্থা হইয়াছে। চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়াছে, পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে। নিকটে গেলে আরও ভয় পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এ তেমন নয়। কলিকাতার উপকণ্ঠেই গ্রাম। আমাদিগকেই ইহারা পর্য্যবেক্ষণের বস্তু করিয়াছে। গ্রাম্য পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেরা এমন ভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আছে কেন—পাঠশালা নাই বুঝি? চৌদ্দ বছরের ছেলেও ত কয়টি দেখিতেছি। কোনও কাজ নাই নাকি? গরু চরান, ঘাস কাটা, বাড়ীর কাজ? না, কোনও কাজ নাই। পাঠশালায় যাইবে কি, ঘরে খাওয়াই জোটে না। বেতন দেওয়ার শক্তি নাই। ছেলেমেয়েগুলির কথাবার্ত্তা ও চালচলন দেখিয়া কষ্ট হইল। সমস্ত গ্রামটার শ্রীহীন ভাব উহাদের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম।

এমন কেন হইল? তাহারা বলিল যে এমন ছিল না। এক কালে গ্রামের শ্রী ছিল—তখন ঘানি চলিত। বাপ-দাদা বাড়ী ঘর রাখিয়া গিয়াছে, জমিজমাও কিছু ছিল, আজ বড় নাই। এখন আর ঘানি চলে না।

"জমিজমা যে সামান্য আছে তাহা নিজেরাই চাষ করত?"

"নিজেরা চাষ করিব কি, চাষ করিতে ত কখনও শিখি নাই।"

"বসিয়া থাক অথচ নিজের জমি অপরকে দিয়া চাষ করাও?"

"হাঁ, কি করিব। চাষ ত জানা নাই। পূর্ব্বে অবস্থা ছিল ভাল, ঘানির কাজ করিতাম, তাহাই জানি। চাষ শিখিতে হয়, হাল-গরু রাখিতে হয়। আর কতটুকুই বা জমি আছে তাহাতে চাষ করাও পোষায় না—বরোগা দেওয়া হয়।"

"তাহা হইলে চলে কি করিয়া?"

"কেহ কেহ এ-কাজ সে-কাজ করে, কেহ বা বসিয়াই কাটাইতেছি।"

"তবুও সংসার চলে কি করিয়া?"

নারিকেল গাছগুলি দেখাইয়া বলিল, "উহারাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সকল বাড়ীতেই কয়টা করিয়া গাছ আছে। ডাবগুলি ভাল দামে বিক্রয় হয়। কতক নারিকেল ঝুনা করা হয়, উহা বেচিলে দাম উঠে না—শুকাইয়া তেল বাহির করা হয়। নিজেদের ঘানিতে ভাঙাইয়া লই, সময়ে অপরের নারিকেলও ভাঙাইয়া দিই—দুই পয়সা তেলের সের হিসাবে মজুরি পাওয়া যায়। তাহার পর নারিকেলের পাতা আছে, উহা হইতে ঝাঁটা হয়, সেগুলিও বেশ বিক্রয় হয়। এই ভাবে চলে।"

দেখিলাম, চলে না। একটা ব্যথা লইয়া ফিরিলাম। লোকগুলি মিষ্টভাষী ও ভদ্র। দারিদ্র্য এ-পর্য্যন্ত তাহাদের বিনয় ও সদাশয়তা নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদের পরবর্ত্তীরা, গ্রামের ছেলেরা, ভিন্ন জিনিষ গড়িয়া উঠিতেছে। যাহারা কল বসাইয়া একটা কুটীরশিল্প নষ্ট করে, যাহারা কুটীরজাত বস্তু ত্যাগ করিয়া কলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাহাদের ভিতর এই ভাবে কলের প্রচলন দ্বারা কি সর্ব্বনাশ হইতেছে এ-কথা যাঁহাদের বুঝিতে পারা উচিত তাঁহারাও বুঝিতে চান না। গ্রাম দেখিয়া দেখিয়া হতাশার শ্বাস ফেলিতে হয়।

কলের ভেজাল

তেলের কথা জানিলাম। কলের তেলও বাজার-চলতি দরে পোষায় না ভেজাল না দিলে। কলওয়ালারা তেল

সস্তা করিতে করিতে প্রতিযোগিতায় এমন অবস্থা আনিয়াছে যে বিস্তর ভেজাল দেওয়া প্রয়োজন, নহিলে প্রতিযোগিতায় টিকা যায় না। কলিকাতাতেই তেলের কল অনেক। এখানে কলঘরের সম্মুখে বিজ্ঞাপন আঁটা হয়—"মিশ্রিত তৈলের কারখানা"। আইন বাঁচাইবার জন্য এই বিজ্ঞাপন আবশ্যক। মিশ্রিত মানে ভেজাল সরিষার তৈল। কলে প্রথমতঃ খাঁটি সরিষা হইতেই সাধারণতঃ তেল বাহির করা হয় এবং সেই তেলে রুচি ও লাভ করার ইচ্ছা অনুযায়ী নানা সস্তা তেল মিশান হয়। ভেজাল দেওয়ার সব চাইতে সস্তা একটা তেল হইতেছে 'হোয়াইট অয়েল'। ইহা কেরোসিন ও ভেজেলিনের মাঝামাঝি মোটা খনিজ তেল। ইহার মূল্য ছয় টাকা, সাড়ে ছয় টাকা মণ। এই পদার্থের রং ঠিক সরিষার তৈলের মত এবং তেলে মিশাইলে তেলের বর্ণবিকার হয় না, গন্ধ কমিয়া যায়। কিন্তু সেজন্য কলে 'রাই' সরিষা বেশী মিশ্রিত করিয়া ভাঙান হয়। উহার ঝাঁজ বেশী। যথেষ্ট হোয়াইট অয়েল মিশাইলেও চলিয়া যায়। এক প্রকার ঝাঁজালো দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়—উহাতে সরিষার তেলের তীব্র গন্ধ থাকে। উহা মিশাইয়া কেবল হোয়াইট অয়েলকেও সরিষার তেল করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যতঃ কতকটা সরিষার তেল মিশান হইয়াই থাকে। এক মণ সরিষার তেল যদি ২০৲ টাকা হয়, আর এক মণ হোয়াইট অয়েল ৬৲, তবে সমান সমান মিশাইলে দুই মণ তেলের মূল্য হইল ২৬৲ টাকা। ১৩৲ টাকা মণ পড়িল। তখন ১৪৲ টাকা মণ বিক্রয় করিয়াও লাভ থাকে।

কলুর বিপদ

এই মিশ্রিত তেল মফস্বলের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। শহরে যে-পাড়ায় কলের তেলের কারখানা আছে, তাহার নিকটেই খনিজ তেলের দোকানও বসিয়া গিয়াছে। গ্রামে সরিষার তেলের নামে কলিকাতা হইতে এই তেল যায়। উহা দোকানদারেরা রাখে। কলুর বিপদ কে বুঝিবে। তাহার জীবিকা বজায় রাখিবার জন্য এক সের তেল ঘানিতে করে ত তিন সের কলের তেল কিনিয়া মিশাইয়া সামান্য অধিক দামে ঘানির তেল বলিয়া বিক্রয় করে। গ্রামের হাটে কলের তেল অপেক্ষা কলুর তেল এখনও সামান্য বেশী দামে বিক্রয় হয়। কিন্তু সে-ভেদ এত সামান্য যে তাহাতে কলুরা খাঁটি ঘানির তেল দিতে পারে না। তাহাকেও ভেজাল দিতে হয়। আর, একবার চরিত্র নষ্ট হইলে, বা ব্যবসার ধারা দুষ্ট হইলে, পারিলেও অনেকে পারিতে চায় না। অধিক লাভের লোভ প্রতিবন্ধক হয়। এই জন্য খাঁটি সরিষার তেল বলিয়া কোনও বস্তু বাংলার হাট-বাজার হইতে বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। যেখানে রেলের মাল পৌঁছিতে পারে সেইখানেই এই অবস্থা। আজ যে-ঘানিগুলি আছে তাহা মৃতকল্প। সেগুলির সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে লোকের বিশ্বাস ভাঙাইয়াই সেগুলি চলিতেছে। লোকে জানিয়া না-জানিয়া, কতকটা সন্দেহ সত্ত্বেও, কলুর তেল তবুও কতকটা খাঁটি, এই বিশ্বাসে ক্রয় করে। কিন্তু এই লোক-দেখান ঘানির সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। যদি কল খাঁটি সরিষার তেল বিক্রয় করিত, তবে ঘানি মরিত না। লোকের রুচি বদলাইয়া সস্তা ভেজাল তেল খাইতে লোককে অভ্যস্ত করিয়াই কল তাহার প্রতিযোগী ঘানিকে নষ্ট করিতেছে। কলওয়ালাদের ভিতরেও যাহারা ভেজাল দিতে চায় না, তাহাদের পক্ষে কারবার টিকাইয়া রাখা শক্ত।

ঘানি অপরাজেয়

যতগুলি গৃহশিল্পের যন্ত্র কলের নিকট হার মানিয়াছে ঘানি তাহাদের একটি নয়। কল-চালিত যন্ত্র কেবল গতিবেগ বাড়াইয়া ও মানুষ বা পশুর পরিবর্তে এঞ্জিন জুড়িয়া দিয়াই ছাড়ে নাই। দ্রব্যপ্রস্তুতের প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হাতে-সুতা-কাটা চরখা, ও কলের চরখায় সমস্ত পদ্ধতিতেই আমূল প্রভেদ। ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটা হয় মুষলের সহিত ধানের ঘর্ষণে। কলে মুষলের ব্যবহার নাই। কিন্তু ঘানিতে তেমন কিছু ঘটে নাই। গ্রামের ঘানি অন্ততঃ বাংলায় যে-ভাবে চলে, কলের ঘানিও ঠিক তাহার নকলে চলে। সেই ঘানি, সেই জাট, কলুর ঘরে ও কলঘরে ঠিক এক রকম। তৈলবীজ ভাঙাইতে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির চেষ্টা যে হয় নাই বা প্রচলিত নাই এমন নহে। কিন্তু সে-সকল পদ্ধতি সরিষার বেলায় ঘানির সহিত প্রতিযোগিতায় আজও পারিয়া উঠিতেছে না। কল দ্বারা চালিত যন্ত্র নূতন ভাবে প্রস্তুত করিয়া ঘানিকে পরাজয় করার চেষ্টা আজও খুব চলিতেছে যদিও সে-সংবাদ আমাদের কলুদের জানাও নাই।

হাইড্রলিক অয়েল-প্রেস

ঘানির পরিবর্ত্তে অপর প্রথায় কলে তেল বাহির করার একটা রীতি হইতেছে হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহার করা। আমার হাতেই কয়েক বৎসর একটি হাইড্রলিক অয়েল-প্রেস ছিল। আমি নিজেই উহা চালাইতাম। উহাতে সরিষা ভাঙার পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঘণ্টায় এক মণ সরিষা ভাঙা যাইত। কলের দাম পড়িয়াছিল ছয় হাজার টাকা। ঘানি অপেক্ষা অধিক তেল সরিষার বেলায় উহা হইতে বাহির করা যাইত না। ঘানির চেয়ে উহা চালাইবার ব্যয়ও অনেক বেশী। কলের দামের ত কথাই নাই। একটা গ্রাম্য ঘানিতে দিনে কুড়ি-ত্রিশ সের সরিষা ভাঙান যায়। ষোলখানা ঘানি চলিলে দিনে আট মণ সরিষা ভাঙান যায় এবং একখানা ছোট হাইড্রলিক প্রেসেও ততটাই ভাঙান যায়। একখানা গ্রাম্য ঘানির মূল্য গরু-সমেত পঞ্চাশ টাকার ভিতর হয়। আট শত টাকায় ষোলখানা ঘানির স্থলে হাইড্রলিক প্রেসের দাম ছিল তখনকার দিনে (ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে) ছয় হাজার টাকা। ইহার উপর এঞ্জিন আছে। হাইড্রলিক প্রেসে সরিষা রোলারে গুঁড়াইয়া, থাকে থাকে প্লেটে সেই গুঁড়া সাজাইয়া প্রেসে চাপিতে হয়। ইহাতে সরিষার সহিত লোহা ঘষা যায় না, সরিষা গরম হয় না। এই তেল গ্রাম্য ঘানির তেলের মতই উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। কিন্তু গ্রাম্য ঘানির মত সস্তায় ইহাতে সরিষার তেল হয় নাই।

ঘানি-কল

হাইড্রলিক প্রেসে সরিষা ভাঙা চলতি নাই—চালান যায় নাই। কলুর ঘানির মতই ঘানি-কল চলিতেছে। কিন্তু কলের ঘানি কলুর ঘানির নকল হইলেও উভয়ের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য আছে। কলের ঘানির জাট লোহার এবং গর্ত্ত কাঠের কিন্তু লোহাঘেরা। জাট লোহার বলিয়া ঘর্ষণে তেল বিস্বাদ হইয়া উঠে। আর একটা ভেদ এই যে কুটীর-ঘানি মিনিটে দুই হইতে তিন বার ঘোরে। ধীরে ঘোরে বলিয়া সরিষা গরম হইতে পারে না। কিন্তু কলে সেই ঘানিই ঘোরে মিনিটে ত্রিশ বার। তেল গরম হইয়া বাহির হয়। একটা গ্রাম্য ঘানিতে দশ সের সরিষা যদি চার ঘণ্টায় ভাঙা যায় ত কলের ঘানিতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ভাঙা যায়। একটা কলের ঘানি পাঁচ-ছয়খানা গ্রাম্য ঘানির সমান। কিন্তু মিনিটে তিন বারের স্থানে ত্রিশ বার ঘোরায় সরিষা ও তেল উভয়ই অতিশয় গরম হইয়া উঠে, তাহার উপর লোহার সহিত ঘর্ষণ ত আছেই। এক বার সরিষার তেল রান্নার জন্য গরম করিলে যে-অবস্থা হয় কলের সদ্যঃপ্রস্তুত তেলের সেই অবস্থা—বরঞ্চ খারাপ, কেননা কেবল তাপ নয়, লোহার ঘর্ষণেও তেলের বিকার হইয়া থাকে। ফলে, কলের ঘানির সরিষার তেল যখন খাঁটি সরিষা হইতেও হয়, তখনও কুটীর-ঘানির তেল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও বিস্বাদ হয়। কলের ঘানর খাঁটি তেল গ্রাম্য ঘানর খাঁটি তেলের সমপর্য্যায়ে পাড়তে পারে না—উহা নিকৃষ্ট জিনিষ।

কিন্তু কল এত দ্রুত ঘানি চালাইয়াও কলুকে মারিতে পারিত না, যদি না ভেজালের আশ্রয় লইত। কলের সরঞ্জাম ও চালাইবার ব্যয় অনেক। আর এদিকে কুটীরে কলুর স্ত্রীই অনেক সময় গৃহকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ঘানি চালায়, কলু কেনা-বেচা করে ও স্ত্রীকে সাহায্য করে। কুটীর-ঘানি নিতান্তই আটপৌরে ঘরোয়া জিনিষ। শান্তভাবে বিনা ঝঞ্জাটে বিনা হট্টগোলে গৃহস্থের গৃহচর্য্যার সহিত খাপ খাইয়া চলে। এই জন্য একটা ছোট কলে পঞ্চাশ-ষাটটা ঘানি এক সঙ্গে চলিলেও এবং তাহা গ্রাম্য তিন শত ঘানির সমান হইলেও উহার খরচা বেশী। প্রতিযোগিতায় গ্রাম্য ঘানির কষ্ট হইলেও গ্রামে বসিয়া গৃহব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া গরুর খোরাকী ছাড়া এক প্রকার একই খরচায় চালান যায় বলিয়া গ্রামে উহা আজও চলিতে পারে।

এক্সপেলার কল

ঘানির উপর, কলের ঘানির উপর, একটা আক্রমণ আসে এক্সপেলার (Expeller) দ্বারা। এক্সপেলার অল্প সময়ে খুব বেশী সরিষা ভাঙাইতে পারে। উহা একটা খোল বদ্ধ স্ক্রুর মত জিনিষ। এক দিকে সরিষা লইয়া অপর দিকে ঠেলিয়া খইল করিয়া বাহির করিয়া দেয়। খোলের মধ্যে চাপে চাপে সরিষা হইতে তেল ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ইহাতে সরিষা আরও গরম হইয়া উঠে, লোহার ঘর্ষণও খুব বেশী হয়। উহার তেল এত নিকৃষ্ট হয় যে কলের তেল বলিয়াও উহা লোকে লইতে

নারাজ হয়। সরিষার তেল বাহির করিতে এক্সপেলার চলিল না। এখন উহা কলের ঘানির সহিত প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া মিত্রতা করিয়াছে। কলের ঘানিতে যে খইল বাহির হয় উহাতে অতি সামান্য তেল থাকে। এক্সপেলার এই খইলটা চিবাইয়া শেষ-তেলটুকু বাহির করিয়া ছাড়ে। এক মণ খইল হইতে এক সের তেল বাহির হয়। কেহ কেহ কল-ঘানির কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য কতকটা বেশী তেল খইলে রাখিয়া দেয় ও পরে এক্সপেলারে চাপিয়া বাহির করিয়া ঐ তেল-ঘানির তেলের সহিত মিশাইয়া দেয়। কিন্তু তেল-ব্যবসায়ে এক্সপেলারের ব্যবহার আর একটা নূতন অসাধুতা আনিয়াছে। এক্সপেলারের খইল দেখা মাত্রই চেনা যায়। উহার মূল্য কলের ঘানির খইল হইতেও কম, উহা লোকে গরুকে খাওয়াইবার জন্য লয় না, সারের জন্যই উহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কলওয়ালাকে উহা হইতে ঘানির খইলের দামই তুলিতে হইবে। সে ঐ কাঠের মত খইল ডিসিন্টিগ্রেটারে গুঁড়াইয়া লয় এবং সেই গুঁড়ার সহিত কতকটা ঘানির খইল ও গাদ মিশাইয়া জলের ছিটা দিয়া পুনরায় ঘানিতে চাপিয়া বাহির করে ও কলের ঘানির খইল বলিয়া বিক্রয় করে।

দেখা যাইতেছে কলের প্রতিযোগিতায় যে-ভাবে ঘানি মরিতেছে সে-ভাবে তাহার মরা অবশ্যম্ভাবী নয়। তথাপি যে মরিতেছে তাহার কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলের ভেজাল দেওয়ার প্রবৃত্তি ও সুবিধা। যদি ভেজাল বন্ধ হইত তবে কুটীর-ঘানিগুলি বাঁচিত।

কুটীর-ঘানি চলিতে পারে

কুটির-ঘানিগুলিকে বাঁচাইতে হইলে কলুকে নির্ভরযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বাসী মধ্যস্থ দ্বারাও এ-কাজ হইতে পারে। আর একটি বিষয় এই যে সকল ঘানি সমান কাজ দেয় না। ঘানির গঠন জেলায় জেলায় ভিন্ন। ভালমন্দ বিচার করিয়া একটা গ্রহণযোগ্য ঘানি আদর্শরূপে লইলে, যে-স্থানে খারাপ ঘানি চলিতেছে সে-স্থানে প্রভূত উপকার হইবে। আমি এমন ঘানি দেখিতেছি যাহাতে দিনে পনর সের মাত্র সরিষা ভাঙান হয়—আবার অন্যত্র দেখিতেছি, সামান্য প্রভেদের জন্য সেই প্রকার ঘানিতে দিনে ত্রিশ সের হইতে চল্লিশ সের সরিষা ভাঙান হয়। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে এই অধিক সরিষা যে-ঘানিতে ভাঙান হয় তাহাতেও উন্নতির অবকাশ আছে।

খাদি-প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েকটা কুটীরশিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। ঘানি তাহার মধ্যে অন্যতম। বিশ্বাসী মধ্যস্থের কার্য্য, অর্থাৎ কলুদ্বারা সরিষা ভাঙাইয়া খাঁটি তেল ক্রেতাকে দেওয়ার কার্য্যও খাদি-প্রতিষ্ঠান হইতে চলিতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকখানা গ্রামে পুরাতন অচল ঘানিগুলি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকের মন যদি জাগ্রত হয়, যদি কুটীরে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ জিনিষের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া আসে তবে ঘানি পুনরায় বাঁচিতে পারে। গ্রামে বিশ্বাসী মধ্যস্থের কাজ শিক্ষিত বেকার যুবকেরা করিতে পারে, যদি চরিত্রবলের সম্পদ ও খ্যাতি তাহাদের থাকে। ঘানি তাহা হইলে সহজেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়া পল্লীকে কতক অংশে শ্রীমণ্ডিত করিতে পারে। কুটীর-ঘানিকে পরাজয় করার মত কল আজও আবিষ্কৃত হয় নাই, ঘানির বাঁচার পক্ষে ইহা একটা বড় কথা।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৪৩

পরদিন সকালবেলা কমল হাসপাতালে ফিরে গেল। ঝড়ের পর একটা ক্ষতমজ্জা বনস্পতির যেমন একরকম ভগ্ন-শাখা ছিন্নপত্র বিধ্বস্তপ্রায় চেহারা হয় তার মনের ভিতরটাও কতকটা তেমনি স্রস্ত শিথিল বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যাবার সময় সে মালতীকে গিয়ে বললে, "দিদি, আমি এসেছিলাম সংসারে শুধু দুঃখ ছড়াবার জন্যে। নিরুপায়ে তোমার পায়ে না-জেনে অনেক অপরাধ করেছি—ক্ষমা ক'রো। খোকনকে দেখো। তুমি ছাড়া···"

এইটুকু বলে আর সে সামলাতে পারলে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

মালতী তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে অশ্রুমুখী হয়ে বললে, "তোমার ভাল করবার ছুতোয় যারা তোমার সর্ব্বনাশ করার ফিকির করে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আর অপরাধ বাড়িও না, বোন। আমি বেঁচে থাকতে খোকনের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না—।"

কমলা গড় হয়ে মালতীর পায়ে প্রণাম করতে করতে বললে, "তা জানি, খোকনের তুমি এই হতভাগী মার চেয়েও যে বেশী তা জানি বলেই আজ বুকটা বাঁধতে পেরেছি দিদি—"

কমলা পায়ে হাত দেওয়ায় মালতী যেন অপরাধ-ভয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, "ও কি ভাই! অপরাধ হবে যে! ষাট্ ষাট্।" বলে কমলাকে ধরে তুললে। কোন্ যুক্তিতে বলা কঠিন, কিন্তু মালতীর মনে কেমন একটা অন্ধ বিশ্বাসই ছিল যে জ্যোৎস্না বামুনের মেয়ে।

বাইরে ভগলু গাড়ী এনে অপেক্ষা করছিল। কমলা চোখের জল মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়ল। বুকটা ফেটে গেলেও, পাছে তার মনে কোন রকম দুর্ব্বলতা এসে তার অন্তরের কঠিন সংকল্প থেকে তাকে বিচ্যুত করে, এই ভয়ে খোকার কোন তত্ত্ব সে করলে না। প্রাণ থাকতে এ-বাড়ীতে সে যে আর পদার্পণ করবে না এ-সম্বন্ধে কাল সমস্ত রাত্রি প্রতিজ্ঞা ক'রে কঠিন পণে নিজের চিত্তকে সে প্রস্তুত করেছে না?

জ্যোৎস্নার দুঃখপীড়িত অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানা মালতীর মনটাকেও অশ্রুভারাক্রান্ত ব্যথিত ক'রে তুললে। স্বামীর উপর রাগে বিরক্তিতে মনটা তার তেতো হয়ে উঠল। তবু কমলা যে খোকনকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে না গিয়ে তারই কাছে রেখে গেল তাতে তার মনটা আপাতত একটা দুর্ভাগ্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জ্যোৎস্নার প্রতি যেন কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তার মধ্যে খোকনের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনাই তাকে বিচলিত করেছিল সব চেয়ে বেশী। সেই চাপা ভয়ের অবরুদ্ধ বেদনার বাষ্প মুক্তি লাভ করতেই মালতীর মন হাল্কা হয়ে নন্দলালের দুষ্ক্রিয়ার প্রতি উদ্যত হয়ে উঠবার অবসর পেল যেন। মনে মনে রেগে বললে, "আসুক না একবার, টের পাওয়াব'খন মজাটা।" কিন্তু 'মজা টের পাওয়াবার' খদ্দেরের দেখা পেলে ত? নন্দলালের নাগাল পাওয়া মালতীর অসাধ্য হয়ে উঠেছে। বাড়ীমুখো যদিই বা সে হয়, তাও গভীর রাত্রে, নিতান্ত চোরের মত। বাইরে বৈঠকখানার ঘরে কোন মতে রাতটা কাটায়—কি কাটায় না, এমনি ভাব। সেদিন রাত্রে মাংসলোলুপ যে নেকড়ে বাঘটা ওর অন্তরের গুহার অন্ধকারে ব'সে ওর চোখমুখ দিয়ে উঁকি মারছিল তার আহত পুচ্ছের ডগাটুকুও আজ আর নজরে পড়ে না। তার জায়গায় যেন বাসা বেঁধেছে একটা হাঁড়িচোরা মেনী বেরাল—ওর মুখ দেখলে তাই মনে হয়।

রেগেমেগে মালতী ক দিন নন্দর কোন খোঁজখবর নিলে না। অবশ্য, নন্দলালের পক্ষে সেটা নিতান্তই যে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নয়। তাকমত কেমন ক'রে মালতীর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বেড়াবে সেইটেই ছিল তার চেষ্টা। মালতীর তরফ থেকে একটা বিপ্লব

সে যেন মনে মনে আকাঙ্ক্ষাই করছিল। তার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে একটা আকস্মিক ভূমিকম্পের আঘাতে ভেঙে পড়া সংসারের ভগ্নস্তূপের মধ্যে কল্পনা ক'রে মনে মনে তার আর স্বস্তি ছিল না। জ্যোৎস্নার উপর অকারণেই তার রাগ হতে লাগল। কোনো একটা কৈফিয়ৎ জুটিয়ে নিয়ে মালতীর কাছে যে সে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাবে তারও দুঃসাহস কিছুতেই সংগ্রহ ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

কাজের উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে উৎসাহ বিহীন গর্দ্দভের মত তার ভারাক্রান্ত দিবসগুলিকে টেনে সে মলিন বেশে রুক্ষকেশে বাইরে বাইরে ঘুরে কাটিয়ে দিতে লাগল। বেচারা নিজে একটু শিথিলপ্রকৃতির মানুষ; তাতে আবার নিজের নিত্য প্রয়োজনের তাগিদগুলো পর্য্যন্ত মালতীর সতর্ক দৃষ্টির শাসনে নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার বহুদিন ধরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নিজের সেবাযত্ন পারিপাট্যের নিপুণতা তার ছিল না। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই নিতান্ত অসহায় অবোধের মত সে অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সত্যই বড় কাতর হয়ে পড়ল। অনাহার-অর্দ্ধাহার-অনিদ্রা-অস্নান-জনিত অত্যাচারে নন্দর অবস্থাটা শত্রুরও অকাম্য হয়ে পড়েছে, এবং এত দিন পরে এবার তার নিজের দুষ্ক্রিয়ায় নিজের উপর প্রায় একটা অকপট বিরক্তি এবং অনুতাপে তার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে করতে লাগল যে না-হোক একটা দুর্ব্যবহার ক'রে মালতী ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলুক। মালতীর কি দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই? যদি তার একটা শক্ত অসুখ হয়? একটা অসুখ-বিসুখ করলে যে মালতী উদাসীন থাকতে পারবে না তা একরকম সে নিশ্চয় জানত; এবং একাগ্রচিত্তে সে দেবতার কাছে অন্তত একটা কঠিন পীড়ার জন্য মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল।

ক্রোধের প্রথম উত্তেজনাটা কেটে গেলে, দু-চার দিন পর থেকে বেকার মালতীর দৃষ্টি নন্দলালের দশাটার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। গোপনে গোপনে নন্দলালের ভাবখানা দেখে তার কেমন মায়া হ'তে লাগল। বস্তুত নিঃসন্তান মালতীর জীবনটা শিশু অজয় এবং নাবালক নন্দলালের পরিচর্য্যার মধ্যে ভাগাভাগি করা ছিল এবং ব্যবসাপটু নন্দলালের নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অপটুতা বা নাবালকত্ব তার মাতৃহৃদয়কে বিচলিত এবং প্রশ্রয়প্রবণ ক'রে তুলেছিল। যদিচ সূক্ষ্ম মানসিক তুলাদণ্ডে নন্দলালের চরিত্রগত অবনতি পরিমাপ ক'রে তার দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করবার মত নৈতিক ঘৃণা অশিক্ষিতা স্নেহপ্রবণ মালতীর চিত্তে বিশেষ ক'রে জাগে নি, তবু আজ তার মন নন্দলালেরই অপরাধের লজ্জায় তার কাছে সহসা গিয়ে সোহাগের শাসন প্রয়োগ করতে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করছিল তাতে সন্দেহ নাই। নন্দলালের বেয়াড়াপনায় সে চটেছিল কম না। হাতে পেলে একচোট নন্দলালের ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে দেবার কল্পনায় মনে মনে যখন তখন সে কোমর বাঁধছিল তাও বটে; তবু নন্দর অপরাধ তার কাছে বেয়াড়াপনার বেশী আর কিছু নয়। অসচ্চরিত্র স্বামীর অধঃপতনজনিত পত্নীবিমুখতার সর্ব্বনাশ কল্পনা ক'রে সমস্ত জগৎ এবং নিজের তাবৎ ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন শূন্যময় দেখে, নিজের প্রতি পরমকরুণায় অসহায় অশ্রুবর্ষণে অনন্যকর্ম্মা হয়ে উপাধান সিক্ত করার কথা তার মনে হয় নি। বরং দু-চার দিন যাবার পর এই লুকোচুরির মধ্যে নন্দলালের এই গরুচোরের মত গোপন সঞ্চরণের ছবি মালতীর স্বভাবহাস্যপ্রবণ চিত্তে যেন একটু কৌতুকের আমেজই লাগিয়েছিল। তার স্থূল দেহটিকে বস্ত্রাবরণে সম্বৃত ক'রে নিয়ে কারণে-অকারণে সে বৈঠকখানার পথে যাতায়াত করতে লাগল। অকস্মাৎ অসময়ে গিয়ে দরজা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দিনে দশবার দেখে নিলে কোন স্পর্দ্ধাবান ঘরে প্রবেশ করছে কি না। মালতীর মনের ভাবখানা এই—"আ মর মিন্‌ষে! রকম দেখ না! পরের মেয়ে ঘরে এনে বদখেয়ালী করবার বেলা মনে থাকে না! ঝাঁটা মেরে সমান করলে তবে গায়ের ঝাল মেটে। না-নেয়ে না-খেয়ে আবার ঢং ক'রে সং সাজা হচ্ছে! মরুক গে; কথাটি কইছি নে আমি, হ্যাঃ! বয়ে গেছে আমার সাধাসাধি করতে—" ইত্যাদি।

আরও দুচার দিন না যেতেই মালতীর সাধাসাধি না করার ধরণটা কিছু উগ্র আকারেই তার ভৃত্যকুলের উপর বর্ষিত হ'তে সুরু হ'ল। মা-ঠাকরুণের তাড়া খেয়ে বেচারারা দুপুর রাত পর্য্যন্ত ওৎ পেতে সাবান গামছা তেল খাদ্য এবং অখাদ্য নিয়ে নন্দলালকে আক্রমণ করতে সুরু ক'রে দিলে। পায়ের উপরে পা দিয়ে ব'সে ব'সে মাইনে গেলবার জন্যে সত্যিই ত তাদের আর রাখা হয় নি; বাবুর

নাওয়া-খাওয়া কি একটুও দেখতে পারে না তারা। কাজ ফাঁকি দেবার যম সব!

এর পর অনুতপ্ত নন্দলালের দাম্পত্য মিলনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এল এবং অত্যন্ত নিরীহ বালকের মত মালতীর শাসন এবং পরিচর্য্যায় সে আত্মসমর্পণ করলে। তাদের সংসারযাত্রা আবার কতকটা স্বাভাবিক হয়ে এল—কেবল অজয়কে মালতী আর পারতপক্ষে তার মেসো-মশায়ের ত্রিসীমানায় যেতে দিলে না। নন্দ যে তাকে সুনজরে দেখবে না মালতীর মনে এমনই একটা শঙ্কা, কেন জানি না, বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল।

নন্দ অবশ্য জ্যোৎস্নার নাম আর মুখে আনলে না, এবং মালতীকে প্রসন্ন করতে খোকার জন্যে নিত্য নূতন মনোহরণ খেলনা পোষাক প্রভৃতি এনে হাজির করতে লাগল।

মালতী বলে, "এ আবার কি আদিখ্যেতা সুরু করলে?"

নন্দ মালতীর দুর্ব্বল মনকে স্পর্শ ক'রে বলে, "ঐ ত একটু হাসি সোহাগ করবার সামগ্রী আছে—আর আমাদের কি আছে বল ত।"

নন্দর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সজল নয়নে মালতী বলে, "ষাট্ ষাট্।"

৪৪

হাসপাতালে ফিরে গিয়ে অসুস্থতা সত্ত্বেও কমল নিজেকে কাজ এবং পড়ার মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। চিন্তার ভার আর যেন সে বইতে পারে না। কোন মতে নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিকে মন থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হবে এই যেন তার পণ। একলা নিজের দুঃসহ সমস্যার সমাধান-চেষ্টা তার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মনে মনে চাইছে সে সহৃদয় নিখিলের শান্ত প্রভাব—যে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে এবং সহানুভূতি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু নিখিলনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে আজকাল। কখন যে সে বাড়ী থাকে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। হাসপাতালের কাজটুকু ছাড়া আর অধিকাংশ সময়ই সে বাড়ী থাকে না। বারংবার দরোয়ান পাঠিয়েও অবসর সময়ে নিখিলের কামরায় তার সন্ধান পাওয়া গেল না। হাসপাতালের কাজে অবশ্য সে কোনদিনই অনুপস্থিত থাকে নি। কিন্তু তখন এক মুহূর্ত্তও তাকে একান্তে পাওয়া দুষ্কর—যাতে অন্যের অগোচরে কমল তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারে। ফিরবার পর প্রথম দিনই তার সঙ্গে কমলের সাক্ষাৎ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কতক্ষণই বা।

"ও কি! আপনি আজই ফিরলেন যে? ভাল আছেন ত?"

ভাল যে সে নেই এমন স্পষ্ট ক'রে তার মুখের চেহারায় তার ছাপ কোন দিনই পড়ে নি। অন্য সময় হ'লে এই পীড়িত ক্লিষ্ট চেহারা নিখিলনাথের দৃষ্টি এড়াত না। কিন্তু আজ তার নিজের চিত্ত ছিল অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত। এই প্রশ্নটুকু মাত্র ক'রে তার উত্তরের জন্যও সে আজ বিশেষ আগ্রহ করলে না। কমলের পীড়িত ক্ষত চিত্তে যে তা অভিমানের সৃষ্টি করে নি তা নয়—কিন্তু তার বড় আবশ্যকের প্রয়োজনে সে-অভিমান তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠবার অবকাশ পেল না।

সন্ধ্যার সময় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় কমলা দরোয়ানের হাতে একটা চিঠি দিয়ে নিখিলনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দরোয়ান ফিরে এসে সংবাদ দিলে যে 'সাব' ঘরে নেই। হতাশ হ'য়ে সে শয্যা নিলে।

অনেক রাত্রে ফিরে নিখিল যখন কমলার চিঠিখানা পেল তখন সকালে হাসপাতালে তার অত্যন্ত ক্লিষ্ট যে মুখখানা তার মনোযোগ জাগিয়ে তুলতে পারে নি সেটা মনে পড়ে তার নিজের এই অন্যমনস্কতার জন্যে তার মনে লজ্জা অনুভব করলে এবং তখনি জ্যোৎস্না দেবীর তত্ত্ব করবার জন্যে নার্স-কোয়ার্টার্সে চলে গেল।

নিখিলনাথ গিয়ে যা দেখলে তাতে এতক্ষণ জ্যোৎস্নার কোন সংবাদ নিতে পারে নি বলে তার একটু লজ্জা হ'ল। কমলের মাথার যন্ত্রণা বেড়েছিল খুবই, তার সঙ্গে জ্বরের ধমকে সে প্রলাপ বকে চলেছিল। নিখিল গিয়ে দেখলেন যে তার যাওয়ার পূর্ব্বে দু-জন জুনিয়র ডাক্তার সেখানে

গিয়েছে এবং মোটামুটি তার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছে। নিখিল গিয়ে রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে তার কামরায় ফিরে গেল। অল্প কিছু আহার এবং বিশ্রাম ক'রে নিয়ে শোবার আগে সে আর একবার কমলকে দেখতে এবং রাত্রের মত শেষ ব্যবস্থা দিয়ে আসবার জন্যে নার্স-কোয়ার্টার্সে ফিরে গেল। জুনিয়ররা তখন বিদায় নিয়েছে।

কমলার ঘর আবৃত ল্যাম্পের উদ্বৃত্ত আলোকে অন্ধকারপ্রায়। কমলা দ্রুত ও অস্ফুট উচ্চারণে প্রলাপ বকছে মাঝে মাঝে। খানিক ক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ এক সময় তার মনে হ'ল যে জ্যোৎস্নার প্রলাপের মধ্যে থেকে দু-একটা কথা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার মনে যে কোন গুরুতর ক্লেশের কারণ সম্প্রতি ঘটেছিল নিখিলের এ সন্দেহ পূর্ব্বেই হয়েছিল। তবু কৌতূহল প্রকাশ ক'রে সে জ্যোৎস্নার আরও দুঃখের কারণ হবে ভেবে চুপ ক'রে ছিল। আজ রোগিণীর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে এই স্তব্ধ কর্ম্মশূন্য অন্ধকারে তার নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কৌতূহলে সে অল্প একটু কাছে সরে এসে দাঁড়াল। তার পর ষ্টেথস্কোপটা নিয়ে বুক পরীক্ষার জন্যে সে নীচু হয়ে শুনলে। দু-একটা কথা সে যেন স্পষ্টই শুনতে পেলে—কিন্তু তার একটার সঙ্গে অন্যটার কোন যোগাযোগ করতে পারলে না। বক্ষ-পরীক্ষা কিছু আর বেশীক্ষণ চলে না। বিন্দু বসেছিল বরফের ব্যাগ মাথায় দিয়ে। নিখিল একটু গম্ভীর মুখে তাকে বললে, "যাও, দুটো হট্-ওয়াটার-ব্যাগ তৈরি ক'রে আন।"

বিন্দু নিখিলের মুখ দেখে একটু ভয় পেল, বললে, "সরোজিনীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।"

নিখিল বললে, "না তার দরকার নেই। সরোজিনীকে দুঘণ্টা পরে ডেকো। আর দুঘণ্টা ক'রে এক-এক জন থেকো। যাও, আমি বসছি একটু।"

বিন্দু ব্যাগ আনতে চলে গেল। নিখিল শুনতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রলাপের কথা প্রায় শোনা যায় না। একবার যেন মনে হ'ল শুনতে পেলে "ভোলাদা খোকাকে ধর।" আর একবার "উঃ কত হাতী।" এই রকম দু-একটা কথা পরস্পর নিতান্ত সঙ্গতিশূন্য। বিন্দু এলে পায়ে গরম এবং মাথায় ঠাণ্ডা দিতে উপদেশ দিয়ে একরকম হতাশ হয়েই সে ফিরে এল।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই কমলের জ্বর ছেড়ে গেল। আরও দু-তিন দিন পরে নিখিলনাথ কোন সুযোগে কমলকে জিজ্ঞেস্ করলে, "ভোলাদা ব'লে আপনার কোন আত্মীয় আছেন?"

কমলা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

নিখিল বললে, "প্রলাপে আপনি তাঁর নাম করেছিলেন। মাপ করবেন আমার কৌতূহলের জন্যে।"

কমলা সঙ্কুচিত হ'য়ে বললে, "না না, আপনি মাপ চাইবেন না।" এবং প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেললে, "আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। দয়া ক'রে যদি একটু সময় করতে পারেন।···এখানে ত বলা হবে না।"

যদিও তার অনুমান করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তবু কেন জানি না, এই অনুরোধে নিখিল যেন বিস্ময় অনুভব করলে না। সে যেন কোন দিন এমনি একটা অনুরোধের জন্য মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। বললে, "আচ্ছা, ভাল হয়ে উঠুন। সে বন্দোবস্ত করব। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি দেন নি।"

কমলা বললে, "কি জানি আমার কি মনে পড়ে না। আর কিছু বলি নি?" তার মনে মনে ভয় হ'ল নন্দলালের কথার কিছু উল্লেখ করেছে হয়ত বা, এই মনে ক'রে।

"বলেছিলেন, ভোলাদা খোকাকে ধর। আর এক বার বলেছিলেন, উঃ কত হাতী।"

কমলা অকস্মাৎ ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে। নিখিল অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "ছিঃ কাঁদবেন না। না জেনে আপনাকে হয়ত দুঃখ দিয়েছি—"

"না না, তা নয়; আমি যে কিছুতে মনে আনতে পারছি নে। অথচ কিছুই ত ভুলি নি আমি···" বলে কান্না থামাবার চেষ্টায় ক্রমাগত সে চোখ মুছতে লাগল।

এই কথায় নিখিল একটু অবাক হ'ল। কথা যেন ধাঁধার মত। জ্যোৎস্নার জীবনে যে কোন দুঃখের ইতিহাস তার সমস্ত অস্তিত্বের মাঝখানে ছায়াপাত ক'রে তার জীবনের স্বাভাবিক আনন্দের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে—এমন সন্দেহ নিখিলের মনে পূর্ব্বে অনেকবারই

হয়েছে ; এবং তারই জন্ম কমলের প্রতি স্বাভাবিক করুণায় তাকে নানা ভাবে সাহায্য ক'রে এসেছে। কিন্তু আজকের কথায় তার মনটা যেন একটা গভীর রহস্যময় সুগভীর বেদনার ইতিহাসের আভাস পেয়ে মনে মনে শুব্ধ হয়ে রইল।

সেদিন আর কোন কথা হবার অবসর হ'ল না।

* * *

কমল নিজের দুঃখের ইতিহাস একটু একটু ক'রে নিখিলনাথকে ব'লে গেল। কাল সমস্ত রাত সে নিজের সঙ্কোচটুকু দূর করবার জন্যে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত ক'রেছে। নইলে তার হতাশার শেষ আশার দীপটুকুও নিবে যায় যে। তবু প্রথম প্রথম তার মনে সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। কিন্তু নিখিলনাথের কৌতূহলবিহীন সম্ভ্রমপূর্ণ সহানুভূতির সহৃদয়তায় ধীরে ধীরে তার সঙ্কোচের বাধা অন্তর্হিত হয়ে তার মনে সে এমন একটা আশাপূর্ণ স্বচ্ছন্দ লঘুতা অনুভব করতে লাগল যে নন্দলালের চরম দুর্ব্যবহারের কাহিনী বলাও তার পক্ষে সহজ হয়ে এলো। তার মনের গ্লানি যেন অপসারিত হয়ে গেল এবং বিস্ময়ের সঙ্গে সে নিজেকে অনেকখানি সুস্থ বোধ করতে লাগল। অজয়ের প্রতি মালতীর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের কথা বলতে বলতে চোখ তার শুষ্ক রইল না ; এবং এই অশ্রুজলে অভিষিক্ত পরম বিস্ময়কর করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে নিখিলনাথ ক্ষণকালের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে কমলের একখানি হাত ধরে বললে, "মানুষের সাধ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তোমার দুঃখ মোচন করবার ক্ষমতা আমার হবে কিনা জানি না, তবু আমাকে তোমার নিজের বড় ভাই বলে জেনো। তোমার স্বামীর অনুসন্ধানে আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। নন্দলাল কোন কারণে তোমার মনের শান্তি যাতে নষ্ট না করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করব।" বলে সে উঠে দাঁড়াল।

অনেক কাল পরে আনন্দিত স্বচ্ছন্দ মনের স্বস্তিপূর্ণ হাসি কমলের মুখে ফুটে উঠল। এখনি যেন তার দুঃখের অনেক-খানি অবসান ঘটেছে এমনি একটা নিরাময় শান্তির আভাস তার মনে অবতীর্ণ হ'ল এবং কৃতজ্ঞচিত্তে অবনত হয়ে সে নিখিলের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

"ছি ছি, ও কি," বলে নিখিল এক পা পিছিয়ে গেল। মনটা তার স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

নিখিলনাথ চিন্তাকুল চিত্তে তার খাসকামরায় ফিরে গেল। কমলের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী তাকে বিস্মিত করেছিল সত্য, কিন্তু তার মনের যে চিন্তা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তার চিত্তকে সম্প্রতি উন্মনা করে রেখেছিল এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। নন্দলালের দুশ্চিন্তা থেকে কমলকে কোন মতে নিরাপদ করতে পারলে আপাতত যেন কমলের প্রতি তার কর্ত্তব্য সমাধা হয়।

অনেক চিন্তার পর, অধিকাংশই তার মধ্যে কমলের কথা নয়, সে কমলকে অধুনা অনিন্দিতা দেবীর নারীভবনে নিয়ে রেখে আসতে মনস্থ করলে। পরীক্ষার আর অল্পদিনই বাকী ছিল। এই সময়টুকু কোনমতে অতিক্রম করতে পারলে কমলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার পথ সুগম হয়ে আসবে।

কমলকে অনিন্দিতা দেবীর নারীভবনে রাখার চিন্তার মধ্যে তার কি কিছু উদ্দেশ্য ছিল ? সীমা তার কথায় যে হিংসার পথ থেকে ফিরবে না সে সম্বন্ধে তার মনে আর সন্দেহ-মাত্র ছিল না। বরং ক্রমে তার মনে এই ধারণাই একটু বদ্ধমূল হচ্ছিল যে তার আগ্রহ সীমাকে যেন ক্রমেই কঠিন ক'রে তুলছে। অবশ্য, এ-ধারণা তার ব্যর্থ হৃদয়ের অভিমানপ্রসূতও হতে পারে। নরনারীর আকর্ষণ-জনিত দুর্ব্বলতা সীমার দীপ্ত মনের পক্ষে কি হেয় ? তার অন্য নাম কি তার কাছে দেশদ্রোহিতা ? নিখিলনাথের প্রেমার্ত্ত চিত্তের উৎকণ্ঠা যেন তার কাছে উপহাসের সামগ্রী। তবে সে কি করবে ? কেমন ক'রে সীমাকে সে আগুনের মোহ থেকে বাঁচাবে ? এই চিন্তায় কিছুকাল যাবৎ তার চিত্ত আকুল হয়ে ছিল। আজ যেন সে নূতন ক'রে একটা পথের সন্ধান পেল। জ্যোৎস্নার শান্ত স্থির বুদ্ধির আকর্ষণে সীমা যদি ক্রমে ধরা দেয়। যদি জ্যোৎস্নাকে তার সমস্ত যুক্তিতর্কে সুসজ্জিত ক'রে ধীরে ধীরে সীমার উত্তপ্ত চিত্তকে শান্ত ক'রে আনতে সমর্থ হয় তা হলে সত্যবানের আদেশ প্রতিপালন করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে। এমন কি—কিন্তু হায় অতটা দুরাশা সে করবে কোন্ দুঃসাহসে ?

পরদিন দুপুরবেলা সে কমলাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টার

জন্যে বাইরে চ'লে গেল এবং সীমার যথাসম্ভব ইতিহাস তাকে ব'লে, বললে, "জ্যোৎস্না, তোমার দুঃখ অপরিসীম, এমন কি হয়ত দুরপনেয়। কিন্তু তার ভিতর তোমার জীবন্ত প্রেমের পরিপূর্ণ উৎস গভীর বিরহের মধ্যেও তোমার হারানো স্বামীর নিবিড় অস্তিত্বের অনুভূতিতে তোমাকে সঞ্জীবিত রেখেছে। কিন্তু যে-নারী তার নারীত্বের সমস্ত মাধুর্য্য সমস্ত সৃষ্টিশক্তির অপরিমেয় কল্যাণকে অস্বীকার করে তার অনন্যসাধারণ মহিমাকে ধ্বংসের আগুনে ছাই ক'রে পুড়িয়ে ফেলতে চলেছে তাকে উল্কার বহ্নিলীলার মত ব্যর্থ হয়ে যাবার সর্ব্বনাশ থেকে তুমি বাঁচাও।"

কথা শুনতে শুনতে কমলের বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভাবে, 'অপদার্থ আমি, আমাকে কি এই বিশ্বাস, এই নির্ভর সাজে?' নিখিলনাথের এমন অস্থিরতা সে কোনদিন দেখে নি। ভাবে 'এ কি শুধু তাঁর গুরুর আদেশ প্রতিপালনের আগ্রহ।' ভাবে, 'আমি কতটুকুই বা, আমাকে দিয়ে যদি কোন কাজে লাগিয়ে নিতে পারেন তাতেও আমার জীবন ত কিছু পরিমাণ সার্থক হবে।' মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, "আমাকে আপনি চালিয়ে নেবেন। জগতে যদি এতটুকু কাজে আসতে পারি তবু আমার বেঁচে থাকার কতকটা সান্ত্বনা পাই।" ব'লে সে চুপ ক'রে ভাবে, সে কেমন মেয়ে না জানি, ওঁর মত লোককেও যে এমন ক'রে বিচলিত করতে পেরেছে।

পরদিন নিখিল কমলকে নিয়ে নারীভবনে রেখে এল।

সীমার শ্যামশ্রীর সেই স্বতোদীপ্ত উজ্জ্বলতা যেন ম্লান হয়েছে। তার মুখে তার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ঘনায়মান করাল মেঘের ছায়া। তার চোখের বিদ্যুৎদীপ্তি, নেপক্ষ্মজালের অন্তরালে, যেন সংশয়াচ্ছন্ন দুরাশায় রহস্যময়। নিখিলনাথ তার এ-রূপ কখনও দেখে নি। ইস্পাতের তরবারির মত সীমার যে-রূপ তার মুগ্ধ চিত্তের উপর উদ্যত ছিল আজ তার সেই বিদ্যুৎহাস্যমুখরিত শ্লেষতীক্ষ্ণ দ্যুতি কিসের ছায়াপাতে যেন দীপ্তিহীন। অকারণ বেদনায় নিখিলের চিত্ত পীড়িত হ'তে লাগল। তবু সে সীমাকে তার বিপদের তার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না। তার প্রগলভতার জন্যে সীমা ক্রুদ্ধ হবে এই ভেবে নয়; কোন্ দুশ্ছেদ্য চক্রান্তজাল কোন্ ভীষণ অনুষ্ঠান এবং কোন্ ভীষণতর ক্রূরতর হিংস্রতার পরিকল্পনার মধ্যে তাকে রক্ষার অতীত ভাবে জড়িত দেখতে পাবে এই দুর্ব্বিষহ আতঙ্কে।

অল্পক্ষণ—সময় এক মিনিটও নয়, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা বিরাট কালের ইতিহাস, মানবচিত্তের সুখদুঃখের বিচিত্র আন্দোলনে তাদের দুই জনের চিত্ত মথিত হ'তে লাগল। নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ ক'রে নিতে সীমার বিলম্ব হ'ল না। কমলাকে নমস্কার ক'রে, নিখিলকে একটু বসতে ব'লে সে তাকে মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত করতে ভিতরে নিয়ে গেল। যখন সে ফিরে এল তখন সেই ছায়া তার মুখ থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে। নিখিল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। সীমা সেই চাহনিটুকু অগ্রাহ্য ক'রে বললে, "এখন পরিচয় দিন।"

সীমাকে কমলের ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে, নিখিলনাথ চলে আসবার সময় সীমাকে জিজ্ঞেস করলে, অর্থের তার আবশ্যক আছে কি না।

মুহূর্ত্তকাল চুপ করে থেকে সীমা বললে, "দেখুন, অর্থের প্রয়োজন আমার অনেক। কিন্তু আপনাকে বঞ্চনা ক'রে অর্থ নিতে আমি পারব না। দেশের প্রয়োজনে লোককে বঞ্চিত ক'রে তাদের আহৃত অর্থ গ্রহণকে যে উচিত মনে করি তা ত আপনাকে বলেছি, তবু বঞ্চনা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করতে আমারও মনে বাধে এখনও। তা ছাড়া অকারণে এর মধ্যে আপনাকে আমি জড়াতে চাই নে। আমার সেদিনকার ধৃষ্টতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার দয়ার কথা আমি ভুলব না। কিন্তু আপনার উপদেশে চলবার রাস্তা আমার খোলা নেই।" সীমার শেষ কথাগুলিতে আশার ক্ষীণ আলোক নিখিলের মনের মধ্যে একটুখানি পথের সন্ধান এনে দিলে যেন। আগ্রহের সুরে একটু অনুনয় মিশিয়ে সে বললে, "কেন নেই?"

"সে কথা বলবার যদি কোনদিন অবসর পাই ত বলব। আজ আমার সে কথা বলবার সময় আসে নি। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার দেখানো পথ আমার পথ হবার যো নেই। এইটুকু মাত্র আজ আপনাকে জানাতে পারি।" বলে কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে যেন একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে,

"জ্যোৎস্না দেবীর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখানে তার কোন অসুবিধা হবে না।"

সীমার এই কথাগুলির মধ্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত যে সুরটি তার কানে পৌঁছল তাতে তার মনটা যেন কতকটা আশা এবং কতকটা ঔৎসুক্যে চকিত হ'য়ে প্রস্তুত হয়ে বসল। নিজের অজ্ঞাতেই প্রায়, সে তার স্বভাববিরুদ্ধ যুবজনসুলভ সূক্ষ্ম কপটতায় সীমার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে সহৃদয় গভীর স্বরে বললে, "জ্যোৎস্না দেবীর ইতিহাস অত্যন্ত করুণ, সীমা, কিন্তু ওর নিজের চরিত্রের মধ্যে এমন একটি শান্ত নিষ্ঠা আছে যে ওর স্পর্শে এলে মনটা আপনিই সম্ভ্রমে নত হ'য়ে আসে। ওর জন্যে আমি চিন্তিত হই নি—আমি ভাবছি যে তোমার কাজের কোন অসুবিধা হবে কি না; অর্থাৎ..."

এই অর্থাৎটা অবশ্য নিতান্তই অনাবশ্যক। সীমার দিকে চেয়ে নিখিল কোন বিশেষ ভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করতে পারলে না।

সীমা বললে, "আমার আর এতে সুবিধে, অসুবিধে কি? বরং বোর্ডিঙের একজন মেম্বর বাড়লে লাভই আমাদের। তবে বোর্ডিঙে যাদের থাকা অভ্যাস নেই তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে ঠেকেই—তা ছাড়া ওর ত আবার পরীক্ষা কাছে।"

নিখিল হতাশ হয়ে ভাবলে, ওর মন যেন বিজলী বাতির নিষ্কম্প দীপশিখার মত—কিছুতেই বিচলিত হয় না।

অত্যন্ত চিন্তাকুল হ'য়ে নিখিল ফিরে গেল। সীমার মুখে যে একটা আসন্ন বিপৎপাতের ছায়া দেখেছিল তার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সীমার কথাগুলি অসহায় আবেগে তার মনকে উতলা করতে লাগল।

৪৫

হাসপাতালে ফিরে সে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে পড়ে গেল যে কিছুক্ষণ তার অন্য চিন্তার কোন অবসরই রইল না।

একটি মেয়েকে আগুনে-পোড়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় তাদের হাসপাতালে এনেছিল। লোকজন আত্মীয়-অনাত্মীয় পুলিস-ডাক্তারের ভিড়ে হাসপাতালে আর স্থান নেই।

নিখিল অগ্রসর হ'তেই ইন্‌স্পেক্টর তাকে খুব পরিচিতের মত বললে, "আরে নিখিল যে! আরে তুমিই ডক্টর রয়? তার পর এখানে কত দিন?...আরে, কি চিনতে পারছ না আমায়? 'বুলডগ'কে ভুলেই গেলে যে!"

নিখিল সত্যিই প্রথমটা চিনতে পারে নি, সে তারই এক সহপাঠী ভুলু দত্ত। তা ছাড়া মৃতকল্প মেয়েটিকে সামনে রেখে রহস্যালাপ করবার মত মন তখন তার ছিল না।

"ও, ভুলু! সত্যি ভাই তোমার ও পোষাকে এতদিন পরে তোমায় চিনতে পারি নি। একটু ব'স ভাই, মেয়েটিকে একটু দেখে আসি।"

ভুলু দত্ত একটু তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বললে. "হ্যাঁ, ও আবার দেখবে কি? ও ত হামেশাই হচ্ছে। একটা ফ্যাশান বই ত নয়। তুমি ঠিক তেমনিটিই আছ দেখছি।..."

নিখিলনাথ আর তার রসিকতার জন্য অপেক্ষা না ক'রে তাড়াতাড়ি মেয়েটির কাছে গেল। বিশেষ আর কিছু করবার ছিল না।

মেয়েটির বাপ দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণ করছিল। মেয়েটির বয়স অল্প, কুমারী। তার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ্য নয় দেখে নিখিল সকলকে বাইরে যেতে আদেশ ক'রে বাপকে নিয়ে পুলিসের কাছে ফিরে গেল।

রিপোর্ট নেওয়া হ'লে ভুলু দত্ত উঠে নিখিলকে বললে, "এস হে একদিন আমার ওখানে, তোমার বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। অবাক হচ্ছ আমাকে দেখে, ভাবছ বুলডগ আবার পুলিস ইনস্‌পেকটর হ'ল। তা ঠিকই হয়েছে—বুলডগ নাম দিয়েছিলে—বুলডগেরই কাজ করছি।" ব'লে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, "যেও একদিন নিশ্চয়—সব সুখদুঃখের কথা হবে।" বলে সে সবলে নিখিলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বেরিয়ে গেল।

নিখিলের মনটা ভুলু দত্তের উপর প্রথমটা যতটা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল শেষটা তা আর রইল না—একটু কোর্‌স্ এই যা, লোকটাকে খারাপ বলে মনে হ'ল না। তা বুলডগ বরাবরই অমনই। এক কালে সে ত বিপ্লবী দলে ভিড়েছিল ওদেরই

সঙ্গে। তার পর নিখিল জেলে যাবার পর আর তার খোঁজ খবর রাখে নি।

ইতিমধ্যে পুলিস-সংস্কারের সুযোগে কবে যে সে পরীক্ষা দিয়ে পুলিসের কাজে বহাল হয়েছে তার সংবাদ তার জানা ছিল না।

হপ্তাখানেক পরে বিকেল বেলার দিকে সেদিন নিখিলের কোনও কাজ ছিল না। নারীভবন থেকে ফিরে এসে মনটা তার অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কমলাকে অধ্যাপনার ছলে সে প্রতিদিন একবার ক'রে নারীভবনে যেত। সীমাকে দেখবার সুযোগলাভ করার চেয়েও কমলাকে ধীরে ধীরে বিপ্লববাদের রূপ, পরিচয় এবং তার বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি তর্কে তাকে দীক্ষিত করতে অভ্যস্ত করা তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ছাত্রীটিও মন্দ নয়। কমলা স্বভাবতঃ শান্ত স্থিরবুদ্ধি, এবং সংরক্ষণপন্থী। তা ছাড়া নারীসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহল এবং নিখিলনাথের মনোভাবের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাকে এই উদ্যমে আগ্রহান্বিত করেছিল কম নয়। অভিনিবেশ সহকারে সে নিখিলনাথের প্রত্যেকটি কথা শুনত, বুঝতে চেষ্টা করত এবং ইতিমধ্যে দু-এক দিন কথার ছলে সীমার সঙ্গে সামান্য দু-একটা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তাতে নিজের গুছিয়ে বলবার ক্ষমতায় সে নিজেই অবাক হ'ল; মনটা প্রসন্নও হ'ল তার। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হ'ল সীমার মনের একান্ত নিষ্ঠায়, অবিচলিত বিশ্বাসে এবং দেশের পরাধীনতায় কারও ব্যথা যে সত্যই এমন নিবিড় এমন গভীর এমন অতলস্পর্শ হ'তে পারে তা প্রত্যক্ষ ক'রে। ও অনুভূতির তীব্রতার সামনে তার যুক্তির চেষ্টা যেন খেলো হয়ে পড়ে—কথা যেন হাল্কা হয়ে যায়।

আজ সীমাকে দেখে নিখিলনাথের মনে কেমন একটা আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। সীমার কথায় বা ব্যবহারে যে কোনরূপ উৎকণ্ঠার কারণ ছিল তা নয়, তবু তার সমস্ত চেহারার মধ্যে তার অন্তর্নিহিত কি এক অগ্নিদাহের পরিচয়ে নিখিলের চিত্ত যেন শঙ্কান্বিত হ'য়ে উঠেছিল।

এ সম্বন্ধে যে-কোন প্রশ্নই যে বাচালতার পর্য্যায়ে গিয়ে পড়বে বারংবার আহত হয়ে নিখিলনাথের তা শিক্ষা হয়েছিল। কিন্তু তার তনুদেহের সুস্পষ্ট কৃশতা, তার দৃষ্টির অস্বাভাবিক শুষ্ক তীব্রতা ক্ষণে ক্ষণে তার উন্মনা চিত্তকে সন্নিবিষ্ট করার গোপন প্রয়াস নিখিলের সীমা সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টির পক্ষে অগোচর ছিল না। অনাগত বিপর্য্যয়ের ধূমায়িত কল্পনায় তার চিত্তাকাশ সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। এ কয়দিন সীমাকে এক রকম এড়িয়েই চলেছে সে—পাছে তার শঙ্কিত চিত্তের ক্ষুব্ধ দুর্ব্বলতা সীমার পরিহাসের আঘাতে পর্য্যুদস্ত হয়। পাছে তার ভীরুতার আভাসে সীমার মন কঠিনতর প্রতিজ্ঞায় নিজেকে অধিকতর বিপদের পথে জিদ ক'রে নিয়ে যায়। পাছে জ্যোৎস্নার বিতর্কের সুর ও কথা তার নিজের অতর্কিতে উচ্চারিত কোনও ভাবের সঙ্গে মিলে গিয়ে সীমার মনে কোন সন্দেহ জাগায়।

নিজের কামরায় বসে চিন্তা করতে করতে তার অত্যন্ত শ্রান্ত অসহায় বোধ হতে লাগল। বিপ্লবীদের নানা জটিল এবং বিপদসঙ্কুল কর্ম্মধারার কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে হ'ল যে ভুলু দত্ত সেদিন বলেছিল যে সি. আই. ডি. থেকে কিছুদিনের জন্য তাকে ধার নেওয়া হয়েছে। শীগগিরই তাকে আবার নিজের কাজে ফিরে যেতে হবে। সে মনে মনে সংকল্প করলে যে ভুলু দত্তের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্কটা ভাল ক'রে ঝালিয়ে নিতে হবে। যদি বিপদের সঙ্কেত কোন রকমে পূর্ব্ব হ'তে সংগ্রহ ক'রে সীমাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এতে পরোক্ষ ভাবে সে যে বিপ্লবেরই সহায়তা করছে এ যুক্তি ক্ষীণ বিবেকের মত তার মনকে ক্ষুণ্ণ করলেও, সীমাকে রক্ষা করতে পারার প্রবল মোহে সে কথা তার মন আমল দিতে চাইলে না। সে উঠে তৎক্ষণাৎ ভুলু দত্তের বাড়ী গেল।

বাইরের প্রশস্ত বারান্দায় বিস্তৃত চায়ের সরঞ্জাম সামনে রেখে ভুলু দত্ত খবরের কাগজ পড়ছিল। নিখিলকে দেখে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে বললে, "আরে, এস এস। আমি ত ভেবেছিলাম যে পুলিসের কাজ নিয়েছি বলে তুমি আর আমার মুখদর্শনই করবে না। তার পর? ব'স, চা খাও। আরে এ তেওয়ারী—"

নিখিল বললে, "ব্যস্ত হ'য়ো না ভাই। হবে'খন। হাতে কাজ ছিল না, তাই ভাবলাম একবার তোমার এখানে এসে গল্পস্বল্প করা যাক্। তার পর আছ কেমন? কতদিন ঢুকেছ সি. আই. ডি-তে?"

"হচ্ছে, হচ্ছে, সব বলছি। এই তেওয়ারী, মা-জীকে বোলো একঠো বাবু আয়া, হাম বোলাতা, সমঝা ?"

নিখিল সসঙ্কোচে বাধা দিয়ে বললে, "না ভাই আজ থাক্, আজ তোমার সঙ্গেই একটু গল্প করি। ও আর একদিন এসে আলাপ করে যাব'খন।"

সেদিন বাড়ী যাবার সময় ভুলু দত্ত বারংবার তাকে আসতে অনুরোধ ক'রে বিদায় দিলে। বললে, "এস ভাই মধ্যে মধ্যে। পুলিসের কাজ ক'রে মনে মনে ত দেশের লোকের কাছে একঘরে হয়েইছি। তোমরাও ঐ সঙ্গে একেবারে পরিত্যাগ ক'রো না। তাহ'লে মনুষ্যসঙ্গবিহনে যদি অমানুষ হ'য়ে উঠি তার জন্যে তোমরাও দায়ী কম হবে না।" ব'লে হাসতে হাসতে বললে, "তা ছাড়া তোমার বৌদি ত পুলিস নয়, কি বল ?"

এমনি ক'রে ভুলু দত্তের উৎসাহে এবং নিখিলের নিজের দরকারে আত্মীয়তা ক্রমে জমে উঠতে লাগল। এমনি অভিনয় ক'রে যেতে প্রথম প্রথম নিখিলের মনে যেটুকু গ্লানি ছিল সেটা ভুলু ও ভুলু-পত্নীর হৃদ্যতায় একসময় কেটে গেল। নিখিল ভাবলে যে, মানুষকে দূরে রাখি বলেই কল্পনায় তাকে বীভৎস ক'রে দেখি। তার মনে পড়ল, পাড়ায় একদিন 'চোর' ধরা পড়েছে শুনে একটি ছোট মেয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিল। ঐ ছোট্ট মানুষটির মনে চোরের অপরূপ মূর্ত্তির যে একটি ছবি ছিল তাই স্মরণ ক'রেই বোধ হয় সে ভয়ে এবং কৌতূহলে তার পা ঘেসে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখছিল। তখন চোরকে সবাই আপনাপন বীরত্বের নমুনা স্বরূপ চাঁদা ক'রে কিছু উত্তমমধ্যমের ব্যবস্থা করেছে; কারুরই উৎসাহের অভাব নেই। হঠাৎ তার বাবাকে দেখে সে কেঁদে ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরলে, "ও বাবা, চোর কই, ও ত মানুষ; ওকে মারছে কেন ?" বৃদ্ধ পিতা কন্যাকে তৎক্ষণাৎ জড়িয়ে কোলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ মা মানুষই ত। ঐ কথাটাই আমরা ভুলে যাই।" বলে তাকে নিয়ে চলে গেলেন। ঘটনাটা সামান্য কিন্তু নিখিল কথাটা কখনও ভুলতে পারে নি।

ক্রমে ভুলু দত্তের সঙ্গে নিখিলনাথের বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভুলু দত্ত নিখিলকে বললে, "তোমাকে একটা অদ্ভুত খবর দিতে পারি।"

নিখিল মনে মনে কান খাড়া ক'রে বসল। বাইরে উদাসীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "বটে! কি রকম ?"

"সত্যদাকে মনে আছে ?" নিখিল গলার স্বরে স্বাভাবিক আগ্রহ বজায় রেখে বললে, "কে সত্যবান ? নিশ্চয়। খবর জান না কি তার ?"

"লাফিও না। জানি, তাও সুখবর নয়। কিংবা তাই হয়ত সুখবর। শোন, মাস আষ্টেক আগে একটা বিশেষ সংবাদ পেয়ে শ্রীরামপুরে একটা তল্লাসে যাই। একজন খবর দিয়েছিল যে ওখানে একটা পোড়ো বাড়ীতে বিপ্লবী কোন একটা ছোট দল আড্ডা নিয়েছে। সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল। অনেক তোড়জোড় ক'রে গিয়ে যা দেখলুম তাতে পুলিসের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু ফল হ'ল না। আমার সঙ্গে আমার সুপিরিয়র ছিল। তার রিপোর্টটাই বলব। রিপোর্টে লিখেছে যে "একটা মৃতদেহ বাড়ীটাতে পাওয়া গেছে, বোধ হয় কোন ভিখারীর। বাড়ীটাতে মনুষ্য-বসবাসের অল্প যা চিহ্ন আছে তা ঐ ভিখারীটার বলেই মনে হয়। একটা লণ্ঠন, দুটো ভাঁড়, একটা বাটী আর কলসী প্রভৃতি দু-একটা বাজে জিনিষ ছাড়া আর কিছু নেই। মিঃ দত্তকে পরদিন ভাল ক'রে অনুসন্ধান করবার জন্যে রেখে এলাম।" মিঃ দত্ত অবশ্য তোমাদের বুলডগ। জানই ত আমার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে তার হদিস না ক'রে আমার শান্তি হয় না। সাহেবের বোধ হয় কলকাতায় ফেরবার তাড়া ছিল। বাড়ীর ভাঙা ঘরগুলো এবং বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে তার কাজ শেষ করে সে চলে গেল। আমিই ইচ্ছে ক'রে সাহেবকে বলে আরও অনুসন্ধানের অনুমতি নিয়ে রয়ে গেলাম। একটু কারণও ছিল তার। বাড়ীটাতে ঢোকবার আগে বাড়ীটা ঘেরাও করা হয়। তার পর আমিই প্রথম হল ঘরটাতে যাই; মৃতদেহটাকে দেখে আমিও প্রথম ভিখারীর মড়াই ভেবেছিলাম; তবু শব্দ না ক'রে আমার সঙ্গের কনস্টেবলটাকে দিয়ে সাহেবকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলাম। হঠাৎ আমার চোখ টর্চ্চের আলোয় একটা ইনজেকশানের এমপিউলের উপর পড়লো। চুপি চুপি সেটা পকেটে পুরলাম। এইটাই আমার ভিখারীর থিওরীটা পাল্টে দিলে। তবু সাহেব কি বলে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাহেবও অনেকক্ষণ দেখে তাকে ভিখিরী বলেই ঠিক করলে। একবার ভাবলাম

এমপ্যুলটা দেখাই। তখনি ভাবলাম—মরুকগে যদি কিছু বার করতে পারি ত তার ক্রেডিটটা ও ব্যাটা আত্মসাৎ করে কেন। তবু আমি তাকে সাবুর বাটী দেখালাম। সাহেবের মাথায় তখন ভিখারীর থিওরী জমে বসেছে। বললে, "কেউ দয়া করে দিয়ে গেছে; খাবার আগেই কাবার হয়েছে। কিংবা বেটা নিজেই তৈরি করে থাকবে, হঠাৎ বোধ হয় হার্টফেল করে মরেছে। ঐ ত চেহারা; যক্ষ্মা, হে যক্ষ্মা, নিশ্চয়, যাকে বলে কন্‌সম্পশন। এখানে বেশী ক্ষণ থেক না; আজ বরং দু জন সেপাই পাহারায় রেখে যাও। উৎসাহ থাকে ত কাল দিনের বেলা এসে দেখো খুঁজে কোন গুপ্তধন পাও কি না।" ব'লে একটু ঠাট্টার হাসি হাসলে। আমি আর তর্ক করলাম না। পর দিন গিয়েছিলাম।

"আমার একটুও আর সন্দেহ নেই—যে মৃতদেহটা দেখেছিলাম তা সত্যবানের; এবং শেষ পর্য্যন্ত তার চিকিৎসা হয়েছিল। তবু সে কথা আমি প্রকাশ করি নি—না-করার আমার উদ্দেশ্য আছে। সত্যবান যে একলা ছিল না, তা ঘুরে ঘুরে পরদিন অনেকগুলি জিনিষ থেকে টের পেয়েছিলাম।"

"ইন্‌ফরমেশনের একটা কথাও ভুল নয়। আমার বিশ্বাস ভেলোয়ারের কাণ্ডর পর যে মেয়েটাকে পুলিস গিরিডি অবধি ধাওয়া করেছিল সেই ওর সঙ্গে ছিল। ভীষণ ধড়িবাজ মেয়ে হে। পুলিসকে একেবারে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে। তাই ভেবেছিলাম যে একেবারে গ্যাং শুদ্ধু গ্রেপ্তার করার ক্রেডিটটা একলাই নেবো। তা আর হ'ল না—ফস্কে গেল। যাক্, আমি ছাড়বার ছেলে নই—ও একদিন বুলডগের মুখে পড়তেই হবে দাদা, হে হে" ব'লে গর্ব্বিত হাস্যে তার অকৃতকার্য্যতা যেন চাপা দিয়ে ফেললে।

নিখিল মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করে ব'লে ফেললে, "ও নিয়ে আর মিছে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? পালের গোদাই যখন মারা পড়েছে তখন বাকী ক-টা এতদিনে দেখ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ঘর-সংসার করছে। চাই কি তোমার পুলিসে নূতন যারা ভর্ত্তি হয়েছে তাদেরও মধ্যে খোঁজ ক'রে দেখ দু-এক জনকে পাওয়া বিচিত্র নয়। তারাই আবার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত হবে—"

ভুলু দত্ত হা হা করে হেসে উঠল বললে, "বেশ বলেছ ভাই, এই আমাকেই দেখ না। আমি যত টেররিষ্টদের 'ঘাঁৎ ঘোঁৎ' জানি আর কোন ব্যাটা জানে তত? তাও বলি ভাই, আমার জন্যেই আবার অনেকগুলো নিরপরাধ ছোকরা বেঁচে গেছে। কর্ত্তারা ত হন্যে হয়ে আছে। ছায়া দেখলেই আঁৎকে ওঠে; আর তখন দোষী-নির্দ্দোষী বাছবার সময় হয় না। তুমি যদি নির্দ্দোষী হও—তবে প্রমাণ ক'রে খালাস হও; নইলে থাক বন্দী হ'য়ে। আরে, ওতে যে ডিস্‌এফেক্‌শন্ স্প্রেড্ করে দেশে—তা কোন বড়কর্ত্তা বা ছোটকর্ত্তাকে বোঝানো যায় না। যাক্ গে, কে আবার কোন দিক থেকে শুনে আমার দফাটি সারবে।..."

একটু মুচকি হেসে নিখিল বললে, "কিন্তু মূর্খ লোকের ধারণা যে, যেমন চোর ডাকাত গুণ্ডা না থাক্‌লে পুলিস পোষা অনাবশ্যক হয়, মিলিটরী আর সি আই ডি-ও অনাবশ্যক হয় তেমনি দেশে এইসব মুভমেণ্ট না থাক্‌লে। তা ছাড়া সময় অসময়ে এই সব হতচ্ছাড়া মুভমেণ্টগুলোই নাকি নানা রকম 'নাগ-পাশ আইন' প্রবর্ত্তনের ওজুহাত জোগায়।"

ভুলু দত্ত প্রসঙ্গটা আর চলতে না দিয়ে একটু শুষ্ক উগ্রস্বরে বললে, "কি জানি ভাই অত পলিটিকস্ আমি বুঝি নে। আমাদের উপর হুকুম টেররিজম্ উচ্ছেদ করবার—তোমরা আবার তারও একটা উল্টো মানে বের করবে। এই জন্যেই ত বাঙালীদের ওপর ওরা চটে। যত নেই কথাকে ফেনিয়ে খই ভাজা। এ যেন সেই তোমাদের রবি ঠাকুরের কবিতা। তার একটা আধ্যাত্মিক মানে বের করাই চাই, নইলে লোকে নির্ব্বোধ বলবে। ওসব আমি বুঝি নে—আমি বুঝি কাজ। টেররিজম্‌কে দেশ থেকে আগাছার মত উপড়ে ফেলতে হবে—য়্যাণ্ড আই উইল ডু দ্যাট।"

নিখিল বললে, "আরে চট কেন ভাই; টেররিজমের উচ্ছেদ হ'লে আমি যতটা খুশী হব - তুমি অন্ততঃ ততটা হবে না। কারণ ওটাই তোমার খোরাক যোগায় কিনা! রাগ কর না ভাই। বন্ধু বলেই এসব বলছি।"

"হাঃ হাঃ! রাগ কি হে? বেশ বলেছ। আজ সি. আই. ডি. উঠে গেলে ভুলু দত্তকে কেউ পঁচিশ টাকার একটা মাষ্টারীও দেবে না। তবে কিনা, আগাছা কাটবার জন্যে,

পাথর ভাঙবার জন্যে খোন্তা-কোদালেরও দরকার। গুণ্ডগুলোর ত উচ্ছেদ করা চাই—"

"নিশ্চয়—টেররিজমের উচ্ছেদ আমি মনে প্রাণে কামনা করি। শুধু খুনোখুনির আতঙ্কে বলছি না; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় মনে ঢুকেও থাকতে পারে, জানি না। টেররিজম মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে, মানুষকে কাপুরুষ ক'রে তোলে বলেই তা কামনা করি। টেররিজম দুর্ব্বলকে কুৎসিত করে—সবলকে বীভৎস করে। সুতরাং অত্যাচারের ভয় দিয়ে মৃত্যুর ভয় দিয়ে যেই শাসাক্ সেই নিজেকে এবং অন্যকে পিশাচ ক'রে তোলে;—সে রামা-শ্যামা বা সত্যবান, যেই হোক। পিশাচের ধর্ম্মই ভয় দেখানো, মানুষের নয়।" ব'লে সে ভুলু দত্তের মুখের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ রেখে আরও বলবার কথাগুলো মনে মনে ভাবতে লাগল। ভুলু দত্তও অল্প একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মাথা নাড়তে লাগল। খানিকটা দম নিয়ে নিখিল যেন নিজের মনের অবরুদ্ধ আবেগে আবার শুরু করলে, "শুধু আমার দেশের জন্যে বলছি নে—চাই যে, সমগ্র মানবজাতির মন থেকে এই টেররিজম দূর হয়ে যাক্। এই পন্থা দেশে দেশে মানুষকে মনুষ্যত্বের পথ থেকে বঞ্চিত করছে, মানুষকে দলে দলে শিক্ষিত হন্তারক পশুতে পরিণত করতে চলেছে। নরনারীর স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তিকে, অধ্যাত্মশক্তিকে ধ্বংসের পথে, পাশবিকতার পথে, সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে। লোভে ক্রোধে হিংসায় জিঘাংসায় তার মুখ থেকে দেবতার ছবি মুছে গেল—হায় হায় কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারলে না—শুধু পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্যে অন্ধ উন্মত্ততায় সর্ব্বনাশের আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে—দলে দলে…" বলতে বলতে ভুলু দত্তের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল। এতটা আবেগের কারণ বুঝতে না পেরে ভুলু হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে—যেন কোন একটা কারণ সে তার দৃষ্টি দিয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিখিল জোর করে একটু কৃত্রিম সলজ্জ হাসি টেনে এনে বললে, "ভাবছ হঠাৎ নিখিলকে বক্তৃতায় পেয়ে বসল কেন? তুমি জান তোমাদের সঙ্গে আমিও একদিন ঐ দলে ছিলাম। তার পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। জীবহত্যা-টত্যার কথা আমি ভাবি না। প্রতিদিন স্লটার-হাউসে ত কত কোটী কোটী প্রাণী আমাদের খাদ্যের জন্যে আমরাই হত্যা করি। সেটা ন্যায় কি অন্যায় তার বিচার এখানে করবার নয়। ভয় দেখিয়ে মানুষকে অমানুষ ক'রে আত্মাকে বামন ক'রে রাখার মত অপরাধ নেই। যে-কেউ তা করে, সেই ঐ পাপে লিপ্ত। প্রবল কেউ যদি শুধু ভয় দেখিয়ে লোককে শিষ্ট করতে চায়, তবে 'টেররিজম্-এর উচ্ছেদ করতে চাই' এ কথা তার বলা সাজে না। ছেলেকে ঠেঙিয়ে শান্ত রাখলেই ছেলে মানুষ করা হয় না—নিজের শক্তির উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকলে কেউ টেররিষ্ট হয় না। সন্ত্রাসন ভীরুর অস্ত্র—তা সে যেই ব্যবহার করুক।

ভুলু দত্ত বললে, "ভাই, তোমার মত ক'রে আমি ভাবি নে। দেশে শাসক থাকবেই—পেনাল কোডও বুদ্ধদেবের রচিত হবে না। চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম অরাজকতা নিবারণের জন্যে শাস্তির ভয় দেখালে যদি দুর্ব্বলতার অপবাদ তবে দেশের শাসন অচল হবে। দেশের শান্তিরক্ষাও বড় জিনিষ—তা না হলে উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না, দেশ সমৃদ্ধ হয় না। এই ত বাবা সোজাসুজি বুঝেছি। দি এণ্ড জাষ্টিফাইজ্ দি মীন্স্।"

নিখিল দেখ্‌লে যে এই উত্তেজনা প্রকাশ ক'রে সে ভাল করে নি। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ এতে রুদ্ধ হ'তে পারে। ভুলু দত্তের কনফিডেন্স্ হারালে তার চলবে না। বললে, "তা সত্যি, তবু কেমন যেন মনে হয় যে ওতে পাগলের পালকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে।"

একটু উৎসাহ পেয়ে ভুলু দত্ত বললে, "না হে না; দেখতে দেখতে কত দুঁদে টেররিষ্ট সিধে হয়ে গেল। কত ব্যাটা আবার কান কেটে সরকারী কাজে জুতে গেছে, দেখ গে। কথায় বলে 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর'—বিলেতের আমদানী কথা নয় হে—অনেক অভিজ্ঞতার ফল। এই শর্ম্মাই কত ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করলে—"

ভাল মানুষের মত নিখিল বললে, "তা ঠিক, টেররিজমকে একেবারে ঠাণ্ডা করেছ তোমরা, তা বলতে হবে—অন্ততঃ বাংলা দেশে।"

"তা আর কই হ'ল হে! এ ব্যাটারা রক্তবীজের ঝাড়, ধোঁয়াচ্ছে হে ধোঁয়াচ্ছে—আবার একদিন শুনবে কিছু

একটা কাণ্ড কিংবা তার আগেই যদি বুলডগের মুখে না পড়—"

"বটে, কই কিছু দেখি না ত আর কাগজে। সব চুপচাপ ঠাণ্ডা।"

"চুপচাপ থাকবে না ত কি জয়ঢাক কাঁধে ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াবে? এরা আর আগেকার মত বোকা নেই হে—আর সে থিয়েটারি ঢংও নেই এদের। এরা ঢের চালাক, ঢের কাজের লোক হয়ে গেছে। এদের মুভমেণ্ট একটুও বোঝবার জো নেই। এদের ফন্দী ফাঁস করতে পারায় সুখ আছে হে; কারণ তা সহজ নয়। সত্যি বলছি ভাই, এদের পিছনে লাগি বটে, কিন্তু এদের এক একটার ব্রেন দেখে সত্যিই অবাক হ'তে হয়। এই ধর না কেন সেই যে মেয়েটার কথা বললাম—সত্যদাব সঙ্গে ছিল। স্রেফ চোখে ধুলো দিলে।"

নিখিল আর বেশী কৌতূহল প্রকাশ না ক'রে বললে, "আমাদের তখনকার মেথড্‌স্ কি রকম ক্রুড ছিল মনে করলে এখন হাসি পায়।"

"তা সত্যি, এখনকার তুলনায় আমাদের লম্ফঝম্প ছিল যেন যাত্রার দলের আখড়াই। শুনলে অবাক হয়ে যাবে এদের সব কথা।"

নিখিল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আজ কাজ আছে ভাই উঠি। শোনা যাবে একদিন তোমার মক্কেলদের কেরদানি, আর তোমার কেরামতি। ঝোঁকের মাথায় এক চোট বক্তৃতা মেরে নিলুম, কিছু মনে ক'রো না।"

"আরে না হে না, আমি আর কি মনে করব। তবে দিন কাল খারাপ, কথাবার্ত্তা একটু সামলে বলাই ভাল—বুঝলে কি না।"

"তা আর কি বুঝি না। তবে তোমার কাছে বলেই বললাম।" বলে নিখিল বিদায় হ'য়ে গেল।

"বুলডগের মুখে পড়া"র কথাটা তার মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল। ক্রমশঃ

নবীন দার্শনিক চিন্তার প্রবর্ত্তন*

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার প্রবর্ত্তন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ভারতবর্ষের এখনও অবিলুপ্ত বিরাট সাহিত্যের মধ্যে। য়ুরোপেও এই রূপে নানা চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছিল এবং এখনও সে প্রচেষ্টার বিরাম নাই। সকল চিন্তার লক্ষ্য সত্যকে উপলব্ধি করা ও জগতের নিকট প্রচারিত করা। পূর্ব্ব মনীষিগণ যে সমস্ত চিন্তারাশি তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে ও ভাষ্যটীকার মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার আলোচনা আমাদিগকে এই স্বাভাবিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসার পথে যেমন সাহায্য করে, তেমনি চিন্তবিশেষে তাহার প্রতিকূলতাও উপলব্ধি করা যায়। যখন আমরা তাহার সমস্ত দিক অনুসন্ধান না করিয়া বা আমাদের বুদ্ধিতে ও অনুভবে যে সমস্ত বিরোধ ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহার একটি সহজ সমাধানের চেষ্টায় সত্য জিজ্ঞাসাকে পঙ্গু বা শক্তিহীন করিয়া কোন একটি মতবিশেষকে আঁকড়িয়া ধরি—তখন এই পুরাতনের প্রতিকূল প্রভাব দেখা যায়। এটাও সম্ভাবনা করিতে পারা যায় যে কোন প্রাচীন দার্শনিক বা ভাবুক যে দৃষ্টিতে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দৃষ্টির সহিত আমাদের দৃষ্টির মিলন না ঘটিলে তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য আমাদের নিকট বাহিরের বস্তুই রহিয়া যায়। কাজেই দার্শনিক জগতে একের পরিশ্রমের দ্বারা অন্যের ফাঁকি দিয়া লাভবান হইবার কোন আশা নাই। যত-ক্ষণ আমার চিন্তা অপরের চিন্তার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত না হয় অর্থাৎ যখন অপরের চিন্তা আমার চিন্তায় পরিণত না হয় এবং আমি সত্যের স্বরূপকে নিজের অনুভূতিতে অসন্দিগ্ধ ভাবে না দেখিতে পারি তত ক্ষণ আমার সত্য জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইবে না। এই কারণেই দেখি মনীষার ক্ষেত্রে নূতন নূতন দার্শনিক চিন্তার প্রবর্ত্তনের বিরাম নাই। অনেকে এইরূপ ভয় দেখান যে পূর্ব্বতন মনীষিগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিগৌরব ও ঐকান্তিক সাধনা সত্ত্বেও যদি সত্য আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই কর্ম্মবহুল কালে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের এত অল্পসময়ের সাহায্যে জগৎতত্ত্বের সহিত পরিচয় স্থাপন করার চেষ্ট নিরর্থক। কিন্তু দার্শনিক এইরূপ বিভীষিকায় ভীত হন না—তিনি অন্তরের প্রেরণায় সাধনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার লক্ষ্য হয় সত্যের উপলব্ধি। পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিফলতা তাঁহাকে দমিত না করিয়া আরও বিপুলতর উদ্যমে ও উৎসাহে তাঁহার সাধনার পথে অনু-প্রাণিত করে। তিনি পূর্ববর্ত্তিগণের চিন্তার মধ্যে বিফলতার বীজ অনুসন্ধান করিয়া এবং যে সমস্ত বিষয় তাঁহাদের চিন্তার পরিধির মধ্যে স্থান পায় নাই এবং এজন্য তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে যে একদেশিতা ও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া সত্যের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল

* 'দার্শনিকী'—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম তিন টাকা।

তাহা পরিহার করিয়া চলেন। কোন দার্শনিকের প্রচেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না—প্রত্যেকের চিন্তার মধ্যে আমরা সত্যের অংশবিশেষের সন্ধান পাই। তাঁহাদের প্রধান ত্রুটি হয় যখন তাঁহারা এই অংশকে পূর্ণ বলিয়া মনে করেন এবং জগতের যে সমস্ত অংশের সহিত তাঁহাদের মতের বিরোধ হয় সেই সমস্ত বিরোধী অংশকে তাঁহারা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে সঙ্কোচ করেন না। আর একটি গুরুতর কারণে দার্শনিকদিগের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই এবং নানা মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইতেছে একটি চিন্তাসূত্রকে সত্যের একমাত্র মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা এবং সেই চিন্তাসূত্রটি অনেক সময়ে প্রতীতি নিরপেক্ষ ভাবে এবং জগৎতত্ত্বের সহিত ঐন্দ্রিয়ক পরিচয়ের পূর্ব্বেই মানব চিত্তে স্ফুরিত হয়—ইহা মনে করা।

এইরূপ ভ্রান্তির নিবারণকল্পে প্রতীচ্য দার্শনিক জগতের প্রদীপ্ত ভাস্কর মহামতি কাণ্ট তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করেন প্রামাণ্যবাদের উপর। চিত্তের নানা শক্তিদ্বারা আমরা জগৎতত্ত্বের সহিত পরিচয় স্থাপন করি। এই শক্তির স্বরূপ ও সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে আমাদের বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানের পথ সহজ হইবে—এই বিশ্বাসে কাণ্ট Epistemologyর (জ্ঞান প্রক্রিয়ার) অবতারণা করিয়া তাহার সাহায্যে দার্শনিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। ভারতবর্ষের সমস্ত দার্শনিক চিন্তারও এইভাবে ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে। "মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও জ্ঞান প্রক্রিয়া (Epistemology) এই দুই দিক দিয়া মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলি বুঝবার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চিত্ত (mind) জিনিসটা যে কি তা একরকম আমরা কিছুই জানি না এবং মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলির যতটুকু আমাদের কাছে ধরা পড়েছে তার অনেক বেশীগুণ জিনিস আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে" (৩৭ পৃঃ)। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'দার্শনিকী' নামক পুস্তিকায় যে নূতন পন্থায় দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন, তাহার মধ্যে আমরা জ্ঞানপ্রক্রিয়ারও বিশিষ্ট স্থান আছে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তিনি যেভাবে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব এবং তাঁহার দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দর্শনশাস্ত্রের অনেক মামুলী বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। জড় ও চৈতন্যের সম্পর্ক লইয়া যে মতভেদ ও কোলাহল উত্থিত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের চতুষ্পার্শ্ব মুখরিত হইয়া আসিতেছে, তিনি নূতন ভাবে সেই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে, জড় ও প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধিত লইয়া যে সমস্ত তর্কের উত্থান হইয়া থাকে, তাহা ডক্টর দাশগুপ্ত মহাশয়ের দৃষ্টিতে অনাবশ্যক। অনেকে এক ও বহুর বিরোধের সহজ সমাধানের চেষ্টায় বহুকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন কিংবা বহুকে জোড়াতাড়া দিয়া একের মধ্যে স্থান দিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্থান আমরা তাঁহার দার্শনিক চিন্তার মধ্যে পাই না। তাঁহার মতবাদের নামকরণ এক কথায় করা কঠিন এবং এরূপ এক কথায় তাহার পরিচয় দেওয়া আমাদের শক্তির অতীত। আমরা এ বিষয়ের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত করিলাম। বাস্তবিক একটি সংজ্ঞার দ্বারা কোন জটিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ নবীন চিন্তার ধারাকে প্রখ্যাপিত করার একটা মুস্কিল আছে—তাহাতে পুরাতন প্রসিদ্ধ কোন মতবাদের সহিত তাহাকে এক করিয়া ফেলিয়া ইহার নূতনতাকে বিকৃত করিয়া ফেলা অস্বাভাবিক নয়। আমরা তাঁহার চিন্তার কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা আলোচনা করিব এবং তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টির গতিও লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব। এইরূপ বুঝিবার চেষ্টা দ্বারা আমরা তাঁহাকে ভুল বুঝি ইহাও খুব স্বাভাবিক। ভুল বুঝিবার আশঙ্কায় আমার নিজের কোন মতামত ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার কথাতেই তাঁহার বক্তব্যগুলি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিব এবং তাহাতে আমরা যে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী যোজনা করিব, তাহা মূল বুঝিবার সুবিধার অনুরোধে।

ডক্টর দাশগুপ্ত 'দার্শনিকী' নাম দিয়া কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'দর্শনের দৃষ্টি', 'পরিচয়', 'জড়, জীব ও ধাতু পুরুষ' নামে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাঁহার নবীন মতের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। 'বেদ ও বেদান্ত' নামক প্রবন্ধে তিনি যে মতবাদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত মায়াবাদের বিপরীত। 'তত্ত্ব কথা' নামক প্রবন্ধটি লেখকের বহু পূর্ব্বের লেখা এবং তাহার মধ্যে Hegel এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত মতবাদের সাদৃশ্য অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন। "তথাপি...পূর্ব্বের চিন্তার সহিত বর্ত্তমান চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক" নাই তাহা নহে। উভয় চিন্তার মধ্যে জগতের কোন অংশকে বাদ দিবার চেষ্টা নাই। জড়, জীব প্রাণ ও চিত্ত সকলেরই সার্থকতা ও বাস্তবতা উভয় চিন্তার মধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই আমরা তাঁহার চিন্তার অপূর্বতা লক্ষ্য করিতেছি। জড়জগতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"জড়ের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির আড়ম্বর নেই, তাই নানা অবস্থায় তার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নেই।" "জড়ের মধ্যে যদি কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় সে উদ্দেশ্য জড়ের নিজের উপকারের জন্য নয়, সে উদ্দেশ্য জীবের উপকারের জন্য... সাংখ্যদর্শনকার জড়ের এই তত্ত্বটুকু ভাল করেই বুঝেছিলেন, তাই তিনি প্রকৃতিকে পরার্থ এবং পুরুষের ভোগাপবর্গসাধনে ব্যাপৃতা বলে বর্ণনা করেছেন।" কিন্তু তাহা হইলেও জড়রাজ্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। জীবরাজ্য জড়রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু তাহাও একেবারে স্বতন্ত্র। "জড়ের উপাদানকে অবলম্বন করেই জীব তার কার্য্য আরম্ভ করে—" কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াই জীবের কাজে লাগে। "জীবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট ও স্পন্দিত না করে জীব কখনও জড়কে নিজের দেহধাতুরূপে ব্যবহার করতে পারে না।" (৭ পৃ.) "আমরা সাধারণত জানি যে কোনও কিছু যদি এক হয় তবে সে বহু নয়, যদি বহু হয় তবে সে এক নয়; তাই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যাঁরা বহুর মায়ায় পড়েছেন তাঁরা এককে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আর যাঁরা একের মায়ায় পড়েছেন তাঁরা বহুকে মিথ্যা বলেছেন কেউ বা বলেছেন, বহু অংশকে নিয়ে এক। কিন্তু প্রাণজগতে এসে আমরা যে লীলা দেখি তাতে দেখি এটা একটা এমন রাজ্য যেখানে কোনও একটি সত্ত্ব বা সম্বন্ধই অপর সত্ত্ব বা সম্বন্ধ ছাড়া তার আপন স্বরূপকে লাভ করতে পারে না। এখানে ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধিকে পাওয়া যায় না, বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়, ক্ষয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি। বৃদ্ধির পর ক্ষয় আসে এ আমরা জানি, বা ক্ষয়ের পর বৃদ্ধি আসে এ আমরা জানি। কিন্তু এখানে দেখি বৃদ্ধি ক্ষয়ের যৌগপদ্য।...একের সমষ্টিতেও বহু নয়, বহুর সমষ্টিতেও এক নয়, কিন্তু যাকে এক বলি তাই বহু এবং যাকে বহু বলি তাই এক।" গ্রন্থকারের ভাষায় আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তা-পদ্ধতি হইতে তাঁহার চিন্তা-পদ্ধতির ভেদ বর্ণনা করিব। "সাধারণতঃ য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে যেটাকে organic view বা জৈবদৃষ্টি বলে সেটাতে একের জীবনের মধ্যে বহু এসে কেমন ওতপ্রোতভাবে মিশেছে এই কথাটিই বিশেষ জোর দিয়ে দেখান হয়।...একের সঙ্গে যে বহুর বিরোধ নেই, বহুকে নিয়েই যে এক আপনাকে সার্থক করছেন" এই কথাটিই তাঁহারা প্রতিপাদন করেন। "কিন্তু এ সমস্ত মতবাদের মধ্যে জৈবদৃষ্টির যথার্থ শিক্ষাটি যে প্রকাশ পেয়েছে আমার ত মনে হয় না। জৈবদৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব এইখানেই প্রকাশ পায়...যে এই দৃষ্টিতে এক ও বহুর চিরপ্রসিদ্ধ ভিন্নতাটি তিরোহিত হইয়াছে।...একের স্বতন্ত্রতায় যে বহুর উৎপত্তি এবং একের স্বতন্ত্রতা যে বহুর স্বতন্ত্রতা ছাড়া হয় না, এই যে কার্য্যকারণ বিরোধী সত্য এতে এক এবং বহুর সীমানাকে এমন অনিবার্য্য ক'রে তুলেছে যে এক বলাও পার্শ্বদৃষ্টি বহু বলাও পার্শ্বদৃষ্টি। বৃদ্ধির মধ্যে ক্ষয় ও

ক্ষয়ের মধ্যে বৃদ্ধি এতে যে ক্রিয়াবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে বৃদ্ধিও পার্শ্বদৃষ্টি, ক্ষয়ও পার্শ্বদৃষ্টি।" লেখক এস্থানে নাগার্জ্জুন, শঙ্করাচার্য্য, Bradley প্রভৃতির সহিত তাঁহার দৃষ্টিভেদ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিরোধ দেখিয়া সম্বন্ধগুলিকে মিথ্যা বলেন বা অখণ্ড দৃষ্টিতে তাঁহাদের বিরোধ তিরোহিত হইয়া যায় এইরূপ আশ্বাস প্রদান করেন। Hegel এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে। কিন্তু গ্রন্থকারের সমাধান অন্যরূপ। তিনি বলেন "সম্বন্ধগুলিকে পৃথক্ ক'রে দেখি ব'লেই ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে তাদের একত্র দেখে তাদের সমাধান করুতে চেষ্টা করি, কিন্তু জৈবদৃষ্টির মধ্যে এই কথাটি যেন আমাদের চোখে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে আসে যে যে-সম্বন্ধগুলিকে আমরা বুদ্ধির মায়ায় পৃথক্ ব'লে মনে করি সেগুলি পৃথক্ নয়; তাদের প্রত্যেকের সত্তা অপরের মধ্যে নিহিত হ'য়ে রয়েছে। তাহা একও নয় বহুও নয়।" তাঁহার মতে চিরকাল হইতে যে Laws of Thought (চিন্তাপদ্ধতির নিয়ম) প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার স্বরূপ একেবারেই বদলাইয়া যায়। The Law of Identity (তাদাত্ম্যনিয়ম) অনুসারে যাহা এক তাহা একই। The Law of Contradiction (বিরোধ নিয়ম) অনুসারে যাহা এক তাহা অনেক নয়। বস্তুর একত্ব ও অনেকত্ব দুইই সত্য নয়। The Law of Excluded Middle (পরস্পরবিরোধী বস্তুদ্বয়ের মধ্যে তৃতীয় প্রকার অসম্ভব) অনুসারে বস্তু এক কিংবা অনেক হইবে—দুইই মিথ্যা নয়। এই নীতিগুলি যাহারা অব্যভিচারী সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে জগৎতত্ত্বকে এক বা বহু বলিতে হইবে এবং তদিতরটিকে মিথ্যা বলিতে হইবে। কিন্তু ডক্টর দাশগুপ্তের মতে ইহা অনাবশ্যক ও অসত্য। সত্যের রূপ প্রতীতির মধ্যেই ধরা পড়ে, কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রতীতিকে উড়াইয়া দিয়া সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

ডক্টর দাশগুপ্তের মতে জড় ও জীবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টাও অনাবশ্যক। কাজেই জড় হইতে জীবের বা জীব হইতে জড়ের সৃষ্টি নিরূপণ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা হইতেও পারে না। এইরূপে জীবলোক হইতে মনোলোকের সৃষ্টিও অসম্ভব। জড়লোকের সহিত জীবলোকের যেমন নিয়ম, প্রকার ও সংগঠন বিষয়ে আত্যন্তিক বৈষম্য দেখা যায় এইরূপ জীবলোকের সহিতও মনোলোকের বৈষম্য দেখা যায়। কাজেই জড় হইতে জীবের উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, এই জীব হইতে চৈতন্যের উৎপত্তিও অসম্ভব। চৈতন্যের স্বপ্রকাশতা ও ও পরপ্রকাশতারূপ ধর্ম্ম জড় বা জীবলোকে দেখা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে Behaviourist গণ এবং Russell প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। "Russell তাঁর Analysis of Mindএ যে সমস্ত উদাহারণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে মানুষের জীবনের সেই দিকটা যে-দিকটায় সে জৈবযাত্রার প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধ বা যে-দিকটায় মানুষ জড়প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু আমাদের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে এবং গোটা মনোব্যাপারের আত্মগতি, আত্মনিয়ম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যের নূতন নূতন নিয়ম পদ্ধতি দেখতে পাই যেগুলিকে কিছুতেই জৈব ব্যাপারের কোঠায় ফেলা যায় না।" তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য পরস্পর সম্বদ্ধ ও পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং কোনও রাজ্যের নিয়মের দ্বারা অপর রাজ্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। প্রত্যেক রাজ্যের নানা ব্যাপারের মধ্যে যে ঐক্য আছে সে ঐক্যের অর্থ সামঞ্জস্য বা "তদর্থযোগিতা—অর্থাৎ একটি যে অপরটির কাজে লাগতে পারে, এ জাতীয় ঐক্য।" আর যেমন নানা জীবনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যে ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া একটি সমষ্টি জীবকোষ উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের অর্থার্থিভাবগত ঐক্যের মধ্যে খণ্ড খণ্ড জীবকোষের স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত না হইয়া পরস্পরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সমগ্রের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং সমগ্রের পুষ্টিতে খণ্ড খণ্ড জীবকোষের পুষ্টি সাধিত হয়—তেমনি একটি চিত্তের উপর অন্য একটি চিত্তের প্রভাব বিস্তারে ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গড়িয়া উঠে এবং ইহার ফলে প্রত্যেক মন তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও ও সত্তা লাভ করে। "Trans subjective ও inter-subjective intercourse-এর যদি অবসর মানুষ না পেত তবে মানুষের মন কখনই তার বিস্ময় ও চিন্তাময়রূপে বেড়ে উঠ্‌তে পারত না।" ডক্টর দাশগুপ্ত মন বলিয়া স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি মন বলিতে বুঝেন কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম পরম্পরা বা ব্যাপার-পরম্পরার সামঞ্জস্য। এই মনের বিশিষ্ট পরিণতিই তাঁহার মতে আত্মা। "আত্মা বা self…হচ্ছে একটা জীবনের সমস্ত অনুভূতির সমস্ত experience-এর একটা সঞ্চিত অভিব্যক্তি।" তিনি আত্মা বলিলে কোন transcendent কূটস্থ বস্তু বা ক্ষণ-বিধ্বংসীস্কন্ধ-সমষ্টি বুঝেন না। আত্মা একটি concrete entity এবং সে entity স্থির পদার্থ নয়; অথচ ক্রমধারা-রূপে সেটি প্রতিভাত হয় না; আমাদের যা কিছু অনুভূতি যা কিছু exprience হ'য়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে হ'য়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছে; সে সত্তার মধ্যে অনুভূতির ক্রম নেই, আছে পূর্ব্বাপরের ক্রমাতীত অখণ্ড সত্তা।…'আমি' বল্‌তে যা বুঝি সেটি হচ্ছে আমার অন্তর্জীবনের সমস্ত অনুভূতির একটি অখণ্ড দীর্ঘ ইতিহাস; অখণ্ড বলেই সেই ইতিহাসটি সকল সময়েই আমার সামনে জাগরূক, সেটি একটি অবিভাজ্য ইতিহাস বলেই মনোরাজ্যের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ও এই 'আমি'র মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে যে ঐক্যটি তার সমস্ত ইতিহাসকে একটি অখণ্ড পদার্থের ন্যায় ব্যবহার করতে পারে।…সমস্ত মনের ইতিহাস 'আমি'র মধ্যে আছে ব'লে 'আমি' একটি বিচিত্রতাময় complex unity বা entity এবং এই জন্যই এর মধ্যে শারীর অনুভূতির অংশ এবং জৈব অনুভূতির অংশগুলিও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই 'আমি'টি স্থির না হ'য়েও স্থির, স্থির হ'য়েও সর্ব্বদাই বর্দ্ধনশীল ও পরিবর্ত্তনশীল।" মানুষ বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা জড়, জীব ও মন এই তিন রাজ্যের পরস্পর সংঘাতে ও আদান প্রদানে উৎপন্ন এবং ইহাদের কোন অংশই মিথ্যা নয়।

"পরিচয়" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই কথাটিই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে দেখানো হইয়াছে যে সৎ, বস্তু বা substance বলিয়া যে category দার্শনিকগণ এতকাল চিন্তা করিয়া আসিতেছেন ইহা বিকল্প (abstraction) মাত্র। এইরূপে আত্মা প্রভৃতিও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। "সম্বন্ধচক্রের সন্নিবেশে যে রচনাটি রহিয়াছে তাহাই আমাদের আত্মা, তাহাই বিশ্বভুবনের আত্মা।" গুণ ও গুণীর, দিক্ কাল ও আধেয় বস্তুর মধ্যে, সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিয়া দার্শনিকগণ যে জটিলতার অবতারণা করিয়া থাকেন, সে জটিলতার কোন অবকাশ নাই ডক্টর দাশগুপ্তের নূতন দর্শনের মধ্যে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় ভেদ কল্পনা করিয়া দার্শনিকগণ ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বকীয় সৃষ্টি। "শব্দের সহিত যেমন অর্থের সম্পর্ক আমাদের মনোলোকের রূপপ্রকাশের সহিতও তেমনি বহির্লোকের রূপের আনুরূপ্য। শব্দ যেমন অর্থের সমানধর্ম্মা না হইয়াও অর্থের পরিচয় দেয় আমাদের অন্তরের রূপপ্রকাশও তেমনি বহির্জগতের রূপলোকের সদৃশ না হইয়াও তাহার আনুরূপ্যের দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করে।…মূর্ত্তরূপে যাহা বাহিরে, অমূর্ত্তজ্ঞানরূপে তাহা ভিতরে, তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ'। ব্রহ্মের দুই রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত।" বর্ত্তমান কালে য়ুরোপ ও আমেরিকায় যে নূতন

Realistic Philosophy গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত ডক্টর দাশগুপ্তের দার্শনিক চিন্তার সম্বন্ধ বড়ই ক্ষীণ। তাঁহার দর্শনের বৈশিষ্ট্যও এইখানে যে তিনি পূর্ব্ব দার্শনিকদের কল্পিত concept-গুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য আশা করা যায় না যে তাঁহার চিন্তাপদ্ধতি দার্শনিক জগতে সকলের নিকট গৃহীত বা সমাদৃত হইবে। concept লইয়া দার্শনিক জগৎ ব্যস্ত ইহাই দার্শনিকদিগের মূলধন বা উপজীব্য। তবে ইহা আশা করা যায় যে তাঁহার চিন্তার গতি তাঁহার বস্তুতত্ত্বের প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক জগতে আলোড়ন আনিয়া দিবে। এই নূতন দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা। এখানে world of values-এর স্থান সমান পর্য্যায়েই স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কিছুকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নাই। রসবোধ—সৌন্দর্য্যবোধ mysticদের অপরোক্ষানুভূতি সমস্তেরই সুসমঞ্জস ও অবিরোধী সন্নিবেশ আছে। কেবল বহির্দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া এই দার্শনিক চিন্তা প্রবৃত্ত হইতেছে না—ইহার চরম পরিণতি অন্তর্দৃষ্টিতে—আনন্দে ও প্রেমে। "প্রেম মাত্রই নিজের অন্তর্মুখী বুদ্ধির একটি বিশেষ বিভাবন ব্যাপার, একটি বিশেষ আত্মপরিচয়।" "কায়িক বাচিক সম্পর্কপরম্পরার মধ্য দিয়া যখন একে অপরের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, একে যখন অপরের অনুকূলে আপনাকে প্রবর্ত্তিত করিতে থাকে, তখন সেই পরিচয়ের অন্তরালে বাহ্যিক ভোগবৃত্তির ছায়ায় একটি নিগূঢ় অন্তরতম আত্মস্বরূপের পরিচয় নিজের নিকট উপলব্ধ হইতে থাকে। এই উপলব্ধির দ্রবীভাবের মধ্যে যতই আপনাকে বিলীন করিয়া দেওয়া হয় ততই আমাদের আন্তর ধাতুর নিবিড় তপস্যায় আমাদের চিত্ত তাহার নানা সম্বন্ধচক্রের মধ্যে যেন অসম্বন্ধ হইয়া ক্রমশঃ আপনার একটি নূতন পরিচয় লাভ করে।" উপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে—"নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" ইহার তাৎপর্য্য এই যে "প্রেমরসের যে আস্বাদন তাহা আমাদের আত্মপরিচয়ের আত্মসার্থকতার একটি রূপমাত্র।" ডক্টর দাশগুপ্তের দার্শনিক চিন্তার সহিত উপনিষদের প্রচারিত সত্যের বিরোধ নাই—তাহা তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। অবশ্য উপনিষদের ব্যাখ্যা তাঁহার নিজের। তাঁহার ব্যাখ্যায় বৈদিক ধর্ম্মের একটি নূতন পরিচয় আমরা পাইতেছি। তাঁহার একটি ব্যাখ্যার দ্বারা এ কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। "আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বৃহৎ বা বৃহত্তম। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ বৃহত্তমের দিকে যে আত্মচর্য্যা বা আত্মচেষ্টা।" তাই অথর্ব্ববেদে বলিতেছেন "ব্রহ্মচর্য্যেণ যোষা যুবানং পতিং ম্যেত্তি"—"স্ত্রী যখন পতির সহিত সঙ্গত হয় তখন সেই সঙ্গতির মধ্যে একটি বৃহত্তমের প্রতিষ্ঠা হয়।" এই প্রেমতত্ত্ব ডক্টর দাশগুপ্তের দর্শনে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অন্যত্র দুর্লভ। "প্রেমের মধ্যে যে একটি নিবিড় যোগ আছে সে যোগ যত ক্ষণ বহিরঙ্গ সম্বন্ধ লইয়া ব্যাপৃত থাকে, বাচিক কায়িক ব্যবহারের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তত ক্ষণ তাহার পূর্ণতা হয় না। ভক্ত যত ক্ষণ ভগবানকে আপন অন্তরঙ্গ প্রেমরসের একটি উপাদানরূপে অনুভব করেন, স্ত্রীপুরুষের যখন রমণ-রমণী ভাব বিগলিত হয় এবং একটি উভয়স্পর্শী প্রেম সম্পর্কের আত্মপরিচয়ের মধ্যে উভয়ে বিধৃত হইয়া থাকেন তখনই তাঁহাদের যথার্থ সার্থকতা লাভ হয়।" এই কথাই আরও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন "তৈল ও বর্ত্তিকাকে অবলম্বন করিয়া যেমন দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই বহিঃপরিচয়ের সহিত আরম্ভ করিয়া, বহিঃপরিচয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরের প্রেম-দীপটিও কায়িক বাচিক ব্যবহারকে অবলম্বন করিয়া অন্তর্লোকে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, এবং তাহারই শিখায় আমরা সমস্ত মনুষ্যলোককে আমাদের অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।"

ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার দার্শনিক চিন্তা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার দর্শনের সমগ্র রূপটি কল্পনা করা এখনও অসম্ভব। নানা দিকে ও নানা সরণিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহা যে রূপ লাভ করিবে তাহার জন্য আমরা উৎসুক ভাবে কালপ্রতীক্ষা করিতেছি। নানা দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে সত্য, কিন্তু জগৎতত্ত্ব আমাদের নিকট আলো ও অন্ধকারের দ্বারাই এখনও আবৃত। নানাদিক দিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের একদেশদর্শিতার দোষ অনেকখানি তিরোহিত হইবে ইহা আশা করা যায়। তাই আমাদের নিবেদন দার্শনিকপ্রবর ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার মতের পরিপুষ্ট ও পূর্ণাবয়ব রূপ আমাদের নিকট প্রকট করুন। তাঁহার মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা কঠিন। কারণ, তাহাতে মৌলিক Concept লইয়াই বিবাদ করা হইবে। তাঁহার মূল সূত্র মানিয়া লইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা যাইবে না। অবশ্য, এ মূল সূত্র সম্বন্ধে বিবাদের অবসান কোন দিন হইবে কিনা তাহা উৎপ্রেক্ষার বিষয়। তবে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ডক্টর দাশগুপ্তের দার্শনিকী গ্রন্থ হইতে অনেক কিছু ভাবিবার বিষয় পাইবেন এবং অনেক কিছু নূতন করিয়া ভাবিবার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিবেন।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমাদের সংক্ষিপ্ত অনুশীলনের উপসংহার করিব। ভারতবর্ষে দার্শনিক জগতে নূতন চিন্তার প্রচেষ্টা অনেক কাল হইতে বন্ধ রহিয়াছে। যাঁহারা দর্শন লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের সংখ্যাও বড় বেশী নহে। মৌলিক চিন্তার পরিমাণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে। যাঁহারা কোন দার্শনিক চিন্তা করেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা প্রায়ই পূর্ব্বতন দার্শনিকদিগের চিন্তার প্রভাব অতিক্রম করে না। অবশ্য যে কোন প্রণালীতেই চিন্তা করা হউক না কেন, প্রাচীন দার্শনিকদিগের বহুমুখী ও বহুধা বিচিত্র চিন্তাধারার কোন না-কোন ধারার সহিত তাঁহার কোন না কোন অংশে মিল থাকিবেই। কিন্তু এই আংশিক ঐক্য বা সাদৃশ্যের দ্বারা কোন দার্শনিক চিন্তার অখণ্ড স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না। দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য তাহার অখণ্ড স্বরূপের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে হইবে। অখণ্ড খণ্ডকে লইয়াই তাহার অখণ্ডত্ব বজায় রাখে—কাজেই খণ্ডগুলিকে অখণ্ড হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইবে না। ডক্টর দাশগুপ্তের চিন্তার অখণ্ড রূপ আমাদের নিকট সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হইলেও তাহার ছায়া ও ভঙ্গী আমরা উপলব্ধি করিতেছি। এই চিন্তা নবীন। ইহার মূলসূত্রে নানা বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্র হইতে আহৃত এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। নূতন করিয়া ভাবিবার ও দেখিবার আবশ্যকতা অনেক সময়ে যাঁহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ডক্টর দাশগুপ্ত মহাশয়ের চিন্তাধারার নবীনতা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিবেন, ইহা আশা করিতে পারি। সুধী সমাজে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহা অধ্যয়ন করা ও ইহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এসিয়া

(ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণকমলেষু)

শ্রীকালিদাস নাগ

বিচিত্র তোমার রূপ, বিরাট তোমার দেহ
বিষমপদ ছন্দে হয়েছে গাঁথা
জননী এসিয়া !
জন্ম দিয়েছ অগণ্য জাত অসংখ্য জীবকে
কেউ এখনও তোমার বুক আঁকড়ে আছে—
কোণ ছেড়ে দূরে চলে গেছে কেউ।
তবু পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশী মানুষ তোমারই বুকে
নানা আচার নানা ভাষা নানা ধর্ম্ম—
যেন মনে হয় অনৈক্যের মহাকাব্য।
অথচ তার মধ্যেই জেগেছে যুগে যুগে
ঐক্যের অমর বাণী।
কি ক'রে ? কেন ? তার জবাব মেলে না।
মানুষের আদিম চেতনা বিধিবদ্ধ হ'ল বেদে—
তার মধ্যে শুনি :
"সত্য সে অসীম জ্ঞান, আনন্দে সে পায় রূপ
মূলে সে দ্বৈতহীন, কর্ম্মে সে কল্যাণ শিব
কর্ম্মান্তে অপরিসীম শান্তি"।
আজ সেই মহাদেশের ইতিহাসে দেখি
পদে পদে দ্বৈত দ্বন্দ্বের বেড়ি
কর্ম্মে নেই কল্যাণের সাড়া
সমাজে অ-শিব ভূতের উৎপাত
আনন্দ গেছে উড়ে, শান্তি পেয়েছে লোপ।

আর কি দেখি এই অবনতি দুর্গতির ধ্বংসস্তূপে ?
গেছে প্রায় সব, আছে তবু কিছু :
সব চেয়ে প্রাচীন সব চেয়ে বড় পাহাড় জাঙ্গাল
সব চেয়ে পুরান নর-কপাল চীনে যবদ্বীপে
বিন্ধ্য শিবালিক্ হিমালয়েও খোঁজ মিলবে।

মিশর সুমেরিয়ার সঙ্গে করছে মিতালি,
সিন্ধু-ভারতের মানুষ,
ইরাণে তুরাণে মঙ্গলে মালয়ে চল্‌ছে কোলাকুলি।
এল মাটি পাথর শাঁখ ঝিনুকের খেল্‌না
এল মণিরত্নের মহার্ঘ অলঙ্কার ;
রূপসীদের বাঁকা চাহনির তোড়ে
উজান বেয়ে চলে সভ্যতার স্রোত—
ভূমধ্যসাগরের প্রবাল, সুদূর চীনের জেড্-মণি
সিন্ধু-সুন্দরীর গায়ে চলে আসে অবাধে।
সাগরের তল থেকে ওঠে মুক্তা
মাটির বুক চিরে ওঠে সোনা হীরে
লক্ষ্মীর শ্রী ফোটে বাণিজ্যের বিস্তারে
ডাঙ্‌পিটে মানুষ ছোটে পৃথিবীটা লুটতে
সর্ব্বনাশের মুখে তুড়ি দিয়ে সর্ব্বজয়ী হতে ;
বাধা দিতে পারে নি মধ্যএসিয়ার মহামরু,
উত্তুঙ্গ ভয়াল হিমালয়,
অন্ধকার সাগর পার হয়ে মানুষ গেয়েছে
আদি উষার বন্দনা
আদিভারতের উদার আবির্ভাব
বিশ্বমানবের সমান আকূতি, অসীম ঐক্য।

সীমার কোটাল শুল্ক লুটেছে নিষ্ঠুর হাতে
ধন-রত্নের তবিল করেছে হাল্কা
কিন্তু ধ্যান-রত্নের উপর চলে নি ইন্‌কম্-ট্যাক্স।
দুনিয়ার দৌলত রাজ্য সাম্রাজ্য পড়ছে গুঁড়িয়ে
রাজায় রাজায় কুরুক্ষেত্র—
ইরাণে জাগে নতুন প্রশ্ন : "যুদ্ধটা বাইরে না ভিতরে ?

তলিয়ে দেখ ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব"
জরথুস্ত্রের প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ধৃতরাষ্ট্রের দল ;
গাথায় গাথায় গড়ে ওঠে জেন্দ্ আবেস্তা—
হিন্দু বেদের নূতন সংস্করণ
তার সাড়া পৌছয় আর্য্যাবর্ত্তে
বসে মানুষ জিজ্ঞাসায়, জাগে উপনিষৎ
সত্য অসত্য বিদ্যা অবিদ্যা মৃত্যু অমৃতের সন্ধান।
তত্ত্বদর্শী পুরুষ মুগ্ধ হয়ে শোনে
প্রজ্ঞারূপিণী মৈত্রেয়ীর বাণী :
"নিয়ে যাও অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে
মৃত্যু হতে অমৃতে"—
মৈত্রেয় বুদ্ধের আসতে দেরি হয় না
হিংসায় বিষিয়ে উঠেছে আকাশ
পৃথিবীর যজ্ঞবেদী রক্তে রাঙা
তাই কি জাগে অহিংসার মন্ত্র, মৈত্রীর সাধনা ?
সারা ভারত ছাপিয়ে ছোটে কল্যাণের ধারা
করুণার দীপালি জ্বলে দ্বীপ-ভারতে চীনে জাপানে
প্রশান্ত সাগর শোনে মহামানবের গান
ভারতকে নিয়ে বিরাট প্রাচ্য জুড়ে যেন মহাভারত অভিনয়—
কাব্যে দর্শনে কলায়
ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে নৃত্যে সঙ্গীতে
গড়ে ওঠে মহান সমন্বয়ের সুর-সঙ্গতি
তার আভাস জাগে লাওৎসা কনফুসাসের দর্শনে
কোবোদাইসি হোনেন নিচিরেনের সাধনায়।
ঘনিয়ে আসে মধ্য যুগের অন্ধকার
তারই মধ্যে ধেয়ে আসে ফিরদৌসি আল্‌বেরুণী মার্কোপোলো
বৌদ্ধ মঙ্গল-সম্রাটের নিমন্ত্রণে আসে
নানা ধর্ম্ম নানা ভাষা সংস্কৃতির নেতা,
পণ্ডিত পাদ্রি সাধক প্রচারক
মধ্যএসিয়ার উত্তুঙ্গ শিখরে বসে
প্রথম মানব-মৈত্রীধর্ম্ম-সঙ্গীতি।
সে সাধনার ধারা মেলে পশ্চিম-এসিয়ার ধর্ম্ম-সুরধুনীতে
ঈশার ধর্ম্ম মূসার ধর্ম্ম উর্ব্বর ক'রে তোলে
মরুভূমির বেদুইন প্রাণ
নতুন করে শেখায় সভ্যতাগর্ব্বী মানুষকে
প্রেমে সবার অবাধ অধিকার—সবার উপরে এক !

তর্কের ভিতরেই খ্রীষ্টভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি যায় মিলে
যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যেই হিন্দু-মুস্‌লিম মরমী করে কোলাকুলি
যেন গড়ে ওঠে বা অপূর্ব্ব মিলন !

হঠাৎ কালের ঘড়ির কাঁটা যায় পিছিয়ে
মৈত্রী হয় পঙ্কিল কাপুরুষতায়
শক্তি হয় লোভন জয়ের মাৎসর্য্যে
প্রচণ্ড বিক্রমে পশ্চিম পড়ে পূবের বুকে
নতুন ক'রে মানুষকে দেয় মন্তর
শান্তি ছায়া, প্রতাপ সত্য,
চাই বল চাই অর্থ চাই সাম্রাজ্য বিশ্বজোড়া।
পশ্চিমী বিশ্ববাদের সঙ্গে কেমন ক'রে মেলে পূবে বিশ্ববাদ ?
রাষ্ট্র-কলের চাপে পিষে যায় অগণ্য নরনারী
তাদের ঘামে তাদের রক্তে পঙ্কিল পৃথিবী,
তবু কলের চাকা থামে না,
মরতে মরতে ভাবে এসিয়ার মানুষ :
"লক্ষ বছর ধরে দেখছি অনেক রাজা ভাঙাগড়া
নতুন করে বইছে রক্তগঙ্গা দিকে দিকে
হয়ত পড়বে না টান মহাসাগরের জলে
ধুয়ে দিতে মানবের রক্তরেখা।"
মেল্‌বার মেলাবার সুযোগ আজ অসীম
কিন্তু লাগাও ভেদ, জাগাও অমিল,
হাতে হাতে চাই লাভ, সাম্‌নে যাই থাক্
এই ত আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি।
বিশ্বজোড়া বাণিজ্যের আয়োজন—
গর্জ্জে ওঠে কলকব্জার হুঙ্কার
কারখানার সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে পারে না
সেকেলে পৃথিবী !
পর্ব্বতপ্রমাণ জমে ওঠে দ্রব্যসম্ভার
কারো লাভ বেশী, কারো কম, লাগে দ্বন্দ্ব।
বাধে যুদ্ধ জাতে জাতে, চীনে-পাঁচিল ওঠে গড়ে,
মানুষ মরে পাঁচিলের ভিতরে বাইরে নিষ্ঠুর ক্ষুধায়,
ডিনার খেয়ে এসে হুকুম দেন মালিক ;
'মরুক কুলি মজুর ছোটলোকের দল,
পোড়াও শস্য খাবার সব দাম যতক্ষণ না বাড়ে,
চিরকাল মরে আসছে যারা মরুক্—মুনফা চাই'।

কোটি কোটি নরনারী অন্নাভাবে মরে অগণ্য গ্রামে
জনকতক সহরে মানুষ তাদের মরণ-বাঁচনের বিধাতা
তুলনা নেই তাদের ক্ষমতার
সীমা নেই তাদের সমৃদ্ধি বিলাসের
নাইবা থাকল গ্রামের মানুষের ভাত, কাপড়,
শিক্ষা স্বাস্থ্য আলো হাওয়া,
সহর উঠুক ঝকমকিয়ে—সহরের জন্যেই ত গ্রাম!
এক দল খাটে এক দল খায় এই ত সমাজনীতি।

অগণ্য দুর্ব্বাক নিরন্ন নিস্তেজ সন্তান বুকে নিয়ে
প্রাচীন পূর্ব্ব ভাবে নূতন পশ্চিমের কথা
নূতনে পুরাতনে এতই প্রভেদ,
এত বৈষম্য কি সত্য না মায়া?
ভেবে পায় না কবে কেমন করে উঠ্‌ল
এত বড় ব্যবধান!
একদিকে শৃঙ্খলিত নিরুপায়
অন্যদিকে জয়দৃপ্ত উপেক্ষা—
মধ্যে পৃথিবীর বুক চিরে চলেছে বয়ে
মূক মানব-বেদনার মহানদী,
নিঃশব্দে পড়ছে ভেঙে পাড় দুদিক দিয়ে
হয়ত কারো চোখেই পড়ছে না
কারো বা পড়ছে,
এতটুকু বোঝা-পড়ার জন্যে প্রতীক্ষা করছে
অসংখ্য মানুষের যুগসঞ্চিত নিষ্পেষণ,
মানুষের সময় হয়ত নেই
বিধাতার ধৈর্য্য হয়ত আছে।

অপরিসীম করুণা, অক্ষয় ক্ষমা,
সাধারণ মানুষের অনর্জ্জিত ধন—
আছে যেন কোথাও!
তা'তে কেউ পারে না হাত দিতে, কেউ করে না লুট,
যে ধন খোয়া যায় না জুয়ার খেয়ালে
জুয়াচোরের চালবাজিতে,
সেই ব্যয়হীন ক্ষয়হীন কারুণ্য ভাণ্ডার থেকে
বেরিয়ে আস্‌বে না আবার কল্যাণলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা
অগণ্য নিরন্নদের বাঁচাতে?
মুমূর্ষু শিশুকে ফেন-ভাতের পথ্য দেয়
গ্রামের জননী,
কোলে তার মরে শিশু,
সৎকারের সামর্থ্য নেঃ
চোখের জল চেপে বেরয় ভিক্ষায়—
সে অশ্রুর দাম যদি থাকে,
পড়বে সাড়া, আস্‌বে কেউ
দিতে অন্ন দিতে স্বাস্থ্য দিতে নূতন প্রাণ;
আস্‌বে কেউ ভৈষজ্য-গুরু হয়ে
আন্‌বে মৃতসঞ্জীবনী সুধা
নূতন তেজ নূতন মনুষ্যত্ব।
আস্‌বে কেউ দীপঙ্কর হয়ে
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে জালিয়ে দেবে আবার
সত্যের আনন্দের প্রেমের দীপালি।
যুগসঞ্চিত বুভুক্ষা অস্বাস্থ্য অন্ধকার
যাবে দূর হয়ে।
উপেক্ষিত নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষ,
চিরকালের মানুষ,
সব জাতের সব দেশের মানুষ,
হাত জোড় ক'রে
মাথা নীচু করে
উদয়াচলের দিকে তাকিয়ে
গেয়ে উঠ্‌বে নরনারী শাশ্বত বন্দনা
পূর্ব্ব পশ্চিমের ভেদ ঘুচিয়ে।
সব দুঃখী সব হতভাগ্যের মুখে হাসি ফুটিয়ে
জাগাবে এসিয়া মিলনের ঐকতান—
জয় শান্তি জয় মৈত্রী
জয় মানবের অখণ্ড চিরন্তন মিলন।

দেবতা

শ্রীসুশীল জানা

দেবতার জন্ম।...

সেদিন গোধূলির আকাশ অন্ধকার করিয়া রূপ-কথার ঝড় উঠিয়াছিল। মুখে ঘাস লইয়া গাভীগুলি ফিরিয়া আসিয়াছে—আসে নাই কেবল কাজলী। রাখাল বালক উদ্বিগ্ন মনে ছুটিয়াছে প্রিয় গাভীটির সন্ধানে। খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে কাজলীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে বালুয়াড়ীর পাশে--বাদাম-জঙ্গলের অন্তরালে। সেদিন বালক বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিল, কাজলী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া—তাহার সমস্ত দুগ্ধ বিনা-দোহনেই বালির উপরে ঝরিয়া পড়িতেছে। দেবতার জন্ম হইয়াছিল সেইখানে।

এ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাহিনী। সেই কাহিনী বাঁচিয়া আছে সরল বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া, কিন্তু দেবতার বাহ্য আড়ম্বর সন্দিগ্ধ মনের উপর ভর করিয়া বৎসরের পর বৎসর দেউলের চূড়ায় সোনার কলস, রূপার কলস সাজাইয়াছে, দেবালয়ের প্রাঙ্গণ বিস্তৃত করিয়াছে, নাটমন্দির তুলিয়াছে, নতুবা যে দেবতা সন্তুষ্ট হইবে না। সন্দিগ্ধ মন সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই তাই চৈতালী ঝড় উগ্রদেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া ধুলাবালি উড়াইয়া চারি দিক অন্ধকার করিয়া ফেলে, বাদাম-ঝাউয়ের শ্রেণী গভীর আর্ত্তনাদে মর্ম্মরিত হইয়া উঠে, অদূরবর্ত্তী সমুদ্র-কল্লোল যাত্রীর মনে শঙ্কা জাগাইয়া তুলে। কাহিনী বলে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই রাখালরাজ ওই সময়ে আসিয়া পাপীর বিধান দিয়া যায়। মহামারী ছড়াইয়া পড়ে।

সেদিনও বাতাস ক্রমশঃ জোরে বহিতেছিল। যাত্রীদের গরুর গাড়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়াছে—সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকার পথ দিয়া। এই সময়টায় গাজন উপলক্ষ্য করিয়া বুড়াশিবের উৎসব চলে। মেলা বসে—বহু দূর দূরান্তর হইতে যাত্রীরা আসে।

গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলিয়াছিল, এমন সময় পাশের বাদাম-বনের ভিতর হইতে এক জন স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিল—আকৃতি দেখিয়া উন্মাদ বলিয়াই বোধ হয়। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মোহন গোঁসাইকে চেন গো? সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, সুবল নাম!...

গাড়োয়ানের নিকট হইতে উত্তর আসিল—না, এখনও ত খোঁজ পাই নি। পেলে বলবো।

যেন অভ্যাস-মত উত্তর। যাহারা এই পথ দিয়া যাতায়াত করে তাহাদের এই রকম উত্তর দিয়া যাইতে হয়।

যাত্রীরা কেহ গাড়ীর ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, কেহ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। স্ত্রীলোকটি হতাশ হইয়া মর্ম্মায়মান বনের মধ্যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া চলিল--মোহন গোঁসাই...সুবল রে...

বধূ মালতীমালা উৎসুক কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল--কে বল ত গো?

—কে হারিয়ে-টারিয়ে গেছে বোধ হয়। তাই...

—না বাবু, হারান নয়—ভেতরে আরও কথা আছে, গাড়োয়ান ভণিতা করিয়া বলিল, ওকে ডাকে লোকে বিশু-পাগলী ব'লে—আসল নাম বিশাখা। বোষ্টমের মেয়ে...

সে যেটুকু জানিত বিবৃত করিয়া গেল। খুব অল্পই সে জানিত। তাই কতকগুলা মিথ্যা কথা জুড়িয়া একটু দীর্ঘ করিয়া চটপট্ উপসংহার করিল: ঝড় উঠবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বাবু আজকে। বলা যায় না, রাখালরাজ হয়ত আসবেন। যাত্রীদের আর দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না তা হ'লে বাবু। তিনি কি আর একা আসবেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন ঝড়, শিলাবৃষ্টি, মহামারী...পাপীর সাজা দেবার মালিক তিনি। আহা, দয়াময়।

গাড়োয়ান অদৃশ্য মালিকটিকে প্রণাম করিল।

বধূ সশঙ্কিত চিত্তে রুগ্ন শিশুটিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া উন্মাদিনীর বাতাসে-ভাসা কণ্ঠস্বর উৎকর্ণ হইয়া

শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আর তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। আবার হয়ত কোন বনান্তরালে মিশিয়া গিয়াছে—পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে একটা বেদনার্ত্ত ইতিহাস!

প্রায় বছর-দশেক পূর্ব্বে এই শিবসাগর গ্রামে ঠিক এই সময়টায় প্রথানুযায়ী বুড়াশিবের গাজন উপলক্ষ্য করিয়া মেলা বসিয়াছিল। সপ্তাহভোর উৎসব চলে; এই সাতটা দিন বিভিন্ন যাত্রার দল পাল্লা দিয়া পর পর গাওনা করে। সে-বারে কোন একটা যাত্রার দল নিতান্ত হাস্যকর গাওনা করায় কানাঘুষা চলিতেছিল, এ কি আর যাত্রা গো···পরশু মোহন গোঁসাইয়ের দল হবে যা শুনে সুখ হয়। শুনবে আর খালি চোখ ফেটে জল বেরুবে। প্রহ্লাদ গাওনা ক'রেছিল একবার— কেঁদে লোকে আসর ভিজিয়ে দিলে না!

গোঁসাই-অপেরার সাজপোষাকের বড় বড় বাক্সগুলা আসিয়া পৌছিয়াছে, আসামীরাও আসিয়াছে। অনেকেই সুপুরুষ দেখিয়া এবং কথার হাব-ভাবে 'য়্যাক্টোর' বীজ নিহিত দেখিয়া আঁচ করিতেছিল, এই লোকটাই বোধ হয় মোহন গোঁসাই হবে।···

কিন্তু মোহন গোঁসাই তখন আসিয়া পৌছায় নাই—ঠিক বাহির হইবার মুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। সুবল অর্থাৎ প্রহ্লাদ যে সাজিবে তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে তাহার খোঁজ মিলিল ঈশান দাসের পোড়ো বাড়ীর মধ্যে;—সোনা পোকা ধরিতে সুবল তখন নিতান্ত ব্যস্ত। 'মোশান মাষ্টার' ঋষি দাসকে দেখিয়াই পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু মাষ্টার খাঁ করিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস্ করিয়া গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া বলিল, পালান হচ্ছে কোথা—ওদিকে সবাই আমরা বসে···এক ফোঁটা ছেলে—ঢিট ক'রতে হয় কি ক'রে তা ঋষি দাস জানে। সে মুখ্যু নয়···

অগত্যা যাইতে হইল সুবলকে।

সুবলকে লইয়া পথহাঁটাই হইল মুস্কিল। পড়ন্ত রোদটাই যেন বেশী চড়া। মাথার গামছা ঘন ঘন শুকাইয়া যাইতেছে—পুকুরের অভাবে ঘন ঘন গামছা ভিজানও মুস্কিল। ক্লান্ত সুবল সম্মুখের দূরতর পথের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, পথ আর কত দূর যেতে হবে গোঁসাই-কাকা?

মোহন উত্তর দিল, এখনও অনেক দূর—যেতে সেই দু-পহর রাত।

দু-পহর! সুবল ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, গাছটার তলে একটু ব'সব গোঁসাই-কাকা। যে রোদ···

—তাই ব'স, রোদই বা আর কতক্ষণ—আর একটু পরে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ যাওয়া যাবে। সেই সকালে ওদের সঙ্গে গেলে এতক্ষণে পৌছে যেতিস্ মেলায়।

সুবল বসিয়া পড়িয়া বলিল, রক্ষে কর গোঁসাই-কাকা—ওদের সঙ্গে কিছুতেই আমি হাঁট্‌তে পারতাম না। তাই ত সকালবেলা লুকিয়েছিলাম। মাও বললে তোমার সঙ্গে যেতে···

মোহন সোৎসাহে বলিল, তোর মা তাই বলেছিল বুঝি! মোহনের আরও কিছু জানিবার ছিল কিন্তু জিজ্ঞাসু মনকে শাসন করিয়া বলিল, তোর পোঁটলায় কিছু বাঁধা আছে নাকি!—খেয়ে নে এই বেলা, আগে গেলে আর ভাল জল পাবি নে—সব লোনা।

সুবল চিঁড়া ভিজাইয়া আনিয়া দুই ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া মোহন বলিল, ও কি কচ্ছিস্ রে!···

—কেন, তুমি খাবে না?

—আমি! আরে রাম···ওই দুটি ত, তুই খেয়ে নে। ছেলেমানুষ—তোর জন্যে দিয়েছে আর আমি···

—না গোঁসাই-কাকা, তোমার জন্যেও যে মা দিয়েছে। এই দেখ না, রসকরা এতগুলো···কাল মা রাত্রে তৈরি ক'রেছে যে!

মোহনের কৌতূহল হইতেছিল জিজ্ঞাসা করে, আমার জন্য পাঠাইবার তার কি প্রয়োজন ছিল? কৌতূহল হইতেছিল সুবলের নিকট হইতে তাহার মনের সমস্ত কথা জানিয়া লয়। কিন্তু তাহা অশোভন হইবে অধিকন্তু অসম্ভব। মোহন গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, তর্ক না ক'রে খেয়ে নে দিকি চট্‌পট্—অনেকটা যেতে হবে যে!

সুবল কিন্তু বসিয়া রহিল।

মোহন একবার তাহাকে আড়চোখে দেখিয়া লইয়া বলিল, খেলি নে এখনও!

সুবল মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, মা বললে যে তোমাকে দিতে! বললে, তোর গোঁসাই-কাকা রসকরাই ভালবাসে। তাই···

মোহন হাসিয়া বলিল, কই দে তবে। মুস্কিলে ফেললি দেখছি। তোর মাকে এবার ফিরে গিয়ে বলিস্—বুঝলি, যে গোঁসাই-কাকা বলেছে, ওরকম লোভ দেখিয়ে কি হবে। হ্যাঁ, পেতুম এ-রকম রোজ, দু-দিন একদিন দিয়ে আসল বৈরাগী মানুষকে শুধু লোভী ক'রে দেওয়া। তার পর একটা রসকরা মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, তোর তবু মা আছে সুবল—রসকরা ক'রে দেয়, চিঁড়ে বেঁধে দেয়; মোহন হাসিল—পুনরায় বলিল, আমার কেউ নেই যে এমন দেয়—না আছে মা, আর না আছে কেউ। এমন কপাল···মোহন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভাবিল, মিথ্যা কথা—তার কিইবা নাই। আসল কথা—সংসার পাতিতে তার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। সংসারের মায়া-মমতা, ইহার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে তাহাকে বৈরাগী সাজাইয়া, নিঃস্ব-কাঙাল সাজাইয়া কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে।

সুবলকে শেষ পর্য্যন্ত কাঁধে তুলিতে হইল।

ঝাউগাছে বাতাস লাগিলে শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এমন যে ভীতিপ্রদ শব্দ হয় তাহা সুবলের নিকট নিতান্ত অজ্ঞাত। তাহার উপরে পথের দু-পাশে নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অদূরে মেলার আলোগুলা জ্বলিতেছে, শরীরও যথেষ্ট ক্লান্ত—এই সমস্তগুলা একযোগে তাহাকে ভীতার্ত্ত করিয়া তুলিল। সে যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইল, অসংখ্য ভূত-প্রেত মুখে আগুন জ্বালাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া চারি দিকে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নরমুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিতেছে। সুবল ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঋষি দাস হাসিয়া বলে, মোহন, সুবলের জন্যে দুধ কেনাটা না-হয় বাদই দিয়ে দাও। সবাই যে রকম হাসাহাসি আরম্ভ করেছে—বলে, আমাদের গোঁসাই-ঠাকুরের হঠাৎ এ হ'ল কি! ননী বোষ্টমের ছেলে সুব্লা—যে ফেন-ভাতও···ঋষি দাস মোহনের মুখের অবস্থা দেখিয়া আর বলিল না।

মোহন বিকৃতমুখে হাসিয়া বলিল, আরে ভাই, পরের ছেলে—বিদেশে এনেছি। ভালয় ভালয় তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে হয়। একটি মাত্র ছেলে রে ভাই, না আছে স্বামী আর না আছে কেউ, বুঝলে না···

ঋষি দাস বোধ হয় বুঝিল তাই, আর প্রতিবাদ করিল না। রিহার্সাল আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে চলিল।

দুই দিন জোর রিহার্সাল চলিতেছিল—মোহন গোঁসাইয়ের দল 'প্রহ্লাদ' গাওনা করিবে। যাহারা পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছে তাহারা মহা গৌরবভরে বলিতেছিল, কি বলে নামটা ওর—কয়াধু, মোহন গোঁসাই কয়াধু সাজলে পুরুষমানুষ ব'লে আর চেনা যায় না ভাই রে—সাজ-পোষাকও তেমনি, সাক্ষাৎ একেবারে মহারাণী। আর সেই প্রহ্লাদ···আহা!···

কিন্তু দৈবের উপরে নাকি হাত চলে না, তাই যে-দিন মোহন গোঁসাইয়ের দলের গাওনা করিবার কথা সেদিন সকালে সুবলের সারা অঙ্গে দুঃসহ বেদনা জাগাইয়া বসন্ত দেখা দিল। ইতিমধ্যে মেলায় চিরাচরিত প্রথামত বসন্ত ও কলেরা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। 'মোশান মাষ্টার' ঋষি দাস বিপদ বুঝিয়া আর এক জনকে প্রহ্লাদের জন্য তৈরি করিতে লাগিল। সকাল হইতে বুঝাইয়া-পড়াইয়া আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে তাহাকে রীতিমত প্রহ্লাদ বানাইয়া ছাড়িয়া দিল।

অনেককে হতাশ করিয়া যাত্রা কিন্তু তেমন জমিল না।

অভিজ্ঞরা অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, আরে ধ্যেৎ—এ কি 'ম্যাক্টো হচ্ছে', শুনেছিলাম সে বছর···

কয়াধু নিতান্ত অন্যমনস্ক—বার-বার কথাগুলো ভুল হইয়া যাইতেছে। কোথায় মূলে যেন সমস্ত গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। আসর হইতে বাহির হইয়াই কয়াধু অনুসন্ধান করে—সুবল এখন কেমন আছে হে?

সুবল তখন অঙ্গের দুঃসহ বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের তৃষ্ণা যেন তাহাকেই আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। যন্ত্রণা উপশমের আশায় মাথাটা এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে কেবলই ডাকিতেছিল, ওঃ—মা গো।

কয়াধু সুবলের শিয়রের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবল নিষ্প্রভ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া যন্ত্রণার একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল।

কয়াধু সুবলের পাশে বসিয়া পড়িল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করে, খুব কষ্ট হচ্ছে—না রে? কয়াধুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসে। নিমপাতার আঁটিটা গায়ে বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, খুব চুলকচ্ছে—না?

সুবল পীড়িত মনের মানস চক্ষে দেখিতে পায়—মা

শিয়রের নিকট আসিয়া বসিয়াছে—চোখে যেন দুই ফোঁটা জল। অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলে, মা, বড্ড ব্যথা।

মা কোন সাড়া দেয় না—অশ্রুসিক্ত দুইটা অপরাধী চক্ষু দিয়া নীরবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে—নিমপাতা-গুলা সর্ব্বাঙ্গে বুলাইতে থাকে। সুবল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অতিকষ্টে কয়াধুর কোলের উপর মাথাটা তুলিয়া দেয়। আরাম করিয়া মাকে যেন জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া মায়ের অদৃশ্য স্নেহটুকু উপভোগ করিবার চেষ্টা করে। চক্ষু মুদিয়া সে যেন শুনিতে পায়—কত দূর-দূরান্তর হইতে ঋষি মাষ্টার ডাকিতেছে, মোহন···ও মোহন—আরে কয়াধু গেল কোথা! নাঃ, মাটি ক'রলে দেখ্‌ছি···

কয়াধু নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া। কোল হইতে সুবলের মাথাটা নামাইতে তাহার সাহস হয় না—হয়ত ছেলেটার তন্দ্রার ঘোরটা কাটিয়া যাইবে। এখন হয়ত যন্ত্রণার একটু লাঘব হইয়াছে। অপরাধীর মত অনড় ভাবে বসিয়া থাকে।

অপরাধীই ত—মোহন ভাবে, এক জনের নিকট সশ্রদ্ধ প্রশংসা কুড়াইতে গিয়া, স্বাভাবিক ভালবাসা, সহজ সরল ভালবাসা কুড়াইতে যাইয়া, নিজেকে মহানুভব সাজাইতে গিয়া অবশেষে সে এ কি কুড়াইবে! সুবল যখন তাহার মা'র নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিবে, গোঁসাই-কাকা আমাকে একটুও যত্ন করে নি মা—আর আমি ওঁর সঙ্গে কিছুতেই যাব না, তুমি কিন্তু কিছু আর বলতে পাবে না। উঃ, বসন্ত হ'লে গা-হাত কি ব্যথা হয় মা—আর চুলকানি, কেউ একটু নিমপাতাটাও বুলিয়ে দেয় নি গায়ে···ইত্যাদি। তাহা হইলে মোহন যাহা পাইয়াছে তাহাও যে হারাইবে! কেবল-মাত্র সুবল ফিরিয়া গিয়া তার মা'র কাছে ভাল বলিবে এই জন্য মোহনের অন্তরে বাহিরে যে কত চেষ্টা—সে কাহাকে তাহা বুঝাইবে। সুবলের যাহাতে কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা না-হয়, সে যাহাতে ভাল থাকে—এক-কথায় কোন অনুযোগই যেন না উঠিতে পায় মোহন সেজন্য যথেষ্ট সতর্ক হইয়াছে, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। দুর্ভাগ্য কপাল তাহার —অবশেষে তাই এমনটা ঘটিল।

যাত্রা কোন রকমে গোঁজামিল দিয়া শেষ হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে মোহন দলের সমস্ত লোকজনকে রওয়ানা করিয়া দিল। ঋষি-মাষ্টার যাইবার সময় সাশ্চর্য্যে বলিল, তুমি কি এখানে একা থাকতে চাও নাকি মোহন!—এই রোগী নিয়ে!

মোহন মৃদু হাসিয়া বলিল, উপায় আর কি! যাও তোমরা—ও একটু ভাল হয়ে উঠলেই যাচ্ছি আমি।

তাই কি হয়! ঋষি মাষ্টার বলিল, আমাকে কি পশু ঠাওরালে নাকি! এই অবস্থায় আমি তোমাকে একা ফেলে যাব! ওরা যাক্—আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

ঋষি-মাষ্টার বলে, মোহন, ছোঁয়াচে রোগ—অত মেশামেশি ভাল নয়।

মোহন কেবল নির্ব্বোধের মত হাসে। সুবলের রোগ-শয্যার উপরে বসিয়া বসিয়া ভাবে, সুবলকে এই যে এত সেবা-যত্ন করা—ইহা সুবলের জন্য না তাহার মায়ের জন্য! সন্দিগ্ধ মন তাহার যাহাই ভাবুক না কেন—যাহাই বলুক না কেন, এই শিশুটাকে ভালবাসিবার ভান করিতে করিতে এখন সে সত্যই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সুবলের মারাত্মক বসন্তের কথা ভাবিয়া এবং হয়ত সে আর বাঁচিবে না এই ভাবিয়া তাহার মনে হয়, বহু দূরান্তরের এক জন বিধবার কি ক্ষতি হইবে ঠিক জানা নাই, তবে তাহার যেন বিশেষ ক্ষতি হইবে। তাহার রোক চাপিয়া যায়—ইহাকে বাঁচাইতেই হইবে, তাহাকে তাহার সাধ্যমত এবং যদি সম্ভব হয় ত সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াও ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। তাহাদের সমাজের মধ্যে, তাহাদের গ্রামের মধ্যে বিশাখা বলিয়া এক জন যে বিধবা আছে এবং সেই স্ত্রীলোকটিকে খেলার সাথীর জীবনকাল হইতে আজিকার এই যৌবন পর্য্যন্ত যে সে একনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছে—এইটুকু দেখাইবার জন্য সুবলকে যত্ন করিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে—ইহা সে ভুলিয়া গেছে। এখন সুবলকে ভালবাসে বলিয়াই তাহার যেন এই সমস্ত করা। ইহার মধ্যে কোথাও কোন বাঁকা-চোরা মানে নাই।

ঋষি দাস মোহনের নির্লিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলে, মোহন, ছেলেবেলায় অনেককে অনেকের ভাল লাগে—তার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভালবাসায় দাঁড়ায়। আমি

তোমার অনেক কথাই জানি, আবার হয়ত অনেক কথাই জানি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব—বলবে ?

মোহন কোন উত্তর দিল না—নীরবে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

ঋষি-মাষ্টার বলিল, বিশাখাকে তুমি ভালবাস জানি আর একথা খুব ছেলেবেলা থেকেই জানি। তোমার বাবা-মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তার ননী বৈরাগীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আর তুমিও সে সময়ে অনুযোগ করবার সুযোগ পাও নি—তাও জানি। কিন্তু পরে ত তুমি তাকে গ্রহণ করতে পারতে! সে যখন বিধবা হ'য়ে ফিরে এল তখন তোমার বাবা-মাও বেঁচেছিলেন না এবং বাধা দেবারও কেউ আর ছিল না। তা ছাড়া, এই রকম ভাবে গ্রহণ করা—এ ত আমাদের সমাজে অচল নয় মোহন!

মোহনকে নির্ব্বাক দেখিয়া ঋষি-মাষ্টার আবার বলিল, এ হয়ত তুমি নিছক আত্মাভিমানের জন্য কর নি। আবার তারই ভয়ে হয়ত তুমি সুবলকে ভালবাস। শুনি—ভালবাসা ব্যর্থ হ'লেও যার বুকে থাকে সে নাকি সত্যিই ফাঁকি পড়ে না। যা হোক একটু ঠাঁই পেলেই লতিয়ে ওঠে—এ হয়ত তাই। তোমার ভাবভঙ্গী আমি বুঝে পাই নে মোহন!...

মোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হ্যারিকেনের দমটা কমাইয়া দিতে দিতে বলিল, শুয়ে পড় ঋষি—রাত হয়েছে।...

মোহন যাই করুক—সুবলকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাইতে পারিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বাতাসের জোর বাড়িতেছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সন্ধ্যারতির সময় বলিয়াছিল, আজ রাত্রের গতিক সুবিধে নয়—মনে হচ্ছে রাখালরাজ আসবেন। ভগবান জানেন কার কি পাপ·· যাত্রীর দল চালাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহাই আলোচনা করিতেছিল। যাহাদের রোগী আছে এবং যাহাদের মধ্যে রোগের কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না তাহারাও দেবতার নামে কিছু কিছু মানৎ করিয়া রাখিতেছিল।

মোহনও মানৎ করিয়া রাখিয়াছিল, সুবলকে বাঁচাইয়া দাও ভগবান।...

উদ্দাম বৈশাখী বাতাস ক্রমশঃ বাড়িতেছিল—উপরের চালাটা কড়কড় করিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল—বাতাসে বোধ করি উড়াইয়া লইয়া যাইবে। ঋষি-মাষ্টার ওপাশে ঘুমাইতেছে। হ্যারিকেনটা প্রকৃতই জ্বালা আছে কিনা বুঝা যাইতেছে না—কালি পড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে।

মোহন সুবলের মুখের উপর ঝুঁকিয়া ছিল—এক সময়ে তাহার নাকের কাছে হাত লইয়া গিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে কিনা। মোহন কিছুই বুঝিতে পারিল না—মৃদু একটু ঠ্যালা দিয়া ডাকিল, সুবল···

তার পর দুই-তিন বার ডাকিল কিন্তু কোন সাড়াই নাই। মোহন ভাবিল, শেষ হইয়া গেল নাকি! — কখন! সকলে ঘরে ফিরিয়াছে—শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত জননী জাগিয়া। ভগবান! —সেখানে একা ফিরিয়া গিয়া কি বলিব! মোহন বিহ্বল হইয়া উঠিল, সুবলকে জোরে ঠেলা দিয়া ডাকিল, সুবল···

মোহন হতাশ হইয়া উঠিয়া দাড়াইল। আজ সকাল হইতে তাহারও গায়ে যেন অল্প অল্প বেদনা বোধ হইতেছে। মোহন ভাবিল, এমন যদি হইত যে আজ রাত্রের মধ্যেই সে মরিয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে···মনে সে যথেষ্ট শান্তি পাইত। ঋষি-মাষ্টার আছে—ঠিক সময়ে দেশে সংবাদটা পৌছাইয়া দিত।

মোহন দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকজ্যোৎস্নার অন্ধকার—ধুলাবালি উড়াইয়া, বাদাম-ঝাউয়ের গাছে অখণ্ড মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া বৈশাখী বাতাস বহিতেছে। মোহন তাহারই মধ্য দিয়া অন্যমনস্ক ভাবে মন্দিরের দিকে চলিল। সে ভাবিতেছিল, সুবল মরিল—তাহার সমস্ত কিছু ব্যর্থ করিয়া দিয়া গেল—ভগবান! বিশাখা,—বিশাখার নিকটে কতখানি সে অপরাধী হইয়া রহিল! তাহার এত ভালবাসা, এত···সে কাঙাল হইয়া গেছে!···মোহন অস্থির চঞ্চল মনে কখন ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে মোহন দেবতার নিকটে তাহার মনের অসংখ্য কথা জানাইতেছিল, মৃত্যুকামনা করিয়া বলিতেছিল, অপরাধী কি জবাব দিবে!—যেন আর না ফিরিতে হয়।

ভোর হইতে বিলম্ব নাই—ঋষি-মাষ্টারের ঘুম ভাঙিয়া

গেল। সুবলের মৃত্যুশয্যার নিকটে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে কিছু মাত্র সে বিস্মিত হইল না। ইহা যে ঘটিবে তাহা সে পূর্ব্বেই জানিত কিন্তু মোহন কোথা!

সমস্ত যাত্রী তখন মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। মাষ্টার তাহাদের অসংলগ্ন কথায় বুঝিল, মন্দিরে নাকি চোর ধরা পড়িয়াছে।

চোর ধরা পড়ে নাই, তবে অজ্ঞান হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে। প্রধান পুরোহিত বুঝাইতেছিল যে, কাল ঝড়ের মধ্য দিয়া রাখালরাজ আসিয়াছিলেন এবং পাপীর বিধান দিয়া গিয়াছেন। দেবতার নাকি সমস্ত অলঙ্কার চুরি গিয়াছে—কিন্তু তাঁহার নিকটে নাকি ফাঁকি চলে না—তাই চোরদিগের মধ্যে এক জন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু দেবতা প্রধান পুরোহিতকে স্বপ্নে বলিয়াছেন, নিষ্কৃতি পাইতে হইলে যাত্রীরা যেন তাহাদের যথাসাধ্য কিছু কিছু অর্থ নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য দিয়া যায়।

ঋষি-মাষ্টার কৌতূহলী হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, চোর নয়—মোহন গোঁসাই, মুখে সুস্পষ্ট বসন্তের চিহ্ন। উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে মুহূর্ত্তে সে বাহির হইয়া আসিল। ব্যাপার সুবিধা নয়—চোরদিগের মধ্যে এক জন বলিয়া তাহাকে ধরা—ইহাদের কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

ইহাও বিচিত্র নয় যে রাখালরাজ সত্যই আসিয়াছিল, হয়ত পাপীর সাজা দিয়া গিয়াছে। কাকজ্যোৎস্নার রাত্রে এই পথে যাইতে যাইতে ঝড় উঠিলে, উন্মাদিনীর বেদনার্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনিলে কাঙাল বৈরাগীর অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটা বেদনাঘন ইতিহাস পথিক যেন একবারও স্মরণ করে।

"হে সংসার, হে লতা"

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কাল রাতে চুপি চুপি বস্‌লে পাশে
অন্ধকারে—
ছায়া-ঢাকা মুখখানি এলোমেলো চুল
অন্ধকারে।
চিনেছি যা চিন্‌বার, জেনেছি যা জান্‌বার
এই জীবনে—
কাছে এসে বসো শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকো
সান্দ্রক্ষণে।
হাতখানি ধ'রে থাকি, ঘামে ভেজা হাতখানি
ব্যাকুল হয়ে—
ঘুম আর মরণের দূতগুলি চেয়ে থাকে
চাহি' উভয়ে—
ভাবনা নিবিড় রাতি, আঁধারে জাগি
জড়ায়ে জাগি।
উদাস বিবশ প্রাণ সাড়া নাহি দেয় আর
পরশ লাগি'।
এম্‌নি বস্‌লে পাশে চুপি চুপি কাল রাতে
অন্ধকারে—
ঘুমের পরীরা সব কোথা হ'তে নেমে এলো
অন্ধকারে—

*

ঘুমের পরীরা থাকে বহুদূর ঝাউবনে
নদীর পারে—
পেঁজা তুলো মেঘে থাকে আর থাকে মনে মনে
অন্ধকারে।
দু-জনেরে ঘিরি' তারা নেচে নেচে নেমে আসে
গভীর রাতে—
জোনাকির মৃদু আলো—শঙ্কায় শিহরাই
গভীর রাতে।
ঘুম আর মরণের দূতগুলি নেমে আসে
মিলন ক্ষণে
মিলন-মরণ আর নিদ্রা-মরণ
আঁধার মনে।

*

কাল রাতে চুপি চুপি বস্‌লে পাশে
অন্ধকারে—
সংসার-লতা মোর জীবনের লতা মোর
অন্ধকারে।

৭ই পৌষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্বোধন

আজ প্রত্যূষে যখন দেখলাম উদয়পথ মেঘে আচ্ছন্ন, আলোক অবরুদ্ধ, আকাশে দিগন্তে অপ্রসন্নতা প্রসারিত, তখন ক্ষণকালের জন্য মনে উদ্বেগের সঞ্চার হ'ল, ভাবলুম এই আনন্দ-উৎসবের আয়োজনে যেন প্রতিকূলতার কালিমা বিস্তীর্ণ হ'ল। কিন্তু পরক্ষণে একথা মনে হ'ল যে মানুষের উৎসবের ভূমিকা তো সহজ নয়, তার নির্ম্মল আনন্দের পথ অতি দুর্গম, সেই পথ অতিক্রম ক'রে অন্তরলোকে সত্যের আবিষ্কার হয়, সে সফলতা লাভ করে। মানুষের সত্যের আয়োজন অন্তরে, তার উৎসবের উপকরণ সাজসজ্জা বাইরে নয়, তাকে অন্তরে প্রস্তুত হ'তে হয়, সেখানে চিদাকাশের তামসকে নিজের সাধনার দ্বারা নির্ম্মল করা চাই।

মানুষ বিধাতার কাছে প্রশ্রয় পায় নি, তাকে আত্মশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সার্থকতা লাভ করতে হয়। কারণ আত্মাকে আপনার মধ্যে আবিষ্কার করা তার জীবনের সাধনা। আমাদের ঋষিরা সেই উপলব্ধির কথাই বলেছেন, বেদাহমেতং, তাঁকে দেখেছি জেনেছি, তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে দেখেছি। অন্ধকার তো বাহিরের নয়, তা মানুষের অন্তরে, তার সঙ্গে তাকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়।

পশুর সমান ধর্ম্ম নিয়েই মানুষ জগতে জন্মলাভ করে। পশুর হিংস্রতা স্থূলতা নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু তার আত্মা নিরন্তর অন্ধকারের আবরণ অপসারিত ক'রে অসীমের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে, মানুষের তো এই ধর্ম্ম, এই সাধনা।

আজ আকাশের কালিমায় এই কথা ব্যাপ্ত হয়ে রইল, যে, আনন্দ মানুষের অন্তরে। সেই আনন্দ অন্তর থেকে আহরণ ক'রে অকৃত্রিম নিষ্ঠার মধ্যে মানুষকে উৎসবের আয়োজন করতে হবে। হৃদয়ের সেই আলোকের দ্বারা সাধনাকে উজ্জ্বল কর, বিমল আনন্দের জ্যোতিতে জাগ্রত হও।

> বিমল আনন্দে জাগো রে
> মগন হও সুধাসাগরে।
> হৃদয় উদয়াচলে দেখো রে চাহি
> প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে॥

—

এই আশ্রমে যিনি নিজের সাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত করেন আমার সেই পিতৃদেবের তরুণ জীবনে মৃত্যু-শোকের অন্ধকার নিবিড় হয়ে আক্রমণ করেছিল। তিনি সেই অন্ধকারকে অপসারিত ক'রে একান্তভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে অমৃতের সন্ধান করেন। তাঁর জীবনীতে এ সময়ের বর্ণনায় বলেছেন যে, গভীর শোক সূর্য্যের জ্যোতিকে তাঁর কাছে কালিমায় আবৃত মনে করেছিল। তিনি তাতে শান্ত থাকতে পারেন নি। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন, তাঁর অসামান্য অতুল ধন-সম্পদের মধ্যে বিলাসিতার উপকরণ পুঞ্জীভূত ছিল। তার মধ্যে থেকে তিনি মনে সান্ত্বনা পান নি। এই ধনবিলাসের দুর্গ থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সহসা দারুণ আঘাতে সহসা তাঁর কাছে দ্বার উদ্ঘাটিত হ'ল। সংসারের আমোদ ও আরামে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাল, মৃত্যু-শোকের আঘাত পেয়ে তিনি একান্ত মনে সন্ধান করতে লাগলেন কিরূপে মৃত্যুর অধিকৃত সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। সে সময়ে যে-বাণী তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিল তা এই—"তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ", সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো, যাঁকে জানলে মৃত্যু ব্যথা দিতে পারে না।

মহর্ষির মনে মৃত্যু-শোকের ভিতরে অমৃতপিপাসু আত্মার আকাঙ্ক্ষা জাগল। যে অহং মানুষকে নিজের দিকে টানে

এবং আপন পুঞ্জীভূত উপকরণে অসীমকে অন্তরালে ফেলে, তাকে অপসারিত ক'রে দিয়ে তিনি মহান্ পুরুষকে জানতে পারলেন। তখন তাঁর যে কত ভার লাঘব হয়ে গেল, তা জীবনীতে লিখে গেছেন।

জীবনের এই অনুভূতি যখন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট, তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁর ধনসম্পদ ধূলিসাৎ হ'ল, পৈতৃক ব্যবসায় ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি সহজে এই দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নিতে পেরেছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে মানুষের অহং যখন উপকরণ নিয়ে আসক্ত থাকে তখন সে দারিদ্র্যের ভার সইতে পারে না। কিন্তু পিতৃদেবকে এই দারিদ্র্য পীড়া দেয় নি। যিনি আবাল্য ধনবিলাসে বেড়ে উঠেছেন, তিনি সেই ধনের অভাবদুঃখকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অবিচলিত হ'তে পেরেছিলেন, তার কারণ আত্মা যখন আপন আনন্দে পূর্ণ থাকে তখন কোনো বোঝাই তাকে অবনত করতে পারে না। মহর্ষি তাঁর জীবনে সেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। তিনি বিপদকালে অকাতরেই ঋণভার মোচন ক'রে দিলেন। বিষয়ী বন্ধুরা বলেছিলেন নানা কৌশলে এই ঋণদায় হ'তে অব্যাহতি পেতে, কিন্তু তিনি বললেন, 'যায় যাক্ সব কিছু ক্ষতি নেই, দুঃখ নেই।' তিনি পিতার ট্রাষ্ট সম্পত্তি বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু তাও মহাজনদের হাতে সঁপে দিলেন। তিনি বহু আয়াসে পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ শোধ করলেন।

আমরা মহর্ষির জীবনের আরেকটা দিক দেখতে পাই। তিনি বলেন নি যে সংসারের সকল কর্ত্তব্যের বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে বৈরাগ্য সাধন করতে হবে। তিনি গৃহী ছিলেন। তিনি বলেছেন যে সংসারের মধ্যে বাস ক'রেই আসক্তির বন্ধন ঘোচাতে হবে। "ফললাভে আসক্ত না হয়ে কর্ম্ম করতে হবে" গীতার এই বাণী তিনি তাঁর জীবনে প্রতিপালন করেন। তিনি বলেন যে মানুষ সংসারের কর্ত্তব্য পালন করবে কিন্তু মনকে মুক্ত রাখবে। মানুষ যখন পূর্ণ স্বরূপকে লাভ করে তখন সংসার তাকে ক্ষতির পীড়া দেয় না, দারিদ্র্যে তার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে না। তাই মহর্ষির জীবনে দেখতে পাই, সুনাবিক যেমন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে ভীত না হয়ে উত্তীর্ণ হবার উদ্যোগ করে, তেমনি তিনি সংসারের শোকদুঃখের তরঙ্গে দোলায়মান হয়েও জীবন-তরণী পরিচালনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বলেন সংসারধর্ম্ম পালন করতে করতে তৎসত্ত্বেও মুক্তি পেতে হবে সংসারের এই শিক্ষা। প্রমাণ করতে হবে মানুষ কেবল দেহমন নিয়েই কাল যাপন করবে না, দেহমনের অতীত যে আত্মা তারই আত্মিক ধর্ম্ম তাকে রক্ষা করতে হবে। তাকে সংসারের কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করতে হবে যে সে পশুধর্ম্মের অতীত।

আমাদের দেশবাসীরা বলে থাকেন যে এ সব মুনি-ঋষির কথা। আমরা সংসারী, আমরা পবিত্র ও মুক্ত হ'তে পারি না। কিন্তু এমন কথা মানুষের আত্মাবমাননার কথা। সংসার ও সন্ন্যাসকে বিভক্ত করা মানুষের শ্রেয়ঃ পথ নয়। গৃহী মানবকেই সন্ন্যাসী হ'তে হবে এবং নিরাসক্ত হয়ে সংসারধর্ম্ম পালন করতে হবে। আজকার দিনে পশ্চিমে ঘোর দুর্গতির কাল ঘনিয়ে এসেছে, দেশে-দেশে মানুষের মনে হিংস্রতার ও দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজকে যদি বলি যে বিজ্ঞানের পাঠশালা বন্ধ ক'রে গিরিগুহায় অরণ্যে চোখ বুজে বসে থাক তবে মিথ্যা বলা হবে। এ যেমন নিরর্থক, তেমনি যদি বলা যায় যে লুব্ধ স্বার্থকে বিস্তার কর, বিজ্ঞানের অস্ত্রে দুর্ব্বলকে মার, সেও তেমনি মিথ্যা কথা। কিন্তু বলতে হবে যে সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালনের মধ্যেই মানুষের আত্মিক শক্তিকে জয়যুক্ত কর। সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন কর, কিন্তু নিরাসক্ত ভাবে, আত্মার উদার লোকে সভ্যতাকে উন্নীত কর। আজকের দিনে একথা বলে লাভ নেই যে ধনসম্পদের আহরণ বন্ধ কর, যা কিছু সব ত্যাগ কর, কিন্তু মানুষকে বলতে হবে যে ঐশ্বর্য্য-সাধনার ভিতর দিয়েই সন্ন্যাসী হও, সংসারের মধ্যে থেকেই তোমার মাহাত্ম্যের পরিচয় দাও।

একদা ভারতবর্ষের সাধক সংসারের মধ্যে বাস করেই এই আধ্যাত্মিকতার সাধনা করেছিলেন। তাঁরা গৃহী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে এই সাধনাপথের পরিবর্ত্তন হ'ল, মানুষ অঙ্গে বিভূতি মেখে জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে আপনাকে শূন্যের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ যে নিভৃত নির্জ্জনতায় সাধনার আসন পেতেছিলেন সেখানেও সংসারীদের যাতায়াত ছিল। সব ত্যাগ ক'রে

চলে যেতে হবে মানুষের পক্ষে একথা সত্য হ'তে পারে না। সংসারের তিমিরান্ধকারের মধ্য হতেই আলোকের পথ আবিষ্কার করতে হবে, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানতে হবে।

আমার জীবনের একটা সৌভাগ্যের কথা ভেবে আশ্চর্য্য লাগে, সেকথা আজ বলতে চাই। এই আশ্রমের প্রারম্ভে আমাকে অসাধ্য ঋণভার ও দারিদ্র্যের বোঝা বহন করতে হয়েছে। আজকের এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন অকস্মাৎ ও সহজে হয় নি, এর পিছনে অনেক কৃচ্ছ্রসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টার ইতিহাস আছে। যখন এ স্থাপিত হয় সে সময়ে আমার নিজের সম্পত্তি ছিল না, দুর্ব্বহ ঋণের বোঝা ছিল। সেই অবস্থাতেই নিজেকে সমস্ত কর্ম্মভার এবং সকল ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। কিন্তু এই কাজ আমার সহজ হয়েছিল, কারণ আমার কর্ত্তব্যের প্রবাহ সহজেই আমাকে আমার নিজের থেকে সর্ব্বদা সরিয়ে রেখেছিল। আশ্রমের এই সুদীর্ঘ ৪০ বছরের ইতিহাসে আমাকে অনেক শোক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও কুৎসা থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই নি, এই প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে আত্মীয়-মণ্ডলী থেকে দূরে পড়ে গিয়েছি। প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না, কারণ বিষয়ীভাবে এই বিদ্যায়তন চালানো যথার্থই মূঢ়তা বলা যেতে পারে। তবু এই দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায় নিন্দা ও অকারণ উপেক্ষার পীড়ন সহ্য করা আমার কাছে সহজ হয়েছে তার একমাত্র কারণ যে, যে অহঙ্কারের ভার অহংকে পীড়িত করে কর্ম্মের প্রেরণাবেগে সে আপনিই কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছিল। যারা পর তারা আমার আত্মীয় হয়েছিল, যারা বাইরের তারা এসেছিল ভিতরে। কঠিন শোক দুঃখ আমাকে আক্রমণ করেছিল কিন্তু এই আশ্রম আমাকে পরাভব থেকে রক্ষা করেছে।

মানুষ আপনার কৃতিত্ব প্রমাণ করবার জন্য যখন কর্ম্মের আয়োজন করে তখন দ্বন্দ্বের অন্ত থাকে না, কারণ কর্ম্মক্ষেত্র তখন অহং ঘোষণার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আজ উৎসবের দিনে আমরা এই কথা বলব যে এখানকার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র আপনকে প্রচারের প্রয়াস নয়, আত্ম-উপলব্ধির সাধনা। এই আদর্শ আমাদের কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করুক, তবেই বিদ্যালয়ে ও আমাদের চারি দিকের পল্লীমণ্ডলে আমাদের কর্ম্মব্রত সত্য হয়ে উঠবে।*

* শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ (১৩৪৩) উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ। শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

সত্তার সমুদ্র তরঙ্গ
হিরোশিগে-অঙ্কিত

অভিনেতা
তোয়াকুনি এবং হিরোশিগে অঙ্কিত

পাল্কীতে আরূঢ় নট কুনিশাদা-অঙ্কিত

ছত্রধারী তোয়াকুনি-অঙ্কিত
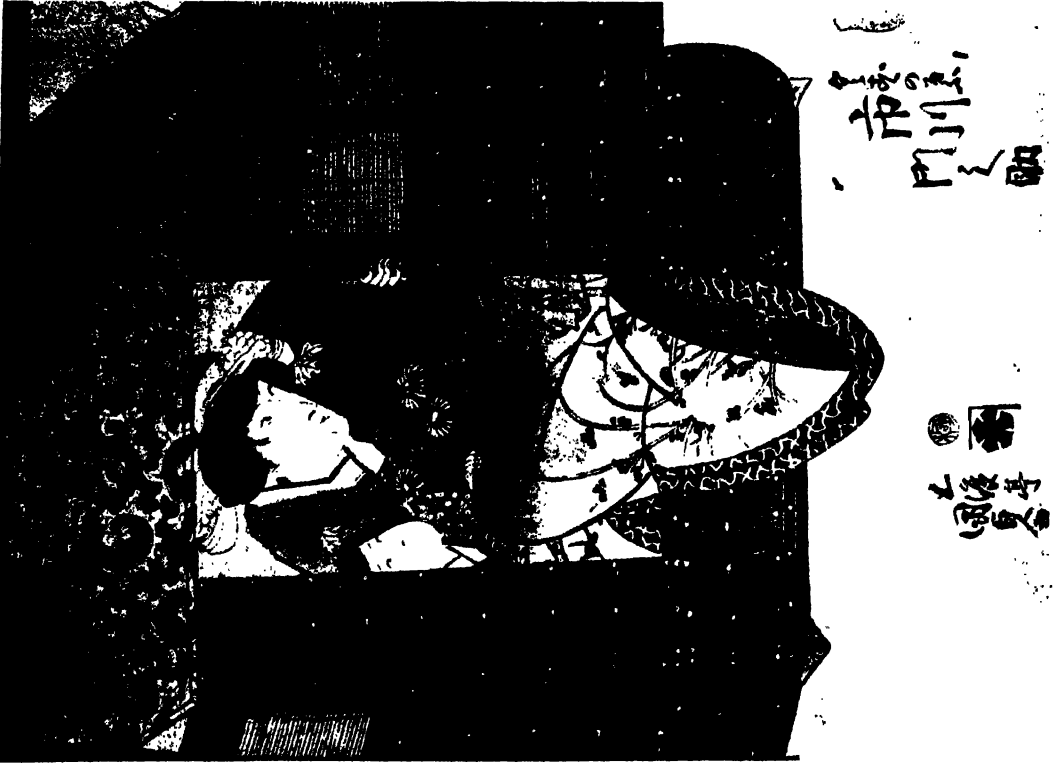
কলিকাতায় জাপানী রঙীন কাঠখোদাই চিত্রের প্রদর্শনী

আমাদের দেশে জনসাধারণের শিল্প-চেতনা যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে, এ-সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট্স্-এর প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হয়; বহুদিন পর্য্যন্ত এই বার্ষিক প্রদর্শনীই কলিকাতার জনসাধারণের পক্ষে শিল্প-পরিচয়ের একমাত্র কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমানে কেবল কলিকাতাতেই তিনটি বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রদর্শনীগুলিতে সাধারণতঃ কেবল আধুনিক শিল্পীদেরই শিল্পকর্ম্ম প্রদর্শিত হয় বলিয়া সাধারণের পক্ষে একটা অসুবিধা থাকিয়া যায়। যে ঐতিহ্যের উপর আধুনিক ভারত-শিল্প প্রতিষ্ঠিত, যে-সকল শিল্পধারার প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে, তাহার সহিত পরিচয় না থাকায় সাধারণের পক্ষে আধুনিক ভারতশিল্পেরও সম্পূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব হয় না।

শিল্পকলা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই জানেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের উপর যে-

পাঠ-নিরতা বালিকা — কুনিশাদা-অঙ্কিত

সকল শিল্পধারার প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে তাহার মধ্যে চীন ও জাপানের শিল্প অন্যতম। এই শিল্পধারার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধনেও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস্ অগ্রণী হইয়াছেন। এই সমিতির উদ্যোগেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম চীন-শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়। সম্প্রতি ইহারই উদ্যোগে কলিকাতায় জাপানী কাঠখোদাই চিত্রের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলি জাপান-প্রবাসী অধ্যাপক স্পেইট কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহারই সৌজন্যে প্রদর্শিত হয়। পুরাতন ও আধুনিক প্রায় সাড়ে ছয় শত রঙীন কাঠখোদাই ছবি এই প্রদর্শনীতে ছিল।

জাপানের রঙীন কাঠখোদাই ছবি জগতের সর্ব্বত্র ছাপা ছবির অত্যুৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে সমাদৃত হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাপানের অভিজাত শিল্প-রসিকগণ অতীতে ইহাকে অবজ্ঞাই করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাধারণ লোকেরই উপযুক্ত, শিল্পের আভিজাত্য ইহাতে নাই। আমাদের নিকট এই মত অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে, কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যের আভাস আছে। এই সকল ছবি যাঁহারা প্রস্তুত করিতেন জীবিতকালে তাঁহারা জাপানের শিল্পীসমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন না, নিম্নস্তরের পটুয়া বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন; এই ছাপের ছবির ক্রেতাও ছিল সাধারণ লোক। সমসাময়িক অভিমত যাহাই হউক, আধুনিক শিল্পরসিকগণ জাপানের রঙীন কাঠখোদাই ছবিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। জনসাধারণের চিত্তেও যে সূক্ষ্ম রসবোধের বিস্তার সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে, জন-মন ও শিল্পচেতনায় যে একান্ত কোন বিরোধ নাই, ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

জাপানের শিল্পীদের মধ্যে যে-সকল বিভিন্ন শিল্পপন্থার প্রচলন ছিল তাহার অন্যতম উকিওইয়ে বা 'দৃশ্যমান সংসারের দর্পণ'; সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছ চিত্র ও ঘটনাই ইহার বিষয়বস্তু বলিয়াই এই পন্থার এইরূপ নামকরণ। রঙীন [illegible]দাই ছবিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হিশিকাওয়া [illegible] (জন্ম ১৬৩৮) এই কাঠখোদাই ছবির প্রথম [illegible] ১৬[illegible] হইতে ১৬৯৫ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ত্রিশ [illegible]খানা পুস্তক এইভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্রগুলি অবশ্য পুরাপুরি ছাপের কাজ নয়; প্রথম একটি কাঠের ব্লক হইতে ছাপ লইয়া পরে তাহাতে হাতে স্বতন্ত্র বর্ণ-সংযোজনা করা হইত। কিয়োনোবু নামে এক শিল্পী সর্ব্বপ্রথমে রঙীন ছবি সম্পূর্ণ ছাপিয়া বাহির করেন।

১৭৫০ হইতে ১৮৫০ সাল এই এক শত বৎসরই রঙীন কাঠখোদাই ছবির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির সময়—কিয়োনাগা, হারুনোবু, শিগেমাসা, মাসোনাবু, উতামারো, টোয়োকুনি, হকুসাই, হিরোশিগে প্রভৃতি এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই চিত্রধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে—দেশীয় সূক্ষ্ম রঙের পরিবর্ত্তে বিদেশী রঙের ব্যবহার, ও অন্যান্য সামাজিক পরিবর্ত্তনই ইহার মূলে।

কাঠখোদাই ছবি জাপানে কি ভাবে প্রস্তুত হইত তাহার একটু আভাস অন্ততঃ দেওয়া আবশ্যক। সম্পূর্ণ চিত্র প্রস্তুত হইত তিন জনের সহযোগে—সর্ব্বপ্রথমে চিত্রকর পরিকল্পনা বা নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিতেন; ইঁহারই নামে ছবিটি বাজারে চলিত। এনগ্রেভার এই নক্সা সকুরা-কাঠের ব্লকে আঁটিয়া লইয়া উহাতে নক্সাটি ছুরি দিয়া আঁকিয়া লইতেন। কাঠের অনাবশ্যক অংশ চাঁচিয়া বাদ দিলে শুধু নক্সাটিই কাঠের উপর ফুটিয়া উঠিত। অতঃপর প্রত্যেক রঙের জন্য আলাদা ব্লক করা হইলে ছবি ছাপিবার পালা।

ছবি ছাপিতে রঙের সূক্ষ্ম গুঁড়া ভাতের ফেনের সহিত মিশাইয়া লওয়া হইত—ইহাতে ছবির রং বিশেষ উজ্জ্বল হইত। তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত এক রূপ কাগজে এই ছবি ছাপা হইত—এই কাগজে কালি চুপসাইয়া যাইত না।

জাপানী রঙীন কাঠখোদাই ছবির বিষয়বস্তু শিল্পী অনুসারে বহুবিচিত্র। উতামারো প্রধানত রমণীর প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন; টোয়োকুনি আঁকিয়াছেন—অভিনেতাদের মূর্ত্তি, হকুসাই ও হিরোশিগে প্রধানত দৃশ্য আঁকিয়াছেন। কিন্তু চিত্রের বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, যে-শিল্পীর বা যে-যুগের চিত্রই হউক না কেন, সর্ব্বত্রই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই সকল ছবি প্রস্তুত করিত সাধারণ লোক এবং ইহার ক্রেতাও ছিল সাধারণ লোক—সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে যে-সকল বিষয় রুচিকর তাহারই ছবি শিল্পীদিগকে প্রস্তুত করিতে হইত। ইহার মধ্যে রমণীমূর্ত্তি, অভিনয় ও অভিনেতাদের চিত্র, ইতিহাসের কাহিনী, ও দৃশ্যচিত্রই প্রধান।

মহিলা-সংবাদ

যুগোস্লাভিয়ার ডুব্রোভনিকে আন্তর্জ্জাতিক নারী-পরিষদের ১৯৩৬, অক্টোবর মাসে যে অধিবেশন হয় তাহাতে বোম্বাইয়ের শ্রীমতী মানেকলাল প্রেমচাঁদ সহ-সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩০-৩৪ সালে তিনি ভারতবর্ষের

শ্রীমতী মানেকলাল প্রেমচাঁদ

জাতীয় নারী-সংসদের সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ইহার সহ-সভাপতি। আন্তর্জ্জাতিক নারী-পরিষদের ১৯৩৪ সালের প্যারিস অধিবেশনে শ্রীমতী প্রেমচাঁদ ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষে এরোপ্লেন-চালকের 'এ' লাইসেন্স যাঁহারা পাইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীমতী ইমতিয়াজ আলি একমাত্র মুসলিম নারী। ১৯৩৬, জানুয়ারীতে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ঐ বৎসরের জুন মাসে এরোপ্লেন-চালনার সকল কৌশল আয়ত্ত করিয়া তিনি 'এ' লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী ইমতিয়াজ এক জন লেখিকা। তিনি উর্দ্দুতে ছোট গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখিয়াছেন।

শ্রীমতী ইমতিয়াজ আলি

নবদ্বীপের বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়া কুমারী গীতা রায়কে দেখিয়াছিলাম। বালিকাটির অকালমৃত্যুতে নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশ এমন একটি কন্যারত্নকে হারাইল যে বাঁচিয়া থাকিলে মহীয়সী দেশসেবিকা হইতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে ঐ বিদ্যালয়ের [illegible]

গীতা রায়

শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল গোস্বামী আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রী সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যাহার উৎসাহে ইহার কর্ম্মধারা ও 'দীপালী' নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছিল, সেই গীতা রায় টাইফয়েড রোগে মারা গিয়াছে। মেয়েটি গত ১৯৩৬ সালে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং আমাদেরই সাহায্যে এই বিদ্যালয় হইতেই আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু স্কুল কালেজের লেখাপড়ার দিক তাহার জীবনের একটি সামান্য অংশ মাত্র, যদিও সেদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ছাত্রীগণের অন্যতম হইবার যোগ্যতা তাহার মধ্যে ছিল। তাহার জীবন বিকশিত হইতেছিল সেবা ও সহানুভূতি, সংগঠন-শক্তি ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির মধ্য দিয়া, বাড়ীর সমস্ত কাজ নিজে হাতে সারিয়া, রাঁধা হইতে গঙ্গা হইতে জল আনা পর্য্যন্ত নিজে করিয়া, ১১।১২টার মধ্যে বিদ্যালয়ে আসিয়া লেখা-পড়া করিত, শিক্ষাকার্য্যে বিদ্যালয়ের সহায়তা করিত এবং সমিতি ও 'দীপালী'র কাজ করিত। তার পর ছাত্রী সমিতির জন্য চাঁদা তোলা-বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এই বিদ্যালয়ের ও সমিতির প্রয়োজনীয়তা মেয়েদের সকলকে বুঝান-এই সব মাত্র ১৬ বৎসরের মেয়ে একলা করিয়া গিয়াছে। অনুরোধ বা উপরোধের দ্বারা নয়-নিজের আদর্শের দ্বারা সে সঙ্গীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দু-এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমাদের বিদ্যালয় একটু অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া। তাহারাই আমাদের কাছে ভগবৎ-প্রেরিত "Say not, the struggle naught availeth" (এই সংগ্রাম ব্যর্থ, বলিও না") এই আশার বাণী লইয়া আসিয়াছে, এবং সেই প্রাণশক্তির কেন্দ্র ছিল আমাদের 'গীতা'। তার মা'র নিকট সে বার বার বলিয়াছে, "মা তোমরা আমার কাজে বাধা দিও না-আমি নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই 'বঙ্গবাণী'কে গড়ে তুলব, আমি বঙ্গবাণীর প্রতি সকলের আগ্রহ জন্মিয়ে দেব নিজে লেখাপড়া শিখে আমি এর দারিদ্র্য ঘোচাব।"

মৃত্যুর কয়েক দিন তাহার চেতনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল। অচেতন অবস্থায় প্রলাপের মধ্যে 'বঙ্গবাণী ও 'দীপালী' প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। জীবনের প্রভাতেই আত্মোৎসর্গের একটি চরম দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিতেছিল। এত পরিশ্রম করিয়াও তাহাকে কেহ কখনও শ্রান্ত বা অবসাদগ্রস্ত হইতে দেখে নাই, কর্ম্মশক্তির এমন একটি অফুরন্ত উৎস ছিল তাহার মধ্যে। গত অমাবস্যার অধিবেশনে আমরা ভগবানের নিকট তাহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলাম সে নিশ্চয় একদিন "গৃহদীপ গ্রামদীপ সমাজ দীপ হইবে" (আপনার ভাষায়।)

ব্যাং-মাছ

ভূপঞ্জরের অন্তর্নিহিত অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জন্তুর প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল বা তাহাদের আকৃতির প্রস্তরীভূত ছাপ এবং বর্ত্তমান একই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর বিষয় আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রমবিকাশের ফলেই জীবজগতের এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভূপঞ্জরের অস্থিকঙ্কাল বা ছাপ কখনই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না; আমাদেরই বরং বুঝিবার ভুল হইতে পারে। প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল বা মৃত জীবজন্তুর আকৃতির ছাপ হইতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে মৎস্যই সর্ব্বপ্রথম মেরুদণ্ডী জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বহুযুগ অতিক্রান্ত হইবার পর ক্রমশ হস্ত পদ ও অঙ্গুলি সমন্বিত উভচর জীবের আবির্ভাব হয়। তাহারও বহুযুগ পরে সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীরা পৃথিবীর জল স্থল অধিকার করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। মৎস্যের ন্যায় টিকটিকি ও গিরগিটি জাতীয় জীব সামুদ্রিক সর্প, জলচর ও খেচর ড্রাগন ক্রমশ বিভিন্ন রূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধিকারবিস্তার করিয়াছিল। মনে হয় স্থলচর ডাইনোসোরস্ হইতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া এবং জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার অদম্য বাসনার ফলেই পাখী ও স্তন্যপায়ী জন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে তাহারা ক্রমশ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সর্ব্বশেষে মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। জীবজগতের বিভিন্ন রূপে ক্রমবিকাশ ঘটিলেও আদি জীবজন্তুর সকলেরই বিলোপ ঘটে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থানবিশেষে কেহ কেহ আজও তাহাদের বংশ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অবশ্য, যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে অথবা যাহারা কেবল জন্মগত বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহারা জীবনসংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছে। ভূপঞ্জর প্রাগৈতিহাসিক যুগের এমন অনেক জীবজন্তুর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়, যাহারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মধ্যে বিরোধ খাদ্য ও স্থানাভাব প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়াই জীবজগৎ বিচিত্রভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। জীবজগতের এই ক্রমপরিণতি অহরহই ঘটিতেছে। অতি ধীর অতি মন্থর বলিয়া, আমরা তাহা সহসা ধরিতে পারি না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এক এক জাতীয় জীব আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের সুবিধার জন্য নিজ নিজ ধারার কোন কোন পুরাতন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন অনুকূল প্রকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া একই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এক মৎস্যজাতীয় প্রাণীর কথা আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে এক সময়ে কত বিপুলকায় মৎস্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল; কালক্রমে তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে কত বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যের আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাং-মা

উপর হইতে: ব্যাং-মাছ পাকের ভিতর ঢুকিতে যাইতেছে। দূরে উড়ন্ত মশা দেখিয়া ব্যাং-মাছ শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। ব্যাং-মাছেরা একে অপরের পিঠে উঠিয়া খেলা করিতেছে। ব্যাং-মাছের গায়ের নীলাভ ফোঁটা, গিরগিটির মত আঁশ, ও পায়ের ন্যায় সম্মুখের পাখনা দেখা যাইতেছে।

ভবিষ্যতে যে আরও কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা কে জানে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর ইতিহাসে মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মৎস্যই দেখা যায়। মেরুদণ্ডী ও অ-মেরুদণ্ডী জীবের মাঝামাঝি অ্যাম্ফিওক্সাস্ (Amphioxus) নামে এক জাতীয় জীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। ইহাদের মেরুদণ্ড নাই কিন্তু মেরুদণ্ডের স্থলে 'নোটো-কর্ড' নামে স্থূল মাংসের একটি দণ্ড আছে। অ্যাম্ফিওক্সাস-জাতীয় কোন একটি জীব হইতেই মেরুদণ্ডী মাছের উৎপত্তি হইয়াছিল। কত লক্ষ বর্ষ অতিক্রান্ত হইল—মাছই তখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। পৃথিবীতে নৈসর্গিক বিপ্লব অহরহই ঘটিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে আজ যেখানে জল কালই সেখানে স্থলভাগ আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ বিরাট বিপ্লবে নদীনালা শুষ্ক হইয়া গেল; মাছেরা এমনি ভাবে ডাঙায় উঠিয়া পড়িল, যাহারা ডাঙায় আসিল, বায়ু হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য তাহাদের ফুস্‌ফুস্ ছিল না, কাজেই লক্ষ লক্ষ মাছ মরিতে লাগিল। অবশিষ্ট জলে কতক মাছ আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু প্রখর রৌদ্রে অতিষ্ঠ হইয়া ছায়ার আশায় ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইল। কিন্তু কতক্ষণ আর ডাঙায় থাকিবে আবার ফিরিতে হইল। এই গুরুতর অশান্তির মধ্যে পড়িয়া তাহাদের কেহ কেহ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অতি কষ্টে কান্‌কোর পাশের পাতলা চামড়া দ্বারা বাতাস হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইল অবশিষ্টেরা মরিল। ইউরোপের কোন কোন স্থানে এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে ফুস্‌ফুস্ মাছ বলে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হয়ত প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে বা অন্য কোন অবস্থাবিপর্য্যয়ে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহাদের ফুলকো ও ফুস্‌ফুস্ দুইই আছে। জলের মধ্যে ফুলকো ও বাতাসের মধ্যে ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে। ক্রমে এই ভাবে মাছের সাহস বাড়িয়া গেল—তাহারা ডাঙায় ও জলে উভয় স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। আমাদের দেশীয় কইমাছ জলে বাস করিলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডাঙায় থাকিয়াও জীবনধারণ করিতে পারে। ইহাদিগকে উভচর মাছ বলা যাইতে পারে। কান্‌কোর সাহায্যে ডাঙায় অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহারা অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে পারে। অতিবর্ষণের সময় কইমাছ পুকুরের খাড়া পাড় বাহিয়া ডাঙায় উঠিয়া আসে; ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপে কত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মাছেরা যে কত বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনুশীলনের ফলে কোন কোন মাছের আবার পাখীর মত আকাশে উড়িবার ক্ষমতাও জন্মিয়াছে। ব্যবহারের ফলে তাহাদের কান্‌কোর সম্মুখস্থ পাখনা দুইটি ডানার মত বড় হইয়া গিয়াছে। উভচর মাছের মধ্যে কইমাছ ব্যতীত আমাদের দেশের সমুদ্রের কাছে নদীর মোহানায় নোনা জলে 'গুলে' মাছের মত এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে আমরা ব্যাং মাছ নামে অভিহিত করিব। কারণ হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে লম্বা লেজওয়ালা বড় বড় বেঙাচি বলিয়াই ভুল হয়। ইহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম 'পেরিঅপ্‌থ্যাল্‌মাস্'। ইহাদের চক্ষু দুইটি বাঁকড়ার মত লম্বা বোঁটার উপর অবস্থিত বলিয়াই এই নামকরণ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের সমুদ্রোপকূলে এবং সামুদ্রিক দ্বীপের নদনদীর মধ্যে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই সব পার্ব্বত্য নদনদীই ইহাদের আদি জন্মস্থান। খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর প্রবাহে দূর সমুদ্রে চলিয়া গিয়া শত্রুর মুখে পড়িবার ভয়ে বুকের পাখনার সাহায্যে কঠিন জিনিষ আঁকড়াইয়া ধরিবার ও ডাঙায় বেড়াইবার স্বভাব ইহাদের আয়ত্ত হইয়াছিল। বংশবৃদ্ধির ফলে কালক্রমে ইহারা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলের নদনদীতে, ডায়মণ্ড হারবার, ফলতা প্রভৃতি স্থানে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের মাছগুলি প্রায়ই আমাদের দেশীয় 'গুলে' মাছের মত প্রায় ৯।১০ ইঞ্চি লম্বা হয়। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবার ও ফলতা

ব্যাং-মাছ কাচের গা বাহিয়া জল হইতে কিছু দূর উপরে উঠিয়া শোষণ-যন্ত্রদ্বারা আটকাইয়া রহিয়াছে

ব্যাং-মাছ টিকটিকির মত গাছে চড়িয়াছে

প্রভৃতি স্থানের মাছগুলি সাধারণতঃ ২।৩ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। মাথাটি দেখিতে ঠিক 'গুলে' মাছের মত। শরীরের চামড়া গিরগিটির গায়ের মত। উপর ও নীচের চোয়ালে সূচের মত কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধারালো দাঁত আছে। ইহার সাহায্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকামাকড় ধরিয়া খায়। পিঠের উপরের পাখনায় এবং শরীরের ঊর্দ্ধভাগে উজ্জ্বল ফিকে নীল রঙের কতকগুলি ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ইহাদের চোখ দুটি। মস্তকের ঊর্দ্ধভাগে পাশাপাশি সম্মিলিত দুইটি বোঁটার ডগায় চোখ দুটি স্থাপিত। চক্ষু-তারকা সাধারণ মাছের মত গোলাকার নহে, অনেকটা শিম-বীজের মত। চক্ষু-তারকা ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে বা ছোট বড় করিতে পারে। সময়ে সময়ে একটি চোখ উঁচু করিয়া অপর চোখটিকে কোটরের মধ্যে ঢুকাইয়া লয়, মনে হয় যেন চোখ ঠারিতেছে। সাপ যেমন জলের মধ্যে মাথা একটু উঁচু রাখিয়া সাঁতার কাটে, ইহারা যখন জলে থাকে তখন অনেকটা সাপের সাঁতার কাটার মতই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইহারা জলের ধারে কর্দ্দমাক্ত ডাঙার উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ইহাদের কান্‌কোর সম্মুখস্থ পাখ্‌না দুটি খুব পুরু এবং জোরালো। এই পাখনা দুটির সাহায্যেই ইহারা কর্দ্দমাক্ত স্থানের মধ্যে গুটিগুটি হাটিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পাঁকের মধ্যে ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কেহ অনুসরণ করিলে বা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে অতি দ্রুতবেগে লাফাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বহুদূরে চলিয়া যায় এই জন্য ডাঙায় থাকিলেও ইহাদিগকে ধরা অতি কষ্টকর ব্যাপার। জলের ধারে কোন গাছপালা থাকিলে ইহারা টিকটিকির মত গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং হেলানো ডালপালার উপর উঠিয়া এক জন আর এক জনের ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া অথবা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া খেলা করিয়া থাকে। ইহাদের বুকের নীচে ছত্রাকার একটি পাখ্‌না আছে। ইহা এক প্রকার শোষণযন্ত্রবিশেষ। ইহার মধ্যস্থল বাটীর মত নিম্ন-পৃষ্ঠ। গাছপালা বাহিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিবার সময় উক্ত শোষণ-যন্ত্রের দ্বারা গাছের গায়ে আটকাইয়া থাকে এবং পড়িয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এমন কি মসৃণ কাচের গা বাহিয়া অবলীলাক্রমে উপরে উঠিয়া যায়। আমার পরীক্ষাগারের বড় কাচের পাত্রের মধ্যে কতগুলি মাছ রাখিয়া দিয়াছিলাম। একদিন ভুলক্রমে পাত্রের মুখ খোলা পড়িয়া ছিল। তাহার পরদিন দেখি সমস্ত মাছ কাচের গা বাহিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখিতে পাইলাম উঁচু ছাতের কাছে শার্শির গায়ে দুইটি মাছ ব্যাঙের মত ড্যাব্‌ডেবে চোখে চাহিয়া রহিয়াছে। ধরিতে যাইবামাত্রই লাফাইয়া পড়িতে গিয়া একটি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল অপরটি আঙিনায় পড়িয়া ঘাস পাতার মধ্যে কোথায় লুকাইল স্থির করিতে পারিলাম না অপরগুলির আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

জলের নীচে ইহারা কান্‌কো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া সাধারণ মাছের মত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে কিন্তু ডাঙায় উঠিবামাত্র দুই দিকের দুইটি কান্‌কোর ফাঁক বন্ধ করিয়া ঠিক পট্‌কার মত ফুলাইয়া রাখে। মাছের মত কান্‌কো নাড়ে না। অপেক্ষাকৃত বড় মাছগুলো যখন সার বাঁধিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া বসিয়া থাকে তখন বড় অদ্ভুত দেখায়, মনে হয় যেন ছোট ছোট কতকগুলি সিন্ধু-ঘোটক দল বাঁধিয়া ডাঙায় বিশ্রাম করিতেছে।

অধিকাংশ সময় ডাঙায় কাটাইলেও কর্দ্দমাক্ত জমি ছাড়া ইহারা শুষ্ক মাটিতে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। শুষ্ক জমিতে গিয়া পড়িলেই শরীরের জল শুকাইয়া শরীর যেন আঠার মত ভূমির সঙ্গে আটকাইয়া যায়। তখন বেশী লাফাইতে বা হাঁটিতে পারে না। এই অবস্থায় ইহারা সহজেই কাবু হইয়া যায় এবং অনায়াসে ধরা পড়ে সেই জন্য তাড়া খাইলে নেহাৎ নিরুপায় না হইলে শুষ্ক ডাঙার দিকে অগ্রসর হয় না, কেবলই জলের দিকে যাইবার চেষ্টা করে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জার্ম্মেনীতে খ্রীষ্টলীলা

অবতার বা মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী লইয়া আমাদের দেশের জনসাধারণ যেরূপ রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি উৎসবের রচনা করিয়াছে, জার্ম্মেনীর অন্তর্গত 'ওবরম্মর্‌-গৌ' (Oberam-

যীশু ও জন্

অনুচরেরা ক্রুশ হইতে খ্রীষ্টের মৃতদেহ নামাইতেছেন

ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ—যীশু

mergau) নামক স্থানে ভক্ত জনসাধারণ সেইরূপ খ্রীষ্টলীলা নাট্যো সবের (Passion Play) রচনা করিয়াছে।

কথিত আছে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে ভয়ানক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। এই বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত গ্রামবাসিগণ গীর্জ্জায় গিয়া মানত করে যে এই মহামারী হইতে মুক্তি পাইলে তাহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ প্রতি দশ বৎসরে একবার ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী স্মরণ করিয়া নাট্যোৎসবের আয়োজন করিবে। ঐ প্রার্থনার পরই মহামারী সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। সেই সময় হইতে (১৬৩৪) প্রতি দশ বর্ষে একবার এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। শুধু বিগত মহাযুদ্ধের সময় একবার এই উৎসব বন্ধ ছিল। এই গ্রামের জনসংখ্যা সতর কি আঠার শত—তাহার মধ্যে সাত শত নরনারী এই নাট্য-অভিনয়ে যোগদান করে। এই অভিনয় হইতে যীশুর ক্রুশকাষ্ঠ বহন শেষভোজ ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট, প্রভৃতি খ্রীষ্টজীবনীর কতকগুলি সুপরিচিত কাহিনীর চিত্র এতৎসহ মুদ্রিত হইল।

ব্যাং-মাছ কাচের
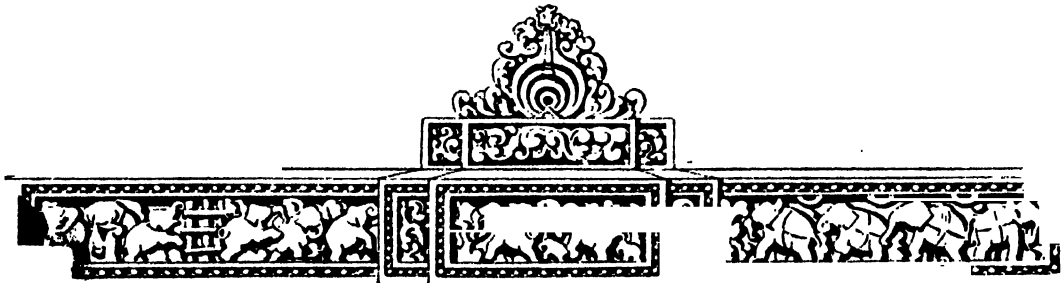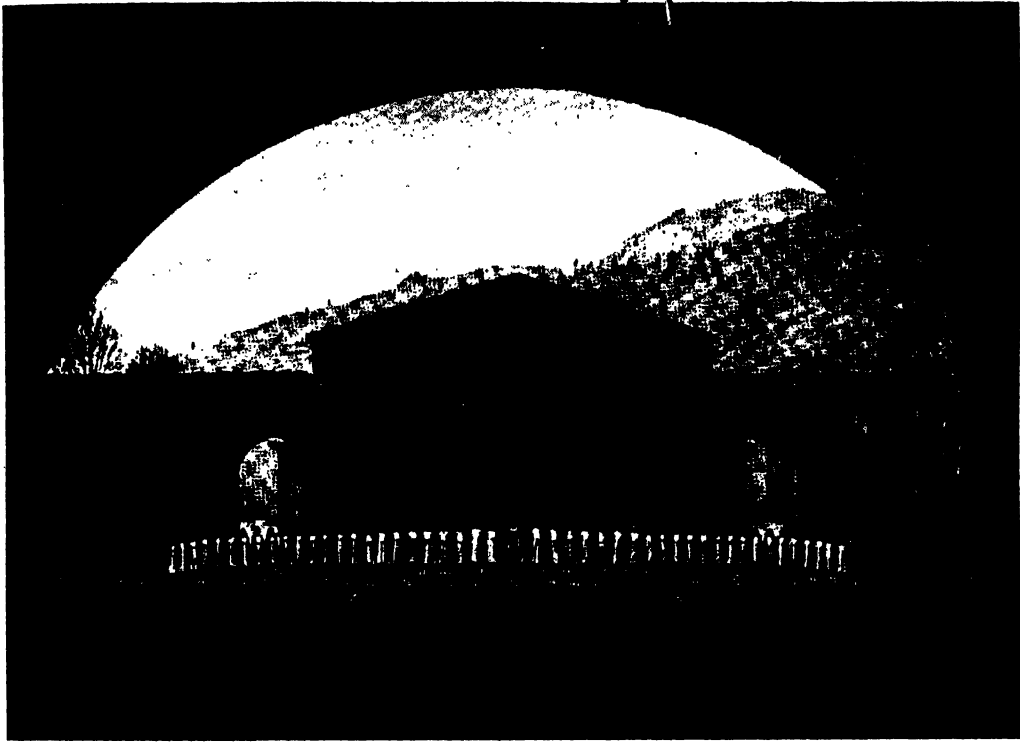
জার্মেনীর ওবরম্মরগৌ-এ খ্রীষ্টলীলার অভিনয়-মঞ্চ

যীশুর অন্তিম ভোজ

খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন

ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু

পশ্চিমযাত্রিকী—শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, ক্রাউন ৮ পেজী, ১৭১ পৃঃ, মূল্য ২৸০।

এই অতি সরস ভ্রমণ-কাহিনী যখন 'প্রবাসী'তে বাহির হইতেছিল তখনই ইহার রচনাভঙ্গিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে পুস্তকাকারে ইহার সুদৃশ্য কলেবর ও রম্য প্রচ্ছদপট দেখিয়া এই জন্য খুশী হইয়াছি যে, প্রকাশকের হাতেও ইহার মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে। বাংলায় এ-পর্য্যন্ত বহু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে; কবিত্ব পাণ্ডিত্য ও তথ্য প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত সমাবেশে, অথবা লেখকের আত্মপ্রচারের ভঙ্গিমায় সে-সকল রচনা যতই উপভোগ্য হউক প্রায়ই এমন সরস ও সুখপাঠ্য হয় না। এই কাহিনীটি পড়িবার সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও ইন্দুমাধব মল্লিকের 'বিলাত ভ্রমণ' স্মরণ করিয়াছি। সকল সাহিত্যিক রচনা যে কারণে উৎকৃষ্ট হয় লেখকের সেই স্বকীয় দৃষ্টি ও সহজ প্রকাশ-ক্ষমতা এই ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে। এই গ্রন্থখানি এক হিসাবে সম্পূর্ণ নূতন—ইতিপূর্ব্বে খাঁটি বাঙালী মেয়ের চোখে, য়ুরোপের রাস্তাঘাট, দোকান-পসার ও লোকযাত্রার নানা দৃশ্য এমনভাবে প্রকাশিত হইতে আমরা দেখি নাই। আমাদেরই ঘরের মেয়ে অন্তঃপুর ছাড়িয়া, সমুদ্রে পর্ব্বতে মরুভূমিতে, আধুনিক সভ্যতার জনাকীর্ণ পীঠস্থানগুলিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন; নারীসুলভ কৌতূহলের যেমন অন্ত নাই তেমনই পথের মাঝেও কুলায়-প্রত্যাশী মনের নানা বিষয়ে অতৃপ্তি, আহার্য্য-সংগ্রহ ও রন্ধন-পারিপাট্যের জন্য উৎকণ্ঠা কম নহে, আবার জলের অপ্রাচুর্য্যহেতু বঙ্গরমণীসুলভ অস্বস্তি, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য অধীর অসন্তোষ প্রভৃতি রচনাকে যেমন সত্য ও সজীব করিয়াছে, তেমনই সর্ব্বত্র একটি সবল অথচ সুনম্র আত্মমর্য্যাদাবোধ এবং সেই সঙ্গে চাপল্যহীন রসিকতা তাহাকে শ্রীমতী করিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার সুফল যে সুস্থ ও উদার মনোবৃত্তি, লেখিকার রচনায় তাহা যেমন ফুটিয়াছে, তেমনই ভদ্রঘরের বাঙালী বধূ ও কন্যার যে স্বভাবটিকে আমরা এখনও বহুকালার্জ্জিত মূল্যবান সম্পদের মতই গণ্য করি তাহাও ইহাকে একটি ক্রমশঃ দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পরিচয় হিসাবে দু-একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"ফটো তুলতে গিয়ে সে এক হাসির ব্যাপার, আমরাও চড়ব না, আর গাইডও ছাড়বে না; বলে কি, ছবি তোলবার সময় অন্ততঃ একবার উটের পিঠে চড়তেই হবে। তাকে বোঝান গেল, আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতেই ভালবাসি। সে নাছোড়বান্দা, বললে উটের পিঠে নিতান্তই যদি না ওঠ তো, উটের লাগামটি হাতে ধ'রে তোমাদের "হাসব্যাণ্ড"দের ঠিক পাশেই দাঁড়াও, তা হ'লে কায়দা মন্দ হবে না। কি করি, পড়েছি যবনের হাতে, একবার ধরতে চেষ্টা করলুম, পোড়া উট এমন বিকট সুরে ডেকে উঠল যে লাগাম ছেড়ে বলে ফেললুম না বাপু, কাজ নেই এসব কায়দায়। বাঙালীর মেয়ে সকাল হ'লেই ভাঁড়ার ঘর ক'রে বঁটি পেতে কুটনোর বসা অভ্যেস, এ হেন মনিষ্যি চোখে পিরামিড দেখছি তাই যথেষ্ট।"

"একোয়েরিয়ম দেখে ফিরে আসছি হঠাৎ পিছনে এক অদ্ভুত রকম গলার স্বর শুনে ফিরে চাইতে দেখি দুটি যুবতী আমার হাত তুলে বক দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম এমন বুড়োধাড়ী মেয়ে এত অসভ্য কেন? আমাদের দেশে ও-বয়সে যে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করতে হয়।"

"এক ইংরেজ মহিলা তার ছোট ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি খেলা করতে করতে তার গালে কি রকমে একটু কাদা লাগিয়ে ফেলে-ছিল। শিক্ষিতা জননী তৎক্ষণাৎ তাঁর রুমাল বার ক'রে নিজের মুখের থুথুর দ্বারা এক কোণ ভিজিয়ে ছেলের গালের কাদা তুলে দিলেন। আর একদিন...এক জায়গায় গোটাকতক কুলী শাবল নিয়ে রাস্তা খুঁড়ছিল। হঠাৎ থুথু ফেলার আওয়াজ হতেই আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম।...ও হরি! দেখি তার হাতে কালি লেগেছে, সেই হাত দুখানি অঞ্জলি ক'রে মুখের সামনে ধ'রে অনবরত ওয়াক্‌থু ক'রে হাতের তেলোর উপরেই থুথু ফেলে হাতে সাবান দেওয়ার মত হাত কচলাতে লাগল। তার পর পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুছে ফেললে।...আমাদের দেশের ধাঙড় ও মেথর—যারা অনবরত ময়লা পরিষ্কার করছে—তাদের ভেতরেও বোধ হয় থুথুর দ্বারা ছেলের মুখ-মোছান, নিজের হাত ধোয়ার ইচ্ছা কোন দিন হবে না।"

বইখানির ভাষা আধুনিক 'চলতি ভাষা' নয়—সত্যকার মাতৃভাষা; যেমন শুদ্ধ ইডিয়ম তেমনি শিষ্ট ও সুশ্রী। এই পুস্তকখানির প্রতি শিক্ষিত পাঠকশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

আনন্দবাজার—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹।

শ্রীযুত অশোক চট্টোপাধ্যায় এত দিনে স্বনামে জাহির হইলেন। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় এই সকল রঙ্গ-চিত্র যখন বেনামীতে বাহির হইত তখনও এগুলির লেখক কে সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকিত না। কারণ এগুলির ভাষা ও কল্পনার ভঙ্গীতে আর যাহাই না থাক একটি যে বলিষ্ঠ মন—রসিকতার মাত্রা-রক্ষাতে যে প্রকৃতস্থতা, এবং প্লট-উদ্ভাবনায় যে জ্যামিতিক রীতি লক্ষিত হয়, তাহা ঐ ব্যক্তিটিরই নিজস্ব। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক জন স্বেচ্ছা-সেবক সাহিত্যিক অর্থাৎ আসন করিয়া চক্রে বসিয়া সাধনা করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বয়-স্কাউটদের সর্দ্দারী, লাইট ইনফ্যান্ট্রির সিপাহীগিরি, মোটর লইয়া দূরের পাল্লা, বক্সিং-চর্চ্চা, কালোয়াতী সঙ্গীতের প্যাঁচ প্রভৃতির মতই কবিতা ও গল্পরচনা তাঁহার দেহমনের সহজ ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়। আজিকার দিনে এরূপ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মনঃপ্রকৃতি আমাদের সমাজে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং 'আনন্দবাজারে'র মত পুস্তকে যে ধরণের কৌতুকপ্রিয়তা ও তাহার অন্তরালে যে বলিষ্ঠ ব্যাঙ্গ-মনোভাব রহিয়াছে তাহা একটু অসাধারণ বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহার চিত্রিত হসন্ত তরফদার, পীতাম্বর সাণ্ডেল, সর্ব্বেশ্বর ঘটক প্রভৃতির প্রোটোটাইপ আধুনিক সমাজের বাসিন্দাই বটে, কিন্তু সেগুলিকে তিনি যে হাস্য-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন সে-দর্পণের বিশেষত্ব এই যে তাহাতে ব্যক্তিগুলির চেহারা অতিমাত্রায় প্রলম্বিত বা হ্রস্বীকৃত হইলেও, কুত্রাপি কদাহাস্যের

পরিবর্ত্তে গল-হাস্য উদ্রেক করে না। সংসার-গ্যালারির নানা স্বভাব-বিড়ম্বিত মনু-নন্দনের প্রতি এইরূপ স্পোর্টস্‌ম্যান-সুলভ নির্ব্বিষ উচ্চহাস্যই এই গ্রন্থের বিশিষ্ট হাস্যরস। রসকল্পনার সূক্ষ্মতা ইহাতে নাই; বরং অতিশয় সরল ও সবল কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে যে সংযম ও শিষ্টতা, এবং নক্সাগুলিতে যে উদ্ভাবনী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় আছে তাহাতে এই রচনাগুলি একটি বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চক্রবর্ত্তী হইতে অবশ্যই রাজী হইবেন না, নতুবা রীতিমত চক্রে বসিয়া সাধনা করিলে আমাদের বিশ্বাস তিনি বাংলা-সাহিত্যের একটি দিক পুষ্ট করিয়া আমাদের মনঃপ্রাণের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারিতেন।

হংসদূত—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

এখানিও মেঘদূত ও ওমরখৈয়াম বংশীয় একখানি চিত্রকাব্য—পড়িতে হয় না, বাহিরের চটকেই ক্রেতার চিত্তচটক চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ছবির কল্যাণে কবির মান রক্ষা হয়। সব সময়ে কবিকেও দরকার হয় না, অনুবাদ যেমনই হউক চাই একটা পুরান বড় নাম আর ছবি ও ছাপার কারুকার্য্য বহন করিবার জন্য মুদ্রিত অক্ষরের জালিকা। এ সকল পুস্তক কেহ না পড়িলেও চলে অর্থাৎ বিক্রয় হয়, কারণ বিবাহে বা ঐরূপ উপলক্ষ্যে উপহার-সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রকাশকেরা এইরূপ কারু-কাব্য প্রস্তুত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ও তৎসহ কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিও সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইয়াছে—ত্রিবর্ণ চিত্র, নানা কারুকার্য্যপূর্ণ নক্সা ও মার্জ্জিন-শোভায় বইখানি উপহার দিদিক্ষু ব্যক্তির নেত্রাকর্ষণ করিবে। কিন্তু ইহা ত প্রকাশকের কৃতিত্ব। তাহাতে কবির মুখ ত উজ্জ্বল হইবে না বরং এরূপ প্রশংসায় ম্লান হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু কি করিব? ছবি দেখিব না কবিতা পড়িব? তথাপি পড়িয়াছি, কারণ অনুবাদের ভাষা ও ছন্দ বেশ সহজ সাবলীল হইয়াছে এবং এই ধরণের কাব্যে মূলে যতটুকু কাব্যরস থাকা সম্ভব সে-রস অনুবাদেও বজায় আছে, এমন কি আধুনিক ভাষা ও ছন্দের বেশভূষায় যেন একটু রূপান্তর হইয়াছে। হংসদূত রূপগোস্বামী-কৃত একখানি বৈষ্ণব কাব্য—বাঙালী রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি মধ্যম শ্রেণীর গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য এখনও বাংলা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—ভাল অনুবাদ বিরল। আমরা এই নবীন কবিকে সেই সকল কাব্যের অনুবাদকার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করি তাহাতে তাঁহার পরিশ্রম আরও সার্থক হইবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ছিটে-ফোঁটা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক সেন ব্রাদার্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

ছিটে-ফোঁটা নামকরণে গ্রন্থকার অতি বিনয় প্রকাশ করেছেন। 'তাড়িভরা নয় সে তাড়ি, মত্ত জনের পিপাসার'—একথা সত্য। কিন্তু 'নয় নভেলের রোমান্স বা দার্শনিকের তত্ত্ব-ফল'—একথা সত্য নয়। কারণ একটি তত্ত্বকথা এর সর্ব্বত্র ছড়ান রয়েছে, যার প্রচার গ্রন্থকারের জীবনের 'মিশন'; সেটি এই: 'আমি নচিকেতাও নই, থিওসফিষ্টও নই। ওপারের খবর দিতে পারিব না। তবে জানি—ইহলোকের পাঁচ জনকে নিয়া আমাদের কারবার। বায়োলজি, য়্যানথ্রপলজির সাহায্যে ইহাদের বুঝিবার চেষ্টা করা, আর ইহাদের সহিত সুখে-দুঃখে বাস করার নাম সুখ। দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টা বাতুলতা।'

ছিটে-ফোঁটার কয়েকটি ফোঁটা বেশ মোটা-মোটা—কড্‌লিভার অয়েলের মত। ঠিক কলমের ডগায় ছিটাবার মত নয়। 'চাকরির কাহিনী', 'গোকুল', 'ধর্ম্মের খেলা', 'শংটং', 'অরবানন্দ', 'পূজার বাজার', 'ভূতের বোঝা', 'চোখে-দেখা ঘটনা', 'কানাই-বলাই' 'কৃষ্ণকথা'—এরা এই দলের। এগুলির ব্যঙ্গ ও ভাব-গৌরব কেবল 'ঠোঁটের বোঁটায় একটু হাসি, চোখের কোণায় একটু জল' নয়।

বইয়ের শেষের দিকের কয়টি ফোঁটা ছোট হ'লেও, শিশিরবিন্দুর মত সম্পূর্ণ, সৌন্দর্য্যে টলটল, হাসি-কান্নায় ঝকঝকে,—এক-একটি গীতি-কবিতাকল্প।

সত্যিকারের ছিটে-ফোঁটা আছে কয়েকটি কবিতায়। একটু নির্ম্মল হাসির সৃষ্টি করা তাদের উদ্দেশ্য। এ জাতীয় কবিতা বাজারে দুর্লভ, কারণ আমরা কান্তের ঠোকরকেই হাস্যরসের উপাদান মনে করি। কতকগুলিতে একটু ঝাল আছে—ধর্ম্মের বিরুদ্ধে (কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়),—এগুলি পরিপাক করিলে কাজে লাগিবে। কতকগুলি চিবাইয়া পড়িতে হয় ও রস গ্রহণ মাত্র অট্টহাস্যের আবির্ভাব হয়। 'জীবতত্ত্ব' 'প্রেতত্ত্ব'—এগুলি এই জাতের।

গ্রন্থকার লিখিতেছেন অনেক, কিন্তু পড়বে কে? আমার মনে হয়, দেশের মনোরাজ্যে একটা ঘোর দুর্দ্দিন এসেছে। এখন না-আছে 'হরিনাম' না আছে সুচিন্তিত নাস্তিক্য; না আছে ভাব, না আছে অভিজ্ঞতা। আছে শুধু—ধর্ম্মে মন্দির-প্রবেশ, কর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা, আর সাহিত্যে অজ্ঞাত ফ্রয়েড ও অনাগত সাইকলজির বিভীষিকা।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

নেপালের পথে—শ্রীসুধাংশুকুমার আচার্য্য ও শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃ. ৯৯ ও ৫ খানি চিত্র।

লেখকদ্বয় শিবরাত্রির মেলায় পশুপতিনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা পথে যাহা দেখিয়াছিলেন, পুস্তকে মোটামুটি তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব ইহা ভবিষ্যৎ যাত্রীগণের উপকারে লাগিবে।

গ্রন্থের ভাষা দুর্ব্বল, ছাপাতেও অনেক ভুল রহিয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

আয়না—লেখক আবুল মনসুর আহমদ। প্রকাশিকা মুসম্মৎ আকিকুন্নেসা, ময়মনসিংহ। দাম পাঁচ সিকা।

কয়েকটি সচিত্র ব্যঙ্গরচনা। লেখকের নির্ভীক মতামত ও সহজ রসবোধ সৎ-সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক, কিন্তু আরবী-উর্দ্দু সংমিশ্রিত 'নয়া বাংলা' ভাষা সর্ব্বত্র বোধ্য নহে। স্থানে স্থানে রুচিপতন পীড়াদায়ক। তৎসত্ত্বেও পুস্তকখানি ভাল। লেখকের বেদনা অকৃত্রিম, তাই বিদ্রূপ তীব্র। জয়নাল-অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রগুলি সুন্দর।

একটি সকাল—লেখক আবুল ফজল। প্রকাশক পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। দাম আট আনা।

তিনটি নাটিকা। লেখকের মনোভাব সাহিত্য রচনা নহে, বিবাহ ও নারীর প্রতি ব্যবহার বিষয়ে মোস্‌লেম মতামত প্রচার। ভাষা অপাঠ্য ও রুচি অমার্জ্জিত।

আলোকলতা—লেখক আবুল ফজল। প্রকাশক খান মহাম্মদ মঈনুদ্দিন, দাম আট আনা।

পাঁচটি ব্যঙ্গনাট্য। কুরুচিপূর্ণ পুস্তক। ছাপা বাঁধাই খারাপ।

মেঘমল্লার—লেখক শ্রীভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম ; শিলচর। দাম আট আনা।

একাঙ্ক গীতিনাটিকা। অনেকগুলি গান আছে। রবীন্দ্রগন্ধী হইলেও শেষের গানটি ও আরও দু-একটি গান ছন্দে, শব্দ-বিন্যাসে সুন্দর। নাট্যাংশ মামুলী। ভাষা ভাল।

শেষ সাধ—বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কমলা পাব্লিশিং হাউস, ২৭ কলেজ ষ্ট্রীট। দাম এক টাকা।

উপন্যাস। কাঁচা হাতের লেখা, ঘটনাবিন্যাস অসংলগ্ন।

শ্রীমণীশ ঘটক

গোবিন্দদাসের করচারহস্য—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

গত বর্ষের মাঘ মাসের প্রবাসী তে সমালোচিত 'চৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' নামক পুস্তকের ন্যায় বর্ত্তমান পুস্তকেরও উদ্দেশ্য গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামে প্রচলিত 'গোবিন্দদাসের করচা' নামক চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের বিবরণ বিষয়ক বহু বিবাদাস্পদ গ্রন্থের অসারতা, অর্বাচীনতা, ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন। করচাখানির প্রথম প্রকাশকালেই (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মৃণালবাবু আলোচ্য পুস্তকে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থখানির সারবত্তা ও অকৃত্রিমতা প্রতিপাদনের যে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। নবীন প্রাচীন নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তিনি দীনেশ বাবুর কতকগুলি কথার অসামঞ্জস্য ও অন্যান্য ত্রুটিও প্রদর্শন করিয়াছেন। উপসংহারে দেখান হইয়াছে যে গ্রন্থখানির প্রথম প্রচারক জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতে গোস্বামী মহাশয়ই এই গ্রন্থের রচয়িতা—বস্তুতঃ, গ্রন্থের অর্বাচীন ভাব ও ভাষাও এই মতেরই সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। করচা সম্বন্ধে নানা সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে-সমস্ত আলোচনা গ্রন্থে বা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির আভাস এই পুস্তক হইতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহাদের একটি পূর্ণ তালিকা এই সঙ্গে যোজিত হইলে বিশেষ সুবিধা হইত। নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে এই পুস্তক পরিপূর্ণ ; তবে দীনেশ বাবু সম্বন্ধে যে-সমস্ত ইঙ্গিত ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এ-জাতীয় গ্রন্থের গৌরব ক্ষুণ্ণ করে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

দেউল—প্রভাময়ী মিত্র। প্রকাশক, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৮বি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

প্রাচীন ভারতের শিল্পসাধনার ধারা লেখিকা এই নাটকখানির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কিংবদন্তী ও কল্পনার সাহায্যে লেখিকা যে কয়টি চরিত্রের প্রাণ দান করিয়াছেন, তাহা অসার্থক হয় নাই সেই গৌরবময় যুগের চিরবরণীয় শিল্পী ও কবিরা পার্থিব সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া যে-ভাবে "দেউল" রচনায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন সেই দুষ্কর সাধনার রূপটি বর্ত্তমান যুগে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পল্লী সাথী—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস, এম-এ পি-এইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৩। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই বইখানি পল্লীগ্রামের দুইটি তরুণ-তরুণীর আবাল্য প্রেমের কাহিনী লইয়া রচিত। তরুণীর অভিভাবকের আপত্তিতে প্রথমে তাহাদের মিলনে বাধা জন্মে। কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে ঐ বাধা দূরীভূত হওয়ায় মিলন সম্ভবপর হয়। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

পুরস্কার প্রতিযোগিতা—শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত। প্রকাশক, সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

সহপাঠীদের চক্রান্তে নানা দুর্দ্দশায় পড়িয়াও দরিদ্র ছাত্র প্রসাদ কিরূপে শেষ পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইল, তাহাই এই শিশুপাঠ্য উপন্যাসের গল্পাংশ। বইটি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য ; তবে ঘটনা-সংস্থান স্থানে স্থানে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। প্রসাদকে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার সহপাঠীরা যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ও আত্মরক্ষার জন্য যেরূপ যোগসাধন করিয়াছিল তাহা স্কুলের অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব ত বটেই—বয়স্ক ও দুর্দ্ধর্ষ কুচক্রীদেরও তাহা হইতে শিখিবার আছে।

নূতন কিছু—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়। প্রকাশক, ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১ বি, রসারোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

শিশুপাঠ্য হাসির গল্পের সমষ্টি। 'নতুন কিছু'র সন্ধান না পাইলেও অধিকাংশ গল্পই আনন্দদায়ক। তবে কোন কোন গল্পে খেলো রসিকতা করিয়া হাসাইবার চেষ্টা আছে, যাহা শিশুপাঠ্য পুস্তকে অন্ততঃ শোভন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রীকৃষ্ণ-উত্তরা সংবাদ বা ললনা-মঙ্গল গীতা—শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত।

ইহা একখানি সদুপদেশপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। লেখক ইহাতে অনেক গম্ভীর বিষয় সহজভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরল, সতেজ ও স্বচ্ছন্দ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

বন্ধনহীন গ্রন্থি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

দীপ্তি চাটার্জী ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়ে। রিসার্চ স্কলার নরেন লাহিড়ীর সঙ্গে ভাবটা একটু বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-গৃহে বাল্যবন্ধু তমালের সহিত সাক্ষাৎ। এই তিন উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে লইয়া উপন্যাসটি রচিত। কাহিনী ঘটনাবহুল বা বিচিত্র নহে, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গীতে সুখপাঠ্য হইয়াছে। ঘটনার গতি-নিয়ন্ত্রণে ও ভাষার প্রয়োগে লেখক সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। রুচি সুমার্জ্জিত, ভাষা সহজ ও সরল, চরিত্রগুলি সজীব।

ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

ছাইচাপা আগুন

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

শহরের এক ধারে একতলা বাড়ী। উপরটা টালি, নীচের দিকটা পাকা। ইহারই মধ্যে দুইটি পরিবার; মধ্যে দরমার বেড়া। কলতলাটা একটু বাহির পানে, তাহার পাশে একটা ছোট জামগাছও আছে। দুই পরিবারের একই কলতলা। চৌবাচ্চা আছে; বাঁশের চিরের একটা ছোট জলভরার নলও আছে, একটা টিনের মগও আছে, এক টুকরা কাপড়কাচা সাবান আছে। এ সবই উভয় পরিবারের; সাবান ফুরাইলেই আসে; সেজন্য কোনদিন কোন কথা নাই।

চন্দনা বিধবা; অল্প বয়সে বিধবা। রূপেন্দু তার বড় ভাই, বাস্ চালায়। আর ছোট ভাই গৌর, স্কুলে পড়ে। চন্দনা নিজে আলতা তৈয়ারী করে, আচার করে, জেলী করে। বোতলে করিয়া সুদৃশ্য ইংরেজী লেবেল মারিয়া দাদার হাতে দেয়। রূপেন্দু তাহা নির্দ্ধারিত দোকানে দিয়া নগদ দাম লইয়া আসে। সংসার ছোট, চলে ছোট ভাবে,—অভাব-অভিযোগ নাই।

দরমার ওধারে ওরাও ছোট পরিবার, তবে ওরা নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে;—বলিতেও পারে। কেদারনাথ পেন্সন পান; পুত্র রাজীব পাটনায় চাকরি করে। কিছু পাঠায় না। স্ত্রী লইয়া সংসার চালাইয়া পিতার ভাগে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। তবু কেদারনাথের পুত্র আছে ও চাকরিও করে। কন্যা নন্দিনীর বিবাহ হইয়াছে গত বৎসর। সে এখন পিতামাতার নিকটেই আছে। স্বামী রেলে চাকরি করে, জব্বলপুরে তাহার প্রধান আড্ডা। সুতরাং ওরা মধ্যবিত্ত। তবু ছোটভাবে থাকে, তাই বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। কেদারবাবু চন্দনাদের যেন করুণাপ্রবণ আশ্রিত-পালকের চক্ষে দেখেন। চন্দনা সেই মর্য্যাদাটুকু কেদারবাবুকে দিয়া তাঁহাকে জ্যেঠামহাশয় ডাকে আপ্যায়িত রাখিত। সুতরাং এক কলতলা হইলেও জলের অংশ লইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি এই পরিবারের অজ্ঞাতই ছিল।

চন্দনা সকালে উঠিয়াই দাদার জন্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়; দাদা ছয়টার আগেই বাহির হইয়া যান। ততক্ষণে গৌর ওঠে; মুখ হাত পা ধুইয়া তাহারও কিছু জলযোগ হয়। সে নিজের পড়াশুনা লইয়া বসে। চন্দনার ওদিকে উনুনে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে। নিরামিষ য'-হয় ফুটাইয়া লইয়া, সে মাছ রাঁধিতে বসে। মাছটুকু আনিয়া দেয় নন্দিনীদের চাকরটা, উহাদেরই বাজারের সঙ্গে। পড়া সাঙ্গ হইলে আবশ্যক-মত বাজার গৌরই করিয়া দেয়। তার পর স্নান আহার সারিয়া সে স্কুলে চলিয়া যায়। চন্দনা বসিয়া থাকিবে সেই বারোটা পর্য্যন্ত।

রূপেন্দু তাহার খাকী পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে ডাক পাড়ে—"কই রে চন্দন, ভাত বাড়্।"

"বাপ রে বাপ। ছেলে বাড়ী এলেন, অমনি যেন ডাকাত পড়ল। পাশের বাড়ীর সব লোকেরা কি বলবে বল তো?" বলিয়া চন্দনা চুপ করে।

রূপেন্দু আলনায় পাজামাটা ঝুলাইতে ঝুলাইতে বলে, "বলবে আবার কি! বলবে ছেলেটার কি রাক্ষুসে খিদে!"

চন্দনা আলতার শিশির গায়ে লেবেল আঁটিতে আঁটিতে বলে, "আজ রান্না হয় নি দাদা!"

রূপেন্দু এক লাফে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়,—"বলিস কি রে? রান্না হয় নি? খিদেয় যে পেটের নাড়ীতে টান ধরেছে।"

"কি করি বল, একে শরীর খারাপ;—তার ওপর পঞ্চাশ শিশি আলতায় লেবেল লাগালাম। একা হাতে আর পারি নে।"

"মোটর ড্রাইভারের বোনের শরীর খারাপ কি রে? বললে যে লোকে হাসবে?"

এই কথাটায় চন্দনা খুব আঘাত পাইত। সে বলিল, "ফের দাদা?—রান্না তো কোন্ কালে হয়ে গিয়েছে। জিরুবে, নাইবে, তার পরে তো গিলবে? —না বাইরে থেকেই হাঁকপাড়াপাড়ি—'ভাত বাড়'—যেন ডাকাত পড়েছে। কেন এটা কি হোটেল নাকি? আমি আর পারব না, তুমি বৌ আন।"

"বা রে মেয়ে! কোন্ কথায় কোন্ কথা আনে দেখ। ওরে মুখ্যু ড্রাইভারের হাতে কে মেয়ে দেবে?"

আবার শত ঝঙ্কারে চন্দনা বলিয়া উঠিল, "মেয়ে না-দেয় না-দেবে। কারুর দোরে হাত পাততে যাব নাকি? বিয়ে করতে যাবে কেন? বিধবা একটা বোন্, ভাত কাপড়ে ঝি রাঁধুনী পেয়েছ; তোমার আর বিয়ের দরকার?"

"বলি খেতে দিবি, না ঝগড়া ক'রে মরবি।"—কলতলা

হইতে ঝুপ ঝুপ শব্দ আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহা থামিয়া গেল।

চন্দনা উঠিয়া ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িতে গেল। রূপেন্দু চুল আঁচড়াইয়া আসিয়া বসিতে বসিতে, চন্দনা ভাতবাড়া সাঙ্গ করিয়া পাখা-হাতে মাছি তাড়াইতেছিল।

ধুতি পরিয়া খাইতে আসিয়া আসনে দাঁড়াইয়াই কি একটা ঝুপ্ করিয়া সে চন্দনার সম্মুখে ফেলিয়া দেয়। "এই নে!"

"কি, ও দাদা?"

"খুলে দেখ্ না।"

খুলিয়া দেখে একগাদা লেবেল আর আলতার মশলা।

"এত কি করব?"

"দিন-পনরর মধ্যে ওদের পাঁচ-শ আলতার শিশি চাই।"

হাসিয়া চন্দনা বলিল, "আর আমি পারি নে বাপু!"

রূপেন্দু চলিয়া যায়। আসিবে সেই রাত বারটার পর।

নিজের খাওয়া সারিয়া, সে আবার আলতার শিশি লইয়া বসে।

একটু পরেই আসে নন্দিনী।

নন্দিনী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে।

"কি রে নন্দ?"

"কিছু নয়!"

"কিছু নয় যখন তখনও বুঝি; আবার কিছু কিছু যখন তা-ও বুঝি। এ তো তোমার কিছু-নয়ের হাসি নয় ভাই। কি যেন কোথায় একটু ঝিকিমিকি করছে।"

একগাল হাসিয়া চন্দনার সুডৌল পিঠে একটা ছোট চড় মারিয়া নন্দিনী বলিল, "আ-হা-া-া রে, উনি যেন সবজান্তা! কিছু কোথায় আছে তো কি বল না?"

"আচ্ছা বলব? — কি দেবে বল?"

"যা চাও।"

"তার মানেই কিছু নয়। আমি যা চাই, তা আর তুমি কি ক'রে দেবে বল? তুমি যা দেবে তাই নেব। কি দেবে?"

"আচ্ছা দেব একটা জিনিষ। — বল তো কি?"

"আচ্ছা, কি বোকা মেয়ে তুমি। এখনও বুঝবো না কি? যে কথাটা বলতে পারলে আমি যা চাই তাই তুমি আমায় দিয়ে ফেলতে পার, সে-কথাটা কি তা-কি এখনও আমি বলতে পারব না?"

"বলই না।"

আলতা-রাঙা দুটি আঙুলে নন্দিনীর চিবুকে মৃদু একটা ঠেলা দিয়া সে বলিল, "বরের চিঠি গো! বরের চিঠি!"

বলিতেই সেমিজের মধ্য হইতে নন্দিনী বাহির করিল তাহার প্রিয়তমের পত্র। ছুঁড়িয়া সেখানা চন্দনার দিকে ফেলিয়া বলিল, "এই নাও।"

চন্দনা হাসিয়া বলিল, "আমি নিয়ে আর কি করব, তুই পড় শুনি।"

এমনিই হয়।...নন্দিনীর নূতন বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীর পত্রে নববিবাহের প্রেমচন্দনের তিলকের দাগ তখনও আনন্দোজ্জ্বলতায় সুপ্রসন্ন। সে পত্রের আদ্যোপান্ত ভরা থাকে নবজাত সহজ দাম্পত্যলীলার রসমাধুর্য্যে। একাকিনী কিশোরী নন্দিনী তাহার মাদকতায় নিভৃতে উচ্ছল হইয়া উঠে। এক-এক বার পতিগর্ব্বে তাহার বক্ষশ্বাস গভীরতর ও মন্থরতর হইয়া আসে; এক-এক বার আকণ্ঠ অসহনীয় পিপাসায় তাহার চারি ধার নিঃশেষিত আনন্দের ক্লান্ত অবশেষের ন্যায় ম্লান হইয়া উঠে।

নারীর এইখানে আছে একটি অবর্ণনীয় দুর্ব্বলতা। সে তাহার সুখ দেখাইয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসে। পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। তাহার সুখ অপরের মনে কোন্ রহস্যের সৃষ্টি করিল, তাহা সে জানিতে চাহে না। সে চাহে শুধুমাত্র অংশ দিতে। একেবারে দিতে নহে। নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখাইতে। নারীর সখীত্ব, নারীর পত্নীত্ব, নারীর মাতৃত্ব— সকল গৌরবময় বৃত্তি সার্থকতা পায় এই অংশ দেওয়ার মাঝে। নন্দিনী ও চন্দনার সখীত্ব বাড়িত এই ভাগ্যাংশ পরিসন্ধানের মধ্য দিয়া। দুর্ভাগিনী চন্দনার দুর্ভাগ্য দেখাইয়া লাভ নাই, তাই নন্দিনীর একার সৌভাগ্য দেখিয়া ও দেখাইয়াই ইহারা উভয়ে এক হইয়াছিল।

নন্দিনী তাহার স্বামীর পত্র আনিয়া দেখাইত চন্দনাকে। চন্দনার নিজেরই প্রথম প্রথম দেখিতে লজ্জা করিত; কিন্তু না দেখিলে নন্দিনী যে আবার রাগ করে; তাই দেখিতে হয়।

"দাও দেখি।"

নন্দিনী চন্দনার ঘাড়ের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কতবার পড়া চিঠিখানা আবার পড়ে।

চন্দনা আলতার কাজ ছাড়িয়া দিয়া চিঠিতে মন দেয়।

এক-এক জায়গায় উভয়ে গা-ঠেলাঠেলি করিয়া হাসে।

নন্দিনী মুখ লাল করিয়া বলে, "দেখেছ ভাই, পুরুষ-মানুষগুলো কি বেহায়া হয়! চিঠিতে এসব কথা লিখতে একটু বাধে না?"

চন্দনা বলে, "তোমার বুঝি বাধে?"

নন্দিনী সলজ্জ চাহনিতে হাসিয়া বলে, "বাধে না-তো কি? আমার চিঠি তো তুমি সব দেখেছ। আমি ভাই চিঠিতে অমন সব যা-তা লিখতে পারি নে।"

ফস্ করিয়া চন্দনা বলিয়া ফেলে, "আমায় দিও, আমি লিখে দেব।"

উৎফুল্ল হইয়া নন্দিনী বলে, "দেবে ভাই? সত্যি দেবে? আমার ভাই কেমন যেন হয় না। তুমি ঠিক পারবে।"

আত্মপ্রশংসায় হাসিয়া লেবেল-মারা আলতার শিশি-গুলি এক পাশে সরাইতে সরাইতে চন্দনা বলে, "হাঁ। ঠিক পারবে! ...কেমন করে জানলে তুমি পারব?"

নন্দিনীও চন্দনার দেখাদেখি শিশির গায়ে লেবেল মারিতে মারিতে বলে, "আহা, তা আর জানি না। তুমি ভাই কত লেখাপড়া শিখেছ। গৌরকে তুমি পড়াও। আমি ভাই কি জানি?"

ম্লান হাসি হাসিয়া উদাস কণ্ঠে চন্দনা বলিল, "এত জেনেই বা কি হ'ল বল? তোমার না-জানাই বজায় থাক ভাই, আমার মত জেনে তোমার দরকার নেই:

নন্দিনী একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। সে বলে, "তোমার ভাই ঘুরে ফিরে ওই এক কথা। ...যাক, আমার এ চিঠির জবাব তোমায় লিখে দিতে হবে।"

এই বাস্তবিকতার ছায়াপাতে শঙ্কায় শিহরিয়া চন্দনা বলিল, "যাঃ, তাই আবার হয় নাকি?"

"কেন? না হবে কেন?"

"যাঃ, পাগল নাকি? তোর চিঠি আমি লিখে দেব কি?"

"দিলেই বা, আমার হয়ে তুমি লিখে দেবে। আগেকার দিনে তো সব মেয়েরাই তাই করত। তারা কি লেখাপড়া জানতো নাকি? তারা তো পুরুষমানুষকে দিয়েও লেখাত।"

গম্ভীর হইয়া মাথা নীচু করিয়া চন্দনা বলিল, "পুরুষ-মানুষকে দিয়ে লেখান সম্ভব। কিন্তু বিধবা মেয়েমানুষকে দিয়ে স্বামীর প্রেমপত্র লেখাতে নেই নন্দ।"

নন্দ যেন হতভম্ব হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কোন্ কথায় কোন্ কথা আসিয়া পড়ে। চন্দনা যেন কি! নন্দিনীর ওসব কথা ভাল লাগে না। বিধবা তো কি হইয়াছে? চিঠি লেখা বইতো নয়! সেই অনুরোধটুকুর জন্য এত কথা। বেচারীর চোখ ভরিয়া জল আসিল। সন্তর্পণে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া সে এক পা এক পা করিয়া দরমার বেড়ার ওপাশে চলিয়া গেল।

চন্দনা মুখ নীচু করিয়া শিশির গায়ে লেবেল আঁটিতে লাগিল।

লেবেল আঁটিতে আঁটিতে রৌদ্র ঐ হলুদ রঙের বড় বাড়ীটার চিলে-কোঠার ওধারে চলিয়া গেল। গৌরও আসিয়া পড়িল। সব কাজ নিত্য যেরূপ হয় তেমনই হইল। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া চন্দনার মনে পড়িতে লাগিল—নন্দিনীর সেই ম্লান বেদনাকাতর মুখখানি।

আহা, বেচারী শুধু শুধু ব্যথা পাইয়াছে। ও মাত্র নবপরিণীতা বালিকাবধূ, বৈধব্যের অন্তর্যাতনা বুঝিবার মত অনুভূতি ওর কোথায়? শাস্ত্রে লেখে, বিধবার ইহা করিতে নাই, উহা করিতে নাই;—করিতে যে কেন নাই তাহা বিধবা ছাড়া কয়জনই বা বোঝে? যাহারা ভাবিলে বুঝিতে পারে, তাহারা ভাবে না। নববিবাহিতা সখীর প্রণয়লিপি বিধবাকে লিখিতে নাই, এরূপ কথা শাস্ত্রে লেখে নাই সত্য, কিন্তু চন্দনা নিশ্চয় জানে, মনপ্রাণ দিয়া জানে, ও-কাজ তাহাকে করিতে নাই। বিধবার রসলিপ্সা থাকিতে নাই। ইঙ্গিতে, আভাসে, নেপথ্যে, অভিনয়ে কোনও প্রকারেই প্রণয়িনী হওয়া তাহার সাজে না। সাজে না কেন তাহা নন্দিনীর পত্র পড়িবার সময়েই চন্দনা বুঝিয়াছে। তাহার মনের কোণে, তাহার অগোচরে, সেই অপরিচিত কোন্ একটি যুবকের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অজ্ঞাতে দেখিয়াছে প্রিয়তমাকে পত্র লিখিবার জন্য নন্দিনীর স্বামীর বক্ষে কি ব্যাকুলতা, চক্ষে কি উদ্ভাসন, তাহার শরীরকে অবসন্ন করিয়া সে কি পুলক! চন্দনার নিজের মনে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। তাহার দেহে মনে আসিয়াছে চাঞ্চল্য। না হইবে কেন,—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"! ইহার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নহে, চন্দনা বোঝে।—তাই সে নন্দিনীর ওই বিপুল আগ্রহকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু এখন মন কেমন করে। আহা, নন্দ, বেচারী! জোর করিয়া উঠিয়া গিয়া বেড়ার পাশে গিয়া সে ডাকিল, "নন্দ।"

নন্দিনী প্রথমটায় উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার পর দু-এক ডাকে উত্তর আসিল, "কি চন্দন?"

"চল্ না কলতলায় গা ধুয়ে আসি। ও কি, চুলও তো বাঁধা হয় নি!"

"না ভাই, আজ আর চুল বাঁধব না।"

"আয় চুল বেঁধে দিই!"

"না ভাই, থাক, একেই তোমার কাজের অন্ত নেই, আবার আমার চুল।"

"রাগ হ'ল বুঝি?" চন্দনা আর নন্দিনীর মুখের পানে সহজভাবে চাহিতে পারিতেছিল না, চক্ষু দুটি জলে ভরা, মুখখানি বিষণ্ণ-প্রতিমা। "অত রাগ করে না,—বলছি এস।" হাত টানিয়া সে লইয়া আসিল। গৌরকে দিয়া জ্যেঠা-মশায়দের ঘর হইতে ফিতা চিরুণী আনাইয়া লইল।

চুলবাঁধা গা-ধোয়ার মধ্য দিয়া নন্দিনীর মুখের ভার অনেকটা কমিল বটে, কিন্তু গেল না। গৌর গেল সন্ধ্যার

পরে, আলতার শিশি ভরিবার বাক্স আনিতে,—নন্দিনী আসিয়া চন্দনার রান্নার ধারে বসিল। "কই চন্দন, দাও ভাই আলতার শিশি, আমি লেবেল লাগাব।"

"না থাক, তুমি হাত নোংরা করবে কেন?"

"তুমি কর কেন?"

"এ তোমার ভারী মজার প্রশ্ন ভাই!—আমি আর তুমি? ভগবান করুন আমার মত করা যেন তোমায় না-ই করতে হয়!"

"তুমি দেবে না তো?"

"অমনি রাগ হয়ে গেল? ঐ তো ডালায় সব রয়েছে, যা খুশী কর।"

"তবে থাক।"

অভিমানে নন্দিনীর মন ভারী হইয়া আসিতেছে দেখিয়া চন্দনা অন্য কথা পাড়িল। "ও কাজে কি হবে? চিঠি লেখা হ'ল?"

"না ভাই, চিঠি আমি আর লিখব না।"

"চিঠি লিখবে না? সে আবার একটা কথা হ'ল?"

দরজার পাশে গৌরের অঙ্ক কষিবার শ্লেট পেন্সিল ছিল। নন্দিনী শ্লেটের গায়ে আঁচড় টানিতে টানিতে বলিল, "না ভাই, কথা আর না হবে কেন? মা তো কতবার বলেন তোমার কাছে এসে চিঠি লিখতে। কোন বার আসি না। একবার যদি বা এলাম, তোমার তো আর তা লিখতে নেই!"

"তা এতবার যখন তোমার লেখায় হয়েছে, এবারেই বা হবে না কেন?"

"সে কথা তো আর হচ্ছে না, একবারই বা তুমি লিখে দিলে কি হয়? আমার কি একখানা ভাল চিঠি লিখতে সাধ যায় না?"

চন্দনার মন এই অতি সরল কিশোরীটির কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সে খুন্তীখানা অস্বাভাবিকতার সহিত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সাধ যায় নাকি?—তা আমি না লিখে দিলে তুমি আর লিখবে না, সে কি হয় নন্দ? তুমি বেশ পারবে, খুব পারবে, এতদিন তো পেরেছ। নিয়ে এস কাগজকলম,—আমার সুমুখে বসে লেখ তো!"

শ্লেটখানি যথাস্থানে রাখিয়া সে বলিল, "থাক ভাই ও কথায় আর দরকার নেই। এতদিন কি চিঠি লিখেছি সে তো আমি জানি।"—বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

নন্দিনীর গলার স্বরে সন্দিহান হইয়া চাহিতেই চন্দনা দেখিল নন্দিনী উঠিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে কত ডাকিল—"নন্দ ও-নন্দ!" কিন্তু অভিমানিনী নন্দ চলিয়াই গেল।

তরকারীটা নামাইয়া ওধারে যাইবে ভাবিতেছে, গৌর আসিয়া একগাদা পেষ্টবোর্ডের লাল লম্বা লম্বা বাক্স ঘরে ফেলিল।

"কত বাক্স পেলি রে গৌর?"

"দু-শ, দিদি!"

"কত হ'ল?"

"আড়াই টাকা।"

"সব বাকী রইল তো?"

"না দেড় টাকা রইল; একটা দিয়ে এলাম।"

"যা হাত পা ধুয়ে ফেল।"

হাত পা ধুইয়া আসিয়া গৌর বলিল, "এখন পড়াবে দিদি?"

"বোস্ এই রান্নাঘরের দোরে। ইংরিজী বই খোল।"

গৌর পড়িতে লাগিল। সহজভাবেই চন্দনা তাহাকে পড়াইতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইল। দশটার আগেই গৌর খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বারটায় রূপেন্দু আসিবে। চন্দনা ধীরে ধীরে নন্দিনীর ঘরে গেল।

নন্দিনী তখনও শোয় নাই। বাতি জ্বালিয়া বসিয়া আছে।

"কি ভাবছ নন্দ?"

"চন্দন এসেছ?"

"দেখি তোমার চিঠি।"

"কেন ভাই?"

"দাও গো, জবাব লিখে দিই।"

অভিমানের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, ক্ষিপ্র হস্তে কাগজ কলম আনিয়া দিয়া সে পাশে বসিল।···বিধবা পতিবিয়োগবিধুরা চন্দনা কল্পিতা প্রেমিকা সাজিয়া কল্পিত স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

সে কত বৎসর পূর্ব্বের কথা! এই কল্পনা সেদিন সত্য ছিল। এই চিঠি লেখা ছিল অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ। সে দিন তাহার প্রণয় ছিল যাদুমন্ত্রের ন্যায়, স্পষ্টোচ্চারিত অথচ বুদ্ধির অনধিগম্য। সেদিন স্বামী ছিলেন জীবন্ত দেবতা, আশাপরিপূর স্বর্ণ বিগ্রহ। পত্র ছিল প্রাণ পুলকের অধিকার—অভিনন্দন। সে পত্রের আয়োজনে ছিল উৎসাহ, রচনায় ছিল পুলক, রোমাঞ্চ; প্রতিটি অক্ষরে, পংক্তিতে, ব্যঞ্জনায় ছিল অধীর আগ্রহের সংযত বিকাশ। তাহার অপেক্ষায় ছিল পল-গণনার বিরক্তি, তাহার প্রাপ্তিতে ছিল ভুবনদোলান অবর্ণনীয় চঞ্চলতা। আজ সেই সে চন্দনা, সেই প্রণয়লিপি, সেই স্বামি-স্ত্রীর অপরূপ গ্রন্থীসম্বন্ধ। তথাপি কি হাস্যকর পাপ অভিনয়। চন্দনার বক্ষ দুরু দুরু কাঁপে, অতীতের যথার্থ সত্য আর বর্ত্তমানের অর্থহীন মিথ্যা অভিনয়ের দ্বন্দ্বে। সে ছত্রের পর ছত্র লিখিয়া চলে।—

"প্রিয়তমেষু,—মেয়েমানুষ, চিঠি লিখতে তোমার মত পারব না, কিন্তু প্রাণের কথাটুকু জানাবার ব্যাকুলতা···" এই ভাবে। চিঠি লেখা শেষ হয়। নন্দিনী বলে, "দেখ তো

এমন চিঠি আমি কখনও লিখতে পারি! তোমার এক কথা। সকালে যখন আমায় অমন ক'রে বললে, আমার এত দুঃখ হয়েছিল, ভেবেছিলাম আর তোমার কাছে কোন দিন কিছু চাইব না। কিন্তু আবার তোমার কাছে না গিয়ে পারলাম না।"

চন্দনার বুকে যেন নক্ষত্ররাজ্যের বাতাসের স্পর্শ লাগিতেছে। সে কিছুতেই সে কম্পনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তবুও সে মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, "এখন রাগ গেছে ত? আমি লিখে দিলাম তবে হ'ল। বাপ রে বাপ, কি রাগ মেয়ের! আমার তোমার কাজ ক'রে কি লাভ বল তো? এতক্ষণে আমার পঞ্চাশ শিশি আলতা গোলা হ'ত।"

কৃতজ্ঞতায় নন্দিনীর দুই চক্ষু চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। "আচ্ছা ভাই, কাল আমি তোমার পঞ্চাশ শিশি আলতায় লেবেল লাগিয়ে দেব।"

সহসা ডাক আসিল, "কই রে চন্দন, কোথায় গেলি। মেয়ের শুধু আড্ডা আর আড্ডা।"

দুই জনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। চন্দনা তবু একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "যাই ভাই, দেরী আর করব না; নইলে দাদা আবার চেঁচাবে।"

দাদাকে খাইতে দেওয়া; তার পর আর কাজের কিছুই প্রায় বাকী থাকে না। নিজে যৎসামান্য জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু পোড়া মনে কেবলই বাজে—"না-জানা কোন্ অজ্ঞাত পুরুষকে সে লিখিয়াছে প্রিয়তম! কে সে? কোন দিন যদি এ কথা প্রকাশ পায়? সেদিন? সেদিন কি হইবে? লজ্জা না ভয়? হয়ত প্রণয়লোলুপ সেই যুবকটি বলিবে, 'এত কথা আপনি জানতেন, ওঃ কম নন্ তো?' —ওঃ সে কি লজ্জার কথা! হয়তো বা বলিবে, তুমিই চন্দনা, আমার সখীর সখী?—তোমার কথাই..."

সেই তো সেদিন কথা হইতেছিল জামাই আসিবে। জামাই হয়তো আসিয়াছে।

কি নাম তার? সুরথ? বেশ নাম!

সুরথ ঐ নন্দিনীর ঘরে বসিয়া, চন্দনা ত আর সে কথা জানে না। সে যেমন নিত্য যায়, সেদিনও গেল।—"কই গো নন্দরাণী!"

নন্দিনী খস্ খস্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মাথায় কাপড় একটু টানিয়া দেয়।

"ও কি, ঘোমটা কেন?" পরক্ষণেই চক্ষু পড়িয়া যায় শয্যায় উপবিষ্ট দিব্যকান্তি ঐ যুবকটির পানে। কণ্ঠকে সব্রীড় সংযত করিয়া বলে, "ওমা, উনি বসে, বলিস নি; ধন্যি মেয়ে! চব্বিশ ঘণ্টা কি পুটুর পুটুর করিস বল তো? এমনি তো মুখে কথা নেই!"

গায়ে স্নেহসূচক ধাক্কা দিয়া নন্দিনী বলে, "কি আবার বলছিলাম,—ঘরে এসেছিলাম, একটু কাজ ছিল।"

ধীরে ধীরে সুরথ না শুনিতে পায় এই ভাবে চন্দনা বলে, "কাজই ত, আমি কি আর বলছি কাজ নয়!"

কথা হইতেছে আগাগোড়া সুরথেরই চোখের উপর।

সুরথ এতক্ষণে কথা কহে, "দু-জনায় ত খুব আলাপ জমে উঠল। আমি একটু পরিচিত হই।...আপনিই ত... কি বলি,—ব্যাসের গণেশ বলি, না গণেশের ব্যাস বলি! নাঃ, আপনি বোধ হয় ব্যাসদেবকেও হার মানিয়েছেন, নিজেই রচয়িত্রী আর নিজেই লেখিকা!"

চন্দনা হাসিয়া বলে, "আমি কি আর অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত লিখতে ভরসা পাই; আমি রামায়ণের বাছাবাছা দুটি কাণ্ড লেখবার চেষ্টা করেছি।"

রহস্য বুঝিতে পারিয়া নব্যটি বলে, "কোন দুটি দিদি? আদিকাণ্ড, আর...কোন্‌টা বলি?...মজা দেখেছেন,— রামায়ণে এমন দুটি কাণ্ড নেই যাতে শুধুই কীর্ত্তি আর আনন্দ। বিয়োগান্ত না হলে যেন বাল্মীকি লিখতে পারতেন না।"

কথাটায় কেমন একটা সত্যের ছায়া দেখিয়া চন্দনা শিহরিয়া উঠে। তথাপি সংযত মিষ্ট স্বরে বলে, "নিজের কোলে মাছ টানতে গিয়ে কেন আর বাল্মীকি বেচারীকে দোষ দিচ্ছেন। উপযুক্ত নায়ক পেয়ে আমি কিষ্কিন্ধ্যা আর লঙ্কা কাণ্ড দুটিই বর্ণনা করছিলাম। আমার লেখায় তিনি ফুটলেই হ'ল!"

হাসিয়া সুরথ বলে, "তা আপনি কৃতকার্য্য হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা মস্ত ভুল ক'রে গেছেন। সেই মহা বীরটির পত্নীদায় ব'লে ত কোন দায় ছিল না, আপনার নায়ক কিন্তু..."

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চন্দনা বলে, "তা হোক, বিবাহ তাঁর না হ'তে পারে। কিন্তু তাঁর স্বজাতীয়া কিষ্কিন্ধ্যা-বাসিনীরা যদি অক্ষর-পরিচয় জানতেন, দু-চার খানা চিঠি-পেতে বা দিতে তাঁর কোন আপত্তি হ'ত না। আর তিনি যে এমন করেন নি একথাও বাল্মীকি লেখেন না।"

একটু গম্ভীর হইয়া সুরথ বলিল, "তা শুনলাম চিঠি ত আপনিই দিয়েছেন।"

চন্দনা একটু শিহরিয়া ওঠে, "তাই তো কথাটা বড় অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে বলা হইয়াছে তো!"

"দিলামই বা আমি! সে তো নকল আমি। আসল যে সে আসলই আছে।"

নন্দিনী বাহির হইয়া গিয়াছে। কক্ষে তাহারা শুধু দুই জন।

সুরথ বলে, "আশ্চর্য্য আপনার চিঠিগুলি। আমি

সাধনরতা
শ্রীমতী ভদ্রা দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কতবার ক'রে পড়েছি। তখনই আমি জানতে পেরেছিলাম, এ কখনও নন্দিনীর লেখা হ'তে পারে না।"

"কেন বলুন ত ?"

"আমি ত ওকে জানি। ওর মনের প্রসার যে তত দূর হ'তে পারে না। তা ছাড়া, আমার প্রতিও যেটুকু ভালবাসা জন্মেছে সেই পুঁজিতেই অমন গভীর চিন্তাপূর্ণ ভালবাসার কথা ও লিখতে পারে না। সে বয়স ওর হয় নি।"

"জেনে শুনেও আপনি অমন সব চিঠির জবাব দিতেন কেন ?"

"আমার অগোচরে যে রহস্যাবগুণ্ঠনা নারী আমায় অমন পত্র দিত তার কাছ থেকে অমন সুন্দর জবাব পাব এই আশায়! হাজার হ'লেও সাহিত্যরসের এমন গভীর একটা নির্দেশ আছে যাকে পাবার লালসা আমি কিছুতেই দমন করতে পারলাম না। তা ছাড়া সে সাহিত্যসৃষ্টি যখন অপরিচিতা রহস্যময়ী এক নারী করছেন!"

"কি ক'রে জানলেন নারীরই লেখা ?"

"সে জানা যায় ভাষার কমনীয়তায়। আপনারা কি ভাবেন, আপনাদের পেলব নারীত্ব শুধু দেহে ? তা নয়, নারীর নারীত্ব তার দেহে, তার স্বরে, তার ভঙ্গীতে আচার-ব্যবহারে, ভাষায়,—এমন কি সাহিত্যিক ভাষাতেও। তা ছাড়া, চিঠিগুলিতে সত্যকার নারীর সত্যকার প্রেমের পরিচয় ছিল। তা কি আপনি অস্বীকার করেন ?"

সহসা কঠোর দৃপ্তস্বরে চন্দনা বলে, "নিশ্চয়। আপনি বলতে চান সুরথ বাবু যে আমার মধ্যেকার সত্যকার নারী আপনাকে সত্যকার প্রেম জ্ঞাপন করেছিল! এ অপমান আপনি আমায় করতে পাবেন না। শুধু নন্দিনীর অতিকাতর প্রার্থনা অবহেলা করতে-না-পারার দুর্বলতার বশে আমায় তার হয়ে আপনাকে পত্র লিখতে হয়েছিল। আমি তার উপকার করেছিলাম। নিজের বাসনার চরিতার্থতা খুঁজি নি।"

সুরথ রেলের চাকুরী করে, কিন্তু অতি-আধুনিক বলিয়া গর্ব রাখে, সেই জন্য যথারীতি ও যথাসুবিধা লেখাপড়া করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে সংযম আছে, বিনয় আছে, ভদ্রতা আছে,—যাহা তাহার সৌম্য সহাস বলিষ্ঠ দেহের মধ্যকার একটি বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দেয়। সে রুচিসঙ্গত কণ্ঠে বলে, "আমি তোমাকে এতটুকুও অপমান করি নি চন্দনা, করতে চাইও নি। আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির বাহুল্যে তুমি আমার অপমানের বহু বাহিরে গেছ। তুমি যা বললে তার উত্তর আমি এখন দেব না। আমার এ-কথায় যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তুমি আবার আমার কাছে আসবে, তখন তোমার ইচ্ছা হ'লে তোমার কথার উত্তর দেব। নইলে আর নয়। তবে সত্যিই তোমায় অপমান আমি করি নি। তোমার আলোচনায় ও তোমার পত্রের প্রসারতায় তোমার সঙ্গে সত্যই একটু সহজ ও প্রকাশ্যভাবে কথা বলেছি। যদি কটু লেগে থাকে, অজ্ঞানতাকৃত ও উদ্দেশ্যহীন ব'লে ক্ষমা ক'রো।"

চন্দনা মনে মনে একটু নরম হয়। তথাপি কঠিন ভাবেই বলে, "অপমান করেন নি একথা মুখে বললেন, কিন্তু হঠাৎ 'আপনি' থেকে 'তুমি'র পর্য্যায়ে নামিয়ে দিলেন কোন্ সম্মানের অধিকারে বলতে পারেন ?"

"নিশ্চয়, এটুকু আর বলতে পারব না! তোমার পত্রে ও আলাপে তোমার প্রতি আমার একটা টান এসেছিল। তা শ্রদ্ধার টান। সেই সূত্রে তোমাকে আমি আপনি বলতে চেয়েছিলাম, শ্রদ্ধার পাত্রী বলে। এখন দেখলাম, আমি ভুল করেছি। মন তোমার সত্যকার বড় মন, আকাঙ্ক্ষা তোমার গভীরতাকে চায়;—কিন্তু তুমি ভারি ছোট, বয়সেও, বুদ্ধিতেও। তোমাকে 'আপনি' বলার মত শ্রদ্ধা করার আমার কিছু নেই। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে তুমি একটু তফাৎ, কিন্তু আমার কাছে শেখবার তোমার এখনও যথেষ্ট আছে।···আমায় ভুল বুঝো না।"

নন্দিনী ঘরে ঢোকে। বলে, "রাগ ক'রো না ভাই, চেঁচানটা বড্ড বেশী হচ্ছে। কি হ'ল, ঝগড়া বুঝি ? ঘণ্টাখানেক ঘরে থেকে তোমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারে, তার সঙ্গে সারাজীবন কি ক'রে ঘর করব ভাই ?"

ক্রোধে অধীর হইয়া চন্দনা বলে,—ঝগড়া হবে না ? রাক্ষুসী! কেন মরতে বলতে গিয়েছিলে আমি চিঠি লিখে দিয়েছিলাম! না ব'লে পার নি ?"

"বা রে, তা কি হ'ল ? উনিই ত বললেন। কত ক'রে বললেন। তাই তোমার কথা বলেছি। তাতে কি হয়েছে ? উনি ক্ষেপাচ্ছেন বুঝি ?"

"ক্ষেপাচ্ছেন বইকি!" চন্দনার স্বর ভারী হইয়া আসে।

হতভম্ব হইয়া নন্দিনী বলে, "কি হ'ল, কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি নে।"

গম্ভীর স্বরে সুরথ ডাকে, "চন্দন!"

সে স্বরে চন্দনার সারা দেহমন দুলিয়া ওঠে। শিহরিয়া ওঠে প্রতি শিরা-উপশিরা। ক্লান্ত স্বরে সে উত্তর করে—"কি বলছেন!"

গম্ভীরতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুরথ বলে, "বাড়ী যাও। আর এখানে থেক না। যাও আমার কথা রাখ।"

মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় চন্দনা উঠিয়া চলিয়া যায়।

সে-রাত্রে কি দুর্য্যোগই গেল! বর্ষায় ঝড়ে যেন মাতামাতি। চন্দনার সারা রাত্রে ঘুম নাই। পল গণিয়া

গণিয়া সময় কাটে। কে এই সুরথ? কেন সে আসিল? কেন সে অমন সুন্দর ঐ ছেলেটিকে পত্র দিতে গেল! সে যে তাহার বালুচাপা ফল্গুর অন্তস্তল ভেদ করিয়া জলের উৎস বাহির করিল। সে তাহার অন্তর্গ্রন্থী ধরিয়া টানিতেছে!

প্রভাতের বাতাসে জ্বালা! দিবসের প্রাত্যহিক কর্ম্মে ক্লান্তি! আলতা-গোলা গামলা উল্টাইয়া গিয়া তাহার সারা উঠানটুকু রাঙা হইয়া উঠিল।

দ্বিপ্রহরের অবিচ্ছেদ্য আলস্য। সময় নড়িয়া বসিতে চায় না। মনে হয় ওই অদ্ভুত মানুষটির কথা। "যদি আমার এ-কথায় তোমার বিশ্বাস হয়, তুমি কাল আবার আসবে!" নাঃ, আজ সে যাইবে না; কোনমতেই না। সে আলতার শিশির গায়ে লেবেল মারে। চক্ষু নিদ্রায় ঢুলিয়া আসে, সে ঘুমাইয়া পড়ে।

কতক ক্ষণ সে ঘুমাইয়াছিল সে নিজেই জানে না। সহসা পায়ে কাহার উত্তপ্ত হস্তের স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া ডাকে, "কে?"

"ভয় পেও না,—আমি।"

পরিচিত কাঙ্ক্ষিত বিস্ময়কে সম্মুখে পাইবার বিস্ময়টাও বড় কম নয়। সুরথকে দেখিয়া সে বলে, "আপনি, এ সময়ে এখানে?"

সুরথ বলে, "কেন? কোন অন্যায় করেছি কি?"

নিজেকে সংবৃত করিয়া চন্দনা বলে, "কিছু না, অন্যায় আবার কি? বসুন, আসন এনে দিই।"

সুরথ বলে, "থাক্, আসন আমার লাগবে না; সেটা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়াতেই আমার প্রাপ্য সম্মানটুকু আমি পেয়েছি।"

তবু বাঙালী মেয়ে চন্দনা, আসন আনিয়া বসিতে দিয়া বলে, "ওঃ, বেলা যে পড়ে এল। আরও কতক্ষণ ঘুমুতাম কে জানে। ভাগ্যি আপনি ডাকলেন। আমার তো এ-ভাবের ঘুম কখনও ছিল না!"

সুরথ বলে, "কখনও যা ছিল না, কখনও তা আসবে না, এমন কথা কি জোর ক'রে বলা চলে? আচ্ছা, ভূশয্যায় শয়ন কি বৈধব্য ব্রতের একটা অবশ্যপালনীয় অঙ্গ নাকি?"

একটু মিষ্ট হাসিয়া চন্দনা বলিল, "বৈধব্য-ব্রত-পালনে যে আমি এক জন উৎকট তপস্বিনী এমন পরিচয় আপনাকে দিলে কে?"

"তোমাদের ধর্ম্ম সনাতন মতানুযায়ী যাঁকে আমার অবয়বের একাঙ্গ ক'রে তুলেছেন তিনি তো তোমার নামে এমনি একটা অপবাদই দিচ্ছেলেন।"

লজ্জিতভাবে চন্দনা বলিল, "ও, সেটুকুও পোড়ার-মুখী বলতে ছাড়ে নি।"

বিস্ময়ের ভান করিয়া সুরথ বলিল, "তুমি কার কথা বলছ জানি না চন্দনা, কিন্তু আমি যাঁর কথা বলছিলাম তাঁর মুখে অগ্নিদেবের প্রতাপের কোন চিহ্ন আমি পাই নি! আমি ত বরং..."

"সবাই কি আর সমান দেখে! আমার চোখে আপনিও যদি তাকে দেখেন, তবে ত সে বেচারী প্রাণে মারা যায়!" চন্দনার চক্ষুতে ঘুম জড়াইয়া ছিল, ছোট্ট একটি হাই সে কোন মতেই না তুলিয়া পারিল না। মুখে হাত চাপা দিল।

সুরথ বলিল, "কাল রাত্রে বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নি!"

"কি ক'রে আর হবে বলুন; যা ঝড় আর জল গেছে!"

"সত্যিই কাল রাত্রের ঝড় আর জলের কথা মনে ক'রে আমার আজও ভারী ভয় বোধ হচ্ছিল। তা এখন ত দেখতে পাচ্ছি, আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন নির্মেঘ।" কথাটায় দু-জনেই হাসিল।

চন্দনা বলিল, "কেন আর সে-কথা তুলে লজ্জা দিচ্ছেন।"

কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "একটু বসবেন, আমি দুটো ফল কেটে আর একটু সরবৎ ক'রে আনি?"

"কেন? জামাই-সৎকার নাকি?"

হাসিয়া চন্দনা বলিল, "সামাজিক বিধান যখন আছে তখন আর অমান্য কেন করি বলুন!"

"সত্যি চন্দনা, তুমি বেশ কথা কও।" কথাটা বলিয়াই চন্দনার মুখের পানে চাহিয়া সুরথ একটু স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর দৃঢ়ভাবে বলিল, "যাও, সামাজিক আপ্যায়ন কি করবে তার ব্যবস্থা আমার সুমুখেই এনে কর না, দুটো কথা কই।"

গম্ভীর ভাবে উঠিয়া গিয়া, ক্ষণেকের মধ্যে দুটি আম, চারটি নারকেল-নাড়ু, এক টুকরা আনারস ও এক গ্লাস সরবৎ ও লেবু লইয়া চন্দনা উপস্থিত হইল। সমস্ত সরঞ্জাম-গুলি রাখিয়া, সুরথের সম্মুখে বসিয়াই সে ফলগুলি বানাইতে লাগিল।

সুরথ ধীরে ধীরে বলিল, "কাল রাত থেকেই আমার কি মনে হচ্ছে জান? ঠিক তোমার মত আমার যদি একটি বোন হ'ত! কি ঝগড়াই করতাম চন্দনা, কি বলব!"

চন্দনার বাইরেকার আবরণ নড়িয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল এ ধরণের মিষ্টকথা শোনা তার উচিত নয়। সে বলিল, "আপনি বোধ হয় জানেন আমার দেবতার মত এক বড় ভাই আছেন। বোন ব'লে আমায় পাবার লোভ আপনার জন্মালেও ভাই ব'লে তার চেয়ে বড় আর যোগ্য আমার আর কারুকে মনে হয় না।"

এই আকস্মিক আঘাতে প্রায় বিবর্ণ হইয়া স্বরথ বলে, "না, সে কথা তো আমি বলছি না। আমি খুব সরলভাবেই আমার হৃদয়ের সত্যকার নিষ্পাপ একটা অভাব তোমাকে জানিয়েছিলাম। আশা আমি নিশ্চয়ই করি নি তুমি তা পূরণ করবে। তোমার দাদা যে দেবতুল্য তা আমি জানি।"

একটু চমকিয়া চন্দনা বলিল, "কি রকম? দাদার সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কি ক'রে?"

স্বরথ হাসিয়া বলিল, "সে-কথা শুনে তোমার মনে কষ্টই হবে। আজ সকালে একটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে তোমার মুখের আদল পেয়ে আমি সাহস ক'রে এই বাড়ীর ঠিকানা বলি। আমার তখন ট্যাক্সির প্রয়োজনও ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর পরিচয় নিলাম, আলাপ জমে উঠল, কর্ত্তব্য কাজ ভুলে দু-জনে খুব বেড়ালাম আর গল্প করলাম। সত্য দেবতুল্য লোক! অদ্ভুত মনের জোর।"

"দাদ তো বাস্ চালান।"

"তা তিনি বললেন, এখন বাস্খানা রিপেয়ার হচ্ছে ব'লে ট্যাক্সিই চালাচ্ছেন।"

"দাদাকে কত ভাড়া দিলেন?"

"ছি চন্দনা! অযথা এত রূঢ় হও কেন বল ত? তোমার দাদা ট্যাক্সি চালান, আমি চালাই ট্রেন,—দু-জনেই তো অটোমোবাইল-পন্থী! এতে গর্বের কি…!"

চন্দনা রেকাব আগাইয়া দিয়া পাখা লইয়া বসিল।

দেখিতে দেখিতে গৌর আসিয়া পড়িল।

স্বরথ বলিল, "চন্দনা, একটি ভিক্ষা চাইব, দেবে?"

"কি বলুন। কি চাইবেন না-জেনে দেব বলার মত দাতা আমি নই, বিশেষতঃ আপনাদের কাছে। সাধ্যমত হ'লে নিশ্চয় দেব, তা আপনিও জানেন।"

"গৌরকে ছেড়ে দেবে এবেলা? একটু থিয়েটারে যেতাম।"

"কেন আমি?"

"যা হবে না তার প্রলোভন কেন দেখাও। গৌরকে যেতে দিলেই যথেষ্ট।"

"আমি ওকে এসব বিলাস থেকে তফাৎ রাখি আর রাখতে চাই…গৌর, মুখ হাত পা ধুয়ে এস, এই সঙ্গে সেরে নাও। কাল দাদা আম এনেছেন।"

স্বরথ বলিল, "তবে গৌর যাবে না?"

"যাবে বইকি! আপনি বলেছেন, আর যাবে না। তবে আমিও একটু ভিক্ষা করব।"

আগ্রহ ভরে স্বরথ বলে, "কি বল?"

"আজ না খেয়েই সবাই থিয়েটারে যান। এসে যা-হয় এখানেই খাবেন।"

"রাত হবে না?"

"সেই জন্যই তো বলছিলাম, দাদারও রাত হয় কি না! যা-হয় এক সঙ্গেই দু-জনে…"

"বেশ, বেশ,…"

চন্দনা বলিল, "যা তো গৌর, তোর নন্দদিদিকে ডেকে নিয়ে আয় তো। অমনি জেঠাইমাকে ব'লে আসবি আজ নন্দ আর স্বরথ বাবু এখানেই খাবেন।"

গৌর নন্দিনীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে আনন্দবিহ্বল গৌরকে লইয়া নন্দিনী আর স্বরথ থিয়েটারে গেল।

রাত্রে আনন্দের মধ্য দিয়া আহারাদি-পর্ব্ব সমাধা হইল। চমৎকার-স্বভাব রূপেন্দুর কথায় চন্দনা-স্বরথের বিতণ্ডার সকল লঘু মেঘগুলি কোথায় সরিয়া গিয়াছিল। তাহার যান্ত্রিক জীবনের একটি রাত্রিতে এই সুন্দর সামাজিক আনন্দের সুরটুকু ভরিয়া রহিল।

আর সেই সুর আরও নিবিড় আরও মুখর হইয়া বাজিতে লাগিল চন্দনার বক্ষের কন্দরে কন্দরে। সে কিছুতেই তাহার মনকে স্বরথের দিব্য স্বভাব ও রূপ হইতে টানিয়া আনিতে পারে না। সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না এই ব্যক্তিটিকে সে পরিপূর্ণ প্রেমরসে সিক্ত করিয়া পত্র দিয়াছে। তাহার কল্পলোকের প্রেমিক পত্রবিনিময়কারী এত সত্য, এত জীবন্ত। কল্পনা যখন প্রত্যক্ষ হয়, আদর্শ-বাদীর জীবনে সে আসে এক তুমুল বিপ্লবের সময়। এই বিপ্লবকেই কেন্দ্র করিয়া জগতে কত অসাধ্য সাধনই হইয়া গিয়াছে।

সকলেই চারি দিকে নিদ্রাগুব্ধ। একা চন্দনা তাহার বক্ষে এই গুরুভার ও আনুষঙ্গিক চিন্তাভার লইয়া সংসারের সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া শয্যা বিছাইল। শয্যাবিছান তাহার অধিকারে, কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম ডাকিয়া আনা তাহার অধিকারের বাহিরের বস্তু। ঐ চিঠিগুলিই তাহার শত্রু। ঐগুলিকে তাহার উদ্ধার করিতেই হইবে। এই চিন্তা তাহার মস্তিষ্কে শতদংষ্ট্রা কীটের ন্যায় সহস্রে সহস্রে দংশিতে লাগিল। সে-বিষ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গেল। গভীর রাত্রের এই ভাবের উদ্দাত চিন্তা মাথায় খুন চাপাইয়া দেয়। চন্দনা ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। দরমার বেড়া ঠেলিয়া স্বরথের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। ভয়ে ও উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে, তবু তাহার মাথার খুন নামিল না।

গ্রীষ্মকাল। দুয়ার অর্গলহীন, উন্মুক্ত। ভিতরে মশারি খাটান, নিস্তব্ধতা বিরাজমান। চন্দনা পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আলনা হইতে স্বরথের কোটের পকেট হইতে চাবি উদ্ধারে বিলম্ব হইল না। কার্য্য

উদ্ধার করিয়া, সুটকেশ বন্ধ করিয়া, চাবী যথাস্থানে রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দরমার বেড়ার এ ধারটায় ঐ জামগাছটার নীচে অন্ধকার। কে চন্দনার হাত চাপিয়া ধরিল।

শব্দ করিবার পূর্বেই সে বলিল, "চুপ; আমি সুরথ। ভয় নেই, তুমি আমার সুটকেশ থেকে কি নিয়ে যাচ্ছ?"

"আপনি হাত ছাড়ুন। আমি আপনার প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ নিয়ে যাচ্ছি না।"

"কিন্তু জিনিষটা যে তোমার খুব প্রয়োজনীয়, তা নেবার সময় ও পদ্ধতি থেকে বুঝেছি। কি জিনিষ বল।"

"আমি বলব না, আমায় ছাড়ুন।"

"তোমার ভয় নেই; কিন্তু কি নিলে না-বললে আমি ছাড়ব না, তা নিশ্চয়।"

"তার মানে, আপনি আমায় চোর মনে করেন?"

"যা দেখলাম, তার পরে যদি তাই মনেও করি অন্যায় কিছু করব না; তবু তোমায় আমি তা মনে করি না।"

"কেন?"

"সে তুমি বুঝবে না চন্দনা। কিন্তু তোমায় আমি ব'লে দিতে পারি তুমি কি নিয়েছ।"

"বলুন।"

"চিঠি।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার লেখা চিঠি আপনার কাছে থাকবে না।"

"তোমার লেখা হোক, যার হোক, চিঠি এখন আমার। ও চিঠি আমায় দিতেই হবে। ও চিঠি আমার স্ত্রী আমায় দিয়েছে। একথা অস্বীকার করলে তোমার সম্মান বাড়বে না চন্দনা।"

"আপনি প্যাঁচে ফেলে আমার কাছ থেকে এ-চিঠি আদায় করবেন?"—প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া চন্দনা বলিল, "এই নিন্ চিঠি, আমায় ছাড়ুন সুরথবাবু। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

"না চন্দন, ও চিঠি তুমি নাও। কিন্তু চিঠি ত হ'ল যন্ত্র, সে-যন্ত্র বুকে যে দাগ বসিয়েছে তা তুমি কি কেড়ে নিতে পার? সে যে তোমার নিজের হাতে, নিজের মনের দান! আমার অন্তরে সে-দাগ অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।"

চন্দনার বুকে কে দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে কাতরস্বরে বলিল, "ওগো, তুমি আমায় ছাড়, আমি তোমার পায়ে পড়ি।"

কিন্তু সুরথ ছাড়িল না। সে ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন তুমি চিঠি দিয়েছিলে? তোমার লজ্জা হয় নি?"

চন্দনা হাত ছাড়াইয়া বলিল, "তার জন্য সহস্র যাতনা আমি রোজ পাচ্ছি, তুমি আর দিও না।"

—বলিয়াই ছুটিয়া সে ওধারে চলিয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল; তাহার মনে হইতে লাগিল, এখনই বুঝি তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে।

হাঁকে ডাকে ধড়ফড় করিয়া চাহিয়া দেখিল, "ওঃ কত বেলা! রূপেন্দু খাকী পোষাক পরিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, "কি রে চন্দন্, উঠ্‌বি নে? বেলা যে বড্ড হ'ল! এত ক'রে বলি যে রাত জেগে কাজ করিস্ নে! কাল অত রাতে কাজ সেরে আবার বুঝি আলতা নিয়ে মরছিলি?"

চন্দনা বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিল। রাত্রের কথা মনে হইল। কি মিথ্যা…ওঃ, কি দুঃস্বপ্ন! তবু সে একবার প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ দাদা, তোমাদের বাস্ খারাপ হ'য়ে গেলে কি তোমরা ট্যাক্সি চালাও?"

রূপেন্দু উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "তা চালাতে হয় বইকি; কিন্তু সে-কথা এত সকালে কেন বল্ তো?"

অপ্রস্তুত হইয়া সে বলে, "না, কিছু নয়,…কিন্তু কাল কি খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল?"

রূপেন্দু বলিল, "তুই স্বপন দেখছিস…ঘুমো, ঘুমো, আরও ঘুমো…হ্যা ঝড়বিষ্টি—ঘুমো—আমি চললাম।"

রূপেন্দু বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কি দুঃস্বপ্ন…

সকালের কাজে হাত দিতে-না-দিতে নন্দিনী একখানা লাল খাম লইয়া উপস্থিত।

"গৌর কই?"

"কেন রে?"

"চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসুক।"

"ঐ ঘরে গৌর, যা!"

একবার মনে হইল এ-চিঠি সে দেবে না। আবার মনে হইল, একখানাই তো, যাক্ না। তার পর আর না।

দ্বিপ্রহরে আলতার শিশিতে আলতা ভরিতে ভরিতে চন্দনা গত রাত্রের কথা ভাবে, হাসে আর মাঝে মাঝে শিহরিয়া ওঠে।

নন্দিনী আসিয়া পাশে বসে।

চন্দনা লেবেলের ঝুড়িটা আগাইয়া দেয় মাত্র। আর সব চাপা থাকে।

লক্ষ্য করে নন্দিনীর চোখে মুখে চিক্ চিক্ করে অন্তরের পুলক।

সত্য গোপন

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বড়দিনের ছুটির অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ২১শে ডিসেম্বর তারিখের এই চিঠি-খানি আমার হস্তগত হইয়াছিল—

"আপনি বৎসর তিন পূর্ব্বে রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন কিনা এই প্রশ্নটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। সে জন্য আপনাকে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত একটি আলোচনা পাঠাইতেছি। ইহা হইতে মনে হইতেছে রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না। এই বিষয়ে আপনার মত কি জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। বলা বাহুল্য, 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আলোচনাটি আমার দ্বারা লিখিত নহে; মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে আমি উহা দেখিও নাই।"

এই পত্রের সঙ্গে বর্ত্তমান সনের পৌষ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত "রামমোহন রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ চন্দ" শীর্ষক প্রসঙ্গ কথার কয়েকখানি (৪২৮-৪৩৩ পৃঃ) বিচ্ছিন্ন পত্র ছিল। এই পত্র পাইবার দুই দিন পূর্ব্বে (২০শে ডিসেম্বর রবিবার) শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইরূপ আর এক প্রস্থ ছিন্নপত্র এবং কলিকাতা রিভিউতে ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত একটি প্রবন্ধের ছিন্নপত্রসহ তাঁহার নিকট লিখিত ব্রজেন্দ্র বাবুর একখানি পত্র আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র "প্রসঙ্গ কথা" পাঠ করিয়া আমি আনন্দিতই হইয়াছিলাম। তাহার এক কারণ, 'শনিবারের চিঠি'তে সাধারণতঃ কবিসম্রাট, সাহিত্যসম্রাট, কথাসাহিত্যসম্রাট প্রভৃতি মহারথগণের কথা আলোচিত হয়। এইরূপ সৎসঙ্গে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির প্রবেশ শ্লাঘার বিষয়। দ্বিতীয় কারণ, এ-যাবৎ আর কোথাও আমার উক্ত লেখাটির আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। 'শনিবারের চিঠি'র লেখক আমার অবজ্ঞাত লেখাটিতে প্রকাশিত মতের আলোচনা উপলক্ষে উহা হইতে দুই পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। অবশ্য গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বলের একটি প্রবন্ধ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া এই লেখক মহাশয় আমাকে কার্য্যতঃ সৎসাহসবিহীন সত্যগোপনকারী সাব্যস্ত করিয়াছেন। বিচারে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও আমি ইহার জন্য 'শনিবারের চিঠি'র লেখক মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না; দোষ আমার অদৃষ্টের এবং তাঁহার সময়ের অভাবের। বর্ত্তমান পৌষ সংখ্যার প্রবাসী বোধ হয় ২৯শে অগ্রহায়ণের (১৫ই ডিসেম্বরের) বা ১লা পৌষের (১৬ই ডিসেম্বরের) পূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু পৌষ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র ছিন্নপত্রসহ আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ২১শে ডিসেম্বর, ৬ই পৌষ, এবং রামানন্দ বাবুর নিকট ঐরূপ ছিন্নপত্রসহ চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন বোধ হয় ১৮ই ডিসেম্বর, ৩রা পৌষ। পৌষের 'শনিবারের চিঠি' কোন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল জানি না। যাহা হউক, বর্ত্তমান পৌষ সংখ্যার প্রবাসীতে আমার রামমোহন রায় বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমার বিস্মৃত পুস্তিকা খুঁজিয়া বাহির করিয়া, ৬পৃষ্ঠাব্যাপী "প্রসঙ্গ কথা" লিখিয়া সময়-মত পৌষ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র জন্য দিতে গিয়া লেখক মহাশয়কে বিশেষ তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিতে হইয়াছিল। এই তাড়াতাড়িতে তিনি অন্ততঃ দুইটি গুরুতর বিষয় লক্ষ্য করেন নাই।

প্রথম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল বেচারাম সেনের জবানবন্দী হইতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর তারিখের যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই যদি শুদ্ধ হয় তবে এই শুদ্ধ পাঠে নিবদ্ধ সংবাদের উপেক্ষা যেমন আমার জ্ঞানকৃত সৎসাহসের অভাববশতঃ হইতে পারে, তেমন অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ একটা সাধারণ ভুল মাত্র হইতে পারে। সময়াভাব বশতঃ 'শনিবারের চিঠি'র লেখক মহাশয় আমার অপরাধ অজ্ঞানকৃতও হইতে পারে এইরূপ সন্দেহ মনে স্থান দিয়া আমাকে benefit of doubt—অর্থাৎ সন্দেহজনিত সুবিধাটুকু হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, উক্ত লেখক মহাশয় ১৩৪০ সনের আশ্বিন

সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী' পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় সময়-অভাবে এইবার প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু "রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন (অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)" শীর্ষক উক্ত সংখ্যায় বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে গোড়ার অংশে লিখিয়াছেন—

"১৮১৭ সনে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহনের নামে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে একটি মোকদ্দমা রুজু করেন। এই মোকদ্দমায় রামমোহনের প্রথম জীবন ও বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই উঠে, এবং রামমোহনের নিজের, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের জবানবন্দী লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার পরিজন, বাল্যজীবন বিষয় সম্পত্তি ও চাকুরী ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই সকল জবানবন্দীর ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই প্রবন্ধে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইবে তাহা প্রধানতঃ এই সকল কাগজপত্র ও বোর্ড-অব-রেভিনিউ-এর পত্রাবলীর সাহায্যে রচিত।" (২৮১ পৃঃ)

এইখানে ব্রজেন্দ্র বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, রামমোহন রায়ের স্বজনের এবং নিজের জীবনের প্রথম ভাগের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে গোবিন্দপ্রসাদের মোকদ্দমার "জবানবন্দী ব্যবহার অপরিহার্য্য।" তার পর এই প্রবন্ধের উপসংহারে ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"উপরে রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন সম্বন্ধে সমসাময়িক দলিল-পত্রের সাহায্যে কয়েকটি সঠিক সংবাদ দিবার চেষ্টা করা হইল। এই সকল সংবাদ পরিমাণে খুব বেশী নয়, কিন্তু উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সে জন্য উহাদের সাহায্যে রামমোহনের জীবনের যে কাঠামো তৈয়ারী করা হইল তাহা টিকিয়া থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। হয়ত বা ভবিষ্যতে নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে উহা দু-এক জায়গায় আরও একটু স্পষ্ট হইবে, কোন জায়গায় বা একটু পরিবর্ত্তিতও হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর উহা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" (২৯১ পৃঃ)

ব্রজেন্দ্রবাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মোকদ্দমার সাক্ষীর জবানবন্দীগুলি পাঠ করিয়াই অবশ্য এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের প্রথম জীবনের এবং রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি অবশ্যই বেচারাম সেনের জবানবন্দী পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন কাগজ-পত্রের এক জন পরিপক্ক পাঠক। তিনিও ত বল-মহাশয়ের আবিষ্কৃত নূতন পাঠটি দেখিতে পান নাই। যদি এই পাঠ তাঁহার চক্ষে পড়িত, তবে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুসময় বর্দ্ধমানে রামমোহন রায়ের অনুপস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে এত কথা বলিতে হইত না। ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুল্লেখ স্মরণ করিয়াও 'শনিবারের চিঠি'র লেখক মহাশয়ের বল-মহাশয়ের পাঠ সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সময়-অভাবে তিনি এদিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

আমার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকটে প্রেরিত আমার উত্তরে এইরূপে লিখিত হইয়াছে—

'সেন্টিনারীর সময় প্রথম আমি এই বিষয় আলোচনা করি তখন আপনার লেখা ভিন্ন আমার আর কোন সম্বল ছিল না। তার পর ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয় মোকদ্দমার অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত আমাকে বেচারাম সেনের জবানবন্দী দিয়াছিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে সেই সকল আমি মূলের সহিত মিলাইয়া লইয়াছি। গতকল্য (২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬) আমি এবং ডক্টর মজুমদার উভয়ে হাইকোর্টে গিয়া বেচারাম সেনের জবানবন্দীর ঐ অংশটি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে fourth Jaist পাঠ পাই নাই।"

বেচারাম সেন মূল জবানবন্দীতে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন—

"Saith that he knew the said Ramcaunt Roy for about 25 or 28 years before his death and up to the time of his death who died in the month of Joistee in the Bengali year one thousand two hundred and ten at Burdwan as he this deponent hath heard or believes.

বল-মহাশয় ভুলে "in the month of Joistee" র স্থলে "on the fourth of Joist" পাঠ করিয়াছেন। বেচারাম সেনের জবানবন্দীতে যদি month of Joisteeর স্থানে fourth of Joistee থাকিত তাহা হইলেও পিতার মৃত্যুর সময় বর্দ্ধমানে উপস্থিতি সম্বন্ধে রামমোহন রায়কে নিঃসংশয়রূপে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা যাইত না। বেচারাম সেন যে তারিখ সম্বন্ধে অভ্রান্ত ছিলেন না ইহা আমি "গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী" নামক প্রবন্ধে ('প্রবাসী', ১৩৪৩, পৌষ, ৩৫০ পৃঃ) দেখাইয়াছি।

এ-যাবৎ আমরা যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতে যে ভুলচুক থাকিতে পারে না এমন দাবী আমি করি না। সুতরাং আশা করি 'শনিবারের চিঠি'র লেখক মহাশয় আমাদের সাক্ষাতে হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইডের রেকর্ড-রুমে গিয়া স্বয়ং তদন্ত করিয়া এই তর্কের পুনর্বিচার করিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিবেন।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৯

নৌকার প্রতীক্ষায় এক দুই ক'রে পাঁচ দিন কেটে গেল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভোট, খাম, অম্‌দু (দক্ষিণ-চীন ও মঙ্গোলীয়ার প্রান্তের দক্ষিণে তিব্বতীয় প্রদেশ) প্রভৃতি দেশের নানা চমকপ্রদ গল্প শুনিয়াও দিন কাটা ভার হইল। এই সময় মন্ত্রজপের তিব্বতীয় প্রথা অভ্যাস করিলাম। এখানে অধিকাংশ লোকই এক হাতে মালা অন্য হাতে জপচক্র ঘুরায়। জপচক্র তাম্র বা রৌপ্যের চোঙ্গা; চোঙ্গার ভিতর লক্ষাধিক মন্ত্র কাগজে লিখিয়া ভরিয়া দেওয়া হয় এবং একবার ঘুরাইলে তত-সংখ্যক মন্ত্রজপের ফললাভ হয়। অতি বৃহৎ জপচক্রও আছে, তাহা জলের স্রোতের সাহায্যে বা মানুষের গায়ের জোরে জাঁতার মত ঘুরানো হয়, কোথাও কোথাও উষ্ণবায়ু-যন্ত্র (hot air motor)-যোগেও চালানো হয়। তিব্বতে বিদ্যুৎশক্তির প্রচলন হইলে তাহাও জপচক্রচালনে ব্যবহৃত হইবে সন্দেহ নাই। যন্ত্র-শক্তিযোগে পুণ্যসঞ্চয়ে তিব্বত এখনও ভারত অপেক্ষা শতবর্ষ অগ্রগামী!

যাহা হউক, আমার কাছে মাণী (জপচক্র) ছিল না, তবে নেপাল হইতে এক জপমালা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পথে সময়ে অসময়ে ইহা ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এত দিনে আসল সুযোগ জুটিল। তিব্বতীয়েরা অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র (ওঁ মণি পদ্মে হুঁ) বা বজ্রসত্ত্বের মন্ত্র (ওঁ বজ্রসত্ত্ব হুঁ, ওঁ বজ্রগুরু পদ্মসিদ্ধি হুঁ, ওঁ আ হুঁ) জপ করে, আমি সে-স্থলে "নমো বুদ্ধায়" জপ করিতাম। তিব্বতী মালায় এক শত আট গুটিকা এবং একটি সুমেরু থাকে। ইহা ভিন্ন তিন গুচ্ছে দশ-দশটি করিয়া রৌপ্য বা অন্য ধাতুর পুঁতি মালার সঙ্গে বাঁধা। পুঁতিগুলি ছাগল বা হরিণের নরম চামড়ায় গাঁথা, এই জন্য কোন পুঁতি উপরে টানিয়া দিলে আটকাইয়া থাকে। একবার মালা জপ হইলে প্রথম গুচ্ছের প্রথম পুঁতিটি টানিয়া উপরে চড়ানো হয় এবং এইরূপে দশবার মালা জপ হইলে প্রথম গুচ্ছের দশটি পুঁতিই উপরে টানা হয়, তাহার অর্থ সহস্রাধিক মন্ত্রজপ হইল। প্রথম গুচ্ছের দশটি পুঁতিই উপরে উঠিলে দ্বিতীয়ের একটি উঠে, অর্থাৎ দ্বিতীয় দশটি উঠিলে দশ হাজার মন্ত্রজপ বুঝায় এবং ঐরূপে তৃতীয় দশটি উঠিলে লক্ষাধিক মন্ত্র জপ হয়। এখানে ঐরূপে কয়েক লক্ষ বার মন্ত্র জপ হইল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা পুণ্যার্জ্জন ভাল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে ব্রহ্মপুত্রের চড়া অতি বিস্তৃত। স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত, দুইটির উপরই রজ্জু-সেতুতে লোক পারাপার হয়। পশু বা বৃহৎ মোট পারের জন্য কিছু দূরে খেয়াঘাট আছে। ঘাট হইতে কিছু দূরে গ্রামের পাশে একটি পাহাড় একাকী দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই শিরে জোঙ্‌ বা কলেক্টরী অর্থাৎ সেখানে নূতন গৃহনির্ম্মাণ চলিতেছে এবং নির্ম্মাণকার্য্যে ভোটীয় নিয়ম অনুসারে বেগার-মজুরীতেই হইতেছে। এদেশে প্রত্যেক গৃহপিছু এক জন লোককে কিয়ৎকাল সরকারী বেগার খাটিতে হয়, অবশ্য, যাহারা ধনী তাহারা অপরকে মজুরীর পয়সা দিয়া উদ্ধার পায়। ঐ সময় দলে দলে স্ত্রী পুরুষ (স্ত্রীলোকই বেশী) চমরীর পশমে তৈয়ারী থলীতে নদীতীরের পাথর বোঝাই করিয়া গান গাহিয়া জোঙ্‌-এ লইয়া যাইতেছিল। কাজের সঙ্গে সঙ্গে লাফালাফি-খেলা, হাসি-ঠাট্টা সবই চলিতেছিল। স্ত্রীলোকদের কাপড় টানিয়া উলঙ্গ করাও ইহাদের কাছে রহস্য মাত্র! স্নানের সময় স্ত্রীলোকদের দৃষ্টির মধ্যেই নগ্নাবস্থায় ছুটাছুটি, স্নান, কাদা-ছিটানো এসবও চলিতেছিল। সময় গ্রীষ্মকাল হইলেও নদীর জল অতিশয় ঠাণ্ডা, সেজন্য আমি অল্পক্ষণ জলে থাকিতেও কষ্ট পাইতাম, কিন্তু ভোটীয় ছেলেরা বহুক্ষণ সাঁতার কাটিত দেখিতাম।

ল্যার্সে গ্রামে প্রথম দিনই নমাজের আজানের ডাক শুনিয়াছিলাম, তখন সেটা নিজের ভ্রম ভাবিয়াছিলাম, পরে জানিলাম ঐ গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান ভোটীয়ের বাস

আছে। লাসা হইতে লদাখ যাইবার পথে ল্যর্সে পড়ে এবং এই মুসলমানেরা লদাখী মুসলমানদিগের ভোটীয় স্ত্রীদের সন্তান। অন্য ভোটিয় অপেক্ষা ইহারা ধর্ম্মকর্ম্মে মজবুত।

২২শে জুন কয়েকখানি ক্ষা (চামড়ার নৌকা) আসিল, তাহাতে আমরা যাইতে পারিতাম কিন্তু সঙ্গীরা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বলায় থাকিয়া গেলাম। পরদিন তাঁহাদের ক্ষা আসিলে দুই দিনের পাথেয়ের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ শুষ্ক ভেড়ার মাংস কিনিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলাম। ভোটিয়দের মতে শুষ্ক মাংস "স্বয়ংপক", কিন্তু আমি তখনও অতটা অগ্রসর হইতে পারি নাই। সঙ্গী বলিলেন, সিদ্ধ করিলে মাংসের সার বাহির হইয়া যাইবে, তাহা শুনিয়াও মাংস সিদ্ধ করিয়া খণ্ডগুলি পথের জন্য বাঁধিয়া লইলাম এবং ক্কাথ ঢাবাকে দিতে চাহিলাম। ঢাবা সুরুয়া লইতে অস্বীকার করায় প্রথমে বুঝিতে পারি নাই পরে শুনিলাম তাহাকে মাংসখণ্ড না দেওয়ায় সে চটিয়াছে। আমার মতলবই ছিল যে পথে তাহাকে দিব এবং সেই জন্যই বুঝিতে পারি নাই যে এখন না দেওয়ায় কিছু অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক, যাহা ভুল হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, এখন শোধরাইবার উপায় নাই।

পথে গাধার পিঠে আসিতে আসিতে নৌকার চামড়া শুকাইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য মাল্লার দল সেগুলি পাথর চাপা দিয়া নদীর জলে এক দিন ডুবাইয়া রাখিয়া পরের দিন কাঠের কাঠামোতে আঁটিতে লাগিল। চামড়া আঁটা হইলে নৌকা জলে ভাসাইয়া প্রথমে খোলের নীচের দিকে সঙ্গীদের সংগৃহীত কাঠ সাজানো হইল এবং তাহার উপর মালপত্র বোঝাই করা হইল। সকালে ঢাবা নিজে আসিয়া বলিল, "নৌকায় আপনাদের স্থান হইবে না।" দ্বিপ্রহরে মাল বোঝাই শেষ হইলে সে সেই কথা পুনর্ব্বার বলিল, কিন্তু আমি ইহা ঠাট্টা হিসাবে লইলাম। পরে মটকা-ভরা ছঙ্ আসিল এবং তাহার সাহায্যে মাল্লাদের ভোজ হইলে লাল নীল কাপড়ের টুকরার নিশান-পতাকা এক এক জোড়া-বাঁধা নৌকার সম্মুখে লাগানো সুরু হইল। ইতিমধ্যে শীগর্চী-যাত্রী কয়েক জন পথিক আসিলে তাহাদের যাইবার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমার যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা হইল না। অন্য সওদাগর বলিল, "আমার সর্দ্দার আপনাদের লইতে চাহে না, আমি কি করিতে পারি?" আমি একটি কথাও না বলিয়া আমাদের জিনিষপত্র সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমার নিজের কাঁধে উঠাইয়া গুম্বায় চলিয়া আসিলাম।

গুম্বায় আসিয়া আমি চা-পানের ব্যবস্থা করিয়া সুমতি-প্রজ্ঞকে ঘোড়া বা খচ্চরের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তিনি সেই কাজে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরে লাসার সেই দুই সওদাগর আসিয়া বলিল, "আমরা সর্দ্দারকে বুঝাইয়া বলিয়া রাজী করিয়াছি, আপনি চলুন।" আমি সাথীর কথা বলায় তাহারা বলিল, তাঁহার স্থান হইবে না। আমি বলিলাম, "তবে তোমাদের সঙ্গে লাসায় দেখা হইবে। আমি তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নহি, কিন্তু এরূপ স্থলে আমি সঙ্গীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" তাহারা চলিয়া যাইবার পরেই সুমতি-প্রজ্ঞ আসিয়া বলিলেন, "লাসা-গামী এক খচ্চরের দল আসিয়াছে। আমি শীগর্চী পর্য্যন্ত দুইটি খচ্চর চার সাং (প্রায় ৩৲ টাকা) ভাড়ায় ঠিক করিয়াছি। তাহারা কাল সকালে রওয়ানা হইবে।"

২৬শে জুন সকালেই চা-পান করিয়া মালপত্র লইয়া আমরা খচ্চরওয়ালাদের কাছে গেলাম। তাহারা বলিল যে ঐস্থানের রাজকর্ম্মচারীর কিছু জিনিষপত্র লইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং পরদিন যাত্রারম্ভ হইবে। আমরা গুম্বা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, খচ্চরের আড্ডায় থাকিবার জায়গাও নাই, সুতরাং মালপত্র তাহাদের কাছে ছাড়িয়া দেড় মাইল পথ অগ্রসর হইয়া সুমতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ চা-পানের পর চাঙ-বোমো বিহার অভিমুখে—তাহার মহাস্তূপ দূরে দেখা যাইতেছিল—কাহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। আমি কিছুক্ষণ গৃহবধূর তাঁত বোনা দেখিতে লাগিলাম। তিব্বতে ঘরে ঘরে পশমের সুতা কাটা ও বোনা হয়। উলের কাপড় এক বিঘৎ মাত্র চওড়া করিয়া বোনা হয়, সহজেই ইহার প্রস্থ বড় করা যায়, কিন্তু সেদিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। কাপড় সুন্দর ও মজবুত হয়। কিছুক্ষণ পরে ছাতে বেড়াইতে গেলাম। কিন্তু অল্প পরেই গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা নামিয়া আসিতে বলিল। পরে শুনিলাম, এখানকার লোকেরা ছাতে বেড়ানো অমঙ্গল মনে করে। এই গৃহ ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে দূরে, কিন্তু এখানেও উপত্যকা বিস্তৃত ও সমতল, যদিও নদীর জল এখানে আসে না। ক্ষেতে চারা অল্প অল্প অঙ্কুরিত

তিব্বতের দুর্গ (জোঙ্)

পথে খচ্চরের দল-সহ যাত্রীগণ
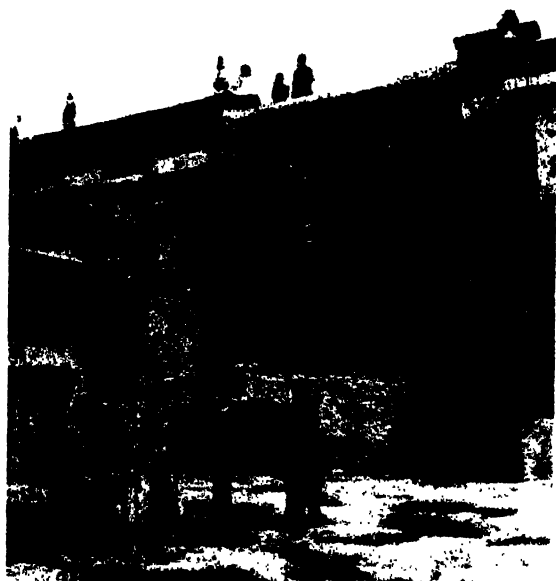
সম্ভ্রান্ত তিব্বতীয়ের বাসভবন

লাসার বাজার

তিব্বতীয় মঠে তালপত্রের পুঁথির সংগ্রহ

তিব্বতীয় মহিলা

তিব্বতীয় বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ

তিব্বতীয় মহিলাদের বেশবিন্যাস

হইয়াছে, সেগুলি সেচনের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। কূপ হইতে চামড়ার ডোল করিয়া গ্রামের জল তোলা হয়, কূপ বিশেষ গভীর নয়। রাত্রে গৃহস্থ আমাদের থুক্‌-পা খাওয়াইলে পরে সুমতি-প্রজ্ঞ পথে কেনা কাপড় টুকরা করিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসাদ বলিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন।

পরদিন চা পান করিয়া দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ভাবিলাম আজও বুঝি খচ্চরের দল রওয়ানা হইবে না। সেই জন্য ফিরিয়া খচ্চরের আড্ডার দিকে যাইতে যাইতে গ্রামের কাছে দলের সঙ্গে দেখা হইল। আমি ও সুমতি-প্রজ্ঞ দুই জনে দুইটি খচ্চরের সওয়ার হইলাম। খচ্চরের মুখে লাগাম নাই, সুতরাং আমরাই তাহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া চলিলাম। আমাদের দল ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়িয়া ডাহিন দিকে চলিল। কিছু দূর যাইবার পর দেখিলাম এখানে-ওখানে দূরবিস্তৃত বালুর চর, তাহার মাঝে মাঝে কুশের মত ঘাস, এবং অল্প চড়াইয়ের পরে এক জোত বা ঘাট, দ্বিপ্রহরে তাহা পার হইলাম। উৎরাইও সহজ, এখানকার পাহাড়গুলিও বৃক্ষগুল্মহীন। কিছু দূরে পর্ব্বতশিখরে বামে ও দক্ষিণে দুইটি গুম্বার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল এবং সেই পাহাড়েরই নীচে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী দেখিলাম, মনে হইল সেগুলি আখরোট কিংবা বিরি বৃক্ষ।

সেদিন বেলা দুইটা পর্য্যন্ত পথ চলা হইল। কিছুক্ষণের জন্য এক গ্রামে অপেক্ষা করিয়া খচ্চরগুলির ভূষি ও আমাদের চা জোগাড় করা হইল। গ্রামের পরই চড়াই আরম্ভ, উপর হইতে একটি জলের ধারা নামিতেছিল, সেই জলে এই গ্রামের ক্ষেতের সেচ হয়। তাহার পাশ দিয়া চলিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা চড়াইয়ের পর উপরের ঘাটে পৌছিলাম। ঘাটের উপরিস্থিত পর্ব্বতগাত্রের পাথরগুলি আড়ভাবে খাড়া হইয়া আছে, সুতরাং খচ্চরের সুবিধার জন্য উৎরাইয়ের কতকটা পথ হাঁটিয়া চলিলাম। এইখানে এক প্রকার কালো পাথর চারি দিকে দেখা গেল, শুনিলাম এইরূপ পাথরের নিকটেই সোনার খনি থাকে। অনেকটা উৎরাইয়ের পর মোটা পাথরের দেওয়ালযুক্ত একটি ছোট দুর্গের বা ফৌজী চৌকির কাছে পৌছিলাম, ইমারতটি প্রাচীন নহে, কিন্তু এখন জনশূন্য। কেল্লার দেওয়ালে ঘাটের-দিকে-মুখ-করা কামানের ছিদ্র। কিছু দূর চলিবার পর আমরা ঐ জলধারার পাশ ছাড়িয়া, একটি ছোট পাহাড় ও একটি নালা পার হইয়া চব্-অঙ্-চারো গ্রামে পৌছিলাম। গ্রামে মাত্র পাঁচ-ছয়টি ঘর, একটি বেশ বড়, বোধ হয় কোন ধনীর, অন্যগুলি খুব ছোট। সুমতি-প্রজ্ঞ ও আমি এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় লইলাম, খচ্চর-ওয়ালারা মাঠে লোহার খোঁটায় দড়ি দিয়া খচ্চরগুলি বাঁধিয়া বোঝা নামাইয়া ভূষি খাওয়াইল। ভূষি খাওয়ানো হইলে তাহাদিগকে খুলিয়া জল পান. করাইয়া মুখে দানার থলি বাঁধিয়া দিল। দানা বলিতে এখানে দলিত কাঁচা মটর বা ঐ জাতীয় পদার্থ দেওয়া হয়। আমাদের জন্য বৃদ্ধা থুক্‌-পা রাঁধিয়া দিল এবং শয্যার জন্য গদীও পাতিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে এক টঙ্কা "নে-ছঙ" (বাস করিবার জন্য বকশিশ) দিয়া খচ্চরওয়ালাদের দলের দিকে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা প্রস্তুত হইয়া চলিতে লাগিল। পথ বহুদূর পর্য্যন্ত উৎরাই, চারি দিকে কালো পাথর চকমক্ করিতেছে, মধ্যে খচ্চরের পাল লোহার ঘণ্টার ধ্বনিতে পথ মুখরিত করিয়া দ্রুত চলিয়াছে। প্রায় এগারটা নাগাদ উৎরাইয়ের শেষে একটি লাল রঙের গুম্বা দেখা দিল এবং সামনে একটি নদীও পাইলাম। নদী পার হইয়া তাহার দক্ষিণ তীর ধরিয়া উপরের দিকে কিছু দূর গিয়া এক গ্রামে চা-পানের জন্য আমরা থামিলাম। গ্রাম হইতে নদী ছাড়িয়া অল্প চড়াইয়ের পর অনেক দূর পর্য্যন্ত সমতল পথে চলিয়া লা (ঘাট) পার হইলাম। এখানকার মাটি মসৃণ ও হরিদ্রাভ, বর্ষায় চাষের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আরও পরে কতক-গুলি ক্ষেত দেখা গেল, সেগুলিও বর্ষার উপর নির্ভর করে। এইরূপে অনেক দূর চলিয়া শব্-কী নদীর পারে একটি বড় গ্রামে পৌছিলাম। গ্রামে বড় বড় ঘর, সফেদা ও বিরি বৃক্ষের বাগান এবং সেচ-খালের ব্যবস্থা সবই আছে। এখানে নদীর উপর পাথরের সেতুও রহিয়াছে। সেতু এবড়ো-খেবড়ো পাথরের তৈয়ারী, মাঝে মাঝে কাঠের ব্যবহারও হইয়াছে, স্তম্ভগুলি রক্ষার জন্য তাহাদের মূলে চবুতরা করা আছে। নদীর

তট বিস্তৃত কিন্তু সমতল নহে। আমরা নদী ডাহিনে রাখিয়া আগে চলিলাম, কিছুক্ষণ চলিবার পর নদী বহু দূরে পড়িয়া গেল। বেলা চারটার সময় নে-চোঙ্ গ্রামে পৌছিলাম, এখানে খচ্চর, গাধা ইত্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এখানকার লোকে চা ভুষি প্রভৃতি-জিনিষ বিক্রয় করিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করে, সুতরাং এইরূপ গাধা-খচ্চরের দলকে আদর-যত্ন করিয়া থাকে। আজিকার পথ দীর্ঘ, খচ্চরে চড়িয়া চলিতে চলিতে গায়ে ব্যথা হইয়াছিল। আমি গিয়াই, যে-ঘর আমাদের দেওয়া হইল সেখানে বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম, সুমতি-প্রজ্ঞ আমাকে দু-চার কথা শুনাইয়া চা তৈয়ারী করিতে বসিলেন। রাত্রে থুক-পা রাঁধিবার সময়ও তিনি বেশ দু-কথা শুনাইলেন, এই ত তাঁহার প্রধান দোষ—তবে আমি কিছুই বলিলাম না।

২৯শে জুন প্রাতে রওয়ানা হইয়া সোজা সমতল পথ দিয়া আমরা চলিলাম। দশটার সময় লা অর্থাৎ ঘাট পার হইলাম। চড়াই-উৎরাই না থাকায় ইহাকে লা বলা উচিত নহে, তবে দস্যুভয় যথেষ্ট আছে। তাহার পর সামান্য উৎরাই এবং আরও পরে প্রায় সমতল ঢালু উপত্যকার বিস্তৃত জমি। বারটার পর আমরা নার-থঙ্ পৌছিলাম, এখানকার কঞ্জুর-তঞ্জুরের ছাপাখানা বৃহৎ, সে বিষয়ে পরে বলিব। এখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া চা পান করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম; দুইটার পর পর্ব্বতমূলে বিশাল মঠ দেখিতে পাইলাম, ইহাই টশী লামার বিখ্যাত টশী লুম্পো মঠ।

মঠ দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সকলে খচ্চর হইতে নামিয়া পড়িল। উপর নীচে সাজানো সুদূরবিস্তৃত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যস্থিত মন্দিরগুলির চীনা-ধরণের ছাদের সোনালী শোভা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। মঠের সর্ব্বনিম্ন অংশে টশী লামার উদ্যান, তাহারই দেওয়ালের পাশ দিয়া আমরা মঠের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারের কাছে বাগানে ছোট ছোট কেয়ারীতে ও গামলায় মূলা এবং শাকসব্জী লাগানো রহিয়াছে। এখান হইতে শীগচীর বস্তী মাত্র কয়েক শত গজ দূরে। সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন চীনা দুর্গের নগ্ন মৃৎ-প্রাচীর, তাহার পর প্রস্তরে ক্ষোদিত বহু মন্ত্র ও দেবমূর্ত্তি প্রাচীরে স্থাপিত আছে, তাহার নাম "মাণী"। অবলোকিতেশ্বরের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"; মণি শব্দ হইতে এইরূপে জপচক্র ও মন্ত্রপূত স্তূপের নাম "মাণী" হইয়াছে। মাণীর বাম পাশ দিয়া আমরা শীগচীতে প্রবেশ করিলাম। গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া খচ্চরওয়ালারা আমাদের জিনিষপত্র নামাইয়া দিল এবং সুমতি-প্রজ্ঞ আশ্রয়ের সন্ধানে গেলেন। তাঁহার পরিচিত গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাডাকি করিয়াও কেহ বাহিরে আসিল না দেখিয়া আমরা আরও কয়েক জায়গায় চেষ্টা করিলাম কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় আমাদের বেশ, এমন জীর্ণ মলিন বসনধারীকে স্থান দেয় কে? শেষে অনেক চেষ্টার পর এক সরাইয়ের বারাণ্ডায়, দৈনিক এক টঙ্কা ভাড়ায় জায়গা পাওয়া গেল।

সে-রাত্রেও সুমতি-প্রজ্ঞ অশেষ কটূক্তি করায় আমি ভাবিলাম ইঁহার সঙ্গে আর চলা যায় না। ইঁহার এ অভ্যাস যাইবে না, আমি উত্তর না-হয়-নাই দিলাম কিন্তু মনের শান্তি অটুট রাখাও সম্ভব নহে। পরদিন সকাল হইতে আমি মাল-পত্র ছাড়িয়া কোন নেপালীর খোঁজে বাহির হইলাম। নেপালে এক সজ্জন শীগচীবাসী নেপালী দুই সওদাগর ভ্রাতার ঠিকানা দিয়াছিলেন। আমি তাহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু দুই ভাই একত্রে এখানে ব্যবসায় করেন বলায় এখানকার এক নেপালী সজ্জন তাহাদের নাম ঠিকানা বলিয়া দিলেন। এখানে বিশ-পঁচিশটি নেপালী দোকান আছে, তাহার মধ্যে চার-পাঁচটি বেশ বড়, সুতরাং আমি সহজেই তাহাদের খুঁজিয়া পাইলাম। সকাল সাতটা—তখনও পর্য্যন্ত সাহু নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু আমার খবর পাওয়ায় বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং অতি আদরের সহিত আমাকে স্বাগত করিয়া তাঁহার লোককে আমার সঙ্গে মালপত্র আনিতে পাঠাইলেন। সরাইয়ে আমাদের দু-জনের ভাড়া চুকাইয়া এবং সুমতি-প্রজ্ঞের জন্য নিজের ঠিকানা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সেখানে গরম জল ও সাবানে মুখ হাত ধুইয়া সত্তু-সহ চা ও মাংস ভোজন করিলাম।

ভোজনের পর শ্রীআনন্দ ও অন্য বন্ধুদের নামে চিঠি লিখিয়া সাহু মহাশয়কে দিলাম এবং শীঘ্র আমার লাসা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি দশ-বার দিন থাকিতে বলায় বলিলাম, "আমি লুকাইয়া

চোরের মত যাইতেছি, ধরা পড়িলে এখান হইতেই ফিরিতে হইবে। লাসা গিয়া দলাই লামাকে নিজের পরিচয় দিয়া কোন সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব।" ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া খচ্চরের আড্ডায় চলিলেন কিন্তু লাসাযাত্রী কোন দল পাওয়া গেল না, শেষে ল্যসে'র সেই দলের খোঁজে গেলাম কিন্তু তাহারা আড্ডায় ছিল না, সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাহাদিগকে দেখা করিতে বলিয়া আসিলাম।

ভোটদেশে লাসার পরই শীগচী বৃহত্তম বসতি। এখানে দশ হাজার লোকের বাস, তাহার মধ্যে বিশ-পঁচিশ ঘর নেপালী ব্যাপারী এবং অনুরূপ সংখ্যার মুসলমান দোকানী আছে। অধিকাংশ দোকানই ঘরের ভিতর দিকে স্থিত, রাস্তার দিকে মুখ থাকিলে লুটের আশঙ্কা আছে এই জন্য ঐ রূপ ব্যবস্থা। প্রতি নেপালীর দোকানে দুই-তিনটি পাঁচ-ছয় নলা পিস্তল আছে। আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা ছাড়া প্রত্যেকের ছাদে দুই-চারিটি বৃহৎ কুকুর ছাড়া থাকে যাহাতে দস্যুদল ছাতে উঠিয়া ভিতরে ঢুকিতে না পারে।

এখানে সকাল নটা হইতে এগারটা পর্যন্ত বৃহৎ মাণীর পিছনে হাট বসে। শাকসব্জী কাপড় বাসন মাখন ইত্যাদি সমস্ত ঐ দুই ঘণ্টায় বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে না হইলে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। হাটের পশ্চিম দিকে লাসায় দলাই লামার প্রাসাদ—"পোতলা"র আকারে নির্ম্মিত জোঙ্। এখানকার স্ত্রীলোকদিগের শিরোভূষণ দেখিতে অনেকটা ধনুর মত। উহার দুই ধারে পরচুলার বেণী থাকে এবং অবস্থা অনুযায়ী প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতিও লাগানো হয়। ভোটদেশে আসিবার পর এখানেই প্রথম শূকরের বাহুল্য দেখিলাম।

১লা জুলাই রামপুর-বুশহর (শিমলা-পাহাড় অঞ্চল) হইতে আগত তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ যুবক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। দেশের স্কুলে আপার প্রাইমারী পর্য্যন্ত উর্দ্দু পড়ায় তাহার উর্দ্দু ও হিন্দী কথা পরিষ্কার, এখন চার-পাঁচ বৎসর যাবৎ এখানে ভোটীয় ভাষায় লেখাপড়া শিখিতেছে। কুতী ছাড়িবার পর ইহার সঙ্গেই প্রথম হিন্দী বলিবার সুযোগ পাইলাম। তাহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে আমার পরিচিত এক লদাখী যুবক গৃহ ও মুহুরীর চাকরী ছাড়িয়া এখানে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, সে দুই বৎসরের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হইয়া লাসার এক তরুণী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া এই পথে দিনকয়েক পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে। রামপুরের এই যুবকের নাম রঘুবর। রঘুবর তাহাকে নর-কপালে "কারণ" পান ও ভূত ভবিষ্যৎ গণনায় লোকের সুখ-দুঃখের কথা বলিতে দেখিয়াছে। এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে সেই খচ্চরওয়ালারা আসিয়া পড়িল। তাহাদের সঙ্গে আট সাঙ্ (পাঁচ টাকার কিছু বেশী) ভাড়া ঠিক হইল এবং তাহারা গ্যাঙ্চীর পথে বার দিনে আমাকে লাসায় পৌঁছাইয়া দিবার কথা দিল। সোজা পথে লাসা সাত দিনে যাওয়া সম্ভব এবং গ্যাঙ্চীতে ইংরেজ বাণিজ্যদূত থাকায় সে-পথে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমার যাইবার অন্য উপায় না থাকায় এবং এত দিনে নিজের ছদ্মবেশের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস হওয়ায় উহাতেই রাজী হইলাম।

২রা জুলাই দ্বিপ্রহরে নদীতীরে নাচের আয়োজন ছিল। সকল শ্রেণীর লোকেই মদ্য ও খাওয়া-দাওয়ার অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া সেখানে যাইতেছিল, কেন-না ভোটিয়েরা নৃত্য বিশেষ আসক্ত। নাচ হইলে ইহারা সবই ভুলিয়া যায়। স্ত্রীলোকেই নাচে, বাদ্য বাজায় পুরুষ। এখানেও প্রায় প্রত্যেক নেপালীর ভোটীয় রক্ষিতা আছে, তাহারাও নাচে যাইতেছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত নাচ চলিল, তাহার পর যে যাহার ঘরে ফিরিল। এদেশে চাউল জন্মায় না, কিন্তু নেপালী মাত্রেই অন্ততঃ রাত্রে একবার ভাত খায়, মাংস ত তিন বেলা চলে এবং রাত্রে মদ্যপান নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার।

৩রা জুলাই যাত্রার দিন, সেদিন অতি প্রত্যূষেই সাহুর সঙ্গে আমি টশী লুম্পো গুম্বা দেখিতে গেলাম। এখানে বহু দেবালয় আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান এবং সেগুলির ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত। প্রথমে আমরা আগামী বুদ্ধ মৈত্রেয় দেখিতে গেলাম। অতি বিশাল মূর্ত্তি, মুখ উত্তমরূপে দেখিতে হইলে দ্বিতলে উঠিতে হয়, প্রতিমা মৃন্ময় কিন্তু সোনার পাতে আচ্ছাদিত। মৈত্রেয় মূর্ত্তি শান্ত ও সুন্দর এবং কক্ষ নানা বর্ণের রেশমী ধ্বজায় অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। প্রতিমার সম্মুখে স্বর্ণ-রৌপ্যময় ঘৃত-প্রদীপ আবরাম অষ্ট প্রহর জ্বলিতেছে। মূর্ত্তির আশপাশে অনেক

ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং পাশের কক্ষে শত শত সুন্দর ছোট পিত্তলের মূর্ত্তি সাজানো আছে। ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য্য ও সিদ্ধ পুরুষের মূর্ত্তিও ইহার মধ্যে আছে। অঙ্গহীনকে সাধুশ্রেণীভুক্ত করা বিনয়ের মতবিরুদ্ধ, কিন্তু এখানে কাণা শ্রমণ দেখিলাম। এক দিকে ভোটীয় ভাষায় স্তোত্রগীত হইতেছে শুনিলাম, সুর নেপালী স্তোত্রগীতের অনুরূপ। অন্যান্য মন্দিরও অতি সুন্দর এবং স্বর্ণরৌপ্য মণি-মাণিক্যে পূর্ণ। আজ সময় ছিল না এবং পুনর্ব্বার এখানে আসিতে হইবে, সুতরাং শীঘ্র দেখা সাঙ্গ করিয়া ফিরিলাম। ফিরিবার পথে খচ্চরওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হইল।

ভোজনের আয়োজন ঠিক ছিল কিন্তু তাড়াতাড়িতে খাওয়া হইল না। নয়টার মধ্যে মালপত্র লইয়া খচ্চর-ওয়ালাদের নিকট পৌছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে শীগর্চী ত্যাগ করিলাম। চারি দিকে শ্যামল ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে নহরের (সেচনালী) জলস্রোত চলিয়াছে, যব ও গমের চারা উঠিতেছে এবং সরিষার ফুলের পীত শোভায় চারি দিক আলোকিত। কোথাও বা লাল ফুলে পূর্ণ মটরের ক্ষেত, কৃষকেরা কোথাও জলসেচনে, কোথাও বা ঘাস নিড়াইতে ব্যস্ত। পথের চারি দিকে ক্রোশব্যাপী ক্ষেত, খচ্চরেরা যাহাতে ক্ষেতে চরিতে না-পারে সেই জন্য তাহাদের মুখে কাঠের চুপড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামগুলির নিকট সাদা ছাল এবং সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত সফেদা বৃক্ষের ছোট ছোট বাগান ছিল। বিরি গাছের কাটা মাথা হইতে পাতলা সবুজ পাতায় ঢাকা লম্বা বেতের মত সরু শাখা-গুলি পিশাচের মাথার চুলের মত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন আমরা মাঘ মাসে ভারতের যুক্তপ্রদেশের প্রান্তস্থিত কোনও অঞ্চলে রহিয়াছি। এক ঘণ্টা পথ চলার পর তুরিং গ্রামে পৌছিলাম, আজ আমাদের এখানেই বাসা।

আমাদের তিন জন খচ্চরওয়ালার মধ্যে এক জন ছিল সর্দ্দার, উহার খচ্চরের সংখ্যাই অধিক। সে কিছু লেখা-পড়া জানিত এবং নিজেকে উচ্চবংশীয় প্রমাণ করিবার জন্য ফিরোজাপাথর-বসানো প্রায় আড়াই তোলা ওজনের সোনার মাকড়ী কানে পরিত, হাতের বাম অঙ্গুষ্ঠেও চওড়া সবুজ পাথরের সিল আংটি ছিল। অন্য দুই জনের কানে পাঁচ-ছয় তোলা ওজনের রূপার আংটা ছিল। মাথায় পুরানো ইংরেজী ফেল্ট হ্যাট ত এখন তিব্বতে সাধারণ ব্যবহারের জিনিষ।

আমরা গ্রামে পৌছিলে খচ্চরগুলি বাহিরে বাঁধা হইল এবং তাহাদের খাওয়ানো চলিল। আমরা ভিতরে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাম কর্ণে লম্বিত প্রবাল-মুক্তা-জড়িত সোনালী পেন্সিল তাঁহার সরকারী উচ্চপদের পরিচয় দিতেছিল। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঙ্গীরা লম্বা জিহ্বা বাহির করিয়া ডান হাতে টুপি খুলিয়া দুই-চার বার উপর নীচে সঞ্চালন করিল; এইরূপে অভি-বাদনের পালা শেষ হইলে সকলে মাটিতে বিছানো গদীর উপর বসিলাম। যদিও আগেকার ন্যায় আমার পরিধেয় ভিখারীর মতই ছিল, এখন নেপালী সাহুর নিকট এত সম্মান পাওয়ার ফলে সঙ্গীদের নিকটও সম্মান পাইতেছিলাম। আমিও মাঝে মাঝে নিজের ভিক্ষুক-বেশের উপযোগী আচরণ ভুলিয়া যাইতেছিলাম। এক্ষেত্রেও আমাকে বিশেষ আসন এবং চা-পানের জন্য চৈনিক চীনা মাটির পেয়ালা দেওয়া হইল, অন্যদের দেওয়া হইল শুকানো মাংস ও ছঙ্। সর্দ্দার মদ্যপান করিত না, সে চা-পান করিল, অন্যেরা খচ্চর-আগলানোর মাঝে ক্রমাগত ছঙ্ চালাইল, গৃহকর্ত্তার চাকরাণী তাহাদের তামা-পিতলের ছঙ্দানে সর্ব্বদা মদ ঢালিতে থাকিল। ক্লান্ত হইয়াও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা পান থামাইল না, পেটে স্থান ছিল না সুতরাং টুপি খুলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া অবিরাম অধিকারী মহাশয়কে সেলাম জানাইতে লাগিল, কিন্তু "উহাদের আরও দাও" হুকুম পূর্ব্ববৎ চলিল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে ছঙের পালা শেষ হইল।

ভোটিয়াদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কলারুচি সাধারণ ভাবে ব্যাপ্ত। এই ঘরের দেওয়ালের হাসিয়া (dado) সুন্দর এবং লাল সবুজ ঝালরে সুসজ্জিত। সত্তুর কাষ্ঠপাত্র নানারূপে অলঙ্কৃত, চায়ের চৌকী নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহার পায়াগুলির বর্ণবিন্যাস সুরুচির পরিচায়ক, বসিবার গদী ঘাসে ঠাসা কিন্তু তাহার খোল নানা বর্ণের উলের পট্টি দিয়া সুন্দর ভাবে সাজানো এবং তাহার উপর চীনদেশীয় ছাপা ফরাস পাতা। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি হওয়ায় অঙ্গনে কালপাড়-যুক্ত

সাদা জিনের চাঁদোয়া খাটানো হইল। জানালার পাল্লাগুলি কাঠের জালির উপর কাপড় মুড়িয়া তৈয়ারী, বাহিরের দিকে কাল ধারিযুক্ত সাদা জিনের পর্দা, সেগুলি রঙীন খুন্টি ও দড়ির সাহায্যে যতটা ইচ্ছা খোলা ও গুটানো যায়। বৈঠকখানার পাশেই অধিকারী মহাশয়ের দুই পুত্র শিক্ষকের কাছে পড়িতেছিল। এদেশে সুন্দর ও দ্রুত লেখার জন্য দুই প্রকার লিপি ব্যবহৃত হয়, প্রথমটি "উ-চেন" (দাঁড়িযুক্ত), অন্যটি "উ-মেদ" (দাঁড়িবিহীন)। সাধারণ ভাবে উ-মেদের ব্যবহার ও প্রয়োজন অধিক, সেই জন্য ভিক্ষু ভিন্ন অন্য সাধারণে ঐ লিপিই শিক্ষা করে। এখানে শিক্ষক কাগজের উপর নিজে সুন্দর ভাবে অক্ষর লিখিয়া দিতেছিলেন, ছাত্রেরা কাঠের পাটায় তাহার অনুকরণ ও অভ্যাস করিতেছিল। আমাদের পুরাতন পাঠশালার পণ্ডিতদের মত এখানেও শিক্ষায় বেতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলিয়া গৃহীত। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের ভুল হইলে তাহাকে গাল ফুলাইতে বলিয়া গালের উপর চওড়া বেত বা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া সশব্দে ভুল শোধন করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

চড়ুই

শ্রীঅচ্যুত রায়

অন্ধগলির মধ্যে এক জীর্ণ বাড়ীর খোপর ডিমপাড়ার পক্ষে উপযুক্ত স্থান মনে ক'রে এক চড়ুই-দম্পতী তাতে খড়-কুটো জড় করতে লাগল। বড় রাস্তার দুষ্ট ছেলেরা এ-পথে যাতায়াত করে না, হিংস্র পাখীরা এর কোন খোঁজ পাবে না এবং যে-ছোকরাটি ঘরের মধ্যে থাকে তার কাছ থেকে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নেই, সে খুব ভোরে বেরিয়ে যায় এবং গভীর রাত্রে বাসায় ফিরে কালিপড়া মিটমিটে কেরোসিনের বাতি জেলে কি একটু লেখাপড়া ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে, ডিমপাড়ার এর থেকে সুন্দর জায়গা আর পাওয়া যাবে না।

দেখতে দেখতে খোপরটি ভ'রে উঠল, ছেঁড়া কাগজ, দেশলাইয়ের কাঠি, শালপাতার টুকরো, জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলা সুকেশীদের কেশগুচ্ছ এবং অনুরূপ অন্যান্য অনেক প্রকার সরঞ্জাম এনে পাখী দুটি তাদের বাসা সাজিয়ে তুলল। সমস্ত দিন ধ'রে ওরা বাসা বাঁধে। শুধু দুপুরবেলা একবার মোড়ের ঐ মুদীর দোকানের কাছ থেকে ঘুরে আসে। কত খুদ, ডালের কণা ছড়ানো আছে ওর পথে, তার গোটা-কয়েক হ'লেই ওদের দু-জনের একদিন চলে যায়।

পুরুষ-পাখীটা খড়কুটো জোগাড় ক'রে নিয়ে আসে গোলপাতার চাল থেকে, ডাষ্টবিনের পাশ থেকে। যেখানে যা ভাল জিনিষ পায় সবই এনে মেয়ে-পাখীটাকে দেয়। সে সেগুলিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখে। এক-এক দিন বেলা-শেষে ঝড়বৃষ্টিতে চারি দিক অন্ধকার হয়ে আসে। আশপাশে বড় বড় বাড়ী থাকাতে হাওয়ার কোন ঝাপট ওরা অনুভব করে না। পাশাপাশি দু-জনে চুপ ক'রে বসে থাকে। মেয়ে-পাখীটি চোখ বুজে দেখতে থাকে ওদের সংসারে কত নূতন প্রাণী এসেছে; তারা সকলে মিলে শহরের বাতাসকে তোলপাড় ক'রে এ-ছাদ থেকে সে-ছাদে মনের সুখে উড়ে যাচ্ছে। পথের পাশে একটা গাছে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সকলে জড় হয়; রাত্রি পর্য্যন্ত গান গেয়ে খেলা ক'রে কেটে যায়।

এক দিন মেয়ে-পাখীটি তার সাথীকে বলল, "দেখেছ, ক'দিন ধরে ঐ ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছি নে। ওর বিছানা-পত্রও এ-ঘরে নেই, আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। এঘরে বাসা না বাঁধলেই ভাল হ'ত।"

"তোমার সব তাতেই কেমন কেমন লাগে। কোথায়

পথের পাশে বাসা বাঁধতে, ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ত, চিলে ছোঁ মারত, তার থেকে এ অনেক ভাল হয়েছে। কোনও ভয় নেই তোমার।" পুরুষ-পাখী মোড়ের মুদীর দোকানের দিকে উড়ে গেল।

মেয়ে-পাখীর মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। এখান থেকে অনেক দূরে এক খড়ের চালের কোণে মা'র সঙ্গে ওরা থাকত। ওর ছোট ভাই, ও, আর ওদের বাপ-মা এই চার জনে কত সুখে সময় কেটে যেত। ও তখন সবে উড়তে শিখেছে, ওর ভাই পারত না। এক দিন সন্ধ্যাবেলা কোত্থেকে একটা সাপ এঁকে-বেঁকে এসে ওর ভাইটিকে— "ও কি এনেছ?"

"তোমাকে আর আজ থেকে বাইরে যেতে হবে না। একটা অঘটন ঘ'টে বসতে পারে। খাবার নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।"

"তুমি এখন কোথাও যেও না। বড় ভয় করছে আমার।"

"তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। কোনও ভয় নেই। চিলের সাধ্য কি যে এখানে আসে। আর যদিও আসে, তুমি দেখো, খুব ভাল শিক্ষা দিয়ে দেব তাকে।"

"মাকে একটা খবর দিতে পারবে?"

"কোথায় থাকে আমি জানি না ত। অনেক দিন আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

"উত্তর দিকে সেই সবচেয়ে বড় পার্কের কোণে মালীর যে টালির একখানা চালা আছে, তার দক্ষিণ দিকের কড়ি-কাঠে বসে মা রাত্রে ঘুমোয়, এখন গেলে দেখা পাবে না। আজ সন্ধ্যাবেলা যেও।"

"আচ্ছা।"

"এ-পথে যেন কয়েক দিন ধ'রে লোকজন বেশী চলাফেরা করছে। গলির মধ্যে লম্বা লম্বা কতকগুলি কি এনে ফেলেছে দেখেছ।"

"ও-সব কিছু নয়।"

"পরশু দুপুরে তুমি বেরিয়ে যাবার পর কতকগুলি লোক এসে দেয়ালগুলি মেপে কি সব দেখছিল।"

"তোমার কোনও ভয় নেই। একলা থাক ব'লে ঐ রকম মনে হয়। আজ সন্ধ্যাবেলাই তোমার মাকে ব'লে আসব। সে এলে কোনও ভয় থাকবে না।"

"পাশের বাড়ীর কলতলায় দুটি বউ কাপড় কাচতে কাচতে গল্প করছিল, এই গলিটা ভেঙে মস্তবড় একটা রাস্তা তৈরি হবে, এ-সব বাড়ীঘর কিছুই থাকবে না।"

"তুমিও যেমন! বউরা সব জানে! এই সব বাড়ী ভেঙে রাস্তা তৈরি করা মুখের কথা কি না! তোমার কোন ভয় নেই।"

আরও দুটি দিন কেটে গেল। পুরুষ-পাখী মেয়ে-পাখীর মাকে ব'লে এসেছে। কিন্তু সে আসার কোন সময় পায় নি। হয়ত সেও তার বাসা বাঁধতে ব্যস্ত।

খাবার নিয়ে পুরুষ-পাখী বাসার দিকে আসছিল, মেয়ে-পাখী তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল। "সর্ব্বনাশ হয়েছে। আজ বিকেলে এই বাড়ী ভাঙা সুরু হবে। কয়েক জন লোক এই কতক্ষণ হল-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঐ দেখ মোটা মোটা কতকগুলি কি রেখে গেছে।"

"কি বলছ?"

"কি হবে এখন?"

"ভাঙবে কি বলছ!"

"তাই ত লোকগুলি ব'লে গেল, কি হবে এখন?"

পুরুষ-পাখী তার সাথীকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ভয়ের কোন কারণ নেই। এখানেই ওরা থাকবে বাচ্চাগুলি বড় হওয়া পর্য্যন্ত। বাচ্চাগুলি উড়তে শিখলে একটা ভাল গাছ দেখে তাতে বাসা বাঁধবে, মেয়ে-পাখীটা যে কেন এত উতলা হয় তা ও বুঝতে পারে না। মেয়ে-পাখী কিছুতেই প্রবোধ মানতে চাইল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পুরুষ-পাখীর ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল।

বাইরে খুব হৈচৈ শোনা গেল। শাবলের ধাক্কায় দেয়াল-গুলি কেঁপে উঠল। কতকগুলি কুলিমজুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা জানলাগুলি ভাঙার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়ে-পাখীটা চেঁচিয়ে উঠল, "আর দেরি ক'রো না। এখনই বেরিয়ে চল। দেয়ালের চাপে যে শেষে মরতে হবে।"

যখন তারা বাইরে এসে পাশের বড় বাড়ীর ছাদে গিয়ে বসল তখন ছোট ঘরখানি মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাসাটিও।

মেয়ে-পাখী বলল, "কি হবে ?"

"তোমার কোন ভয় নেই। এক দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে খাসা বাসা বেঁধে দেব। ওর চেয়ে অনেক ভাল, অনেক সুন্দর। শহরের দক্ষিণে অনেক দূরে যেখানে বাড়ীগুলি গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেছে, রাস্তাগুলি মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, সেখানে আমার এক চেনা জায়গা আছে। কোন ভয় সেখানে নেই। খাবার খুঁজবার কোন চেষ্টাও সেখানে করতে হবে না। চল আমরা সেখানে যাই।"

তারা উড়তে আরম্ভ করল।

মেয়ে-পাখী বলল, "বেশীক্ষণ ত আমি উড়তে পারব না। আজ শেষরাত্রেই আমাকে ডিম পাড়তে হবে। চল এখানে কোথাও নামি।"

"এখানে নামবে কি? সবে শহরতলীতে এসেছি; সে জায়গা যে এখনও অনেক দূরে।"

"তা হোক। আমি আর পারি নে। আর কিছুক্ষণ উড়লে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব।"

"তবে নাম।"

একখানা একতালা বাড়ীর জানালার পাশে একটা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছে ওরা বসল। পুরুষ-পাখীটা আবার খড়কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ জড় ক'রে বাসা বাঁধতে লাগল। এবার ও একা। মেয়ে-পাখীটা চুপ ক'রে ব'সে আছে। এইটুকু উড়েই ও হাঁপিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। তবু পুরুষ-পাখীর একটুও বিরাম নাই। ও যেখান থেকে যা পারল সব জোগাড় ক'রে বাসা বাঁধতে লাগল। আজ ওর মরবার অবসর নেই। শেষরাত্রের আগেই ওর বাসা বাঁধা চাই, আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় কোন জিনিষ দেখতে কষ্ট হয় না। দূরের ঐ খড়ো বাড়ীর চালে কত কুটোকাটি আছে। হাজারটা বাসা বুনলেও তা শেষ হবে না।

এক জন যুবতী জানালা খুলে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলে উঠল, "পোড়া পাখীর মরণ নেই। জ্যোৎস্না দেখে গান আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।"

শেষ রাত্রের আগেই বাসা বাঁধা শেষ হয়ে গেল। পুরুষ-পাখী জিজ্ঞেস করল, "মাথাধরা একটু কমেছে? শুনছ?"

"এঁ্যা।"

"ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?"

"না।"

'মাথাধরা কমল?"

"হ্যাঁ, এখন আর নেই।"

"বাসা হয়ে গেছে। কি সুন্দর বাসা দেখ, ব'সো এর ওপর। এখন আর কোন ভয় নেই, গাছটা বেশ সুন্দর, নয়?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু মানুষগুলির কোন বুদ্ধি নেই, জানালার পাশে কখনও গাছ রাখতে হয়!"

"আমার বড় ভয় করছে।"

"কিসের?"

"এখনই, তুমি একবার মাকে ডেকে আনবে?"

"এই রাত্তিরে!"

"হ'লেই বা, জ্যোৎস্না আছে, একবার যাও, লক্ষীটি, সেই কড়িকাঠের ওপরে মাকে দেখতে পাবে, রোদ ওঠার আগেই ফিরে এস।"

"আমি এই এলাম ব'লে।" পুরুষ-পাখী পার্কের দিকে চলল।

গাছটার ছোট ছোট পাতা। এ-রকম গাছ পার্কের মধ্যে ও কয়েকটা দেখেছে। একটা বড় গাছের ডালে বাসা বাঁধলেই ভাল হ'ত। এত ছোট গাছ বাড়ীর পাশে। ছেলেপিলেগুলি টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না। ওরা খুব চুপ ক'রে ব'সে থাকবে। বাচ্চাগুলি একবার উড়তে পারলেই হ'ল। পার্ক থেকে আসতে পুরুষ-পাখীর কত দেরি হয়। সকাল থেকেই ওর শরীর ভাল নেই। এইটুকু উড়ে আসতে হাঁপিয়ে পড়েছে। মাথা ঘুরছে কেন? সমস্ত শরীরটাও কেমন কেমন করছে। তাই ত, নীচে পড়ে যাব না ত! কেন ওকে পাঠালো, কি করবে ও একা একা—বুকের মধ্যেও কেমন করছে—এই অন্ধকারে—তাই ত—দুটি ডিম!

পুরুষ-পাখী যখন ফিরে এল তখন ফর্সা হয়ে গেছে। বলল, "তোমার মাকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম, পরশুদিনের ঝড়ের মধ্যে পড়ে উত্তর দিকে উড়ে গেছে।

অন্য সকলকে ব'লে এসেছি, এলেই এখানে পাঠিয়ে দেবে।"

"আস্তে, দেখছ না ?"

"কি বলছ ?"

"তুমি যেন কিছুই শুনতে পাও না। রাস্তার পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, টের পেলেই যে ছুটে আসবে। পাশেই আবার এত বড় একটা বাড়ী।"

"ডিম পেড়েছ ? তা এতক্ষণ বল নি কেন ? ক'টা ? দেখি, দুটো ?"

"চেঁচিও না, চুপ ক'রে ব'সো।"

পাখী দুটি চুপ ক'রে বসে থাকে ; কেউ কোনও কথা বলে না। মাঝে মাঝে পুরুষ-পাখীটি অভ্যাস বশতঃ গল্প সুরু ক'রে দেয়, কিন্তু মেয়ে-পাখীর চোখের দিকে চেয়ে আবার চুপ করে। এই ভাবেই ওদের কয়েক দিন কাটল।

এখানেও ওদের খাবার ভাবনা নেই। দূরের রকে ছেলেমেয়েগুলি মুড়ি-মুড়কির ঠোঙা নিয়ে বসে। অর্দ্ধেক খায়, অর্দ্ধেক ফেলে দেয়। তার গোটাকয়েক কুড়িয়ে নিয়ে ওদের চলে যায়। মেয়ে-পাখীকে কখনও কখনও ও বেড়িয়ে আসতে বলে, নদীর পাড়ের গাছগুলির মধ্য থেকে অন্ততঃ রাস্তা ধরে সোজা কিছু দূর পর্য্যন্ত, কিন্তু সে তা সাহস করে না।

পুরুষ-পাখী এক দিন জিজ্ঞেস করল, "আর কত দিন ?"

"বেশী দিন নয়। দিন-দুয়েকের মধ্যেই ফুটবে। মাঝে মাঝে ঠোকরাবার শব্দ শুনতে পাই।"

"দুটো বাচ্চা হবে ?"

"দুটো ডিম থেকে কি তিনটে বাচ্চা হয় ?"

"তা বলছি নে। বেশ হবে তা হ'লে, ক'দিনে ওরা উড়তে পারবে ?"

"কি ক'রে বলব। মা ঠিক বলতে পারত। মা কিন্তু এক দিনও এল না। কাল সকালে তুমি একবার যাবে ?"

"যাব এখন।"

পরদিন সকালে পুরুষ-পাখীটা যখন পার্ক থেকে ফিরে এল, তখন মেয়ে-পাখীটা একতালা বাড়ীর ছাদের উপর ব'সে কাঁদছে। গাছটা সেখানে নেই। শুধু তার কর্ত্তিত অংশটুকু পৃথিবীর বুক চিরে আকাশের দিকে তার নীরব ব্যথা উন্মুক্ত ক'রে ধরেছিল।

"গাছটা কি হ'ল ?" পুরুষ-পাখী জিজ্ঞেস করল।

"ওরা কেটে ফেলেছে।"

"বাসা ?"

"সেটা গাছের মধ্যে।—"

"ডিম দুটো ?"

"তা দিয়ে এই বাড়ীর ছোট ছেলেটা গুলি খেলছে ওরা যে দু-দিন পরেই ফুটত, কত কষ্ট পাচ্ছে ওরা। হয়ত এতক্ষণ—ওগো আমি কেমন ক'রে সহ্য করব ?—"

পাখী দুটোর কি হ'ল সে খবর আর কেউ জানে না। হয়ত ওরা আবার রাস্তার পাশে কোনও গাছে ফিরে গিয়েছিল, কোনও ঘরের কড়িকাঠে ব'সে কিচমিচ করতে সুরু করেছিল কোনও কবিকে কবিতা-লেখার প্রেরণা দিতে। কিন্তু মেয়ে-পাখীটিকে ভাগ্যবতী বলেই মনে হয়। ডিম ফোটার পর গাছটা কাটা গেলে ওর যে দুঃখের কোনও অবধি থাকত না!

ফলবান চালমুগরা গাছ। ইহাই বাংলার সাধারণ চালমুগরা

খদিরবৃক্ষ লাক্ষা। গাছের অন্তর্কাষ্ঠ হইতে খয়ের উৎপন্ন হয়

কুর্গের চন্দনবৃক্ষ। ∴রণ্যপথের দুই ধারে ১৯২০ সালে পোঁতা গাছের সারি

অরণ্য-সম্পদ্

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুপ্ত, আই. এফ. এস.

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের মনে অরণ্য-সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছাপ ফেলতে পারে নি। কাঠের গুঁড়ি বা জ্বালানী কাঠ ছাড়া জগতের অরণ্য-লোক থেকে প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য যে-সব জিনিষ আমরা পাই, এ প্রবন্ধ তারই আলোচনা।

প্রথমে কাগজের কথা ধরি। বেশী কাগজ তৈরি হয় জার্মেনী, নরওয়ে, সুইডেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। প্রধানতঃ ডগলাস ফার (Douglas Fir) এবং স্প্রুস—এই দুই জাতের গাছের কাঠই ও-সব দেশের কাগজের মূল উপাদান। প্রথমে কাঠকে মণ্ডে পরিণত করা হয়। তার পর যে শ্রেণীর কাগজ তৈরি করতে হবে, সেই অনুপাতে অংশতঃ অথবা সম্পূর্ণভাবে তা ব্লিচ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিষ্কার করা হয়। তার পর যন্ত্রের পেষণে তা হয় কাগজ। ভারতবর্ষে যে-কয়টি কাগজের কল আছে, তাদের মধ্যে টিটাগড় পেপার মিল্‌স উল্লেখযোগ্য। এই মিলে কিন্তু মূল উপাদান হিসাবে কাঠের বদলে বাঁশ অথবা ঘাস ব্যবহার করা হয়। এর কারণ অবশ্য এ নয় যে, আমাদের দেশের অরণ্যে কাগজের উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছের অভাব আছে। আসল ব্যাপার হ'ল যে সেই সব গাছ ইতস্তত ভাবে অন্য নানা জাতীয় গাছের সঙ্গে মিশে সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে, সেই জন্যে সেই সব গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করার খরচ বেশী পড়ে যায়। সুতরাং নানা জাতীয় বাঁশ এবং ঘাসই উপযুক্ত। কাগজ তৈরি করবার জন্যে যে ঘাস ব্যবহৃত হয়, সেগুলো লম্বা জঙ্গলী ঘাস—তাদের মধ্যে ভাবর অথবা সাবাই ঘাসই হ'ল প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে প্রথম উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে তার একটা লম্বা নাম আছে—ইসকোইমাম এঙ্গাসটি ফোলাম্ (Ischoemum angusti folum)। এই ঘাস সমগ্র উত্তর-ভারতের পাহাড়ে পাহাড়ে জন্মায়। ১৯০৮-৯ সালে বাংলা দেশের অরণ্য থেকে এই ঘাস ৩২৯৪ টন পাওয়া যায়, মূল্য চব্বিশ হাজার চুরানব্বই টাকা।

তার পর ছিপির কথা। কোয়েরকাস সুবার ও কোয়েরকাস অক্সিডেণ্টালিস নামে দু-জাতের ওক গাছ আছে। সেই দু-জাতের ওক গাছের ছাল থেকে ছিপি তৈরি হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে যে-সব দেশ আছে, সেই সব দেশে, যেমন স্পেন, পর্ত্তুগাল, কর্সিকা, দক্ষিণ-ফ্রান্স, ইতালী, উত্তর-আফ্রিকায় এই গাছ যখন গাছগুলোর কুড়ি বছর বয়স হয় তখন তার ছালের উপরের স্তর কেটে ফেলা হয়। এই উপরের ছালকে সাধারণতঃ মেল কর্ক অর্থাৎ পুরুষ কর্ক বলা হয় এবং সেটা কোনও কাজে লাগে না। তার পর যে নতুন ছাল জন্মায় তাকে বলে ফিমেল কর্ক অর্থাৎ মেয়ে কর্ক; সেই নূতন ছাল বা ফিমেল কর্ক থেকেই ছিপি হয়। প্রত্যেক ৮ কিংবা ১০ বৎসর অন্তর সেই গাছ কাটা হয়। আমাদের ভারতবর্ষে বহু বিভিন্ন জাতের গাছ আছে যা থেকে ছিপি হয় এবং সেই সব ছিপি এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর যে ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ থেকে যে-সব ছিপি আমদানী হয়, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না।

এবার রবারের ব্যাপার বলি। রবার হ'ল সাধারণ নাম, কারণ জিনিষটা নানা বিভিন্ন ধরণের হয়। যাকে আমরা ইণ্ডিয়া রবার বলি এবং বাণিজ্য সম্পর্কে যার নাম হ'ল Cantchonc, সেটা নানা গাছগাছড়া এবং গুল্মের গোড়া অথবা শাখার রস জমিয়ে তৈরি হয়। আমাদের দেশে এই জাতীয় গাছের মধ্যে বটশ্রেণীর এক রকম গাছ আছে —তার নাম হ'ল Ficus charitica, সেইটাই হ'ল সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয়। এই জাতীয় গাছ স্বভাবতই পূর্ব্ব দিকে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয়ের বাইরের অঞ্চলে জন্মায়।

আগে এই জাতীয় গাছের চাষ ভারতের কোন কোন অংশে করা হয়, কিন্তু ইদানীং এই জাতীয় গাছের প্রতি ভাগ্য বিরূপ হয়ে পড়েছে, এক রকম বিদেশী গাছ তাকে একেবারে বনে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই বিদেশী গাছের নাম হ'ল হিভিয়া ব্রেজিলিয়েন্সিস—অবশ্য, নাম থেকেই বোঝা যায় যে ইনি এসেছেন ব্রেজিল থেকে। প্যারা-রবার ব'লে যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রবার বাজারে প্রচলিত তা এই গাছ থেকেই পাওয়া যায়। আজকাল সিংহল এবং ডাচ ঈষ্টইণ্ডিজে বিস্তৃতভাবে এই গাছের চাষ হচ্ছে, কিন্তু জার্মেনী যে সিনথেটিক রবার তৈরি করতে স্বরু করেছে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রবারের চাষের টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে আর এক রকমের রবার আছে তার নাম হ'ল সিয়ারা রবার, এই রবারও মনিহট গ্ল্যাজিওভাই নামে এক শ্রেণীর বিদেশী গাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে হয়ত একথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমরা যাকে ভল্‌কানাইট বলি এবং যা দিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই তৈরি হচ্ছে, সেটা হ'ল রবার এবং গন্ধকের একটা সংমিশ্রণ।

কাচের পরিবর্ত্তে আমরা সাধারণতঃ গাটাপাচার বহু জিনিষ ব্যবহার করি। সম্মিলিত মালয় ষ্টেট্‌, বোর্ণিও, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে পালা কুইয়াম গাটা ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়। সেই গাছের রস থেকে গাটাপাচা তৈরি হয়।

অনেকে হয়ত জানেন যে পাথর থেকে ছাপবার কালি, সিলমোহরের মোম, গ্রামোফোন রেকর্ড, পালিস, বার্নিস প্রভৃতি জিনিষের প্রধান উপাদান হ'ল গালা। এই গালা কোন কোন গাছের ছোট ছোট ডালে ট্যাকর্ডিয়া ভাক্কা নামে এক রকম পোকার স্ত্রীজাতিদের দ্বারা তৈরি হয়। এই জাতীয় গাছের মধ্যে পলাশ, কুসুম, বাবুল এবং কুল-গাছই প্রধান। নানা ভাবে পরিষ্কার ক'রে এবং গালিয়ে গালা থেকেই সেলল্যাক্‌ অর্থাৎ পাতা-গালা এবং বোতামের গালা তৈরি হয়। বিহার এবং উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ এব[illegible]কোন কোন অংশ, আসাম, যুক্তপ্রদেশ এবং পঞ্জাব ই[illegible]গালা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে, যেমন মালদহ জেলায়, কিছু কিছু গালা তৈরি হয়। গালা উৎপাদন হ'ল প্রকৃতপক্ষে ভারতের একচেটে, কারণ জগতে যত গালা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৮৫ ভাগ ভারতবর্ষে জাত। ভারতের সংলগ্ন কোন কোন দেশে গালা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ভারতীয় গালার তুলনায় তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না।

চন্দনকাঠ আমাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত, কিন্তু কেউ কেউ হয়ত নাও জানতে পারেন যে তার প্রয়োজনীয়তা কি এবং ঠিক কোথায় তা জন্মায়। ওজন ধরে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে বলতে হয় যে চন্দনকাঠ হ'ল জগতে সকলের চেয়ে বেশী দামী কাঠ। চন্দন গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল স্যাণ্টালুম অ্যালবাম। এটা হ'ল এক রকমের পরজীবী গাছ। তার কারণ কতকগুলি গাছের শিকড়ের ওপর এই গাছ জন্মায় এবং সেই সব গাছের শিকড় থেকেই চন্দনগাছের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কুর্গ এবং প্রধানতঃ মহীশূরে এই গাছ জন্মায়। চন্দন কাঠ চুঁইয়ে স্যাণ্ডাল অয়েল নামে এক রকম তেল পাওয়া যায়; ইউরোপ এবং আমেরিকায় খুব উঁচুদরের গন্ধদ্রব্য তৈরি করবার জন্য এই তেল ব্যবহার করা হয়। আগে চন্দন কাঠ চুঁইয়ে তেল বার করা শুধু ইউরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সেই হ'ত; কিন্তু আজকাল ভারতবর্ষে, মহীশূরে এবং অযোধ্যায় তা হচ্ছে।

রেড স্যাণ্ডার্স নামে আর এক রকম কাঠ আছে—যাকে আমরা বলি রক্তচন্দন। আসল চন্দনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। রক্তচন্দনের তিলক ব্রাহ্মণদের কপালে প্রায়ই শোভা পায়। আগে রক্তচন্দন বিশেষ মাত্রায় য়ুরোপে রপ্তানী করা হ'ত, কিন্তু য়্যানিলাইন্‌ ডাই আবিষ্কারের পর থেকে এই রপ্তানী বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এখন এই কাঠের ব্যবহার যা কিছু ভারতবর্ষেই হয়। দক্ষিণ-ভারতে টেরো-কার্পাস স্যাণ্টালিনুস্‌ ব'লে এক রকমের ছোট গাছ আছে, তাই থেকে এই দরকারী কাঠ আমরা পাই।

'এসেন্‌শিয়াল অয়েল'-এর ব্যবসাকে রীতিমত দরকারী ব্যবসা ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। এই জাতীয় পাতলা তেল এক রকম ঘাস চুঁইয়ে পাওয়া যায়। ইহা কতকগুলি বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট কাজে লাগে, তা ছাড়া, এই জাতীয় তেল

সাধারণত টুথপেষ্ট, গায়ে মাখবার ভাল সাবান এবং মাথা ঘষবার সুগন্ধি তেলে কখনও আলাদা কখনও সংমিশ্রিত ভাবে ব্যবহৃত হয়। সিংহল, জাভা এবং ভারত-মহাসাগরের সেচেল্লেস দ্বীপপুঞ্জে সিম্বোপোগন নার্ডাস ব'লে এক রকম ঘাস পাওয়া যায়। সেই ঘাস থেকে সিট্রোনেল্লা তেল পাওয়া যায়। মশা-তাড়ানোর জন্য এই তেল ভারতবর্ষে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্রধানত দক্ষিণ-ভারতে এবং সেচেল্লেস দ্বীপে সিম্বোপোগন সাইট্রেটাস ব'লে এক রকম ঘাস জন্মায়, তার থেকে বাজারের ট্রাভাঙ্কোর লিমন গ্রাস অয়েল পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে, নিমার, বেরার এবং বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশে এবং সেচেল্লেস দ্বীপে সিম্বোপোগন মার্টিনি ব'লে যে ঘাস পাওয়া যায় তার আবার দুটো আলাদা জাত আছে। মোতিয়া জাতের ঘাস থেকে গোলাপগন্ধি পাল্মারোসা তেল—যাকে নিমার অথবা ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান জেরেনিয়াম অয়েল বলা হয়, সেই তেল পাওয়া যায় এবং সোফিয়া জাতের ঘাস থেকে বাজারের জিঞ্জার গ্রাস তেল পাওয়া যায়। সিম্বোপোগন ফ্লেক্সুয়সাস ব'লে দক্ষিণ-ভারতে আর এক রকম ঘাস হয়, তা থেকে আমরা বাজারে মালাবার তেল অর্থাৎ কোচিন তেল পাই। এই ধরণের আরও কতকগুলি ঘাস আছে যা থেকে এসেনশিয়াল অয়েল আমরা পাই বটে, কিন্তু সে-সব তেলের ব্যবসাগত কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই।

তার পর আসে ইউকালিপ্‌টাস তেলের কথা। যখন বেশ সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগে, তখন আমাদের সকলকেই এই তেলের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হয়। নানা জাতীয় ইউকালিপ্‌টাস গাছের পাতা এবং কচি কচি ডাল চুঁইয়ে এই তেল পাওয়া যায়। ইউকালিপ্‌টাস গ্লোবিউলাস জাতীয় গাছ থেকে (যার সাধারণ নাম হ'ল ব্লু-গাম গাছ) আমরা সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের ইউকালিপটাস পাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টাসমানিয়ার জঙ্গলে ল্যাবিলার্ডিয়ার নামে এক জন লোক এই গাছ আবিষ্কার করেন এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যামেল এই গাছ ইউরোপে নিয়ে আসেন। ইউকালিপ্‌টাস তেলের নানা গুণের জন্য আজকাল সারা জগতে এই গাছের চাষ হয়। আমাদের দেশে নীলগিরি অঞ্চলে এই গাছ ব্যাপকভাবে আছে। যদিও জগতের প্রয়োজনীয় ইউকালিপ্‌টাস তেল

আলমোরা অরণ্যের দীর্ঘপত্র হিমালয়-পাইন। গাছের নীচের দিকে চেরার দাগ। এই অংশ হইতেই রজন বাহির হইয়া মাটির পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে।
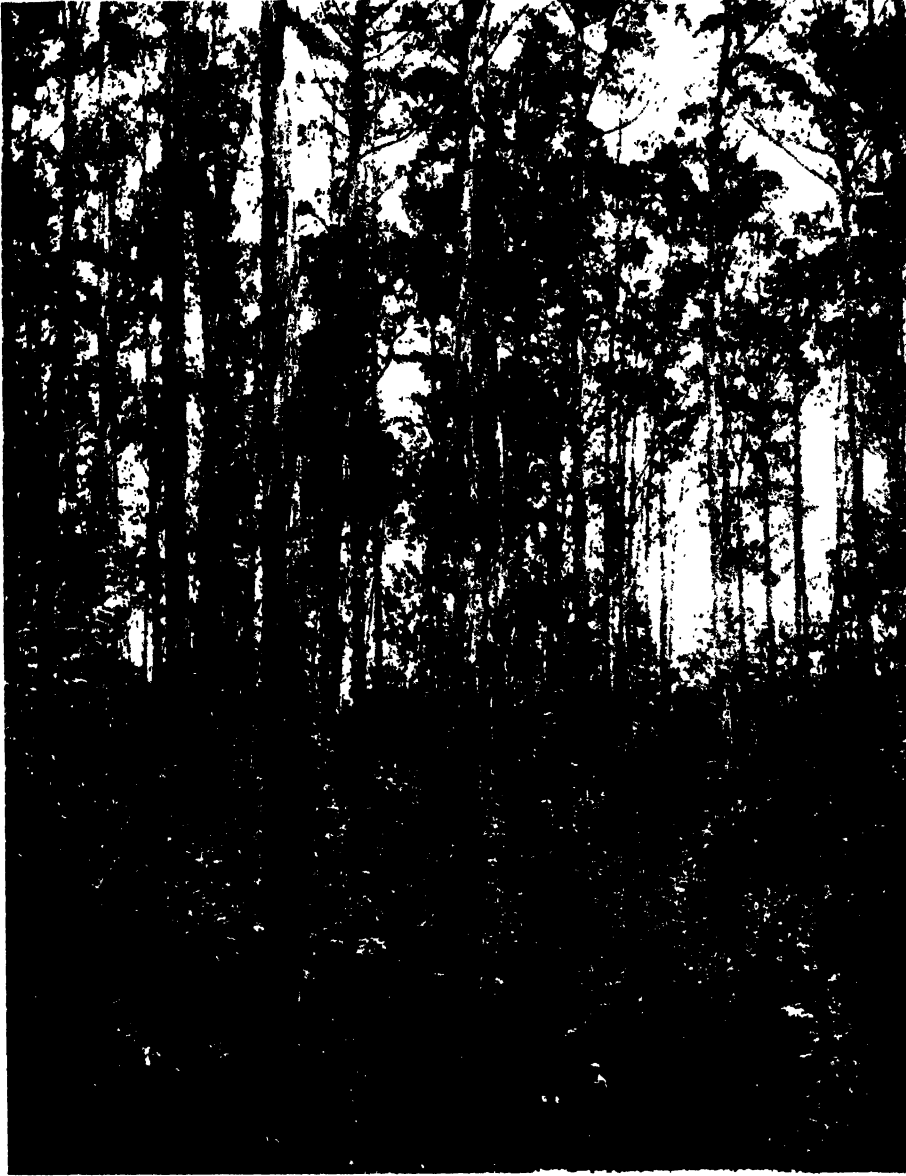
মাদ্রাজের উটাকামণ্ডের অরণ্যে ব্লু-গাম বৃক্ষরাজি। ইহা হইতেই বাজার-চল্‌তি উৎকৃষ্ট ইউক্যালিপ্‌টাস তৈল পাওয়া যায়

অধিকাংশই অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসে, তবুও ভারতবর্ষেরও তার মধ্যে কিছু অংশ আছে। য়্যাস্‌পিরিন খুব একটা প্রচলিত ওষুধ। জেরুলথেরিয়া ফ্র্যাগ্রান্টিসিমা নামে ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এক রকম গাছ জন্মায়। সেই গাছের পাতা চুঁইয়ে উই-টার-গ্রীণ অয়েল ব'লে এক রকম তেল পাওয়া যায়। এই তেলই হ'ল য়্যাসপিরিনের মূল উপাদান। এই তেলের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে সরবরাহ করা হয়। আমাদের দেশের তৈরি তেল আমেরিকার তেলের মতই উৎকৃষ্ট হ'লেও বাণিজ্যের উপযোগী বৃহৎ ভাবে এই তেলের

ব্যবসা আমাদের দেশে করা হয় নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল বাজার-চল্‌তি অধিকাংশ য়্যাসপিরিনই রাসায়নিক সংমিশ্রণে তৈরি হয়।

চম্মরোগের পক্ষে চাল্‌মুগরা তেল বিশেষ উপযোগী। স্যর লিওনার্ড রোজার্স যখন আবিষ্কার করলেন যে এই তেল কুষ্ঠব্যাধির পক্ষে বিশেষ উপকারী, তখন থেকে এই তেলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে বেড়ে গিয়েছে। তিনটি বিভিন্ন জাতীয় গাছের বীজ থেকে এই তেল পাওয়া যায়। যথা, Taraktogenos, Kurzii, Gynocardia odorata। প্রথমোক্ত গাছ থেকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেল পাওয়া যায়। এই গাছ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে জন্মায়। দ্বিতীয় গাছ থেকে মধ্যম শ্রেণীর তেল পাওয়া যায় এবং এই গাছ বাংলা, ব্রহ্মদেশ এবং আসাম অঞ্চলে জন্মায়। শেষোক্ত গাছ থেকে যে তেল পাওয়া যায় ব্যবসার বাজারে তার বিশেষ কোন চাহিদা নেই—এই গাছ হিমালয়ের পূর্ব্ব অঞ্চলের জঙ্গলে পাওয়া যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধে সিনামন অয়েল হ'ল প্রধান অঙ্গ। দক্ষিণ-ভারতে এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে cinnamomum zeylanicum ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়। সেই গাছের পাতা চুঁইয়ে এই তেল পাওয়া যায়। সেচেল্লিস দ্বীপপুঞ্জেও এই জাতীয় গাছ জন্মায়, এবং সেখানে পাতা চুঁইয়ে তেল বার করবার তিরানব্বইটি ডিস্‌টিলারী আছে। এই গাছের ছালই হ'ল আমাদের ডালচিনি।

যাঁরা রোলাণ্ডের ম্যাকাসার অয়েল ব্যবহার করেছেন, এই তেল কি ভাবে তৈরি হয়, তা জানতে হয়ত তাঁদের ঔৎসুক্য থাকতে পারে। প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে Sekeleichera trijuga নামে এক রকম গাছ জন্মে, সাধারণত আমরা এই গাছকে কুসুম গাছ বলি। এই কুসুম গাছের বীজ থেকে যে কুসুম তেল তৈরি হয় তাই হ'ল সেই মাথার তেলের প্রধান উপাদান। ব্রহ্মদেশ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-ভারতে এই রকম গাছ জন্মায়। তার নাম হ'ল ষ্ট্রিক্‌নাস-নাক্স-ভোমিকা, এই গাছের বীজ থেকে নাক্স-ভোমিকা তৈরি হয়। নাক্স-ভোমিকা থেকে ষ্ট্রিকনিন পাওয়া যায়। তেতো চিরেতার কথা আপনারা সকলেই জানেন। হিমালয়ের উচ্চতর অঞ্চলে Swertia chirata ব'লে এক রকম লতাগুল্ম জন্মে, সেই শুকনো লতাগুলাই হ'ল আমাদের চিরেতা।

কতকগুলি গাছের পাতা ও কচি কচি ডাল বাষ্পের সাহায্যে চুঁইয়ে কর্পূর পাওয়া যায়। বাজারে দু-রকমের কর্পূর চল্‌তি আছে। একটি হ'ল জাপানী কর্পূর, সেইটে হ'ল সাধারণ যে কর্পূর আমরা ব্যবহার করি। আর একটি হ'ল বোর্ণিও কর্পূর।

চীন জাপান এবং জাপানের অধিকারভুক্ত ফর্মোসা দ্বীপে cinnamomum camphora ব'লে গাছ জন্মায়, তার থেকে প্রথমোক্ত কর্পূর তৈরি হয় এবং এই কর্পূরই বৃহৎ মাত্রায় ইউরোপে চালান যায়। বোর্ণিও, সুমাত্রা এবং সম্মিলিত মালয় ষ্টেটে Dryabalanops Oromatica ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়, সেই গাছ থেকে বোর্ণিও কর্পূর পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে জগতের প্রয়োজনীয় কর্পূরের বহু অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং প্রধানতঃ জার্ম্মেনীতেই তা হয়, কিন্তু সেই রাসায়নিক পদ্ধতিরও মূলে আছে টারপেন্‌টাইন যা আসে জঙ্গল থেকে। টারপেনটাইনের কথাও এইবার বলছি।

আজকাল বড়লোকের বৈঠকখানায় বার্ণিস ল্যাকারের কাজ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই ল্যাকারের বার্ণিস কি ক'রে পাওয়া যায় তা হয়ত অনেকে জানেন না। বর্ম্মা ও শ্যামের জঙ্গলে melonorrhoea usitata ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়। এই গাছ থেকে আলকাৎরার মত এক রকম রস বার করা হয়। সেই রস থেকেই থিট্‌সি অয়েল ব'লে এক রকম তেল তৈরি হয়। এই তেল হ'ল ল্যাকারের মূল উপাদান। বাক্স টেবিল ডিশ এবং অনুরূপ ভারী জিনিসের জন্যে ল্যাকারের কাজের ভিত্তি স্বরূপ বাঁশ এবং হালকা কাঠ ব্যবহৃত হয় এবং চুরুটের বাক্স-জাতীয় ছোটখাটো জিনিসের জন্যে কাপড়ই ব্যবহৃত হয়।

আমরা যাকে রজন বলি ইংরেজীতে তার নাম হ'ল রোসিন, কখনও কখনও কোলোফনি বলা হয়। সাবান, অয়েল-ক্লথ, লিনোলিয়াম কাগজ, সিলমোহরের মোম, গ্রামোফোন রেকর্ড, বৈদ্যুতিক ইন্‌সুলেটর প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্যে রজন লাগে। পাইন-জাতীয় গাছের গুঁড়ি থেকে রোসিন পাওয়া যায়। চোয়াবার সময় টারপেণ্টাইনের

সঙ্গে রজনও পাওয়া যায়। টারপেনটাইন হ'ল রং গোলবার একটা মূল উপাদান, জিনিষের উপরে রঙে ছাপাবার কাজে রংকে পাকা করবার প্রধান জিনিষ, জুতোর পালিস, মালিস প্রভৃতির প্রধান অঙ্গ এবং আগেই বলেছি যে রাসায়নিক কর্পূরের ভিত্তি। রজন এবং টারপেণ্টাইনের ব্যবসায়ে জগতের উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ৭০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে, শতকরা ২৫ ভাগ ফ্রান্সের অধিকারে এবং মাত্র বাকী শতকরা ৫ ভাগ সারা জগতের বিভিন্ন জাতির অধিকারে আছে। যে-সব পাইন থেকে বাজার চলতি রজন পাওয়া যায় তাদের মধ্যে হিমালয়ের পাতা-ওয়ালা Pinus longifoliaই হ'ল সর্ব্বপ্রধান। তার পর হ'ল Pinus excelsa, যার অন্য নাম হ'ল দি ব্লু পাইন। বর্ম্মার পাইন গাছের মধ্যে Pinus Khasyaই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সাল হ'তে পাইন গাছ থেকে রজন বার করবার কাজ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধের সময় শেলে বুলেট বসাবার জন্যে রজনের ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে চলেছিল এবং যখন আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে গেল তখন ভারতবর্ষে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করবার কারখানায় পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের রজনই ব্যবহার করা হয়েছিল।

Boswellia ব'লে কয়েক শ্রেণীর গাছ আছে যা থেকে alibanum ব'লে আঠার মত এক রকম জিনিষ পাওয়া যায়। ধূপকাঠির প্রধান উপাদান হ'ল এই alibanum. আরব এবং উত্তর-আফ্রিকা থেকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধূপ আমরা পাই। ভারতবর্ষে আমরা যে ধূপ পাই তা প্রধানত Boswellia serata নামে এক রকম গাছ থেকে হয়। এই গাছ ভারতের মধ্যে প্রধানত মধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ-ভারতে জন্মায়।

আমরা সাধারণত যে ধুনা ব্যবহার করি এবং যার বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল Gum Benzoin, মালয় দ্বীপপুঞ্জে Styrax benzoin ব'লে এক রকম ছোট ছোট গাছ হয়, তার থেকে উহা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই জাতীয় গাছের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Styrax serrulatum canarium Sikkimense, শাল এবং অর্জ্জুন।
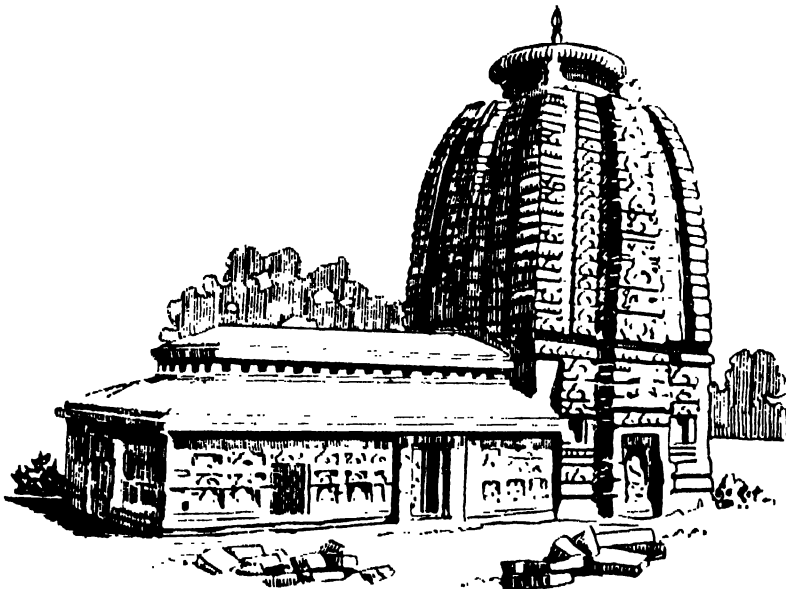
শীত-সন্ধ্যা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শীতের কুহেলিঘন সন্ধ্যায়
স্বপনের অনুভবে লভি' তায়
আবেশ নামিল চোখে,—
এই দেহ-নির্ম্মোকে
ফেলে রেখে ভেসে যেতে মন চায়।

অশ্রুর অশ্রুত ভাষাতে
বুক বাঁধা সুখহীন আশাতে :
কিছুতেই বুঝি না যে
সহসা শীতের সাঁঝে
সে বাঁধ মিলায় কেন হাওয়াতে।

চকিতে চমকি ভাবি, 'তাই কি !
বারে বারে পথ ভুলে যাই কি ?
বেদনার বুক চিরি
যাহারে খুঁজিয়া ফিরি
ত্রিভুবনে কোথাও সে নাই কি ?'

ঝাপ্‌সা নয়নে দূরে ওঠে চাঁদ
নেই নব জ্যোৎস্নার মায়াফাঁদ,
কুন্দকলির হারে
কে আজ সাজাবে তারে
আদরে ঘোচাবে সব অবসাদ।

হিমেল হাওয়ায় তার কান্না
উছসিত, আর না গো আর না ;
ও দুই নয়নতলে
বেদনার শোভা ঝলে
জলে-থলে ফলে শত পান্না।

আমার বেদনা পেল রূপ কি !
অশ্রুর বাষ্পের ধূপ কি
মোর প্রতি নিঃশ্বাসে ?
আকাশে বাতাসে ভাসে
মুখর ভাষণ, তাই চুপ কি !

ফাগুনের ফুলদলে ভুলেছি
এবার ব্যথার ঢেউয়ে দুলেছি,
উত্তরী বাতাসের
বানে ওগো দখিনের
দুখ আজ নিঃশেষে ভুলেছি।

পদ্মদীঘির পারে চলে যাই,
জানি জানি, জানি সেথা জল নাই,
মৃণাল মলিনমুখী
আমি তার দুখে দুখী,
কামনা-কমলে মোর দল নাই।

চঞ্চল হিল্লোল হারা হায়
নিতল দীঘির জল মূরছায় ;
পাংশু পাতার 'পরে
শীত বায়ু সঞ্চরে,
বুকে কাঁপে হিমকণা লজ্জায়।

নীরব বিজন এই লগনে
সন্ধ্যার সকরুণ স্বপনে
নয়নের মণি দুটি
যে শোভা নিয়েছে লুটি
তারে তুলে রাখি মন-গহনে ॥
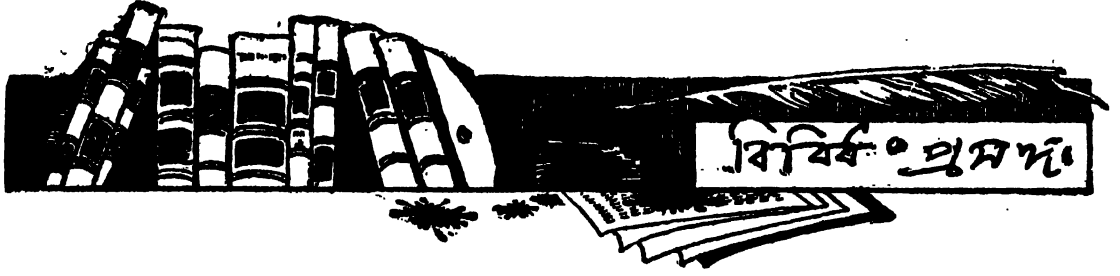
পৌষ মাসে বহু সভাসমিতির অধিবেশন

ভারতবর্ষ যে-রাজার অধীন, তিনি খ্রীষ্টিয়ান এবং তাঁহার নিযুক্ত প্রধান শাসনকর্তারা খ্রীষ্টিয়ান। এই কারণে খ্রীষ্টিয়ানদের বড়দিন উপলক্ষ্যে এদেশের আপিস আদালত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ থাকে। আগে দুই-তিন দিন ছুটি হইত। লর্ড কার্জ্জনের আমল হইতে ছুটি দীর্ঘতর হইয়া আসিতেছে। এই বড়দিন পৌষ মাসে পড়ে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়, তখন হইতে পৌষ মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন ব্যতীত অন্য অনেক সভাসমিতির অধিবেশনও হইয়া আসিতেছে। মধ্যে কয়েক বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন পৌষ মাসে না হইয়া অন্য সময়ে হইয়াছিল; এবার আবার পৌষেই উহার অধিবেশন হইয়াছিল। ডিসেম্বরের অর্দ্ধেক ও জানুয়ারী মাসের অর্দ্ধেক পৌষ মাসের মধ্যে পড়ে। গত পৌষে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিষয়ক, ধর্ম্মবিষয়ক, সংস্কৃতিসম্বন্ধীয় ও অন্তবিধ এত সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, যে, তাহাতে যাহা কিছু বলা ও করা হইয়াছে তৎসমুদয়ের উল্লেখ ও আলোচনা একখানি মাসিকপত্রের কয়েকটি পাতায় করা অসম্ভব। বড় বড় দৈনিকেও তাহাদের অনেকগুলির সংবাদ সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেকগুলির কার্য্যকলাপের কোন আলোচনাই সম্ভবপর হয় নাই।

এত রকমের সভাসমিতির অধিবেশন হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে, ভারতবর্ষের লোকেরা কেবল রাজনীতির কথা ভাবিতেছেন না, অন্য অনেক বিষয়েও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মন দিতেছেন। এমন যদি হইতে ..., যে, সকলেই, কেমন করিয়া দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ... স্বপরিবর্ত্তন হয়, কেমন করিয়া দেশকে স্বাধীন করা ...াহার চিন্তা ও আলোচনা করিতেন, এবং দেশ স্বাধীন হইবার পর অন্য সব বিষয়ে মন দিতেন, তাহা হইলে মন্দ হইত না। কারণ, বাস্তবিক পরাধীন দেশে অরাজনৈতিক কোন বিষয়ে কোন দিকে সম্যক উন্নতি হইতে পারে না, সে রকম উন্নতির সর্ব্ববিধ চেষ্টাও পূর্ণমাত্রায় করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, স্বাধীনতার চেষ্টাও অন্যান্য অনেক দিকে উন্নতির উপর নির্ভর করে। তাহার দু-একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দি। সামাজিক তাচ্ছিল্য উপেক্ষা অবহেলা লাঞ্ছনা উৎপীড়ন হইতে দেশের নানা শ্রেণীর অগণিত লোক মুক্তি না পাইলে তাহারা স্বাধীনতার জন্য সমবেত চেষ্টায় যোগ দিবে কেমন করিয়া? অতএব সামাজিক প্রচেষ্টাও চাই। স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বার্ত্তা ও আহ্বান এই বিশাল দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট পৌঁছাইতে হইলে অন্ততঃ সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোককে লিখনপঠনক্ষম করা আবশ্যক।

সকল রকমের সংস্কারকার্য্য এবং উন্নতি প্রগতি পরস্পর-সাপেক্ষ।

সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক ছাড়া অন্য রকমের বিস্তর সভা-সমিতির প্রয়োজন আছে। যাঁহার যেরূপ শক্তি রুচি সুযোগ অবস্থা তিনি তদনুসারে যেটি বা যে-যে গুলির সহিত সক্রিয় যোগ রাখিতে পারেন, রাখিবেন।

অবস্থাবৈগুণ্যে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিবার যো নাই। তাঁহারা গবর্ন্মেণ্টের চাকরী করেন বলিয়া তাঁহাদের এ বিষয়ে স্বাধীনতা নাই। তাঁহাদের অনেকের আর্থিক অবস্থা ভাল; কর্ম্মশক্তি অল্লাধিক সকলেরই আছে; এবং স্বদেশহিতৈষণাতেও তাঁহাদের অনেকে রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মীদের সকলের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য যত রকমে দেশের হিত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা করিলে তাঁহাদের দেশহিতৈষণা সফল হয়, তাঁহাদের শক্তির ও অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, এবং দেশের কিছু কল্যাণ হয়।

—
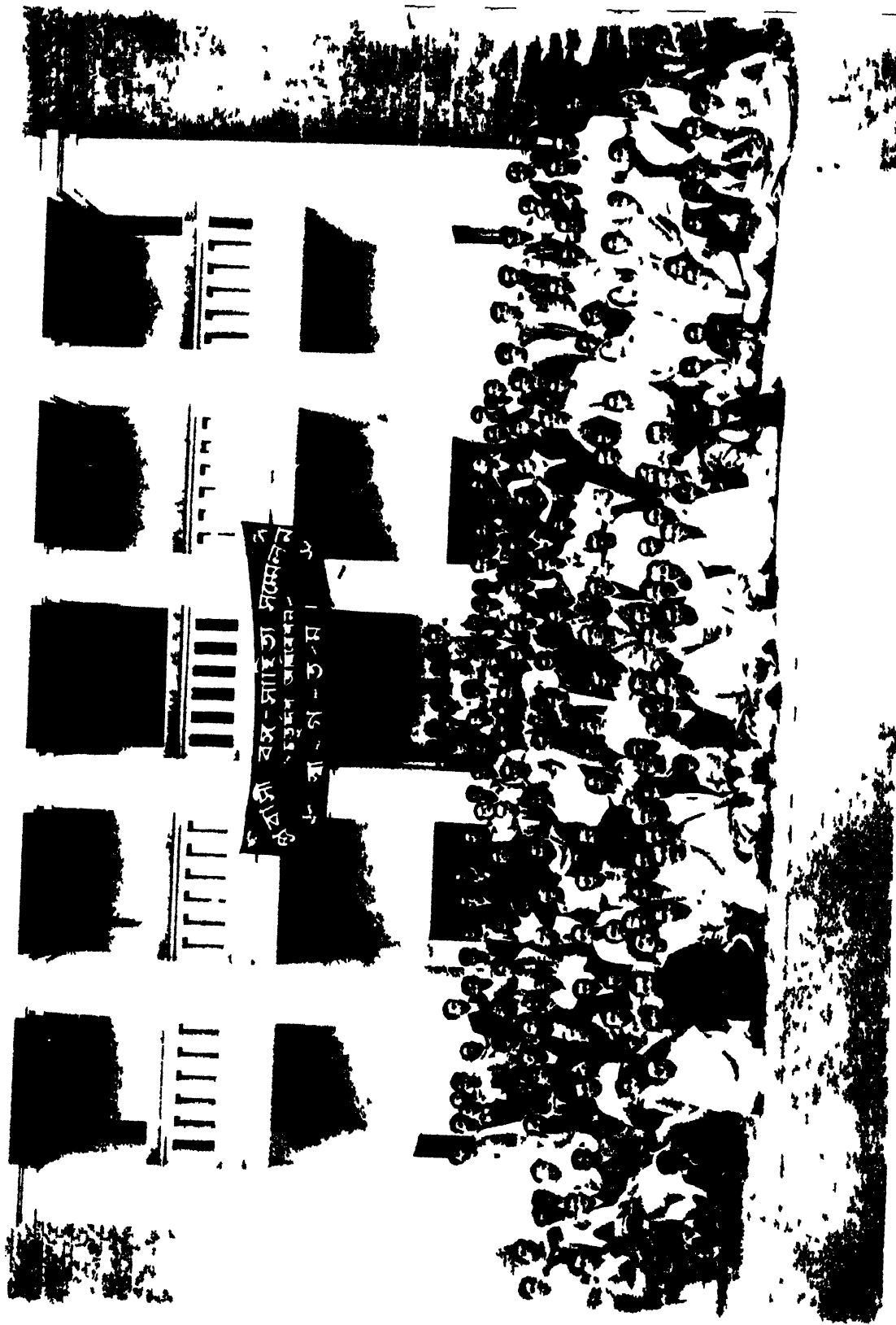
রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন উপলক্ষ্যে সমবেত প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য ও সভাপতিগণ

ফৈজপুর কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

ফৈজপুর টিলকনগরে কংগ্রেসাগ্নিবাহকের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সভাপতি জবাহরলাল কংগ্রেস-বর্ত্তিকা ও পতাকা উত্তোলন করিতেছেন

নিখিল-ভারত পল্লীশিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধনে মহাত্মা গান্ধী মাইক্রোফোন-সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের আচার্য্য অধ্যাপকগণ ছাত্রবৃন্দ ও তিন জন অতিথি

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়

১৯১৬ সালে যুবক সন্ন্যাসী স্বামী যোগানন্দ সহকর্ম্মিগণসহ কলিকাতার প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট নানা যুক্তি দিয়া একটি আবেদন করেন। মহারাজ আবেদনপত্র পাইয়া কলিকাতার ঐ ক্ষুদ্র আশ্রম-বিদ্যালয় দেখিয়া খুশী হন এবং একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন ও চালনার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হইলে ১৯১৭ সালে দামোদর ষ্টেশনের নিকট দামোদর-তীরে স্বামী যোগানন্দ কর্ত্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সালে এই বিদ্যালয়টি রাঁচিতে স্থানান্তরিত হয়। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যালয়ের জন্য কোনও স্থায়ী স্থান বা অন্য বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এবং স্বামী যোগানন্দের অনুপস্থিতিহেতু অন্যান্য কর্ম্মিগণ হঠাৎ পৃষ্ঠপোষকহীন হইয়া অতিকষ্টে বিদ্যালয় চালাইতে থাকেন। এই অভাবের মধ্যেও বিদ্যালয়ের কোন বিভাগের কর্ম্ম বন্ধ হয় নাই। ১৯৩৫ সালে স্বামী যোগানন্দ ১৫ বৎসর পর আমেরিকা হইতে আগমন করিয়া বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার আমেরিকান শিষ্য ও বন্ধুবর্গের এবং বাংলা দেশের কোন মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে রাঁচির ৭০ বিঘা বিস্তীর্ণ বাগানটি আশ্রমের জন্য খরিদ করেন। তাঁহার অনুরোধে বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী কিছু কম মূল্যে এই বাগান বিক্রয় করেন। স্থায়ী স্থান পাইয়া বিদ্যালয় নানা ভাবে কর্ম্মে অগ্রসর হইতেছে। নানা স্থান হইতে সাহায্য পাইবারও সম্ভাবনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টি "যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি" নামে ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত সমিতির ট্রাষ্টিগণের অধীন। ইহা এখন কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে।

ফৈজপুর কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন

ফৈজপুর টিলকনগরে কংগ্রেসাগ্নিবাহকের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সভাপতি জবাহরলাল কংগ্রেস-বর্ত্তিকা ও পতাকা উত্তোলন করিতেছেন

নিখিল-ভারত পল্লীশিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধনে মহাত্মা গান্ধী মাইক্রোফোন-সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন

রঁাচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের আচার্য্য, অধ্যাপকগণ, ছাত্রবৃন্দ ও তিন জন অতিথি

রঁাচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়

১৯১৬ সালে যুবক সন্ন্যাসী স্বামী যোগানন্দ সহকর্ম্মিগণসহ কলিকাতার প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট নানা যুক্তি দিয়া একটি আবেদন করেন। মহারাজ আবেদনপত্র পাইয়া কলিকাতার ঐ ক্ষুদ্র আশ্রম-বিদ্যালয় দেখিয়া খুশী হন এবং একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন ও চালনার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হইলে ১৯১৭ সালে দামোদর ষ্টেশনের নিকট দামোদর-তীরে স্বামী যোগানন্দ কর্ত্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সালে এই বিদ্যালয়টি রঁাচিতে স্থানান্তরিত হয়। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যালয়ের জন্য কোনও স্থায়ী স্থান বা অন্য বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এবং স্বামী যোগানন্দের অনুপস্থিতিহেতু অন্যান্য কর্ম্মিগণ হঠাৎ পৃষ্ঠপোষকহীন হইয়া অতিকষ্টে বিদ্যালয় চালাইতে থাকেন। এই অভাবের মধ্যেও বিদ্যালয়ের কোন বিভাগের কর্ম্ম বন্ধ হয় নাই। ১৯৩৫ সালে স্বামী যোগানন্দ ১৫ বৎসর পর আমেরিকা হইতে আগমন করিয়া বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার আমেরিকান শিষ্য ও বন্ধুবর্গের এবং বাংলা দেশের কোন মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে রঁাচির ৭০ বিঘা বিস্তীর্ণ বাগানটি আশ্রমের জন্য খরিদ করেন। তাঁহার অনুরোধে বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী কিছু কম মূল্যে এই বাগান বিক্রয় করেন। স্থায়ী স্থান পাইয়া বিদ্যালয় নানা ভাবে কর্ম্মে অগ্রসর হইতেছে। নানা স্থান হইতে সাহায্য পাইবারও সম্ভাবনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টি "যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি" নামে ১৮৬০ সালের ২১ আইন-অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত সমিতির ট্রাষ্টিগণের অধীন। ইহা এখন কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে।

বিদ্যালয়-সংলগ্ন যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমে যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি সাধন ভজন করিতে পারিবেন।

এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগের ও অবহেলিত শ্রেণীর লোকদিগের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয়ের কার্য্যও চলিতেছে। এই সমস্ত জনসেবামূলক কর্ম্মের জন্য এবং বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগাদির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা এই বিদ্যালয় দেখিয়াছি। ইহাতে ছাত্রেরা সুশিক্ষা পাইয়া থাকে। ইহা বাঙালীর প্রতিষ্ঠান এবং সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

—

রাঁচির 'বালিকা শিক্ষাভবন'

বাংলা দেশের বাহিরে এবং যাহা বাস্তবিক বাংলা দেশের অন্তর্গত কিন্তু অন্য প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে এরূপ স্থানেও বাঙালী বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নহে; বাঙালী বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এরূপ স্থানসমূহে আরও কঠিন। কঠিনতার একটি কারণ এই, যে, এই সকল স্থানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বাঙালীর সংস্কৃতির সহিত বালক-বালিকাদিগের যোগ স্থাপন ও রক্ষা করা সুসাধ্য নহে। সুখের বিষয়, নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এইরূপ অনেক স্থানের বাঙালীরা বালক-বালিকাদিগকে বাঙালী রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রাঁচির 'বালিকা-শিক্ষাভবন' তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। এই বিদ্যালয়টি হইতে বালিকারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। আগামী বারে ১৫।১৬টি বালিকা এই পরীক্ষা দিবে। ছাত্রীদিগকে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ তিনটি শ্রেণী ইহাতে আছে। মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে আগেকার শিক্ষা পাইয়া ছাত্রীরা এখানে ভর্ত্তি হয়। যাহারা এখান হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়, তাহাদের এই একটি অসুবিধা আছে, যে, তাহারা রাঁচিতে পরীক্ষা দিতে পারে না, তাহাদিগকে কলিকাতা কেন্দ্রে গিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। ইহাতে ব্যয়বাহুল্য ও অন্য অসুবিধা আছে। সকল ছাত্রীর অভিভাবকদের এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিবার ক্ষমতা নাই। বর্ত্তমানে বাংলা ও আসাম এই দুটি প্রদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত এই দুটি প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার কেন্দ্র নাই। অন্য কোথাও কেন্দ্র হইতে পারে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বা কোন নিয়মে এরূপ নিষে আছে কি না জানি না। যদি না-থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমা কর্ম্মিষ্ঠ ও বিদ্যোৎসাহী ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসা মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাঁচিতে প্রবেশিকার একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিলে তথাকার পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচি অধিবেশন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন রাঁচিতে সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে। এইরূপ সম্মেলনগুলি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি হইবার আশা কেহ করে না। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উনিশবার হইয়া গিয়াছে; কয়েক বৎসর স্থগিত থাকিয়া তাহার বিংশ অধিবেশন চন্দননগরে হইবে। বাংলার নিজস্ব এই সম্মেলনটির দ্বারা সাহিত্যের বিশেষ কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। তথাপি তাহা ব্যর্থ বিবেচিত হয় না। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা সেরূপ কিছু ফল উৎপন্ন না হইলে তাহা নৈরাশ্যজনক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বঙ্গের সাহিত্য-সম্মেলনে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির আলোচনা নিষিদ্ধ কিনা, জানি না। কিন্তু প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কোন বিষয়ের আলোচনা না-করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারী বা পেন্স্যানভোগী বা তাঁহাদের পরিবারভুক্ত। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রবাসী সমুদয় বাঙালীকে বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত যোগ ও সংস্পর্শ রক্ষা করিবার সুযোগ দেওয়া। তজ্জন্য বিশেষ কোন শ্রেণীর বাঙালীদিগকে ইহা হইতে বাদ দেওয়া যায় না; এবং সরকারী চাকুরিয়া বা পেন্স্যানভোগীদিগকে ইহার সহিত যুক্ত রাখিতে হইলে রাজনীতির চর্চ্চা ইহার অধিবেশনগুলিতে করা চলে না। রাজনীতির প্রকাশ্য আলোচনা না-করিলে সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক বা

সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের পর শ্রীযুক্ত ... মহাশয় সভামণ্ডপের বাহিরে আসিতেছেন

...শয়

অনুরূপা দেবী ও পরিচালক-সমিতির সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ সেন

সাহিত্যসেবী হওয়া যায় না, এমন নয়। বস্তুতঃ বঙ্গের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম্মী কবি বা অন্য প্রকারের গ্রন্থকার নহেন, এবং প্রসিদ্ধ কবি ঔপন্যাসিক ও অন্যবিধ গ্রন্থকারেরাও অধিকাংশ স্থলে রাজনৈতিক কর্ম্মী বলিয়া বিখ্যাত নহেন। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রাজনৈতিক কোন বিষয়ের আলোচনা না হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় বলিয়া মনে করি না। রাজনীতির সর্ব্বগ্রাসী হওয়া উচিত নয়। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রাজনৈতিক আলোচনা না হওয়ায় যাঁহারা দুঃখিত, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য উপরের কথাগুলি লিখিলাম

কেহ সরকারী চাকুরিয়া হইলেই যে তাঁহার বাস্তব জগতের সহিত সহানুভূতি থাকিবে না, জাতীয় বেদনা ও স্বাধীনতার স্পন্দন তিনি অনুভব করিবেন না, জাতীয় আশা-ভরসার কোন খবর রাখিবেন না, বা জাতীয় আদর্শ তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন না, এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন—শুধু তাই নয়, গবর্ণ্মেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর এবং "সী আই ঈ"ও করিয়াছিলেন। অথচ তিনি "আনন্দমঠ" ও "দেবী চৌধুরাণী" লিখিয়াছিলেন, এবং

ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

তাঁহার বন্দে মাতরম্ গান কংগ্রেসের ও অন্য বহু রাজনৈতিক সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে গীত হইয়া থাকে।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সরকারী চাকুরিয়াগণের প্রভাব বেশী থাকাতে ইহার মধ্যে সাহিত্যের পোষাকী ঠাট বড় হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ একটি অভিযোগ পড়িয়াছি। যাঁহারা এই অভিযোগ করেন, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি। আমরা এই সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনের কথা এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কেবল দুইটির কথা বলিতেছি। গোরখপুরের অধিবেশনে এই প্রভাব ছিল না, কলিকাতার অধিবেশনে ছিল না; অথচ এই দুই অধিবেশনে সাহিত্যের ঠাট যেরূপ ছিল, অন্য সব অধিবেশনেও সেইরূপ ছিল। বঙ্গের সম্মেলনের উনিশটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর সরকারী চাকুরিয়াদের প্রভাব ছিল না। তাহাতে সাহিত্যের ঠাট যেরূপ ছিল, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেও ঠাট সেই রকম আছে। রাঁচির অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সহকারী সভাপতি প্রধান কর্ম্মসচিব প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের অধিকাংশ সরকারী চাকুরিয়া নহেন বলিয়া শুনিয়াছি।

বাস্তব জগতের বেদনাধ্বনি রাঁচির বাঙালীরা শুনিতে পান না, বা বাংলার যুবকজীবন হইতে তাঁহারা বহুদূরে বাস করেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেখানেও শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল, সেখানেও বাঙালী যুবক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া জেলে গিয়াছিলেন আমরা স্বয়ং জানি। রাঁচির অধিবেশনের কর্ম্মীদের মধ্যেও এরূপ লোক ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের দুটি অভিভাষণ

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সাধারণ সভাপতি ও সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নীকে মুমূর্ষু অবস্থায় বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে রাঁচি যাইতে হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় ছিলেন। হয়ত সেই কারণেই দীনেশবাবু তাঁহার অভিভাষণ দুটি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার রাঁচি পৌঁছিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যুসংবাদ সেখানে পৌঁছে, যদিও সে খবর তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। ইহা সাতিশয় শোকাবহ।

দীনেশ বাবু সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে তরুণ সাহিত্যিকদের "কাহারও কাহারও মত" এবং লেখার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করায়, সভাস্থলে প্রকাশ্য আলোচনা না হইলেও, আলোচনা খুব হইয়াছিল এবং উত্তাপেরও আবির্ভাব খুব হইয়াছিল। সব তরুণ লেখকের লেখায় তাঁহার উল্লিখিত দোষ নাই—হয়ত তিনিও তাহা মনে করেন না, এবং সব অ-তরুণের লেখা উপনিষদ বা ভগবদ্-গীতার মত নহে। দীনেশবাবু কোন কোন লেখকের লেখা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা অতি জঘন্য। শুনিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল। তিনি যে অশ্লীল পুস্তকসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা পাঠ করার নিষেধবিধি ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে উল্টা ফল হইবার আশঙ্কা করি—তাহাতে ঐ সকল বহির পাঠক-সংখ্যা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। দীনেশবাবুর এই অভিভাষণটির বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার সহিত আমাদের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন, তিনি "চোখের বালি"র বিনোদিনীর যাহা 'সহজ পরিণতি' বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যম্ভাবী মনে করি না, এবং কবি সেই 'সহজ পরিণতি' না দেখানতে তাঁহার পরিকল্পনা 'কতকটা inartistic' হইয়াছে

মনে করি না। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষার ও লিপির সংরক্ষণ ও বিস্তার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মোটের উপর আমরা তাহা সমর্থনযোগ্য মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, "যে-সকল পুস্তক পড়ার যোগ্য স্যর আশুতোষ তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন।" এইরূপ তালিকা একাধিক যোগ্য ব্যক্তির সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহা পাঠকবর্গের এবং গ্রন্থাগার-পরিচালকদের কাজে লাগিবে :

সাধারণ সভাপতি রূপে তিনি বলিয়াছেন :—

"আজ সমস্ত বাঙালী জাতিই প্রবাসী ; আপনারা উত্তরপশ্চিমে যাইয়া প্রবাসী হইয়াছেন,—আমরা বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিয়াও প্রবাসী সুতরাং এক পর্য্যায়ে।"

ইহা সত্য কথা। বাঙালী "নিজ বাসভূমে পরবাসী।" এক দিকে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিয়াছিলেন, বঙ্গে অবাঙালী বিত্তশালী হয়, অন্য দিকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালীকে বঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে নিজের স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিতে বলিতেছেন। এখন জমিদারীতে পর্য্যন্ত অবাঙালী স্থান করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। দীনেশবাবুও অন্য এক দিক দিয়া বাঙালীকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

—

রাঁচি অধিবেশনের অন্যান্য অভিভাষণ ও প্রবন্ধ

রাঁচি অধিবেশনে পঠিত অন্য সব মুদ্রিত বা হস্তলিখিত অভিভাষণগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান ও সময় নাই। সংক্ষেপে ইহা বলিতে পারি, যে, সেগুলি উৎকৃষ্ট এবং অন্য এইরূপ যে-কোন সম্মেলনের যোগ্য হইয়াছিল।

প্রবন্ধ বেশী পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহারও সবগুলি পড়িবার সময় হয় নাই। পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। সভাপতির অভিভাষণগুলি যে খুব দীর্ঘ হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু যে-প্রকারেই হউক, প্রবন্ধ পড়িবার জন্য আরও সময় দেওয়া আবশ্যক। নতুবা প্রবন্ধ পাঠাইবার অনুরোধের মূল্য কমিয়া যায়।

—

রাঁচি অধিবেশনের সফলতা

আমাদের বিবেচনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচি অধিবেশন বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সব ব্যবস্থা যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসুর বীণাবাদন চমৎকার হইয়াছিল।

—

রাঁচিতে প্রদর্শনী

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাঁচিতে যে-সকল ছবি, নৃতত্ত্বসম্বন্ধীয় অতি প্রাচীন নানা সামগ্রী ও চিত্র এবং রাঁচিতে প্রস্তুত নানাবিধ বস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিবার শিখিবার ও আনন্দলাভ করিবার অনেক জিনিষ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাল করিয়া দেখিবার সময় আমরা পাই নাই—আর কেহ পাইয়া ছিলেন কি না জানি না। যদি সময় থাকিত এবং নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সামগ্রীগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, ছবিগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এবং পণ্যশিল্পজাত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ সকলকে কিছু বলিতেন, তাহা হইলে সকলে আনন্দিত ও উপকৃত হইতেন। ভবিষ্যতে সম্মেলন তিন দিনের পরিবর্ত্তে চারি দিন করিলে হয়ত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইতে পারে।

—

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলন

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলনও গত পৌষ মাসে হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা পড়িলাম, তাহাতে উহা সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিল। অভিভাষণগুলির মধ্যে কেবল সাধারণ সভাপতি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ও নানা তথ্যপূর্ণ অভিভাষণটি দেখিয়াছি।

—

ওরাঁওদের নৃত্য ও "ছো" নৃত্য

রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে ওরাঁওদের দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল সরল নৃত্য বেশ সুন্দর হইয়াছিল। "ছো" নৃত্যও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও আমোদজনক হইয়াছিল। "ছো" শব্দের অর্থ মুখোস। আদিম জাতি-

কংগ্রেস সেবক ও পতাকাধারী গোকুলদাস ভট্টের সম্বর্দ্ধনা

সমূহের অনেকে মুখোস পরিয়া এবং নৃত্য করে। এই নৃত্য দ্বারা রামায়ণ আদি প্রাচীন গল্পের অভিনয় করা হয়। মুখোসগুলি দেখিয়া যবদ্বীপের মুখোস-পরা পুতুলের নাচ মনে পড়িয়াছিল। সেগুলি কতকটা তিব্বতী ও ভুটিয়াদের নৃত্যের মুখোসেরও মত।

—

কংগ্রেসের বর্ত্তিকা ও পতাকা

মহারাষ্ট্র দেশের ফৈজপুর গ্রামে কংগ্রেসের গত অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বোম্বাই ভারতবর্ষের প্রথম দুটি শহরের মধ্যে একটি, এবং সকলের চেয়ে বড় ব্যবসার জায়গা। প্রথম প্রথম যাহারা কংগ্রেসে যোগ দিতেন, তাঁহারা ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং হয় ধনী বা অন্ততঃ মধ্যবিত্ত সচ্ছল অবস্থার লোক। এবার যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে, তাহা মহারাষ্ট্রের ফৈজপুর নামক একটি গ্রামে। গ্রামে কংগ্রেস করা হইয়াছে প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের সহিত গ্রামবাসী লোকদের যোগস্থাপন, যাহারা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের বৃহত্তম অংশ, এবং এই যোগস্থাপন দ্বারা তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলা ও জাতীয় স্বাধীনতা ও প্রগতির প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে প্রধান কর্ম্মী করিয়া তোলা।

বোম্বাইয়ের প্রথম কংগ্রেস হইতে ফৈজপুরের আধুনিক কংগ্রেস নানা পরিবর্ত্তন সূচিত করে। কংগ্রেস শহর হইতে গ্রামে পৌঁছিয়াছে, নাগরিকদিগকে উদ্বুদ্ধ করার পর গ্রামবাসীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। কংগ্রেস প্রথমে ইংরেজীশিক্ষা-প্রাপ্ত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকদের প্রতিষ্ঠান ছিল। এখন ইহা ইংরেজী-না-জানা, এমন কি নিরক্ষর, লোকদেরও প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়াছে। ইহা আগে প্রধানতঃ চাকুরীজীবী বা ইংরেজীশিক্ষা-সাপেক্ষ আইন চিকিৎসা আদি বৃত্তি অবলম্বী লোকদের ও বড় বণিক ও কলকারখানার মালিকদের প্রতিষ্ঠান ছিল। এখন ইহা কৃষক ও শ্রমিকদেরও প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়াছে। আগে ইহা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান ছিল

যাহারা হাতের ব্যবহার করিতেন লিখিবার জন্য। এখন ইহা হইতে চলিয়াছে তাহাদেরও প্রতিষ্ঠান যাহারা চাষ করিবার জন্য, নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কল চালাইবার জন্য, পাথর ভাঙিবার, খনি হইতে খনিজ খুঁড়িয়া তুলিবার জন্য,...হাতের ব্যবহার করেন।

কিন্তু এক বিষয়ে গোড়া হইতে এখন পর্য্যন্ত একটি ঐক্য অচ্ছিন্ন রহিয়াছে—কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা দেশের হিত চাহিয়াছিলেন, তাহার বর্ত্তমান পরিচালকেরাও দেশের হিত চান। এই যে হিতৈষণার আগুন ও পতাকা বোম্বাই নগর হইতে ফৈজপুর গ্রামে পৌঁছিয়াছে, তাহা সূচিত করিবার নিমিত্ত এক-এক জন মশাল ও পতাকাধারী এক মাইল করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী অন্য এক জনের হাতে মশাল ও পতাকা দিয়াছে। এই প্রকারে তিন শত জন বর্ত্তিকা-পতাকাধারীর সাহায্যে কংগ্রেসের আগুন আলোক ও পতাকা তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নগর হইতে গ্রামে পৌঁছিয়াছে।

—

ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন

ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। বড় শহরেও কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইলে অনেক হাজার লোকের থাকিবার জায়গা, রাত্রে আলোক, স্নান পান আহারাদি, স্বাস্থ্য, যাতায়াতের জন্য যান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সহজ হয় না। গ্রামে তাহা করা আরও কঠিন। ফৈজপুরের কংগ্রেসে আবার বহুসহস্রের পরিবর্ত্তে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেখানে জল, আলোক, বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহ, প্রভৃতির ব্যবস্থা আগাগোড়া নূতন করিয়া করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মীদের উদ্যোগিতায় সমুদায় বাধা

অতিক্রান্ত হইয়াছিল। ইহা মহারাষ্ট্রের বিশেষ প্রশংসার বিষয়, মহারাষ্ট্র যে-ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাহারও প্রশংসার বিষয়।

গ্রামের কংগ্রেসের সভাপতি যদি মোটরে যাইতেন, তাহা হইলে তাহা বেশ মানানসই হইত না। সেই জন্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে একটি প্রাচীন কালের রথের মত যানে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ফৈজপুরের কংগ্রেসপুরী টিলকনগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রথটির পরিকল্পনা ও সজ্জা করিয়াছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। উহা ছয় জোড়া বলদে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

—

কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণ

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যেমন, ফৈজপুরের কংগ্রেসেও তেমনি, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সমগ্র জগতে দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের সহিত ভারতবর্ষেও ঐ দুই শক্তির সংঘর্ষের সাদৃশ্য ও যোগ প্রদর্শন করেন। এই দুই বিপরীত শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ এবং গণতান্ত্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতা। ইহাদের নাম যাহাই দেওয়া হউক, কথাটা সত্য যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র কতকগুলি জাতি ও লোক অপর কতকগুলি জাতি ও লোককে নিজেদের প্রভুত্বের অধীন রাখিয়া তাহাদেরই পরিশ্রমে আপনারা ধনী হইয়া বিলাসে কাল কাটাইতে চায়। এই অবস্থার উচ্ছেদ আবশ্যক।

সমাজতান্ত্রিকতা শব্দটা অনেকের বড় অপ্রিয়। উহার ব্যবহারে তাঁহারা ভীত। কিন্তু একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, নিরক্ষর, জ্ঞানালোকে বঞ্চিত, বুভুক্ষিত, প্রায়নগ্ন, গৃহহীন, বা অতিক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে, রোগে চিকিৎসা ও ঔষধ পায় না। এই অবস্থার প্রতিকারও হওয়া চাই। কেহ যদি বলেন, যে, প্রতিকার হওয়া আবশ্যক নহে বা হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহার মত আলোচনা করিতে চাই না। যাহারা মনে করেন, প্রতিকার আবশ্যক ও হইতে পারে, তাঁহাদের মত আলোচনার যোগ্য। সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন, সমাজতন্ত্রদ্বারা সকল মানুষের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। যাহারা তাহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অন্য কি উপায় অবলম্বনীয় তাহা বলিতেও অবলম্বন করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও অন্য ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন, সদ্য সদ্য এখনই ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না; আগে দেশকে স্বাধীন করিয়া তবে পরে সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, কারণ রাষ্ট্রশক্তি করতলগত না হইলে সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা যায় না।

—

দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ

কংগ্রেস দেশের জন্য স্বাধীনতা বা পূর্ণস্বরাজ চান, উদারনৈতিক সংঘ ঔপনিবেশিক স্বরাজ (ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্) চান। ব্রিটেনে ওয়েষ্টমিনষ্টার ষ্ট্যাট্যুট নামক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর সারতঃ এই দুটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ সামান্য—বিশেষতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ সমুদয় ব্যাপার সম্বন্ধে। সুতরাং এই দুইটির নাম লইয়া তর্ক করা অনাবশ্যক। যে-কেহ অন্ততঃ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস চান, তাঁহার সহিত কংগ্রেসের সহযোগিতা করিতে এবং কংগ্রেসের সহিত উদারনৈতিকদিগের সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হওয়া উচিত নয়।

—

অহিংস স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি

কংগ্রেস অহিংস উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চান। তাহার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি শুনা যায়। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। (১) স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। কিন্তু কেহ যদি মনে করে যাইবে, তাহা হইলে তাহাকে চেষ্টা করিতে দিতে আপত্তি কি? সে ত আপত্তিকারীদিগকে প্রচেষ্টায় যোগ দিতে বাধ্য করিতেছে না, করিতে পারে না। (২) স্বাধীনতালাভের চেষ্টা বিপৎসঙ্কুল। তাহা হইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ বিপদের সম্মুখীন হইতে চায়, তাহাকে সম্মুখীন হইতে দাও না কেন? সে ত তোমাকে টানিতেছে না। (৩) স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা দেশকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিবে। কিন্তু এখন কি দেশ সুখের সাগরে ভাসিতেছে? (৪) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রাখিতে পারিবে না। এস্থলে আপত্তিকারী ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, স্বাধীনতাকামীরা ব্রিটেনের কাছে স্বাধীনতার বর মাগিতেছে না; তাহারা উহা অর্জ্জন করিতে চায়। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা যাহাদের

হইবে, উহা রক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকিবে। (৫) স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা ও স্বাধীনতালাভ উভয়েরই ফল হইবে এই, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের মিত্রতা ও সাহায্য হারাইবে, অথচ এই দুটি ভারতবর্ষেরই স্বার্থের জন্য আবশ্যক। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, যে, কোন দেশের সহিত অন্য কোন দেশের মিত্রতা বা শত্রুতা স্থায়ী জিনিষ নহে—এক দেশ নিজের সুবিধা ও স্বার্থ অনুসারে কখন কখন অন্য দেশের মিত্র হয়, কখন বা শত্রু হয়। ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না, যে, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করিবার মত শক্তিশালী হইতে পারে, তাহা হইলে এত বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশের সহিত ব্রিটেন বন্ধুতাসূচক সন্ধিস্থাপন নিজের পক্ষে সুবিধা-জনক মনে করিবে। ইহাও মনে রাখা আবশ্যক, যে, ব্রিটেনই পৃথিবীতে একমাত্র শক্তিশালী দেশ নহে। শক্তি-শালী ও স্বাধীন ভারতবর্ষের সহিত মৈত্রীসূচক সন্ধি স্থাপনের সুবুদ্ধি যদি ব্রিটেনের না-হয়, অন্য কোন-না-কোন শক্তিশালী জাতির সেরূপ সুবুদ্ধি হইবে।

এই সমস্তই ভবিষ্যতের কথা। যাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য ডোমীনিয়নত্ব বা ঔপনিবেশিক স্বরাজ চান, তাঁহারাও ত তাহা কল্য সূর্য্যোদয়েই পাইতেছেন না। তাহাও ভবিষ্যতের কথা। স্বাধীনতালাভ যত কঠিন, ডোমীনিয়নত্ব লাভ তার চেয়ে অত্যন্ত কম কঠিন নহে। ডোমীনিয়নত্ব মূল্যহীন নহে। মূল্যহীন হইলে বিলাতী পার্লেমেণ্ট তাহা ভারতবর্ষকে সহজেই দিত, ডোমীনিয়নত্ব দিবার অঙ্গীকার যে-কেহ আগে করিয়াছেন তাহা করিবার অধিকার তাহার ছিল না এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতে পার্লেমেণ্ট বাধ্য নহে, ইহা প্রমাণ করিতে এত চেষ্টা হইত না। কংগ্রেস ডোমীনিয়নত্ব না-চাহিতে পারেন, কিন্তু আমরা স্বাধীনতার সার অংশ স্বরূপ এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার উপায়স্বরূপ ইহাকে মূল্যবান মনে করি।

রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের বক্তৃতার একটি বিশেষত্ব

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা—যেমন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু—প্রধানতঃ দেশের লোকদের ধনসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় দারিদ্র্যের কথাই বলেন। তাহা বলা এবং এই প্রকার দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু এই দারিদ্র্যই আমাদের দেশের একমাত্র দারিদ্র্য নহে। আমাদের দেশের লোকদের মানসিক দারিদ্র্যও অত্যন্ত অধিক, বুদ্ধির বিকাশ অত্যন্ত কম। অতএব মানসিক দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করাও একান্ত আবশ্যক। সমস্ত জাতিটার মন না জাগিলে সমস্ত জাতিটার ধনাগমও হইবে না। আবার শুধু ধনাগম হইলে এবং বুদ্ধির বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যন্ত্রনির্ম্মাণকৌশল বাড়িলেই জাতিটা কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতাতেও আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে, পাশ্চাত্য জগৎ ধনী, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যন্ত্রনির্ম্মাণদক্ষতা তাহার আছে। তথাপি তাহার সভ্যতা বিপন্ন হইয়াছে কেন? এই জন্য, যে, তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি যথেষ্ট হয় নাই।

ধর্ম্মনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি মডার্ণ রিভিয়ুর জন্য সংক্ষেপে তাহা লিখিয়া রাঁচি গিয়াছিলাম। সেখানে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের অভিভাষণে ঐ প্রকারের কথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন :—

জড়বিজ্ঞান মানুষকে পুষ্টি দিয়াছে, বিদ্যা দিয়াছে, পৃথিবীর ধনদৌলত হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ও সদবুদ্ধি দিতে পারে নাই। নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান যাহাতে তাহা দিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা আন্তর্জ্জাতিক ভাবে, মানুষের আধুনিক অবস্থা ও আধুনিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর আগে, যখন জড়বিজ্ঞানের এই সব যুগান্তকারী প্রয়োগ হয় নাই, যখন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাগাভাগী সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের লোক প্রত্যেকে অচলায়তনের মধ্যে বাস করিত, তখনকার সময়ের রীতি, নীতি আইনকানুন আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না। পুরাতন জীর্ণ বসন ত্যাগ না করিয়া জোর করিয়া পরিধান করিতে চেষ্টা করিলে তাহা আরও ছিঁড়িয়া যায়। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে যাহা করিবে তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এখন মানুষের যান্ত্রিক শক্তির প্রধান উৎস অনুপরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া। কিন্তু এ শক্তি অণুপরমাণুর উপরকার আবরণের শক্তি মাত্র। পরমাণুর অভ্যন্তরে যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে তাহার সন্ধান মানুষ সবে মাত্র পাইয়াছে। এই শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিলে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করিবে। কিন্তু তখনও যদি মানুষের চরিত্রের ও মনের উন্নতি না হয়

তাহা হইলে মানুষ এ শক্তি লইয়া কি করিবে? অবোধ শিশুর হাতে আগুনের মত সে এই শক্তি লইয়া পৃথিবীতে ধ্বংসের লীলা সুরু করিয়া দিবে। সুতরাং উপসংহারে আবার বলি জড়বিজ্ঞানের যে দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্য এখন চর্চ্চা করিতে হইবে মানুষের নীতিবিজ্ঞান, চরিত্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এক কথায় মানব-বিজ্ঞান। নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইলে চলিবে না। সকলকে অভয়ের বাণী শুনাইতে হইবে। মানুষ অতীতে যেমন বর্ব্বরতার অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া সভ্যতার আলোক দেখিতে সক্ষম হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতেও তেমনি যন্ত্রের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত সভ্যতার যা ফল—শুধু শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়—মানসিক উৎকর্ষ, শিক্ষা ও কৃষ্টি, তাহাও—সকলে সমানে, অবাধে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

—

সাধারণ লোকদের সহিত কংগ্রেসের সংস্পার্শ

কংগ্রেস দেশের সাধারণ লোকদের সহিত সংস্পর্শ স্থাপন ও রক্ষা করিতে চান। ইহাকে পূর্ণ মাত্রায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে হইলে এই সংস্পর্শ একান্ত আবশ্যক। প্রচারক পাঠাইয়া কিছু সংস্পর্শ স্থাপন করা যায়। কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক প্রচারক পাওয়া ও তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন। গ্রামে গ্রামে গ্রামোন্নতিসাধক কর্ম্মী নিয়োগ বা প্রেরণ করিতে পারিলে সংস্পর্শস্থাপন আরও ভাল করিয়া হয়। কিন্তু ইহাও সাতিশয় ব্যয়সাধ্য। কিন্তু ব্যয়সাধ্য হইলেও এই উভয় উপায় অবলম্বন যথাসাধ্য করিতে হইবে। পুলিস যে প্রচারক ও কর্ম্মীদের কাজ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু পুলিসের মনোযোগ সত্ত্বেও সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কাজ করিতে হইবে।

যদি গ্রামে গ্রামে রেডিও থাকিত এবং যদি তাহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে রেডিও দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজহিতসাধক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক কাজ করিতে পারিত। কিন্তু রেডিও দ্বারা স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত কোন কাজ করা অসম্ভব।

আমাদের দেশে যদি জাপানের মত লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের থাকিত তাহা হইলে সকল প্রতিষ্ঠানেরই কাজ করা সহজ হইত। এই জন্য সমুদয় বালকবালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে-সব বালকবালিকা কেবল মাত্র অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণসমূহের সহিত পরিচিত, তাহারাও এই একান্ত আবশ্যক কাজ করিতে পারে। সকলকেই এই কাজে প্রবৃত্ত করা উচিত।

—

গ্রামে গ্রামে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

এইরূপ একটি সরকারী সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, যে, ভারত-গবর্ন্মেণ্টের গ্রামোন্নতি-কার্য্যপদ্ধতির অঙ্গস্বরূপ গ্রামসমূহেও টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রচলনের একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতবর্ষের গ্রামবাসী লোকদের মধ্যে অগণিত লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের পরণে জীর্ণ বস্ত্র, কুটীর জীর্ণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই, রাস্তা না-থাকার মধ্যে, যাহা আছে তাহা পরিষ্কৃত ও সংস্কৃত রাখিবার বন্দোবস্ত নাই, নর্দ্দামা নাই, স্নানের ও পানের বিশুদ্ধ জলের অভাব যথেষ্ট আছে, মূত্রপুরীষে পথঘাটমাঠ দূষিত। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ব্যবস্থা হইতেছে এ হেন গ্রামবাসীদের জন্য, ভাবিলে ও বিশ্বাস করিতে হইলে হাসি পায়। ভারতীয়েরা পরাধীন হইলেও এতটুকু বুদ্ধি তাহাদের আছে, যাহার সাহায্যে তাহারা বুঝিতে পারে, যে, এই সব ব্যবস্থা শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য করা হইতেছে। যাহা হউক, যেমন প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সামরিক ও ব্রিটিশ জাতির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিলেও তাহা দেশের লোকদেরও কাজে লাগিতেছে, তেমনি গ্রামে টেলিগ্রাফ টেলিফোন বসাইলে সেগুলিও কতকটা দেশের লোকদের কাজে লাগিবে। কোন কোন প্রদেশে যে গ্রাম-সমূহেও রেডিওর ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাও সরকারী প্রয়োজনে। কিন্তু তাহাও দেশের লোকদের কাজে লাগিবে।

—

কংগ্রেসের মনোনীত ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী

গত নবেম্বর মাসে পাঁচ জন কংগ্রেস নেতা (তাঁহাদের মধ্যে সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুও ছিলেন) কোন কোন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলিকে যে-ভাবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী নির্ব্বাচন করিতেছিলেন, তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কমিটিগুলিকে সাবধান করিয়া দিয়া-

ছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "the quality of candidates from the point of view of the Congress policy is more important than the winning of seats and the capture of a fictitious majority in the Legislatures." তাঁহাদের এই উক্তিতে সদস্য-পদপ্রার্থীদের উৎকর্ষের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যে কমিটিগুলিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, কোন কোন স্থলে অযোগ্য বা অবাঞ্ছিত কিংবা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য বা অবাঞ্ছিত রকমের প্রার্থী মনোনীত করা হইয়াছে। অথচ এখন দেখিতেছি, কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় বা তাঁহার প্রতিযোগী প্রার্থীর সমর্থন করায় কোন কোন প্রদেশে কোন কোন কংগ্রেসওয়ালাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। মোটের উপর অবশ্য ইহা ঠিক বটে, যে, কংগ্রেসের ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই ওজুহাতে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের কোনও কংগ্রেসওয়ালার ন্যায্য স্বাধীনতা লোপ করা অনুচিত। কংগ্রেস-নেতাদের সতর্কতার বাণী হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে, সব কংগ্রেস কমিটির সব মনোনয়ন নিখুঁত হয় নাই—কোন কোন স্থলে তাহা ভ্রান্ত বা দূষিত হইয়াছে। অথচ সেই ভ্রম বা দোষত্রুটি-সংশোধনের জন্য যদি অন্য কোন কংগ্রেসওয়ালা স্বয়ং প্রার্থী হন বা কোন যোগ্য কংগ্রেসওয়ালা প্রার্থীর চেষ্টার সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কেন শাস্তি দেওয়া হইবে? নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার চেষ্টারও ত একটা সীমা থাকা চাই।

যোগ্যতমকে অমনোনয়নের একটি দৃষ্টান্ত বাংলা দেশ হইতে দিতেছি।

—

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নারীদিগের জন্য যে একটি "সাধারণ" আসন সংরক্ষিত আছে, কংগ্রেস কর্ত্তৃক তাহার জন্য প্রার্থী মনোনীত হইতে যাঁহারা চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ। কিন্তু কংগ্রেস তাঁহাকে মনোনয়ন না-করিয়া এমন একটি মহিলাকে মনোনীত করিয়াছেন রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্য সার্ব্বজনিক অবৈতনিক কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহার কৃতিত্ব বা সক্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা কখনও কিছু পড়ি নাই শুনি নাই। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ও সিংহলের একটি শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপাল ছিলেন। শিক্ষাসম্পর্কীয় অন্য নানা কাজ এবং বহু সার্ব্বজনিক কাজও তিনি করিয়াছেন। সে সকল বলিবার স্থান ইহা নহে। এখানে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক কাজের কথাই বলিব। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ষোল বৎসর ভারতের—বিশেষতঃ কলিকাতার এবং বাংলার, বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপারে জড়িত থাকিয়া কাজ করিয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর বাণী বহন করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়াছেন। কারাবাস ও অন্য দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনাকে গ্রাহ্য না করিয়া দেশের মঙ্গল হইবে মনে করিয়াই কংগ্রেসের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সরকারী চাকুরী ও অর্থের মোহ পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। নারী-হিতকর বহু প্রতিষ্ঠান, জনসেবা-ব্রতে ব্রতী বহু প্রতিষ্ঠান ও আর্ত্তত্রাণে নিয়োজিত বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ও তাহাদের মধ্য দিয়া জনসাধারণের ও দুঃখপ্রপীড়িতদিগের সেবায় নিজকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেস তাঁহাকে মনোনীত না-করায় স্বয়ং নারীদের আসনটির জন্য স্বাধীন ভাবে তাঁহাকে প্রার্থী হইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি নির্ব্বাচিত হইলে কংগ্রেসেরই কাজ হইবে। কেন-না তিনি নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে কাজ করিবেন। (১) নূতন শাসনতন্ত্রকে বাধা দিতে হইবে। (২) সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিরোধ করিতে হইবে। (৩) মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। (৪) দমননীতির প্রতিরোধ করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করিতে হইবে। (৫) দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করিতে হইবে। (৬) নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

এই সকল কারণে আমরা মনে করি, তাঁহাকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচিত করা উচিত। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি আছে, বাংলা ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিবার শক্তি অভ্যাস ও সাহস আছে এবং রাজনীতির জ্ঞান আছে।

আমরা এপর্য্যন্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে কোনও প্রার্থী সম্বন্ধে আমাদের কাগজে কিছু লিখি নাই। নারীর আসনটি সম্বন্ধে অন্যায় মনোনয়ন হওয়ায় কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। কেমন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, সে-বিষয়ে অবশ্য সাধারণ ভাবে আগে কিছু লিখিয়াছি, এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়া মোটের উপর কংগ্রেসের জয়লাভ চাহিয়াছি।

"On the whole we should be glad if the Congress were able to capture the majority of the seats in the provincial legislatures, and, in due course, in the central or federal legislature also. Congress members are likely to fight for India's freedom more strenuously and courageously and in a more organized manner than the followers of any other party or parties. And it is freedom--political and economic - which matters more than anything else." P. 705.

আমরা কংগ্রেসদলভুক্ত না-হইয়াও মোটের উপর কংগ্রেসের জয় কামনা করিয়াছি—যদিও কংগ্রেসের মনোনীত প্রত্যেক প্রার্থীকে অন্য প্রত্যেক প্রার্থীর চেয়ে যোগ্যতর মনে করি না। সেই জন্য ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিয়ুতে এই কথাও লিখিয়াছি :—

"As we have said already, we should be pleased if the nominees of the Congress succeeded in capturing the majority of the seats in the legislatures. This does not mean that, in our opinion, every Congress candidate is preferable to every non-Congress candidate. That is not so." P. 706.

নির্ব্বাচনে সরকারী কর্ম্মচারীদের হস্তক্ষেপ

গণতন্ত্রের যুগে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের কার্য্যকুশলতার উপরই দেশের বা জাতির সুখ-সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সুতরাং এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ব্যতীত ইহা সম্ভব হয় না। এই জন্যই নির্ব্বাচনবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে, নিরপেক্ষতা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে যতগুলি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নির্ব্বাচন ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের নিরপেক্ষতা তাহাদের অন্যতম। পূর্ব্বাপর যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আসন্ন নির্ব্বাচনে বাংলা দেশে এই প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। বাংলা-সরকারের তরফ হইতে কোনও প্রতিবিধানের কথা আমরা আজও শুনি নাই।

নির্ব্বাচনপ্রার্থী যদি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর সাহায্য লাভে সমর্থ হন, তবে তিনি অতি সহজেই নিজ পথ সুগম করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে শুধু যে প্রতিযোগিতার সুফল হইতেই দেশ বঞ্চিত হয় তাহা নহে,—ক্ষমতা অপাত্রে ন্যস্ত হয় এবং ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দেশের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি অনিবার্য্য।

আমরা অবগত হইয়াছি, বাংলা-সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী একাধিক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রী মহোদয়ের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, হয়ত তাঁহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার অভিপ্রায়েই তিনি কয়েকটি কেন্দ্র হইতেই সমভাবে চেষ্টা করিতেছেন—এক স্থানে না এক স্থানে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবেই। একাধিক কেন্দ্র হইতে চেষ্টা করার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে, এবং আমাদের অনুমান, হয়ত তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ সকল কেন্দ্র হইতেই যদি তিনি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, তবে তাঁহার উপর জনসাধারণের আস্থার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইতে পারিবেন, এবং ইহাতে তাঁহার অভিলষিত প্রধান মন্ত্রীর পদের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু, একাধিক কেন্দ্র হইতে তিনি নির্ব্বাচিত হইলে একটি ব্যতীত অপরাপর কেন্দ্রে যে উপনির্ব্বাচন হইবে তাহাতে নিজ পক্ষ সমর্থনকারী প্রার্থীর নির্ব্বাচনে সাহায্য করা অতি সহজ হইবে। তাঁহাদের কৃতকার্য্যতায় আবার ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রী বাহাদুরের দলপুষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথ আরও সরল হইয়া আসিবে।

মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের লোকবল ও অর্থবলের তুলনা অতি বিরল। তাঁহার অধিকৃত পদের গুণে তিনি একাধিক সরকারী বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা। কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ইহাদের প্রত্যেকেরই শক্তি ও প্রতিপত্তি বর্ত্তমান। উদাহরণ-স্বরূপ কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রীর অধীনস্থ সমবায়-বিভাগের কথা উল্লেখ করা যায়। এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা কম নহে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য সমবায়-সমিতি কৃষি-প্রাণ বাংলার পল্লী উন্নয়নের জন্য সমগ্র প্রদেশটিকে জালের মত বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাদের মিলিত শক্তি অপরিসীম। ইদানীং সমবায়-বিভাগের সংস্কার ও কার্য্য-প্রসার উদ্দেশ্যে

কতকগুলি পদ মঞ্জুর হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অভাবনীয় দুরবস্থায় ঐ সকল পদের আশায় এবং মন্ত্রী বাহাদুরের প্রসাদ লাভোদ্দেশ্যে প্রতিপত্তিশালী অনেক লোক নির্ব্বাচন-ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এই সকল সাহায্য মন্ত্রী বাহাদুরের ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির পরিচায়ক নহে—পদমর্য্যাদার অন্যায় সুবিধা গ্রহণের নিদর্শন মাত্র।

সমবায়-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী রেজিষ্ট্রার। তিনি মন্ত্রী সাহেবের বিশেষ আত্মীয়। প্রধানতঃ সেই জন্যই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিয়াছেন। তিনি যে আজ ১৫ বৎসর ধরিয়া সমবায়-বিভাগের নানা কার্য্যে নিযুক্ত, একথা অনেকেরই অজ্ঞাত। কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রীর অবৈতনিক এজেন্ট হিসাবে রেজিষ্ট্রার মহোদয় বৎসরাধিক ধরিয়া মন্ত্রী সাহেবের নির্ব্বাচন-কার্য্যে তদবির ও তদুদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্যাদি সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া করিতেছেন। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সমবায় কন্‌ফারেন্স বসাইয়া তিনি এই কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। স্থল-বিশেষে আবার মন্ত্রী বাহাদুরও এই সকল কন্‌ফারেন্সে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দেশ-সেবায় নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সরকারের অনুমতি ভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারিগণ অভিনন্দন গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু রেজিষ্ট্রার সাহেব নির্ব্বিকার চিত্তে নানা স্থানে অভিনন্দন গ্রহণ করেন এবং নানা প্রকার পার্টি ও ডিনারের বন্দোবস্ত হয়। এই সকলের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা সমিতি-সমূহের, এবং রেজিষ্ট্রার ও তাঁহার অফিসারগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের ব্যয় সরকার বহন করেন।

রেজিষ্ট্রারের অনুরোধে কিছু দিন যাবৎ অঞ্চলবিশেষে সমবায় পল্লী-সংস্কার সমিতি গজাইতেছে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে দৈবদুর্ব্বিপাকে সেই অঞ্চলগুলি অনেক স্থানেই আবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্ব্বাচন-ব্যাপারসংশ্লিষ্ট। যে-সকল কর্ম্মচারী এই কার্য্যে উৎসাহ দেখাইতেছেন তাঁহাদের উন্নতি এবং যাঁহারা উপযুক্তসংখ্যক সমিতি গঠন করিতে অসমর্থ হইতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। রেজিষ্ট্রার সাহেব স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে মন্ত্রী সাহেবও এই প্রকার সমিতির উদ্বোধনকার্য্যে উপস্থিত থাকেন। বলা বাহুল্য, সরকার এবং সমিতির ব্যয়ে তাঁহাদের নির্ব্বাচনের সুবিধার্থে প্রচার-কার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। এই সকল অর্গ্যানাইজ্. করিবার ভার সমবায়-বিভাগের জনৈক গেজেটেড্ অফিসারের উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত। এই অফিসারের উপর মন্ত্রী সাহেবের নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার কার্য্যাদির ভারও ন্যস্ত আছে।

ইদানীং সমবায়-বিভাগের যে-সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রেজিষ্ট্রার ও মন্ত্রী মহোদয়ের মতে অডিট্ সার্কল্ (audit circle) অন্যতম। এই ব্যবস্থায় প্রায় প্রত্যেক ১০০টি সমিতির হিসাব পরীক্ষার ভার এক জন করিয়া অডিটারের উপর ন্যস্ত। অডিটারদিগের মন্তব্যের উপর সমিতির মঙ্গলামঙ্গল বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। তাঁহারা যদি উপরওয়ালার নিকট হইতে ব্যক্তিগত নির্দ্দেশ পাইয়া অধীনস্থ সমিতিগুলিকে ইঙ্গিত করেন তবেই নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা পক্ষ সমর্থনে বাধ্য করিতে পারেন। এইরূপ চেষ্টা এক দিকে যেমন পল্লী-সরলতার অপব্যবহার, অপর দিকে তেমনি পল্লীবাসীদের উপর চাপ দেওয়া। কোনও কোনও সমবায়-কন্‌ফারেন্সে গ্রাম্য সমবায়-সমিতির সভ্যগণকে বলিতে শুনা গিয়াছে, যে, এই অডিট্ সার্কেলগুলি মন্ত্রীর নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত হিসাব-পরীক্ষার আদর্শ নীতি অনুসারেও হিসাব-পরীক্ষকদের কর্ত্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

সমবায় কর্ম্মচারীদের বদলি, নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সমবায়-বিভাগে অস্থায়ী লোক নিয়োগ প্রভৃতিও নির্ব্বাচনে জয়লাভের কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত অঞ্চলে বদলি করিয়া ইহাদেরই সাহায্যে সরকারী কার্য্যচ্ছলে স্থানীয় লোকদের হাত করিবার চেষ্টা কিছু দিন হইতে বেশ টের পাওয়া যাইতেছে। গত এক বৎসর যাবৎ যে-প্রণালীতে সমবায়-বিভাগের এই সব কার্য্য চলিতেছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেই উপরিউক্ত অবৈধ কাজগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

সমবায়-বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা অল্প। এই অজুহাতেই উপযুক্তরূপে কার্য্য পরিচালনার জন্য কতকগুলি নূতন পদ মঞ্জুর

করাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অল্পতা সত্ত্বেও যে অনেক কর্ম্মচারীকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতার-কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা হইতেছে, তাহাতে কি উপযুক্ত কার্য্য পরিচালনার ব্যাঘাত হয় না? এতদ্ব্যতীত কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও যে এই পথ অবলম্বিত হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

কিছু দিন পর্য্যন্ত মন্ত্রী মহোদয়ের পশ্চিম-বঙ্গের নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতার কাজকর্ম্ম ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। রেজিষ্ট্রারের তত্ত্বাবধানে কোনও একটি গেজেটেড্ অফিসার সমিতি এবং সমবায়-বিভাগের কর্ম্মচারি-গণের সাহায্যে এই অঞ্চলে মন্ত্রী মহোদয়ের কৃতকার্য্যতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। শুনা যায়, রেজিষ্ট্রার সাহেবও পল্লী-সংস্কার প্রভৃতি নানা কার্য্যের অজুহাতে ঐ অঞ্চলে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়া নির্ব্বাচন-কার্য্য পরিদর্শনাদি করিয়া থাকেন। আরও শুনা যায়, যে মন্ত্রী-মহাশয়ের সাহায্যকল্পে সমবায়-বিভাগের প্রেসিডেন্সী ডিভিজন এলাকাস্থ কতক কর্ম্মচারীকে মফস্বল হইতে কলিকাতা আনা হইয়াছে। কলিকাতার কর্ম্মচারীদের মধ্যেও অনেকে এই কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মন্ত্রী-মহাশয়ের অধীনস্থ অন্য এক বিভাগের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারীও তাঁহার এই অঞ্চলস্থ জমীদারী এবং পৈত্রিক প্রতিপত্তির বলে মন্ত্রী-মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে রত আছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমবায়-সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার মহোদয় কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের নির্ব্বাচন ব্যাপারে এক প্রকার এই প্রদেশের প্রধান কার্য্যকর্ত্তা হিসাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই কার্য্যে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরূপে তিনি ডিপার্ট-মেণ্টের এক জন গেজেটেড অফিসারকে পাইয়াছেন। এই অফিসারটি সমবায়-বিভাগের বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে যে-কার্য্যের জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন সেই কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যতটা তাহা হইতে অনেক বেশী হইতেছে রাজনৈতিক কাজ; যথা কাউন্সিলের মেম্বারগণকে ঠিক পথে চালান, সমবায় কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং বদলি ও সায়েস্তা করার কার্য্যে রেজিষ্ট্রারকে উপযুক্ত পরামর্শ ইত্যাদি দান এবং যে-সকল সমিতি কিংবা কর্ম্মচারিকে রেজিষ্ট্রার এবং মন্ত্রীর আজ্ঞাধীনে আনা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা; তাঁহার উপর কলিকাতার একটি বিশিষ্ট সমিতির কার্য্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতে নানা প্রকার সাহায্য প্রয়োজন হইলে এই সকল কার্য্যের উন্নতির জন্য নিয়োগ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর চেষ্টায় কাউন্সিলে সমবায়-বিভাগ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে মন্ত্রী সাহেবের কৃতকার্য্যতা এবং উপরোক্ত সভ্যটির পরাজয় অনেকটা এই গেজেটেড অফিসারটির উপযুক্ত লবিইঙের (lobbying-এর) ফল-স্বরূপ। কিছু দিন পূর্ব্বে এই সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত ঘটক মহাশয় নিযুক্ত হন। যখন দেখা গেল, তিনি বিভাগের আজ্ঞাধীনে থাকিবার মত লোক নহেন, তখন হঠাৎ তাঁহাকে সরাইয়া মন্ত্রী সাহেবের এক জন প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়কে (যাঁহার নির্ব্বাচনের জন্য একটি উপযুক্ত কেন্দ্রের অনুসন্ধান চলিয়াছিল) নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত ঘটক এই সমিতির অপূর্ব্ব কার্য্যাবলী সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টকে জ্ঞাত করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত তদ্বিরের ফলে তিনি যাহা জানাইয়াছেন তাহা চাপা পড়িয়া আছে। আমরা আশা করি বাংলা-সরকার এবং গবর্ণরের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রী-মহাশয়ের প্রতিপত্তিশালী সমর্থনকারীদের মধ্যে বীরভূম ও নদীয়া অঞ্চল হইতে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারাও কি মন্ত্রী সাহেবের নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় যে-সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহারই সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিতে আশা করেন?

এদেশে সমবায়-সমিতিসমূহের সৃষ্টির সময়েই রাজ-নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা একটি আবশ্যক নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও সমবায়-বিভাগের এই জাতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। কিন্তু আসন্ন নির্ব্বাচনে সমবায়-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যের জন্য রাজনৈতিক কার্য্যে রত থাকিয়া এই রীতি লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছেন। যদি সরকার-পক্ষ

হইতে এই অবস্থার প্রতিকারের কোনও সুবন্দোবস্ত না-হয় তবে পরিণাম ভয়াবহ। মন্ত্রী-মহাশয়ের অধীনস্থ আরও যে কয়েকটি বিভাগ আছে তাহাদের সকলের মিলিত শক্তি ব্যবহারের সুযোগ করিয়া লইতে সমর্থ হইলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন এবং তাঁহার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাবলে সব-কিছুই করিতে পারিবেন। এই সকল সম্ভাবিত বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় হয়। এই জন্যই আমরা বাংলার গবর্ণর ও সরকারের উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অবিলম্বে উপরে লিখিত অবৈধ কাজগুলির যথাযোগ্য প্রতিকারার্থ এত কথা লিখিলাম।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে রফা

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত্ত অনুযায়ী একটি রফার বিষয়ে সর্ আবদুল হালিম গজনবী ও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাবের দুটি চিঠি এবং অন্য কয়েক জনের মতামত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। রফার সর্ত্তগুলি এই :—

1. "The Communal Award to remain, subject to revision at the end of ten years, or unless and until the Communal Award is modified by the mutual agreement of the communities affected by it.

2. "The cabinet to contain an equal number of Hindu and Muslim ministers.

3. "All the services under the Provincial Government to be recruited from now in equal numbers in the proportion of 50 : 50 from the Hindu and Muslim communities in Bengal, subject to the reservation of an agreed percentage thereof for members of the European, Anglo-Indian and Christian communities of the Province and subject to the candidates of all the communities satisfying a test of minimum efficiency to be formulated by a provincial commission."

তাৎপর্য্য। ১। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই সর্ত্তে এখন কায়েম থাকিবে যে উহা দশ বৎসর পরে সংশোধনাধীন হইবে, অথবা তত দিন থাকিবে যতদিন পর্য্যন্ত না উহা উহার সহিত জড়িতস্বার্থ বঙ্গের সম্প্রদায়গুলির সম্মতি অনুসারে পরিবর্ত্তিত না হইবে।

২। বঙ্গের মন্ত্রিসভায় সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রী থাকিবে।

৩। এখন হইতে প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের অধীন সমস্ত চাকুরী-বিভাগেই সব পদে বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সমান-সমান-সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫০ : ৫০টির অনুপাতে কর্ম্মচারী লওয়া হইবে এই সর্ত্তাধীন ভাবে যে ইউরোপীয়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়গুলির জন্য সমগ্র পদগুলির একটা, সব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত, অংশ সংরক্ষিত থাকিবে, এবং সব সম্প্রদায়ের কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে প্রাদেশিক চাকুরী-কমিশনের নির্দ্ধারিত একটি ন্যূনতম কার্য্যক্ষমতের প্রমাণ দিতে হইবে।

বঙ্গের সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় যে কাহারা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং কয়েক জন লোক উক্ত তিন দফা সর্ত্তে রাজী হইলেই যে বঙ্গের সব অধিবাসীর সম্মতি পাওয়া গিয়াছে, এরূপ বলা কঠিন হইবে। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যে, বঙ্গের সকল অধিবাসীর প্রতিনিধিস্থানীয় সব নেতারা সর্ত্তগুলাতে রাজী হইয়াছেন। তাহা হইলেও জানিতে হইবে, বাংলা-গবর্মেণ্ট ও বঙ্গের গবর্ণর রাজী হইয়াছেন বা হইবেন কি না। বাংলা-সরকার রাজী হইলেও তাহা যথেষ্ট হইবে না, লণ্ডনস্থ ভারত-সচিব ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার রাজী হওয়া চাই; কিন্তু তাঁহারা রাজী না-হইতেও পারেন। কারণ, বঙ্গে আদায়ী রাজস্বের যত টাকা বাংলা-সরকার বঙ্গের খরচের জন্য চাহিয়াছিলেন, ভারত-সচিব তাহা দিতে রাজী হন নাই।

সর্ আবদুল হালিম গজনবীর যে চিঠিটিতে তিনি সর্ত্তগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যে, তিনি বাঙালী মুসলমানদের প্রায় সব নেতা এবং আগা খাঁ প্রভৃতি অবাঙালী প্রায় সব মুসলমান নেতার পরামর্শ ও সম্মতি লইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের চিঠিতে কিন্তু বঙ্গের বাহিরের অবাঙালী নেতাদের পরামর্শ ও সম্মতি লইবার কোন উল্লেখ নাই। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য, শুধু বঙ্গের জন্য নহে। এক প্রদেশে উহার পরিবর্ত্তন করিলে অন্যত্রও পরিবর্ত্তন করিতে হইতে পারে। সুতরাং যেমন সব প্রদেশের মুসলমান নেতাদের মতামত জানা দরকার, তেমনি সব প্রদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও মতামত জানা আবশ্যক।

গজনবী সাহেব দফা দফা কেবল তিনটা সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চিঠিটার শেষে একটি লেজ (বা হুল ?) জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহা এই :—

"The acceptance of the proposal on the Muslim side must be understood to be subject to the proviso

that all agitation against the Communal Award, except in the manner agreed upon, must cease as soon as this settlement is put through; otherwise it will be inoperative and of no effect."

তাৎপর্য্য। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে, যে, মুসলমানপক্ষ হইতে রফার প্রস্তাবটি গ্রহণ এই সর্ত্তের অধীন, যে, রফাটি সম্পন্ন হইবামাত্র সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে, সর্ব্বপক্ষসম্মত প্রকারের ভিন্ন অন্য সব রকম, আন্দোলন থামিয়া যাওয়া চাই, তাহা না হইলে রফা বাতিল হইবে ও তদনুসারে কাজ হইবে না।

গজনবী সাহেবের তাহা হইলে রফাটার দফা তিনটা না করিয়া চারিটা করা উচিত ছিল। অবশ্য ইংরেজীতে বলে বটে, যে, অনেক চিঠির হুলের আঘাতটা থাকে শেষে!

বঙ্গে এমন কোন নেতা নাই, যাঁহার প্রভাবে বা আদেশে একটা কোন রকম আন্দোলন সম্পূর্ণ থামিয়া যাইতে পারে। পীন্যাল কোডে একটা ধারা বসাইয়া দিলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেকটা থামিতে পারে বটে; কিন্তু তাহাতেও একেবারে না-থামিতে পারে। কেন না, "রাজদ্রোহ" সম্বন্ধীয় ধারা পীন্যাল কোডে থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক "রাজদ্রোহ" করিয়া জরিমানা দেয় ও জেলে যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার উচ্ছেদের আগে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পূর্ণ থামিবে না। সে-বিষয়ে গজনবী সাহেব নিশ্চিন্ত থাকুন।

এখন সর্ত্তগুলা সম্বন্ধে কিছু বলি।

গণতন্ত্র (ডিমক্র্যাসি) ও স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজমের) দিক হইতে বাঁটোয়ারাটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল আপত্তি এই, যে, উহা ভারতীয়দিগকে ভারতীয় বলিয়া মানিতেছে না — মানিতেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের, জাতির ও জা'তের, বৃত্তির ও শ্রেণীর, এবং পুরুষ- ও স্ত্রীজাতীয় মানুষ বলিয়া। সেই জন্য নির্ব্বাচকমণ্ডলী সব আলাদা আলাদা করা হইয়াছে। সমগ্র মহাজাতিটাকে (নেশ্যনকে) বাঁটোয়ারাটা যে এই প্রকারে নানা টুকরায় বিভক্ত করিয়াছে, রফাটা তাহার কোনই প্রতিকার করে নাই।

বাঁটোয়ারাটা বঙ্গের হিন্দু ও অন্য ভারতীয়ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রাপ্য আসনও দেয় নাই — তাহাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাণ, এবং জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ ও কৃতিত্ব অনুসারে ত দেয়ই নাই। রফাটা বাঁটোয়ারাটার এই দোষেরও কোনই প্রতিকার করে নাই।

মন্ত্রী মনোনয়ন করা আইন অনুসারে গবর্ণরের কাজ। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ব্যবস্থাপক সভার যোগ্যতম সদস্য-দিগকেই যে মন্ত্রী মনোনয়ন করা হয়, তাহা নহে—যদিও তাহাই করা উচিত। সুতরাং যোগ্যতার বিচার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রী লইলে, সেরূপ বন্দোবস্তকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীদিগকে কেবল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হইতে মনোনীত কেন করা হইবে? তাহারা বঙ্গের প্রধান দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় বটে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয়ও ত বঙ্গে আছে। তাহাদের মধ্যে খুব যোগ্য কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাকে গবর্ণর মন্ত্রী মনোনীত করিতে পারিবেনই না, এমন কোন ব্যবস্থা থাকা ভাল নয়।

এই সব কারণে রফাটার ২ নং সর্ত্ত অনুমোদনযোগ্য নহে।

ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে এবং ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরীর ভাগ না করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে যোগ্যতম লোকদিগকেই চাকরী দেওয়া উচিত। ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে ও ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরী ভাগ করিয়া দিলে শুধু যে সব সম্প্রদায়েরই খুব যোগ্য লোকদিগের প্রতি অবিচার হয় তাহা নহে, খুব যোগ্য হইবার প্রবৃত্তির মূলেই কুঠারাঘাত করা হয় এবং সরকারী সব বিভাগের কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইবার পরিবর্ত্তে অপকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহিত হয়।

অতএব রফার ৩ নং সর্ত্তটাও অনুমোদনযোগ্য নহে।

১ নং সর্ত্তটার ঠিক মানে বুঝা যায় না। ইহার মানে কি এই, যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা দশ বৎসর নিশ্চয়ই থাকিবে ও তাহার পর নিশ্চয়ই সংশোধিত হইবে? না, ইহার মানে এই, যে, সম্প্রদায়গুলি সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একমত হইলে দশ বৎসরের আগেও সংশোধন হইতে পারিবে? অথবা ইহার মানে কি এই, যে, দশ বৎসরের পরেও সম্প্রদায়গুলি একমত না হইলে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না? শিক্ষিত ইংরেজরা হয়ত সর্ত্তটার ঠিক মানে বুঝিতে ও বলিতে পারিবে, আমরা পারি নাই।

সর্ত্তটাতে কেবল সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, কিরূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বলা হয় নাই, বাঁটোয়ারাটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের কথা ত বলা হয়ই নাই। কিন্তু উহার সমূল উচ্ছেদ চাই।

সকল সম্প্রদায়ের সম্মতি অনুসারে উহার পরিবর্ত্তন হইবার কথা রফাটাতে আছে। কিন্তু পত্রব্যবহার হইয়াছে কেবল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্য সংখ্যায় খুব কম। কিন্তু তাহারাও ত মানুষ এবং ট্যাক্স দেয়। তাহাদেরও মত লওয়া উচিত ছিল, এবং ভবিষ্যতে মত লওয়া উচিত হইবে।

এই সব কারণে রফার ১ নং সর্ত্তটাও অনুমোদনযোগ্য নহে।

আমরা গণতন্ত্র ও স্বাজাতিকতার দিক দিয়া যে আপত্তির উল্লেখ করিয়াছি, যদি তাহাই একমাত্র আপত্তি হইত, তাহা হইলেও রফার সমগ্র প্রস্তাবটাই অনুমোদনের অযোগ্য হইত। কিন্তু অন্য আপত্তিও আছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

—

জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের প্রস্তাবাবলী

লক্ষ্ণৌ শহরে গত পৌষ মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান ছয়টি প্রস্তাব উত্তম ও সময়োপযোগী। তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। কিন্তু ইহাও প্রায় নিশ্চিত, যে, নূতন ভারতশাসন আইনের বলে ও সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া দুঃসাধ্য—অসম্ভব বলিলেও খুব অত্যুক্তি হইবে না।

প্রধান প্রস্তাবগুলির প্রথমটিতে সংঘ তাঁহাদের আগে আগে প্রকাশিত মতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ভারতবর্ষকে যে মূল রাষ্ট্রীয় বিধি (কন্সটিটিউশ্যন) দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাতিশয় অসন্তোষজনক এবং গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য; ইহা কেবল যে নিতান্ত অযথেষ্ট তাহা নহে, কিন্তু অনেক বিষয়ে, প্রগতিবিধায়ক না হইয়া, বিপরীতপথগামী, এবং ইহাতে ভারতীয় জাতীয় মতের বিরোধী বহু ব্যবস্থা আছে। তথাপি সংঘ দেশের লোকদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত এবং ডোমীনিয়নত্বের দিকে দেশের আরও প্রগতির বেগ বৃদ্ধির নিমিত্ত ইহা কাজে লাগাইতে চান।

"আরও" কথাটি আমরা আমদানী করি নাই। ইহাতে সংঘের "ফার্দার" কথাটির তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। সংঘ প্রথমে বলিয়াছেন, নূতন আইনটা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রগতির পরিবর্ত্তে উল্টা দিকে লইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কোন প্রগতিই ইহার দ্বারা হয় নাই। তাহার পরই সংঘ কিন্তু আবার বলিতেছেন, যে, "আরও" প্রগতি চাই! কিছু প্রগতি হইয়া থাকিলে তবে "আরও" প্রগতির কথা বলা সাজে। ইহা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইত, যে, বিপরীত দিকে গতির পরিবর্ত্তে প্রগতি চাই।

নূতন ভারতশাসন আইন দোহন। (হিন্দুস্থান টাইম্‌স্ হইতে)

that all agitation against the Communal Award, except in the manner agreed upon, must cease as soon as this settlement is put through; otherwise it will be inoperative and of no effect."

তাৎপর্য্য। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে, যে, মুসলমানপক্ষ হইতে রফার প্রস্তাবটি গ্রহণ এই সর্ত্তের অধীন, যে, রফাটি সম্পন্ন হইবামাত্র সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে, সর্ব্বপক্ষসম্মত প্রকারের ভিন্ন অন্য সব রকম, আন্দোলন থামিয়া যাওয়া চাই, তাহা না হইলে রফা বাতিল হইবে ও তদনুসারে কাজ হইবে না।

গজনবী সাহেবের তাহা হইলে রফাটার দফা তিনটা না করিয়া চারিটা করা উচিত ছিল। অবশ্য ইংরেজীতে বলে বটে, যে, অনেক চিঠির হুলের আঘাতটা থাকে শেষে!

বঙ্গে এমন কোন নেতা নাই, যাঁহার প্রভাবে বা আদেশে একটা কোন রকম আন্দোলন সম্পূর্ণ থামিয়া যাইতে পারে। পীন্যাল কোডে একটা ধারা বসাইয়া দিলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেকটা থামিতে পারে বটে; কিন্তু তাহাতেও একেবারে না-থামিতে পারে। কেন না, "রাজদ্রোহ" সম্বন্ধীয় ধারা পীন্যাল কোডে থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক "রাজদ্রোহ" করিয়া জরিমানা দেয় ও জেলে যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার উচ্ছেদের আগে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পূর্ণ থামিবে না। সে-বিষয়ে গজনবী সাহেব নিশ্চিন্ত থাকুন।

এখন সর্ত্তগুলা সম্বন্ধে কিছু বলি।

গণতন্ত্র (ডিমক্র্যাসি) ও স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজমের) দিক হইতে বাঁটোয়ারাটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল আপত্তি এই, যে, উহা ভারতীয়দিগকে ভারতীয় বলিয়া মানিতেছে না — মানিতেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, জাতির ও জা'তের, বৃত্তির ও শ্রেণীর, এবং পুরুষ- ও স্ত্রীজাতীয় মানুষ বলিয়া। সেই জন্য নির্ব্বাচকমণ্ডলী সব আলাদা আলাদা করা হইয়াছে। সমগ্র মহাজাতিটাকে (নেশ্যনকে) বাঁটোয়ারাটা যে এই প্রকারে নানা টুকরায় বিভক্ত করিয়াছে, রফাটা তাহার কোনই প্রতিকার করে নাই।

বাঁটোয়ারাটা বঙ্গের হিন্দু ও অন্য ভারতীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রাপ্য আসনও দেয় নাই — তাহাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, প্রদত্ত ট্যাক্সের পরিমাণ, এবং সার্ব্বজনিক কার্য্যে উৎসাহ ও কৃতিত্ব অনুসারে ত দেয়ই নাই। রফাটা বাঁটোয়ারাটার এই দোষেরও কোনই প্রতিকার করে নাই।

মন্ত্রী মনোনয়ন করা আইন অনুসারে গবর্ণরের কাজ। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ব্যবস্থাপক সভার যোগ্যতম সদস্যদিগকেই যে মন্ত্রী মনোনয়ন করা হয়, তাহা নহে—যদিও তাহাই করা উচিত। সুতরাং যোগ্যতার বিচার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রী লইলে, সেরূপ বন্দোবস্তকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীদিগকে কেবল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হইতে মনোনীত কেন করা হইবে? তাহারা বঙ্গের প্রধান দুই ধর্ম্মসম্প্রদায় বটে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয়ও ত বঙ্গে আছে। তাহাদের মধ্যে খুব যোগ্য কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে, তাহাকে গবর্ণর মন্ত্রী মনোনীত করিতে পারিবেনই না, এমন কোন ব্যবস্থা থাকা ভাল নয়।

এই সব কারণে রফাটার ২ নং সর্ত্ত অনুমোদনযোগ্য নহে।

ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে এবং ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরীর ভাগ না করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে যোগ্যতম লোকদিগকেই চাকরী দেওয়া উচিত। ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে ও ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরী ভাগ করিয়া দিলে শুধু যে সব সম্প্রদায়েরই খুব যোগ্য লোকদিগের প্রতি অবিচার হয় তাহা নহে, খুব যোগ্য হইবার প্রবৃত্তির মূলেই কুঠারাঘাত করা হয় এবং সরকারী সব বিভাগের কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইবার পরিবর্ত্তে অপকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহিত হয়।

অতএব রফার ৩ নং সর্ত্তটাও অনুমোদনযোগ্য নহে।

১ নং সর্ত্তটার ঠিক মানে বুঝা যায় না। ইহার মানে কি এই, যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা দশ বৎসর নিশ্চয়ই থাকিবে ও তাহার পর নিশ্চয়ই সংশোধিত হইবে? না, ইহার মানে এই, যে, সম্প্রদায়গুলি সংশোধন ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একমত হইলে দশ বৎসরের আগেও সংশোধন হইতে পারিবে? অথবা ইহার মানে কি এই, যে, দশ বৎসরের পরেও সম্প্রদায়গুলি একমত না হইলে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না? শিক্ষিত ইংরেজরা হয়ত সর্ত্তটার ঠিক্ মানে বুঝিতে ও বলিতে পারিবে, আমরা পারি নাই।

সর্ত্তটাতে কেবল সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, কিরূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বলা হয় নাই, বাঁটোয়ারাটার সম্পূর্ণ উচ্ছেদের কথা ত বলা হয়ই নাই। কিন্তু উহার সমূল উচ্ছেদ চাই।

সকল সম্প্রদায়ের সম্মতি অনুসারে উহার পরিবর্ত্তন হইবার কথা রফাটাতে আছে। কিন্তু পত্রব্যবহার হইয়াছে কেবল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্য সংখ্যায় খুব কম। কিন্তু তাহারাও ত মানুষ এবং ট্যাক্স দেয়। তাহাদেরও মত লওয়া উচিত ছিল, এবং ভবিষ্যতে মত লওয়া উচিত হইবে।

এই সব কারণে রফার ১ নং সর্ত্তটাও অনুমোদনযোগ্য নহে।

আমরা গণতন্ত্র ও স্বাজাতিকতার দিক দিয়া যে আপত্তির উল্লেখ করিয়াছি, যদি তাহাই একমাত্র অপত্তি হইত, তাহা হইলেও রফার সমগ্র প্রস্তাবটাই অনুমোদনের অযোগ্য হইত। কিন্তু অন্য আপত্তিও আছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের প্রস্তাবাবলী

লক্ষ্ণৌ শহরে গত পৌষ মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান ছয়টি প্রস্তাব উত্তম ও সময়োপযোগী। তাহা কাজে পরিণত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। কিন্তু ইহাও প্রায় নিশ্চিত, যে, নূতন ভারতশাসন আইনের বলে ও সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া দুঃসাধ্য—অসম্ভব বলিলেও খুব অত্যুক্তি হইবে না।

প্রধান প্রস্তাবগুলির প্রথমটিতে সংঘ তাঁহাদের আগে আগে প্রকাশিত মতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ভারতবর্ষকে যে মূল রাষ্ট্রীয় বিধি (কন্সটিটিউশ্যন) দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাতিশয় অসন্তোষজনক এবং গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য ; ইহা কেবল যে নিতান্ত অযথেষ্ট তাহা নহে, কিন্তু অনেক বিষয়ে, প্রগতিবিধায়ক না হইয়া, বিপরীতপথগামী, এবং ইহাতে ভারতীয় জাতীয় মতের বিরোধী বহু ব্যবস্থা আছে। তথাপি সংঘ দেশের লোকদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত এবং ডোমীনিয়নত্বের দিকে দেশের আরও প্রগতির বেগ বৃদ্ধির নিমিত্ত ইহা কাজে লাগাইতে চান।

"আরও" কথাটি আমরা আমদানী করি নাই। ইহাতে সংঘের "ফার্দার" কথাটির তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। সংঘ প্রথমে বলিয়াছেন, নূতন আইনটা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রগতির পরিবর্ত্তে উল্টা দিকে লইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কোন প্রগতিই ইহার দ্বারা হয় নাই। তাহার পরই সংঘ কিন্তু আবার বলিতেছেন, যে, "আরও" প্রগতি চাই! কিছু প্রগতি হইয়া থাকিলে তবে "আরও" প্রগতির কথা বলা সাজে। ইহা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইত, যে, বিপরীত দিকে গতির পরিবর্ত্তে প্রগতি চাই।

নূতন ভারতশাসন আইন দোহন। (হিন্দুস্থান টাইমস্ হইতে)

নূতন আইনটার সাহায্যে দেশের লোকদের যথাসম্ভব সুবিধা করিয়া লইবার কথা বোম্বাইয়ের সর্ চিমনলাল সেতলবাদ প্রভৃতি উদারনৈতিক নেতারা আগেও অনেক বার বলিয়াছেন। অথচ সেটাকে তাঁহারা সাতিশয় অসন্তোষজনক ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্যও বলিয়াছেন। তথাপি সেটাকে কামধেনুবৎ মনে করিবার কারণ কি?

—

বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী

পৌষে বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের সুবর্ণজয়ন্তী হইয়া গিয়াছে। বালির মত ছোট একটি নগরে ৫০ বৎসর ধরিয়া একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ ক্রমোন্নতি সহকারে চলিয়া আসা তথাকার নাগরিকদের জ্ঞানানুরাগ ও সার্ব্বজনিক কাজে উৎসাহের পরিচায়ক। ইহা বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বালির এই সাধারণ গ্রন্থাগারের বাড়ীটি এবং ইহার অনেক হাজার পুস্তক কোন এক বা দুই-এক ধনী ব্যক্তির দানে নির্ম্মিত ও ক্রীত হয় নাই। এগুলি বহু ব্যক্তির অল্পাধিক দানের পরিচায়ক। বালির নাগরিকেরা কেবল যে টাকাই দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারটির জন্য সময় এবং শক্তিও ব্যয় করিয়াছেন। ইহার সর্ব্ববিধ কাজ অবৈতনিক কর্ম্মীদের দ্বারা এ-পর্য্যন্ত নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকক্রয় বিচার পূর্ব্বক করা হয়, এবং ভাল বহি যাহাতে পঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করা হয়। যাঁহারা সামান্য চাঁদাও দিতে অসমর্থ অথচ যাঁহাদের পাঠানুরাগ আছে, এই গ্রন্থাগার তাঁহাদেরও পড়িবার যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া দিয়া থাকে। দেশে গ্রন্থাগার যত বাড়ে এবং তথায় রক্ষিত ভাল ভাল বহি যতই পঠিত হয়, ততই ভাল। কারণ, আমাদের দেশের দারিদ্র্য শুধু আর্থিক নহে, মানসিক দারিদ্র্যও খুব বেশী। সুব্যবহৃত গ্রন্থাগারসমূহ মানসিক দারিদ্র্য দূর করিবার অন্যতম প্রধান উপায়।

—

নিখিল ভারত নারীরক্ষা সম্মেলন

পৌষে কলিকাতায় নিখিল ভারত নারীরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র নারীদের সম্মেলন। নারীরা যে এই কাজে মন দিয়াছেন, তাহা সন্তোষের বিষয়, কিন্তু পুরুষদের অগৌরবের বিষয়ও বটে। পুরুষদের মধ্যে দুর্বৃত্ত নরপিশাচ এত বেশী না-থাকিলে নারীরক্ষা সমিতি ও নারীরক্ষা সম্মেলনের প্রয়োজন হইত না। এক দিকে যেমন এই পিশাচদের কুপ্রবৃত্তি ও গুণ্ডামি আছে, তেমনি যদি অন্য দিকে অন্য পুরুষদের সুবুদ্ধি, পৌরুষ ও সাহস থাকিত তাহা হইলেও নারীরক্ষা সমিতি ও নারীরক্ষা সম্মেলনের প্রয়োজন হইত না। রাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত ঔদাসীন্য এবং আবশ্যকমত আইন প্রণয়নে অবহেলা ও বর্ত্তমান আইন কার্য্যতঃ প্রয়োগে অবহেলাও ভারতবর্ষে ও বঙ্গে নারীনিগ্রহের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী। হিন্দুসমাজ দুর্বৃত্ত পুরুষকে সমাজচ্যুত করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে, কিন্তু নিরপরাধা অপহৃতা ধর্ষিতা নিগৃহীতা নারী-দিগকে এখনও অনেক স্থলে গৃহে ও সমাজে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করে। এ-বিষয়ে সমাজকে ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয় ও দূরদর্শী হইতে হইবে। নারীদিগকেও সুশিক্ষার দ্বারা, তাঁহাদের দেহমনের শক্তি বাড়াইয়া, আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইবে।

নারীনিগ্রহের প্রতিকার ও তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

—

শিক্ষার উন্নতির ওজুহাতে শিক্ষার সঙ্কোচ

ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন ব্যপদেশে, প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, তাহার সঙ্কোচসাধনের চেষ্টা হইতেছে, এবং এই সঙ্কোচসাধন প্রয়াসের ঢেউ দেশী রাজ্যগুলিতেও অবশ্য গিয়া পৌঁছিতেছে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতে কিন্তু দোষত্রুটি সংশোধনের নামে সংহার বা সঙ্কোচসাধন করা হয় না। আমাদের প্রাথমিক পাঠশালাগুলিকে অকেজো বলা হয়, তাহাতে লিখন-পঠনক্ষমত্ব পর্য্যন্ত অনেক ছাত্রছাত্রীর হয় না বলা হয়। অনেক স্থলে তাহা সত্যও হইতে পারে। কিন্তু এই দোষ সংশোধনের

অতীত নহে। সংশোধন করাই উচিত। শিক্ষার সংকোচ করা উচিত নহে।

মিঃ এ পিণ্ডার (Mr. A. Pindar) নামক এক জন ইংরেজ শিক্ষক বিলাতের বিখ্যাত নিউ ষ্টেট্‌সম্যান নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে লিখিয়াছেন :—

In one senior school I had to teach a class of boys of about twelve years of age. Many were unable to write their own names correctly. Others could not read words of more than four letters. Some did not recognize the map of Europe and all were incapable of performing correctly the simplest arithmetical operation. They seemed to have gained nothing at all from the previous seven years' unremitting and costly effort on the part of the state.

খুব সম্ভব বিলাতে এইরূপ বিদ্যালয় আরও আছে। কিন্তু তাহার জন্য তথায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা হয় নাই, উন্নতির চেষ্টাই হইয়া থাকে ও হইবে।

—

ডাঃ বিপিনবিহারী সেন

বিপিনবিহারী সেন

ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জননায়ক, ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় গত ৮ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১টার সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। তিনি দরিদ্রের মাতাপিতা-স্বরূপ ছিলেন। কত দরিদ্র রোগী যে তাঁহার নিকট হইতে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছে, কত অনাথ ছাত্র যে তাঁহার গৃহে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাই আজ ময়মনসিংহের ঘরে-ঘরে শোকের হাহাকার উঠিয়াছে। তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি বহুকাল ময়মনসিংহ কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন এবং যথেষ্ট সম্মানের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্যকে তিনি দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকে অবহেলা করেন নাই। স্থানীয় সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিতই তিনি সংসৃষ্ট ছিলেন। ময়মনসিংহে অল্পদিন পূর্ব্বে যখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন ইহার প্রতিরোধের জন্য অসুস্থ দেহেও দিবারাত্র তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অনেকের অনুকরণীয়। তিনি নয় বৎসরকাল ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে শহরের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল কৌন্সিল অব মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশনের নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। পরলোকগমনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে কর্ম্মবীর সাধু-পুরুষ পরলোকে চলিয়া গেলেন।

—

স্বাজাতিকতার প্রসার

মুসলমান ছাত্রদের একটি নিখিলভারতীয় কনফারেন্স

করিবার প্রস্তাব হয়। আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রথমেই ইহার প্রতিবাদ করে। তাহারা এই মর্ম্মের কথা বলে যে, আমরা ছাত্র, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রেরাও ছাত্র, সকল ছাত্রদের একটি সম্মিলিত কন্‌ফারেন্স বাঞ্ছনীয়, সাম্প্রদায়িক কন্‌ফারেন্স বাঞ্ছনীয় নহে। তাহার পর আরও নানা প্রদেশের মুসলমান ছাত্রেরা সাম্প্রদায়িক ছাত্র-কন্‌ফারেন্সের প্রতিবাদ করিয়াছে। সুতরাং মুসলমান ছাত্র-কন্‌ফারেন্স করিবার প্রস্তাব আপাততঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা খুব সুসংবাদ।

—

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বিদ্যা শিক্ষণের প্রস্তাব

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কৌন্সিল সংবাদ-পত্রপরিচালন বিদ্যা শিখাইতে ও তাহাতে পরীক্ষা লইয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা দিতে সংকল্প করিয়াছেন। শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার কতকগুলি সাংবাদিকের চেষ্টার ফল এই হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত না হইলে ভাল হইত।

লাহোরের এক দল সঙ্গীতকলাকুশলী ছাত্রী।

উপবিষ্ট : বাম হইতে :—কুমারী লয়লা ভাণ্ডারী, কুমারী প্রিতম্ ধাওয়ান এবং কুমারী লজ্জাবতী ধাওয়ান।

দণ্ডায়মান : কুমারী যমুনা, কুমারী কমলা মোহন, কুমারী কৌমুদী ও কুমারী এস সি চ্যাটার্জ্জী।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন

বিহার-প্রবাসী রায় বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয় সম্প্রতি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত [illegible] সালের বিহার প্রদেশে ভূমিকম্পের পর হইতে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ইনি শিক্ষা-বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ "ইনসপেক্টর অফ স্কুলস" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্প্রতি ইনি নানা দেশের নানা স্থানে বালক-বালিকাগণের শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন।

কৃতী ছাত্র

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায় 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস' বৃত্তি লাভ করিয়া [illegible] খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যান। তিনি ষ্ট্রাকচারাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ চৌধুরী অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে আসিয়া অবশেষে ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন। লণ্ডন ওয়েষ্ট-এণ্ডে তৎপরিচালিত ভারতীয় আহারের হোটেল বিশেষ জনপ্রিয়। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনে নানা ভারতীয় পণ্যের একটি দোকান খুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

নয়া দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের সাহিত্য-বিভাগ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ের একটি প্রবন্ধ আহ্বান করা যাইতেছে। বাঙ্গালার বাহিরে যে-কোন স্থান হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী (স্ত্রী বা পুরুষ) প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিবেন।

বিষয়—"প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা ও তাহা নিরাকরণের উপায়।"

প্রবন্ধটি সাধারণ [illegible] ১৫ পৃষ্ঠার অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক একটি রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে।

প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় [illegible] মাসের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

অথবা — শ্রী[illegible] দত্ত
১২, [illegible] স্কোয়ার — সম্পাদক—সাহিত্য বিভাগ
নিউ দিল্লী। — [illegible] রোড—নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরী

শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায়

শ্রীসত্যশরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন

উপরে : দার্দানেলিস-প্রণালী সুরক্ষিত করিবার অধিকার তুর্কী পুনঃপ্রাপ্ত হইলে দেশময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়
নীচে : ত্রয়োদশ বর্ষ পরে এই প্রথম তুর্ক অশ্বারোহী সৈন্যদল চানাকেলে প্রবেশ করিতেছে
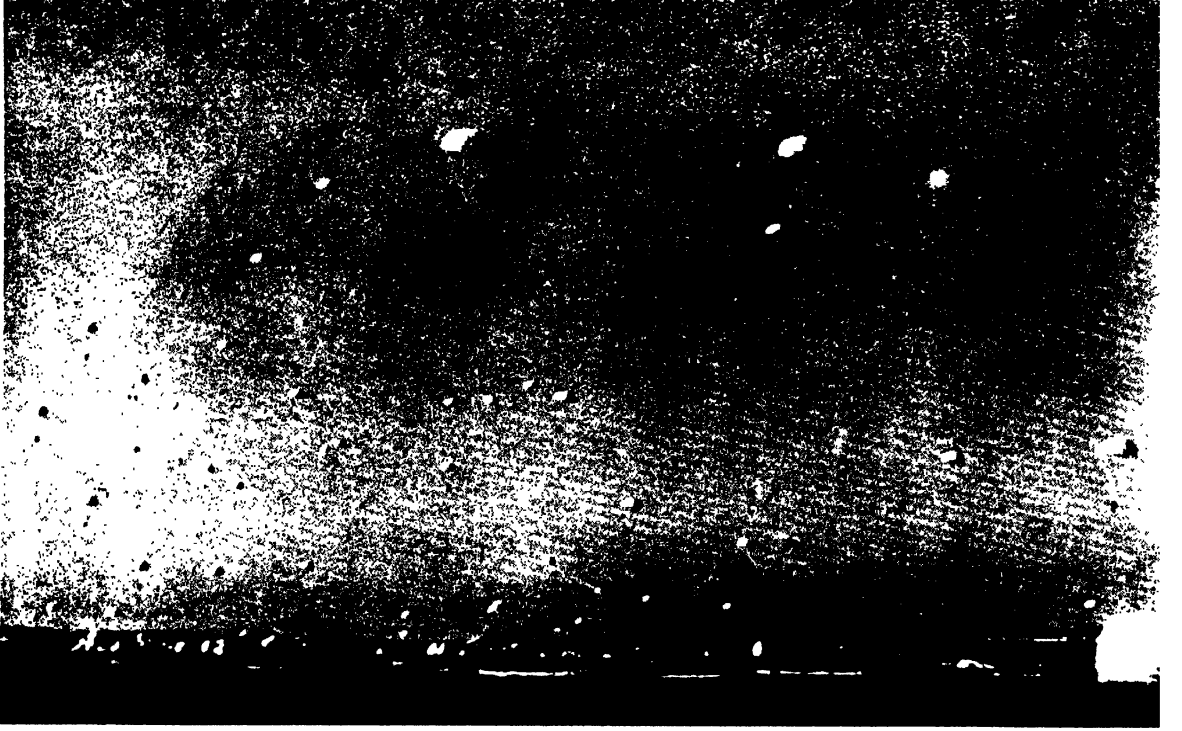
সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন : বোমাবর্ষণকারী এরোপ্লেন হইতে প্যারাশুট-সাহায্যে সৈন্যদের অবতরণ

প্যারাশুট-অবতীর্ণ এক সশস্ত্র রুশ পদাতিক স্থলপথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত

নূতন ভারতীয় প্রচেষ্টা—'বোর্ণ-ভিটা'

যুক্তপ্রদেশের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে বাণিজ্য-সচিব সর্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কার্লটন হোটেল কর্ত্তৃক পরিচালিত 'বোর্ণ-ভিটা' দুগ্ধ বিপণির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় এই নূতন ভারতীয় প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমেরিকায় এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই প্রকার 'মিল্ক বার' বা দুগ্ধ-বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকপ্রিয় হইয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে ও জনসাধারণের মধ্যে দুগ্ধপানেচ্ছা প্রবল করিতে এইরূপ দুগ্ধ-বিপণির বহুল প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়।

কুমারী অমলা নন্দী

কুমারী অমলা নন্দী বিগত কয়েক মাসের মধ্যে আজমীঢ় অল্-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স মজঃফরপুর অল্-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স এবং আগরা কলেজ মিউজিক কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিগত অক্টোবর মাসে রাজপুতানার রাজধানী আজমীঢ় নগরে যে অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে দুই শতের উপর স্বনামধন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যকলা-কুশলীগণ তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কুমারী অমলা সাতখানি স্বর্ণপদক, দুইখানি রৌপ্যপদক এবং তিনটি কাপ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ নগরে মহাসমারোহে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলা দেশ হইতে নৃত্যকলাকুশলা কুমারী অমলা নন্দী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামকিষণ মিশ্র কুমারী বীণা নন্দী কুমারী সুষমা দে কুমারী বীণাপাণি মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বসু এই কনফারেন্সে যোগদান করেন। কুমারী অমলা এই মিউজিক কনফারেন্সে পাঁচখানি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কুমারী অমলার নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইঁহার প্রত্যেক ভঙ্গীটি সুরুচিসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার অধিকাংশ নৃত্য ভগবৎভক্তিভাবোদ্দীপক। ইনি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে সমগ্র ইউরোপে নৃত্য প্রদর্শনে সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। কুমারী অমলা বর্ত্তমানে আশুতোষ কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও ইনি যশোলাভ করিয়াছেন; 'সাত সাগরের পারে' নামক ইউরোপ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গ্রন্থখানি ইঁহার রচিত।

কালীনাথ ঘোষাল

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা অঞ্চলে সুপরিচিত কালীনাথ ঘোষাল মহাশয় প্রায় আশী বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু রাজনৈতিক ও জনহিতকর আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সহিত

কুমারী অমলা নন্দী

কালীনাথ ঘোষাল

সংপৃক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া প্রবল আন্দোলন করেন এবং ময়মনসিংহে লর্ড কর্জনের গমনের সময় জনমত গঠনে সাহায্য করেন। মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির কাজেও তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

বিদেশ

ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি

গত ২রা জানুয়ারী রোমে ভূমধ্যসাগর-সমস্যা সমাধানকল্পে সর্ এরিক ড্রামণ্ড ও কাউণ্ট সিয়ানোর দ্বারা একটি ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইটালী কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না; ভূমধ্যসাগরে উভয়েরই যাতায়াতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ব্রিটেন ও ইটালীর ভূমধ্যসাগরে যে-পরিমাণ নৌবল বিদ্যমান আছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে এবং উভয়ে মিলিত ভাবে ইউরোপে শান্তিরক্ষার চেষ্টায় ব্রতী হইবে।

ইতালী-আবিসিনীয়া যুদ্ধের সময় মুসোলিনী ভূমধ্যসাগর ও মিশর সম্বন্ধে যে হুমকী দেন তাহা ব্রিটেনের এক বিষম দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছিল। সেই জন্য ব্রিটেন তাড়াতাড়ি এই দুইটি সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল। এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল শক্তিবর্গ আবিসিনীয়ার প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করে। হতভাগ্য আবিসিনীয়া কাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল! রাষ্ট্রসঙ্ঘের নামে তখন ব্রিটেন যে সোরগোল তুলিয়াছিল তাহা কি নিঃস্বার্থ মানবিকতার দিক দিয়া না, ভূমধ্যসাগরের ক্ষমতা হ্রাস ও ভারতের সহিত যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনায়? অথবা, নাইল উপত্যকার জল-সরবরাহ বন্ধ হইবার আশঙ্কায়?

আবিসিনীয়া-বিজয়ের পর ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পরে স্পেনের গৃহবিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ফাসিষ্ট- ও নাৎসী- পন্থিগণ যে ভাবে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় আছে ও ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় যুদ্ধে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের অধীশ্বর ব্রিটেনেরই বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা; সেই জন্য ইটালীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার এত আগ্রহ।

যাহা হউক, এই চুক্তির ফলে আবিসিনীয় যুদ্ধের সময় হইতে ব্রিটেন ও ইটালীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা কিয়দংশে বিদূরিত হইল। মুসোলিনীও যে এতদিন ধরিয়া ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাও এক প্রকার স্বীকৃত হইল। ব্রিটেনের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে এই চুক্তির ফলে ইটালীর আবিসিনীয়া-বিজয় মানিয়া লওয়া হয় নাই। মানিয়া লওয়ার বাকীই বা রহিল কি? তাহার পর শান্তি স্থাপনের কথা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মুখে শান্তির কথা স্বভাবতই আমাদের হাস্যোদ্রেক করে। ইহা কি সেই শান্তি "লক্ষ লক্ষ ফাসিষ্ট যুবকের দৃঢ় করধৃত সঙ্গীনের অগ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত জলপাই-শাখা" বলিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে মুসোলিনী যাহার আভাস দিয়াছিলেন।

এই চুক্তিতে ইহাও নাকি বলা হইয়াছে যে স্পেনের অখণ্ডতা নষ্ট করিবার অথবা বলিয়ারী দ্বীপপুঞ্জ অধিকারে আনিবার কোন চেষ্টা ইতালী করিবে না। অপর দিক হইতে ঠিক যেন ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে বিদ্রোহী পক্ষে যোগদান করিবার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য ইতালী হইতে প্রেরিত হইয়াছে

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
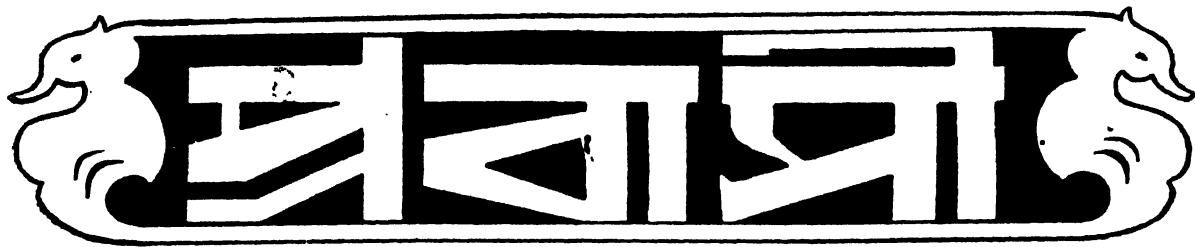
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪৩

৫ম সংখ্যা

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা
হে বন্ধু আমার,
সে পুণ্য তীর্থের যিনি জাগ্রত দেবতা
তাঁরে নমস্কার।
বিশ্বলোক নিত্য যাঁর শাশ্বত শাসনে
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আবর্জ্জনা দূরে যায় জরা জীর্ণতার
তাঁরে নমস্কার।
যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তর দিন
নির্ম্মল করেন যিনি, করেন নবীন,
ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার,
তাঁরে নমস্কার।
পথযাত্রী জীবনের দুঃখ সুখে ভরি'
অজানা উদ্দেশ পানে চলে কাল তরী,
ক্লান্তি তার দূর করি করিছেন পার,
তাঁরে নমস্কার॥

(২)

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক,
তবে তাই হোক্।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক,
তবে তাই হোক।
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক,
তবে তাই হোক।
অশ্রু আঁখি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ চোখ,
তবে তাই হোক।

(৩)

শুভ কর্ম্মপথে ধর নির্ভয় গান ;
সব দুর্ব্বল সংশয় হোক অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে,
লও সে অভিষেক ললাট 'পরে।
তব জাগ্রত নির্ম্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগ-ব্রতে নিক্ দীক্ষা,
বিঘ্ন হ'তে নিক্ শিক্ষা,
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান,
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান ॥
যাত্রি, চলো দিন রাত্রি,
কর অমৃত লোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তা তামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ,
দিন অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ-তীর্থে কর স্নান ॥

১১ মাঘ, ১৩৪৫
শান্তিনিকেতন

রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্রের বেষ্টন, পূর্ব্ব দিকে গভীর অরণ্য, কেবল পশ্চিমে দুর্গম গিরিসঙ্কটের পথ ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে তার অখণ্ডতা, কিন্তু লোকবসতির দিক থেকে সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আচারে বিচারে, ধর্ম্মে ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে খণ্ডিত। এখানে যারা পাশাপাশি আছে, তারা মিলতে চায় না। এই দুর্ব্বলতা দ্বারা ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম।

আর একটি দুর্গতি স্থায়ী হয়ে এ দেশকে জীর্ণ করেছে। অশথ গাছ পুরাতন মন্দিরকে সর্ব্বাঙ্গে বিদীর্ণ ক'রে তাকে শিকড়ে শিকড়ে যেমন আঁকড়ে থাকে তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ় সংস্কার-জাল দেশের চিত্তকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে জড়িয়ে রয়েছে। আগাছার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জোর আছে, তার জন্য চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ধর্ম্মের উৎকর্ষের জন্য নিরন্তর সাধনা চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্ব্বপ্রকার মুক্তির অন্তরায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে' অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গল হয়ে আছে। এমন কি, এদেশে যাঁরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁদেরও বহু লোকের মন গূঢ়ভাবে আফিমের নেশার মতো তামসিকতার দ্বারা অভিভূত। এর সঙ্গে লড়াই করা দুঃসাধ্য।

আর্য্যজাতি যাদের এক দিন পরাজিত করেছিলেন, অবশেষে তাদেরই প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটিয়ে তুলেছে মারাত্মক আত্মবিচ্ছেদ। পরস্পরকে অবজ্ঞা করা এবং পাশ কাটিয়ে চলার যে দুর্ব্যবহার তা এই দেশের সকল জাতিকেই যুগ যুগ ধ'রে আঘাত করছে।

আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর, তখন এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্যবিধির ঐক্যদ্বারা কোনো দেশ কখনই সর্ব্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র। যেন একটা বৃহৎ রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে সুনির্দ্দিষ্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ সেখানে সকলে শিক্ষায় দীক্ষায় নিবিড়ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলেবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের এক-পথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তি-সাফল্যের এই প্রধান কারণ।

খণ্ডিত মন ও আচরণ নিয়ে আমাদের ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সত্ত্বেও জিতে যাব, এমন দুরাশা পোষণ করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐক্যের দরকার আছে, এ কথা আমরা তর্কদ্বারা বুঝি, কিন্তু কোনো মতেই সেই অন্তর দিয়ে বুঝি নে যেখানে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাদ্রাজের লোক, মাড়োয়ারের লোককে আমরা পর ব'লেই জানি, তার প্রধান কারণ যে-আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে-আচার কেবল যে স্বীকার করে না বুদ্ধিকে তা নয়, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়। আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মূঢ়তার গণ্ডির মতো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।

আমাদের দেশের হরিজন-সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মূলে যে মনোবিকার আছে, তার মতো বর্ব্বরতা পৃথিবীতে আর কী আছে জানি না। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ, সে-কথা স্বীকার না ক'রে নিজেদের বঞ্চনা করতে যাই। মনে করি, ইংলণ্ড স্বাধীন

হয়েছে পার্লামেন্টের রীতি মেনে, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করব। ভুলে যাই যে, সে দেশে পার্লামেন্ট বাইরে থেকে আমদানি করা জিনিষ নয়, অনুকূল অবস্থায় ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠা জিনিষ। এককালে ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে দূর হয়েছে। ধর্ম্মের তফাৎ সেখানে মানুষকে তফাৎ করে নি।

মনুষ্যত্বের বিচ্ছিন্নতাই প্রধান সমস্যা। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে কালে কালে যে-সব সাধক, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা অনুভব করেছেন মিলনের পন্থাই ভারতপন্থা। মধ্যযুগে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বড় সমস্যা হয়ে উঠেছিল, তখন দাদূ, কবীর প্রভৃতি সাধকগণ সেই বিচ্ছেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য-সেতু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক'রে গেছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁরাও ভাবেন নি। প্রদেশে প্রদেশে আজ যে ভেদজ্ঞান, একই প্রদেশের মধ্যে যে পরস্পর ব্যবধান, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে বিভক্ততা, এ দুর্গতি তখন তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছেদ আমাদের পীড়া দিচ্ছে। এই পীড়া উভয় পক্ষেই নিরতিশয় দুঃসহ দুর্ব্বহ হয়ে উঠলে উভয়ের চেষ্টায় তার একটা নিষ্পত্তি হ'তে পারবে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাধ্য সমস্যা হিন্দুদের, যারা শাশ্বত ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের প্রতি সুবুদ্ধিবিরুদ্ধ অসম্মানকর নিরর্থক ভাগবিভাগ নিত্য ক'রে রাখে।

এই জন্যই মনে হয়, নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক পূর্ব্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ, ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড় মন তাঁর ছিল। বর্ত্তমান কালে অন্তত বাংলা দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ, বেদান্তে, উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবী পারসীতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেই সঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্ব্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্ম্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্ব্বগ। এদেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্ম্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হ'তে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্ম্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে, সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হ'তে, সেই আলোই তিনি আপন জীবন-যাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে যে, সেই সময়ে কী ক'রে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে। তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয়। এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ, তিনি সাহস ক'রে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্যসাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য ঘটনা।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভাল ক'রে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্ব্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে

আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালী চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

তাঁকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ্য করতে পারে নি, এতেই তাঁর যথার্থ গৌরবের পরিচয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখলে তিনি অনায়াসে জয়ধ্বনি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না ক'রে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার ক'রে গেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয়। এই জন্য তাঁকে আজ নমস্কার করি।

আমাদের অন্তরেও মুক্তি নেই, ঘরেও মুক্তি নেই। পর পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাভব যেখানে এত বড়, সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড় হৃদয়ও চাই। মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেই রকম বড় হৃদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব ব'লে এখানে এসেছি।*

* ১০ই আশ্বিন ১৩৪৩, শান্তিনিকেতনে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী মন্দিরে অভিভাষণ। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লখা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সুধার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে সুধা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নূতনত্বের ভিতর সুধা কোন আশ্রয় পাইল না। পীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নূতন নূতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত সুধাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার কিছুদিন পরে একটি নবাগতা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ সুধার বন্ধুপ্রীতি উথলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন! স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হৈমন্তীর সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব লইয়া স্কুলের অন্য মেয়েরা ঠাট্টা তামাসা করে, তাহাতে সুধা লজ্জা পায়, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি তাহার নিবিড়তর হইয়া উঠে। হৈমন্তীর চোখের ভিতর দিয়া সে নিজেকেও যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। পূজার সময় মাসীমা সুরধুনী কলিকাতায় বোনকে দেখিতে আসাতে, সুধা সেই ফাঁকে শিবুকে লইয়া একবার নয়ানজোড় ঘুরিয়া আসিল। মন কিন্তু যেন কলিকাতায় ফেলিয়া গেল। সুধা নিজের আসন্ন যৌবন সম্বন্ধে নিজে ততটা সচেতন নয় কিন্তু মাসীমা পিসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সারাক্ষণ সাবধান করিয়া দিতেছে।

১৭

চুলটা বাঁধিয়া প্রসাধনের শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না-পৌঁছিতে গলির ওপার হইতে হৈমন্তীদের পরিচিত হর্ণের শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিল। সুধার হাত পা আরও দ্রুত চলিতে লাগিল, তাহার ভয় হইল পাছে সে শেষ কর্ত্তব্য অবধি সমাপন করিবার পূর্ব্বেই হৈমন্তী দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া

উপস্থিত হয়। হৈমন্তীকে সুধা ভালবাসিত, তাহাকে কাছে পাইলে আনন্দিত হইত। কিন্তু তাহার উপস্থিতিতে মনের সহজ আটপৌরে স্বস্তি যেন কোথায় চলিয়া যাইত। সংসারের প্রাত্যহিক ধর্ম্ম তখন চোখে এত ছোট বলিয়া মনে হইত, ঘরোয়া প্রয়োজনের কথাবার্ত্তা কানে এমনই বেসুরো শুনাইত যে তাহার হাত পা মন সবই যেন অকস্মাৎ আড়ষ্ট হইয়া যাইত। দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহাদের আর নিযুক্ত করা যাইত না। সেই জন্য এই সব চুল বাঁধা মুখ ধোওয়ার কাজ সে নেপথ্যে চুকাইয়া রাখিতেই ভালবাসে।

সিঁড়িতে হৈমন্তীর উঁচু হিলের বিলাতী জুতার খট্‌খট্ শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মৃদু একটা অঙ্গরাগের সুগন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া ঘরে আসিল। সুধার চেয়ে হৈমন্তী অনেকটা সহজ মানুষ ছিল। সিঁড়ি হইতেই একবার ডাকিয়া বলিল, "মাসিমা, আমি সুধাকে নিতে এসেছি।"

ছোট খোকা একমাথা কোঁকড়া চুল দুলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "হেমুদিদি, তোমার গলাটা বেশ সরু! তুমি সোনার ঘড়ি পরেছ?"

হৈমন্তী হাসিয়া তাহার হাতের ঘড়িটা খুলিয়া একবার খোকার হাতে বাঁধিয়া দিল। মহামায়া বলিলেন, "ফিরতে কি রাত হবে মা তোমাদের?"

হৈমন্তী বলিল, "না, রাত হবে কেন? আর হ'লেও আপনার ভয় নেই। আমি সুধাকে নিজের হাতে ফিরিয়ে এনে আপনার বাড়ীতে দিয়ে যাব। আর আমরা ত একলা যাচ্ছি না। সঙ্গে ত সবাই রয়েছেন।"

হৈমন্তীদের সিডান গাড়ীতে তাহার বাবা, ছোট ভাই ও একটি জেঠতুত বোন ছিলেন। সুধাকে দেখিয়া তিন জনেই সমস্বরে কথা বলিয়া উঠিলেন। হৈমন্তীর এই দিদি মিলি বয়সে তাহার চেয়ে বছর-তিনেক বড়। নিজের অস্তিত্ব মর্য্যাদা ও রূপগুণ সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য সচেতন মানুষ খুব কম দেখা যায়। সুধাকে দেখিয়াই সে একবার মাথার চুলের উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া, কানের নূতন গহনা দুইটি নাড়িয়া, গায়ের উপরের শাড়ীর ভাঁজ ও পাড়ের ভঙ্গীটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার চোখের দৃষ্টিটা এমন মোলায়েম করিয়া লইল যেন নিজের প্রসাধন সম্বন্ধে নিজে সে সম্পূর্ণই উদাসীন।

মিলি বলিল, "ওয়াকিং শু প'রে এলে না কেন সুধা? এদিক্ ওদিক্ কত ঘোরাঘুরি করতে হবে, পাগুলো বেশ আরামে থাকত।"

হৈমন্তী সুধাকে জবাব দিবার বিড়ম্বনা হইতে বাঁচাইবার জন্য বলিল, "বাঙালীর মেয়েরা শুধু-পায়ে হরিদ্বার থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত বেড়িয়েছে, তাদের চটিতে ত বিশ্ব বিজয় করা হয়ে যায়।"

রণেন বাবু বলিলেন, "তোমার রোদে রোদে ঘোরা অভ্যেস আছে ত মা?"

হৈমন্তীর ছোট ভাই সতু ভাঙা গলায় বলিল, "আমি কি খালি একলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে যাচ্ছি? আমার দলের ত কই কেউ জুটল না। আপনার ভাইকেও যদি আনতেন ত একটু কাজ হ'ত।"

গাড়ী সুধীন্দ্র বাবুর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া এবং রণেন বাবুকে একটা দোকানে নামাইয়া দিয়া গাড়ী সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইবে।

দক্ষিণেশ্বরের জীর্ণ ফটকের কাছে গাড়ী যখন পৌঁছাইল, তখন দেখা গেল ভিতরে ইঁহাদেরই অপেক্ষায় আর একদল মানুষ পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীটা দেখিয়াই চার জন যুবক ছুটিয়া আসিয়া প্রায় একই সঙ্গে দরজার হাতল ধরিয়া টান দিল। এ দলে একটিও মেয়ে নাই। নিখিল, সুরেশ, তপন ও মহেন্দ্র চার জনে প্রায় সমবয়সী। ইহারা প্রায়ই হৈমন্তীদের বাড়ী যাওয়া-আসা করে।

মহেন্দ্র দূরসম্পর্কে সুধীন্দ্র বাবুর কি রকম যেন আত্মীয় হয়। তাঁহাদের বাড়ীতেই ছেলেবেলা হইতে বেশীর ভাগ সময় থাকিত, এখন পাস করিয়া নিজে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। হৈমন্তীকে এক সময় সে সংস্কৃত পড়াইত, সেই সূত্রেই তাহাদের সঙ্গে পরিচয়। আজ ইঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন শুনিয়া মহেন্দ্র আপনা হইতেই তাহার তিন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। সুধার সকলের সঙ্গে পরিচয় নাই কিন্তু হৈমন্তীর সকলেই পূর্ব্বপরিচিত।

নিখিল দীর্ঘাকৃতি শ্যামবর্ণ সদাহাস্যমুখ সুপুরুষ যুবা, সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবীর উপর গলায় চামড়ার ব্যাগে ক্যামেরা ঝুলিতেছে, কথা হাসি ও ছবিতোলা কোন বিষয়েই কার্পণ্য নাই।

সুরেশ কালো মোটা ছোটখাট মানুষ, চোখের চশমা গলায় সরু চেন দিয়া বাঁধা, কখনও বুকের উপর দোলে, কখনও চোখে থাকে। মানুষটা বেশী কথা বলে না। কিন্তু মনে হয় চশমার ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ দেখিয়া নিজের মনের খাতায় লিখিয়া রাখিতেছে। মোটাসোটা মানুষের পক্ষে তাহাকে প্রখরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণধী বলিয়া মনে হয়। কোন বিষয়ে ঔদাস্য নাই।

তপন নবীন ভাস্করের মতই আশ্চর্য্য সুন্দর। দেখিলে মনে হয় বিধাতা ইহাকে মর্ম্মর পাথরের উপর তুলি দিয়া আঁকিয়া তাহার পর অতন্দ্রিত অধ্যবসায়ের সহিত নিঁখুত করিয়া বাটালি দিয়া কাটিয়াছেন। গ্রীক মূর্ত্তির মত তাহার সুগঠিত নাসা, উড়ন্ত পাখীর ডানার মত ভ্রূ-যুগল যেন এখনই নড়িয়া উঠিবে, স্থির সমুদ্রের মত নীল চোখে উজ্জ্বল কালো তারা, কুঞ্চিত ঘন কালো চুল অর্দ্ধচন্দ্রের মত দীপ্যমান প্রশস্ত ললাট ছাড়াইয়া সুগোল মাথার চারি পাশে সমান ওজনে হেলিয়া পড়িয়াছে। পদ্মকোরকের মত হাত দুখানি দেখিলে মনে হয় না পৃথিবীর কোনও কাজে কোন দিন লাগিয়াছে, পূজার মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিতেই শুধু এমন হাতের প্রয়োজন। তপনের মুখে বেশী কথা নাই, দৃষ্টিতেও চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সে যেন কোন ধ্যানে সমাহিত।

মহেন্দ্র সাহেবদের মত ধপধপে শাদা, চেহারায় খুব কিছু বিশেষত্ব নাই। চুলগুলি একেবারে সোজা, বিনা সিঁথিতে পালিশ করিয়া একেবারে পিছন দিকে ঠেলা, কপালটা একবিন্দুও কোথাও ঢাকা নাই। নাকটা একটু বেশী উঁচু এবং খড়্গের মত বাঁকা, হাত পা শক্ত শুষ্ক কাঠের মত ও গ্রন্থিবহুল কথাও বলে জটিল বিষয়ে গুরুগম্ভীরভাবে। যেন সমস্ত পৃথিবীর গুরু-পদ এই বয়সেই তাহাকে কে লিখিয়া দিয়াছে। সকলের শিক্ষা সে না সমাপ্ত করিলে মানব-সমাজের আসন্ন প্রলয় হইতে আর মুক্তির উপায় নাই। মহেন্দ্রেরও গলায় একটা খুব দামী ক্যামেরা ঝুলিতেছে, কিন্তু সে-বিষয়ে সে খুব সজাগ নয়।

সুধার সহিত ছেলেদের সকলের পরিচয় ছিল না। সুধীন্দ্র বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই সকলের পরিচয় দিলেন। একে ত আলাপ করা বিষয়েই সুধা অত্যন্ত অপটু, তাহার উপর একসঙ্গে চারি জন জুটিলে ত কথা খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত। তবু সুরেশ ও মহেন্দ্রর সহিত কথা বলা তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হইল। নিখিল ও তপনকে দেখিয়া কেন যে তাহার মুখে কথা আটকাইয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, অথচ নিখিল ও কথা বলিতে খুবই ব্যগ্র।

সকলের আগে নিখিলই গাড়ীর ভিতর উঁকিঝুঁকি মারিয়া একটা টিফিন-কেরিয়ার ও জলের কুঁজা দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বাহির করিয়া লইল। এদিক ওদিক চাহিয়া আর তেমন কিছু দেখিতে না পাইয়া মেয়েদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "করেছেন কি? রোদ ত এখনও বেশ আছে, অথচ আপনারা কেউ একটা ছাতা আনেন নি, বাড়ী গিয়ে মাথা ধ'রে সারারাত ঘুমোতে পারবেন না যে।"

মিলি কাপড়ের আঁচলটা ঠিক সমান করিয়া লইয়া ছোট আয়নায় মুখখানা তাড়াতাড়ি একটু দেখিয়া লইল। তাহার পর যেন এইমাত্র কথাটা শুনিয়াছে এমন ভাবে বলিল, "আমি একটা ছাতা এনেছি, আর সবাই ত এঁরা সাক্ষাৎ এক-একটি 'এঞ্জেল', পা পিছলে দৈবাৎ স্বর্গের সিঁড়ি থেকে মাটিতে পড়েছেন, পৃথিবীর দুঃখকষ্টের কথা ওঁদের মনেই থাকে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে চললেই ওঁদের পেটও ভ'রে যায়, রোদ ঝড় বৃষ্টিও উড়ে যায়।"

মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলিল, "আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে মেয়েরা পরস্পরের দোষ সম্বন্ধে পুরুষের চেয়ে বেশী সচেতন? এটা তাদের সব চেয়ে প্রিয় টপিক?"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আচ্ছা খ্যাপা দেখছি। আগে মেয়েদের বসবার দাঁড়াবার একটু ব্যবস্থা কর, তার পরে না-হয় নারদ-মুনির কাজটা সুরু করা যাবে। আপনারা মহেন্দ্রর কথা শুনবেন না, ও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বড় অথরিটি যে নয়, তা ত আপনাদের খুশী করবার অপর্য্যাপ্ত চেষ্টা দেখেই বুঝতে পারছেন।"

সুরেশ ইহাদের কথা ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিল, "চলুন, ঐ পঞ্চবটীর দিকে গঙ্গার ধারটায় বসা যাবে, ভারী সুন্দর জায়গা।"

সকলে সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। শীতের দিনে অধিকাংশ গাছের পাতাই ঝরিয়া পড়িতেছে। কোন কোন

গাছের ডালপালা অনাবৃত শিরা-উপশিরার জালের মত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যেন তাহারা আকাশের দিকে সহস্র অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া নূতন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। গঙ্গার ঠিক ধারে একটা বটগাছের বড় শিকড় গুঁড়ির মত মোটা হইয়া প্রায় হেলিয়া শুইয়া আছে। সুরেশ বলিল, "এখানে পা ঝুলিয়ে বেশ বসা যায়। আপনারা যদি চান ত একটা শতরঞ্চিও পাতা যেতে পারে।"

গাড়ীতে গদির তলায় শতরঞ্চি ছিল, সতু এতক্ষণে তবু একটা কাজের মত কাজ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আনিতে দৌড়িল। ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাঙা গলায় গান ধরিয়াছিল,—"এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে।"

শতরঞ্চি আসিয়া পৌঁছিলে মহেন্দ্র পালা করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কে কোথায় বসবে বল, তার পর একটা ছবি তোলার ব্যবস্থা হবে।"

সুধীন্দ্রবাবু বলিলেন, "দেখ, আমার যদিও মনে হয়, 'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো, সবার আমি একবয়সী যেন,' তবুও সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বুড়ো এ-কথা লুকানো যায় না। সুতরাং আমি তোমাদের ছবির বাইরে থাকলেই ভাল। ঐ উঁচু বেদীটাতে আমার স্থান ক'রে নিচ্ছি আমি। ওখান থেকে গঙ্গার ওপার পর্য্যন্ত সারাক্ষণ দেখা যায়।"

নিখিল বলিল, "আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে আপনি বুড়ো হ'তে পাবেন না। আপনার যে রকম শরীর তাতে আমাদের চেয়ে আপনার আয়ু কম হবে না।"

সতু বলিল, "আমি বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে না ব'সে ঐ উঁচু ডালটাকে দোলনা ক'রে বসি।"

হৈমন্তী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "হনুমানেরা যত উঁচু ডালে বসে মানুষের পক্ষে ততই নিরাপদ্। তুমি সামনে থাকলে ত আমাদের আর সব ভাবনাই ভুলিয়ে দেবে।"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "কিন্তু মনে রাখবেন, এখানে আমরা শুধু ভাবনা ভাবতে আসি নি, অন্য কিছু কিছু সাধু উদ্দেশ্যও আছে।"

সুরেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিখিলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কি কি উদ্দেশ্য আছে নির্ভয়ে ব'লে ফেল না। আশ্রমপীড়া না ঘটে এইটুকু মনে রাখলেই হ'ল।"

তপন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "একটা ত খুব নির্দ্দোষ উদ্দেশ্য ছিল ছবিতোলা। তার জন্যে মস্তিষ্ক কি মাংসপেশী কোনটারই খাটুনি বেশী হ'ত না।"

সুধা যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই বলিল, "মন্দির-টন্দির কিছুই দেখলাম না, আগেই ছবি তুলে কি হবে?"

মিলি আতঙ্কিত হইয়া বলিল, "কি যে তোমাদের সব ব্যবস্থা? ঘুরে ঘুরে ধুলোয় আর হাওয়ায় চুলগুলো জটাই-বুড়ীর মত হ'লে তার পর যা ছবি উঠবে, বাঁধিয়ে রাখবার মত।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা ভাই সুরেশদা, দিদিকে রাগিয়ে কাজ নেই। ওর চেহারাটা অপ্সরার মত থাকতে থাকতে ছবি তুলে ফেলাই ভাল।"

মিলি বলিল, "বাবা, তুমি ত ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানতে ন', তোমার মুখে এত কথা ফুটল কবে থেকে?"

প্রথম ছবিখানা তুলিল মহেন্দ্র, দ্বিতীয় নিখিল।

নিখিল বলিল, "আমাদের দেশের সনাতন প্রথামত মেয়েরা একদিকে ছেলেরা একদিকে দাঁড়াতে পাবে না। এক-এক জন মেয়ের পাশে এক-এক জন ছেলে। কে কার পাশে দাঁড়াবে বল।"

সতু গাছের উপর হইতে বলিল, "মিলিদিদি, তুমি ভাই তপনদার পাশে দাঁড়িও না, দোহাই, তাহলে Beauty and the Beast-এর উল্টো ছবি হয়ে যাবে।"

মহেন্দ্র বলিল, "এই বোকা ছেলেটাকে আজ না আনলেই ত হ'ত। কথা বলতেও শেখে নি।"

সুধা স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, বেড়ানো-চেড়ানোর সময়েও প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবসৃষ্ট শিল্পের সৌন্দর্য্য অনুভূতির দিকে তাহার যতটা মন, সঙ্গীদলের হাল্কা কথা ও হাসির সুরের প্রতি তাহার তত মন নয়। কিন্তু আজ সে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে আজিকার এই তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথায় তাহার মন ত বেশ আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। যে যত হাল্কা হাসির দিকে কথার মোড় ফিরাইতেছে, তাহাকেই তত যেন বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাণী রাসমণির প্রকাণ্ড কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবের মন্দির,

পরমহংসদেবের ঘরদ্বার ঘুরিয়া সকলে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। একদল মানুষকে ঘাটে নামিতে দেখিয়া কয়েকটা পানসী নৌকার মাঝি হাত তুলিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল। তখন ভাঁটা সুরু হইবার উপক্রম করিয়াছে। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি কচি ছেলের মত ক্রমাগত টলিয়া টলিয়া চলিতেছিল। একবার তীরের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, আবার সরিয়া যায়। ছেলেরা বলিল, "নৌকো চড়তে হ'লে নেমে আসতে হবে, কিছু কাদাও ভাঙতে হবে।"

সুধা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাহার ভয় কম, কোমরে আঁচল গুঁজিয়া একেবারে ঘাটের শেষ ধাপে নামিয়া গেল। একটা ষ্টীমার দুই ধারের জলে ঢেউ তুলিয়া মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুই পাশের ভাঙা ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া দুই তটে গিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুধার পায়ের উপরেই ঢেউগুলি আছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া হৈমন্তী বলিল, "গঙ্গাদেবী কাকে প্রণাম জানাচ্ছেন কে জানে, তুমি ভাই ও প্রণাম চুরি ক'রো না।"

সুধা বলিল, "এ প্রণাম নয়, এ জাহ্নবীর ডাক, উত্তর-রামচরিতে পড় নি? দেখ, দেখ, ঢেউয়ের চূড়াগুলি কেমন আঙুলের ডগার মত নুয়ে নুয়ে পড়ছে। দেবী জাহ্নবী সহস্র অঙ্গুলি তুলে তাঁর কন্যাকে ডাক দিচ্ছেন। ইচ্ছা করে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

এতগুলা কথা বলিয়াই সুধা কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল তাহার কথা হৈমন্তী ছাড়া বেশী কেউ লক্ষ্য করে নাই। নিখিল ও সুরেশ তখন নৌকার দর করিতে ব্যস্ত। অনেক দর-কষাকষির পর আট আনায় নৌকা ঠিক হইল। নিখিল ও মহেন্দ্রই একটু শক্ত গোছের মানুষ, তাহারা দুই ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েদের হাতে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া দিতে লাগিল। নৌকা এত টলে যে তাহার উপর স্থির হইয়া দাঁড়ানোই যায় না। মিলি ও হৈমন্তী নিখিলের হাত ধরিয়া ও মহেন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল সুধা। ছেলেদের সঙ্গে চলা-ফিরায় সে অভ্যস্ত ছিল না। ইহার ভিতর নিন্দা-প্রশংসার কোন কথা থাকিতে পারে কি না এ চিন্তা স্পষ্ট করিয়া তাহার মনে উঠে নাই। একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আপনা হইতেই তাহাকে বাধা দিতেছিল। তদুপরি পিসিমার অতিরিক্ত সাবধানতার বাণী হয়ত তাহার মনে অলক্ষ্যে কিছু কাজ করিয়াছিল।

মহেন্দ্র হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া শক্ত করিয়া সুধার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখুন, ভীরুতা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হ'লেও সব সময় এ ধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখা বুদ্ধির পরিচয় নয়। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?"

মহেন্দ্রর হাতের তলায় সুধার হাত কাঁপিয়া উঠিল; জলে পড়ার ভয়ে নয়, সম্পূর্ণ অজানা অচেনা কি একটা ভয়ে বুকটা দুলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে একেবারে নূতন। সুধা উত্তর দিতে পারিল না; নিখিলও অগ্রসর হইয়া আসিল। "কিসের আপনার এত ভয়? আচ্ছা, আমরা দু-জনেই আপনাকে তুলে দিচ্ছি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওহে সুরেশ, তোমরা কিন্তু এ সময়ে স্ন্যাপ নিতে চেষ্টা ক'রো না।"

নিখিল ও মহেন্দ্র যখন সুধাকে মাটি হইতে প্রায় শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়াছে, তখন সুধা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি নিজেই পারব। আমাকে তুলে দিতে হবে না।"

নিখিল নৌকার কাছে প্রায় কাদার মধ্যে শরীরটা নীচু করিয়া অর্দ্ধেক হাঁটু গাড়িয়া বসিতেই সুধা তাহার পিঠে ভর করিয়া উঠিয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে মহেন্দ্র ও নিখিল নৌকার তক্তার উপর সুধার দুই পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তপন বসিয়াছিল হৈমন্তীর পাশে, আর সুরেশ মিলির ও সতুর মাঝখানে। সুধার ইচ্ছা করিল, উঠিয়া গিয়া হৈমন্তীর পাশে বসে, নিখিল ও মহেন্দ্রর সঙ্গে গল্প করিতে ত সে আসে নাই, গল্প করিবার ক্ষমতাও তাহার বেশী নাই। কিন্তু উঠিয়া গেলে শহরের ছেলেরা যে ইহাকে অপমান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে এ ভয়টাও তাহার ছিল। তাহার মনে আছে গত বৎসর আলিপুরের বাগানে বেড়াইতে গিয়া সে মহেন্দ্রর কেনা লেমনেড খাইতে আপত্তি করিয়াছিল ভদ্রতা ভাবিয়া, কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্র এমনই অপমানিত বোধ করিল যে রাগিয়া গেলাসসুদ্ধ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। মহেন্দ্র বলিয়াছিল, "আমি কি এমনই অস্পৃশ্য যে আমার হাতে জলও খাওয়া যায় না।"

সেই হইতে শহরের মানুষকে বিশেষত ছেলেদের সুধা ভয় করিয়া চলে।

বেড়ানো আজ যথেষ্টই হইল, কিন্তু অনেক দিন পরে যে আশা লইয়া সে আসিয়াছিল তাহা ত পূর্ণ হইল না। নিরিবিলিতে হৈমন্তীর সহিত দুই দণ্ড গঙ্গার ধারে বসিয়া যে অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিবে মনে করিয়াছিল, তাহার আশা এই হাস্যকোলাহলের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য! সুধা আজ ঘরে ফিরিয়া নৈরাশ্যের কোন বেদনা মনে অনুভব করিতেছে না।

১৮

পৃথিবীতে কেবল যে সুধার একলারই পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা নয়, আশেপাশে আরও পাঁচজনেরও হইতেছে, ইহা সুধা পূজার ছুটির পর স্কুলে আসিয়া ভাল করিয়া অনুভব করিল। স্নেহলতা, মনীষা ইহারা যেন এই দেড় মাসেই সুধার চেয়েও অনেক বেশী বড় হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কথাবার্ত্তা চলনধরণ সব যেন এক ভিন্ন লোকের। স্কুলে তাহারা পড়ে বটে, কিন্তু তাহাদের আলাপ আলোচনা, ভাবনা চিন্তা স্কুলের বাহিরের বিষয় লইয়াই।

মনীষা একটু সেকেলে হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্নেহলতা ক্রীষ্টান। মানুষের বিবাহের আদর্শ কি হওয়া উচিত এই লইয়া সেদিন টিফিনের ঘণ্টায় দুই জনে তর্ক লাগিয়া গিয়াছিল। মনীষা বলিল, "বাপ মা য'কে ভাল বুঝে হাতে ধ'রে স'পে দেবেন তাকেই স্বামী ব'লে গ্রহণ করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। বাপ-মায়ের চেয়ে আমাদের মঙ্গল কে বুঝবে আর তাঁদের চেয়ে বুদ্ধি বিবেচনাই বা কার বেশী?"

স্নেহলতা মনীষার কথায় তাচ্ছিল্য ভরে হাসিয়া বলিল, "বুদ্ধি-বিবেচনা মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা কে বলছে? তুমি আদত কথাটাই বুঝলে না। মানুষের জীবনে ভালবাসার চেয়ে বড় জিনিষ নেই এটা বোঝ ত? তার একটা নিজস্ব সম্মান আর দাবী আছে। মঙ্গল-অমঙ্গল বাপ-মা কিছুর কাছেই তাকে বলি দেওয়া যায় না। যে মানুষ একজনকে ভালবেসে আর একজনকে বিয়ে করে, সে নিজেরও অপমান করে, ভালবাসারও অপমান করে।"

মনীষা বলিল, "যাও, কি যে ভালবাসা ভালবাসা করছ, তোমার লজ্জা করে না? বিয়ে হবার আগেই পুরু মানুষকে মেয়েমানুষে ভালবাসলে কখনও তার মান থাকে ভদ্র মেয়েরা ওরকম করে না কখনও।"

স্নেহলতা চটিয়া বলিল, "পৃথিবীতে তুমি ছাড়া সব তাহলে অভদ্র। যার গায়ে ঠেলে ফে'লে দেবে তা ভালবাসাই বুঝি খুব ভদ্রতা? আত্মসম্মান বোধ ব'লে য একটা জিনিষ নেই, সেই ওকথা বলতে পারে।"

মনীষা বলিল, "আচ্ছা, সুধাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, কখ্খন তোমার কথায় সায় দেবে না। আমার চেয়ে তা কথা ত তুমি বেশী বিশ্বাস কর? আমি না-হয় পণ্ডি নই, সে ত বটে!"

স্কুল-বাড়ীর ছাদের উপর হৈমন্তী তখন সুধাকে টেনিসনে 'ইন্ মেমোরিয়ম' পড়িয়া শুনাইতেছিল। সুধা ও হৈমন্তী যে যখন-তখন ছাদে চলিয়া যায় মনীষারা তাহা জানিত। হৈমন্তীর গলার স্বরটা ছিল ভারি মিষ্ট, ইংরেজী কবিতা তাহার গলায় রূপার ঘণ্টা-ধ্বনির মত শুনাইত। হৈমন্তী সুধার মুখের দিকে চাহিয়া এমন করিয়া কবিতা পড়িয়া শুনাইতেছিল, যেন হৈমন্তীই কবি, সে-ই বন্ধুব বিরহে আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মনীষা ও স্নেহলতাকে দেখিয়া হৈমন্তী থামিয়া গেল। স্নেহলতা মনীষাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "তুমি ভালবাসার নিন্দে করছিলে, এই দেখ, ভালবাসা কাকে বলে! সবচেয়ে যদি ওই জিনিষ পৃথিবীতে বড় না হবে, তবে ওরা পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায় কেন?"

সুধা ও হৈমন্তীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মনীষা অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া বলিল, "যা নয় তাই একটা ব'লে বসলেই হ'ল! কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তুমি ত আর সখ্যের কথা বলছিলে না, তুমি প্রেমের কথা বলছিলে।"

স্নেহলতা বলিল, "তোমার মত অত সংস্কৃত কথা আমি জানি না বাপু। সুধা, বল দিখি, ঘটকালির বিয়ে ভাল না লভ-ম্যারেজ ভাল? মনীষা বলছে, ভদ্র মেয়েরা নাকি কাউকে ভালবাসে না।"

মনীষা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া বলিল, "দেখেছ একবার রকম? আমি তাই বলেছি বইকি!" মনীষার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল।

স্নেহলতা নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা না হোক, তুমি

বলেছ ত যে বিয়ে হবার আগে কোন ভদ্র মেয়ে পুরুষ-মানুষকে ভালবাসে না? তাহলে পৃথিবীতে ক'টা যে ভদ্র মেয়ে আছে খুঁজে বার করা শক্ত।"

মনীষা বলিল, "তুমি বলতে চাও যে সব মেয়েই ঐ রকম করে?"

স্নেহলতা খুব বিজ্ঞের মত বলিল, "হয় করে, নয় মিথ্যে কথা বলে।"

হৈমন্তী বলিল, "এ তোমার অন্যায় কথা ভাই। মানুষ সব রকমই আছে। সবাই তোমার শাস্ত্রও মেনে চলে না, মনীষার শাস্ত্রও মেনে চলে না।"

স্নেহলতা বলিল, "বাইরে না মানতে পারে, কিন্তু যোল-সতের বছর বয়স হয়েছে, অথচ মনে মনেও কিছু হয় নি, এমন যারা বলে তারা মিথ্যে কথা বলে। মানুষ ওরকম ভাবে তৈরিই নয়।"

সুধা বলিল, "তোমার ভালবাসা মানে কি? কাউকে কারুর একটু ভাল লাগলেই ভালবাসা হয়ে গেল? অমন ত কত মানুষকেই লোকের ভাল লাগে। পৃথিবীতে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্তই ধরতে গেলে ত আমরা মানুষকে ভালবাসি। তার জন্যে বয়স হবার দরকার করে না।"

স্নেহলতা বলিল, "তা কেন? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা। যার জন্যে বাপ-মাকেও ছেড়ে দেওয়া যায়, সেই রকম ভালবাসা। তুমি যেন আর কিছু বোঝ না?"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "যে তোমার সত্যি কেউ হয় না, তার জন্যে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে যাবে? এও কি কখনও হয়? যে অমন কাজ করতে বলে সে কখনও সত্যি ভালবাসে না।"

মনীষা এইবার গাল ফুলাইয়া বলিল, "দেখলে ত? এই কথা আমি বলেছিলাম ব'লে আমায় যা খুশী বললে নির্ব্বিবাদে।"

স্নেহলতা বলিল, "সুধা, তুমিও ভাই মনীষার মত খুকী সেজো না। সত্যি কথা বলতে তোমার ভয় কি? তোমায় ত কেউ গলা টিপে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে না?"

হৈমন্তী বলিল, "স্নেহ, মনীষার পেছনে অমন ক'রে লেগেছ কেন ভাই? ওর যা বিশ্বাস তা ও বলবে না? সব মানুষই নিজের মতকে সত্য ব'লে মনে করে।"

সুধা বলিল, "আমি খুকী সাজছি না ভাই। তোমার কথা ভাল ক'রে না বুঝে আমি জবাব দিতে পারব না। আমাকে ভেবে দেখতে হবে।"

স্নেহলতার আজ রোখ চাপিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "ভেবে আবার দেখবে কি? এত রোমিও জুলিয়েট, আইভ্যান হো, শকুন্তলা, উত্তরচরিত পড়লে আবার ভেবে না দেখলে বুঝতে পারবে না? তোমরা প্রমাণ করতে চাও যে আমি সকলের চেয়ে পাকা, আর তোমরা এখনও কেউ কিছু বোঝ না। সব 'ব্রেড এণ্ড বটর মিস'।"

এ-কথার কি জবাব দিবে সুধা ভাবিয়া পাইল না। সে কিছুই বোঝে না বলিলে সত্য বলা হয় না এবং স্নেহলতাও বিশ্বাস করিবে না, অথচ তাহার কথা সব ঠিক বুঝিয়াছে বলিলেও মিথ্যা বলা হয় এবং মনীষার প্রতি অন্যায় করা হয়। বাস্তবিকই তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গল্পের বইয়ে অনেক প্রেমের কথা সে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবের সহিত মিলাইতে কখনও সে চেষ্টা করে নাই। গল্পেতে সব জিনিষ বাড়াবাড়ি করিয়া লেখার একটা নিয়ম আছে, ইহাই সে ছেলেবেলা হইতে মানিয়া লইয়াছিল। স্নেহলতা শুনিলে চটিয়া যাইবে যে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অনেক প্রেমিক-প্রেমিকার বক্তৃতাই সুধার এক এক সময় পাগলের প্রলাপের মত লাগিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে অবশ্য সে বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। গল্পাংশটার দিকেই এ-সব সময় তাহার ঝোঁক থাকে বেশী, অন্য জিনিষগুলিকে অবান্তর ভাবেই সে গ্রহণ করিয়া গিয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। টিফিনের ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে। সকলে উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিতে লাগিল। ইতিহাসের পড়া আছে। মাষ্টার মহাশয় ঘণ্টার আগেই ক্লাসে আসিয়া বসিয়া থাকেন, কে কতখানি দেরী করিয়াছে সব লক্ষ্য করিবেন। বিবাহ বিষয়ে দারুণ তর্কযুদ্ধ আপাতত ধামা চাপা দিয়া সকলকে বই লইয়া ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের মহোন্নতির কথা চিন্তা করিতে হইবে।

মনীষা ও স্নেহলতার তর্কটা কিন্তু সুধার মনে গভীর

চিহ্ন রাখিয়া গেল। সে বহুদিন একথা ভুলিতে পারে নাই। শুধু যে ভোলে নাই তাহা নহে, সুধার চক্ষে ইহা যেন একটা নূতন অঞ্জন পরাইয়া দিল। সংসারে স্বামী-স্ত্রী রূপে যাহারা পরিচিত তাহারা যে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন গৃহ হইতে আসিয়া একত্রে নীড় বাঁধিয়াছে এ-কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সে জানে, কিন্তু তবু তাহার মনে একটা জন্মগত সংস্কার ও শিশুজনোচিত ধারণা ছিল যে মাতা পুত্র, ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ যেমন মানুষ ভাঙিতে গড়িতে পারে না, এই সম্বন্ধও সেই রকমই। বর-কন্যা পরস্পরকে বাছিয়া বিবাহ করিলে বেশী সম্মানার্হ হয়, কি তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে বিবাহ হইলে বেশী সম্মানার্হ হয় এ-কথা ভাবিয়া দেখিবার কারণ তাহার জীবনে ঘটে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজনের বিবাহ তাহার জ্ঞান বুদ্ধি হইবার আগেই হইয়াছে এবং প্রাচীন মতেই হইয়াছে। আধুনিক আর একটা বিবাহ-পদ্ধতি যে আছে, কলিকাতা আসিবার আগে সুধা তাহা জানিতই না। এখন যদিও জানে, তবু প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে এই পদ্ধতির যে একটা দারুণ বিরোধ থাকা খুব স্বাভাবিক সে-কথা কখনও সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। দুই পক্ষীয় লোকেরাই যে আপন আপন মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে তাহাও সুধার মনে আসে নাই। প্রাচীন পন্থাতে সে অভ্যস্ত ছিল, কাজেই মনে মনে খানিকটা প্রাচীনপন্থীই হয়ত সে ছিল। আজ অকস্মাৎ স্নেহলতার কথায় তাহার মনে হইল, স্বামী বলিয়াই স্ত্রীলোক যেমন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসে, তেমন ভালবাসে বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষকে বিবাহ করিতে সে চাহিতে পারে। দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কি রোমিও জুলিয়েট, ইত্যাদিতে যাহা সুধা পড়িয়াছে জগতে তেমন জিনিষ হয়ত সত্য সত্যই ঘটে। কিন্তু তবু অজানা অচেনা একজন মানুষকে এতখানি ভাল কি করিয়া বাসা যায় যাহাতে চিরজন্মের বন্ধু বাবা মা সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া সব ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যায়, বুঝিতে সুধার কষ্ট হইতেছিল। উপন্যাসে রোমান্সে যাহাই থাকুক, কিছু তাহার মধ্যে অতিরঞ্জিত নিশ্চয়। হৈমন্তী অবশ্য বন্ধু মাত্র, কিন্তু তাহাকে সুধা যেমন ভালবাসে তেমন ভালবাসা পৃথিবীতে নিশ্চয় কম দেখা যায়। তবু কই, হৈমন্তীর জন্য বাবাকে কিংবা পীড়িতা মাকে ফেলিয়া চিরদিনের জন্য কোথাও সে চলিয়া যাইতেছে এ-কথা ত সে ভাবিতে পারে না। নিজের শ্রেষ্ঠতম সুখও সে হৈমন্তীর জন্য ছাড়িতে পারে কিন্তু আজন্মের যাঁহারা প্রিয় ও আত্মীয় তাঁহাদের সে ছাড়িতে পারে না। তাহারা যে তাহার সকলের প্রথম।

আবার মনে হইল, তাহার বৃদ্ধ দাদামশায়ের কথা, কত আদরে মহামায়াকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, বৎসরান্তে দেখিবার জন্য কাছে পাইবার জন্য কি আগ্রহে পথের ধারে ছুটিয়া আসিতেন! আজ দিদিমা নাই, তবু মা কতকাল দাদামশায়কে একদিনের জন্যও দেখিতে যান না। এ কি শুধু মা'র অক্ষমতার জন্য, না মা'র মন এখন আপন সংসারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া? অবশ্য, দাদামশায়ই মাকে এ সংসারে জুড়িয়া দিয়াছেন, মা আপনি বাছিয়া লন নাই। যদি বিবাহ না দিতেন, হয়ত মা চিরদিনই রতনজোড়ে দাদামশায়ের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। তবুও মা'র এই পরিবর্ত্তনের কারণের ভিতর আর কিছু আছে কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার।

সুধা স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াই মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি তিন-চার বৎসর দাদামশায়কে দেখতে যাও নি, তোমার মন কেমন ক'রে না?"

মহামায়া কেমন যেন ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? এমন কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস? কোন খারাপ খবর আসে নি ত! বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল।"

সুধা তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিল, "না, না, খারাপ খবর কিছু আসে নি। তোমার বাবাকে দেখতে তোমার ইচ্ছে করে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।"

মহামায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "করে বইকি মা! বাপ-মায়ের মত জিনিষ সংসারে কি আছে? কিন্তু মানুষের মন যা চায় পৃথিবীতে সব সময় কি তাই পাওয়া যায়?"

মহামায়ার কাছে যা শুনিবে আশা করিয়া সুধা কথা পাড়িয়াছিল তাহা তিনি বলিলেন না, তাঁহার চিন্তা-ধারা অন্য পথে চলিয়া গেল। মহামায়া বলিলেন, "বুড়ো বয়সে বাপ-মায়ের সেবা করতে পাওয়া বহু জন্মের

তপস্যার ফল। আমি কি তেমন কিছু পুণ্য করেছি যে ও কাজ করতে পাব? সে পুণ্য করেছেন আমার দিদি। আমি এখন যেখানে যাব সেখানেই লোকের সেবা নেব। এ আমার গত জন্মের পাপের ফল, মা।"

মহামায়ার মনে এই দুঃখ বেদনা জাগাইয়া তুলিতে সুধা চায় নাই, সুতরাং এ-কথায় আর সে কথা যোগাইল না। একবার ভাবিল মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করে, "মা দাদামশায় যদি তোমার বিয়ে না দিতেন, তুমি কি নিজে থেকে বাবাকে বিয়ে করতে পারতে?" কিন্তু সুধার লজ্জা করিল, সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। সে জানিত, প্রায় শৈশবেই মহামায়ার বিবাহ হইয়াছিল এবং বাপ-মা ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়া সাত দিন ধরিয়া তিনি এমন কান্নাকাটি করিয়াছিলেন যে পাড়ায় তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। পাড়ার গৃহিণীরা নাকি বলিয়াছিলেন, "যে-মেয়ে বাপ-মাযের জন্যে এমন ক'রে কাঁদতে পারে, সে-ই স্বামীপুত্তুরকে সত্যি ভালবাসতে পারবে।"

এ-সকল গল্প সুধার মুখস্থ ছিল, কিন্তু ইহার অর্থ তলাইয়া বুঝিতে আগে সে চেষ্টা করে নাই। বাপ-মাকে যে এমন করিয়া ভালবাসে, সে অন্য কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিতে পারে না, এই ছিল তাহার শৈশবের একটা মোটামুটি ধারণা। এখন সে ধারণা আপনা হইতেই তাহার বদলাইয়া গিয়াছে। স্বামীকে ভালবাসা সে চোখে দেখিয়াছে এবং হয়ত খানিকটা বুঝিয়াছেও, কিন্তু স্বামী নির্ব্বাচন করা জিনিষটা কাব্য উপন্যাসের বাহিরে কখনও সে ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়া দেখে নাই। স্নেহলতারা যে তর্ক তুলিয়াছে তাহা আবার সাদাসিধা নির্ব্বাচনের অপেক্ষাও জটিল। ধরা যাক্, সুধার বাবা মা একটি বর নির্ব্বাচন করিয়া সুধাকে বিবাহ করিতে বলিলেন এবং সুধা তাঁহাদের অপ্রিয় আর একজনকে বিবাহ করিতে চাহিল। তাহা হইলে জিনিষটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? সুধা মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, বাবা-মার যাহা পছন্দ নয় এমন কোন জিনিষ সচরাচর তাহার পছন্দ হয় না, সে যেন আপনার পছন্দ ও রুচিকে তাঁহাদেরই ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাদের অপ্রিয় একটা মানুষকে অকস্মাৎ সে পছন্দ করিয়া বসিবে কি করিয়া? কি জানি, দিনে দিনে মানুষের কত পরিবর্ত্তনই হয়, হয়ত একদিন এমনই অভাবনীয় একটা ব্যাপার তাহার জীবনেও ঘটিয়া বসিতে পারে। আজ পর্য্যন্ত তাহার ত বিশ্বাস যে সে তাহার পিতামাতারই মিলিত মনের একটি নূতন সংস্করণ মাত্র। তাহার নিকট ভাল ও মন্দ বলিতে যে দুইটি বিভাগ, তাহা পিতামাতার ভাল-মন্দ বিভাগের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। কিন্তু এমনও ত হইতে পারে এবং তাহা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পৃথিবীর অনেক জিনিসই সে জানে না, সে বিষয়ে ভাল-মন্দ কি তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার হয় নাই। সেই সব ক্ষেত্রে গিয়া পড়িলে সে কি করিবে? পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে সে পারিবে কি? হইবার কোনও গোপন সম্ভাবনা তাহার চরিত্রের ভিতর লুকাইয়া আছে কি?

কিন্তু এ-সকল কথা খুব বেশী সুধা ভাবিতে পারিত না। তাহার জীবনে এই চিন্তার প্রয়োজন এমন জরুরি ছিল না যে ইহা লইয়া সারাক্ষণ সে মাথা ঘামায়। বন্ধুপ্রীতির বিমল আনন্দে তাহার মনটা ছিল ভরপুর, তাহার উপর কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সে ছিল আপনার প্রতি অতি নিষ্ঠুর। এই দুইটি কোমল ও কঠিন বন্ধনে সে আপনাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার ভিতর ভবিষ্যতের ভাবনার বিশেষ স্থান ছিল না। বন্ধুরা তাহার দৃষ্টিটা এই দিকে খুলিয়া দিয়াছিল মাত্র।

(ক্রমশঃ)

মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

স্বর্গীয় পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুতিথি আসন্ন। তাঁহার অনেক কথা আজ মনে হইতেছে। এক দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ, এই হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী আর্যভূমিতে বাস করিবার সময় উভয়েরই সহিত এই লেখকের একটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহারই ফলে হয়তো এমন কয়েকটি কথা আমার জানিবার সুবিধা হইয়াছিল যাহা অন্যে জানেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এইরূপই কয়েকটি কথা আজ লিখিতেছি। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, অথবা যাঁহারা জানেন না, উভয়েই ইহাতে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বড় রসিক ও পরিহাসশীল ছিলেন। একবার পূজাবকাশে আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। সে বার পূজা হইয়াছিল কার্তিক মাসে। দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা ছিল একখানি খামের মধ্যে। খামখানি ছিঁড়িয়া পত্রের প্রথমেই ডান দিকে তারিখের সংখ্যার পরে দেখিলাম সারি সারি ছয়টি মুণ্ড আঁকা রহিয়াছে। তাহার পর সালের সংখ্যা। কী বিচিত্র! উহার মানে কী? আমার বুঝিতে দেরী হইল না। ঐ ছয়টি মুণ্ডে দ্বিজেন্দ্রনাথ কার্তিক মাস বুঝাইয়াছেন। কার্ত্তিকের একটি নাম ষড়ানন। ইহাই হইল তাঁহার ঐ কৌতুকের মূলে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙ্‌লার রেখাক্ষর লইয়া দীর্ঘকাল, এমন কি শেষ সময় পর্যন্ত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই রেখাক্ষরের এক-একটি কবিতায় তাঁহার পরিহাস-প্রিয়তা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ইহার একখানি আমাকে দিয়াছিলেন। ইহাতে আমার নামের পূর্বে একটি চমৎকার বিশেষণ বসাইয়াছিলেন। তাহা এই—"নিখিল শাস্ত্রপারাবারের অগস্ত্য মুনি।" বলা বাহুল্য পাঠকের বুঝিতে দেরী হইবে না, উহার অর্থ হইতেছে, অগস্ত্য মুনি যেমন এক চুমুকে সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তিও তেমনি সমস্ত শাস্ত্র অধিকার করিয়া শেষ করিয়াছে!

দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। তিনি নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাথাও ধরে নাই। পরে একবার তাঁহার গুরুতর পীড়া হয়। তিনি নিজের আমলককুঞ্জে (নীচু বাঙ্‌লায়) ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে ঐ অসুস্থাবস্থায় তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের অতিথি-শালার দোতালার উপর আনা হয়। তাঁহার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেই ইহা হইয়াছিল। রোগ যখন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল তখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করান স্থির হয়। তদনুসারে রেলগাড়ীর উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত ঠিকঠাক। কিন্তু তাঁহাকে যখন ইহা জানান হইল তিনি একেবারেই বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই তিনি যাইবেন না। তাঁহার ডাক্তারী চিকিৎসায় একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিলেন, "তোমরা ত আমাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু এমন (অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের মত) atmosphere সেখানে কোথায়?" যখন তিনি কলিকাতায় আসিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, তখন মিথ্যার আশ্রয়ে আনিবার চেষ্টা হইল। তাঁহাকে বলা হইল, ভাল, তিনি না-হয় কলিকাতায় না-ই যাইবেন। কিন্তু তাঁহার নিজের আমলককুঞ্জে গেলে ভাল হয়। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। এই সুযোগে তাঁহাকে মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া একেবারে ষ্টেশনে আনিয়া রেলগাড়ীতে উঠান হয়, এবং এইরূপে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে নিজের বাড়ীতে আনা হয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তিনি ভাল হইয়া উঠেন, কিন্তু দুর্ব্বল ছিলেন বহুদিন পর্য্যন্ত।

এই সময়ে আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে গুরুদেবের

(পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের) কাছে উপস্থিত হই। ইচ্ছা ছিল, গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরে বড় বাবু মহাশয়ের (আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথকে বড় বাবু মহাশয় বলিতাম) নিকট যাইব। তিনি কিন্তু ইহারই মধ্যে আমার সেখানে আসার কথা শুনিয়াই চাকর পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন যে, আমি যেন অবিলম্বে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি ভিতর বাড়ীতে খুব বড় একখানি খাটে শুইয়া আছেন। আমি ঘরে ঢুকিতেই খাটের উপরে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আসুন শাস্ত্রী মহাশয়, আসুন। শুনুন, আমি এক শ্লোক রচনা করিয়াছি।" এই বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে যে কি হাসি, তা যে তাঁহার হাসি না শুনিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। নীচু বাঙ্‌লায় তাঁহার হাস্যশব্দ আমরা বর্ত্তমানের 'আদি কুটীরে'র কাছে শুনিতে পাইয়াছি। তিনি তখন আমাকে ঐ খাটের একপাশে বসাইয়া শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

ডাক্তারা বহবঃ সন্তি patientকে দগ্ধে-মারিণঃ।
দুর্লভাস্তে তু ডাক্তারাঃ patientকে শান্তিদায়িনঃ॥

শ্লোক পড়িয়াই আবার সেইরূপ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। ইহা থামিতে একটু সময় লাগিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ডাক্তারদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না, ঐ শ্লোকে তাহাই কেমন চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এই রচনাটি হইতেছে নিম্নলিখিত শ্লোকটির পরিহাসাত্মক অনুকরণ (parody):

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
গুরবো দুর্লভাস্তে তু শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃতেও এইরূপ দুই-একটি কবিতা রচনা করিতেন। তিনি একখানি চিরকুটে লিখিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন—

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি যে শ্লোকটার দুই চরণ আপনাকে শুনাইয়াছিলাম, তাহার চারি চরণ পূরণ করিয়া দিলাম, যথা—

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ, পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥
নিশয়া চ শশী শশিনা চ নিশা, নিশয়া শশিনা চ বিভাতি শরৎ।
রবিণা চ বিধুর্বিধুনা রবী রবিণা বিধুনা চ বিভাতি জগৎ॥

কেমন হইল এবার?"

"পয়সা কমলং" হইতে "বিভাতি করঃ" এই পর্য্যন্ত একটি সম্পূর্ণ শ্লোক, ইহা প্রাচীন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহাকেই দুই চরণ ধরিয়া শেষের নিজ কৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটিকে অপর দুই চরণ বলিয়া ধরিয়াছেন। "রবিণা" হইতে "জগৎ" পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি যে আর একটি অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা কেহ কেহ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তিনি সুললিত বাঙ্‌লায় পদ্যে এই কবিতা দুইটির অনুবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অনেক সময়ে অনেক আলোচনা হইত। অন্যান্য নানা কাজে আবদ্ধ থাকিতে হইত বলিয়া সব সময়ে তাঁহার কাছে আমার যাওয়া সম্ভব হইত না। তিনিও ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই অনেক সময় ছোট ছোট চিরকুটে আমাদের প্রশ্নোত্তর চলিত। তিনি যে সব চিরকুট পাঠাইতেন তাহাদের অনেকের মধ্যে বড় চমৎকার কথা থাকিত। ওগুলি যত্ন করিয়া রাখিলে খুব ভাল হইত। খানকতক মাত্র আছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

(১)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি খুব জানি যে, আপনার মতো সাধুসজ্জন ব্যক্তিরও সহিষ্ণুতার সীমা আছে, এই জন্য এবারে আমার বক্তব্যটা অতীব সংক্ষেপে সারিলাম। সে কথা এই:—

আপনি যদি পক্ষপাতিতা দোষ গায়ে মাখিয়া লইয়া কালিদাসের রৈয়ম্বকের ব্যালা খা'ন, এবং করগুবের ব্যালা আমার প্রতি খড়্গহস্ত হন—তবে আমি নাচার।

নাছোড়বন্দ দ্বিজ।"

একটা শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন।

(২)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আপনার চতুষ্পাঠীর বিদ্যাভূষণরা যদি মাঝের

ফুটনোটটির ভাবার্থ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখেন তবে আমি সুখী হইব।"

(৩)

আমাদের মধ্যে একটা তর্ক বাধিয়াছিল। ইহাতে আমার মন্তব্য পাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"তাড়াতাড়িতে ঠিক শব্দটা সহসা মাথায় যোগাইল না বলিয়া গতকল্য আমি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম 'আপনার টিপ্পনীর জ্বালায়' ইত্যাদি; এক্ষণে দেখিতেছি যে, ওরূপ একটা অযোগ্য শব্দ যে লেখনী দিয়া বাহির হইয়াছে সে লেখনীকে আগুনে জ্বালাইয়া ভস্ম করাই উচিত বিধান। উহার পরিবর্ত্তে আমার উচিত ছিল বলা 'আপনার টিপ্পনীর উত্তেজনায়—।' আপনাকে বলা বাহুল্য যে, গতস্য শোচনা নাস্তি। বিন্দুবিসর্গশিরস্ক চারি ছত্রের মধ্যে বদলাইবার যদি কিছু দেখেন বলিবেন।"

(৪)

"দেশীয় দর্শনের কথা-বার্ত্তার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিতে দেশীয় দর্শনের পরিভাষার জঙ্গল পরিষ্কার করা বড্ড আবশ্যক। জঙ্গল কিরূপ তাহার নমুনা দেখাইতেছি। প্রকরণ ও প্রকৃত শব্দের দার্শনিক অর্থ কী? প্র—করণ= প্র+করণ। করণ শব্দের মুখ্য অর্থ যাহা দ্বারা অভীষ্ট সাধন করা হয়। প্রকরণ শব্দের মুখ্য অর্থ তাই অভীষ্ট সাধনের প্রণালী পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমরা [বলি] বর্ত্তমান প্রকরণে এ-কথা আলোচনা যোগ্য নহে বা এ কথায় প্রকরণ ভঙ্গ বা অপ্রকৃত প্রসঙ্গ হয় বা এ কথা প্রকরণ বিরুদ্ধ, তখন প্রকরণের মুখ্য অর্থ বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আমার জিজ্ঞাস্য এখানে প্রকরণের গোড়ার অর্থের সঙ্গে শেষের অর্থের মিল কিরূপ? "মিল নাই" বলিলে আমি ছাড়িব না। আর ঘট-কচু-ভামনী ন্যায়ানুযায়ী অর্থেও প্রবোধ মানিব না। প্রস্থান শব্দের দার্শনিক অর্থ কী? সেটাও জানিতে ইচ্ছা করি। ইংরাজীতে যাহাকে বলে stand-point তাহাই কি প্রস্থান শব্দ বুঝায়?"

(৫)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

৯ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যদি লেখনীর দুই এক আঁচড়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন—আর বেশী কোনো কিছু বলিবার থাকিলে লেখনীটাকে তদুপযুক্ত বেশী দৌড় দেওয়ান, তবে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিব।

চাতক দ্বিজ।"

(৬)

আমার একটা উত্তর দিবার অথবা তাহার কাছে যাইবার কথা ছিল, তাহা না হওয়ায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

"গরজিল মেঘ, দিল না ধারা।
চাতক হইল ভাবিয়া সারা॥"

(৭)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি পাততাড়ি গুটাইবার উদ্যোগ করিতেছি। আপনি ৪৭ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিব। বিশেষত, দুর্বোধ্য অংশগুলি কিরূপে সুবোধ্য করা যাইতে পারে তাহার উপায় যদি বাৎলাইয়া দেন, তবে আমার কৃতজ্ঞতার ফোয়ারা খুলিয়া যাইবে।"

(৮)

"শাস্ত্রীমহাশয়,

আবার আমি হাঁড়ি চড়াইলাম। রান্না কেমন হ'চ্চে—একটু আস্বাদন করিয়া দেখিয়া লবণাদির পরিমাণ ঠিক হইয়াছে কিনা আমাকে এই বেলা বলুন। লবণাদির আতিশয্যে বা ন্যূনতায় রান্না মাটি না হইয়া যায় সেই বিষয়টিতে পূর্ব্বাহ্ণে সাবধান হওয়া পাচকের অতীব কর্ত্তব্য।"

(৯)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

শাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে কেবল আত্মাই অসঙ্গ আর সবই সসঙ্গ। বস্তু সকলের পরস্পরের সঙ্গ-মিলনকে (সম্মিলন বলিলাম না তাহার কারণ এই যে সম্মিলিত বস্তু অনেক সময় একীভূত হইয়া যায়—যেমন দুই শিশির বিন্দু এক শিশির বিন্দু হইয়া যায়) ইংরাজী ভাষায় বলে "association". Associationএর দেশী শব্দ আমার দরকার হইয়াছে—আপনি যদি সংস্কৃত শাস্ত্রে association শব্দের অনুরূপ শব্দ পাইয়া থাকেন তবে তাহার মূল্য আমার কাছে বেশী। আর ফস্ করিয়া Monier Williams-এর

পাতা উল্টাইয়া যদি association-এর একটা প্রতিশব্দ আমাকে গছাইয়া দেন তবে তাহার মূল্য আমার কাছে কম। কিন্তু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—যেন. তেন প্রকারেণ একটা সুরুচিসঙ্গত এবং বিজ্ঞানসঙ্গত প্রতিশব্দ আমাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

(১০)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আপনি আমাকে "প্রত্যভিজ্ঞানের" সংজ্ঞা যাহা দেখাইলেন তাহার সমস্তটা আমাকে যদি লিখিয়া পাঠা'ন্ তাহা হইলে আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিব।

আপনাকে বিরক্ত করণেওয়ালা

Old man of the Mountain."

(১১)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আপনারা আমাকে বলপূর্ব্বক মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়া তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত করাইতেছেন—গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতেছেন—এখন ইহার তাল সাম্‌লান্। তীর্থপর্যটক ক্ষিতিমোহন আয়ুর্বিদাং বরঃ পাণ্ডা হইয়া যাত্রীগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন ইহার অর্থ এই যে আপনাদের মতো লোকের সংসঙ্গের বাতাস গায়ে লাগিলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে।"

উল্লিখিত ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন।

(১২)

ওঁ

"শাস্ত্রী মহাশয়,

সুদুর্দান্ত ক্ষিতিমোহন আয়ুর্বেদী কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন নর্ম্মদা কাবেরী গোদাবরী প্রভৃতি সারা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এখনও তার তীর্থযাত্রার আশা মেটে নাই—এই মাত্র তিনি কালিঘাটাভিমুখে পদব্রজে রওনা হইলেন। তাঁহাকে পেরে ওঠা ভার, তিনি গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন—শান্তিনিকেতনের শান্তিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিহারা পরিব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাকে গীতার এই শ্রেয়স্কর বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দ্যান যে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ তবে বড্ড ভাল হয়, তাঁর আশা আমি পরিত্যাগ করিলাম। আপদ্‌ধর্ম্মের বিধি অনুসারে আপনি [যদি] ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে নীচে নাবিয়া উপস্থিত পাণ্ডাগিরি কার্য্যটির ভার গ্রহণ করেন তবে আমি আপনাকে first prize প্রদান করিতে রামানন্দ বাবুকে অনুরোধ করিব।

অনন্যোপায় দীন দ্বিজ।

পুনশ্চ দিনুকে ভুলিবেন না।"

পর্যটনপটু বন্ধুবর ক্ষিতিমোহন অনেক সময় তাঁহার কাছে যাইতে পারিতেন না, ইহাই এই পত্রের বিষয়। উল্লিখিত রামানন্দ বাবু হইতেছেন 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সেই সময়ে তিনি কৌতুক করিয়া শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে কয়েকটা পুরস্কারের ঘোষণা করেন, তাহার বিচারের ভার ছিল রামানন্দ বাবুর উপর। পত্রে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। দিনু হইতেছেন স্বর্গীয় সুহৃদ্বর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার পৌত্র।

(১৩)

"অনিল

শাস্ত্রী মহাশয়,

যদি বসুন্ধর ধন্বর্দ্ধর মহাশয়কে এবং গুণ্ গুণ্ কারী তোমরা ভীমরাওকে টানিয়া আনেন অথবা তুমি টানিয়া আনো তবে ভাল হয়—বসুন্ধর মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি সকালে আসিবেন।"

এই পত্রে বসুন্ধর শব্দে ক্ষিতিমোহন বাবুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ক্ষিতি স্ত্রীলিঙ্গ, তাই বসুন্ধরা। কিন্তু আমাদের ক্ষিতি অর্থাৎ ক্ষিতিমোহন বাবু পুরুষ, তাই তিনি হইলেন বসুন্ধর। অনিল হইতেছেন তাঁহার সেক্রেটারী স্বর্গীয় বন্ধু অনিলকুমার মিত্র। এই চিরকুটখানি লিখিয়া অনিল বাবু অথবা আমাকে দিবার জন্য তিনি চাকরের হাতে দিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী সাঙ্খ্যতীর্থ ঐ সময়ে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতের অধ্যাপক ছিলেন। ভীমরাও নামে তাহাকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ইঁহাকে অনেক সময়ে ছোট পণ্ডিত বলিতেন, বড় পণ্ডিত ছিলাম আমি।

(১৫)

"ওঁ বিষ্ণু—বড্ড একটা ভুল করিয়াছি। বৈদ্য তিন

শ্রেণীতে নহে পরন্তু চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুর্থ শ্রেণী হচ্চে গোবৈদ্য। গোখোর পণ্ডিতব্যাঘ্রের শিষ্য—এই অর্থে গোবৈদ্য। ইঁহাদের মতে কুইনাইন হইতেছে সর্ব্বরোগ-হরৌষধি। ইঁহারা কালেজের লেজ ধরিয়া ভীষণ প্রতাপে বাহির হইয়া গোগদ্দভমহলে প্রবেশ করেন। ইঁহাদের রাক্ষসী চিকিৎসায় রোগভোগী বেচারাদিগের জীর্ণ-শীর্ণ দেহে জ্বর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীত্যাগ হইয়া যাইতে একটুও বিলম্ব হয় না।"

এই চিরকুট খানি লিখিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর এক খানি লিখিয়াছিলেন। উহা হারাইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সংশোধন করিয়া ইহা লিখিয়াছিলেন। আমার উত্তর লিখিয়া পাঠাইতে পাঠাইতে কখনো কখনো তাঁহার তিন চার খানি পত্র উপর্য্যুপরি আসিয়া পড়িত। ইহাও সেইরূপ। ডাক্তারী চিকিৎসায় তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই পত্র খানিতেও তাহা দেখা যাইতেছে।

পূজ্যপাদ গুরুদেবও (রবীন্দ্রনাথ) এক সময়ে একটি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, শান্তিনিকেতন আশ্রমে কেবল ইস্কুলই ছিল। সেই সময়ে বোলপুর হইতে একজন ডাক্তার প্রতিদিন আশ্রমে আসিয়া রোগীদের দেখাশুনা করিতেন। আশ্রম হইতে তাঁহাকে একখানা বাইসাইকেল দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তারটির উপর গুরুদেবের তেমন বিশ্বাস ছিল না। ইহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, যমের আসিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু সাইকেলে চড়িয়া যমদূতের আসিতে বিলম্ব হয় না।

(১৫)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আপনি সন্ধ্যার পূর্বে এখানে আসিলে আমি বড়ই সুখী হইব।

এই সুযোগে প্রকৃত কথাটা তবে আপনাকে ভাঙিয়া বলি।

মঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতা আপনাদের সৎসঙ্গের বাতাসে আমার উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকে অতবড় একটা শ্রেয়ঃ পথের প্রদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন আর সেই সঙ্গে আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙিয়া দিলেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

এই অহঙ্কারের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। আমি এটা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আপনাদের সৎসঙ্গের সাহায্য ব্যতিরেকে আমি অমনধারা উচ্চ অঙ্গের লেখা এক কলমও লিখিতে পারিতাম না। আমি একজন আদার ব্যাপারী রেখাক্ষরের চুটকি কবিতা লিখিয়া সরস্বতীর পদে বিনিয়োগ করি, কিন্তু ইহাই আমার পক্ষে ঢের।"

ইহাতে যে লেখার কথা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকা। ইহা তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতার আকারে শান্তিনিকেতনে পাঠ করিয়াছিলেন।

(১৬)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি চোকে দেখতে পাই নে ব'লে লেখাটা ছড়িভঙ্গি হইয়া গিয়াছে, কীরূপ আপনার লাগে বলিবেন।

নারিকেলের মতো অমন একটা রসালো ফলের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে অসামঞ্জস্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া জগজ্জননী প্রকৃতির উপরে আমার অভক্তি জন্মিয়াছে। অন্তরঙ্গ কোমল হইতে কোমলতর, বহিরঙ্গ কঠিন হইতে কঠিনতর—এটা কি ভাল?

উত্তর (প্রথমটা যেমন আছে তেমনি থাকিবে। তাহার পরে সর্ব্বশেষে বসিবে এইরূপ) শাস্ত্রে বলে যে জনক রাজা প্রভৃতির ন্যায় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের অনন্যসাধারণ লক্ষণ একটি এই যে, তাঁহারা বাহিরে কর্ত্তা ভিতরে অকর্ত্তা। ইহার নিগূঢ় অর্থ যিনি বোঝেন—নারিকেলের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে ওরূপ বৈশাদৃশ্য ঘটিবার কারণ বুঝিতে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না।"

(১৭)

"শাস্ত্রী মহাশয়,

ধূমকেতুর ল্যাজের ন্যায় সূক্ষ্ম শরদভ্রের ন্যায় বাষ্পীয় পদার্থকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন "nebulous matter," neb=নভ=আকাশ। কিন্তু অম্বর (আকাশ), অম্বু, এবং অম্ভঃ এই তিন শব্দের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানঘটিত খুব

নিকট সম্বন্ধ। আকাশ জলগর্ভ অভ্রনিচয়ের আধার এই অর্থে অম্বর। nebulous matter এক প্রকার সূক্ষ্ম শরদভ্রের ন্যায় পদার্থ নভ-ল পদার্থ। nebulous matter. বৈজ্ঞানিক মতে নাক্ষত্রিক এবং সৌর জগতের আদিম উপাদান। nebulous matterকে আমি বাঙ্‌লায় বলিতে চাহিতেছি—নভিল পদার্থ। ল অক্ষর অনেক সময়ে বিশেষ্যকে বিশেষণে উঠাইয়া দ্যায়—কখনও কখনও বিশেষণকে দোমেটে করিয়া দেয়। যেমন ফেন—ফেনিল, এস্থলে ফেন বিশেষ্য ; বহু—বহুল, এখানে বহু একমেটে বিশেষণ, বহুল দোমেটে বিশেষণ। ফেন হইতে যেমন ফেনিল হইয়াছে, neb হইতে তেমনি nebulous হইয়াছে। নভ হইতে তেমনি বিধান মতে নভিল হইতে পারে। লান্ত শব্দের এইরূপ অর্থের আর কয়েকটি উদাহরণ। যাহা চলে তাহাকে যেমন চল পদার্থ বলে, তেমনি যাহা সরে তাহাকে সর পদার্থ বলা যাইতে পারে। কফ কাশী যখন গলা দিয়া নাক দিয়া বেশ সরে, তখন আমরা বলি যে তাহা সরল হইয়াছে। সর+ল =সরল। পুনশ্চ সরল=সরিল যেমন ফেনল=ফেনিল। সর+ল=সরল=সরিল=সলিল। স্থ=স্থূল স্থাবর পদার্থ। স্থ+ল=স্থল=স্থূল। জ=ল=জল। জল বাষ্প হইতে বা মেঘ হইতে জন্মায় এই অর্থে জ-ল। স্থল, স্থির থাকে এই অর্থে স্থল ; স্থূল পদার্থও এইরূপ অর্থে স্থূ-ল (= স্থল)।”

ইহা লিখিবার পরে সঙ্গে সঙ্গেই আবার লিখিয়াছিলেন—

“শাস্ত্রী মহাশয়, আর একটা উদাহরণ আমার মনে পড়িল।

Circular=চক্রিল হ'তে পারে সহজে।”

এইরূপ তিনি বহু বহু লিখিয়াছিলেন, যত্ন করিয়া রাখিলে কাজে লাগিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা আমি করি নাই।

তিনি আমাদের সঙ্গে কেমন আলোচনা করিতেন ইহাতে তাহা জানা যাইবে। আজ এই প্রসঙ্গে এক দিনের ঘটনা মনে হইতেছে। আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারিতাম না দেখিয়া কখনো কখনো তিনি নিজেই আমাদের কাছে আসিতেন। এক দিন প্রাতে বেলা প্রায় দশটা এগারটার সময় আমি আমাদের গ্রন্থাগারে ছিলাম। তিনি তখন বেড়াইতে পারিতেন না। একখানি রিক্‌শাতে করিয়া তিনি নীচের বারান্দার কাছে শালগাছের নীচে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আসিলাম। তিনি রিক্‌শাতেই বসিয়া আমার সঙ্গে একটা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেদিন একটা বড় রকমের তর্ক হইল। ক্রমশ তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন—যদিও আমি খুব সংযত, ধীর ও সাবধানে উত্তর দিতেছিলাম। শেষে এমন হইয়াছিল যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। আজ ইহা মনে পড়ায় কষ্ট হইতেছে। পাঠকেরা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, যদিও ঐরূপ ঘটিয়াছিল তথাপি তিনি সেজন্য আমার উপর বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হন নাই।

সন্তরণের অ, আ, ক, খ

শ্রীশান্তি পাল

সন্তরণ-শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই দো-হাতি পাড়ির সাহায্যে অর্থাৎ দুই হাত মাথার উপর দিয়া নিক্ষেপ করিয়া সাঁতার দিতে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষার্থীর পাড়ি সুষ্ঠু না হইলেও ক্ষতি নাই। নিয়মিত অভ্যাস করিতে করিতে পাড়ি আপনিই সুষ্ঠু হইয়া আসিবে। বুক-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার বা অন্যান্য ধরণের সাঁতার পরে শিক্ষা করিলেই ভাল হয়। ভেলা, লাইফ-বেল্ট বা অন্য কোন সাহায্য লইবেন না।

শিক্ষার্থী সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন, শিক্ষাকালে দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ (চিত্র ১ ও ২, ক—ক) এবং ঐরূপে বাম
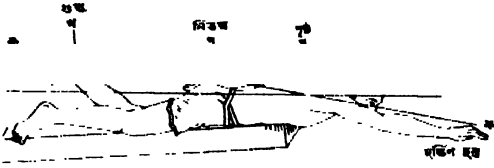
১ নং চিত্র
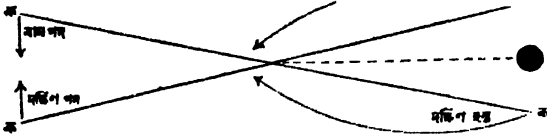
২ নং চিত্র

হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের বরাবর মিল রাখিয়া শরীরকে যত দূর সম্ভব (চিত্র ১ খ, গ, ঘ) ভঙ্গীতে জলের উপর ভাসাইয়া, মধ্যে মধ্যে মাথা ডুবাইয়া (বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সাঁতার দিতে চেষ্টা করিবেন। এই মিলযুক্ত পাড়ির দ্বারা যে-কোন আধুনিক উন্নত দ্রুত পাড়ি ইচ্ছা করিলে সহজেই বসাইতে পারা যায়। শিক্ষার্থীর যদি ঐ মিলযুক্ত পাড়িতে জলে সাঁতার দিতে অসুবিধা হয়, অর্থাৎ ১ নং চিত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক মিল না আসে, তাহা হইলে স্থলের উপর একখানি সরু বেঞ্চিতে গদি সংলগ্ন করিয়া ১ নং চিত্র অনুযায়ী অভ্যাস করিবেন। দোষদুষ্ট পাড়ি বা ভঙ্গীতে (৩ নং চিত্র) প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও বড় সাঁতারু হওয়া যায় না। অধিক অভ্যাসের ফলে ঐরূপ দোষযুক্ত ভঙ্গীতে ছোট ছোট
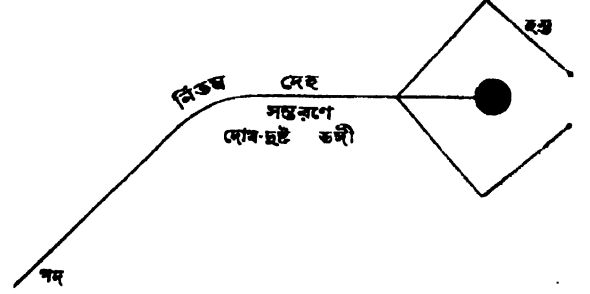
৩ নং চিত্র

প্রতিযোগিতায় কোন কোন ক্ষেত্রে জয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাঁতারের দম বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না ; এবং অধিক দূর পথও স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় না।
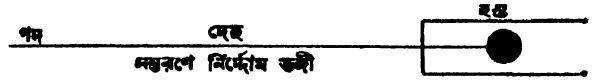
৪ নং চিত্র

শরীরের সুষ্ঠু ভঙ্গী ৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। সন্তরণ কালে সর্ব্বদাই ঐরূপ নির্দোষ দেহভঙ্গী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অধিকক্ষণ জলে থাকিতে বা অধিক দূর পথ সাঁতার কাটিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে শ্বাস-যন্ত্র দুর্ব্বল ও স্বাভাবিক দেহবৃদ্ধি ক্রমে হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে।

সরল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—সকলেরই জানা আছে, মানুষকে সাঁতার-কাটা শিক্ষা করিতে হয়, অথচ গরু মহিষ কুকুর প্রভৃতি জন্তু জন্মিয়াই অনায়াসে জলে ভাসিতে ও চলিতে পারে। এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ আমাদের জানা আবশ্যক। মোটামুটিভাবে বলা চলে,—জগতের যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;

(১) কাঠ, সোলা প্রভৃতি জিনিষ, সমান আয়তনের জল অপেক্ষা লঘু ও সেই কারণে জলে ভাসে; (২) লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি পদার্থ সমান আয়তনের জল অপেক্ষা ভারী, সেই কারণে জলে ডুবিয়া যায়। কিন্তু যদি লোহাকে বা ঐরূপ কোন ভারী পদার্থকে পিটিয়া, চেপ্টা করিয়া বাঁকাইয়া নৌকার খোল নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার আয়তন জোর করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং তখন তাহা স্বচ্ছন্দে সোলা বা কাঠের মত জলে ভাসিতে থাকে। সেই জন্যই লোহা দ্বারা জাহাজ নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। ভাসমান পদার্থের এই সাধারণ নিয়ম মানুষের শরীর সম্বন্ধেও খাটে।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন, মানুষের শরীর জল অপেক্ষা লঘু; অন্যান্য জীবজন্তুর শরীরও তাই, এবং সেই জন্য তাহারা উভয়ে স্বভাবতই জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মানুষের বেলায় বিপদ হইয়াছে তাহার মাথাটি লইয়া। দেহের মধ্যে তাহার মাথার দিকটা জল অপেক্ষা আয়তনের অনুপাতে কিঞ্চিৎ ভারী; সুতরাং মানুষের শরীরকে জলে ছাড়িয়া দিলে মাথা এবং পা ঝুলিয়া নীচের দিকে চলিয়া যাইবে; বুক ও পেটের কিয়দংশ জাগিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাতে ত মানুষ বাঁচিতে পারে না, দম বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। সেই জন্য কি করিয়া মাথা জাগাইয়া রাখিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারা যায়, তাহা মানুষকে শিক্ষা করিতে হয়। জীব-জন্তুর সুবিধা এই, তাহাদের মাথার দিকটা মানুষের মত ভারী নহে। তাহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে মাথা জলের উপর স্বভাবতই জাগিয়া থাকে। সেই জন্য তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কোনও অসুবিধা হয় না।

চিৎ-সাঁতার—আধুনিক উন্নত প্রণালীর চিৎ-সাঁতার শিক্ষা করিতে হইলে সাঁতারু প্রথমতঃ দেহটিকে ১ নং চিত্র অনুযায়ী জলপৃষ্ঠে ঋজুভাবে ভাসাইয়া রাখিবেন। তার পর
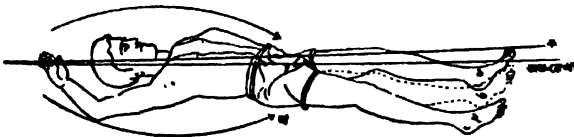
চিৎ-সাঁতার ১নং চিত্র

যে ভাবে ছয়পদী, আমেরিকান কিংবা অষ্ট্রেলিয়ান ডুব্ পাড়ির ভঙ্গীতে সাঁতার কাটা হয়, অবিকল সেই ভাবে চিৎ হইয়া একটির পর একটি হাত মাথার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া তালুদ্বারা উরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত জল টানিবেন। এই সময় যে-হস্তে জল টানা হইতেছে সেই হস্তের কনুইটি শক্ত রাখিবেন, যাহাতে জল টানিবার সময় হাতে জোর পাওয়া যায়। পা-দুটি ছয়-পদী ডুব্ পাড়ির অনুকরণে—এখানে ছয়-পদী ডুব্-পাড়ির চিত্র দেওয়া হইয়াছে,—দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদের মিল রাখিয়া, (চিত্র ১, ক—ক) দক্ষিণ পদের একটি জোর ও দুইটি অপেক্ষাকৃত মৃদু আঘাত দিয়া (দক্ষিণ, বাম, দক্ষিণ অর্থাৎ ২, ১, ৩) অথবা বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া, সাঁতারুর সুবিধা অনুযায়ী বাম পদের একটি জোর ও দুইটি অপেক্ষাকৃত মৃদু আঘাত দিয়া (বাম, দক্ষিণ, বাম অর্থাৎ ১, ২, ৩) মোট দুই পায়ের ছয়টি আঘাতের সহিত দুই হাত পরিবর্ত্তিত ভাবে মাথার উপর দিয়া (চিত্র ১ ক—খ) উরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত জল টানিবেন।

এই চিৎ-সাঁতার ভিন্ন ভঙ্গীতেও কাটা সম্ভব। ১ নং চিত্র অনুযায়ী দেহটিকে পূর্ব্ববৎ জলপৃষ্ঠে ভাসাইয়া অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ান ডুব-পাড়ির ন্যায় দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ এবং বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া, অথবা আমেরিকান ডুব্-পাড়ির ন্যায় অবিরাম পদদ্বয় উপর নীচে করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হাত দুটি মাথার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া সাঁতার কাটিতে পারা যায়। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন, যেন সন্তরণ-কালে বুক ও চিবুকের কিয়দংশ জলপৃষ্ঠের উপরে এবং মস্তকের অর্দ্ধভাগ জলপৃষ্ঠের নিম্নে অবস্থান করে। মোটামুটি ভাবে শরীরকে যত দূর হাল্কা করা সম্ভব তত দূর করিবেন। এই চিৎ-সাঁতারের নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-প্রণালী অবিকল ডুব্-পাড়ির ন্যায়, অর্থাৎ সাঁতারু নিজ সুবিধা অনুযায়ী এক হস্তের সহিত প্রশ্বাস গ্রহণ ও অপর হস্তের সহিত নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। এই ধরণের চিৎ-সাঁতার অতি আধুনিক ও প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক।

পুরাতন প্রণালী—এই ধরণের চিৎ-সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারু প্রথমতঃ দেহটিকে ২ নং চিত্র অনুযায়ী ঋজুভাবে জলের উপর ভাসাইয়া, পরে ৩ নং চিত্র অনুযায়ী
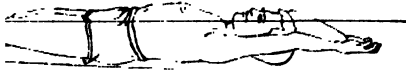
চিৎ-সাঁতার ২ নং চিত্র
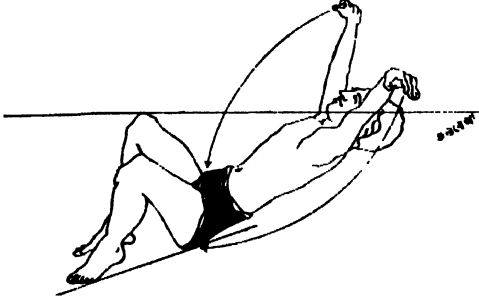
চিৎ-সাঁতার ৩ নং চিত্র

চিৎ-সাঁতার ৪ নং চিত্র

জানুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া দুই হস্ত যুগপৎ মাথার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া পদদ্বয়ের জোর নিক্ষেপের সহিত ঊরুদেশের শেষ পর্য্যন্ত জল টানিয়া ৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায় আসিবেন। ৩ নং চিত্রের অবস্থায় আসিলেই প্রশ্বাস লইবেন ও ৪ নং চিত্রের অবস্থায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন।

প্রতিযোগিতার সময় সাঁতারুগণ জলের মধ্যে মঞ্চের দিকে মুখ রাখিয়া উভয় হস্ত ও পদ দ্বারা মঞ্চ স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিবেন; পরে যাত্রা-জ্ঞাপকের ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ধাক্কা দিয়া পূর্ব্বলিখিত নিয়মে নিজ নিজ সুবিধা ও শক্তি অনুযায়ী সাঁতার সুরু করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, প্রতি ক্ষেপ ঘুরণের সময় অথবা শেষ ক্ষেপে যদি প্রতিযোগী মঞ্চ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই উপুড় হইয়া পড়েন, তবে নিয়মানুযায়ী তাঁহার সাঁতার নাকচ হওয়া সম্ভব।

নিমজ্জমান ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থে চিৎ-সাঁতার বিশেষ উপকারী, সুতরাং প্রত্যেক সাঁতারু ইহার কলাকৌশলগুলি অভ্যাস করিবেন।

যবনিকার অন্তরালে

শ্রীপারুল দেবী

১

নীলিমার অনেক দিনের সাধ সে একবার সখের থিয়েটার করে। তাহার স্কুল-কলেজের সাথী ও অন্যান্য আলাপী পরিচিতের দল অনেকেই এ কার্য্যে একাধিক বার ব্রতী হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাগ্যে এখনও একবারও সে সুযোগ আসে নাই; ইহা নীলিমার মনের একটি গোপন ক্ষোভ। কিন্তু এত দিনে সুযোগ মিলিল। বিহার ভূমিকম্পে সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতাতে সহি করিতে করিতে সকলে যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময়ে স্থানীয় বঙ্গ-মহিলা-ক্লাবে একদিন কথাটা

রমলা মিত্র, এম-এ. তথাকথিত-ক্লাবের সেক্রেটরী ও ভাণ্ডারী একাধারে দুই-ই। কথাটা তিনিই তুলিলেন। "সত্যি, আর পারা যায় না। ক্লাবের খাতাতেও আমরা দেব, মহিলা-সমিতিতেও আমরা দেব, আবার নূতন রিলিফ-ফাণ্ডও সেই আমাদেরই নিয়ে—ক'দিক আর সামলাই বলুন? মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, একটা কিছু করুন না—চ্যারিটি শো দাঁড় করান একটা। টাকা উঠতেও দেরি হবে না, আমরাও ক্রমাগত চাঁদা দেওয়া থেকে একটু রেহাই পাব। আর সত্যি একটা আমোদ-আহ্লাদের জন্যে টাকা দিতে লোকেরও তত গায়ে লাগে না—নেহাৎ শুকনো চাঁদা দিতে দিতে লোকে থকে গেল যে! আমার ত আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে যে, লোকের বাড়ী দেখা করতে যেতে ভয় করে—আমার চেহারা দেখলেই ভাববে বুঝি চাঁদা

নিতে এসেছি। দোষই বা দিই কি ক'রে বলুন? গত দু-মাসে চার বার চাঁদা তুলতে বেরিয়েছি। একটা শো-টো কিছু না করাতে পারলে শুধু চাঁদা তোলা আমাকে দিয়ে ত বাপু আর হবে না সত্যি।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "ভাল লোককে বলেছেন আপনি! আমি ত গার্ল-গাইড আর স্কুলের সেই ফিজিক্যাল কাল্চারের নতুন হাঙ্গামটা নিয়ে মরবার ফুরসৎ পাই নে; তার উপর আবার মহাপ্রভুদের মিটিং নিত্যি লেগে আছে। গিয়ে কাজ কিছু করি না-করি সময়মত হাজিরা ত ঠিক দিতে হয় আমাকে কিনা। ও সব নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবার সময় পাই কিনা দেখুন, তা আবার থিয়েটার করা! ঐ ত লতিকা, মাধুরী, কল্যাণী সবাই রয়েছে, বলুন না ওদের।"

কল্যাণী ধর মিহি সুরে বলিলেন, "মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর যেমন কথা! আমাকে নিলেই আপনাদের থিয়েটার জমবে ভাল! এমনিতেই ত বড্ড-একটা কথা-টথা আসে না আমার মুখে—গলাও ওঠে না কোনও কালে—তার উপর আবার লোকজনের সামনে হ'লে ত আর কথাই নেই। আর তাছাড়া আপনারা সব এম-এ, বি-এ,—আপনারা সবই পারেন, আমার মত মুখ্যু মানুষকে নিয়ে কি করবেন?"

রমলা মিত্র জোর গলায় বলিলেন, "এম-এ, বি-এ-র সঙ্গে থিয়েটার করার কি যোগ? তোমাকে ত আর কেমিষ্ট্রির ফরমূলা আওড়াতে ডাকা হচ্ছে না। ও রকম বাজে ওজরে পাশ কাটালে ত চলবে না—মাধুরী এদিকে এস, তোমাকেও করতে হবে কিছু।"

মাধুরী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁট, আঁচলে চাবির গোছা বাঁধা, সাদা দেশী-শাড়ী পরনে মেয়েটি হাসিতে খুশীতে যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। "রমলা-দি, আমাকে ভাই একটা হাসির পার্ট দেবেন কিন্তু—আমার ষ্টেজে উঠে দাঁড়ালেই সামনে কাল কাল মুণ্ডুর সারি দেখলেই হাসি পাবে, তা আমি ব'লে দিলুম। কথাবার্ত্তা কইতে হয় না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসলেই চলে, এমন কোনও পার্ট হয় না? আমার যে ভাই কথা-টথা একটুও মনে থাকে না, সেই ত মুস্কিল কি না আর একটা! দিনের মধ্যে সাতবার ছেলেটার নাম ভুলি, আর কি বলব বলুন এর উপর? চাবি যে কোথায় ফেলছি কিছুই মনে থাকে না, শাশুড়ী এক কাজ করতে বললে, আর এক কাজ করে রেখে দিই, এমন জ্বালা। সেদিন কি করেছি জানেন না ত? মাগো, সে যা কাণ্ড!"

বলিতে বলিতে সেদিনকার কাণ্ড স্মরণ করিয়া মাধুরীর হাসি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হাসিটা সংক্রামক; মাধুরীর হাসি দেখিয়া কল্যাণীরও হাসি পাইল এবং এত হাসির কারণটা জানিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাণ্ড করেছিলে ভাই? আর কারুর স্বামীকে নিজের স্বামী ব'লে ভুল কর নি ত?"

মাধুরী সেদিনের কাণ্ড বলিতে তখনই প্রস্তুত; কিন্তু রমলা মিত্র, এম-এ, কাজের লোক; বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে তিনি ভালবাসেন না—তিনি বাধা দিলেন। "ও-সব রাখ এখন। আগে কাজের কথাটা সেরে নিতে হবে। লতিকা, তোমাকেও নামতে হবে, কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না। প্রীতি, শোন এদিকে।"

প্রীতি মজুমদার একটি সমবয়স্কা সখীর সহিত গল্প করিতেছিল, উঠিয়া আসিল।

"প্রীতি, মাধুরী, কল্যাণী, লতিকা আর আমি এই ত মোটে পাঁচ জন। পাঁচ জনে মিলে ত আর একটা শো দাঁড় করান যায় না। অবিশ্যি আরও মেয়ে পাওয়া যাবে—অসীমা আছে, সুধীরাও হয়ত যোগ দিতে পারে; আরও ভেবে দেখতে হবে কে আছে না-আছে। তবে সকলকে দিয়েও ত আবার এ কাজ হবে না—উপযুক্তও ত হওয়া চাই। একটু বেছে-টেছে নেওয়া দরকার।—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, রাখুন আপনার স্কুল আর মীটিং। ওসব কাজের জিনিষ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এটা যে আরও বড় একটা কাজ সেটাও মনে রাখবেন। উপস্থিত প্রয়োজনের দাবী আগে মেটাতে হবে ত! আর সবাই হেল্‌প না করলে একা আমি কি ক'রে কি করব? বেশী ভারটা ত আমার উপরেই পড়বে তা জানি, কিন্তু আপনারা সব যোগ না দিলে ত হয় না। আপনাকে নামতেই হবে।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "নেহাৎ লোক না পান তখন নামতেই হবে, আর উপায় কি বলুন? কিন্তু আমার বাড়ীর কাজ, বাইরের কাজ সবই এত বেশী যে, আমাকে বাদ

দিলেই ভাল হয়। তবে কাজের লোকের উপরেই আবার কাজের ভারও বেশী বেশী পড়ে কি না, তাই বুঝছি সেই শেষ অবধি ঘাড়ে নিতেই হবে।"

কল্যাণী ও লতিকা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিল—হাসিটা অর্থপূর্ণ। রমলা মিত্রের চোখে সে হাসি এড়াইল না, কিন্তু তিনি যেন লক্ষ্য করেন নাই এমন ভাবে বলিলেন, "কল্যাণী যাও ত, লাইব্রেরী-ঘর থেকে খানকয়েক ভাল ভাল বই বেছে আন ত—দেখি প্লে করার মত কিছু পাওয়া যায় কি না। বই বাছাই যে এক বিষম হাঙ্গাম। তারই উপর প্লের সাক্‌সেস নির্ভর করে কিনা অনেক।"

মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "কল্যাণী-দি, বসুন বসুন আমি যাচ্ছি। আমি লম্বা আছি, সব উঁচু উঁচু তাকগুলো হাতে নাগাল পাব। বাব্বা, এখনও যেন বছরে বছরে লম্বায় বেড়ে চলেছি মনে হয়—আমার স্বামীকে মাথায় ছাড়িয়ে যাব এবার বোধ হয়। আমার দেওর আমাকে কি ব'লে ডাকে জানেন? লম্বৌদি ব'লে। লম্বা বৌদির সন্ধি।"

হাসিতে হাসিতে মাধুরী বই আনিতে চলিয়া গেল।

বাহিরে একটা মোটর আসিয়া থামিল, শব্দ শুনিয়া বোঝা গেল। রমলা মিত্র বলিলেন, "দেখি কেউ এল এখন বোধ হয়। সাত আট জনের বেশী ত আজ ক্লাবে লোকই আসে নি, কাকে নিয়ে ঠিক করি।"

একটি মহিলা খুট্‌খুট্ করিয়া জুতার শব্দ করিয়া বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া ময়দানে নামিয়া আসিলেন। "মিসেস্ মল্লিক যে! আসুন, আসুন, আসুন। আপনি নেই, কাজেই আমাদের এতক্ষণ কিছু ঠিকই হচ্ছে না। আসুন দেখি—কাজটা আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক।"

নবাগতা মহিলাটির নাম নীহারিকা মল্লিক। তিনি স্থানীয় কোনও খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী—ফ্যাশানে অগ্রগণ্যা বলিয়া মহিলা-সমাজে তাঁহার কিছু প্রতিপত্তি আছে। সবুজ জরিপাড় ফিকা-বেগুনী রঙের জর্জেট শাড়ী, সবুজ সাটিনের জামা, পায়ে সবুজ রঙের জুতা, কপালের টিপটি পর্য্যন্ত সবুজ—বোধ হয় ফরমাস দিয়া করাইয়াছেন। হাতে একগোছা সবুজ ও ফিকা-বেগুনী রঙের কাচের চুড়ি—সোনার বালাই নাই।

রমলা মিত্রের আহ্বানে নীহারিকা হাসিয়া ব'ললেন, "ব্যাপার কি আপনাদের? কাজ-টাজ আবার কিসের? আর কাজ যদি কিছু পড়েই থাকে ত এই ত আপনার সামনেই কাজের লোক ব'সে। কেমন, ঠিক বলি নি মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী?"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী নিজের চেয়ারটা একটু দূরে সরাইয়া লইয়া যেন নবাগতার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলেন—যদিও আবশ্যক ছিল না। কেননা, কথাবার্ত্তা হইতেছিল ক্লাবের ময়দানে—স্থান প্রচুর। নীহারিকার কথা কানে না তুলিয়া রমলা মিত্রকে উদ্দেশ করিয়া মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "এই ত আপনার থিয়েটার করবার লোক এসে গেছে, আর ভাবনা কি? ও যার কাজ তারেই সাজে, অন্যেরে লাঠি বাজে, জানেন ত? ওসব এঁদেরই উপযুক্ত কাজ। সময়েরও অভাব নেই, বরং সময় কাটাবার কাজেরই অভাব। আর তাছাড়া সাজগোজ, ভাবভঙ্গী জানা চাই, আর্টিষ্টিক হওয়া চাই; আমরা হলাম কাঠখোট্টা লোক, কোনও রকমে দরকারী কাজগুলা সারবারই সময় পাই না—তা আবার থিয়েটার! উনি ত মাঝে মাঝে বলেন, তোমার কি সখ ক'রে কখনও ভাল কাপড়ও একটা পরতে ইচ্ছে করে না? তা আমি এদিকে নিজের স্কুলের ঠেলাই সামলাই, না কাপড়-চোপড় পরি, বলুন ত?

রমলা মিত্রের সে সমস্যা সমাধান করিবার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তিনি নীহারিকার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মিসেস্ মল্লিক, ভাবছি একটা চ্যারিটি শো করাই এই বিহারের সাহায্যের জন্যে, তা শো করাই কাকে দিয়ে? কেউ ত করতেই চায় না। মাধুরী বলে ওর হাসি পায়, কল্যাণীর গলা ওঠে না, মিসেস চ্যাটার্জ্জীর ত স্কুল নিয়ে তিলার্দ্ধ সময় নেই, মাধবীর ত ছেলের অসুখ জানাই আছে, সে ত আজ কতদিন হ'ল ক্লাবেই আসে না—হ্যাঁ নীলিমা, তোমার কি? তোমার ত ছেলেপিলেও নেই, স্কুলও নেই, গলাও ওঠে বলে জানি—এদিকে এস দেখি ত।"

নীলিমা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। তাহাকে রমলা মিত্র ডাকেন নাই বলিয়া সে অভিমানে দূরেই সরিয়া বসিয়াছিল, যেন এ সকল কথা কানেই যায় নাই। সন্ধ্যার ম্লান

আকাশে দলে দলে পাখীরা ঘরে ফিরিতেছে, তাহাই চাহিয়া চাহিয়া সে দেখিতেছিল, এখন চমক ভাঙিয়া এদিকে চাহিল। রমলা মিত্র আবার বলিলেন, "তুমি যে বড় চুপচাপ দূরে স'রে আছ? সবাই অমন পাশ কাটালে ত চলবে না—এদিকে এস। কিছু পার্ট করতে পারবে ত? আর পারা-পারিই বা কি—করতেই হবে, যে যেমন পারে।"

নীলিমা ম্লান মুখে নিরুৎসাহে জবার দিল, "আমি ত কখনও কিছু থিয়েটার-ফিয়েটার করি নি; হয়ত আপনাদের সব খারাপ ক'রে দেব। তার চেয়ে আমাকে বাদই দিন না।"

রমলা মিত্র বলিলেন, "তোমাকে বাদ যেন দিলাম, কিন্তু তার বদলে নেব কাকে বল? জানি ত এখানকার কাণ্ড! সেবার সেই 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' করাতে গিয়ে সে কি হাঙ্গাম—মেয়েই জোটে না।"

নীহারিকা বলিলেন, "হ্যাঁ কে কত ভাল পারে কে মন্দ পারে, বিচার ক'রে কি আর নেওয়া চলে? যা জোটে তাই নিতে হবে। কল্‌কাতা হ'ত ত সে আলাদা কথা।"

মাধুরী পাঁচ-সাতখানা বই হাতে করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ডাকিল, "আসুন রমলাদি'রা সবাই—বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখা যাবে না—ঘরে আসুন, বই বাছবেন।" সকলে বই বাছিতে ঘরে আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই নীলিমা মুখখানি ম্লান করিয়া উঠিয়া আসিয়া কল্যাণীকে বলিল, "না ভাই আমরা ত আর কল্‌কাতার প্রোফেসনাল য্যাক্টর নই—যা পারি তাই করব। তা যদি সব মনে না ধরে ত আমাদের নেবারই বা দরকার কি? নীহারদি নিজেই বা কি এমন য্যাক্ট করেন দেখেছি ত সেবার। কেবল ক্ষণে ক্ষণে লাল, নীল, গোলাপী কাপড় বদলে সেজে সেজেই অস্থির। তা লোকের ওঁর সাজ দেখে দেখে চক্ষু ঘুরে গেছে—তা দেখবার জন্যে আর কেউ খরচ ক'রে টিকিট কিনে আসবে না।"

কল্যাণী বলিল, "সত্যি। সবুজের ঘটা দেখ্ না আজ একবার! বাব্বা, এতও পারে!"

সকলে ঘরে আসিতে মাধুরীর আনীত বই কয়খানি লইয়া তুমুল সমালোচনা চলিল। অমৃত বোসের লেখা অভিনীত হইবে কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের অথবা রবীন্দ্রনাথের —প্রথমে ইহা সাব্যস্ত হইতেই আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাহার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে যখন ভাগ্যবান রবীন্দ্রনাথই নির্ব্বাচিত হইলেন তখন গোল বাধিল বই লইয়া। কেহ বলিলেন, 'রাজা ও রাণী' হউক, কেহ বলিলেন, 'গোড়ায় গলদ'ই ভাল, কাহারও মতে 'চিরকুমার সভা'ই সকলের শ্রেষ্ঠ।

নীহারিকা বলিলেন, "অত মতামত শুনতে গেলে আজ আর কোনও কিছু ঠিক করা হবে না; কেবল গণ্ডগোলই হবে। আমি বলি 'রাজা ও রাণী' হোক—আর মতভেদে কাজ নেই। চমৎকার বই। আহা, ভাই-বোনের যা সুন্দর সীন, চোখে জল আসে। বইখানা বোধ হয় পঞ্চাশ বার পড়েছি, তবু যেন পুরনো হয় না। আর ভাই গোলমাল ক'রে কাজ নেই ঐটেই হোক—আপনি কি বলেন মিসেস্ মিত্র?"

রমলা মিত্রের মনের কথা কি তাহা ঠিক জানা গেল না। মুখে বলিলেন "বেশ তাই হোক, যদি আপনাদের সকলের মত হয়। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী কি বলেন? আপনার মত নেওয়াটা দরকার।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "আমার ত ওরকম সীরিয়স্ ধরণের বই ভাল লাগে না—না না বইটা চমৎকার, তা বলছি নে—তবে প্লে করবার পক্ষে বলছি আর কি। সারাদিনই ত জীবনের সীরিয়স্ দিকটাই দেখছি, আবার আমোদ ক'রে থিয়েটার দেখব তাও যদি সেই একই ঘ্যানঘ্যানানী শুনতে হয় তাহলে ত বড় বিপদ। কিন্তু আমার মতামতে কি হবে? আপনারাই করবেন—ওসব আপনারাই বোঝেন ভাল; যা ভাল বোঝেন করুন। আমি ত পার্ট নেব কি না তাই এখনও ঠিক করি নি।"

নীহারিকা বাঁ-হাতের কব্‌জী উল্টাইয়া ঘড়ি দেখিলেন। "একি, এ যে আটটা বাজে। আটটা পনরয় আমার বাড়ীতে ডিনার যে! দেরি ক'রে ফেললাম হয়ত। কি মুস্কিল—কথা কইতে কইতে কোথা দিয়ে সময় যায় যে! আমি চললাম; অনেকটা পথ যেতে হবে। মিসেস্ মিত্র, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, নমস্কার। যা ঠিক হয় জানাবেন। আর একটা মীটিং ডাকুন না, শুধু এইটে সেট্‌ল্ করবার জন্যে—না হ'লে কি হয়? কোথায় মীটিং হবে? এই ক্লাবের ঘরে? কেন

তার দরকার কি, আমার বাড়ী ত সেণ্ট্রাল জায়গায়, কারুরই আসতে অসুবিধা নেই, আমার বাড়ীতেই হোক না। কালই হোক—সন্ধ্যা ৬টায় ধরুন। ··· ওঃ কাল ত হবে না, ভুলে যাচ্ছিলাম। কাল যে একটা পার্টি রয়েছে—সে আমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা পরশুই হোক না হয়—কি বলেন?"

রমলা মিত্র বলিলেন, "পরশু আমি বুক্‌ড্—আমি ত পরশু সন্ধ্যাবেলা যেতে পারব না। তা হ'লে না হয় বুধবারে করুন।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "বুধবার দিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে স্কুলের মেয়েদের ল্যাণ্টার্ণ লেকচার দিতে হবে—আমি ত যেতে পারব না। তা হোক আমাকে বাদ দিয়েই আপনারা করুন না—আমাকে জড়ালে আপনারাই মুস্কিলে পড়বেন।"

নীহারিকা বারাণ্ডা হইতে নামিতে নামিতে বলিলেন, "তা হয় না, আপনাকে বাদ দেওয়া যায় না। কি মুস্কিলেই পড়েছি—রোজই একটা-না-একটা বাধা। আমার ত আজ আর দাঁড়াবারও সময় নেই ছাই যে কিছু একটা ঠিক করি। হয়ত গেষ্টরা এসে ব'সে থাকবেন—বড় অপ্রস্তুত হ'তে হবে তাহলে। আপনারাই ঠিক করে নিন—আমাকে জানিয়ে দেবেন শুধু—আমি কোনও রকমে ম্যানেজ ক'রে নেব। গুড্‌নাইট্, গুড্‌নাইট্—নমস্কার। জানাবেন আমাকে—সময় ত নেই বেশী। এই ড্রাইভার—জলদি চলো।"

ড্রাইভার মোটরে ষ্টার্ট দিল। নীহারিকা চলিয়া যাইতে মাধুরী বলিল, "রমলাদি নীহারদিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ষ্টেজে বার ক'রে দিন্ না ভাই। বাব্বা, কি ব্যস্তবাগীশ মানুষ!"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "সারাটা দিন শুয়ে ব'সে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলাই ওঁর যত কাজ কিনা। আর কাজের মধ্যে ত দেখতে পাই, হয় বাড়ীতে ডিনার, নয় বাইরে ডিনার—তা সে ত কিছু কিছু বাদ দিলেও চলে। আমাদের যে হয়েছে মুস্কিল—সখের কাজ ত নয় যে বাদ দেব। অসুখ করলেও রেহাই পাবার জো নেই—তা আর কিসে পাব বলুন? উনি তাই বলছিলেন—।"

রমলা মিত্র কথাটা শেষ করিতে দিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা আমি একটা দিন ঠিক ক'রে বাড়ী বাড়ী নোটিস লিখে পাঠাব—যাঁর যাঁর সুবিধা হবে আসবেন; যাঁর সুবিধা হবে না, তাঁকে বাদ দিয়েই অগত্যা সেদিনের কাজ চালাতে হবে। কি আর করা যায়! আপাততঃ আজ ত বাড়ী যাওয়া যাক্—রাত হ'ল।"

নীলিমা বলিল, "মাধুরী আমাকে পৌঁছে দেবে ভাই? আমাকে উনি নামিয়ে দিয়ে কি কাজে গেছেন, কই এখনও এলেন না ত।"

মাধুরী উত্তর দিল, "এই যে হয়েছে! আবার ভুলেছি, গাড়ী কই আসতে বলি নি ত। পারি না আর বাবা! নূতন একটা ড্রাইভারও জুটেছে তেমনি! নামিয়ে দিয়ে গেল তা কই একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ত কখন আবার আসবে! দেখি ভাই কার গাড়ী আবার পাওয়া যায়—একটা কারুর জুটেই যাবে দেখ না। আমাদের একসঙ্গে যাবার কিছু মুস্কিল হবে না—একদিকেই ত বাড়ী।"

মোটর জুটিয়া গেল। এ ইহার গাড়ীতে, ও উহার গাড়ীতে করিয়া সকলেই বাড়ী চলিয়া গেল।

২

কয়েক দিন পরে নীহারিকার বাড়ীতেই প্রথম রিহার্স্যাল সাড়ে পাঁচটা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—সাড়ে সাতটা বাজে, কিন্তু এখনও যে কিছু বিশেষ কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। নীলিমাকে 'রাজা ও রাণী'র ইলার পার্ট দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সকলের মত ছিল না—কিন্তু নীলিমা গান গাহিতে পারে এবং তাহার মুখখানি সর্ব্বদাই অকারণে যেন ম্লান দেখায়, সেই কারণে ইলার পার্ট হয়ত উৎরাইয়া যাইবে এই ভরসায় শেষ অবধি সকলে মত দিয়াছেন। "এরা পরকে আপন করে আপনারে পর" গানখানি নীলিমা স্বরলিপি দেখিয়া বাড়ী হইতে শিখিয়া আসিয়াছিল এবং এইমাত্র এখানে আসিয়া সকলকে গাহিয়া শুনাইয়াছে। সকলেই গান শুনিয়া তুষ্ট; কিন্তু ইলার অভিনয় সম্বন্ধে সকলেই এত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছেন যে, নীলিমা তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে একবার জনান্তিকে

মাধুরীকে বলিল, "প্রথম দিনেই যদি একেবারে নিখুঁত ইলা সাজতে পারতুম তাহলে এতদিনে শিশির ভাদুড়ীর দলে নাম লেখাতুম গিয়ে। এঁরা সব করছেন দেখ না! যেন যা করছি তাই ভুল! নিজেদের যে সব কি এ্যাকটিঙের ছিরী তা ত আর নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন না। কষ্ট ক'রে গান-টান শিখে এলুম বটে, কিন্তু সত্যি ভাই আমার আর এখন করতে ইচ্ছে করছে না।"

নীহারিকা রমলা মিত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, যেখানে ইলা সখীদের গান করতে ডাকছে আর বলছে 'সখি তোরা আয়, এরে বাঁধ্ ফুলপাশে কর্ গান', সেখানটাতে ওরকম ঐ এক ধরণের সুর করলে চলবে কেন? মোটেই মানাচ্ছে না। যেখানে বলছে—'যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ?' সেখানটা ত ঠিক আছে, সে জায়গাটা তো নীলিমা মন্দ করছে না।"

রমলা মিত্র সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সব কথা এক সুরে ব'লে যায় এই ত নীলিমার দোষ। আমি ত সে-কথা সেই প্রথম থেকেই বলছি।"

নীলিমা মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, "তা ভাই কি করব? যা পারি তাই ত করব। আপনাদের মত ভাল যদি আমি না-ই পারি!"

রমলা মিত্র বলিলেন, "না, না, আমাদের তোমাদের কথা নয়। সকলেরই অভিনয়ে দোষ আছে, সকলকেই শোধরাতে হবে। আমারই কি অভিনয় নিখুঁৎ হচ্ছে? মোটেই নয়। তবে চেষ্টা করতে হবে—ক্রমে ক্রমে হবে, এই আর কি! মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, আপনারও কিন্তু দেবদত্তের পার্টটি ঠিকমত হচ্ছে না এখনও। ওর সব কথা একটুখানি বিদ্রূপের সুরে বলতে হবে কিনা। রাজার বয়স্য, তাতে রসিক লোক—বুঝেছেন ত? আপনার কিনা স্কুলে লেকচার দেওয়া অভ্যেস, তাই একটু বক্তৃতার সুর সহজেই এসে পড়ে আর কি—তা সেটা বন্ধ করতে হবে। চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এই দেখুন এমনি ক'রে—

"আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে।
এবার দেখেছি সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও না ছাড়ে পঞ্চবাণ;
ছোট বড় করে না বিচার।"

এই রকমটা হবে আর কি। ···কি বলেন মিসেস্ মল্লিক? কতকটা ঠিক হ'ল কি? আমারও ত এই প্রথম দিন, সব কি আর ঠিক হচ্ছে?"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "তা আপনিই নিন্ না বাপু দেবদত্তের পার্ট। আমার ওসব আসে-টাসে না, আমি ত বলেই দিয়েছি আপনাদের। আপনারাই টানাটানি করলেন ব'লে আমার আসা—আমি ত চাই নি এসব ফ্যাসাদে জড়াতে। উনি বরং বলছিলেন, 'তুমি ঠিক পারবে, করেওছ ত কত।' তা সে যখন করেছি, তখন করেছি—এখন নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি, এ-সব বাজে কাজের সময় কোথা?"

রমলা মিত্র বলিলেন, "রাজা বিক্রমদেবের পার্ট যে আমি না হ'লে করবার লোক নেই—না হ'লে আমার আর কি—আমাকে যে পার্ট দেবেন, আমি দু-দিনে তৈরি ক'রে নেব—যেমন ক'রে হোক। দেবদত্তের পার্ট একটা ভাল পার্ট, তাই আপনাকেই দিয়েছিলাম। তবে আপনার যদি এত বাজে কাজের সময় না থাকে ত সে আলাদা কথা—তাহলে আর কাউকে এখনই দেখতে হয়।"

নীহারিকা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন—প্রমাদ গণিলেন। "ওমা, সে কি? সব ঠিকঠাক, এখন কি আর লোক বদল করা যায়? সব মাটি হবে তাহলে। না, না, আমার ত মনে হয় মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীকে দেবদত্তের পার্টে খুব মানিয়েছে, ও দু-দিন রিহার্সাল দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর আমরা মেয়েরা সব করছি—এ্যামেচারের দল সব—একটু যদি খুঁৎই থেকে যায় তা আর কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? টাকা তোলবার জন্যেই করা—পরের গরজে এতগুলি মেয়ে খেটেখুটে সময় দিয়ে জিনিষটা গ'ড়ে তুলছে, এই ত আমার কাছে খুব প্রশংসার বিষয় ব'লে মনে হয়। এ ত আর প্রোফেসনাল য়্যাক্টর নয় যে সকলে নিখুঁৎ য়্যাক্ট করবে কেউ আশা করে।···এই প্রীতি, যুধাজিতের পার্ট ত সামান্যই, তুমি নাও ত, ঐ পাশের ঘরে গিয়ে নিজের এই পার্টটুকু বেশ ক'রে মুখস্ত ক'রে আন, এখনই হয়ে যাবে।···মাধুরী, কুমারের পার্টে হাসি-টাসি নেই মনে রেখো, খবরদার হেসো না যেন। নিজের নিজের পার্ট ভাল ক'রে মুখস্ত কর সবাই আগে—নাহলে অত বই দেখে দেখে রিহার্সাল যেন মোটে জমছেই না। আমারই হয়েছে

মুস্কিল, সুমিত্রার পার্ট যেমন শক্ত তেমনই লম্বা। কি যে করি!"

মাধুরী কুমার সাজিবে। কুমারের কথাবার্ত্তাগুলি একটা কাগজে সে লিখিয়া লইয়াছে, সেইটা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বলিল, "আপনারা সব কতবার করেছেন, আর পারেনও ভাল—আপনাদের আবার মুস্কিল কি নীহারদি? আমি যা ফ্যাসাদে পড়েছি সে আমিই জানি, একে ত কুমারের মুখে হাসির নাম নেই কোনখানে—আর ভাই ঐ নীলিমাকে যেই বলতে যাচ্ছি 'আমারে কি করেছিস অয়ি কুহকিনি' এমন হাসি পাচ্ছে যে কিছুতে রাখতে পারছি নে। আর নীলিমাটা কি বেঁটে রে বাবা—আমার পেট অবধি ওর মাথাটা আসে। সত্যি, আমাকে যাই-ই দিন নীহারদি—আমি সব আপনাদের খারাপ ক'রে ফেলব।"

মাধুরী হাসিতে লাগিল, কিন্তু রমলা মিত্র ধমক দিলেন। "তোমাদের অবধি সব আর সাধতে পারি নে। সবার মুখে কেবল ঐ এক কথা 'করব না আর পারব না'। আর আমার নিজের পার্ট মুখস্ত চুলোয় গেল, আমার এখন কাজ হয়েছে তোমাদের সকলকে সেধে বেড়ান। ও সব চলবে না—যার উপর যা ভার দেওয়া হয়েছে তার আর নড়চড় হবে না মনে রেখ। একবার যখন সব নেমেছ তখন কাজটা শেষ অবধি ক'রে তবে ছাড়ান পাবে। নিজের নিজের পার্ট ভাল ক'রে মুখস্ত ক'রে পরশু আবার এইখানেই সবাই আসবে, বুঝেছ?...ওহো দেখেছ! আসল কথাই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করের পার্ট করবে কে? সেটা ত ঠিক হ'ল না।"

বৃদ্ধ শঙ্কর সাজিতে কেহই রাজী নহে। সকলকেই একবার করিয়া অনুরোধ করা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই। শঙ্কর বৃদ্ধ, শঙ্কর ভৃত্য, শঙ্কর সাজিলে দাড়ি পরিতে হইবে ইত্যাদি কারণে শঙ্করের পার্ট কেহ করিতে চাহে না। নীলিমা একবার ভাবিয়াছিল যে করিবে কিনা—কিন্তু শঙ্করের ত গান নাই—নীলিমার গানটা তাহা হইলে মাঠে মারা যায়। তাই তাহাকে ও পার্ট দেওয়াতে কাহারও মত হইল না। আপাততঃ শঙ্কর-সমস্যা সকলকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

নীহারিকা বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, ছোটবৌদিকে শঙ্কর সাজালে কি হয়? একটু বয়েসও হয়েছে, আর ওকে যা বল ও তাইতেই রাজী, কোনও গোল নেই। সবাই মিলে একটু চেপে ধরলে ও ঠিক রাজী হয়ে যাবে। একটু মোটা বেশী—পুরুষমানুষ সাজলে হয়ত ঠিক মানাবে না, কিন্তু তা আর কি করা যায়! ও-ই ঠিক্ হয়ে যাবে। দাঁড়াও আমি গাড়ী পাঠাচ্ছি।...এই প্রীতি, যাও ত ভাই আমার গাড়ীতে, ছোটবৌদিকে ধ'রে আন ত। এই ত বাড়ী—যাবে আর আসবে, দেরি ক'রো না।

রমলা মিত্র উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিলেন, "সত্যি ঠিক মনে করেছেন। আপনার কিন্তু খুব উপস্থিতবুদ্ধি। আমি ত আজ কতবারই ভেবেছি যে ও পার্টটা কাকে দেওয়া যায়—কিন্তু ছোটবৌদির নামটা ত কই মনে পড়ে নি। বাঃ বেশ বুদ্ধি দিয়েছেন আপনি! সাতটা মাথা নইলে কি আর এ-সব কাজ হয়! একটা মাথায় আর কত দিকে ভাবব বলুন?"

ছোটবৌদি অর্থাৎ শ্রীমতী সরোজিনী দেবী কোনও অজ্ঞাত কারণে সকলেরই ছোটবৌদি। নীহারিকারও ছোটবৌদি; নীহারিকার একাদশবর্ষীয়া কন্যা রমারও ছোটবৌদি এবং মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী, মিসেস্ মিত্র, প্রীতি, মাধুরীরও ছোটবৌদি।

প্রীতি কিছুক্ষণ পরে যখন এ হেন ছোটবৌদিকে লইয়া আসিয়া পৌঁছাইল, তখন রিহার্সাল পুরাদমে চলিয়াছে। ছোটবৌদি ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই তোমরা সব ক্ষেপলে নাকি? তোমরা সব কি থিয়েটার করছ শুনছি, আমাকে নাকি তাতে কি সাজাবে? তা যদি কিছু সাজাও ত বরং না-হয় রূপীবাঁদর সাজাও—তোমাদের থিয়েটারে নাচব। তাছাড়া ত আর কিছু সাজলে আমাকে মানাবে না ভাই।"

রমলা মিত্র, মিসেস চ্যাটার্জ্জী, নীহারিকা, মাধুরী সকলে রিহার্সাল ফেলিয়া মহাসমারোহে ছোটবৌদিকে অভ্যর্থনা করিলেন, "আসুন আসুন ছোটবৌদি—বাঁচালেন আপনি এসে। কই, দাও, দাও শঙ্করের পার্ট যে আলাদা ক'রে লেখা আছে, এনে দাও শীগ্‌গির ছোটবৌদিকে। আপনি না হ'লে এ পার্ট আমাদের হচ্ছিলই না—মাটি হচ্ছিল সব।

ছোটবৌদি বলিলেন, "তোমরা সব রূপসী, বিদ্যেবতী, কলাবতী—তোমরা করছ থিয়েটার—তার মধ্যে আমি বুড়োমানুষ, আমাকে কেন ভাই?"

সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিলেন, "লক্ষ্মীটি ছোটবৌদি, আপনি না করবেন না। আপনি বুড়োমানুষ আর আমরা বুঝি সব একেবারে ছেলেমানুষ? না না ও সব বাজে ওজর আপনার শোনা হবে না। কিছু শক্তও নয়। আপনি যেমন ভাবে কথা বলেন ঐ ভাবেই এই কাগজে লেখা কথাগুলো ব'লে যাবেন—তাহলেই চমৎকার হবে। আপনাকে নিতেই হবে এ ভারটা—কিছুতেই ছাড়ব না আমরা।"

ছোটবৌদি ক্ষীণস্বরে পুনর্ব্বার কি একটা আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু টিকিল না। শঙ্কর-সমস্যা ঘুচিল।

৩

আজ থিয়েটার। নীহারিকা মল্লিকের বাটীর ময়দানে শামিয়ানা খাটাইয়া ষ্টেজ দাঁড় করান হইয়াছে। স্থানীয় সিনেমা হাউস একটি ভাড়া করিয়া সেইখানে অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভাড়া বেশী চাহে বলিয়া সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। চ্যারিটি শো—যত অল্প খরচে করা যায়।

আলো, ফুল ও পাতার বাহার সব ঠিকই আছে—তাগাতে কিছু খরচ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু কি আর করা যায়। দর্শকের দল ক্রমে ক্রমে আসিয়া টিকেটের নম্বর মিলাইয়া নিজ নিজ আসন অধিকার করিয়া বসিতেছে। ছোট মেয়েরা জনকয়েক টিকিট বিক্রী করিতেছে; কতকগুলি বালিকা এক-এক গোছা প্রোগ্রাম হাতে লইয়া অভ্যাগতদের বলিয়া বেড়াইতেছে, "প্রোগ্রাম কিনবেন না? কিনুন না। চার আনা ক'রে কপি।" কেহ কেহ দর্শকদিগকে বসাইবার কার্য্যে নিযুক্ত। অভিনেত্রীগণের পিতা, ভ্রাতা, স্বামীবৃন্দ অনেকেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের মুখে স্পষ্ট উৎকণ্ঠার চিহ্ন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই বসিবার স্থান প্রায় ভরিয়া আসিল। অধীর আগ্রহে দর্শকের দল উন্মুখ।

ভিতরেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার সীমা নাই। অভিনেত্রীর দল ছাড়াও, প্রম্প্টার, ডিরেক্টর, ষ্টেজ-ম্যানেজার, বাদ্য-যন্ত্রী ইত্যাদির ভিড়ে গ্রীনরুমে পা ফেলিবার স্থান নাই। নীলিমা আধ ঘণ্টার ভিতর তিনবার গোলমরিচ সহযোগে চা পান করিয়াও গলা ঠিক করিতে পারিতেছে না। শঙ্করের দাড়ি এতক্ষণ সম্মুখেই রাখা ছিল, এখন ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে যে সে-দাড়ি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, কোনখানে তাহার সন্ধান মিলিতেছে না। রমলা মিত্র বকিতেছেন, "এই সখীর দলকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে এই কাণ্ড! কতবার বলেছিলাম সখীরা সব নিজের নিজের বাড়ী থেকে একেবারে সেজে তৈরি হয়ে আসবে—এখানে এত সাজাবার লোকই বা কোথা, আর জায়গাই বা কই? সাজতে ত কেউই কম জান না, কিন্তু আজ দরকার কিনা, আজ আর কেউ নিজে সেজে আসতে পারলে না! এইটুকু ঘরে এই এতগুলো লোকের রকমারি কাপড়—কোথায় যে চোখের পলকে কোন্ জিনিষ উড়ে যাচ্ছে জানি না। একটা জিনিষ হাতের কাছে পাবার জো নেই। সেফ্টি-পিনের বাক্সটা তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তা কোথায় যে কে রেখেছে তার ঠিক নেই। এই প্রীতি, ও কি করছ? বোস না, বোস না ওখানে—আমার পাগড়ী রয়েছে যে, দেখতে পাচ্ছ না? হয়েছিল এখুনি। গিয়েছিল আমার পাগড়ী একেবারে চেপ্টে শেষ হয়ে। ছোটবৌদির দাড়ি গেছে, আমার পাগড়ীও যাবার দাখিল—ব্যবস্থা চমৎকার।"

প্রীতি ভয় পাইয়া সরিয়া আসিল। মাধুরী গ্রীনরুমের এক কোণে দাঁড়াইয়া বই হাতে করিয়া অনর্গল কুমারের পার্ট মুখস্থ বলিতেছিল। এখন সরিয়া আসিয়া প্রীতির হাতে বইখানা দিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি ভাই, দেখ না একটু, আমার ঠিক মুখস্থ হয়েছে কি না। যত সময় এগিয়ে আসছে, সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে আরও—বুক ধরাস্ ধরাস্ করছে। তখন ভেবেছিলাম হাসি পাবে, এখন মনে হচ্ছে কেঁদে না ফেলি। শোন্ না ভাই, ঠিকমত বলতে পারছি কিনা। তোর ত সুধাজিতের পার্ট সামান্য, ভাবনা নেই।"

প্রীতি শুনিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে ভুল সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল।

নীহারিকা মল্লিক সুমিত্রা সাজিতেছেন। তাঁহার সাজ

প্রায় সম্পূর্ণ, কোনও ত্রুটি হয় নাই; কেবল রাণীজনোচিত মুকুট একখানি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই, তাই মনে সামান্য ক্ষোভ। কিন্তু মুকুট যাক—এখন প্লেটা উৎরাইয়া গেলে বাঁচা যায়। শঙ্করের দাড়ির জন্য আবার গাড়ী ছুটিয়াছে, ভগবানের কৃপায় এখন আর একটি দাড়ি দোকানে তৈয়ারী পাওয়া যায় তবে তো! না হইলে কি যে হইবে তাহা ভাবাও যায় না। ছোটবৌদির মুখখানা আবার এতই নারীসুলভ যে দাড়ি না পরাইলে পুরুষের পোষাকে তাঁহাকে অত্যন্ত অশোভন দেখাইবে। অত করিয়া ফরমাস দিয়া করান দাড়ি শুধু শুধু হারাইয়া গেল! কি মুস্কিলেই পড়া গিয়াছে।

সখীর দলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গায়িকা, সে এখন অবধি অনুপস্থিত। কথা আছে সেই মেয়েটি পুরা গানটা গাহিবে; সখীর দলের মধ্যে অন্য তিনটি মেয়ে সামান্য গাহিতে জানে, তাদেরও যোগ দিতে বলা হইয়াছে; বাকী দুই জন শুধু মুখ নাড়িলেই চলিবে। নীহারিকা চোখের সুর্ম্মা ঠিক করিতে করিতে বলিলেন, "এদের কি সত্যি একটুও সময়ের জ্ঞান নেই? বার-বার ক'রে সুরমাকে বলেছিলুম যে, তোমার উপরেই সব সখীদের ভার, তুমি একটু আগে আগে এস—তা দেখেছ একবার কাণ্ড? সবাই এল সে-ই নেই। কতদিক আর একা সামলান যায়? মিসেস্ মিত্র, তখনই আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমাকে আর য়্যাক্‌টিঙের মধ্যে রাখবেন না—এক জন শক্ত ম্যানেজার চাই—আমি সে কাজটার ভার নিলে আর এ রকম গণ্ডগোলটি হ'ত না। ও মিসেস্ করকে ম্যানেজার করা না-করা সমান। ওদিকে চুপটি ক'রে কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছেন জানি না; আমি ত এ এক ঘণ্টার ভিতর তাঁর চেহারাই দেখি নি। এর নাম কি ম্যানেজিং? আমি হ'লে সব ডিউটি ভাগ ক'রে ক'রে দিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দিতাম। এখন আমি নিজেই সাজি, না অন্যকে দেখি!"

মিসেস্ মিত্রের নিকট হইতে কিছু সাড়া না পাইয়া নীহারিকা সুর্ম্মা-পরা বন্ধ করিয়া একবার দেখিয়া লইলেন। রমলা মিত্র সেখানে নাই।

"কি হ'ল কি হ'ল, ব্যাপার কি? আরে বাপু, হ'ল কি তাই বল্ না ছাই—" ইত্যাদি শব্দে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন নীলিমা ওরফে ইলা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে। রমলা মিত্র সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, "বাপ্ রে বাপ্—এত 'টাচি' হ'লে ত আর কোনও পাবলিক কাজে নামা চলে না। দশ জনের সামনে দেখাতে হবে, সকলেই সমালোচনা করবে, তার আগে নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা একটু শুধ্‌রে না নিলে কি ক'রে চলবে? আর তাই বা কি বলেছি? যা কথায় কথায় অভিমান নীলিমার—আমি ত ভয়ে ভয়ে চুপ করেই থাকি। ভাবি যাক্ গে আমার কি? ভাল হলেও ওর, মন্দ হলেও ওর; বলতে গেলেই ত দোষের ভাগী কেবল।"

ব্যাপারটা ভাল বোঝা গেল না—কেহ বুঝিবার বিশেষ চেষ্টাও করিল না; সকলেই আপনাকে লইয়া উদ্‌ভ্রান্ত—নীলিমা কাঁদিতেই লাগিল, মুখের রং খারাপ হইয়া গেল, চোখের কাজল গালে লাগিয়া গালের রং গোলাপীর পরিবর্ত্তে কালো দেখাইতে লাগিল। নীহারিকা সুর্ম্মা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। নীলিমার কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ওমা, ওমা, কান্না কিসের? নীলিমা বয়সে ছেলেমানুষ ত কাজেও ছেলেমানুষ। কাঁদে না, কাঁদে না, লক্ষীটি ভাই, চুপ কর। তোমাদেরই উপর ভরসা ক'রে এ কাজে নামা—এখন একটু কটু কথা সয়ে হোক, যা ক'রে হোক কাজটা উদ্ধার ক'রে দাও ভাই। চুপ কর, চুপ কর।...প্রীতি রঙের বাসনটা আন ত ভাই—গেল সব মুখের রং ধুয়ে; আবার ঠিক ক'রে দিই। বেজেছে কটা—? আর কত সময় আছে? বাবা আমার ত মাথা কেমন করছে—ষ্টেজে উঠে না পড়ে যাই।"

প্রীতির হাত হইতে রঙের পাত্র লইয়া চোখ মুছিয়া নীলিমা নিজেই মুখে রং মাখিতে লাগিল। কান্না-ভরা স্বরে বলিল, "আমি ত পারি না ভাল, সকলেই আপনারা জানেন নীহারদি। তা আমি ত আর সেধে সেধে থিয়েটার করতে আসি নি। আপনাদেরই লোক পাওয়া যাচ্ছিল না ব'লে জোর ক'রে আপনারা আমাকে নামালেন। দেখেছেন ত আমি বরাবরই চেষ্টা করছি ভাল ক'রে করতে—তা ক্ষমতা না থাকলে কি করব বলুন? রমলাদি এমন ক'রে কথা বলেন

যে, যেন আমার দোষেই ওঁদের সব প্লেটা মাটি হয়ে যাবে। বার-বার এক কথা শুনলে কষ্ট হয় না? রমলাদির যদি তাই বিশ্বাস যে আমার জন্য সব মাটি হয়ে যাবে—তাহলে. আগেই আমাকে বাদ দিলে পারতেন—এ শেষ মুহূর্তে গোলমাল ক'রে আমাকে অপদস্ত করবার দরকার কি?"

নীহারিকা সাধ্যমত মিষ্ট কথায় নীলিমাকে যথাসম্ভব তুষ্ট করিয়া পায়ে আলতা পরিতে চলিয়া গেলেন। আর আধ ঘণ্টাও সময় নাই। বাহিরে লোক জমিতেছে, তাহার গুঞ্জনধ্বনি কানে আসিয়া বুকের ভিতরটা গুমাইয়া উঠিতেছে।

বাহির হইতে একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া শঙ্করের দাড়িটি নীহারিকার হাতে দিল, বলিল, "ড্রাইভার দিলে। আর জানেন নীহারদি, আপনারা আগে যা বিক্রী করেছেন, তা করেছেন,—তাছাড়া এখনই আমি নগদ ৭২৲ টাকার টিকিট বিক্রী করলাম। বাপ রে লোক যা হয়েছে—আর ত ধরে না।……ও মাগো, ছোটবৌদিকে কি রকম দেখাচ্ছে। কিছু চেনা যাচ্ছে না। বাঁ-দিকের দাড়িটা আরও চেপ্টে দিন কিন্তু—গাল দেখা যাচ্ছে।"

মেয়েটি ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী ওরফে দেবদত্তের শুভ্র উত্তরীয়ে গোলাপী রং খানিকটা উল্টাইয়া পড়িয়াছে। যেমন ভাবেই উত্তরীয় গায়ে দেওয়া হউক সে গোলাপী রং কিছুতেই ঢাকা পড়িতেছে না, এই লইয়া দেবদত্ত আকুল। লতিকা সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল।

নীহারিকা সর্ব্বাঙ্গে গহনাদি পরিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন, আলতা পরিতে পারিতেছেন না পাছে কোন কিছু সাজ স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। ডাকিলেন, "লতিকা একবারটি এসো না ভাই—পায়ে যেন হাতই পৌঁছচ্ছে না। যেমন-তেমন ক'রে পায়ে খানিকটা আলতা না খেবড়ে দিলে—পা-টা যে বড্ড সাদা দেখাতে লাগল।"

দেবদত্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বলিলেন, "থামুন মিসেস মল্লিক। পায়ের দিকে অত কে দেখছে আপনার? আমার চাদর যে সকলের আগেই চোখে পড়বে। এই সখীর দলকে মিসেস মিত্র আর ঐ আপনাদের ষ্টেজ-ম্যানেজার কি ব'লে যে গ্রীন-রুমে ঢোকালেন আমি তা ভেবে পাই নে। শঙ্করের দাড়ি গেল, আমার চাদরে রং উল্টে দিলে, তাছাড়া কি অনর্থক চ্যাচামেচি করছে যে আমার ত প্রাণ যেন খাবি খাচ্ছে। প্রথম সীনেই আমি, প্রথম কথাই আমার—আর আমার চাদরের এই অবস্থা। কি কুক্ষণেই আপনারা থিয়েটারের হুজুগ তুলেছিলেন—অপদস্থের একশেষ হ'তে হবে শেষ অবধি, এ আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমার আর কি—আমি গোলাপী চাদর নিয়েই বেরোব।"

ইলা অর্থাৎ নীলিমার চোখে তখনও থাকিয়া থাকিয়া জল আসিতেছে—দূর হইতে দেখিয়া রমলা মিত্র মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। পাগড়ীটা মাথায় ঠিক করিয়া বসাইতে বসাইতে নীহারিকাকে বলিলেন, "মিছিমিছি কি রকম সীন করলে নীলিমা দেখলেন ত? কিছুই বলি নি—শুধু বলেছি এখন অবধি বই হাতে ক'রে ব'সে আছ, তাহলেই তোমাকে দিয়ে ইলার পার্ট হয়েছে! প্লেটা দেখছি তুমিই মাটি করবে। এইটুকু ত কথা—এতেই চোখে একেবারে বান ডাকছে। ওকি শেষে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদবে নাকি? আমি ত বাবা আর কিছু বলতে যাব না—আপনি বরং বলুন একটু গিয়ে।"

নীহারিকা আলতা পরিতেছিলেন, বলিলেন, "ওর ষ্টেজে বেরোতে দেরি আছে—ততক্ষণে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এখন আর ওসব কিছু দেখবেন না—সময় হয়ে গেল বোধ হয়। আপনি যান, আরম্ভ করুন। সব ঠিক আছে ত? সীন তোলবার লোক দু-দিকে দু-জন ঠিক আছে ত? দেখুন, কিছু যেন ভুল না হয়ে যায়।"

রমলা মিত্র বলিলেন, "কত দিক আর দেখব? মিসেস্ করের ত দেখা পাবার জো নেই। ওঁর ষ্টেজ ম্যানেজ করবার কথা—তা দেখলাম এখন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছেন! এ রকম লোককে কখনও কাজের ভার দিতে আছে? আমার ত সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুনছি সীট নাকি একটিও আর খালি নেই, সব ভ'রে গেছে। অত লোকের সামনে কি ক'রে যে কি করব—আমার আবার পুরুষের পার্ট—এত নার্ভাস মনে হচ্ছে।"

তার পর ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "উঃ সত্যি আর ত সময় নেই—৭টা বাজতে ২ মিনিট। আর না, আর না, আর একটুও সময় নেই। এই প্রম্প্‌টার দু-জন, তোমরা দু-জনে

দু-দিকে থাক। হারমোনিয়াম কে বাজাবে? ঘুন্টু? আচ্ছা বেশ ব'সো গে নিজের জায়গায়। দেরি ক'রো না আর। প্রথম সীনে দেবদত্ত আর আমি। দেবদত্ত, এদিকে এস। থাকগে ও গোলাপী চাদরে এসে যাবে না কিছু। আমাকে কে প্রম্প্‌ট করবে? লীলা? আচ্ছা। প্রথমেই কি ব'লে সুরু একটু ব'লে দাও না ভাই, সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ও, ঠিক! প্রথমে দেবদত্ত বলবে, 'মহারাজ, এ কি উপদ্রব?' আমি বলব 'হয়েছে কি?' না? আচ্ছা—'হয়েছে কি' হ'ল আমার প্রথম কথা। প্রথমটা একবার আরম্ভ ক'রে নিলে তার পর আপনি এসে যাবে। এস এস দেবদত্ত চ'লে এস আর সময় নেই। দেখুন ত মিসেস্ মল্লিক, আমাদের দাঁড়ানোটা ঠিক হয়েছে? ...আচ্ছা, আগে ঘণ্টা বাজাও. তার পর সীন তোল।"

যবনিকা উঠিল।

ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলি যে মানব-ইতিহাসের গোড়ার কথা, এ সম্বন্ধে দ্বি-মত হইবার আশঙ্কা নাই।

সকলেই অবগত আছেন যে, আদিম মানবের পশুপ্রায় দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির ক্রমিক উন্নয়ন ও তাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনযাত্রার ক্রমিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌকুমার্য্য সাধন দ্বারা মানব-সভ্যতার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি কি রীতিতে সাধিত হইয়াছে, ইহাই নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক বিভিন্ন জাতিদের কুলজি ও তাহাদের সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলি এবং বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে তাহাদের পরিবর্ত্তন-প্রণালী নৃতত্ত্বের অন্যতম গবেষণার বিষয়। মানব-সভ্যতার দিঙনির্ণয় ও গতি নিরূপণ এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান কালের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা-মূলক (a posteriori) প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে অতীতের অভিমুখী হইতেছেন।

এইরূপে প্রাণীজগতের আধুনিক যুগ হইতে উন্মেষ-যুগ পর্য্যন্ত ধরিত্রীর স্তরে স্তরে প্রত্নজীবের ও বিশেষতঃ প্রত্ন-মানবের কঙ্কালাবশেষ এবং প্রস্তর, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কারাদি ও গিরি-গহ্বরে বা গিরি-গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রাদি, পুরাকালের সমাধি ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারের ভূরি ভূরি নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া, এই সমস্ত বস্তুগত উপাদানগুলির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রত্নজীবের ও প্রত্নমানবের যথাসম্ভব একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের প্রসাদে এখন আমরা তৃতীয়ক যুগের (tertiary period-এর) অন্ত্যাধুনিক (pliocene) অন্তর্যুগ হইতে চতুর্থক বা আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত কিরূপে ট্রিনিলের (Trinil) প্রাক্-মানব (Pre-man) হইতে ক্রমে পিল্ট ডাউন, হাইডেলবার্গ, পেকিন ও রোডেসিয়ার গোড়ার মানব (Proto-man) ও নিয়ানডারথাল-জাতীয় পশুভাবাপন্ন প্রাথমিক মানব (Homo-Primigenius) ও সর্ব্বশেষে আধুনিক মানব Homo-Recens বা Homo-Sapiens) উদ্ভূত হইল; এবং কিরূপে রয়টিলিয়ান, ম্যাফিলিয়ান, মেসভিনিয়ান প্রভৃতি উষা-শীলা (Eoliths) হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতন প্রস্তরযুগের চেলিয়ান, আসোলিয়ান, মুষ্টেরিয়ান, ঔরিগনেসিয়ান, সলুট্রিয়ান, ম্যাগডেলেনিয়ান, আজিলিয়ান, টারডিনয়সিয়ান প্রভৃতি প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধ (palæoliths) ও ক্রমে মধ্যপ্রস্তরায়ুধ (mesoliths) ও নবপ্রস্তরায়ুধ (neoliths) এবং পরে তাম্রায়ুধ ও লৌহায়ুধের উদ্ভাবন ও প্রচলন হইল তাহার একটি

স্থূল ধারণা করিতে পারি। আর সেই প্রত্ন-ইতিহাসের পরিপূরকরূপে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদেরা বর্ত্তমান অসভ্য জাতিদের জীবনধারা পর্য্যালোচনা করিয়া মানব-সভ্যতার ও মানব-সমাজের শৈশব-যুগের চিত্র অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন। নৃতত্ত্বের এই সমস্ত তথ্যগুলিই মানবের ও মানব-সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা।

সিদ্ধান্ত হিসাবে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও কার্য্যতঃ বিশ্বমানবের ইতিহাসের এই প্রথম অধ্যায় বাদ দিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। আমাদের স্কুল-কলেজেও এইরূপ মূল-অঙ্গহীন ইতিহাসের অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাস-শিক্ষার্থী প্রায় কোনও ছাত্রই নৃতত্ত্বের অনুশীলন করেন না বা করিবার সুযোগও প্রাপ্ত হন না। ভারতবর্ষে এ-বিষয়ের অনুশীলন বা প্রচার প্রায় কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র ভারতের পঞ্চদশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের নেতৃত্বে পৃথকভাবে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অংশস্বরূপ নৃতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা পনর-ষোল বৎসর যাবৎ হইয়াছে। এবং সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে নৃতত্ত্ব মধ্য-পরীক্ষার (Intermediate) পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেবল বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সমাজতত্ত্বের, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের, ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের অঙ্গস্বরূপ কেবল আংশিকভাবে নৃতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

প্রাচীন ভারতে নৃতত্ত্বের এরূপ অনাদর ছিল না। নৃতত্ত্ব বর্জ্জন করিয়া পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস রচিত বা অধীত হইত না। কিংবা, তাহা হইতে পারে, এরূপ ধারণাও প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে ইতিহাস (History) এবং নৃতত্ত্ব (Anthropology) বলেন এই উভয় শাস্ত্রেরই স্থান প্রাচীন ভারতে অধিকার করিত আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলি ও কতিপয় সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র। আর ভারতের দুইখানি অমূল্য মহাকাব্য—রামায়ণ ও বিশেষতঃ মহাভারত,—আংশিক অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন সত্ত্বেও, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের নানা তথ্যের আকর। আমাদের পুরাণকার ঋষিরা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে মানবের ও মানব-সমাজের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের অবস্থা-পরম্পরার একটি সমগ্র-চিত্র পুরাণ গ্রন্থগুলিতে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ-বর্ণিত কোন্ তথ্য কত দূর প্রামাণ্য তাহা স্বতন্ত্র কথা। এখনও সে-সম্বন্ধে সম্যক্ গবেষণা হয় নাই। সে যাহা হউক, পুরাণ-প্রণেতা ঋষিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান, বাস্তবের মধ্যে আদর্শের সন্ধান ও সেই আদর্শকে ইতিহাসের মধ্যে পরিস্ফুট ও প্রচার করা। কেবল ঐহিক ঘটনাবলীর ইতিহাস অনুশীলনে তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন না। ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন আর্য্যঋষিদের ধারণার সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণার অবশ্য সম্পূর্ণ মিল হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি প্রধানতঃ বহির্ম্মুখী, কিন্তু ভারতের আর্য্যঋষিদের দৃষ্টি ছিল অন্তর্ম্মুখী। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ প্রধানতঃ বহিঃপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব-স্থাপন; ভারত-সভ্যতার আদর্শ অন্তঃপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের পূর্ণ প্রকাশ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের নিরূপিত পারিবারিক নীতি ও ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের চরম লক্ষ্যের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-বিধানের মধ্যে কালক্রমে অনেক আবর্জ্জনা প্রক্ষিপ্ত ও সঞ্চিত হইলেও তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানবের পশুপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া দেব-প্রকৃতির স্ফুরণ ও তাহার আধিপত্য স্থাপনের উপায় বিধান। হিন্দুর দুর্গাপ্রতিমা মানবের দেবভাবের দ্বারা পশুভাবের পরাজয়েরই প্রতীক। চণ্ডীর মহিষাসুর-বধ ইহারই রূপক।

আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলি সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল আখ্যায়িকার সাহায্যে ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতেছে। সামাজিক ইতিহাস, নৃতত্ত্বের আধার স্বরূপ সমগ্র ভারতের তৎকালীন প্রচলিত লৌকিক রীতিনীতি, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-সংস্কার ও যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, আশ্রম-ধর্ম্ম, দায়-বিভাগ, দণ্ডনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সমাহরণ, সংশ্লেষণ ও সমীকরণ করিয়া পুরাণ ও সংহিতাগুলিতে যথারীতি বিধিবদ্ধ

করা হইয়াছিল। ধর্ম্মশিক্ষার দিক্ দিয়া পুরাণ গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন বিভিন্ন স্তরের মানব-সমাজের আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেই সমস্ত আদর্শ আজও হিন্দুসমাজকে অল্প-বিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এইরূপে পুরাণগুলিকে একাধারে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। আর সংহিতাকারেরা ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতির সামঞ্জস্য করিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সমাজে যে বিভিন্ন প্রকার যৌন-সম্বন্ধ ও বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে সেইগুলি সংহিতাকার সমাহরণ করিয়া আট শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব্য, রাক্ষস, ও পৈশাচ। এখনও বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিভিন্ন বিবাহপ্রথা অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। সংহিতা-প্রণেতা ঋষিরা সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য উক্ত আট প্রকারের বিবাহই বৈধ বিবাহ এবং তন্মধ্যে চারি প্রকারের বিবাহ "উত্তম" বিবাহ এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে বিধান দিয়াছেন যে বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে কোনও কোনও শ্রেণীর বিবাহ "প্রশস্ত", কোনওটি "ধর্ম্ম্য" অর্থাৎ "প্রশস্ত" বিবাহের অভাবে করণীয়। আরও বিধান দিয়াছেন যে পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ নিন্দনীয় ও সকল বর্ণেরই অকর্ত্তব্য; কিন্তু বিহিত সম্বন্ধের অভাবে এই দুইটি নিষিদ্ধ বিবাহও কেবলমাত্র শূদ্রের পক্ষে করণীয়।

প্রচলিত আচার-ব্যবহারের উপর মানব-সমাজের ভিত্তি অবস্থিত ইহা উপলব্ধি করিয়া সংহিতাকারেরা সেই আচার-ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন ও সেইগুলির স্তর-বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সমাজ-সংস্কারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রে ইতিহাস ও নৃতত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। পুরাণগ্রন্থে সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্বন্তর বা বিভিন্ন মনুর কালের বিবরণ, গ্রহনক্ষত্রাদির বিবরণ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, সমস্ত যুগবার্তা, পুরাবৃত্ত, বিভিন্ন প্রথিতনামা ঋষিদের ও নৃপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ, বংশানুচরিত, যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজসংস্থান, প্রচলিত লৌকিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রভৃতি যথাজ্ঞানে সুসম্বদ্ধ ও শিষ্যপরম্পরায় সুরক্ষিত হইয়াছিল, এবং পরে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য পুরাণ-গ্রন্থগুলিকে "ইতিহাস পুরাণ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বায়ুপুরাণের প্রথম অধ্যায়ের ৩১-৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

> "স্বধর্ম্ম এষসূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈ।
> দেবতানামৃষীনাঞ্চ রাজ্ঞাং চমিততেজসাম্॥
> বংশানাং ধারণং কার্য্যং শ্রুতানাঞ্চমহাত্মনম্।
> ইতিহাস-পুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥

পুরাণগুলিকে অনেকে, বিশেষতঃ অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, ইতিহাসের মধ্যে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। বস্তুতঃ পুরাণপ্রণেতা ঋষিগণ অধিক পরিমাণে ঐতিহ্য বা কিম্বদন্তীর উপর, হয়ত কতকটা অনুমান ও সম্ভাব্যতার উপর, কতকটা প্রমাণনিরপেক্ষ (a priori) অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্জ্ঞানের (অনেকের মতে কল্পনার) উপর নির্ভর করিয়া পুরাণগুলি উপাখ্যানের আকারে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের ঐতিহাসিক ভাবনার (Historical Senseএর) অভাব ছিল এ-কথা বলা সঙ্গত মনে হয় না।

যুগে যুগে যে-সমস্ত কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর মহাপুরুষ-পরম্পরা ভারতের মানব-সমাজের উন্নতির পথে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, পুরাণেতিহাসে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; বস্তুতঃ তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপই প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি। সে যাহা হউক, আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্বমানবের আদিপর্ব্বের জ্ঞান ও ধারণার অভাবে কোনও দেশের বা জাতির ইতিহাসের সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ এখন যাহাকে ইতিহাস বলা হয় তাহা ইতিহাস-বর্ণিত জাতিগুলির বীরপুরুষদের কর্ম্ম বা পুরুষকারের সামান্য প্রতিচ্ছবি মাত্র, জাতীয় জীবনের সমগ্র চিত্র নহে। বুদ্ধি, ভাব ও কর্ম্ম এই তিন শক্তির সমাবেশেই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠিত হয়। ভাব, বুদ্ধি ও কর্ম্ম পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ; একটিকেও ছাড়িয়া দিলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। কোনও জাতির সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি তাহার ভাব ও চিন্তার পরিচায়ক। এজন্য এগুলি বাদ দিলে জাতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। এই সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-তত্ত্বই নৃতত্ত্বের

প্রধান অঙ্গ। কোনও কর্ম্মের প্ররোচক ও অন্তর্নিহিত ভাব ও চিন্তার উপলব্ধি দ্বারা যেমন ঐ কর্ম্মের ও কর্ম্মীর যথার্থ স্বরূপ বোধগম্য হয়, তেমনই কোনও জাতির সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতির পরিচয়েই জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-তত্ত্বই নৃতত্ত্বের প্রাণ-স্বরূপ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা এই সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মানবের সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-তত্ত্ব পুরাণেতিহাসের অঙ্গীভূত ছিল। মানবের বাহ্যাবয়ব অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতির উপরেই প্রাচীন হিন্দুঋষিদের অধিকতর দৃষ্টি থাকায় বাহ্যাবয়ব সম্বন্ধীয় নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করে নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ এই বাহ্য অবয়ব সম্বন্ধীয় নৃতত্ত্বের প্রামাণিকতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন। বস্তুতঃ মানবের শ্বেত-পীত-কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণগত জাতি-বিভাগ (race-classification) পশুজগতের কিংবা উদ্ভিদ-জগতের জাতি-ভেদ (differentiation of species) হইতে অনেকটা বিভিন্ন। পশু বা উদ্ভিদের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ যেমন অধিক স্থলে অনুর্ব্বর হয়, মানবের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সেরূপ বন্ধ্যাতা দৃষ্ট হয় না। ইহা মানবের মূলতঃ একজাতিত্বের পরিচায়ক। আর দেশ-ভেদে ক্রমে জাতিভেদের উৎপত্তি হইলেও দেশান্তর-গমন (migration) প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন দেশের নানা জাতির মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে এত সংমিশ্রণ চলিয়াছে যে আধুনিক সকল জাতিই অল্পবিস্তর বর্ণসঙ্কর,—নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের এইরূপ অভিমত। ভারতের এই মহামানবের তীর্থে বিভিন্ন কালে যে নানা জাতির সমাগম হইয়াছিল বর্ত্তমান ভারত-বাসীদের শোণিতে তাহার বিচিত্র স্বর কোথাও কোথাও আংশিকভাবে ধ্বনিত হইতেছে এই অনুমান একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আর্য্যঋষিরা বাহ্যপ্রকৃতির ও মানবের বাহ্য অবয়বের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা কেবল মানবের বাহ্য অঙ্গ-অবয়বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া তাহার মধ্য দিয়া মানবের অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধান করিতেন ও উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যত্নবান ছিলেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আয়তন পরিমাপের অপেক্ষা তাহাদের আকার-প্রকার ও ভাবব্যঞ্জনার (expressionএর) দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির ও জাতির অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়ের সন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা আদিম অসভ্য জাতিদের "কৃষ্ণত্বক" "খর্ব্বদেহ" ও "অনুন্নত নাসিকা" প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের মস্তিষ্কের ও নাসিকার দীর্ঘ বা চ্যাপ্টা বা মধ্যবিধ আকার অনুসারে সমগ্র মানবজাতির জাতিবিভাগ করেন নাই। সংস্কৃতিতে সম্যক্ উন্নত ব্যক্তি মাত্রই আর্য্য পদবাচ্য হইতে পারিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন আর্য্যঋষিদের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে অন্তর্মুখী ছিল। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া ব্যাপ্তি সিদ্ধান্তের (induction) দ্বারা মানবের অন্তঃপ্রকৃতির সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের পরস্পরের আপেক্ষিক আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে 'ব্রাহ্মণ' 'ক্ষত্রিয়' 'বৈশ্য' 'শূদ্র' এই চারি বর্ণে সমগ্র মানব-জাতিকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি ও দেহাবয়বের ও চিত্তবৃত্তির উপর তাহাদের জন্মগ্রহের গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত মানবের শরীরের ও মনের সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারা নির্ণয় করিয়া এইরূপ বর্ণবিভাগের পোষকতা করিয়াছিলেন। এই প্রাকৃতিক বর্ণবিভাগের সহিত লৌকিক জাতি-বিভাগের কোনও সম্বন্ধ নাই। উপজীবিকা-ভেদে যে ব্যাবহারিক জাতি-ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার প্রত্যেক জাতিই বিভিন্ন স্বাভাবিক বর্ণের ব্যক্তিসমষ্টি। আর্য্যঋষিরা বংশগত স্বভাব ও সংস্কারের এবং উপজীবিকার প্রভাব অগ্রাহ্য করিতেন না বটে, কিন্তু কৌলিক ও লৌকিক জাতি-বিভাগকে অনমনীয় বা অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিতেন না। হিন্দুজাতির ও সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃত্তিগত জাতিভেদ সম্পূর্ণ বংশগত ও অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া পড়ে ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুসংস্কারে দুষ্ট হইয়া সমাজকে বিকলাঙ্গ ও বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বর্ত্তমান বংশগত বিকৃত জাতিভেদ-প্রথা প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রোক্ত গুণগত বর্ণভেদ-প্রথাকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া ক্রমে নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই গুণগত বর্ণভেদের উপরেই গুরুত্ব আরোপণ করিতেন। বস্তুতঃ নৃতত্ত্বের বা বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ভারতের বৃত্তি ও বংশগত

জাতিভেদ কিংবা পাশ্চাত্য দেশের ধনগত জাতিভেদ ও উত্তর-আমেরিকার ও দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেত-কৃষ্ণ-চর্ম্মগত জাতিভেদ অপেক্ষা প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক গুণগত বর্ণভেদই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। তবে ব্যাবহারিক জাতি-বিভাগে বংশ বা কুলের প্রভাব একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

অতঃপর নৃতত্ত্ব অনুশীলনের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে দুই-এক কথা নিবেদন করিব।

নৃতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণাই সম্ভবতঃ নৃতত্ত্ব অনুশীলনে আমাদের ঔদাসীন্যের হেতু। কেহ কেহ মনে করেন যে অসভ্য জাতিদের কৌতুকপ্রদ আচার-ব্যবহার লইয়া অবসর বিনোদন করাই নৃতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। সত্য বটে, বিভিন্ন দেশের মানবের বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতি-প্রকৃতি, জীবিকা, সাজ-সজ্জা, পান-ভোজন, সামাজিক বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস, পূজাপার্ব্বণ ও লোকসাহিত্য প্রভৃতি নৃতত্ত্বের আলোচনার বিষয়ীভূত। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মানব-সমাজের জীবন-ধারার জীবন্ত চিত্র নৃতত্ত্বের সাহায্যে অঙ্কিত হইতেছে। যাদুঘরের কিংবা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর ন্যায় ক্ষণিক আনন্দ প্রদান করা এই চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য নহে। এই সমস্ত আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উদ্ভব-প্রণালী ও তাৎপর্য্য নির্ণয় নৃতত্ত্বের গবেষণার বিষয়ীভূত।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নিখিল সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের নিগূঢ় সত্যের আবিষ্কার করা,—অন্তর্নিহিত অর্থের উদ্ঘাটন করা। সৃষ্টির এই নিহিতার্থের অনুসন্ধানকেই "বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচর্চ্চা" (Study of Science for its own sake) বলা হয়। এই ভাবে ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যে-কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয় তাহা যিনি একবার আস্বাদন করিয়াছেন তিনি আর বিস্মৃত হইতে পারেন না।

বিজ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মহিমার ক্রমিক আবিষ্কার চলিতেছে। নৃতত্ত্বে যে নিগূঢ় সত্যের আবিষ্কার চলিতেছে তাহা এই যে মানবজাতি সমাজবদ্ধ হইয়া আবহমান কাল হইতে অদম্য উৎসাহে ও অসীম আশায় কেবল বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে প্রবৃত্ত তাহা নহে, অন্তঃপ্রকৃতিকেও বশে আনিতে যত্নবান; পশুপ্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির স্ফুরণ ও আধিপত্য স্থাপনে প্রবৃত্ত। এই প্রচেষ্টায় সাফল্যের পরিমাণই সভ্যতার মানদণ্ড।

মানবের ও মানবসমাজের এই নিত্য প্রসারের ও সম্পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ বিভিন্ন দেশের মানব-সমাজে যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে তাহার বিবরণ সঙ্কলন করা নৃতত্ত্বের কার্য্য। এই বিবরণ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য মানবের ও মানব-সভ্যতার চরম লক্ষ্যের সন্ধান। সেই সন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে মানব-সভ্যতার স্তরপরম্পরা মানবের মধ্যেও ভগবত্তার বা ভগবৎ শক্তির ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষ্য সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মার বা পরমাত্মার প্রকাশ ও তজ্জনিত শাশ্বত পূর্ণানন্দলাভ। তাই পুরাণকার বলিয়াছেন—

"মহেশ্বর সর্ব্বমিদং পুরাণম্।"

অর্থাৎ, ভগবানই এই নিখিল পুরাণের প্রতিপাদ্য।

বিজ্ঞানের যে মহান্ লক্ষ্য আর্য্যঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ভরসা করি সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা-প্রণালীর সহিত আমাদের ঋষিপ্রদর্শিত প্রণালীর সংযোজন ও যথাযথ সমন্বয় করিয়া ভারতের নৃতত্ত্বসেবীরা অদূর ভবিষ্যতে নৃতত্ত্বের গবেষণার ও সাধনার এমন একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন যেখানে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্বসেবীরাও প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন। ভারতগৌরব স্যর জগদীশ-চন্দ্রের জড়বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান (Bose Institute of Science) এইরূপ আদর্শেই স্থাপিত। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের পথ সুগম হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈপরীত্য সম্বন্ধে কিপ্‌লিঙের চপল উক্তি—

"East is East, and West is West
And the twain shall never meet,—"

অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানসেবীরা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের যথার্থ মিলনসাধন সম্ভবপর।

নৃতত্ত্বের গবেষণার বিষয় সমগ্র মানবজাতির জীবন। তবে

নৃতত্ত্ব অনুশীলনকল্পে যে আমরা অসভ্য জাতিদের জীবনধারার সবিশেষ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া থাকি তাহার একমাত্র হেতু এই যে আদিম জাতির সামাজিক জীবনই নৃতত্ত্বের আদিক্ষেত্র; এজন্য সেখানেই মানব-সভ্যতার বীজতত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভব।

কিন্তু সম্প্রতি এই জাতিগুলির কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান জাতিগুলি সভ্যতর জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন আদর্শের প্রভাবে ও শিক্ষার সাহায্যে নব আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া সভ্যতার বহু যুগের সঞ্চিত ঋণ (past arrears) পরিশোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ক্ষিপ্রপদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিছুকাল পরে মানব-সভ্যতার নিম্নতম স্তরগুলির এই সমস্ত নিদর্শন একেবারে অন্তর্হিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেবল লোকাচার, বিশেষতঃ স্ত্রীআচার, উপকথা, লোকগীতি, জনশ্রুতি প্রভৃতি লোক-সাহিত্য (folk-lore) সভ্যতার নিম্নতর স্তরগুলির সংস্কৃতির দুর্জ্ঞেয় নিদর্শন-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকিবে। এই জন্যই অসভ্য জাতিদের জীবনধারার ও সংস্কৃতির অলোচনায় নৃতত্ত্বসেবীরা আপাততঃ সর্ব্বাধিক মনোনিবেশ করিতেছেন। কিন্তু সভ্যতর জাতিদের সংস্কৃতির অনুশীলনও নৃতত্ত্ববিৎ উপেক্ষা করেন না।

নৃতত্ত্ব অনুশীলনে বিভিন্ন জাতির রীতি-নীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে সমগ্র মানব-জাতি ও মানব-সভ্যতা পরস্পর-সম্বদ্ধ একই অখণ্ড সত্তা। কেবল অনুশীলনের সৌকর্য্যার্থে, মানবজাতির সমগ্র সভ্যতার ধারা ও গতি সম্যক্ উপলব্ধির সুবিধার জন্য ও কিরূপে বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার পরস্পর সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণে (contact of cultures and intermixture of races) বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির গতি ও বেগ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ইহা অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি খণ্ড খণ্ড ভাবে নৃতত্ত্বে আলোচিত হয়। আর জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তিগুলি একই জাতীয় জীবনের পরস্পর-সম্বদ্ধ বিভিন্ন স্পন্দন বা ক্রিয়া হইলেও কেবল অনুশীলনসৌকর্য্যের জন্য ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিভিন্ন জাতির বস্তুগত সংস্কৃতি (material culture), সমাজ-সংস্থান (social organization), মানসিক সংস্কৃতি (intellectual and aesthetic culture), ধর্ম্মবিশ্বাস ও ক্রিয়া-কলাপ (religious belief and ritual) প্রভৃতি ধারা-গুলি বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন দিক্ দিয়া নৃতত্ত্ববিদেরা পর্য্যালোচনা করেন। এইরূপ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে এই সত্য প্রকট হয় যে জাতীয় জীবনের এই বিভিন্ন স্পন্দনগুলি সমগ্র মানব-সভ্যতার উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ আদিম জাতিগুলির মধ্যেই ইহাদের উৎপত্তি ও প্রথম সাড়া বর্ত্তমান, ও সভ্যতার উচ্চতর স্তর-পরম্পরায় তাহারই ক্রমিক স্ফুরণ হইয়া চলিয়াছে। এইরূপে নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের দ্বারাই সমগ্র মানবজাতির ও মানব সভ্যতার অখণ্ড একত্ব (integral unity) সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই বিশ্বজনের মেলায় যে "চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে," নৃতত্ত্ব সেই সুরগুলি ধরিবার চেষ্টা করে ও তাহাদের মধ্যে মহামানবের জীবনবাণীর মূল সুরের অনুসন্ধান করে।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে প্রকৃত নৃতত্ত্ববিৎ বিশ্ব-মানবের সমগ্র জীবন আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ, ধ্যান ও ধারণা করিয়া জ্ঞানালোকে হৃদয়-মনকে আলোকিত করিতে যত্নবান হন। নৃতত্ত্বের যথাযথ অনুশীলনে সমগ্র মানব জাতির একত্ব ও মানবাত্মার ও মানব-সমাজের অনন্ত উন্নতির ও অক্ষয় আনন্দের দিকে—অমৃতের দিকে—গতির অনুভূতি হয়। যদিও প্রত্যেক জাতির সভ্যতা একটি সরলরেখা ধরিয়া অগ্রসর হয় না, তথাপি মোটের উপর সমগ্র মানব-সভ্যতার গতি উর্দ্ধমুখী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন ও বিমল জ্ঞানানন্দই বিজ্ঞানচর্চ্চার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সূর্য্যালোকের প্রভাবে যেমন বৃক্ষে ফল উৎপন্ন হয়, তেমনই এই জ্ঞানালোক হইতে নানা প্রকার গৌণ ফলও লাভ হয়। তাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুশীলনের প্রবর্ত্তক ইংরেজ মনীষী বেকন বলিয়াছেন, "Light first, fruit afterwards", অর্থাৎ, "বিজ্ঞানানুশীলনের মূল লক্ষ্য জ্ঞানলাভ, পরে তাহা হইতে স্বতঃই ফললাভ ঘটিয়া থাকে।"

নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের এই গৌণ ফলের সম্বন্ধে সামান্য আভাসমাত্র দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নৃতত্ত্বাস্ত-

শীলনে কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও জ্ঞানপিপাসার চরিতার্থতা হয় তাহা নহে, মনের উদার ভাবের উন্মেষণ ও চিত্তে ভূমার সংস্পর্শ লাভ হয়। বিশ্বমানব একই মূল হইতে উদ্ভূত এবং একই ধারার চিন্তা, ভাব ও বাসনায় অনুপ্রাণিত, ও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একই লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত, সমগ্র মানব জাতির এক-জাতিত্বের এই উপলব্ধির দ্বারা আত্মার অসীমত্বের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই আত্মপ্রসারের ফলে নৃতত্ত্বসেবী সাধকের হৃদয়ে সার্ব্বজনীন সহানুভূতির ও প্রীতির প্রচ্ছন্ন উৎস উন্মুক্ত ও প্রকটিত হয়। এবং মানবেতর জীবজগতের জৈব-দ্বন্দ্বের (biological rivalry-র) পরিবর্ত্তে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই সার্ব্বজনীন আত্মীয়তাবোধ পরিস্ফুট হয়।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় মানব-সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা—প্রথম অধ্যায়ের বিষয়ীভূত। আর নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের ফলে যে একাত্মানুভূতি জন্মে তাহাই সভ্যতার ইতিহাসের শেষ কথা। এজন্য নৃতত্ত্বকে সমগ্র মানব-সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

নৃতত্ত্বানুশীলনের সুফল কেবল নৃতত্ত্বসেবীর নিজের জ্ঞানলাভ ও চিত্তের প্রসারেই পর্য্যবসিত হয় না। নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নানা জাতির সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কার, সুখ-দুঃখ, ভয় ও আশার সহিত পরিচিত হইলে ধর্ম্মপ্রচারক, শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রশাসক এবং বিচারকও স্ব-স্ব কর্ত্তব্য ও জীবনব্রত অধিকতর নিপুণভাবে পালন করিতে সমর্থ হইবেন। আর নৃতত্ত্বজ্ঞান হইতে যে সার্ব্বজনীন সহানুভূতি, সমবেদনা ও প্রীতি উদ্ভূত হয় তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ স্ব-স্ব শক্তি ও সুযোগানুসারে প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, নানাবিধ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, দুর্নীতিমূলক ও পীড়াদায়ক সামাজিক আচারে ক্লিষ্ট আদিম জাতিদের হিতকল্পে সাধ্যানুযায়ী যত্ন ও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বহুকাল যাবৎ আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিকূল অবস্থার পীড়নে যে-সমস্ত অন্ত্যজ আদিম জাতির গতিশক্তি এত দিন রুদ্ধপ্রায় আছে, তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যপালনে নৃতত্ত্বজ্ঞান আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবে। নৃতত্ত্বানুশীলনের দ্বারা আমরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে ঐ সব পশ্চাৎপদ জাতিরা আমাদেরই ভ্রাতা-ভগ্নী। তাহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

"এই সব মৌন ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

দৈবদুর্ব্বিপাকে সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রতিকূল আবেষ্টনীর প্রভাবে ও সভ্যতর জাতিদের এবং উচ্চতর সংস্কৃতির সংস্পর্শের অভাবে (মনুর ভাষায়, "ব্রাহ্মণানাং অদর্শনাৎ") অনেকগুলি আদিম জাতি প্রায় স্থাণুবৎ নিশ্চল রহিয়াছে। আর অপর পক্ষে ভগবৎপ্রসাদে অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাবে এবং বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে ও আংশিক সংমিশ্রণে বর্ত্তমান সভ্য জাতিদের অভিব্যক্তির বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ঐ সমস্ত আদিম জাতির প্রতি সভ্যতাভিমানী জাতিদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা এ পর্য্যন্ত আমাদের এই অনুন্নত পশ্চাৎপদ আত্মীয়দের সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তাই করি নাই। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের যথাসাধ্য সহায়তা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, এ কথা আমরা এত দিন বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এই কর্ত্তব্য পালনে আশা করা যায়, নৃতত্ত্ব-জ্ঞান আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে। আর সভ্যতার নব নব ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাইতে গিয়া এই সব জাতি যাহাতে সুধার সঙ্গে হলাহল পান না করে এ সম্বন্ধেও, আশা করা যায়, সমাজ-সংস্কারকেরা নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে যথাযথ উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন। রাষ্ট্রশাসন ও বিচারকার্য্যে নৃতত্ত্ব-জ্ঞানের উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-পরিচালকেরা এখন সজাগ হইয়াছেন; ভরসা করি ভারত-সরকারও হইবেন। দুঃখের বিষয়, যদিও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য বিলাতে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে নৃতত্ত্ব অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, ভারতে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে নৃতত্ত্ব এখন পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে পরিগৃহীত হয় না।

সে যাহা হউক, নৃতত্ত্ব-অনুশীলন হইতে আর একটি প্রকৃষ্ট ফল প্রত্যাশা করা যায়। তাহা এই যে নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র মানব-জাতির ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ উপলব্ধি হইলে জগতে যথার্থ মহা-মানব-সংঘ,—জেনেভা-মার্কা রাজনৈতিক

সংঘ (League of Nations) নহে, — যথাথ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ("Parliament of Man,— the Federation of the World") স্থাপিত হইতে পারে। তখনই সফল হইবে রাজ-কবি টেনিসনের স্বপ্ন :—

"Earth at last a warless world,
A single race, a single tongue."

মানবজাতির নিত্য-প্রসার্য্যমান জীবনধারা পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, সৃষ্টিকালে ভগবান মানবের মধ্যে যে অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত রাখিয়াছিলেন তাহারই অভিব্যক্তি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। কবির ভাষায়,—

"Only That which made us meant us to be
mightier by and by,—
Set the sphere of all the boundless heavens
within the human eye,
Sent the shadow of Himself, the boundless,
through the human soul,
Boundless inward, in the atom, boundless
outward in the whole."

পরিশেষে, নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের চরম ফল এই যে ইহা দ্বারা মানবজাতির মধ্য দিয়া ভগবানের বিশ্ব-মানব রূপের ধ্যান ও ধারণা জন্মায়।

ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের মহান্ মন্ত্র (১০ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত) নৃতত্ত্ব-সাধনার সিদ্ধিমন্ত্র রূপেই আমার নিকট প্রতিভাত হয়।

"সহস্র-শীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্র-পাৎ পুরুষ" বা ভগবান হইতে উদ্ভূত বিশ্ব-রূপী বিরাট পুরুষের বিশ্বপশুরূপে আত্মাহুতি প্রদান ও সেই যজ্ঞে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বিভিন্ন বর্ণের মানবের উৎপত্তি ও যজ্ঞাবশেষ হইতে অপর সমস্ত জীবের উৎপত্তি,—ভগবানের বিশ্বরূপে ও বিশেষতঃ মানব-রূপে আত্মপ্রকাশের এমন সুস্পষ্ট মহান্ চিত্র বা রূপক (metaphor) পৃথিবীর অপর কোনও সাহিত্যে আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

মায়ামৃগ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

এই কাহিনীটি আমার নিজস্ব নয়; অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে ধূম-বিশেষ সহযোগে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। তাই সর্ব্বাগ্রে নিজের সমস্ত দাবী-দাওয়া তুলিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিতেছি।

যে হঠাৎ-লব্ধ বন্ধুটির মুখে এ কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তিনি নিজের চারিধারে এমন একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের জাল রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার গল্পকে ছাপাইয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই একটা প্রবল কৌতূহল আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। মাত্র দুইবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তার পর তিনি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। জানি না, এখন তিনি কোথায়। হয়ত শ্যামদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে দুরারোহ গিরিসঙ্কটের মধ্যে সেই অদ্ভুত মায়ামৃগের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তবে নিশ্চয় ভাবে বলিতে পারি না; শুনিয়াছি বড় বড় শিকারীদের কথা একটু লবণ সহযোগে গ্রহণ করিতে হয়।

এই কাহিনী আমি যেমনটি শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনটিই লিপিবদ্ধ করিব। কয়েক স্থানে বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। ভরসা শুধু এই, যাঁহারা ইহা পড়িবেন তাঁহারা সকলেই আমা-অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, বুঝিবার মত ইঙ্গিত কিছু থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয় ধরিয়া ফেলিবেন, এবং কাহিনীটি যদি নিছক আষাঢ়ে গল্পই হয়,

তাহা হইলেও তাঁহাদের বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। আমি কেবল মাছি-মারা ভাবে অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া খালাস।

* * *

গত শীতকালে একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ খেয়াল হইল পক্ষীশিকারে বাহির হইব। বড়দিনের ছুটি যাইতেছে, শীতও বেশ কন্‌কনে। বৎসরের মধ্যে ঠিক এই সময়টাতে, কেন জানি না, পক্ষীজাতির উপর নিদারুণ জিঘাংসা জাগিয়া উঠে।

সঙ্গী পাইলাম না; একাই বাইসিকেল আরোহণে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বন আছে, শস্যপুষ্ট নানা জাতীয় পক্ষী এই সময় তাহাতে ভীড় করিয়া থাকে।

সারা দুপুরটা জঙ্গলের মধ্যে মন্দ কাটিল না। কয়েকটা পাখীও জোগাড় হইল। কিন্তু অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিবার কথা যখন স্মরণ হইল তখন দেখি, অজ্ঞাতে শিকারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি—প্রায় বারো মাইল। শরীরও বেশ ক্লান্ত হইয়াছে এবং পাকস্থলী অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে নিজের রিক্ততা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শীঘ্র বাড়ী পৌঁছিতে হইবে। বন হইতে পাকা সড়কে উঠিয়া গৃহাভিমুখে বাইসিকেল চালাইলাম। গৈরিক ধূলায় সমাচ্ছন্ন পথ, দু-ধারে কখনও অড়রের ঘন-পল্লব ক্ষেত, কখনও নিসন্দের ঝাড়; কখনও বা ধূম-চন্দ্রাতপে ঢাকা ক্ষুদ্র দু-একটা বস্তি।

যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিয়াছি; আলো থাকিতে থাকিতে বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই ভাল; কারণ বাইসিকেলের বাতি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

দিনের আলো ক্রমে নিবিয়া আসিতে লাগিল। গো-ক্ষুর ধূলায় শীত-সন্ধ্যার অবসন্ন দীপ্তি আরও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এই আধা-আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া নিষ্করুণ দীর্ঘ পথটা মৃত সর্পের মত পড়িয়া আছে মনে হইল।

চার-পাঁচ মাইল অতিক্রম করিবার পর দেখিলাম হাত দুটা শীতের হাওয়ায় অসাড় হইয়া আসিতেছে; বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেল ধরিয়া আছি কিনা টের পাইতেছি না। দু-একবার ক্ষুদ্র ইটের টুকরায় ঠোকর খাইয়া পড়ি-পড়ি হইয়া বাঁচিয়া গেলাম। রাস্তার উপর কোথায় কি বিঘ্ন আছে, আর ভাল দেখিতে পাইতেছি না।

আরও কিছু দূর গিয়া বাইসিকেল হইতে নামিতে হইল। দ্বিচক্রযানে আরোহণ আর নিরাপদ নয়; এই স্থানে বাইসিকেল হইতে আছাড় খাইলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে।

এইবার সমস্ত চেতনাকে অবসন্ন করিয়া নিজের অবস্থাটা পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইল। পৌষ মাসের অন্ধকার রাত্রে ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত দেহ লইয়া গৃহ হইতে ছয়-সাত মাইল দূরে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি। কোথাও জনপ্রাণী নাই; সঙ্গীর মধ্যে কয়েকটা মৃত পক্ষী, একটা ভারী বন্দুক এবং ততোধিক ভারী অকর্ম্মণ্য দ্বিচক্রযান। এইগুলিকে বহন করিয়া বাড়ী পৌঁছিতে হইবে; পথ পরিচিত বটে, কিন্তু অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নৈরাশ্যে হাত-পা যেন শিথিল হইয়া গেল।

কিন্তু তবু দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। দিল্লী দুরন্ত! যেমন করিয়া হোক বাড়ী পৌঁছনো চাই! বাইসিকেল ঠেলিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। এই দুঃসময়েও কবির কাব্য মনে পড়িয়া গেল—

ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কবির বিহঙ্গের অবস্থা আমার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল না।

বোধ হয় এক ঘণ্টা এইভাবে চলিলাম। শীতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে শরীর অবশ হইয়া গিয়াছিল, মনটাও সেই সঙ্গে কেমন যেন আচ্ছন্ন ও সাড়হীন হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সচেতন হইয়া মনে হইল, পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি; কারণ, পায়ের নীচে পাকা রাস্তার কঠিন প্রস্তরময় স্পর্শ আর পাইতেছি না,—হয় কাঁচা পথে নামিয়া আসিয়াছি, নয়ত অজ্ঞাতসারে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইয়াছি। সভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। রন্ধ্রহীন অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া আছে- কোনও দিকে দৃষ্টি চলে না। কেবল ঊর্দ্ধে নক্ষত্রগুলা শিকারী জন্তুর নিষ্করুণ চক্ষুর মত আমার পানে নির্নিমেষ লুব্ধতায় তাকাইয়া আছে!

এই নূতন বিপৎপাতের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া ভাবিলাম, যেদিকে হোক চলিতে যখন হইবেই তখন সামনে চলাই ভাল ; পিছু ফিরিলে হয়ত আবার জঙ্গলের দিকেই চলিয়া যাইব। এটা যদি কাঁচা রাস্তাই হয় তবে ইহার প্রান্তে নিশ্চয় লোকালয় আছে। একটা মানুষের সাক্ষাৎ পাইলে আর ভাবনা নাই।

লোকালয় ও মানুষের সাক্ষাৎকার যে একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

দু-পা অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় চোখের উপর একটা তীব্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল এবং আলোকের পশ্চাৎ হইতে কড়া সুরে প্রশ্ন আসিল, 'কে ? কৌন্ হায় ?'

আলোকের অসহ্য রূঢ়তা হইতে অনভ্যস্ত চক্ষুকে বাঁচাইবার জন্য একটা হাত আপনা হইতে মুখের সম্মুখে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইল ; তখন আরও কড়া হুকুম আসিল, 'হাত নামাও। কে তুমি ?'

হাত নামাইলাম ; কিন্তু কি বলিয়া নিজের পরিচয় দিব ভাবিয়া পাইলাম না, দু-বার 'আমি—আমি' বলিয়া থামিয়া গেলাম।

আলোকধারী আরও কাছে আসিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। এতক্ষণে আমার চক্ষুও আলোকে অভ্যস্ত হইয়াছিল ; দেখিলাম আলোটা যত তীব্র মনে করিয়াছিলাম তত তীব্র নয়—একটা সাধারণ বৈদ্যুতিক টর্চ্চ। আলোকধারীকেও আবছায়া ভাবে দেখিতে পাইলাম, সে বাঁ-হাতে টর্চ্চ ধরিয়াছে এবং ডান হাতে কি একটা জিনিষ আমার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া আছে।

আলোকধারী আবার কথা কহিল, এবার সুর বেশ নরম। বলিল, 'আপনি বাঙালী দেখছি। এ সময়ে এখানে কি ক'রে এলেন ?'

এই প্রশ্নটা আমার মনেও এতক্ষণ চাপা ছিল, পরিস্ফুট হইতে পায় নাই। আমি বলিলাম, 'আপনিও ত বাঙালী ;—এখানে কি করছেন ?'

'সে কথা পরে হবে। আপনি কেন এখানে এসেছেন আগে বলুন।' আবার সুর একটু কড়া।

ক্ষীণস্বরে বলিলাম, 'কাছেই জঙ্গল আছে, সেখানে শিকার করতে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল—পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'আপনার বাড়ী কোথায় ?'

'মুঙ্গের, এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল হবে।'

'নাম কি ?'

নাম বলিলাম। মনে হইল যেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া উকিলের জেরার উত্তর দিতেছি।

কিছুক্ষণ আর কোনও প্রশ্ন হইল না। লক্ষ্য করিলাম, প্রশ্নকর্ত্তার উদ্যত ডান হাতখানা পকেটের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। টর্চ্চের আলোও আমার মুখ হইতে নামিয়া মাটির উপর একটা উজ্জ্বল চক্র সৃজন করিল।

'আপনি নিশ্চয় বাড়ী ফিরতে চান ?'

সাগ্রহে বলিলাম, 'সে কথা আর বলতে! তবে একটা আলো না পেলে—' প্রচ্ছন্ন অনুরোধটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ কোনো জবাব নাই। তার পর হঠাৎ তিনি বলিলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। আপনি শিকারী ; আমি শিকারীর ব্যথা বুঝি। বোধ হয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে, ক্লান্তও হয়েছেন ; এক পেয়ালা গরম চা বোধ করি মন্দ লাগবে না। আমি কাছেই থাকি।—আসুন।'

গরম চায়ের নামে সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলাম, 'চলুন।'

২

দুই জন পাশাপাশি চলিলাম। টর্চ্চের রশ্মি অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না, বিশ কদম যাইতে-না-যাইতে একটি ভগ্ন জরাজীর্ণ বাড়ীর উপর আলো পড়িল। বাড়ী বলিলাম বটে, কিন্তু বস্তুত সেটা একটা ইট-কাঠের স্তূপ। চারিদিকে খসিয়া-পড়া-ইট ছড়ানো রহিয়াছে ; যেটুকু দাঁড়াইয়া আছে তাহাও জঙ্গলে, কাঁটাগাছে এমন ভাবে আচ্ছন্ন যে সেখানে বাঘ লুকাইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের কিছু নাই। একটা তরুণ অশথগাছ সম্মুখের ছাদহীন দালানের ভিত্তি কাটাইয়া মাথা তুলিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশের পথ ঘন-পল্লবে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে।

বাড়ীখানা সত্তর-আশী বছর আগে হয়ত কোনও স্থানীয় জমিদারের বাসভবন ছিল, তার পর বহুকাল পরিত্যক্ত

থাকিয়া প্রকৃতির প্রকোপে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভিতরে বাসোপযোগী ঘর দু-এক খানা এখনও খাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী বলিলেন, 'বাইসিকেল্ এইখানে রাখুন।'—বলিয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিলেন।

আমি আর বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'আপনি এই বাড়ীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল যে অযথা কৌতূহল তিনি পছন্দ করেন না। আর প্রশ্ন করিলাম না, দেয়ালের গায়ে বাইসিকেল্ হেলাইয়া রাখিয়া তাঁহার অনুগামী হইলাম। তবু মনের মধ্যে নানা উত্তেজিত প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। বিহারের এক প্রান্তে শহর—লোকালয় হইতে বহুদূরে একটি ভাঙা বাড়ীর মধ্যে এই বাঙালী ভদ্রলোকটি কি করিতেছেন? কে ইনি! এই অজ্ঞাতবাসের অর্থ কি?

নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তরের পথ কিন্তু অতিশয় কুটিল ও বিঘ্নসঙ্কুল। সদর দ্বারের অশথগাছ উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম একটা দেয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাকে এড়াইয়া আরও কিছু দূর যাইবার পর দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড শালের কড়ি বক্রভাবে প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইয়া মাঝখানে আগড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পদে পদে কাঁটাগাছ বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ধরিতে লাগিল; যেন আমাদের ভিতরে যাইতে দিবার ইচ্ছা কাহারও নাই।

যা হোক, অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এক দরজার সম্মুখে আসিয়া আমার সঙ্গী দাঁড়াইলেন। দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো।

তালা খুলিয়া তিনি মরিচা-ধরা ভারী দরজা উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তার পর আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অন্ধকার গহ্বরের মত ঘর দেখিয়া সহসা প্রবেশ করিতে ভয় হয়। কিন্তু যে চক্রব্যূহের এতটা পথ নিরাপত্তিতে আসিয়াছি, তাহার মুখ হইতে ফিরিব কি বলিয়া? বুকের ভিতর অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল—এই অজ্ঞাতকুলশীল সঙ্গীটি কেমন লোক? কোথায় আমাকে লইয়া চলিয়াছেন?

কণ্ঠের মধ্যে একটা কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ করিয়া চৌকাঠ পার হইলাম। তিনিও ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। টর্চ্চের আলো একবার চারিদিকে ঘুরিয়া নিবিয়া গেল।

রুদ্ধশ্বাসে অনুভব করিলাম, তিনি আমার পাশ হইতে সরিয়া গিয়া কি একটা জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। পরক্ষণেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় ঘর ভরিয়া গেল।

এতক্ষণে আমার আবছায়া সঙ্গীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মধ্যমাকৃতি লোকটি, রোগা কিংবা মোটা কোনটাই বলা চলে না, মুখের গড়নও নিতান্ত সাধারণ,—কেবল চোখের দৃষ্টি অতিশয় গভীর, মনে হয় যেন সে-দৃষ্টির নিকট হইতে কিছুই লুকান চলিবে না। চোয়ালের হাড় দৃঢ় ও পরিপুষ্ট, গোঁফ-দাড়ি কামান—বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি। পরিধানে একটা চেক-কাটা রেশমের লুঙ্গি ও পাঁশুটে রঙের মোটা কোট-সোয়েটার। তাঁহার চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া সহসা তাঁহার জাতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাঁহার গম্ভীর সপ্রশ্ন চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া অধরে একটু হাসির ভঙ্গিমা করিয়া তিনি বলিলেন, 'স্বাগত। বন্দুক রাখুন।'

বন্দুক কাঁধেই ঝোলান ছিল; পাখীর থলেটাও সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলা নামাইতে নামাইতে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ঘরের মাঝখানে একটা প্যাকিং বাক্সকে কাত করিয়া টেবিলে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার উপর কেরোসিন ল্যাম্প রক্ষিত। ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল, ঘরটি মাঝারি আয়তনের, এক কোণে পুরু ভাবে খড় পাতা রহিয়াছে, ইহাই বোধ হয় বর্ত্তমান গৃহস্বামীর শয্যা। ইহা ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নাই। ঘরের লবণ-জর্জ্জরিত দেওয়ালগুলি যেন আপনার নিরাভরণ দীনতার কথা স্মরণ করিয়াই ক্লেদ-সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দুক দেয়ালে হেলাইয়া রাখিলে গৃহস্বামী বলিলেন, 'আপনার ওটা কি বন্দুক ?'

বলিলাম, 'সাধারণ শুট্-গান্।' খাঁটি দেশী জিনিষ কিন্তু; এখানকারই তৈরি।'

তিনি আসিয়া বন্দুকটা হাতে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার বন্দুক-ধরার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম আগ্নেয়াস্ত্র-চালনায় তিনি অনভ্যস্ত নন। বন্দুকের ঘাড় ভাঙিয়া নলের ভিতর দিয়া দৃষ্টি চালাইয়া তিনি বলিলেন,—মন্দ জিনিষ নয়ত। পঁচাত্তর গজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার পাল্লা মারবে। একটু বেশী ভারি—তা ক্ষতি কি ?—কই কি পাখী মেরেছেন দেখি ?'

তিনি নিজেই থলে আজাড় করিয়া পাখীগুলি বাহির করিলেন। তার পর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন,—'বাঃ এ যে তিতির আর বন-পায়রা দেখছি। দুটো হারিয়ালও পেয়েছেন;—এদিকে অনেক হারিয়াল পাওয়া যায়—আমি দেখেছি।'

দেখিলাম অকৃত্রিম শিশুসুলভ আনন্দে তাঁহার মুখ ভরিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ আমাদের মাঝখানে যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবধান ছিল তাহা যেন অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া গেল।

পাখীগুলিকে সস্নেহে নাড়িয়া-চাড়িয়া অবশেষে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, একটু লজ্জিত স্বরে বলিলেন, 'চায়ের আশ্বাস দিয়ে আপনাকে এনে কেবল পাখীই দেখছি। আসুন চায়ের ব্যবস্থা করি। আপনি বসুন; কিন্তু বসতে দেব কোথায়।—একটু অপেক্ষা করুন।' তিনি দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া পরক্ষণেই দুটি ছোট মজবুত-গোছের প্যাকিং কেস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, একটিকে টেবিলের পাশে বসাইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া শয্যার দিকে গেলেন, সেখান হইতে একটা সাদা লোমশ আসন আনিয়া বাক্সের উপর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এবার বসুন।'

শাদা আস্তরণটা আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন জন্তুর চামড়া, ধবধবে সাদা রেশমের মত মোলায়েম দীর্ঘ লোমে ঢাকা চামড়াটি; দেখিলেই লোভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিসের চামড়া ?'

তিনি বলিলেন. 'হরিণের।'

বিস্মিত ভাবে বলিলাম, 'হরিণের! কিন্তু—সাদা হরিণ ?'

তিনি একটু হাসিলেন, 'হাঁ—সাদা হরিণ।'

সাদা হরিণের কথা কোথাও শুনি নাই, কিন্তু, কে জানে, থাকিতেও পারে। প্রশ্ন করিলাম, 'কোথায় পেলেন ? উত্তরমেরুর হরিণ নাকি ?'

তিনি মাথা নাড়িলেন, 'না, অত দূরের নয়, শ্যাম-দেশের। ওর একটা মজার ইতিহাস আছে।—কিন্তু আপনি বসুন' বলিয়া আতিথ্যসৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেখা গেল তাঁহার প্যাকিং বাক্সটি কেবল টেবিল নয়, তাঁহার ভাঁড়ারও বটে। তাহার ভিতর হইতে একটি ষ্টোভ বাহির করিয়া তিনি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চায়ের কৌটা, চিনির মোড়ক, জমানো দুধের টিন ও দুটি কলাই-করা মগ বাহির করিয়া পাশে রাখিলেন। তার পর একটি অ্যালু-মিনিয়ামের ঘটিতে জল লইয়া ষ্টোভে চড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার ক্ষিপ্র নিপুণ কার্য্যতৎপরতা দেখিতে দেখিতে আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি যে এক জন পাকা শিকারী তা ত বুঝতে পারছি, আপনার নাম কি ?'

তাঁহার প্রফুল্ল মুখ একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন, 'আমার নাম শুনে আপনার লাভ কি ?'

'কিছুই না। তবু কৌতূহল হয় না কি ?'

'তা বটে। মনে করুন আমার নাম—প্রমথেশ রুদ্র।'

বুঝিলাম, আসল নামটা বলিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

তার পর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি একলা এই ভাঙা বাড়ীতে কেন রয়েছেন এ প্রশ্ন করাও ধৃষ্টতা হবে কি ?'

তিনি উত্তর দিলেন না, যেন আমার প্রশ্ন শুনিতে পান নাই এমনি ভাবে ষ্টোভে পাম্প করিতে লাগিলেন; মনে হইল তাঁহার চোখের উপর একটা অদৃশ্য পর্দ্দা নামিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে চায়ের জল ষ্টোভের উপর ঝিঁঝিপোকার মত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

তিনি সহজভাবে বলিলেন, 'চায়ের জলও গরম হয়ে এল। কিন্তু শুধু চা খাবেন ? আমার ঘরে এমন কিছু নেই যা-দিয়ে অতিথিসেবা করতে পারি। কাল রাত্রে তৈরি

খানকয়েক শুকনো রুটি আছে, কিন্তু সে বোধ হয় আপনার গলা দিয়ে নামবে না।'

আমি বলিলাম, 'ক্ষিদের সময় গলা দিয়ে নামে না এমন কঠিন বস্তু পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু তা ছাড়াও ঐ পাখীগুলা ত রয়েছে! ওগুলার সৎকার করলে হয় না?'

'ওগুলা আপনি বাড়ী নিয়ে যাবেন না?'

'বাড়ী নিয়ে গিয়েও ত খেতেই হবে! তবে এখানে খেতে দোষ কি? পাখীগুলা এক জন যথার্থ শিকারীর পেটে গিয়ে ধন্য হ'ত।'

তিনি হাসিলেন, 'মন্দ কথা নয়। পাখীর স্বাদ ভুলেই গেছি।' তাঁহার মুখে একটা বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল; যেন পাখীর স্বাদ ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা মিষ্ট কৌতুক লুক্কায়িত আছে। হাসিটি আত্মগত, আমাকে দেখাইবার ইচ্ছা বোধ হয় তাঁহার ছিল না; তাই ক্ষণেক পরে সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাহলে ওগুলাকে ছাড়িয়ে ফেলা যাক—কি বলেন? নরম মাংস, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে।'

তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পাখী ছাড়াইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। সেই পুরাতন প্রশ্নই মনে জাগিতে লাগিল—কে ইনি? লোকচক্ষুর আড়ালে লুকাইয়া শুকনা রুটি খাইয়া জীবনযাপন করিতেছেন কেন?

এক সময় তিনি সহাস্যে মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'আজ একটু শীত আছে। চামড়াটা বেশ গরম মনে হচ্ছে ত?'

'চমৎকার। আচ্ছা, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন—না?'

'হ্যাঁ।'

'প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, তবে সম্ভবত শিকারের জন্যেই দেশ-বিদেশে ঘুরে বেরিয়েছেন?'

'তা বলতে পারেন।'

যিনি নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন তাঁহার সহিত অন্য কথা বলাই ভাল। তাই ইচ্ছা করিয়া শিকারের আলোচনাই আরম্ভ করিলাম, বিশেষতঃ সাদা চামড়াটা সম্বন্ধে বেশ একটু কৌতুহলও জাগিয়াছিল।

বলিলাম, 'শ্যামদেশে সাদা হরিণ পাওয়া যায়? কিন্তু কোথাও পড়ি নি ত?'

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'না পড়বারই কথা। ও হরিণ আর কেউ চোখে দেখে নি। চোখে দেখার জিনিষ ও নয়।'

'কি রকম?'

'পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্য্য জীব আছে—ঐ হরিণ তার মধ্যে একটি। প্রকৃতির সৃষ্টিতে এর তুলনা নেই।'

'কি ব্যাপার বলুন ত? অবশ্য সাদা হরিণ খুবই অসাধারণ, কিন্তু—'

'আপনি কেবল সাদা চামড়াটা দেখছেন। আমি কিন্তু ওকে দেখেছি সম্পূর্ণ অন্য রূপে—অর্থাৎ দেখি নি বললেই হয়।'

'আপনি যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন, 'অদৃশ্য প্রাণীর কথা কখনও শুনেছেন?'

'অদৃশ্য প্রাণী! সে কি?'

'হ্যাঁ—যাদের চোখে দেখা যায় না, চোখের সামনে যারা মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়। শ্যামদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকায় আমি তাদের দেখেছি,—বিশ্বাস করছেন না? আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তখন ওই চামড়াটা স্পর্শ ক'রে দেখি।'

'বড় কৌতুহল হচ্ছে; সব কথা আমায় বলবেন কি?'

তিনি একটু খামখেয়ালি-হাসি হাসিলেন, বলিলেন, 'বেশ;—চায়ের জল হয়ে গেছে, মাংসটা চড়িয়ে দিয়ে এই অদ্ভুত গল্প আরম্ভ করা যাবে। সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ হবে না।'

৩

চায়ের পাত্র সম্মুখে লইয়া দু-জনে মুখোমুখি বসিলাম। এক চুমুক পান করিতেই মনে হইল শরীরের ভিতর দিয়া অত্যন্ত সুখকর উত্তাপের একটা প্রবাহ বহিয়া গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন চা?'

বলিলাম, 'চা নয়—নির্জ্জলা অমৃত। এবার গল্প আরম্ভ করুন।'

তিনি কিছুক্ষণ শূন্যের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু স্মৃতিচ্ছায়ায় আবিষ্ট হইল। তিনি থামিয়া থামিয়া অসংলগ্ন ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

'গত বছর এই সময়—কিছুদিন আগেই হবে; হ্যাঁ, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আমি আর আমার এক বন্ধু পাকেচক্রে প'ড়ে বর্ম্মার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলুম।

'বন্ধুটির নাম জঙ্-বাহাদুর—নেপালী ক্ষত্রিয়। আমাদের লটবহরের মধ্যে ছিল দুটি কম্বল আর দুটি রাইফেল। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে যাত্রা সুরু করতে হয়েছিল তাই বেশী কিছু সঙ্গে নিতে পারি নি।

'অফুরন্ত পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে পথঘাট সব গুলিয়ে গিয়েছিল। যেখানে মাসান্তে মানুষের মুখ দেখা যায় না, এবং শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা বা শিকারী জন্তুর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াই পা-চালানোর একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে স্থান-কাল ঠিক রাখা শক্ত। আমরা শুধু পূর্ব্বদিকটাকে সামনে রেখে আর-সব শ্রীভগবানের হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়ে চলেছিলুম। কোথায় গিয়ে এ যাত্রা শেষ হবে তার কোন ঠিকানা ছিল না।

'একদিন একটা প্রকাণ্ড নদী বেতের ডোঙায় ক'রে পার হয়ে গেলুম। জানতেও পারলুম না যে বর্ম্মাকে পিছনে ফেলে আর এক রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। জানতে অবশ্য পেরেছিলুম—কয়েক দিন পরে।

'মেকং নদীর নাম নিশ্চয় জানেন। সেই মেকং নদী আমরা পার হলুম এমন জায়গায় যেখানে তিনটি রাজ্যের সীমানা এসে মিশেছে—পশ্চিমে বর্ম্মা, দক্ষিণে শ্যামদেশ, আর পূর্ব্বে ফরাসী-শাসিত আনাম। এ সব খবর কিন্তু পার হবার সময় কিছুই জানতুম না।

'মেকং পার হয়ে আমরা নদীর ধার ঘেঁষে দক্ষিণ মুখে চললুম। এদিকে পাহাড় জঙ্গল ওরই মধ্যে কম, মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম আছে। শিকারও প্রচুর। খাদ্যের অভাব নেই। জঙ্-বাহাদুর এ দেশের ভাষা কিছু কিছু বোঝে, তাই রাত্রিকালে গ্রামে কোন গৃহস্থের কুটীরে আশ্রয় নেবার সুবিধা হয়—দুর্জ্জয় শীতে মাথা রাখবার জায়গা পাই।

'বড় শহর বা গ্রাম আমরা যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতুম। তবু একদিন ধরা প'ড়ে গেলুম। দুপুরবেলা দু-জনে একটা পাথুরে গিরিসঙ্কটের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বাঁ-দিক থেকে কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠে দেখি, একটা লোক পাথরের চাঙড়ের আড়ালে থেকে রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের লক্ষ্য ক'রে আছে। দিশী লোক—নাক চ্যাপ্‌টা থ্যাবড়া মুখ কিন্তু তার পরিধানে সিপাহীর ইউনিফর্ম্ম; গায়ে খাকি পোষাক, মাথায় জরির কাজ করা গোল টুপী, পায়ে পটি আর অ্যামুনিশন বুট।

'বুঝতে বাকী রইল না যে বিপদে পড়েছি। সিপাহী সেই অবস্থাতেই বাঁশী বাজালে; দেখতে দেখতে আরও দু-জন এসে উপস্থিত হ'ল। তখন তারা আমাদের সামনে রেখে মার্চ্চ করিয়ে নিয়ে চলল।

'কাছেই তাদের ঘাঁটি। সেখানকার অফিসার আমাদের খানাতল্লাস করলেন, অনেক প্রশ্ন করলেন যার একটাও বুঝতে পারলুম না, তার পর বন্দুক আর টোটা বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে চার জন সিপাহীর জিম্মায় দিয়ে আমাদের রওনা ক'রে দিলেন।

'মাইল-তিনেক যাবার পর দেখলুম এক শহরে এসে পৌঁছেছি। নদীর ধারেই শহরটি—খুব বড় নয়, কিন্তু ছবির মত দেখতে।

'সিপাহীরা নদীর কিনারায় একটা বড় বাংলায় আমাদের নিয়ে হাজির করলে। এখানে শহরের সবচেয়ে বড় কর্ম্মচারী থাকেন।

'যথাসময়ে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম তিনি এক জন ফৌজী অফিসার—জাতিতে ফরাসী—বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, গায়ের রং বহুকাল গরম দেশে থেকে তামাটে হয়ে গেছে।

'তিনি ইংরেজী কিছু কিছু বলতে পারেন। আমার সঙ্গে প্রথমেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল। ফরাসীদের মত এমন মিশুক জাত আর আমি দেখি নি, সাদা-কালোর প্রভেদ তাদের মনে নেই। এঁর নাম কাপ্তেন দু'বোয়া। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ সুরু ক'রে দিলেন। তাঁরই মুখে প্রথম জানতে পারলুম, আমরা আনাম দেশে এসে পড়েছি, নদীর ওপারে ঐ পর্ব্বত-বন্ধুর দেশটা শ্যামরাজ্য। মেকং নদী এই দুই রাজ্যের সীমান্ত রচনা ক'রে বয়ে গেছে।

'আমরা কোথা থেকে আসছি, কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এ সব প্রশ্নও তিনি করলেন। যথাসাধ্য সত্য উত্তর দিলুম। বললুম প্রাচ্যদেশ পদব্রজে ভ্রমণ করবার অভিপ্রায়েই বৃটিশ

রাজ্য থেকে বেরিয়েছি, পাসপোর্ট নেওয়া যে দরকার তা জানতুম না। তবে শিকার এবং দেশ-বিদেশ দেখা ছাড়া আমাদের আর কোনও অসাধু উদ্দেশ্য নেই।

'নানাবিধ গল্প করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এইবার কাপ্তেন দু'বোয়া ফরাসী শিষ্টতার চরম করলেন, আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ জানালেন। শুধু তাই নয়, রাত্রে তাঁর বাড়ীতে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হ'ল। রাজ-পুরুষের এই অযাচিত সহৃদয়তা আমাদের পক্ষে যেমন অভাবনীয় তেমনই অস্বস্তিকর।

'রাত্রে আহারে ব'সে কাপ্তেন হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা ব্রিটিশ ফৌজি-রাইফেল কোথায় পেলেন ?

বললুম,—আর্মি ষ্টোর থেকে মাঝে মাঝে পুরনো বন্দুক বিক্রী হয়, তাই কিনেছি।

কাপ্তেন আর কিছু বললেন না।

'অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্পগুজব হ'ল। তার পর কাপ্তেন নিজে এসে আমাদের শোবার ঘরের দোর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে নরম বিছানায় শয়ন করলুম। কিন্তু তবু ভাল ঘুম হ'ল না।

'শেষরাত্রির দিকে জঙ-বাহাদুর আমার গা ঠেলে চুপি চুপি বললে,—চলুন—পালাই।

আমি বললুম—আপত্তি নেই। কিন্তু দরজায় শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে যে।

'জঙ-বাহাদুর দরজা ফাঁক ক'রে একবার উঁকি মেরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

'ভোর হ'তে না হ'তে কাপ্তেন সাহেব নিজে এসে আমাদের ডেকে তুললেন। তার পর সুমিষ্ট স্বরে সুপ্রভাত জ্ঞাপন ক'রে আমাদের নদীর ধারে বাঁধাঘাটে নিয়ে গেলেন।

'দেখলুম, কিনারায় একটি ছোট বেতের ডোঙা বাঁধা রয়েছে, আর ঘাটের শানের উপর বারো জন রাইফেলধারী সেপাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাপ্তেন আমাদের করমর্দ্দন ক'রে বললেন,—আপনাদের সঙ্গ-সুখ পেয়ে আমার একটা দিন বড় আনন্দে কেটেছে। কিন্তু এবার আপনাদের যেতে হবে।

পরপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—শ্যামরাজ্যের ঐ অংশটা বড় অনুর্ব্বর, এক-শ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। আপনাদের সঙ্গে খাবার দিয়েছি। রাইফেলও দিলাম, আর পাঁচটা কার্ত্তুজ। এরই সাহায্যে আশা করি আপনারা নির্ব্বিঘ্নে লোকালয়ে পৌঁছতে পারবেন। — বঁ ভোয়াজ।

'আমি আপত্তি করতে গেলুম, তিনি হেসে বললেন,— ডোঙায় উঠুন। নদীর এপারে নামবার চেষ্টা করবেন না, তা হলে—সৈন্যদের দিকে হাত নেড়ে দেখালেন।

'ডোঙায় গিয়ে উঠলুম, বারো জন সৈনিক বন্দুক তুলে আমাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে রইল।

'তীর থেকে বিশ গজ দূরে ডোঙা যাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—আমাদের অপরাধ কি তাও কি জানতে পারব না ?

'তিনি ঘাট থেকে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বললেন,— আনামে ব্রিটিশ গুপ্তচরের স্থান নেই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রমথেশ রুদ্র থামিলেন। তাঁহার মুখে ধীরে ধীরে একটি অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'একেই বলে দৈব বিড়ম্বনা। কাপ্তেন দু'বোয়া আমাদের হাতে মিলিটারি বন্দুক দেখে আমাদের ইংরেজের গোয়েন্দা মনে করেছিলেন।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে ত এখন বন্ধুত্ব চলছে !'

'হুঁ—একেবারে গলাগলি ভাব। কিন্তু ওরা আজ পর্য্যন্ত কখনও পরস্পরকে বিশ্বাস করে নি, যত দিন চন্দ্রসূর্য্য থাকবে তত দিন করবে না। ওরা শুধু দুটো আলাদা জাত নয়, মানব-সভ্যতার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রতীক। কিন্তু সে যাক—' বলিয়া আবার গল্প আরম্ভ করিলেন।

'যতক্ষণ নদী পার হলুম, সিপাহীরা বন্দুক উঁচিয়ে রইল। বুঝলাম, দুটি মাত্র পথ আছে—হয় পরপার, নয় পরলোক। তৃতীয় পন্থা নেই।

'পরপারেই গিয়ে নামলুম। তার পর বন্দুক আর খাবারের হ্যাভারস্যাক্ কাঁধে ফেলে শ্যামদেশের লোকালয়ের সন্ধানে রওনা হয়ে পড়া গেল।

'প্রায় নদীর কিনারা থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। আনাম-রাজ্য এবং মেকং নদী পিছনে রেখে চড়াই উঠতে

আরম্ভ করলুম। পাহাড়ের পথ বন্ধুর দুলঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমরা পথশ্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম; এই পার্ব্বত্য ভূমি যত শীঘ্র সম্ভব পার হবার জন্তে সজোরে পা চালিয়ে দিলুম।

'দুপুরবেলা নাগাদ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলুম যেখান থেকে চারি দিকে অগণ্য নীরস পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—গাছপালা পর্য্যন্ত নেই, কেবল পাথর আর পাথর।

'বিলক্ষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। খাবারের ঝুলি নামিয়ে দু-জনে খেতে বসলুম। ঝুলি খুলে দেখি, তাজা খাবার কিছু নেই, কেবল কতকগুলা টিনের কৌটা। যাহোক, যে-অবস্থায় পড়েছি তাতে টিনে-বন্ধ চালানি খাবারই বা ক'জন পায়?

'কিন্তু টিনের লেবেল দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল—Corned beef—গো-মাংস! পরস্পর মুখের দিকে তাকালুম। জঙ-বাহাদুর খাঁটি হিন্দু, কিছুক্ষণ মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে ব'সে রইল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

'কোনও কথা হ'ল না, দু-জনে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। অখাদ্য টিনগুলা পিছনে প'ড়ে রইল।

'তার পর আমাদের যে দুর্গতির অভিযান আরম্ভ হ'ল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে আপনাকে দুঃখ দেব না। আকাশে একটা পাখী নেই, মাটিতে অন্য জন্তু ত দূরের কথা, একটা গিরগিটি পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম না। তৃষ্ণায় টাকরা শুকিয়ে গেল কিন্তু জল নেই।

'প্রথম দিনটা এক দানা খাদ্য বা এক ফোঁটা জল পেটে গেল না। রাত্রি কাটালুম খোলা আকাশের নীচে কম্বল মুড়ি দিয়ে। দ্বিতীয় দিন বেলা তিন প্রহরে একটা জন্তু দেখতে পেলুম, কিন্তু এত দূরে যে, সেটা কি জন্তু তা চেনা গেল না। কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন এমন যে, মা ভগবতী ছাড়া কিছুতেই আপত্তি নেই। প্রায় তিন-শ গজ দূর থেকে তার ওপর গুলি চালালুম—কিন্তু লাগল না। মোট পাঁচটি কার্ত্তুজ ছিল, একটি গেল।

'সেদিন সন্ধ্যার সময় জল পেলুম। একটা পাথরের ফাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে, আধ ঘণ্টায় এক গণ্ডূষ জল ধরা যায়। জঙ-বাহাদুরের মুখ ঝামার মত কালো হয়ে গিয়েছিল; আমার মুখও যে অনুরূপ বর্ণ ধারণ করেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। শরীরের রক্ত তরল বস্তুর অভাবে গাঢ় হয়ে আসছিল; সেদিন জল না পেলে বোধ হয় বাঁচতুম না।

'কিন্তু তবু শুধু জল খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, মাথাও বোধ হয় আর ধাতস্থ ছিল না। তৃতীয় দিনের ঘটনাগুলা একটানা দুঃস্বপ্নের মত মনে আছে। একটা লালচে রঙের খরগোশ দেখতে পেয়ে তারই পিছনে তাড়া করেছিলুম—দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। খরগোশটা আমাদের সঙ্গে যেন খেলা করছিল; একেবারে পালিয়েও যাচ্ছিল না, আবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যেও ধরা দিচ্ছিল না। তার পিছনে দুটো কার্ত্তুজ খরচ করলুম; কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে, হাতও কাঁপছে, খরগোশটা মারতে পারলুম না।

'সন্ধ্যেবেলা একটা লম্বা বাঁধের মত পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে খরগোশ মিলিয়ে গেল। দেহে তখন আর শক্তি নেই, বন্দুকটা অসহ্য ভারি বোধ হচ্ছে; তবু আমরাও সেখানে উঠলুম। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তখন চলছি না, একটা অন্ধ আবেগের ঝোঁকেই খরগোশের পশ্চাদ্ধাবন করেছি। পাহাড়ের ওপর উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, একটা সবুজ রঙের আলো চোখের সামনে ঝিলিক্ মেরে উঠ্‌ল; তার পর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

'যখন মূর্চ্ছা ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। জঙ্-বাহাদুর তখনও আমার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর—আর সামনেই ঠিক পাহাড়ের কোলে যত দূর দৃষ্টি যায় একটি সবুজ ঘাসে-ভরা উপত্যকা। তার বুক চিরে জরির ফিতের মত একটি সরু পার্ব্বত্য নদী বয়ে গেছে।

'কিছুক্ষণ পরে জঙ্-বাহাদুরের জ্ঞান হ'ল। তখন দু-জনে দু-জনকে অবলম্বন ক'রে টলতে টলতে পাহাড় থেকে নেমে সেই নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

'তৃষ্ণা নিবারণ হ'ল। আকণ্ঠ জল খেয়ে ঘাসের ওপর অনেকক্ষণ পড়ে রইলুম। আপনি এখনি চায়ের সঙ্গে অমৃতের তুলনা করছিলেন; আমরা সেদিন যে-জল খেয়েছিলুম, অমৃতও বোধ করি তার কাছে বিস্বাদ।

'কিন্তু সে যাক—তৃষ্ণানিবারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার ভাবনা এসে জুটেছিল। তাকে মেটাই কি দিয়ে?

'আমাদের উপত্যকার চারিদিকে তাকালুম, কিন্তু কোথাও একটি পল্লী নেই। এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ যেন দলবদ্ধ হয়ে জন্মেছে, হয়ত কোন গাছে ফল ফলেছে এই আশায় উঠে বললুম—জঙ-বাহাদুর, চল দেখি, যদি গাছে কিছু পাই।

'গাছে কিন্তু ফল-ফলবার সময় নয়। একটা ফুলের মত কাঁটাওয়ালা গাছে ছ'টি ছোট ছোট কাঁচা ফল পেলুম। তৎক্ষণাৎ দু-জনে ভাগাভাগি ক'রে উদরসাৎ করলুম। দারুণ টক—কিন্তু তবু খাদ্য ত!

'আরও ফলের সন্ধানে অন্য একটা ঝোপের দিকে চলেছি, জঙ্-বাহাদুর পাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল,—ঐ—ঐ দেখুন!

'ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—আশ্চর্য্য দৃশ্য! সাদা ধবধবে এক পাল হরিণ নির্ভয়ে মন্থর-পদে নদীর দিকে চলেছে। সকলের আগে একটা শৃঙ্গধর মদ্দা হরিণ, তার পিছনে গুটি আট-দশ হরিণী। আমাদের কাছ থেকে প্রায় এক-শ গজ দূর দিয়ে তারা যাচ্ছে।

'কিন্তু এ দৃশ্য দেখলুম মুহূর্ত্ত কালের জন্যে। জঙ্-বাহাদুরের চীৎকার বোধ হয় তাদের কানে গিয়েছিল—তারা এক-সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চাইলে। তার পর এক অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল। হরিণগুলা দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম; তার পর চোখ রগড়ে আবার দেখলুম। কিছু নেই—রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকা একেবারে শূন্য।

'ভয় হ'ল। এ কি ভৌতিক উপত্যকা? না আমরাই ক্ষুধার মত্ততায় কাল্পনিক জীবজন্তু দেখতে আরম্ভ করেছি? মরুভূমিতে শুনেছি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উন্মাদ পান্থ মৃত্যুর আগে এমনি মায়ামূর্ত্তি দেখে থাকে। তবে কি আমাদেরও মৃত্যু আসন্ন!

'জঙ্-বাহাদুরের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো পাগলের মত বিস্ফারিত। সে ত্রাস-কম্পিত স্বরে ব'লে উঠল, —এ আমরা কোথায় এসেছি!—তার ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল।

'দু-জনে একসঙ্গে ভয়ে দিশাহারা হ'লে চলবে না। আমি জঙ্-বাহাদুরকে সাহস দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু বোঝাব কি? নিজেরই তখন ধাত ছেড়ে আসছে!

'একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসলুম। খাবার খোঁজবার উদ্যমও আর ছিল না; অবসন্ন ভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

'আধ ঘণ্টা এই ভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম; ঠিক মনে হ'ল একপাল হরিণ ক্ষুরের শব্দ ক'রে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে গেল। পরক্ষণেই পিছন দিকে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের চীৎকার যেন বাতাসকে চিরে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। ফিরে দেখি, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে প্রকাণ্ড দুটো ধূসর রঙের নেকড়ে পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে আছে; কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারা আর একবার চীৎকার ক'রে উঠল—শিকার ফস্কে যাওয়ার ব্যর্থ গর্জ্জন। তার পর অনিচ্ছাভরে বিপরীত মুখে চ'লে গেল।

অনেক দূর পর্য্যন্ত তাদের দেখতে পেলুম। এবার নূতন রকমের ধোঁকা লাগল। তাই ত! নেকড়ে দুটো ত মিলিয়ে গেল না! তবে ত আমাদের চোখের ভ্রান্তি নয়! অথচ হরিণগুলা অমন কর্পূরের মত উবে গেল কেন? আর, এখনই যে ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পেলুম, সেটাই বা কি?

'ক্রমে বেলা দুপুর হ'ল। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। উপত্যকায় পৌছনোর প্রথম উত্তেজনা কেটে গিয়ে তিন দিনের অনশন আর ক্লান্তি দেহকে আক্রমণ করেছে। হয়ত এই ভাবে নিস্তেজ হ'তে হ'তে ক্রমে তৈলহীন প্রদীপের মত নিবে যাব।

'নিবে যেতুমও, যদি না এই সময় একটি পরম বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আমাদের চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলত। অসাড় ভাবে নদীর দিকেই তাকিয়ে ছিলুম, সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছিল। এই সময় দেখলুম নদীর কিনারায় যেন অস্পষ্ট ভাবে কি নড়ছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তপ্ত বালির চড়ার ওপর যেমন বাষ্পের ছায়াকুণ্ডলী উঠতে থাকে, অনেকটা সেই রকম। ক্রমে সেগুলা যেন আরও স্থূল আকার ধারণ করলে। তার পর ধীরে ধীরে একদল সাদা

হরিণ আমাদের চোখের সামনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে দাঁড়াল।

'মুগ্ধ অবিশ্বাস ভরে চেয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব? এরা কি সত্যিই শরীর-ধারী? তাদের দেখে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই; সাদা রোমশ গায়ে সূর্য্যের আলো পিছলে পড়ছে। নিশ্চিন্ত অসঙ্কোচে তারা নদীতে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে খেলা করছে,—কেউ বা নদীর ধারের কচি ঘাস ছিঁড়ে তৃপ্তি ভরে চিবচ্ছে।

'জঙ্-বাহাদুর কখন রাইফেল তুলে নিয়েছিল তা জানতে পারি নি, এত তন্ময় হয়ে দেখছিলুম। হঠাৎ কানের পাশে গুলির আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলুম; দেখি জঙ্-বাহাদুরের হাতে রাইফেলের নল কম্পাসের কাঁটার মত দুলছে। সে রাইফেল ফেলে দিয়ে বললে,—পারলাম না, ওরা মায়াবী।

'হরিণের দল তখন আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'এতক্ষণে এই অদ্ভুত হরিণের রহস্য যেন কতক বুঝতে পারলুম। ওরা অশরীরী নয়, সাধারণ জীবের মত ওদেরও দেহ আছে, কিন্তু কোনও কারণে ভয় পেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিকক্ষণ আগে ওদের নেকড়ে তাড়া করেছিল, তখন ওদেরই অদৃশ্য পদধ্বনি আমরা শুনেছিলুম। প্রকৃতির বিধান বিচিত্র! এই পাহাড়ে-ঘেরা ছোট উপত্যকাটিতে ওরা অনাদি কাল থেকে আছে; সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তরাও আছে। তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র ওদের নেই, তাই শত্রু দেখলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

বক্তা আবার থামিলেন। সেই গূঢ়ার্থ হাসি আবার তাঁহার মুখে খেলিয়া গেল।

আমি মোহাচ্ছন্নের মত শুনিতেছিলাম। অলৌকিক রূপকথাকে বাস্তব আবহাওয়ার মাঝখানে স্থাপন করিলে যেমন শুনিতে হয়, গল্পটা সেইরূপ মনে হইতেছিল; বলিলাম, 'কিন্তু একি সম্ভব? অর্থাৎ বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে অপ্রাকৃত নয় কি?'

তিনি বলিলেন, 'দেখুন, বিজ্ঞান এখনও সৃষ্টি-সমুদ্রের কিনারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তীরের উপলখণ্ড কুড়িয়ে ঝুলি ভরছে—সমুদ্রে ডুব দিতে পারে নি। তাছাড়া, অপ্রাকৃতই বা কি ক'রে বলি? ক্যামিলিয়ন নামে একটা জন্তু আছে, সে ইচ্ছামত নিজের দেহের রং বদলাতে পারে। প্রকৃতি আত্মরক্ষার জন্য তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। বেশী দূর যাবার দরকার নেই, আজ যে আপনি হারিয়াল মেরেছেন তাদের কথাই ধরুন না। হারিয়াল একবার গাছে বসলে আর তাদের দেখতে পান কি?'

বলিলাম, 'তা পাই না বটে। গাছের পাতার সঙ্গে তাদের গায়ের রং মিশে যায়।'

তিনি বলিলেন, 'তবেই দেখুন, সেও ত এক রকম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এই হরিণের অদৃশ্য হওয়া বড়জোর তার চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে।'

'তার পর বলুন।'

'ব্যাপারটা মোটামুটি রকম বুঝে নিয়ে জঙ্-বাহাদুরকে বললুম,—ভয় নেই জঙ্-বাহাদুর, ওরা মায়াবী নয়! বরং আমাদের বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়।

'একটি মাত্র কার্ত্তুজ তখন অবশিষ্ট আছে—এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথের শেষ পাথেয়। এটি যদি ফস্কায় তাহ'লে অনশনে মৃত্যু কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

'টোটা রাইফেলে পুরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে রইলুম—হয়ত তারা আবার এখানে আসবে জল খেতে। কিন্তু যদি না আসে? দু-বার এইখানেই ভয় পেয়েছে—না আসতেও পারে।

'দিন ক্রমে ফুরিয়ে এল; সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেল। জঙ্-বাহাদুর কেমন যেন নিঝুম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ব'সে আছে; আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিরাশা আর অবসাদকে দূরে ঠেলে রেখে প্রতীক্ষা করছি।

'নদীর জলের ঝকঝকে রূপালী রং মলিন হয়ে এল, কিন্তু হরিণের দেখা নেই। নিরাশাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। তারা সত্যিই পালিয়েছে, আর আসবে না।

'কিন্তু প্রকৃতির বিধানে একটা সামঞ্জস্য আছে,—এমার্সন যাকে law of compensation বলেছেন। এক দিক দিয়ে প্রকৃতি যদি কিছু কম দিয়ে ফেলেন, অন্য দিক দিয়ে অমনি তা পূরণ ক'রে দেন। এই হরিণগুলোকে তিনি বুদ্ধি কম দিয়েছেন বলেই বোধ হয় এমন অপরূপ আত্মরক্ষার উপায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দান করেছেন। অন্ধকার হ'তে আর দেরি

নেই এমন সময় তারা আবার ঠিক সেই জায়গায় এসে আবির্ভূত হ'ল।

'তাদের দেখে আমার বুক ভীষণ ভাবে ধরাস ধরাস করতে লাগল। তারা আগের মতই দলবদ্ধ হয়ে এসেছে—তেমনই স্বচ্ছন্দ মনে ঘাস খাচ্ছে—খেলা করছে। আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম। পাল্লা বড়জোর পঁচাত্তর গজ, রাইফেলের পক্ষে কিছুই নয়; তবু হাত কাঁপছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই শেষ কার্ত্তুজ—

'নিজের রাইফেলের আওয়াজে নিজেই চমকে উঠলুম। একটা হরিণ খাড়া উঁচু দিকে লাফিয়ে উঠল—তার পর আবার সমস্ত দল ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল।

'শেষ কার্ত্তুজও ব্যর্থ হ'ল! পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় মন নিয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলুম। তার পর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে এল। মনে হ'ল, যেখানে হরিণগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে একগুচ্ছ লম্বা ঘাস আপনা-আপনি নড়ছে।

'কি হ'ল! তবে কি—? ধুঁকতে ধুঁকতে দু-জনে সেখানে গেলুম।

'বাতাস বইছে না, কিন্তু তবু ঘাসগুলো নড়ছে—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নড়াচ্ছে। ক্রমে ঘাসের আন্দোলন কমে এল। তার পর ছায়ার মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল—চারটি হরিণের ক্ষুর!

'মরেছে! মরেছে!—জঙ-বাহাদুর ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল। আমি তখন পাগলের মত ঘাসের উপর নৃত্য সুরু ক'রে দিয়েছি। একটা নিরীহ ভীরু প্রাণীকে হত্যা ক'রে এমন উৎকট আনন্দ কখনও অনুভব করি নি।

'পনর মিনিটের মধ্যে মৃত হরিণের দেহটি পরিপূর্ণ দেখা গেল। মৃত্যু এসে তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে প্রকট ক'রে দিলে।...

'তারই চামড়ার ওপর আপনি আজ ব'সে আছেন।'

তাঁহার গল্প হঠাৎ শেষ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'তার পর?'

তিনি বলিলেন, 'তার পর আর কি—শূন্য মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচালুম। সাত দিন পরে সেই উপত্যকার গণ্ডী পার হয়ে লোকালয়ে পৌঁছলাম। তার পর দু-মাস একাদিক্রমে হেঁটে এক দিন ব্যাঙ্কক শহরে পদার্পণ করা গেল। সেখান থেকে জঙ-বাহাদুর চীনের জাহাজে চড়ল; আর আমি—; মাংসটা বোধ হয় তৈরি হ'য়ে গেছে।'

৪

আহার শেষ করিয়া যখন এই ভাঙা বাড়ী হইতে বাহির হইলাম তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বন্ধু আমার সঙ্গে চলিলেন। টর্চ্চ জ্বালিলেন না, অন্ধকারে আমার বাইকের একটা হাতল ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

প্রায় দশ মিনিট নীরবে চলিয়াছি। কোন্ দিকে চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই; মনে হইতেছে যে-পথে আসিয়াছিলাম সে পথে ফিরিতেছি না।

হঠাৎ বন্ধু বলিলেন, 'আজ সন্ধ্যাটা আমার বড় ভাল কাট্‌ল।'

আমি বলিলাম, 'আপনার—না আমার?'

'আমার। মাসখানেকের মধ্যে মন খুলে কথা কইবার সুযোগ পাই নি।'

আরও পনর মিনিট নিঃশব্দে চলিলাম। তার পর তিনি আমার হাতে টর্চ্চ দিয়া বলিলেন, 'পাকা রাস্তায় পৌঁছে গেছেন, এখান থেকে সহজেই বাড়ী ফিরতে পারবেন। এবার বিদায়। আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না।'

আমি বলিলাম, 'সে কি! আমি আবার আসব। অন্তত আপনার টর্চ্চটা ফেরত দিতে হবে ত।'

'আসার দরকার নেই। এলেও আমার আস্তানা খুঁজে পাবেন না। টর্চ্চ আপনার কাছেই থাক—একটা সন্ধ্যার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই চ'লে যাব।'

'কোথায় যাবেন?'

তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তা জানি না। হয়ত আবার শ্যামদেশে যাব। এবার একটা জীবন্ত হরিণ ধ'রে আনবার চেষ্টা করব—কি বলেন?'

'বেশ ত। কিন্তু—আর আমাদের দেখা হবে না?'

'সম্ভব নয়। আচ্ছা—বিদায়।'

'বিদায়। দুদ্দিনের বন্ধু—নমস্কার।'

কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া টর্চ্চ জ্বালিলাম—দেখিলাম, তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছেন।

* * *

কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না, আর একবার দেখা হইল। দিন-সাতেক পরে একদিন রাত্রি সাতটার ট্রেনে আমার এক আত্মীয়কে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে গিয়াছি—অকস্মাৎ তাঁহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল।

'একি! আপনি!'

তাঁহার মাথায় একটা কান-ঢাকা টুপী; গায়ে সেই সোয়েটার ও লুঙ্গি। একটু হাসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছি।'

এই সময় ঘণ্টা বাজিল। ষ্টেশনে ভীড় ছিল; এক জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রকাণ্ড পোঁটলাসুদ্ধ পিছন হইতে আমাকে ধাক্কা মারিল। তাল সামলাইয়া ফিরিয়া দেখি—বন্ধু নাই।

বিস্মিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতেছি—দেখি আমাদের শশাঙ্ক বাবু আসিতেছেন। পুলিসের ডি-এস্-পি হইলেও লোকটি মিশুক। পরিচয় ছিল, এড়াইতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি খবর? আপনি কোথায় চলেছেন?'

'যাব না কোথাও। ষ্টেশনে বেড়াতে এসেছি'—বলিয়া মৃদু হাস্যে তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়া গিয়াছিল। তবু বন্ধুকে চারিদিকে খুঁজিলাম; কিন্তু এই দুই মিনিটের মধ্যে তিনি তাঁহার মায়ামৃগের মতই এমন অদৃশ্য হইয়াছিলেন যে, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

তার পর হইতে এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দেখি নাই; আর কখনও দেখিব কিনা জানি না।

* * *

গল্প-সাহিত্যের আইন-কানুন অনুসারে এ কাহিনী বোধ হয় বহুপূর্ব্বেই শেষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। বস্তুত, মায়া-হরিণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, 'ধান ভানিতে শিবের গীতই' বেশী গাহিয়াছি; গল্পের চেয়ে গল্পের বক্তার কথাই বেশী বলিয়াছি। আমি প্রথিতযশা কথা-শিল্পী নই, এইটুকুই যা রক্ষা, নহিলে লজ্জা রাখিবার আর স্থান থাকিত না।

যা হোক, আইন-ভঙ্গ যখন হইয়াই গিয়াছে তখন আর একটু বলিব। এই কাহিনী লেখা সমাপ্ত করিবার পর একটি চিঠি পাইয়াছি, সেই চিঠিখানি উপসংহার-স্বরূপ এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিলাম—

প্রীতিনিলয়েষু,

আমাকে বোধ হয় ভোলেন নাই। শ্যামদেশে গিয়াছিলাম, কিন্তু সে-হরিণ ধরিয়া আনিতে পারি নাই। বন্দী-দশায় উহারা বাঁচে না—না খাইয়া মরিয়া যায়।

ইতি—

শ্রীপ্রমথেশ রুদ্র

চিঠিতে তারিখ বা ঠিকানা নাই। পোষ্ট-অফিসের মোহরও এমন অস্পষ্ট যে কিছু পড়া যায় না।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী অমূলক প্রমাণ করিবার জন্য, এবং এই উদ্দেশ্যে কোর্টে যে সকল দলীলপত্র দাখিল করা হইয়াছিল তাহা তজ্‌দিক (মৌলিক প্রমাণ) করাইবার জন্য প্রতিবাদী রামমোহন রায়কে অনেক সাক্ষী মান্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে এই দশ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছিল—

(১) গুরুপ্রসাদ রায়। রামকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ ভাই নিমানন্দ রায়ের পুত্র। জবানবন্দীর সময় (১৮১৮ সালের ১লা অক্টোবর) ইহার বয়স প্রায় ৪৭ বৎসর ছিল। ১৭৭২ সালে জন্ম ধরিলে এই সময়ে রামমোহন রায়ের বয়স দাঁড়ায় ৪৬ বৎসর, অর্থাৎ গুরুপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। প্রশ্নমালার (interrogatories) শেষভাগে লিখিত হলপের বিবরণে দেখা যায়, গুরুপ্রসাদ রায় প্রচলিত রীতিতে হলপ করিয়াছিলেন ; রামতনু রায়, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের মত স্বতন্ত্র রীতিতে হলপ করেন নাই ; অর্থাৎ গুরুপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভায় প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

(২) রামতনু রায়। রামকান্ত রায়ের আর এক ভাই, গোপীমোহন রায়ের পুত্র। বয়সে রামমোহন রায়ের অপেক্ষা সাত-আট বৎসরের ছোট। ইনি এক সময় তমলুকের নিমক মহালের দেওয়ান ছিলেন। ইনি স্বতন্ত্র রীতিতে হলপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। রামমোহন রায়ের ভাগিনেয়। জবানবন্দীর সময় (১৮১৯ সালের ৩০শে এপ্রিল) বয়স প্রায় ৩২ বৎসর ছিল। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। হলপের রীতি হইতে দেখা যায় ইনি মাতুলের শিষ্য হইয়াছিলেন।

এই তিন জন সাক্ষী রাধানগরের এবং লাঙ্গুড়পাড়ার রায়-পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) রাজীবলোচন রায়। জবানবন্দী দেওয়ার সময় (১৮১৯ সালের ২০শে এপ্রিল) বয়স পঞ্চাশ বৎসর কিম্বা ততোধিক ছিল। রাজীবলোচন রায় বলিয়াছেন, ত্রিশ বৎসর যাবৎ, অর্থাৎ রামমোহন রায়ের বয়স যখন ১৬।১৭ বৎসর তদবধি তিনি তাঁহাকে চেনেন। ত্রিশ বৎসর এখানে মোটামুটি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ষোল বৎসর বয়সের সময় রামমোহন বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন ; সুতরাং মনে করিতে হইবে তাহার পূর্ব্বাবধি, অর্থাৎ আশৈশব, রাজীবলোচন রামমোহন রায়কে চিনিতেন। রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবনের সহিত রাজীবলোচন রায় বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন এই কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। রাজীবলোচন রায় প্রচলিত রীতি অনুসারে হলপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি গুরুপ্রসাদ রায়ের মত রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

(৫) গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। জবানবন্দী দেওয়ার সময় (১৮১৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর) ইঁহার বয়স ছিল প্রায় ৩২ বৎসর। ১২০৮ সনে (১৮০১-২ সালে) গোপীমোহন রামমোহন রায়ের তহবীলদার (খাজাঞ্চী) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হলপের রীতি হইতে দেখা যায় ইনি রামমোহন রায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন।

এই পাঁচ জন প্রধান সাক্ষী। অপর পাঁচ জন সাক্ষী কোর্টে দাখিল করা দলীলে নিজের বা অপরের স্বাক্ষর এবং হস্তাক্ষর তজ্‌দিক করিয়াছেন বা প্রতিবাদীর দুই-একটি কথা সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। ১২০৬ সনের ৭ই পৌষ রাজীবলোচন রায় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক সম্বন্ধে যে একরারনামা সম্পাদন

করিয়াছিলেন, এবং ১৮১২ সালের ১৪ই জানুয়ারী গুরুদাস মুখোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের বরাবরে এই দুই খানি তালুকের যে কবালা সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই দুই খানি দলীলেই নন্দকুমার শর্ম্মা বা বিদ্যালঙ্কার সাক্ষী আছেন। এই দুই খানি দলীলের সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর স্বীকার করিবার জন্য নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার জবানবন্দী দিয়াছেন। এই মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রামমোহন রায়ের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন-চরিতে কোন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নাই, এবং তিনি নিজেও বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ লিপ্ত ছিলেন না, রাজীবলোচন রায় তাঁহার বিষয়কর্ম্ম পরিচালন করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধর্ম্মজীবন বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যময়। নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জবানবন্দীতে একটি উক্তি আছে যাহা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মজীবনের ধারা বুঝিবার বিশেষ সহায়তা করে। আমরা সংক্ষেপে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিবরণ প্রদান করিয়া এই উক্তিটির আলোচনা করিব।

১৮১৯ সালের ১৪ই মে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের পক্ষের শেষ সাক্ষী যশোদানন্দন ঘোষের জবানবন্দী হইয়া গেলে, ২৭শে মে প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার আবেদন করিয়াছিলেন, মোকদ্দমায় গৃহীত জবানবন্দী এবং প্রমাণ প্রকাশিত করা হউক। ইহার অর্থ, উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী বন্ধ করিয়া সওয়াল জবাবের দিন ধার্য্য করা হউক। তখন যেন বাদী গোবিন্দপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ১১ই জুন এফিডেবিট করিলেন, তাঁহার পক্ষের দরকারী সাক্ষীগণকে হাজির করিবার জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হউক। তদবধি ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোকদ্দমার ইতিহাস "গোবিন্দপ্রসাদের দাবী" নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।* ২৪শে আগষ্ট গোবিন্দ-প্রসাদ রায় পপার রূপে সরকারী খরচে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এই প্রার্থনাও নামঞ্জুর হইয়াছিল। তার পর কি ঘটিয়াছিল তাহা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, এবং বিচারপতি স্যার ফ্রানসিস ম্যাকন্যানটেন এবং স্যার আণ্টনী বুলারের রায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"This cause coming on this day to be heard and debated before the Court in the presence of Counsel learned for the Defendant and no person appearing for the Complainant, etc."

এই শুনানীর তারিখ ১৮১৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার। বাদীপক্ষের কেহ তখন কোর্টে হাজির ছিল না। প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তার পর রায়ে বাদীর আর্জ্জির এবং প্রতিবাদীর জবাবের সার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং উপসংহারে বলা হইয়াছে—

Whereas after the filing of the said answer and issue joined thereon and examination of witnesses had and publication passed and upon reading Subpoena to hear Judgment which issued on the 6th day of October in the year of our Lord one thousand eight hundred and nineteen and an affidavit of Gorauchund Doss sworn this 25th day of October last of the due service thereof and upon reading the office copy of an order of this Court made in this cause on the 29th day July last past and upon hearing what was alleged by the advocates for the Defendants. This Court doth think fit to adjudge Order and Decree and doth adjudge Order and Decree that the said Bill of Complaint of the said Complainant in this cause do stand absolutely dismissed out of and from this Court with costs.

এখানে বাদী গোবিন্দপ্রসাদের দাবী সম্পূর্ণরূপে ডিসমিস্ করা হইয়াছে, এবং প্রতিবাদীর খরচের ভার বাদীর স্কন্ধে চাপান হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের ঘরোয়া জীবনের অনেক ঘটনার আভাস পাওয়া যায় বলিয়া আমরা গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আনীত মোকদ্দমার কাগজপত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম। এই আড়াই বৎসর ব্যাপী মোকদ্দমার বা সর্ব্বস্ব লইয়া টানাটানির ফলে রামমোহন রায় কলিকাতা আসিয়া যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—যে প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল কিনা তাহা এখন আলোচ্য। ১৭৬৯ শকের (১৮৪৭ সালের) আশ্বিন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা'য় প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

---

* প্রবাসী, ১৩৪৩, পৌষ, ৩৫২—৩৫৮ পৃঃ

"ইতিমধ্যে ১৭৩৯ শকে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট বিচারালয়ে অভিযোগ করেন ইহাতে তিনি প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিব্রত থাকাতে জ্ঞানচর্চ্চা জন্য তাঁহার তিল মাত্র অবকাশ ছিল না আত্মীয় সভা পর্য্যন্ত আর হইত না। পরন্তু তিনি সেই অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভা আরম্ভ করিলেন।"*

মোকদ্দমা লইয়া রামমোহন রায় যে বিব্রত ছিলেন মোকদ্দমার নথীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হয়ত আত্মীয় সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা তখন অসুবিধাজনক হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চার জন্য তাঁহার তিল মাত্র অবকাশ ছিল না একথা সত্য নহে। ১৮১৭ হইতে ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায় যে সকল ইংরেজী এবং বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহাদের কথা হিসাব করিলে মনে হয়, এই সময় তাঁহার জ্ঞান-চর্চ্চার অবকাশ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছিল। ১৮১৭ সালের ২০শে জুন গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জ্জি দাখিল করা হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ব্যারিষ্টার কম্পটন সাহেব জবাব দাখিল করিবার জন্য প্রথমতঃ এক মাস সময় চাহিয়াছিলেন। জবাব প্রস্তুত করিবার জন্য নানাবিধ কাগজপত্র এবং দলীল অনুবাদ করিতে সময় লাগিতেছে বলিয়া ২৯শে আগষ্ট রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে পুনরায় তিন সপ্তাহের সময় চাওয়া হইয়াছিল। এই তিন সপ্তাহ পরে, ২৪শে সেপ্টেম্বর, জবাব দাখিল করিবার জন্য আরও আট দিনের সময় লওয়া হইয়াছিল, এবং অবশেষে ৪ঠা অক্টোবর জবাব দাখিল করা হইয়াছিল। সুতরাং জবাব প্রস্তুত করিবার জন্য রামমোহন রায় যে বিব্রত হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যখন জবাবের মোসাবিদা চলিতেছিল সেই সময়ে, ১২২৪ সনের ১৩ই ভাদ্র (১৮১৭ সালের ৩০শে আগষ্ট) বাংলা অনুবাদসহ কঠোপনিষৎ, এবং জবাব দাখিলের পর দিন, ২১শে আশ্বিন (৫ই অকটোবর), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুই খানি গ্রন্থ আকারে ছোট হইলেও, মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকার গুরুত্ব অত্যধিক। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত ঈশোপনিষদের ভূমিকায় পৌত্তলিকতার তীব্র আক্রমণ করিয়া রামমোহন রায় দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রচলিত উপাসনা-রীতির ধ্বংসের

* প্রবাসী, ১৩৪৩, জ্যৈষ্ঠ, ২৯২ পৃঃ

বিধান করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় তিনি ব্রহ্মোপাসনার রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই উপাসনা রীতিতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। এই ব্রহ্মোপাসনা রীতির আকর শঙ্করের ব্যাখ্যাত দশোপনিষৎ। এই সকল উপনিষদে পরস্পরবিরোধী মতও রহিয়াছে। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শন সৃষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র বা উত্তরমীমাংসা প্রচলিত আছে। বাদরায়ণের সূত্রে দেখা যায়, এক সময়ে জৈমিনি প্রভৃতি অন্যান্য মুনির রচিত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রও প্রচলিত ছিল। বাদরায়ণ স্থানে স্থানে তাঁহাদের মত উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আবশ্যকমত খণ্ডনও করিয়াছেন। বাদারায়ণের বেদান্তসূত্রের শঙ্কর কৃত ভাষ্য এবং অন্যান্য অনেক ভাষ্য আছে। রামমোহন রায় উপনিষদের মর্ম্ম সম্বন্ধে বাদরায়ণের এবং শঙ্করের অনুগত ছিলেন। কিন্তু তদতিরিক্ত তিনি বুদ্ধির বিবেচনার অনুসরণ করাও কর্ত্তব্য বোধ করিতেন। বেদান্তসারের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

"বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন।"

বুদ্ধির বিবেচনা অনুসারে উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে রামমোহন রায় বাদরায়ণের এবং শঙ্করের দুইটি উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। একটী সন্ন্যাস। বাদরায়ণ এবং শঙ্কর উভয়ের মতেই সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান এবং মুক্তি লাভ করা যায় না। দ্বিতীয়, আসন করিয়া যোগাভ্যাস। ছান্দোগ উপনিষদের উপসংহার ভাগের উপর নির্ভর করিয়া, গৃহস্থের পক্ষে যে মোক্ষলাভ করা সম্ভব, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের যে অধিকার আছে, এই মত তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা কেবল গ্রন্থচর্চ্চার ফল নহে, বুদ্ধির দীর্ঘ বিবেচনার ফল। গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির জবাবের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায় এই নব উপাসনারীতি পরিচিন্তনে রত ছিলেন।

মোকদ্দমা যখন রীতিমত চলিতেছিল তখন, ১৮১৮ সালে, রামমোহন রায় বাংলায় এবং ইংরেজীতে "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ" প্রকাশিত করিয়া

আর একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সহমরণ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮১৯ সালে। গোবিন্দপ্রসাদের মোকদ্দমার সময় রামমোহন রায়ের এই সকল কার্য্যকলাপের প্রতি দৃকপাত করিলে মনে হয়, তিনি যেন তখনও ধর্ম্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কার কার্য্যেই বিব্রত। তাঁহার যেন আর কোন গুরুতর কার্য্য নাই। এইরূপ অবিচলিত এবং অশ্রান্ত ভাবে বিষয়াতিরিক্ত মহত্তর কর্ত্তব্য পালনের নাম সাধনা। রামমোহন রায় কিশোর বয়স হইতে সাধনোচিত শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন, এবং চিরজীবন সাধনেই রত ছিলেন। এই সংবাদের আভাস পাওয়া যায় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জবানবন্দীতে। তিনি বলিয়াছেন—

To the Second Interrogatory this Deponent saith that he doth know the parties the Complainant and defendant in the title of these intrrogatories named saith that he hath known the said Complainant Govindpersaud Roy from his the said Govindpersaud Roy's childhood but he hath never been upon terms of intimacy with the said Complainant. Saith that he hath known the Defendant Rammohun Roy from the time that the said Defendant attained the age of fourteen years and hath ever since been on the most intimate terms with him.

অর্থাৎ সাক্ষী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে আশৈশব জানেন, কিন্তু বাদীর সহিত তাঁহার কখনও মিশামিশি হয় নাই। সাক্ষী প্রতিবাদী রামমোহন রায়কে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে জানেন। সেই অবধি রামমোহন রায়ের সহিত বরাবর তাঁহার খুব মিশামিশি চলিয়াছে।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের লাঙ্গুলপাড়ার রায় পরিবারের আভ্যন্তরীণ অনেক খবরই জানিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু জবানবন্দীর সময় সে সকল বিষয়ে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই, এবং তিনিও কোন কথা বলেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয়, তিনি সাধন ভজনে এত ব্যস্ত এবং রামমোহন রায়ের এবং তাঁহার পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে বরাবর এত উদাসীন ছিলেন, যে তাঁহার নিকট কোন সঠিক খবর পাওয়ার আশা ছিল না। জবানবন্দী দেওয়ার সময় (১৮১৯ সালের ২৪শে এপ্রিল) তাঁহার বয়স ছিল ৫৬ বৎসর বা তাহার কাছাকাছি (or thereabouts)। সুতরাং ১৭৬৩ সালে নন্দকুমারের জন্ম ধরা যাইতে পারে। ১৭৭২ সালের মে মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম ধরিলে নন্দকুমার বয়সে রামমোহনের ৯ বৎসরের বড় হয়েন। এই হিসাবে রামমোহন চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন ১৭৮৬ সালে। তখন নন্দকুমারের বয়স ২৩ বৎসর। যুবক নন্দকুমারের সহিত কিশোর রামমোহনের তখন কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল? উপরে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রবন্ধে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি রাজার সন্নিধানে ছায়াবৎ অনুগত ছিলেন। রামমোহন রায় যখন কলিকাতায় (১৮১৪-১৮২৯) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন এখানে তখনকার কথা বলা হইয়াছে। ১৭৬৭ সালের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনবৃত্তান্ত" প্রবন্ধে (১৬৫ পৃঃ) নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সম্বন্ধে এই সংবাদ পাওয়া যায়—

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯শে মাঘ বুধবারে পালপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার. তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন; ... ...

* * * * *

পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করতঃ রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরীর দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্রচর্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদপ্রযুক্ত তীর্থস্বামীকে মহাসমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। স্বভাবতঃ গাঢ় জ্ঞানৈষণা ও স্বদেশের মঙ্গলাভিলাষে শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় বিষয়কর্ম্মে জড়িত থাকিতে অসম্মত হইয়া রঙ্গপুরের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থস্বামীকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন।*

এই লেখা পাঠ করিলে মনে হয়, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে এই মূল্যবান প্রবন্ধের একটি নকল পাইয়াছি এবং তাহা মূলের সহিত মিলাইয়া লইয়াছি।

সহিত রামমোহন রায়ের প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল রংপুরে ১৮০৯ সালের শেষ ভাগে বা তাহার পরে। ১২০৬ সনের ৭ই পৌষ (১৮০৫ সালের ১২ই ফেব্রয়ারী) রাজীবলোচন রায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বপুর তালুক সম্বন্ধে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বরাবরে যে একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে একজন সাক্ষী শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা সাং রঘুনাথপুর। এই দলীল হয় কলিকাতায় না-হয় বর্দ্ধমানে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই নন্দকুমার শর্ম্মা যে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী) তাহা তিনি জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মনে করিতে হইবে, এই সময়ও নন্দকুমারের বিদ্যালঙ্কার রামমোহন রায়ের সঙ্গে ছিলেন। উভয়ের মধ্যে এই সঙ্গলিপ্সার বীজ রামমোহন রায়ের চৌদ্দ বৎসর বয়সের প্রথম মিলনের সময়ই বপন করা হইয়াছিল। আমি কোন কোন সন্ন্যাসীর এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, প্রবাদ আছে, হরিহরানন্দনাথ রামমোহন রায়ের গুরু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ থাক আর না থাক, এক সময়ে যে রামমোহন রায়ের উপর বয়োজ্যেষ্ঠ হরিহরানন্দনাথের বিশেষ প্রভাব ছিল এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগের সাধন রীতির পরিচয় লাভ করিতে হইলে, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সাধনরীতি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী উপাধি হইতে বুঝা যায়, তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বা দণ্ডী ছিলেন। এই সম্প্রদায় বেদান্তপন্থী; সুতরাং নন্দকুমারও বৈদান্তিক ছিলেন। তাহার উপরে তিনি কুলাবধূত ছিলেন। সংস্কৃত অভিধানে অবধূত শব্দের অর্থ বিষয়ে এই দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

> যো বিলংঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
> অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।
> অক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধূত সংসার বংধনাৎ।
> তত্ত্বমস্যর্থ সিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে।

"যে ব্যক্তি চতুরাশ্রমধর্ম্ম এবং বর্ণধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন, সেই অতিবর্ণাশ্রমী যোগীকে অবধূত বলে।

"তিনি অক্ষর পুরুষ স্বরূপ, বরণীয়, সংসারবন্ধন মুক্ত এবং তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ অনুভব করিয়াছেন বলিয়া (তাঁহাকে) অবধূত বলে।"

নন্দকুমার কেবল অবধূত বা অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতেন না, তিনি "কুলাবধূত" অর্থাৎ কুলাচারী অবধূত ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য, তিনি তান্ত্রিক কুলাচার অনুসারে অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকৃত "তন্ত্রসার" নামক প্রমাণ্য তান্ত্রিক নিবন্ধে কুলাচার বা বামাচার বা বীরাচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এদেশের মানুষ পরলোকে সুখলাভের বা জন্মজরামৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য ঋজু-কুটিল নানা প্রকার পথের, নানা প্রকার শর্ট কাটের (short cut), অনুসন্ধান করিয়াছে। ইন্দ্রিয় জয় এবং চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি লাভ করা যায় না। কুলাচার ইন্দ্রিয় জয় এবং চিত্তস্থির করিবার একটি শর্ট কাট বলিয়া গণ্য। কবে যে নন্দকুমার সন্ন্যাস গ্রহণ এবং কুলাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে যে দিন চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক রামমোহনের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল, সেই দিন তাঁহার আশ্রম যাহাই হউক, সাধন রীতি কুলাচার-মুখী ছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে। বালক রামমোহনও একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ১৭৬৮ শকের বৈশাখ (১৮৪৬ সালের এপ্রিল) মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্তে" লিখিত হইয়াছে—

"প্রথমে তিনি (রামমোহন) বৈষ্ণবধর্ম্ম অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন, তাহাতে তাঁহার এমত ভক্তি ছিল যে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু রামমোহন রায়ের বুদ্ধি ইহাতে কতকাল অভিভূত থাকিতে পারে? তিনি আরবি ভাষায় ইউক্লিড ও এরিষ্টটল নামক দুই পণ্ডিতের গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে বুদ্ধির বিশেষ প্রাখর্য্য হইল এবং তদবধি তিনি ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিবেচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম তৎকালের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে" (১ পৃঃ)।

সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্তলেখক কোথা হইতে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। ডাক্তার কার্পেন্টার ও এরিষ্টটলের এবং ইউক্লিডের আরবী

† প্রবাসী, ১৩৪৩, কার্ত্তিক, ৩৬ পৃঃ।

অনুবাদ পড়ার কথা লিখিয়াছেন।* এই সকল সংবাদের মধ্যে কোন্‌টি কত দূর সত্য তাহা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া এই পর্য্যন্ত নিরাপদে বলা যাইতে পারে—রামমোহন আশৈশব ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বিচারনিষ্ঠ ছিলেন। এমন সময় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্তকার তার পরের ঘটনার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন—

তিনি কহিয়াছেন যে "আমি যখন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক, তখন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থ এবং ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীয় ব্যক্তিদিগের সহিত আমার ভাবান্তর হইল; এ কারণে আমি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলাম।" রামমোহন রায় তিব্বত দেশে তিন বৎসর অবস্থিতিপূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিলেন। তদনন্তর ভারতবর্ষ ও তাহার উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন। পরে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইল তখন রামকান্ত রায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহে আহ্বান করিলেন ও তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডাক্তার কার্পেণ্টার রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত "সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে" (Biographical Sketchএ) গৃহত্যাগ এবং তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

রামমোহন রায়ের বয়স যখন মাত্র পনের বৎসর তখন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিবার এবং অন্যপ্রকার ধর্ম্ম দেখিবার জন্য তিনি তিব্বত ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দেশে দুই তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন, এবং দেবত্বের দাবীদার একজন জীবিত মনুষ্য জগতের স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এই মত উপেক্ষা করিয়া অনেক সময় লামা-উপাসকগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার সময় তিব্বতীয় পরিবারের মহিলাগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত এবং তাঁহার উপর দয়া প্রকাশ করিত।

* * * * *

যখন তিনি হিন্দুস্তানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েকজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং তিনি (পিতা) তাঁহাকে বিশেষ আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে রামমোহন রায় সম্ভবতঃ সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষার অনুশীলনে এবং প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।†

ডাক্তার কার্পেণ্টারের লেখার ভঙ্গী হইতে মনে হয়, তিনি রাজার নিজের মুখ হইতে তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী শুনিয়াছিলেন।* গুপ্তচরদিগের বিপজ্জনক ভ্রমণকাহিনীর সহিত পরিচিত এ কালের শিক্ষিত লোকেরা রামমোহন রায়ের তিব্বত ভ্রমণকাহিনী সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। হিন্দুর দুইটি প্রধান তীর্থ, মানস সরোবর এবং কৈলাস পর্ব্বত, তিব্বতদেশে অবস্থিত। এই সকল তীর্থ দর্শন করিবার জন্য এখনও হিন্দু সাধুরা তিব্বত গিয়া থাকেন। আমার সুপরিচিত একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আর কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিশোর রামমোহন সম্ভবতঃ এইরূপ একদল তীর্থযাত্রী সাধুসঙ্গে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কিশোর রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণে তান্ত্রিক নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের প্রভাব লক্ষিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে তিব্বতের নাম মহাচীন। মহাচীন তারা উপাসকের এবং বামাচারীর মহাতীর্থ। "তারা-রহস্য-বৃত্তিকা" নামক একখানি প্রাচীন নিবন্ধে চীনাচার তন্ত্রের অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল বচনে কথিত হইয়াছে, বশিষ্ঠ ঋষি মহাচীনে গিয়া বুদ্ধরূপী নারায়ণের নিকট চীনাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। চীনাচার বামাচারের রূপান্তর। রামমোহন বোধ হয় নন্দকুমারের নিকট মহাচীনের মহিমা শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে তথায় গিয়াছিলেন। রামমোহনের গতিবিধির কথা খুব সম্ভব নন্দকুমার জানিতেন এবং রামকান্ত রায়কে জানাইতেন। তাই যখন রামমোহন তিব্বত হইতে হিন্দুস্থানে ফিরিলেন, তখন রামকান্ত রায় পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া রামমোহন হয়ত নন্দকুমারের তত্ত্বাবধানেই হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন সাড়ে চব্বিশ বৎসর তখন রামকান্ত রায় তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ ভাগ তিন হিস্যায় বিভাগ করিয়া এক হিস্যা রামমোহন রায়কে দান করিয়াছিলেন। তার পর হইতে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারকে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা

* Mary Carpenter, *The Last Days in England of Rammohun Roy*, Calcutta. 1815, p. 3.

† Mary Carpenter, *op. cit.* pp. 3-4.

* "And his gentle feeling heart dwelt, with deep interest, at the distance of more than forty years, on the recollection of that period; these, he said, had made him always feel respect and gratitude towards the female sex."

যায়। উভয়ে একত্র হইয়া কি করিতেন? শাস্ত্রালোচনা এক কাজ ছিল। তাহা ছাড়া, রামমোহন রায় বোধ হয় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সহিত সাধন ভজন করিতেন—কুলাচারীর সহিত কুলাচার অনুষ্ঠান করিতেন। পূর্ব্বোল্লিখিত "ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার বিবরণ" প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে—

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত হয়েন, তিনি যদিও রাজার সন্নিধানে ছায়াবৎ অনুগত ছিলেন, কিন্তু তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠা মাত্র ছিল না।

এই বচন পাঠ করিলে মনে হয়, নন্দকুমার বামাচারী ছিলেন। লেখক বামাচারের প্রতি একটু অবজ্ঞাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে রামমোহন রায় যে একজন বামাচারীকে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এমন মনে হয় না। তিনি স্বয়ং এক সময় বামাচারী সাধক ছিলেন এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৮২২ সালের চৈত্র (মার্চ্চ-এপ্রিল) মাসে রামমোহন রায় এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া সংবাদ পত্রে চারিটি প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি এই—

ব্রাহ্মণ সজ্জনের অবৈধ হিংসা করণ কোন্ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ সর্ব্বভূতে-হিতেরত অহিংসক পরম কারুণিক আত্মতত্ত্ব জ্ঞানিদের আত্মোদর ভরণার্থে পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি ছেদন কারণ কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশ সদাচার মহাশয় সকলের স্কন্দপুরাণ অনুসারে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকার হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

কৌলের ধর্ম্ম যে নিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন ও মৎস্য মাংস যে আহার না করে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও করিয়া থাকেন কি না।

"কৌল" অর্থ কুলাচারী বা বামাচারী। কুলাচারীকে বীর বলে। যে কুলাচার অনুষ্ঠান করতঃ মৎস্য, মাংস আহার না করে তাহাকে পশু বলে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী (চারি প্রশ্নের কর্ত্তা) কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ করিয়া থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগ হনন কালে বিদ্যমান থাকিয়া নৃত্য কিম্বা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন কি ভোজন কালে বসিয়া স্ব স্ব উপাসনার অনুসারে অনিবেদিত ভোজন করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন। দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী সত্যকে একেকালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি যাঁহারা পরমেশ্বরের জন্ম মরণ চৌর্য্য পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন তাঁহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন ইহাও আমোদের বিষয়।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে সুরাপানের সমর্থনে কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ পশুর্ন স্যাৎ মমাজ্ঞয়া।
অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে।

কলিকালে ব্রাহ্মণগণ পশু হইবে না অর্থাৎ মদ্য-মাংস বর্জ্জন করিয়া পশুভাবে সাধন করিবে না। দ্বিজাতির পক্ষে (সাধনের সময়) মদ্যপান বিহিত হইয়াছে।

তারপর কুলার্ণব ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে এই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকার লক্ষণং।
সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্র প্রকীর্ত্তিতং।
পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিতং।
মন্ত্রার্থ স্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরায় চ।
অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং লোলুপো নরকং ব্রজেৎ।
পানে ভ্রান্তির্ভবেৎ যস্য সিদ্ধিস্তস্য ন জায়তে।

কুলবধূরা মদ্য পান করিবে না, মদের আঘ্রাণ মাত্র লইবে। গৃহস্থ সাধকেরা পাঁচ পাত্রের অধিক মদ্য পান করিবে না। এক এক পাত্রে পাঁচ তোলার বেশী মদ ধরিবে না। মন্ত্রার্থের স্ফূর্ত্তির জন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার জন্য মদ্য পান করা কর্ত্তব্য। লোভের বশীভূত হইয়া মদ্য পান করিলে নরকে যাইতে হয়। মদ্য পান করিলে যাহার নেশা হয় সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

চারি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় যে ভাবে বামাচারের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে অনুমান হয় তিনি নিজে বামাচারী ছিলেন। এই উত্তরের উত্তরে ১২২৯ সনের ২০শে মাঘ (১৮২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী) "পাষণ্ড পীড়ন" প্রকাশিত এবং বৈশাখ মাসে বিতরিত হইয়াছিল। "পাষণ্ড পীড়নে"র উত্তরে রামমোহন রায় ১২৩০ সনের ১৫ই পৌষ "পথ্য প্রদান" প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুই খানি পুস্তকেই গ্রন্থকার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন—

সমানুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টকর্ত্তৃক।

By one who laments his inability to perform all righteousness.

"পথ্য প্রদানে" গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

১৪৫ পৃষ্ঠের শেষে ["পাষণ্ড পীড়ন"কার] লিখেন "কখন তত্ত্বজ্ঞানী কখন বা ভাক্ত বামাচারী" এবং ১৬০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃপুনঃ কথন আছে. কিন্তু ধর্ম্ম সংহারকের এইরূপ লিখনাতে আশ্চর্য্য কি যে হেতু তাঁহার এ বোধও নাই যে কুলাচার সর্ব্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে বামাচারের মন্ত্র এই হয় (একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং) এবং দ্রব্য শোধনের বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুর অর্থ সংস্থান. অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্ত্তে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব যাহা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য হইয়াছে। কুলার্চ্চন দীপিকাধৃত তন্ত্র বচন—

* * * * *

কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।"

এই অংশ এবং "পথ্য প্রদানের" অন্যান্য অংশ পাঠ করিলে অনুমান হয়, রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বামাচার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের জনশ্রুতি যে রামমোহন রায় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর শিষ্য ছিলেন। হরিহরানন্দনাথ বামাচারী ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের নিত্য সঙ্গী ছিলেন। এই সম্পর্কে "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" লেখকের উক্তি আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জবানবন্দীর সহিত এই সকল প্রমাণ একত্র বিবেচনা করিলে সিদ্ধান্ত হয়, রামমোহন রায় কিশোর বয়সে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের নিকট তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং বাঁটোয়ারার পর বৈষয়িক স্বাধীনতা লাভ করিয়া গুরুকে সাধনের সঙ্গীরূপে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বামাচারের নামান্তর বীরাচার, এবং যাহারা অন্য প্রকার আচরণ করে তাহাদিগকে বলে পশু। পশুর আচার সম্বন্ধে রামমোহন রায় "পথ্য প্রদানে" কুলার্চ্চন চন্দ্রিকাধৃত কুব্জিকাতন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

পত্রং পুষ্পং ফলংতোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন পিবেন্মাদকং দ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ॥

পশু স্বয়ং পত্র, পুষ্প, ফল, জল আহরণ করিবে, কিন্তু মাদক দ্রব্য পান করিবে না, এবং আমিষ (মৎস্য, মাংস) আহার করিবে না।

বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিশোর রামমোহন ঘটনাচক্রে বামাচার আশ্রয় করিয়া সাধন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা রামমোহন রায়ের মদ্যপানের কথা স্মরণ করেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে তিনি সাধকরূপে সাধনের সামগ্রীরূপে মদ্যপান করিতেন। বামাচার স্বেচ্ছাচার (self-indulgence) নহে, এক প্রকার সাধন (discipline)। বামাচার রামমোহন রায়ের পক্ষে সুফল উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এই সঙ্কীর্ণ পথে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়া উপনিষদের দক্ষিণাচারে পৌছিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নূতন আকার দান করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের বামাচারের গুরু এবং সঙ্গী যেমন ছিলেন হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নব দক্ষিণাচারের প্রধান শিষ্য এবং সঙ্গী ছিলেন হরিহরানন্দনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। বামাচার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণামে রামমোহন কিরূপ বিশুদ্ধ আচারে পৌছিয়াছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনে এবং আচরণে। সৌভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর মাসাধিক কাল পরে, ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত" নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাবাগীশের কোনও সহকর্ম্মীর লিখিত এই প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে প্রদান করিব।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯শে মাঘ (১৭৮৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী) পালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পালপাড়ায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রামচন্দ্র কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং যখন তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর তখন শান্তিপুরের রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির নিকট স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাঠ শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার আর দুই ভাই তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিয়া অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত করিলেন। বিদ্যাবাগীশের এই বিপদের সময় তাঁহার অগ্রজ হরিহরানন্দনাথ তাঁহাকে আনিয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। কলিকাতা আসিয়া রামমোহন রায়ের

প্রচারকার্য্য আরম্ভের সমসময়ে, অর্থাৎ ১৮১৪ বা ১৮১৫ সালে, তাঁহার সহিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের এই মিলন ঘটিয়াছিল। এই দুই জনে মিলিত হইয়া কি করিয়াছিলেন জীবনবৃত্তান্তকারের ভাষায় তাহ বর্ণন করিব।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্নপ্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রমপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একজন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকট উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষপ্রযোজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্পকাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহপূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকট ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপনপূর্ব্বক কয়েকজন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এই প্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্নদ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্ম সমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল তখন তিনি তাহার একজন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিষয়ক ব্যাখ্যানদ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বামাচারী ছিলেন না। সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং সর্ব্বধর্ম্মের আচারের বিচার করিয়া রাজা রামমোহন রায় যে আচার উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে স্বয়ং যে আচার প্রচার করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্থল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের আচার। বিদ্যাবাগীশের জীবনবৃত্তান্তকার লিখিয়াছেন—

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এইরূপ বিধিবৎ লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্যপ্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞানবলে লোকের মন সত্যধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্যরূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধিপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ (১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।

এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় এই দীক্ষাবিধি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। হরিহরানন্দনাথ এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই দুই ভাই রামমোহন রায়ের বাম দক্ষিণ দুই বাহু ছিলেন। কিন্তু এই দুই ভাইই ছিলেন যন্ত্র মাত্র, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন যন্ত্রী। "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণে"র পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনে হরিহরানন্দনাথ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,

"বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠা মাত্র ছিল না।"

এই বিবরণকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এ দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার সম্যক অনুবর্ত্তী ছিলেন কিন্তু লোকভয়প্রযুক্ত তিনিও সর্ব্বদা স্বমতানুগত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন না। সহমরণ নিবারণের ব্যবস্থা প্রচার হইলে তাহা রহিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তক পক্ষরা রাজ বিচারালয়ে যে আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ইহাতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন।"*

---

* প্রবাসী, ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ, ২১২ পৃঃ

পুস্তক পরিচয়

খাদ্যবিজ্ঞান। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম, এস্-সি প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও এন্ ডি রায় বুক ব্যুরো, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য আহার না করিলে সুস্থ ও সবল থাকা যায় না, ইহা বিদ্যালয়ের ছোট ছাত্রছাত্রীরাও পুস্তকে পড়িয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন খাদ্যদ্রব্য পুষ্টিকর, এবং তাহা কোন বয়সের লোকদের কি পরিমাণে খাওয়া আবশ্যক, তাহা সকলের জানা নাই। এই বিষয়ের আলোচনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতেছে। লীগ অব নেশ্যন্‌স বা মহাজাতি-সংঘ জেনিভা হইতে পুষ্টি সম্বন্ধে চারি ভল্যুম বহি বাহির করিয়াছেন। তাহাতে এতদ্বিষয়ক গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ আছে। বাংলা দেশে স্বাস্থ্যের ও পুষ্টির অবস্থা ভাল নহে। সুতরাং যে বিষয়ের আলোচনা পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে হইতেছে, তাহার আলোচনা ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ যে বাংলা দেশের পক্ষে আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। ইংরেজীতে খাদ্য সম্বন্ধে বিদেশে প্রকাশিত যে-সকল পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাংলার প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যগুলি সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যোগ্য বাঙালীর দ্বারাই বহি লিখিত হওয়া চাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস এই বহি লিখিয়া বাঙালী জাতির উপকার করিয়াছেন। ইহা বস্তুর লীলা-বৈচিত্র্য, শরীর-যন্ত্র, এনজাইম ও পরিপাকপ্রণালী পরিপাকযন্ত্র ও পরিপাকপ্রণালী, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, ভাইটামিন, ভাইটামিন ও বাঙালীর খাদ্য, হরমোন, লবণপদার্থ, বয়স ও অবস্থাভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা, রোগীর খাদ্য, বিবিধ, ও উপসংহার, এই কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পরিশিষ্ট আছে। ইহা ছাত্রছাত্রীদের এবং গৃহস্থালীর কর্ত্তা ও কর্ত্রীদের—বিশেষ করিয়া কর্ত্রীদের—অবশ্য-পাঠ্য। ইহা গল্পের মত আমোদদায়ক বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। কিন্তু ইহা যথাসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা হইয়াছে।

সূচীসমেত ইহার পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৩২০। পৃষ্ঠাগুলি প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক। কাগজ ও ছাপা ভাল, বাঁধাই মজবুত। দাম রাখা হইয়াছে দেড় টাকা মাত্র। অতএব গ্রন্থকারদ্বয় ও প্রকাশক বইখানি বেশ সস্তা করিয়াছেন বলিতে হইবে।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মঃ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। নবম সংস্করণ। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কাগজের মলাট ৮০, কাপড়ের মলাট ১৵০।

'ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম' গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ বহুকাল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবদ্দশায় মুদ্রিত শেষ সংস্করণকে আদর্শ করিয়া এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষৎ ও দ্বিতীয় খণ্ডে অনুশাসন আছে। সংস্কৃত বচন, এবং বচনগুলির সংস্কৃত টীকা, বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ পরিশ্রম করিয়া ইহাতে কয়েকটি বিষয় পরিশিষ্টে যোজিত করিয়াছেন। যথা এই গ্রন্থরচনা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের ভাব, ইহার বিভিন্ন অংশের রচনার ইতিহাস, ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের বিবরণ, ব্রাহ্মসমাজের উপর এই গ্রন্থের প্রভাব, গ্রন্থোদ্ধৃত বচনাবলীর মূল, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অপরাপর কয়েক জন আচার্য্য কর্ত্তৃক ইহার বচন অবলম্বনে প্রদত্ত বাংলা ও ইংরেজী ব্যাখ্যানের সূচী, প্রভৃতি।

এই গ্রন্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের পাঠযোগ্য।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত। ২১৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা, হইতে শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আকারের ৩৪২ পৃষ্ঠা। এণ্টীক কাগজে ছাপা। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের তিনটি ছবি আর্ট কাগজে ছাপা। মোটা কাগজের পাটার মজবুত বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

এই বইখানি তৎপরতার সহিত এক সপ্তাহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মিত্র মহাশয়ের দীর্ঘ জীবনের বৃত্তান্ত তাঁহার বাল্যকাল হইতে নির্ব্বাসনের পর কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তীকে নিজের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা লিখাইয়াছিলেন তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার যৌবনকাল হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দেশের সমুদয় প্রধান প্রধান সার্ব্বজনিক প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত ও অনেক ভিতরের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁহার নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলেন নাই, যেমন, "সঞ্জীবনী" স্থাপন ও তাহার দ্বারা দেশের হিতার্থ বহু প্রচেষ্টার সমর্থন বা আন্দোলন পরিচালন। তাঁহার সন্তান-দিগকে "সঞ্জীবনী"র পুরাতন সংখ্যাগুলি হইতে এই সমুদয়ের বৃত্তান্ত আলাদা একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। অন্যান্য কথাও তাঁহার এখনও জীবিত বন্ধুদের সাহায্যে লিখিতে হইবে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর যে ২৬ বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশের বৃত্তান্তও ঐ পুস্তিকায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। এই অংশে তিনি নিগৃহীতা, অপহৃতা, ধর্ষিতা নারীদের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অন্য কোনও কর্মীর দ্বারা অনতিক্রান্ত। অন্য প্রকারে সাহায্য করা ছাড়া তিনি বহু অত্যাচরিত নারীকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "গল্পের বহি যেরূপ আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, আমি সেই রূপ আগ্রহের সহিত ইহা আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি।" পুস্তকটির পরিচয় দিবার নিমিত্ত আরও অনেক কথা ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে।

দিনেন্দ্র-রচনাবলী। প্রকাশিকা শ্রীকমলা দেবী ঠাকুরাণী। ৪নং বকুল বাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। প্রবাসীর মত পৃষ্ঠার ১২৪ পৃষ্ঠা। আর্ট কাগজে ছাপা তিনটি ছবি। বহিখানি এণ্টীক কাগজে ছাপা। মূল্য ১৷০ টাকা।

এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় প্রীত হইয়াছি। কিন্তু ইহা দেখিয়া

এমন অনেক স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিতেছে, যাহা নিরানন্দের নহে, কিন্তু যাহা বেদনা দিতেছে।

ইহাতে স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কতকগুলি গান ও তাঁহার স্বরলিপি এবং তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা আছে। "রবীন্দ্র সঙ্গীত" ও "সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামক দুটি গদ্য রচনাও আছে। গোড়ায় আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ভূমিকা। পুস্তকখানির শেষে "দিনেন্দ্র স্মরণে" নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং দিনেন্দ্রনাথের কয়েক জন ছাত্রছাত্রীর ও বয়স্যের লেখা আছে।

সমগ্র বইখানি আনন্দদায়ক। ইহা দিনেন্দ্রনাথের পূজনীয় পিতামহ মহাশয়ের স্নেহভাজন বহু ব্যক্তির, তাঁহার বহু পিতৃবন্ধুর, তাঁহার বন্ধু ও বয়স্যদের এবং তাঁহার নানা প্রদেশে ও জেলায় বিক্ষিপ্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় হইবে।

দিনেন্দ্রনাথের আত্মগোপন ও আত্মবিলোপ কিরূপ অসামান্য ছিল তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকায় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :

"দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোন দিন তার নিজের গান শুনি নি।...গান নিয়ে যারা তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তারা জানে সুরের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আদর্শ পর্য্যন্ত না পৌঁছয়, বোধ করি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা; কাব্যরসে তার মতো দরদী অল্পই দেখা গেছে।......অথচ কবিতা সে যে নিজে লেখে, এ কথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়।......চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করে নি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হোত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোন দিন ক্লান্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতি হোতে দেখি নি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চ্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয় নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আর এতেই আমি সুখ বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতুষ্টির উপকরণ আমিই তাকে জোগাতে পেরেছিলুম।

"... ...তার বন্ধু ছিল অনেক, তার ছাত্রেরও অভাব ছিল না, এদের সম্মুখে এবং আমাদের মতে স্নিগ্ধজনের কাছে এই লেখাগুলি নিয়ে তার একটি মানসমূর্ত্তির আবরণ উদ্ঘাটিত হোলে—এই আমাদের লাভ।"

মার্কিন সমাজ ও সমস্যা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ [নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা] প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং. ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য লেখা নাই। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক আকারের প্রায় ২৭০ পৃষ্ঠা। মজবুত কাগজের পাটায় বাঁধান। এণ্টীক কাগজে ছাপ।

এই গ্রন্থে লেখক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধনদৌলৎ, যৌবন সমস্যা, পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যা, গণতন্ত্র, আইনের অবমাননা, অপরাধের বিভীষিকা, অপরাধীর প্রাণদণ্ড, ভ্রাতৃত্ব ও ভগবান—এই কয়টি বিষয় সম্বন্ধে নিজের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষে একটি উপসংহারের অধ্যায়ও আছে। ইহা পাঠ করিলে আমেরিকা সম্বন্ধে বহু বিষয় জানা যায় বিশেষতঃ মন্দ দিকটা। আমেরিকাপ্রবাসী অধ্যাপক ডক্টর সুধীন্দ্র বসুর লিখিত Mother America পাঠ আরও জ্ঞানলাভের জন্য আবশ্যক।

চ.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রামরাম বসু রচিত ও ১৮০১ সনে প্রথম প্রকাশিত। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২৫।২ মোহনবাগান রো, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲।

এই পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস উচ্চ উপাধি পরীক্ষার পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু পাঠ্যসাহিত্যের একান্ত অভাব। এ কথা যাঁহারা অধ্যাপনা করেন তাঁহারাই জানেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা গদ্যসাহিত্য-সৃষ্টির যে প্রয়াস তাহার কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এই সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে এইরূপ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা বিনাশ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই সকল গ্রন্থ পুনঃপ্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই—তাহার আবশ্যকতাও নাই। তিনি এইগুলিকে আর একবার ছাপিয়া কয়েকখানি প্রতিলিপি মাত্র ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আর দেরি করিলে শুধুই দুষ্প্রাপ্য নয়, এগুলি একেবারে লোপ পাইবে। তখন এই সাহিত্যের উদ্ভব-রহস্য আর জানা যাইবে না—উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের প্রথম অধ্যায়, ইতিহাসের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান তাহার কোনও উপাদান আর মিলিবে না।

সকল গ্রন্থই এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; বাছিয়া বাছিয়া কয়েকখানি মাত্র ছাপা হইতেছে; এই নির্ব্বাচনকার্য্যেও যথেষ্ট বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে। এ যাবৎ তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—'কলিকাতা কমলালয়', 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' ও 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।' ইহার প্রত্যেকটিই যে সুনির্ব্বাচিত পণ্ডিত মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

প্রথমখানি আদি গদ্যরীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ত বটেই; কিন্তু তদপেক্ষা আর এক হিসাবে অতিশয় মূল্যবান। বাঙালীর অনভ্যস্ত নাগরিক জীবনের নূতন রীতিনীতি ও তদবিরুদ্ধে পুরাতন পল্লীবাসীর সংস্কার এই গ্রন্থে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আধুনিকতম সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থে শুধুই গদ্য নহে গদ্যসাহিত্যের অঙ্কুর দেখা যাইতেছে। শিশু যেন প্রথম চলিতে শিখিতেছে। একটিতে এখনও পদক্ষেপ সঙ্কোচময়, অপরটিতে স্বচ্ছন্দ না হইলেও সবল ও নির্ভীক।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত রীতিমত গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে যেমন মূল্যবান, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিতেছে। রামরাম বসু শব্দসৃষ্টি ও বাক্যযোজনা বিষয়ে যেমন নিপুণ চলতি ভাষার শব্দগুলিকে অদ্ভুত উচ্চারণ ও বানান সাহায্যে গুরুগম্ভীর সাধুভাষার গাম্ভীর্য্য দান করিতে যেমন পটু, তেমনই কিম্বদন্তী ও যৎসামান্য ঐতিহাসিক মসলা সহযোগে প্রতাপাদিত্য-কথাকে তিনি যেভাবে 'সত্যমূলক' করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাঁহার মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম প্রকট হইয়াছে বলিতে হইবে। ইতিহাস-রচনার ভানে সেকালের এই বুদ্ধিজীবী বাঙালী মুন্সী যে চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা শক্তি হিসাবে নিষ্ফল হয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু উহার যেটুকু জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেই যে মানুষটির পরিচয় পাই সেই মানুষের পক্ষেই এইরূপ অকুতোভয়ে

লেখনী চালনা সম্ভব, এবং তাহারই ফলে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' সত্যকার ইতিহাস না হইলেও, কল্পনার প্রসারে ও ভাষার স্বচ্ছন্দ মুক্ত ভঙ্গিতে সাহিত্যিক গদ্যরচনার একটি আদি ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে পরবর্ত্তীকালে যে নাটক বা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে এই গ্রন্থই তাহার ঘটনাবস্তুর প্রায় সব, এমন কি কল্পনারও প্রেরণা জোগাইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থখানি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক কারণে মূল্যবান বলিতে হইবে।

পরিশেষে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার সম্পাদনকার্য্য যেভাবে হইতেছে, গ্রন্থকারের জীবনী ও তৎসহ নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য যেরূপ পরিশ্রম সহকারে সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক গ্রন্থ অন্য কারণেও অতিশয় মূল্যবান হইয়াছে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জন্মস্বত্ব (উপন্যাস), শ্রীসীতা দেবী প্রণীত। কাত্যায়নী বুকষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা। ২৬৮ পৃষ্ঠা।

লেখিকা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা, বাংলা সাহিত্যের আসরে তিনি স্বকীয় শক্তিবলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। সরল অথচ মধুর, স্বচ্ছন্দগতি ভাষা, অনাড়ম্বর, অকুণ্ঠিত প্রকাশ ভঙ্গী সীতা দেবীর রচনার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার সে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্লটের মধ্যে কূটকল্পনাপ্রসূত কোন জটিলতা নাই, কোথাও একবিন্দু অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই। আধুনিক যুগের কলিকাতার প্রগতিশীল সমাজের কাহিনী হইলেও কোন ছত্রে এক ফোঁটা উগ্রতা অথবা পাশ্চাত্য-সাহিত্য উদ্গারিত ন্যাকামী নাই। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, লেখিকা এত বড় পুস্তকখানিতে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা গভীর নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, জীবনে যে জন নারীর প্রিয়তম হইবে, যাহার সহিত নারী নীড় বাঁধিবে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অধিকার নারীর একান্ত ভাবে নিজস্ব, এ তাহার জন্মস্বত্ব।

এই বিংশ শতাব্দীতেও এই মত লইয়া বিরোধ করিবার লোকের হয়ত অভাব হইবে না, নারীর জন্মস্বত্বের দাবী নাকচ করিবার জন্য মামলা অনেকে করিবেন, কিন্তু জন্মস্বত্ব বইখানি যে রসবিচারে উত্তীর্ণ এ স্বত্ব লইয়া কেহ কোন বিরোধ করিবেন না।

চরিত্রাঙ্কনেও লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মানুষগুলি রক্তমাংসের মানুষের মত রূপ লইয়া মানস-লোকে চলাফেরা করে, কথা কয়। সুরেশ্বর যামিনীকে বড় ভাল লাগিল। মমতা নিখুঁত, সুজিত সুরেশ্বরের উপযুক্ত পুত্র। ভাবী আই, সি এস দেবেশ চমৎকার, অলকা আরও চমৎকার। কোন একটা ক্ষেত্রে অলকা দেবেশকে লেখিকা যদি মুখোমুখী দাঁড় করাইয়া দিতেন তবে বড়ই উপভোগ্য হইত। অন্যের মধ্যে অমরেন্দ্র মমতার উপযুক্ত দয়িত রূপেই ফুটিয়াছে।

বইখানি শুধু সুন্দরই নয়। উগ্র আধুনিকতার যুগে যে শুভ্র পবিত্র শান্ত সত্যের সংযত রূপ বইখানি প্রকাশ করিয়াছে, তাহা মঙ্গলময় বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—ঘৃতং পিবেৎ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ১৲

চার্বাকবাদের সূচক হিসাবে যে ক্ষুদ্র শ্লোকটি প্রচলিত ঘৃতং পিবেৎ তাহার মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠতম অংশ। আধুনিক সভ্যতার এটি মূলমন্ত্র। এই সভ্যতার জন্মভূমি ইউরোপের অনুকরণে এই মন্ত্রের সাধনায় আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে লেখক এই বইখানিতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশেষ করিয়া বিবাহের দিকটাই বইয়ের লক্ষ্য। ভূমিকায় লেখা হইয়াছে—"'ঘৃতং পিবেৎ' বিবাহতত্ত্ববিষয়ক একখানি অপ রোমান্টিক নাটক।" জাতীয় বিবাহে পূর্বরাগের স্থান নাই, অথচ তাহার একটা নিজস্ব রোমান্স আছে। ইহার মধ্যে আধুনিক প্রথায় পূর্বরাগ আসিয়া পড়িয়া এমন একটা 'জগাখিচুড়ি' পাকাইয়া তুলিতেছে। ইহাতে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহার বহুবিধ সম্ভাবনার মধ্যে অন্যতম দুইটা [illegible] সাজাইয়াছেন।

এই পূর্বরাগ আর হিন্দু বিবাহের অচ্ছেদ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া লেখক আধুনিক সমাজের অনেকগুলি জিনিষ চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন - নিও আরিষ্টোক্র্যাসি, কম্যুনিজম, ব্যবসায়গন্ধিক সাহিত্য, আরও অনেক কিছু। [illegible] যাহা তাহা ভূমিকায় আছে।

প্রবল নিষ্ঠার এই মত জাতীয় জীবনের (অর্থাৎ বর্তমানে জাতীয় জীবন যাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার) সমস্ত উপাদানগুলিকে নিরপেক্ষ ভাবে তুলিলে সব সময় লেখকের সহিত একমত হওয়া যায় না। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় G. B. S. এর অনুকরণে তিনি বাংলা নাটকে যে পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই বহুলাংশে সফল হইয়াছেন। সাহিত্যে সিনিসিজম্ একটা আর্ট; এই আর্টে সিদ্ধহস্ত হইবার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহার ঔজ্জ্বল্য, বাক্যের তীক্ষ্ণতা, হিউমার;—যা হাসির সঙ্গে সঙ্গে গায়ে জল-বিছুটি দেয়, সবই তাঁহার আয়ত্ত, আর বেশ পুরামাত্রায়। নাটকীয় সিচুয়েশান সৃষ্টি করিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রবন্ধাংশে (যথা ভূমিকায়) তাঁহার কলম সবচেয়ে খোলে। 'বীরবলে'র পর তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে এ জিনিষ বাঁচাইয়া রাখিবেন।

বোধ হয় নূতন প্রচেষ্টা বলিয়া মাঝে মাঝে শক্তির অপব্যয় হইয়াছে তাহাতে কথাবার্তায় এবং ঘটনা-সৃষ্টিতে কোথাও কোথাও জটিলতা আসিয়া গিয়াছে। শক্তিশালী লেখক এ-দোষ নিজেই ভবিষ্যতে কাটাইয়া উঠিবেন।

কাগজের বাঁধাই। ছাপা ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সোসিয়ালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ, এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য সন্স লিমিটেড, ১৮ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

সোসিয়ালিজম্ ও কম্যুনিজমের মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে অথচ নিপুণভাবে গ্রন্থকার এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় এবং সময়োপযোগী। শেষ পরিচ্ছেদে হিন্দু 'সোসিয়ালিজম্' সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। আমরা লেখকের বিদ্যাবত্তা ও লিখন-ভঙ্গির প্রশংসা করি এবং বইখানার বিস্তৃত প্রচার কামনা করি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীগীতাসার বা গদ্য শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা,—শ্রীবরদাচরণ সেন কর্ত্তৃক বিবৃত। শান্তিপ্রেস, ঢাকা, মূল্য—১।০

গ্রন্থকার তাঁহার গীতাসারে গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে,

তিনি গীতার সমস্ত শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া, গীতার সার মর্ম্মের সরল অনুবাদ দিয়াছেন। লেখক বহু পুস্তক হইতে ভাব ও ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, গীতার ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুগ-সমস্যার দিনে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

জয়না—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, পৃষ্ঠ ১৫৫, মূল্য ১।০ মাত্র।

লেখিকা 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি' ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাহার পরিচায়ক। ইহাতে ২৪টি ছোট ছোট প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধের বিষয়গুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) সমাজ, (২) ধর্ম্ম, (৩) নীতি, (৪) শিক্ষা ও (৫) বিবিধ। আমাদের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যে সকল সমস্যা (অস্পৃশ্যতা, বর্ণগত জাতিভেদ, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাদিগের অন্ন-সংস্থান প্রভৃতি) অমীমাংসিত রহিয়াছে বা সম্যকরূপে মীমাংসিত হয় নাই এবং অধুনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে যে সমস্ত নূতন সমস্যার (পাশ্চাত্য ধরণে জীবনযাপন ও পরিবার-গঠন, ধনগত জাতিভেদ ইত্যাদি) উদ্ভব হইয়াছে, এই বইখানিতে তাহাদেরই আলোচনা আছে। এই সমস্যাগুলির আলোচনা ও সমাধান করিতে গিয়া লেখিকা বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মত অতি উদার; সিদ্ধান্তগুলিও সুস্পষ্ট। তিনি বাজে কথায় প্রবন্ধগুলির কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই, অল্প কথায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা অনাড়ম্বর, সরল ও স্বচ্ছন্দ, কোথাও জটিলতা নাই। স্ত্রী পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট পুস্তকখানি যে আদৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

কাঁটা—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ সিকা।

আটটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি একটানা পড়িয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না, ভাষা বেশ পরিষ্কার। ছোট গল্পে প্রকাশ-পরিমিতি যেটুকু বাঞ্ছনীয় নিত্যনারায়ণ বাবুর গল্পে তাহার অভাব নাই কিন্তু যে ঘনত্ব ছোট গল্পের প্রাণ, অধিকাংশ গল্পে তাহার অভাব আছে। সেজন্য সেগুলি মনের উপর গভীর রেখাপাত করে না। অর্থাৎ সেগুলি গল্পের সম্পূর্ণতা পায় নাই। 'নিয়তি' গল্পটির চং বিলাতি, এবং এইটিই তাঁহার সমস্ত গল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট। 'বলাই চাটুজ্যে', 'বারো ঘণ্টা' এবং 'সমস্যা' ইহার তুলনায় দ্বিতীয় স্থান পাইবে। 'সমস্যা'র শেষ অংশে সমস্যা আলোচনার অত্যধিক বিস্তার না থাকিলে ইহা একটি উৎকৃষ্ট গল্প হইতে পারিত। গল্পগুলি পড়িয়া আশা হয় লেখকের দ্বারা উচ্চশ্রেণীর গল্প রচনা সম্ভব।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

মধুচ্ছন্দা (কবিতার বই)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে গোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

'মধুচ্ছন্দা' নামটির আকর্ষণে একান্ত আগ্রহ লইয়া বইখানি খুলিয়া আগাগোড়া পড়িলাম। আগ্রহ অসার্থক হইল না। প্রথমেই ছন্দের দোদুল দোলায় দুলে 'মধুচ্ছন্দা' রূপমূর্ত্তিতে আবির্ভূত।

বর্ষামেঘের রাতি কাঁপে মধুচ্ছন্দা,
ধার হিন্দোলে নামে রূপলোকানন্দা।

এই রূপলোকানন্দা মধুচ্ছন্দা কবির মানসপদ্মে নামিয়াই কবিকে দিয়া "বিশ্বমালার সূত্র" গাঁথাইলেন। এই "বিশ্বমালার সূত্র"টির সঙ্গে মধুচ্ছন্দার সমস্ত কবিতাগুলি গ্রথিত। মধুচ্ছন্দার ভাবে আবিষ্ট কবি এই মাটির ধরণীতে নামিয়া পার্থিব জীবনের সমস্ত ভোগকে মানবজীবনের ঊর্দ্ধমুখী শতদলের সঙ্গে একত্রে গাঁথিয়াছেন। গ্রন্থের মধুচ্ছন্দা নামের ইহাই সার্থকতা।

কবির কল্পনা কখনও উর্দ্ধে উঠিয়াছে, কখনও বা মৃন্ময় জগতের টানে নীচে নামিয়া পৃথিবীর রূপে রসে নিজেকে হিল্লোলিত করিয়াছে। কোন কোন স্থলে নিতান্ত ভোগের বস্তুর মধ্যে তাঁহার কাব্য রক্তমাংসের দেহকে আশ্রয় করিয়াও দেহাতীত হইতে পারিয়াছে। কবির মূলসন্ধান যে উর্দ্ধমুখী ইহা তাহারই পরিচয়।

চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি স্খলিতছন্দের কবিতা দেখিলাম, যাহা মধুচ্ছন্দার সৌন্দর্য্য-শতদলে কীটস্বরূপ হইয়া আছে। আমার মনে হয় ঐ শ্রেণীর দুই একটি কবিতা কবির নিতান্ত কিশোর বয়সের লেখা। এগুলি মধুচ্ছন্দায় না সাজাইলেই ভাল হইত। তবে কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও চন্দ্র যেমন মানবমনকে নন্দিত করে এবং কীট থাকা সত্ত্বেও পদ্ম যেমন পবিত্রতা-গৌরবে অনায়াসে দেবচরণ চুম্বনের অধিকার পায়, তেমনি দুএকটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই কাব্যগ্রন্থখানি বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে যে পদ্মের ন্যায়ই ফুটিয়া রহিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি মধুচ্ছন্দার কবির এই কাব্য-সাধনা জয়যুক্ত ও অক্ষয় হইবে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যক্ষ্মা-চিকিৎসা—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—হোমিও কেমিষ্ট, রাঁচি। ১৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকের লেখক স্বয়ং যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া কিরূপে উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন তাহার বিশদ পরিচয় প্রদান করিয়া যক্ষ্মারোগের হাত হইতে কিরূপে অব্যাহত থাকা যায় এবং যক্ষ্মা রোগীর কিরূপ নিয়ম পালন করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। যক্ষ্মারোগের পরীক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় কতিপয় ঔষধ লেখক যাহা ব্যবহার করিয়া ও অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া ফল পাইয়াছেন সেই সব ঔষধের প্রস্তুতবিধি এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর চিকিৎসাধীনে থাকাকালীন লেখক যে-সব ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের উপাদান প্রসঙ্গে "মৃত্যু-রাজপত্র" প্রভৃতি কয়েকটি বনৌষধির উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল বনৌষধির পরিচয়, উহাদের বাংলা নাম এবং কোথায় পাওয়া যায় যদি স্বামীজীর নিকট হইতে জানিয়া প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে সংগ্রহ করা সহজ হইত। লেখক পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে বিশুদ্ধ বায়ু, প্রফুল্ল মন, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম রোগ আরোগ্যের সহায়। ইহার সহিত আর একটি কথা যোগ করিলে ভাল হইত—মাদক দ্রব্য পরিহার। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ দিনের পর দিন যক্ষ্মারোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণে—বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিরা এই পুস্তক পাঠে বহু বিষয় জানিতে পারিবেন। পুস্তকের কলেবরের তুলনায় মূল্য অধিক হইয়াছে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

নারী

শ্রীউমা দেবী কাব্যনিধি

এসেছিলে নারী,
সৃষ্টির আদিম প্রাতে স্রষ্টার সৃজন-ধন্যা হয়ে
হাতে লয়ে কী বেদনা বারি!
মথিয়া ত্রিলোকসিন্ধু—ভাগ্যে তব উঠিল গরল,
সৌন্দর্য্য-পসরাখানি শিরে ধরি—চল অচঞ্চল।
করুণায় কেঁদেছিল ভূমি
সেদিন চরণ-দুটি চুমি,
তোমার সঙ্গীতে অয়ি, বিষাদের গভীর রাগিণী
দিকে দিকে উঠিল ঝঙ্কারি,
অভাগিনী নারী।

শোক, দুঃখ, দৈন্য ও ভরম,
আশা, প্রীতি, হৃদয়-ধরম
যেদিন মানব প্রাণে আবর্ত্তিল স্রোত-জলরাশি
জাগিল সরম।
জীব-জননীর রূপে মহিমায় দীপ্ত মহীয়সী
মানবের গৃহে যবে শক্তি তব উঠিল উচ্ছ্বসি,
বিধাতার বিধানে কি নব—
এলো বুকে দুর্ব্বলতা তব?
স্নেহ, প্রেম, সরলতা, করুণায় ভরিল মরম।
চিনিল মানব জাতি, তোমার দুর্ব্বল চিত্তখানি,
কাঞ্চনে পড়িলে রেখা সে কলঙ্ক মুছে নাকো জানি।
ধীরে ধীরে অলক্ষেতে আসি
তোমারে করিল তারা দাসী,
হরিল স্বাধীন বৃত্তি হৃদয়ের আনন্দ-গরিমা,
চারি দিকে বেড়ি দিল সীমা;
সুখ সাধ শূন্যেতে বিলীন—
তুমি হ'লে হীন।

অয়ি গৃহদেবী,
হ'ল শত অত্যাচার সেবি
পবিত্র দেউল তব প্রেতের বীভৎস ক্রীড়াভূমি;
চিত্ত শতদল হ'তে ঝরে দল ম্লান ধূলি চুমি।
কোথা তব প্রেম-অর্ঘ্য শুচিশুভ্র কলঙ্কবিহীন?
তোমার নৈবেদ্য হের কুক্কুরের প্রসাদ অধীন।

তবু সেথা ছদ্মবেশ পরি,
পূজা নিতে হবে, পুট ভরি?
আত্মারে ছলিতে হবে দেবী,
প্রতারণা সেবি?

যে করে লাঞ্ছনা,
তাহারি চরণ তলে বিমুগ্ধ আত্মারে আনি
আপনারে করিবে বঞ্চনা?
দারুণ মিথ্যার জাল দৃঢ় হস্তে ছিন্ন কর টানি,
ধ্বনিত হউক বিশ্বে সুকঠিন ধ্রুব সত্যবাণী!
অসত্যের ক'রো না কামনা,
সুন্দরের নির্ম্মলের কর উপাসনা।

জড়ের আকার
কুসুম-পেলব প্রাণে সহ্য কর প্রবলের মিথ্যা অত্যাচার!
সর্ব্বসত্তাহীন
কোন্ মোহে ত্যাগ কর মানুষের আত্ম-অধিকার?
বিবেকবিহীন,
মনুষ্যত্বে তুচ্ছ করে নির্ম্মম মানব;
দুই পদে দলি সত্য নৃত্য করে অন্যায়-দানব।
বক্ষমাঝে মূর্চ্ছাহত প্রাণ,
গাহিতেছে মরণের গান;
নিষ্প্রভ জীবনীশক্তি, মহিমা সে লুণ্ঠিত ধূলায়,
হ'লে কি আহুতি তুমি সমাজের পাবক-শিখায়?
তার পরে অন্তহীন তমিস্রায় লীন
জগৎ মলিন।

বরি নিলে বালা,
এই নাগপাশে-বাঁধা, রুদ্ধ মৌন অন্ধ কারাগারে
শত তীব্র বৃশ্চিকের জ্বালা,
নির্ব্বিকার শান্তমুখে, সহিষ্ণুতা-ছদ্মবেশ ধরি
গ্লানি আর লাঞ্ছনারে কেন নিলে বরি?
মুক্ত কারাগার,
আত্মার আদেশ বাণী লঙ্ঘন ক'রো না বার বার।
বিজয়ের সুরভিত মালা
বহি আনো বালা!

দুধ-লতা প্রজাপতির জন্মকথা

রূপকথার ব্যাং যেমন রাজকন্যা-সকাশে তাহার কুৎসিত আবরণটা পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ রাজপুত্রের রূপ ধারণ করিত প্রাণী-জগতে কিন্তু এরূপ সত্যিকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের আশেপাশে অহরহ কত বিচিত্র বর্ণের সুদৃশ্য প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাই। তাহাদের জন্ম-ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এস্থলে আমাদের দেশীয় লালচে হলদে রঙের দুধ-লতা প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।

দুধ-লতা প্রজাপতির কীড়া বা প্রাক্‌-কীটাবস্থা
নীচে: পূর্ণাঙ্গ দুধ-লতা প্রজাপতি

কলিকাতার আশেপাশে বনেজঙ্গলে বড় গাছ বা বেড়ার গায়ে অযত্নবর্দ্ধিত এক প্রকার বন্য লতার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পাতাগুলি একটু গোলাকার ধরণের, প্রায় প্রত্যেক গাঁট হইতে এক-একটা লম্বা বোঁটার ডগায় এক জোড়া কাঁটাওয়ালা সরু-মুখ ফল ধরে। ফলগুলি শুকাইলে ফাটিয়া যায় এবং ঝাঁটার মত এক গোছা সূক্ষ্ম তন্তু সমন্বিত বীজ বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে; পাতা বা ডাঁটা ছিঁড়িলে দুধের মত অজস্র রস ঝরিতে থাকে, এই জন্যই বোধ হয় ইহাদিগকে দুধ-লতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একটু মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিলেই এই লতার গায়ে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার অভদ্র শুয়াপোকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই শুয়াপোকাগুলি প্রায় এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, গায়ের উপরি ভাগে হলদে ও কাল রঙের ডোরা-কাটা। দেহের সম্মুখ ভাগে পিঠের উপর দুই জোড়া এবং শেষের দিকে এক জোড়া কাল রঙের লম্বা শুঁড় আছে। মুখটা সাদা কাল ডোরাযুক্ত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহারা রাত দিন এই দুধ-লতার পাতা ও ডাঁটা খাইতেছে। এক দণ্ডও বিশ্রাম নাই, পাতার ধার হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে প্রায় ½ ইঞ্চি স্থান লম্বালম্বিভাবে অতি সূক্ষ্ম অংশে কাটিয়া খায়। খাইবার সময় দেখা যায় যেন মুখটাকে কেবল বার-বার উপর হইতে নীচের দিকে নামাইতেছে। ইহাদের চেহারা দেখিতে ভীষণ হইলেও অন্যান্য সাধারণ শুয়াপোকার মত বিষাক্ত নহে। অন্যান্য সাধারণ শুয়া-পোকা মানুষের গায়ে লাগিলেই চামড়ার মধ্যে শুঁয়াগুলি বিদ্ধ হইয়া যায় এবং সেস্থানে প্রদাহ, এমন কি সময়ে সময়ে ক্ষতেরও সৃষ্টি করে। কিন্তু এই শুয়াপোকার গায়ে মোটেই শুঁয়া নাই। ইহারাই দুধ-লতা প্রজাপতির বাচ্চা বা কীড়া। এই কীড়া বা শুয়াপোকাই কালক্রমে অমন সুন্দর প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই দুধ-লতা প্রজাপতিই যেখানে-সেখানে বেশীর ভাগ নজরে পড়ে। দিনের বেলায় উড়িতে উড়িতে ইহাদের যৌন সম্মিলন ঘটে; এই সম্মিলনের কিছুকাল পরেই স্ত্রী-প্রজাপতি দুধ-লতার পাতার গায়ে একসঙ্গে কতকগুলি করিয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। দিন-দশ-পনর পরে ডিম ফুটিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুয়াপোকা বাহির হয়। তখন তাহাদের গায়ের রং থাকে কতকটা ছাইয়ের রঙের মত। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার কিছুক্ষণ বাদেই খাইতে সুরু করিয়া দেয়। কিন্তু তখন পাতার সমস্ত অংশটাই খাইতে পারে না; কেবল পাতার সবুজ অংশটুকুই কুরিয়া কুরিয়া খায়। আর একটু বড় হইলেই পাতা বা ডাঁটার সমস্ত অংশ কাটিয়া কাটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। প্রায় দশ-পনর দিন এরূপ খাইতে খাইতে বড় হইয়া হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, এবং কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া শক্ত একটি ডাঁটা নির্ব্বাচন করিয়া শরীরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে এক প্রকার আঠালো পদার্থ নির্গত করে এবং ঐ ডাঁটার গায়ে মাখাইতে থাকে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাখান মাত্রই ঐ রস জমিয়া সুতার আকার ধারণ করে এবং বোঁটার ন্যায় ঐ সুতার সঙ্গে শুয়াপোকাটি মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ঝুলিয়া পড়ে। ঝুলিবার সময় কেন্নোর ন্যায় মাথার দিক ঈষৎ বক্র ভাবে থাকে। প্রায় আট-দশ ঘণ্টা এরূপ নিস্পন্দভাবে ঝুলিয়া থাকিবার পর হঠাৎ দেখা যায়—শুয়া-পোকাটার শরীর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ কাঁপুনি বাড়িতে বাড়িতে ঝাঁকুনিতে পরিণত হয়। এই সময়ে ে
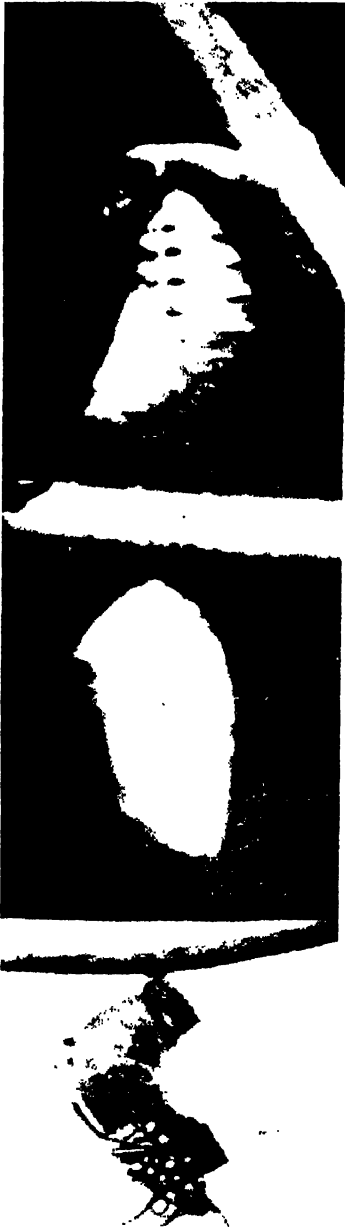
দুধ-লতা প্রজাপতির কীড়া
গুটি বাঁধিবার জন্য ঝুলিয়া
পড়িয়াছে

উপরের খোলস ত্যাগ
করিয়া ঐ কীড়া গুটি
বাঁধিতেছে, গায়ের
খোলসের কিয়দংশ দেখা
যাইতেছে

গুটির আকার ক্রমঃ
পরিবর্তিত হইতেছে

১। গুটির আকার প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে
২। পিউপা বা স্বাভাবিক গুটি

গুটি বাঁধিবার আঠার দিন পরে প্রজাপতি বাহির হইতেছে

১। গুটি হইতে সবে প্রজাপতি বাহির হইয়াছে
২। পরিত্যক্ত গুটির খোলসের উপর প্রজাপতিটি বসিয়া আছে, ডানা বড় হইয়াছে

শুঁয়াপোকাটার মাথার দিকে পিঠের উপর খানিকটা স্থান হঠাৎ একটু স্ফীত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চামড়াটা ফাটিয়া গেল, এবং ভিতর হইতে উপরের দিক সরু ও নীচের দিক মোটা এক অপূর্ব্ব সবুজাভ পিণ্ডাকার পদার্থ বাহির হইতে লাগিল। তখনও শরীরের ঝাঁকুনি পূর্ব্বমতই চলিতেছে। প্রায় দশ-পনর সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে উপরের চামড়াটা সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া গিয়া একটু কাল ঝুলের মত বোঁটার কাছে আটকাইয়া রহিল। সবুজ পিণ্ডাকার পদার্থটা সেই বোঁটায় ঝুলিয়াই শরীর একবার প্রসারিত এবং একবার সঙ্কুচিত করিয়া নানাভাবে মোচড় খাইতে লাগিল। পরিবর্ত্তিত হইয়া উপরের দিক মোটা ও নীচের দিক সরু হইয়া গেল। উপরের দিকে পাশাপাশি ভাবে একটু স্ফীত স্থানের উপর উজ্জ্বল সোনালী রঙের ফোঁটা সারি সারি ফুটিয়া উঠিল। শরীরের নিম্নভাগেও ঐরূপ কয়েকটি সোনালী রঙের ফোঁটা আত্মপ্রকাশ করে। পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরই এমন একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিয়া যায় যে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। তার পর সেই অবস্থায় সবুজ রঙের ঠিক ছোট একটি আঙুর ফলের মত লতার গায়ে ঝুলিতে থাকে। রং প্রথমে হাল্কা সবুজ, পরে গাঢ় সবুজ হইয়া যায়। সোনালী ফোঁটাগুলিতে আলো প্রতিফলিত হইয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে। কিন্তু পাতার সবুজ রঙের সহিত ইহাদের গায়ের রঙের এমন অপূর্ব্ব সাদৃশ্য যে অনেক ক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে অন্বেষণ না করিলে সহসা কোন মতেই নজরে পড়ে না। পনর হইতে বিশ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে ঠিক কানের দুলের মত ঝুলিয়া থাকে। ইহাই প্রজাপতির গুটি বা পিউপা অবস্থা। বিভিন্ন প্রজাপতির গুটি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রঙের হইয়া থাকে। কত না তাহাদের রঙের বাহার, কত না তাহাদের কারুকার্য্য! বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে ও গঠন-পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কবির ভাষায় ইহাদিগকে সত্যিকার 'পরীর কানের দুল' বলিতেই ইচ্ছা হয়।

দুধ-লতা প্রজাপতির গুটি বা পিউপার রং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় সবুজ; কিন্তু মাঝে মাঝে কতকগুলির রং একেবারে সাদা হইয়া থাকে। সোনালী ফোঁটাগুলি কিন্তু উভয়েরই একই রকমের।

পনর-বিশ দিন পরে গুটির রং ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিকে হইয়া যায়। তখন উপরের আবরণটা অনেক স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। তখন তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের প্রজাপতিটিকে আবছা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—যেন ডানা মুড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গুটির মধ্যস্থল হইতে নীচের দিকে একাংশ ফাটিয়া যায় এবং তাহার ভিতর দিয়া প্রজাপতি আস্তে আস্তে মুখ বাহির করিতে থাকে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ডানা বাহিরে আসে তার পর একবারে প্রজাপতির সমস্ত শরীর বহির্গত হয়। খোলস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার সময় তাহার ডানা অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকে। লেজের দিকও সেইরূপ অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র কিন্তু মোটা। বাহিরে আসিয়াই ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতিটি তাহার পরিত্যক্ত খোলস আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ও ডানাগুলি তর তর করিয়া বাড়িতে থাকে। প্রায় চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক প্রজাপতির অবস্থায় পরিণত হয়। এই সময়ে ডানাগুলি কোমল ও তকতকে থাকে। বেকায়দায় পড়িয়া ডানাগুলি একটু এদিক-ওদিক বাঁকিয়া গেলে আর সোজা হইবার উপায় থাকে না। স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পরও প্রায় ঘণ্টাখানেকের উপর প্রজাপতিটি ডানা মুড়িয়া সেই পরিত্যক্ত খোলসের উপরই বসিয়া থাকে। তার পর ডানা একবার প্রসারিত করিয়া আবার গুটাইয়া পরখ করিয়া দেখে ঠিক উড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা। তাহার কিছুক্ষণ পরেই উড়িয়া গিয়া ফুলের মধু আহরণে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মিউনিক্ শহর

মিউনিক্

শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ও শ্রীধন্যকুমার জৈন

ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক্ শহরকে জার্ম্মেনীর প্রাণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। মিউনিক ওদেশের সব চেয়ে সুন্দর জায়গা। জার্ম্মানরা একে সাজিয়ে-গুজিয়ে এমন মনোরম ক'রে তুলেছে যে একে একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। তা-ছাড়া, প্রকৃতির দানও কম নয়;—চারদিকে গাছ-পালা, জলাশয়, পাহাড়-পর্ব্বত,—দেখে প্রাণে কবিত্বের উদয় হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে একটি বিরাট মিউজিয়ম বা বৈজ্ঞানিক সংগ্রহালয় স্থাপন করা হয়। সেই থেকে শহরটা যন্ত্র-যুগের তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা দেশ থেকে বিজ্ঞানের উপাসকেরা এই যন্ত্র-তীর্থে এসে থাকে।

কিন্তু আজকাল সেই আকর্ষণের মধ্যে একটা ভীষণতা প্রবেশ করেছে। এটা হ'ল হিটলারের প্রিয় নগরী। নাৎসি-শক্তির প্রাদুর্ভাব এইখানেই হয়েছিল এবং এখনও সে শক্তি পরিচালিত হয় এখান থেকেই। কাজেই মিউনিক্ এখন হিটলারের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদপত্রে নাৎসি-অত্যাচারের কাহিনী প'ড়ে মনে হ'ত, কাগজওয়ালারা বড় বাড়িয়ে লেখে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম তার মধ্যে অত্যুক্তি নাই। বার্লিনের পুলিস তবু সভ্য, কিন্তু মিউনিকের পুলিসের ব্যবহার দেখে বর্ব্বর যুগের কথা মনে পড়ে। রাস্তায় হিটলারের উদ্ধত নাৎসি যুবকরা আমাদের দেখে এমনি মুখভঙ্গী করত, যেন আমরা তাদের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য। এই বিংশ শতাব্দীতে, এমন সভ্য যুগে এ-সব দেখে-শুনে বড় দুঃখ হয়।

শহরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানকার লোকসংখ্যা সাত লক্ষ। নদীর দুই ধারে শহর, মাঝখানে ইসার বইছে। প্রশস্ত রাজপথগুলি সোজা টানা চ'লে গেছে। স্থানে স্থানে মাঠ, গাছপালা, বাগান-বাড়ি আর বড় বড় ফোয়ারা। দেখে মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এখানকার একটি ফোয়ারা (Wittelsbacker Brunnen) জগৎ-প্রসিদ্ধ এবং সেটার জন্য জার্ম্মানরা গর্ব্ব বোধ করে।

সাধারণতঃ দেখতে গেলে জার্ম্মেনীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই জার্ম্মান-সংস্কৃতির কেন্দ্র, কিন্তু বার্লিন ও মিউনিক্ তাদের মধ্যে প্রধান। মিউনিক্-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সব দেশেরই বিদ্যার্থীরা জ্ঞানলাভ ক'রে থাকে। ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাও কম নয়। এখানে বিজ্ঞানের এবং আরও অনেক রকম পরীক্ষাগার আছে। এখানকার হাইড্রলিক বিদ্যালয় দেখে আনন্দ হ'ল। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও মন্দ নয়।
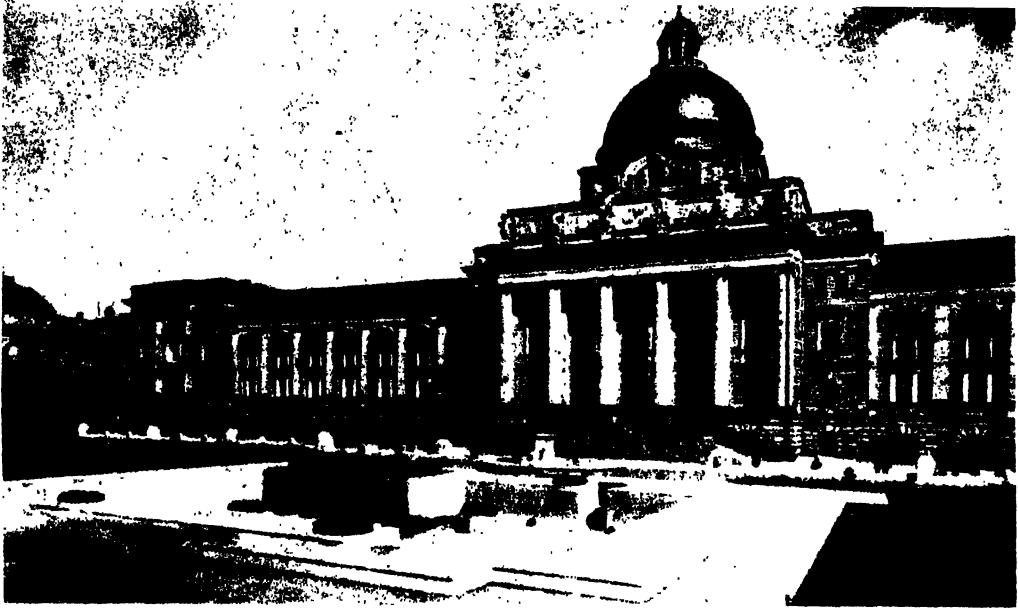
আর্মি-মিউজিয়ম

শিল্প ও কলা বিদ্যালয় এবং টেক্‌নিক্যাল স্কুল আরও সুন্দর :—প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। মিউনিকের বিরাট টাউন-হল দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা অতি সুন্দর।

মিউজিয়মগুলির মধ্যে ডয়েটশ্চে মিউজিয়মই শ্রেষ্ঠ, জগতে ইহার তুলনা বিরল। এখানকার লোক এর জন্য গর্ব্ব ক'রে থাকে। ইসার নদীর মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ, তার উপর মিউজিয়মের বিশাল অট্টালিকা। চারদিকে নদীর নীল জলের ঢেউ আর স্নিগ্ধ সমীর। সাজাহানের সময়কার রাজকবির সেই কথা মনে পড়ে,

"অগর দুনিয়ামেঁ হৈ জন্নত কহীঁ পর
য়হীঁ পর হৈ, য়হীঁ পর হৈ, য়হীঁ পর।"

যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে সেটা এখানেই। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় ও সুন্দর বৈজ্ঞানিক মিউজিয়ম কোথাও আছে কি না সন্দেহ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ অস্কার ফন্ মিলার ইহা স্থাপন করেন।

১৯২৫ সালে অর্থাৎ বাইশ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। সমস্ত মিউজিয়মটা ঘুরে-ফিরে ভাল ক'রে দেখতে গেলে ন-মাইল হাঁটতে হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে কি বিরাট ব্যাপার! মিউজিয়মের দর্শনীয় জিনিষগুলি ষাট হাজার বর্গ-গজ জায়গায় সাজান। ভারতবর্ষে লণ্ডনের মিউজিয়মের বেশ প্রশংসা আছে এবং সাধারণতঃ ভারতীয় যাত্রীরা তাই দেখে ফিরে আসেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহালয় হিসাবে মিউনিকের এই মিউজিয়মের কোন তুলনাই নাই। এখানে শত শত উচ্চশ্রেণীর ছাত্র নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। তারা প্রত্যেকটি ব্যাপার এবং তার প্রয়োগ ও পরীক্ষা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ ক'রে জ্ঞান সঞ্চয় করে। এত সুবিধা অন্যত্র পাওয়া দুরূহ। বিজ্ঞান-বিভাগে হাজার রকমের পরীক্ষা-যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম এমন ভাবে সাজান যে, যার যখন ইচ্ছা, সেগুলি চালিয়ে প্রয়োগ-কৌশলের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

অপরাপর বিভাগেও ঠিক এই রকম সুবিধা আছে। সব বিভাগের কথা লিখতে গেলে এখানে কুলিয়ে উঠবে না তাই প্রধান ক'টি বিভাগের কথা বলব, যেমন—ভূ-তত্ত্ব, খনি-বিজ্ঞান ধাতুবিদ্যা ও পাওয়ার-এঞ্জিন বিভাগ।

মাটির ভিতরকার শত শত ফুট নিয়ে অবস্থিত কয়লা,
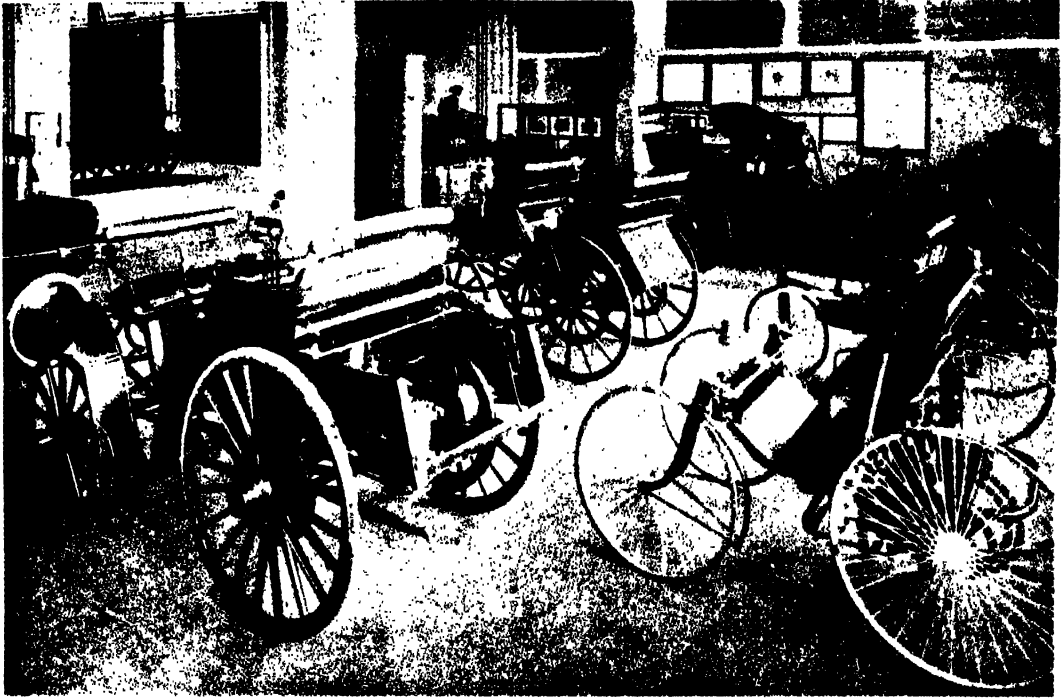
মিউজিয়মের মোটর গাড়ী বিভাগ। এখানে আজ পর্যন্ত যত রকম মোটর গাড়ী আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলির নমুনা পাবেন

লবণ, তৈল প্রভৃতি খনির মডেল খুব বড় ক'রে দেখান হয়েছে। পূর্ব্বে খনির ভিতর রেল ও ঘোড়ার গাড়ির দ্বারা কেমন ক'রে কাজ হ'ত, তার পর এঞ্জিন-শক্তির কেমন ক'রে প্রসার হ'ল, খননকারীরা কেমন ক'রে কাজ করে, এমনই সব ব্যাপার স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা যায়। কেমন ক'রে ভূমিকম্প হয়, কেমন ক'রে পৃথিবী ফাটে, এ সব কঠিন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বড় বড় মডেল দেখলে মুস্কিল আপনা হতেই আসান হয়ে যায়।

রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যান-বাহন বিভাগও বেশ উপভোগ্য। এই বিভাগে রাস্তা-ঘাট, রেল-লাইন, ছোট-বড় পুল, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি দেখান হয়েছে। এমন সুন্দরভাবে সব সাজান যে দেখে তাক্ লেগে যায়। জাহাজের মডেলগুলি আরও চমৎকার। ট্রাফালগারে ব্যবহৃত বৃটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসনের 'ভিক্টরী' নামক জাহাজ থেকে আরম্ভ ক'রে অতিআধুনিক যুদ্ধ-জাহাজের মডেল পর্য্যন্ত এখানে বিদ্যমান। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস যে-জাহাজে চ'ড়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন সেই জাহাজের সঙ্গে আধুনিক জাহাজের তুলনা করতে বেশ লাগে। জার্ম্মেনীর প্রথম সাবমেরিন 'U 1' ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এই সাবমেরিন ১৪০ ফুট লম্বা। 'U 1'-এর মডেলটি অতি চমৎকার।

উড়ো-জাহাজ বিভাগটা দেখে চমক লাগে। চোখের সামনে উড়ো-জাহাজের এমন প্রত্যক্ষ ইতিহাস দেখা সহজে ঘটে না। সেই বেলুন-যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে অতি আধুনিক এরোপ্লেন ও জেপ্‌লিনের মডেলগুলি পর পর সুন্দরভাবে সাজান। এই সব উড়ো-জাহাজ কেমন করে তৈরি করা হয়, তাও দেখান হয়েছে।

গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন-বিদ্যা বিভাগও প্রশংসার যোগ্য। এই বিভাগে সময়ের মাপ (measurement of time), গণিত, আলোক-বিজ্ঞান তাপ-তত্ত্ব, বিদ্যুৎ-তত্ত্ব, ধ্বনি-তত্ত্ব, বাদ্যযন্ত্র, তারবার্ত্তা, টেলিফোন, টেলিভিসন, রসায়ন, শারীর-রসায়ন ঔষধ-বিজ্ঞান প্রভৃতি এমন সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে যে, অনভিজ্ঞ লোকও একবার ভাল ক'রে দেখলে সব বুঝতে পারবে।

বাস্তু-বিভাগে বাড়ি তৈরি করবার সরঞ্জাম, ঘরে আলোর ব্যবস্থা, শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখার প্রণালী, জল গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপার সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে। ইহা চতুর্থ বিভাগ।

পঞ্চম বিভাগে জ্যোতিষ, জরীপ, বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী প্রভৃতি দেখান হয়েছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে এমন সুন্দর সংগ্রহ অন্যত্র আছে কি-না সন্দেহ। এখানে দুইটি মানমন্দির আছে,—একটি টলেমিপন্থী, আর একটি কোপার্নিক্যান। মানমন্দিরে যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের অলৌকিক দৃশ্য দেখানোর সময় ঘর অন্ধকার ক'রে দেওয়া হয়। সেই নিবিড় অন্ধকারে নবগ্রহ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা ও অন্যান্য তারকা-প্রকাশ, চন্দ্রোদয়, সূর্য্যোদয়, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি দেখে মনে হ'ল যেন আকাশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এ সব দৃশ্য দেখে মনে হয় মানুষ বুদ্ধি-বলে অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে।

সংগ্রহালয়ের এক ধারে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। এই গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ের পুরাতন ও নূতন এক লক্ষ ষাট হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। জগতে এরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সংগ্রহ খুব কমই দেখা যায়। এখানে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের ব্যবস্থাও আছে।

একটি কথা বলতে ভুলে গেছি; সংগ্রহালয়ে আগ্রার তাজমহল ও জয়পুরের মানমন্দিরের মডেলও রাখা হয়েছে। দেশের দুটো জিনিষ দেখে একটু গৌরব অনুভব করলাম।

দর্শকদের মধ্যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের সংখ্যাই বেশী। স্কুলের শিক্ষকেরা তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান ও বক্তৃতা দিয়ে সহজে সব ব্যাপার বুঝিয়ে দেন।

এখানকার কংগ্রেস-হল এবং আর্মি ও রেজিমেণ্ট মিউজিয়মও দেখবার জিনিষ। আর্মি-মিউজিয়মে প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগ অবধি সব রকমের যুদ্ধাস্ত্র রাখা হয়েছে। সবটা দেখে গা ছম্‌ছম্ ক'রে উঠে। দেখলাম এখানেও ছেলে-মেয়েদের বেশ ভিড়। রেজিমেণ্ট-মিউজিয়মের বিরাট সৌধ, তার পিছনে বাগান, আশেপাশে খেলবার মাঠ, থিয়েটার-ইত্যাদি। আগে এই বাড়িটা ব্যাভেরিয়ার রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন সাধারণের মিউজিয়ম। ভিতরটা অতি সুন্দর, প্রায় দু-শ হল ও কামরা আছে। প্রত্যেক গৃহ সুদৃশ্য কারুকার্য্যে মণ্ডিত। দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণের রকমারি পাথর, মতি, ঝিনুক, প্রভৃতি বসিয়ে অনেক রকম লতা-পুষ্প ও পশু-পক্ষী আঁকা হয়েছে। নীল রঙের পাথরে বাসনের সেট দেখে নীলমণি ব'লে ভ্রম হয়। চিনেমাটির বাসনও অতি চমৎকার। চিনেমাটির ছবিগুলি বিচিত্র, দূর থেকে মনে হয় যেন তৈলচিত্র। মিউজিয়মের উপরতলার অংশের নাম 'স্বর্ণ-ভবন'। এর সমস্ত কারুকার্য্য সোনালি রঙের, ছাদের গড়ন ও চিত্রাঙ্কন দেখে শিল্পীর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারা যায় না।

মিউজিয়মের উড়ো-জাহাজ বিভাগ

মিউনিক শহরের মধ্যস্থলে ইসার নদী
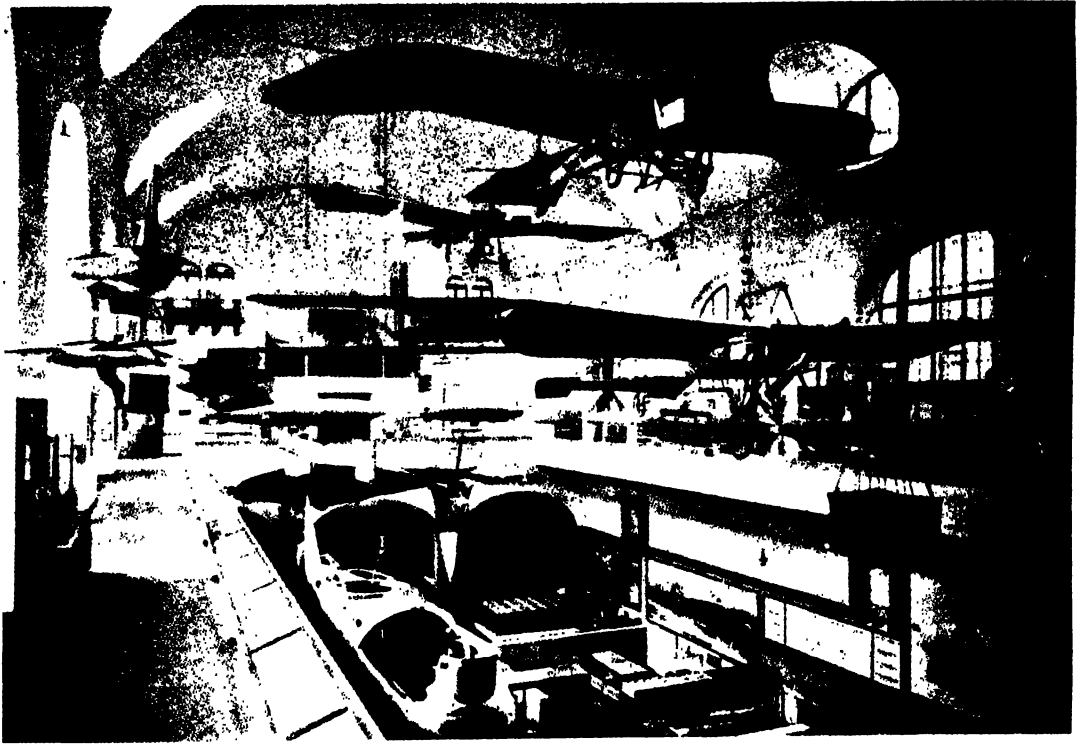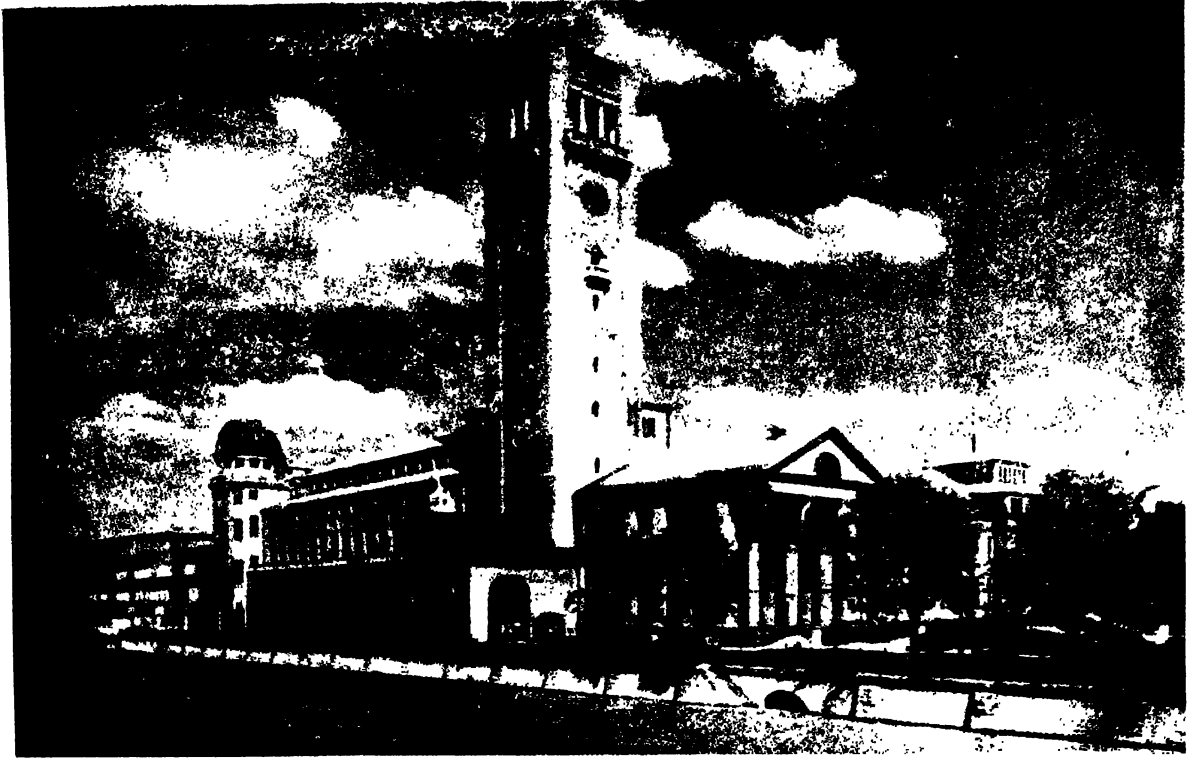
মিউনিকের ডয়েটশ্চে নামক মিউজিয়ম। টাওয়ারটি ২১০ ফুট উচ্চ
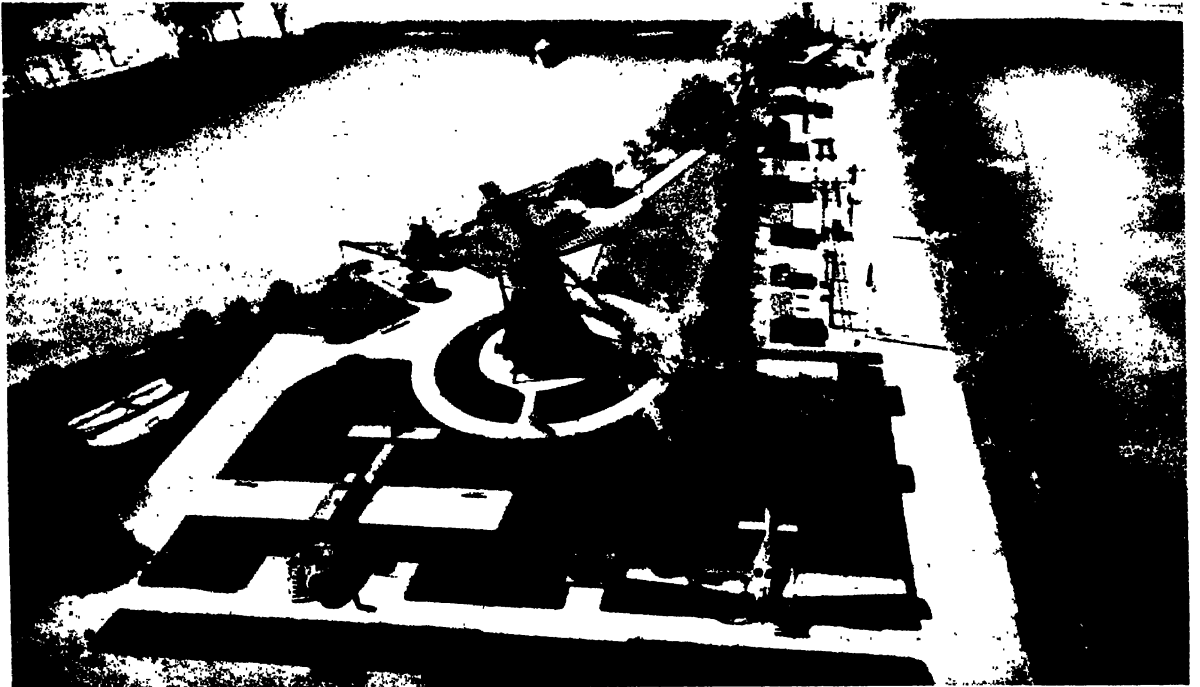
মিউজিয়মের ময়দান। এখানে উড়ো-জাহাজ ও উইণ্ডমিল (বায়ুচক্র) প্রভৃতি দেখান হইয়াছে

পরমা

শ্রীমণীশ ঘটক

আর কেহ বুঝিবে না। তোমাতে আমাতে
এ বোঝা-পড়ার পালা সাঙ্গ করে যাব আজ রাতে
অন্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে
শান্ততর, স্নিগ্ধতর হয়ে এল বায়ু।
তৃতীয়ার চন্দ্রের প্রমায়ু
হ'ল শেষ। মেঘলোক হয়ে পার
ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার।

হলা পিয় সহি,
অন্তর্বিজিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা-পণ
বধির বাসব হস্ত-চ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিল চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্ব্বাপিত
সে অনল,—স্মৃতিভস্মস্তূপে সমাহিত।
অনলস কাল আবর্ত্তনে
মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার। হয়ত পরম কোনো ক্ষণে
অঙ্গারে ফুটিবে হীরা,—আজি সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

পূর্ণলোহ যৌবনের মধ্যাহ্ন-ভাস্কর
সেদিন জলিতেছিল এ দেহ অম্বরে।
দিকে দিগন্তরে
সমীর শ্বসিতেছিল অগ্নিবর্ষী শ্বাস।
চক্ষে ভরি ত্রাস
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধ্বংস-উৎসবে?
যৌবন গৌরবে
বল্কল-শাসন-মুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়,
সহসা উদ্বেল হ'ল শুভ্র বক্ষময়।
অজ্ঞাত শঙ্কায়
অপাঙ্গে অনঙ্গ-তীর মুহুর্মুহু থমকিল হায়।
শিহরিল প্রবাল-অধর
কেন্দ্রীভূত কামনার চুম্বক বিথারে থর থর!

আশ্রম-আশ্রয় ত্যজি আজন্ম-তাপসী কণ্বসুতা
নিষ্কলুষা কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে হলে আবির্ভূতা।
নিষ্করুণ কিরাতের পরুষ সংস্পর্শে আচম্বিত
মদাপ্লুতা,—হারালে সম্বিৎ!

হায় সখি হায়,
তুমি তো জানিলে না-কো সেই মৃগয়ায়
এক অস্ত্রে হত হ'ল মৃগী ও নিষাদ!
আদি রিপু উন্মোচিল প্লাবনের বাঁধ
সেই পথ দিয়া।
প্রেম এল বন্যাসম দুকূল ছাপিয়া
সুগম্ভীর সমারোহে।
অনাদ্যন্ত আজও তাহা বহে
দুর্ব্বার প্রবাহে তুলি উন্মত্ত কল্লোল।
আমার নিখিল তারি উল্লাসে আজিও উতরোল

ভ্রষ্ট-লগ্ন

বনফুল

১

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

*　　*　　*

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশী করিয়া মেশে নাই।

স্কুলে পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিংে আর তকু থাকিত বাড়ীতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই-দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওই তকুকে যেমন ক'রে হোক হটাতে হবে। পারবে ত?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তকু কি বস্তু।

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন, "ওই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে ভাল ছেলে—কিন্তু হাজার ভাল হলেও পাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরেজীতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না—"

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ। তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই সেই জন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তকু ছিল কবি—সে কবিতা লিখিতে সুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ-করা ভাল ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্স্ট হওয়ার গৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমি রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্স্ট বয় আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের এক জন উদীয়মান কবি। তফাৎটা যে কি এবং কত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে,—তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

২

ক্রমশঃ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্য্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহ-কোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর এক জন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। 'অসাধারণ রূপ' বলিতেছি কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া। অমন সুন্দরী সত্যই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোখ মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ব্ব। চাঁপাফুলে গোলাপী আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর-দশেকের মেয়ে—অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া। আমার সহিত কথাই বলিল না! আচারে, ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল যে আমাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কিই বা ছিল।...সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

* * *

তকুর বাড়ী প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারেই। সুতরাং ক্রমশঃ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়াছিল, "দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফার্ষ্ট হয়?"

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, "হ্যাঁ—"

উত্তরে সে কি বলিল শুনিবেন?

"বই মুখস্থ ক'রে ফার্ষ্ট সবাই হ'তে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি?"

মনে পড়িতেছে একটু সলজ্জ গলা-খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম, "আমি তোমার দাদার মত নই ত। হ'তেও চাই না—"

"পারবেনই না—"

দশ বছরের মেয়ে!

৩

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ী বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়ীটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—না হয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ীর মুখপানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল—মাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সেই সদ্যজাগ্রত যৌবনে—বেশী বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গীতে কথায়-বার্ত্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে! আশ্চর্য্য প্রেমের নিয়ম! আমি ঠিক তাহাদের পালটি ঘর ছিলাম, আমার ভাল ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত—বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিত ভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলবেন না। নিজের চেহারাটা কখনও দেখেছেন আয়নায়?"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।......সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অত বড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব্ব করিবার মত রূপ আছে সে তাহা লইয়া গর্ব্ব করিবে বইকি! রূপসী মাত্রেই গরবিনী। গর্ব্বটা সৌন্দর্য্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর মনের নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি।

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশোনায় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—তাহার পর পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

৪

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গেল—বাবা, মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আর আপন বলিতে

বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে ম্যাট্রিকটা পর্য্যন্ত পাস করিতে পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল। তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম—লিখিয়াছে মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি ভাল পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, "ভাল পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানাশোনা একটি ভাল পাত্র আছে—কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল ত সম্বন্ধ করি।"

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

৫

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম-এ পড়িতেছি। আশ্চর্য্য মানুষের মন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর এক জন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস্ মিত্র। আমার সহপাঠিনী।...আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরীতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিস্ মিত্র আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণতঃ যেভাবে ঘনিষ্টতর হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। মিস্ মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখে মুখে এমন একটা মার্জ্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিয়াছিলাম যে মনে রং ধরিয়া গেল।...ক্রমশঃ দেখিলাম তাহার অনুপস্থিতিতেও আমি তাহার কথা চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলা-ফেরা লক্ষ্য করিতেছি, কোন্ রঙের শাড়ী পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

৬

যখন মিস্ মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে—আর কয়েক দিন পরেই বিবাহ হইবে—এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম!

বলিলাম, "সে কি সম্ভব?"

তকু বলিল, "সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল? অসাবধানে ষ্টোভ জালতে গিয়ে—ছি, ছি, কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। মা বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতেও সাহস পাই না যে!—" বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "না ভাই এখন আর সে হয় না। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—"

মানপুর গেলাম।

* * * *

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি, "কক্ষণো তুমি আমায় ভালবাস না—কক্ষণো না। একদিনও বাস নি—বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ—কেন—কেন—কেন—কেন—"

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

"শোন—একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—"

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে তাহার এ মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া কদাকার! অসাবধানে ষ্টোভ জালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই তাহার পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

অতএব গাওয়া শব্দটির মূল ধাতু 'গাহ্' কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত মূল ধাতু 'গা', তাহা হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলায় 'গায়', 'গাও,' ও 'গাই'; যেমন 'যা' ধাতু হইতে 'যায়,' 'যাও,' ও 'যাই'। এই 'যা' ধাতুর নিয়মানুমোদিত শব্দ যেমন 'যা'ব', 'যা'বেন,' 'যা'বার' তেমনি 'গা' ধাতু গঠিত শব্দও 'গা'ব, 'গা'বেন,' 'গা'বার'। অতএব এই শব্দগুলির বিশুদ্ধতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সাধুভাষায় এই প্রকার শব্দের শিষ্ট প্রয়োগের অন্ত নাই; যেমন,

"গা'ব গান খুলি হরিদ্বার।" 'মহিলা-কাব্য'—৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রতিপক্ষ একটি কথা বলিতে পারেন যে 'র-সংযুক্ত 'হ'-ধ্বনির উচ্চারণ প্রাচীন বাংলাতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং 'র ধ্বনি সেই স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার উত্তরেও এই বক্তব্য যে প্রাচীন এমন কি মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতেও 'র-সংযুক্ত 'হ' ধ্বনি লুপ্ত হইতে দেখা যায় না; যেমন,

"টালত মোর ঘর নাহি পড় বেষী" বৌদ্ধগান, চর্য্যা ৩৩

"কাহ্ন মোর এ দুখ সহোদর নাহি মতী।"—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩৪৮

"কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।" ঐ পৃঃ ঐ

এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখিতে পাই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতেও 'নাহি', 'থাহা' (আধুনিক বাংলায় 'নাই', 'থা') 'হ'-সংযুক্তই রহিয়াছে, 'নাই', 'থা' হয় নাই। তেমনি গান গাওয়া শব্দটির ধাতু যদি 'হ' যুক্ত অর্থাৎ 'গাহ্' হইত তাহা হইলে তজ্জাত শব্দগুলি হইতেও 'হ'-ধ্বনি বিলুপ্ত হইত না, কিন্তু পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে ঐ ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ কদাচ 'হ'-যুক্ত হয় নাই, যেমন, 'গাইল', 'গাণ' ইত্যাদি। অতএব "বাংলা গাওয়া শব্দের মূলধাতু 'গাহ্' নহে ইহার মূল ধাতু 'গা'। সংস্কৃতেও (ভ্বাদিগণীয়) 'গা' ধাতুর অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহা একেবারে আভিজাত্য বর্জ্জিত নহে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাধুভাষায় (বিশেষত কবিতায়) গান গাওয়া অর্থবাচক শব্দে কোন কোন স্থানে 'হ' বর্ণটির উদয় হইয়াছে। যেমন,

"গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা"—গান ভঙ্গ (রবীন্দ্রনাথ)

"গল ছাড়িয়া গান গাহ।"—ঐ

"গাহিবে একজন খুলিয়া গল"

কিন্তু, "আরেক জনে গাবে মনে।" ঐ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে অর্ব্বাচীন 'গাহ্' ও প্রাচীন 'গা' উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এমন কি একই বাক্যে দ্বিবিধ ধাতুনিষ্পন্ন দুইটি শব্দই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই "গাহ্" ধাতুটি কৃত্রিম। ছন্দানুরোধে কবিতার যে সমস্ত চরণে স্বরবর্ণের লঘু উচ্চারণ পরিহার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সব স্থলেই স্বরের উচ্চারণকে মহাপ্রাণে উন্নত করিয়া 'হ' সংযুক্ত করা হইয়াছে। এমন অন্যান্য শব্দেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; যেমন,

"সঘনে বলে বাহা বাহা"—গানভঙ্গ (রবীন্দ্রনাথ)

"সেখানে গান নাহি জাগে। ঐ

যদিও 'বাহা' ও 'নাহি' ইত্যাদি শব্দ হইতে আধুনিক বাংলায় 'হ'-ধ্বনির উচ্চারণ বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়াছে তথাপি ব্যঞ্জন ধ্বনিবহুল ছন্দের উচ্চারণ-গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বর-ধ্বনিতেও 'হ' (ব্যঞ্জন)-যুক্ত করা হইয়াছে। কবিতার এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতেই আধুনিক বাংলার সাধুভাষার ওজস্বিনী গদ্য-রচনায়ও এই প্রকার স্বরকে 'হ'-যুক্ত aspirated করা হইয়া থাকে। সেই জন্য বলিয়াছি "গাহ্" ধাতুটি কৃত্রিম, ও অর্ব্বাচীন এবং ইহা কথা ও সাধুভাষার "গা" ধাতুর কপট ভদ্র-বেশ মাত্র। অতএব ইহাকে প্রকৃত আভিজাত্যের মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না।

(২)

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "গান গা'ব" বাক্যের "গা'ব" শব্দটিকে আমি অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছি।

আমি ঐ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহার কিয়দংশ পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতে চাই। আমি লিখিয়াছি:—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীবন্ত ভাষা সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদা ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলে না। যে-ভাষা অন্ধের মত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া চলে সে-ভাষার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃতই তাহার প্রমাণ। অথচ প্রাকৃত ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আজ পর্যন্ত সজীবতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকগণ ব্যাকরণের অননুমোদিত পদ ও ভাষার ব্যবহার করেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গাহিব অর্থে কোথাও কোথাও 'গাব' লিখিয়াছেন।...উল্লিখিত পদগুলি অধুনা প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে অচল হইলেও, পরবর্ত্তী কালে যে ব্যাকরণ রচিত হইবে তাহাতে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারকালে ব্যাকরণের সাক্ষ্যই একমাত্র নির্ভরস্থল নয়। তাহা হইলে 'মনীষা' 'শকন্ধু' 'সীমন্ত' 'হিরণ্ময়' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ভাষায় অপাংক্তেয় হইয়া যাইত। মহর্ষি চার্বাক তাঁহার ভস্মীভূত দেহের অন্তরালে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেন। বৈয়াকরণের রোষাগ্নি মহাদেবের ক্রোধানল অপেক্ষা তীব্রতর হইলে 'মন্মথ' দেবের পুনরাবির্ভাব সম্ভব হইত না। সমাসের প্রধান বিশেষত্ব অস্বীকার করিয়াও অলুক্ সমাস সমাস বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। ব্যাকরণের সাধারণ বিধি ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই। স্ব স্ব শক্তিবলে ইহারা ভাষায় নিজ নিজ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বৈয়াকরণ তাহাদের জন্য বিশেষ বিধি রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গাব'ও সাধারণ বিধিতে পড়ে নাই, তাহার জন্য বিশেষ বিধি আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে যে সাধারণ বিধির উল্লেখ করিয়াছিলাম রবীন্দ্রনাথই তাহা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। বীমস্ সাহেব যখন 'খেতে' 'পেতে' 'যেতে'র সহিত 'গাইতে' 'চাইতে' 'নাইতে'র সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া গাহ্ চাহ্ নাহ্ প্রভৃতি ধাতুমূলকে নাতিপ্রচলিত বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথই তখন তাঁহার পরিত্যক্ত হাল ধরিয়া অনায়াসে তরণী তীরস্থ করেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বে তাঁহার সেই নিয়মটি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই নিয়মের বলে বহু শব্দের মূল নির্ণয় সম্ভব ও সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির* মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে এই তিনটি শব্দ মাত্র বীমস্ সাহেবের নিয়ম পালন করে।+ বাকি ছয়টি অন্য

---

* তালিকায় নয়টি নাই, আটটি ধাতুর উল্লেখ আছে।

+ অর্থাৎ খেতে পেতে ও যেতে হয়।

নিয়মে চলে। এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা 'হ' লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়,— যথা,— গাহিতে, চাহিতে, নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)। হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে, চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া করতে চলতে হয়; কিন্তু বহিতে, সহিতে, কহিতে শব্দের ইকার বইতে, সইতে, কইতে শব্দের মধ্যে টিঁকিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর কোন অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।"—'শব্দতত্ত্ব' (নূতন সংস্করণ), পৃ. ৭৯।

হ-অন্ত সকল ধাতুই প্রায় সব স্থানে তাঁহার এই নিয়মের বন্ধনে ধরা দিয়াছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখা যায়।

	√গাহ্	√চাহ্	√নাহ্	√খা	√পা	√যা
নিত্য অতীত	গাইত	চাইত	নাইত	খেত	পেত	যেত
অচির অতীত	গাইল	চাইল	নাইল	খেল	পেল	×
কৃদ্‌যোগে — ইতে	গাইতে	চাইতে	নাইতে	খেতে	পেতে	যেতে
কৃদ্‌যোগে — ইলে	গাইলে	চাইলে	নাইলে	খেলে	পেলে	×

নিত্য ভবিষ্যতের প্রত্যয়ও উল্লিখিত প্রত্যয়গুলির অনুরূপ বলিয়া আমি ধারণা করিয়াছিলাম গাহ্ বা চাহ্ ধাতুর ভবিষ্যতে একমাত্র 'গাইব' 'চাইব' হওয়াই সম্ভব। আমি নিজে 'গাইব' বলি এবং বহু লোকের মুখে শুনিয়াছিও ঐরূপ। রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনার পর অনেকের সঙ্গে কথা বলিয়াছি। তাহার ফলে এখন বুঝিতে পারিতেছি কথা ভাষায় কোন কোন স্থলে বিকল্পে ই লোপ হইয়া থাকে। এই লোপের ক্ষেত্র কত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সে আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে একটি সুদূর-প্রসারী সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এই কথাই আমি সবিনয়ে বলিতে চাই। 'খাব' 'যাব'র সাদৃশ্যবশতই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণে হউক 'গাব' শব্দ তাঁহার প্রদর্শিত নিয়মের বন্ধনে ধরা দেয় নাই। ইহাকে যদি অশুদ্ধ বলি সে এই হিসাবেই। কিন্তু ঠিক অশুদ্ধ আমি বলি নাই—"তথাকথিত অশুদ্ধ" বলিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। আস্ ধাতুর নিত্য বর্তমানে 'আস' (আসিয়া থাক) হওয়া উচিত। আমার যত দূর মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাহাই বলেন। কিন্তু ঐ স্থলে অনুজ্ঞার সাদৃশ্যে 'এস' শব্দের ব্যবহার সাহিত্যেও বেশ চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাই, কথোপকথনের মধ্যে ত কথাই নাই। তথাপি ব্যাকরণের নিয়মে কি উহাকে অশুদ্ধ বলিবেন না?

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দোহা ক্রিয়াপদের আরম্ভে ওকার আছে তারই জোরে ই থেকে যায় বলি 'দোহইবে'।" এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার আছে। আমি বলি, দোহা ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ √দুহ এবং এই দুহের 'হ' ই দুহিবের 'হ'কে লুপ্ত হইতে দেয় না। এখানেও রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত বিধানই বলবান বলিয়া আমার বিশ্বাস।

√পোহা ধাতুর "পুহাবে" রূপ হইতে পারে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়; কিন্তু শব্দের মন ততোর আপনা আপনি টিকিয়াছে। "পুহাবে"র অনুরূপ একটি শব্দও খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহার মত আর কয়েকটি ণিজন্ত ধাতুর নাম করা যাক। যথা, গাহা, চাহা, নাহা, সহা ইত্যাদি। ইহাদের ভবিষ্যৎ-রূপ হইবে গাওয়াবে, চাওয়াবে, নাওয়াবে, সওয়াবে; বিকল্পে গাহাবে চাহাবে হইতে পারে না। গয়লাকে দিয়ে দুধ "দোয়াবে" বলি, "দুহাবে" বলি না। 'দুহাবে' অণিজন্ত √দুহ ধাতুর ভবিষ্যৎ রূপ, 'দোয়াবে' ণিজন্ত দোহা-র। √শোহা, √বোধা প্রভৃতি ধাতুর মত পোহা-র অণিজন্ত রূপ নাই। পোহার অণিজন্ত রূপ √পুহ থাকিলে তাহার ভবিষ্যতে 'পুহবে' হওয়া সম্ভব ছিল। 'পোহা' হইতে 'পুহাবে' পদ যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে একমাত্র ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরিতে হইবে।

স্বরলিপি

গান—দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

II	সা	-গা	গা	I	গা	গা	-া	I	গা	গা	-া	I	গা	গা	-া	I
	দুঃ	০	খে		র	তি	০		মি	রে	০		য	দি	০	
I	গা	-া	-রা	I	রা	-মা	-া	I	গা	-া	-া		জ্ঞা	পা	-জ্ঞা	I
	জ্ব	০	০		লে	০	০		০	০	০		ত	ব	০	
I	পা	-না	না	I	ধা	পা	-জ্ঞা	I	ধপা	-মা	-পা		মা	গা	-মা	I
	ম	ঙ্	গ		ল	আ	০		লো০	০	০		য	দি	০	
I	রা	-া	গমা	I	(ম)গা	-া	-া	I	-া	-া	-া		র্সা	র্সা	-না	I
	জ্ব	০	০০		লে	০	০		০	০	০		ত	বে	০	
I	র্সা	-া	-র্গা	I	র্রা	-র্সা	-া	I	-া	-র্সা	-া	I	র্সা	র্সা	-না	I
	তা	০	ই		হো	০	০		০	ক	০		ত	বে	০	

I ধা -া নর্সা । না -া -া I ধনা -ধা -পা । ক্ষপা -া -া II

তা ০ ০ই হো ০ ০ ০ ০ ০ ক্ ০ ০

-া -া -া II পা পা পা । না ধা -না I র্সা র্সা -া ।

০ ০ ০ মৃ ০ ত্যু য দি ০ কা ছে ০

। র্সা র্সা -না I ধা -না -ধা । ধা র্সা -া I র্সা -া -া ।

আ নে ০ তো ০ ০ মা ০ ০ বৃ ০ ০

। -া -া -া I র্সা র্সর্গা র্গা । র্রা -া -া I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -না I

০ ০ ০ অ মৃ০ ত ম ০ য় লো ০ ক্ ত বে ০

I ধা -া র্সা । না -া -া I না -া -া । ধা ধা -পা I

তা ০ ই হো ০ ০ ক্ ০ ০ ত বে ০

I পা ক্ষা -ধা । পা -া -া I -া -া -া । -া -া -া II

তা ই ০ হো ০ ০ ক্ ০ ০ ০ ০ ০

II গপা পা পা । পা পা পা I পা -া -া । পা -ক্ষা -গা I

পূ জা র প্র দী পে ত ০ ০ ব ০ ০

I গা -া -ক্ষা । গা ক্ষপা ক্ষা I গা -া -া । গা গা -সা I

জ ০ ০ লে ০০ য দি ০ ০ ম ম ০

I গা -া -সা । পা -া -গা I রসা -া -া । সা সা -রা I

দী ০ ০ ০ ০ প্র শো০ ০ ক্ ত বে ০

I গা -া -সা । পা -া -গা I রসা -া -সা । -া -া -া II

তা ০ ০ ০ ০ ই হো০ ০ ক্ ০ ০ ০

II পা -া গা । পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I

অ ০ শ্রু আঁ খি ০ প রে ০ য দি ০

I র্সা র্রা -া । র্সা -রা -র্গা I গর্সা -া -া । র্সা র্সা -না I

ফু টে ০ ও ০ ০ ঠে ০ ০ ত ব ০

I ধা -া -না । ধা র্সা না I ধপা -া পা । পা -পা -ক্ষা I

স্নে ০ ০ ০ ০ হ চো ০ খ ত বে ০

I গা -া -ক্ষা । -পা -া -না I ধপা -া পা । ক্ষা গা -া I

তা ০ ০ ০ ০ ই হো ০ ক্ ত বে ০

I গা -া সা । পা -া গা I রসা -া -া । -া -া -া II II

তা ০ ০ ই ০ ০ হো ০ ক ০ ০ ০

মহিলা-সংবাদ

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত লক্ষ্যা গ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ইতিপূর্ব্বে একবার আমাকে তাঁহার তৈরি অনেকগুলি সুন্দর বড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবৎসরও আবার শ্রীযুক্ত স্বদেশনারায়ণ মাইতি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর অনেক বড়ি আমাকে দিয়াছেন। এগুলির আকৃতি ও বর্ণবিন্যাস চমৎকার। আকৃতি কতকটা ফোটোগ্রাফগুলি হইতে বুঝা যাইবে, কিন্তু নানা রঙের বিন্যাস তাহা হইতে বুঝা যাইবে না; অনেকগুলি বড়ি যে কত বড় তাহাও বুঝা যাইবে না। বৃত্তাকার কোন-কোনটির ব্যাস এবং চারি-কোণা কোন-কোনটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ এক হাত বা ততোধিক। সবগুলি ভাজিয়া খাইবার উপযুক্ত! কিন্তু রসনাতৃপ্তির উপায় বলিয়া সেগুলির প্রশংসা করিতেছি না। ছাঁচের সন্দেশ যাঁহারা করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু দক্ষতা প্রকাশ পায় না—ছাঁচ যে সূত্রধর নির্ম্মাণ করেন দক্ষতা প্রধানতঃ তাঁহার। কিন্তু এই বড়িগুলির পরিকল্পনা রচনায় ও পারকল্পনার অনুযায়ী বড়ি দেওয়াতে, যিনি এই কাজ করেন তাঁহারই শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। নানা-

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বড়ি দিতেছেন
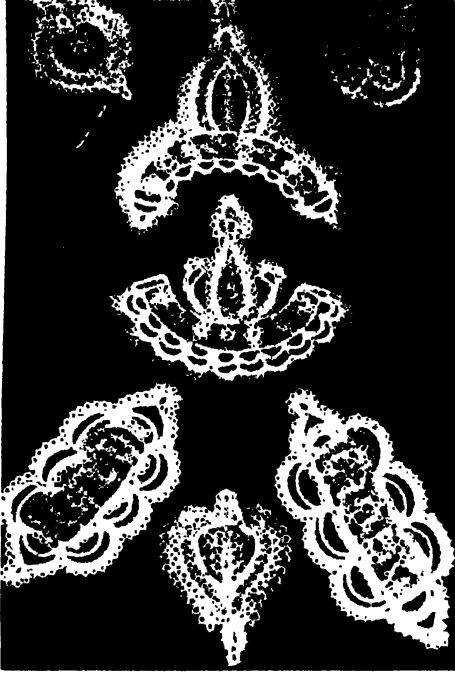
কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা

বিধ বিচিত্র আলিপনা দেওয়া অপেক্ষা ইহা অধিকতর কলা-দক্ষতার পরিচায়ক। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর কলাকুশলতা অধিকতর স্থায়ী কোন শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুতিতে প্রকাশ পাইলে আমরা আরও প্রীত হইব। তিনি যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারই সম্যক্ আদর হইলে আমরা আপাততঃ তৃপ্ত হইব।

কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক জি সি দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, বি-টি, পাস করিয়া উচ্চশিক্ষা-লাভার্থে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। তথায় তিনি মারিয়া গ্রে ট্রেনিং কলেজে যোগদান করেন ও গত জুলাই মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডিপ্লোমা ইন্ এডুকেশ্যন" প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা উচ্চতর রাজকর্ম্মচারীদিগের সাহায্য লাভে সমর্থ হন ও তাঁহাদের সহায়তায় ইংলণ্ডের প্রায় তেইশটি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার সুযোগ লাভ করেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক মণ্টেসরি কন্ফারেন্সের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি যোগদান করেন।

বেগম মির আমিরুদ্দীন, মাঙ্গালোরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ মিঃ মির আমিরুদ্দীনের পত্নী। ইনি 'সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কংগ্রেস' (World Congress of Faiths)-এর আগামী অধিবেশনে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আগামী জুলাই মাসের শেষভাগে অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। বেগম মির আমিরুদ্দীন প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের বহুদেশ, মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ইনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নারী-আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্না। উক্ত কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বেগম মির আমিরুদ্দীন

কুমারী দীপ্তি সান্যাল

শ্রীমতী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবিনী ছাত্রী। তিনি বি-এ অনার্স ও এম-এ এই উভয় পরীক্ষাতেই দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করিবার জন্য তিনি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার থীসিস্ যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তিনি সম্প্রতি অক্সফোর্ডের ডি-ফিল (ডক্টর অফ ফিলজফি) উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী রমা বসু শ্রীযুক্ত এস এম বসুর কন্যা এবং স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী।

গত নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কুমারী দীপ্তি সান্যাল প্রাচ্য নৃত্যে দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন। শ্রীযুক্ত এস কে পোদ্দার ইঁহার নৃত্যকুশলতার জন্য ইঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দিয়াছেন। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মিলনীতেও নৃত্য দেখাইয়া ইনি একটি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। কুমারী দীপ্তি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের অষ্টম মানের ছাত্রী।

শ্রীমতী রমা বসু

বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

যে পরিবারে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ গভীর, যেখানে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকের কল্যাণ সাধনে তৎপর, পারিবারিক সুখ্যাতির জন্য, গোষ্ঠীর শির উন্নত রাখিবার জন্য যে-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে পরান্মুখ নহে, সে-পরিবারের ঐক্য ও সংহতি দর্শনে পক্ষপাতশূন্য প্রতিবেশী ও জনসাধারণ মুগ্ধ হয়, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ পুলকিত হয় ও পরিবারের পরশ্রীকাতর শত্রুরা ঈর্ষায় জর্জ্জরিত ও ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়।

বীরেশ্বর পাড়ে ধর্ম্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব

এই সত্যটি পরিবার সম্বন্ধে যেমন, জাতির সম্বন্ধেও তেমনি সমভাবে প্রযোজ্য। আমার স্বজাতির দুঃখে যে-দিন আমি অশ্রুত্যাগ করিব, কোন এক জন নগণ্য অথচ নিরপরাধী বাঙালী কোন সুদূরতম প্রদেশেও অকারণে লাঞ্ছিত হইতেছে শুনিয়া যে-দিন সমগ্র বাঙালী জাতি না হউক অধিকাংশ বাঙালী নিজেদের লাঞ্ছিতজ্ঞানে যথাকর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইবে, ব্যষ্টির দুঃখে যে-দিন সমষ্টির হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিবে, জাতির পক্ষে সে-দিন পরম শুভদিন। আমাদের অন্ধকার জাতীয় জীবনে যেন আজ সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের লক্ষণসমূহ সূচিত হইতেছে, পূর্ব্বদিগন্ত যেন সেই পরমতম শুভ প্রভাতের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হইতেছে। বাঙালী আজ স্বদেশবাসীর দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী হইতে শিখিয়াছে। তাই মনে হয় বাঙালীর অনাগত ভবিষ্যৎ জীবন সাফল্যের আলোকপাতে অচিরেই আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এ আশা হয়ত নিতান্ত দুরাশা নহে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল শুভ লক্ষণ দর্শনে আজ এই আশার কথা মনে উদয় হইতেছে, সে-সমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। বঙ্গে ও বাহিরে তীর্থকামী ও পর্য্যটকদের আশ্রয়দানকল্পে বাঙালীকর্ত্তৃক অদ্যাবধি যে-কয়টি ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহারই বিশদ বিবৃতি মাত্র এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

ভিন্ন প্রদেশীয় দানশীল ধন-কুবেরদের দ্বারা অজস্র অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ভারতের অসংখ্য প্রাসাদোপম ধর্ম্মশালার পার্শ্বে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় নাতিবৃহৎ ধর্ম্মশালা হয়ত কাহারও কাহারও নিকট চন্দ্রের পার্শ্বে খদ্যোতের ন্যায়ই অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে পারে, কিন্তু সর্ষপ পরিমাণ ক্ষুদ্রাকৃতি বীজের মধ্যেই যে বিশাল বটবৃক্ষের বিরাট সম্ভাবনা নিহিত থাকে সে-কথাও মিথ্যা নহে, অথবা উত্তর-কালে সেই বহুশাখ মহামহীরুহের তলদেশে যে আতপতাপ-তপ্ত পরিশ্রান্ত বহু পথিক আশ্রয় ও বিশ্রামলাভে উপকৃত হয়, এ-কথাও অসত্য নহে। উপরন্তু, স্বজাতির কুটীরও

বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালা, বারাণসী

যে বিদেশীয়ের প্রাসাদ অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়, এ-কথা সহজেই অনুমেয়। বাঙালীর ধর্ম্মশালায় বাঙালী পর্যটক যে সশ্রদ্ধ ব্যবহার লাভ করে, অবাঙালীর ধর্ম্মশালায় সাধারণতঃ সে ব্যবহার আমরা আশাতীত মনে করি;—এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে শেষোক্ত ধর্ম্মশালায় আমাদের অপরিসীম লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়, সে-কথা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

বাঙালীর এবম্বিধ বহু দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেরা দুঃখ ভোগ করিয়া কতিপয় দানশীল মহানুভব বাঙালী ভদ্রলোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া স্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহাতে অন্যান্য ধনশালী বাঙালী আরও অনেক ধর্ম্মশালা স্থাপনে সচেষ্ট হন, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই সূত্রে তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, মথুরা, বৃন্দাবন, বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত সুপরিচালিত ধর্ম্মশালার অভাবে বাঙালী যাত্রীরা প্রায়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গের বাহিরে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপনের ইচ্ছা প্রথম উদয় হয় কলিকাতা চোরবাগানের সুবিখ্যাত রাজবাটীর কুমার যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের মনে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কুরুক্ষেত্রে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। ধর্ম্মশালাটি আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও অথবা তাহার পরিচালন-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছু না থাকিলেও, প্রথম বাঙালী ধর্ম্মশালা স্থাপনের সমস্ত গৌরব মল্লিক-মহাশয়েরই প্রাপ্য। কিন্তু যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, উক্ত ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধানের সমুদয় ভার স্থানীয় পাণ্ডাদের হস্তেই ন্যস্ত হওয়ায় যাত্রীদের দুর্দ্দশার বিশেষ কোন লাঘব হয় নাই। সংবাদটি সত্য হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

'আজমীর বাঙালী-ধর্ম্মশালা' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়

হরির বাঙালী ধর্ম্মশালা, কাশীধাম
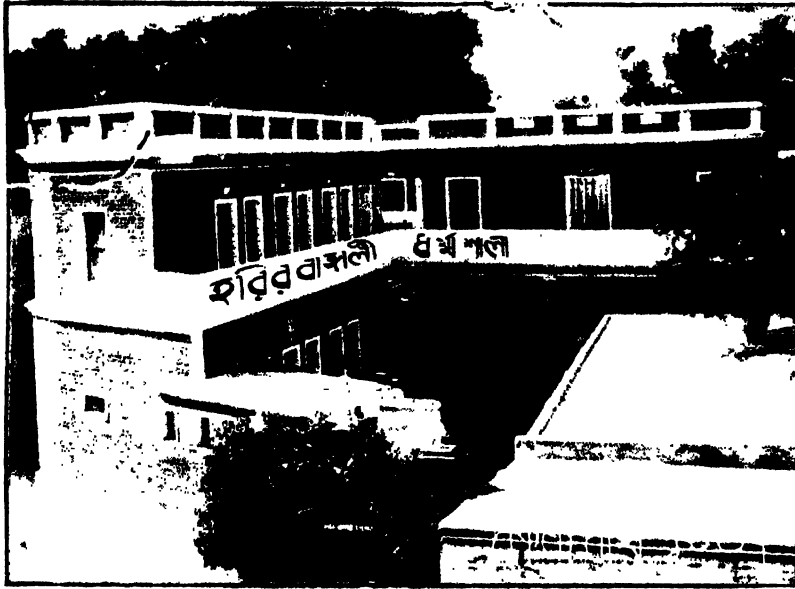
হরির বাঙালী ধর্ম্মশালা, বৈদ্যনাথধাম

১৯২৪ সালে। প্রধানতঃ যে স্বদেশপ্রেমিক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির উদ্যোগে ও কর্ম্মনিষ্ঠায় এই ধর্ম্মশালাটি স্থাপিত হয় তাঁহার নাম শ্রীযুত হরিদাস গোস্বামী। ইঁহার নিবাস নবদ্বীপে। ইনি যখন আজমীরে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন, সেই সময় পুষ্করযাত্রী নিরাশ্রয় বাঙালী নরনারীর নির্য্যাতন দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি তাহাদের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হন। তিনি নিজে ধনী ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি স্বয়ং স্থানীয় প্রত্যেক বাঙালীর নিকট গিয়া তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ও প্রত্যেকের নিকট অর্থ প্রার্থনা করেন। এইরূপে বহু পরিশ্রমে স্থানীয় বাঙালী জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে বাঙালীদের জন্য এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য, গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে অনেকগুলি উৎসাহী বাঙালী সহকর্ম্মীর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

'আজমীর বাঙালী ধর্ম্মশালা'র দ্বিতল বাটী আজমীর রেল-ষ্টেশনের সন্নিকটে (দুই মিনিটের পথ) কাছারী রোডের উপর অবস্থিত। ইহাতে সর্ব্বসমেত চৌদ্দ-পনর খানি ঘর আছে। ইহা ভিন্ন স্নানাগার, জলের কল ও পৃথক্ রন্ধনেরও ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে ইহা ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

গত ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে দোলপূর্ণিমার দিন কলিকাতা ১৩ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে পুষ্করমনতীর্থে 'বাঙালী হিন্দু ধর্ম্মশালা' নামে বাঙালীদের জন্য আর একটি দ্বিতল প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহত্তর ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। পুষ্কর-হ্রদের তীরে ব্রহ্মাঘাটের পার্শ্বে ছয়-সাত

কাঠা জমির উপর এই অট্টালিকা অবস্থিত। যে-সকল যাত্রী সাবিত্রী পাহাড় ও পুষ্করতীর্থ উভয় স্থানই দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই ধর্মশালায় অবস্থান করা বিশেষ সুবিধাজনক; কারণ উক্ত উভয় স্থানই এই ধর্ম্ম-শালা হইতে অধিক দূরে নহে। ইহাতে প্রচুর সূর্য্যালোক ও বাতাসযুক্ত চৌদ্দ-পনরখানি প্রশস্ত ঘর ও পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্নানাদির পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা পাতকুয়ার ও পুষ্কর-হ্রদের জল ব্যবহার করেন; সেই জন্য জলের কলের অভাব আদৌ অনুভূত হয় না।

বাঙালী হিন্দু ধর্ম্মশালা, পুষ্কর

দেওঘর বৈদ্যনাথধামে রেলষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত 'হরির বাঙালী ধর্ম্মশালা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রথযাত্রার দিন। কলিকাতার বি দত্ত এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, ৩১ ইমামবক্স লেন, বীডন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মহাশয় ইহার সংস্থাপক। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া হরিধনবাবু এই তিক্ত অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছেন যে, ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় ও ছত্রে মৎস্যাহারী বলিয়া বাঙালীদের অনেক সময়ে স্থান দান করা হয় না। অথবা যিনি বহু

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘ-পরিচালিত ধর্ম্মশালা, গয়া

হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা, বারাণসী

পুণ্যফলে স্থানলাভে সমর্থ হন, তাঁহাকে প্রায়ই পরে অনেক দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে হয়। স্বদেশবাসীর এই দুঃখে ও নির্যাতনে মর্ম্মাহত হইয়া তন্নিবারণকল্পে হরিধনবাবু বৈদ্যনাথধামে বাঙালীদের জন্য এই ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিয়মাবলীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ধর্ম্মশালার মধ্যে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। ধর্ম্মশালার বৃহৎ বাটীটি দ্বিতল ও দেড় বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহাতে দুই শত ব্যক্তির বাসোপযোগী কুড়িখানি প্রশস্ত গৃহ আছে। শুধু ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াই হরিধনবাবু তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধা করেন নাই, অসুস্থ যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য ধর্ম্মশালার অদূরে হরিধন দত্ত ফ্রি ওয়ার্ড নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও করিয়া দিয়াছেন।

স্বদেশবাসীর মঙ্গলার্থ হরিধনবাবুর দানশীলতার দৃষ্টান্ত আরও আছে। বাঙালী তীর্থযাত্রীদের বাসের সুবিধার জন্য তিনি কাশীধামের লাক্সা, রামাপুরায় সতর কাঠা জমির উপর 'হরির বাঙালী ধর্ম্মশালা' নামে আর একটি ধর্ম্মশালা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে এককালীন প্রায় দুই শত লোকের বাসোপযোগী চব্বিশখানি প্রশস্ত কক্ষ আছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে শারদীয় দেবীপক্ষের প্রতিপদে ইহার দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

বিশেষ সুখের বিষয়, বারাণসী-ধামের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে ইহাই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ধর্ম্মশালা নহে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালার অনতিদূরে গোধূলিয়ায় কলিকাতার ১১, সিমলা ষ্ট্রীট নিবাসী বিখ্যাত ঔষধ-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত 'হরসুন্দরী ধর্ম্মশালা' অবস্থিত। মহেশবাবু

পুরসুন্দরী ধর্ম্মশালা, কলিকাতা

বেদনা

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
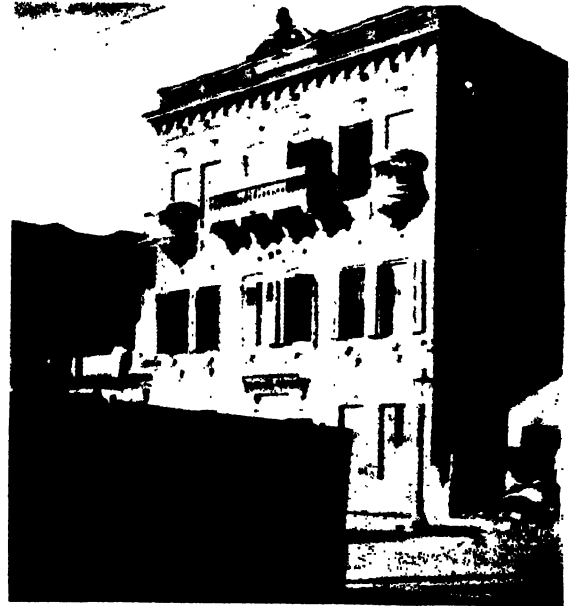
কুমিল্লার অধিবাসী; এখন তাঁহার বয়স প্রায় পচাত্তর বৎসর। বঙ্গের বাহিরে ধর্ম্মশালা-স্থাপনের বাসনা তাঁহার কি করিয়া হইল, বলিতেছি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, মহেশবাবু গয়াধামে গিয়া আশ্রয় অভাবে কিছুকাল এক জন বাঙালী ভদ্রলোকের বাটীতে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। অথচ, তজ্জন্য সেই ভদ্রলোক স্বভাবতই কোন মূল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পর মহেশবাবু হিন্দুসাধারণের বাসের স্থবিধার জন্য গয়ায় একখানি ছোট ঘর মাসিক পাচ টাকা হিসাবে ছয় মাসের জন্য ভাড়া করেন। অল্প দিনের জন্য হইলেও সেই ঘরখানি তখন গয়ায় ধর্ম্মশালার অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিয়াছিল।

পরে যে-কারণেই হউক, মহেশবাবু গয়ার পরিবর্ত্তে কাশীতে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। গয়ার ন্যায় কাশীতেও তিনি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যে একটি বৃহত্তর বাটী ভাড়া করেন ও তাহার সম্মুখে সাধারণের অবগতির জন্য একটি ক্ষুদ্র সাইনবোর্ডও প্রলম্বিত করা হয়। অত্যল্পকাল মধ্যেই সেই গৃহে এরূপ যাত্রীসমাগম হইতে থাকে যে তদ্দর্শনে মহেশবাবু বাটীখানি ক্রয় করিতে মনস্থ করেন ও সেই বিষয়ে গৃহস্বামীর সহিত কথাবার্ত্তাও হইতে থাকে। পরে একচল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে বাটীটি ক্রীত হইলে, মহেশবাবু বহু অর্থব্যয়ে উহা সুসংস্কৃত করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে ধর্ম্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ত্রিশখানি প্রশস্ত গৃহযুক্ত এই দ্বিতল ধর্ম্মশালাটির সুপরিচালনের জন্য তিন জন বেতন-ভোগী ম্যানেজার ও তাঁহাদের অধীনে একাধিক দ্বারবান, ভৃত্য, মেথর প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। কর্ত্তৃপক্ষ যে শুধু যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখেন তাহা নহে, পরন্তু যাহাতে বিদেশে নবাগত তীর্থকামী যাত্রীদের উপর স্থানীয় পাণ্ডারা কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার না করিতে পারে, সে-বিষয়েও ইঁহারা বিশেষ সচেতন। ধর্ম্মশালায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্নানের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। যাত্রীদের কেহ কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কাশীর তৃতীয় ধর্ম্মশালাটির নাম 'বীরেশ্বর পাণ্ডে ধর্ম্মশালা।' ইহা কলিকাতার খ্যাতনামা ধনী, অধুনালুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী ৺মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার স্বর্গগত পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত হয়। বীরেশ্বরবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি ও বঙ্গসাহিত্যের সেবক ছিলেন। মনোমোহন-বাবুরা মূলতঃ ভিন্ন প্রদেশবাসী হইলেও বহু পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিয়া ও বঙ্গদেশীয় ধর্ম ও সমাজ অনুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া বাঙালী রূপেই পরিচিত ছিলেন। মনোমোহনবাবু যশোহরের মুঠিয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশের বিবাহাদি ক্রিয়াও এ দেশীয়দের সহিতই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনোমোহনবাবু হিন্দু নরনারীর বাসের স্থবিধার জন্য যে বিশাল প্রাসাদতুল্য ধর্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালাসমূহের মধ্যে এই ধর্মশালাটিই যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯৯, ২০০ নং রামাপুরা, বেনারস সিটীতে আড়াই বিঘা জমির উপর ইহা অবস্থিত। ইহাতে পাচ শতাধিক লোকের বাসোপযোগী সত্তরখানি সুপ্রশস্ত শয়ন-গৃহ, কুড়িটি পাকশালা ও প্রায় চল্লিশটি ড্রেন-পাইখানা আছে। যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য টিউবওয়েল, ইঁদারা, জলের কল ও বিজলী-বাতির ব্যবস্থা আছে। ১৯৩৪ সালে, ৪ঠা নবেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি (অধুনা অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলী ও বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যোগদান করিয়া মনোমোহনবাবুকে তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মনোমোহনবাবুর বাসনা ছিল, ধর্ম্মশালার সংলগ্ন জমিতে অনেকগুলি কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া দিবেন ও প্রাপ্ত অর্থে ধর্মশালা পরিচালনার জন্য স্থাপিত স্থায়ী ধনভাণ্ডারের পুষ্টি হইবে। কিন্তু জাতির নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁহার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইল (২২শে আশ্বিন, ১৩৪২)।

পূর্ব্বে গয়ার বাঙালী হিন্দুযাত্রীরা একটি সুপরিচালিত ধর্ম্মশালার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেন। তখন বঙ্গদেশাগত সরলপ্রকৃতি তীর্থযাত্রীরা দুর্ব্বৃত্তদের ও স্থানীয় পাণ্ডাদের নিকট প্রায়ই উৎপীড়িত হইতেন। উপর্য্যুপরি কয়েক জন বাঙালী যাত্রীকে এইরূপে অত্যাচরিত হইতে দেখিয়া গয়ার বঙ্গীয় ঔপনিবেশিক সমিতি (Bengalee Settlers' Association) ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতা বাজিৎপুর-নিবাসী আচার্য্য শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দজীকে গয়ায় সেবাশ্রমের একটি শাখা স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। ইহারই ফলে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সামান্য একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গয়া সেবাশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। আশ্রমের সুব্যবস্থার গুণে আশ্রয়প্রার্থী যাত্রীর সংখ্যা শীঘ্রই অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় আর একখানি বাড়ী ভাড়া করার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইল। কিন্তু দুইখানি বাড়ী ভাড়া হইবার পরেও আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানাভাবে বহু আশ্রয়প্রার্থী যাত্রীদের বিমুখ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সঙ্ঘ-কর্ম্মিগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ৪,২৭৩৲ টাকা সংগৃহীত হইল। এক জন দানশীল বাঙালী ভদ্রলোক আট হাজার টাকা দান করিলেন। মোট এই ১২,২৭৩৲ টাকা ব্যয়ে ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্‌লাউড্‌গঞ্জ রোডের উপর বারো বিঘা পরিমাণ এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ডও ক্রয় করা হইল। এইরূপে বাঙালীদেরই একান্ত চেষ্টায় ও উদ্যোগে বঙ্গীয় ঔপনিবেশিক সমিতির বহুদিনের কামনা পূরণের পথ প্রশস্ত হইল। ইহার পর ১৯২৯ সালে কলিকাতার এক জন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী এই জমির উপর একটি প্রশস্ত যাত্রীনিবাস ও একটি পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সে প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইতিমধ্যে সেবাব্রতী কর্ম্মিগণের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ বহু দানশীল হিন্দু প্রদত্ত অর্থসাহায্যে ধর্ম্মশালার আরও প্রসার হইয়াছে। এখন আশ্রমে দুই শত পঞ্চাশ জন লোকের এককালীন বাসোপযোগী দুইটি সুবৃহৎ দ্বিতল দালান-সংলগ্ন বহু কক্ষ, দুইটি পাকশালা, একটি সাধারণ আহারের স্থান, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ প্রার্থনার জন্য একটি মন্দির আছে। হিন্দুমাত্রেই এখানে সাদরে গৃহীত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হন। ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এই ধর্ম্মশালাটি পরিচালিত হয় এবং ইঁহারা আশ্রিত যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। পুণ্যার্থী হিন্দুযাত্রীরা যাহাতে সপরিবারে এখানে থাকিয়া সামান্য ব্যয়ে গয়াকৃত্য প্রভৃতি করিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও ইঁহারা করিয়া দেন। আরও দুই-একটি তীর্থস্থানে ধর্ম্মশালা স্থাপনোদ্দেশ্যে ইঁহারা জমি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন ; অর্থাভাবের জন্য কার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

ভুবনেশ্বরে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পাল মহাশয়ের একটি ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে বিন্দু-সরোবরের তীরে ইহা অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া যাত্রীদের মন্দির ও দেবদর্শনের বিশেষ সুবিধা আছে।

৺কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী জনসাধারণের নিকট ভিক্ষালব্ধ অর্থে অযোধ্যা, মধ্যভারত, পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, কাবুল, বেলুচিস্থান ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে বত্রিশটি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবাসে বাঙালীর যে সুচারু আশ্রয় ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আজ ধর্ম্মশালার ইতিহাস সম্পর্কে সেই কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার সেই অক্ষয় কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি যাহাতে উত্তরকালে বঙ্গযুবকদের অনুরূপ সুচিরস্থায়ী সৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, প্রত্যেক বাঙালীর সে-বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ৺কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বাংলার মধ্যেও বাঙালীর আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন আছে, সে-কথাও স্বজাতিপ্রেমিক বাঙালীরা বিস্মৃত হন নাই। প্রদীপের নীচেই যেমন আলোকের অভাব অনুভূত হয়, বাংলার মধ্যেই অনেক সময়ে সেইরূপ বাঙালীকে আশ্রয়ের অভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

কলিকাতা বড়বাজারের সুপরিচিত জমিদার দক্ষিণারঞ্জন বসাক মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার দানশীলা সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসী স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কলিকাতায় নবাগত বাঙালী হিন্দুদিগের বাসের জন্য

একটি ধর্ম্মশালা স্থাপনের ইচ্ছা করেন ও তদুদ্দেশ্যে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৯, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে প্রায় সাত কাঠা জমির উপর অবস্থিত সুবৃহৎ দ্বিতল বাটীখানি ক্রীত হয়। ধর্ম্মশালাটির প্রতিষ্ঠা হয় ১০ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সালে। 'দক্ষিণারঞ্জন বসাক ধর্ম্মশালা'ই কলিকাতায় বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ধর্ম্মশালা। এই ধর্ম্মশালায় সর্ব্বসমেত আঠারখানি প্রশস্ত কক্ষ ও তদ্ভিন্ন পৃথক্ পাকশালা আছে। ঘরগুলিতে বিজলী-বাতিরও বন্দোবস্ত আছে। ধর্ম্মশালায় যাত্রীসমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতলে আরও অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আশ্রিত ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধার জন্য একজন ম্যানেজারের অধীনে অনেকগুলি ভৃত্য, দরোয়ান, মেথর প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। ধর্ম্মশালাটি প্রকৃতই সুপরিচালিত।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতায় নানা কার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু হিন্দু নর-নারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের আশ্রয়দানের অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্র সুব্যবস্থাও যাহাতে সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতা, ২ নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্ নিবাসী স্বর্গীয় হৃষীকেশ মল্লিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ও পুণ্যশ্লোক মতিলাল শীল মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী পুরসুন্দরী দাসী সাত বৎসর পূর্ব্বে উনআশি হাজার টাকা ব্যয়ে ৬২।৪, বীডন ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদোপম ত্রিতল বাটীখানি ক্রয় করেন ও দানপত্রে যথারীতি স্বাক্ষর করিয়া হিন্দু জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুদিগের বাসের জন্য উৎসর্গ করেন। এই পুণ্যবতী হিন্দুমহিলা ধর্ম্মশালার জন্য শুধু বাটীখানি দান করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনোদ্দেশ্যে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন ও [illegible]জন অছি (Trustee) নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে এই অর্থ ও বাটীখানি অর্পণ করিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক আট কাঠা পাঁচ ছটাক জমির উপর অবস্থিত এই ত্রিতল ধর্ম্মশালায় সর্ব্বসমেত চব্বিশখানি প্রশস্ত গৃহ আছে। ধর্ম্মশালা সুপরিচালনার জন্য এক জন বেতনভোগী ধর্ম্মাধ্যক্ষ, দুই জন দরোয়ান, একজন ভৃত্য ও এক জন ঝাড়ুদার নিযুক্ত আছে। ইংরেজী ১৯২৯ সালে, ১লা নভেম্বর, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জে সি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক 'পুরসুন্দরী ধর্ম্মশালা'র দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

কলিকাতার 'দক্ষিণারঞ্জন বসাক ধর্ম্মশালা' ও 'পুরসুন্দরী ধর্ম্মশালা' ও চাঁদপুরের শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম্মশালা ব্যতীত বাঙালী হিন্দু-মহিলা প্রতিষ্ঠিত আর কোন ধর্ম্মশালা আছে বলিয়া অবগত নহি।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় 'রামেন্দ্র স্মৃতি-ভবন' নামে একটি অতিথিশালা আছে। স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকদের উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে ৺আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের অদূরে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাটোয়ায় ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে গৌরাঙ্গঘাটের সন্নিকটে শ্রীযুক্ত দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি কালীবাড়ী আছে। সেখানে হিন্দু আগন্তুকদের আশ্রয়দানের সুব্যবস্থা থাকায় ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যও কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইতেছে।

বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি ও চন্দননগর ও নবদ্বীপে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি ধর্ম্মশালা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টায় পার্ব্বতী নিজেকে কিছুতেই অণুমাত্র বিশ্রাম দিল না। নব নব উন্নতির পন্থা উদ্ভাবন ক'রে আশ্রমকে সে যেন আবার নূতন রূপ দিয়ে গ'ড়ে তোলবার উদ্যমে প্রাণপাত করতে লাগল। এই উৎসাহের স্রোতে পার্ব্বতীর কর্ম্মপ্রবণ হৃদয়কে, তার ক্ষুব্ধ অন্তরের মৃত্যুগুহার অন্ধ সমাধি থেকে আবার কখন যে ধীরে ধীরে আশা-আনন্দ-আলোকময় সঞ্জীবনরসধারাপ্রবাহে আপন দয়িতের সুখ-শান্তি-সান্ত্বনাপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি স্নেহাতুর ক'রে তুললে তা সে জানতেও পারে নি। সমস্ত মাসের অন্তে শচীন্দ্র যখন এসে উপস্থিত হবে তখন এই নূতন সৃষ্টির বিস্ময়ের অর্ঘ্য দিয়ে সে শচীন্দ্রের ক্ষুব্ধচিত্তে যে অপরিমিত আনন্দের সঞ্চার করবে সেইটুকু কল্পনা ক'রে তার মহাশ্রম মনে মনে যেন প্রসাদ লাভ করতে লাগল। তার চিত্তের সকল সংশয় অপসারিত হ'য়ে গেল।

দিনের পর দিন যায় তার বুভুক্ষু চিত্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার উত্তেজনায় তোলপাড় করতে থাকে। যে প্রসাধন সম্বন্ধে কোনদিন তার রুচিতে আগ্রহের ছোঁয়াচ লাগবার অবসর পায় নি, সেই প্রসাধন সম্বন্ধেও নিজের অজ্ঞাতসারে সে যেন একটু সজাগ হচ্ছে। বাঙালী রান্নার নানা বিচিত্র জটিল রহস্য আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে ওখানকার ছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন ক'রে ক'রে বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে তুলেছে। বাঙালী পরিবারের গৃহস্থালী সম্পর্কে গল্পের ছলে মেয়েদের কাছে নানা তথ্য সংগ্রহ করে—এমনি ক'রে দিন যায় তার ভবিষ্য-জীবন রচনার ভূমিকা-বিন্যাসে।

মাস অতীত হ'তে চলল; শচীন্দ্রের কাছ থেকে কোনও আগমনীবার্ত্তা এখনও এসে পৌছল না। পার্ব্বতী ভাবে—নিশ্চয় জমিদারীর কাজে ফুরসৎ পান নি।

আজ মাসের শেষদিন। শচীন্দ্রের আগমন-প্রতীক্ষায় পার্ব্বতী গিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছে। তার বেশভূষায় কোথাও আতিশয্য না থাকলেও পারিপাট্যের অভাব নেই। মুখ তার আশা ও আনন্দের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দূরে বাঁকের মুখে লঞ্চের আভাস দেখা দিয়েছে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই লঞ্চ এসে ঘাটের কাছে পৌছবে। কিন্তু এই সময়টুকু যেন কাটতে আর চায় না, এটুকু সময় যেন এই ২৯ দিনের চেয়েও অনেক বিস্তৃত। সারেঙটা যেন কি! লঞ্চের গতি যে নৌকারও অধম হ'ল! তবু সময় যায়। লঞ্চ ঘাটের কাছে এসে পৌছয়। কিন্তু কই শচীন্দ্র ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই! কেবিনে গেছে নিশ্চয়—কোনও কাজে।

লঞ্চ ঘাটে লাগতেই পার্ব্বতী এগিয়ে গেল। কিন্তু শচীন্দ্র কই! ভোলানাথ এগিয়ে এসে 'গড় ক'রে' একটা কাগজের মোড়ক পার্ব্বতীর হাতে দিলে। শচীন্দ্র আসে নি। কোনও কঠিন অসুখ করে নি ত! জিজ্ঞেস করতে যেন সাহস হয় না। সেই যে বিলেতে একবার—উঃ কত কষ্ট ক'রেই না তাকে বাঁচিয়েছিল!

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পার্ব্বতীর মনে সম্ভব-অসম্ভব লক্ষ কথার চুমকি তুবড়ীর ফুলঝুরির মত মনের মধ্যে ঝ'রে ঝ'রে পড়ল। শক্ত মেয়ে সে; মনের এই উত্তাল উচ্ছ্বাস সে কঠিন বলে চেপে জিজ্ঞেস করলে, "ভোলাদা—ভাল আছ ত? তোমার বাবু এলেন না যে?"—ব'লে সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না দিয়ে ক্রমাগত কথা ব'লে যেতে লাগল—যেন, পাছে কোন দুঃসংবাদ ভোলাদার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, এই ভয়।

"উঃ কত দিন পরে তুমি এলে বল ত ভোলাদা? দেখ সব বদলে গেছে। বলতে হবে—দিদিমণির ক্ষমতা আছে। তোমার বাবু এলে অবাক হতেন। কিন্তু এলেন না ত! কিছু খেয়েছ সকালে? চল আমার বাড়ী চল। বিশ্রাম ক'রে নাও। তার পর সব শুনব'খন।" ইত্যাদি অনেক—

শুধু নিরাশার উদ্বেল বেদনার উপর কথার পর কথা চাপা দিয়ে চলা।

চল্‌তে চল্‌তে ভোলানাথ এক সময়ে অবসর পেয়ে বললে, "বাবু পশ্চিমে গেল দিদিমণি। তা বাবুকে কত বললুম, 'বাবু আমাকে সঙ্গে নাও'—তা শুনলে না। বললে, 'না ভোলাদা, তুই বরং তোর দিদিমণির কাছে থাক তদ্দিন আমি ক'টা দিন পশ্চিমটা একটু ঘুরে আসি। তুই থাকলে তবু আমি একটু নিশ্চিন্দি হ'তে পারি।' তা দিদিমণি আমি জানি কি না। ও আর কোথাও না; বাবু গেছে ঐ প্রাগে। তুমি দেখে নিও। বৌমারে কি ভালই না বাসত বাবু! আমারে এই টাকা আর পত্তর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।"

স্নেহশীল ভোলানাথের সরল উক্তি পার্ব্বতীর মনে শচীন্দ্র সম্বন্ধে আবার একটু দ্বিধা উপস্থিত করলে। তবে কি সত্যই সে শচীন্দ্রকে তার কর্ত্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়!

বিপুল বলে সে মন থেকে আপাততঃ এই চিন্তা সরিয়ে দিলে। ভোলানাথের আতিথ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সে চিঠিপত্র নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

প্রথম প্যাকেটটায় কিছু টাকা, তার পরেরটায় হিসাব-পত্রের একটা খসড়া। এই রকম আরও দু-তিনটা। তার পর কয়েকখানা চিঠি—তার মধ্যে মেয়ে পাঠাবার দরখাস্ত থেকে আশ্রম-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের চিঠি। একখানা চিঠিতে অনিন্দিতা দেবী, কলিকাতা নারীভবন থেকে লিখছেন, "আপনার ও আপনার আশ্রম সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আশ্রম দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমিও সামান্তভাবে একটি 'নারীভবন' খুলিয়াছি। আপনার নিকট হইতে সাহায্য পাইলে উপকৃত হইব। দয়া করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব।"—

নারী-প্রতিষ্ঠানে আসতে হ'লে, হয় পার্ব্বতীকে লঞ্চের ব্যবস্থা করতে হয়—তাই চিঠিখানা সে আলাদা ক'রে রেখে দিলে; নতুবা কলকাতার ঘাট, যেখান থেকে লঞ্চ ছাড়ে, সেখানে অত্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে টিকিট কিনে লঞ্চে যাওয়া চলে। সপ্তাহে মাত্র দু-দিন এই লঞ্চ যাতায়াত করে।

শেষ পত্রখানি একটা খামে মোহর করা। শচীন্দ্রের হস্তাক্ষর। পার্ব্বতীর মনটা ব'লে উঠল "না গো না এমন ক'রে বিচ্ছেদ হ'তে পারে না। "না—না—না" ব'লে সে পত্রোন্মোচনের পূর্ব্বে নিজেকে যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

চিঠি ইংরেজীতে—এবং ছোট। চিঠিতে লেখা—যাহা বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলে উপযুক্ত হয়, ভাষায় এমন শব্দ পাই না। তুমি আমার চিত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য গ্রহণ কর। তাহাকে প্রেম বলিতে চাও বল, না বলিতে চাও, যাহা ইচ্ছা বলিও—কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিও না। আমার পত্নীর প্রতি আমার যে প্রেম তাহার মহামৃত্যু ঘটিতে পারে না,—সেই কথাটাই জানিবার জন্য বাহির হইলাম। পুনশ্চঃ:—ব্যাঙ্কের সহায়তায় নির্ম্মিত টাকা পঁহুছিবে—আশা করি তাহাতে কাজের অসুবিধা হইবে না।

চিঠিতে প্রত্যুত্তরের জন্য কোনও ঠিকানা দেওয়া নাই।

চিঠিখানা হাতে ক'রে সে দীর্ঘকাল বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারই ভর্ৎসনার আঘাতে কতখানি অভিমানের আবেগে যে পত্রখানি রচনা করা সেই কথা মনে ক'রে শচীন্দ্রের দুর্ভাগা জীবনের প্রতি করুণায় প্রেমে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে মনে নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে চিঠিখানি বাক্সে রেখে সে বারান্দায় গিয়ে বসল।

৪৭

অনিন্দিতা দেবীর নারীভবনে আজ দু-মাস কমলা কতকটা নিরুদ্বেগে এবং অপেক্ষাকৃত মনের স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করবার সুযোগ পেয়ে এক দিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিল অন্য দিকে অজয়ের অদর্শনে তার মনের অশান্তিও কিছু কম ছিল না।

সীমার বন্ধুত্বে এবং সীমা সম্বন্ধে নিখিলনাথের অনুরোধ পালনের চেষ্টায় সময় তার অবশ্য নিতান্ত ভারবহ হয়ে ওঠে নি এই যা। তবু সময়-সময় দরোয়ান পাঠিয়ে গোপনে নিখিলনাথকে অজয়ের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এনে দিতে হয়েছে। এতে যে দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় কমলের জীবনে অহেতুক অনুশোচনার কারণ তার চেয়ে বড় আর কখনও ঘটে নি।

কয়েক দিন হ'ল কমলের হাসপাতালের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে কিছু বিশেষ কাজ না থাকায় উপরের জানলায় ব'সে রাস্তার জনস্রোতের দিকে চেয়ে তার দীর্ঘ অলস প্রহর

যাপন করছে সে। মনটা যেন তার অসাড় হয়ে গেছে। তার স্বামীর আশু অনুসন্ধানের সম্ভাবনা নিখিলনাথের উদ্বেগ-পীড়িত চিত্তে চেতিয়ে তোলবার মত স্বার্থপরতা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। নিখিলনাথ এ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বা উদাসীন নয়—তা সে কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করত। ব্যথিত হৃদয়ে অসহায় ব্যাকুল বেদনায় সে পথের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। গ্যাসের বাতি জ্বালান হয়ে গেছে। অল্প দূরে একটা গ্যাস-পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাদেরই বাড়ীটাকে লক্ষ্য করছে ব'লেই মনে হ'ল। আলো-আবছায়ায় মুখ ভাল দেখা যায় না। কমলা ভাবলে সীমার দলের লোকই হবে বোধ হয়। তবু কি জানি—সীমাকে জানান উচিত বলেই মনে হ'ল। উঠে যাবে—এমন সময় তার ভঙ্গী দেখে বুকটা ধড়াস ক'রে তার মনে হ'ল সে নন্দলাল। লোকটা তখন স'রে গেছে। কমলের মনটা কেমন বিকল হয়ে রইল।

নিজের চিন্তাকে ভোলবার জন্যে সে নিখিলের কাজে তার ক্ষুদ্র শক্তি নিযুক্ত করতে চেষ্টা করে। সুযোগ খুঁজে নিয়ে প্রায়ই সে সাবধানে ধীরে ধীরে তর্ক তোলে এবং নিখিল-নাথের শিক্ষার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার ক'রে নিখিলের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করে। কমলের চিত্তে এই তর্কের আর একটি আকর্ষণ ছিল; তা সীমাকে নিরীহ পন্থায় প্রত্যাবৃত্ত করা নয়; সীমার প্রতি নিখিলের দুর্নিবার আকর্ষণের কথা কমলের ক্রমে আর অগোচর ছিল না। স্ত্রীলোকের চিত্তে অনুপ্রেরণার পক্ষে তাই কি যথেষ্ট নয়?

তর্কের মুখে শিক্ষামত কমলা সেদিন সীমাকে বলেছিল, "হবে না কেন? পৃথিবীর সমস্ত মানুষ স্বাধীনতা লাভ ক'রে নিজেদের জন্মগত উপস্বত্ব ভোগ করবে, মনুষ্য-সমাজের এ নিয়মই নয়। এক জন অপরের উপর প্রভুত্ব করবেই। কোন একটা স্বাধীন দেশের মানুষ যে সেখানকার অন্য কতকগুলি মানুষের প্রভুত্বের বা আইনের বা সামাজিক স্তরগত নিয়ম-তন্ত্রের অধীন এ ত দেখতেই পাচ্ছি। তবে তোমারই দেশের কতকগুলি মানুষ তোমার উপর প্রভুত্ব করছে না, অন্য দেশের মানুষে করছে, এতে পরাধীনতার তফাৎ হচ্ছে কোথায়?"

"হচ্ছে; এক-শ বার হচ্ছে। স্বাধীনতা বলতে পশুর জীবন আমি কখনও বলতে চাই নি—যাদের রাষ্ট্র নাই, সমাজ নাই, সংস্কৃতি নাই—কিছুই নাই। স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা বোঝায়। যেখানে নিজের অর্থ আমি নিজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় ব্যয় করতে পারি, যেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে সমস্ত জাতির সঙ্গে সমান গৌরবে দাঁড়াতে পারি, যেখানে—"

"সোজা কথায় বল না ভাই যে মানুষের মঙ্গলের চেয়ে মানুষের দেমাকটাকে বড় ক'রে বল্‌তে চাও—তাতে মঙ্গল হয় ভাল, না-হয় নেই, নেই। স্বাধীন হ'লেই যে মানুষে মনুষ্যত্বলাভ করে না সে ত হাজার বার তুমিই ভাই দেখাচ্ছ—অন্য সব স্বাধীনতা-মত্ত জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। তবে স্বাধীনতা-স্বাধীনতা ক'রে ক্ষেপে বেড়াবার আমাদের কি আছে বল ত? দেশের লোককে মানুষ ক'রে তোল দেখ স্বাধীন হওয়ার চেয়ে অনেক বড় হবে। সে এমন কি শেষে, চাই কি স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে। মনুষ্যত্বলাভ করলে স্বাধীন যারা তাদের চেয়েও কি বড় হবে না? এই যে তুমি নারীভবন করেছ এইটাকেই গড়ে তোল না। আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষ কেউ আত্মনির্ভরশীল নয়। সকলকে পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখাও না। আরও ত কেউ কেউ এই কাজে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা তোমার মনুষ্যত্ব-বিরোধী স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার চেয়ে খারাপ কিছু করেছে বলে ত আমার মনে হয় না। এই কমলাপুরীর কথাই ধর না কেন। দেখ না, পার্ব্বতী দেবী কি ক'রে তুলেছেন? এই ত কাজ!"

"পার্ব্বতী দেবীটি কে?"

"বাঃ কমলাপুরীর নারী-প্রতিষ্ঠানের কথা শোন নি? এ রকম একটা প্রকাণ্ড জিনিষ এক জন মাত্র মেয়ের পক্ষে গ'ড়ে তোলা যে কী—পড়লে অবাক হ'তে হয়। দাঁড়াও—এই ব'লে কমলা নিখিলনাথের সংগৃহীত কমলাপুরীর প্রস্‌পেক্টস্‌ ইত্যাদি এনে দেখাল।

কাগজ পড়তে পড়তে সীমার মনের চিন্তা অন্য ধারায় বইতে লাগল। "এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে যদি হাতে পাওয়া যায়! এই ত চাই; নিজের পায়ের উপর যারা নির্ভর ক'রে আত্মীয়ের পরাধীনতাকে যারা ঘৃণা করতে শিখেছে, তাদের মনে বিজাতির পরাধীনতার উপর বিদ্বেষ

আনতে পারলে—!" তার মনের ভিতরটা এই প্রতিষ্ঠানের উপর যেন কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল। যেন তারই কাজ এরা অনেকটা ক'রে রেখেছে। এই ত একটা বৃহৎ জমি প্রস্তুত—অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'লে এই রকম একটা জায়গা থেকে কি না হ'তে পারে!

সে মনে মনে কমলাপুরী দেখে আসবার সংকল্প স্থির করলে। মুখে অবশ্য কোনও কথা সে প্রকাশ করলে না।

সীমাকে স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করতে দেখে কমলার মনে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। সে উৎসাহিত হয়ে বললে, "মানুষকে কল্যাণের পথে চালাতে হ'লে যে-শক্তির দরকার এই মেয়েটির তা নিশ্চয়ই প্রচুর আছে। কিন্তু আমি জানি না তোমার মত এমন একটা প্রকাণ্ড কাজের ক্ষেত্র ক'রে এমন সহজে চালাবার ক্ষমতা তার আছে কি না। তুমি যদি মনে কর, কি না করতে পার বল ত? সমস্ত দেশের শিক্ষা, শিল্প, শক্তিকে জাগাতে তোমার এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে অনায়াসেই তুমি পার। যাদের স্বাধীনতা চাও তাদের ভিতর থেকে স্বাধীন ক'রে তোল—বাইরের পরাধীনতার খোলস একদিন খ'সে যাবেই।"

হঠাৎ সীমার মুখের দিকে চেয়ে তার শূন্য দৃষ্টির উপর চোখ পড়ায় কমলা চুপ করলে—সীমা তার কথা শুনছে না নাকি! না তারই কথায় তার মনটা বিচলিত হয়েছে। বললে, "সত্যি ভাই, তুমি এমনি একটা কাজে লেগে যাও ত আমার এই আঁস্তাকুড়ে ফেলে-দেওয়া জীবনটা একটা কাজের রাস্তা পেয়ে বেঁচে যায়। আমি সামান্য, কিন্তু তোমার উপর আমার ভালবাসা ত কম নয়। কাঠবেরালি দিয়েও সেতু বাঁধার কাজ হয়েছিল—কি বল?"—ব'লে হাসতে লাগল।

সীমা অল্প হাসবার ভান ক'রে বললে, "তবে কাঠবেরালি ত জতুগৃহ-নির্ম্মাণে লাগে নি। না না সত্যি, আসল কথা তোমরা উল্টো ক'রে ভাব তাই আমার কথা তোমরা বোঝ না। এটা প্রতিমা গড়া নয় যে তার কাঠ-খড় ঠিকমত সাজাও, রং দাও তার পর একদিন মন্ত্র পড়লেই তা'তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। এটা একটা জীবন্ত মহাতরু; মরতে বসেছে যে সূর্য্যালোকের অভাবে, সেই সূর্য্যালোক তাকে দেখাও—দেখো ফলে ফুলে পাতায় সৌন্দর্য্যে হিল্লোলে আপনিই ঝলমল ক'রে উঠবে। স্বাধীনতা আমাদের সেই সূর্য্যালোক—সেই আমাদের অমৃতরস যোগাবে। গাছকে সূর্য্যালোক থেকে বঞ্চিত ক'রে তার তদ্বির-তদারক করতে বললে তাকে উপহাস করা ছাড়া আর কিছু হয় না।" ব'লে অসহিষ্ণু চোখে জানালার বাইরে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

কমলা তার বিরক্তি দেখে আর কিছু বলবে না ভাবছে এমন সময় সীমা তার দিকে ফিরে বললে, "কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমাদের ঐ রকম বিনিয়ে বিনিয়ে চুনিয়ে চুনিয়ে ভাবতে দেখলে আমার ধৈর্য্য থাকে না। নিখিলবাবুর মত লোক, যাঁর মৃত্যুভয় কেন, কোন ভয় কোন লোভ নেই ব'লে আমার বিশ্বাস; যাঁর মত লোক দেশের কাজে নামলে আমাদের বুকটা দশ হাত বেড়ে যায়, এই বয়সে তিনিও যখন বালাপোষ-মুড়ি-দেওয়া তামাক-খেকো বুড়োদের মত গুঞ্জন ক'রে ক'রে কথা বলতে থাকেন তখন তোমায় আর কি বলব বল? কিন্তু সত্যি বল ত সত্যিই কি তোমরা দেশের স্বাধীনতাকে প্রাণে মনে কামনা কর না? স্বাধীনতার চেয়ে বড় কাম্য কেমন ক'রে লোকের মনে থাকতে পারে তা আমি ভেবেই পাই না। সমস্ত স্বাধীন দেশের লোকেদের গিয়ে জিজ্ঞেস্ কর যে, কি হারালে তারা সবচেয়ে নিজেদের দরিদ্র ব'লে অনুভব করবে—একবাক্যে তারা বলবে স্বাধীনতা। আমরাই কেবল নানা মনোভাবের তাড়নায় প'ড়ে দার্শনিক সেজে রইলাম।"

কমলা খুব নরম সুরে বললে, "ভাই তোমাদের মত ত আমি পড়াশুনো করি নাই। খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে যেটুকু শিখি। সব ভাই আবার বুঝিও না। স্বাধীনতা যে ভাল সে-কথা ত "না" বলছি না। তবু আজকাল আবার অনেক চিন্তাশীল লোক ত এই সব জিনিষকে অন্য চোখে দেখতে সুরু করেছেন। সেদিন কোথায় যেন দেখলাম যে এই রাজনৈতিক জাতিভেদ অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা এ-সব জিনিষ সভ্যতা এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী—আর এটা নাকি সভ্যজগতে আর বেশী দিন টিকবে না। 'এতখানি জমি আমি দখল ক'রে আছি এর মধ্যে কেউ পা বাড়িও না তা হলেই খুনোখুনি বাধবে—কিংবা আমার গায়ের জোর

বাড়লেই তোমারটা কেড়ে নেব' এ-সব অসভ্যতা বেশী দি[illegible] টিকবে না। 'দেশ জাতি' এ-সব মানুষের মধ্যের তফাৎ উঠে গিয়ে পৃথিবীর জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের যোগাযোগে শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র সব গ'ড়ে উঠবে। এই রকম সব কথা ; ঠিক বুঝি নে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোন একটা দেশে আজ সেই দেশের লোক প্রভুত্ব করতে পেল না ব'লে—"

কমলা বেচারা নিতান্ত মরিয়া হয়েই নিখিলের শেখানো মুখস্থ কথা আওরাতে গিয়ে মুস্কিলে প'ড়ে গেল। সীমা আর ধৈর্য্য রাখতে পারলে না, বললে, "হয়েছে, হয়েছে। নিখিলবাবুর চেলাগিরি আর করতে হবে না। ওসব ঢের শুনেছি—তাঁকে শোনাও গে যাও, তোমার উপর ভক্তি বেড়ে যাবে।" ব'লে একটু নরম হয়ে হেসে বললে, "অমনিই কিছু কম নেই অবিশ্যি।"

কমলা জিব কেটে বললে, "ছিঃ ও কি ভাই। শ্রদ্ধা যদি সত্যি কাউকে করেন ত সে তোমাকে। তা ভাই তোমার মুখের উপর বলছি ব'লে নয়, তোমার মত মেয়েকেও যদি তাঁর শ্রদ্ধা করবার চোখ না থাকত ত তাঁকে নিন্দে করতাম নিশ্চয়।"

সীমা ঠাট্টার মুখে একটু ঝাঁজ দিয়ে বললে, "আচ্ছা, থাক্ আর শ্রদ্ধা করাতে হবে না। তোমার নিখিলবাবুকে তাঁর 'বালাপোষ-বৃত্তিটা' একটু পরিত্যাগ করতে ব'লো তাহ'লে আমার শ্রদ্ধাও কিছু পেতে পারেন। তারও মূল্য কিছু অল্প নয়, কি বল ?" ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে গেল।

সীমার কথার ঝাঁজে তার মনের রহস্যটুকু কল্পনা ক'রে কমলা মনে মনে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করলে।

৪৮

সমস্ত কথা শুনে নিখিলের এ-কথা বুঝতে বাকী ছিল না যে সীমা কমলাপুরী গিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নিখিলের মনে সত্যই একটা শ্রদ্ধা এবং দরদ ছিল। পাছে সীমার দল এদের উপর কোন উৎপাত করে হঠাৎ তার এই ভয় মনে পেয়ে বসল এবং সেও কমলাপুরী যাওয়া মনে মনে স্থির ক'রে হাসপাতালে ফিরে গেল, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

কমলার মুখে সীমার অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানের কথা নিখিলকে চিন্তাকুল ক'রে তুলেছিল। তা ছাড়া আজ কিছুদিন যাবৎ সীমার এবং রঙ্গলালের গতিবিধি নিখিলকে অমনিই ভাবিয়ে তুলেছিল। একটা গুরুতর কোন প্ল্যান যে তাদের মাথায় খেলছে—নিখিলনাথের তা বুঝতে বাকী ছিল না। সম্প্রতি কয়েকটা অদ্ভুত ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলির কোন কিনারা হয় নি। ডাকাতিতে লুটপাটের কোন চেষ্টা ছিল না। অর্থবান লোককে হঠাৎ 'গুম' ক'রে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই এগুলির উদ্দেশ্য ছিল। অনুসন্ধানের দাপটে পুলিসের ও গৃহস্থের আর আহার নিদ্রা ছিল না।

নিখিল সীমার সীমানার মধ্যে গতায়াত করলেও সীমা বা রঙ্গলাল অবশ্য তাদের নিজেদের গতিবিধি কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কখনও নিখিলের সঙ্গে প্রকাশ্য আলোচনা করত না। নিখিল সম্বন্ধে রঙ্গলালের মনের দ্বিধা যদিও কোনদিন সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয় নি, তবু সীমার খাতিরেই সে নিখিলকে সহ্য করত।

নিখিলকে এই স্রোতের মধ্যে আকৃষ্ট করবার জন্যেই হোক বা মনস্তত্ত্বঘটিত অন্য কোন কারণেই হোক সীমা যে তাকে মোটামুটি বিশ্বাস করে এটুকু তার ব্যবহারে প্রকাশ করতে ত্রুটি করত না। দমদমার বাড়ীতে যেতেও যে নিখিলের বাধা ছিল না এইটুকু গলাধঃকরণ করতেই রঙ্গলালের সবচেয়ে বাধত। সীমার খাতিরে কোনমতে সে সহ্য ক'রে যেত এই যা।

কারণও ছিল তার। রঙ্গলাল মোটের উপর বলতে গেলে এই নূতন উদ্যমের কর্ম্মকর্ত্তা। সেই হিসাবে সীমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা সে মনে মনে দাবী করত। সীমা অবশ্য তাকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে ত্রুটি করত না ; কিন্তু দেশের কাজের জন্য রঙ্গলালের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার চিন্তা তার কাছে হাস্যকর ছিল। দেশের কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারায় রঙ্গলাল যদি নিজেকে ভাগ্যবান মনে না করে তবে দেশের কাজে না নেমে হাততালির লোভে তার যাত্রার দলে আখড়াধারীর কাজে যাওয়া সমীচীন ছিল, এই তার মত ; এবং স্পষ্ট ভাষায় এ মত ব্যক্ত করতে সে কসুর করত না।

রঙ্গলালের এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নির্জ্জলা দেশ-প্রীতি মনে করলে একটু ভুল হবে। আরও ভুল হবে সে সীমার প্রতি বা কারও প্রতি কোন আকর্ষণে এ কাজে নেমেছে মনে করলে। দেশের কাজে তার মন যে একেবারেই টানত না তা নয়; কিন্তু সে প্রাণপাত করবার মত এমন কিছু নয়। আসল কথা আদিম বোমারু দলের কোন কোন নায়কের মত রঙ্গলালের মনেও দুর্দ্ধর্ষ কিছু একটা ক'রে এবং দেশময় একটা বিরাট হুলস্থূল বাধিয়ে দুন্দুভি নিনাদ করার উচ্চাভিলাষ তার মনে মনে বরাবরই ছিল। তা ছাড়া দুরন্ত বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মরার নেশাও তার প্রবল ছিল। স্বাধীন দেশে এরাই হয়ত দুঃসাহসী সেনানায়ক হ'তে পারত। কিন্তু দৃপ্ত যৌবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের দুর্ভাগা দেশে তাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। ভীরু সে কোন কালেই ছিল না; সুতরাং সীমার আহ্বানে সীমাকে কেন্দ্র ক'রে একটা কিছু ঘটিয়ে তোলবার নেশাতেই সে এই দলগঠনের, এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালনের ভার নিয়েছিল।

সম্প্রতি নিখিলকে নিয়ে সীমার সঙ্গে তার মনোমালিন্য ঘটেছিল। সীমা যে মানুষ হিসাবে, এমন কি জননায়ক হিসাবেও নিখিলকে মনে মনে একটা বড় আসন দেয় এবং সেই হিসাবে দলের মধ্যে তাকে পেতেও চায়, এটা রঙ্গলালের পক্ষে রুচিরোচন ছিল না। সীমাকে অবশ্য সে লঙ্ঘন করতে ভরসা পেত না, কারণ দলের সকলেরই সীমার নিষ্ঠায় একাগ্রতায় সাহসে সে দলের প্রায় দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দেবতার আসন আমাদের দেশে সস্তা হলেও এক্ষেত্রে দেবতা নিতান্ত নির্গুণ ছিলেন না। সে যাই হোক, কিছুদিন হ'ল একটি ঘটনায় রঙ্গলাল সীমার উপর আন্তরিক বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে উঠেছিল। ঘটনাটি এই—

"কৃতকার্য্যতার উৎসাহে রঙ্গলাল এবং তার পল্টনদের কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লোপ পাবার যো হয়েছিল। এবারে যাকে চুরি করেছিল সে একটা পাড়াগেঁয়ে কুশীদজীবীর একমাত্র পুত্র—নিতান্ত কচি ছেলে। এই লোকটির ধনের এবং কুশীদ-ব্যবসায়ের দুর্নাম ছিল অল্প নয়। এমন লোককেও একমাত্র শিশুর প্রতি অপরিসীম মোহের তাড়নে, প্রাণের আতঙ্কে কলকাতায় তার চিকিৎসার জন্য আনতে হয়। অর্থব্যয় করতে হয়—অর্থ তখন তার কাছে তুচ্ছ বোধ হয়। দাইয়ের সাহায্যে এই শিশুটিকে তারা হরণ ক'রে দমদমার বাগানে এনেছিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলী-ভারাক্রান্ত জীর্ণ এতটুকু দেহের মধ্যে প্রাণ তার যেন শুধু শক্তির অভাবেই বেরিয়ে যেতে পারে নি। সীমার মনের মধ্যে কেন যে মাতৃস্নেহ অকস্মাৎ উদ্বেল হয়ে উঠল বলা যায় না। অকস্মাৎ তার শুষ্ক চোখ জলে ভ'রে এ'ল, সে শিশুটিকে বুকে চেপে নিয়ে বললে, "রঙ্গদা একে দিয়ে এ'স, এর মা এতক্ষণে হয়ত আত্মহত্যা করেছে, এ এক্ষুনি মারা যাবে তা'তে কারোর কিছু লাভ হবে না।"

ফিরিয়ে দিয়ে আসার প্রস্তাব অবশ্য কঠিন—ধরা পড়বার ভয় ছিল। রঙ্গলাল কিছুতেই রাজী হ'ল না, ব্যঙ্গ ক'রে বললে, "এত করুণাময়ী দিয়ে দেশের কাজ হবে না—তুমি গিয়ে ঘরকন্না কর গে। শিশুপালনের অবসরও মিলবে তা'তে।

গোপালকটি রঙ্গলালের সহায় ছিল, সীমার কথায় তারও চোখ ছলছল ক'রে এসেছিল। তার ছোট ভাইটিকে মরণাপন্ন দেখে এসেছে কাল। এমন সময় বিভ্রাট হ'ল নিখিল উপস্থিত হ'য়ে। তীব্র উত্তেজিত স্বরে এই অমানুষিকতার সে প্রতিবাদ করতে লাগল, বললে, "এই রকম শ্বাপদবৃত্তির মূল্যে ক্রয় করা স্বাধীনতার চেষ্টায় দেশ যদি তাদের হাতে স্বাধীন হয় তবে তা মানুষের দেশ থাকবে না, পশুরই দেশ হবে। এমন ঘটতে দিও না সীমা—তোমার মধ্যে যে মাতৃস্নেহ এখনও বেঁচে আছে তার দোহাই: এমনি ক'রে দেশকে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রো না।"

সীমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে বুকে চেপে ধ'রে তার ক্ষুদ্র প্রাণস্পন্দ নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। এক মুহূর্ত্তে এই সব স্বাধীনতার প্রয়াস, বিজাতীয় শৃঙ্খল, দেশের অধিকার ইত্যাদি মহৎ ব্যাপার তার কাছে বীভৎস হয়ে দেখা দিল। কিন্তু হায় ফেরবার তখন তার পথ নাই। চারিদিকে পরের এবং নিজের, শত্রুর এবং মিত্রের গ'ড়ে তোলা বেড়াজালে তাকে ঘিরেছে। মুক্তিপথপ্রয়াসীর মুক্তিঅবকাশবিহীন সেই জতুগৃহের মধ্যে যে আগুন সে জেলেছে তার থেকে পালাবার পথ কোথায়! এবং অন্ত

সকলকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে একাকী পলায়নের মত ভীরু নীচতার চিন্তাও তার পক্ষে অসম্ভব।

রঙ্গলাল দাঁড়িয়ে সীমার ভাবটুকু লক্ষ্য ক'রে নিখিলের কথায় একেবারে জ্বলে উঠল, বললে, "বাঃ বেশ, থিয়েটারী চলছে মন্দ নয়! নিখিলবাবু এ অনধিকার চর্চ্চায় ত আপনার কোন প্রয়োজন নেই। বেশ খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আরামে আছেন—বুদ্ধি ক'রে প্রাণ নিয়ে সরে পড়েছেন সেই ত বেশ। আবার মিশনরীগিরি ফলাবার চেষ্টা নাই করলেন। নারী নিয়ে আপনার কারবার—নারীভবনে যান্ মিশনরীর কাজটা লাগবে ভাল,"—ব'লে পাশের বালকটির দিকে চেয়ে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে। বালকটি লজ্জায় মুখ নীচ ক'রে রইল।

সীমা আর সহ্য করতে পারল না। এগিয়ে এসে বললে, "রঙ্গলাল তোমার ইতরামি করবার জায়গা এ নয়। যাও, এখনই এখান থেকে, চলে যাও—নইলে সীমাকে তুমি জান; আমি এখনই গিয়ে পুলিসে ধরা দেব—তোমাকেও বাদ দেব না।"

রঙ্গলাল এতটা আশা করে নি। ধরা দিয়ে কুকুরের মত মারা পড়বার মত মনোবৃত্তি তার নয়। প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে বিপুল অভিযান ক'রে দেশের ও দুনিয়ার লোককে চমকে দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সামনাসামনি লড়াই ক'রে মারা যাবার বেপরোয়া কল্পনায় সে তুড়ুক-সওয়ার।

ক্রোধে, বিরক্তিতে, হিংসায় মুখ তার বিকৃত হ'য়ে এ'ল। তবু আপাততঃ নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে একটা শপথ-বাক্য উচ্চারণ ক'রে সে সরে গেল।

সীমা এগিয়ে এসে বালকটির কোলে শিশুকে দিয়ে বললে, "নিখিলবাবু একে ফিরিয়ে দিতে যাওয়ায় অনর্থক বিপদ আছে তা'ত আপনি বোঝেন। আপনি কি দয়া ক'রে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করবেন?"

নিখিল অত্যন্ত খুশীভরা আগ্রহের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয়, আমাকে যে-রকম বল তাই করতে প্রস্তুত আছি। আমি একে নিয়ে কি ওর বাবার কাছে—"

সীমা একটু হেসে বাধা দিয়ে বললে, "না না তেমন কিছু করবেন না। তাতে আপনার ত মঙ্গল নাই-ই—আমরাও এড়িয়ে না যেতে পারি। আমরা টাকা দিচ্ছি। আপনি দয়া ক'রে একে ওর বাবার নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে আপনার হাসপাতালে শিশু-বিভাগে একটা কেবিনে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে তাদের খবর দিন এই ব'লে যে তারা শিশুকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আর কোন খোঁজ করছে না কেন। তাতে আপনার চিকিৎসায় ওরও বাঁচবার উপায় হবে. কি বলেন?"

সীমার ব্যবস্থায় তার প্রতি নিখিলের প্রশংসমান চিত্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল; বললে, "সত্যি তোমার তুলনা নেই।" এই প্রশংসার লজ্জায় এবং একটা অপরিচিত তৃপ্তিতে সীমার মনটা ভ'রে গেল।

ঘটনাটি মাসখানেক পূর্ব্বের। ইতিমধ্যে রঙ্গলালের ব্যবহারে অবশ্য কোন বিচ্যুতি ঘটে নি। সামরিক নিয়মে রঙ্গলাল নিজের কাজ ক'রে যায়। সীমার সঙ্গেও ব্যবহারে তার আর কোন কঠিন ঋজুতা নাই। সীমা ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। শুধু কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্ব্বের সন্ধ্যাবেলা সেই বালকটি হঠাৎ এসে একটা প্রণাম ক'রে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি একটি ছোট চিঠি তার হাতে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ছেলেটি সীমাকে সত্যিই ভক্তি করত। সেই কাগজখণ্ডে 'প্রধানে'র সম্বন্ধে সাবধান হ'তে সনির্ব্বন্ধ অনুনয় ছিল। সেইটুকু প'ড়ে সীমার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। সে উঠে গিয়ে কাগজটার অগ্নিসংকার করলে।

*   *   *

নিখিলের দুশ্চিন্তার আরও একটা গুরুতর কারণ ছিল। শিকারের গন্ধ পেলে হাউণ্ডের মুখের ভাবখানা যেমন হয় ভুলু দত্তের মুখের ভাবখানা প্রায় তারই অনুরূপ হ'য়ে উঠেছে আজ ক'দিন। আগেকার মত বেশী কথা আর সে কয় না—মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, যেন কোন বিশেষ সমস্যার এক-একটা সমাধান তার মনে মনে হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবদের আর তেমন হৃদ্যতার সঙ্গে ব্যাপকভাবে আদর-আপ্যায়ন করে না। লোক এলেই তাড়াতাড়ি বিদায় ক'রে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়। আবার অধিকাংশ সময় তাকে বাড়ীতেও পাওয়া যায় না।

এক নিখিলের সঙ্গে ব্যবহারে ভুলু দত্তের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। টেররিজমের প্রতি নিখিলের নিদারুণ বিরুদ্ধতা এবং অসহিষ্ণুতা ক্রমে ভুলু দত্তের মনেও একটা

বিশ্বাস এমন কি তার 'উত্তেজনার' প্রতি একটু কৌতুকের ভাবই এনে দিয়েছিল। বস্তুতঃ টেররিজম সম্বন্ধে ভুলু দত্তের মনে নিখিলের মত বিশেষ কোন উত্তেজনাই ছিল না, থাকার কথাও নয়। টেররিষ্টদের কার্য্যকলাপ গতিবিধি নিয়েই ভুলু দত্তের সমস্ত মনের এবং ক্ষমতার প্রেরণা নিযুক্ত ছিল। টেররিজমের নৈতিক দিক সম্বন্ধে তার কোন মাথাব্যথা ছিল না; সুতরাং দিনের পর দিন নিখিলের অসহিষ্ণু উত্তেজনার সূত্রে সে নিজের চেয়েও নিখিলকে টেররিজমের ঘোরতর শত্রু ব'লে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল। নিখিল যে ক'টি লোক তার দলের সকলেরই এ বিশ্বাস ছিল; এবং বিশ্বাসঘাতকতা তার দ্বারা যে অসম্ভব পুলিস হ'য়েও তার পূর্ব্ব জীবনের এ ধারণা মন থেকে কখনও ঘোচে নি। সুতরাং নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে অল্পস্বল্প গর্ব্ব করা নিখিলের কাছে বিপজ্জনক ব'লে তার মনে হ'ত না। শুধু মাঝে মাঝে অভ্যাসমত বলত, 'দেখো ভাই কোথাও গল্প ক'রে আমার হাতে হাতকড়ি দিয়ে অন্নটি মেরো না।' নিখিল যে অলস গল্প ক'রে বেড়াবে না এ বিশ্বাস অবশ্য তার মনে দৃঢ় ছিল। ক্রমশঃ

ভোরাই

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাবছিলাম ব'সে ব'সে একটি গল্প লিখি। বর্ণনার অতি-রঞ্জন থাকবে না তাতে, একটি কোন উপেক্ষিত দরিদ্র জীবনের ইতিহাস, সব সময়ে যা চোখে পড়ে অথচ মন যা সব সময়ে গ্রহণ করে না এমনি কোন একটি ছোট করুণ কাহিনী। বর্ষার দিনে গুনগুন্ ক'রে গান ক'রে আর সংসারের অসংখ্য কাজ ক'রে যায় এমন একটি মেয়ে—চোখের কোণে একটি অবরুদ্ধ বিষাদের রেখা—মন তা'র কোথায় পাড়ি দেয় অজানা লোকে। বেশ নিপুণভাবে ব'সে ব'সে একটির পর একটি অধ্যায়ে সেই মেয়েটির ইতিবৃত্ত রচনা ক'রে যাই এমনি ইচ্ছা ছিল।

সব সময়ে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করা কঠিন। বিশেষ ক'রে গল্প রচনা করবার অবসর পাওয়াই শক্ত। মনকে প্রস্তুত করতে হয়, যা দেখেছি এবং যা দেখি নি এই উভয়কে মিলিয়ে একটি বিচিত্র রহস্য-লোক মনের মধ্যে গ'ড়ে তুলতে হয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সে-অবসর কোথায়? কোথায় কোন্ উপেক্ষিত জীবনের উপর স্রষ্টার দৃষ্টির আলো পড়বে, তার জন্যে সে জীবন অপেক্ষা ক'রে ব'সে নেই। তাছাড়া জীবনের সমগ্রতাকে কে কবে হাতের মুঠোর মধ্যে অনায়াসলভ্য ক'রে পেয়েছে? অথচ সেই সমগ্রতাকে নইলে চলবে না, সমস্ত খণ্ড খণ্ড রূপ একটি অপরিচ্ছিন্নতায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে—কুশলী শিল্পীর ত সেইখানেই সার্থকতা।

ব'সে ব'সে এমনি ভাবছিলাম বর্ষার দিনে। ভিজে নারকেল গাছের গা বেয়ে বৃষ্টির ধারা মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। পথে লোকচলাচল নেই—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঁদারায় জল তুলতে আসে নি কেউ। অন্ধকার ছোট্ট ঘরটিতে একরাশ বই ছড়ান—তারই মধ্যে ব'সে ব'সে ভাবছি। হঠাৎ বাইরে ভারি একটা গোলমাল।

'এখানে হবে না বাপু, যাও যাও অন্য কোথাও দেখ গিয়ে। ও দিদি, দেখসে একটা বুড়ো লোক কি রকম নাচছে আর গান করছে!'

আমার অন্ধকার ঘরের নেপথ্যে কি হচ্ছে জানবার ভারি একটি কৌতূহল হ'ল। কান পেতে আছি কি হয় জানবার জন্যে অথচ উঠে দেখতেও ইচ্ছে করছে না।

'ওগো নাচ দেখে যাও গো, নাচ দেখে যাও—যেন একটি সং—আ মরণ!'

'ছিঃ, বলতে নেই—ও বাউল।'

বই-খাতা ছেড়ে উঠেছি। মেয়েদের সব কলকণ্ঠ চাপিয়ে একতারায় একটা তীব্র দীপ্ত ঝঙ্কার উঠল—

গুরু গৌরাঙ্গ বল মনপাখী
ও তুই বসে বসে ভাবছ কি?
গুরু গৌরাঙ্গ বল মনপাখী।

মাথায় একটি গেরুয়া চাদর জড়ান—আলখাল্লা-পরা রুক্ষ বৈরাগীর মূর্ত্তি। তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে বললাম—গান কর, শুনি।

কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে বুঝলাম তার বাড়ী পূর্ব্ব-বঙ্গে। অতি সঙ্কোচের সঙ্গে সে তার একতারাটি নিয়ে বসল আর শিরা-বার-করা হাতে পিড়িং পিড়িং ক'রে একতারা বাজিয়ে গান গাইতে লাগল। বর্ষার দিনে তার সেই উদাস-করা সুর বড় ভাল লাগল।

১ তুই বইসে বইসে ভাবছ কি
গুরু গৌরাঙ্গ বল মনপাখী
গুরুরূপে গৌরাঙ্গ এসে
মন্ত্র দিল কর্ণমূলে পেলাম না দিশে
ও ক্ষ্যাপা পেলাম না দিশে
২ তুই যারে বলিস আপন আপন
চেয়েই দেখ সব ফাঁকি—
গুরু গৌরাঙ্গ বল মনপাখী !

অনেক ক্ষণ ধ'রে একই গান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইলে। তাকে যত্ন ক'রে খেতে দেওয়া হ'ল—ভারি সঙ্কোচ তার। বলে, 'কোথাও খাই নে বাবু, আপনারা যত্ন করলেন, তাই পেলাম।' তার পর তার কাছ থেকে অনেকগুলি গান খাতায় লিখে নিলাম। ভাল গান সংগ্রহের বাতিক ছিল। খাতায় লিখে নিয়েই তৃপ্তি হ'ল না। সে চ'লে যাওয়ার পর ঠিক তারই সুর নকল ক'রে ক'রে আপন মনে গাইতে সুরু করলাম। আমার অন্ধকার নির্জ্জন ঘর পূর্ব্ব-বঙ্গের সেই বাউলের সুরে মুখর হয়ে উঠল। প্রায়ই মনের মধ্যে তারই কথা ওঠে। সেই বাউল, তার একতারা, তার সেই উদাস-করা সুর, যে-সুর ক্ষণকালের জন্যও সংসারের কাঁদন ভুলিয়ে দেয়! ভাবতে থাকি তার জীবনের মাধুরী কোথায়?

বন্ধু মাধব—সে বেশী পড়াশুনা করে নি; চাষ-আবাদ নিয়ে থাকে। গাঁয়ের লোকের প্রয়োজন হ'লে সে করতে পারে না এমন কিছু নেই। সে একদিন হঠাৎ এসে বললে, 'কি হচ্ছে এ-সব নিয়ে? চল বেড়িয়ে আসি।'

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, বাউলের সুরের নিহিতার্থ। পুঁথি প'ড়ে প'ড়ে বাউল-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান অর্জ্জন করেছি, সে সব তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে শুধু হাসে আর বলে 'আমিও বাউল।'

এমনি ক'রে কিছুদিন আমাদের বাউলের নেশায় চেপে ধরল। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সন্ধ্যায় যখন ভিড় ক'রে বসত, বাউলের গান চলত তাদের সেই আসরে। গান শেষ হ'লে তারা বলত—'দাদাঠাকুর এ গান বেশ শিখে নিয়েছেন।'

মনে মনে গোপন ইচ্ছা ছিল, এমনি ক'রে সব লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করি—ছড়া, পাঁচালি, বাউল এবং কর্ত্তা-ভজার গান। সংগ্রহ ক'রে ক'রে পাদটীকা দিয়ে দিয়ে এক পুঁথি রচনা করি—এমন দুরাশাও ছিল। বন্ধু মাধব তা হ'তে দিল না। সে তার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য আর নির্ম্মল হাসি নিয়ে আমার পড়ুয়া মনকে গাঁয়ের নানা কাজের মধ্যে ছুটি দিত। কোথায় পাড়ায় কাদের মধ্যে বেধেছে ঝগড়া, মেটাতে হবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, লোক্যাল বোর্ডে দরখাস্ত ক'রে রাস্তাঘাট মেরামত করাতে হবে, গাঁয়ের কোন্ দিকের কোন জঙ্গলটি পরিষ্কার করলে লোকজনের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে—ডিস্‌পেন্সারি নেই—হোমিওপ্যাথি ওষুধ আনিয়ে হোমিওপ্যাথি বই আনিয়ে সেবাকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে, কোথায় বাঁশের বন, কাদের বাড়ীর চারি পাশে মশা এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে, তার বিহিত করতে হবে জমিদারকে জানিয়ে—ক্রমশঃ এই সব আমাদের নিত্য আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

আর, সন্ধ্যার নির্জ্জন অবসরে ঠাকুর-ঘরের নীচে দুর্ব্বাদলের উপরে ব'সে কীর্ত্তন আর বাউলের গান—যেন নেশার মত আমাদের পেয়ে বসল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন যখন এমনি জড়িয়ে পড়ছে কীর্ত্তনের নেশায়, তখন একদিন আমাদের দীনবন্ধু দাদাঠাকুর আবির্ভূত হলেন আমাদের সামনে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে। মূর্ত্তি তাঁর কঠোর নয়, স্নিগ্ধ স্মিত-হাস্যও মুখে ছিল না। গ্রামের সিধু মুচীকে দিয়ে তৈরি করান এক জোড়া চটি পায়ে, অনাবৃত দেহে আমাদের সামনে এলেন, বললেন, 'কি হচ্ছে ছোকরারা? জঙ্গল সাফ করছ বুঝি?' বললাম, 'হ্যাঁ, কি আর করি? ছুটির সময়টা এইভাবে কাটাচ্ছি।'

'তা আমার ওখানে গেলেও ত পার! বই আনিয়েছি বিস্তর। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, চণ্ডী, গীতা—এ-সব পড়তে পার ত ব'সে ব'সে।'

বললাম, 'পড়বার কিছু পেলেই পড়ি—তা যাব এক দিন আপনার ওখানে।'

হাত নেড়ে বললেন, 'যেও। আর এ-সব জঙ্গল-টঙ্গল কাটা বাদ দাও। এসব ধুয়ো আজকাল উঠেছে—আমরা কিন্তু চিরকাল জঙ্গলেই কাটালাম।'

হেসে বললাম, 'জঙ্গল ত বরাবরই ছিল—না হয় এখনও থাকবে। তবে ব'সে ত থাকেন দাদামশায়, আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন না, তা'হলে আমরা বড় খুশী হ'ব।'

দীনবন্ধু ঠাকুর একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'তা, তা তোমরা যেও আমার ওখানে, ভেবে দেখব।' এই ব'লে তিনি চটি পায়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় মাধব আর আমি—আমরা বেরিয়েছি কুড়ুল হাতে নিয়ে—কেউ না আসে নিজেরাই জঙ্গল পরিষ্কার করব এই উদ্দেশ্য। দেখি দাদামশায় তাঁর চটি বাদ দিয়ে হাতে একখানি কাস্তে নিয়ে আমাদের পিছন পিছন

আসছেন। 'বলি ওহে ছোক্‌রারা, চল আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে জঙ্গল কাটতে।'

আমরা বিস্মিত হলাম। বৃদ্ধ যে হঠাৎ আমাদের সঙ্গী হবেন—এমন আশা করি নি।

তিনি বললেন, 'এই দেখ কোমরে গামছা বেঁধে এসেছি, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরেছি—ঠিক তোমাদের মত জঙ্গল সাফ করতে যদি না পারি—ত নাম দীনবন্ধু নয়!'

এই ব'লে তিনি আর তিলমাত্র অপেক্ষা না ক'রে কাস্তে দিয়ে পথের দুই পাশের আসসেওড়ার জঙ্গল সাফ করতে লাগলেন।

তার উৎসাহে আমাদের তরুণ উৎসাহ দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠল। আমরা কুড়ুল নিয়ে সিধু মুচীর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের জঙ্গল কাটতে লাগলাম। ছোট ছোট গাছ কাটা হ'য়ে গেলে একটা বড় নিমগাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ল। মাধব বললে, 'থাক্ ওগাছটা আর কেটে দরকার নেই।'

বললাম, 'জঙ্গল কাটতে যখন নেমেছি, তখন গাঁয়ের যেখানে যেখানে জঙ্গল দেখবে, সব কেটে পরিষ্কার ক'রে ফেলবে।'

মাধব বললে, 'তবে এস দেখা যাক্—' এই ব'লে সে গাছের গোড়ায় ব'সে কুড়ুল চালাতে লাগল। আমিও তার সঙ্গে যোগ দিলাম। দেখলাম, মাধবের অভ্যস্ত হাত, তার কুড়ুলের আঘাত নির্ভুল, আমার হাত থেকে কুড়ুল কেবলই খুলে খুলে স'রে স'রে যায়।

মাধব একটু হেসে বললে, 'তুমি পারবে না—ঐদিকে স'রে ব'স।'

আমি কুড়ুলটি এক পাশে ফেলে রেখে আসসেওড়ার জঙ্গলের দিকে স'রে এসে বসলাম। চোখের সামনে দেখছি গাছের বাকল কেটে চৌচির হয়ে গেল, কাঠের টুকরোগুলো ছিটকে ছিটকে দূরে চ'লে যাচ্ছে—গাছটার অনিবার্য মৃত্যু মাধবের হাতে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

সিধু মুচীর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের নিবিড় জঙ্গল প্রায় পরিষ্কার হয়ে এল। এক-একটা বড় গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে এতখানি ফাঁকা হয়ে যায় যে, তাই দেখে মন আমার বড় খুশী হয়ে ওঠে। মাধবকে ডেকে বললাম, 'মাধব, আর কত দূর?'

মাধব বললে, 'এই আর একটুখানি বাকী আছে'—বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কুড়ুলের শেষ ঘা পড়ল এবং মড়্‌মড়্ করতে করতে গাছটি তার বিপুল দেহ নিয়ে সিধু মুচীর বাড়ীর চালের উপর পড়ল। খড়ের ছাউনি সমেত খানিকটা চাল এবং দেওয়ালের খানিকটা ধ্বসে গেল।

দাদামশায় কাস্তে হাতে এসে হাজির, বললেন, 'এ হে, ছোকরারা করলে কি? করলে কি?'

মাধব মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। গরিব সিধু মুচীর আকাশের হাওয়া খাওয়ার তত দরকার ছিল না, যত দরকার ছিল তার ঘরের চালের এবং দেওয়ালের। সে বেচারা সমস্ত দিন খেটে-খুটে এসে দাওয়ায় শুয়েছিল, হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল—আমাদের দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে রইল। বাবুরা জঙ্গল কাটতে নেমেছেন, এ সে জানত, শেষকালে যে তারই খড়ের চালের উপর বাবুদের কাটা নিমগাছ সশব্দে এসে পড়বে এ ধারণা তার নিশ্চয়ই ছিল না। তাই সে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দাদামশায় তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'এই গাছটি তুই নিস্' ব'লে আশ্বস্ত ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর আসসেওড়ার কীর্তি দেখাতে দেখাতে পথ চলতে লাগলেন।

'একটু সাবধান হয়ে জঙ্গল-টঙ্গল কাটতে হয় হে ছোকরারা—অন্ততঃ গাছটি কাটবার আগে আমাকে একটু ডাকলে পারতে।'

আমরা নিঃশব্দে পথ চলতে লাগলাম। সিধু মুচীর ঘরের দুর্দশায় আমাদের মনে আর উৎসাহ ছিল না। তিনি ব'লে চললেন—গ্রামের পুরনো দিনের কাহিনী। গ্রাম ছিল না আগে, ছিল নিবিড় জঙ্গল, বেতবন, মজাদীঘি। এক দল ব্রাহ্মণ এসে বাস করতে লাগলেন এই গ্রামে—জঙ্গল কাটালেন তাঁরা। অনেক পুরাতন কীর্তি, অনেক আনন্দ, প্রাচুর্য এবং সমারোহের ব্যাপার বললেন, 'আমরা সে-সব দেখি নি। আমরা এই গ্রামই দেখছি। এই দুর্দশা, ম্যালেরিয়া—এ সব এত ছিল না যেমন তোমরা দেখছ।'

মাধব বললে, 'দাদা, একটু চেষ্টা করা যায় না গ্রামটিকে আবার ভাল করবার?' দাদামশায় বললেন, 'তুমি একা কি করতে পার? অনেক হাঙ্গামার প্রয়োজন। অনেক দরখাস্ত করা, অনেক টাকাকড়ি খরচের দরকার।' আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর তুমি কিশোর, তুমি ত বেশী দিন এখানে থাকবে না। তবে দেখ, যত দিন পার নিজেরা খেটে-খুটে। পয়সাকড়ি কেউ বড়-একটা খরচ করতে চাইবে না।'

আমাদের উৎসাহ একটু কমে এল। দাদামশায়ের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। পল্লীর দুঃখদৈন্য-ভরা শ্যামলশ্রীকে আমরা কেটে ক্ষতবিক্ষত করছি—এই ভেবে মনটি একটু ব্যথিত হ'ল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবকে একদিন ডেকে বললাম, 'ওহে আমার ত চ'লে যাওয়ার সময় এল। তুমি দেখ যদি গ্রামের কোনও উপকার করতে পার।'

মাধব বললে, 'তুমি চ'লে গেলে আমি আর কি চেষ্টাই

বা করব ? একা একা তোমার সেই বাউলের গান গেয়ে বেড়াতে হবে আর কি !'

মনটা একটু খারাপ হ'ল। ইচ্ছা ছিল সমস্ত উৎসাহ আনন্দ এবং কাজের শেষে একটি গল্প লিখবার। সে সুযোগ আর পেলুম না। কল্‌কাতা গিয়ে কি সম্বল নিয়েই বা গল্প লিখব ? নির্জ্জন গ্রাম এসে মনের মধ্যে বারে বারে দেখা দেবে। শুধু গ্রাম আর গাছপালা নিয়ে কি গল্পই বা লিখব ? এমন একটি মেয়ে যে সমস্ত দিন সংসারের কাজ করে আর গান গায়, সে মেয়েটিকে পাই কোথায় ? বাউলের গানের করুণ সুর এসে বারে বারে মনের চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে লাগল। আমার সেই বই-ছড়ানো অন্ধকার ঘর আমাকে বারে বারে ডাকতে লাগল। ছুটিতে বাড়ী এসে গ্রামের কাজ-টাজ করা, আবার ছুটি শেষ হয়ে গেলে নিজের কর্ম্মস্থানে ফিরে যাওয়া—এ রকম ত কতবার হয়েছে। কিন্তু এবারে মনটা যেন কিছু বেশী মাত্রায় উদাসীন হয়ে আছে।

মাধবকে ডেকে বললাম, 'মাধব, সবই ত হ'ল, কিন্তু একটা গল্প লিখবার ইচ্ছা ছিল, সেটা বোধ হয় এ যাত্রা আর হ'ল না।'

মাধব তার ঝক্‌ঝকে সাদা দু-পাটি দাঁত বের ক'রে হেসে বললে, 'গল্প—গল্প আবার কি রে ? গল্প লিখিস্ না কি তুই ?'

'মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছে যায় রে ! করুণ কোনও কাহিনী লিখতে আমার বড় ইচ্ছে করে।' মাধব একটুখানি মাথা চুলকে বললে, 'বই-টই পড়ি বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু আমার ভাল লাগে না কেন বল্‌তে পারিস ?'

মাধবের কথায় তত কান দিই নি। নিজের মনে গল্পের ভাবনা আর আমার মুখর অন্ধকার ঘরের ভাবনা নিয়েই ছিলাম। মাধব আমাকে অন্যমনস্ক দেখে বল্‌লে, 'কি ভাবছিস অত ? আমার কথা কি শুনতে পাস্ নি ?'

বললাম, 'গল্পের কথাই ভাব্‌ছি। বই-টই পড়ার কথা বলছিলি ? বইয়ের লেখার সঙ্গে সব সময়ে সাধারণ জীবন খাপ খায় না, তাই বোধ হয় তোর বই পড়তে ভাল লাগে না !'

মাধব বললে, 'কি জানি ? অনেক মোটা-মোটা নভেল পড়েছি, কিন্তু কেন জানি নে, সে-সব প'ড়ে আমি তেমন আনন্দ পাই নে।'

* * *

মাধবের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলাম। একখানা বারোয়ারী পূজার ঘর তুলতে হবে—মাধবের সঙ্গে সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলাম। চাঁদা কারা কারা দেবে বা না-দেবে তাই নিয়ে আলোচনা।

রাস্তার পাশে মাদুর বিছিয়ে গ্রামের লোকেরা ব'সে ব'সে গল্প করছে। অগাধ আলস্য—তামাক—চাষ-আবাদের কথাবার্ত্তা। তারা বললে, 'দাদাঠাকুররা—যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?'

মাধব বললে, 'এই তোরা চাঁদা দিবি ? বারোয়ারী ঘর তুলছি আমরা।' চাঁদা !— তারা যেন আকাশ থেকে পড়ল। নিতান্ত জোর-জবরদস্তি ক'রে চাঁদা আদায় করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মাধব বললে, 'আমি ফন্দ ক'রে ফেলছি—চাঁদা দিতে হবেই।'

'আচ্ছা, আগে ফন্দ ত তৈরি হোক, তার পর দেখা যাবে।'

তারা যেন এই রকম চিরকাল। স্থির হয়ে ব'সে আছে—রৌদ্র বৃষ্টি—সর্ব্ব অবস্থাতেই একটি অসীম উদাসীনতা। জোর কর, চেঁচাও—কথা কইবে। নইলে, তামাক টানবে ব'সে ব'সে অনন্ত কাল ধ'রে।

মাধবের সঙ্গে ব'সে ব'সে একটি ফন্দ ক'রে ফেলা গেল। দাদামশায়ের নামটি আমরা সর্ব্বাগ্রে দিলাম। দাদামশায় তার দাওয়ায় ব'সে জমাখরচের খাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, 'আমি কিন্তু বেশী দিতে পারছি নে।' তার পর দাদা-মশায়ের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ নিতে লাগলাম। তিনি তাঁর পুরনো চশমাজোড়া মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, 'খুব সাবধান ভায়ারা—বেশী চেঁচামেচি ক'রো না। যে যা দেবে তাই হাসিমুখে নিতে হয়।'

* * *

মাধব চ'লে গেলে একা একা ফিরছি গ্রামের পথ দিয়ে। ঘন বাঁশের বন মাথার উপর নত হয়ে পড়েছে। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু বন—ঘন হয়ে ক্রমশঃ অনেক দূরে জমাট অন্ধকারে মিশে গেছে। সেই ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে একা একা ফিরছি।

পিছন থেকে কে ডাকল, 'বাবুজী ?'

পিছনে চাইলাম। চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে ?'

'চিনতে পারবেন না বাবু আমাকে। আপনাকে অনেক ছোট দেখেছি।'

'কি নাম ?'

'আমার নাম সহায়রাম—কথকতা করি, গান গেয়ে বেড়াই। এই হল আমার পেশা।'

'গান গেয়ে বেড়াও ? কি গান ?'—গানের কথা শুনলেই বিহ্বল হয়ে পড়ি।

'এই ধরুন গিয়ে রামায়ণের গান, বেহুলার গান—এই সব।'

'তা বেশ,বেশ !'

লোকটির মাথার চুল বড় বড়। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। গলায় বৈষ্ণবদের মত মালা।

'বাবুজী, এদিকে যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?'

'এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তা আমাদের এ দেশ ঘোরবারই বটে !'

হেসে বললাম, 'থাকি নে তাই। নইলে এ দেশ শুধু তোমাদের নয়, আমারও।' একটু থেমে তার দিকে চেয়ে বললাম, 'আচ্ছা গান গাইতে পার ?'

লোকটি অবাক হয়ে গেল। গান ত সে গাইতে পারেই। আমার প্রশ্নটা অনেকটা অন্যমনস্কের মত হয়ে গেল। বললে, 'গান শুনবেন বাবু ?'

'বড় ইচ্ছে আমার গান শোনবার। তবে, বোধ হয় এ যাত্রা আর হয় না। ফিরে এসে দেখা যাবে।'

তারা ত এমনি গান করবে না। আসরে যেমন সাধারণতঃ গান করে, সেই ভাবে তারা গাইবে—তাই ও কথা বললাম।

লোকটিকে বড় ভাল লাগল। সে যখন হাসে, এত সরল তাকে মনে হয় !

* * *

বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ীতে কেউ নেই। অন্ধকার নিৰ্জ্জন ঘরে ব'সে বাইরে চেয়ে রইলাম। অনেক কাজ করবার থাকে। শিক্ষিত মন নিয়ে মনে হয়, এ যেন ঠিক হচ্ছে না। ঐ ডোবাটাকে বুজিয়ে দেওয়া উচিত। দক্ষিণ দিকের বাঁশঝাড় আরও পাতলা হওয়া দরকার। রাস্তায় এত কাদা আর জল জমে—এত সাপ—এত ম্যালেরিয়া—ডোবার উপর হলদে পানাগুলো দেখলে কেমন যেন একটা হৃৎকম্প আসে। কাকে বলা যাবে এ কথা ? মানুষ ম'রে যায়—শুধু এ-সব দিকে কারও দৃষ্টি পড়ে না।

ব'সে ব'সে বইয়ের পাতা উলটাতে লাগলাম। আজই যাত্রা করব শহরের দিকে। অসমাপ্ত কাজ অনেক র'য়ে গেল।

* * *

প্রত্যেক বার গ্রাম ছেড়ে যখন কলকাতা গিয়েছি, মন আমার ঘুরে ঘুরে গ্রামের পথ বেয়ে আবার গ্রামে ফিরে গেছে। কত দুঃখ, কত দারিদ্র্য, তবু গ্রামকে ভুলে থাকা যায় না। সমস্ত কাজ-কৰ্ম্মের শেষে মাঠের মধ্যে আমি আর মাধব একটা মোটা আমকাঠের গুঁড়িতে এসে বসতাম। সেই দৃশ্যটি মনে পড়ল এবার গ্রাম থেকে চ'লে আসবার আগে। মাধবকে বলতাম, 'মাধব, এত দুঃখ গ্রামের, অমুক লোকটা খেতে পাচ্ছে না, অমুক লোকটার বাড়ী-ঘর নেই—এ সব ত নিত্য দেখছি—তবু এই গ্রাম এত ভাল লাগে কেন বলতে পারিস ?'

মাধব শুধু হাসত, আমার মনের গোলকধাঁধায় পড়ত, শুনে সে ভাল উত্তর দিতে পারত না।

সন্ধ্যা নেমে আসত। সমস্ত গ্রামের গোয়ালঘরের ধোঁয়া জমাট বেঁধে সূক্ষ্ম কুয়াশার আবরণের মত ঘন বনের উপরে ভাসত। কোন অভিনবত্ব নেই—তবু এ মনের মধ্যে একখানি ছবির মত মুদ্রিত হয়ে থাকত।

জানতাম কিছু হবে না। পোড়ো ভিটে আর নিবিড় জঙ্গলে গ্রাম ছেয়ে যাবে—দিনের বেলায় শেয়াল ডাকতে থাকবে 'হুক্কা হুয়া'। যে কয়েকটা লোক আছে, তারা দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পালিয়ে যাবে গ্রাম ছেড়ে—তবু আমার মন কেমন করত—অসহায়ের অরণ্যে রোদনের মত।

* * *

ভাল দেখে একটি মেস ঠিক ক'রে সেইখানে থাকব এই ইচ্ছা ছিল। বন্ধু চরণদাস বললেন, 'আমাদের মেসে এস।'

বেশী হাঙ্গামা-ঝঞ্ঝাট কোন কালে পোয়াই নি; বিশেষ ক'রে মেস খুঁজে নেওয়ার মত বাবুয়ানি আর নেই। চরণদাসের মেসে এসে ওঠা গেল। নীচের ঘরগুলো অন্ধকার। চাকর-বাকররা থাকে। খাবার ঘরে দিনের বেলায় হারিকেন জ্বেলে খেতে হয়। উপরে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি নড়-বড় ক'রে নড়ে। তেতলার উপরে একখানি ঘর—পূৰ্ব্ব-দক্ষিণ খোলা—সেই ঘরে এসে ওঠা গেল। চার জন ভদ্রলোকের সীট রয়েছে। আমি তারই পাশে সসঙ্কোচে নিজের জিনিষপত্র রাখলাম।

এত একা-একা কোনও কালে মনে হয় নি। কয়েকটা ভাঙা ফুলের টবে দুটি শীর্ণকায় বেলফুলের গাছ বাইরের ছাদের উপরে। বিকেলবেলায় দেখি কালো-কটি এক ভদ্রলোক হাত-পা-মাথা নেড়ে প্রখর ব্যায়াম আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন।

চরণদাস এসে বললেন, 'এই আমাদের মেস কিশোর বাবু।'

কিশোরবাবু অর্থাৎ আমি তখন হতভম্ব হয়ে ব'সে আছি। এক বিপুলকায় ভদ্রলোক প্রলয়কালীন মেঘের মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বিছানার পাশে দুটি প্রকাণ্ড মুগুর, চৌকির নীচে ছোলা ভিজিয়ে খাবার সরঞ্জাম। তিনি গুরুগর্জ্জনে আমাকে বললেন, 'আপনি নূতন এসেছেন বুঝি !'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চুপ ক'রে ব'সে রয়েছেন যে! এখানে চাকরদের ডাকলে পাওয়া যায় না। নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে নিন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে করছি।'

চরণদাস ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'সে কি কথা ? চাকর

ডাকলে পাওয়া যায় না—একি একটা কথা হ'ল ?' চাকর এল এবং এক পাশে থাকবার একটা ব্যবস্থাও হ'ল।

খেতে ব'সে চরণদাস হেসে বললেন, 'গরিবদের মেস এটি কিশোরবাবু, চার্জ্জও খুব কম—অসুবিধে হ'লে বলবেন।'

একপাশে সেই ক্ষীণ-কটি ভদ্রলোক ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছেন দেখলাম। তারই মধ্যে কোনও রকমে আহার সমাপ্ত ক'রে উপরে উঠে আসা গেল। আহারাদি শেষ হওয়ার পর একটা প্রচণ্ড তর্ক-সভা বসে। সেদিন আর তর্কে যোগ দেওয়া হ'ল না। কয়েক মাস ধ'রে গ্রামে যে কাজ ক'রে এসেছি, তারই খণ্ড-চিত্রগুলি ছায়া-ছবির মত নিদ্রা-জড়িত চোখের উপরে ভাসতে লাগল।

* * *

কয়েক দিন পরে চরণদাস একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম কিশোরবাবু, কেমন আছেন এ মেসে ?' বললাম, 'তবু ভাল এত দিন পরে খোঁজ নিচ্ছেন।'

'বড় ব্যস্ত থাকি মশায়, যা দিনকাল পড়েছে—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তা দেখুন, আমাদের এ মেসে খরচপত্র খুবই কম। টিউশনী দুএক-আধটা করতে পারেন ইচ্ছে করলে। পড়া-শুনাও করতে পারেন—ইচ্ছা করলে চাকুরীর চেষ্টাও করতে পারেন—যেমন খুশী কি বলেন ?'

চেয়ে দেখি তিনি কথা কইছেন এদিকে আর এক দিকে জমা-খরচ লিখে যাচ্ছেন—কখনও বা গীতার ভাষ্য মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন। বাইরে দেখলে মনে হয় নিরাবরণ নিস্পৃহ ভদ্রলোকটি।

একটু হাসলাম। দেখি তার বিরাম নেই—মেসটি তিনিই রেখেছেন চেষ্টাচরিত্র ক'রে।

মাঝে মাঝে মেসের দোতলায় নামতাম। দেখি একটি ঘরে এক দল ভদ্রলোক ব'সে নানা রকমের আলোচনা করছেন। সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজ কত কি যে আলোচনা তার আর অন্ত নেই। কাগজপত্র ছড়িয়ে এক ভদ্রলোক ক্রমাগত খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ ক'রে প্রকাণ্ড একখানি খাতায় আটা দিয়ে আঁটছেন। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন।'

পাশের চৌকিতে এক দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি ভদ্রলোক ক্রমাগত বাণভট্টের কাদম্বরী আউড়ে যাচ্ছেন। বইয়ের স্তূপের মধ্যে তিনি সমাহিত।

ভদ্রলোকদের আলোচনা শুনতে লাগলাম।

'সাহিত্যের 'স' জানে না এমন সব লেখক আজকাল বুঝলে হে! যা খুশী তাই লিখলেই হ'ল ?'

'মাসিকপত্রখানা উলটে যান একধার থেকে দেখবেন সবই এক—একই লেখক নানা কাগজে লিখছেন—না আছে বিস্ময় না আছে বৈচিত্র্য।'

'আচ্ছা এরা লেখে কেন বলতে পার ? কি আনন্দ পায় ভাই লিখে বুঝতে পারি নে।'

'তার পর ধর দেশ—কি উপকারটা হচ্ছে বল দেশের ? গ্রামগুলো ত যায়—গ্রামেরই যদি উন্নতি না হ'ল, সংস্কার না হ'ল—তা হলে কি হবে দেশের ?'

'সবেতেই সেই একই সমস্যা দাদা—সেই অর্থসমস্যা !'

'তা হলেও ত চেষ্টার দরকার।'

'তারপর ধরুন গল্প—সব যেন মনে হয় বায়োস্কোপের ভাষা পড়ছি।'

'ঠিক ঠিক—বায়োস্কোপের ভাষাই বটে। ভাষার এত শ্রীহীনতা কখনও দেখি নি।'

'কালে কালে কতই বা দেখব! আর সমাজ! সমাজের কথা আর বল কেন ?'

এমন সময়ে চা এল। তাঁরা সব চা খেতে লাগলেন। আমি যাঁর কাছে বসেছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করেন আপনি এখানে ?'

'আজকাল অগতির গতি কি বলুন ত দেখি !'

হেসে বললাম, 'টিউশনী ?'

'তাই করি।'

তাঁকে বড় ভাল লাগল।

* * *

মেসের গতানুগতিক বিস্বাদ জীবন চলতে লাগল। কত লোক, কত মেলামেশা, কত কোলাহল। টিউশনী ত সংগ্রহ করলাম—খরচপত্র মেটাতে হবে ত। চরণদাস বললেন, 'দেখুন, এই ভাবেই চলছে আজকাল সবারই। সুখ বা শান্তি যা-কিছু বলেন সে-সব মানুষের নিজের সৃষ্টি।'

'তা ত বটেই। মানুষের নিজের সৃষ্টি সমস্তই।'

মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম পার্কে, ভিক্টোরিয়ায়—মাঠে। দেখি অসম্ভব ভিড়—মানুষের সদাব্যস্ততা, কর্ম্মকোলাহল, অগণিত অসংখ্য মানুষ—জীবনের সংগ্রাম। চুপ ক'রে ব'সে থাকি—বাউলের গানের সুর মনে পড়ে—আর মনে পড়ে আমার গ্রাম—শিশিরসিক্ত মাঠ, বিদ্রোহহীন, কোলাহলহীন শান্ত জীবন-যাত্রা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছুটিতে আবার গ্রামে ফিরে এলাম—দেখি, সমস্ত গ্রাম জুড়ে নানা রকম অসুখের পালা চলেছে। মাধব কেবলই ছুটাছুটি করছে—ওষুধ সংগ্রহ করছে, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছে, আর এ-বাড়ী সে-বাড়ী ক'রে সেবা ক'রে বেড়াচ্ছে। লোক দেখাবার জন্যে সে যে সেবা করছে তা' নয়—কেমন একটা আন্তরিকতা—যেটা শুধু তার দ্বারাই সম্ভব। আর দেখলাম, যেখানে-যেখানে আমরা জঙ্গল

কেটেছি, সে-সব জায়গায় আবার জঙ্গলে ভ'রে গেছে। ব্যর্থ চেষ্টার দিকে তাকিয়ে হাসি পেল।

মাধবের সঙ্গে কিছু দিন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা গেল। কেউ কেউ বললেন, 'অকারণে ছুটাছুটি করছেন বাবু—ওরা মরবেই।'

মাধব আমাকে পাশে পেয়ে আরও উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। দাদামশায়ও দেখাদেখি এসে যোগ দিলেন। তিনি দয়া ক'রে কিছু কিছু খরচও করলেন। আমাদের চেষ্টায় গ্রামেরও কেউ কেউ উৎসাহান্বিত হ'ল। প্রবল চেষ্টার জয় সর্ব্বত্র। অসুখের সময়টা কেটে গেলে অনেকেই সেরে উঠল।

মাধবের বৈঠকখানায় একদিন গেলাম। দেখি সে অনেক কিছু জোগাড় করেছে। ওষুধপত্র আনিয়ে রেখেছে। নিতান্ত প্রয়োজনের সময় যা তার কাজে লাগতে পারে এমন সব জিনিষ সে আনিয়ে রেখেছে। বাইরের নানা সমিতি থেকে তার কাছে চিঠিপত্র আসছে। বারে বারে ব্যর্থ হয়েও তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। টিউবওয়েল বসাবার চেষ্টায় সে এবার উঠে-প'ড়ে লাগবে বললে।

* * *

দাদামশায়ের কাছে গিয়ে একদিন বললাম, 'দাদামশায়, একদিন গাঁয়ে গানের ব্যবস্থা হোক।'

দাদামশায় বললেন, 'তা বেশ ত—ব্যবস্থা কর।'

মাধবের কাছে গেলুম। সে তখন জঙ্গল কাটাবার দরখাস্ত করছে। দেখলাম সে একেবারে আস্ত একটা পল্লীসংস্কারক হয়ে গেছে। সাধারণতঃ তা-হ হয়।

মাধবও আমার কথা শুনে বলল, 'বেশ, চেষ্টা করা যাক।'

ফন্দ ধ'রে চাঁদা আদায় হ'ল। গান হবে এই কথাটি দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ উৎসাহটি অন্য রকমের। অসুখ যার সেরেছে এবং অসুখ যার সারে নি—সকলেই উৎসাহিত হয়ে উঠল, গান হবে শুনে।

* * *

তাকেই খবর পাঠান হ'ল—যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাঁশবনের অন্ধকারে। সে খবর পাওয়া মাত্র এল তার দলবল নিয়ে। তার পর পাড়াগাঁয়ে যেমন গানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। তেমনি ব্যবস্থা হ'ল। এক পাশে মেয়েরা এসে বসলেন—আর এক পাশে পুরুষরা। পোড়া তামাকের গন্ধে, রাত্রির শিশিরে, কালি-পড়া পুরানো লণ্ঠনের ধোঁয়ায় স্থানটি অপরূপ হয়ে উঠল। কেউবা এক-একগাছি ছোট বাঁশের লাঠি নিয়ে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা সতরঞ্চি আর কম্বল বিছিয়ে মাঝে মাঝে তামাক টানছেন। এক পাশ থেকে কখনও ব'সে কখনও বা দাঁড়িয়ে দেখছি।

এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ গানের ব্যবস্থা হ'ল কেন?'

তামাক টানতে টানতে এক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'এ সব ঐ কিশোর মাধবদের কাজ।'

'তা মন্দ হয় নি—কি বল হে?'

কেউ উত্তর দিল, কেউ বা দিল না। এরই মধ্যে গানের আসরে লব-কুশের আবির্ভাব হ'ল। হাতে চামর, মাথার চুল চূড়া ক'রে বাঁধা—ঠিক যেন রামায়ণের ছবির লব-কুশ। আসরের স্বল্প আলোয় তাদের বড় সুন্দর দেখাতে লাগল।

তারা চামর ঢুলায় আর গান গায়। মাঝে মাঝে গানের শেষে নাচে। প্রথমটা 'সীতার বনবাসে'র একটা ছোটখাট বর্ণনা দিল, তার পর নাচের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাঙা পয়ারে রচিত কোন অখ্যাতনামা কবির ভাষা সুর ক'রে ক'রে গান করলে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে সেই গানের সুরে সীতার বনবাসের করুণ কথা বেশ জ'মে উঠল।

দুঃখিনী সীতা নির্ব্বাসিত হয়েছেন তমসাতীরে বাল্মীকির তপোবনে। সেখানে কুশ-লবের জন্ম হয়েছে। সেই কুশ-লব বাল্মীকির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের যজ্ঞশেষে সেই কুশ-লব এসেছেন বাল্মীকির আদেশে রামায়ণ গান করতে। রামচন্দ্র জানেন না যে, এই কুশ-লব তাঁরই সন্তান। বাল্মীকির রচিত রামায়ণ-কথা কুশ-লব সমবেত অযোধ্যাবাসী-দের সম্মুখে গান করছেন সুললিত কণ্ঠে। রামচন্দ্রের মনে আসছে কৌতূহল, 'এই তরুণ সুকণ্ঠ কিশোর দুটি কারা?' কখনও শ্রদ্ধা, কখনও বাৎসল্য, কখনও বা করুণা—রামচন্দ্রের বিদীর্যমান হৃদয়ের মধ্যে নানা চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব চলছে। প্রিয়দর্শন দুটি কিশোর কিন্তু ধীরকণ্ঠে রামায়ণ গান ক'রে চলেছেন।

মহাকাব্যের সেই চিরন্তন দুঃখ-কাহিনী সেদিনকার

পাড়াগাঁয়ের ধূলিধূসর আসরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই বিচলিত করল।

শেষ দিকটায় কেউ কেউ উঠে গেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন—কি স্ত্রী কি পুরুষ—তাঁরা আগেই চ'লে গেছেন। গান যখন ভাঙল, তখন রাত অনেক। বেণুবনের পাশে চাঁদ উঠেছে। একটা শীতল বাতাসের স্রোত কোথা থেকে ভেসে আসছে। বাড়ী ফিরে যাব ভাবছি—এমন সময় মাধব দৌড়ে এসে বলল, 'ওরে কিশোর, এদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে—আমার এখন অনেক কাজ বাকী।'

অন্ধকার রাত্রি। মাধব আমার হাতে একটি কালি-পড়া লণ্ঠন দিল।

* * *

এঁরা যে কারা, সে-কথা মাধব আমাকে ব'লে দিলে না। কয়দিনের পরিশ্রমে রাত জেগে ঘুমও পেয়েছে খুব। কালি-ঝুল-মাখা লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে যাঁদের আগিয়ে দিয়ে আসতে হবে তাঁদের দিকে চেয়ে বললাম, 'আসুন।' গাঁয়ের সকলকে ঠিক চিনি না—কাজেই তাঁরা আগে আগে চলতে লাগলেন আর আমি লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে পিছনে পিছনে আসতে লাগলাম। গ্রামের পথ এঁকে-বেঁকে চ'লে গিয়েছে, মাঝে মাঝে এক-এক ঘর বাড়ী—ক্রমশঃ ভীড় কমে আসতে লাগল। লণ্ঠন নিয়ে আমি চলেছি—দুই-একটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর একটি মেয়ে তখনও বাকী। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আরও একটু আসতে হবে তোমাকে।'

আমার তখন ক্লান্তিতে আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু হেসে বললাম, 'চলুন'। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দূর যেতে হবে?'

'বেশী দূর নয়—এই বাগ্দীপাড়া পার হয়ে গিয়ে মাঠের কাছাকাছি আমাদের বাড়ী।'

'কোন্ বাড়ী বলুন ত? মাধবদের বাড়ীও ঐখানে।'

'না, মাধবদের বাড়ী নয়— মাধবদের বাড়ীর পাশেই।

'ও বুঝেছি—চলুন।' কি যে বুঝলাম জানি না, তবু বলতে হ'ল বুঝেছি। মনে হ'ল তিনি আমাকে চেনেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে?' আমি বললাম, 'ছুটিতে এসেছি, ছুটি ফুরলেই আমাকে আবার চ'লে যেতে হবে।'

পথ যেন আর শেষ হ'তে চায় না। চাঁদের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে এল। নির্জ্জন পথে সঙ্গীহীন অবস্থায় আবার ফিরে আসতে হবে। মাধব সঙ্গে এলে বড় ভাল হ'ত। কিছু জিজ্ঞাসা করাও শক্ত। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমাকে জানেন দেখছি।' অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমাকে আবার কে না জানে?'

সেই নির্জ্জন পথে তাঁর পরিচয় জানবার ঔৎসুক্য থাকলেও বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তিনি বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝলেন এবং বললেন, 'তুমি এইবার বাড়ী যাও। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছ, তা-ছাড়া এ ক-দিনের গানের হাঙ্গামাতেও কষ্ট পেয়েছ খুবই। কেমন না?'

লজ্জিত হলাম। বুঝলাম, তিনি অনেক খবর রাখেন। মনে একটি অদ্ভুত আনন্দ এল। সে আনন্দকে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝান শক্ত। ফিরে এলাম। লণ্ঠন নিবিয়ে দিলাম। রাত্রি ভোর হয়ে আসছে, রাত্রি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে চলতে মনে হ'ল—গ্রামের এখনও অনেক কাজ বাকী আছে।

* * *

বকুলবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ভোরের মৃদু হাওয়ায় টুপটাপ ক'রে বকুল ফুল ঝরে পড়ছে। ফুল-ঝরার মত গানের সুর কোথা থেকে কানে ভেসে এল। সম্মুখে তাকিয়ে দেখি—সহায়রাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি গো গানের আসর ভাঙল বুঝি!'

সহায়রাম সচকিত হয়ে উঠল। বলল, 'কে, দাদাঠাকুর?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

আসর ত অনেকক্ষণ ভেঙেছে। গান গাইতে গাইতে এই পথ দিয়ে যাচ্ছি। সহায়রামকে বড় ভাল লাগে। বললাম, 'বড় সুন্দর তোমার গান সহায়রাম।' সে ম্লানস্বরে বলল, 'কি করব দাদাঠাকুর?—এই গানই আমার পেশা।'

বললাম, 'আর একদিন তোমার গান হবে।'

সে খুশী হয়ে বকুল-বনের পথ দিয়ে চলে গেল।

ভোরের সুর কানে বাজতে লাগল।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১০

এই তিব্বতী ভদ্র-মহোদয়ের গৃহে বহু চাকর-চাকরাণী কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "চাম-কুশোক" (ভদ্র-মহিলা অর্থাৎ কর্ত্রী ঠাকুরাণী) মাথায় ধনুকাকার মুক্তাপ্রবাল-মণ্ডিত শিরোভূষণ পরিয়া ক্রমাগত রন্ধনশালা, মদ্যাগার, দেব-গৃহ প্রভৃতি বাড়ীর সকল অংশে ঘুরিতেছিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারও হাতে-মুখে বেশ এক পোঁচ ময়লা জমিয়াছিল এবং পরিচ্ছদের সামনে-ঝুলানো পশমী ঝাড়ন একেবারে কালো রঙে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রে মাংসযুক্ত থুক্পা ভোজনের পর আঢ্য মহাশয় অনেকক্ষণ 'আমার জন্মস্থান' লদাখ সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, তাহার পরে অনেক রাত্রে নিদ্রার জন্য সভা ভঙ্গ হইল। ততক্ষণে কর্ত্তা-মহাশয়ের দুই পুত্র লোমযুক্ত মোটা মোলায়েম কম্বল 'চুকটু'-নির্ম্মিত থলির মধ্যে 'নাকে তেল দিয়া' ঘুমাইতেছিল। ভোটদেশে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করে, ইহাতে তাহাদের সঙ্কোচ বোধ নাই, এমন কি একই ঘরে পিতামাতা, পুত্র-পুত্রবধূ ভিন্ন ভিন্ন শয়নস্থালিতে ঐ ভাবে নিদ্রা যায়, বহু-ভর্তৃকা পত্নীও ঐ ভাবে পতিমণ্ডলীর সঙ্গে লেপ-কম্বলের মধ্যে নিদ্রা যায়।

৪ঠা জুলাই সকাল দশটায় ডুরিং হইতে যাত্রা করিয়া ক্ষেতের মাঝের পথ ধরিয়া আমরা দুইটা নাগাদ জু-গ্যা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে পৌঁছিবার একটু আগেই পথ এক গভীর ও স্বল্পপরিসরের সেচ-নালীর পাড় দিয়া চলিয়াছিল। খচ্চর জীবটাই দুষ্ট, কখনও সোজা পথে চলে না, একটা বুড়া খচ্চর বোঝা-সুদ্ধ ক্ষেতের উঁচু আলে উঠিয়া প্রহারের ভয়ে সেচ-নালীর গভীর অংশে লাফাইয়া পড়িল। চাউলের বোঝার ভারে প্রথমে ত সেটা মুখ থুবড়াইয়া জলের ভিতর বসিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম আপদটা বুঝি মরিল, কিন্তু খচ্চরওয়ালারা তাহার মুখ জলের উপর তুলিয়া ধরিয়া চাউলের বস্তাগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত খুলিয়া লওয়ায় দুষ্ট বাহনটি উঠিয়া আসিতে পারিল। চাউল ভিজিয়া গিয়াছে, এদিকে চাউলের বস্তার মুখ বন্ধ এবং গালা দিয়া সীলমোহর করা, কিন্তু চাউল না শুখাইলে লাসা পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই তাহা অখাদ্য অবস্থায় পরিণত হইবে; সুতরাং খচ্চরওয়ালারা জু-গ্যা গ্রামে পৌঁছিয়া ঐ মোহর ভাঙিয়া চাউল খুলিয়া বাহির করিয়া কম্বলের উপর ছড়াইয়া শুখাইতে দিল। পারিশ্রমিক হিসাবে দিন দুই-তিনের মত থুক্পার জন্য চাউলের ব্যবস্থাও করিয়া লইল।

শীগর্চী হইতেই আমরা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ছাড়িয়া গ্যাঙ্চী নদীর উপত্যকা দিয়া চলিতেছিলাম। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে শীগর্চী ১২,৮৫০ ফুট এবং গ্যাঙ্চী বা 'গিয়াংসি' ১৩,১২০ ফুট উচ্চে অবস্থিত সুতরাং গ্যাঙ্চীতে অপেক্ষাকৃত অধিক শৈত্য অনুভূত হয়। এখনও আমরা শীগর্চী হইতে বিশেষ দূরে আসি নাই, সুতরাং এই অঞ্চল গরম বলিয়াই অনুভব করিতেছিলাম। এখানের ক্ষেতে প্রচুর বথুয়া শাক দেখিলাম। জু-গ্যাতে আমাদের সর্দ্দারের পূর্ব্বজদিগের ভদ্রাসন, মাত্র দুই-এক পুরুষ আগে ইঁহারা এখান হইতে লাসার কাছে গন্দনে ভিটা বাঁধিয়াছে। খবর পৌঁছিবা-মাত্র সর্দ্দারের জ্ঞাতিভাইদের পত্নীরা পান-ভোজনের সম্ভার লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মুড়ি, খই, তেলে-ভাজা, সেও, কমলালেবুর মিঠাই এমনি অনেক খাবার আসিল। এ দেশের নিয়ম এই যে ঐরূপ খাদ্য-সামগ্রী সামনে রাখিলে দুই-চার দানা মাত্র মুখে দিতে হয় নহিলে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করা হয়। আমিও ভদ্রতা রক্ষা করার চেষ্টায় ছিলাম কিন্তু সর্দ্দার বলিল, "খুব খাও।" পরে প্রচুর মাখনযুক্ত গরম চা-ও অনেক আসিল। রাত্রে সর্দ্দার তাহার জ্ঞাতি-বন্ধুদের ঘরে দেখা করিতে গেল।

৫ই জুলাই যবের আটা সিদ্ধ ও গরম সরিষার তৈল প্রাতরাশের জন্য আসিল, তবে আমি তাহা খাইলাম না। দশটার সময় খচ্চরগুলিকে খাওয়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ

করিলাম ; আজ পথ অল্পই ছিল, গ্রাম হইতে দক্ষিণ মুখে চলিয়া প্রথমে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া পাহাড়ের নীচে নীচে ক্ষেতের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। এদিকে সেচ-নালীর ব্যবস্থা ভাল, সে-সব পার হইয়া আড়াই মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আমরা পা-চা গ্রামে পৌঁছাইলাম। খচ্চরগুলি ইতি-পূর্ব্বে ভাল বিশ্রাম করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই সর্দ্দারের ইচ্ছা ছিল এখানে দু-চার দিন থাকিয়া তাহাদের সস্তা দানা-ভুষি খাওয়ায় এবং নিজে নাটক অভিনয় দেখে। পা-চা গ্রামে যাহার গোশালায় আমরা ছিলাম সে এ-অঞ্চলের বড় জায়গীরদার, তাহার গৃহের ভিতরে যাই নাই কিন্তু বাহির হইতে উহা অতি সুন্দর মনে হইতেছিল।

চা-পানের পর সকলে নাটক অভিনয় দেখিতে গেলাম। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে, প্রায় এক মাইল দূরে, নদীর পাড়ে অভিনয় চলিতেছিল। এখানে এই যাত্রাকে "অচী লাহমো"র "তেম্" অর্থাৎ 'স্ত্রী দেবীর লীলা', অভিনয় বলে। ইহাকে ভোটীয় ধর্ম্মাভিনয় বলা উচিত। আমাদের সঙ্গে দুটি বড় কুকুর ছিল, সেগুলিকে দরজায় বাঁধিয়া, দ্বারে তালা দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তরে রঙ্গভূমি, তাহার পাশে স্রিব্বতী বাবলাগাছের জঙ্গল। এই যাত্রা প্রতি বৎসর এখানকার জমিদার নিজের খরচে করাইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ নাটকের অভিনেতা। ভিক্ষু-পাত্রদের পান-ভোজন পারিতোষিকের ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হয়; অধিকন্তু অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আহারাদির ব্যয়ও তাঁহাকে দিতে হয়। নাটকের অভিনয়ের জন্য বৃহৎ চতুষ্কোণ শামিয়ানা টাঙানো ছিল; আশেপাশে আরও অনেকগুলি ছোট বড় শামিয়ানায় দূর হইতে আগত অতিথিদের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, সেগুলির পাশে তাহাদের ঘোড়া বাঁধা থাকিত। রঙ্গভূমির দক্ষিণে ছোট ছোট সুন্দর তাম্বুতে বহু সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষ বসিয়া ছিলেন এবং পূর্ব্বদিকে রৌদ্রের মধ্যেই অন্য অতিথিদের জন্য ফরাশ বিছানো ছিল। অন্য সব দিকে অন্যান্য দর্শকেরা নিজ নিজ আসন বিছাইয়া বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক। জমিদার মহাশয় আমার সঙ্গীকে দেখিয়াই লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া পূর্ব্বদিকের ফরাশের উপর বসাইলেন। নাটক দেখার সঙ্গে চা ও ছঙ-পান সমানে চলিতেছিল, আমাদের জন্যও চা আসিল। দ্বিপ্রহরে রৌদ্র প্রখর হওয়া সত্ত্বেও লোকে উঠিবার নাম করিল না। ভোটীয় নাটকে যবনিকার ব্যবহার নাই, রঙ্গমঞ্চও সমতলভূমি। অভিনেতাদের জন্য বাদকদিগের স্থানের পাশে মদ্যপূর্ণ চামড়ার মটকা সাজানো। বাদ্যের মধ্যে রোশনচৌকী, দীর্ঘাকৃতি বীণ, এবং দীর্ঘ দণ্ডের উপর স্থাপিত এক প্রকার ডমরু। বাদক ও নট সকলেই নিকটস্থ এক গুম্বার "ঢাবা"। নাটকের প্রসঙ্গ বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের জাতক সম্বন্ধীয় এবং অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যগীত, রঙ্গভঙ্গী, কৌতুক সবই ছিল। অভিনেতাদিগের মুখোস কাগজ বা কাপড়ের, বেশভূষা সুন্দর। গানের প্রশংসা চারি দিকেই, যদিও গানের কথার তাৎপর্য্য দু-চার জনও বুঝিতেছিল কিনা সন্দেহ। গদ্য-পদ্য দুয়েরই উচ্চারণের কৃত্রিমতায় আমাদের রামলীলার অভিনয়ের অস্বাভাবিক আবৃত্তির কথা মনে হইতেছিল। যাত্রার এক অঙ্কে চারিটি স্ত্রী-ভূমিকা ছিল, তাহাদের পরিচ্ছদ স্বাভাবিক। অমনিতেই সাধারণ ভোটীয় মহিলাদের বেশ যথেষ্ট কৃত্রিম (যথা, পরচুলার ব্যবহার, বৃহৎ শিরোভূষণ ইত্যাদি), নাটকে অধিক কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। এই চারিটি নারীর মধ্যে দুই জন চাং (কুতী হইতে থম্বা-লা পর্য্যন্ত) অঞ্চলের ধনুকাকার শিরোভূষণ এবং অন্য দুই জন লাসা অঞ্চলের ত্রিকোণ শিরোভূষণ পরিয়াছিল। লাসার বেশ যাহারা পরিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এক জন এতই ভাল সাজিয়াছিল যে, স্ত্রী-দর্শকেরাও তাহাকে প্রকৃত স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল, যদিও সকলেই জানিত এই শ্রেণীর নাটকে স্ত্রী-অভিনেত্রী লওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। নৃত্যে তাল-লয়-সহযোগে মন্দগতিতে অগ্রপশ্চাৎ গমন, হস্তসঞ্চালন, চক্রবৎ পরিভ্রমণ সবই অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রহসনের মধ্যে বৈদ্য ও মন্ত্রবিশারদের এক অঙ্কে কিছু অশ্লীল অংশ ছিল কিন্তু লোকে হাসিয়া গড়াইতেছিল। নাটকের পাত্রগণের অধিকাংশই দেবতা, নাটকের মধ্যেই পান-লীলা ছিল, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ-বেশে সুসজ্জিত বহু রাজপরিচারক রৌপ্যময় পানপাত্রে মদ্য লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেলা দুইটার সময় সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগের মধ্যে মাংস, ডিম্বাদি পরিবেশন আরম্ভ

তিব্বতের দৃশ্যাবলী
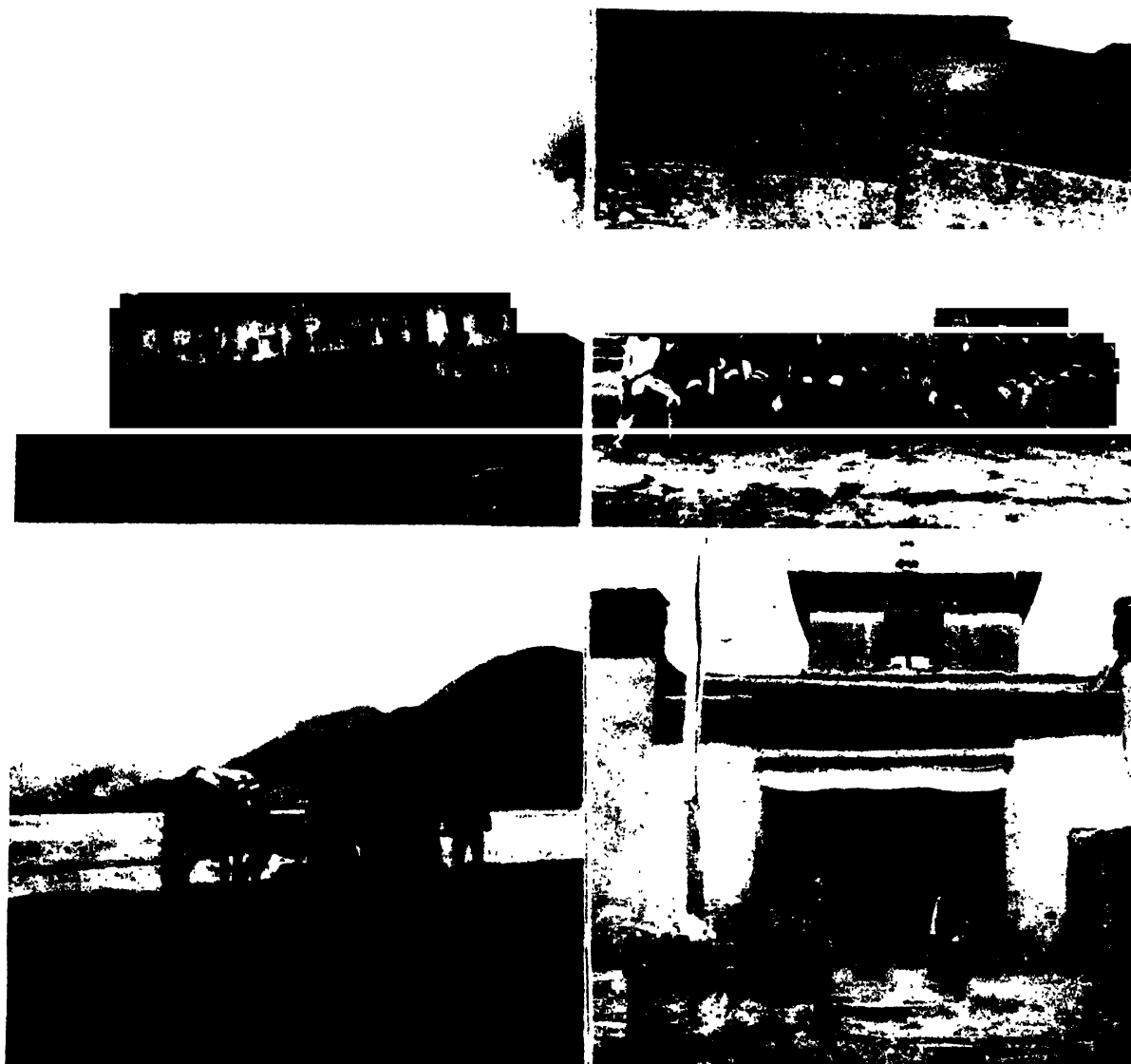
—রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক গৃহীত ফোটো

হইল ; মাংস কিসের স্থির করিতে না পারায় আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। খাইবার সরঞ্জামের মধ্যে কাঠের বারকোস, চীনা-মাটির বাসন এবং কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চীনা "চপ-ষ্টিক" (চীনারা এই শলাকা কাঁটা-চামচের মত ব্যবহার করে) দেওয়া হইতেছিল। চীন দেশের সঙ্গে বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এদেশে বহু চীনা রীতি-নীতির চলন হইয়াছে। বেলা চারিটার সময় আমরা ফিরিলাম, পথে এক জন ভোটিয়াকে বলিতে শুনিলাম, "এ নিশ্চয় ভারতীয়।" ইহাতে আমি একটু শঙ্কিত হইলাম, তবে লদাখ ও বুশহরের লোকের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য থাকায় এরূপ সন্দেহ ঘুচানো সহজ সুতরাং ভয়ের কারণ বিশেষ ছিল না। গ্যাঙ্গী কাছে হওয়ায়, এখানের অনেকে ভারতীয় সিপাহী দেখিয়াছে, তাহাদের এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের কুকুর দুইটি এতদিনে আমাকে চিনিয়া গিয়াছিল। কুকুরগুলির বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমি প্রথমে ভাবিতাম, ভোটিয়েরা নিশ্চয়ই উহাদের খুব খাওয়ায়; কিন্তু দেখিলাম প্রাতে সের-দুই গরম জলে দেড় ছটাক আন্দাজ সত্তু এবং সন্ধ্যায়ও তাহাই মাত্র ইহাদের আহার। তিব্বতী কুকুর মাত্রেরই দৈনিক খাদ্যের এই পরিমাণ। বস্তুতঃ ঐ দেশে সকল কুকুরই সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত থাকে, কেন না একদিন যাত্রা শুনিতে না যাওয়ায় আমি ঐ কুকুর দুইটিকে খাওয়াইয়া দেখিলাম এক-একটি প্রায় এক সেরের উপর সত্তু পার করিল। যেখানে আমরা ছিলাম সেই গৃহের ছাদে একটি বিরাট কুকুরের ছালে ভুষি ভরিয়া লটকাইয়া দেওয়া ছিল। কোথাও কোথাও ঐরূপে য়াক ও ভল্লুকের ছালও টাঙান দেখিয়াছি, বোধ হয় ইহা তিব্বতী তুক-তাকের অঙ্গীভূত। ভোটিয়েরা রাত্রে ছাদে কুকুর ছাড়িয়া দেয়। এক রাত্রে আমি ও আমার এক সঙ্গী ভুলক্রমে ছাদেই শুইয়াছিলাম। অতি ভোরে সঙ্গী উঠিয়া চলিয়া যায়, আমি শুইয়া থাকায় (না বুঝিতে পারায়) কুকুরগুলি আমাকে আক্রমণ করে নাই, কিন্তু জাগিবামাত্র আমি বুঝিলাম উঠিলেই আমাকে কুকুরের সঙ্গে লড়িতে হইবে। সুতরাং অনেক দেরি হওয়া সত্ত্বেও, যতক্ষণ একজন বাড়ির লোক উপরে না আসিল, ততক্ষণ আমি চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

সুমতি-প্রজ্ঞ একদিন বলিয়াছিলেন এদেশের লোকে উকুন খায়। সেই সময় এই খচ্চরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় সে এ-কথা অস্বীকার করে। একদিন ঐ সর্দ্দারেরই এক ধনী-জাতির তরুণী স্ত্রী আমাদের বাসায় আসিল। ভোটিয়েরা স্নান না করায় উকুনের উৎপাত স্বাভাবিক। স্ত্রীলোকদের সাধারণ পরিচ্ছদের মধ্যে বাহিরে লম্বা পশমী ছুপা (চোগা), ভিতরে কোমরের উপরে রঙীন সুতা বা রেশমী জ্যাকেট, এবং কোমরের নীচে সুতা বা রেশমী লম্বা ঘাগরা। এই জ্যাকেট ও ঘাগরা শরীরে লগ্ন হওয়ায় ঐগুলিতেই উকুনের বাসা। ঐ তরুণী সেদিন তাহার জ্যাকেট খুলিয়া তাহা হইতে উকুন বাছিয়া খাইতে লাগিল। আগে এক জন ভোটিয় আমায় বলিয়াছিল এরূপ ব্যাপার এদেশে অতি সাধারণ এবং উকুন খাইতে টক লাগে!

৮ই জুলাই প্রাতরাশের পর আবার যাত্রারম্ভ হইল। সুরুতেই একটা খচ্চর তাহার বোঝার বন্ধনী খুলিয়া ফেলায় কিছু দেরি হইল। গ্রাম হইতে প্রথমে দক্ষিণে পরে পূর্ব্বদিকে যাওয়া হইল, এখানে একটি দেবালয় আছে, তাহার পাশের সেচ-নালীর ধার দিয়া রাস্তা গিয়াছে। এই পথে, ক্ষেত-গুলির পাশে পাহাড়ের ধারে ধারে অতি ধীরে চড়াই পথে চলিয়া বেলা বারটার সময় স-চা গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের নিকট এক পাহাড়ের মূলে নেশা নামক একটি ছোট মঠ আছে। এত দিন পরে খচ্চরওয়ালারা নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিল। উত্তর দিবার প্রবৃত্তি দমন করিলেও এরূপ রূঢ় ব্যবহারের ফলে মনের মধ্যে বিরক্তি থাকিয়া গেল। কি ভাবে চলিলে তাহারা আমার উপর প্রসন্ন থাকে বা আমা হইতে অসম্ভব কিছু আশা না করে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ ব্যবহার ইহাদের শুধু নহে, ভোটীয় জাতিরই স্বভাবগত।

সন্ধ্যার সময় উহারা বলিল, কাল প্রাতে রওয়ানা হইয়া গ্যাঙ্গীতে চা পান করিয়াই সেখান হইতে যাত্রা করিব; সেখানে ভুষি-চারার দাম বেশী সুতরাং আরও আগে চলিয়া কোথাও থাকিব। সেই কথা মত ৯ই জুলাই সূর্য্যোদয়ের পরেই চলিতে সুরু করিলাম। এদিকের সেচ-নালীতে জল বেশী, ক্ষেতগুলির হরিৎশোভা নয়নমনোহর, নদীর ধারের বাবলা-বনের শোভাও সুন্দর

গ্রামের অবস্থা ভাল, বাড়ীগুলি দুইতলা ও দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। দেওয়ালের সাদা মাটির প্রলেপ, কাল কাঠের টুকরায় তৈরি চাউনির কৃষ্ণরেখা, ছাদের উন্নত ধ্বজা এবং দ্বার-জানালার সরল রেখা দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। সেচ-নালীর অন্তঃস্থিত প্রপাতস্থলে সত্তু পিষিবার "পঞ্চক্কি" (জলধারায় চালিত পেষণ-যন্ত্র) প্রায় চারিদিকেই দেখা যাইতেছিল। সেচ-নালী মধ্য-ভোট দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু এদিকের গুলি অধিক সুরক্ষিত ও নিপুণভাবে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। গ্রামের মধ্যেও ঐরূপ পঞ্চক্কি এবং বহু অর্ব্বুদকোটি মন্ত্রে পূর্ণ একটি বৃহৎ "মাণী" জলশক্তিতে চালিত আছে দেখিলাম। মাণীর উপরিভাগে বাহিরের দিকে একটি দণ্ড যুক্ত ছিল, মাণী ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতি সম্পূর্ণ পরিক্রমায় একবার ঐ দণ্ড দিয়া উপরে লম্বমান ঘণ্টার জিহ্বায় আঘাত করিতেছিল এবং এইরূপে প্রতি চক্রের শেষে একবার ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে বহু অর্ব্বুদ মন্ত্র জপের পুণ্য অর্জ্জিত হইতেছিল। এই মন্ত্রও সাধারণ নহে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম মন্ত্রের এক কোটি ইহার একটির সমান, সুতরাং এক সেকেণ্ডে এই গ্রামে যে-পরিমাণ পুণ্য উৎপন্ন হইতেছিল তাহা সামান্য গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি ভাবিতেছিলাম যে যদি এই সমস্ত পুণ্যরাশি ঐ মাণী-স্থাপনকারী নিজের জন্য রাখে তবে এক মুহূর্ত্তের পুণ্য ভোগ করিতেই তাহাকে বহু কল্পকাল ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে, এক মাসের পুণ্যের ত কথাই নাই! গণিতের এই দুরূহ সমস্যায় শ্রান্ত আমার মন এই ভাবিয়া শান্তি পাইল যে, এদেশে মহাযান প্রচলিত সুতরাং ঐ পুণ্যের পুঁজি প্রাণীমাত্রেই পাইবে। কে বলিতে পারে, হয়ত এই ঘোর পাপসঙ্কটে লিপ্ত ভূমণ্ডলে মনুষ্য সমাজ যে এতদিনে ভূগর্ভে বা সমুদ্রতলে বিলীন হয় নাই তাহার কারণ তিব্বতের এই হাজার হাজার "মাণী"! অহো! যদি যন্ত্রবাদী দুনিয়ার সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিত এবং আল্লা, খ্রীষ্ট, রাম, কৃষ্ণ এই সকল নাম প্রতি যন্ত্রচক্রে লক্ষ লক্ষ বার লিখিয়া রাখিত, যদি প্রতি ঘড়ির চাকায় শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার শ্লোক অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে...!

দশটার সময় আমরা গ্যাঞ্চী পৌছিলাম। কাঠমাণ্ডুবের ধর্ম্মমান সাহুর অপার ধর্ম্মশ্রদ্ধার কথা ত সিংহলেই এক লদাখী মিত্রের নিকট শুনিয়াছিলাম। শীগর্চীতে শুনিয়াছিলাম যে এখন কিছু দিনের মত তাঁহার এখানকার দোকান বন্ধ আছে। গ্যাঞ্চীতে তাঁহার দোকানের নাম গ্যো-লিং-ছোক-পা, তিব্বতে মহল্লা বা নম্বরের স্থলে প্রতি গৃহের এইরূপ পৃথক নাম থাকে। এখনও লাসায় পৌছিতে আট-দশ দিন বাকী, এই জন্য আমি খচ্চরওয়ালাকে বলিলাম, আমি দ্বিপ্রহরে গ্যো-লিং-ছোক-পা-তে থাকিয়া কিছু আহার্য্য ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করিব, তাহার পর তাহাদের সঙ্গে চলিব। আমি সেখানে গেলে পর কিছুক্ষণ বাদে খচ্চরওয়ালারা জানাইল তাহারাও সেদিন গ্যাঞ্চীতেই থাকিবে, পরদিন যাত্রা করা হইবে।

গ্যাঞ্চী—লাসা ও ভারতের প্রধান পথের উপরে পড়ে, এই পথ কালিম্পং হইয়া শিলিগুড়ি চলিয়া গিয়াছে। এখানে ভারত-সরকারের বাণিজ্যদূত, নেপাল সরকারের "উকিল" (রাজদূত) ও তাঁহার সঙ্গে সহায়ক-বাণিজ্যদূত, ডাক্তার এবং দু-এক জন ইংরেজ অফিসার থাকেন। প্রায় এক শত হিন্দুস্থানী সিপাহী-পল্টনও এখানে থাকে। গ্যাঞ্চীর বিষয় পরে লিখিব সুতরাং এখন এইটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট।

রাত্রে বর্ষা নামিল, এবং পরদিন (১০ই জুলাই) বেলা দশটা পর্য্যন্ত বৃষ্টি চলিল। গ্যাঞ্চীতেও সকালে আটটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত হাট বসে, আমি পথের জন্য কাঁচা মূলা, চিঁড়া, চিনি, চাউল, চা, মিঠাই, সিদ্ধ মাংস ও মিষ্ট পরটা কিনিয়া লইলাম। পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালার একটি বাহু গ্যাঞ্চীর প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার অন্তিম শিখরে গ্যাঞ্চীর জোঙ্‌ এবং তিন দিকে গ্যাঞ্চীর বসতি। প্রধান বাজার ঐ পর্ব্বতবাহুর দক্ষিণ দিকে নীচে হইতে ঘুরিয়া পর্ব্বতের উপরিস্থিত গুম্বার ফাটক পর্য্যন্ত লম্বা চলিয়া গিয়াছে। গ্যো-লিং-ছোক-পা যে-পথে স্থিত তাহার উপর দীর্ঘ মাণীর দেওয়াল আছে। দ্বিপ্রহরে আমরা পর্ব্বতের ছোট টিলা পার হইয়া অন্য পারের বসতিতে আসিলাম। বস্তী হইতে-বাহির হইবার পথে কোথাও কোথাও জল বহিয়া যাইতেছিল। পাশের ক্ষেতের বৃষ্টি-স্নাত গম ও যবের চারার হরিৎ আভা আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

পথে চীনা-সিপাহীদের থাকিবার স্থানের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। রাস্তার পূর্ব্ব দিকে বৃটিশ দূতাবাসের পাটলবর্ণের বৃহৎ অট্টালিকা। এখানে প্রান্তর অতি বিস্তৃত, সুদূরপ্রসারী হরিৎবর্ণ ক্ষেত দেখা যাইতেছিল। আরও অগ্রসর হইলে পর টেলিগ্রাফের তারের কাঠের থামের সারি নজরে পড়িল। গ্যাঞ্চী পর্য্যন্ত বৃটিশ তার ও ডাকঘর, ইহার পরে লাসা পর্য্যন্ত তিব্বত-সরকারের টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। ভোট-সরকারের ডাকঘর ফরী-জোঙ্ পর্য্যন্ত আছে। গ্যাঞ্চী হইতে এক মাইল পথ যাইতে যাইতে ভোটীয় ডাকবাহী দু-জন পিয়নের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাদের হাতে ঘুঙুর-বাঁধা ছোট-মালা এবং পিঠে পীতবর্ণ পশমী ডাকের থলি। ঐ দু-জনের মধ্যে এক জন দশ-বার বৎসরের বালক মাত্র। যেখানে গ্যাঞ্চী পর্য্যন্ত ইংরেজী ডাক লইতে দুইটি ঘোড়া লাগে সেখানে তিব্বতী ডাক ঐ রকম দুইটি লোকে দুই ছোট পুঁটলিতে লইয়া চলিয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় এদেশের লোকের ভোটীয় ডাকের উপর কতটা আস্থা। এদিকের ইংরেজী ডাকে ইন্সিওর (বীমা) করা যায় না, কিন্তু তৎসত্বেও নেপালী সওদাগরেরা ঐ ডাক মারফৎ বহু মূল্যবান পদার্থ আদান-প্রদান করে এবং ভোটীয় ডাকে বীমা করা সম্ভব হইলেও তাহারা তাহার মারফৎ পারতপক্ষে কিছুই পাঠায় না।

ঘণ্টাখানেক চলিবার পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং সেই সময় দেখা গেল যে, আমাদের একটা কুকুর গ্যাঞ্চীতে ফেলিয়া আসা হইয়াছে। কুকুরের মালিক গ্যাঞ্চী ফিরিয়া গেল, আমরা অগ্রসর হইতে থাকিলাম। পথের দুই পার্শ্বে বিরি ও সফেদা বৃক্ষে ঘেরা গ্রাম ও শস্যে ভরা ক্ষেত। পথে পর্ব্বতমালার একটি বাহু অতিক্রম করিতে হইল, তাহাতে চড়াই বেশী নহে কিন্তু তাহার উপরের ফৌজী পরিখা সামরিক হিসাবে তাহার গুরুত্বের প্রমাণ দিতেছিল। পার হইলে পরে কাঁচা মাটির ছোট কেল্লার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেল। কিছু দূর উত্তর-পূর্ব্ব মুখে চলিবার পর দি-কী-ঠো-মো পৌছান গেল, সেখানে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ী। মালবহনের সঙ্গে চিঠিপত্র লইয়া যাওয়াও আমাদের সঙ্গীদের এক কাজ ছিল, ডাকের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে বনজারা ব্যাপারীরা যেরূপ করিত। সেই গৃহস্থের বাড়ীর কাছে যাইতেই একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর আমাদের স্বাগত-সম্ভাষণ করিতে আসিল, কিন্তু ভোটীয়েরা এরূপ কুকুরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে কিনা সন্দেহ। বৃষ্টি পড়িতেছিল, খচ্চরের পিঠ হইতে মাল নামাইতে আমিও সাহায্য করিতে লাগিলাম। শীঘ্র সে-কাজ শেষ করিয়া ছোলদারী তাঁবুর সারি খাটানো গেল। তাহার খোঁটায় খচ্চর বাঁধিয়া তাহাদের সম্মুখে ভুষি ঢালিয়া সর্দ্দার ও আমি সেই ধনীর গৃহে চলিলাম। গৃহস্থের দরজার বাহিরে মোটা খোঁটায় মজবুত শিকলে বাঁধা অতি ভয়ানক এক কুকুর আমাদের দেখিয়াই গর্জ্জন ও লম্ফঝম্প করিতে লাগিল। দ্বারের ভিতর উপরে যাইবার সিঁড়ির পাশেও ঐরূপ আর একটি কুকুর বাঁধা ছিল। এই দুইটিই বিরাট কলেবর, নেকড়ে বাঘ ইহাদের কাছে কিছুই নয়। আমার ধারণা ছিল এইরূপ কুকুর অতি মূল্যবান, কিন্তু শুনিলাম দশ-পনর টাকায় এই জাতীয় কুকুরের বাচ্চার জোড়া কিনিতে পাওয়া যায়। ঘরের একটি ছেলে কুকুরের মুখ চাপিয়া ধরিলে আমরা উপরে গিয়া রন্ধনশালায় গদীতে বসিলাম। সত্তু ও চা আসিল। আমি কিছু ঘোলও পান করিলাম। গৃহস্বামী লদাখের খবরাখবর করিলেন। ঐ সময়ে গৃহস্বামীর মঙ্গলার্থে পূজাপাঠ করিতে কতকগুলি ভিক্ষুও আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও "লদাখী ভিক্ষু"র কুশল প্রশ্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের আড্ডায় ফিরিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গী কুকুর লইয়া ফিরিল। এই গৃহের কিছু উত্তরে একটি নদী, ওপারে চাষের উপযুক্ত অনেক জমী পড়িয়া আছে। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছু তফাতে একটি স্তূপ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ গৃহস্বামী মালা ও মাণী হাতে তাহার পরিক্রমায় চলিলেন, সঙ্গীরাও গৃহান্তরে গেল, আমি একেলা ঘরে রহিলাম। সে সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টপ্‌টপ্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। একেলা বসিয়া আমি ভাবিতে-ছিলাম, গ্যাঞ্চীও তো পার হইয়াছি, লাসা আর কয়-দিনের পথ মাত্র; এই তো সেই পথ যাহার সম্বন্ধে নেপাল পর্য্যন্ত সব লোক ভয় দেখাইয়াছিল, এখনও

পর্য্যন্ত তো সেরূপ কিছু দেখি নাই, অল্প কয়দিন পরে রহস্যময় লাসায়ও এইরূপে পৌঁছিয়া যাইব এবং তখন বলিব যে মিথ্যাই লোকে এ-পথের সম্বন্ধে এত ভয় দেখায়। ভয়ের সময় উত্তীর্ণ হইলে লোকে এইরূপই ভাবে, আমি যখন এইরূপে কল্পনারাজ্যে বিহার করিতেছি সেই সময় সেই ছাড়া-কুকুরটি আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া গর্জ্জন সুরু করিয়া দিল। বলা বাহুল্য তাহাকে দেখিয়াই আমার চিন্তা-ধারার সূত্র ছিন্ন হইল, আমি তাড়াতাড়ি লাঠি-হাতে বসিয়া পড়িলাম। দূর হইতে কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া সে চলিয়া গেল। খানিক রাত্রি হইলে, সঙ্গীর দল বিলক্ষণ ছঙ্ পান করিয়া ফিরিলে পরে, সকলে মিলিয়া তাঁবুর ভিতর নিদ্রার ব্যবস্থা করিলাম। (ক্রমশঃ)

কুয়াশা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

কুয়াশায় ঢাকা অঞ্চলখানি নীলনভোময় চন্দ্রাতপে—
হে উদাসিনী!
রহিয়া রহিয়া শিহরি ওঠে
তন্দ্রাবিহীন গ্রহতারাদল অসীম শূন্য মরুতে লোটে;
তোমার মর্ম্ম অনাহত সুরে বিরহের মহামন্ত্র জপে
তুমি কি গৌরী সন্ন্যাসিনী?
ছায়া পড়ে তব সিন্ধু বুকে—
ফুলিয়া ফুলিয়া উন্মনা ঢেউ নাচে সেই ছায়া ধরিয়া সুখে।

শুভ্রাংশুর পাংশু আঁখিতে দুঃসহ ব্যথা ঘনায়ে আসে
হে বিরহিণী!
বেহুলার মত বাসরঘরে—
হে ভীরু বালিকা, আলুথালু কেশে কি খুঁজিছ দিক্‌দিগন্তরে?
দীর্ঘ নিশাস বহে হুহু করি আকাশ অশ্রুসাগরে ভাসে;
তব ক্রন্দন হে মায়াবিনী,
ঘনায় বিপুল কুজ্ঝটিকা
বাহিরের জ্যোতি হরিয়া জ্বালায় ভিতরে বিরহ বহ্নিশিখা।

ঘন-তালীবন বেষ্টিত দূর নিবিড় স্বপ্ন কুয়াশা-দ্বীপে
নির্ব্বাসিতা,
কারে আজ তুমি বেসেছ ভাল?
তোমার প্রণয় তুষার রাজ্য ভেদিয়া আসিছে মেরুর আলো;
কার স্মরণের তুলসীমঞ্চ আলোকিত আজ সন্ধ্যাদীপে
কোন্ শ্রীরামের স্বর্ণসীতা?
বলে যাও তব মর্ম্মবাণী
কার বিরহের অতল সাগরে শুক্তির মাঝে মুক্তারাণী!

কুয়াশায় ঢাকা ছল-ছল আঁখি প্রেমিকের বুকে ফুটিয়া উঠে,
হে উদাসিনী!
মৃত পুষ্পের মাল্য গাঁথি
এলোচুলে কেন জড়ায়েছ সখি, আসে নিত আজো প্রলয়-রাতি
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে তোমার অসহ যাতনা ওষ্ঠ-পুটে
বঞ্চিতা ওগো সন্ন্যাসিনী,
ধূমহীনা তুমি বহ্নি-শিখা,
প্রেমের সাধনা জটিল করেছ ঢাকিয়া নিবিড় কুজ্ঝটিকা
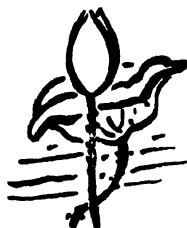
ইথিয়োপিয়ার বেদনা
আবিসীনিয়ার মৃত্যুদণ্ডে-দণ্ডিত-পুত্র-শোকাতুর পিতা ইতালীহস্তে বন্দী রাস:ইমরু:

স্পেনীয় রিপাব্লিকান-সরকারের সাহায্যার্থ খাদ্য বস্ত্র ও অর্থ লইয়া প্যারিসের ঘাট হইতে
যাত্রার প্রাক্কালে জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত একখানি ফরাসী জাহাজ

জার্ম্মেনার অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে 'শী' বা 'স্কী' প্রতিযোগিতায় পার্টেনবাচেনের
জোসেফ কিম্পবেকের অপূর্ব্ব স্কী-দৌড় প্রদর্শন
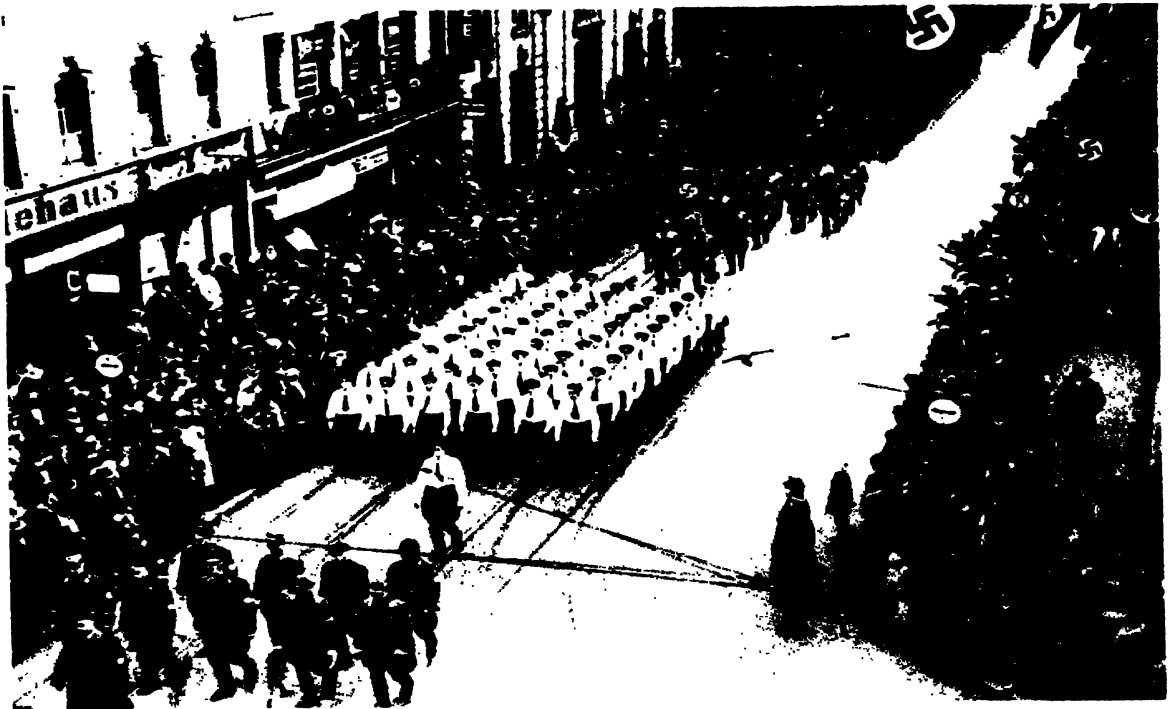
সারল্যাণ্ডের জার্ম্মান রাষ্ট্রভুক্ত হইবার প্রস্তাব সম্পর্কে জনমতগ্রহণের দ্বিতীয় বার্ষিক
উৎসবে সার-বাসী ও জার্ম্মান সৈন্যদলের শোভাযাত্রা
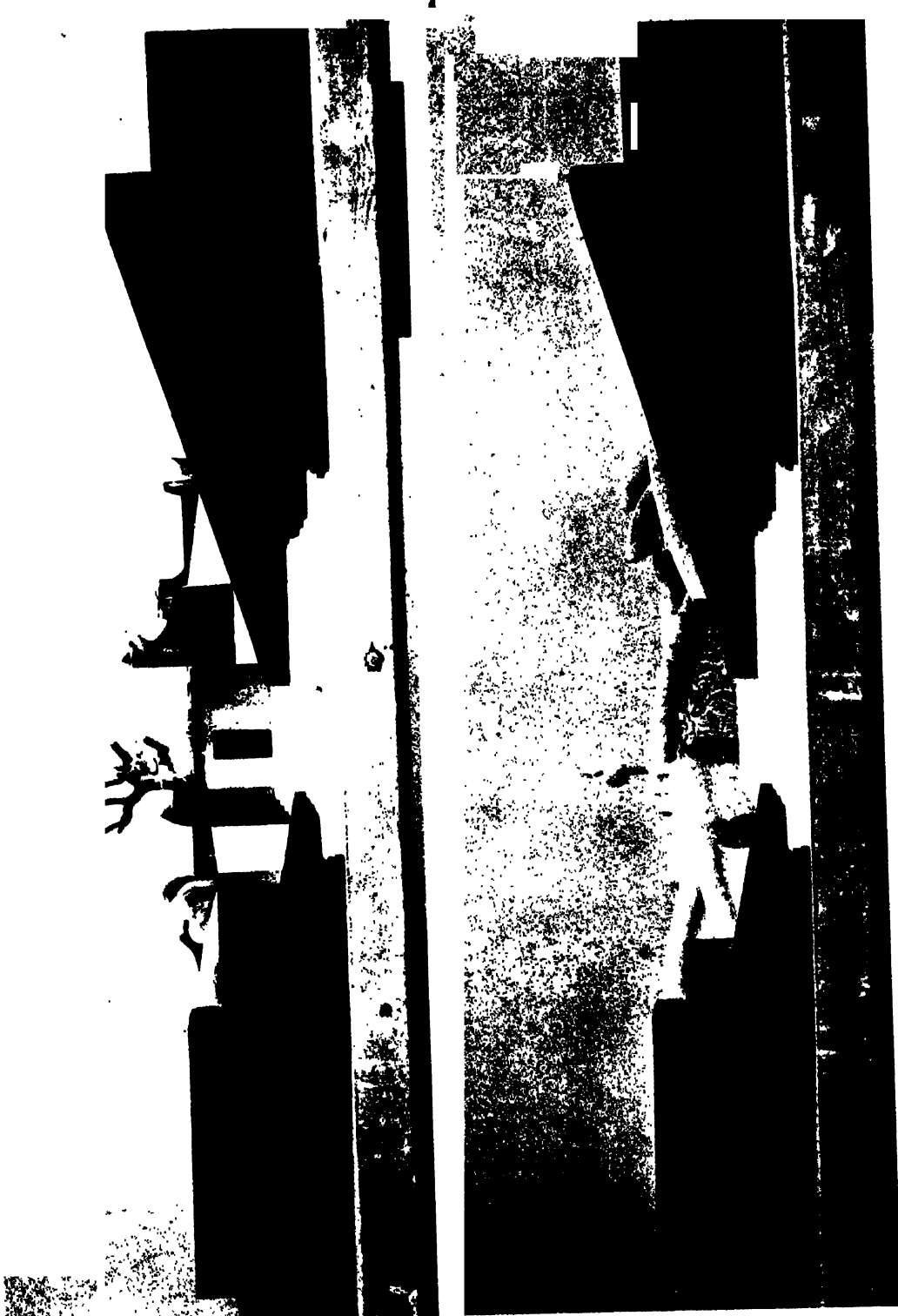
দুইলো কাম্বেলোত্তি কর্তৃক সিসিলির সাইরাকিউসের প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

উপরে : ইউরিপাইডিসের 'হিপোলিটো' নাটকের একটি দৃশ্য

নিম্নে : সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের একটি দৃশ্য

রাষ্ট্রবন্দীদের সংখ্যা

১৯৩৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্ন করিয়া জানিতে চান, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ-পর্য্যন্ত কোন্ প্রদেশে কত জন কত সময়ের জন্য কোন-না-কোন রেগুলেশ্যন অনুসারে (বিনা বিচারে) বন্দী ছিলেন বা এখনও আছেন। গবর্মেণ্টপক্ষ হইতে সম্প্রতি সর্ হেনরী ক্রেক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। উত্তরে যে-সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যোগ দিয়া দেখিতেছি, যাঁহাদিগকে রাষ্ট্রবন্দী করা হইয়াছিল এবং যাঁহারা এখন আর বন্দী নাই, প্রদেশ অনুসারে তাঁহাদের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ।

পঞ্জাব	১৬,
মান্দ্রাজ	১৬,
বঙ্গ	২১০,
বোম্বাই	৯,
আজমের-মেরওয়ারা	২,
মধ্য-প্রদেশ	২,
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২০,
দিল্লী	২।

যাঁহারা এখনও বন্দী আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত রূপ।

বঙ্গ	১৭,
পঞ্জাব	৭,
দিল্লী	৩,
ব্রহ্মদেশ	১,
মান্দ্রাজ	১,
আজমের-মেরওয়ারা	১।

কাহাকে ঠিক্ কি কারণে রাষ্ট্রবন্দী (State prisoner) করা হইয়াছিল, তাহা জানা নাই। মোটামুটি যেরূপ অনুমান লোকে করিয়া থাকে, তাহাতে মনে নানা প্রশ্নের আবির্ভাব হয়। যথা—বাঙালীরাই কি ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দান্ত জাতি? অথবা, বাঙালীরাই কি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনতাকামী জাতি? কিংবা, বাঙালীরাই কি ইংরেজ-রাজত্ব বা ইংরেজ-প্রভুত্ব বিনাশের জন্য সকলের চেয়ে অধিক চেষ্টা করিয়াছে? ইত্যাদি। এরূপ প্রশ্ন যদি যুক্তিসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে আর কি প্রশ্ন করা যাইতে পারে যাহার উত্তরে বাঙালী-দিগকে এত বেশী সংখ্যায় রাষ্ট্রবন্দী করিবার কারণ জানা যাইতে পারে?

—

"অন্তরীন"দের সংখ্যা ও মুক্তির প্রশ্ন

বঙ্গে যে-সকল লোককে এ-পর্য্যন্ত বিনা বিচারে রাষ্ট্রবন্দী করা হইয়াছে, তা ছাড়া, যত দূর জানা যায়, আনুমানিক আড়াই হাজার বাঙালী পুরুষ ও মহিলাকে বিনা-বিচারে "অন্তরীন" করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ঠিক্ কি কারণে "অন্তরীন" করা হইয়াছে, গবর্মেণ্ট তাহা বলেন নাই। সাধারণতঃ সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, তাহারা সন্ত্রাসনপন্থী (অর্থাৎ "টেরারিষ্ট")। যাহা হউক, ইহা ঠিক যে, তাহারা (অবৈধ উপায়ে) দেশের স্বাধীনতা চায়, এই সন্দেহে সরকার তাহাদিগকে বন্দী রাখিয়াছেন। তাহারা দেশের স্বাধীনতা চায়, এ অনুমান হয়ত ঠিক। অবৈধ উপায়ে, বিশেষতঃ সন্ত্রাসন দ্বারা, তাহারা দেশকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ সর্ব্বসাধারণে অবগত নহে।

এতগুলি মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিবার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, রাষ্ট্রবন্দীদের সংখ্যা হইতে এবং "অন্তরীন"দের সংখ্যা হইতে অনুমান হয়, যে, সরকার সন্দেহ করেন, সব প্রদেশের মধ্যে বঙ্গে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা

প্রবলতম এবং ব্রিটিশ মতে অবৈধ উপায়ে সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার চেষ্টা বঙ্গে অধিক হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটিশ জাতি স্বাধীনতা পাইবার ইচ্ছার নিন্দা করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতীয়দিগকে, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতিকে, এই জাতির বলিয়া দেওয়া উচিত, স্বাধীনতা লাভের বৈধ উপায় কি, এবং সে উপায় যে অব্যর্থ তাহার প্রমাণও ইতিহাস হইতে দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

ভারতীয়েরা ও বাঙালীরা "অন্তরীন"দের কোন অপরাধের প্রমাণ না পাওয়ায়, বার-বার হয় তাহাদের মুক্তি নয় তাহাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার প্রার্থনা করিয়া থাকে। সরকার-পক্ষ প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার করিতে চান না। তাহাদের মুক্তি সম্বন্ধে বরাবর একই কথা বলিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতিও সর্ হেনরী ক্রেক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাই বলিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে সর্ হেনরী বলেন, "সন্ত্রাসনবাদ সম্বন্ধে পরিস্থিতির ("situation") উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা সন্ত্রাসনবাদ সম্পর্কে বন্দী আছে, এই উন্নতির জন্য তাহাদের সকলকে মুক্তিদান সমর্থন করা যায় না, কারণ অতীত কালে এইরূপ মুক্তির পর আবার সন্ত্রাসনপ্রচেষ্টার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল।"

এখানে সর্ হেনরী ধরিয়া লইয়াছেন, যে, এই বন্দীরা সন্ত্রাসক; ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন, যে, অতীতে এইরূপ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়াতেই সন্ত্রাসন-প্রচেষ্টার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, অন্য কোন কারণে হয় নাই, হইতে পারে না। অধিকন্তু তাঁহার কথার মধ্যে ইহাও উহ্য রহিয়াছে, যে, সন্ত্রাসনপন্থার পুনরুজ্জীবন মুক্ত বন্দীরাই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে করিয়াছিল। কিন্তু এতগুলি অনুমান ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি। বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তি চাহিলে বা তাহাদের পীড়া ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, এই প্রকার অনুমানের ফলে র-পক্ষ ভাবেন ও বলেন, যে, তদ্দ্বারা সন্ত্রাসনবাদের ও সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। বস্তুতঃ রক্তপাত ও নরহত্যার সমর্থক নহি. এবং দু-এক জন সরকারী কর্মচারীকে বধ করিয়া দেশকে স্বাধীন ও উন্নত করা যায়, ইহাও বিশ্বাস করি না।

যদি সন্ত্রাসনপন্থীদের সক্রিয়তা বজায় থাকিত এবং সে অবস্থায় কেহ ব্যবস্থাপক সভায় "অন্তরীন"দের মুক্তি চাহিতেন, তাহা হইলে সরকারী জবাব এই হইত, যে, এখনও সন্ত্রাসকরা তাহাদের প্রচেষ্টা চালাইতেছে, অতএব এখন "অন্তরীন"দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এখন সন্ত্রাসকদের অস্তিত্বের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, তাহারা সন্ত্রাসন ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজ করিতেছে। তাহাদের মত পরিবর্তন প্রযুক্তই হউক, শাস্তির ভয়েই হউক, সন্ত্রাসক কার্য্য নিবারণে পুলিসের কৃতকার্য্যতার জন্যই হউক, লোকমত সন্ত্রাসকদের বিরুদ্ধ হওয়ার জন্যই হউক—যে কোন কারণ বা কারণ-সমবায়েই হউক, সন্ত্রাসনপন্থা সম্বন্ধে দেশের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এ অবস্থাতেও কিন্তু সরকার বলিতেছেন, "অন্তরীন"দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, সন্ত্রাসন যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে ত তাহাদিগকে খালাস দেওয়া যায়ই না; কিন্তু যদি তাহা চলিতে না-থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কি অবস্থায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়? কোন অবস্থাতেই নহে?

এই "অন্তরীন"রা যে প্রত্যেকে, পৃথক্ পৃথক্, বা সকলে, দলবদ্ধ সমষ্টিগত ভাবে সন্ত্রাসক কাজ করিয়াছিল বা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহা কোন আদালতে প্রমাণিত হয় নাই। অথচ তাহারা দণ্ড ভোগ করিতেছে এবং অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য দণ্ডভোগ করিতেছে। অন্য দিকে, তাহাদিগকে যে প্রকার বেআইনী কাজ বা চেষ্টার সন্দেহে বন্দী রাখা হইয়াছে, সেই প্রকার চেষ্টা ও কাজের জন্য আদালতের প্রকাশ্য বিচারে অনেকের নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারাদণ্ড হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হয় নাই, তাহাদের শাস্তি অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য, কিন্তু যাহাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদের শাস্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাদণ্ড। এই প্রকার ব্যবস্থাকে কি বিশেষণে বিশেষিত করা উচিত? সরকার-পক্ষ এই প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই বিশেষণটির উপযোগিতা বিবেচিত হইতে পারে।

—

"অন্তরীন"দের ক্রমিক পৃথক্ মুক্তি

সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে, কৃষি বা শিল্প শিখাইয়া দিয়া জনা চল্লিশ "অন্তরীন"কে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর জনা ষাটকে ঐ প্রকারে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী কোন কোন উক্তি এবং এই প্রকার কাজ হইতে অনুমান হয়, গবর্মেণ্ট ক্রমে ক্রমে কয়েক জন বন্দীকে প্রতি বৎসর ছাড়িয়া দিবেন। কৃষি ও শিল্প ভাল। কিন্তু অনেক যুবক অন্য কাজের উপযুক্ত, কৃষিকার্য্য ও শিল্পের কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। তাহারা কি খালাস পাইবে না?

এখন ঠিক কত জন এই রকম বন্দী আছে, জানি না। যেমন কতকগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তেমনই আবার নূতন নূতন লোককেও বন্দী করা হইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা—ঠিক বলিতে পারি না। যাহা হউক, ব্যবস্থাপক সভায় আগেকার কোন কোন প্রশ্নোত্তর হইতে মনে হয়, এখন বিনা-বিচারে বন্দীর সংখ্যা আড়াই হাজার হইতে পারে—দু-হাজারের কম নয়। যদি প্রতি বৎসর গড়ে পঞ্চাশ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে সকলের মুক্তি পাইতে পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসর লাগিবে—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে তাহাদের স্থান পূরণের নিমিত্ত নূতন নূতন বন্দীর আমদানী না হয়। পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসরের আগেই অনেকের ভবধাম হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে—রোগে বা স্বেচ্ছাবলম্বিত উপায়ে। প্রতি বৎসর গড়ে এক শত জনকে খালাস দিলেও সকলের মুক্তি পাইতে পঁচিশ বা কুড়ি বৎসর লাগিবে। এক জন লোককেও বিনা বিচারে পঞ্চাশ চল্লিশ পঁচিশ বা বিশ বৎসর, কিংবা এক বৎসরও, বন্দী করিয়া রাখা কি উচিত?

—

বিনা বিচারে বন্দীকরণের ফল

যে-সব খবরের কাগজের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাষ্ট্রবন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, বন্দীরা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বলিয়া তাহা করেন না—অনেকেরই সহিত কোন বন্দীর দূর সম্পর্কও নাই। তাঁহারা আলোচনা করেন এই নীতির অনুসরণ করিয়া, যে, বিনা বিচারে কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা উচিত নয়। এবং ব্রিটিশ আইনের একটি ভিত্তিগত নীতিও এই, যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ অপরাধী প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে নিরপরাধ বিবেচনা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রবন্দীদের দুর্দ্দশামোচনের চেষ্টার অন্য প্রধান কারণও আছে। তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু লোকমত এই, যে, তাহাদের অধিকাংশ কোন বেআইনী কাজ করে নাই এবং দেশভক্তি ও দেশের দুর্দ্দশামোচনের ইচ্ছাই তাহাদের দুঃখভোগের কারণ। তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী পরার্থপর ব্যক্তি অনেকে আছেন। এতগুলি মানুষের সেবা হইতে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হওয়ায় দেশের ক্ষতি হইতেছে। অধিকন্তু, বিনা বিচারে বহু যুবক ও কতিপয় যুবতী বন্দী হওয়ায় বঙ্গের সমগ্র যুবসমাজের উপর অবসাদের নিরুৎসাহতার আশাহীনতার একটা গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কারণ।

—

যুবক রাষ্ট্রবন্দীদের নমুনা

যুবক রাষ্ট্রবন্দীরা সবাই খুব বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী, এরূপ বলিবার মত কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে যে বেশ বুদ্ধিমান্, তাহার প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়া যাইতেছে। প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বন্দী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেন এবং অনেকে পাস করে—কেহ কেহ বেশ ভাল পাস করে। তাহারা শিক্ষকদের ও ভাল লাইব্রেরীর সাহায্য ব্যতিরেকেও এইরূপ কৃতিত্ব দেখায়।

গত ২৫শে মাঘ শান্তিনিকেতনে "বঙ্গীয় শব্দকোষ" নামক বৃহত্তম বাংলা অভিধানের প্রণেতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার গ্রন্থখানির গ্রাহক কিরূপ হইতেছে তাহার সংবাদ লইতেছিলাম। তিনি অন্য দুই একটি খবরের সঙ্গে আমাকে বলিলেন, একটি রাষ্ট্র-বন্দীও তাঁহার অভিধানের গ্রাহক হইয়াছেন। তাহাতে আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রীতও অবশ্যই হইয়াছিলাম। আমরা ত অনেকেই দিব্য আরামে নিজের নিজের বাড়ীতে থাকি, আয়ও নিজের নিজের আছে। অথচ এক জন নিঃসম্বল পণ্ডিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার করিতেছেন, দেশের সচ্ছল বা ধনী কয় জন লোক ঐ

সহযোগিতা করিতেছেন? অন্য দিকে এই একটি যুবক কারাগারে বন্দী থাকিয়া ও সরকারী সামান্য ভাতার উপর নির্ভর করিয়া "বঙ্গীয় শব্দকোষ" কিনিয়াছেন। ইঁহার চিঠি দেখিলাম। ইঁহার নাম ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, বন্দী আছেন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বরেলী জেলে। মহাদেব সরকার নামক আর এক জন এইরূপ বন্দী হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের অভিধানখানির জন্য চিঠি লিখিয়াছেন। ইঁহাদের মাতৃভাষানুরাগ প্রশংসনীয়।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান বর্ত্তমান বৎসরেও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোন-কোনটি সম্বন্ধে সকলে একমত না-হইতে পারেন, কেহ কেহ আরও কিছু যোগ করিতে চাহিতে পারেন—আমরাও (বোধ হয় গত বৎসর) লিখিয়াছিলাম ইহার সহিত একটি প্রাক্তনছাত্রসম্মেলন সংযোজিত হওয়া আবশ্যক—কিন্তু আংশিক মতভেদের জন্য অনুষ্ঠানটি বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রেরই ইহা যোগদানের যোগ্য মনে করি।

বর্ত্তমান বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের দলবদ্ধ পথ-চারিতার আনুষঙ্গিক এই গানটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

"ওঁ

"চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই।
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জ্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো মুক্তি-পথে, চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে,
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন,
স্বপ্ন-কুহক করো ছিন্ন,
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ, জড়তার জর্জ্জরবন্ধে।
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,
মুক্তির জয় বলো ভাই—
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।
চলো দুর্গম দূর পথ যাত্রী
চলো দিবা রাত্রি,
করো জয় যাত্রা, চলো বহি নির্ভয় বীর্য্যের বার্ত্তা,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,
সত্যের জয় বলো ভাই,
যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।
দূর করো সংশয় শঙ্কার ভার
যাও চলি তিমির দিগন্তের পার,
চলো চলো জ্যোতির্ম্ময় লোকে জাগ্রত চোখে,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়—
বলো নির্ম্মল জ্যোতির জয় বল ভাই—
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।
হও মৃত্যু তোরণ উত্তীর্ণ,
যাক্, যাক্ ভেঙে যাক্ যাহা জীর্ণ,
চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,
অমৃতের জয় বল ভাই—
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।"

প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে শুধু এই গানটি থাকিলেও তাহা অনুপ্রেরণালাভের উপায় বিবেচিত হইতে পারিত। ইহাতে যে মুক্তিপথের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মানবজীবনের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তির পথ।

প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে খবরের কাগজে কিছু সমালোচনা দেখিয়াছিলাম। দুই পক্ষের প্রতিবাদ বা সমালোচনার কথা মনে পড়িতেছে। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রেরা কোন কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রেরাও প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। শেষোক্তদের একটি প্রধান আপত্তি "বন্দেমাতরম্" গানটি অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে গীত হওয়া সম্বন্ধে। ইহার কোন কোন পংক্তির 'আক্ষরিক' (literal) অর্থ করিলে তাহা মূর্ত্তিপূজাসূচক বলিয়া যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না তাঁহাদের অননুমোদিত হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ 'আক্ষরিক' অর্থ সকলে করেন না। ব্রাহ্মেরা একেশ্বরবাদী এবং মূর্ত্তিপূজা করেন না। রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন এরূপ ব্রাহ্ম নেতা ও আচার্য্যদিগকে বন্দেমাতরম্ গানে আপত্তি করিতে শুনি নাই। স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস ও স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র আপত্তি করিতেন বলিয়া অবগত নহি।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গ ও প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা

লিণ্ডবার্গ এরোপ্লেন-পরিচালক না হইলে বিমান-বিহার করিবেন না তাঁহার এই অঙ্গীকার ডি ভ্যালেরা রক্ষা করিয়াছেন। আইরিশ ফ্রী-ষ্টেটে লিণ্ডবার্গসহ ডি ভ্যালেরার এবার প্রথম বিমান-যাত্রা
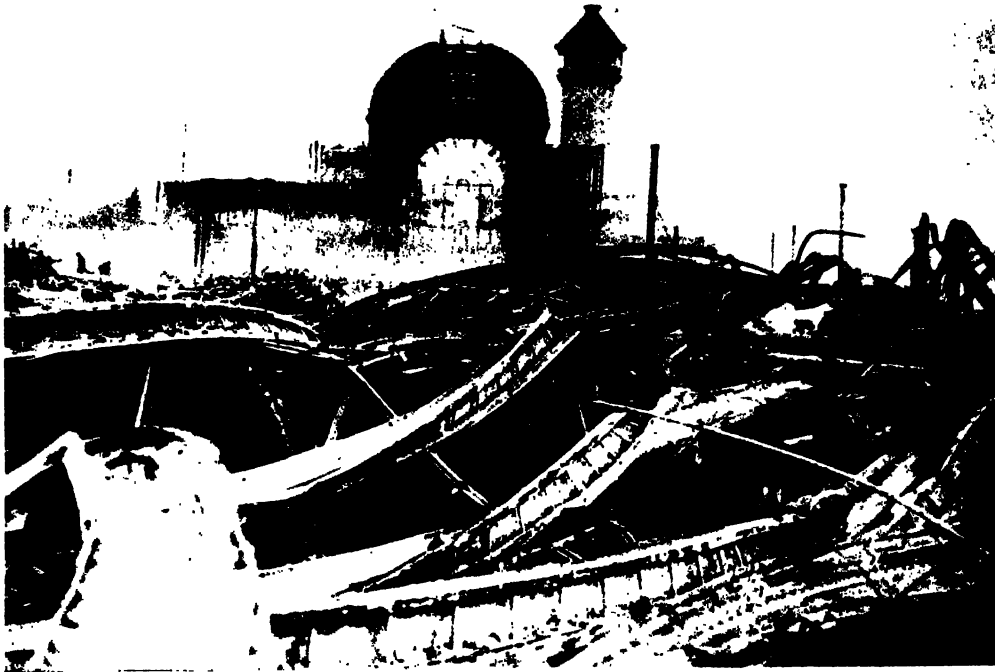
লণ্ডনের স্ফটিক-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

কোন কোন সংবাদ পত্র বলে, শত্রু-বিমানের পথপ্রদর্শকরূপে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব বলিয়া এই প্রসিদ্ধ সীমা-চিহ্নটি 'অপসারিত' হইয়াছে

মহীশূরের যুবরাজ মহীশূর বাণিজ্য-ভাণ্ডারের নূতন সৌধের উদ্বোধন করিতেছেন
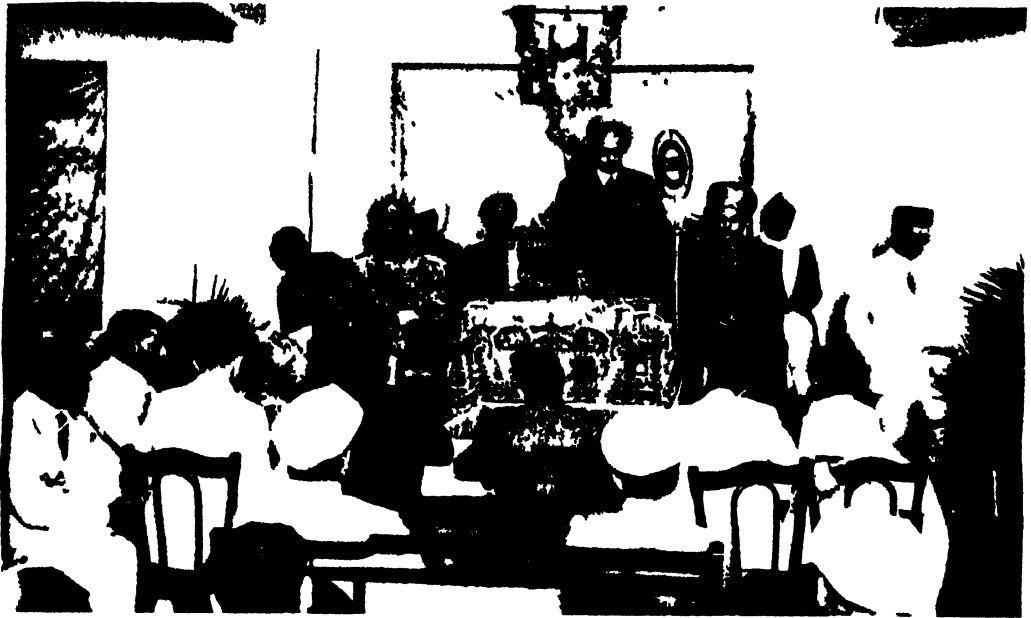
মার্শাল চ্যাং শুয়ে লিয়াং, শ্রীমতী চ্যাং, মিসেস্ চিয়াং এবং সেনাপতি চিয়াং কাইসেক

ললিতমোহন দাস মহাশয় আমাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, তিনি "ত্বংহি দুর্গা" ইত্যাদি কথাগুলি রূপকভাবে, "মাতৃভূমিই দুর্গা", এই অর্থে বুঝিতেন। তাঁহার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, দুর্গাকে রূপকের যে প্রতীক মনে করা হয়, মাতৃভূমিই সেই প্রতীক। যাহা হউক, তিনি যাহাই বুঝিয়া থাকুন, ব্রাহ্ম রাষ্ট্রনীতিক নেতারা "বন্দেমাতরম্" গানে আপত্তি করেন নাই আমাদের ইহা বলাই উদ্দেশ্য। "বন্দেমাতরম্" জয়ধ্বনিতেও তাঁহারা আপত্তি করেন নাই। তাঁহারা অবশ্য সংখ্যায় অতি কম একটি সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে পড়িতেছে, যে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় একাধিক প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতাও (এবং খ্রীষ্টিয়ান কোন কোন নেতাও) আপত্তি করেন নাই।

"বন্দেমাতরম্" গানটির "ত্বংহি দুর্গা" প্রভৃতি কথা সম্বন্ধে যাহাই হউক, প্রথম কয়েক পংক্তি সম্বন্ধে ধর্ম্মমতমূলক কোন আপত্তি না-হওয়া উচিত। কবিতা ও গানের প্রত্যেকটি কথার 'আক্ষরিক' অর্থ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু ঐ সংগীতের কেবল প্রথম চারিটি পংক্তি গান করার বিরুদ্ধেও নাকি আপত্তি হইয়াছিল। "বন্দেমাতরম্" কথাদুটিও নাকি পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক। আমরা এইরূপ পড়িয়াছিলাম—ইংরেজী অনুবাদে পড়িয়াছিলাম, হজরত মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, "Paradise lies at the feet of the mother," "স্বর্গ মাতার পদতলে"। তিনি ঠিক্ ইহা বলিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কারণ কোন মুসলমান শাস্ত্র আরবীতে পড়ি নাই। কিন্তু তিনি যদি ইহা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলঙ্কারিক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

আপত্তিকারী মুসলমান ছাত্রদের আরও আপত্তি আছে শুনা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় ও সীলমোহরের মাঝখানে যে পদ্মের ছবি ও "শ্রী" লেখা আছে, তাহাও আপত্তির কারণ বিবেচিত হইয়াছে। পদ্ম কোন কোন হিন্দু দেবদেবীর আসন ও আলয় বটে। কিন্তু যিনি আরাধ্যতম তাঁহার আসন হৃদয়কমলে, ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ বাক্য আছে, এবং মানুষের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা ভক্তিভাজন তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেও এরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মুসলমানধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কি না, বলিতে পারি না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলেও প্রাচীনকালাগত ভারতীয় সাহিত্যিক প্রয়োগ তাহার প্রভাবে লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

"শ্রী" শব্দটির অর্থগুলি আপ্‌টে-প্রণীত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Wealth, riches, affluence, prosperity, plenty. 2. Royalty, majesty, royal wealth. 3. Dignity, high position, state. 4. Beauty, grace, splendour, lustre 5. Colour, aspect. 6. The goddess of wealth; Lakshmi the wife of Vishnu. 7. Any virtue or excellence. 8. Decoration. 9. Intellect, understanding. 10. Superhuman power. 11. The three objects of human existence taken collectively [namely, dharma, artha and kama]. 12. The Sarala tree. 13. The Vilva tree. 14. Cloves. 15. A lotus. 16. The twelfth digit of the moon. 17. Name of Sarasvati. 18 Speech 19 Fame, glory. 20. m. Name of one of the six Ragas or musical modes.

"শ্রী" শব্দের এই কুড়িটি অর্থের মধ্যে কেবল দুটি দুই হিন্দু দেবীর, লক্ষ্মীর ও সরস্বতীর, নাম। বাকী অর্থগুলির মধ্যে আছে ধনসম্পদ, অভ্যুদয়, প্রাচুর্য্য, রাজকীয় মহিমা, মান সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, উচ্চ পদ, সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, যে-কোন সদ্‌গুণ, সজ্জা, বুদ্ধি, বোধ, অতিমানব শক্তি, ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম, পদ্ম, বাণী, যশ। আপত্তিকারী মুসলমানেরা কি ইহার কিছুই চান না? যদি দুইটি অর্থে শ্রী শব্দ হিন্দু কোন দেবী বাচক বলিয়া শ্রীর ব্যবহার বর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণমালাই ত ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার গোড়ার অক্ষর অ। ইহা বিষ্ণুর নাম; শিব, ব্রহ্মা, বায়ু ও বৈশ্বানরেরও নাম। আমাদের বর্ণমালার অনেক অক্ষর এইরূপ দেবতাবাচক। কিন্তু ভারতীয় ভাষা যাহারা ব্যবহার করে, তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাহাই হউক, তাহাদিগকে এই বর্ণমালা ব্যবহার করিতে হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় মুসলমানেরাও তাহা ব্যবহার করিতেছে। তাহা করায় তাহারা অমুসলমান হইয়া যায় নাই।

রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সাফল্যের জন্য যেমন পুরুষ কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রশংসার্হ, মহিলা কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবিকারাও তদ্রূপ প্রশংসার পাত্রী। বস্তুতঃ তাঁহাদের অধিকতর প্রশংসাই

রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ-পরিবৃত কর্ম্মিগণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সেন, ২। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী (সহকারী সম্পাদক), ৩। শ্রীযুক্ত লালমোহন ধর চৌধুরী (যুগ্ম-সম্পাদক), ৪। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ, ৫। শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক), ৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত (সম্পাদক, আতিথ্য-বিভাগ), ৭। শ্রীযুক্ত কালীপদ চৌধুরী, ৮। শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার গুহ, ৯। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ সেন।

করা উচিত। সামাজিক প্রথার জন্ত তাঁহাদের ঘরের বাহিরের কাজ করিবার সুযোগ, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা কম হওয়া সত্বেও তাঁহারা সম্মেলনের তাঁহাদের অংশের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রশংসাভাজন করিয়াছিল। অধিকন্ত তাঁহারা মহিলা-বিভাগের অধিবেশন ব্যতীত অন্ত অধিবেশনগুলিকেও সঙ্গীতের দ্বারা আনন্দদায়ক ও অনুপ্রেরণাপূর্ণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর শোভাযাত্রা

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী নানা অঙ্গে সমৃদ্ধ হইয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কলিকাতার অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ কয়েক দিন আগেকার নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের দীর্ঘ মিছিল।

এই শোভাযাত্রায় কোন্ কোন্ ধর্ম্মের লোক যোগ দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ জানি না। হিন্দু ছাড়া শিখরাও যোগ দিয়াছিলেন, খবরের কাগজে দেখিয়াছি। তাঁহারাও

রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ-পরিবৃতা মহিলা কর্ম্মিগণ
১। শ্রীযুক্তা শান্তশীলা রায় (সম্পাদিকা মহিলা-বিভাগ) ২। শ্রীযুক্তা সুধাকণা দাসগুপ্ত (পরিচালিকা, স্বেচ্ছাসেবিকা-বিভাগ)

মহাসভার নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দু। জৈন, দ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা কেহ কেহ যোগ াছিলেন কিনা, অবগত নহি। যোগ দিয়া থাকিলে হা সন্তোষের বিষয়।

যিনি সকল ধর্ম্মকে সত্য মনে করিতেন, তিনি সকল ়ের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, ই শ্রদ্ধার প্রতি ও শ্রদ্ধাবানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ও র্শন স্বাভাবিক।

এমন এক সময় ছিল যখন ধর্ম্মবিশেষের লোকেরা অন্য ল ধর্ম্মকে মিথ্যা ও শয়তানের ছলনা বোধে অবজ্ঞা রিতেন। এখন তাঁহারাও অন্যান্য ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত স্বীকার করেন—যদিও তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মকেই ও একমাত্র সত্য ধর্ম্ম মনে করেন। সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মের লোকেরা রামকৃষ্ণের মত অন্য সব প্রধান ধর্ম্মকে সত্য মনে না করিলেও, যদি তাহাদের সবগুলিতে সত্য আছে মনে করেন এবং তাহা মনে করিয়া তৎপ্রতি আংশিক ভাবেও শ্রদ্ধাবান্ হন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক অবজ্ঞা দ্বেষ কলহ কমিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনেকেই এখনও অন্য ধর্ম্মের লোকদিগের সমান পর্য্যায়ে পাশাপাশি দাঁড়াইতে চান না। রামকৃষ্ণের ঔদার্য্য এই সাম্প্রদায়িক আত্মাভিমান কিয়ৎপরিমাণেও কমাইয়া থাকিলে তাহা সন্তোষের বিষয়।

—

সরিষায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি বিদ্যালয়

কিছু দিন হইল কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ছাত্রীদের ড্রিল

সরিষা গ্রামে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বালকদের ও বালিকাদের দুটি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল। বিদ্যালয় দুটি ডায়মণ্ড হারবার রোডের অদূরে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। স্থানটি গ্রামের নিকটে হওয়ায় অথচ গ্রামটির সহিত সংলগ্ন না-হওয়ায় বিদ্যালয়ের উপযোগী। এই বিদ্যালয় দুটিতে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে সুস্থ সবল রাখিয়া সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নানা প্রকার খেলা ও ড্রিল, বাইসিকল ব্যবহার, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রী ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল। কয়েকটি ছাত্রী এই অঞ্চলের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার পাইয়াছে। ছাত্রেরা গ্রামের উন্নতিসাধনের জন্ত অনেক কাজ করিয়া থাকে। যেমন, তাহারা গ্রামের প্রধান পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়াছে।

এই বিদ্যালয় দুটিতে অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষালাভের জন্ত আসে। অনেকে না-খাইয়াই আসে। তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। এই জন্ত ইহাতে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কোন সন্ন্যাসী ও অন্ত আত্মোৎসৃষ্ট শিক্ষকেরা কাজ করিলেও ব্যয় মাসিক প্রায় দেড় হাজার টাকার কম হয় না। তাহা এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা হইতে সংগৃহীত হয়। বাঙালীরা কেহই কিছু দেন না, এমন নয়। কিন্তু অবগত হইলাম বেশী দান মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া বণিকগণই করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের আত্ম-প্রসাদের কারণ, কিন্তু বাঙালীদের পক্ষে গৌরবজনক নহে।

ইহার ভাণ্ডারটি যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাহাতে নানা খাদ্যোপকরণ যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হইয়াছে, তাহা অনেক গৃহস্থের অনুকরণযোগ্য।

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক মেলা

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সুরুলের শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত পল্লীসংগঠন-বিভাগ খুলেন। সেখানে কয়েক বৎসর হইতে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে একটি মেলা হইতেছে। কৃষি ও শিল্পের প্রদর্শনী এই মেলার একটি অঙ্গ। ইহাতে শ্রীনিকেতনে উৎপন্ন এবং নিকটস্থ গ্রামসমূহে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়। মেলার বাহিরের জায়গায় দেখিলাম সাঁওতালদের তৈরি বিস্তর চৌকাঠ ও কপাট বিক্রীর জন্ত রাখা হইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ নানা চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নানা তথ্য ও নিয়ম বুঝাইয়া দেন। সরকারী কৃষি-বিভাগ ধান্ত ও বহু শস্যের উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতেছেন। উৎকৃষ্ট পাট, শণ প্রভৃতি রাখিয়াছেন, ভাল আকের জড় ও তাহার প্রভৃতি প্রণালী দেখাইতেছেন। নানা

উপরে : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাণ্ড মধ্যে উপবিষ্ট ভাইস-চ্যান্সেলর।

নিম্নে : দক্ষিণে—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলর—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন।
বামে—প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে ছাত্রগণের পাইক-নৃত্য
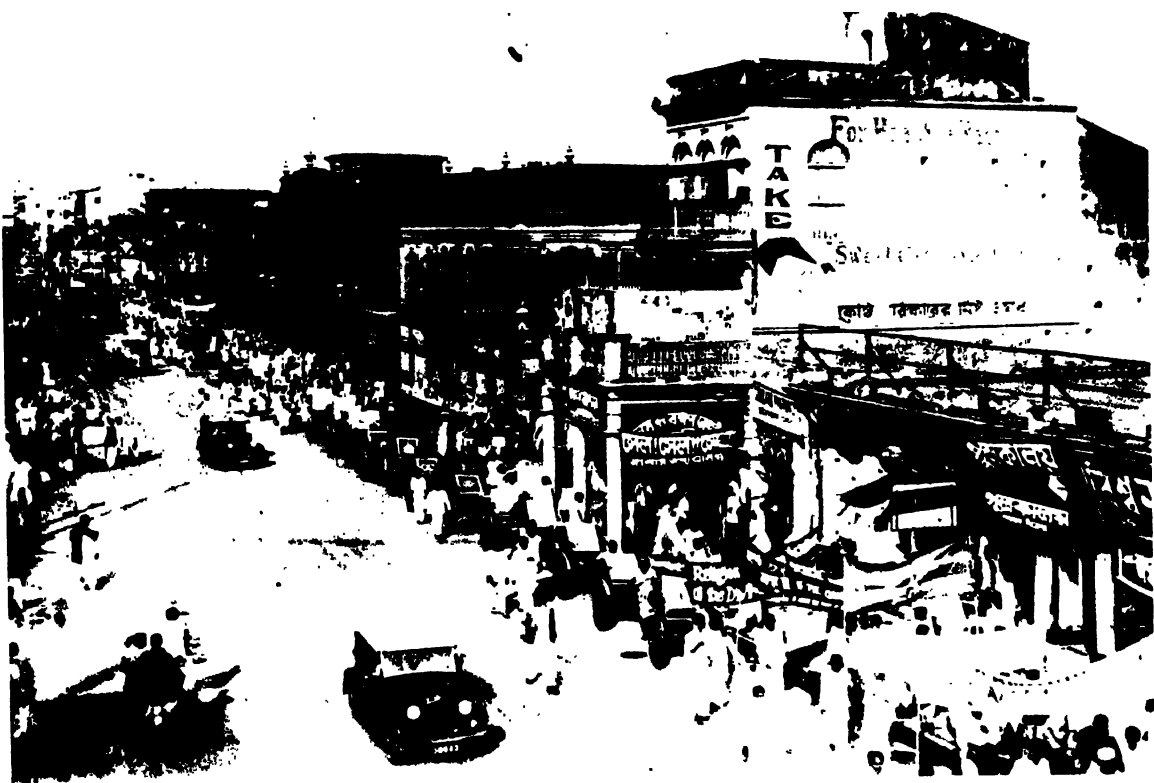
রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব—শোভাযাত্রার একাংশ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রীদের মিছিল

রকমের লাঙলও রাখা হইয়াছে। পল্লীবাসীদের আমোদ ও শিক্ষার নিমিত্ত যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। নাগরদোলাও একটি খুব ঘুরিতেছে দেখিলাম। এখন অনেক দোকানী-পসারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এখানে দোকান খুলে। তাহা হইতে বুঝা যায় তাহারা ও তাহাদের ক্রেতা পল্লীবাসীরা মেলাটির সুবিধা ও হিতকারিতা বুঝিয়াছে।

পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য- ও অন্ন-সমস্যা

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক মেলার সময় সেখানে বীরভূমের স্বাস্থ্যসমস্যা ও অন্নসমস্যার আলোচনা করিবার জন্য একটি কনফারেন্স হয়। তাহাতে স্থানীয় পল্লীবাসীরা ছাড়া বঙ্গের উচ্চপদস্থ কোন কোন সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী কোন কোন কংগ্রেসকর্মী যোগ দিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা-বিভাগের কর্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ তাঁহার একটি মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার অধিকাংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনিকেতনে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে এক দল কর্মী যখন সুরুল গ্রামস্থিত শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। জঙ্গলাকীর্ণ শ্রীনিকেতন তখন ম্যালেরিয়ার প্রধান আড্ডা ছিল। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যাঁহারা এখানে বাস করিতেন তাঁহারা সকলেই ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। গ্রামবাসীদের প্লীহাগ্রস্ত দেহ কৃষির জন্য উপযুক্ত শ্রম করিতে অক্ষম। তখন আমাদিগের হিতৈষী বন্ধু মিঃ এলমহার্ষ্টের উপদেশানুযায়ী একটি ক্ষুদ্র ডাক্তারখানা স্থাপিত হয় এবং কর্ম্মিগণ পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে নয়টি সমবায় পল্লীসংগঠন ও স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিয়া ম্যালেরিয়ার গতিরোধ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই সময় এক জন অভিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া এই সকল গ্রামের বর্দ্ধিত প্লীহার তালিকা (spleen index) লওয়া হয়। তাহাতে দেখা যায় শতকরা ৮০ হইতে ৯৫ জন বালকের বর্দ্ধিত প্লীহা আছে।

উক্ত সমিতির কার্য্য পরিচালনের জন্য পল্লীসমিতির প্রত্যেক সভ্যকে মাসিক।০ চারি আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইত। যাহাদের কোন জায়গা জমি নাই, এবং যাহাদিগকে মজুরি খাটিয়া দিনাতিপাত করিতে হয় তাহাদিগকে মাসে একদিন করিয়া বিনা বেতনে সমিতির জন্য খাটিয়া দিতে হইত। সমিতির সভ্যগণ শ্রীনিকেতন ডাক্তারখানা হইতে /০ এক আনা মূল্যে এক শিশি ঔষধ এবং এক টাকা ফি-তে ডাক্তার ডাকিতে পারিত; সমিতির ডাক্তারের উপদেশানুযায়ী গ্রামবাসিগণ নিম্নলিখিত উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা করিতে থাকেন :—

(১) গ্রামে ড্রেন কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

(২) অনাবশ্যক ডোবা ভরাট করিয়া দেওয়া।

(৩) পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা।

(৪) ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া ফেলা।

(৫) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং শ্রীনিকেতনের সাহায্যে ম্যালেরিয়া ঋতুতে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া কুইনাইন খাওয়ান।

(৬) বর্ষাকালে ডোবা ও পুষ্করিণীতে কেরোসিন দেওয়া।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামে রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য এই সকল সমিতি যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

এই সময় শ্রীনিকেতনে যে-সকল মেডিকেল অফিসার (Medical officer) ছিলেন, তাঁহারা প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্ (private practice) করিতে পারিতেন। সেজন্য সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহারা যথেষ্ট সময় দিতে পারিতেন না। সুতরাং প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গত ১৯২৭ সালে ডাক্তার জিতেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম-বি, পল্লীসংগঠনের কার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল গ্রামের সমিতিগুলি নবজীবন লাভ করে। এই সময় সভ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং ডাক্তারের কাজও বাড়িয়া যায়। সমিতির সভ্যদিগের সুচিকিৎসার জন্য ডাক্তার চক্রবর্তীর উদ্যোগে একটি ক্লিনিকাল ল্যাবরেটারী (Clinical Laboratory) স্থাপিত হয়। অতঃপর ডাক্তার হ্যারি টিমব্রেস (Dr. H. Timbres) নামক এক জন আমেরিকান ডাক্তার ম্যালেরিয়া সার্ভের জন্য শ্রীনিকেতনে আগমন করেন ও বেলুটী, বাহাদুরপুর, ইস্‌লামপুর, লোহাগড় এই চারিটি গ্রামে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া নানাদিক হইতে আরও সমিতি গঠন করিবার জন্য আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এক জন ডাক্তারের পক্ষে অধিকসংখ্যক গ্রামের ভার লওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া কর্ম্মিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহারা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার উপদেশের জন্য উপস্থিত হন। গ্রামের অধিবাসিগণ যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, ভবিষ্যতে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা আমাদের মুখাপেক্ষী না হইয়াও নিজেদের চেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারে তিনি এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে আদেশ দেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রেরণার বলে ১৯৩২ সালে বেলুটী, বল্লভপুর, গোয়ালপাড়া ও বাঁধগোড়ায় চারিটি ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়। এই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ বাহির হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে এই সকল ডাক্তারখানার মূলধন সংগ্রহ করে। এইগুলির পরিচালনার জন্য দুই জন অতিরিক্ত ডাক্তার (Sub-Assistant Surgeon) নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার চক্রবর্তী চীফ্ মেডিকেল অফিসার রূপে ইঁহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। এবং এই সকল স্বাস্থ্য সমিতি পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিধান প্রবর্ত্তন করা হয় :—

(১) চার পাঁচটি গ্রামের ২৫০ আড়াই শত পরিবার লইয়া এক একটি স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক পরিবারকে /০ এক আনা করিয়া মাসিক ও ৩।০ তিন টাকা চারি আনা করিয়া বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে।

(৩) সভ্যগণ /- এক আনা মূল্যে সাধারণ ঔষধ এক শিশি পাইবেন। যাঁহারা সভ্য নহেন তাঁহাদিগকে বাজার দরে ঔষধের মূল্য দিতে হইবে।

(৪) সভ্যগণ ।৹ চারি আনা মাত্র ভিজিটে ডাক্তার ডাকিতে পারিবেন।

(৫) চিকিৎসালয়ে আসিয়া রোগ দেখাইলে ভিজিট লাগিবে না।

(৬) ভিজিটের আয় সমিতির তহবিলে জমা হইবে।

(৭) ডাক্তারের নিজের প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিস্ থাকিবে না।

(৮) সমিতি নিজেদের পঞ্চায়েত নিজেরা নির্ব্বাচন করিবে।

(৯) সমিতির অধীনস্থ গ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বার্ষিক কার্য্যসূচী প্রস্তুত করা হইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ডাক্তার পঞ্চায়েত সভাকে উপদেশ দিবেন এবং তাহাদের কার্য্য-প্রণালী তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই অবস্থায় এক দিকে যেমন দরিদ্র পল্লীবাসী অতি সস্তায় সুচিকিৎসার সুযোগ লাভ করিল, অপর দিকে রোগের উৎপত্তির কারণগুলিকে দূর করিবার জন্য প্রবল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

এই সময় বাঁধগোড়া সমিতির সভ্যগণ তাহাদিগের গ্রামকে ম্যালেরিয়ার গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের সং-দৃষ্টান্তে আকৃষ্ট হইয়া বোলপুরের অধিবাসিগণ ১৯৩৪ সালে তাহা-দিগের সঙ্গে যোগদান করেন। বোলপুর-বাঁধগোড়া স্বাস্থ্য-সমিতি সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছে। ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ সরকার এল্. এম্. এফ্. এক জন কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

বাঁধগোড়া-সমিতির এক জন সভ্যের পরিবারের এক বৎসরের চিকিৎসার ব্যয় হইয়াছে ২২৸৹ বাইশ টাকা বারো আনা। গ্রামের সমিতি না থাকিলে বাজার দরে উক্ত চিকিৎসার ব্যয় হইত ১২৮৷৹ এক শত আটাশ টাকা আট আনা। অতএব দেখা যায়, এই একটি পরিবারের এক বৎসরের চিকিৎসায় ১০৫৸৹ এক শত পাঁচ টাকা বারো আনা বাঁচিয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে সমিতির সাহায্যে সমগ্র গ্রামের চিকিৎসার ব্যয় এক বৎসরে ১৬৮৩৸৹ ষোল শত তিরাশী টাকা বারো আনা বাঁচিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বাঁধগোড়া-সমিতি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নূতন রাস্তা তৈয়ারী, রাস্তা মেরামত, নূতন ড্রেন তৈয়ারী, ও মেরামত, ডোবা ভরাট, জঙ্গল পরিষ্কার ও কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনমত প্রত্যেক বৎসরে দুই-তিন বার করিয়া ডোবা এবং পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার করা হয় এবং ম্যালেরিয়া ঋতুতে নিয়মিত ভাবে কেরোসিন তৈল দেওয়া হয়।

গত অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ (Malaria specialist) ডাক্তার এস. এন. সুর মহোদয় যখন স্বাস্থ্য-সমিতি পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন বাঁধগোড়া গ্রামে কোনও বালকের বর্দ্ধিত প্লীহা পান নাই। ইহা যে তাঁহাদের সৎচেষ্টার ফল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১৯৩৩ সালে বিহুড়ী পল্লীসংগঠন কেন্দ্রে উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী আর একটি স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করা হয় এবং ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এল্-এম্-এফ্, এক জন কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে সমিতির কার্য্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীনিকেতন হইতে প্রথম দুই বৎসর এই সমিতির ব্যয়ের অর্দ্ধেক বহন করা হয়। গত বৎসর হইতে শ্রীনিকেতনের কোন আর্থিক সাহায্য না লইয়া সমিতির সভ্যগণ ইহার যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিষয়ে সমিতির সভাপতি এবং রূপপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল এবং রূপপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। অপরাপর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ উক্ত প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ইউনিয়নেই এইরূপ স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইতে পারে।

মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ বাহাদুর এই দুইটি সমিতির সফলতা দর্শনে আনন্দিত হইয়া আরও পাঁচটি নূতন স্বাস্থ্য-সমিতি গঠনের জন্য বিশ্বভারতীর হস্তে ১১,০০০৲ এগার হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন এবং এই অর্থের সাহায্যে ইলামবাজার বাহিরী আদিত্যপুর, লাঙ্গুলিয়া ও আদিরেপাড়ায় পাঁচটি স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতিগুলির শৈশব অবস্থা এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। তন্মধ্যে অধিকাংশ সমিতির কার্য্যই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এক বৎসর অতিবাহিত না হইলে উহার ফলাফল নির্দ্দেশ করিতে পারিব না।

এই বৎসর এই জিলায় মশার উপদ্রব খুব কম, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে গত বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে গ্রীষ্মকালে গ্রামে খুব অল্প জায়গাতেই জল ছিল, সেজন্য মশার উৎপত্তিস্থানের অভাব হওয়ায় উহাদের পর্য্যাপ্তরূপে বংশবৃদ্ধি সম্ভবপর হয় নাই। ম্যালেরিয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুর মনে করেন যে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন অধিকাংশ নালা ডোবা শুকাইয়া যায় তখন যদি গ্রামের যাবতীয় পুষ্করিণী ও ডোবা পরিষ্কার করিয়া নিয়মিতরূপে কেরোসিন প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সেই গ্রামে মশককুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে এবং বর্ষাকালে গ্রামের বহু স্থানে জল জমিলেও ডিম পাড়িবার জন্য মশা আর থাকিবে না এবং তখন কেরোসিন দেওয়ারও কোন প্রয়োজন হইবে না। শীত ও গ্রীষ্মকালে গ্রামে অল্প জায়গায় জল থাকে বলিয়া কেরোসিন দেওয়ার ব্যয়ও কম হইবে। এই মতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আমরা গোয়ালপাড়া গ্রামে পরীক্ষা করিতেছি। তথায় ৫৬টি পুকুর ও ডোবা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া সেগুলিতে সপ্তাহে এক দিন করিয়া কেরোসিন প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কাজ চলিবে।

গত তিন বৎসর হইতে এই গোয়ালপাড়া গ্রামে স্বাস্থ্য-সমিতির কার্য্য সুরু করা হয় এবং ইতিমধ্যে তাহারা স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে রাস্তা মেরামত, ড্রেন মেরামত, জঙ্গল কাটা, ডোবা ভরাট, পুকুর পরিষ্কার কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে। এই কার্য্যের ফলে উক্ত গ্রামে বর্দ্ধিত প্লীহার হার শতকরা ৬৭ হইতে কমিয়া শতকরা ৩৪ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বৎসর ম্যালেরিয়া ঋতুতে নিয়মিত ভাবে পুকুর পরিষ্কার করা ও কেরোসিন দেওয়া হয়।

যে-সকল গ্রামে এই বৎসর স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করিয়াছি সেই সকল গ্রামের স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার সহিত তুলনা করিয়া বৎসরান্তে আমরা

ফলাফল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রতিদিনই অনুভব করিতেছি যে পল্লীগ্রামে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি পালন সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্য। এই বিষয়ে তাহাদের চিত্তকে সচেতন করিবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদির সাহায্যে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গের বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার অবস্থা বীরভূমের সদৃশ। তথাকার বহু পল্লীগ্রামে শ্রীনিকেতন-প্রবর্ত্তিত স্বাস্থ্য-সমিতিসমূহের মত সমিতি স্থাপিত ও পরিচালিত হইলে তাহার দ্বারা দেশের হিত হইবে বলিয়া সমিতিগুলির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিলাম।

কন্‌ফারেন্সটিতে বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। জলসেচনের অনেক হাজার পুষ্করিণী বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আছে (বা ছিল)। কিন্তু অধিকাংশ ভরাট বা আধ-ভরাট হইয়া যাওয়ায় তদ্দ্বারা জলসেচনের কাজ হয় না, অধিকন্তু সেগুলি মশার উৎপত্তির কারণ হইয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যনাশ করে। এইগুলির পঙ্কোদ্ধার একান্ত আবশ্যক। তাহার জন্য অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা গবর্ন্মেণ্টের দেওয়া উচিত। তাহা গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য। এবং তাহাতে গবর্ন্মেণ্টের লাভ বই লোকসান হইবে না। এইরূপ ব্যয় করিলে যে-সব গ্রামের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইবে, তথাকার লোকদের চাষের আয় বাড়িবে ও স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তাহাতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে গবর্ন্মেণ্টেরও আয় বাড়িবে।

—

ব্যবসায়ী সমিতি

ফরিদপুর জেলার ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে কয়েক দিন পূর্ব্বে ফরিদপুর গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে এক বার ও অপরাহ্ণে এক বার তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাতঃকালের অধিবেশনে সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় একটি বহুতথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি, ফরিদপুর হইতে যত রকম জিনিষ রপ্তানী হয় বা হইতে পারে, এবং ফরিদপুরে যত রকম জিনিষ আমদানী হয়, তাহার প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির উল্লেখ করেন; ফরিদপুরের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের উল্লেখ করেন এবং লাভজনক আরও কি কি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহা বলেন; এবং স্থলপথে ও জলপথে যাতায়াত ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর সুবিধা-অসুবিধার কথা বলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্য নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধার কথাও তাঁহার অভিভাষণে ছিল।

অপরাহ্ণের অধিবেশনে সমিতির নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটিতে রেল ও ষ্টীমারের কর্তৃপক্ষ এবং গবর্ন্মেণ্টকে ব্যবসায়ীদিগের অনেক অসুবিধার কথা জানান হইয়াছে। এইগুলি শীঘ্র দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

ভেজাল দ্রব্যের সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধীয় অসুবিধা ও অভিযোগটির প্রতিকার না হইলে শুধু যে ব্যবসায়ীদের অসুবিধা তাহা নহে, যে-সকল ক্রেতা না-জানিয়া ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ভেজাল দ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি ও তাহার আলোচনা হইতে জানিলাম, যে, ভেজাল জিনিষের পরীক্ষার ফল জানিতে পাঁচ ছয় মাস বিলম্ব হয়, তত দিনে দোকান হইতে তাহা সমস্তই বিক্রী হইয়া যায় এবং তাহার ব্যবহারে সাধারণের যে স্বাস্থ্যহানি হইবার তাহা হইয়া যায়। তখন ভেজাল-দ্রব্যবিক্রেতা দোকানদারের শাস্তি হইলেও ক্রেতাদের স্বাস্থ্যহানি যাহা হইয়া যায় তাহার কোন প্রতিকার হয় না।

অভিযোগটির আলোচনায় ইহাও শুনিলাম, যে, ভেজাল দ্রব্য যাহারা উৎপাদন করে—যেমন ভেজাল সরিষার তেল উৎপাদক কলওয়ালা, শাস্তি তাহাদের হয় না; কিন্তু মফস্বলের যে আমদানীকারী খুচরা বিক্রেতা তাহা আমদানী করিয়া বিক্রী করে, শাস্তি তাহার হয়, কারণ ভেজাল দ্রব্যের নমুনা তাহার দোকান হইতে গৃহীত।

ফরিদপুরে যেরূপ ব্যবসায়ী সমিতি আছে, তেমন সমিতি আর কোন্ কোন্ জেলায় আছে জানি না। কিন্তু সকল জেলাতেই এই প্রকার সমিতি থাকা উচিত, এবং সকলগুলির সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য ও প্রয়োজন-মত পরামর্শের জন্য কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সমিতিও একটি থাকা আবশ্যক। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের উদ্দেশ্য যদি এইরূপ হয় এবং তাহার দ্বারা যদি এইরূপ কাজ হয়, ত ভালই। নতুবা অন্য একটি কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে বাঙালীও সভ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে অবাঙালীর সংখ্যা ও প্রাধান্যই বেশী। মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদেরই স্বার্থ দেখা হয়। সুতরাং বাঙালী ব্যবসাদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া বাঙালীদের ব্যবসায়ী সমিতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ফরিদপুর ব্যবসায়ী সমিতি কোন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যবসাদারের সমিতি নহে। এই জন্য এই প্রকার সমিতির দ্বারা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ফরিদপুর ব্যবসায়ী সমিতির কার্য্যবিবরণ, প্রস্তাবাবলী এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের অভিভাষণটি মুদ্রিত হইয়া সকল জেলার ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে ফল ভাল হইবে মনে করি।

—

অধ্যাপকের মহৎ দান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। আবার এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। তাহার আইনানুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত হইতেছে। অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ধনী লোক নহেন, তিনিও ধনী নহেন। তিনি সস্ত্রীক অতিশয় সাদাসিধা ভাবে থাকিয়া অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও কলেজ-পরিদর্শক রূপে যাহা পাইয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই এই প্রকারে দান করিয়াছেন।

ধন্য তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

—

ফজলল হকের জয়

খাজা নাজিমুদ্দিনকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যনির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত করিয়া মিঃ ফজলল হক যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহার রাজনৈতিক অর্থ ব্যাখ্যা অনেক কাগজে করা হইয়াছে। আমরা ইহার অন্য একটা দিকের উল্লেখ করিতেছি। খাজা নাজিমুদ্দিন পুরুষানুক্রমে বাঙালী ও বাংলার নিমক খান, কিন্তু বাংলা বলেন না—বলেন উর্দ্দু। মিঃ ফজলল হক বাংলাভাষী বাঙালী। বঙ্গে বাংলাভাষী বাঙালীর কাছে উর্দ্দুভাষী বাঙালীর পরাজয় ঠিকই হইয়াছে।

—

সম্পত্তিতে হিন্দু-বিধবাদের অধিকার

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সম্পত্তিতে বিধবাদের ও অন্য নারীদের যে অধিকার আছে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক পণ্ডিতী ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে সেই অধিকার হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইহা দেখাইয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ডাঃ দেশমুখের চেষ্টায় যে নূতন আইন প্রণীত হইল, তাহাতে হিন্দু বিধবাদের অধিকার কতকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। আইনসচিব সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, আইনটি দ্বারা যতটা অধিকার প্রদত্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই, কিন্তু কতকটা হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, আমরা স্বয়ং অন্যের দাস হওয়ার ফলে নারীদিগকে আমাদের দাসের মত করিয়াছি। বস্তুতঃ সর্ নৃপেন্দ্রনাথ অনুকূল থাকাতেই ডাঃ দেশমুখের বিলটি পাস হইতে পারিয়াছে। এই জন্য, ডাঃ দেশমুখের মত তিনিও কৃতজ্ঞতার পাত্র ও ধন্যবাদভাজন।

—

ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেক-উৎসব

ইংলণ্ডে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিষেক-উৎসব হইবে, কিন্তু আগামী শীতকালে তাঁহার ভারতে অভিষেক-উৎসব উপলক্ষ্যে যে তাঁহার এদেশে আসিবার কথা ছিল, তাহা তিনি আসিতে পারিবেন না—তখন তিনি বেশীদিন ইংলণ্ড হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। ইউরোপের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইহা বিচিত্র নহে।

যে আটই ফেব্রুয়ারী ঐ সংবাদ ভারতবর্ষে আসে সেই আটই ফেব্রুয়ারী পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন হয়, যে, ভারতে অভিষেক-উৎসব 'বয়কট' করিতে অনুরোধ করিয়া কংগ্রেস একটি প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছে; অতএব ভারতসচিব কি তাহা বিবেচনা করিয়া রাজাকে তদনুরূপ পরামর্শ দিবেন। উত্তরে সহকারী ভারতসচিব বলেন, রাজা ভারতে গেলে ভারতীয়েরা খুব রাজভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিবে ইহা নিশ্চিত; সুতরাং ভারতসচিব কংগ্রেস-প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া কোন পরামর্শ দিবেন না (অর্থাৎ রাজাকে ভারতবর্ষে না যাইতে পরামর্শ দিবেন না)। এদিকে কিন্তু, যাহার পরামর্শেই হউক, রাজা ঐ প্রশ্নোত্তরের পূর্ব্বেই বা তৎসমকালেই আপাততঃ ভারতবর্ষে না-আসাই ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছিলেন!

ইহাকে কাকতালীয় ন্যায় বলিব, না আর কিছু?

—

রামমোহন রায় সম্বন্ধে সত্যনির্ণয়

রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক গুজব ও নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। সেগুলি সত্য কি মিথ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক ছিল। রামমোহন রায়ের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারিত নিন্দা বিশ্বাস করেন না। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবিশ্বাস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট নহে। অবিশ্বাস প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আগে যে-সকল তথ্য জানা ছিল এ-পর্য্যন্ত তাহার সাহায্যেই নিন্দাগুলার অমূলকত্ব প্রমাণিত হইতেছিল। তাহার পর গত কয়েক মাস হইতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের অনুসন্ধানে কলিকাতায় ও বর্দ্ধমানে সরকারী রেকর্ড আফিসসমূহে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তজ্জন্য ইঁহারা ধন্যবাদার্হ। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই সব নীরস দলিল অনেক পরিশ্রম করিয়া ধৈর্য্যসহকারে অধ্যয়নপূর্ব্বক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখায় সত্যনির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য হইয়াছে। তাহার জন্য তিনি সত্যজিজ্ঞাসু সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা

করিয়া তাঁহাকে যে-প্রকারে উৎপীড়িত করা হইয়াছিল, তাহা বহুপরিমাণে জানা গিয়াছে। তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে মোকদ্দমাজালে জড়িত করিয়া পিতা ও পুত্রকে বহু বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্যাতন করা হইয়াছিল, তাহা যতীন্দ্রবাবু ও রমাপ্রসাদবাবু অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধেও রমাপ্রসাদবাবু কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিবেন। এইগুলি হইতেও রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্তে আলোকপাত হইবে। সমুদয় মূল দলিল পুস্তকাকারে বাহির করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা

বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত গত বৎসর একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার ভারও এই কমিটির উপর ছিল। এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র রিপোর্টটির আলোচনা এখানে করা সম্ভবপর নহে। কেবল ধর্ম্মশিক্ষাবিধি সম্বন্ধে কিছু বলিব। বলিয়া রাখা ভাল, ধর্ম্মশিক্ষার বিরোধী আমরা নহি।

যে-সকল বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে, তাহাতে তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার আমরা প্রথম হইতেই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। জাপানে ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সংখ্যা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক কম। তাহা সত্ত্বেও জাপানী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা নিষিদ্ধ। কমিটির অন্যতম সভ্য অধ্যাপক অনাথনাথ বসু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাদান বিষয়ে অন্য সভ্য সকলের মতের ও রিপোর্টের সহিত অনৈক্য জানাইবার নিমিত্ত একটি পৃথক্ মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন ও তাহা রিপোর্টের সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা শিক্ষানুরাগী সকলের পড়া উচিত।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, একই বিদ্যালয়ে নানা ধর্ম্ম নানা ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদিগকে শিখাইবার চেষ্টায় শৈশব হইতেই তাহাদের ভেদবোধ জাগ্রত করা হইবে, মানবিক ঐক্যবোধ জন্মান হইবে না। ইহা হিতকর নহে, অমঙ্গল-জনক।

মুসলমান বালক-বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কেননা, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য; তদ্ভিন্ন আবার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তালিকায় যে-সকল আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার কেবল দু-একটির অর্থ জানি, অন্যগুলির জানি না।

হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষাবিধির আলোচনায় আমরা, হিন্দুধর্ম্মে কি শ্রেষ্ঠ কি অশ্রেষ্ঠ, এরূপ কোন বিচার করিব না। প্রচলিত হিন্দু মত যাহা তাহাই শিখাইতে হইবে, ইহা ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। তাহাও বিস্তারিত ভাবে এখন করিতে পারিব না।

হিন্দুধর্ম্মশিক্ষাবিধিতে যাহা যাহা শিখাইতে বলা হইয়াছে, তাহার অনেক অংশ এবং অনেক বাক্য ও শ্লোক বালক-বালিকাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝাইতে বলা হইয়াছে। তাহা খুব সহজ নহে।

ধর্ম্মকে ইংরেজীতে religion and morality বলিয়া কমিটি ঠিক করিয়াছেন। শিশুদের শিক্ষায় ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ মত অপেক্ষা সুনীতি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া শ্রেয়ঃ। নিরাকার উপাসনা হিন্দুধর্ম্মসম্মত বলিয়া কমিটি যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সন্তোষের বিষয়; কেননা, সাধারণতঃ শিক্ষিত হিন্দুরাও সাকার উপাসনাকেই হিন্দুধর্ম্মসম্মত মনে করেন। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আবার নিরাকার উপাসনা অসম্ভব বলিয়াছেন!

"God has appeared to devotees in many forms," "ঈশ্বর ভক্তদের নিকট নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন," এই উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু ইহার পর যে বলা হইয়াছে, যে, "The hymns selected should have no exclusive reference to any particular form or aspect of the Deity," "[মুখস্থ করিয়া প্রার্থনার সময়ে আবৃত্তির নিমিত্ত] যে-সকল স্তোত্র নির্ব্বাচিত হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কেবল বিশেষ কোন মূর্ত্তিরই উল্লেখ যেন না-থাকে," তাহা বলায় প্রথমোক্ত উক্তিটির গুরুত্ব কমান হইয়াছে। কারণ, যদি ঈশ্বর নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন মূর্ত্তিরই উল্লেখ অবৈধ নহে। অবশ্য আমরা নিজে এরূপ স্তোত্রেরই পক্ষপাতী যাহাতে কোন মূর্ত্তির উল্লেখ নাই।

আদর্শ পুরুষ ও নারী চরিত্র বুঝাইবার নিমিত্ত পৌরাণিক বহু আখ্যায়িকার ব্যবহার করিতে বলিয়া কমিটি ঠিক করিয়াছেন।

> জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এই বচনটির প্রকৃত অর্থ বালক-বালিকাদের বোধগম্য হইবে কি? বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়েরা ইহার প্রকৃত অর্থ জানেন কি? সাংসারিক লোকেরা ইহার দ্বিতীয় পংক্তিটির এইরূপ (উল্টা) মানে করিয়া থাকে, যে, "আমরা মন্দ যাহা করি, তাহাও ভগবান করান, সুতরাং তাহাতে

আমাদের কোন দোষ বা পাপ হয় না ;" অথচ ইহার প্রকৃত অর্থ, হৃদিস্থিত ভগবান যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব। এই সব সাংসারিক লোকদের মত বালক-বালিকাদের কুবুদ্ধিবিচলিত হইবার আশঙ্কা নাই কি ?

. একটি বচনে বলা হইয়াছে, বেদ, স্মৃতি, সদাচার, নিজ আত্মার অনুমোদন—এই চারিটি ধর্ম্মের লক্ষণ। কিন্তু প্রাধান্য কাহার ? কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে, যে, বেদসকল বিভিন্ন, স্মৃতিসকল বিভিন্ন, এবং যাঁহার মত ভিন্ন নহে তিনি মুনি নহেন। ইহাও উক্ত হইয়াছে, যে, কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। গীতাতে "বেদবাদরত" লোকদের নিন্দা করা হইয়াছে।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ব্যাখ্যা করিয়া শিখাইতে বলা হইয়াছে। এই প্রকার দার্শনিক মত শিক্ষা বালক-বালিকাদের উপযোগী কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

হিন্দুশাস্ত্র বহু ও বিস্তীর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম খুব ব্যাপক। উভয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী জিনিষ আছে। সমুদয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কিছু নির্দ্দেশ দিতে গেলে তাহা অল্প বয়সের মানুষদের উপযোগী হয় না। অথচ বালক-বালিকাদিগকে ধর্ম্ম যদি শিখাইতে হয়, তাহা হইলে তাহা জটিলতাবর্জ্জিত ও সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যক।

খ্রীষ্টিয়ান বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রটেষ্টাণ্টদের জন্য এক প্রকার ও রোমান কাথলিক বালক-বালিকাদের নিমিত্ত অন্য এক প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোনটিরই বিস্তারিত আলোচনা করিব না—রোমান কাথলিক পদ্ধতিটিতে বিস্তারিত কিছু লিখিত না থাকায় তাহার আলোচনা করা সম্ভবপরও নহে। প্রটেষ্টাণ্ট পদ্ধতিটিতে এদেন উদ্যানের (Garden of Eden-এর) কাহিনীটি শিখাইতে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যে, আদম ও হবা যে ঈশ্বরের অবাধ্য হইয়াছিলেন, সেই অবাধ্যতার কাহিনী এবং পৃথিবীতে পাপের প্রবেশের কাহিনী বাদ দিতে হইবে। এগুলি কি বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বাদ দেওয়া হইবে, না অনিষ্টকর বলিয়া বাদ দেওয়া হইবে ?

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ছাড়া অন্য ধর্ম্মের বালক-বালিকারা ধর্ম্মশিক্ষার ঘণ্টায় কি করিবে ?

—

শ্রীনিকেতনে গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়

সরকারী গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়সকলে পাঠশালায় গুরু হইবার উপযোগী শিক্ষা দিবার কথা। অর্থাৎ পাঠশালা-সকলে যে-সব বিষয় শিক্ষা দিতে হয়, সেগুলি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মাইবার ও শিক্ষাপ্রণালী শিখাইবার কথা। এই কাজ বিদ্যালয়গুলি কিয়ৎপরিমাণে করিয়া থাকে। কিন্তু যে-শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদিগকে শিখান হয়, তাহা সেকেলে গোছের—আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানের সহিত তাহার সম্পর্ক কম। অধিকন্তু, যে-গ্রামসমূহে গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষা দিতে ও জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহার নানাবিধ সমস্যার সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করিবার ও তৎসমুদয়ের সমাধানকল্পে কিছু করিতে শিখাইবার কোন চেষ্টা এই সব বিদ্যালয়ে হয় না। মোটামুটি এইরূপ কারণে, গবর্ন্মেণ্ট বিশ্বভারতীর পরিচালনার অধীন একটি গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় শ্রীনিকেতনে স্থাপন করা মঞ্জুর করিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে সেখানে শিক্ষাধীন গুরুরা শিশুমনস্তত্ত্বের ও শিশুশিক্ষার আধুনিকতম তত্ত্বের ও প্রণালীর সহিত পরিচিত বিশ্বভারতীর কতিপয় অধ্যাপকের সাহায্য পাইবেন ও গ্রাম্য সমস্যাসমূহের সমাধানরীতিও শিখিবেন।

বিদ্যালয়টির কাজ গত ২রা জানুয়ারী আরম্ভ হইয়াছে। শান্তিনিকেতন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেনের উপর ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছে।

সুইডেনে হাতের কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ইউরোপের বহু দেশের হাতের কাজ শিক্ষার প্রণালীর সহিত পরিচিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ নানা প্রকার হাতের কাজ ও কোন কোন কুটীরশিল্প শিখাইবেন।

—

মেদিনীপুরে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর জয়

গবর্ন্মেণ্টের দমননীতি ও কংগ্রেসবিরোধী নীতি মেদিনীপুর অপেক্ষা অন্য কোন জেলায় কঠোরতর রূপে প্রযুক্ত হয় নাই। এ হেন জেলায় গবর্ন্মেণ্টের প্রিয়পাত্র প্রার্থীকে ৬৫০০০ ভোটে পরাজিত করিয়া কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ নির্ব্বাচিত হওয়াতে বুঝা গেল এত করিয়াও সরকার মেদিনীপুরকে কংগ্রেসবিরোধী করিতে পারিলেন না। অথবা হয়ত ইহা বলাই ঠিক যে, গবর্ন্মেণ্ট এত করিয়াছেন বলিয়াই মেদিনীপুর বেশী করিয়া বেহাত হইয়া গেল।

—

ইংলণ্ডেশ্বরের ভ্রাতারা কি রাজবন্দী ?

সিংহাসনত্যাগী ভূতপূর্ব্ব রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড এখন উইণ্ডসরের ডিউক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার এক ভাইয়ের তাঁহার সহিত ইউরোপে তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থানে দেখা করিবার কথা উঠে। ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। রাজভ্রাতারা কি রাজবন্দী ? না, তাঁহারা সরকারী ভাতা পান বলিয়া মন্ত্রীদের আদেশ শুনিতে বাধ্য ? এরূপ কোন সন্দেহ আছে কি যে, উইণ্ডসরের ডিউক তাঁহাদের সহিত কোন ষড়যন্ত্র করিতে পারেন ?

—

আচার্য্য উইণ্টারনিট্জ্

চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগের জর্ম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর মরিস্ উইণ্টারনিট্জের মৃত্যুতে পাশ্চাত্য মহাদেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের তিরোধান হইল। তিনি কেবল বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, মানুষ হিসাবেও খুব বড় ছিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রাগে তাঁহার বাড়ীতে ও প্রাগের অন্যতম পৌরজনরূপে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, কলিকাতায় যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িতেছে। প্রাগে রবীন্দ্রনাথের ও আমাদের কয়েক জনের চিঠিপত্র তাঁহার ঠিকানায় আসিত। তিনি ডাকপিয়নদের মত একটি ব্যাগে করিয়া সেগুলি হোটেলে আমাদিগকে দিয়া যাইতেন। প্রাগে আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি। তথাকার প্রসিদ্ধতম ডাক্তার আমাকে রাত্রে ফ্লানেলের পাজামা ও জামা ব্যবহার না করিয়া সাধারণ সুতী পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে বলেন। ইউরোপে সেরূপ কিছু দরকার হইবে না মনে করিয়া সুতী সব জামা পাজামা আমি পূর্ব্বেই আমার একটি আমেরিকা-প্রত্যাগত ভারতবর্ষযাত্রী প্রাক্তন বাঙালী ছাত্রের মারফৎ জেনিভা হইতে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার সুতী জামা পাজামা কিছু নাই, অধ্যাপক উইণ্টারনিট্জ্ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রমুখাৎ শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সস্ত্রীক আমাদের হোটেলে আসিয়া আমার অন্য জামা পাজামা দোকানে লইয়া গিয়া সেই মাপের সুতী জিনিষ আমার জন্য কিনিয়া আনিয়া দিলেন। এই সামান্য ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম, এই জগদ্বিখ্যাত ও আমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়ের সহৃদয়তার ক্ষুদ্র একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। প্রাগের জর্ম্যান থিয়েটারে যখন রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" জর্ম্যান ভাষায় অভিনীত হয়, তাহার পূর্ব্বে অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বলেন, "আমি আপনাদের দেশের ও জাতির সহিত পরিচিত বলিয়া, অভিনয় যাহারা করিবে তাহাদিগকে আমি শিখাইয়াছি; অভিনয় কেমন হয় আমাকে বলিবেন।" অভিনয়ের পর তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম, যে, ভালই হইয়াছে।

তিনি নিজে অসাংসারিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের মানুষ ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী গৃহিণী গুছাইয়া সংসার চালাইতেন ও তাঁহাকেও চালাইতেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাহাতে তিনি বড় আঘাত পান বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না, তাঁহার জীবনপথের সঙ্গিনী হারাইয়া অনেকটা অসহায়ও হন।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক মহাশয়কে তাঁহার অন্যতম বন্ধুরূপে এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপক রূপে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাঁহার ভগিনীকে কবি সমবেদনা জানাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক মহাশয় সম্বন্ধে লিখিত প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য :—

The news was indeed painful for us, who were used to looking upon him as one of our truest and most respected friends outside India. During my long life and extensive travels, I never met a savant more worthy of respect than the learned doctor. His deep and broad humanity, co-extensive with his amazingly wide scholarship, his devotion to truth and the courage with which he held fast to his idealism in the midst of a growingly hostile atmosphere in Central Europe, are his claims to our homage. In him I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friends, and humanity one of its most sincere champions.

অধ্যাপক মহাশয় মডার্ন রিভিয়ু মাসিক পত্রে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এখন কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা মনে পড়িতেছে। অধ্যাপক মহাশয়ের সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটি চৈত্রের প্রবাসীতে ছাপিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যাতেই উহা অধিকতর সময়োচিত হইবে মনে করিয়া এখানেই দিতেছি।

—

উইন্টারনিট্জ্

এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের জীবন বাহিরের ঘটনা দিয়া সম্পূর্ণ জানা যায় না। অধ্যাপক উইন্টারনিট্জ্ (Winternitz) ছিলেন এইরূপ মানুষ। ভারতের প্রতি এমন খাঁটি ও গভীর অনুরাগ ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রে ও বিদ্যায় এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখা যায় না।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রিয়ার নিম্ন প্রদেশে তাঁহার জন্ম। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষোল কি সতর বৎসর বয়সে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দর্শনশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞানই ছিল তাঁহার মুখ্য সাধনার বিষয়। তাহার পর বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, অধ্যাপক বূলরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। তখন হইতে তিনি নৃতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসর বয়সে, তিনি ডক্‌টর উপাধি লাভ করিলেন। জ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম উপহার হইল আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র। এই গ্রন্থখানি সম্পাদনে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

এই সময় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের বিখ্যাত ঋগ্বেদ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন হয়। তাই তিনি এক জন যোগ্য সহকর্ম্মী খুঁজিতেছিলেন। আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র গ্রন্থখানির সম্পাদনপ্রণালী দেখিয়া তিনি যুবক উইন্টারনিট্জকেই তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে মনোনীত করিলেন।

তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। এই বয়সেই তিনি যেরূপ নিপুণ পাণ্ডিত্যের সহিত ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণটি বাহির করিলেন, তাহাতে এই গ্রন্থখানিই তাঁহার তপস্যা ও সাধনার অমর কীর্তিস্তম্ভ হইয়া রহিল।

এই উপলক্ষ্যে তিনি অফ্রেক্‌ট প্রভৃতি বহু প্রবীণ আচার্য্যগণের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। কতকটা তাঁহার নৃতত্ত্বের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বৈদিক যুগের উদ্বাহকাণ্ডের দিকে। তাঁহার রচনা এই বিষয়ে বহু পরিমাণে আলোকপাত করিল। তাঁহার সম্পাদিত আপস্তম্ব মন্ত্রপাঠও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনার সাক্ষী।

ইহার পর তিনি যে-কাজে হাত দিলেন তাহা একান্ত নীরস ও একঘেয়ে হইলেও তাহার দ্বারা তাঁহার অনুরাগ ও সাধনা একটি কঠিন প্রতিষ্ঠাভূমি ও যাথাতথ্য লাভ করিল। তিনি বিখ্যাত বড্‌লিয়ান গ্রন্থালয়ের বৈদিক পুঁথির সূচী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের পুস্তকালয়স্থিত দক্ষিণ-ভারতীয় পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন। এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি মহাভারতের মহিমা উপলব্ধি করেন এবং এই মহাগ্রন্থের একখানি সুসম্পাদিত সংস্করণের প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। নৃতত্ত্বের প্রতি তাঁহার অনুরাগও কতক পরিমাণে ইহার হেতু হইতে পারে। এই নৃতত্ত্বানুরাগই তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Position of Women in Brahmanic Literature-এর ("ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নারীর সামাজিক অবস্থা"র) মূল কারণ। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহারও পারিচয় দিয়াছেন তিনি বহু গ্রন্থে এবং রচনায়।

তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ তিনি আপন হস্তেই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা তাঁহার তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ History of Indian Literature ("ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের ইতিহাস")। এই গ্রন্থখানা প্রথমে বাহির হয় জর্ম্যান ভাষায়, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

ইহার পরে তিনি আসেন ভারতে। এদেশে তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে মুখ্য হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Six Readership Lectures।

জ্ঞানক্ষেত্রের বিখ্যাত দুইখানি জর্ণালও তাঁহার প্রেরণায় চালিত হইত। জীবনে ছোট বড় গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রায় চারি শতখানি তাঁহার রচনা। মোট কথা, আপন স্মৃতিস্তম্ভ রচনার ভার তিনি পরহস্তে রাখিয়া যান নাই।

এই পর্য্যন্ত তাঁহার যে জীবন তাহা তাঁহার গ্রন্থাদি দেখিয়াই জানা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার আসল মাহাত্ম্যটি আমরা ধরিতে পারিলাম না। তাহার সন্ধান পাইলাম বিশ্বভারতীর সাধনা-ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা।* কবিবরের নিমন্ত্রণে তিনি আসিলেন ভারতে। বিশ্বভারতীতে পৌছিবার পূর্ব্বে পথে তিনি কয়দিন কাটাইয়া আসিলেন পুনায়। সেখানে বিখ্যাত ভাণ্ডারকর ইনস্‌টিটিউটে তিনি দেখাইয়া দেন কেমন করিয়া ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের পুঁথি মিলাইয়া সুবিচারসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হয়। তাঁহার প্রদর্শিত এই প্রণালীতেই বুঝা যায় তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞান।

যদিও তাঁহার জ্ঞান ছিল অতি বিস্তৃত ও অতুলনীয় তবু তাহা কোন প্রকারেই নির্জীব ও অচল প্রকৃতির ছিল না। এই দেশের জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার মনীষা বহু দিকে নব আলোক লাভ করিল। সেই সব সম্পদে পূর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগটি তাঁহার স্বরচিত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থখানি মূল জর্ম্যান ভাষা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করিতেছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইল তাহার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডখানা সম্পূর্ণ হইল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় খণ্ডখানার কাজ চলিতেছে এমন সময় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। আমরা সবাই তাঁহার তৃতীয় খণ্ডখানির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম। তাই তিনি একটু সুস্থ হইয়াই জানাইলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল হইতেছে, শীঘ্রই তিনি কাজে হাত দিতে পারিবেন।

আমরা তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহার তৃতীয় খণ্ডখানিতে ভারতের অনেক রহস্যপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আলোকপাত করিবার কথা। এই ইংরেজী অনুবাদ ত অনুবাদ মাত্র নহে, ইহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার পরিণত জীবনসঞ্চিত তাবৎ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য, এই অমূল্য গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাকে অমরধামে প্রয়াণ করিতে হইল।

তিনি যখন প্রথম বিশ্বভারতীতে আসিলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল তাঁহার অতুলনীয় ভদ্রতা, বিনয় ও চরিত্রমাধুর্য্য। আমাদের কাছেও তিনি শ্রদ্ধানত ছাত্রের মত বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করিতেন। অথচ সেই সব বিষয়ে দেখিতাম তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অবধি নাই।

---

* প্রাগে কবিকে তথাকার পৌরজনদিগের পক্ষ হইতে যে সম্বর্দ্ধনা করা হয়, তদুপলক্ষ্যে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন।

প্রবাসীর সম্পাদক।

বাম দিক হইতে—অধ্যাপক উইন্টারনিট্জ্, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক লেজ্নী
—১৯২৮ সালে প্রাগ শহরে গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

তাঁহার সম্পাদন ও বিচারপ্রণালীর মধ্যে যেমন দেখা যাইত তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা তেমনি থাকিত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ় হইলেও তাঁহার বিচারবুদ্ধি ছিল সদা জাগ্রত। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদের আলোচনায় তিনি মহৎ সব ভাবের প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন তেমনি অসার ও হীন বস্তুর প্রতি কখনও মিথ্যা সম্মান দেখান নাই। এক কথায় তাঁহার বিচারপ্রণালীর মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বোধ (balance) ছিল। তাহাই তাঁহার প্রণালীর বিশেষত্ব।

আমাদের মনে তখন একটা ভাব ছিল যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মের মধ্যে তেমন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু উইন্টারনিট্জের ক্ষেত্রে এই কথাটা খাটিল না। তিনি নিজে মহৎ ছিলেন বলিয়া ভারতীয় সাধনার যথার্থ মাহাত্ম্য তাঁহার কাছে সহজে ধরা দিল। শুধু পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেই এই মর্ম্মগত পরিচয়টি লাভ করা সম্ভব হয় না।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন কঠ, ১,২,২৩

ভারতীয় সাধনায় আত্মা ত এক বিরাট সাধনার উপলব্ধির বস্তু। কিন্তু এই কথাই বিচার্য্য যে, যে-কোন মানুষের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাই কি সহজ? চিরকাল এক সংসারে বসবাস করিয়াও ভাইয়ের অন্তরের মধ্যে ভাই, স্বামীর অন্তরে স্ত্রী, স্ত্রীর অন্তরে স্বামী, কি সব সময়ে প্রবেশ করিতে পারেন? অনেক সময়েই দেখা যায় চিরটা কাল একত্র থাকিয়াও কেহ কাহাকেও বুঝেন নাই। হাজার-হাজার মাইল দূরের মানুষ হইয়াও কেমন করিয়া তিনি যে ভারতের মর্ম্মের মধ্যে এমন সহজে প্রবেশ করিতে পারিলেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। তাঁহার মুখে দেখিতে পাই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের উদারতা ও বিশালতা, অন্তরের মহত্ত্ব ও গভীর দরদ (sympathy)।

অথর্ববেদের মর্ম্মগত তাৎপর্য্যে, উপনিষদের গভীর রহস্যে, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল গভীর, অথচ দৃষ্টি ছিল বিচারে সদা জাগ্রত। বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ

হিন্দু ভাবের মধ্যে যে কোথাও মর্ম্মগত বিরোধ নাই, ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত সহজ হইয়া দেখা দিয়াছিল।

এখানে আসিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও যোগ-বাসিষ্ঠাদি গ্রন্থের নিগূঢ় পরিচয় পাইলেন এবং গভীর ভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণতঃ বিদেশীর পক্ষে এই সাধনা সহজ নয়, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্বের কাছে সব বাধাই পরাভূত হইল।

ভারতের সবটা পরিচয় যে গ্রন্থের ও শাস্ত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, গ্রন্থের বাহিরেও ভারতের জীবনে ও সাধনায় তাহার যে আরও কিছু পরিচয় থাকিতে পারে, এই কথা বড় বড় পণ্ডিতদের ধারণাতেও সহজে আসে না। উইন্-টারনিট্জ্ সারাটা জীবন কাটাইলেন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া। তাঁহার কাছে এই সত্যটি ধরা পড়িল কেমন করিয়া তাহা বুঝা কঠিন।

দেখিয়াছি, তিনি ভারতীয় কলাশাস্ত্রের সম্পাদিত কোন গ্রন্থ দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে প্রশ্ন করিতেন, "দেশবাসীর জীবনের মধ্যে এই সব কলার যে রূপটি আছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া গ্রন্থগত সব বস্তু কেন সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। বিদেশী কোন পণ্ডিত এরূপ করিলে তাহা মার্জ্জনীয় হইলেও ভারতীয় কোন পণ্ডিতের পক্ষে এইরূপ অসম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত কোন গ্রন্থ সুধীজনসমাজে উপস্থিত করা বড়ই লজ্জার কথা।"

যোগ, তন্ত্র, ভারতীয় সাধনা, সন্তমত, বাউলমত, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার গভীর আলোচনা চলিত। সব সময়েই তাঁহার অনুরাগ ও অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। এইখানে তাঁহার কাছে আমার একটি ঋণ স্বীকার করা সঙ্গত। তিনি গুরুর মত আমাকে একটি মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঋণ আমার কখনও পরিশোধ করা অসম্ভব।

কাশীতে আমার জন্ম। ভারতীয় শাস্ত্রে আমার শিক্ষা-দীক্ষাও হইয়াছিল সেখানেই। কিন্তু পরে আমি তন্ত্রমত, সন্তমত ও বাউলমত প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু সেই সব জিনিষ কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই এবং প্রকাশ করা সঙ্গতও মনে করি নাই। বরং এরূপ প্রস্তাব হইলে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতাম। বিশ্বভারতীতে আচার্য্যপ্রবর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে এই সব জিনিষ আলোচনারই ভার আমাকে দিলেন। তখন চারি দিকে অবস্থা কিছু এই সব বস্তুর অনুকূল ছিল না। এমন কি কাশীতে নাগরীর মহাপণ্ডিতগণ তখনও কবীরকে হিন্দী সাহিত্যের নবরত্নের মধ্যে স্থান দেন নাই। কাশীতে আজও এমন সব মহাপণ্ডিত আছেন যাঁহারা কবীরকে কোন মতেই স্বীকার করেন না। বাংলা দেশের কথা এখানে না-ই উল্লেখ করিলাম। কাজেই বিশ্বভারতীতে আমার এই কাজ ছিল তখন পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টির বাহিরে।

পরলোকগত মহাপণ্ডিত আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভী যখন বিশ্বভারতীতে চীনীয় ও তিব্বতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলেন, তখন আমিও তাহাতে যোগ দিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে কিছু কাজও করিলাম। তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া এমন ভাবে উৎসাহ দিলেন যে, আমার চিত্তে একটা প্রলোভন উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, "কেন আর পণ্ডিতবর্গের উপেক্ষিত ক্ষেত্রে নিজের জীবনটা ক্ষয় করি? পণ্ডিতবর্গের সমাদৃত পথেই তো আমি সবার দৃষ্টি ও সম্মান লাভ করিতে পারি।"

মন যখন আমার এইরূপ দুর্ব্বলতায় টলটলায়মান, তখন আচার্য্য উইন্‌টারনিট্জ্ বলিলেন, "বলেন কি! এমন কাজও করিবেন না। ভারতের অতি গভীর পরিচয় আজও এই ক্ষেত্রে চাপা পড়িয়া আছে। য়ুরোপ এখনও তাহার নানা জালজঞ্জাল লইয়া ইহার উপর আসিয়া পড়িল হুড়মুড় করিয়া। এখন হয়তো আপন পরিচয়টুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া এই সব দুর্লভ বস্তু চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে। এমন দুঃসময়ে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আপনি নিজ সাধনায় অটল আসন হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। কিছুতেই যেন আপনাকে ব্রতভ্রষ্ট না করে।"

তাঁহার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে এরূপ শাস্ত্রবহির্ভূত ক্ষেত্রের সাধনাতে এমন উৎসাহ পাইব তাহা আশাই করি নাই। এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব।

এখান হইতে দেশে গিয়াও তিনি আমাদিগকে বা বিশ্বভারতীকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। সর্ব্বদাই নানা ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি উৎসুক থাকিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য যখন ভাঙিয়া আসিয়াছে, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি জীবনী লিখিয়া তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাটুকুর পরিচয় দিয়াছেন।

শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল তাঁহার অসাধারণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গভীরতর ছিল তাঁহার মানবপ্রেম। স্ত্রীর বিয়োগেই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর চলিল তাঁহার দুর্জ্জয় সাধনা। বৃদ্ধ বয়সে এমন সাধনাক্লিষ্ট শরীরে তিনি স্ত্রীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আরও পড়িলেন ভাঙিয়া। তাহার মধ্যে একবার একটু আশার রেখা দেখা দিল, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মৃন্ময় জগৎ হইতে বিদায় লইয়া তিনি ভারতীয় জ্ঞানসেবকদের চিন্ময় সিংহাসনে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এখান হইতে কেহ কোন দিন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কাল ও মৃত্যুর আক্রমণের অতীত এই অমরধাম।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

প্রয়াগের শরৎচন্দ্র চৌধুরী

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগের সমগ্র সমাজ, এবং বিশেষ করিয়া তথাকার বাঙালী সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শরৎবাবুর চুল পাকিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বার্দ্ধক্যবশতঃ নহে। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু। তাঁহার পিতা এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সেকালের অন্য সব প্রসিদ্ধ উকীল পণ্ডিত সর্ সুন্দরলাল, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, মুন্‌শী রামপ্রসাদ প্রভৃতির মত আইনের জ্ঞানে ও তাহার প্রয়োগে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। শরৎবাবুরও

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চৌধুরী

আইনের জ্ঞান বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তাঁহাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করিলে যথাযোগ্য নিয়োগ হইত। তিনি কেবল আইনজ্ঞ ছিলেন না। ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতিতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, এবং তিনি সাধারণ সংস্কৃতি, সৌজন্য ও চরিত্রমাধুর্য্যের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন।

—

কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

উড়িষ্যা প্রদেশের ও বিহার প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের লোকেরা অধিকাংশ আসন অধিকার করিয়াছেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেও তাহা হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গে তাহা হয় নাই, পঞ্জাবেও হইবে না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে কি হইবে, বলা যায় না—উভয় প্রদেশে কংগ্রেসের প্রাধান্য হইতেও পারে।

এখন কংগ্রেসকে স্থির করিতে হইবে, কংগ্রেসওয়ালা সদস্যেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না। যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, সেখানে তাঁহারা সম্মত হইলে মন্ত্রিত্ব পাইতে পারিবেন; অন্যত্র না-পাইতে পারেন, পাইতেও পারেন। কংগ্রেসকে স্থির করিতে হইবে, সব প্রদেশে একই রীতি অবলম্বিত হইবে, না কংগ্রেসওয়ালা সদস্যদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠতা বা সংখ্যালঘিষ্ঠতা অনুসারে প্রদেশভেদে দু-রকমের কোন এক রকম নীতি অবলম্বিত হইবে। কংগ্রেস নূতন কন্‌ষ্টিটিউশ্যনটাকে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। মন্ত্রিত্বগ্রহণ এই নিন্দাবাদের সহিত খাপ খাইবে না।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এ-বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটিসমূহের মত জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুধু হাঁ না বলিলে চলিবে না, সিদ্ধান্তের সমর্থক যুক্তি ও তথ্যও তাঁহাকে পাঠাইতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ও স্বরাজ

মিঃ এইচ এস্ এল পোলাক মহাত্মা গান্ধীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা বলিতে তিনি কি বুঝেন। মহাত্মা গান্ধী উত্তর দিয়াছেন—

"আপনি জানিতে চাহিয়াছেন ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের সময় আমি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম এখনও ঐ মতই আমি পোষণ করি কি না। আমি তখনও যাহা বলিয়াছি, এখনও আবার তাহাই বলিব। আমার ব্যক্তিগত কথা এই যে 'ষ্টাটিউট্ ... মতে ইচ্ছানুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ... 'ষ্টেটাস' পাইলে উহা আমি গ্রহণ করিব, কোন দ্বিধাবোধ করিব না"

গোলটেবিল বৈঠকের সময় মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, তিনি স্বাধীনতার সার অংশ ("substance of independence") পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। এখনও সেইরূপ কথাই বলিতেছেন। বস্তুতঃ ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ষ্টাটিউট আইন অনুসারে ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলিকে প্রায় স্বাধীন করা হইয়াছে। তাহাদের মর্য্যাদা ব্রিটেনের সমান। যে-কোন ডোমীনিয়ন আবশ্যকবোধে ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে। আমরা বহুবার বলিয়াছি, এইরূপ সর্ত্তে ভারতবর্ষের

উপবিষ্ট : বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিগণ : বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ডাঙ্গালী (অভ্যর্থনা-সমিতি), শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার (ইতিহাস), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন হালদার (বিজ্ঞান), শ্রীযুক্ত নৃপেশচন্দ্র দাস (দর্শন) ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), মৌলবী শ্রীযুক্ত সখায়ৎ হোসেন খাঁ (সঙ্গীত) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী (সাহিত্য), শ্রীযুক্ত বিনয়শরণ কাহালী (কর্ম্মসচিব)।
দণ্ডায়মান : বাম হইতে—শ্রীযুক্ত শান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরমেশ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয় রায় (সহ কর্ম্মসচিবত্রয়)।
—জস্ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে।

ডোমীনিয়নত্ব প্রাপ্তিতে লাভ বই ক্ষতি নাই—দরকার হইলেই ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, যে, ব্রিটেন সহজে ভারতবর্ষের ডোমীনিয়নত্বলাভে রাজী হইবে না—সুতরাং তাহা দূরপরাহত। তবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কমাত্রশূন্য পূর্ণ-স্বাধীনতালাভও সুদূরপরাহত। —

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধর্ম্মঘটের অবসান

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে-সকল কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জিত হইয়াছে। তাঁহাদেরই সর্ত্তে ঐ রেলওয়ের এজেন্টকে রাজী হইতে হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মঘটকালের বেতন পাইবেন না। তেমনই অন্য দিকে ঐ রেলেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। আশা করি, শুধু ঐ রেলওয়ের নহে, অন্য রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগেরও এখন চেতনা ও সুবুদ্ধি হইবে। গরিব লোকদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার সব সময়েই সব অবস্থায় করা লাভজনক বা সম্ভবপর নহে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা যে তাহার কর্ত্তৃপক্ষকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ। —

স্পেনের খবর

স্পেনে বিদ্রোহীরা মালাগা দখল করিয়াছে। ইটালী ও জার্ম্যানীর সাহায্যে তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। ঐ দুই দেশ বরাবরই বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতেছে। বস্তুতঃ, যেমন আবিসীনিয়ার যুদ্ধে, তেমনই স্পেনেরও এই যুদ্ধে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকিবার তথাকথিত চেষ্টা কথার কথা ও ফাঁকি মাত্র।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মেলন

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মেলনের বিষয় আমরা আগে-আগে লিখিয়াছি। তাহার একটি বিস্তারিত বিবরণ পাইয়াছি। যথেষ্ট স্থান না থাকায় তাহা এই সংখ্যায় ছাপিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে তাহার অন্ততঃ কিছু অংশ ছাপিতে পারি কি না বিবেচনা করিব। বৃত্তান্তটি পড়িলে বুঝা যায়, ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীর এই প্রথম চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। —

মূলসভার অধিবেশন ২১শে ফেব্রুয়ারী ১২টার সময় আরম্ভ হইবে। ঐ দিনে সাহিত্য-শাখার ও ইতিহাস-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ পঠিত হইবে। অন্যান্য শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি পাঠ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য ও যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের ২৲ করিয়া দেয় স্থির হইয়াছে। সাধারণের জন্য প্রথম দিনের প্রবেশমূল্য ।৹ ও ছাত্রদের ।৹ করা হইয়াছে। ছাত্রী ও ভদ্রমহিলাগণ বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পাইবেন।

সম্মিলনের সহিত একটি প্রদর্শনীও সংযোজিত করা হইবে। এই প্রদর্শনীতে চন্দননগরের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক বস্তু তথা চিত্রাদি পরিদর্শিত হইবে। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত হরিশঙ্কর পাল মহাশয়।

রবি-বাসর—

সাত বৎসর পূর্ব্বে অধুনা-লুপ্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র কার্য্যালয়ে একটি সান্ধ্য চায়ের মজলিস বসিত। সেই প্রাত্যহিক মজলিসে কয়েক জন নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যামোদী, কলাবিৎ ও পত্র-সম্পাদক যোগদান করিতেন। কিছুদিন পরে তাহা রীতিমত সভায় রূপান্তরিত হইয়া 'রবি-বাসর' নাম ধারণ করে। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ইহার অধ্যক্ষ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি ইহার পূর্ব্বতন সম্পাদক ছিলেন, বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। রবি-বাসরের সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশতে সীমাবদ্ধ। পাক্ষিক প্রতি রবিবারে ইহার অধিবেশন হয়। বাংলা সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগের বহু শ্রেষ্ঠ লেখক এবং শিল্প-বিভাগের বহু সুপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ইহার সভ্য। রবি-বাসর শুধু কলাবিৎ এবং সাহিত্যিকগণের আলোচনা সভা নহে, ইহা তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ মিলন-ক্ষেত্র। প্রত্যেক সদস্য পর্য্যায়ক্রমে বৎসরে একবার করিয়া স্বভবনে সভা আহ্বান করেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে আহূত সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিনায়ক-পদ এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার আলয়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। শেষোক্ত অধিবেশনে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত 'বাংলা সাহিত্যের অভাব-অভিযোগ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ('প্রবাসী'র পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে।) রবীন্দ্রনাথের অধিনায়ক-পদ গ্রহণে 'রবি-বাসর' নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র বসু—

কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট এবং হাইকোর্ট বার-এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় গত ১৪ই নভেম্বর ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শরৎবাবু সেকালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু মহাশয়ের পুত্র। তিনিও কংগ্রেসের সেবকরূপে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের সদস্যরূপে, তিনি স্বীয় পৈতৃক বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলা হইতে দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৫ সনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন ও অল্প সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। তিনি বাগ্মিতা-শক্তির অধিকারী এবং ব্যক্তিগত জীবনে উদার দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। খনি-বিষয়ক আইন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শরৎচন্দ্র বসু

কর্নেল লিণ্ডবার্গ ও প্রেসিডেণ্ট ডি ভালেরা

লিণ্ডবার্গ এরোপ্লেন-পরিচালক না হইলে বিমান-বিহার করিবেন না তাঁহার এই অঙ্গীকার ডি ভালেরা রক্ষা করিয়াছেন। আইরিশ ফ্রী-ষ্টেট লিণ্ডবার্গসহ ডি ভালেরার এহাই প্রথম বিমান-যাত্রা

লণ্ডনের স্ফটিক-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
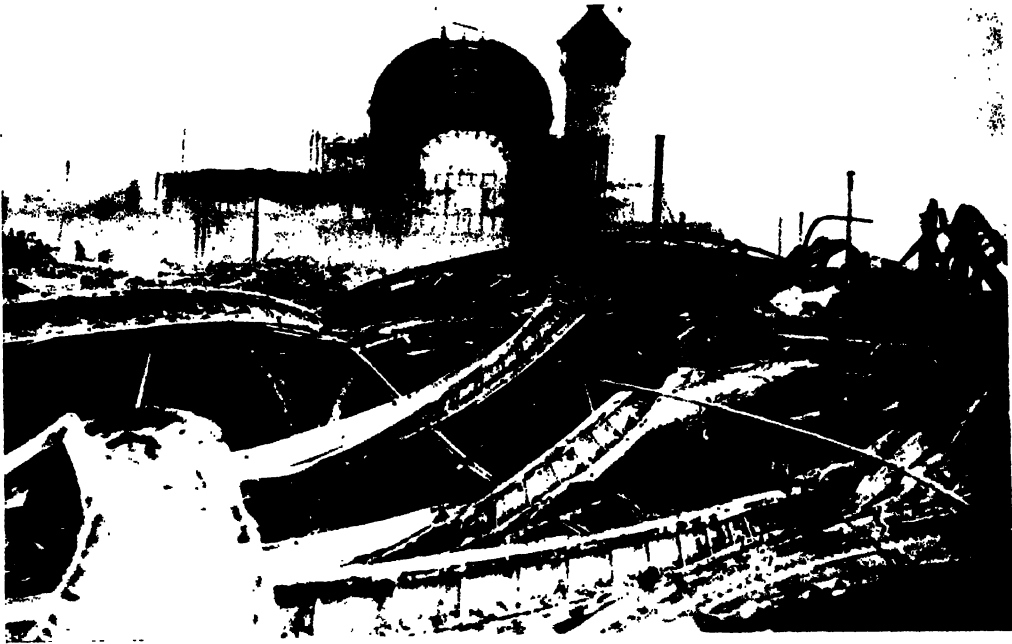
কোন কোন সংবাদ পত্র বলে, শত্রু-বিমানের পথপ্রদর্শকরূপে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব বলিয়া এই প্রসিদ্ধ সীমা-চিহ্নটি 'অপসারিত' হইয়াছে

মহীশূরের যুবরাজ মহীশূর বাণিজ্য-ভাণ্ডারের নূতন সৌধের উদ্বোধন করিতেছেন

মার্শাল চ্যাং শুয়ে-লিয়াং, শ্রীমতী চ্যাং, মিসেস্ চিয়াং এবং সেনাপতি চিয়াং কাইসেক

পাটনায় প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলন—

গত ১০ই ও ১১ই মাঘ শনিবার ও রবিবার পাটনা-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রসমিতি 'প্রভাতী সঙ্ঘের' বাৎসরিক উৎসব স্থানীয় বি. এন. কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসরও এইরূপ সম্মেলনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

এই সম্মিলনীতে ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস, ঔপন্যাসিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল গোস্বামী, "বনফুল" ওরফে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা ও বিহারের কয়েক জন সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মেলন উপলক্ষে পাটনার সর্ব্বত্র খুবই উৎসাহের সঞ্চার হয়। সভায় দুই দিনই প্রচুর জনসমাগম হয়। পাটনার বাহির হইতেও দর্শকবৃন্দ আসিয়াছিলেন। সম্মেলনীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি প্রীতি-সম্মেলনীর ব্যবস্থা হয়। তাহার মধ্যে অধ্যাপক শ্রীনবীন হালদার ও বেঙ্গলী সেট্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমিহিরচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের গৃহে চা-পানের আয়োজন উল্লেখযোগ্য। অতিথিবৃন্দের

পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘে সমাগত সাহিত্যিকগণ উদ্যান-সম্মিলনে অধ্যাপক শ্রীনবীন হালদার কর্তৃক অভ্যর্থিত
[শ্রীবিবেক কুণ্ডু ... গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

অধিকাংশই পরলোকগত অধ্যাপক হালদার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন।

অধ্যাপক বলদেব মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলে সম্মেলনীর সভাপতি নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি" নামক অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীপরিমল গোস্বামী 'সম্মেলনীর সার্থকতা" নামক একটি প্রবন্ধ ও 'বনফুল' 'ভূয়োদর্শন" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুইটি প্রবন্ধই হাস্যরসাত্মক অথচ সুলিখিত ছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত, বিবিধ তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সরস নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার সাহিত্য সাধনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ মহাশয়দ্বয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেন।

রাঁচি জেলার একটি প্রাচীন অনাবিষ্কৃত মন্দির

গত পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় "রাঁচির কথা" প্রবন্ধের ৪২২ পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন মন্দিরের ছবি দিয়াছেন, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে তাহার অবস্থান প্রভৃতি কোনরূপ বর্ণনা দেখিলাম না। সম্ভবতঃ নীরদবাবু ৪২৮ পৃষ্ঠায় যে ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা তাহারই ছবি হইবে। এই স্থলে রাঁচি জেলার অপর একটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই মন্দিরটি লোহারডাগা রেলওয়ে ষ্টেশনের চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে খেখ্‌পারতা নামক একটি গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরটির অবস্থা খুব শোচনীয় না হইলেও ১ নং চিত্র হইতে বুঝা যাইবে যে ইহার সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই মন্দিরটি সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।

খেখ্‌পারতার মন্দিরটি একটি ছোট পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত, মন্দিরটির উচ্চতা ১০।১২ ফুট হইবে। মন্দিরের পূর্ব্বমুখে একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার (চিত্র নং ২) আছে। প্রবেশ-দ্বারের সদ্দালের (Lintel) মধ্যস্থলে একটি গণেশের মূর্ত্তি অমসৃণভাবে খোদিত এবং মন্দিরের সম্মুখেও কয়েকটি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। খেখ্‌পারতা গ্রামটি ওরাওঁ-প্রধান হিন্দুর মধ্যে কয়েক ঘর শুঁড়ী আছে। ইহাদের মধ্যে এই মন্দির সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী প্রচলিত নাই, তবে প্রবাদ, ওরাওঁরা এই মন্দিরের পার্শ্বে গো-বলি দিয়া থাকে।

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। শক্তিপ্রসাদবাবু ইতিপূর্ব্বে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার রূপেও কিছুকাল কাজ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ. এন. ধর কিছুদিন পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষালাভার্থে জাপান যাত্রা করেন। তাঁহার পিতা জাহানাবাদ গয়ার এক জন বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধরকে জাপানের ওসাকা ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিল্পসম্পর্কীয় রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ অনুমতি-লাভ এই প্রথম।

নৃত্যকলাকুশলী কুমারী জগসিয়া—

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে, করাচীর কুমারী ভিশিনী জগসিয়া উচ্চাঙ্গের ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করিয়া সাতটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার

কুমারী ভিশিনী জগসিয়া

নৃত্যকলা শান্তিনিকেতনের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কুমারী জগসিয়ার 'আরতি' এবং পূজা' নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমারী ভিশিনী কিছুদিন পূর্ব্বে একবার ছায়াচিত্রেও বিশেষ সফলতার সহিত অভিনয় করেন। কুমারী এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

—

বিদেশ

নাৎসী শাসনাধীনে জার্ম্মেনী—

সম্প্রতি বার্লিনে নাৎসী শাসনের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং হের হিটলার আরও চার বৎসরের জন্য রাইখ্‌স্টাগের প্রেসিডেণ্ট পদে বহাল রহিলেন। গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মেনী যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল সেই অবস্থা হইতে আজ সে যে অনেকটা উদ্ধার পাইয়াছে তাহার মূলে হের হিটলার।

বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনিও নিজেকে শান্তিকামী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি নিরন্তর যে বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গীরণ করিতেছেন ও দল পাকাইতেছেন তাহাতে ইউরোপে শান্তির আশা আরও সুদূরপরাহত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। জাতি-গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প জার্ম্মেনী অধুনা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। রাজস্বের ত্রিচতুর্থাংশ অস্ত্রসজ্জায় ব্যয়িত হইতেছে। রাইনল্যাণ্ড-সমস্যার এক প্রকার সমাধান হইয়াছে, ভার্সাই চুক্তির জলপথ সম্বন্ধীয় ধারা নাকচ করিয়া নিজেদের কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইবার চাই উপনিবেশ। ব্রিটেনের ফ্রান্সের রাশিয়ার উপনিবেশ আছে, ইটালীও সম্প্রতি রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে; সুতরাং জার্ম্মেনীই বা বাকী থাকে কেন? জার্ম্মেনী আপাততঃ তাহার এই উপনিবেশ সম্পর্কিত দাবী সমগ্র জগৎকে জানাইতে ব্যস্ত। গত মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি প্রয়োজনীয় উপনিবেশ জার্ম্মেনীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং আপাততঃ তাহা রাষ্ট্রসঙ্ঘপ্রদত্ত ম্যাণ্ডেট ক্ষমতাবলে বিভিন্ন শক্তিবর্গ ভোগ করিতেছে। কিন্তু ইহুদীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার অধুনা জার্ম্মেনীতে চলিতেছে তাহাতে তাহাদের এই দাবী সমর্থনযোগ্য কি না তাহা বিবেচ্য।

এই উৎসবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হের হিটলার আর একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জার্ম্মানদিগের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। গত বৎসর নাৎসীদিগের বিরাগভাজন ওসিটেস্কি নামক জনৈক শান্তিকামী 'নোবেল পীস' পুরস্কার পাওয়াতে এই বিধান করা হইল।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগ,
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার-বার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্য্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল আকাশের দুর্ব্বোধ সঙ্কেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভি নিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল,
গর্ব্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্ব্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হোলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্ত্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সঙ্গীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর দ্বারে,
বলো, ক্ষমা করো,—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৮ মাঘ, ১৩৪৩

খ্রীষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের এই ভূলোককে বেষ্টন ক'রে আছে ভুবর্লোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভুবর্লোক আছে ব'লেই আমাদের পৃথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সঙ্গীত-সম্পদে সমৃদ্ধ,—পৃথিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবর্লোকের দান। এক সময় পৃথিবী যখন দ্রবপ্রায় অবস্থায় ছিল তখন তার চারদিকে বিষবাষ্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্য্যকিরণ এই আচ্ছাদন ভাল ক'রে ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অসংযত হয়ে জলস্থলকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। ক্রমশঃ এই তাপ শান্ত হয়ে গেলে আকাশ নির্ম্মল হয়ে এল, মেঘপুঞ্জ হ'ল ক্ষীণ, সূর্য্যকিরণ পৃথিবীর ললাটে আশীর্ব্বাদটীকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভুবর্লোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হ'লে পৃথিবী হ'ল সুন্দর, জীবজন্তু হ'ল আনন্দিত। মানবলোকসৃষ্টিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমণ্ডলকে মোহকালিমা থেকে নির্মুক্ত করবার জন্য, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্য, মানুষকে চলতে হয়েছে দুঃখস্বীকারের কাঁটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টায় মানুষ ভুল করেছে, কালিমা শোধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পৃথিবী যখন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভূকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, বায়ুমণ্ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, লুব্ধতা, দুর্ব্বলকে পীড়ন আজও চলছে; আদিম কালে রিপুর অন্ধবেগের পথে শুভবুদ্ধির বাধা আরও অল্প ছিল। এই যে বিষনিঃশ্বাসে মানুষের ভুবর্লোক আবিল মেঘাচ্ছন্ন, এই যে কালিমা আলোককে অবরুদ্ধ করে, তাকে নির্ম্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেষ্টা শুধু নিয়মশাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হ'তে পারে না। নিয়মের বন্যায় প্রমত্ত রিপুর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে, কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিয়ম মানে ভয়ে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্ব্বলতা। ভয়দ্বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মানুষকে পশুর তুল্য অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মানুষের অন্তরের বায়ুমণ্ডল মলিনতামুক্ত হয় নি বলেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের অন্তর-লোকের মোহাবরণ মুক্ত করবার জন্যে যুগে যুগে মহৎ প্রাণের অভ্যুদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেখানে তার সোনারূপার খনি, যেখানে মানুষের অশন-বসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্থূল ভূমিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই স্থূল মৃত্তিকাভাণ্ডারই তো পৃথিবীর মাহাত্ম্য-ভাণ্ডার নয়। যেখানে তার আলোক বিচ্ছুরিত, যেখানে নিঃশ্বসিত তার প্রাণ, যেখানে প্রসারিত তার মুক্তি, সেই ঊর্দ্ধলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ, সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য্য। মানবপ্রকৃতিতেও আছে স্থূলতা, যেখানে তার বিষয়বুদ্ধি, যেখানে তার অর্জ্জন এবং সঞ্চয়, তারই প্রতি আসক্তিই যদি কোনো মূঢ়তায় সর্ব্বপ্রধান হয়ে ওঠে, তাহ'লে শান্তি থাকে না, সমাজ বিষ-বাষ্পে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লুব্ধতা প্রবল হয়ে উঠে মানুষে মানুষে হিংস্রবহ্নির আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে স্মরণ করি সেই মহাপুরুষদের যাঁরা মানুষকে সোনা-রূপার ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে আসেন নি, দুর্ব্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড় রাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা যাঁরা নন,—মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ যে মুক্তি, সেই মুক্তি দান করা যাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না—কিন্তু নিশ্চয়ই

এমন অনেক আছেন এখনও যাঁরা এই পৃথিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে সুন্দর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জন্তুরা যে বিষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিঃশ্বাস গ্রহণ ক'রে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত ক'রে দেয়। তেমনই মানুষের চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উদ্গার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে। এই শুভচেষ্টা মানবলোকে যাঁরা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রতীক, যন্তুদ্রং তন্ন আসুব, এই বাণী যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই—যাঁরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যাঁর জন্মদিন ব'লে খ্যাত সেই যীশুর নিকটই উপস্থিত করি জগতে যাঁরা প্রণম্য তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখতে পেয়েছি কয়েক জনের মধ্যে। এই কল্যাণের দূত আমাদের ইতিহাসে অল্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হ'তে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেন না শাস্ত্র-বাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যাঁর কথা স্মরণ করছি তিনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, বিরুদ্ধতা, শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্যত্ব চিরকালের মতো দেদীপ্যমান হয়ে আছে এ তো বই-পড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল। এঁকে উপলব্ধি করা সহজ; শাস্ত্র-বাক্যকে তো আমরা ভালবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালবাসতে পারি তাঁদের, যাঁরা মানুষকে ভালবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি; সেই ভক্তির মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। খ্রীষ্টকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভালবাসতে পেরেছেন তাঁরা শুধু একা ব'সে রিপু দমন করেন নি, তাঁরা দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দূর-দূরান্তরে, পর্ব্বত সমুদ্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এই রকম আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান, তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে।

খ্রীষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোট বড় কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন। কী দানবতা আজ চারদিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন—তবু বলতে হবে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এই বিরাট কলুষ-নিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন, নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হ'ত, সমস্ত সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হ'ত। *

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

* শান্তিনিকেতন মন্দিরে বড়দিন উপলক্ষ্যে কথিত। শ্রীপুলিন বিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য

প্রতিমা দেবী

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা গত ১৯৩৬ সনের জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রথম অভিনীত হয়। তার পর থেকে এই নাটকের বিবিধ আলোচনা অনেক কাগজে অনেক মাসিক পত্রিকায় নানা ভাবে লিখিত হয়েছে এবং সম্প্রতি ধূর্জ্জটিবাবুর লেখা প্রবাসীতে প'ড়ে আমাদের দিক্ থেকে যা বলবার মতো মনে হ'ল তাই লিখবার চেষ্টা করব।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর ধ'রে লোকচক্ষুর অগোচরে যে কলাবিদ্যার সাধনা শান্তিনিকেতনে সুরু হয়েছিল আজ চিত্রাঙ্গদায় তারই বিশুদ্ধ রূপের বিকাশ হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার যাঁরা প্রধান রূপায়নী (যেমন যমুনা, নন্দিতা, নিবেদিতা) তাঁরা শিশুকাল থেকে এই কলাবিদ্যার চর্চ্চা সুরু করেছিলেন। তখন তাঁরাও জানতেন না যে, তাঁদের দ্বারা ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নূতন রূপ পাবে। যাঁরা শান্তিনিকেতনের নৃত্যপদ্ধতির ক্রমপর্য্যায়ের ধারা বিশেষভাবে অনুসরণ ক'রে এসেছেন তাঁরা সকলেই জানেন কি ভাবে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নৃত্যকলা বিকাশ লাভ করল।

শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল উৎসবগুলির মধ্যে নৃত্যের প্রথম কাকুতি দেখি। তার অপরিণত ভাষা আঁকুবাঁকু করত নিজেকে পরিস্ফুট করবার জন্যে। শিশুর প্রথম চলার মতো সে আপন ধাত্রী গীতকলাকে আঁকড়ে থাকত, তার নিজের ক্ষমতা তখনও তার অগোচর। তার পর এল "নটীর পূজা"র সরল ছন্দে নৃত্যের নূতন রূপ। সহজ ও স্নিগ্ধ তার গতি। তাই মুগ্ধ করেছিল সে দর্শকের চিত্তকে তার স্বতউচ্ছ্বসিত অশিক্ষিতপটুত্বে। "নটীর পূজা"র সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ বিশেষত্ব লাভ করেছিল।

এর পর সঙ্গীতের রূপসৃষ্টি নিয়ে "ঋতুরঙ্গ" দেখা দিল। নৃত্যকলায় জাগাল সে নূতন আকাঙ্ক্ষা। "ঋতুরঙ্গে"র মধ্যে ভঙ্গীর বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। তখন থেকেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন, ভঙ্গী খুব নিখুঁত হওয়া চাই।

"ঋতুরঙ্গে"র কিছু পূর্ব্বে গুরুদেব জাভা যাত্রা করেছিলেন। জাভানী নৃত্যের নানাবিধ ছবি এবং নৃত্য-সাহিত্য তাঁর সঙ্গে দেশে এসেছিল, আর এসেছিল সেখানকার কলানৈপুণ্যের প্ররোচনা। এই সূত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের জাভানী নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করবার সুযোগ হয়েছিল। সেই জন্য ঋতুরঙ্গের নাট্যসংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্ত্তমান ছিল এবং সুরেনবাবুর রচিত ষ্টেজের মধ্যেও জাভানী স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ঋতুরঙ্গের কয়েকটি নৃত্য কলাজগতে সম্মানলাভের যোগ্য। যেমন "নৃত্যের তালে তালে" "যেতে যেতে একলা পথে" এবং আলপনার নাচ ইত্যাদি—(নিশ্চলকান্ত নমো হে নমঃ)। খুঁটিনাটি বাদ দিয়েও সমগ্রটা মিলিয়ে দেখতে গেলে ঋতুরঙ্গ একটি কলাকুশল রচনা। পরবর্ত্তী কালেও বহুদিন পর্য্যন্ত ঋতুরঙ্গের কলারীতি নিয়েই নাড়াচাড়া চলেছিল। মাঝে মাঝে অনেকগুলি নৃত্য উল্লেখযোগ্য হয়েছিল ব'লে মনে করি, যেমন শ্রীমতী দেবীর "এসো নীপবনে" "দে দোল" "শিশুতীর্থ" ইত্যাদি। কিন্তু তখনও আমরা চলেছি পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। বর্ত্তমান যুগে নাচের প্রকৃত রূপ কি হওয়া উচিত, সে সময়ে মনের মধ্যে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি; অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মতো কতকটা মূক-অভিনয়, কতকটা গীতাভিনয়, কতকটা দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়ে ভাবের প্রকাশ হ'ত বটে কিন্তু তার পরিপূর্ণ রূপ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল।

তখন নাচগুলি ছিল ছোট, খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে হ'ত তার আরম্ভ ও শেষ। সেই টুকরা নৃত্যগুলি সুন্দর হ'লেও দর্শকের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেত, মনে

কোন স্থায়ী রস রেখে যেতে পারত না। শাপমোচনের যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জয়ন্তী উৎসবের সময় য়ুনিভর্সিটির ছাত্রদের অনুরোধে তিনি "শাপমোচনে"র কথাবস্তু লিখেছিলেন এবং কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দালানে "ষ্টুডেন্টস্ ডে"-তে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের গল্পাংশকে অনুসরণ ক'রে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে মূক-অভিনয়ের দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। সব জায়গায় প্রকৃত নৃত্যনাট্যের প্রকৃতি রক্ষা করতে না পারলেও গুরুদেবের সঙ্গীত ও মূক-অভিনয় মিলিয়ে জিনিষটি মনোরম হয়েছিল। কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যকলা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। এই নাটক প্রথমে লক্ষ্ণৌয়ে ও পরে বহুবার মান্দ্রাজ, বম্বে, সিংহলে অভিনীত হ'তে হ'তে পরিণতি লাভ করেছে। এই "শাপমোচনে"র অভিনয় বাইরে যখন প্রশংসিত হ'ল, তখন এল বাংলা দেশে উদয়শঙ্করের যুগ। এই সময় থেকে শান্তিনিকেতনের নাচের পালা কলকাতায় কিছুদিনের মতো স্থগিত রাখা হ'ল। এই অবসরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে তাদের নৃত্যসাধনা এগিয়ে চলেছিল দ্রুতগতিতে। কয়েক বৎসরের মধ্যে যাঁরা তৈরি হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যে কল্যাণীয়া যমুনা, নিবেদিতা, নন্দিতার নাম বিশেষভাবে প্রশংসাযোগ্য, আর পুরুষদের মধ্যে শান্তি ঘোষ। শ্রীমতীকেও আমাদেরই ছাত্রী বলতে পারি কারণ তাঁর প্রথম নৃত্যশিক্ষা শান্তিনিকেতনের মণিপুরী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই। অবশ্য পরে য়ুরোপে নানা দেশ ভ্রমণের দ্বারা নৃত্যকলা সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন কিন্তু তাঁর নৃত্যের মূলে যে গুরুদেবের সঙ্গীতের প্রেরণা রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশংসা এবং উৎসাহের আতিশয্য হয়তো আর্টের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই হয়েছিল আমাদের শাপমোচনের পর্ব্বে। অনেকেরই মনে হ'তে লাগল শাপমোচনেই হয়তো আমাদের শক্তির সীমা।

এই সময় ঘটনাচক্রে আমরা বিলাত-যাত্রা করলুম। সেখানে ডেভনশায়ার ডার্টিংটন স্কুলে জার্ম্মেনীর সুপ্রসিদ্ধ নর্ত্তক লাবানের শিষ্য মিষ্টার ইয়স্ (Joss) একটি নৃত্যশালা খুলেছিলেন। তখন একটি নূতন নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনার কাজ তাঁর ষ্টুডিয়োতে আরম্ভ হয়েছিল। মিষ্টার ইয়সের উদারতাগুণে আমি তাঁর কার্য্যপ্রণালী দেখবার সুযোগ পেলুম। ইয়স্ যে-প্রণালীতে নৃত্যনাট্যের প্রত্যেক অধ্যায় বানিয়ে তোলেন সেটা আমার কাছে খুবই উপাদেয় লেগেছিল। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-নাচে মিলে ক্রমে ক্রমে যে-ক'রে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা পরিণত হ'তে পারে তারই নূতন পদ্ধতি চোখে পড়তে লাগল। ছাত্রছাত্রীরা কি গভীর অনুরাগ নিয়ে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করত নৃত্যকলা-সৃষ্টির কাজে, দেখে আনন্দিত হয়েছি। দেখলুম য়ুরোপীয় গানে যেমন বহুস্বরের সঙ্গতি আছে তেমনি য়ুরোপীয় নাচে নানা ভঙ্গীর সমবায়তা সংঘটিত হয়েছে। একই দৃশ্যে হয়তো দশ জন লোক বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচছে, একই তালকে অনুসরণ ক'রে। উদাহরণস্বরূপ ইয়সের নাটকের একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে; তার নাম—"পথের দৃশ্য"। কোথাও বা একদল লোক স্ফূর্ত্তি করছে, কোথাও বা দু-জন প্রেমিক নিজের মনোভাব প্রকাশ করছে, দূর থেকে কয়েক জন অপরিচিতা উপহাস করছে। বিচিত্র ভাবের লীলা একই দৃশ্যে একই তালকে অনুসরণ ক'রে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ক্লান্তি আনে নি মনে, কেন না তালের লয় প্রত্যেক ভাবের সঙ্গে বদলে বদলে গিয়ে ঔৎসুক্য সজাগ ক'রে রাখে। ইয়সের এই সংগঠনপ্রণালী একটি নাটক তৈরির পক্ষে খুব উপযোগী। বিচিত্র ভাবকে প্রকাশ করতে হ'লে তালকে অনেকটা মুক্তি দেওয়া চাই। ইয়সের নৃত্যপ্রণালীর মধ্যে সে স্বাধীনতা ছিল তাই তাঁদের নৃত্যকৌশল দেখে নাচ সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন ধারণা আমার মনে এসেছিল একথা স্বীকার করি। তার পরে যখন দেশে ফিরে শুনলুম দিল্লীতে "শাপমোচন" অভিনয় হবার কথা হচ্ছে, তখন ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় একটি নূতন নৃত্যনাট্যের সংগঠনের কথা মনে এল। এই সময় আমাদের দুই জন নৃত্যাচার্য্য ছিলেন, এক জন মণিপুরী, অপরটি মান্দ্রাজী। শেষোক্তটি লোক-নৃত্যশিল্পী। ছাত্রীরাও দেখলুম আঙ্গিকে বিশেষ দখল লাভ করেছেন। এরই মধ্যে অনেক নূতন ধরণের নাচ তাঁরা আয়ত্ত করেছেন,

তাছাড়া মণিপুরী নাচ যেন তখন তাঁদের নিজের জিনিষ হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য নাচের শিক্ষা কোন দিনই আমার ছিল না, রূপকারের চোখেই সমস্ত জিনিষটা মনের মধ্যে আঁকতে হ'ল। স্থির হ'ল, আখ্যানের জন্তে নেওয়া হবে চিত্রাঙ্গদার কবিতা। কেননা, এই কবিতার সাঙ্গীতিক আবেগ নাচের সম্পূর্ণ উপযোগী। নাচের ক্লাসগুলি দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলুম মণিপুরী ও দক্ষিণী নাচের অনেক ভঙ্গী ও তাল একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিলে একটি ভূমিকা অনায়াসেই তৈরি করা যায়। এখানে চিত্রাঙ্গদাকে নাচের ভাষায় অভিব্যক্ত করতে হবে কাজেই সেই ভাব প্রকাশের অনুরূপ নৃত্যের ভঙ্গী ও তালের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি বাছাই ক'রে নিতে হ'ল। ধূর্জ্জটিবাবু চিত্রাঙ্গদাকে বিশুদ্ধ নৃত্যনাট্য ব'লে স্বীকার করেছেন কিন্তু চিত্রাঙ্গদার বৈশিষ্ট্য কি ভাবে গ'ড়ে উঠল সেটা আমাদের দিক্ থেকে বলতে চেষ্টা করব। প্রথমেই হ'ল গুরুদেবের সঙ্গীত যার উপর সমস্ত নৃত্যনাট্যটি প্রতিষ্ঠিত। চিত্রাঙ্গদার এই নূতন রূপ তাঁরই সঙ্গীতকে অবলম্বন ক'রে বিকশিত। কবিতার চিত্রাঙ্গদা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করেছে মাত্র, তারই শৌর্য্যের নিচক রূপ জেগে উঠেছে তাল ও সুরের বিচিত্র ছন্দে। এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিবিধ তালের সমন্বয় ঘটেছে যেমন মণিপুরী কাওয়ালী, হিন্দীতে যাকে বলে কাহারবা, মণিপুরী চারতাল যার হিন্দী নাম আড়া চৌতাল। মাদ্রাজী নাচের থেকে এল তেওরা এবং দাদরা। আর ঝাঁপতাল এসে পড়ল গুরুদেবের গানের মধ্য দিয়ে। অর্জ্জুনের ধ্যানভঙ্গের নাচে তেহাই তোরাপরণ তালের কৌশল যুক্ত হয়েছে। এই তালটি শুনে হয়তো ধূর্জ্জটিবাবুর মনে হয়ে থাকতে পারে যে, আমাদের ছাত্রীরা উত্তর-ভারতের নৃত্যকলা চর্চ্চা করেছেন কিন্তু আমরা এই তালটি পেয়েছি মণিপুরী নাচের মধ্য দিয়ে। মাদ্রাজী তেওরা ও দাদ্‌রা মণিপুরী খোলের বোলের সঙ্গে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কানে খাঁটি তেওরা ও দাদ্‌রার আমেজ লাগায়। পঞ্চম নামে আছে মণিপুরের আর একটি তাল যা রাসলীলা-নৃত্যে ব্যবহার হয়ে থাকে, যার ছন্দ আমাদের কানে কাওয়ালীর আভাস নিয়ে আসে। এই দক্ষিণী ও মণিপুরী নৃত্য যখন চিরকালীন প্রথা অনুসরণ করে তখন দর্শকের চিত্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার তালের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে। লোকনৃত্য মাত্রেই আছে এই পৌনঃপুনিকতা। য়ুরোপে নৃত্যের বেগ খুব উঁচুতে চ'ড়ে গিয়ে আবার ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে একটি স্থিতিতে পরিণত হয়। এই বৈচিত্র্যকরণ আমাদের সনাতন নাচের মধ্যে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। নৃত্যে কেবল প্রাচীনকে মেনে চললে নাটকের যোগ্য বৈচিত্র্য প্রকাশ অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু দেখেছি ধ্রুবপদী বিভিন্ন নাচকে যথোচিত কৌশলে জুড়ে দিয়ে সাজাতে পারলে নৃত্যে ভাবপ্রকাশে কোনও জড়তা থাকে না। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে অনেক দৃশ্যেই এই দুই নাচকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি জায়গার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন "শুনি ক্ষণে ক্ষণে" এই গানের নাচের মধ্যে মণিপুরী কাওয়ালী, চারতাল ও মাদ্রাজী তেওরা ও দাদরা তালের মিলন ঘটেছে। এই দুই নাচের সংযোগে দেখা গেল ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর অবিচিত্র তালের অবসাদ কেটে গিয়ে নূতন উদ্দীপনা এনেছে। মণিপুরী নর্ত্তকরা মুখে বা চোখে কোন ভাবের প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নয়। তাদের মনের গতি প্রকাশ পায় তালের মধ্য দিয়ে। সব জায়গায় মণিপুরী নাচের এই বিশেষত্ব আমরা রাখি নি। তবে কোথাও কোথাও দরকার-মতো তার অনুসরণ করা হয়েছে— যেমন চিত্রাঙ্গদা যখন মদন-দেবতার পূজার আয়োজনের জন্ত ফুল তোলবার আদেশ করছেন কিংবা শিকারের নাচে অর্জ্জুনকে দেখে তাঁর মানসিক পরিবর্ত্তন হওয়াতে সখীদের বনভূমি হ'তে বিদায় দিচ্ছেন, এই সব জায়গাগুলিতে তালের মধ্য দিয়েই ভাবের প্রকাশ হয়েছে। অথবা অর্জ্জুনের "যদি মিলে দেখা" গানে তাঁর মুখের ভাবকে ছাড়িয়ে তাল ও সুর বহুদূর চলে গেছে। সেখানে দর্শকের চোখে নর্ত্তকের মুখ দৃষ্টিপথে পড়ে না, সুর ও তালের ছন্দ জানিয়ে দেয় যে অর্জ্জুনের মনের মধ্যে কর্ম্মজগতের আহ্বান পৌঁছেছে, তিনি বেরিয়ে পড়তে চান। ভোগাবেশে অভিভূত পৌরুষ হয়েছে ক্লান্ত ও অনুতপ্ত। এই জায়গায় তাল ও সুর দেহের রেখাবিন্যাসের সঙ্গে মিলে এমন ভাবে ঐক্য পেয়েছিল যে মুখের ভাবের কোনও প্রয়োজন হয় নি, এই যে মণিকাঞ্চনযোগ এই হ'ল যথার্থ নৃত্যের আদর্শ।

"অর্জ্জুন তুমি অর্জ্জুন" চিত্রাঙ্গদার এই প্রথম আবেগপূর্ণ বাণী যখন চরম উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল "হা হতভাগিনী, এ কি অভ্যর্থনা মহতের"—বিষাদের এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, এখানকার সুর ও তালের বৈচিত্রীকরণ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং নাটকীয় সংঘাত পূর্ণ হয়েছে তালের বিরামে এসে। এই থামার দ্বারা পরবর্ত্তী বিষয়ের সঙ্গে ঘটনাসূত্র যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় সেই জন্ম রূপসংযোজনার ছবি দিয়ে নৃত্যের সঙ্গতি রক্ষা করতে হয়েছে। এখানে সুর তাল মিলে একটি চিত্রপরিপ্রেক্ষণী দর্শকের চোখে জেগে ওঠে যার মধ্যে আছে চিত্রাঙ্গদার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিতকে দেখবার উচ্ছ্বাস, অর্জ্জুনের অবজ্ঞা এবং হঠাৎ ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে সখীদের আশ্চর্য্যান্বিত ভাব। এই সমস্তটাই সংযোজনার দ্বারাই ফুটিয়ে তুলতে হয়েছিল। এখানে প্রথাগত নাচ চলত কিনা সন্দেহ। নৃত্যের মধ্যে এই রেখাচিত্রের প্রকাশ পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বিষয়ের মাঝখানে থাকাতে নাটকের আবেগকে আরও একাগ্র ক'রে তুলেছিল এবং অসংলগ্নতা দোষ ঘটতে দেয় নি। দর্শকের মনের মধ্যে নৃত্যনাট্যের উত্থানপতন যে তালে তালে চলেছিল কোথাও বাধা বা ক্লান্তি আনতে পারে নি তার একটি কারণ নাটকীয় গতি মাঝে মাঝে সংযত হয়েছিল ছবির রাজ্যে এসে। চিত্রাঙ্গদায় আর একটি বিশেষ জিনিষ হ'ল ছোট ছোট কবিতা-গুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ ক'রে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হ'ল তাদের কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্ত্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা। যে বিশেষ প্রণালীকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন তাল ও সুর এক হয়ে একটি বিশেষ ভাবকে চিত্রাঙ্গদায় রূপ দান করল এই বিচিত্র উপাদানকে সম্বদ্ধ করার নিয়মকেই সংযোজনা ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। এই জিনিষ য়ুরোপীয় নৃত্যনাট্যে খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছে। আমাদের প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি এই প্রণালী অনুসরণ করে কি না তা আমার জানা নেই। সেই জন্ম সংঘটন-প্রণালীর দিক থেকে পুরাণী পদ্ধতি চিত্রাঙ্গদায় মেনে চলা হয় নি। সেখানে সনাতন প্রথাকে ছাড়িয়ে সে নূতন রূপ নিয়েছে। চিত্রাঙ্গদার সমস্ত নৃত্যই পুরাণী ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কতকগুলি বিশুদ্ধ তাল-নৃত্য ও গীতনৃত্যের বৈচিত্র্য দেবার জন্ম রাখা হয়েছিল দেহরেখার ব্যঞ্জনা, এগুলি বাদ দিলে সঙ্গীতযোগে নৃত্যগুলিকে জমিয়ে তোলা যায় না। চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হ'ল সুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলা মাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্মে পটভূমির দরকার হয় রং ও আলো। এই রং আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনও অবান্তর ভঙ্গী হ'ল তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য। নৃত্য হ'ল ইঙ্গিতকলা। তার প্রেরণা অনির্ব্বচনীয়। বিশুদ্ধ নাটকের মতো তার আবেদন সুপ্রত্যক্ষ নয়। দেহের মধ্য দিয়ে যে ছন্দলীলার ইঙ্গিত মানুষের মনে গভীর ছাপ দিয়ে যায় তাকে ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না, তার ভাব অনুভূতির রাজ্যে আপনি আত্মপ্রকাশ করে সেই জন্মই এই নৃত্যকলার তাৎপর্য্য বোঝা সাধারণ মনের পক্ষে কঠিন কিন্তু তার স্থায়ী আকর্ষণ সুধীসমাজের মনে চিরকালই থাকবে।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে আমরা একটি জিনিষ পুরাতন প্রথা অনুযায়ী গ্রহণ করি নি সেটি হচ্ছে—দক্ষিণী ও উত্তর-ভারতীয় ঘাড় ও চোখের খেলা। আমার মনে হয় যদিও এটি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে তবুও এর মধ্যে একটু বিদেশী গন্ধ আছে। পুরাকালে যখন আরবি ও পারসি প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ছায়াপাত করেছিল সেই সময় নাচের এই চোখ ও ঘাড় নাড়ার ভঙ্গীও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের নৃত্যে এসে পড়েছিল, সেই জন্ম অন্ত কোন এদেশী লোকনৃত্যে এই ভঙ্গীগুলি চোখে পড়ে ব'লে জানি না। মণিপুরী নৃত্যে বাইরের কোনও

মিশ্রণ ঘটে নি ব'লে ভারতীয় আদর্শ অনুসারে সে বরাবর নিজের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে এসেছে। সেই জন্ম মণিপুরী নাচে মুখের হাবভাব বা কটিদেশের কোনও প্রকার আন্দোলন নেই, অধিকন্তু তাদের নাচের মধ্যে এই প্রথা অত্যন্ত দূষণীয় ব'লে গণ্য হয়। নৃত্য শিক্ষা দেবার সময় মণিপুরী শিক্ষক দেখেছি বিশেষভাবে এ বিষয়ে সাবধানতা গ্রহণ করেন। মণিপুরী নৃত্য যথার্থ সৌন্দর্য্যকেই সাধনা করে, তার মধ্যে কোনও দৈহিক স্থূল আকর্ষণের আয়োজন নেই। ভারতীয় নাচে বিদেশী প্রভাবের ধারণা আমার কাছে আরও সমর্থন পেয়েছিল যখন ইরাকের কোনও প্রসিদ্ধ নর্ত্তকীর নৃত্যের মধ্যে ঐ ঘাড় ও চোখের খেলা দেখলুম। কিন্তু তাঁর নৃত্যে দেহের সকল ভঙ্গীই ঐ চোখ ও ঘাড় নাড়ার কায়দার অনুবর্ত্তী ছিল তাই সমস্ত দেহের সঙ্গে মিলে নৃত্যের ঐ কলাকৌশলটি অসঙ্গত ব'লে মনে হয় নি, যদিও স্পষ্টই দেখা গেল সেখানকার নৃত্য স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তির আদিমতাকেই প্রকাশ করে। মানুষের কল্পনারাজ্যের রহস্য তার মধ্যে নেই। তার স্থান নৃত্যকলা-জগতে খুব উচ্চে নয়। তবে আঙ্গিকের নৈপুণ্য তার মধ্যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান আছে। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়াতীত রসের সঙ্কেত পাওয়া যায়, সে স্থান, কাল, পাত্র সমস্তকে ছাড়িয়ে তার আসন বিছিয়েছে সর্ব্বজনীন রসানুভূতির মধ্যে। তাই শিবের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়ে একদিন সে সমস্ত দেশকে মুগ্ধ করেছিল আজও যার শক্তি কত ছবি কত মূর্ত্তির মধ্যে তার বিশেষত্বের নিদর্শন রেখে গেছে। সেই শক্তিশালী নৃত্যের মধ্যে এই ঘাড় ও চোখের খেলা অসঙ্গত মনে হয়। তবে উত্তর-ভারতে যেখানে পারসি সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটেছে সেখানে কৃষ্ণলীলা বা গজলের সঙ্গে এই ভাবভঙ্গিগুলি অসঙ্গত হ'তে নাও পারে কারণ আদিরসাত্মক বিষয়ের সঙ্গে ওটা মানিয়ে যেতে পারে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসের তাৎপর্য্য এমন সূক্ষ্ম পরিমাপনীর উপর দাঁড়িয়ে আছে যে তার কোনদিকে একটু স্থূলতার ভার চাপলে গতি নিম্নগামী হবে এই আশঙ্কায় অনেকগুলি প্রচলিত নৃত্যরীতিকে আমরা স্বীকার করি নি।

শান্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয় নি তার কারণ গুরুদেবের সঙ্গীত ও সুর বাজনার অভাব পুরিয়ে দেয়। এখানে তাঁর সুরের ও গানের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যের এক অভাবনীয় মিলন হয়েছে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের ধারা এক নূতন রসসৃষ্টির পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। এই যে সঙ্গীত ও নৃত্যের অপূর্ব্ব ঐক্য যেখানে কেউ কাউকে পূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা না দিয়ে নিজের শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে, এইখানেই চিত্রাঙ্গদার আর একটি বিশেষত্ব। বাংলার নূতন চিত্রকলা যেমন ভারতের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির সুর ফিরিয়ে দিয়ে চারুশিল্পজগতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করল, বাংলার বা শান্তিনিকেতনের নাচ সেই একই কাজ করেছে নৃত্যকলা-জগতে। নৃত্যকলার প্রতি আজ ভারতের জনসাধারণের যে আগ্রহ জেগেছে সে তাকিয়ে রয়েছে বাংলার দিকেই। আমাদেরই মণিপুরী শিক্ষক নানা জায়গায় নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছেন। তার মধ্যে নবকুমার ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য মনে করি। কিন্তু এঁরা শুধু যে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন তা নয়, গুরুদেবের সঙ্গীতের ধারণার মধ্য দিয়ে কি ক'রে প্রাচীন নৃত্যকলা নূতন হয়ে বর্ত্তমান যুগে স্থান পাবে সে শিক্ষা তাঁরা এখান থেকে পেয়ে গেছেন। এই সূত্রে তাঁদের প্রাচীন প্রথাগত নাচ অনেক পরিবর্ত্তন দিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাপ নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গীতসহযোগে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আমাদের নৃত্যের রূপদানীরা যাঁরা এই কলাকে নিজের সাধনার জিনিষ মনে করেন তাঁদের হাতে এই নৃত্যকলার নব নব অধ্যায়ের ক্রমবিকাশের দায়িত্ব রয়েছে ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে।

অগ্রদানী

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর অবস্থাও এখন তেমনি। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা; লোকে বলিত, 'মই আসছে, মই আসছে'। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ—কি রকম, হাসছ যে?

—এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

—হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা ও তোমার রস খাওয়ারই সমান। এক জন হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল—'মই আসছে'।

চক্রবর্ত্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত—হুঁ তা বটে! তা, কাঁধে চড়লে স্বগ্‌গে যাওয়া যায়। বেশ, পেট ভ'রে খাইয়ে দিলেই ব্যস্ স্বগ্‌গে পাঠিয়ে দোব।

—আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা?

চক্রবর্ত্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই চক্রবর্ত্তীর নজরে পড়িত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্ত্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোন দিন রায়েদের বাগানে—কোন দিন মিঞাদের বাগানে—ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি বোলতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারি দিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, এ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, এ্যাঁ!

সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা-দুই মুখে পুরিয়া বলিত—আঃ!

কেহ হয়ত বলিত—বাঃ পুন্ন কাকা তুমি যে খেতে লেগেছ! ঠাকুরপুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত—ফল—ফল; ভাত মুড়ি ত নয়, ফল—ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়ীতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষ্যে ছিল ব্রাহ্মণভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী শিবরাণী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছু দিন অপেক্ষা ক'রে দেখ; তারপর আমি বারণ করব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দোব।

শিবরাণী তখন আবার সন্তানসম্ভবা। শ্যামদাসবাবু সে-অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে-ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরাণীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক বলা হয় না, পুত্রেষ্টি-যজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পংক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন কি নাই, কি চাই! একপাশে পূর্ণ চক্রবর্ত্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা

অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাসবাবুর বাড়ীতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দ্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়ীতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্য্যন্ত কোনরূপে ঢাকে এমনি বহরের তাহার পোষাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে—হুঁ; তা কর্ত্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার ব'লে দেন! ওঃ মাছগুলো যে বেশ তেলুক-তেলুক ঠেকছে!—হুই—হুই! নিয়েছিল এক্ষুনি চিলে।

চিলটা উড়িতেছে দূর আকাশের গায়, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। দুর্দ্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেরে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্ত্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্ত্তব্য সারিয়া আসে; সেই কর্ম্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক্।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন—আর কয়েক খানা মাছ দিক চক্রবর্ত্তী?

চক্রবর্ত্তীর তখন খান-বিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল—আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে ত। হ'রে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—সে ত হবেই; একটা মাছের মাথা—?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—ছোট দেখে!

মুড়োর মাথাটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্ত্তী ছেলেদের বলিল—হুঁ! বেশ ক'রে পাতা পরিষ্কার কর সব; হুঁ! নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি নে; মাছসুদ্ধ পড়ে আছে!

বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতের আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল—এই দিকে!

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটিপি করিয়া হাসিতেছিল, এক জন বলিল—চোখ দুটো দেখ—চোখ দুটো দেখ!

—উঃ যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

—আমি ত ভাই কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ কি দৃষ্টি! ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্ত্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল।

—ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

—বাঃ— সে তো চারটে ক'রে মিষ্টি পান মশাই!

—সে দুটো ক'রে যদি পাতে পড়ে—তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে—তখন আটটা পাব না—বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন,—যোলটা দাও ওঁর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনি-মাইনেতে নেমন্তন্ন ক'রে আসেন—দাও—যোলটা দাও!

পূর্ণ চক্রবর্ত্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল—আঁচলে দাও—আমার আঁচলে দাও!

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—চক্রবর্ত্তী কাল সকালে একবার আসবে ত! কেমন! এখানে এসেই জল খাবে।

—যে আজ্ঞে; তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল—চক্রবর্ত্তী, বাবুকে ধ'রে প'ড়ে তুমি বিদূষক হয়ে যাও। আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত!

চক্রবর্ত্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,

হ! তা তোমার, হ'লে ত ভালই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের ছেলের লজ্জাই বা কি? রাজা জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভাল মন্দটা—।

বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া উঠিল।

* * *

বাড়ীতে আসিয়া ছাঁদা বাঁধা গামছাটা বড়ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্ত্তী বলিল, যা বাড়ীতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজমেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো?

—সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

—এঁ্যা—তুমি লুকিয়ে রাখবে! ষোলটা মিষ্টি কিন্তু গুণে নোব—হ্যাঁ!

—আরে—আরে—এ বলছে কি? ষোলটা কোথা রে বাপু!—দিলেতো—আটটা; তাও কত ঝগড়া ক'রে—।

—মা—মা! দেখ, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রাখছে—এঁ্যা!

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, তবুও হৈমবতী যেন সত্যই হৈমবতী! কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত, সুন্দর কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি; প্রভাতের পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্ত্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল, বলাছ, তুই নিয়ে যেতে পারবি না; না, মেয়ে চেঁচাতে—।

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাও।

চক্রবর্ত্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিয়ো না, মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে বাবাকে, মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো—বেরো—বেরো বলছি আমার সুমুখ থেকে হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন—আমি যে বাঁচি।

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল—দেখ না, ছেলের তরিবৎ—যেন চাষার তরিবৎ।

হৈম বলিল—বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই—রোগে ওষুধ নেই—গায়ে জামা নেই—তবু মরে না ওরা! রাক্ষসের ঝাড়, অখণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্ত্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ্ দেখিরে, এক টুক্‌রো হরিতকী কি সুপুরী এককুচি যদি পাস। তোর মার কাছে যেন চাস নে বাবা!

সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্ত্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে, রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলে-টারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্ততঃ চক্রবর্ত্তীর তাই মনে হইল, সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্দ্ধমান বহ্নি-শিখার মত জ্বলিতেছে!

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তাহার ভাঙিয়া পড়ে। ছেলেগুলাও ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্ত্তী হৈমর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হ্যাঁ হৈম ঘুমাইয়াছে! চক্রবর্ত্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, হৈমর আঁচল হইতে দড়িতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল—ছানাবড়া খাব। বড়ছেলেটা ঘুর-ঘুর করিয়া বার-বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল—আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল—সব—সব—সবগুলো বের ক'রে

দিচ্ছি, একটা কেন? সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলান ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে—মিষ্টান্নগুলির অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে; মাত্র গোটা তিন-চার মেঝের উপর পড়িয়া আছে—তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক—নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকাটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

* * *

বাবু বলিলেন, চক্রবর্ত্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে তুমি, এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকা-গৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্ত্তীর সন্তানদের মধ্যে সবকটিই জীবিত, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি; তাঁহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্ত্তীই শুইয়া থাকে। তাই শিবরাণী এবার এ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে—কল্যাণের এমনি সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামাদাসবাবুও তাহার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্ত্তী বলিল, হুঁ। তা আজ্ঞে!

এক জন মোসায়েব বলিয়া উঠিল, তা—না—না—কিছু নাই চক্রবর্ত্তী। দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাত্রে—ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে—বুঝেছ—।

বলিয়া সে 'ঘড়-ঘড়' করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্ত্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ—তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—ব'সো তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার আসছে। বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

এক জন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্ন-পরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

এক জন বলিল—খাও, চক্রবর্ত্তী।

—হুঁ! তা, একটু জল—হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর এক জন পারিষদ বলিল—গঙ্গা গঙ্গা ব'লে ব'সে পড়

সব শুদ্ধ, ব'সে পড়।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী লোলুপ ভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্ত্তী?

চক্রবর্ত্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। এক জন বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে কথা বলবার অবসর নেই, চক্রবর্ত্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিল—আজ্ঞে পরিপূর্ণ! তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে। সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্ত্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দোব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তা হ'লে তোমার কথা ত পাকা—কেমন?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্ত্তী পুলকিত হইয়া উঠিল! সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ সে যে রাজভোগ!

—হুঁ! তা পাকা বইকি! হুজুরের—।

কথা অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি—দেখি—ওহে দেখি!

চোখ তাহার যেন জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্ত্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মত বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্ত্তী স্থান কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—দেখি—দেখি—ওহে দেখি—দেখি!

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি—কর কি—এঁটো ওটা এঁটো! নতুন এনে দিক!

চক্রবর্ত্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল—আজ্ঞে, রাজার প্রসাদ!

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকীটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ীতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলা কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজমেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে—তাই দাদা ঝগড়া ক'রে মাকে মেরে পালাল। মা প'ড়ে গিয়ে—।

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্ত্তীর চোখে জল আসিল; জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি—ছি—ছি; তোমাকে কি বলব আমি—ছি!

চক্রবর্ত্তী হৈমর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল—মাথা ঠুকে মরব আমি—ছাড় পা ছাড়! সমস্ত দিন হৈম নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্ত্তী সমস্ত কথা বলিয়া বলিল—তোমার বলছ আবার ওই সময়েই—! তা হ'লে না হয় কাল ব'লে দেব যে পারব না আমি।

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, না, না, না! মরুক—মরুক, হয়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব! জমি পেলে অন্যগুলো ত বাঁচবে।

* * *

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাস-বাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্ত্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে।

চক্রবর্ত্তী বিব্রত হইয়া উঠিল; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল—যাও তুমি।

—কিন্তু!—

—আমাকে আর জালিয়ো না। বাপু, যাও। বাড়ীতে বড় খোকা রয়েছে—যাও তুমি!

চক্রবর্ত্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ী তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—এস চক্রবর্ত্তী, এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি যেন রান্নাবাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্ত্তী সটান গিয়া তখনই রান্নাশালে উঠিল।

—হুঁ! ঠাকুর—কি রান্না হচ্ছে আজ? বাঃ খোসবুই ত খুব উঠছে। কি হে ওটা, মাছের কালিয়া না মাংস?

—মাংস। আজ মায়ের পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কি না!

—হুঁ! তা তোমার রান্নাও খুব ভাল। তার ওপর তোমার, বাদলার দিন! কত দূর, বলি দেরি কত? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্ত্তী!

—হুঁ! তা বলেছ ঠিক! তা একটু বেশী। তা বটে!

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—সিদ্ধ হ'তে দেরি আছে না কি?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বললে ত বিশ্বাস করবে না! নাও—হুঃ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াম করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী বলিল, হুঁ! বাঃ ঝোলটা বেড়ে হয়েছে! হুঁ! তা তোমার রান্না, যাকে বলে উৎকৃষ্ট!

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না।

চক্রবর্ত্তী আবার বলিল, হুঁ। তা তোমার এ চাকলায় ত কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না! মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্ত্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হ'লে খবর দেবে চাকররা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠ!

চক্রবর্ত্তী উঠিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সময়েই তাহার বড়ছেলেটা আসিয়া ডাকিল, বাবা!

চক্রবর্ত্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে?

—একবার বাড়ী এস। ছেলে হয়েছে।

—তোর মা, তোর মা কেমন আছে?

—ভালই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ী; নাড়ী কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

—হৈম!

—ভয় নেই, ভালই আছি। তুমি শুদুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে ত পাওয়া যাবে না!

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল, সোন্দর খোকা হইচে বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হ'লে কি ছেলে সোন্দর হয়! মা কেমন, দেখতে হবে!

হৈম বলিল, যা যা বকিস নে বাপু; কাজ হ'ল তোর, তুই যা!

চক্রবর্ত্তী বলিল, হুঁ! তা হ'লে, তাই ত! খোকা যাক্, ব'লে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুন ওঁরা।

হৈম বলিল, দেখ জালিয়ো না আমাকে! যাও বলছি যাও!

চক্রবর্ত্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার-বাড়ী শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।

পূর্ব্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্ত্তী বাড়ী আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলেটার ভোররাত্রে যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে!

চক্রবর্ত্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল—হুঁ! তা—!

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলে। কিসে যে কি হয়—হুঁ!

হৈম বলিল—ও কিছু না। আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সাটাকের সাবু কি দুধ যদি একটু পাও ত দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও ত এক ফোঁটা দুধ বেরুবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্ত্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ীর দিকেই চলিল, দুধের জন্য। কাছারী-বাড়ীতে ঘটিটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্ত্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও বাড়ী যাও।

চক্রবর্ত্তী ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। এক জন নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্ত্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বাবা, ছেলের জন্যে গাই দোয়া হয় নি?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, ধারস্ত খাবে না কি? আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক! না, গাই দোয়া হয় নি—বাড়ীতে ছেলের অসুখ, ওসব হবে না এখন যাও।

● ● ●

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরাণীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি-জাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়া ছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরাণী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিলেন। এ কি ছেলে যে কেমন করিতেছে। তাহার পূর্ব্বের সন্তানগুলিও ত এমনি ভাবেই—! চোখের জলে শিবরাণীর বুক ভাসিয়া গেল! শিশুর শুভ্র-পুষ্প-তুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরাণী আর্ত্তস্বরে ডাকিল, যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে ত!

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও ছেলে কেমন হয়ে গেছে। সেই অসুখ!

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা! দুর্গা!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন! স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শ-মত শহরেও লোক পাঠান হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরাণীর আশঙ্কা সত্য; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্য্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্ব্বনাশা রোগেই শিবরাণীর শিশুগুলি এমনি করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, ছেলে—?

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি!

শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই ছেলে নিয়ে আয় ত দেখি!

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ আমার কপাল রে! বলিয়া ললাটে তিনি করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন—আর ও বার ক'রে দিতে হয়েছে।···কি ক'রেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—!

ডাক্তার, শ্যামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বলুন!

ডাক্তার, শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া বলিল—আমিও তাই ভেবেছিলাম। ঐ হ'ল আপনার সন্তানদের অকালমৃত্যুর কারণ।

—তা হ'লে, ছেলেটা কি—?

—নাঃ—আশা আমি দেখি নে—বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ীর মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা! আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে ত!

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোন প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই না কি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরাণীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্ম্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরাণীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্ত্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ। কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্ত্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল বিধিলিপি! তাহার শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত তবে চক্রবর্ত্তী অন্ততঃ বাঁচিত! দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য এক থালা! ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।

চক্রবর্ত্তী দাইটাকে বলিল—একটু জল-টল মুখে দে রে বাপু!

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল—জল কি যাবে গো ঠাকুর! তা বলছ, দিই!

সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তার পর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই!

চক্রবর্ত্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশ-জোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যে[র] কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনি অন্ধকার।—আঃ—ছেলেটা যদি যাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া উঠে চক্রবর্ত্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্প[র্শ] করিল।

অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল! ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপে!

না—না—সে হয় না! জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরাণীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না! কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্ত্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে!

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্ত্তি—তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে! সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্ত্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে! চক্রবর্ত্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল! কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত। পরমুহূর্ত্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত—সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মত। নিঃশব্দে, লঘু দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! ভাঙা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্ব্বত্র নাই। হৈমর সূতিকা-গৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনরূপে দুয়ারটা কোনরূপে আগলান আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন!

চক্রবর্ত্তী আবার বাতাসের মত লঘু ক্ষিপ্র-গতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে!

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্ত্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরাণীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল—দাই ও দাই! ওমা নাক ডাকছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মত ঘুমিয়েছে! ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল, এই বুঝি তোর ছেলে আগলান! ছেলে যে কাতরাচ্ছে! মুখে একটু ক'রে জল দে!

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল; শুষ্ককণ্ঠ শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওগো জল খাচ্ছে গো, ঠোঁট চেটে চেটে!

শিবরাণী দুর্ব্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে, কারও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে। এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে! দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্ত্তী না কি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে। হতভাগ্যের সন্তানটি মারা গিয়াছে! প্রায়ান্ধকার সূতিকা-গৃহে শিবরাণী জ্বর-কাতর শিশুটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা, তাহার হারান মাণিক!

• • •

দশ বিঘা জমি চক্রবর্ত্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্ত্তী সেই তেমনি করিয়াই বেড়ায়।

লোকে বলে, স্বভাব যায় না ম'লে!

চক্রবর্ত্তী বলে, হুঁ—তা বটে! কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক একটা ছেলে যে একটা হাতীর সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইস্কুলে দিয়াছে। বড়ছেলেটি এখন ইতরের মত কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা! ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ কেউ

বার দেখলেই সড়াম্ ক'রে মুখে বোল টানে'। তুমি পু বারণ ক'রে দিও বাবাকে। হৈম সে কথা বলিতেই ক্রবর্ত্তী সহসা যেন আগুনের মত জলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী বলিল—চ'লে যাব, চলে যাব, আমি সন্ন্যেসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল—চক্রবর্ত্তী!

—কে?

—বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ী তত্ত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভাল-মন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

—আচ্ছা,—চল যাই। চক্রবর্ত্তী বাহির হইয়া পড়িল।

বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ী গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারী হইতেছিল সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল—ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণং গতি! হুঁ! তা যেতে হবে বইকি! উনোনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল হে মোদক মশায়!

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * *

বৎসর-দশেক পর। শিবরাণী হঠাৎ মারা গেলেন। লোকে বলিল—ভাগ্যবতী! স্বামী-পুত্তুর রেখে, ডঙ্কা মেরে চলে গেল।

শ্যামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্ত্তীর এখন ঐখানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুক ঠুক করিয়া গিয়া হাজির হয়। বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলি-বন্দোবস্ত দেখে। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল—হুঁ। ছাঁদা একটা ক'রে ত দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা ক'খানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

এক জন উত্তর দিল, হবে, হবে! একখানা ক'রে লুচি, এই চালুনের মত। আর মিষ্টি একটা ক'রে, তোমার লেডীকেনী, এই পাশ-বালিশের মত, বুঝলে!

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থাম ত সব। হ্যাঁ কি হ'ল—পাওয়া গেল না?

এক জন কর্ম্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্ম্মচারীটি বলিল—আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্ব্বংশ হয়ে গিয়েছে।

—তা হ'লে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হ'লে ত শ্রাদ্ধ হয় না।

—আচ্ছা তাই দেখি। অগ্রদানী ত বড় বেশী নেই—দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর-আধঘর।

কে এক জন বলিয়া উঠিল—তা আমাদের চক্রবর্ত্তী রয়েছে—চক্রবর্ত্তী নাও না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত ক'রে আর কে কি করবে তোমার?

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন—মন্দ কি, চক্রবর্ত্তী! শুধু দান-সামগ্রী নয়, ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে; পঁচিশ বিঘে জমি দোব আমি, আর তুমি যদি রাজী হও তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দোব আমি, দেখ।

বলিয়াই তিনি এদিক-ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্ত্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে, নিয়ে আয়!

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরাণীর শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে অগ্র দান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্ত্তী।

তার পর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্ত্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

* * *

গল্পের এইখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর কাহিনীর এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্ত্তীর আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই। লুব্ধ-দৃষ্টি লোলুপ-রসনা লইয়া সে তেমনি করিয়াই ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাস বাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া স্তব্ধ অশ্বত্থ তরুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্ত্তী তাঁহার দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না পারলে উপায় কি, চক্রবর্ত্তী! আমি বাপ হ'য়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারব না বললে চলবে কেন, বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু-পুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে—তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্ত্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্ত্তী!

একটা গ্রাস মুখে তুলিয়াই চক্রবর্ত্তী খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে আঁ আঁ শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

জল, জল, জল! পিণ্ডি বুকে লেগেছে—জল, জল!

পুরোহিত চীৎকার করিয়া উঠিল।

পূর্ণ চক্রবর্ত্তী কিন্তু তাহাতেও মরিল না; তবে কিছু দিনের মধ্যেই তাহার সোজা দীর্ঘ দেহখানা কে যেন মচকাইয়া ভাঙিয়া দিল।

আর তাহার আহারে রুচি নাই—বলে সব তেতো!

লোক হাসিয়া গোপনে বলে, লোভী মরবে এইবার।

ভারতে কৃষির উন্নতি

ডাঃ নীলরতন ধর

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিকাংশ লোকেরই জীবিকানির্ব্বাহ কৃষিদ্বারা হয়। তথাপি ভারতের কৃষির অবস্থা শোচনীয়। অন্যান্য দেশের সহিত বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের তুলনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হব। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশে গড়ে প্রত্যেক একরে গম ৭।৮ মণের অধিক জন্মায় না। যে-সব অঞ্চলে খাল কেটে বিশেষ ভাবে সিঞ্চন করা হয় সেখানেও ১১ হইতে ১৩ মণের অধিক গম কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বেলজিয়ামে প্রতি একরে ২৭ মণ ও ইংলণ্ডে ২৪ মণ গম জন্মায়। এমন কি ধান, যার চাষ ভারতে অন্যান্য সব শস্যের চেয়েও অধিক, তাও অন্যান্য দেশে ভারতের তুলনায় অনেক অধিক উৎপন্ন হয়। ভারতে ধান প্রতি একরে জন্মায় ১৩০০ পাউণ্ড, জাপানে ৩০৪০ পাউণ্ড ও মিশরের যে-সব স্থলে নীলনদ থেকে খাল কেটে সেচন ক'রে ধানের চাষ করা হয় সেখানে ২৮০০ পাউণ্ড।

আহমদাবাদ, বম্বে, সুরাট প্রভৃতি স্থানে তুলা উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যের "ব্ল্যাক কটন্ সয়েল্" তুলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই কারণে সেখানে তুলার কল অনেক আছে। আহমদাবাদে ৮২টি কাপড়ের কল আছে। সেখানে গিয়ে সেগুলি তুলনা ক'রে দেখবার আমার সুবিধা হয়েছিল। 'ক্যালিকো' মিলের স্বত্বাধিকারী অম্বালাল সারাভাইয়ের সহিত দেখা হয়েছিল। তাঁহার কলে আগেকার জোলারাই বেশী কাজ করে। তিনি আক্ষেপের স্বরে বলেন যে, তাঁহার কলের জন্য শতকরা ৯০ ভাগ তুলা বিদেশ—আফ্রিকা, মিশর ও আমেরিকা—থেকে আনাতে হয়। ইহার একমাত্র কারণ যে ভারতের ভূমির তুলা-উৎপাদিকা শক্তি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। ভারতে একর-প্রতি ৮৭ পাউণ্ড তুলা জন্মায়, কিন্তু মিশরে ২৭৮৩ ও জাপানে ৩০৪০ পাউণ্ড।

তার পরে নেওয়া যাক আকের চাষ। সরকার কর্তৃক

সংরক্ষণ (প্রোটেক্শন) প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষে এখন অনেকগুলি চিনির কল স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩১ সালে মাত্র ৩০।৩২টি চিনির কল ছিল, কিন্তু এখন ১০৮টি। ভারতীয় মিলগুলি এখন সমগ্র ভারতবাসীর চিনি যোগাচ্ছে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে যখন এ সংরক্ষণ আর থাকবে না তখন ভারতীয় চিনির অবস্থা এইরূপই থাকবে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ ভারতবর্ষের চেয়ে জাভা ইত্যাদি স্থানে আকের চাষ অনেক ভাল হয়। ভারতবর্ষে প্রতি একর থেকে ২৪০০ পাউণ্ড চিনি পাওয়া যায়, কিন্তু জাভায় ১২০০০ পাউণ্ড ও হাওয়াই-দ্বীপে ১৭০০০ পাউণ্ড। কোথায় যে গলদ, তা বোঝা দায়। স্বপ্নেও আমরা এর সমকক্ষ হ'তে পারি ব'লে ত মনে হয় না।

সাধারণতঃ সুস্থ সবল ভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রত্যেক মানুষের ২ একর ভূমির উৎপন্ন ফসলের প্রয়োজন। ফ্রান্সে এক-এক জনের ভাগে ২'৩ একর ও আমেরিকাতে ২'৬ একর পড়ে। তাই তারা স্বাস্থ্যে এত উন্নত। কিন্তু ভারতে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে মাত্র ০'৭৫ একর। এর একটা কারণ ভারতের লোকসংখ্যা এত বেশী এবং এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে—মাত্র দশ বৎসরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ৪ কোটি (সমগ্র ইংলণ্ডের জনসংখ্যা মোট ৩ কোটি ৭০ লক্ষ)। কিন্তু কর্ষিত ভূমি বৃদ্ধি পায় নি। তাই পূর্ব্বে লোকপিছু ১ একর ভূমি ছিল; আর এখন আরও শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য খারাপ। স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হ'লে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদনের দুটি উপায়:—

প্রথমতঃ জমিতে সার দিয়ে তার ফসল বাড়ান ও দ্বিতীয়তঃ যে-সব জমিতে চাষ হয় না বা হ'তে পারে না বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার উর্ব্বরা-শক্তি বাড়িয়ে তাতে চাষ করা।

এক কালে আমাদের দেশ সত্যসত্যই সুজলা সুফলা ছিল। কিন্তু ক্রমাগত চাষ ক'রে এখন অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের মত এখন সে-সব জমিরও খাদ্যের প্রয়োজন। আমরা যা খাই তার মধ্যে অধিকাংশ বস্তুতেই কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে চিনি। চিনিতে একটু জল মিশিয়ে তাতে সালফিউরিক এসিড ঢাললেই পরিষ্কার বোঝা যাবে চিনিতে কয়লা বা কার্বন আছে, কারণ এই প্রক্রিয়ার পর কয়লা প'ড়ে থাকে এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প নির্গত হয়। ভাত বা আলু বা গুড়ের সহিত ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। আমরা যে-সব বস্তু খাই বায়ুর সঙ্গে তার কার্বন মিলিত হয়ে তাপ বা শক্তি দেয়। এই শক্তি থেকেই আমরা কাজ করতে পারি; এবং পরিশ্রমের পর শ্রান্তি অনুভব করলে পুনরায় শক্তি আহরণের জন্য আমাদের খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। এর সমতুল্য বলা যেতে পারে কয়লা পুড়িয়ে জাহাজ চালান। বেগবৃদ্ধি কয়লা বেশী পুড়িয়ে করা যায়, কারণ তাতে শক্তি বেশী পাওয়া যায়। আমরা যখন দৌড়াই বা পরিশ্রম করি তখন আমাদের শক্তির বেশী অপচয় হয় এবং সেই জন্যই বেশী ক্ষুধা পায়।

নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্পে ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়—কয়লা পুড়িয়ে নয়।

বাতাসে মুখ্যতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। শক্তি প্রয়োগ ক'রে এই দুটিকে মিলিত ক'রে নানা প্রকারের উপযোগী ও উপকারী দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ক্ষেতের সার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সোরা ইত্যাদি এইরূপে প্রস্তুত করা যেতে পারে। ইংলণ্ডেও বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা বায়বীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এবং জলের হাইড্রোজেন মিলিত ক'রে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। সেখানে এ-সব কার্য্যের জন্য প্রতি ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি এক পয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু এলাহাবাদে প্রতি ইউনিট তিন আনা। সুতরাং এ-সব অঞ্চলে ইহা ব্যয়সাধ্য নহে। অথচ ভারতের ভূমি অনুর্ব্বর এবং সারের প্রয়োজন বেশী।

মানবদেহের জন্য নাইট্রোজেনের আবশ্যক কিন্তু বাতাসের নাইট্রোজেনে মানুষের কোনও লাভ হয় না। সেই জন্যই নাইট্রোজেন-সংযুক্ত খাদ্য বা প্রোটীন অপরিহার্য্য। ডাল, ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে কিন্তু এই সব উদ্ভিদ-প্রোটীনে মস্তিষ্ক-বৃদ্ধি বিশেষ হয় না। মানসিক উন্নতির জন্য জৈব প্রোটীন খাওয়া উচিত। জৈব প্রোটীন-ঘটিত পদার্থ—দুধ, দধি, মাংস, মৎস্য, ডিম ইত্যাদিতে বুদ্ধি-বৃদ্ধি হয়। জগতের বুদ্ধিমান জাতিমাত্রই এ সব জিনিষ খেয়ে থাকে। মানুষের মত গাছের জন্যও

নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, লৌহঘটিত পদার্থ ও চূণ চাই।

ভারতবর্ষের জমিতে ফস্‌ফরাস, চূণ ও লৌহঘটিত পদার্থের অভাব নেই কিন্তু নাইট্রোজেনের বিশেষ অভাব আছে। ভারতের জমিতে মাত্র শতকরা ০'০৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে আছে শতকরা ০'১৫ ভাগ। এই নাইট্রোজেন সোরা বা অ্যামোনিয়াম সল্‌ট্‌সে আছে।

ইউরোপে নানা স্থানে যুক্ত-নাইট্রোজেনের কারখানা আছে। কারণ যুদ্ধের সময় বিস্ফোরক ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য এইগুলির একান্ত আবশ্যক। যুক্ত-নাইট্রোজেন যুদ্ধের রক্তমাংসের মত। এই প্রকারের কারখানা যে-দেশে যত বেশী আছে আধুনিক কালে সেই দেশকেই তত সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য জ্ঞান করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সমগ্র ভারতে এইরূপ একটিও কারখানা নেই যেখানে যুক্ত-নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা হয়।

নানা গবেষণার দ্বারা আমরা গুড় থেকে এই নাইট্রোজেন জমির জন্য পাবার সন্ধান পেয়েছি। ভারতে কাপড়ের ব্যবসা সবচেয়ে বেশী, তার পরেই চিনি (অন্যান্য দেশে প্রথম লৌহ, তার পর কয়লা ও যুক্ত-নাইট্রোজেন)। এই চিনির কলগুলি থেকে অনেক মাৎগুড় পাওয়া যায়—যা থেকে আর চিনি প্রস্তুত করার কোনও কল ভারতে নেই। সুতরাং সেগুলি নষ্টই হয়। এরূপে মাৎগুড়ে প্রায় দশ কোটি টাকার চিনি প্রতি বৎসর নষ্ট হয়। অথচ এই মাৎগুড় দিয়েই আমরা ভূমির উৎকর্ষ সাধন করেছি। এই গুড়ই ভূমিকে শক্তি দেয়। ও দেশে বিদ্যুৎ থেকে শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের সেই শক্তিকে পেতে হবে গুড় জ্বালিয়ে।

কতকগুলি পরীক্ষাদ্বারা এই-সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপলব্ধি সহজে করা যায়। কোনও একটি ম্যাঙ্গানীজ সল্টে কষ্টিক সোডা দিলে প্রথমে সাদা রং দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ক্রমশঃ লাল রং হ'তে থাকে। লৌহঘটিত কোনও বস্তুতে কষ্টিক সোডা দিলেও ধীরে ধীরে রঙের পরিবর্তন হয়—সবুজ থেকে বাদামী। এইরূপ পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড ও কষ্টিক সোডা মিশ্রিত হ'লে ক্রমশঃ রং কালো হয়ে যায়। এই সকল বস্তু সহজেই বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় ও তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, সেই জন্যই ক্রমশঃ রঙের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু চিনি এরূপ পদার্থ নহে। ইহা সহজে কোনও মতেই বায়ু থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। যেমন টার্টারিক অ্যাসিড সহজে অক্সিজেন নেয় না ও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সহিত সংমিশ্রণে কোনও প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। অথচ সামান্য মাত্রাতে যদি কোনও লৌহঘটিত পদার্থ দেওয়া যায় তৎক্ষণাৎ প্রক্রিয়া দ্রুতবেগে আরম্ভ হয়। রক্তেও লৌহঘটিত দ্রব্য আছে এবং এইরূপেই এই দ্রব্যের সাহায্যে চিনি অক্সিজেনের সহিত দেহপ্রান্তরে মিশ্রিত হয়। মাটিতে লৌহ থাকায় গুড় দিলে ঠিক এইরূপেই বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হ'তে পারে।

আলোক দ্বারাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশে সূর্য্যরশ্মি প্রচুর এবং সেই কারণেই আমাদের রং কালো। কিন্তু এই সূর্য্যরশ্মির জন্যই অনেক ক্ষতিকারী জীবাণু ধ্বংস হয় এবং আমাদের দেশে শীতপ্রধান দেশের চেয়ে রিকেট্‌স, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া ও অন্যান্য কয়েকটি রোগ কম হয়। সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে মাৎগুড়ের সহিত বায়ুর প্রক্রিয়া হয়, এবং তাহা হইতে শক্তি উৎপাদিত হয়। ভারতে প্রতি বৎসর ১,০০০০০ টন চিনি প্রস্তুত করা হয় এবং চিনির কারখানা থেকে পাঁচ ছয় লক্ষ টন মাৎগুড় পাওয়া যায়। জমিতে মাৎগুড় দিলে দু-এক মাসেই যুক্ত-নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় সুতরাং জমির ফসল-উৎপাদিকা শক্তিও বাড়ে। এমন কি ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশের মত সুফলা ভূমি করা যায়। যেখানে পূর্ব্বে মাত্র ৭।৮ মণ ধান প্রতি একরে পাওয়া যেত, এখন সেখানেই ১৪।১৫ মণ পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে অনেক ক্ষারযুক্ত ভূমি আছে (এ অঞ্চলে যাকে "ঊসর" বলে)। কেবল মাত্র সংযুক্ত প্রান্তেই ৪০,০০,০০০ একর এরূপ ভূমি আছে। এই ক্ষার বা সোডা অনুর্ব্বরতার একটি প্রধান কারণ। ফেনল্‌থালিন-এর সহিত সংমিশ্রণ হ'লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উর্ব্বর ভূমিতে ক্ষার নেই এবং যে-ভূমি যত অনুর্ব্বর ক্ষারও তা'তে তত বেশী; কারণ ফেনল্‌থালিন যোগে তত ঘন-লাল রং দেখা যায়। কিন্তু এই ক্ষারযুক্ত জমিতে গুড় দিয়ে তার পর ফেনল্‌থালিন দিলে দেখা যায় যে,

ঠিক উর্ব্বর ভূমির মতই কোনও রং হয় না, অর্থাৎ ক্ষার বিনষ্ট হয়ে যায়। গুড় ব্যতীত খোল দিলেও ক্ষার নষ্ট করা যায়। তাই ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চলে চিনির কল নেই এবং গুড় নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য সে-সকল স্থানে খোল ব্যবহার ক'রে জমি উর্ব্বর করা যায়।

আমরা সোঁয়াও-এ খারাপ জমিতে গুড় দিয়ে ধানের চাষ করতে সফল হয়েছি। পূর্ব্বে জমি এত খারাপ ছিল যে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মাত না। মহীশূরে অনুর্ব্বর ভূমিতে এক একরে ১ টন গুড় ঢেলে ১২০০—১৮০০ পাউণ্ড ধান পাওয়া গেছে। মহীশূর-সরকারের চিনির কল আছে। এই কলের লোকেরা সমস্ত ক্ষারযুক্ত জমি উর্ব্বর ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছেন। তাঁরা এ বৎসর ১০০ একর ক্ষারযুক্ত জমি গুড় দিয়ে উর্ব্বর করছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে কর্ষিত ভূমির উন্নতি জমিতে গুড় ঢেলে করা যায় এবং ভারতবাসীর অন্নকষ্ট-সমস্যার এইরূপে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম ঘটতে পারে।*

* প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গসাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা। সম্পাদক শ্রীদিব্যেন্দুমোহন কর কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

কাষ্ঠধ্বংসী ছত্রাক—'পলিপোর'

ডক্টর সহায়রাম বসু

'পলিপোর,' বেসিডিওমাইসেটিস্ জাতীয় এক প্রকার ছত্রাক। ইহারা মোটর গাড়ীর কাষ্ঠনির্ম্মিত অংশ ও গৃহের কড়ি, বরগার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। 'পলিপোর' ছত্রাকের নিম্ন পৃষ্ঠে অসংখ্য ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল ছিদ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণ রেণু (spores) নির্গত হইয়া থাকে। বহুছিদ্রবিশিষ্ট বলিয়াই ইহাদের 'পলিপোর' নাম দেওয়া হইয়াছে।

বৃক্ষপত্রস্থিত 'ক্লোরোফিল' বা সবুজ-কণিকা যেমন তাহাদের পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে, ছত্রাকের দেহে সেরূপ কোন সবুজ-কণিকার অস্তিত্ব নাই; কাজেই উপযুক্ত খাদ্য আহরণের জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষদেহ আশ্রয় করিতে হয়। দেহগঠনোপযোগী খাদ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে না বলিয়াই ইহারা পরনির্ভরশীল। খাদ্য আহরণের প্রকার-ভেদে ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল ছত্রাক সজীব উদ্ভিদের দেহ হইতে খাদ্য আহরণ করে তাহাদিগকে পরজীবী বলা হয়; আর যাহারা মৃত উদ্ভিদ-জাত দ্রব্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদিগকে গলিত-ভোজী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'পলিপোর' জাতীয় ছত্রাকের বেশীর ভাগই গলিত-ভোজী। অবশ্য, পরজীবী ছত্রাকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। ইহারা সাধারণতঃ ক্ষত ভোজী এবং বৃক্ষকাণ্ডের কর্ত্তিত অংশে প্রবেশ করিয়া আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। 'পলিপোর' জাতীয় ছত্রাক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও কঠিন হইয়া থাকে। সময় সময় ইহাদের কোন কোনটির ওজন ৩০-৪০ পাউণ্ডেরও অধিক হইয়া থাকে। সময় সময় ইহাদিগকে পুরাতন বৃক্ষের কাণ্ডে বা শাখার গায়ে বড় বড় 'ব্রাকেটে'র মত সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায় (১নং চিত্র)। গাছ সকল অবস্থাতেই ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। তবে পরিণত বয়স্ক গাছের পক্ষেই ছত্রাকের আক্রমণ বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ শিকড়ের উপর আক্রমণেই বেশী অনিষ্ট হইয়া থাকে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে 'পলিপোরে'র জীবনেতিহাস সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনেতিহাসেরই প্রতিরূপ। সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তির সময় বীজের ভিতর হইতে যেমন অঙ্কুর উদ্গম হয়, পলিপোরেরও তেমন এক একটি অতি ক্ষুদ্র কোষ বা রেণু প্রথমে 'টিউব' বা নলাকার ধারণ করে। এই নল

ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া অতি সূক্ষ্ম সূত্র-গুচ্ছের সৃষ্টি করে। এই সূত্রগুলিই ছত্রাকের পোষকাংশ। ইহাদিগকে ছত্রাক-সূত্র বলা হয়। ইহারা সবুজ উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। কিছুকাল পরে যখন এই ছত্রাক-সূত্র গাছের বা কাঠের তন্তুতে সম্পূর্ণভাবে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয় এবং তথা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিতে থাকে তখন 'পলিপোর' সবুজ উদ্ভিদের পুষ্পের মত গাছের বা কাঠের বহির্দ্দেশে ফলাবয়বের সৃষ্টি করে। পুষ্পের ভিতর হইতে যেমন বীজের উৎপত্তি হয় সেরূপ এক একটি পরিপক্ক ফলাবয়ব হইতে অসংখ্য রেণু বা বীজকোষ নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কথনও কখনও আশ্রয়দাতার বহির্দ্দেশে অথবা তন্তুর অভ্যন্তরে আর এক প্রকার রেণু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে কতকগুলি সূত্রগুচ্ছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে এবং নূতন ছত্রাক-বংশ গড়িয়া তোলে।

বন্যবৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, শাল্, সেগুন, পাইন প্রভৃতি গাছকে ছত্রাকের অনিষ্টকর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ইহাদের আক্রমণের ধারা, আক্রমণের শেষ পরিণতি কিরূপ, কিরূপে ইহাদের প্রসার প্রতিরোধ করা যায়, গাছের সাধারণ গঠন এবং কোন্ অঙ্গ বিশেষ করিয়া আক্রান্ত হয়—ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে।

গাছের কাণ্ডের, শাখাপ্রশাখার ও শিকড়ের প্রান্তভাগে ও অভ্যন্তরস্থ কাঠের মধ্যস্থলে নির্ম্মকস্তর নামে নিয়ত বর্দ্ধনশীল অতিসূক্ষ্ম কতকগুলি কোষ সমষ্টি আছে। ইহাদের সাহায্যে গাছ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে বাড়িয়া থাকে। পাশাপাশিভাবে গুঁড়ি ছেদ করিলে তাহার অভ্যন্তরে কতগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ম্মকস্তরের সাহায্যে প্রস্থে বর্দ্ধিত হইবার ফলে প্রত্যেক বৎসরে এক একটি নূতন স্তরের সৃষ্টি হয়। রেখাগুলি এই বৃদ্ধির পরিচায়ক। এই রেখার সাহায্যে বৃক্ষের বয়স নিরূপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে অতি পুরাতন রেখাগুলির কোষসমূহ মরিয়া যায় এবং কোষগুলির রং পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহাই অন্তঃকাঠ বা (সার কাঠ) নামে পরিচিত। ইহার বাহিরের সজীব স্তরসমূহকে রসবাহী কাঠ নামে অভিহিত করা হয়।

'পলিপোর' ছত্রাক, বৃক্ষের মূল বা কাণ্ডের ক্ষতস্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ট্রুপ (R. S. Troup: *Indian Forest Utilization*, 1907) বলিয়াছেন,ভারতবর্ষের যে-সব পরজীবী ছত্রাক শিকড় ভেদ করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে প্রবেশ করে তাহাদের মধ্যে 'ফমিস্ এনোসাস্' (Fomes annosus) সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। ইহারা বৃক্ষকাণ্ডের নীচের দিকে কাষ্ঠস্তরকে প্রথমে আক্রমণ করে। এইরূপ আক্রমণের ফলে হিমালয় অঞ্চলের বহু দেবদারু ও শিশু বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কাণ্ড আক্রমণকারী বিভিন্ন ছত্রাক বিভিন্ন বৃক্ষের অন্তঃকাষ্ঠ আক্রমণ করিয়া কাণ্ডগুলিকে ফাঁপা নলে পরিণত করিয়া ফেলে। গাছ কাটিয়া কাঠে পরিণত করিলে অধিকাংশ 'পলিপোরে'রই ধ্বংসক্রিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না। ছত্রাকের আক্রমণে অন্তঃকাঠ অপেক্ষা রসবাহী কাষ্ঠই সহজে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রসবাহী কাঠের কোষগুলিতে এমন কোন পদার্থ থাকে যাহা খাদ্যরূপে আক্রমণের পক্ষে সুবিধাই করে কিন্তু অন্তঃকাঠে হয়ত এমন কোন বিষাক্ত পদার্থ থাকে যাহা আক্রমণ-প্রতিরোধক।

ছত্রাকাক্রান্ত কাঠের মোটামুটি বিশিষ্টতা হিসাবে দুই প্রকারের গলন দেখা যায়। এই প্রকার গলনকে রংএর প্রকারভেদে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যেমন, শ্বেত গলন ও বাদামী গলন। প্রথম শ্রেণীর গলনে কাঠের রং অনেকটা ফিকে হইয়া যায় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গলনে কাঠের রং স্বাভাবিক রং অপেক্ষা কালো বা লাল বাদামী রং ধারণ করে। প্রথম শ্রেণীর গলনে কাঠের উপরিভাগ স্থানে স্থানে সাদা হইয়া যায়, অথবা সমস্ত কাঠের রং-টাই ফিকে বর্ণে পরিণত হয়। যে সব ছত্রাক হইতে শ্বেত গলনের উৎপত্তি হয় তাহারা সাধারণতঃ কাঠের দারুকে (lignin) আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু যে-সব ছত্রাক বাদামী গলনের সৃষ্টি করে তাহারা কাঠের তৌলিকের (cellulose) উপরেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, ফলে কাঠের উপর কতকগুলি বাদামী খণ্ডের সৃষ্টি হয়, অথবা কাঠের গায়ে লম্বা লম্বা কাটলের উৎপত্তি হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পলিস্টিক্টাস্ ভার্সিকলার (Polystictus versicolor) সাধারণতঃ বেশী এবং এরা শ্বেত গলন সৃষ্টি করিতে খুব মজবুত।

যত দিন না এই ছত্রাক সমস্ত কাঠের ভিতর বেশ ভাল

ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে তত দিন 'পলিপোরে'র ফলোদ্গম হয় না। অবশ্য আলোর উপরেও ইহা অনেকটা নির্ভর করে। 'পলিপোরে'র আক্রমণের সাধারণ রীতি এই যে, যখন সজীব রেণুগুলি স্যাঁৎসেঁতে কাঠের গায়ে পড়ে তখন বাতাসের সংস্পর্শে ভিজা ও ঈষদুষ্ণ জমিতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের মত তাহাদেরও গাত্র হইতে বহুসংখ্যক সূত্রগুচ্ছের উদ্গম হয়; এইগুলিকে সূত্রাণু (hyphae) বলা হয়। এই সূত্রাণুগুলি হইতে অনেক শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া কাঠের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা প্রথমতঃ কাঠের ভিতরকার অগণিত কোষ হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে। তার পর এই সূত্রাণুগুলির বর্দ্ধনশীল অগ্রভাগ হইতে এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হইয়া কোষের আবরণগুলিকে দ্রবীভূত করে ও শেষে ঐগুলিকেই ইহারা খাদ্যসামগ্রীরূপে ব্যবহার করে। এইরূপে ইহারা সরাসরিভাবে কোষাবরণ ভেদ করিয়া কিংবা কোষাবরণের কোন স্বাভাবিক গর্ত্ত বা ছিদ্র দিয়া অগ্রসর হয়। কিঞ্চিন্মাত্রায় আর্দ্র বা স্যাঁৎসেঁতে স্থান ব্যতিরেকে ছত্রাক জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই কাষ্ঠখানি যখন কিঞ্চিদধিক মাত্রায় আর্দ্র হইয়া পড়ে তখনই সকল রকমের শুষ্ক গলনের আক্রমণ সুরু হয়। যে-সব ছত্রাক বেশী রকমের শুষ্ক আনয়ন করে তাহাদের মধ্যে মেরুলিয়াস্ ল্যাক্রিম্যানস্, পোরিয়া ইন্‌ক্রাসেটা, পোরিয়া ভেপোরেরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

কার্টরাইট্ (K. St. G. Cartwright)এর মতে ইংলণ্ডের গৃহকাষ্ঠাদির শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ ক্ষতি একা মেরুলিয়াস্ ল্যাক্রিম্যানস্-এর দ্বারাই সাধিত হয়। অবশ্য, এটা সুখের বিষয় যে আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অত্যধিক তাপ হেতু এই ছত্রাক জন্মায় না। কার্টরাইট ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জগতে সাধারণ অবস্থায় প্রধানতঃ মেরুলিয়াস্ ল্যাক্রিম্যানস্ জন্মায় না। মানুষ ও তাহার কার্য্যকলাপের সঙ্গে এই ছত্রাক বিশেষভাবে জড়িত। কার্টরাইটের মতে তাহার কারণ এই যে গৃহনির্ম্মাণের জায়গাতেই ছত্রাক জন্মাবার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা বর্ত্তমান। কেননা, সেখানে অনেক কাদামাটি স্তূপাকার করা থাকে কিংবা অনেক গর্ত্ত থাকে যেগুলি জলে ভর্ত্তি হইলে জল-সীমানা জমির উপরিভাগের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। এই সব স্থানে কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে শুষ্ক গলনের আক্রমণ (২-নং চিত্র) এক রকম সুনিশ্চিত। বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক সময় খুবই ফলপ্রদ হয়, কিন্তু সেই বায়ুর ভিতরে যদি অত্যধিক জলীয় অংশ থাকে তাহাতে আরও অধিকতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে হাম্‌ফ্রি (C. J. Hamphrey) উল্লেখ করিয়াছেন যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে মেরুলিয়াস্ (Merulius) শ্রেণীর ছত্রাকের চেয়ে পোরিয়া ইন্‌ক্রাসেটা (Poria incrasata)-ই সবচেয়ে বেশী অনিষ্টকারক।

পোরিয়া ইন্‌ক্রাসেটা ও মেরুলিয়াস্ ল্যাকিম্যানস্-এর কৃত ধ্বংস অনেকটা একই রকমের এবং সেই জন্যেই এই দুই ছত্রাকের মধ্যে অনেকে গোলমাল করিয়া ফেলেন। তার আরও কারণ এই যে মেরুলিয়াস্ ল্যাক্রিম্যানস্ প্রায়ই অফলা অবস্থায় পাওয়া যায়। ঠিক মেরুলিয়াস্ ল্যাক্রিম্যানস্এর মত ভিজা ও ঠাণ্ডা জায়গায় কাঠের উপর ইহার আক্রমণ সুরু হয়—বিশেষতঃ যে সব কাঠ মেঝের নীচে মাটির সহিত মিশিয়া আছে, অথবা মাটির কিঞ্চিৎ উপরে আছে। আলাবামা পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউটের ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৮ নং সার্কুলারে ডাঃ হামফ্রি পোরিয়া ইন্‌ক্রাসেটার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং উদাহরণ-স্বরূপ একটি সুন্দর রঙীন চিত্র ও কতকগুলি আদর্শ চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। পোরিয়া ইন্‌ক্রাসেটার রেণুগুলির রং কালো সবুজবর্ণ (কতকটা ধূসর ধরণের), কিন্তু ম্যারুলিয়াস্ ল্যাক্রিম্যানস্-এর রেণুগুলির রং লোহার মরিচার রঙের মত লাল। এ ছাড়া দুইয়ের পরিণত ফলাবয়বের রঙের মধ্যেও বিশেষ তারতম্য আছে। পোরিয়া ইন্‌ক্রাসেটার পরিণত ফলাবয়ব বাদামী অথবা তাহা হইতে কিছু গাঢ় হয়; কিন্তু মারুলিয়াস ল্যাক্রিম্যানস-এর ফলাবয়বের রং গন্ধকের মত হলদে, অথবা তাহাতে বেগুনী রঙের আভাও কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পোরিয়া ভ্যাপোরিয়া যে প্রকার ধ্বংসের সৃষ্টি করে তাহা মেরুলিয়াস-জনিত ধ্বংস হইতে অভিন্ন, কিন্তু ইহার ফলাবয়ব সম্পূর্ণ অন্য রকমের ও তাহাতে গন্ধকের মত হলুদে অথবা ছাইয়ের

১ নং চিত্র—বৃক্ষের কাণ্ডে সংলগ্ন 'ব্রাকেটে'র মত বড় বড় ছত্রাক

মত ধূসর রং নাই, এবং ইহার রেণুগুলিও বর্ণহীন। এই ছত্রাক ইংলণ্ডে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার জন্মাইলে ইহারা বোধ হয় মেরুলিয়াসের মতই ধ্বংসকারী হয়।

অগভীর স্যাঁৎসেঁতে খনিই ছত্রাকের জন্মের ও বংশ-বিস্তারের সুবিধাজনক স্থান। সেইখানকার তাপের সমতা ও বাতাসের আর্দ্রতা ছত্রাকের বংশ-বিস্তারের পক্ষে একান্ত অনুকূল। সেইখানে কাষ্ঠধ্বংসকারী ছত্রাক প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া এক অতি চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ছত্রাকের এইরূপ বৃদ্ধিতে যদি বাধা প্রদান করা না হয় তাহা হইলে ছত্রাকসূত্রগুলি একটি গভীর জাল রচনা করে এবং আলোর অভাব হেতু সেখানে সকল প্রকারের অস্বাভাবিক আকার জন্মাইতে দেখা যায়। আশ্চর্য্যরূপ ক্ষিপ্রগতিতে পোষকাংশ বৃদ্ধির ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং ইহার জন্য খনির কাষ্ঠের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা নিতান্ত কম নহে। এনেলিস্ ইকোলজিসি ৩০ ভাগে (১৯৩৩ সাল) এলবার্ট দা প্রাগ্ দেশে ১·১৪ কিলোমিটার লম্বা ভাইন-বগার রেল-সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পোরিয়া আঙেটা ক একটী ছত্রাকের পোষকাংশের এরূপ প্রচুর বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। রেলরাস্তার কাঠ ও অন্যান্য ঠের উপর প্রথমে আক্রমণ সুরু হইয়া এখন সমস্ত ঙ্গের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে এই ক্রমণের গতিরোধ করা যায় তাহা একটা মহা সমস্যা হইয়া াইয়াছে।

মোটরগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহনাদিতে সাধারণতঃ

২ নং চিত্র—গৃহকাষ্ঠে শুষ্ক গলনের আক্রমণ
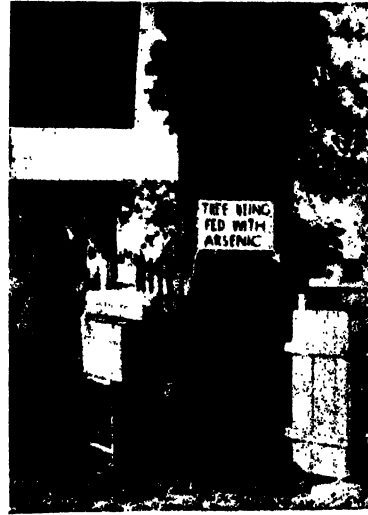
৪ নং চিত্র—ছত্রাকের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গাছে আর্সেনিক প্রয়োগ

যে সকল কাঠ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তাপযুক্ত জলীয় আবহাওয়ার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। গাড়ী বারে বারে ধুইবার সময় কিংবা বৃষ্টির সময় বন্ধ দরজা ও জানলায় জলের ছিটা লাগিয়া কাঠের ভিতর অনায়াসেই জল প্রবেশ করে; তাহার ফলে খুব সহজেই কাষ্ঠধ্বংসকারী ছত্রাকের আবির্ভাব হয়। সেই জন্য গাড়ীগুলিতে এ দেশে আসিবার পরেই এইরূপ আক্রমণ সুরু হয়। (৩ নং চিত্র) আমার বন্ধু-ছত্রাকবিৎ ডাঃ হরপ্রসাদ চৌধুরীর সৌজন্যে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় একটি ছাদ-আঁটা মোটরগাড়ীর ভিতরের

৩ নং চিত্র—মোটরগাড়ীর কাষ্ঠ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত

বসিবার জায়গার পিছন হইতে এবং ১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে লাহোর হইতে প্রেরিত আমি পোলিষ্টিকৃটাস্ স্যাঙ্গুইনিয়াস্ এবং ইর্‌পেক্স (Irpex) নামক ছত্রাকের দুইটি ফলাবয়ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ১৯৩১ সালে ফিলিপাইন্‌স্ হইতে ডাঃ হাম্‌ফ্রি গাড়ীর কাঠের উপর ফলোৎপাদনকারী তিনটি বিভিন্ন প্রকারের 'পলিপোরে'র কথা আমাদের জানাইয়াছেন, যথা লেঞ্জাইটিস্ ষ্ট্রিয়েটাস্, পোলিষ্টিকৃটাস্ স্যাঙ্গুনিয়াস্ ও ট্র্যামিটিস্ ভার্সে টিলিস্। এরা সকলেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে। তিনি ছত্রাকের দ্বারা এইরূপ ক্ষতি নিবারণের দুই প্রকার পন্থা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পন্থা হইতেছে, মোটরগাড়ী-নির্ম্মাতা ব্যবসায়ীদের পক্ষে একান্ত টেকসই কাঠ বাছাই করিয়া তাহার অন্তঃকাষ্ঠ হইতে গাড়ীর দেহ নির্ম্মাণ করা। দ্বিতীয়টি হইতেছে, যদি সাধারণ কাঠই ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে সেই কাঠ ভেদ করিয়া ক্রিয়োজোট্, জিঙ্ক ক্লোরাইড অথবা সোডিয়াম ফ্লুরাইড জাতীয় ছত্রাক-নিবারক কোন প্রকার পদার্থ তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। আজ-কাল কতকগুলি বিলাতী গাড়ীতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আব-হাওয়ার উপযোগী কাঠ ব্যবহার করা হইতেছে এবং সেই-গুলি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল ফলই দিতেছে।

এই ব্যাধির আক্রমণের পূর্ব্বেই প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোন গাছ যদি একবার এই ভয়ঙ্কর শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহ হইলে তাহাকে বাঁচান অতি দুরূহ ব্যাপার। অন্তঃগলন-উৎপাদনকারী ছত্রাক একবার কোন গাছকে আক্রমণ করিলে সে গাছকে কিছুতেই বাঁচান যায় না। তাহা চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়।

সেই জন্যই চারাগাছ প্রস্তুতের ক্ষেত্র ও বাগিচার চারি-ধার যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। ব্যাধিগ্রস্ত বৃক্ষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বনের গাছগুলি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন গাছে ছত্রাক প্রবেশ করে তাহা হইলে ইহা নিবারণের একমাত্র পন্থা হইল—যতটা জায়গা ছত্রাকাক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইতে দুই তিন ফুট নীচের কাঠ কাটিয়া সেই ছত্রাক সমূলে বিনাশ করা এবং নীরোগ অংশের উপর ক্রিয়োজোট, জিঙ্ক ক্লোরাইড প্রভৃতি কোন জীবাণুনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করা ও তাহাকে শুষ্ক করা। ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিয়ারসন্স ম্যাগাজিনে (Pearson's Magazine-এ, (নং ৪৭৭, পৃঃ ২৩৮-২৪৫) সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে প্রিন্‌সেস্ রিস্‌বরোর (Prince's Risborough-র) বনবিভাগীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করিয়া ছত্রাক নিবারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহারা ঘরের কাঠের মেঝেতে কৃত্রিম উপায়ে মেরুলিয়াস্ লাক্রিমানস্ নামক ছত্রাক রোপণ করিয়া আক্রান্ত কাঠে এই শুষ্ক গলন-জীবাণুনাশক দ্রব্যে প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা গবেষণাগারে একটি পরীক্ষামূলক শুষ্কগলনপ্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিনাশকার্য্যের প্রধান অসুবিধা হইতেছে জীবাণুনাশক দ্রব্যকে কাঠের ভিতরকার ছত্রাকের দেহে প্রবেশ করান, কেননা, শুধু কাঠের উপরে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করিলে কেবল উপরের ছত্রাকগুলিই ধ্বংস হয়। ঐ সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই, তবে তাঁহারা এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। উক্ত পরীক্ষাগারের ডিরেক্টার মিঃ পিয়ারসন্ যথার্থ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে "ইহা বহু সময়সাপেক্ষ।...আমরা কাঠের জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে যতই জ্ঞান লাভ করিতেছি ততই অনুভব করিতেছি যে আরও কতই না জানিবার আছে।" তাঁহারা শত্রুদিগকে দমন করিবার জন্য গাছে আর্সেনিক প্রয়োগ করিতেছেন। (৪ নং চিত্র)

হাজারিবাগে বাঙালী

শ্রীঅশোক চৌধুরী ও শ্রীকল্যাণী দেবী

বাঙালী যে সর্ব্বদাই ঘরের কোণে ব'সে থাকত না, তা বাংলা দেশের বাহিরে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা, প্রভাব এবং পূর্ব্বকার প্রতিপত্তির ইতিহাস থেকে জানা যায়। বর্ত্তমানে অবশ্য প্রাদেশিকতার চাপে অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীর

সাধারণ রঙ্গনালয়

প্রসার কমে এসেছে এবং সেই কারণে নিজের দেশে গুঁতোগুঁতি করা ছাড়া উপায় নেই। এখন বাংলা দেশ থেকে লোক অন্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করা দূরে থাকুক, সুদূর পঞ্জাব, রাজপুতানা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান থেকে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে অ-বাঙালীরা এসে দিন দিন বাংলা দেশ ছেয়ে ফেলছে।

ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা আমাদেরই দেশে, এবং এই বাংলা দেশ থেকেই যেমন এই রাজত্ব ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর প্রসারও তেমনই সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকার্য্যে এবং রাজনীতিতে বাঙালীর দানই সর্ব্বপ্রথম, সেই রকম ব্রিটিশ রীতিতে আপিস, আদালত, স্কুল সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়াতে, বাঙালীই সর্ব্বপ্রথম তাতে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং উচ্চপদ লাভ ক'রে দেশ বিদেশে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা অধিকার ক'রে ক্রমশঃ আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, তার পর উত্তর-ভারত, এই রকমে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষকেই গ্রাস করে। ছোট-নাগপুর প্রদেশও বাদ পড়ে নি। তখন হাজারিবাগ সামান্য শহর। দেশীয় রাজা, নবাব এবং ভূস্বামীদের সঙ্গে কোম্পানীকে কম যুদ্ধ করতে হয় নি, এবং এমনি ধারা

নববিধান মন্দির

রামগড়ের রাজার সঙ্গেও গোলমাল বেধেছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছোটনাগপুরের উত্তর ভাগটা—যেটাকে আজকাল হাজারিবাগ জেলা বলা হয়—সেটাকে রামগড় জেলা নাম দিয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা-সরকারের এলাকায় রেখেছিল—তখনও এ শহরের দিকে দৃষ্টি পড়ে নি।

১৮৩১ সালে বাধল কোল-বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ক্যাপ্টেন টাইলারের অধীনে কলকাতা থেকে এক দল সৈন্য পাঠান হয়—এই সেনাদল রামগড়ের কাছে হাজারিবাগ শহরের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পল্লী ওকনীতে আস্তানা গাড়ে। এর পূর্ব্বে ১৭[illegible] সালে উপযুক্ত দেখে এক ক্যাণ্টনমেণ্ট নির্ম্মাণ করা উত্তর-ছোটনাগপুরের শান্তি রক্ষা করবার [illegible]। ক্যাণ্টনমেণ্ট অবশ্য বহুদিন হ'ল তুলে দেওয়া হয়েছে, তার
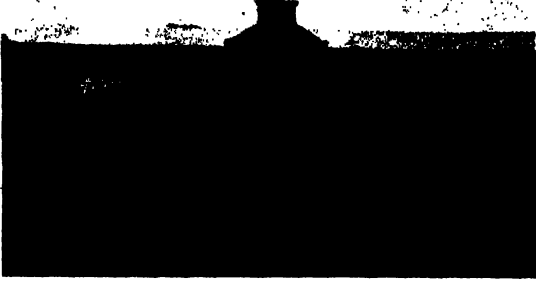
বেলজিয়াম সেমিনরী

মেয়েদের সেণ্ট কলম্বাস্ হাসপাতাল

বাড়ী-ঘর প্রায় সব ভেঙে চুরে গেছে ; যা ছিল, তা মেরামত ক'রে পুলিস-ফৌজদারী কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

সেই সময় ক্যাণ্টনমেণ্ট সৃষ্টি হওয়াতে এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং মনোরম আবহাওয়া, ও স্বাস্থ্যকরতার প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টি পড়ে। কোল-বিদ্রোহের পর ১৮৩৩ সালে কোম্পানী হাজারিবাগ জেলার পত্তন ক'রে এই ওকনী গ্রামকে এবং সংলগ্ন হাজারিবাগ পল্লীকে শহরের আকারে বাড়িয়ে জেলার সদরে পরিণত করে। নূতন আপিস-আদালত খোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সহিত শিক্ষিত বাঙালীও ক্রমশঃ শহরে উপনিবেশ স্থাপন করতে আসেন। সেই সময় রাঁচিতে কেন্দ্র ক'রে জার্ম্মান ইভাঞ্জেলিক লুথারান্ মিশন এখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে আদিম কোল, সাঁওতাল, ভূঁইয়া এদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত করছিলেন। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহে এই অগ্রগতিতে বাধা পড়ে।

১৮৬৪ সালে হুগলী থেকে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এখানে সরকারী উকিল হ'য়ে আসেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পল্লী খতম্‌বাজারে তিনি অনেকটা ভূমি ক্রয় করেন। তার পর ক্রমশঃ হাজারিবাগ সদর-কোর্টে বাঙালী উকিলের সংখ্যা বেড়ে যেতে অনেকেই জমি-জমা [illegible]রে এখানে বাস করতে থাকেন। বাহিরে তদানীন্তন [illegible] প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ ছিল যথেষ্ট, কারণ স্থানীয় [illegible]বাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভালরূপে গ্রহণই করে নি।

ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-মনীষিগণের উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন কলকাতা থেকে হাজারিবাগেও পৌঁছতে দেরি হয় নি। তৎকালীন বাঙালী অধিবাসীরা সকলে মিলে খতম্‌বাজারে যদুনাথ বাবুর জমিতে বড় রাস্তার ধারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও বড়বাজারের মধ্যে নববিধান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে টাউন-হল খোলা হয় একটা বৃহৎ বাংলোতে, সেখানে বাঙালী ক্লাব ও একটা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের নামে পরে সেটার 'কেশব-হল' নামকরণ হয়। প্রতিবৎসর মাঘোৎসবে এই কেশব-হলে আনন্দ-মেলা হয়, তাতে স্থানীয় মহিলারা যোগদান ক'রে আলাপ-আলোচনা এবং আমোদ-প্রমোদে তুষ্টি লাভ করেন। স্থানীয় শিক্ষিত বাঙালীর মজলিস এই ক্লাবের অঙ্গনেই বসে—তাতে পাঠাগার ও খেলা-ধূলার বিভাগ আছে। পাঠাগারটিতে ভাল ভাল বাংলা ও ইংরেজী বই আছে দেখলাম। হলে মাঝে মাঝে সভা এবং জলসার আয়োজন হ'ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি সেখানে এক সিনেমার আবির্ভাব হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রত্যহ শো দেখান হয়। নিকটেই কিছুদিন হ'ল কোন মাড়োয়ারী কি বিহারী বণিকের উদ্যোগে আর একটি প্রেক্ষাগারও নির্ম্মিত হয়েছে—'রঘুনন্দন হল'—সেখানেও মাঝে মাঝে থিয়েটার-বায়স্কোপ হয়ে থাকে।

নববিধান-মন্দিরটি আকারে বড় নয়, অনেকটা আমাদের ভবানীপুরের পুরাতন সাধারণ সমাজের মত। অঙ্গনের মাঝে সম্মুখেই সাধু প্রমথলালের স্মৃতিচিহ্ন। এখানে প্রতি রবিবার নিয়মিত প্রার্থনা হয়।

ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক

জেলা স্কুল—ছাত্রনিবাস

সাধারণ সমাজের আচার্য্য মন্মথবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মন্দিরটি তুলনায় বড়, চমৎকার পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একটা নাতিবৃহৎ টাইল-গৃহে অবস্থিত। প্রত্যহ সকালে দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়। মন্দিরের পিছনেই আচার্য্য মহাশয়ের কুটীর।

বড় রাস্তার ধারেই বাজারের সামনে মেয়েদের স্কুল—শুনলাম স্থানীয় শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হ'ল স্থাপিত হয়েছে। ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত এগোতে পারে নি এখনও।

মেয়েদের আরও কয়েকটা স্কুল আছে, তার মধ্যে মিশনরী স্কুলটাই উল্লেখযোগ্য—এখানে কয়েক জন বাঙালী শিক্ষয়িত্রী আছেন, এ ছাড়া জেলা স্কুল ও মিশনরী সেণ্ট কলম্বাস কলেজ-স্কুল প্রভৃতি ছেলেদের স্কুলও আছে। হিন্দী মাইনর স্কুলও গোটাকতক আছে। হজরৎগঞ্জে মিশনরী-পরিচালিত মেয়েদেরও একটি হিন্দী স্কুল আছে—রাঁচি রোডে খড়্গবাবুর বাড়ীর নিকটেই।

হাজারিবাগ শহরের শিক্ষার প্রসার কিরূপ তা মিশনরী সেণ্ট কলম্বাস কলেজটি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সুন্দর প্রাসাদোপম কলেজ-গৃহটি—নির্জ্জন নিরিবিলি জায়গায় বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ অবস্থান। বিস্তৃত হাতার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৃক্ষলতায়-ঘেরা কলেজ-গৃহ, ছাত্রাবাস, টেনিসকোর্ট।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় মিশন এই প্রদেশে কাজ করতে আসেন। তাঁরা প্রথম সরকারের কাছ থেকে পুরাতন সেনাদলের পরিত্যক্ত হাসপাতাল-গৃহটি নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার এবং শিক্ষা-প্রসার সুরু করেন। বিশপ্ হুইট্‌লী ছিলেন এই দলের নেতা। তাঁদেরই উৎসাহে ১৮৯৯ সালে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। প্রথমে, বর্ত্তমানে যে-গৃহে ডাকঘর রয়েছে সেইখানে ক্লাস হ'ল। মারে সাহেব হলেন সর্ব্বপ্রথম প্রিন্সিপ্যাল। পরে কয়েক জন খ্রীষ্টান বাঙালী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পর চাঁদা তুলে ১৯০৮ সালে এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। এর মাঝখানে প্রার্থনা-ভবন, হুইট্‌লী সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত। সেণ্ট কলম্বা কলেজ-স্কুলও এঁদেরই উদ্যোগে সৃষ্ট। মহিলা-বিভাগ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত এখনও অগ্রসর হয় নি শুনলাম।
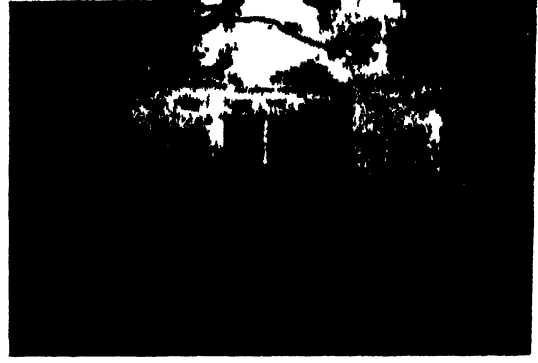
সেণ্ট ষ্টিফেন্স গীর্জ্জাও এঁদের উদ্যোগে নির্ম্মিত হয়। ডাবলিন মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি, জেনানা হাসপাতাল। চমৎকার একটি দ্বিতল অট্টালিকায় এটি অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে ছিল ডাক্তার হার্ণের অক্লান্ত উদ্যম। প্রথমে সামান্য ডিস্পেন্সরী-গোছের ছিল, তার পর ১৯১৩ সালে এই বাড়ী নির্ম্মিত হয়। প্রায় ৪০।৫০টি রোগীর আসন আছে, সরকারের কাছ থেকে কিছু বার্ষিক সাহায্যও পেয়ে থাকেন শুনলাম। প্রাইভেট্ ওয়ার্ডে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও ইচ্ছা করলে বেশ আরামে থাকতে পারেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্ব্বে হাজারিবাগ কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে এখানে অনেকগুলি বাঙালী শিক্ষক আছেন। কলেজে কলা ও বিজ্ঞান দুই-ই পড়ান হয়। বাঙালী ছাত্রের সংখ্যাও মন্দ

রঘুনন্দন হল

নয়। বাঙালী অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই কলেজের নিকটেই বাড়ী ক'রে বাস করছেন।

হাজারিবাগ শহরের এক প্রান্তে শীতাগড় পাহাড়ের তলায় আর একটি ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়—বেলজিয়ান মিশন একটি সেমিনরী নির্ম্মাণ ক'রে বাস করছেন। এঁরা রোম্যান ক্যাথলিক ব্রহ্মচারী। মিশনের অবস্থানটি অনেকটা শিলঙের ইটালীয়ান্ কনভেন্টের মত। চমৎকার নির্জ্জন স্থান—সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী। মেয়েদের কোন বিভাগ নেই—পাদ্রীরা সকলে নিজেরাই পালা ক'রে রান্নাবান্না করেন এবং আপন-আপন পড়াশুনায় নিমগ্ন থাকেন।

শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে হাজারিবাগের গুরুত্ব কিছু কম নয়—সাধারণ কলেজ ভিন্ন গবর্ণমেন্টের পুলিস ট্রেনিং কলেজ উল্লেখযোগ্য। ওখানকার সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবার পর আমরা আবিষ্কার করলাম যে তিনি বাঙালী। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখবার ঔৎসুক্য এবং উৎসাহে তিনি আহ্লাদিত হ'য়ে যত্নের সহিত সব

জেলখানা

দেখালেন। ভদ্রলোকের নাম শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা তাঁর জন্মভূমি। বললেন, এককালীন জন-পঞ্চাশ ছাত্র থাকে—এক বৎসরের কোর্স। ওখানে প্রবেশলাভ স্থানীয় এস-পির উপরেই নির্ভর করে। কলেজটির অবস্থানও মনোরম, পুরাতন ট্রাঙ্ক রোডের উপরেই বেশ বড়গোছের দ্বিতল অট্টালিকায় ছেলেরা শিক্ষালাভ করে।

সেণ্ট্রাল জেলের প্রায় সংলগ্ন এবং শহরের উত্তর সীমানায় কৃত্রিম হ্রদের উপরেই সংশোধনী বিদ্যালয় (রিফর্মেটরী)। এটি দেখবার সুযোগ সহজেই হয়। অনেক রকম অর্থকরী শিক্ষা দেওয়া ছাড়া সাধারণভাবে লেখাপড়াও শেখান হয়—তার জন্য হাতার মধ্যেই একটি স্কুল রয়েছে দেখলাম। সাধারণ জেলের মত ছোটখাট হাসপাতালও রয়েছে। প্রায় দু-শ জন ছেলের স্থান আছে—সম্প্রতি বোধ হয় ১৭০।৭৫ জন অধিবাসী। এদের মধ্যে কিছু বাঙালী আছে। বাঙালী শিক্ষকও কয়েক জন আছেন। রিফর্মেটরীর কারখানা একটি দেখবার জিনিষ—কোথাও ছেলেরা ইলেক্ট্রোপ্লেটিং শিখছে, কোথাও বেতের বা কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করা শিখছে, কোথাও আঁকা বা স্কেচিং শিখছে।

রিফর্মেটরী স্কুল

হাজারিবাগের সদর চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরী ও পশু-চিকিৎসালয়টিও দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সদর হাসপাতালের বর্ত্তমান সিভিল সার্জ্জন

ক্যাপ্টেন হিক্ সাহেব—তাঁর সহকারী হলেন ডাক্তার ব্যানার্জ্জি। আরও দু-এক জন ওখানে কাজ করেন, কয়েক জন বাঙালী নার্স‘ও আছেন। ওখানকার বড় চিকিৎসক হলেন ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। আমরা ওঁকে প্রায়ই সান্ধ্যভ্রমণে রত দেখতাম। স্বর্গীয় আশুতোষ রায় মহাশয় ওখানে এক জন স্বনামখ্যাত ডাক্তার ছিলেন—ওঁর সঙ্গে এক সময় আলাপ হয়েছিল।

হাজারিবাগ কলেজ

হাজারিবাগ কোর্টে বাঙালী উকিলের সংখ্যা যথেষ্ট। সরকারী উকিল শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। দেখলাম তিনি একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করছেন। নন্‌-রেগুলেটেড জেলা, দেওয়ানী মোকদ্দমা বিশেষ হয় না, তার জন্য একটি মুন্সেফ্ কোর্ট। ফৌজদারী বিভাগে বোধ হয় পাঁচ-ছয় জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণতঃ দু-তিন জন থাকেন। পূর্ব্বে শ্রীনন্দলাল ঘোষ মহাশয় ছিলেন এস. ডি. ও। ডেপুটি কমিশনার মারউড্ সাহেব ছুটি লওয়াতে সম্প্রতি রায়বাহাদুর নগেন্দ্র রায় তাঁর স্থানে কাজ করছেন। কাছারীতে কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম ব'লে মনে হ'ল।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কিছু কম নয়। তার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পরিচয় ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক এবং গাঙ্গুলি কোম্পানীর লাল মোটর। গাঙ্গুলি কোম্পানী বহুদিন থেকে এখানে মোটর এবং বাস সার্ভিসের ব্যবসা করছেন। এঁরা পূর্ব্বে এটি একচেটিয়া ক'রে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি কয় বৎসর কয়েকটা অ-বাঙালী কোম্পানী জন্মলাভ করেছে। প্রশংসার বিষয় যে, গাঙ্গুলি কোম্পানী কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না ক'রে বহু বিহারীকে চাকরি দিয়েছেন। বাঙালী যুবক কয়েক জন প্রাইভেট্ ট্যাক্সির ব্যবসা ক'রে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করছেন। তবে কলকাতার মত অনেক পঞ্জাবী হালে এখানে বাস, ট্যাক্সি ক'রে ফেলেছে।
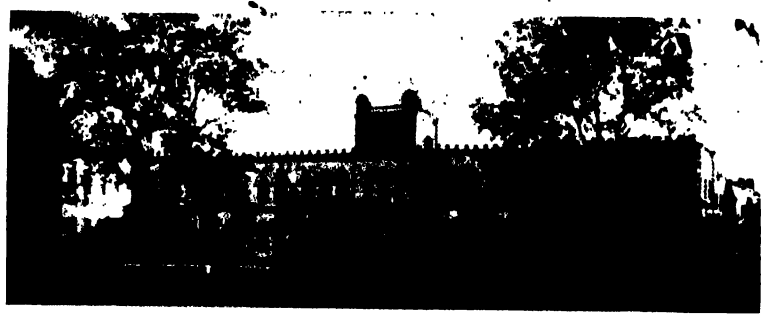
জেলা স্কুল

ছোটনাগপুরের ব্যাঙ্কের নূতন দ্বিতল গৃহটি যেমন সুন্দর তেমনই উপযোগী। এই প্রতিষ্ঠান ছোটনাগপুরে বাঙালীর সম্মান বৃদ্ধি করেছে। হাজারিবাগের বাঙালী সম্প্রদায়ে কয়েক জন কোদর্ম্মা এবং তার নিকটবর্ত্তী অভ্রখনিতে অনেক দিন ব্যবসা ক'রে আসছেন; নিজস্ব খনি কয়েক জনের আছে। তাঁরা খনিতেই বেশীর ভাগ সময় থাকেন, তবে সকলেই প্রায় শহরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন—পূর্ব্বে গ্র্যাণ্ড-কর্ড খোলবার আগে আরও ছিল তবে কোদর্ম্মা রেলষ্টেশন হওয়াতে একটু কমে গেছে। এ ছাড়া মহুয়া, গালা, সবাই-ঘাস, খয়ের এবং শালপাতা ও কাঠ প্রভৃতি ছোটখাট ব্যবসা অনেক আছে।

হোটেল, বোর্ডিং বা স্বাস্থ্যনিবাস প্রায় পাঁচ-ছয়টি— প্রায় সবগুলিই বাঙালীর। সাহেবপাড়ায় হ্যাম্পটন্ কোট টিই সর্ব্বাপেক্ষা . পুরাতন এবং মিস্ পলি মিত্র এটি প্রথম স্থাপন

সদর জেলা হাসপাতাল

করেন। উপস্থিত তাঁর মেয়ে মিস্ মেরী মিত্র এটাকে চালাচ্ছেন।

বাঙালীর পক্ষে চাকরির বাজার অন্যান্য স্থানের মতই সঙ্কীর্ণ, তবে বোধ করি রামগড় এষ্টেটে কয়েক জন বাঙালী কর্ম্মচারী এবং কেরাণী আছেন। কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের কাছাকাছি অনেক সেরেস্তা আছে এবং সৌভাগ্যবশতঃ এখনও কিছু বাঙালী এগুলিতে নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়া শহরের মধ্যে কয়েকটি বাঙালী-পরিচালিত দোকান আছে। তবে বড় বড় কাপড়ের দোকান বা মুদিখানা সম্পূর্ণ মাড়োয়ারী বণিকের হাতে।

গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারী অনুসারে হাজারিবাগ শহরের লোকসংখ্যা এইরূপ—

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৭,৬৮২	৬,৯৬৬	১৪,৬৪৮
মুসলমান	২,৫১০	২,৪৬৫	৪,৯৭৫
খ্রীষ্টান	৪৫৫	৪০৫	৮৬০
আদিম জাতি	১২৯	১৩২	২৬১
জৈন	১১১	১০২	২১৩
শিখ	১৪	৪	১৮
অপর	২	২	
সর্ব্বসমেত	১০,৯০৩	১০,০৭৪	২০,৯৯৭

চৌদ্দ হাজার হিন্দু নাগরিকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সম্ভবতঃ দুই-তিন হাজারের বেশী হবে না। খ্রীষ্টানের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ ঘর বাঙালী আছেন, তাঁরা বেশীর ভাগ হার্ণগঞ্জের দিকেই বাস করেন। মুসলমানদের সংখ্যা গিরিডির তুলনায় অনেক কম—ক্ষীরগাঁওয়ের দিকেই এদের আড্ডা।

প্রতি বৎসর বহু বাঙালী স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিহারের এই সমস্ত শহরে বেড়াতে আসেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্বের মত সুযোগ-সুবিধা তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। প্রাদেশিকতার হুজুগে এই সমস্ত শহরে জমি কিনে বাস করাও হয়ত পরে আর বাঙালীর পক্ষে ঘটে উঠবে না। আসলে ছোটনাগপুর প্রদেশ—বিহারেরও নয়, উড়িষ্যারও ছিল না। এটা মূলতঃ আদিম জাতির আবাসভূমি। আজ বাংলা দেশের জনসংখ্যা বিহার অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে অধিক; শুধু তাই নয়, বাংলায়, বিশেষতঃ কলিকাতায় বিহারী জন-সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে বাংলা দেশের আয়তন বৃদ্ধি করা সরকারের একান্ত উচিত। মাঝে বাংলাকে কোন এক স্বাস্থ্যকর জেলা দেবার কথা শুনে-ছিলাম; সমস্ত ছোটনাগপুর প্রদেশ—না হয় অন্ততঃ মানভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং হাজারিবাগ জেলা, এই তিনটিকে দিলেও বাঙালীর যথেষ্ট উপকার হ'তে পারে।

বঙ্গে আধুনিক প্রাচীর-চিত্র

উপরে ও নীচে : শ্রীসুধাংশু চৌধুরী অঙ্কিত একখানি প্রাচীর-চিত্রের দুই অংশ
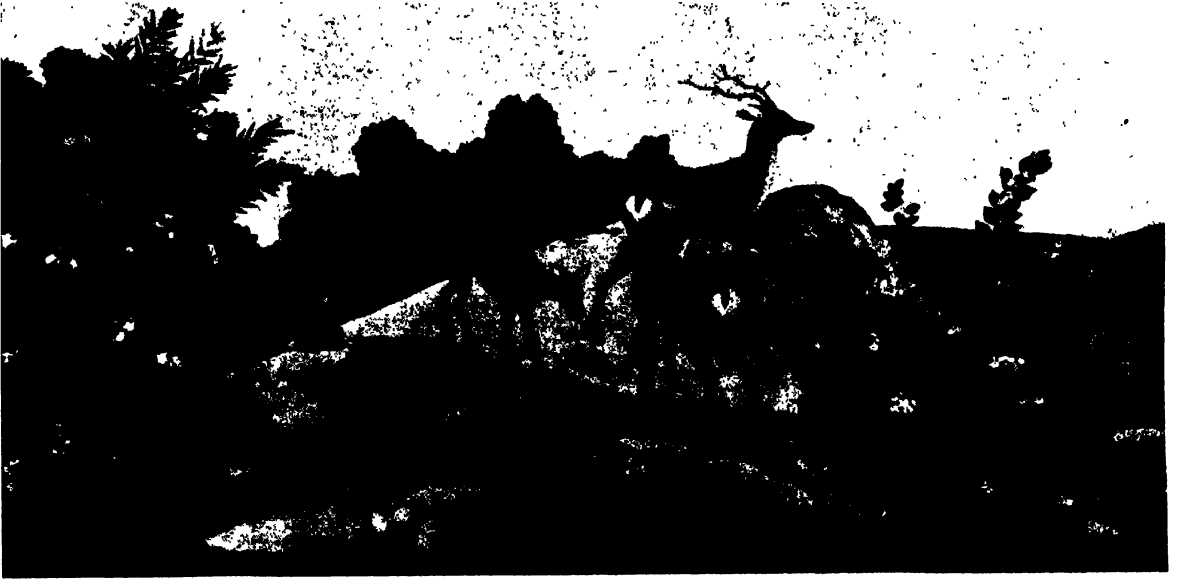
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র
[কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের অস্ত্রত্যাগ ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ]

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সুধার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে সুধা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নূতনত্বের ভিতর সুধা কোনও আশ্রয় পাইল না। পীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নূতন নূতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত সুধাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার কিছুদিন পরে একটি নবাগতা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ সুধার বন্ধুপ্রীতি উথলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন। স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হৈমন্তীর সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব লইয়া স্কুলের অন্য মেয়েরা ঠাট্টা তামাসা করে, তাহাতে সুধা লজ্জা পায়, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি তাহার নিবিড়তর হইয়া উঠে। হৈমন্তীর চোখের ভিতর দিয়া সে নিজেকেও যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। পূজার সময় মাসিমা সুরধুনী কলিকাতায় বোনকে দেখিতে আসাতে, সুধা সেই ফাঁকে শিবুকে লইয়া একবার নয়ানজোড় ঘুরিয়া আসিল। মন কিন্তু যেন কলিকাতায় ফেলিয়া গেল। সুধা নিজের আসন্ন যৌবন সম্বন্ধে নিজে ততটা সচেতন নয়, কিন্তু মাসিমা পিসিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সারাক্ষণ সাবধান করিয়া দিতেছে।

হৈমন্তীর কল্যাণে সুধা প্রথম নিঃসম্পর্কীয় যুবকদের সঙ্গেও মিশিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন দল বাঁধিয়া অনেকে বেড়াইয়া আসিল। দলে চারজন যুবক ছিল, মহেন্দ্র, সুরেশ, তপন আর নিখিল। তপন অতিশয় সুপুরুষ, সুরেশ মোটা, কালো, ছোট-খাট মানুষ, বেশী কথা বলে না, তবে প্রখরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণধী। মহেন্দ্র কাঠখোট্টা গোছের মানুষ, সারাক্ষণ মানবজাতির গুরুগিরি করিতে ব্যস্ত। নিখিল দীর্ঘাকৃতি, শ্যামবর্ণ সদাহাস্যময়।

স্কুলে একদিন মেয়েমহলে মহাতর্ক হইয়া গেল। মেয়েদের স্বামী নির্ব্বাচন ভালবাসিয়া নিজে করা উচিত, না উচিত চোখ কান বুজিয়া মা-বাপের হাতের পুতুলের মত পার হইয়া যাওয়া। মনীষা একদিকে, স্নেহলতা আর-একদিকে। সুধা এ বিষয়ে আগে কিছু ভাবে নাই, এখন ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও কূল পাইল না। সনাতনপন্থী জীবনযাত্রা দেখিতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু এখন আবার মনে সংশয় জাগে হয়ত আর এক ধরণের জীবনও আছে, তাহাতে মানুষের নিজের মন তাহার একমাত্র কাণ্ডারী। এবং হয়ত সে পথে-যাহারা চলে তাহারা সকলেই ভুল করে না।]

১৯

হৈমন্তীদের বাড়ীতে বড় একটা গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে। হৈমন্তীর জ্যাঠামহাশয় নরেশ্বর পালিত পাড়া-গাঁয়েরই মানুষ, কিন্তু তাঁহার সখ ছিল বিলাত-ফেরত ভাইয়ের কাছে রাখিয়া মেয়েটিকে একটু আধুনিক ধরণে মানুষ করেন। তাই অল্প বয়স হইতেই মিলি আসিয়াছে কলিকাতায়; চলন ধরণ সাজসজ্জা কথাবার্ত্তা কোনও কিছুতেই আজ আর তাহার খুৎ পাওয়া যায় না। ছেলেবেলা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছে, বড় হইয়া বাংলা স্কুলেও হৈমন্তীর মত দুই-তিন বছর ছিল; সুতরাং দুই জাতীয় শিক্ষাই তাহার অল্পবিস্তর হইয়াছে। মেয়ের বয়স উনিশের কাছাকাছি হইল দেখিয়া বাপ জ্যাঠা সকলেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত। বেশ ভাল একটি বিলাত-ফেরত ছেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। অর্থ সামর্থ্য বংশমর্য্যাদা ও রূপ, কোনও দিক্ দিয়াই সে ছেলে উপেক্ষার যোগ্য নয়। মিলিকে ঠিক সুন্দরী কিংবা ধনী-কন্যা বলা যায় না, সুতরাং তাহার পক্ষে এই রকম স্বামী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই দশজনে বলিবে। কিন্তু মিলি হঠাৎ বলিয়া বসিল যে সে বিবাহ করিবে না। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষেরই চক্ষুস্থির!

মিলির মা শহুরে সভ্য-ভব্য কথার ধার ধারেন না। তিনি চটিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। "ঢেঁকি মেয়ে, বিয়ে

করবি না ত কি, চিরকাল আইবুড়ো হয়ে ব'সে থাকবি? তোর জন্যে জাতকুল সব খোয়াব নাকি আমরা? অমন ছেলে তপিস্যে করলে পাওয়া যায় না, রূপসী মেয়ে আমার থ্যাদা নাক উঁচিয়ে অমনি 'না' ব'লে বসলেন। ঘাড়ে ধ'রে তোকে আমি বিয়ে দেব।"

হৈমন্তীর মা নাই, কাজেই রণেন পালিত আসিলেন যুদ্ধ মিটাইতে। তিনি বলিলেন, "বৌঠাকরুণ, অমন রণরঙ্গিণীর মত খাঁড়া না তুলে একটু অন্য পন্থা ধর না? হিমুকে দিয়ে খোঁজ নাও, কেন মেয়ের আপত্তি। আজ-কালকার মেয়ে, কেন কি বলছে সব জেনেশুনে কাজ করা দরকার। হয়ত আর কাউকে মনে ধরেছে। স্বয়ম্বরের যুগ।"

বৌঠাকরুণ একেবারে করুণ সুর ধরিলেন, "ওমা, আমার কপালে শেষে এই ছিল! এমন মেয়ে আমি গর্ভে ধরলাম যে যা নয় তাই আমায় শুনতে হল এই বয়সে।"

পালিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "'যা নয়', নয় বৌঠাকরুণ, আজকাল এইগুলোই হয়। ওর জন্যে ভেব না, তোমার কিছু মানহানি হবে না। তুমি একবার হিমুকে মিলির পেছনে লাগিয়ে দাও।"

বৌঠাকুরাণী কি আর করেন, হৈমন্তীরই শরণ লইলেন। ভাবিলেন, যস্মিন্ দেশে যদাচার তা মানিয়াই চলিতে হইবে।

হৈমন্তী স্কুলে আসিয়াই টিফিনের ঘণ্টায় সর্ব্বাগ্রে সুধাকে ডাকিয়া বলিল, "জান ভাই, মিলিদিদি এক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সব ভেঙে দিয়েছে কি জানি কি জন্যে। জ্যাঠাইমা এখন বলছেন, 'তুই খোঁজ নে ওর কাকে মনে ধরেছে।' কি ক'রে খোঁজ নি বল ত আমি?"

কথাটা শুনিয়াই সুধা চোখ বড় করিয়া বলিল, "আমি হয়ত জানি সে কে!"

হৈমন্তী সুধার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "তুমি? পৃথিবীতে এত লোক থাকতে শেষে তোমার মত 'ইনোসেন্ট বেবী'র কাছে খবর নিতে হবে?"

হৈমন্তীর ঠাট্টার জবাব না দিয়া সুধা গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল, "তোমাদের পূবের বারান্দায় আমি একদিন দেখেছিলাম, মিলিদি সুরেশদার গলা জড়িয়ে— বুঝেছ? আমাকে হঠাৎ দেখে সুরেশদা চমকে উঠেছিল, তার পরেই বলল, 'বন্ধুত্বের মর্য্যাদা তুমি নিশ্চয় রক্ষা করবে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।' আমি কিছু বলি নি, কিন্তু আমার ভারী রাগ হয়েছিল। লুকিয়ে কোন কাজ কি মানুষের করা উচিত?"

হৈমন্তী মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "বেচারী মিলিদিদি, বেচারী সুরেশদা!"

সুধা বিচারকের মত কঠিন সুরে বলিল, "বেচারী কেন বলছ ভাই, ওরা ত জেনেশুনেই যা করবার করেছে?"

হৈমন্তী সুধার দিকে করুণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "বোকা মেয়ে! তুমি বুঝবে না। সুরেশদার যে এক পয়সার সম্বল নেই। মিলিদি এত আদরে মানুষ, শেষে এই দুঃখ বরণ করা তার কপালে ছিল! জ্যাঠামশায় নিশ্চয় কিছুই দেবেন না।"

সুধা বলিল, "মিলিদি ত নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে কেন এ পথে গেল?"

হৈমন্তী উদাস চোখে অন্য দিকে চাহিয়া যেন কতকটা আপন মনেই বলিল, "সুধা! আমি যদি এমন কাজ করি, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?" সুধা চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হৈমন্তী আবার বলিল, "মানুষের ভবিতব্য মানুষকে এই পথে টেনে নিয়ে যায়, তার দৃষ্টি যে তখন প্রবল ঝড়ে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়, একথা তুমি কবে বুঝতে শিখবে? তুমি কি তপস্বিনী হবে ব'লে পৃথিবীতে এসেছ?"

সুধা তবু বলিল, "আচ্ছা, মিলিদি না-হয় যা করেছে করেছে, সুরেশদা ত পুরুষ মানুষ, তাকে সংসারের ভার নিতে হবে। সে যদি সে কাজের যোগ্য না হয়ে থাকে তবে মিলিদিকে এই পথে টানার জন্যে নিজের কাছে নিজে সে কি অপরাধী নয়?"

হৈমন্তী বলিল, "পাগলী, মানুষ কি মানুষ বেছে নিয়ে প্ল্যান ক'রে তবে ভালবাসে? অদৃষ্ট যাকে যে দিকে নিয়ে যায় তাকে সেই দিকেই ছুটতে হয়।"

সুধা এবার হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আমার চেয়েও বয়সে ছোট, তুমি অমন সবজান্তার মত কথা বলছ কেন? অদৃষ্টই হোক আর যাই হোক, নিজেকে নিজের হাতের

মুঠোর মধ্যে রাখবার ক্ষমতা মানুষের নিশ্চয় আছে। সে ইচ্ছা করলেই তার বাইরের ব্যবহারকে সংযত করতে পারে। মানুষের মনুষ্যত্বই ওইখানে।"

হৈমন্তী বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছ এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু হয়ত আর একদিন অন্য দিক্‌টাও কিছু বুঝবে তুমি। আমি যদি তার আগেই কিছু ক'রে বসি, তুমি যেন আমার ওপর রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে ব'স না।"

কথাটা শুনিয়াই সুধার অভিমান হইল। মিলিদির কথা হইতেছে, তাহার কথা হইলেই চলিত, হৈমন্তী আবার ইহার ভিতর আপনার কথা ঢুকাইতে ব্যস্ত কেন? এখনই কি তাহার বন্ধুত্বের কাব্য শেষ করিয়া সংসারের হাঁড়িকুঁড়ির ভিতর ঢুকিবার বয়স হইয়াছে? এত শীঘ্র এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের কথা ভুলিয়া হৈমন্তী অন্য কথা ভাবে কি করিয়া?

হৈমন্তী সুধার অভিমান বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "যাক, এখন থেকেই আর গাল ফুলিয়ে থাকতে হবে না। মিলিদিকে কি ক'রে জিজ্ঞেস করব এস পরামর্শ করা যাক্। তুমি আমাদের বাড়ী চা খেয়ে তার পর বাড়ী ফিরো। ততক্ষণে একটা কিছু উপায় ঠিক বার করা যাবে।"

এত শীঘ্রই মিলির মনের খবর জানিতে পারিবে হৈমন্তী ভাবে নাই। সে আজ মিলিকে কোন প্রশ্ন করিবেও মনে করে নাই। সুধাকে সঙ্গে করিয়া স্কুল হইতে ফিরিয়া চায়ের সন্ধানে ভাঁড়ার-ঘরে অকস্মাৎ মিলিকে আবিষ্কার করিয়া হৈমন্তী বিস্মিত ভাবে বলিল, "দিদি, আজ অসময়ে এমন জায়গায় কেন? ড্রেসিং টেবিলের ধারেই ত তোমার এখন আসন পাতবার সময়।"

মিলি মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, "চুলোর ভিতর আসন নিলেই আমার সব চেয়ে ভাল হয়। ড্রেস করব আর আমি কি সুখে? মা ত আমায় গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।"

হৈমন্তী রাগ করিয়া বলিল, "ও সব কি ছাইভস্ম কথা বলছ ভাই! তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, তুমি ক'রো না। সত্যি কি কাউকে কেউ জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দিতে পারে?"

মিলি বলিল, "যতখানি যুদ্ধ করলে জোরজবরদস্তি ঠেকিয়ে রাখা যায়, ততটা ক্ষমতা যদি আমার না থাকে?"

হৈমন্তী বলিল, "তাহলে তোমার তাই নিয়ে কাঁদবার অধিকার নেই। যে অতটাই দুর্ব্বল তার নিজের পথ নিজে বাছবার যোগ্যতা কেউ স্বীকার করবে না।"

মিলির চোখে জল ছল ছল করিতে লাগিল। সে মুখটা নীচু করিয়া বলিল, "বাইরে যতই মেমসাহেবী দেখাই, আমি ভিতরে এখনও সেই পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। আমার মত মেয়েমানুষের শক্তির উপর আমার নিজেরই বিশ্বাস নেই। যে আমাকে শক্তি যোগাতে পারত সে যদি আমার পাশে থাকত তাহলে আমায় যত বল যুদ্ধ করতে পারতাম। এখন যা হবে তা আমি জানি, মার জেদে হার মানব, তার পর চিরজন্ম কাঁদব।"

সুধার নাম প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে হৈমন্তী সব জানিয়াও প্রশ্ন করিল, "সে কে ভাই?"

মিলি হৈমন্তীর কাঁধের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "তোকেও কি ব'লে দিতে হবে? তুই ত তাকে চিনিস্, তাকে দাদা ব'লে ডাকিস্।"

হৈমন্তী মিলির চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সুরেশদা? আচ্ছা, জ্যাঠাইমাকে একবার ব'লে দেখব? তিনি ত আমার খোঁজখবর নিতেই বলেছিলেন। মেয়ের কান্না দেখে হয়ত রাজি হয়ে যেতেও পারেন।"

মিলি বলিল, "তুই এখনও ছেলেমানুষ, তাই ওকথা ভাবতে পারিস্। চোখের জলে নরম হবার বয়স মার এখন নেই। মা আমাকে সারাক্ষণ ভারতনারীর আদর্শ আর নিষ্কাম প্রেম বিষয়ে লেক্‌চার দিচ্ছেন। মা বলেন, এ বয়সের ভালবাসা ভালবাসাই নয়, ও শুধু চোখের নেশা, মনের মোহ। তোর মত একটা কচি মেয়ের কথায় মা ভুলবেন সে আশা আমার নেই, বরং উল্টো উৎপত্তিই হবে। জানতে পারলে তাকে আর কেউ এ বাড়ী ঢুকতে দেবে না। এ জন্মের মত দেখাশুনো বন্ধ হয়ে যাবে।"

হৈমন্তী বলিল, "কিন্তু তুমি কথাটা চিরকাল লুকিয়েই বা রাখবে কি ক'রে? তুমি যদি তার সঙ্গে চিরদিনের সম্পর্ক পাতাতে চাও, যদি সে বিষয়ে তোমাদের বোঝাপড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যত শীঘ্র সেটা প্রকাশ ক'রে

বলবে ততই ত ভাল। যদি সে আশা ছেড়ে দিতে, তাহলে না-হয় সব কথা চাপা দিয়েও দিতে পারতে।"

মিলি ভীতকণ্ঠে বলিল, "সে কথা সত্যি বটে, কিন্তু এখনই আর্ত্তনাদ সুরু হয়ে যাবে মনে করলে ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে পারি না। শুধু বর্ত্তমানের কয়েকটা মুহূর্ত্তে যা কুড়িয়ে পাই, তার লোভ যে সামলাতে পারি না।"

হৈমন্তী বলিল, "এ বর্ত্তমান তোমার বেশী দিন থাকবে না ভাই। এমন একটা গোলমালের পর চারদিকে কড়া নজর আপনা থেকেই সকলের পড়বে। তুমি তাঁদের কাছে ধরা পড়ার অপমান কেন স্বীকার করবে? নিজে থেকে তোমার যা বলবার আছে ব'লে দাও।"

বাহিরে সুধার মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, "হৈমন্তী, আমি কি আজ বাড়ী যাব না? তুমি আমায় বসিয়ে রেখে ভাঁড়ার-ঘরে কি করছ? একলাই সব খাওয়া সেরে নিলে?"

মিলি চোখের জল মুছিয়া সংযত হইয়া বসিল। হৈমন্তী ডাকিল, "ঘরে এস ভাই। দিদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চায়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।"

সুধা ঘরে ঢুকিয়া মিলির অশ্রুস্নাত আত্মবিস্মৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আজ কতদিন ধরিয়া হৈমন্তীর বাড়ী সুধার আসা-যাওয়া, কিন্তু ইহার ভিতর একদিনও মিলিকে সে এমন যোগিনীমূর্ত্তিতে দেখে নাই। মিলির সিঁথির রেখা, আঁচলের ভাঁজ, মুখের পাউডার, খোঁপার বাঁধন, নখের পালিশ, কোনটাকে কোনও দিন সে স্থানভ্রষ্ট হইতে দেখে নাই। আজ সেই মিলি ভাঁড়ার-ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিপর্য্যস্ত বেশভূষায় যেন বৈষ্ণব কবিতার রাধিকার মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কিসের ধ্যান করিতেছে? সুধার মনে পড়িল, কি একটা প্রাচীন পুঁথিতে সে পড়িয়াছিল,

"বিরতি আঁধারে রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা
সদাই ধেয়ানে চাহি মুখপানে না চলে নয়নতারা।"

পড়িবার সময় কবিতাটা সুধা ঠিক বুঝে নাই; কিন্তু আজ মিলিকে দেখিয়া কাব্যের অর্থ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হৈমন্তী যে ঝড়ের কথা বলিয়াছিল, সেই ঝড় কি মিলির এমন দশা করিয়া দিয়া গিয়াছে? সখ্যের প্রীতির মত এ শুধু মধুর আনন্দের বন্যা নয়, এ যে কি সুধা আজও তাহা ঠিক জানে না। পৃথিবীর বুকের রহস্যের অন্তরালে যে ভয়ঙ্করী লুকাইয়া আছে, এ কি তাহারই প্রলয়লীলার চিহ্ন মিলির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে? মানুষ আনাচে-কানাচে কি যে একটা ভয়ঙ্কর রহস্যের ইসারা সদাসর্ব্বদা করে, যাহার নাম কেহ করে না, অথচ কিশোর-বয়স্কদের যাহার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য পদে পদে সাবধান করিয়া দেয়, এই কি তাহার উন্মত্ত অন্তরের আভাস?

হৈমন্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি চায়ের জল আনতে বলছি, চা খেয়েই তুমি যাবে।"

সুধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "না, না, আমি চা খাব না, আমি এখুনি চ'লে যাই।" এমন জায়গায় বসিয়া সে খাইতে পারিবে না।

মিলি অকস্মাৎ সুধার হাত ধরিয়া বলিল, "সুধা, তোমাকে ভাই আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। তোমার মত কচি মেয়েকে কেউ সন্দেহ করবে না, তুমিই একমাত্র নিরাপদ, তা ছাড়া তুমি ত ভাই সব জান।"

কি একটা গোপন ষড়যন্ত্রের ভিতর সুধাকে টানা হইতেছে মনে করিয়া আশঙ্কায় সে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মিলি এমন কাতর হইয়া তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে যে তাহাকে 'না' বলা বড়ই কঠিন হইবে, কিন্তু সুধার বিবেক যেখানে সায় না দিবে এমন কোনও কাজ যদি মিলি তাহাকে করিতে বলে তবে কেমন করিয়া সুধা তাহা করিবে? সেই ভয়টাই তাহার আগে হইল।

মিলি বলিল, "আমি তোমাকে একটা চিঠি দেব সেটা তোমায় পোষ্ট ক'রে দিতে হবে। তার জবাবও তোমার নামে আসবে; লক্ষীটি, আমার সেটা পৌঁছে দিও।" সুধার হাতের ভিতর মিলি যেন চিঠি গুঁজিয়া দিতেছে এমনই আশঙ্কায় সুধা হাত দুইটা মুঠা করিয়া ফেলিল। এই গোপন দৌত্যের কাজ সে কি করিয়া করিবে? ইহা কি ভাল কাজ, উচিত কাজ? সুধার সন্দেহবিক্ষুব্ধ মনের ভাব মুখের রেখায় ফুটিয়া উঠিল, দেখিয়াই হৈমন্তী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। হৈমন্তী বলিল, "তোমার ভয় নেই সুধা, কোন অন্যায় কাজ তোমার করতে বলা হচ্ছে না।"

সুধা বলিল, "কি জানি ভাই, যা ভাল কাজ তা লুকিয়ে করতে হবে কেন? কিসের জন্ত কাউকে ভয় ক'রে চলতে হবে সেখানে?"

মিলি বলিল, "সব ভাল কাজকে সবাই ভাল ব'লে বুঝতে পারে না। যারা বোঝে না তাদের কাছে লুকানো ছাড়া কি পথ আছে?"

সুধা বলিল, "কিন্তু তুমিই যে ঠিক বুঝেছ তা তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি যাঁদের লুকোচ্ছ তাঁরা ত সব জিনিষই তোমার চেয়ে বেশী বোঝেন।"

মিলি বিস্মিত হইয়া সুধার মুখের দিকে তাকাইল। সুধা এত বোকা? এইটুকু বোঝে না? মিলি বলিল, "আমার সমস্ত মন যাকে ঠিক বলছে, যা নইলে আমার বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য—তা ভুল কি ক'রে বলব? যাঁদের সামনে এ সমস্যা নেই তাঁরা এর মূল্য কি ক'রে বুঝবেন? অতীতেও এ সব তাঁদের কোনওদিন ভাবতে হয় নি।"

সুধা চুপ করিয়া রহিল। সে কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি সুরেশদাকে আমাদের বাড়ীতে কাল ডাকব, তুমি সেখানে গিয়ে তোমার যা বলবার ব'লো। আমাকে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলব যে সুরেশদাকে আমি ডেকেছিলাম। কিন্তু আমার নামে চিঠি ডাকে দিতে ব'লো না, আমি লুকোচুরি করতে পারব না।"

মিলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহা নিষ্ঠুরতা হইল কিনা ভাবিয়া সুধা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আবার তাহার নিজের প্রস্তাবটাও ঠিক হইয়াছে কিনা এও হইল মস্ত একটা ভাবনা। দুইমুখী দুই চিন্তায় তাহার মনটা তোলপাড় করিতে লাগিল।

২০

সুধার নিমন্ত্রণে তাহাদেরই বাড়ীতে সুরেশ ও মিলির দেখা হইয়াছিল। সুরেশের অর্থ না থাকিলেও সাহস ছিল। সে বলিল, "কপালে যাই থাক্, আমার যা বক্তব্য আমাকে তা বলতেই হবে।"

তাহার বক্তব্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। আপাতত এ-বাড়ীতে আসা তাহার বন্ধ রাখিতে হইল। নরেশ্বর পালিত বলিলেন, "তুমি আমার জামাই হবার যোগ্য হয়ে তবে এ-বাড়ীতে আসবে। তার আগে আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ চলবে না। লুকিয়ে কচি মেয়ের মন পাওয়া যত সহজ, তাকে ভরণ-পোষণ করবার যোগ্যতা অর্জন যে তার চেয়ে শক্ত, এটা তোমার আগে জানা উচিত ছিল।"

সুরেশ পরের ছেলে, তাহাকে বিদায় করা সহজ হইলেও ঘরের মেয়েকে বশ করা শক্ত। দেখা গেল, সে তর্জন-গর্জন, অনুনয়-বিনয়, অর্দ্ধাশন-অনশন, কিছুতেই ভুলিবার মেয়ে নয়। মেয়েকে শাসন করিতে গিয়া মায়েরও আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই। মিলিকে খাইতে বলিলে খায় না, বেড়াইতে বলিলে বেড়ায় না, লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও তুলিয়া দিয়াছে। পাছে কোনও শত্রুপক্ষ লুকাইয়া তাহাকে কনে দেখিয়া যায়, এই ভয়ে শত্রু মিত্র সকলকেই সে এড়াইয়া চলে।

রণেন পালিত বলিলেন, "দেখ, তোমরা উভয় পক্ষই যদি এমন যুধং দেহি ব'লে চলতে থাক তাহলে ও ছেলে-মানুষের হাড় বেশী দিন টিঁকবে না। হয় ও একটা শক্ত অসুখ বিসুখ ক'রে মারা যাবে, নয় একটা এমন কিছু কাণ্ড ক'রে বসবে যার থেকে আর উদ্ধারের উপায় থাকবে না।"

নরেশ্বর বলিলেন, "তুমি তবে কি করতে বল? ঐ ভবঘুরের ভিক্ষের ঝুলিটি দেখেই মেয়েটাকে স'পে দেব?"

রণেন্দ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাই কি আর ঠিক বলছি? ওদের স'ঙ্গে একটা রফা ক'রে দেখ না। আজ ভিক্ষের ঝুলি ছাড়া কিছু নেই, কাল লক্ষ্মীর আসন পাতা হতে ত আপত্তি নেই। একটু সময় নিয়ে দেখ। বল যে এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি এত টাকা রোজগার করতে পার তাহলে তোমাদেরই কথা থাকবে।"

মিলির মায়ের মহা আপত্তি। "এমন ক'রে কতকাল আইবুড়ো মেয়ে টাঙিয়ে রেখে দেবে? ওরকম সময়ের কোন ত ধরাবাঁধা নেই। আমি বুঝি, বাঙালীর মেয়ে, বিয়ে হ'লেই স্বামীকে ভালবাসবে, তাই এখনও বলি, জোর ক'রে বিয়েটা সেরে ফেলা হোক।"

নরেশ্বর চটিয়া বলিলেন, "মুখে বলতে ত পয়সা খরচ হয় না! কাজে ক'রে দেখাতে পেরেছ? এই দুই-তিন মাস ধ'রে মেয়ের একটা কড়ে আঙুলও ত নাড়াতে পারছ না।"

রণেন বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ কর। ওকে কিছুদিনের জন্যে বিদেশে পাঠিয়ে দাও। শরীরটা খারাপ আছে, বছর-খানিক রেঙুনে পিসির কাছে থেকে আসুক। ফিরে এসে ওর কি মতামত থাকে দে'খে ব্যবস্থা করা যাবে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্র-গৃহিণীকে এই ব্যবস্থাতে রাজি হইতে হইল। মিলি ও হৈমন্তীর এক পিসি কয়েক বছর হইল রেঙুনে ঘরবাড়ী করিয়া আছেন। তিনি খুব ফ্যাশানেবল সমাজে ঘোরেন ফেরেন, শরীর সারাইবার নাম করিয়া সেখানে পিসির দরবারে যদি কাহারও হাতে কোনও উপায়ে মেয়েটিকে সঁপিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে। অত দূর দেশে সুরেশ বাগ্‌ড়া দিতে যাইতে পারিবে না, মিলিও নূতন আবহাওয়ার ভিতর পড়িয়া তাহার পুরাতন সাজ-সজ্জা জাঁকজমকের নেশায় আবার মাতিয়া উঠিতে পারে। এখানে এক কবিতা-পড়া হৈমন্তী ছাড়া দ্বিতীয় সঙ্গী নাই, কে মিলিকে সংসারের শ্রেষ্ঠ রস চিনাইয়া দেয়? মা হইয়া মেয়েকে কি করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যে সংসারে টাকার চেয়ে বড় কিছু নাই? টাকা না হইলে সুখ সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য, মান মর্য্যাদা, কিছুই রক্ষা করা যায় না, অথচ টাকা যে সবার বড় একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে যাওয়াও লজ্জার কথা। তাহার চেয়ে যেখানে টাকার সুখ, টাকার আনন্দ মানুষ দুই বেলা হাজার কাজে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে, সেইখানে মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পরখ করিয়া দেখা যাউক না, আপনা হইতে উহার মস্তিষ্কে কিছু ঢোকে কি না! এ বিষয়ে হৈমন্তীর মত বোকা ত সে ছিল না বরাবর। হৈমন্তীকে পুতুলের মত সাজাইয়া রাখা হয়, তাই সে সাজে গোজে, কিন্তু মিলির এ সকল বিষয়ে আপনার অন্তরের প্রেরণা ছিল। হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা ভিখারী ছেলের পাল্লায় পড়িয়া তাহার যে এমন মাথা বিগড়াইয়া যাইবে তাহা কে জানিত? যৌবন-ধর্ম্ম বাস্তবিকই বিচিত্র! মিলির মত মেয়ে এই অর্থ-সর্ব্বস্ব দিনে গেল ক্ষেপিয়া, আর মিত্র-গৃহিণীর মত রামকৃষ্ণের ভক্তিমতী শিষ্যাকে কিনা শেষে কন্যাকে বুঝাইতে হইবে টাকার মর্য্যাদা!

মিলি যাত্রার আয়োজন করিল প্রায় সন্ন্যাসিনীর মত। যত ভাল কাপড়চোপড় ছিল সব আলমারী বোঝাই করিয়া রাখিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা মোটা কাপড়ে বাক্স সাজানো হইল। সুধা দেখিয়া বলিল, "তুমি ভাই, এই ক'মাসে এমন বদ্‌লে গেলে কি ক'রে? তোমার রেঙুনের পিসিমার বাড়ী পান থেকে চুণ খসলে ত বল ঢি ঢি প'ড়ে যায়, সেখানে নাকি আয়ারা ছাড়া কেউ সুতোর কাপড় পরে না, তবে তুমি কোন্ সাহসে এমন ক'রে সেখানে যাচ্ছ?"

মিলি বলিল, "আমি ত তপস্যা করতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি? ত্যাগেই তপস্যার সিদ্ধি হয়, ভোগে কি সিদ্ধি মেলে কখনও?"

সুধা অবাক্ হইয়া মিলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিলিদি, তুমি এসব কথা কোথা থেকে শিখলে? এসব তুমি জানতে? বিশ্বাস হয় না ভাল ক'রে।"

মিলি বলিল, "সব মানুষেরই আত্মচৈতন্য জাগবার দিন আসে। এতদিন ঘুমিয়ে অন্ধ হয়ে ছিলাম ব'লে আমি কি চিরদিনই তাই থাকব? দুঃখ আমার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে।"

মিলিকে কিছু বলিল না, কিন্তু সুধার মনে পড়িল, প্রথম যখন সে রবিবাবুর 'মেঘ ও রৌদ্র' পড়ে তখন হৈমন্তী তাহাকে 'এস হে ফিরে এস, নাথ হে ফিরে এস' গানটি গাহিয়া শুনাইয়াছিল। সে বেশীদিনের কথা নয় সুধা বলিয়াছিল, 'আমার নিতি সুখ ফিরে এস হে, আমার চিরদুখ ফিরে 'এস' মানে কি? যে নিতি সুখ, সেই কি চিরদুখ হইতে পারে? হৈমন্তী বলিয়াছিল, "ঐখানেই ত গানের আসল সৌন্দর্য্য!" আজও সুধা ভাবিতেছিল, মিলির জীবনের এই সমস্যার দিনে কোন্‌টা বড়, তাহার দুঃখ না তাহার সুখ? সুখের সন্ধানে কি সে দুঃখের কণ্টকমুকুট মাথায় করিয়া চলিয়াছে, না দুঃখ-বেদনাই তাহাকে সুখের তুচ্ছতা বুঝাইয়া

দিয়াছে? মানুষ পৃথিবীতে আনন্দের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুঃখই বলুক আর ত্যাগই বলুক, এই বেদনা, এই নিপীড়নের ভিতর মিলিদিদি নিশ্চয়ই কিছু একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা তাহাকে অনায়াসে সকল কিছুর উপরে উঠিতে সমর্থ করিতেছে। সুধা বুঝিয়াছে, ইহা মিলির প্রেমের গৌরব।

হৈমন্তী কালো বলিয়া স্কুলের মেয়েরা যখন তাহার সমালোচনা করিয়াছিল, তখন সুধা বিস্মিত হইয়াছিল তাহাদের অন্ধতা দেখিয়া যাহারা হৈমন্তীর আয়ত গভীর চোখের দৃষ্টি ও মৃণালগ্রীবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী দেখিতে পায় নাই। আজ সুধাই ভাবিতেছিল, মানুষের পরিচয়ের প্রথম সূত্র ত চোখের দৃষ্টি, সেই ত প্রথম ভাল-লাগার সিংহদরজা খুলিয়া দেয়। কিন্তু সুরেশদাকে দেখিয়া ভাল লাগিবার কিছু ত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে শুধু কালো নয়, মোটা বেঁটে। চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখরতা তাহার একমাত্র সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে চোখও ত সারাক্ষণ থাকে চশমায় ঢাকা। কথা বলিয়া মানুষের মনকে মুগ্ধ করার দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠতর একটি পথ আছে বটে, কিন্তু সুরেশদার কাজে আলস্য যতই কম হউক, কথা বলায় আলস্য অসাধারণ। মিলির মত যে মেয়ে পৃথিবীর বাহিরের খোলস দেখিয়াই বিশ্বসংসারের মূল্য নির্দ্ধারণ করিত, সে কি করিয়া বাহিরের এত বড় সব বাধাকে অতিক্রম করিয়া একেবারে সুরেশের অন্তরের খবর লইতে অগ্রসর হইল?

নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সুধা নিজেকেই তিরস্কার করিল। যাহাদের অন্তরের পরিচয়কে বিধাতা বহু রূপহীন আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের চিনিয়া লইবার জন্য তিনিই যে মানুষের মনে পরশপাথরের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কি সুধার ভোলা উচিত? বিধাতা ত সুধাকে রূপের পসরা দিয়া পৃথিবীতে পাঠান নাই, বাগ্দেবীই বা তাহার উপর সদয় কোথায়? তবে সে কি মনে করে যে পৃথিবীতে তাহাকে কেহ কোনও দিন চিনিবে না? সুধা জানে, সুধা বিশ্বাস করে, এই রকম অসম্ভব জগতে প্রতিনিয়ত সম্ভব হইতেছে। এমনই করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করাতেই মানুষের ভালবাসার গৌরব, ইহা যত দিন যাইতেছে ততই সুধা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। পৃথিবীতে অমর হইয়া তাহারা থাকে না যাহারা ধন জন রূপ মান মর্য্যাদা দেখিয়া ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহারাই হয় অমর যাহারা ভালবাসার জন্য দারিদ্র্য অপমান, দুঃখ বেদনা, সকলই মাথা পাতিয়া লইয়াছে। একথা কাব্যে সাহিত্যে প্রতিদিনই ত সে পড়িতেছে। তাহার অন্তরও ত ইহাতেই শ্রদ্ধার সহিত সায় দিতেছে।

মিলি কঠিন সঙ্কল্প লইয়া চলিয়া গেল, হৈমন্তী ও সুধার কৈশোর-নাট্যে যেন যবনিকা পড়িয়া নূতন একটা অঙ্কের আরম্ভ হইল। যাহা কাগজে-কালিতে এতদিন পড়িয়াছে তাহা এমন করিয়া বাস্তব হইয়া উঠিতে তাহারা ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। তাহাদের স্কুলের তর্কের পিছনে এখন জীবন্ত উপমা সর্ব্বদা মনের পর্দায় আঁকা থাকে, শুধু মস্তিষ্কের বিচার-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তর্ক করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। মিলি যেন নীরবে চোখ তুলিয়া বলে, আমার দিকে চেয়ে কথা বল। তর্কের যুক্তির খেই হারাইয়া যায়, তাহার নীরব অনুরোধ বড় হইয়া উঠে। [ক্রমশঃ]

বঙ্গে নারী-নির্যাতন ও তাহার প্রতিকার

কাজী আনিসর রহমান, যশোহর

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের বর্ব্বরতার কাহিনী কর্ণগোচর হওয়ার পর যার সর্ব্বদেহের রক্তকণিকা উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে লোকসমাজে হিন্দু বা মুসলমান যে-নামেই পরিচিত হোক না কেন—আমরা মনে করি, তার ধর্ম্মই নেই, কারণ আজ পর্য্যন্ত জগতের কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকই পাপের প্রশ্রয় দেবার নির্দ্দেশ দিয়ে যান নি। মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন সমাজহিতৈষী হয়ত বলতে পারেন যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা না হলেও অনেকটা অতিরঞ্জিত; হিন্দুরা একে সাজিয়ে-গুজিয়ে খুব বড় ক'রে দেখিয়েছেন। এ মন্তব্যটি মেনে নিলেও ঘটনাটি যে-আকারে প্রকাশিত হয়েছে তার যদি এক-চতুর্থাংশও সত্য হয় তবে তা শুধু মুসলমানের নয়, সমগ্র বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক।

প্রতিহিংসার নাম ক'রে যে-দেশে এখনও দলবদ্ধ ভাবে এক জন বর্ষীয়সী মহিলার শ্লীলতা ও সতীত্বের উপর নিকৃষ্ট বর্ব্বরতা চলতে পারে সে-দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার শুদ্ধতা নিয়ে আজ যদি জগৎ-সভায় কোন অপ্রিয় প্রশ্ন উঠেই পড়ে ত তার জন্য যে-কোন আন্তর্জাতিক আন্দোলনই সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষেই একান্ত লজ্জাকর; কারণ খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের আসামীরা আগে বাঙালী, পরে মুসলমান।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ঠিক উক্ত ঘটনার পর থেকেই, কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যেক বাঙালীর মনে প্রাণে এবং সামাজিক ব্যবস্থায় এমন একটি পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত যার ফলে ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা বঙ্গদেশকে অভিশপ্ত করতে না পারে।

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের ঘটনা না-হয় উৎকট প্রতিহিংসার একটি জঘন্যতম নারকীয় রূপ, কিন্তু সে ঘটনা বাদ দিলেও প্রতিদিন নারীঘটিত যে-সব পাশবিক ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে তাই-ই বা কম কি? বহুদিন থেকে দেখে আসছি, দৈনিক খবরের কাগজ উল্‌টোতেই "আইন আদালত" প্রসঙ্গে সব-চেয়ে বেশী ক'রে চোখে পড়ে নারী-নিগ্রহের সংবাদ; পথে ঘাটে ট্রেনে ষ্টীমারে প্রায়ই চোখে পড়ে, হয়ত একটি লোক একখানা দৈনিক কাগজ ধরে বসে আছে. আর একদল লোক, সকলেই বাঙালী—হিন্দু-মুসলমান—আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নারীর উপর অত্যাচারের যে পরম উপাদেয় খবর নিঃশেষে সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে—যেন এক দল ক্ষুধাতুরের মধ্যে এক ঝুড়ি মিষ্টান্ন ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

আদালতে দেখা যায়, খুনী মোকদ্দমায় যত লোক জমা হয় তার চেয়ে বেশী লোক হাজির হয় সামান্য কোন নারী-নির্যাতনের লজ্জাকর মোকদ্দমার রস উপভোগ করার জন্য। এ থেকে এটুকু বেশ সহজেই বোঝা যায় যে, নারী-নির্যাতন ব্যাপারে বাঙালী সম্পূর্ণ উদাসীন নয়। নারী-নির্যাতনের কৌতুকবোধে তারা বিশেষ মনোযোগী, কেবল তার প্রতিকার ও নিরোধের বেলাতেই তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

আজকাল কয়েক জন সহৃদয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় কয়েকটি আশ্রমের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নির্যাতিতা মেয়েরা আশ্রয় পান এবং যেখান থেকে ঐ সমস্ত মোকদ্দমার তদ্‌বিরাদি করা হয়। ঊষর মরুভূমির উত্তপ্ত কঠোরতা ও অত্যুগ্র জ্বালার মাঝে ঐ দুটি-একটি জলাশয়ের সৃষ্টিতে বাস্তবিকই গৌরব বোধ করা যায়। কিন্তু নিরাশ্রিতাদের সংখ্যার তুলনায় সেগুলি অকিঞ্চিৎকর এবং ঐ সব আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও উদ্যম বর্ত্তমান, বোধ হয় ঠিক সেই পরিমাণে অর্থের অনটন। বাংলা দেশে আজও এমন দু-এক জন ধনবান ব্যক্তি আছেন যাঁদের মনের প্রসার তাঁদের ধনের পরিমাণে যদি বেড়ে

যায় তাহ'লে ঐ-সব শুভপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ উন্নতি হ'তে পারে এবং নির্যাতিতা সকল মহিলাদেরই হয়ত পরে সদুপায়ে নির্দোষ কায়িক পরিশ্রমে জীবন ধারণের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

তবু নারী-নির্যাতন ঠিক একই ভাবেই চলতে থাকবে যদি সঙ্গে সঙ্গে তা নিরোধের অন্য প্রকার ব্যবস্থাও না করা যায়। হয়ত ঐ সব আশ্রমের তরফ থেকে তদ্বির আরও ভাল হবে, অপরাধীর দণ্ড আরও বেশী হবে, কিন্তু তাতে অপরাধের সংখ্যা কম হবে কি? যদি তাই হ'ত তাহ'লে খুনের বদলে ফাঁসির দৃষ্টান্ত এ-দেশ থেকে হত্যাবৃত্তির বিলোপ সাধন করত। মানুষ যত দিন স্বীয় বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে কোন কাজকে অন্যায় ও নিন্দনীয় মনে না করবে তত দিন অনুকূল অবস্থা পেলেই সে অপরাধ করেই যেতে থাকবে। সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা শাস্তির দৃষ্টান্ত থেকেই কোন দিনই সৎ লোকে পরিণত হবে না। একই ব্যক্তি বার-বার একই অপরাধে দণ্ডিত হচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

নির্যাতিতা ও নির্যাতকের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে নারী-নির্যাতনের বাস্তবিকই প্রতিকার হ'তে পারে।

সম্প্রতি মেয়েদের ভিতরেও প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের ব্যাপারের পর তাঁরাও দলবদ্ধ ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং এর প্রতিকারের জন্য সমিতি প্রভৃতির সৃষ্টি করছেন। এ সমস্তই শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা যে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন এবং অন্যান্য মেয়েদের শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য করতে পারেন ততই এ-দেশের পক্ষে মঙ্গল, কিন্তু তাঁদের প্রচারকার্য্য যেন তাঁদের নিজেদের ভিতরই সীমাবদ্ধ না হয়। শহরের গুটিকয়েক শিক্ষিতা মহিলার ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শিক্ষায় বাংলার লক্ষ লক্ষ অবগুণ্ঠনবতী পল্লীবধূর উপকার হবে না।

অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে উক্ত নারী-নির্যাতনের প্রকৃত প্রতিকারের জন্য আমাদিগকে হিন্দু-মুসলমান ও স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সমবেতভাবে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা শুধু কথায় পর্য্যবসিত না হয়ে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হয়। সর্ব্বসাধারণের বিবেচনার জন্য কতকগুলি বিধিব্যবস্থার উল্লেখ করছি যেগুলি নারী-নির্যাতনে সবিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে হয়:—

(১) যে-সকল শিক্ষিতা মহিলা লাঠি, ছোরা ও যুযুৎসু খেলায় নিপুণা তাঁদের সমবেত চেষ্টায় পল্লী-অঞ্চলে বিস্তৃত ও ব্যাপক ভাবে সমিতি স্থাপন, এবং সেই সকল সমিতির উদ্যোগে গ্রামস্থ মহিলাগণকে সাহসী ও শক্তিশালী ক'রে গ'ড়ে তোলা,—বিপদ উপস্থিত হ'লে যাতে বিপদগ্রস্ত পল্লী-বধূ ও পল্লীবালারা ভয়ে অস্থির না হয়ে সাহস বিক্রম ও উপস্থিত-বুদ্ধি প্রয়োগে আপন আপন নিষ্কৃতির পথ আবিষ্কার করতে পারেন। সমিতির মেয়েরা হিন্দু-মুসলমান জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রতি গৃহে উপযাচিকা হয়ে উপস্থিত হবেন এবং তথাকার মহিলাগণকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলবেন। এই কার্য্যে হয়ত তাঁরা প্রতি গ্রাম থেকেই অল্পবিস্তর বাধা পাবেন, কিন্তু সেই বাধা জয় করাই হবে তাঁদের কৃতিত্ব।

সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে নারী-নির্যাতনের প্রতিকার সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা প্রয়োজন, যাতে বিষয়টির খুব গুরুত্ব সকলে বুঝতে পারেন এবং তার প্রতিকারের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অবিরত চেষ্টা চলতে থাকে। ফলে আজ যাঁরা সংবাদপত্রে নারী-নির্যাতন প্রসঙ্গের উপর দলবদ্ধভাবে কৌতুকোৎসাহে ঝুঁকে পড়ছেন হয়ত কাল তাঁরাই ঐ একই সংবাদে ঘৃণায় ক্রোধে ও লজ্জায় অস্থির বোধ করবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের নিভৃত পল্লীপ্রান্তেও নারী-নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য প্রত্যেকেই সচেষ্ট হবেন। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়েই এই ব্যাপারে দেশের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগ লাভ করা সম্ভব হবে। বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখক লেখিকাদের একান্ত মনোযোগ এই সমস্যার দিকে যেন আকৃষ্ট হয়।

(২) কোন নারী-নির্যাতনের ঘটনাকে যেন সাম্প্রদায়িক ক'রে না-তোলা হয়। অপরাধী হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, সর্ব্বক্ষেত্রেই নিন্দা ও শাস্তির পাত্র। যেহেতু

আসামী এক জন মুসলমান এবং নির্যাতিতা নারী হিন্দু কাজেই মুসলমানমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে আসামীকে সাহায্য করতে হবে, সে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলেও তাকে রক্ষা করতেই হবে, কোন মুসলমানই যেন এরূপ চিন্তা মনে পোষণ না করেন। ধর্ম্ম নিয়ে, চাকুরী নিয়ে, সরকারের দান নিয়ে, সদস্য-সংখ্যা নিয়ে, যে-সব সাম্প্রদায়িকতা এতদিন চ'লে আসছে তাতেই এ-দেশের উত্তাপ তাপমান-যন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রিতে ইতিমধ্যেই উঠে গেছে, এর পর চোর ডাকাত বদমায়েসদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক লীলা আরম্ভ করলে দেশের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে যে বোধ হয় সারারাত লাঠি হাতে ক'রে ঘরের সম্মুখে পাহারা দিয়েই জীবন কাটাতে হবে। নির্যাতিতা স্ত্রীলোক হিন্দু হ'লে এবং অত্যাচারীরা মুসলমান হ'লে এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রে, হিন্দু ও মুসলান উভয় সমাজ থেকে অপরাধীকে কোন প্রকার অনুকম্পা সহানুভূতি বা সাহায্য করতে কেহই যেন অগ্রসর না হন। গ্রামের নেতা ও মাতব্বরগণ থেকে আরম্ভ ক'রে পুলিস ও উকিল-মোক্তার পর্য্যন্ত কেহই যেন নারী-নির্যাতনকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার মনে না ক'রে যথার্থ অপরাধীর শাস্তিপ্রদানে তৎপর হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মৌলবী-মওলানা থেকে আরম্ভ ক'রে বঙ্গদেশের প্রত্যেক মসজিদের এমামগণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেশের ভিতর দিয়ে অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে উক্ত অপরাধের গুরুত্ব কি ও পরিণতি কত দূর তা যেন সুন্দররূপে বুঝিয়ে দেন। অপরাধীদের মধ্যে সংখ্যা হিসাবে মুসলমানই বেশী, সুতরাং তাহাদেরই শাস্তি বেশী হইবে বলিয়া কোন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানই যেন দুঃখিত না হন। দুষ্ট স্ফোটকের অস্ত্রোপচারের সময় সামাজিক অঙ্গ থেকে যে রুধিরপাত হবে এ ত স্বাভাবিক, কিন্তু তাই ব'লে ত আর বিষাক্ত স্ফোটককে পোষণ করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার বশবর্ত্তী হয়ে না-হয় ইংরেজের আদালত থেকেই আসামীকে ছাড়িয়ে আনলাম, কিন্তু এইরূপ অপরাধীর জন্য কোরান-শরিফে যে-সব ব্যবস্থার কথা লেখা আছে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? কুলবধূদের ইজ্জৎ যখন বিপদাপন্ন তখন আইন একটু কঠিন হ'লে ক্ষতি কি?

(৩) ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতি এবং রক্ষীর দলের মত প্রতি গ্রামে উৎসাহী ভদ্র যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক এক-একটি সমিতি গঠিত হোক—যাদের কাজ হবে প্রতি রাত্রে পালাক্রমে দলবদ্ধভাবে গ্রামস্থ চৌকিদার ও দফাদার সমভিব্যাহারে গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাহারা দেওয়া, সন্দিগ্ধ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং অবস্থা-বিশেষে উপরিস্থ পুলিস কর্ম্মচারী বা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাময়িক রিপোর্ট দিয়ে তাঁদের সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখা। উক্ত সমিতি যেখানে যেখানে রক্ষীর দল আছে তাদের এবং প্রয়োজন-মত নবগঠিত মহিলা-সমিতির সাহায্য লাভ করতে পারবে। গবর্ন্মেণ্টের কাছ থেকে উক্ত কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য লাভের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের ইউনিয়ন বোর্ডগুলিও যাতে সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বৃত্ত-দমনে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে তারও ব্যবস্থা করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা দরকার।

(৪) পর্দ্দা বিষয়ে যথাসম্ভব সাবধান হওয়া। উপযুক্ত পর্দ্দা প্রচলিত রাখলে নারী-শিক্ষা ও নারী-জাগরণ অসম্ভব হবে একথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখতে পাব যে উপযুক্ত পর্দ্দার ভিতর আব্রু রক্ষা করেও সেকালে স্ত্রীলোকেরা সাহিত্য ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন এবং অনেকে রাজ্যশাসনেও অভ্যস্ত ছিলেন। সেরূপ ব্যাপক ভাবে পর্দ্দার ব্যবস্থা না হয় নাই হ'ল তবু স্থান-বিশেষে এবং প্রয়োজন-মত পর্দ্দারক্ষার ব্যবস্থা না করলে এ-দেশে নিরাপদ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা বোধ করি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শহরের শিক্ষিতা মহিলাগণের কথা পৃথক। কারণ সেখানে ঐ সমস্ত অপরাধের সুযোগ ও সুবিধা অল্প এবং সে-সমস্ত মহিলা এত দূর অগ্রসর যে, দরকার হ'লে আত্মরক্ষার যে-কোন ব্যবস্থা তাঁরা যেরূপেই হোক করতে পারেন। সেইরূপ কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের কথাও পৃথক। যাঁরা গ্রামে বাস করেন তাঁদের ভিতর পর্দ্দা সম্বন্ধে আর একটু হুঁশিয়ার হ'লে বোধ হয় অনেকটা ভাল হয়। লজ্জাশীলা গ্রাম্য নারী আত্মরক্ষার কোন উপায়েই অভ্যস্তা নন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এত দূর অগ্রসর নন যে সহসা আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন।

আর সবচেয়ে বিপদে পড়েন এই সব নিরীহ গ্রাম্য মহিলারাই। নির্যাতিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, হয় তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান (যাঁদের পর্দ্দা নেই) নয়ত গ্রাম্য হিন্দু পরিবারের অন্তর্ভুক্তা। ঐ সব পল্লীবালা ও পল্লীবধূগণ গ্রামস্থ পুকুর-দীঘি এবং নদীর ঘাটে স্নান করেন এবং স্নানান্তে সিক্তবসনাবৃতা, লজ্জায় সঙ্কুচিতা হয়ে যখন পল্লীপথে গৃহাভিমুখিনী হন তখনই ঐ-সব নরপশুর ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিও লালসায় উন্মত্ত হয়ে নির্দ্দিষ্ট কুলললনা বা কুলবধূর অনুগামী হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগ বুঝে কোন এক অশুভক্ষণে তাদের কারুর-না-কারুর সর্ব্বনাশ সাধন করে। সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চশ্রেণীর মুসলমান পরিবারে সচরাচর এ ঘটনা দেখা যায় না, কারণ পর্দ্দার সেখানে খুবই কড়াকড়ি এবং যে-সমস্ত হিন্দু এঁদেরই মত পর্দ্দা মেনে চলেন তাঁরাও কতকটা নিশ্চিন্ত, আর যে-সমস্ত মহিলা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন বা শহরে বাস ক'রে চালচলনে অভ্যস্তা হয়েছেন, যাঁরা এক ঘা খাবার আগেই দু-ঘা দেওয়ার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন তাঁদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁরা ততটা পারেন নি সেই সমস্ত গ্রাম্য কুলললনা ও কুলবধূদের ভিতর পর্দ্দার খুব কড়াকড়ি না করলেও অন্ততঃ স্থান-বিশেষে এবং লোক ও শ্রেণী বিশেষের সম্মুখে অন্তরালবর্ত্তিনী হয়ে চলাটাই বোধ হয় বিশেষ সুফলপ্রদ হবে। পর্দ্দা-উচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কোন কথা বলছি না। যে-সমস্ত মহিলা আত্মনির্ভরশীলা হয়ে পথে-ঘাটে চলার মত সাহস, ক্ষমতা, শিক্ষা ও শক্তি অর্জ্জন করতে পেরেছেন তাঁরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন এবং যে ভাবে ইচ্ছা চলতে পারেন। কিন্তু যাঁরা তা পারেন নি, তাঁরা কেন এ-সব বিপদের ভিতর অযথা ঝাঁপ দেবেন?

দেশের সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য আশা-ভরসার উৎস যে মায়েরা তাঁদেরই সম্ভ্রম ও নারীত্ব যেরূপ অমানুষিক বর্ব্বরতা-দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে চলেছে, তাতে হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে বঙ্গের সমস্ত সুসন্তানকে সমবেতভাবে এমন ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে হবে যাতে এই পাপ ও পঙ্কিলতার ধারাবর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারা যায়।

চিলে-কোঠার ছাদ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হেমন্তের অপরাহ্ণে সুজিত রায়ের মিনার্ভা-গাড়ীখানি অরুণ গুহের নবনির্ম্মিত বাড়ীর দুয়ারে অল্প একটু শব্দ করিয়া থামিল। অরুণ গুহ হালের বড়লোক। সরকারী চাকুরী হইতে সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন এবং অবসরপ্রাপ্তির সুযোগে কিছু মোটা টাকা হাতে আসাতে কাঞ্চন-কৌলীন্য বজায় রাখিতে লেক-বরাবর একখানি ত্রিতল বাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছেন।

কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌-গেটের দু-ধারে পিতলের হরফে নিজ নামের পরিচয় খুদিয়া রাখিয়া আপনাকে অমর করিবার বাসনা অন্যান্য বড় লোকদেরই মত তাঁরও প্রবল। গেটের মধ্য দিয়া নাতিবৃহৎ বৈঠকখানায় ঢুকিলেই বুঝা যায় অতিআধুনিকতার সঙ্গে তাঁর রুচির কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বৈঠকখানায় ঢুকিবার আগে সুজিত রায়ের মিনার্ভা-কার হঠাৎ কেন এখানে আসিল সেই কথা বলা যাক।

নূতন বাড়ীতে আসিবার মুখে যে-উৎসব নবাগত অধিবাসীদের বার্ত্তা পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করিয়া দেয়, হিসাবী গুহ-পরিবার সেই উৎসবকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া এখানে ঢুকিয়াছিলেন। মাত্র মাস-দেড়েকের কথা, পূজার সময় তাঁরা আসিয়াছেন এবং অগ্রহায়ণে এক ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে গৃহপ্রবেশের ত্রুটিটুকু সুদে আসলে পোষাইয়া লইতেছেন।

আজ বৌ-ভাত। আলোকমালায় উজ্জ্বলিত নাট্যমঞ্চের মত সাদা বাড়ীখানি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। প্রত্যেক

বাতায়নে সুদৃশ্য রেশমী পর্দার আড়ালে বিদ্যুৎ-লেখার মত রূপের রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। কত রকমের শাড়ী ও গহনা এবং সৌন্দর্য্যপ্রকাশের কত না অভিনব ভঙ্গী! বাড়ীখানির নিকটবর্ত্তী হইলে ঘন পুষ্পসার-সৌরভে সুরভিত উদ্যানে আসিয়াছি বলিয়া ভ্রম হয় (অবশ্য চক্ষু মুদিলে) এবং পরক্ষণেই কোলাহলে সে মোহ ভাঙিয়া হাটের মাঝে দাঁড়াইয়া আছি এ ধারণাও দৃঢ়তর হয়। যে ধারণাই হউক, নূতন বাড়ী এবং প্রথম উৎসব, প্রচারের গৌরব যাহাতে কোনক্রমে মলিন না হয় সে-দিকে গৃহস্বামীর দৃষ্টি প্রখর।

মোটর থামিতেই গৃহকর্ত্রী অগ্রসর হইয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সুজিত রায়ের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। রায় বাহাদুর সুজিত রায়—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার; বংশমর্য্যাদায় ও ধনশালিতায় সে প্রতাপের কিয়দংশ বালিগঞ্জ-সমাজে প্রচারিত। ঐ বাড়ীর এক ছেলে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছে, এক ছেলে কোথাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, চিত্র-প্রতিভায় এক ছেলের খ্যাতি বর্ষাসন্ধ্যার হাসনুহানার গন্ধের মত বাংলায় বহুদূরব্যাপী, কনিষ্ঠ পুত্রটি লাট-দপ্তরের বড় চাকুরিয়া। অর্থ এবং সম্মানের সৌভাগ্য দুই-ই প্রচুর। ইঁহাদের পরিবার যে অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

অরুণ গুহের বাড়ীখানি বড় হইলেও গঠন-নৈপুণ্যে অতি-আধুনিকতার কিছু ত্রুটি ইহাতে আছে। বাড়ীর সামনে এতটুকু লন নাই যেখানে বৈকালিক ব্যাডমিন্টনের আসর অনায়াসে জমিয়া উঠিবে। ফটকের সামনে নাতিপ্রশস্ত সিঁড়িতে তাই পাম-অর্কিড বসাইয়া উদ্যানবিলাসকে পরিতৃপ্ত করিতে হইয়াছে। সেই কৃত্রিম উদ্যানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গুহ-গৃহিণী রায়-পরিবারকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সামনের ঘরটি বৈঠকখানা। ঠিক চতুষ্কোণ নহে, খুব প্রশস্তও নহে এবং নাতিবৃহৎ বলিয়াই বেশীরকম আসবাব-পত্র দিয়া ঢাকিয়া দোকানের শো-কেসের আকৃতি ধারণ করে নাই। দুয়ার-জানালায় আটটি।···মধ্যস্থলের দুয়ারের মাথায় গোলাকৃতি পিতলের ঘড়ি—ঘণ্টা ও আধ ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মিনিটব্যাপী সুমধুর জলতরঙ্গের শব্দ শ্রবণ পরিতৃপ্ত করে। বাকী সাতটি দুয়ার-জানালার মাথায় দেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি—যে-ছবিগুলির অধিকাংশই চিত্র-প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে।

ঘড়ির নীচের কারুকার্য্যখচিত এক ব্রাকেটে পিতলের ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। সাদা রজনীগন্ধার মালা তথাগতের কণ্ঠ-দেশে বিলম্বিত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। প্রত্যেক ছবির ফ্রেম বেড়িয়া আধফুটন্ত কুন্দমালা। ঘরের মেঝের ছোট টেবিলটার উপরে ও মীনাখচিত ফুলদানে গোলাপ-গুচ্ছ ও রজনীগন্ধার ঝাড়। দামী টেবিল-ক্লথের নক্সা এই বাড়ীরই কোন কুমারী কন্যার শিল্পসাধনার পরিচয় বহন করিতেছে; বিকশিত পদ্মের প্রত্যেকটি পাপড়িতে সূক্ষ্ম সূচীশিল্পে তার নামের আদ্যাক্ষর বিদ্যমান।

মেঝেয় পাতা পুরু গালিচায় পা দিলে অতি কোমল আরামস্পর্শে মন যেন তন্দ্রালু হইয়া উঠে। নিতান্ত পায়ের তলায় পড়িয়া আছে বলিয়াই তার বুননশিল্পের এতটুকু প্রতিভা কাহারও মনের মাঝে কোন পরিচয়ই বহন করে না উপরে মখমলের নীল চন্দ্রাতপ,—অত্যন্ত ছোট ও ক্ষীণ-। জ্যোতি বিজলী বাতির ঘন সন্নিবেশে নক্ষত্রখচিত আকাশের মতই মনোরম। লতায়, ফুলে, গন্ধে ও সজ্জাপারিপাট্যে মনোহরণের চেষ্টা সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। ঘরের কোণে টিপয়ের উপর রক্ষিত পিতলের 'ভাস্' ও সারসপাখীর কথা বলিতে ভুল হইয়াছে এবং চকচকে মেহগনি পালিশের দেওয়াল-আলমারিতে সোনার জলে নাম লেখা যে-সব বই ঝকঝক করিতেছে—কাব্য, ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস—সেগুলির কথাও বলা হয় নাই। ছোট আলমারি, সংগ্রহ কম, কিন্তু সারবান। বিশ্বসাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনার নমুনা ঐটুকু আলমারিতেই পাওয়া যায়। বুঝা গেল, ধনের সঙ্গে রুচির সামঞ্জস্য সাধনে গৃহস্বামী অকৃপণ।

মেয়েরা কিন্তু বৈঠকখানায় বসিলেন না।

দুয়ারে টাঙানো সুদৃশ্য ও সুবাসিত মখমলের পর্দা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন।

কাজের বাড়ী, তথাপি বিশৃঙ্খলতার চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। লাল সিমেন্টের উঠান—বেলে পাথরের মত মসৃণ ও চকচকে; ঘরের মেঝেগুলি সুদৃশ্য কার্পেটে ঢাকা না থাকিলে 'মোজেক' শিল্পের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইত।

প্রত্যেক ঘরে ঢুকিবার সময় নীচের চৌকাঠে বাধিয়া স্থাণ্ডাল-পরিহিত পদযুগল যাহাতে স্বল্পমাত্র বাধা প্রাপ্ত না হয়, সেই জন্য চৌকাঠের বালাই নাই। পালিশ-করা সেগুন কাঠের নক্সা-কাটা দুয়ার, মাঝখানটার চড়া পালিশ আয়নার কাজ করিতেছে, চীনা-মিস্ত্রীর হাতে কাঠের ফুল ফোটে ভাল—তাই চার গুণ মজুরি দিয়া দুয়ারের উপর ফুল ফুটানো হইয়াছে। বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান থাকিলে প্যাগোডা নির্ম্মাণের জন্য জাপান হইতে কারিগর আসিত এবং তক্ষণ-শিল্পের উৎকর্ষ দেখাইতে গ্রীক ভাস্কর যে না-আসিত এমন নহে, সেজন্য অল্প একটু আক্ষেপ করিয়া গুহ-গৃহিণী ঝিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পরাণের মা, মাছ তুমি একাই কুটলে ?"

পরাণের মা দোক্তা-রঞ্জিত কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল, "শোন গো কথা! ওই রাক্ষুসে মাছ একা কুটনু কি গো? রাজভজন ফুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলানোর মত চেলিয়ে দিলে—তবে ত পুঁটিতে আমাতে ধরাধরি ক'রে কুটনু!"

গৃহিণী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "ক-টা এসেছিল ?"

হাতের বুড়া আঙুলটি মাত্র মুড়িয়া ঝি ইঙ্গিতে জানাইল। পানের রসে মজা দোক্তার পিক্‌টুকু তখন সে পরম আরামে গিলিতেছিল। গৃহিণী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মোটে চারটে! এদিকে যে হাজার লোকের আয়োজন করা হয়েছে!"

ঝি এবার মুখে জবাব দিল, "চারটে ত চার মণেরও বেশী। ও তোমাদের বাঁশ-দীঘিথে এসেছেল। আর বাজারে-কেনা আছে চার মণ, গল্‌দা চিংড়ি আছে—"

"হ'লেই ভাল।" বলিয়া অতিথিদের লইয়া গুহ-গৃহিণী সামনের ঘরখানিতে ঢুকিলেন।

প্রকাণ্ড পালঙ্ক—প্রায় ঘরখানি জুড়িয়া আছে। এত বড় ও ভারি পালং একালে কেহ কদাচিৎ ব্যবহার করে। ভারি পায়ায় সেকালের দেশী ছুতার-মিস্ত্রির কাজ, নামী মিস্ত্রী তিনটি পায়ার নক্সা কাটিয়া চতুর্থটি সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই এবং তাহার অসম্পূর্ণ কাজ বহু চেষ্টায় যদি বা চীনা মিস্ত্রী দ্বারা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে—তথাপি নাকি তেমনটি হয় নাই।

নীল ফানুসের স্নিগ্ধ আলো পড়িয়া ঘরের মধ্যে পোষাকের আলমারিটা বেশ মানাইয়াছে।

মুক্তা-বসানো বেনারসী ব্লাউস ও জ্যাকেট, পাড়ের উপর মীনার কাজ করা শান্তিপুরী শাড়ীগুলি অত্যন্ত লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

কক্ষান্তরে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ হইতেছে ফটো-এলবাম। এই পরিবারস্থ জীবিত এবং মৃত, বৃদ্ধ এবং তরুণের, একক অথবা গোষ্ঠীসমেত বিচিত্র রকমের ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন রকমের ফটোগুলি বংশের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেকটি ফটোর পাশে জন্ম, মৃত্যু ও জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বা কীর্ত্তিগুলির সন-তারিখ লেখা—ভবিষ্যতে কোন তথ্যানুসন্ধানী এই বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যাহাতে ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইয়া না পড়েন সেই জন্যই বা হয়ত এই সতর্কতা! উৎসব উপলক্ষ্যে আজ প্রত্যেকটি ফটো মাল্যবিভূষিত, ফটোর ফ্রেমে শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা!

এ-ঘরের মধ্য দিয়া যে লম্বা ফালি-ঘরখানিতে যাওয়া যায়—সেটা এ-বাড়ীর ভাঁড়ার। সুন্দর পালঙ্ক নাই; ফুলের মালা, ফটো বা নয়নরঞ্জক কোন কিছু না থাকিলেও দু-দণ্ড চাহিয়া দেখিবার বস্তু আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিতলের গামলা, ডেকচি, পিতলের বালতি, জাগ্‌, নানান রকমের কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘড়া, হাতা, বেড়ি প্রভৃতিতে ঘরখানি আকণ্ঠ বোঝাই। জিনিষগুলি যে কর্ম্মোপলক্ষ্যে অন্য বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা হয় নাই তাহার প্রমাণ-স্বরূপ গুহ-গৃহিণী পিতলের সবচেয়ে বড় গামলাখানা হাত দিয়া উল্টাইয়া অতিথির পানে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, "কর্ত্তার খেয়াল—পুরো নাম না লেখালে জিনিষ চুরি যেতে পারে। প্রত্যেকটিতে এমনি ধারা পুরো নাম লেখা।" একটু থামিয়া বলিলেন, "চুরিই যদি যায় নামে কি কোন কিনারা হয়!"—বলিয়া পরম কৌতুকভরে হাসিলেন।

একতলার রান্নাঘরটা তেতলায় প্রমোশন পাইবে—কোক কয়লার পাট তুলিয়া দিয়া বিদ্যুত্তাপে রান্না করিলে অনর্থক ধোঁয়া হয় না, দামী আসবাবপত্র বা ঘরের পেন্টিংও নষ্ট হয় না—কর্ত্তা নিমরাজী হইয়াছেন, সুতরাং এখন ও-ঘরটায় ঢুকিয়া কাজ নাই।

উহার পাশে ঝি চাকরদের ঘর—হাজার বলা-কহা করিলেও নোংরামি উহাদের মজ্জাগত স্বভাব—মিছামিছি ও-ঘরে গিয়া মাথা ধরাইয়া কি হইবে?

দোতলায় পিতলমণ্ডিত সিঁড়ি আর সিঁড়ির পাশে ছোট ছোট আয়না ও লতাফুলে আঁকা নকশা—কর্তার সখ।

বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময় সখের দিকে চাহিয়া খরচের কথাটা একদম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কর্তা যদি সখ করিলেন লতায়, গৃহিণীর সখ গেল স্নানঘরের পারিপাট্যসাধনে। ঠাণ্ডা ও গরম জলের বাথ-টব, হাঁসের ডিমের মত চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো বড় আয়না, টয়লেটের জন্য সুদৃশ্য দেওয়াল-আলমারি, উচ্চশক্তিবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক আলো, মেঝে ও দেওয়ালে দুগ্ধধবল মর্ম্মর প্রস্তর—এ-সব তাঁরই ফরমাস-মত হইয়াছে। স্নানঘর ঠাকুরঘরের চেয়েও এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ। দেহমন্দির সুসংস্কৃত করিতে যেখানে সকাল-বিকালের অনেকগুলি মুহূর্ত্ত প্রত্যহ ব্যয়িত হইয়া যায়, প্রসাধনে দেহের সজীবতা ও মনের প্রফুল্লতা যেখানে প্রজ্জলিত দীপ-শলাকার স্পর্শে পূর্ণ-তৈল প্রদীপের মতই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। শুচিতায়, সৌগন্ধে, তারুণ্যে ও নবীভূত আশায় যেখানে প্রাণের দলগুলি নিত্য বিকশিত হয়—তেমন স্থান এই স্নানাগার। জীবনে স্মরণীয় রাত্রির রেখা এই ঘরের প্রত্যেক পাথরের স্বচ্ছতায় দীপ্যমান এবং দিনের পুঞ্জীভূত আলস্যে সেগুলি মন্থর।

কিন্তু স্নানঘরের এই বিস্তৃত বর্ণনার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কেবল মাত্র গৃহিণীর সখের জিনিষ এবং গৃহিণীই বক্তা বলিয়া নিরুপায় লেখক এবং ততোধিক নিরুপায় পাঠকের ধৈর্য্যকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সব পথই বন্ধ।

সেই নিরুপায়তার পথ ধরিয়া আমরা দোতলায় পৌঁছিলাম। এখানেও 'মোজেকে'র মেঝে পুরু গালিচায় ঢাকা, ছবির ফ্রেমে ফুলের মালা ও বোম্বাই খাটে নেটের মশারি। এখানে আলনা, আলমারি, প্রসাধন-টেবিল, শ্বেত পাথরের টিপয়, বুককেস, প্রত্যেক ঘরে বিভিন্ন রকমের ঘড়ি, বিভিন্ন রকমের পুষ্পসারসৌরভ; বিদ্যুৎ-বাতিতেও বৈচিত্র্য যথেষ্ট। রূপার মীনা-করা ট্রেতে গোলাপী পান আনিয়া দাসী হাজির করিল; ট্রের এক পাশে সোনার কৌটায় লক্ষ্ণৌ-জরদা ও কাশ্মীর সুর্ত্তি। এই বাড়ীরই এক মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া রূপার পিচ্‌কারীতে গোলাপজল ছিটাইয়া অতিথিদের স্নান করাইয়া দিল।

সকলে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই রাস্তার এক ভিখারী মেয়ে হাত উঁচু করিয়া ভিক্ষা চাহিল। মেয়েটার বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য। কালো রং, ময়লা কাপড় ও ঝাঁকড়া চুলে তাকে বেশ কুৎসিত দেখাইতেছে।

গৃহিণীর ছোট মেয়ে হাত তুলিয়া বলিল, "ভাগ্‌"। গৃহিণী তাহাকে মিষ্ট স্বরে ধমক দিলেন এবং আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া একটি টাকা ভিখারী মেয়ের প্রসারিত হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েকে বলিলেন, "ছি মা! কাউকে কটু কথা বলতে নেই। ওরা হচ্ছে দরিদ্রনারায়ণ।"

ভিখারী মেয়েটির উচ্ছ্বসিত কল্যাণকামনায় কান না দিয়া গৃহিণী সকলকে লইয়া চলিলেন ত্রিতলে।

ত্রিতলে—যে-ঘরে ফুলশয্যা হইবে সেই ঘরে আসিয়া—একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া অন্য সকলকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ঘরে আসবাব বেশী নাই—দেওয়াল হইতে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত ফুলে ঢাকা। ঘরের কোণে অর্গ্যান আর জানালার ধারে পালঙ্ক, কোথাও ফুলের অপ্রাচুর্য্য নাই। ঘন কুসুমসৌরভে বাতাসটুকু পর্য্যন্ত সেখানে নিশ্বাসের অনুকূল নহে এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে যে-টুকু পরিচয় জমিয়া উঠিল তাহাও ঘনতায় কুসুমগন্ধের মতই শ্বাসরোধক। আয়নায় হাই দিলে যেমন অস্বচ্ছতা জমিয়া উঠে কিংবা শীতের দিনে মেঘলা আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য্যকে যেমন দেখায়, তেমনই এই পরিচয়ের প্রণয় এ-পিঠের পাশে ও-পিঠের প্রতিবিম্বকে ভাসাইয়া তুলে না। গৃহিণী শ্রোত্রীদের গল্প বলিতেছিলেন, "ওঁর ইচ্ছে বিলেত যান··· বাড়ীর কর্ত্তাদের অমত। তাঁদের প্রেজুডিস না থাকলেও কেমন একটা ভয় ছিল—লণ্ডনের হাওয়ায় এ দেশের ছেলেগুলির স্বভাব যায় বদলে। আমায় বললেন, 'কি করি?' ছোট মেয়ে আমি—কি-ই বা বুঝি! তবু বুক বেঁধে বললুম, 'যাও।' মনে ভয় আর ভাবনা অবিশ্যি খুবই হয়েছিল, কিন্তু ওঁর যাবার আগ্রহ দেখে 'না' ব'লতে পারলুম না।······বিলেত থেকে ফিরে এলেন—এতটুকুও বদলে যান নি। ধুতি প'রে বাবা-মাকে

প্রণাম করতেই তাঁরা খুশী হয়ে বললেন, 'বৌমারই জয়।' যাহোক ভাই আমি ত খোঁটা খাবার দায় থেকে বেঁচে গেলুম!"

মুখে চোখে তাঁর আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। কয়েকটি পান গালে পুরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "চাকরি নিয়েও বিভ্রাট। মোটা মাইনের একটা অফারে যাচ্ছিলেন—সিমলেয়। বললুম, 'না, বাপ-মা'র মনে আর কষ্ট দিও না'।"

সুজিত রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "শুধু বাপ-মায়ের মনে?"

গৃহিণীও হাসিলেন, "সে ত ভাই নিজের মনেই জান। কষ্টটা যারই হোক বা যে-দিক দিয়েই হোক বলবার রাস্তা ওই একটি।"

ঘরসুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

হাসির মধ্যেই গৃহিণী আরম্ভ করিলেন, "কলকাতাতেই রইলেন—চাকরি করপোরেশনে। মাইনে অবিশ্যি খুব মোটা নয়—পাঁচ-শ থেকে সুরু। এখন আমায় দেন খোঁটা,—'সিমলেয় গেলে এ-রকম বাড়ী দশখানা তুলে ছাড়তুম!' আমিও হাসি আর বলি, 'তোমার মাত্র দুই ছেলে—মেয়েও দুই। যা আছে ওদের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা ঐ থেকেই হবে। আমাদের দিন ত শেষ হয়ে এল।'"

সুজিত রায়ের বিধবা ভগ্নী বলিলেন, "তা ত বটেই। বড়ছেলেটি বুঝি বিলেত গেছে?"

"হাঁ, ইচ্ছেটা ওর আই-সি-এস হয়। আমরা বলি আই-সি-এসই হও আর যাই হও এমনটি নাম আর করতে হবে না। ছোট এবার ডাক্তারী দিলে—ওর ইচ্ছে জার্ম্মেনীতে যায়।"

সুজিত রায়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কহিলেন, "তা ঘুরে এলেই না হয় বিয়ে দিতেন।"

"যে-বাড়ীর যে প্রথা।"

"প্রথার কথা বলছি না, দূর-প্রবাসে স্বামী গেলে বউয়ের মনে কি হয় সেটা ত জানেন।"

"সে ভাই তুমিও ত জান। ক-বছর হ'ল?"

বউটি মুখ নামাইয়া কহিলেন, "পাঁচ।"

সুজিত রায়ের ভগ্নী কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "ছেলের বিয়ে ত শুনলুম দিয়েছেন বিলেত-ফেরতের ঘরে, ছেলে যে বিলেত যাবে তা', আর আশ্চর্য্য কি!"

গৃহিণী প্রসঙ্গ পাইয়া শতমুখ হইলেন, "ওই দেখুন, বলতে ভুলেছি—বিলেত-ফেরতের চোখই আলাদা। আসুন না, দেখবেন বিয়ের দান-সামগ্রী, দুটি ঘর বোঝাই শুধু ফার্ণিচার। কর্ত্তা বলছিলেন, 'এই-সব সাজাতে নতুন একখানা বাড়ী করতে হবে সায়েবী ফ্যাশানের'।" বললুম, আসুক ত বিলেত ঘুরে, যদি ডাক্তার হয় কাজে লাগবে। বেয়াই বুদ্ধিমান, শুনেছেন জামাই জার্ম্মেনী যাবে ডাক্তারী শিখতে, তাই আগে থেকেই ডাক্তারের ঘর দিচ্ছেন গুছিয়ে।"

গৃহিণীর কথা শেষ হইল না, বাহিরে ঘন ঘন মোটরের শব্দ উঠিল। সিঁড়িতে জুতার ও শাড়ীর শব্দ, বহু কণ্ঠের কোলাহল, উগ্র পুষ্পসার সৌরভ ভাসিয়া আসিল। নাম-জাদা ঘর হইতে নিমন্ত্রিতেরা আসিয়াছেন—তাঁহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়—ব্যস্ত হইয়া গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা হইতে রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত উৎসবের যে-কলরোল চলিল তাহার বর্ণনা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। উৎসবের ক্ষেত্র পাইলে প্রকাশের মহিমা যে কতটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে সে-কথা বিচিত্রবেশিনী অন্তঃপুরিকারা ভালই জানেন। তাঁদের নবতর ফ্যাশান বা বনিয়াদী চাল, তাঁদের হাসির মাত্রা ও বাক্যের শালীনতা, তাঁদের শিষ্টাচার ও বিলাস-পরিমিতির ইতিহাস দেওয়া বাহুল্য মাত্র, কেন না, ইতিহাস পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করে!

এ-বাড়ীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছেন সকল স্থানেরই কাহিনী শুনিয়াছেন—কার খেয়ালে কোন স্থানের সুষমাটুকু ভাল ফুটিয়াছে সে তথ্য কাহারও অবিদিত নহে, শুধু পরিত্যক্ত চিলে-কোঠার কাহিনী অনুক্ত রহিয়াছে।

একান্ত নির্জ্জন—সমস্ত ঐশ্বর্য্যেরই মণিস্বরূপ হইয়াও শ্রীহীন ছাদে উঠিবার সিঁড়ি না থাকিলে যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ কল্পনা করিতে পারিত না সেই সর্ব্বহারা বাংলার বিধবার মত উৎসব-ক্ষেত্র হইতে সসঙ্কোচে সুদূরে অবস্থিত চিলে-কোঠায় আসিবার সময় এতক্ষণে হইল।

রাত্রি গভীর। চারিদিকের কোলাহল স্তিমিতপ্রায়, নীচের দীপাবলী নিবিয়া গিয়াছে, আকাশজোড়া অন্ধকারের কোলে শ্রান্তিমগ্ন বাড়ীখানি অত্যন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। উপরের ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রের আলোয় দেখা গেল, তেতলার ছাদে দুইটি তরুণ-তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল।

ছাদের অধিকাংশ হোগলায় ছাওয়া, এক পাশে তার ভিয়ানঘর। বাকী জায়গাটা উচ্ছিষ্ট পাতায়, গ্রাসে লুচি-তরকারির সঙ্গে থই থই করিতেছে, ও-দিক পানে পা দেওয়া দূরের কথা চাহিলেই গা বমি বমি করে।

তরুণ-তরুণীও সেখানে দাঁড়াইল না, চিলেকোঠার ছাদে উঠিবার জন্ত যে কাঠের সিঁড়ি ছিল তাহার প্রথম ধাপে পা দিয়া তরুণ তরুণীর হাত ধরিয়া কহিল, "এস।"

তারপর দু-জনে নিঃশব্দে চিলে-কোঠার ছাদের উপর উঠিয়া আসিল। ক্ষীণ-জ্যোতি তারার আলোয় দেখা গেল উঁহাদের সুকুমার ললাট চন্দনচর্চ্চিত, গলায় ফুলের মালা, পরনে দামী ধুতি ও বেনারসী শাড়ী। ফুলের টায়রাটা মাথা হইতে খুলিয়া হাতে লইয়া তরুণী নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আঃ! যা মাথা ধরেছে!"

তরুণও হাসিয়া বলিল, "ওপরে এসে বাঁচলুম। এস, বসা যাক।"

অপরিষ্কার ছাদের উপর বর-বধূ পরম আরামে পাশাপাশি বসিল।

ছেলেটি বধূর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার খুব ভয় কচ্ছিল, নয়?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল।

ছেলেটি বলিল, "সারাদিন যা গেছে! হৈ হৈ হট্টগোল—বিয়ে না বাজার বসানো! ঐ ফুল, আলো, খাওয়াদাওয়া আর লোকের লৌকিকতাগুলো যদি কেউ উঠিয়ে দেয় ত বিয়েটা খুব সোজা হয়ে আসে!"

মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ছেলেটি বলিল, "তোমার ভাল লাগছিল?"

মেয়েটি হাসিতে হাসিতেই জবাব দিল, "না লাগলে উপায় কি? তুমি ত ঘুরলে বাইরে বাইরে; সেজেগুজে এক গা গহনা প'রে যদি চোরের মত বসতে ত টের পেতে মজা।"

ছেলেটি বলিল, "তুমি যেন নতুন-কেনা পুতুল, তাই ঠকা-জেতার বিচার করবেন বাইরের পাঁচ জনে!"

মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল, "দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ—জান ত?"

ছেলেটি একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "যাক ও-সব কথা। কেমন লাগছে ছাদ? আকাশে চাঁদ নেই, বাঁচা গেছে। অন্ধকারে তুমি আর আমি, নতুন আলাপের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ব্যাকগ্রাউণ্ড আর কি হ'তে পারে?"

মেয়েটি বলিল, "সারারাত এখানে কাটাবে নাকি?"

"ক্ষতি কি। আর একটু স'রে এস, তোমার হাত—বাঃ রে শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছ যে। কোথায় আমি মনে করছি তোমার কোলে মাথা রেখে—"

মেয়েটি হাসিল, "দু-জনের মন আজ থেকে এক হ'ল কিনা—তাই তোমার মনের কথা আমার মনকেও ছুঁয়েছে।" —বলিয়া মেয়েটি সত্যসত্যই জঞ্জাল ভরা ছাদে সটান শুইয়া পড়িয়া ছেলেটির কোলে মাথা রাখিল।

তার এলো খোঁপাটা সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া পড়িয়া চুলের গন্ধের সঙ্গে ফুলের গন্ধ মিশিয়া গেল ও অন্ধকার ছাদ সেই পরম লোভনীয় স্বাদে স্বাদু হইয়া উঠিল।

ছেলেটির হাত দুখানি প্রথম প্রিয়স্পর্শের সুখাতিশয্যে অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই মৃদু-কম্পিত হাত দুখানি দিয়া তার মসৃণ ললাটের চূর্ণ কুন্তলদাম সরাইতে সরাইতে বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল, "নন্ত, নন্তরাণী?"

চক্ষু মুদিয়া নন্তরাণী ছোট্ট জবাব দিল, "উঁ।"

খানিকক্ষণ স্পর্শবিহ্বলতার মধ্যে কাটিবার পর নন্তরাণী বলিল, "একটা কথা ভাবছি।"

"কি কথা, রাণী?"

"এই চিলে-কোঠার ছাদ কি চিরকাল আমাদের মনে থাকবে?"

"কেন থাকবে না, রাণী?"

"কি জানি! আমার ত মনে হয় পুরো একটা রাত্রি নীচের ঘরে কাটালে ওপরকে রীতিমত ভয় করতে শিখব।"

"দূর পাগলি!"—বলিয়া ছেলেটি আঙুল দিয়া মেয়েটি[র] মাথায় মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগিল।

"এ যে আমাদের প্রথম আলাপের ক্ষেত্র—একে ভোলা যায়? ওকি পা গুটিয়ে নিচ্ছ যে? শীত করছে বুঝি অঘ্রাণ মাস, হিম ত মন্দ পড়ছে না! দাঁড়াও, আমার গায়ে[র] শালখানা দিয়ে তোমার পা দুটি ঢেকে দিই—"

"তার চেয়ে ঘরে চল না কেন?"

"না, এই ত বেশ আছি।" বলিয়া ছেলেটি [গা] হইতে পাতলা শালখানা খুলিয়া মেয়েটির পা দুটি সন্ত[র্পণে] ঢাকিয়া দিল এবং দুটি বাহু দিয়া তার গন্ধসিক্ত মুখ[খানি] নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিয়া তুলিয়া ধরিল ও সঙ্গে [সঙ্গে] দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া আপনার মুখখানি বেপথুমতী[র] মুখখানির অতি সন্নিকটে নামাইয়া আনিল।

নদীপথে

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও সর্ব্বদাই অতিমাত্রায় সতর্ক। যে স্থানে এই বাহুড় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার আশেপাশে কেহ উপস্থিত হইলেই ইহারা ডানার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া শত্রুর গতি-বিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। নিস্পন্দ অবস্থান করিলে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার ঘটে না; কিন্তু এই

ধরা পড়িয়া

চেষ্টা

ছিঁচকে-বাহুড়ের আত্মরক্ষার কৌশল

বাহুড় এক অদ্ভুত প্রাণী। পাখীর মত আকাশে উড়িয়া বেড়াইলেও ইহারা পক্ষিশ্রেণীভুক্ত নহে। পাখীর ডানা যেমন বিভিন্ন রকমের পালকের সমবায়ে গঠিত, ইহাদের ডানার গড়ন সেরূপ নহে। ডানার হাড় পরীক্ষা করিলে মানুষের হাতের সঙ্গে উহার অনেকটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য আঙুলগুলি অসম্ভব লম্বা হইয়া গিয়াছে। ডানা হইতে পা পর্য্যন্ত একখানি পাতলা চামড়া বিস্তৃত। ডানা বিস্তার করিলে এই পাতলা চামড়াই প্যারাসুটের মত বাতাস কাটাইয়া বাহুড়কে আকাশে উড়িতে সাহায্য করে। কোন্ যুগে বাহুড় সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার সঠিক হিসাব এখনও নির্ণীত হয় নাই। কেবল 'ইয়োসিন' যুগের উর্দ্ধতন স্তর হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় ছয়টি বিভিন্ন গণভুক্ত কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর বাহুড়ের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের বংশধরেরা আজও পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রচেষ্টা প্রাণী-জগতের বৈচিত্র্য সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ-ভীতি অথবা ভক্ষকের হস্ত হইতে ভক্ষ্যের আত্মরক্ষার্থ পলায়নের প্রচেষ্টার ফলে যে বিভিন্ন ধারায় জীব-জগতের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে—এই মতবাদ সুনির্দিষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও অযৌক্তিক নহে। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ বা ঐরূপ কোন প্রাণী হইতে পক্ষযুক্ত প্রাণীর উৎপত্তির বিবরণ সন্দেহাতীত না হইলেও, পাখী ব্যতীত উড়িতে সমর্থ অন্যান্য প্রাণী-দের বিষয় আলোচনা করিলে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, আত্মরক্ষার্থ শত্রুর হস্ত হইতে দ্রুত পলায়ন-প্রচেষ্টার ফলেই তাহাদের উড়িবার উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ হইয়াছে। উড়ুক্কু মাছ, উড়ুক্কু কাঠবিড়াল, উড়ুক্কু গিরগিটি, বাহুড় এমন কি উড়ুক্কু সাপেরা বোধ হয় এমনই কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া উড়িবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছিল। কিন্তু পাখীকে বাদ দিলে, এক বাহুড় ছাড়া আর কেহই আকাশে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে না। উড়ুক্কু মাছেরা তাহাদের পাখ্‌নার সাহায্যে এবং কাঠবিড়ালী ও গিরগিটি জাতীয় প্রাণীরা প্যারাসুটের মত বর্দ্ধিত চামড়ার সাহায্যে বাতাসে ভর করিয়া খানিক দূর উড়িয়া যাইতে পারে মাত্র। এই সমস্ত অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশের উপর অভ্যাস বা অনভ্যাসের ফলাফলও সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। ডানা থাকা সত্ত্বেও অনভ্যাসের ফলে অনেক গৃহপালিত ও বন্য পাখীর উড়িবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। পেঙ্গুইনদের ডানা যেন ক্রমশই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে, আধিপত্য বিস্তার বা আত্মরক্ষার্থ বংশানুপরম্পরায় পোষিত কোন অত্যুগ্র বাসনা প্রাণীজগতের দৈহিক ক্রমবিকাশের সহায়ক কি না? আদিম যুগ হইতে মানুষ আকাশে বিচরণ করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে। স্বাভাবিক উপায়ে সেই বাসনা পরিতৃপ্তির কোন লক্ষণ প্রকট হইয়াছে কি? অথচ নিম্ন শ্রেণীর অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে অধিকাংশ কীটপতঙ্গই এই ক্ষমতার অধিকারী. মেরুদণ্ডীদের মধ্যে, উড়িবার ক্ষমতায় পাখীর পরেই বাহুড়ের নাম করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে বিচিত্র বর্ণ ও বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির বাহুড়ের সংখ্যা যে কত তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ, সাধারণতঃ কীটপতঙ্গ ও ফলমূলভোজী বাহুড়ের সংখ্যাই বেশী। কীটপতঙ্গভুক্ বাহুড়েরা প্রায়ই আকারে ছোট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত ৬০০ শত বিভিন্ন জাতীয় কীট

ছিঁচকে-বাহুড়ের ডালে ঝুলিয়া মাথা নীচু করিয়া বিশ্রামের উপক্রম

বৃক্ষশাখা অবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ছিঁচকে-বাদুড় অগ্রসর হইতেছে

ছিঁচকে-বাদুড় উড়িয়া আসিয়া এইমাত্র একটা ঝোপের উপর পড়িয়াছে। এখন পা দিয়া ডাল ধরিয়া মাথা নীচু করিয়া বিশ্রাম করিতেছে

পতঙ্গভুক্ বাদুড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত "নকটিলিওনিডি" গোষ্ঠীভুক্ত মৎস্যভোজী এবং "ভ্যাম্পায়ার" নামক রক্তশোষক বাদুড়ও পৃথিবীর কোন কোন অংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। জাভার "কেলং" বাদুড়ই বোধ হয় আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের শরীর প্রায় এক ফুট লম্বা। ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাঁচ ফুটেরও বেশী লম্বা হইয়া থাকে। বাদুড়েরা একধারে একটি বা দুইটি বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চারা মায়ের বুক আঁকড়াইয়া থাকে। স্ত্রী-বাদুড় বাচ্চা বুকে করিয়াই উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা বাসা বাঁধে না মাথা নীচু করিয়া, পায়ের নখের সাহায্যে গাছের ডালে ঝুলিয়া সারাদিন কাটাইয়া দেয় এবং সূর্য্যাস্তের পর আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। দিনের বেলায় বিশ্রামকালে প্রায়ই চেঁচামেচি করিয়া বাসস্থান মুখরিত করিয়া তোলে। বাদুড়ের মাংস নাকি খরগোসের মাংসের মত খাইতে সুস্বাদু। অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের "টেরোডেক্‌টিল" নামক অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে বাদুড়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি বাদুড় ও "টেরোডেক্‌টিল" এক শ্রেণীর প্রাণী নহে। বাদুড়ের দৈহিক গঠন হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা "মারসুপিয়েল" বা প্রাগৈতিহাসিক কাঠবিড়ালীর অনুরূপ কোন জন্তু হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমবিকাশের [illegible] বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। টেরোডেক্‌টিল প্রকৃতিদত্ত [illegible] বাদুড় অপেক্ষা অধিকতর বলীয়ান ছিল এবং আকৃতিতেও [illegible] তাহারা বাদুড় অপেক্ষা অনেক বড়। তথাপি জীবনসংগ্রামে তাহারা হারিয়া গেল, অথচ শত শত বিভিন্ন জাতীয় বাদুড় আজও পৃথিবীর বুকে অবাধে বিচরণ করিতেছে। তবে আত্মরক্ষার্থ ইহাদের অনেকেরই নানাবিধ কৌশল ও লুকোচুরির আশ্রয় লইতে হইয়াছে এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশীয় ছিঁচকে-বাদুড় বা কলা-বাদুড় নামে এক প্রকার মধ্যমাকৃতি বাদুড়ের জীবনযাত্রা ও আত্মরক্ষার কৌশলের কথা বিবৃত করিতেছি।

আমাদের দেশে ছোট ও বড় কয়েক প্রকারের বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বাদুড়েরা বংশপরম্পরায় একই স্থানে প্রকাণ্ডভাবে দলবদ্ধাবস্থায় উঁচু গাছের ডালে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ছিঁচকে-বাদুড়েরা এক স্থানে দলবদ্ধ ভাবে বাস করে না। এক স্থানে একটি বা সময়ে সময়ে দুইটির অধিক ছিঁচকে-বাদুড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায়ই কলা গাছে অথবা ছোট ছোট নারিকেল সুপারি গাছের পাতার গায়ে ঝুলিয়া দিনের বেলায় বিশ্রাম উপভোগ করে। সময় সময় পরিত্যক্ত নির্জ্জন প্রকোষ্ঠেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, সর্ব্বদাই যেন সজাগ; একটু শব্দ পাইলেই কান খাড়া করিয়া, চোখ ঘুরাইয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে, ইহারা রাত্রিচর বলিয়া অনেকের ধারণা আছে যে, দিনের বেলায় ইহারা চোখে দেখিতে পায় না। কিন্তু সে ধারণা ভুল। বাদুড় পুষিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—দিনের বেলায় ইহাদের দৃষ্টিশক্তির বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। কানের মধ্যে পাশাপাশি ভাবে সমান্তরাল কতকগুলি ভাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় ইহা শব্দানুভূতির তীক্ষ্ণতা বর্দ্ধনের সহায়তা করিয়া থাকে। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিঁচকে-বাদুড়ের ডানা প্রায়ই এক ফুট হইতে দেড় ফুটের বেশী লম্বা হয় না। গায়ের লোম গাঢ় ধূসর বর্ণের; কিন্তু ডানার পাতলা পর্দার রং কালো। বিশ্রাম করিবার সময় গাছের শুষ্ক অথবা পচা পাতার মধ্যে ডানায় সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া মুখ গুঁজিয়া ঝুলিয়া থাকে; কিন্তু চোখ কান অনাবৃত রাখে। হঠাৎ দেখিলে এই অবস্থায় ইহাদিগকে শুষ্ক পত্র বা ঐরূপ কোন আবর্জ্জনা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এই ভাবে আত্মগোপন করিয়া সহজেই ইহারা শত্রুর দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হয়। কিন্তু অতিরিক্ত সাবধানতার ফলে সময় সময় ইহারা শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যায় দলবদ্ধ ভাবে উঁচু গাছে অবস্থান করে বলিয়াই হউক অথবা সর্ব্বদা চেঁচামেচি করিয়া বিশ্রম্ভালাপে মসগুল থাকে বলিয়াই হউক, বড় বাদুড়েরা আত্মগোপনের জন্য কোন ছলচাতুরী অবলম্বন করে না কিন্তু ছিঁচকে-বাদুড়েরা সাধারণতঃ নীচু গাছে, শত্রুর নাগালের সীমানার মধ্যে বাস করে বলিয়াই বোধ হয় প্রকৃতিদত্ত আত্মগোপন

ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও সর্ব্বদাই অতিমাত্রায় সতর্ক। যে স্থানে এই বাছড় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার আশেপাশে কেহ উপস্থিত হইলেই ইহারা ডানার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিলে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কোনই কারণ ঘটে না; কিন্তু এই প্রকার মস্তক-সঞ্চালনের ফলে সহজেই ইহারা ধরা পড়িয়া যায়। ধরা পড়িয়া গেলেও সহজে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে না। সম্মুখের ডানার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ ও পিছনের পায়ের সাহায্যে ডাল বা আশ্রয়স্থানের গা বাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকে। দিনের বেলায় আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে গেলে ইহাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর কথা বাদ দিলেও পাখীদের মধ্যে অনেকেই ইহাদের শত্রু। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপীড়ন করে কাকেরা; কোনক্রমে একবার একটু দেখিলেই হয়। যেখানে যায়, কাকেরা দল বাঁধিয়া ইহাদিগকে অনুসরণ করে এবং ঠোকরাইয়া বাহির করে।

গল্পে আছে—একসময়ে পশু ও পাখীদের মধ্যে গুরুতর লড়াই বাধিয়া উঠিয়াছিল। বাছড়ের সঙ্গে পশু ও পাখী উভয়েরই কোন না-কোন বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের সুযোগে, লড়াইয়ের গতিক বুঝিয়া বাছড় একবার পশুর দলে একবার পাখীর দলে ভিড়িতে লাগিল। পরে উভয় দলে সন্ধি স্থাপিত হইলে বাছড় মহা ফাঁপরে পড়িল। সেই অবধি সে উভয় দল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া বেড়ায়। কাকেরা নাকি তাহার পক্ষে দৌত্যকার্য্য করিয়া প্রতারিত হইয়াছিল, তাই আজও তাহারা বাছড়ের অনিষ্ট করিতে ছাড়ে না।

গল্পে যাহাই থাকুক—কাকেরা যে তাহার মাংসের লোভে পিছু তাড়া করে না তাহা তাহাদের ব্যবহার দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাহারা উহাকে উত্যক্ত করিয়াই যেন যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করে। কারণ কাকদের কিরূপ দুষ্টামি করা স্বভাব, চিল-শকুনির বেলায় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কাকেরা তাড়া করিতে করিতে ছিঁচকে-বাছড়কে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেই ইহারা প্রাণভয়ে এমন বিকট চীৎকার জুড়িয়া দেয় যে কাকগুলি ভয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। চারিদিক ঘেরিয়া সকলে মিলিয়া কেবল উচ্চকণ্ঠে কলরব করিতে থাকে।

কিছু দিন আগের কথা। কলিকাতার উপকণ্ঠে একটা বাড়ীতে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। হঠাৎ বাহিরে একসঙ্গে অনেকগুলি কাকের কলরব শুনিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে বিকৃত মনুষ্য-কণ্ঠের স্থায় এক একটা বিকট চীৎকার। বাহিরে আসিয়া দেখি—কাকগুলি কোথা হইতে যেন একটা বড় ছিঁচকে-বাছড়কে তাড়া করিয়া আনিয়াছে। বাছড়টা উড়িয়া যেদিকেই পলাইবার চেষ্টা করে সকলে মিলিয়া কাকেরা সেদিকেই অনুসরণ করে। দুই-তিন বার বাছড়টা দালানের কার্ণিসের নীচে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না; কাকেরা সেখান হইতে তাহাকে খোঁচাইয়া বাহির করিল। উড়িবার সময় দেখিলাম বাছড়টার পায়ে প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা একগাছি মোটা সুতা বাঁধা রহিয়াছে। বোধ হয় ছেলেরা ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; বাঁধন কাটিয়া পলাইয়াছে। হয়রান হইয়া অবশেষে সে আঙিনার এক প্রান্তে পোঁতা একটা কালো রঙের লম্বা [illegible]টির [illegible] চাইয়া বসিয়া পড়িল। আধাআধিভাবে ডানা মেলিয়া বসিবার অদ্ভুত কায়দায় গায়ের রং খুঁটির রঙের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়া গেল যে, কাকগুলি ত দূরের কথা, আমিও অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কাকগুলি বাছড়টাকে খুঁজিয়া না পাইয়া আশে-পাশে তখনও চুপচাপ বসিয়াছিল। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করিতেই দেখিতে পাইলাম পায়ের সেই মোটা সুতাটা খুঁটির এক পাশ হইতে ঝুলিতেছে। ধরিবার চেষ্টা করিতেই আবার উড়িয়া গেল। কাকগুলি আবার পিছু লইল। এবার ছোট্ট একটা নারিকেলের পাতার ভিতর লুকাইল। এমনই আত্মগোপন করিবার ক্ষমতা যে পরিষ্কার জায়গায় একটা পাতার গায়ে ঝুলিয়া থাকা সত্ত্বেও এতগুলি কাকের নজরে পড়িল না। আমি একটু দূরে থাকিয়া উহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম—এবার আমারও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। আন্দাজী দুই-চারটা ঢিল ছুঁড়িতেই, বাছড়টা চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গিয়া একটা উঁচু কলাগাছে আশ্রয় লইল। এবার কিন্তু কাকগুলি ঠিকই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। তাহারা একযোগে অনেকেই গিয়া গাছটার উপর পড়িল।

ডানার নখের সাহায্যে ছিঁচকে-বাছড়ের এক ডাল হইতে অন্য ডালে যাইবার চেষ্টা

লম্বমান ছিঁচকে বাদুড় ডানা নাড়িয়া যেন নিজের গায়ে হাওয়া করিতেছে

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর কাহারও সাড়াশব্দ নাই। বুঝিলাম—বাদুড়টা কাকগুলির চোখে ধুলা দিয়াছে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পরে গোটাদুই কাক কলাগাছটার মাথার ডাঁটাগুলির মধ্যে ঠোকরাইতেই একটা বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলাম। সে কি ভীষণ চীৎকার! কানে না শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না। ছাতের উপর উঠিয়া দেখিলাম—বাদুড়টা বোধ হয় সেই পায়ে-বাঁধা সুতাটায় কোনক্রমে গাছের সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। তাই কাকগুলিকে সম্মুখে দেখিয়া প্রাণভয়ে মুখ হাঁ করিয়া বিকট চীৎকার করিতেছে। তাহার সেই সময়ের মুখের ভঙ্গী এবং সেই বিকট চীৎকার শুনিলে সাহসী লোকেরও বোধ হয় হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। আশ্চর্য্য এই দেখিলাম—বাদুড়টার মুখের সেই আক্রমণাত্মক ভাব ও চীৎকারে কাকগুলি ভড়কাইয়া দূরে সরিয়া গেল। খানিক বাদে আবার কাছে যাইতেই সেই বিকট চীৎকার—আর হাঁ করিয়া যেন গিলিতে আসে। কাকগুলি আর অগ্রসর হইল না। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর তাহারা এদিক ওদিক চুপচাপ বসিয়া রহিল। অবশেষে একান্ত মনমরা হইয়াই যেন উড়িয়া চলিয়া গেল।

ছিঁচকে-বাদুড়ের মুখের উপরের ও নীচের চোয়ালের ধারালো দাঁতের সারি দেখিলে কীটপতঙ্গ চিবাইয়া খাইবার উপযোগী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমি ইহাদিগকে কীটপতঙ্গ খাইতে লক্ষ্য করি নাই। পেয়ারা, কলা প্রভৃতি ফল ডানার সম্মুখের নখ দিয়া বুকের উপর লইয়া কুড়িয়া কুড়িয়া খায়। কিছুক্ষণ খাইয়া আবার জিভ দিয়া চাটিতে থাকে। দুইটি বাদুড় একত্র হইলে উভয়ে অনেক প্রকার ক্রীড়াকৌতুক করে আবার সময়ে সময়ে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া চেঁচামেচি করে। সময়ে সময়ে দেখা যায় ঝুলিতে ঝুলিতে ডানা মেলিয়া যেন নিজের শরীরে হাওয়া করিতেছে। কখনও বা সম্মুখের নখ দিয়া ঝুলিয়া যেন হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়—দূর হইতে মনে হয় যেন একটা কালো রঙের অদ্ভুত আকৃতির ব্যাং আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। নির্জ্জন সমাধিমন্দিরে বা পরিত্যক্ত নির্জ্জন বাড়ীতে সময় সময় ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য বাদুড়ের কণ্ঠস্বরের তুলনায় এই ছিঁচকে-বাদুড়ের কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ—বিকৃত মনুষ্যকণ্ঠস্বরের ন্যায়। ইহাদের এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের জন্যই অনেক সময়ে নির্জ্জন স্থানসমূহ 'ভূতের আড্ডা' বলিয়া লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া থাকে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহারাজ দিব্য

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

অষ্টম শতাব্দীর এক পুণ্যতিথিতে গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ প্রশংসনীয় উদ্যমে সমবেত হইয়া অরাজকতা নিবারণকল্পে গোপাল নামক অনুপম সৌভাগ্যশালী এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পাল-বংশের আদিপুরুষ। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ সুদীর্ঘকাল প্রজাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন এবং প্রজাগণও সম্পদে বিপদে রাজশক্তির সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া পালরাজগণ আসমুদ্র হিমাচল সাম্রাজ্যবিস্তার, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও তাহার হস্ত হইতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাশক্তি পাল-সাম্রাজ্যের সঞ্জীবনীশক্তির আধার ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে এই বংশের একাদশ রাজা তৃতীয়-বিগ্রহপাল, মহীপাল, শূরপাল, রামপাল নামক তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিলে মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই বংশে এক নূতন নাট্যের অভিনয় আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী পালরাজগণের তাম্রশাসনে ইঁহার কৃতকর্ম্মের উল্লেখ নাই সত্য কিন্তু ইঁহার কর্ম্মদোষে হস্তান্তরিত রাজ্য পরবর্ত্তী রাজাকর্ত্তৃক পুনরায় অর্জ্জিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখিত আছে। মহীপালের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলী-লিপির দুইটি শ্লোক এইরূপ—

> তস্যোর্জ্জস্বল পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
> পুত্র পালকুলাব্ধি শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
> তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্ যথাবদ্যশঃ
> ক্ষৌণীনায়ক ভীমরাবণ বধাদ্যুর্দ্ধাম্ববোল্লংঘনাৎ।

নৃপতি বিগ্রহপালের রামপাল নামক পুত্র ছিলেন। তিনি যুদ্ধরূপ সাগর লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীনায়ক ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া জনকভূরূপ সীতার উদ্ধার করিয়া ত্রিজগতে যশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

কুমারপালের ভ্রাতা রাজা মদনপালের মনহলি-লিপির একটি শ্লোক এইরূপ—

> এতস্যাপি সহোদর নরপতির্দ্দিব্য প্রজানির্ভর।
> ক্ষোভাহূত বিধূত বাসবধৃতি রামপালোঽভবৎ।

দেবলোকবাসিগণের অতিশয় চিত্তচাঞ্চল্যে আহূত হইয়া আন্দোলিতচিত্ত দেবরাজ যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন এই নরপতির (শূরপালের) সহোদর শ্রীরামপাল নামক নরপতি সেইরূপ দিব্যের পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহূত ও আন্দোলিতচিত্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন।

মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ

উল্লিখিত তাম্রশাসনদ্বয়ে ইঙ্গিতে যে-ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে 'রামচরিতে' তাহাই অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বর্ণিত। রামচরিতের কবি সন্ধ্যাকর রামপালের সান্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র ও মদনপালের সভাসদ। এক পক্ষে অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের কীর্তিকাহিনী অন্য পক্ষে রামপালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দ্বারা তৎপুত্র মদনপালের প্রীতিভাজন হওয়া কবির উদ্দেশ্য ছিল।

মহীপাল মদনপালের পিতৃব্য, সুতরাং মহীপাল যতই অনীতিক আচরণ করুন না কেন তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিয়া মদনপালের প্রশংসালাভ করা কবি বা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু পিতা রামপালের প্রতি তাঁহার আচরণ বর্ণন দ্বারা কবির সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সমধিক। এই জন্য রামচরিতে অমাত্য ও প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত মহীপালের ব্যবহারের আভাস মাত্র প্রদত্ত হইলেও রামপালের সহিত তাঁহার ব্যবহার সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রজাবর্গের প্রতি মহীপালের ব্যবহার কাব্যে বর্ণিত না হইবার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রী অধিকারের পর যখন পাল-সাম্রাজ্যে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছিল তখন 'রামচরিত' রচিত।

ভ্রাতা রামপালের সহিত মহীপালের ব্যবহার সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন,—

> বামেতুচিত্রকূটং বিকটোপলপটলকুট্টিম কঠোরম্
>
> ভূমি ভৃতমাপতিতে তপস্বিনি মহাশয়েঽসহনে। ১।৩২

রামপাল পক্ষের টীকা—চিত্রকূটং অদ্ভুতমায়ং শিলাকুট্টিমবৎ কর্কশম্ ভভৃতং (?) মহীপালং তপস্বিনি অনুকম্পাঽহে দশাপন্নে।

বিচিত্র কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বা অদ্ভুত খলস্বভাব কর্কশপ্রকৃতি মহীপালকে পাইয়া মহাশয় রামপাল অসহনীয় অনুকম্পার্হ দশায় উপনীত হইয়াছিলেন।

> অপর ভ্রাত্রাবসতি কষ্টাগারং মহাবনং ঘোরম্।
>
> হতবিধিবশেন বায়স কুশীলতা ভেত্তৃকুচজানো। ১।৩৩

দুর্দৈববশে অপর ভ্রাতা শূরপালের সহিত (যখন) রামপাল ভীষণ কারাগারে বাস করিতেছিলেন এবং লতার মত বন্ধনকারী নূতন লোহার শৃঙ্খল তাঁহাদের জানু বিদীর্ণ করিতেছিল।

পরবর্তী ৩৪, ৩৫ শ্লোকে কারারুদ্ধ রামপালের দুরবস্থা বর্ণন করিবার পর কবি ১।৩৬ শ্লোকে বলিয়াছেন,

হস্তলিখিত রামচরিতম্

[উহার তৃতীয় ছত্রে 'অত্র' পং হইতে ১।৩৬ শ্লোকের রামপাল পক্ষের টীকা আরম্ভ]

—রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে

বিজনাবস্থান ব্যূহে ভূতনয়াত্রাণযুক্তদায়াদে
বিদ্যুদ্বিলাস চঞ্চল মায়ামৃগ তৃষ্ণয়াস্তরিতে।

রামপাল পক্ষের টীকা—অত্রত্র বিজনে স্থানমবস্থানং তেন ব্যূহবিগত উ যস্ত তস্মিন রামপালে ভূতং সত্যং নয়োনীতং তয়োরবক্ষণে যুক্তঃ প্রসক্তোদায়াদো ভ্রাতা মহীপালো যস্যা মায়া লক্ষ্মা মৃগতৃষ্ণয়া মমায়ং লক্ষ্মীং গ্রহীষ্যতীতি মুগ্ধতয়াহস্তরিতে তিরোহিতে ভূমিগৃহাদিগুপ্তাক্ষিপ্তে রামপালে সতি॥

নির্জ্জনে নির্ব্বাকভাবে রামপাল অবস্থান করিতেছিলেন। সত্য ও ন্যায় এই দুইটির অরক্ষণে (তয়োররক্ষণে= তয়োঃ+ অরক্ষণে) নিযুক্ত অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ভ্রাতা মহীপাল "আমার লক্ষ্মী হরণ করিবে" এই অলীক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রামপালকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (১)

মায়িধ্বনিনা শঙ্কিতবিপদো ভর্ত্তুর্ভুবঃ প্রভূতায়াঃ।
নিকৃতি প্রযুক্তিতো রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথাপন্নে॥ ১।৩৭॥

টীকা—অত্রত্র মায়িনাং খলানাং ধ্বনিনা অয়ং রামপাল ক্ষমোহধিকারী সর্ব্বসম্মতঃ ততশ্চ দেবস্য রাজ্যং গ্রহীষ্যতীতি সূচনয়া শঙ্কিত বিপদঃ মামসৌ হনিষ্যতীতি শঙ্কিতা বিপদ্যেন তস্য ভুবোভর্ত্তুর্মহীপালস্য প্রভূতায়া বহুতরায়া নিরাকৃতি প্রযুক্তিতঃ শাঠ্যপ্রয়োগাৎ উপায় বধচেষ্টয়া তথাত্বনাকারেনাপন্নে দুর্গতে কনিষ্ঠে ভ্রাতরি রামপালে রক্ষিতরি ভাবার্থে।

তাৎপর্য্য—খল লোকেরা মহীপালকে পরামর্শ দিয়াছিল "এই রামপাল ক্ষমতাশালী সুযোগ্য এবং সকলের প্রিয়। সুতরাং ইনি আপনার রাজ্য কাড়িয়া লইবেন।" এই কথা শুনিয়া নৃপতি মহীপাল মনে করিলেন "রামপাল আমাকে বধ করিবে" এবং অনেক শঠতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। রামপালের প্রশংসার্থে রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে কবি মহীপাল চরিত্রের আভাস প্রদান করিয়াছেন।

লোকান্তর প্রণয়িনো দুর্ণয়ভাজোহগ্রজন্মনো ব্যসনাৎ।
পতিতান্ধকার বত্যামুভাবাদুদহারি গোতমী তেন॥ ১।২২॥

পরলোকগত দুর্নীতিপরায়ণ অগ্রজ মহীপালের নিষ্ফল যুদ্ধে রত . .. ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর অন্ধকার রামপাল কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছিল।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে কাব্যে মহীপালের কৃতকর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারম্।
বিভ্রত্যনীতিকারম্ভরতে রামাধিকারিতাং দধতি॥ ১।৩১॥

পিতৃবিয়োগের পর প্রথমতঃ ভ্রাতা মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত হন। রামপালের তৎকালীন অবস্থা পরে বর্ণিত হইতেছে।

এক্ষণে টীকাসহ ২২, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭ শ্লোক একত্রে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মহীপাল দুর্নীতিপরায়ণ, অনৈতিক আচরণকারী, বিচিত্র কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্কশপ্রকৃতি, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী রাজা ছিলেন, ও খলস্বভাব ব্যক্তিদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন।

তিনি যে বিচক্ষণ মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতেন তাহা ১।৩১ শ্লোকের টীকার "ষাড়গুণগণ্যস্য মন্ত্রীনো গুণীতমোবগুণয়ন" পদ হইতে আমরা জানিতে পারি। অনন্তসামন্তচক্রের বিপুল বাহিনী যখন তাঁহার বিরুদ্ধে সুসজ্জিত তখন ষড়বিধ উপায়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের উপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করিয়া রণভূমে অবতীর্ণ হন। যিনি বিপদকালে যুদ্ধের প্রাক্কালে মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করেন, তিনি সম্পৎকালে অধীন রাজপুরুষগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা সহজে অনুমেয়, অথচ ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষ মন্ত্রিগণের নীতিকৌশলে বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহীপালের এইরূপ চরিত্র ও আচরণ হইতে সামন্তচক্র ও প্রজাবর্গের উপর তাঁহার ব্যবহার অনুমান করা যায়। মন্ত্রিবর্গ ও কারারুদ্ধ রামপাল অত্যাচারক্লিষ্ট হইলেও কতক পরিমাণে নিরুপায়, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ ও সামন্তচক্র রাজ-অত্যাচার নির্ব্বিঘ্নে সহ্য করিতে পারেন না। মাৎস্যন্যায় নিবারণের জন্য যাহাদের রাজ-নির্ব্বাচনের অধিকার ছিল, অনৈতিক আচরণের প্রতিকারেরও অধিকার তাহারা তখন বিস্মৃত হয় নাই। গৌড়জন যখন আর মহীপালকে সহ্য করিতে পারিল না তখন আবার সম্মিলিত হইল। (২)

(১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত রামচরিতের ১।৩৬ শ্লোকের টীকায় 'তয়োররক্ষণে' পদটি তয়োর (রর) ক্ষণে' রূপে লিখিত ও 'ভ্রাতা' শব্দ বিলুপ্ত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অসুবিধা হইয়াছে। নেপাল হইতে আনীত ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি হইতে টীকা ও উহার আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল।

(২) 'বাঙ্গালীর বল', ১০১ পৃষ্ঠা।

তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। দিব্য নামে যে কোন রাজা ছিলেন 'রামচরিত'-আবিষ্কারের পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিতেন না। এমন কি তৎপূর্ব্বে কেহ কমৌলি-লিপির চতুর্থ শ্লোকের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বুকাননকে যিনি 'ধীবর' শুনাইয়াছেন তিনি মনে করিয়া থাকিবেন, 'দিবর' অর্থহীন শব্দ—'ধীবর' শুদ্ধ। স্তর যদুনাথ সরকার মহাশয় বুকাননের এই উক্তি সম্পর্কে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "'দিবর দীঘিটি'কে বুকানন হ্যামিণ্টনের সঙ্গী পণ্ডিত ও মুন্সিগণ ধীবর দীঘির আকারে প্রাপ্ত হন। ১৮০৮-১৪ খৃঃ অব্দে বুকানন হ্যামিণ্টন যখন বিহার ও উত্তর-বঙ্গে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিত ও মৌলবী ক'টি অতি অজ্ঞ ছিল। ভারততত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব (Indology and Archæology) সম্বন্ধে তাহারা ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এবং বুকানন নিজেও বেশী জানিতেন না। জোন্স, কোলব্রুক প্রভৃতির তুলনায় বুকানন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ (Orientalist) বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ বিশ্বাস যোগ্য বটে, কিন্তু পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মতামত (Archæological opinions) অসার; তাঁহার বিহার অধ্যায়গুলিতে ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল বাহির হইয়াছে। সুতরাং বুকাননের রিপোর্ট বেদবাক্য নহে।"

'ভীম জাঙ্গাল' নামে কয়েকটি সুবৃহৎ রথ্যা উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিদৃষ্ট হয়।

পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এদেশের বৌদ্ধেরা হিন্দুই ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা বর্ণধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন।(১১) দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন (৫ম শ্লোক), তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছিলিপি (১৩ শ্লোক) হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। রামচরিতের বৌদ্ধ কবিও বরেন্দ্রভূমির পবিত্রতা বর্ণন করিতে গিয়া উহাকে 'ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং'। (৩।৭) বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের উদ্ভব স্থান, রামাবতীকে 'ভগবদ্ভক্ত বিপ্র' ও 'প্রশান্ততম অনূচান' (৩।৬) সাঙ্গ বেদে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং নিজ জন্মভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরীকে 'বহুবটু'—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বলিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপত্তি না থাকিলে বৌদ্ধ রাজসভা হইতে ব্রাহ্মণত্বের শ্রেষ্ঠত্ব বিজ্ঞাপক এইরূপ উক্তি কখন উচ্চারিত হইত না। পক্ষান্তরে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন পুঁথি হইতে দেখাইয়াছেন—মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণ তৎকালে সমাজনিন্দিত ছিল ও বৌদ্ধধর্ম্মের শীতল ছায়া হইতেও দূরে ছিল, এমন কি বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন।(১২) ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পালরাজগণ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বর্ণাশ্রমী হিন্দুর ন্যায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুন্নত হিন্দুর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন।

পালরাজগণ স্ব-স্ব তাম্রশাসনে নিজ জাতির কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইঁহাদের সামন্ত নরপতি বৈদ্যদেব ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।(১৩) রামচরিতে উঁহাদিগকে শ্রীপতিনাভিঃ সম্ভূত (১।১৭)—শ্রীপতি পার্থিবো যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ তস্মাৎ সম্ভূতঃ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-সম্ভূত বলা হইয়াছে; সোজাসুজি ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই। 'ক্ষত্রিয়' শব্দ দুর্ব্বলভাবে উপন্যস্ত হওয়ায় মনে হয় ইঁহাদের পিতৃকুল ক্ষত্রিয় হইলেও মাতৃকুল নহে। অবশ্য এই অভিজাত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন শেষ রাজদ্বয়ের সময়ে উত্থাপিত। এই সকল লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় 'রামচরিতে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—As time went on, their pretensions seem to have been on the increase···In none of the earlier inscriptions do the Palas advance any such pretensions.

রামচরিতের টীকায় দিব্যকে কৈবর্ত্ত-জাতীয় বলা হইয়াছে। পালরাজত্বকালে কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত মৎস্যঘাতী সমাজ লাঞ্ছিত সম্প্রদায়-বিশেষের বিদ্যমানতা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আফগানরাজ আমানুল্লার সিংহাসনচ্যুতির সুযোগে বাচ্চাইশাকো, বা মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের প্রাণরক্ষার বিনিময়ে ভিস্তিওয়ালার ন্যায় দিব্য হঠাৎ এক দিনের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। বরেন্দ্রী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তিনি প্রধান সেনাপতি বা প্রধান মন্ত্রীর পদবীতে আরূঢ় থাকিয়া বিপুল সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভীম সম্বন্ধেও

(১১) চন্দ-মহাশয়ের অভিভাষণ

(১২) প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক ১৩৩০; প্রবাসী, মাঘ ১৩৩০।

(১৩) কমৌলি-লিপি, ২য় শ্লোক

বি বলিয়াছেন—তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর আবাসস্থল ও সজ্জন-প্রতিপালক ছিলেন। বরেন্দ্রেও তৎকালে সাঙ্গ বেদে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াছি। আধুনিক রুশিয়ার স্থায় পাল-সাম্রাজ্যে আভিজাত্যবিহীন ব্যক্তি সমাদৃত হইতেন এরূপ নিদর্শন নাই; বরং আলোচ্য সময়ে আভিজাত্যের মর্য্যাদা বাড়িয়াই গিয়াছিল, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই সময়ে যিনি সুবিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্যের রাজপুরুষের সর্ব্বোত্তম পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বিদ্যাবত্তা, আভিজাত্য ও কুলগৌরব অল্প ছিল না। মহীপালের অত্যাচারপ্রপীড়িত বরেন্দ্রের অনন্তসামন্তচক্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৌদ্ধ নরপতিগণ যাঁহাকে নায়ক রূপে এবং মহীপালের মৃত্যুর পর যাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তীরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার বংশধরের জন্য বরেন্দ্রের অনন্তসামন্তচক্র ও বীর প্রজাবৃন্দ পুনঃ পুনঃ অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বীরের বাঞ্ছিত শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তৎকালীন জনসাধারণ ও শাস্ত্রবেত্তাগণের নিন্দিত মৎস্য-ঘাতী কৈবর্ত্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কল্পনা করাও যায় না। পরলোকগত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন—Divya or Dibyaka, chief of the Chasi Kaivarta tribe or Mahisya caste which at that time was powerful in northern Bengal (*Early History of India*, 4th edition, page 416.)

স্যর যদুনাথ সরকার মহোদয়ও তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহাদের (দিব্য ও ভীমের) স্বজাতিগণ মাহিষ্য বলিয়া অভিহিত হন।

দিব্য ও ভীম জাতিতে যাহাই হউন না কেন তাঁহারা যে তাঁহাদের জননী জন্মভূমির অতিশয় দুর্দ্দশার দিনে অতুলনীয় স্বদেশপ্রীতি-প্রণোদিত অপূর্ব্ব বীরত্ব ও মঙ্গলময় ঐক্যে 'অরবিন্দেন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল' 'পুণ্যভূ' বরেন্দ্রীর সুমতি উদ্ঘোষিত করিয়াছিলেন সেই ইতিবৃত্ত সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের ন্যায় 'জনগণপথপরিচায়ক' রূপে আজিকার দিগ্‌ভ্রান্ত-বিচ্ছিন্ন-শক্তি বাঙালীকে সুপথ প্রদান করিবে।

বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে মুসলিম স্বার্থ

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

ব্রিটিশ-সরকারের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এদেশের হিন্দুদের অভিমত যেমন স্পষ্ট, অধিকাংশ মুসলমানের অভিমতও সেইরূপ সুস্পষ্ট ও দ্বিধা-সন্দেহের বহির্ভূত। হিন্দুরা যেমন কোন দিক দিয়াই বাঁটোয়ারাকে সমর্থন করিতে সম্মত নহে, মুসলমানগণও সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থায় কোনক্রমেই উহার একটি 'কমা-সেমিকোলন'ও পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহে। অথচ যে-সিদ্ধান্তকে দেশের কোন সম্প্রদায়ই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন না, তাহার পরিবর্ত্তনের কথা উঠিলে মুসলমানগণ কেন এত বিচলিত ও ভীত হইয়া পড়েন তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের নেতারা প্রত্যেক ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে মুসলমানের স্বার্থের কথাই ভাবিয়া থাকেন। স্বাধীনতার কথাই হউক আর দেশের সাধারণ কল্যাণের কথাই হউক, সকলের উর্দ্ধে তাঁহারা স্থান দিয়া থাকেন মুসলমানের কয়েকটি বিশেষ স্বার্থকে। এইগুলি রক্ষিত হইলেই মুসলমানের আর কোনও বিপদ নাই, ইহাদেরই জোরে মুসলমান সকল বাধা ঠেলিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে এই কথা তাঁহারা মনে করেন। এই বিশেষ স্বার্থের তাগিদে লীগ, কন্‌ফারেন্স, সভা সমিতি প্রভৃতি অনেক কিছুর আয়োজন হইয়াছে, মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফার সৃষ্টি হইয়াছে। যে বাঁটোয়ারা এই চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দফাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, চৌদ্দ দফার অভাবে তাহাকেই আমাদের নেতারা মুসলিম

স্বার্থের "ম্যাগনা কার্টা" বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, সরকার চৌদ্দ দফাকে বর্ণে বর্ণে স্বীকার করিবেন না। সুতরাং তাহার বদলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভাল, এই নীতিতে বাঁটোয়ারাকে অন্ধের যষ্টির মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, এবং কিছুতেই ইহার রদ-বদল হইতে দিবেন না, এরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রবন্ধে বাঁটোয়ারার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে দুই-একটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, উহার আশ্রয়ে মুসলমানদের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে না, বরং তাহা নানাভাবে পদদলিত হইবে।

অনেক স্থূলদর্শী ব্যক্তি বাঁটোয়ারার অন্তর্নিহিত দোষ-গুণের বিচার না করিয়া এই যুক্তি দেখান যে, যেহেতু হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবিয়া উহার বিরোধিতা করিতেছে, অতএব নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে মুসলমানদেরও উহাকে সমর্থন করাই উচিত। সেই জন্ত বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে হিন্দুরা যে আন্দোলন করিতেছে তাহাতে তাঁহারা যোগদান ত করেনই না, বরং উহাকে মুসলিম স্বার্থের বিরোধী আন্দোলন বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু এই যুক্তি ও অজুহাত নিতান্ত ভুল। অপরের আচরণ দেখিয়া কোন বিষয়ের দোষগুণ নির্দ্ধারিত হয় না; বিষয়টির অন্তর্নিহিত দোষগুণ বিচার করিয়াই তাহা সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এই বাঁটোয়ারাকেও আমরা সেই ভাবে বিচার করিব।

আমাদের মনে হয় হিন্দুদের ন্তায় যদি আমরাও সমভাবে বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করি, এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে কোন একটা মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করি, তবে তাহা দেশের সকলেরই পক্ষে শুভকর হইবে। যেখানে দেশের আপামর সাধারণ হিন্দুর স্বার্থ, সাধারণ মুসলমানের স্বার্থ হইতে একটুও বিভিন্ন নহে, বরং সর্ব্বাংশে এক ও অভিন্ন, সেখানে দুই সম্প্রদায়ের জন্ত দুই রূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। বাঁটোয়ারাকে সমর্থন করিবার সময় আমাদিগকে সব সময় দেখিতে হইবে উহা দেশের সাধারণ স্বার্থের বিরোধী কি না। যদি বিরোধী হয়, তবে সকল অবস্থাতেই তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। এক জনকে একটু প্রলোভন দেখাইলে ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলিয়া অবিবেচকের মত আহ্লাদে আটখানা হইলে চলিবে না।

বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে বলিয়া যাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা কি মনে করেন যে, বাস্তবিকই মুসলিম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অথবা মুসলমানদের উদ্ধারের জন্ত উহা রচিত হইয়াছে? তাঁহারা কি মনে করেন সরকার-বাহাদুর মুসলমানদের এত দরদী বন্ধু যে তাঁহাদের প্রেমে গদগদ হইয়া তাঁহারা এই অপরূপ অমৃত-ভাণ্ডার মুসলমানদিগকে উপহারস্বরূপ দিয়াছেন? যদি তাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তবে তাঁহাদিগকে বাঁটোয়ারার ধারাগুলি পুনরায় দেখিতে অনুরোধ করি। যদি সেগুলি কেহ নিরপেক্ষভাবে দেখেন তবে বুঝিবেন যে, মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্ত উহা রচিত হয় নাই—উহা হইয়াছে সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্ত—সাম্রাজ্যবাদের রথচক্র ঘর্ঘর রবে ভারতের বুকে চালাইবার জন্ত। মুসলিম স্বার্থের সহিত উহার নামগন্ধ সম্বন্ধ নাই। উহা সাম্রাজ্যবাদীদের লৌহ হস্তে ভারতকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিবার উপায়-বিশেষ।

আগামী শাসন-সংস্কারে যাহাতে ব্রিটিশ-স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্ত নানাদিকে আটঘাট বাঁধিয়া এমন কতকগুলি রক্ষাকবচ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যে তাহার চাপে এদেশের কোনও সম্প্রদায়ই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

এই রক্ষাকবচ-কণ্টকিত শাসনতন্ত্রে ভারতীয়গণ স্বেচ্ছামত নিজেদের অভীপ্সিত কোন প্রস্তাবেই বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। লাট সাহেবদের বিশেষ ক্ষমতা, মন্ত্রীদের সঙ্কুচিত ক্ষমতা, নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের অভাব—এইগুলি হইবে নবাগত ব্যবস্থাপক সভার সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়। তা ছাড়া দেশবাসীর নির্ব্বাচিত সদস্যদের সব বিষয়ে কোন ক্ষমতা থাকিবে না,—এমন কতকগুলি বিষয় থাকিবে যাহা তাঁহাদের আলোচনা করিবার কোনই অধিকার থাকিবে না। এই সব বিষয় প্রবাসীতে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এই সব অসুবিধা ও ক্ষমতা-সঙ্কোচে যাহা পরিপূর্ণ তাহা যে পদে পদে দেশবাসীকে পর্য্যুদস্ত করিবে

তাহা কি এখনও কেহ বুঝেন নাই? এইসব ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণ দেশের কল্যাণের জন্ম বিশেষ কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্ষমতা এত সঙ্কুচিত করিয়াও আমাদের কর্ত্তাগণ স্বস্তি পান নাই। তাঁহারা অন্য উপায়েও ব্যবস্থাপক সভার মর্য্যাদা ও সংহতি-শক্তিকে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই উপায় হইতেছে এই বহুনিন্দিত বাঁটোয়ারা। ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যগণ যদি একজোটে কাজ করিবার অবসর পাইতেন, তবে অন্য কিছু না পারিতেন, দেশের অনিষ্টে বাধা দিতে পারিতেন, এবং পুনঃপুনঃ প্রতি বিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দিয়া উহার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রমাণিত করিতে পারিতেন, প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করিয়া দিতে পারিতেন। ইহার পরিণাম সুদূরপ্রসারী হইত। কিন্তু বাঁটোয়ারার জন্য ইহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। কারণ ভারতীয়গণ যাহাতে একজোট হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া বাঁটোয়ারা রচিত হইয়াছে, অন্ততঃ সেইটা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আর যত দিন বাঁটোয়ারা বর্ত্তমান অবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন যে দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবোধ জাগিবে না ইহা সুনিশ্চিত। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কোলাহল লাগিয়াই থাকিবে, মাঝে মাঝে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবে না, তাহাও মনে হয় না। এই ঈর্ষা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিতে পারে না, নানা ভাবে তাহাদের অসুবিধা হইবে, প্রতিশোধমূলক কার্য্যে তাহাদের সময় ও শক্তি অধিক ব্যয়িত হইবে। তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য অধিক ভোট পাইতে হইলে তাহাদিগকে অন্য সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাকিবে না বলিয়া তাহাদের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন না। হয়ত কতকগুলি অসার বিষয়ে অন্যবিধ কারণে ইউরোপীয়ানদের সাহায্য পাইতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রতিদানে তাঁহাদিগকে দেশের স্বার্থ বলি দিতে হইবে।

ইহা সত্য যে বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা সমূহে মুসলমানদের আনুপাতিক সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। আর কেন্দ্রীয় সভায়ও মুসলমানেরা এক-তৃতীয়াংশ আসন পাইবেন। বাংলা ও পঞ্জাবে অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদের জন্য অধিক আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং অন্যান্য প্রদেশে আশানুরূপ 'ওয়েটেজ' সহ আসন পাইয়াছেন। এই দিক দিয়া বাঁটোয়ারার কল্যাণে মুসলমানদের ষোল আনা লাভই হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত লাভ নহে। সাম্রাজ্য-বাদীদের দয়ার দানকে আশার রঙীন চশমা দিয়া দেখিলে কার্য্যক্ষেত্রে হতাশ হইতে হইবে। এই আপাতমধুর সুবিধার মোহে না ভুলিয়া বাঁটোয়ারার অন্য দিকটা একবার দেখিলে সমস্ত আশা ও আনন্দ নিরাশা, হতাশা ও নিরানন্দে পরিণত হইবে। সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, যদি তাহাদের প্রস্তাবিত প্রত্যেক কার্য্য পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণের যদি কোন অধিকার না থাকে, তবে আশানুরূপ অতিরিক্ত আসন লাভ করিয়া তাঁহারা কি কোন কাজ করিতে পারিবেন? আর নূতন ব্যবস্থাপক সভার যে কোনই ক্ষমতা থাকিবে না তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ফাঁকা আওয়াজে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত তথায় বিশেষ কোন কাজ হইবে না। সুতরাং বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে নিজেদের ভারতবাসী হিসাবে নিরাপদ মনে করা নিতান্ত ভুল হইবে। এই প্রলোভনে না ভুলিয়া মুসলমানদের উচিত, প্রকৃত ক্ষমতা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা।

এরূপ ক্ষেত্রে বাঁটোয়ারাকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আমাদের জন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই। কেন প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা আবশ্যক।

পরাধীন দেশের ব্যবস্থাপক সভায়, যেখানে কোনরূপ প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় না, আর যে সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা নানাবিধ আইন দ্বারা কণ্টকিত, সেখানে দুইটি উপায়ে ক্ষমতা প্রসারের অথবা আদায়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, উহাকে সরাসরিভাবে পরিত্যাগ বা বয়কট করা। দেশবাসীকে এমন ভাবে একত্র করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে উহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে ঘৃণা বোধ করে। শাসনকর্ত্তাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁহাদেরকেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যদি কেহই উহা স্পর্শ না করে তবে সরকার তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর দাবী অনুযায়ী শাসন-সংস্কার দিতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, ব্যবস্থাপক

সভায় প্রবেশ করিয়া নানা উপায়ে উাহাকে অচল করিয়া তুলিতে হইবে, যেমন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রথম পন্থাটা অবলম্বন করা হয়ত সম্ভবপর হইবে না। যদিও আমাদের মতে তাহাই উচিত ছিল, কিন্তু তদভাবে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন আত্মমর্য্যাদাশীল ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। এই সব উপায় ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে আসন্ন শাসন সংস্কারের অকর্ম্মণ্যতার বিষয় দেশবাসীর নিকট প্রকট করিতে পারিব না। সমগ্র ভারতবাসী একত্র হইয়া একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে যে এই পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ ভাল করিয়াই জানেন। তাহা যাহাতে সম্ভব না হয় এই জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রচনা করিয়াছেন। মুসলমানদের প্রতি দরদের জন্য নহে, তাহাদের দ্বারা কাজ হাসিল করিবার জন্যই তাঁহারা তাহাদের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেছেন। তাঁহারা জানেন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের সম্যক স্ফুরণ হয় নাই। পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে ইহাদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে তাহাতে সরকার পক্ষেরই লাভ হইবে, এ-কথা বিগত দ্বৈত-শাসনের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন। তাই এই নূতন শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ করিবার সময় তাঁহারা মুসলমানগণকে অধিক আসনের লোভ দেখাইয়া এমন ভাবে এই বহুনিন্দিত বাঁটোয়ারাটি রচনা করিলেন যাহাতে উপরিউক্ত দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা কোনও মতে সম্ভব না হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া নির্ব্বাচকগণ কোন মহান আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না। রাজনীতিতে অনগ্রসর সরকারপন্থী বহু ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়া যাইবেন। আর তাঁহারা তখন সমাজ ও স্বদেশ ভুলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের অনগ্রসর মতের লোকের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় এমন একটা দল গঠন করিবেন, যাহা সরকারী 'ব্লকে'রই অনুরূপ হইবে। যে রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদিগকে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিবে, বাঁটোয়ারা ব্যাপারে তাহার জন্য আন্দোলন করাও সম্ভব হইবে না। এই ভাবে মুসলমানদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্বার্থ পদে পদে ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ হইতে থাকিবে।

তার পর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে অধিকার করিয়া সচল করিলে কিছু উপকার পাওয়া যাইবে, তাহা হইলেও বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার বিশেষ কোন আশা নাই। কারণ অপরের সদিচ্ছা ব্যতীত কেবল মুসলমানদের সাহায্যে তাহা সম্ভব নহে; আর বাঁটোয়ারা থাকিতে সে লাভের সদিচ্ছা আশা বাতুলতা মাত্র। যাহা মুসলমানদের প্রকৃত ও মূল স্বার্থ তাহা ভারতীয় অমুসলমানের বিশেষতঃ হিন্দুদের স্বার্থ হইতে একটুও বিভিন্ন নহে। মুসলমানদের আধিক্য না হইলেও সে-স্বার্থগুলি হিন্দুদের সাহায্যে সংরক্ষিত হইবে, কারণ সে-সকল বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ সমভাবে জড়িত। তাহার জন্য বাঁটোয়ারার মত সর্ব্বনাশকর ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।

সাধারণ মুসলমানদের নিকট একটা কথা বিনয়ের সহিত নিবেদন করি। বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে তাঁহারা অধিক সংখ্যক আসন পাইবেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন এগুলি কোন্ শ্রেণীর মুসলমানদের কবলিত হইবে? ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আমাদের নেতাদের উৎকট সাম্প্রদায়িকতার জন্য সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রচার হয় নাই, এবং সমাজ কোনরূপ উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। আসন্ন নির্ব্বাচনের সময় নবাব, সুবা, জমিদার ও হোমরা-চোমরাদের প্রভাব কি এ-সমাজ সহজে পরিহার করিতে পারিবে? বহু যুগ পরে হয়ত পারিবে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব হইবে না। আর অত দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে কি সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইবে না? শুধু মুসলমানদের বেলায় নহে, বাঁটোয়ারার জন্য সাধারণ হিন্দুরাও অবাঞ্ছিতদের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবে না। কিন্তু মিশ্র নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সমবেত চেষ্টায় নিজেদের মনোনীত প্রার্থী নির্ব্বাচিত করিতে পারিত, কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন থাকাতে সাধারণের একত্র যোগ হওয়া সম্ভবপর হইবে না। সকল সম্প্রদায়ের জমিদার শ্রেণীর লোক অল্প

বাধায় বা বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়া যাইবে। ইহারা হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক, ব্যবস্থাপক সভায় ইহাঁদের সংখ্যাধিক্যের অর্থই হইতেছে সাধারণ প্রজাদের সমূহ ক্ষতি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশকর। মুসলমানদের ক্ষতি হিন্দুদের অপেক্ষা মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ কংগ্রেসের প্রভাবে অনেক প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার পরাভূত হইবেন, আর কংগ্রেস যাহাই করুক, দরিদ্র প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যাহারা জমিদার শ্রেণীভুক্ত তাহারা সমাজের ধর্ম্মান্ধতার সুযোগ লইয়া নিজেদের দল ভারী করিবে, চাকরির প্রলোভন দেখাইয়া সমাজকে বৃহত্তম কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবে, কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের কোনই উপকারে আসিবে না। হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর প্রজাদের এক হওয়া চাই। কিন্তু বাঁটোয়ারার অভিশাপে তাহা হইবে না। প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, দেশে মুসলিম স্বার্থ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই—দেশবাসীর সাধারণ স্বার্থই এক মাত্র সার বস্তু যাহার জন্য সকলকে এক সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। স্বরাজ আসিবে একটা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া; বহু লোকের মিলন ও সংহতি হইতে। কিন্তু বাঁটোয়ারার উপর নির্ভর করিলে অথবা তাহাকে অপরিবর্ত্তিত থাকিতে দিলে বহু লোকের একত্র মিলন সম্ভব হইবে না—ইহাতে সাধারণ মুসলমানের ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইবে। আজ মুসলিম স্বার্থের চাঁই সাজিয়া যাঁহারা সমাজে নেতৃত্ব করিতেছেন তাঁহারা কে ও কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা কি সাধারণ মুসলমান এখনও বুঝে নাই? ভারতে ব্রিটিশ বণিকদের যাহারা পৃষ্ঠপোষক, সরকারের চণ্ডনীতির যাহারা সমর্থক মুসলিম স্বার্থের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ? কোন প্রকার মুসলিম স্বার্থ তাহাদের হস্তে নিরাপদ নহে; অথচ বাঁটোয়ারার জন্য তাহাদের পরিহার করিবার উপায় নাই।

বাঁটোয়ারার সবচেয়ে অনিষ্টকর অংশ হইতেছে ইউরোপীয়ানদিগকে অত্যধিক আসন দেওয়া। বলিতে গেলে ইউরোপীয়ানরা এদেশের কেহই নহে, এদেশের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সহিত তাহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা এদেশের অর্থ শোষণই তাহাদের প্রধান কাজ, আর সেই জন্য তাহারা এদেশের বুকে বৈদেশিক প্রভুত্ব চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপক সভায় ইহাদের প্রাধান্যের অর্থই হইতেছে ইহাদের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিতে সাহায্য করা। অন্য কোন কারণে না হউক, এই একমাত্র কারণে বাঁটোয়ারাকে সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল, অথচ এদিকে আমাদের নেতাদের কোনই দৃষ্টি নাই। নিজেদের জন্য কতকগুলি অধিক আসন পাইয়াই তাঁহারা ইহার অন্তর্নিহিত মূল ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করিতে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুরা বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করিলেই তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, মনে করেন মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাহারা এইরূপ করিতেছে। কিন্তু যাহাতে ইউরোপীয়ানদিগকে অতিরিক্ত আসন দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ কি মুসলমানদের নাই? নিজেদের জন্য কয়েকটি আসনের লোভে তাঁহারা যদি কোন উচ্চবাচ্য না করেন তবে বুঝিব, দেশের প্রতি মমত্ববোধ তাঁহাদের কাহারও নাই, রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও তাঁহাদের নাই। বস্তুত, ইউরোপীয়ানদিগকে যে-অনুপাতে আসন দেওয়া হইয়াছে ভারতের কাহাকেও তাহা দেওয়া হয় নাই। বাঁটোয়ারার দ্বারা যদি কেহ ষোল আনা লাভবান হইয়া থাকে তবে তাহা ইউরোপীয়গণ। এই অত্যধিক আসনের ফলে বাংলায় ইহারাই হইবে সমস্ত ক্ষমতার পরিচালক ও নিয়ামক। সরকারের স্থলে দেশের উপর বিশেষতঃ নির্ব্বাচিত সদস্যদের উপর তাহারাই করিবে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। কখনও মুসলমানকে দলে টানিয়া হিন্দুদের বিরোধিতা করিবে, আবার কখনও হিন্দুদিগকে পক্ষপুটে লইয়া মুসলমানদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবে। এই জন্য মুসলমানদের কি মূল স্বার্থ, কি বিশেষ স্বার্থ, সবই প্রতিপদে ব্যাহত হইতে থাকিবে। মন্ত্রীত্বের স্থায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করিবে এই ইউরোপীয়ানদের দয়ার উপর। ব্যবস্থাপক সভায় যত দিন ইউরোপীয়ানদের প্রাধান্য থাকিবে, তত দিন কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই দেশের জন্য কল্যাণকর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। ইউরোপীয়গণ ব্যতীত, আরও যে-সকল বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলির প্রভাবেও মুসলমানদের স্বার্থ প্রতি ক্ষেত্রেই বিপন্ন হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

আর এই সব বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্ম আমাদের অবিবেচক নেতারাই অধিকাংশ স্থলে দায়ী। তাঁহাদের যদি একটুও দূরদর্শিতা থাকিত তবে তাঁহারা কিছুতেই ভারতবাসীকে এই ভাবে ছিন্নভিন্ন হইতে দিতেন না। কিন্তু আপাতরম্য সুখের লোভে তাঁহারা এসব বিষয়ের প্রতি একটুও লক্ষ্য রাখেন নাই। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে চৌদ্দ দফার দাবী মিটাইতে গেলে ব্রিটিশ সরকার আরও নানাবিধ বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলী সৃষ্টি না করিয়া ছাড়িবেন না, তখনই তাঁহাদের সকল দাবী পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া অবাধ যুক্ত নির্ব্বাচনের দাবী করিতে হইত—যেন কোথাও কাহারও জন্ম কোনরূপ বিশেষ স্বার্থ আইনতঃ স্বীকৃত না হইতে পায়। ইহাতে মুসলমানদের লাভ কোনও অংশেই কম হইত না। কিন্তু তাঁহাদের অদূরদর্শিতার ফলে আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত আসন পাইয়াও তাঁহারা সমাজের জন্ম বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না।

বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে যে, উহার দ্বারা ভারতের কোন সম্প্রদায়ই উপকৃত হইবে না। যে সম্প্রদায় উপকৃত হইবে, তাহারা হইতেছে অ-ভারতীয় ও ভারতের স্বার্থবিরোধী ইউরোপীয়গণ। সমগ্র ভারতবাসী এক দলভুক্ত, তাহাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন, এই মূল বিষয়টি বাঁটোয়ারা স্বীকার করে নাই।

বাংলার মুসলমানদের সম্মুখে এই সকল কথা পেশ করিলাম, যেন তাঁহারা আবার এ-বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া উহার দোষ-গুণ বিচার করিয়া দেখেন। স্বাধীনভাবে এবং অপরের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাঁহারা বাঁটোয়ারার অসারতা ও অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিবেন এবং উহাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত হইবেন।

বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে হিন্দু স্বার্থ সম্পর্কে বারান্তরে বলিবার বাসনা রহিল।

তুমি

"বনফুল"

প্রথম সে যৌবনের স্বপ্নময় লোকে
একদা দেখিয়াছিনু কল্পনা-আলোকে
গুণ্ঠিতা তরুণী এক মানস-হারিণী
মুখ ছিল ঢাকা তার চিনিতে পারি নি।

সহসা আজি সে নারী মুখ খুলিয়াছে
রহস্য-গুণ্ঠনখানি ধীরে তুলিয়াছে
আলোক পড়েছে তার সর্ব্ব অঙ্গ চুমি
দেখিতেছি সবিস্ময়ে—এ কি এ যে তুমি!
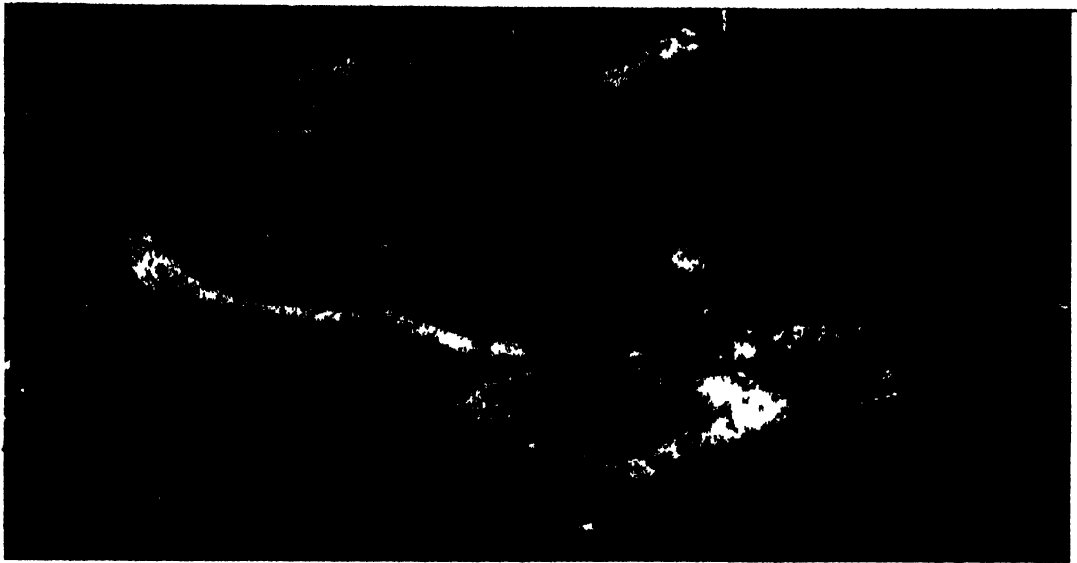
বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বন-চাতকী আর আঁখিজল পাশাপাশি গ্রাম। আমাদের গ্রামের নাম বাবুইডাঙ্গা—তরঙ্গী নদীর অপর পারে। আমরা বাবুইডাঙ্গা হইতে আঁখিজলের জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের বাড়ী বরযাত্রী আসিয়াছিলাম তরঙ্গী পার হইয়া এবং উভয় গ্রামের মধ্যে দূরত্ব প্রায় দশ মাইলেরও সামান্ত ঊর্দ্ধে হইবে বলিয়া ধারণা হয়। বয়স আমার তখন অল্পই—স্কুলে পড়ি, অবশ্য স্কুলে পড়ার বয়সও সেটা ঠিক নয়, আর একটু উচ্চ স্থানে কোথাও পড়িলেই ভাল হইত। কিন্তু গান-বাজনা আমাকে কেমন পাইয়া বসিয়াছিল, কাজেই পড়াশুনার দিকটায় তেমন নজর দিতে পারি নাই। গ্রামে আমার গান-বাজনায় বেশ একটু সুনাম হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, গ্রামের কোন ছেলের যদি অন্তত্র কোথাও বিবাহ হইত ত বরযাত্রী আর কেহ না গেলেও আমাকে যাইতেই হইত। আঁখিজলের জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের বাড়ী না যাইবই বা কেন, আর এ বৃহৎ ব্যাপারে গ্রামের লোকেরাই বা আমাকে ছাড়িবে কেন। কাজেই গিয়াছিলাম।

তখনও শীত ঠিক পড়ে নাই, পড়ার আয়োজন চলিতেছিল। সন্ধ্যার সামান্ত পূর্ব্বেই আমরা আঁখিজলের জমিদার-ভবনে আসিয়া পৌছিলাম। আদর-অভ্যর্থনার ঘটা পড়িয়া গেল। কোন ত্রুটি কিছুতেই দেখিলাম না। মনে হইল, এক রাত্রির জন্ত যেন আমরা আঁখিজলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব চালাইতে আসিয়াছি।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের বহির্ব্বাটীর বৃহৎ আটচালায় আমাদের জন্ত বিরাট্ ফরাশ বিছাইয়া আসর করা হইয়াছিল, তাকিয়ায় তাকিয়ায় ফরাশ ছাইয়া ছিল, আশে-পাশে ছয় সাতটি গড়গড়া প্রস্তুত ছিল এবং চার পাঁচটি রূপার রেকাবীতে পান, জরদা, চূণ ও মশলা সাজান ছিল। ফরাশের একপাশে দেখিলাম, একটা হারমোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা বসান রহিয়াছে। আয়োজন দেখিয়া খুশী হইলাম।

যথাকালে হারমোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা আসরের মাঝে আসিয়া গেল এবং আমাকেও তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে হইল, তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া আরাম উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া। যথারীতি প্রথম একটু না না করিয়া হারমোনিয়ম ধরিলাম। অমনি কথা উঠিল তবলচীর; কে যে আমার সঙ্গে তবলা বাজাইবে তাহারই ভাবনা দেখা দিল। কেহ আর সাহস করে না। আমাদের মধ্যে এমন উপযুক্ত কেহই ছিল না।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কেমন একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, তাই ত! শ্রীমন্ত পৈলান এসে পৌছে গেলে বড় যে ভাল হ'ত! আপনাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আপাততঃ কাজ চালিয়ে নেয়?

কাজ চালাইয়া লইবার মত লোকও আমাদের মধ্যে ছিল না। আর যাহাকে দিয়া চলিলেও চলিতে পারিত, সে শ্রীমন্ত পৈলানের নাম শুনিয়াই কেমন যেন হইয়া গেল, তাহাকে কিছুতেই আর রাজী করানো গেল না। শুনিয়াছি এদিককার মধ্যে বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান এক জন বিখ্যাত তবলচী, কিন্তু কখনও তাহাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আজ দেখিতে পাইব ভাবিয়া খুশী হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে আমাকেই গান গাহিতে হইবে তাহা ভাবিয়া রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। না জানি, সভামধ্যে আমাকে আজ দ্রৌপদীর মত লজ্জায় পড়িতে হয়, ভয়ে তাই লজ্জাহারী মধুসূদনের নামই মনে মনে জপিলাম।

শেষ পর্য্যন্ত জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে স্বয়ং বাড়ীর ভিতর হইতে প্রায় আমারই সমবয়সী একটি ছেলেকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। ছেলেটিকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সে বাড়ীর ভিতরে কি যেন কাজে ব্যস্ত ছিল, আর সেই অবস্থাতেই তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। ছেলেটি

আসরে আসিয়া যেন মহা লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে! কোন রকমে মালকোছা খুলিয়া দাঁড়াইল। আর জমিদার শম্ভু মুখুজ্যেও তাহাকে আসরে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, নইলে গান সুরু হ'তে পারছে না দীপু, কিছুক্ষণ চালা, শ্রীমন্ত হয়ত এরই মধ্যে এসে যাবে।

দীপু ওরফে দীপক তখন বলিল, ভাল জ্বালাতনে ফেললেন আপনি মেসোমশাই, তবলা কি আমি বাজাতে জানি, না ছাই! এজন্যে আসতে হবে জানলে একটা কিছু গায়ে দিয়েই না-হয় আসতাম। যাই, বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কিছু গায়ে দিয়েই আসি।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, লোক পাঠিয়ে আমি তা আনিয়ে দিচ্ছি, তুই বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে ব'স ত।

দীপক তাহাতে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিল, হ্যাঁ, বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে বসি, আর শ্রীমন্ত পৈলান এসে তাই দেখুক!

সকলের একান্ত অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত দীপক নিজের কাছেই বাঁয়া-তবলা টানিয়া নিয়া বসিল।

দুই জনের বয়স প্রায় সমান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বনিবনা হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইল না। একটা সহজ বনিবনা করিয়া লইয়া গান ধরিলাম,—

জাগো ফুলদল রজনী উতল
পদধ্বনি মোর শুনি।—

দেখিতে দেখিতে গান বেশ জমিয়া উঠিল। দীপক সঙ্গে চমৎকার তবলা বাজাইয়া চলিয়াছিল। আমি নিজে কোন অসুবিধা বোধ করিতেছিলাম না। দীপকের লজ্জাও ক্রমে কাটিয়া আসিল, সে সহজ ভাবেই বাজাইতে লাগিল। দ্বিতীয় গান সুরু করার আগেই আসরের এক পাশ হইতে আখিজলের লোকের মন্তব্য শুনিলাম, ছেলেটি খাসা গায় ত! অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া সগর্ব্বে দ্বিতীয় গান ধরিলাম। কিন্তু এক চরণ গাহিয়া শেষ করিতেই সহসা আসরের চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বুঝিলাম, শ্রীমন্ত পৈলান আসিয়া গিয়াছে। সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপক হঠাৎ বাঁয়া-তবলা ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া এক লাফে আসরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। আমিও বাধ্য হইয়া গান বন্ধ করিলাম।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে স্বয়ং বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানকে এক প্রকার জড়াইয়া ধরিয়া আসরে লইয়া আসিলেন এবং তাহাদের পিছনে একটি চাকরের হাতে দেখিলাম, এক-জোড়া বাঁয়া-তবলা। দেখিয়াই বুঝিলাম, নিশ্চয়, ইহা শ্রীমন্ত পৈলানের নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে যায়—সঙ্গে লইয়া যায়।

মুহূর্ত্তে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম একবার বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানকে। তবল্‌চীর উপযুক্ত চেহারাই বটে! সারা দেহে মাংসের কোন বালাই নাই, হাড়-সর্ব্বস্ব। চোখ-মুখের ভাব কেমন যেন তিরিক্ষি ও রুক্ষ, মাথার দুই পাশে বেশ টাক পড়িয়াছে, তাহাতে আবার পাতলা চুল ও পিছনের দিক্ খানিকটা তুলিয়া ঘাড়-কামানোগোছ করিয়া রাখিয়াছে। আসরের সকলের প্রতি একটা চোখ যেন একটু কুঁচকাইয়া চাহিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয়, লোকটা যেন কাহারও প্রতি খুশী নয়।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে সযত্নে শ্রীমন্ত পৈলানকে আসরে স্থান করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন, এসে আমার মুখ রক্ষে করেছ শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত পৈলান আসরের চতুর্দ্দিকে একবার ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আমাদের বাঁড়ুজ্যে-মশাই কই? তাঁকে যে দেখছি না?

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে বলিলেন, বাঁড়ুজ্যে-মশাইয়ের হঠাৎ দু-দিন ধ'রে জ্বর, আজ আবার জ্বরটা বেড়েছে একটু, তাই আসতে পারেন নি। তবে ব'লে পাঠিয়েছেন, 'শ্রীমন্ত পৈলান এসে গেলে আমাকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়'। তা খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, তা হ'লে খবর পাঠান ত ঠিক হয় নি। ঐ জ্বর নিয়েই না আবার এসে হাজির হন। গুণী লোক, ওঁদের কি বিশ্বাস করতে আছে মুখুজ্যে মশাই!

তার পরে সহসা আমার দিকে ফিরিয়া শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, বাইরে থেকেই একটা টান শুনলাম বটে, বেশ মিষ্টি গলাই ত! সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছিলেন বুঝি দীপকবাবু, তিনি গেলেন কোথায়?

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে বলিলেন, সে কি আর থাকে, পালিয়েছে কোথাও নিশ্চয়।

শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, আমাকে ওনার বড় ভয়, কিন্তু

কালে উনি এক জন গুণীলোক হবেন, এখনই বেশ হাত-টাত চলে দেখতে পাই। তবে সাধনা চাই, এক-আধ দিনে কি আর হবার জিনিষ এসব। তাঁর দয়া আর সাধনা এক ঠাঁই হ'লেই তবে হবে। নইলে এ জিনিষ হবার নয়। কি বলেন মুখুজ্যে-মশাই ?

তা বইকি!—বলিয়াই জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে আসরের সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই হ'ল আমাদের বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান, আমাদের এদিককার গৌরব একটা। আপনাদের যে আজকে ওঁর তবলা শোনাতে পারব সে আমার মস্ত সৌভাগ্যের কথা।

শ্রীমন্ত পৈলান সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, কথাটা নেহাৎ অন্যায় কিছু বলেন নি মুখুজ্যে-মশাই। তা বলুক দেখি লোকে যে, শ্রীমন্ত পৈলান কখনও কারও বাড়ী গেছে তবলা শোনাতে। সে পাত্তরই আমি নই। যার শোনবার গরজ থাকবে সে বন-চাতকী গিয়ে শ্রীমন্ত পৈলানের কুঁড়েতে ব'সেই শুনে আসতে পারবে। কিন্তু আঁখিজলের মুখুজ্যে-বাড়ী আমার না এসে উপায় নেই, আপনি আমাকে কিনে নিয়েছেন একেবারে মুখুজ্যে-মশাই।

এমন সময় সর্ব্বাঙ্গে একখানি বালাপোষ জড়াইয়া নন্দ বাঁড়ুয্যে সেখানে উপস্থিত। জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে তাহা দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, এই ভীষণ জ্বর নিয়ে এসে হাজির হ'লেন যে বড়! এমন জানলে ত আপনাকে খবরই পাঠাতাম না।

নন্দ বাঁড়ুজ্যে আসরে শ্রীমন্ত পৈলানের কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, না, সামান্যই জ্বর, মাত্র এক-শ তিন। ভায়া এসে গেছে শুনে না এসে আর থাকতে পারলাম না।

তার পরে শ্রীমন্ত পৈলানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এসে ভালই করেছ ভায়া। আমারও জ্বর, তুমিও আসবে না, তাহ'লে মুখুজ্যে আমাদের বাড়ীতে দশ জন ভদ্রলোক এনে তাঁদের আপ্যায়িত করে কি দিয়ে। তুমি এসে যাওয়ায় গাঁয়ের আমাদের তবু মান থাকল ভদ্রলোকদের কাছে। এইবার বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে বসো। দেখি, কতক্ষণ থাকতে পারি। ম্যালেরিয়ায় এবার বড় কাবু ক'রে ছেড়েছে হে! তোমার ওখানে যাব যাব ক'রে তাই আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। রোজ জ্বরের ঘোরে তবু যেন কানে ভেসে এসেছে বন-চাতকীর দিক থেকে তোমার তবলার আওয়াজ। তাই মুখুজ্যেকে খবর দিতে ব'লে রেখেছিলাম। না এসেও তাই পারলাম না।

নন্দ বাঁড়ুজ্যের কণ্ঠস্বরে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা সহজেই ধরা পড়িতেছিল, লোকটা যেন জ্বরের যাতনায় কথা কহিতেছিল।

শ্রীমন্ত পৈলান গলায় জড়াইয়া রাখা ভাঁজ-করা পুরাতন এণ্ডির চাদরটি গলা হইতে খুলিয়া লইয়া তাহা বৃত্তাকারে পাকাইয়া ফরাশের উপর বসাইয়া তাহারই উপর তবলা বসানোর আয়োজন করিয়া কেপ্-কলারের শার্টের পকেট হইতে একটা ছোট তবলা-পেটা হাতুড়ি বাহির করিয়া কোনদিকে না চাহিয়াই বলিল, বাঁড়ুজ্যে মশাই, তানপুরোটা সঙ্গে নিয়ে যদি আসতেন ত ভদ্রলোকদের আপ্যায়িত ক'রে সুখ হ'ত।

নন্দ বাঁড়ুজ্যে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, ইচ্ছে কি আর না ছিল পৈলান, কিন্তু সামর্থ্যে যে কুলোবে না। আচ্ছা, চলুক ত ততক্ষণ। নেহাৎ যদি না চলে ত তানপুরোটা আনিয়ে নিলেই চলবে।

তা বেশ কথা।—বলিয়া শ্রীমন্ত পৈলান বাঁ-হাতের আঙুল দিয়া আমাকে হারমোনিয়মের একটা রীড টিপিয়া ধরিয়া থাকিতে বলিয়া হাতুড়ি দিয়া তবলার সুর বাঁধিতে সুরু করিল। শ্রীমন্ত পৈলানের তবলায় সুর বাঁধা একটা দেখিবার জিনিষ। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সে যেন সজাগ রাখিয়া সুর বাঁধিতে লাগিল। আমার যে-হাতের আঙুল দিয়া আমি রীড চাপিয়া বসিয়া ছিলাম সে-হাত আমার রীতিমত কাঁপিতেছিল এবং ক্রমেই যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। ভয়ে মনে হইতেছিল, কণ্ঠ দিয়া আর হয়ত আজ স্বর বাহির হইবে না। একটা কেলেঙ্কারী করিয়া যে আঁখিজল হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইবে সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম। মান-সম্ভ্রম বুঝি আর বাঁচিল না।

আসরের লোকজন যখন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন শ্রীমন্ত পৈলানের তবলা ঠিক সুরে বাঁধা হইল। তার পরে নিজের দুই উচ্ছ্রিত জানুর পরে নিশ্চিন্ত নির্ভরে হাত দুইটি ন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নিস্পৃহভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল,

এইবার তবে সুরু হোক। কিন্তু ইনি যে নিতান্ত ছেলে-মানুষ, আপনাদের বয়স্থ আর কেউ নেই বুঝি? ... আর সত্যিই ত, গুণীলোক ছুনিয়ায় দুর্লভ। তা চলুক তবে। বলিয়া শ্রীমন্ত পৈলান এমনভাবে আমার মুখের দিকে চাইল যে, যেটুকু দুঃসাহস অন্তরে তখনও বাঁচিয়া ছিল তাহাও নিঃশেষে মরিয়া গেল। হাত-পা যেন আমার কাঠ হইয়া আসিল।

আমিও গান সুরু করিলাম, শ্রীমন্ত পৈলানও ভ্রুকুটি করিল। অপাঙ্গে তাহা লক্ষ্য করিলাম। লক্ষ্য করিয়াই আরও যেন কেমন হইয়া গেলাম। শেষে, কি যে গাহিয়া চলিয়াছিলাম তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীমন্ত পৈলান হাত তুলিয়াই বসিয়া রহিল, বাঁয়া-তবলায় হাত ছোঁয়াইল না।

হঠাৎ বাড়ুজ্যে মশাই বলিলেন, ছেলেটির গলা ভাল। পৈলান, ঐতেই কোন রকমে চালিয়ে নিয়ে চল। সাধনা আর ক'জনার থাকে। কালে ছেলেটি দাঁড়াতে পারবে।

শ্রীমন্ত পৈলান একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গিয়া হঠাৎ যেন বাঁয়া-তবলার উপর একসঙ্গে হাত রাখিল। আমি নিজেকে তাহাতে যেন আরও দুর্ব্বল, আরও নিঃস্ব মনে করিলাম। তার পরে ঠিক কি যে ঘটিল তাহা আর মনে নাই। তবে বুঝিলাম, গানটি আমাকে শেষ পর্য্যন্ত আর গাহিতে হয় নাই। দেখিলাম, শ্রীমন্ত পৈলান অন্য দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া বসিয়াছে, আর নন্দ বাঁড়ুজ্যে অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে একটি ছেলেকে বলিতেছেন, যা যা, ছুটে যা বাবা অনাদি, আমার তানপুরোটা নিয়ে আসগে যা, নইলে মুখুজ্যের আমাদের আর মানটান থাকে না আর পৈলানেরই বা মর্য্যাদা রক্ষা হয় কেমন ক'রে।

অনাদি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

আমি অগত্যা হারমোনিয়ম ছাড়িয়া আসরের এক পাশে গিয়া বসিলাম। অপমানের চরম যে আমার হইয়াছে সে বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম। শ্রীমন্ত পৈলানের উপর আক্রোশে তাই সমস্ত শরীর আমার জলিতেছিল। মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিয়া সহানুভূতি যে প্রত্যাশা করিব সে সাহসও আর হইতেছিল না।

অনাদি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে তানপুরা আসিল। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, শ্রীমন্ত পৈলান আবার ঘুরিয়া বসিয়াছে। নন্দ বাঁড়ুজ্যে তানপুরায় সুর বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন।

শ্রীমন্ত পৈলান সহসা বলিল, আহা, ছেলেটি বুঝি পালালো? সামান্যই ওর বয়েস, তাল-মান রেখে গাওয়া কি চারটিখানি কথা, কিন্তু গলাটি ওর বেশ। আহা! ছেলেটিকে ডাকুন, হারমোনিয়মে সুর দিয়ে যাক শুধু। এমনি করেই একদিন হবে।

সকলের অনুরোধে আবার আসিয়া হারমোনিয়ম লইয়া বসিলাম। শ্রীমন্ত পৈলান একটা রীডে আঙুল দেখাইয়া সুর দিয়া যাইতে বলিল। যন্ত্রচালিতের মত সুর দিয়াই চলিলাম। তার পরে আধ ঘণ্টারও উপরে চলিল সুর-বাঁধাবাঁধি। বাঁয়া-তবলায় সুর লাগে ত তানপুরায় সুর লাগে না, আবার তানপুরায় সুর লাগে ত বাঁয়া-তবলায় লাগে না। সে যেন দেবাসুরে মিলিয়া সুর-সমুদ্র মন্থন সুরু হইল, অমৃত গরল দুই-ই তাহাতে উঠিয়া আসিল।

তার পরে যখন নন্দ বাঁড়ুজ্যে স্বরগ্রাম সাধিতে সুরু করিলেন তখন তাহার অঙ্গের বালাপোষ ফরাশে নামিয়া আসিল, আর শ্রীমন্ত পৈলানের সর্ব্বাঙ্গে, চোখে-মুখে, এমন কি শিরা-উপশিরাতেও যেন একটা অমানবীয় আসুরিক উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। আজ একটা যেন প্রলয় ঘটিবে এমনই উভয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা। অতি ভয়ে ভয়ে আমি রীড চাপিয়া বসিয়া ছিলাম।

তার পরে ঝঙ্কার আর ঝঙ্কার! থাকিয়া থাকিয়া সারা-দেহময় সুর-শিহরণ অনুভব করিতেছিলাম।

ধন্য শ্রীমন্ত পৈলান! বাঁয়া-তবলা যেন কথা কহিয়া চলিয়াছে, সুরে সুরে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। লজ্জা অপমান মুহূর্ত্তে কোথায় যে আমার ভাসিয়া গেল তাহা আর ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল আজীবন যেন বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানের দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি।

নন্দ বাঁড়ুজ্যে এক জন গুণী লোক বটে! তখন গাহিয়া চলিয়াছিলেন,—

নৃমুণ্ডে তোরে মানাত না মা,
মহেশ যদি না থাকিত রাঙ্গা দুটি পায়ের তলে ;
সে কথা কি ভাবিস্ কালী—শ্মশান-পাষাণী !

সে গান যেন আর থামিতে চাহে না, সুরে সুরে সে যেন ইন্দ্রজাল রচিত হইয়া গেল। সমস্ত অন্তর আমার পরিতৃপ্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যেন কাঁপিতে লাগিল।

গান যখন থামিল তখন আসরের সকলেই বিস্ময়-স্তম্ভিত, কথা বলিয়া কেহ আর আনন্দ প্রকাশের ঔদ্ধত্য জানাইতে সাহসী হইল না।

নন্দ বাঁড়ুজ্যে সহসা বালাপোষ আবার অঙ্গে টানিয়া জড়াইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, শক্তিতে আর দিচ্ছে না পৈলান, আজকের মত উঠি। জ্বর বোধ হয় বেড়েই গেল। তোমার মত গুণী লোককে যদি বা পেলাম ত আপশোষ মিটিয়ে গাইতে পারলাম না।

তার পরে অনাদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ধর ত বাবা অনাদি, একটা হাত ধ'রে তুলে ধর দিকি, গায়ে আর জোর পাচ্ছি নে।

অনাদি এবং দীপক একসঙ্গেই আসিয়া নন্দ বাঁড়ুজ্যেকে ধরিতে গেল। বাঁড়ুজ্যে-মশাই দীপকের হাতে তানপুরাটা দিয়া অনাদির হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বাঁড়ুজ্যে-মশাইকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, আসুন তবে বাঁড়ুজ্যে-মশাই, আমিও ওঠার জোগাড় দেখি। কাজের বাড়ী, মুখুজ্যে-মশাই আবার গেলেন কোথায় কে জানে।

বাঁড়ুজ্যে-মশাই চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই ঠিক বাড়ীর ভিতর হইতে খবর আসিল, বিবাহের আয়োজন সব ঠিক, লগ্নও সমাগত। বিবাহের আসরে আমাদের সবার উপস্থিতির জন্য আহ্বান লইয়া লোক আসিল।

একে একে সকলেই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। আসরে শুধু রহিলাম আমি আর বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান। শ্রীমন্ত পৈলানের মত এতবড় গুণী আর কোথাও কখনও দেখিতে পাইব কিনা জানি না। তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে কেন জানি ভাল লাগিল না।

আশ্চর্য্য! শ্রীমন্ত পৈলান গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। একটা কথাও কহিল না। আমিও কোন কথা কহিয়া তাহার নীরবতা ভাঙিয়া দিতে সাহসী হইলাম না।

অনেক রাত হইয়া গেল; তবু সেখান হইতে আমি না পারিলাম উঠিয়া যাইতে, না পারিলাম শ্রীমন্ত পৈলানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে।

তার পরে জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন এবং শ্রীমন্ত পৈলানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীমন্ত, লোকজন সব কাজে ব্যস্ত, একটা লোক পাচ্ছিলাম না যে তোমার সঙ্গে পাঠাই। আহারাদি ত কোথাও করবে না যখন, তখন আর তোমার দেরি করিয়ে দিয়ে লাভ নেই।

পরে চাকরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, একটা লণ্ঠন সঙ্গে নিয়ে পৈলানকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।

শ্রীমন্ত পৈলান চলিয়া গেল। জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে খানিকটা পথ তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিলেন। আমি এতক্ষণ যে অকারণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়াছিলাম সেজন্য মনে মনে দুঃখই হইল। জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানকে পথে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি যে এখানে একা একা ব'সে আছেন, ভেতরে চলুন।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের সঙ্গে বিবাহের আসরে সমাগত বরযাত্রীদের মধ্যে গিয়া বসিলাম। কিন্তু মন আমার শ্রীমন্ত পৈলানের কথাই ভাবিতে লাগিল। লোকটা অদ্ভুত সন্দেহ নাই, কিন্তু অসাধারণ একজন গুণীও যে সে-কথাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আঁখিজল হইতে বাবুইডাঙা ফিরিয়া আসিয়া কিছুতেই আর কোন জিনিষে মন দিতে পারিতেছিলাম না। বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান যেন আমাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। শ্রীমন্ত পৈলানের কাছে বাঁয়া-তবলা আমাকে শিখিতেই হইবে। আর তাহা যদি না শিখিতে পারি ত গান-বাজনা শেখার কোন মানেই হয় না। অত বড় এক জন গুণীর সামান্য অনুগ্রহ পাইলেও জীবন আমার ধন্য হইয়া যাইবে। অষ্টপ্রহর সেই ভাবনাই আমাকে কেমন পাইয়া বসিল।

শেষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন বন-চাতকীর

উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পড়িলাম। স্থির করিলাম, সমস্ত কিছুর বিনিময়ে শ্রীমন্ত শৈলানের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব।

মধ্যাহ্নে বন-চাতকী আসিয়া পৌছিলাম। কি জানি, বুক আমার কেন জানি শঙ্কায় কাঁপিতেছিল। হয়ত শ্রীমন্ত পৈলান রূঢ় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আমার ইচ্ছায় বাদ সাধিবে। কিন্তু অবজ্ঞা অপমান কিছুই গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে শ্রীমন্ত পৈলানের পা জড়াইয়া ধরিয়াও তাহার মন গলাইতে চেষ্টা পাইব।

শ্রীমন্ত পৈলানের বাড়ী চিনিতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। গ্রামের যে-কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম সে-ই বলিয়া দিল।

শ্রীমন্ত পৈলানের ছোট দুইটি চালাঘরওয়ালা বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি হাত তুলিয়া তাহাকে একটা নমস্কার জানাইয়া বলিলাম, পৈলান মশাই, আপনার কাছেই এলাম। আমাকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? সেই যে আখিজলের জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের বাড়ী বাবুইডাঙ্গা থেকে বরযাত্রী এসেছিল আমিও তাদের সঙ্গে এসেছিলাম।

শ্রীমন্ত পৈলান আমাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ও, এসেছিলে নাকি? হ্যাঁ, অনেকেই এসেছিল বটে, কাউকেই আমার মনে নেই।

সাহস করিয়া আর বলিতে পারিলাম না যে, আমি গান গাহিয়াছিলাম। সে দুঃসাহসের কথা আর স্মরণ করাইয়া দিতে মন চাহিল না।

বলিলাম, বহুদূর থেকে আমি আসছি আপনার কাছে। সেই বাবুইভাঙ্গা থেকেই আমি আসছি। আমার বড় ইচ্ছা যে আপনার কাছে বাজনা শিখি।

শ্রীমন্ত পৈলান আমাকে একটা আসনে বারান্দায় বসিতে দিয়া নিজেও আর একটি আসনে বসিয়া বলিল, তা তোমার চেষ্টা আছে বুঝি, কিন্তু শ্রীমন্ত পৈলান ত কাউকে কখনও শেখায় না। তুমি এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এসে যে বড় ভুল করেছ।

এত সহজে দমিব না, তাহা পথেই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম। কাজেই বলিলাম, তা না শেখান বেশ, কিন্তু আমি আপনার কাছে আপনার চাকরের মত দিনরাত্রি পড়ে থাকবো, আর তাতেই যা সম্ভব তাই শিখে নেব।

শ্রীমন্ত পৈলান মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, না, তাও যে সম্ভব নয়। এ জিনিষ আমি কাউকে আর কখনও একটা অক্ষরও শেখাতে পারব না। অনেক পাপ ছিল জীবনে তারই শাস্তি আজ ভোগ করছি। নইলে এমন ঈশ্বরদত্ত জিনিষের ভাগ কাউকে দিতে পারছি না। ভগবান আমাকে মেরে রেখেছেন। আমার এই ভাঙা ঘরে এসে বহু জায়গার বহু লোক বাজনা শুনে গেছে, কিন্তু শিখতে চেয়েছে কি আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। না, কাউকে আমার আর শেখাবার উপায় নেই। বাজনা যদি শুনতে চাও ত সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বসলেই তা শুনে যেতে পারবে।

শ্রীমন্ত পৈলানের কথা শুনিয়া ভয় পাইলাম। বলিলাম, আমার এত কষ্ট স্বীকার ক'রে আসা কি তাহ'লে বৃথা হ'য়ে যাবে? আমি যে বাড়ী থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এলাম আপনার কাছে তবলা শিখব ব'লে। কিন্তু কিছু না শিখেই বা বাড়ী ফিরি কেমন ক'রে?

শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, আহা! তোমাদের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। এমন কত লোক আগ্রহ নিয়েই না শিখতে এসেছে আমার কাছে, কিন্তু দুর্ভাগা আমি, তাই কাউকে কিছু দিতে পারি নি। আমার 'পরে ভগবানের কৃপাও যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর মহা অভিশাপও আমাকে বহন করতে হচ্ছে। আর সে যে ভগবানের কি নিষ্ঠুর অভিশাপ সে শুধু আমিই জানি। আমার কাউকে আজ আর শেখাবার অধিকার নেই। একদিন বহু ছাত্রই আমার কাছে শিখতে আসত, কিন্তু সে সৌভাগ্য থেকে আমি আজ বঞ্চিত। আমার একটি ছেলে—সে-ই ছিল আমার ছাত্রদের মধ্যে প্রধান। আজ বেঁচে থাকলে হয়ত তোমাদেরই বয়স তার হ'ত। কিন্তু ওস্তাদ হ'ত হয়ত সে আমার চেয়েও ঢের বড়। কারণ, সেই বয়সেই তার বাঁ হাতে বোল উঠত তা দেখে আমিও যেতাম হক্‌চকিয়ে। স্ত্রী মারা যেতে সে-ই হয়েছিল আমার সংসারের একমাত্র সম্বল। ভগবানের চক্র, একদিন আমার সঙ্গে সঙ্গতে বসেছে, হঠাৎ কোথায় যেন দিলে তাল কেটে।

মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না, তবলা-পেটা হাতুড়িটা তুলেই দিলাম তার মাথায় এক ঘা বসিয়ে......

আর কিছু না বলিয়াই মস্ত গুণী শ্রীমস্ত পৈলান নিতান্ত ছেলে মানুষের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীমস্ত পৈলানের মত এত বড় গুণীকে এমন অসহায়ের মত কাঁদিয়া উঠিতে দেখিয়া আমারও চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ উভয়ে আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। তার পরে শ্রীমস্ত পৈলান কাপড়ের খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া বলিল, সেই নিয়ে পড়লাম খুনের মামলায়। একে ত নিজের দুঃখেই নিজে ম'রে আছি, তাতে আবার ঐ বিশ্রী মামলা, হাতে নেই একটা পয়সা। ভগবানের মার, তাই চুপ ক'রেই রইলাম। ভাবলাম, যা বরাতে লেখা আছে তাই হোক্, মামলা থেকে বাঁচার আর কোন চেষ্টাই করব না। অবশ্য, সামর্থ্যও আমার ছিল না। কিন্তু গুণীর আদর জানেন আমাদের আঁখিজলের শম্ভু মুখুজ্যে মশায়। তিনি কত দিনই আমার এই ভাঙা কুঁড়েয় ব'সে আমার বাঁয়া-তবলা শুনে গেছেন। তিনি খবর পেয়েই তাঁর নায়েবকে দিলেন আদালতে পাঠিয়ে। আর ব'লে দিলেন, যত টাকা লাগে এ মামলা থেকে শ্রীমস্ত পৈলানকে বাঁচাতেই হবে। তাঁরই দয়ায় কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচলাম কোন রকমে। সেই থেকে জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের আমি কেনা গুণী। নইলে, কারও কি সাধ্য আছে যে শ্রীমস্ত পৈলানকে নিয়ে যাবে তার বাড়ী, এক তা পারেন আঁখিজলের শম্ভু মুখুজ্যে মশায়, গুণীর যিনি সত্যিকারের আদর জানেন। ব্যস্, সেই অঘটন ঘটার পর থেকেই শেখান আমার শেষ হয়ে গেছে। ভগবানের অভিশাপে তাই বন-চাতকীর শ্রীমস্ত পৈলানকে মরতে হবে নি-শিষ্য অবস্থায়। তাঁর কাছ থেকে যা পেলাম, কাউকে তা দিয়ে যেতে পারলাম না। এর চেয়ে আর অভিশাপ মানুষের জীবনে কি থাকতে পারে?

সমস্ত শুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। শ্রীমস্ত পৈলানের মত এক জন গুণী এমন নৃশংস হত্যার অপরাধে একদিন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল, সে তাহার নিজ পুত্রকে সামান্য একটু ভুলের জন্য হত্যা করিয়াছে! আশ্চর্য্য ত!

বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম।

বন-চাতকীর শ্রীমস্ত পৈলানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা আমার দ্বারা আর সম্ভব হইল না। লোকটা অসাধারণ গুণী হইতে পারে, কিন্তু নিদারুণ অভিশপ্ত!

মদির মুহূর্ত্ত

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বহুযুগ আকাঙ্ক্ষিত আজিকার মুহূর্ত্ত মদির
তোমারে নিরখি সখি জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জছায়,
তরঙ্গিম ফেনপাত্র উচ্ছুসিছে ওষ্ঠের কানায়;
মনোহর রাত্রি-বৃন্তে ইন্দুরশ্মি বর্ষণ-অধীর,
ঝলমল স্বপ্নপুষ্ট জাল বুনি পায়া ও মোতির
মোদের চম্পক-হাতে, মদালসা চীনাংশুক হায়,
শ্রেণীবদ্ধ ঘূর্ণ্যমান বাদুড়ের উল্লাস পাখায়;
আমি লুব্ধ পুরূরবা, তুমি যেন উর্ব্বশী মাটির।

ভুজবদ্ধ তুমি মোর, ঊর্দ্ধে শোভে পূর্ণিমা-শর্ব্বরী,
স্পন্দমান তনুতন্ত্রী, লীলায়িত বাহুভঙ্গী কিবা—
হেরিনু নির্ভয়ে আমি, ভাঙে তব চন্দ্রমল্লী-সিঁথি;
সঙ্কোচজড়িত লজ্জা রেখে আনো ফুল্লপদ্ম গ্রীবা—
প্রথম-প্রণয়-ভীরু স্মিতদৃষ্টি সজ্জ-সহচরী;
আমরা ব্যগ্রতা লয়ে অন্তপুর নেপথ্য-অতিথি।

বাংলা সাহিত্যের অভাব-অভিযোগ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

১

সাহিত্যের যে-সব অভাব নিয়ে অভিযোগ করা চলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তারই একটু আলোচনা উপস্থিত করব। আমাদের নবীন কবিদের মধ্যে দু-চার জনা রবীন্দ্রনাথ নেই কেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় টলষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীসের' মত উপন্যাস কেন লেখেন নি, উরিপিডিস কি শেক্‌সপিয়রের তুল্য নাট্যকার বাংলা দেশে কেন জন্মায় নি—এ নিয়ে ইচ্ছা হ'লে দুঃখ করা যেতে পারে, অভিযোগ করা অর্থহীন। পাঠকের প্রচণ্ড তাগিদে লেখকের ইচ্ছা দুরন্ত হ'লেও তার ফলে রবীন্দ্রনাথ কি টলষ্টয়, উরিপিডিস কি শেক্‌সপিয়র, এমন কি বার্ণাড শ-রও সৃষ্টি হয় না। প্রতিভার সৃষ্টিরহস্য অজ্ঞাত, কিন্তু ইচ্ছার বেগ তার একটা কারণ নয়। সুতরাং আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসস্রষ্টাদের সৃষ্টিপ্রতিভা যদি আশানুরূপ বড় না হয় তা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলে না, কারণ চেষ্টা করলেই তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার রকম ও পরিমাণের রদবদল ঘটাতে পারেন না। তাঁদের সৃষ্টি যদি আমাদের দুর্ভাগ্যে কানা ছেলেই হয়, তবে গালাগালির জোরে তাকে পদ্মলোচন করার চেষ্টা বৃথা। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আবির্ভাব আশা ক'রে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রসের সৃষ্টি নিঃসন্দেহ সাহিত্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই সাহিত্যে অমর। হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ রসশিল্পীদের প্রতিভা যা জন্ম দিয়েছে আজও মানুষকে তা কাব্যের আনন্দ দিচ্ছে, ঐতিহাসিক হয়ে যায় নি, এবং মানুষের মন যদি আমূল বদলে না যায় চিরকাল দেবে। আজকের দিনে যখন সব দেশে প্রকাণ্ড পাঠক-গোষ্ঠীর মোটা চাহিদা মেটাবার জন্ত ঠুনকো গল্প উপন্যাসের অফুরন্ত জোগানে সাহিত্যের বাজার ভরে যাচ্ছে, কবিতার ক্ষেত্র অকিঞ্চিৎকর মানসিক ঢঙের দুর্ব্বল প্রকাশ চেষ্টায় শুকনো আগাছায় আচ্ছন্ন,—তখন এ-কথা মনে করার প্রয়োজন আছে যে সাহিত্যের হীরা-জহরৎ এই বাজারেই মেলে, সাহিত্যের গোলাপ এই আগাছার জঙ্গলেই ফোটে। কিন্তু যাত্রা করলেই তাদের পাওয়া যায় না, এবং কোন্ শুভ সুযোগে তাদের উদয় হয় তার জ্যোতির্ষিক গণনা সম্ভব নয়। জাতির জীবনে যখন অন্য পাঁচ দিকে প্রাণের জোয়ার এসেছে তখন সাহিত্যের বড় সৃষ্টি দেখা দিয়েছে, আবার দেয়ও নি, জাতির অবসাদের সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আবির্ভাবের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। আজকের পৃথিবীতে যখন জাতির সঙ্গে জাতির মানসিক জগতের সীমারেখা পরিক্ষীণ হয়ে এসেছে তখন বড় সাহিত্যিক প্রতিভার উপর তার নিজের দেশের পারিপার্শ্বিকের চাপ হয়ত আগেকার দিনের মত প্রবল নাও হতে পারে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে বড় প্রতিভাবান শিল্পীর উদয় হ'লে আমাদের অন্ন হীনতা ও দুর্দ্দশা তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণে বাধা না হতে পারে; অন্তত তাই মনে ক'রে একটু আনন্দ পাওয়া যাক।

২

কিন্তু মাথা মানুষের উত্তমাঙ্গ হ'লেও তার সমস্ত শরীর নয়, রস-সাহিত্য সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ হ'লেও সমগ্র সাহিত্য নয়। মানুষের অন্তরে শুধু সৌন্দর্য্য ও রসের সৃষ্টির প্রেরণা ও সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাই নেই, তার মনে আছে কৌতূহল—নিজেকে ও জগৎকে জানতে, যা জটিল তাকে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে, বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের টুকরোকে তত্ত্বের কাঠামে সাজিয়ে দেখতে। এই কৌতূহলের ফলে যে চেষ্টা তার অনেক ব্যয় হয় জৈবিক ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে, কিন্তু যা উদ্বৃত্ত থাকে তার কিছু মানুষ লাগিয়েছে সাহিত্যের সৃষ্টিতে। বহুমুখী এই কৌতূহলের মত সে-সাহিত্যও বহুমুখী। এ-সাহিত্য বিচার করে, বিতর্ক করে, তথ্যের সন্ধান করে, তাকে তত্ত্বের রূপ দিতে প্রয়াস পায়। রসসৃষ্টি এ-সাহিত্যের লক্ষ্য নয়, আনুষঙ্গিক ভাবে ছাড়া। মানুষের মননবৃত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা। এ-সাহিত্য রসসাহিত্য নয়, মনন-সাহিত্য।

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, তথ্য, বৃত্তান্ত, বিচার, আলোচনা—যখন সাহিত্যিক রূপ পায় তখনই মনন-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

সভ্যতার ইতিহাসে এ সাহিত্যের আবির্ভাব রস-সাহিত্যের অনেক পরে। কারণ জৈবিক দাসত্ব থেকে মানুষের মন মুক্তি পেয়েছে হৃদয়ের অনেক পরে। আর রসসাহিত্যের তুলনায় এই সকল মনন-সাহিত্যের সৃষ্টি অচিরস্থায়ী। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে মানুষের হৃদয়-বৃত্তি কি মনন-বৃত্তি কারও মূল গড়নের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। সেই জন্য হাজার বছর পূর্ব্বেকার রসশিল্পীর সৃষ্টি আমাদের রসানুভূতিকে আজও নিবিড় আনন্দ দেয়, অনেকটা যেমন শিল্পীর সমসাময়িক লোকদের দিত। কিন্তু মনন-বৃত্তি তার অশ্রান্ত কর্ম্মের ফলে নিজের পূর্ব্ব কর্ম্মফল বিনাশ ও পরিবর্ত্তন ক'রে চলে। যে তথ্য ও জ্ঞান ও জগতের কল্পিত রূপ লোকের মনে কাল ছিল, আজ তা বজায় থাকে না, এবং যে-সাহিত্যের এরই উপর প্রতিষ্ঠা পরবর্ত্তী যুগে তার বেশীর ভাগের মূল্য হয় কেবল ঐতিহাসিক, অর্থাৎ সাহিত্য নয় সাহিত্যের উপাদান। প্রাচীন যুগের অতি শ্রেষ্ঠ মনন-সাহিত্যিকদের রচনারও পরবর্ত্তী কালে প্রধান আকর্ষণ হয় তাদের মূল বক্তব্য নয়, তাদের লেখার সাহিত্যিক গড়ন, এবং বিষয়বস্তু যাই হোক সূক্ষ্ম বুদ্ধির অতি নিপুণ প্রয়োগ কৌশলের আনন্দ। প্লেটো কি শঙ্করের লেখার সঙ্গে সফোক্লিস কি কালিদাসের কাব্যের আধুনিক মনের যোগাযোগ তুলনা করলেই এ-কথা বোঝা যায়।

কিন্তু হোক অচিরস্থায়ী, এই সাহিত্য মানুষের মুক্ত সচল মনের প্রকাশ, যে মন অন্নলোকের উর্দ্ধে উঠে সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রতি কালের মানুষ তার নিজের বিশ্বকে প্রশ্ন করবে, পরীক্ষা করবে—তার চিন্তা ও অনুভূতি সাহিত্যে প্রকাশ করবে। সে বিশ্বের রূপ যখন মনের চোখে বদল হবে তখন নূতন প্রশ্ন, নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হবে, নূতন সাহিত্য জন্ম নেবে। তাতে পুরাতন সাহিত্যের সাহিত্য হিসাবে যদি মৃত্যুও হয় তবু সে নিষ্ফল নয়। মনন-প্রবাহকে সচল রাখার যে কাজ তা সে ক'রেই মরেছে। জীবের মৃত্যু হয়, জীবনের ধারা চলতে থাকে মরণশীল জীব-পরম্পরাকেই আশ্রয় ক'রে।

এই মনন-সাহিত্যের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ। ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রেরণায় আধুনিক বাংলায় যে রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আমাদের মনন-সাহিত্য গুণে ও পরিমাণে হীন ও তুচ্ছ। সাহিত্যের এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য অভিযোগের ফলে প্রতিভার উদয় হয় না, কিন্তু প্রতিভার চেয়ে নীচু শক্তিও অনেক মূল্যবান দান এ-সাহিত্যে দিতে পারে যেমন পশ্চিমের সভ্য দেশগুলিতে দিচ্ছে; এবং চেষ্টা ও একাগ্রতায় এ-শক্তিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা সম্ভব। এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে ইংরেজ যুগের বাঙালী জাতির মধ্যে রসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার চেয়ে মনন-সাহিত্য রচনার মধ্যবিত্ত শক্তিরও পরিমাণ কম। আমাদের রসসাহিত্যের তুলনায় মনন-সাহিত্যের অভাব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, এবং এর মূলে রয়েছে চিন্তা ও মননের জগতে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন ইংরেজী ভাষার মারফৎ ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হ'ল তখন বাংলা ভাষায় রসসাহিত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু চিন্তা ও বিচারের সাহিত্য আলোচনা হ'ত সংস্কৃত ভাষায় ভট্টাচার্য্যের টোলে, নয় আরবী ও পার্শিতে মৌলবীর মাদ্রাসায়। মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য ক'রে বিদেশী ভাষাকেই রস-সম্ভোগের ও রসসৃষ্টির বাহন করার চেষ্টার ব্যর্থতা অল্প দিনেই ধরা পড়ল। কারণ ও ব্যাপারটা ছিল অসম্ভব রকম অস্বাভাবিক। ফলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পুরান খাদেই নূতন জোয়ার এসেছে। বাঙালী কথাশিল্পীদের প্রতিভা ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে বাংলার উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য গড়ে তুলেছে। ইউরোপের মনন-সাহিত্য প্রথম ইংরেজ যুগের বাঙালী মনীষীদের কম আকৃষ্ট করে নি, এবং সংস্কৃত-আরবীর বন্ধন কাটিয়ে বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য গড়ে তোলার প্রেরণা যে তাঁরা পেয়েছিলেন রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী তার সাক্ষী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্য্যন্তও এ-আশা অনেকটা ছিল যে, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাঙালী আয়ত্ত করবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বহুল প্রচারে, যার ফলে শিক্ষিতের অর্থ দাঁড়িয়েছে ইংরেজী-ভাষায় পঠন-লিখনে সুশিক্ষিত। বাঙালী পণ্ডিত ইংরেজ-পূর্ব্ব যুগে মনন-সাহিত্যের চর্চা করত সংস্কৃতে কি ফার্সী-আরবীতে, এখন করছে ইংরেজী ভাষায়। এর অস্বাভাবিকতা বাঙালীর ইংরেজীতে কাব্যরচনার চেষ্টার মত প্রকট নয়, এবং বাঙালীর চিন্তা ও তার প্রকাশের শক্তি যে এতে কত পঙ্গু হয়ে আছে তা ভেবে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম হয় না, সুতরাং সহজেই চোখ ও মন এড়িয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক অবস্থা বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ মনন-সাহিত্য গড়ে ওঠার প্রধান বাধা, আবার মাতৃভাষায় সে সাহিত্যের অভাব বাঙালীর মনন-চেষ্টার ও তার সাহিত্যিক প্রকাশ-ক্ষমতার স্ফূর্ত্তির প্রধান অন্তরায়।

৪

বাংলা ভাষায় যে আমরা মনন-সাহিত্য রচনা করছি নে তা নয়, কিন্তু তা করছি অল্পবিস্তর সৌখীন ভাবে। যখনই মনে করি বলার মত কিছু বলার আছে—ইতিহাসে হোক, ভাষাতত্ত্বে হোক, ধনবিজ্ঞায় হোক, দর্শনে হোক—তখনই তার প্রকাশের বাহন করি ইংরেজী ভাষা; অবশ্য, প্রধান লক্ষ্য যে তা সাগর পেরিয়ে বা সাগরের এ-পারেই আমাদের বিদ্যাগুরুদের নজরে পড়ে, অথবা বলা যাক প্রকৃত সমজদার বৃহত্তর বিদ্বজ্জনসমাজে প্রচারিত হয়। এ-ভরসা রাখি নে যে, বিদ্যা ও চিন্তার জগতে দেবার মত যদি কিছু দিয়ে থাকি, আজ হোক কাল হোক এই বৃহত্তর পণ্ডিত সমাজ তার পরিচয় নিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ এই যে, মানুষের চিন্তা ভাষা-নিরপেক্ষ নয়, এবং সে-চিন্তা ভাষায় সাহিত্যিক রূপ নিয়ে প্রকাশ পেলেই স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য হয়। বিদ্যা ও চিন্তাকে সাহিত্যিক গড়ন দেওয়া নিজের মাতৃভাষায় ছাড়া বিদেশীর ভাষায় প্রায় অসম্ভব। ফলে ইংরেজী ভাষায় আমরা যে ইতিহাস, দর্শন, অর্থবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব রচনা করি তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না-হয় সাহিত্যের কঙ্কাল, বিদেশী লেখকের রচিত সাহিত্যের ফুটনোটের উপাদান। এবং ভাব ও চিন্তা প্রকাশের পরম উপযোগী অতিসমৃদ্ধ এই বিদেশী ভাষায় মনন-চেষ্টা প্রকাশে সে দেশের চিন্তার কাঠামো থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কঠিন। কতটা যে নিজের চিন্তা আর কতটা এই বিদেশী ভাষার মধ্যেই নিহিত তত্ত্ব ও ভঙ্গী—লেখকের কাছে তা সব সময় স্পষ্ট থাকে না।

৫

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মনন-সাহিত্যের ঐকান্তিক চর্চা আমাদের চিন্তাকে কতদূর ভীরু ও দুর্ব্বল করেছে তার একটা উদারণ দিই। ইংরেজী কাব্য ও রসসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইউরোপের যে-কোনও অ-ইংরেজ জাতির চেয়ে অনেক বেশী। এই সাহিত্য আমাদের রসপিপাসা নিবৃত্তির এখনও বোধ হয় প্রধান উৎস। এ-সাহিত্যের বিচার, সমালোচনা, রসোদ্ঘাটন ফরাসী করেছে, জার্মান করেছে, ইতালীয় করেছে, ইউরোপের অন্য সব জাতি করেছে—আমরা করি নি। আমরা ইংরেজের ও অ-ইংরেজের সেই সব আলোচনা মাত্র পড়ে গেছি, অথচ আমরা একটা ভিন্ন জাতি; আমাদের মনের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রসোপলব্ধির ধারা ইউরোপীয়ের সঙ্গে নিশ্চয় সম্পূর্ণ এক নয়। আমাদের চোখে এই সাহিত্যের যথার্থ রূপটি কি ফুটে উঠেছে সে-কথা সাহস ক'রে কখনও বলতে চেষ্টা করি নি, অথচ আমাদের উপর এই সাহিত্যের প্রভাব যে কত, আমাদের নিজেদের আধুনিক রসসাহিত্যই তার প্রমাণ।

বাংলা ভাষার মনন-সাহিত্যকে বড় করতে হ'লে এ মানসিক ও সাহিত্যিক ভীরুতাকে আমাদের মন থেকে দূর করতে হবে, আর এ-সাহিত্য গড়ে না উঠলে আমাদের চিন্তা ও প্রকাশের শক্তি কখনও যথার্থ মুক্তি ও বল পাবে না। বিষয়বস্তু যাই হোক নিজের মতে চিন্তা করবার সাহস এবং নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করার সাহস আমাদের মনে আনতে হবে। আর এ সাহস কিছু দুঃসাহস নয়। ইউরোপীয় মনন-সাহিত্যের যারা মহাপ্রতিভাশালী লেখক নন, মাত্র শক্তিশালী লেখক, তাঁদের রচিত সাহিত্য পড়ে এ মনে হয় না যে বাঙালী শক্তিশালী লেখকের নিষ্ঠা ও চেষ্টার তা উপরে।

কিন্তু 'অভিযোগ' সাহিত্যের এ-ক্ষেত্রেও হয়ত বৃথা। হয়ত মনন-সাহিত্যের প্রতি বিভাগে প্রতিভার আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে—যিনি প্রমাণ করবেন যে এখানেও বাঙালী বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করতে পারে এবং আর কোনও ভাষায় পারে না। পরিমিত শক্তিশালী লেখকদের চিত্ত তখনই বাংলা ভাষার দিকে মুখ ঘোরাবে যখন প্রতিভার সৃষ্টিতে বাংলা মনন-সাহিত্য বিদেশী পাঠকসমাজেও নিশ্চিত আসন পাবে, অর্থাৎ রেস্‌পেক্টেবল্‌ হয়ে উঠবে।

ইউরোপ

শ্রীকালিদাস নাগ

[শ্রীরম্যা রলাঁ করকমলেষু]

হোক মানুষ কালো, হলদে, কটা, লাল, সাদা,
তার চামড়ার তলায় আছে একই রঙ, রক্ত-রাঙা।
বিধাতা গড়েন মানুষকে মূলত এক রেখে,
মানুষ কিন্তু করেছে 'খোদার উপর খোদ্‌কারি,'
থেকে থেকে বলেছে : 'তফাৎ যাও! তুমি আমি এক নয়'।
যুগে যুগে এটা দেখেছি—নজিরের অভাব নেই।
কিন্তু মৌলিক সত্যটার হ'ল কি? গেল কোথায়?
সেটা কি ছাল-চাপা পড়ে' মারা যেতে পারে?
কালো কটা হলদে ছাল উপেক্ষা করে'
তরজে উঠল শাদা ছাল : 'তফাৎ যাও!
নোয়াও মাথা আমার পায়ে; আমি বড়, আমি প্রভু'।
বড়াইটা চ'লে আসছে কিছু কাল
সহে আস্‌ছে কালপুরুষও যেন ভয়ে ভয়ে!
তবু চোখ চেয়ে দেখা যাক শাদার দাবী
যেটুকু সাচ্চা যাবে টিকে, মেকী পড়বে ঝরে।

অগ্নিপ্লাবনের হাপরে ফেলে
বিশ্বকর্ম্মা পুড়িয়ে গলিয়ে গড়লেন পৃথিবীকে;
তার স্মৃতি মানুষের নেই।
কেঁচো গুগলি মাছ পাখী পশুর পর্য্যায় শেষ করে'
সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে দিলেন ডাক।
এল সে ভীরু অসহায় জীব
বহু কষ্টে উঠল বেঁচে, বাড়ল তেজ।
অগ্নিবর্ষণের পর তুষারপ্লাবনে পৃথিবী ফেটে চৌচির,
নতুন করে আবার ভাঙা গড়া
মহাসমুদ্র, সাগর, দেশ, মহাদেশ, ছাপিয়ে ভাসিয়ে—
দেখা দিল শ্বেত দ্বীপ উত্তরে,
দক্ষিণে রইল কালো দ্বীপ, মাঝে ভূমধ্য সাগর।
শ্বেত দ্বীপের আদি মনু গড়ে তুললেন মৈনেয় সভ্যতা
ক্রীট থেকে সীরিয়া মিশর পর্য্যন্ত উঠল জলে
রূপের দীপ্তি ভোগের আসবাব,
মাটির পাত্রে ফুটল রেখা রঙের গলাগলি,
ভিত্তিগাত্রে সজীব ছবি,
গজদন্তে সোনা ঝলিয়ে উঠল নেচে প্রথমা প্রকৃতি—
মাথায় মুকুট, হাতে নাগপাশ, মৈনেয় মনসা।
দেবী দেখা দেন আবার কুমার নিয়ে কোলে
অর্ঘ্য নিয়ে সবাই আসে করতে পূজা
সন্তানের ভিতর দিয়ে চলে সমাজের বিস্তার
শাদায় কালোয় থাকে না ভেদ, কোন দ্বন্দ্ব।
হঠাৎ ছোটে মাইসিনী নারীর বাঁকা কটাক্ষ,
পূর্ব্বে পশ্চিমে লাগে সর্ব্বনেশে রণ।
সংঘর্ষের সেই আদিপর্ব্ব
আজো খুঁজছে, শান্তিপর্ব্ব কোথায়?

ট্রোজান্ নারীর কান্না জাগে ইউরিপিডিসের নাট্যে,
কত ইরানী কত যবনী বহায় অশ্রু-বন্যা,
দারিয়ুস্ সেকেন্দরের কত স্বপ্ন
গড়ে ওঠে, পড়ে ভেঙে
মেটেনা তবু পুব-পশ্চিম কালা-ধলার দ্বন্দ্ব!
ভাঙা স্বপ্নের জের টেনে চলে রোমক রাজ্য,
চাকার তলায় পিষে যায় পিউনিক্ জাত।
যথা কালে ধ্বসে পড়ে রোমের জয়স্তম্ভ
কিন্তু রোমক বিধির ভিতর পড়ে বাঁধা
তিনটে মহাদেশের মানুষ,
গড়ে তোলে মানুষে মানুষে নূতন ঐক্যবোধ।
যে জুডিয়া এসেছে রোম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
তারই বুকের থেকে উথ্‌লে ওঠে প্রেমের বাণী, রোমের
শ্মশানে।
ক্রুশে বিদ্ধ হতে হতে পুবের মানুষ দেয় অমরত্বের সন্ধান,
শান্তির মন্ত্র; কিন্তু নেবে কে?
হুড়্‌হুড় করে নামে বর্ব্বর প্লাবন—
শাদা বর্ব্বরতা পালিস্ করতে লাগে অনেক যুগ।
মধ্যযুগে ক্রুজেদ্-জেহাদের ভাঙা গড়া
পুবে-বন্যা ঠেলে এসে স্তম্ভিত হয় ইস্তাম্বুলে
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র যায় বেড়ে
পুবের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বেড়ে ওঠে পশ্চিমী সভ্যতা।

শাদা নাবিক খুঁজছে পুবের পথ, ধনের পথ, রাজ্যের
পথ,
তখন পুব সাগরে পড়ছে ভাঁটা।
এল দীয়াস্, এল গামা, এল কলন্ ভেস্‌পিউসি—
সোনার ভারত হীরের ভারত চাই! কোথায় পথ?
মহাসাগর মহাদেশ পরিক্রমার শেষে
চোখে পড়ে নতুন পৃথিবী,
লাল চামড়ার মানুষ প্রথম দেখে শাদা মানুষ;
শাদার হাত রক্তে হ'ল রাঙা।
ক্রুশের নরদেবতা কি আর্ত্তনাদ করেন নি?
কিন্তু শুনবে কে? শাদার চোখে কিসের নেশা?
ধর্ম্মের না রক্তের?

সারা সাগরের জলে ধোয়া যায় কি অত রক্ত?
অসীম সাহস অগাধ অহমিকা রূপ ধরে' ওঠে
নব নব শ্বেত সাম্রাজ্যে।
রোমক সাম্রাজ্যও বুঝি হার মানে।
উত্তর দক্ষিণ আমেরিকায় ওড়ে বিজয় কেতন।
লাল-চামড়াদের প্রায় শেষ করে' পড়ে কালো চামড়ার দেশে
শাদা মানুষ, করে কালনেমির লঙ্কাভাগ আফ্রিকার বুকে,
সিংহল ভারতও বাদ পড়ে না।
তবু ঢাকা যায় না কালের বিকট চাপা হাসি,
সভ্যতার সাদা মুখোস যায় খসে,
বেরিয়ে আসে আসল মুখ—
কে কতটা কামড়ে ছিঁড়বে গিলবে,
এই নিয়ে লাগে 'মহাযুদ্ধ'!
সভ্যতার দুর্ব্বলতা এড়িয়ে সহজ বর্ব্বর ছাড়ে হুঙ্কার,
রক্তবন্যায় বিষবাষ্পে দিগ্বিদিক যায় ডুবে!
ন্যায় সত্য শান্তি মিথ্যা, মৈত্রী মিথ্যা—
নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব শোনায় শাদা মানুষ,
মরতে মরতে, মারতে মারতে, হিংসা ধর্ম্মের অবদান।

হায় শাদা মানুষ!
মনের তেজ তোমার অসীম, হাতের শক্তি অপূর্ব্ব,
তারিফ করি তোমায়।
কিন্তু প্রাণ কোথায় তোমার?
খুঁজেছ কি? পেয়েছ কি?
হয়ত দিয়েছ 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো',
হয়ত সয়েছে অনেক অত্যাচার
তোমার অনেক বছরের উদ্দাম যৌবন।
কিন্তু রক্তের স্রোতেও ভাঁটা পড়ে,
মধ্যাহ্নের পর নামে সন্ধ্যার অন্ধকার।
কি নিয়ে জাগবে তার মধ্যে?
কোন অলখ দৃষ্টি? কোন অভঙ্কিত শান্তি?
তোমায় পিথাগোরাস্ সক্রেটিস্ প্লেটো দান্তে রুসো
শিখিয়েছে তোমায় অনেক কথা, দিয়েছে সাধন-সঙ্কেত,
বলেছে তোমায়: "আত্মা অমর, নিজেকে জান, স্বর্গ
আন ধরায়

পৃথিবীকে তোলো স্বর্গে, মানুষকে জান জীবন্ত
দেবতা—
সব মানুষ এক—" এমনি কত বাণী
অমর হয়ে আছে তোমার গ্রন্থে, শাদা মানুষ!
কবে তারা সত্য হবে তোমার রক্তে, তোমার প্রাণে?
লাল মানুষকে প্রায় তুমি করেছ শেষ,
কালো মানুষকে করেছ ক্রীতদাস,
হলদে মানুষদের করতে চাও গ্রাস—
মুখে বল 'শাদার দায়িত্ব বিষম'—
কাজে দেখাও শাদার ক্ষুধা অপরিসীম।
ইতিহাসে ও জীবনে, বাক্যে ও সাধনায়

এই ব্যবধান, এ উৎকট ভেদ,—
কোথায় ঠেলে নিয়ে চলেছে তোমায়?
দৃপ্ত তেজে এখনও আছে মাথা উঁচু
কিন্তু বুকের ভিতর জাগছে না কি ভয়?
সত্য ও মানবত্ব হয়েছে লাঞ্ছিত, ধর্ম্ম বিকৃত,
এতটা সইবে কি ইতিহাস?
বিধাতার ধৈর্য্য ও ক্ষমা কি অসীম?
এ প্রশ্নের জবাব তুমি আমি হয়ত পেয়ে যাব না।
কিন্তু পাবে ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠিত মহামানব,
যদি থাকে শাদা কালো হলদে ছাপমারা চামড়ার উপরে
চিরন্তন ঐক্যে গাঁথা চিরকালের মানুষ।

বেকার-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

শিক্ষিত যুব-বেকারের সমস্যা এক্ষণে কেবল আমাদের দেশে নহে ইউরোপের প্রধান দেশগুলিতেও জাগ্রত হইয়াছে ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিও বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছে। দেখা যায়, লীগ অব্ নেশন্স্ বা জাতিসঙ্ঘ এই সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টিত হইয়াছেন ও উহার নেতৃত্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। যাহা হউক, ইউরোপের বিষয় আলোচনা করা আমার এখানে উদ্দেশ্য নহে, এ বিষয়ে ভারতে, এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে কি হইতেছে তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

আমাদের দেশে শিক্ষিত যুব-বেকারসমস্যা যে কেবল অর্থনীতির দিক দিয়া এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, ইহা এক রাজনীতিক সমস্যারূপেও দাঁড়াইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জীবিকার্জ্জনের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ের দ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ বিদ্যার্জ্জনে কাটিয়া যায়, তাহার পর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেরও উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে তাহাদের মনে কিরূপ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার ভাব জাগ্রত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য, বেকার-সমস্যা চিরদিনই ছিল ও থাকিবেও, কিন্তু ইহা এক্ষণে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয়। শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই নিরাশ ও ব্যর্থ মনোভাবের সুযোগ লইয়া যে সকল লোক তাহাদিগকে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে বিপথগামী করিয়াছে তাহার দ্বারা কেবল যে গবর্ণ্মেণ্টের তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ ক্ষতিসাধন হইয়াছে ও হইবারও যে সম্ভাবনা, তৎপ্রতি দেশের অনেক নেতাই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার ফলও এখন ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া আশান্বিত হওয়া যায় যে অল্পকালের মধ্যে উক্ত সমস্যার তীব্রতা অনেকটা লাঘব

হইবে। এই ব্যাপারে এক্ষণে যে সকল চেষ্টা আমাদের দেশে আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিষয় অল্পবিস্তর অনেকেই অবগত আছেন।

দেখা যায়, এবিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে অবহিত হইয়া যে চেষ্টা গত তিন-চারি বৎসর যাবৎ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী হইয়াছে এবং সুফলও উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় প্রথম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সভ্যদিগকে যুবক বেকাররা যাহাতে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য বহু ব্যয়সাপেক্ষ না-হয় এরূপ কোন্ উপায় দ্বারা গবর্ন্মেণ্ট তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহার স্কীম উদ্ভাবন করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া যে স্কীম সভায় উপস্থিত করেন তাহাই কিছু কিছু সংশোধন করিয়া গবর্ন্মেণ্ট গ্রহণ করেন ও কার্য্যে পরিণত করেন।

গবর্ন্মেণ্টের শিল্পবিভাগ অনেক দিন হইতেই পরীক্ষা ও বিবেচনা করিতেছিলেন কি ভাবে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করা যায়। ইহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দেখেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও উৎপন্ন দ্রব্যগুলি যাহাতে অল্প ব্যয়ে হয়—ইহার দ্বারাই উহা সম্ভব। ইহাতে দেখা যায় যে, এই সকল শিল্পের উক্ত উন্নত প্রণালীর সাহায্যে উন্নতি করিতে হইলে আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মলাভের সুযোগ হইতে পারে। কারণ, দেশে যে-সকল বড় বড় কলকারখানা আছে তাহাতে যত যুবক নিযুক্ত হইতে পারে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক যুবকের কর্ম্মলাভের সম্ভাবনা, যেহেতু এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসার ও বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই সকল শিল্প স্থানীয় ও ইহার উৎপন্ন দ্রব্যগুলি ষোল আনা স্বদেশী, এবং এগুলি জনসাধারণের অর্থনীতিক জীবনের সহিত পুরুষ-পরম্পরা যোগযুক্ত হওয়ায় লোকের নিকট ইহার যে আদর আছে তাহাই ইহার রক্ষাকবচ। কিন্তু এতকাল এই শিল্প-গুলি যে উপায়ের দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়াছে তাহার আধুনিক উপায়ে উন্নতি হইলে ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্র যুবকদের কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক হয়। এই জন্য গবর্ন্মেণ্টের শিল্পবিভাগ এক্ষণে ভদ্র যুবকদের নানা কুটীর-শিল্পে আধুনিক শিক্ষা দিয়া থাকেন। গবর্ন্মেণ্ট টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলিতে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে উপযুক্ত শিক্ষক পাঠাইয়া নানা রূপ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্য্য ব্যপদেশে গবর্ন্মেণ্ট প্রথম বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন।

যাহাতে গবর্ন্মেণ্টের উক্ত কার্য্য ঠিক ভাবে চলিতে পারে ও লোকের বিশ্বাস উৎপাদন হয় তাহার জন্য প্রত্যেক জেলায় তত্রত্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া শিল্প-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-গুলিও আহূত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষার দ্বারা ইতিমধ্যেই সুফল দেখা দিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাক্টরীতে কার্য্য লাভ করিতেছে, আবার নিজেরাও ছোট ছোট কারখানা খুলিয়াছে। এই কারখানাগুলিতে আবার অনুরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা কার্য্য লাভ করিতেছে।

যাহাতে উক্তরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা অধিকতর সংখ্যায় কলকারখানা খুলিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য মূলধন সরবরাহেরও এক পরিকল্পনা গবর্ন্মেণ্ট করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ অধিবেশনে কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় লোকের জ্ঞাতার্থে উক্ত পরিকল্পনার এক বিস্তৃত বিবরণ দান করেন। গবর্ন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন উক্তরূপ ঋণদানের জন্য একটি লিমিটেড সোসাইটী স্থাপন করিবেন যাহার গ্যারাণ্টি-স্বরূপ গবর্ন্মেণ্ট অনেক টাকা দান করিবেন। ইহার দ্বারা যুববেকারসমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে।

দেশের উক্ত সমস্যায় কেবল যে গবর্ন্মেণ্টেরই সকল দায়িত্ব আছে একথা ভাবা ভুল হইবে। যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এত যুবকের শিক্ষাদাতা ও অভিভাবকস্বরূপ কার্য্য করেন তাহারও যে কেবল শিক্ষা দিয়া নহে, যাহাতে উক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকেরা কর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা বা উপায় উদ্ভাবন করারও এক দায়িত্ব আছে। সুখের বিষয় তাহার ব্যবস্থা এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে প্রথম যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট যে সপ্রু-অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত করেন তাহার সুপারিশ মত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নানা উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে ইহার বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যকতা নাই। তবে ইহা লক্ষ্যের বিষয়

উক্ত কমিটি বাংলা গবর্ণমেণ্টের উপরিউক্ত স্কীমের [প্রশ]ংসা ও সুপারিশ করিয়াছেন।

ইহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি বিষয়ে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার বিষয় প্রকাশিত [হই]য়াছে। এই পরিকল্পনা সংক্ষেপে এইরূপ—বিশ্ববিদ্যা[ল]য়ের কর্ত্তৃপক্ষ দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষাধীনভাবে ব্যবস্থা [ক]রিয়াছেন যাহাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যুবক ব্যবসাদি সংক্রান্ত [শি]ক্ষালাভের সুযোগ পায়। ব্যবসাদি বিষয়ের তত্ত্ব শিক্ষা [দি]বার জন্য যেমন এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের ব্যবস্থা [থা]কিবে, তেমনি অন্য দিকে যাহাতে উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা [হা]তেকলমে ব্যবসাদি পরিচালনের বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ [ক]রিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রসিডেণ্টের সহিত আলাপ করিয়া ঠিক করা হইয়াছে। [ব]ড় বড় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যাহাতে উক্ত যুবকদের ব্যবসাদি শিক্ষার সুযোগ দেন তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এ-বিষয়ে যাহাতে দেশীয় ব্যবসায়ীরাও উক্ত যুবকদিগকে ব্যবসাদি হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ দেন তাহার চেষ্টাও হইতেছে। যে সকল মনোনীত যুবক উক্তরূপ শিক্ষার জন্য গৃহীত হইবে তাহাদিগকে শিক্ষাকালীন মাসে ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ব্যাপার পরিচালনের জন্য যে আপিস ও লোকজন রাখিতে হইবে তাহার জন্য ও উক্ত বৃত্তি বাবদে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব করিয়াছেন যে দুই বৎসরে ৩৬,০০০ টাকা ব্যয় হইবে, এবং এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ব্যয়িত হইবে ঠিক হইয়াছে।

অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত স্কীম সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে, সে-বিষয়ে বিবেচনা করার এখানে আবশ্যকতা নাই, যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল; কিন্তু একথা বলিতে হইবে যে এতকাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে উক্ত গুরুতর বিষয়ে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সুখের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাবে যদি বাস্তবিকই যুবকদের কিছু উপকারও সাধন করিতে পারেন ত তাঁহাদের কর্ত্তব্য কথঞ্চিৎ পালিত হয়।

সুখের বিষয়, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষও এ-বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তাঁহারা এ-বিষয়ে যে অনুসন্ধান করিতেছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় এ-বিষয়ে অধিক জানিবার উপায় নাই। অবশ্য, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসেরও যে এ-বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে তাহা অধিক বলা বাহুল্য মাত্র, এবং এবিষয়ে যদি তাঁহারা কিছু কার্য্যকর উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন ত মঙ্গলের বিষয়ই হইবে।

উক্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে জনসাধারণেরও যে এক বিশেষ কর্ত্তব্য আছে একথা ভুলিলে চলিবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি এক স্থানে বক্তৃতায় জনসাধারণের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন দেশের যে-সকল ব্যক্তি চাকুরী প্রভৃতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন তাঁহারা তাহার কিঞ্চিৎ অংশ দান করুন ও তাহা দ্বারা একটি ফণ্ড করিয়া বেকার যুবকরা যাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করুন। অবশ্য ইহা জনসাধারণের উৎসাহের বিষয় না হইয়া থাকিলেও, এ সকল বা অনুরূপ বিষয়ে লোকের বিশেষ চিন্তা করিবার আছে। এই সকল বিষয় যতই আলোচিত হয় এবং লোকেও যতই চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

উপরে গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতির বেকার-সমস্যা সমাধানের যে-সকল পরিকল্পনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা যে দোষশূন্য বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ-কথা কেহ বলেন না। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টার দ্বারা ঠিক ও অধিকতর ভাবে যুবকদের সাহায্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে আরও পরামর্শ দিবার জন্য বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়াছেন। ইহারা বিদেশী বলিয়া ইহাদের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন দেশের প্রকৃত বা ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে না জানায় জনহিতৈষী দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত এ-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের যে সকল ব্যবস্থা দোষযুক্ত তাহা প্রদর্শন করা ও যাহাতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে তাহার উপদেশ বা পরামর্শও দেওয়া। বাস্তবিক যদি এইরূপ দেশপ্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত বিষয়ে আলোচনা চলে ত দেশের ও দশের প্রকৃতই মঙ্গল হয়।

আমি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি বারতা,
মাটির আঁধার হ'তে বিষ-বাষ্প দিয়েছে উত্তর।
মোর শান্ত মুহূর্তের অন্তরের সহজ কামনা—
উদার পরিধি আর অনন্ত বিস্তার,
আলোকের প্রসার বিপুল—
উত্তেজিত মুহূর্তের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চক্রব্যূহে
কুণ্ডলিত সর্পসম পাকে পাকে জড়ায়ে জড়ায়ে
ফুঁসিয়াছে জীর্ণ ক্ষুদ্র আপন বিবরে ;
বৃহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা,
অভ্রচুম্বী চূড়া মোর নিমেষে করেছে ধূলিসাৎ।
কে আমি, কি মোর পরিচয়—
এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি পাসরি
ভালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ, রস, রঙ
আমারে করেছে সৃষ্টি, সেই আমি সংসারের জীব ;
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল, হবে না প্রকাশ
কোন দিন।

জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহতেরে বৃহতেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।
দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, ভুল ভ্রান্তি স্খলন, পতন—
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিত ;
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার ঝরে অশ্রুজল।
সমস্ত ক্ষুদ্রতা ক্ষোভ অসহ্য যন্ত্রণা দুঃখ মাঝে—
প্রতিদিবসের অতি ব্যর্থ শূন্য নিরর্থক কাজে
মাথার উপরে স্থির স্তব্ধ শূন্য অনন্ত আকাশ,
দীর্ঘ বনস্পতি শিরে নবশ্যাম কচি কিশলয়,
নামহীন পাখীদের গান,
নিভৃত অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে গেয়ে-ওঠা বঞ্চিতের
অসম্পূর্ণ গান,
হঠাৎ কাঁপিয়া-জাগা সুর।
হঠাৎ ভাঙিয়া-পড়া বন্ধুত্বের প্রণয়ের উচ্ছ্বাস প্রচুর,
নিজে বেশ ভাল আছি, অকস্মাৎ বুঝিয়া বিস্ময়ে
নিপীড়িত দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে দুই চক্ষে ছল ছল জল—
যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যত আমি ব্যর্থ হই, বৃহতে বিরাটে
নমস্কার,

নমঃ শূন্য নীলাকাশ,
নমো নমো নমঃ হিমালয়,
মানুষের ভগবানে প্রণমিয়া মানুষেরে করি নমস্কার।

ঊর্দ্ধে শূন্য নীলাকাশ
বারম্বার তবু ভুল হয়—
ঘরের কপাট রুধি, বাহিরের রুধিয়া বাতাস
আপনার বিষ-বাষ্পে আচম্বিতে হাঁপাইয়া উঠি ;
মর্ম্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,
রূঢ় কহি প্রিয় বন্ধুজনে—
বিকৃত বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
আপনি শিহরি উঠি নিজেরে প্রত্যক্ষ করি মনের মুকুরে।

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,
মোর মূর্ত্তি সত্য এ তো নহে—
সে তো নহি আমি।
পীড়িতের ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে একা জাগি আমি,
একা গাহি গান—
কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—
অর্থ তার গুপ্ত রহে সুর আর ছন্দের আঁধারে,
আমি—মোর নামের আড়ালে ;
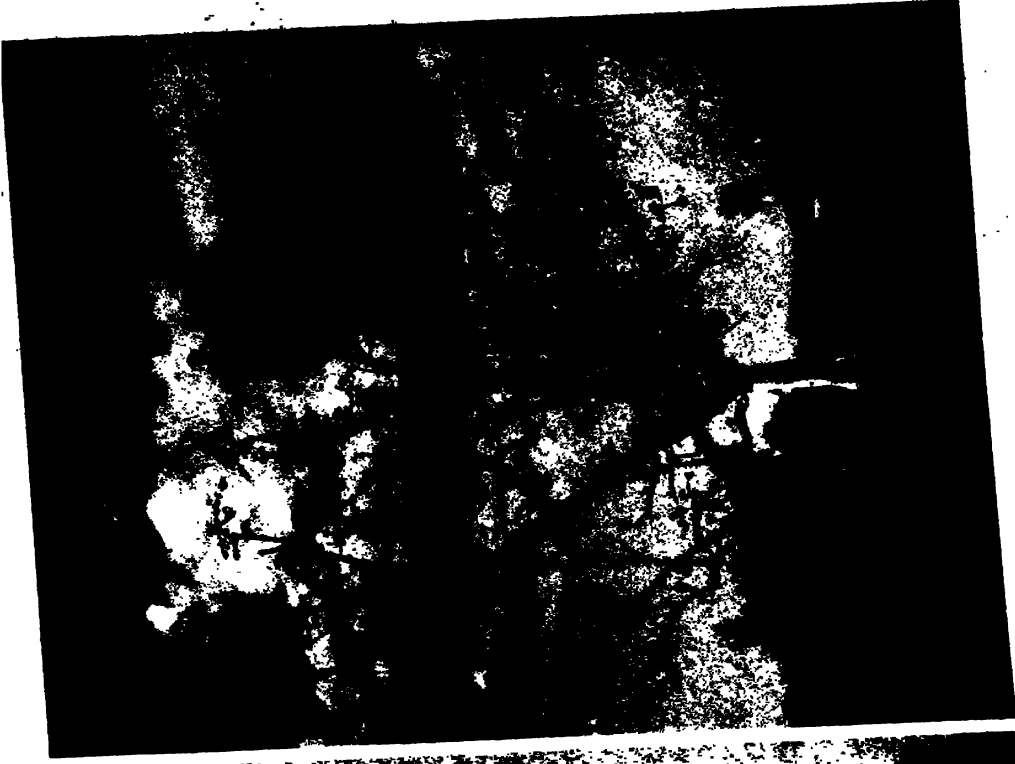
ছায়ার মায়া

একা

শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র

শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের উদ্যান

নাম সে মরিয়া যাবে, উদার নিঃসীম শূন্যে আমি তবু
রহিব জাগিয়া।

বন্ধু, শোন তোমাদেরে বলি,
অনন্ত আমার এই চোখে-দেখা খণ্ড ইতিহাস
যতটুকু আমি তার জানি—
আকাশে খসিছে তারা, নদীতটে ভেঙে পড়ে ঢেউ
ছায়া কভু পড়ে না-ক শুভ্র স্বচ্ছ আকাশের নীলে,
দাগ কভু পড়ে নাই টলমল বারিধির বুকে ;
সে বিরাট শূন্যতায় আমি পরিচয়হীন তোমাদের কাছে ;
তোমরাও নহ প্রয়োজন।
সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর।

শূন্যতায় রৌদ্র করে মায়ার সৃজন
রূপে রঙে তাহার বিকাশ—
মানুষেরে রঙ দেয় রূপ দেয় শুধু ভালবাসা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে একমাত্র মায়া-যাদুকর।

আমি ভালবাসার কাঙাল—
আমারে ডাকিয়া কাছে আমারে নির্মাণ করি লও
ক্ষণিকের আলোকসম্পাতে—
তোমাদের প্রেমের আলোকে।
দেহহীন মানুষেরা নিরালম্ব ভাসিছে অসীমে
পরস্পর পরিচয়হীন—
যার যত ভালবাসা তার কাছে ততই প্রকাশ।
বিশ্ব তার ভরে ওঠে রূপের গৌরবে,
প্রেমের রহস্যে ঘেরা এ-বিশ্বের পরিধি বিপুল—
আমারে তোমরা দাও প্রেম,
রূপ দাও, দেহ দাও মোরে।

সমস্ত বেদনা-বিষ এ-জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে ;
মুছে-যাওয়া শূন্যতায় রূপহীন মানুষের আর কোনো নাহি
পরিচয়।

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ

শ্রীকিরণবালা সেন

পৌষের উৎসব এবারকার মত সাঙ্গ হয়েছে। মনে পড়ে প্রথম যেবার এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম সেদিনকার কথা। সেদিন ভোরে যে-গানটি শুনেছিলাম আর সেদিনকার সব মিলিয়ে যে একটি আনন্দ পেয়েছিলাম তাই মনে পড়ে।

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে
তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।

এই গানটি সেদিন ভোরে যে শুনেছিলাম তার সুরটি যেন আজও কানে লেগে আছে।

এ-উৎসবটি আশ্রমের প্রধান উৎসব। মহর্ষিদেবের দীক্ষার দিন থেকে এই উৎসবের আরম্ভ। ৭ই পৌষে এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এখানে মেলা হয়। এই মেলা আজকাল পুরো তিনটি দিন থাকে। চারদিকের গ্রাম থেকে কত লোক এসে তখন এখানে জড়ো হয়। এই দিনটির কথা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে গুরুদেব [রবীন্দ্রনাথ] এক জায়গায় বলেছেন,

"সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশে ও নির্মল

বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যের অভিভাষণ

বিশ্বভারতী পরিষদের অধিবেশন, ৯ই পৌষ, ১৩৪৩

[শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র]

আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটার চারদিকে এই মন্দির এই আশ্রম এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠেছে। আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে। এই দিনটির আহ্বানে কল্যাণ মূর্ত্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে এবং তাঁর সেই সত্য দীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ ক'রে আনছে।"

এবারও এই উৎসবে কত আনন্দ। বন্ধুবান্ধব, কত অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়স্বজন নিয়ে আনন্দে এই দিন কয়টি আমাদের কেটেছে। উৎসবের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ যে ভগবদর্চ্চনা তাও সুসম্পন্ন হয়েছে। তাই সকলের মনেই একটি তৃপ্তির ভাব। গুরুদেব এবারও মন্দিরে যা বলেছেন তা সকলের মনকে পূর্ণ করেছে।

উৎসব আসবার পূর্ব্বেরও একটি আনন্দ আছে। বৎসারান্তে ৭ই পৌষের উৎসব যখন আবার আসতে থাকে তখন আশ্রমে যে তার একটি সাড়া পড়ে যায় তার মধ্যেও আনন্দ আছে। কর্ম্মীদের মধ্যে আলোচনা-বৈঠক বসে, কোথাও বা গানের অভ্যাস চলে,—উৎসবটিকে সুসম্পন্ন করবার জন্যে নানা আয়োজন চলতে থাকে।

এই উপলক্ষে আশ্রমের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে একটি আনন্দ-উৎসাহ দেখা যায় সেটিও দেখবার জিনিষ। উৎসবের এও যেন একটি অঙ্গ। মেলার জায়গার সব ব্যবস্থা হচ্ছে, নানা সরঞ্জাম আসছে, এসব দেখে তাদের কত আনন্দ। উৎসব আসছে ব'লে এক দিকে শিশুরা উল্লসিত, অন্য দিকে বড়দের মধ্যেও একটি প্রতীক্ষার ভাব। উৎসবের সব আয়োজনের মধ্যে সেদিন মন্দিরের উপদেশ শুনতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলের উপরে। গুরুদেব দেশে থাকলে প্রতিবৎসর এই দিনে তিনি মন্দিরে বলেন। দূরে যাঁরা আছেন তাঁরাও এই দিনটিতে গুরুদেব মন্দিরে কি বলেন সেটা শুনতে পাওয়া যাবে বলে উৎসুক হয়ে থাকেন। শুধু এই জন্যই কত অতিথি এই দিনে এখানে আসেন।

কিন্তু এবারে উৎসবের আগে একদিন গুরুদেব যখন বড় ক্লান্ত হয়েছিলেন তখন বলছিলেন যে কিছুক্ষণ অন্ততঃ চুপ করে থাকার যে একটা শান্তি আছে, সেটা তিনি পাচ্ছেন না। বললেন, "ক্রমাগত লোকের ভীড়, কাজেরও অন্ত নেই। আজ দশ মিনিটও যেন একক্রমে চুপ করে থাকতে পারি নি।" উৎসব কাছে এসে পড়েছে; বললেন, "মন্দিরে আর বলতে ইচ্ছে করে না। ক্লান্তির জন্যই যে শুধু, তা নয়। একটা বয়স আছে যখন থামা দরকার। এই বয়সের একটি পাওয়া আছে, সেই পাওয়ার মধ্যে এই সময়ে সব বলা সব কথার শেষ হওয়া উচিত।"

বললেন, "আমার পিতৃদেবও একটা বয়সে মন্দিরে বলা থামিয়েছিলেন। বোধ হয় আমারও এখন সেই বয়স।

"আমাদের শান্তিনিকেতন" সঙ্গীত করিয়া পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রীদের আশ্রম-প্রদক্ষিণ

৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক সম্মিলন, ১৩৪৩

[শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র]

তার পূর্ব্বে তিনি নিয়মমত মন্দিরে উপদেশ দিতেন। অনেক দিন তা বন্ধ ছিল। বহুকাল পরে প্রবাস থেকে ফিরে এসে একদিন উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন, সেই বারই আমি তাঁর উপদেশ প্রথম শুনি, তার পূর্ব্বে কোন দিন শুনি নি।"

রাত্রিশেষে গুরুদেব অন্ধকার থাকতে উঠে বাইরে এসে ব'সে থাকেন। অনেক দিন থেকে তাঁর এই অভ্যাস। তিনি বলেন, এই সময়ে গভীর একটি শান্তি সমস্ত চিত্তে তিনি অনুভব করেন। এই সময়টির কথা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের কত জায়গায় গুরুদেব লিখেছেন, যেমন,

"এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখী জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না, শালবনের মর্ম্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও এই শান্তিকে স্পর্শ করতে পারে না।"

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের উপদেশগুলি যখন লেখা হয় তখন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে প্রতিদিন মন্দিরে গুরুদেব বলতেন। অনেকেই সে-সময়ে সেখানে একত্র হ'তেন। কি আগ্রহ নিয়ে সকলে শুনতে যেতেন তা দেখেছি। এই অমূল্য সুযোগের কয়েকটি দিন পাবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। তখন শীতকাল। তিনি যখন বলতে আরম্ভ করতেন তখন এমন অন্ধকার থাকত যে পরস্পরকে চেনা যেত না। যখন শেষ হ'ত তখন সবে সূর্য্যোদয় হয়েছে। আর সেই আলো সমস্ত গাছপালা ফুলের উপর প'ড়ে আশ্রমের সুন্দর একটি রূপ ফুটে উঠেছে। তখন আশ্রমে প্রচুর গোলাপ ফুটত মনে আছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রতি বুধবার গুরুদেব মন্দিরে বলতেন। মন্দিরে বলবার মধ্যে তাঁর অনুভূতির গভীরতা ও আনন্দ বোঝা যায়। ভোরের আলোতে সমস্ত প্রকৃতি তাঁর কাছে আনন্দরূপে প্রকাশিত হয়। গুরুদেবের বলায় আর তাঁর গানে সেই আনন্দের উপলব্ধি অপূর্ব্বভাবে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়। এক এক সময়ে অনুরূপ গান নিজেই

রবীন্দ্রনাথ, উৎসবান্তে নবনির্ম্মিত গৃহের সম্মুখে

[শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র]

করেন বা মন্দিরের গানে যোগ দেন। মনের আনন্দে দাদে সেই গানের সুরে যা প্রকাশ হয়, কথায় তা হয় না। কত গান এমন বলার মাঝে মাঝে তিনি গেয়েছেন; এই রকম একটি গানের কথা এখন মনে হচ্ছে:

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে।

গুরুদেব এবার বলেছিলেন, তাঁর বলবার ক্ষমতা কমে গিয়েছে কিন্তু এই ত উৎসব শেষ হ'ল। সকলের যে জন্য প্রতীক্ষা ছিল তা সফল হয়েছে। মন্দিরে এবারেও তিনি যা বলেছেন তার গভীরতা ও আনন্দ অপরিমেয়। সেদিন তাঁর বলায় আর সব গানে এমন একটি সামঞ্জস্য ছিল যে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজেও সেদিন যে-গানটি পেয়েছিলেন সেটির সুরের আর ভাবের তুলনা নেই:

বিমল আনন্দে জাগো রে মগন হও সুধাসাগরে।

এই গানটি সকলের চিত্ত পূর্ণ করে রয়েছে।

এই সঙ্গেই মনে পড়ছে যখন পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতাম, তখন কত দিন শুনেছি স্নানের সময়ে গুরুদেব "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" মন্ত্রটি সুরে গাইছেন। আর সেই সুরে সমস্ত আশ্রম তখন মুখরিত হয়ে উঠত।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী উমা নেহরু

শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী উমা নেহরু যুক্তপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ দেশ সেবিকা। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নব-নির্ব্বাচনে বাবু ব্রিজনারায়ণ রাওকে ১৯,০০০ ভোটে পরাজিত করিয়া তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্ত্তী গত বৎসর [illegible] কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন ও ঈশান-বৃত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু স্বর্ণ-পদক (কেশবচন্দ্র সেন, গঙ্গামণি

মং রাজা শ্রীমতী নান্নুমা

শ্রীমতী এস্ এল্ খাস্তগীর

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিলা-পরিষদের কারুশিল্পপ্রদর্শনী

দেবী, র[illegible]র, পদ্মাবতী স্মৃতি পদক), রৌপ্য-পদক (প্রভাবতী দেবী, শান্তমণি স্মৃতিপদক) ও দুই পুরস্কার (উইলিয়ম স্মিথ, কেশবচন্দ্র পুরস্কার) ও জুবিলি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি লাভ করেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমার মাণিকচারীতে মং সম্প্রদায়ের পরলোকগত অধিনায়ক মং রাজা নেফ্রুসাইনের কন্যা শ্রীযুক্তা নাহ্‌মা সম্প্রতি মং রাজার পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। মং সম্প্রদায়ের অধিনেতৃপদে ইনিই সর্ব্বপ্রথম নারী।

শ্রীমতী এস্ এল্ খাস্তগীর চট্টগ্রামের সর্ব্ববিধ সামাজিক ও নারীমঙ্গল অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্টা। সম্প্রতি তাঁহার উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা" সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছে।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৪৯

পার্ব্বতীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সীমা একটু নিরাশ হ'ল। ব্যক্তিত্বের সতেজ উদগ্র প্রকাশ পার্ব্বতীর মধ্যে সে আশা করেছিল; কিন্তু পার্ব্বতীর মধ্যে সেই তীব্র উত্তেজনাময় অহমিকার প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখে সে প্রথমটা মনে মনে একটু তুচ্ছই করেছিল তাকে। পার্ব্বতী বিনীতভাবে বললে, "দেখুন এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কোন কৃতিত্বই আমার প্রাপ্য নয়। আমি একজন কর্ম্মচারী মাত্র। যাঁর প্রেরণায়, অর্থে এবং শক্তিতে এর প্রতিষ্ঠা তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ সিংহ। তিনি এখানে থাকেন না— মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসেন। সুতরাং আপনার যে নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ-কে যুক্ত ক'রে একযোগে কাজ করবার প্রস্তাব করছেন তা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে আপনাকে তাঁরই সঙ্গে দেখা ক'রে সব বন্দোবস্ত ঠিক করতে হবে।" ব'লে অল্পক্ষণ থেমে আবার বললে, "তা ছাড়া আমি অন্ততঃ যত দূর জানি, দেশের স্বাধীনতা লাভের দিক থেকে চিন্তা ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের কোন উদ্যোগ হয় নি। বাংলা দেশের নারীকে পরান্নপ্রত্যাশী পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটাতে হয়। বাঙালী মেয়ের সেই দুরবস্থার যদি কোন প্রতিকার করা যায় সেই ভাবেই এই উদ্যোগটুকু করা। অন্য কোন মহত্তর বা বৃহত্তর উদ্দেশ্য এর মধ্যে আছে ব'লে আমার মনে হয় না।"

পার্ব্বতীর কথার মধ্যে একটু শ্লেষ কল্পনা ক'রে এবং দেশের প্রতি এমন উদাসীন উক্তিতে সীমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনার কাছেই শুনেছি যে আপনি বিলেতে মানুষ হয়েছেন, সুতরাং আপনি যে পরাধীন দেশে ভারতবাসী হয়ে জন্মেছেন তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়। আপনার কথা না-হয় বাদই দিলাম—কিন্তু দু-এক বছর বিলেতী জমি মাড়িয়ে এসে শচীনবাবুও কি ভারতীয় চর্ম্ম বদলে এসেছেন নাকি, যে দেশের পরাধীনতার চিন্তা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে উঠবে? আমাদের দেশের যে-কোন মঙ্গল কাজ, যে-কোন প্রতিষ্ঠান, দেশের মুক্তি কামনা ক'রে না করলে আমার ত মনে হয় সবই বৃথা। কাজ যত বড়, শক্তির অপব্যয়ও তত বেশী, নয় কি?"

পার্ব্বতী স্থির হয়ে সীমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, "তা কেন হবে বলুন ত? মঙ্গল কাজ ত তাই যাতে লোকের ভাল হয়, সুতরাং সে আপনি দেশের মুক্তি কামনা করেই করুন আর যা' কামনা করেই করুন, তাতে যদি মানুষের মঙ্গল হয় তবে শক্তির অপব্যয় কেন হবে বলছেন ঠিক বুঝলাম না।"

সীমা বললে, "সে হয়ত বোঝান আপনাকে সম্ভব হবে না। তবু ভেবে দেখুন, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মূলধন অল্প। সুতরাং আমাদের সমগ্র শক্তিকে যদি

স্বাধীনতাসূত্রে না গাঁথতে পারি, আমাদের সমগ্র চিত্তকে একমাত্র সেই চিন্তায় পূর্ণ ক'রে না তুলতে পারি তবে আমাদের স্বল্পাবশিষ্ট প্রাণশক্তি ক্ষুদ্রতর মঙ্গল কাজের মধ্যে নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাবে—স্বাধীনতা এবং দেশের বিরাট বৃহত্তর ভবিষ্যৎ সুদূরপরাহত হয়ে উঠবে। অমনিতেই আমাদের অলস দুঃখভীত চিত্ত স্বাধীনতালাভ চেষ্টার দুঃখকে বরণ করবার আশঙ্কায় আড়ষ্ট। তাই সে দেশের আপাত দুঃখ মোচনের ক্ষুদ্রতর তথাকথিত স্বদেশহিতৈষণার আশ্রয়ে নিজেকে এবং অপরকে ভুলিয়ে রেখে নিরাপদ হ'তে চায়। সেই নিরাপদ নীড় সে বেঁধেছে আজ বিদেশীর খাঁচায়—সেখানে আকাশের মুক্তি নেই। সেখানে তার ভোজ্য পরের উদ্বৃত্ত ভোজ্যের উচ্ছিষ্ট। কিন্তু এসব কথার মূল্য আপনার কাছে কিইবা? আপনাকে মিছে বিরক্ত করছি।"

কথার খোঁচায় পার্ব্বতী কিছুমাত্র উষ্মা প্রকাশ না ক'রে শান্ত কণ্ঠে বললে, "দেশকে আপনি ভালবাসেন; তাকে স্বাধীন করতে চান। আপনার এই কথাগুলি সত্যিই আমার ভাল লেগেছে; স্বাধীন দেশে মানুষ হবার গুণেই বোধ হয়। আমি জানি কোন ইংরেজই আপনার এই সেন্টিমেন্টকে তুচ্ছ করবে না। তবে দেশের কথা বলছেন যে, সেটা কোন্ দেশ, বাংলা না ভারতবর্ষ? তা আমি ঠিক জানি না—ও কথা ভাবিও নি কখনও। দেশকে আমিও একরকম ক'রে ভালবাসি, সে আমার মাকে ভালবাসি ব'লে। আমার কাছে দেশের মূল্য মায়ের বাংলা দেশ ব'লে—যেখানকার শ্যামলতা ও সরসতা নিয়ে আমার মা সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবেসেও আমার জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন নি। যেখানকার পুরুষ তার নারীকে মানুষের অধিকার থেকে তিলে তিলে বঞ্চিত ক'রে, সবলে দেবী বানিয়ে তোলবার মূঢ় গর্ব্বে নিষ্ঠুর; যেখানে লক্ষ মায়ের চোখের জল দিনের পর দিন মাটিতে মিশেছে সেই বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার বলে সেই বাংলা দেশকে যদি নারীনির্যাতনের পাপ থেকে একটুও মুক্ত করতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। সেই সামান্য উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আমি যোগ দিয়েছি। আপাততঃ এর চেয়ে বড় মুক্তির কথা আমি ভাবি না। আপনি বলছেন বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষকে দেশ ভেবে সেই দেশের স্বাধীনতার রূপ এ প্রকার অবস্থায় কিছুতেই স্পষ্ট ক'রে ভেবে উঠতে পারছি নে। তা ছাড়া পোলিটিক্যাল ইমান্সিপেশন্ ইত্যাদির কথা আমার কখনও মনে হয় নি। আপনি বরং শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এ-সব কথা বলুন, দেখুন তিনি কি বলেন।"

সীমা পার্ব্বতীর সম্বন্ধে মনে মনে হতাশ হয়ে বললে, "আপনার পূর্ব্ব জীবন যেমন ভাবে কেটেছে বলছেন, তাতে আপনার নিজের দেশের স্বাধীনতার সম্বন্ধে দরদ হওয়ার কথা নয়। সে যাই হোক গে। শচীনবাবু করেন কি? তাঁর ঠিকানাটা যদি—"

"শচীনবাবু জমিদার। তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানা অবশ্য ঠিক জানি না। আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" ব'লে সে বেরিয়ে ভোলানাথের কাছে গেল।

পার্ব্বতীর মনেও শচীনের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা অনেক দিন থেকেই ছিল। ভাবলে, এই মেয়েটির সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না। মেয়েটির প্রস্তাবের আলোচনায় আমাকেও ত দরকার হবে। মেয়েটির কথাবার্ত্তায় তাকে অত্যন্ত আনপ্র্যাকটিক্যাল অব্যাপারী ব'লে পার্ব্বতীর মনে হয়েছিল—এবং তার স্নেহের প্রতিষ্ঠানটিকে ওর সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেবার প্রস্তাব পার্ব্বতীর ভাল লাগে নি। মনে মনে ভাবলে, "দু-মাস এলেন না। কোথায় একলা একলা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়বেন হয়ত।" তারই কথায় যে এমনটি ঘটেছে এই কথা মনে ক'রে অনুতপ্ত হয়ে সে মনে মনে বললে, "না; এর একটা বিহিত ক'রে ফেলতেই হবে।"

শচীন্দ্রের নায়েবের কাছ থেকে যদি কোন ঠিকানা পাওয়া যায় এই আশায় ভোলানাথকে গিয়ে বললে, "ভোলাদা, একটা নৌকা ঠিক ক'রে দিতে পার?"

"কেন দিদিমণি, বেড়াতে যাবে?"

"না, তোমাদের দেশে যাব। নৌকায় কতক্ষণ লাগবে বল ত?"

"তা বাতাস পেলে এক দিনেই যেতে পারে ওতরবাড়ী। সেখান থেকে সিংযোড় রেলে এক ঘণ্টার পথ। আর সিংযোড় ইষ্টিশন থেকে বল্লভপুর এক পো পথ।"

"তোমায় কিন্তু এখানে কয়দিন থাকতে হবে। সব দেখবে শুনবে। পারবে ত?"

তা খুব পারব। সে তোমায় ভাবতে হবে না।"

"আচ্ছা ভোলাদা—এলাহাবাদে যেখানে ছিলে সে জায়গাটার নাম জানো?"

"তা ত মনে নেই, দিদিমণি। যোম্‌নোর ধারে "রাণী কুঠি" বললেই নে যাবে' খন। সামনেই যোম্‌নোর ওপর একটা ভাঙা ইটের বাঁধানো মত আছে। ত্রিবেণী থেকে বেশী দূর নয়।"

"আচ্ছা যাও, নৌকা ঠিক করগে। দুপুরে খেয়ে দেয়ে বেরব।"

কয়েক দিনের জন্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে সীমাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন সীমা ও পার্ব্বতী যখন শচীন্দ্রের গ্রামে গিয়ে পৌঁছল তখন রাত ন-টা। ম্যানেজার অত্যন্ত সমাদরে পার্ব্বতী ও তার সঙ্গিনীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তার পর সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শচীন্দ্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র রূপ দেখাতে এবং গল্প করতে লাগলেন। পার্ব্বতীর থেকে থেকে একটা অস্পষ্ট বেদনা জেগে উঠছে। শচীন্দ্র তার এই সুখসমৃদ্ধির সহজ আরাম পরিত্যাগ ক'রে তারই জন্য আজ গৃহত্যাগী। তাকে তার স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ ত তারই কাজ। এই সব চিন্তায় অন্যমনস্ক রয়েছে সে; সীমাও নির্ব্বাক বিস্ময়ে শচীন্দ্রের এই ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ অনুমান করবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে তার মনে এই বিত্তশালী পুরুষটিকে আয়ত্ত করবার বাসনা জেগে উঠছে। শচীন্দ্রকে যদি কোন মতে তার পথের পথিক করা যায়। ভাবে, মন যার পরের জন্য কাঁদে দেশের ক্রন্দন তার কানে নিশ্চয় পৌঁছবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আবার মনে হয়, যদি সে অন্য দশ জনের মত বিলাসী জমিদার হয়, যদি ভীরু হয়। যদি ইংরেজের প্রসাদজীবী হয়, মন তার জ্বলে ওঠে, রঙ্গলালের কথা মনে হয়। ভাবে, তবে রঙ্গদার বড় শিকার জুটবে—উঃ কি খুসিই হবে সে। ভাবতে ভাবতে ঠিক করে সে কলকাতায় গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে তবে যাবে।

শচীন্দ্র সত্যই প্রয়াগে একাকী যাপন করবার জন্য গিয়েছিল, এবং যদিও ম্যানেজারের প্রতি হুকুম ছিল যে কোন বিষয়কর্ম্ম নিয়ে তাকে বিরক্ত করা না হয়, তবু পার্ব্বতীকে তার ঠিকানা না জানাতে ম্যানেজার সাহস করে নি। কমলাপুরী ও পার্ব্বতী সম্বন্ধে শচীন্দ্রনাথের মনোভাব ম্যানেজারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচর ছিল না। ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পরদিন সীমা ও পার্ব্বতী কলকাতায় রওনা হ'য়ে গেল। কলকাতায় শচীন্দ্রের বাসার ঠিকানা পার্ব্বতীর জানা ছিল। দু-জনে প্রথমে সেখানেই গিয়ে উঠল। সীমা বললে, "দেখুন, আজ রাত্রের ট্রেনেই আমরা রওনা হব। আমি এখন একটু কাজে বেরব। সময়মত আপনি ষ্টেশনে যাবেন, সেখানেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।" পার্ব্বতী একটা নমস্কার ক'রে সীমাকে বিদায় দিলে। তার চিত্ত তখন নানা চিন্তায় আকুল। শচীন্দ্রের এই বাড়ীতে সে অনুপস্থিত শচীন্দ্রের সত্তাকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে একবার অনুভব ক'রে নিতে চায়। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব তার কাছে আনন্দদায়ক নয়।

সমস্ত দিন সে নিজেকে বিশ্রাম দিল না। শচীন্দ্রের বিস্রস্ত সংসার সে নিজের নৈপুণ্য দিয়ে সুন্দর মনোরম ক'রে তুলতে চায়, যেখানে এলে শচীন্দ্রের এতদিনকার লক্ষ্মীছাড়া শ্রীহীন জীবনযাত্রাকে সে তৃপ্তিদান করতে পারবে। বৈকালের দিকে কাজকর্ম্ম সমাধা ক'রে সে শচীন্দ্রের শোবার ঘরের নূতন সরঞ্জামগুলি তদারক করতে গেল। শচীন্দ্রের শয্যার পাশে তার দোলা-চেয়ারটিতে শুয়ে সে শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা দুঃস্বপ্নের আঘাতে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসল। স্বপ্নে দেখল, কমলা ফিরে এসেছে। কমলাপুরীর ঘাটের কাছে লঞ্চ প্রস্তুত, এখনই তাকে চলে যেতে হবে—তার মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে—অথচ কিছুতে শচীন্দ্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। যে লজ্জাহীনা, কমলার অনুপস্থিতিতে তার স্বামীকে গ্রাস করতে চেষ্টা করছে, তার কাছে শচীন্দ্রকে কমলা বিদায় নেবার ছলেও যেতে দেবে না। ঘুম ভেঙে পার্ব্বতীর মনটা বিকল হয়ে গেল। যদিও স্বপ্ন, তবু এ-কথা সে না ভেবে থাকতে পারল না যে শচীন্দ্র কমলারই প্রতি এখনও অনুরক্ত। তবে কেন সে তার প্রতি শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতার সুযোগে তাকে গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করবে। এলাহাবাদে সে যাবে না এটা স্থির ক'রে চাকরকে দিয়ে সে সীমার কাছে ষ্টেশনে চিঠি পাঠিয়ে লিখল,

"বিশেষ কারণে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

সকালে সীমাকে ভৃত্যটি দেখেছিল, সুতরাং পার্ব্বতীর নির্দ্দেশমত ষ্টেশনে সীমাকে খুঁজে বার করতে তার কষ্ট হয় নি।

৫০

সীমা যে কলকাতায় ফিরেছে একথা নারীভবনে প্রকাশ করতে তার বাধা ছিল। তাই সে সোজা রঙ্গলালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

রঙ্গলাল সীমার কথা শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল, বললে, "দরকার কি আর ঘোর-প্যাঁচ খেলে। ওসব ভুঁড়ো-পেট জমিদার তোমার ওসব কথায় রাজী হবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাঁবেদারীতে জমিদারী বাঁচিয়ে তাদের খেতে হবে ত। রেভল্যুশনারী হ'লে তাদের চলবে কেন, তার চেয়ে একেবারে এলাহাবাদ থেকে তাকে কিড্ন্যাপ ক'রে আনা যাক—কি বল?"

সীমা বললে, "রঙ্গদা, তোমার দুঃসাহস যতখানি, বুদ্ধি যদি ততটা খেলত তবে এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তোমার জোড়া মিলত না। লোকটাকে আমি কলকাতায় এনে ফেলি। তখন তোমার ট্যাক্সির সাহায্যে তোমার খাঁচায় পোরা শক্ত হবে না। একেবারে হাওড়া ষ্টেশন থেকে দমদমার বাগানে—বুঝলে কি না। আজ বুধবার, শনিবার সন্ধ্যার সময় প্রস্তুত থেকো।"

আহতপুচ্ছ রঙ্গলাল মনে মনে ক্রোধ পরিপাক ক'রে চলে গেল। সীমার নিয়ত শ্লেষ তার আর সহ্য হচ্ছিল না। সীমার কর্তৃত্বে অকারণ নরহত্যার উত্তেজনা নেই, বিপদের সন্ধান নেই, মাত্র নির্জ্জীব নিয়মের অধীনে সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুযোগের অপেক্ষায় নীরবে কাজ ক'রে চলায় তার ধৈর্য্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে এসেছিল। দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ একটা কিছু ক'রে ফেলবার তাড়নায় তার চিত্ত নিজের বাহিরের পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। ধর্ম্মজ্ঞান ব'লে কোন বস্তু তার বড় একটা ছিল না। সীমার অনুপস্থিতিতে সে কি করবে তার একটা মতলব মনে মনে ঠিক ক'রে সীমাকে বললে, "বেশ কথা, আমি এদিকে সব ঠিকঠাক ক'রে রাখব; কেবল আসবার আগে একটা খবর দিও।" এত সহজে বিনা তর্কে রঙ্গলালকে রাজী হ'তে দেখে সীমা একটু খুশী হ'ল।

৫১

নন্দলাল যদিও বাহ্যতঃ তার সংসারযাত্রায় পরিপূর্ণ আগ্রহ ও একাগ্রতার অভিনয় ক'রে চলেছিল, তবু মন তার সুস্থ ছিল না। জ্যোৎস্নার সম্বন্ধে তার মতিচ্ছন্ন চিত্ত কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল। হতভাগা ডাক্তার যে জ্যোৎস্নাকে তার কাছ থেকে এমন ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আয়ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ ক'রে ফেলবে এ সে সহ্য করতে পারে না। কিছুদিন সে অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি ক'রে নিজের মনকে বশে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার মনে করলে, মরুক গে ডাক্তার, আর এমন ক'রে অশান্তি ভোগ করা যায় না। কিন্তু 'মরুক গে' বললেই উদ্দাম বাসনাকে কিছু আর সংযত করা যায় না। তবু সে অনন্যোপায় হ'য়ে অর্থোপার্জ্জনের দিকে প্রাণপণে নিজেকে নিযুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল। নাওয়া-খাওয়ার সময়ের আর কোন স্থিরতা রইল না। প্রতিদিন রাত্রে ফিরে নিতান্ত শ্রান্ত নির্জ্জীব হয়ে সে রাত্রে শয্যায় আশ্রয় নিত। শ্রান্ত চোখে নিদ্রা আসতে বিলম্ব হ'ত না এবং প্রাতঃকালে উঠেই আবার ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা জটিল ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলবার অসাধ্য সাধনে সময় ও শরীরকে সে ক্ষয় করতে লাগল।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের পরিচিত দরোয়ানের সঙ্গে বাড়ীর দরজায় তার সাক্ষাৎ হ'ল। জ্যোৎস্নার নামে মালতীর একখানা চিঠি নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই নন্দলালের মনে একটা কুটিল সন্দেহপূর্ণ আশার সঞ্চার হ'ল। নিতান্ত অকারণে যে হাসপাতালের দরোয়ানের তার গরীবখানায় আগমন সম্ভব নয় এটুকু বুঝতে তার দেরী হয় নি। জ্যোৎস্নার কাছ থেকেই যে দরোয়ান এসেছে এই কথা মনে ক'রে সে পরিচিত দরোয়ানকে নিতান্ত পুরাতন বন্ধুর মত প্রায় সমাদর ক'রে বললে, "এই যে এস এস দরোয়ানজী! সব ভাল ত? তোমাদের ওদিকে অনেক দিন যেতে পারি নি। তার পর কেমন আছ?"

দরোয়ান অত্যন্ত আপ্যায়িত হ'য়ে কুশল প্রত্যভিবাদন

করলে। নন্দ নিতান্ত ভালমানুষের মত বললে, "আরে একটু বোস দরোয়ানজী। তোমার একটা বড় বকশিশ পাওনা আছে; যাই না ব'লে দেওয়াই হয় নি। আজ নিয়ে যাও।"

এক গাল হেসে দরোয়ান বললে, "হুজুর মা বাপ, আপনাদের পরবস্তিতেই গরীব বেঁচে আছে।" ইত্যাদি বলতে বলতে বৈঠকখানার ঘরের মেঝেয় বসল।

প্রথম চেষ্টাতেই এতটা ফল পেয়ে খুশী হ'য়ে নন্দ তার হাতে একটা পাচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললে, "পরবস্তি আর কি দরোয়ানজী, তোমারই ভরসাতে ত জ্যোৎস্না মাইকে ওখানে রাখা। মাই ভাল আছে ত?"

"মাইজী ত বাবু ওখানে থাকে না। সে একটা বোর্ডিমে উঠে গেছে।"

নন্দ তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, "আরে হ্যাঁ, সে ত গেছেই। ওখানে পড়াশুনার অসুবিধা হয় কি না তাই তাকে অন্য বোর্ডিংে দিতে বলেছি। আমার আবার কাজকর্ম্মের চাপে যাওয়া হয় না। বাড়ীটার নম্বর ভুলে গেছি, একখানা চিঠি দেব তাও হয় না।"

"দেন না, আমাকে দিয়ে দেন, আমি পৌছে দেব।"

"না না আজ মাইজী চিঠি দিয়েছে, আজ আর কাজ নেই। ঠিকানাটা এনে দিও, আর ভাল ক'রে দেখাশুনা ক'রো, তোমায় আরও বকশিস করব। পাস করলে দোপাট্টা আর পাগড়ী পাবে।"

"হুজুর মা বাপ। কালই আপনাকে ঠিকানা এনে দেব।"

"বেশ বেশ। আর দেখ আমি যে ঠিকানা ভুলে গেছি একথা আর কাউকে ব'লো না, এ বড় সরমের বাৎ। বুড়ো হয়ে কিছু মনে থাকে না, বুঝলে। কাল ঠিকানা এনো, বুঝলে?"

"জি হুজুর" ব'লে দরোয়ান বারংবার অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে।

ঠিকানা সংগ্রহ হওয়ার পর থেকে নন্দর আর স্বস্তি রইল না। দুঃসাহসে ভর ক'রে সে যে নারীভবনে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে তেমন সাহস সে সংগ্রহ করে উঠতে পারে না, অথচ নিত্য সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নারীভবনের আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার নেশায় তাকে পেয়ে বসল। নারীভবনের একটা জানালায় একদিন কমলাকে দেখে তার নেশা আরও বেড়ে গেল। মোহগ্রস্ত মেহের আলির মত সে যেন নারীভবনের ক্ষুধিত পাষাণের আকর্ষণ থেকে নিজেকে কিছুতেই দূরে রাখতে পারে না। কমলাকে অপহরণ করবার নানা অসম্ভব কল্পনায় সে প্রায় সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিল; এবং এমনি ক'রে সে রঙ্গলালের অনুচর নারীভবনের রক্ষীদের শুভদৃষ্টির কোপে পড়ে গেল।

প্রত্যহই একটা লোককে সন্দেহজনকভাবে নারীভবনের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখে অনুচরদের একজন আর একজনকে একথা জানালে। ক্রমে রঙ্গলালের কানেও কথাটা উঠল। দু-চার দিন পর্য্যবেক্ষণ ক'রে রঙ্গলালেরও লোকটাকে সুবিধের মনে হ'ল না। পুলিসের চর যে, সে বিষয়ে তার আর সন্দেহ রইল না। নন্দর উপর তারা কড়া নজর রাখতে লাগল।

লোকে নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজেই পরিষ্কার ক'রে থাকে। কমলাকে উদ্ধার করবার কোন উপায় চিন্তা ক'রে উঠতে না পেরে সে মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠল। এমনই ক'রে রাস্তায় রাস্তায় একটা স্ত্রীলোকের মোহে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ানোর গ্লানিও তার মনে সঞ্চিত হচ্ছিল; এবং তার নিজের মনকে ও নিজের অজ্ঞাতে মালতীকে কৈফিয়ৎ দেবার উদ্দেশে সে নিজেকে বুঝিয়েছিল, "জ্যোৎস্নার অভিভাবক সে, জ্যোৎস্নাকে এমন ক'রে ভেসে যেতে দেবার তার কোন অধিকার নেই।" জ্যোৎস্নার প্রতি তার চিত্ত লোভাতুর একথা সে মানতে চাইলে না। কোন এক সময়ের মোহের দুর্ব্বলতার জন্যে চিরকাল কি সে অমানুষ হয়ে আছে? কখনই না। এমনি ক'রে নিজেকে বুঝ দিয়ে সে নিজের এবং অপরের কাছে যেন আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখলে। মনে মনে বললে, "জ্যোৎস্না সম্বন্ধে তার একটা দায়িত্বও ত আছে? ডাক্তার কে? কে বলতে পারে তার অতিভদ্রতার আড়ালে অসদুদ্দেশ্য নেই। এই ত হাসপাতালের ডাক্তাররাই ত কত কি বলে ওর নামে। এমনি কিছু আর বলে না? হ্যাঁ, অমন সাধুগিরি ঢের দেখেছি। আরে তুই কে রে বাবা, যে জ্যোৎস্নার জন্যে

তোর এত মাথা ব্যথা? তা ছাড়া জ্যোৎস্নাই না হয়, নির্ব্বোধ। ওর মৎলব কিছু বোঝে না; তাই ব'লে তাকে বাঁচান ত তারই কাজ।"

তার অন্তরের বাসনা তার কর্ত্তব্য বোধের মহৎ প্রেরণা পেয়ে একেবারে উদ্দাম ক'রে তুললে তার চিত্ত ও চেষ্টাকে। সে যখন অভিভাবক তখন সে পুলিসের সাহায্যে জ্যোৎস্নাকে উদ্ধার করবে না কেন! এই ভেবে সে একদিন উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে পুলিস-ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়েই তার উৎসাহ এল জুড়িয়ে। যদি জ্যোৎস্না তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তার বিরুদ্ধে অত্যাচার করার পাল্টা নালিশ করে? পুলিসকে সে চিরদিনই ভয় ক'রে এসেছে। পুলিসের কাছে নালিশ জানালে ভোগান্তি তারও যে কিছু কম হবে না একথা সে যতই চিন্তা করতে লাগল উৎসাহ তার ততই কমে এলো। তা ছাড়া, ব্যাপারটাকে এত প্রকাশ্য ক'রে ফেলা তার 'সৎসাহসে' কুলচ্ছিল না। মালতী তার এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে তার গোপন অভিসারের কাহিনী জানতে পারলে আর এক পারিবারিক হাঙ্গামে তাকে পড়তে হবে, এবং তার অধুনা নিরাময়যুক্ত গৃহব্যবস্থার মধ্যে আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হবে। কোন দিকেই সে আর যেন কোন উপায় খুঁজে পেল না। চিন্তা করতে করতে তার মনে আর স্বস্তি রইল না। পুলিসের কোন হাঙ্গামে নেমে পড়তে তার ভীরু মন পেছিয়ে এল। কোনও দিকে কোন উপায় না করতে পেরে তার চিরাভ্যস্ত গৃহানুগত ভদ্র অন্তঃকরণ আবার তাকে গৃহাভিমুখে ফিরিয়ে আনবার সুযোগ পেল। সে ভাবতে লাগল, "কেন আমি আমার শান্ত গৃহনীড়টুকুর মধ্যে মালতীর অকৃত্রিম স্নেহ সেবা যত্নে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারব না! আমি ভদ্রসন্তান, কেন আমি বারংবার অভদ্র লোভে বিশ্বাসঘাতকের নীচতার মধ্যে নামতে চাচ্ছি! ছি ছি! এতটুকু সংযমে আমি নিজেকে যদি না বাঁধতে পারি তবে মনুষ্যসমাজে আমার স্থান হওয়া উচিত নয়।"

নিজেকে ভদ্রসন্তান ব'লে চিন্তা করতে করতে সে ভদ্রজনোচিত মনোবৃত্তিকে নিজের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। ভাবলে, "ফিরে গিয়ে নিজেকে মালতীর নিশ্চিত স্নেহাশ্রয়ে সমর্পণ করি। জ্যোৎস্নার জন্য আমার চিত্তে যে-প্রেম, তা যেন আজ থেকে অহেতুকী হয়। ওরই মঙ্গলের জন্য যেন সে-প্রেমকে নিয়োজিত করতে পারি।" ভাবতে ভাবতে সে বাঙালীর ভাবপ্রবণ চিত্তের আবেগে নিজেকে যেন মার্টারের পংক্তিতে নিয়ে বসালে এবং নিজের প্রতি করুণাপূর্ণ শ্রদ্ধা তার মনে জেগে উঠল।

সে শ্রান্তচিত্তে বাড়ী গেল এবং তার অনুতপ্ত মনের অবসাদ নিয়ে মালতীর কাছে অধিকতর স্নেহ করুণা এবং আদরের প্রার্থী হয়ে তার কাছে ফিরে গেল। রাত্রে মালতী উদ্বিগ্ন হ'য়ে সুধোলে "কি গো, অমন করছ কেন?" নন্দলাল তার জবাব না দিয়ে মালতীকে ঘনিষ্ঠতর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে তার বুকে মাথা গুঁজে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল।

রঙ্গলালের চেলাদের মনে যেটুকু সন্দেহ বা ছিল তার আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইল না। সীমার অনুপস্থিতি রঙ্গলালের দুর্দ্দম জিঘাংসাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুললে। সীমাকে নির্ঝঞ্ঝাটে লঙ্ঘন করবার এত বড় সুযোগ সে ছাড়লে না। নিতান্ত অকারণে নিঃসহায় স্বভাব-ভীরু নির্ব্বিরোধী নন্দলালকে পরদিন তার নিজের বাড়ীর সামনে নৃশংসভাবে তারা হত্যা করলে। মালতীর ক্রন্দনে পুলিসের চোখও সেদিন শুষ্ক রইল না। ব্যাপারটা সহজে সীমার গোচর না হয় রঙ্গলাল যথাসাধ্য তার ব্যবস্থা করেছিল।

নিখিলনাথ সংবাদ পেয়ে নন্দলালের বাড়ী উপস্থিত হ'ল; এবং যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থাদি করতে লাগল। প্রথমেই সে জ্যোৎস্নাকে মালতীর কাছে এনে রাখলে। যে-বাড়ীতে প্রাণান্তেও কমল প্রবেশ করবে না ব'লে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল, আজ তারই আশ্রয়দাত্রীর এক অভাবনীয় সর্ব্বনাশের সূত্রে সেখানে প্রবেশ ক'রে নিজেকে সে "দুরদৃষ্ট সর্ব্বনাশী" ব'লে মনে মনে নির্য্যাতন করতে লাগল। নন্দলালের গতিবিধির কথা নিখিল পূর্ব্বে তারই কাছে শুনেছিল; সুতরাং এটা যে সীমার দলেরই কাজ একথা নিখিলের বুঝতে দেরী হয় নি। নিখিল দুঃখ ক'রে কমলাকে বলেছিল, "হায় রে এত ভাল মানুষ এই নন্দবাবু; তাঁর একটা দুর্ম্মতির এ কি অকারণ কঠিন পরিণাম হ'ল!" প্রশ্ন ক'রে নিখিলের কাছ থেকে কমলা ব্যাপারটা বুঝে অনুতাপের তার আর সীমা রইল না। সেই না সীমাকে নন্দলালের গতিবিধির কথা

জা[illegible]য়েছিল! তার জানানতে যে কিছু হয় নি একথা তার মন মানতে চাইল না।

পরদিন নিখিল ভুলু দত্তর কাছে গেল; এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস কমিশনরের কাছে ঘোরাঘুরি ক'রে সে পুলিস হাঙ্গামের ব্যাপারটা অনেকখানি সংক্ষেপ ক'রে আনলে। নন্দলালের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক ব্যাপারের কিছুমাত্র যোগ না থাকায় পুলিস এই খুনটাকে নিছক তার কোন পাওনাদার বা শত্রুর কাজ বলেই সাব্যস্ত করলে। অনুসন্ধান অবশ্য চলতেই লাগল, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপার অনুসন্ধানের উৎসব-আয়োজনের উৎসাহ আর ততটা রইল না।

৫২

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে নিখিলনাথের সময় অতিবাহিত হ'তে লাগল। নন্দলালের বাড়ীর চারিদিকে পুলিস প্রহরী বসেছিল, সুতরাং বাইরে থেকে সে-বাড়ীতে বিপদের সম্ভাবনা বড় একটা ছিল না। তার ভয় ছিল শুধু অনুপস্থিত সীমা সম্বন্ধে। এদের দলের অস্তিত্বের কতখানি সন্ধান ভুলু দত্তের কাছে আছে তা সে জানত না। শুধু একটা অজানা ভয়ে সীমা সম্বন্ধে তার মনকে অত্যন্ত চিন্তাতুর ক'রে তুললে। কমলাকে অবশ্য সে কোন রকম কথাবার্ত্তা পুলিসের কাছে না-বলতে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। তবু তার মনে স্বস্তি রইল না। সীমার সাক্ষাৎ পাওয়া তার নিতান্ত আবশ্যক। এই ঘটনার মধ্যে সীমার কোন হাত ছিল কি না তা সে না জানলেও, সময়মত সীমাকে সাবধান ক'রে দেওয়ার জন্যে মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং অনতি-বিলম্বে কমলাপুরীতে যাওয়া ঠিক ক'রে সে শ্রান্তচিত্তে নিজের কামরায় ফিরে গেল।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মন তার অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সবচেয়ে যা নিয়ে তার মনের দ্বন্দ্ব সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, যে-চিন্তা সবচেয়ে তীব্র হয়ে তার অন্তরাত্মাকে পীড়িত করছিল, যে-সমস্যা তার জীবনপথে সবচেয়ে জটিল হয়ে উঠেছিল, তার কোন সমাধান সে খুঁজে পেল না। তার প্রেমের দিক দিয়ে সীমাকে রক্ষা করবার প্রবল ইচ্ছা তাকে যে তার সত্য থেকে বিচলিত করেছে, তার গ্লানি অন্তরে অন্তরে তাকে পীড়িত ক'রে তুলেছিল। আজ এই হত্যার এবং হত্যাকারী দলের প্রায় সকল সন্ধান জেনেও সীমার প্রতি তার একান্ত আকর্ষণে যে সে বাইরের দিক থেকে বাধাস্বরূপ হয় নি একথা সে ভুলতে পারছে না।

মানুষের চিত্তের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিজের কাজের সমর্থনে চিন্তা এক সময় অন্য যুক্তি তার মনের মধ্যে অবতারণা করলে।

সীমা এই হত্যাকাণ্ডে হয়ত লিপ্ত নেই; অথচ তার নিজের সাধুতার মূল্যে এদের সন্ধান দিয়ে সীমাকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবে কেমন ক'রে। তা ছাড়া এরাই যে তাকে হত্যা করেছে তারই বা নিশ্চয়তা কি! সুতরাং—। কিন্তু এমন ক'রে নিজেকে বুঝিয়েও মনের কাঁটা তার দূর হ'তে চাইল না। নিখিলনাথের মনে সীমার সর্ব্বনাশময় ভবিষ্যতের আতঙ্কে তার নিজের বিবেকের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল। কিছুমাত্র বিলম্ব করলেই যে সীমাকে তার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে কোনমতেই রক্ষা করতে পারবে না একথা মনে করে সে পরদিন প্রত্যূষেই কমলাপুরী যাবার বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ফেললে। লঞ্চের সারেঙকে প্রশ্ন ক'রে সে বুঝতে পারলে যে সীমা সত্যিই কমলাপুরী গিয়েছে এবং সেখান থেকে এখনও ফেরে নি। এইটুকু সংবাদে তার মন অনেকটা শান্ত হ'ল। আর কিছু না হোক, সীমাকে সে কলকাতায় ফিরবার পূর্ব্বেই ধরতে পারবে। সীমাকে যে সে এই ব্যাপার থেকে নিরস্ত করতে পারবে সে আশা তার মনে ছিল না। তবু আপাতবিপদসম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে পারলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথ মুক্ত থাকে এই চিন্তা ক'রে সে নিজের চিত্তকে স্থির করতে চেষ্টা করতে লাগল।

কতকটা এই চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় এবং কতকটা কমলাপুরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার আগ্রহে নিখিল সারেঙের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। অপ্রশস্ত রঙ্গিণী নদীর তীরে তীরে নিরাময় নিশ্চিন্ত আনন্দকলোচ্ছ্বাসপূর্ণ সহজ জীবনযাত্রার বিচিত্র লীলা তার চিত্তে কোলাহল-মুখরিত নগরীর উদ্বেগ উত্তেজনাপূর্ণ জটিল ব্যর্থ অজস্রতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলছিল। তার মনে হ'ল মানবের মঙ্গলসাধনের উন্মাদ মোহের উন্মত্ত গতিবেগ থেকে যদি কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে এই শান্ত কোমল

স্নিগ্ধ নিশ্চিন্ত গ্রাম্য কুটীরের উত্তেজনাবিহীন মাতৃক্রোড়ে স্থান লাভ করতে পারে; যেখানে একটিমাত্র বিক্ষুব্ধ হিংসাতপ্ত জর্জ্জরিত জীবনকে সে আপনার স্নেহের আশ্রয়ে স্নিগ্ধ শান্ত পরিতৃপ্ত ক'রে সে নিজের অবখ্যাত অস্তিত্বের শান্তিপূর্ণ অবসানের মধ্যে অনন্ত বিস্মৃতিসাগরের একটি বুদ্বুদের মত মিশিয়ে যেতে পারবে।

সারেঙ গল্প করে চলেছিল মনের আনন্দে, তার মধ্যে অধিকাংশই তার আত্মকথা; তার জলচর-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর ইতিহাস। সত্যের চেয়ে রূপকথার সঙ্গেই তার সম্পর্ক অধিক। কিন্তু বহু আবৃত্তির ফলে তারও মনে সেগুলি বিশ্বাসের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। সত্য মিথ্যায় পূর্ণ তার এই সরল কাহিনী নিখিলের মনে আনন্দের সঞ্চার কম করে নি। মাঝে মাঝে প্রশংসাপূর্ণ প্রশ্ন ক'রে গল্পের ধারাকে সে অক্ষুণ্ণ রাখলে।

আত্মকাহিনীর গতিবেগ স্তিমিত হয়ে এলে এক সময় নিখিল তাকে প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁ, সাহেব, এই কমলাপুরীতে নাকি কোন পুরুষমানুষ নেই—সব নাকি মেয়েরা করে? সত্যি? কোন পুরুষ সেখানে যেতে পায় না?"

সারেঙ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, "উহুঁ একেবারে বাদশাহদের হারেমের মত।" তুলনাটা ঠিক নয়, তবু সারেঙের মনে কমলাপুরী সম্বন্ধে গর্ব্ব করবার ওর চেয়ে আর সম্মানজনক উপমা তার মনে ছিল না। তার পর একটু থেমে বললে, "কেবল রাজাসাহেব মাসে একবার আসেন। তা সাহেব সেই ত বাদশাহ।" কথাটা বিসদৃশ, কিন্তু সে বেচারার মনে মনিবের পদমর্য্যাদার পরিমাণটা বোঝাবার আগ্রহও কম নয়।

তার কথায় হাসি পেলেও নিখিল গম্ভীর হয়েই শুনছিল। কৌতূহলও হ'ল তার, বললে, "পার্ব্বতী দেবী মালিক না?"

সারেঙ আবার উৎসাহের সহিত বললে, "আলবৎ, ওই ত সব। রাজাসাহেব ত শুধু টাকা দিয়ে খালাস। তিনি জমিদার কিনা! পেল্লায় জমিদার সাহেব। গ্রামে তার হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, সাত মহলা বাড়ী—বাড়ী ত নয় একটা শহর।"

"বটে! তা নিজের গ্রামে এ সব না ক'রে এমন একটা জায়গায় এ-সব কেন করলেন?"

"তা কি জানি সাহেব। রাজা-রাজড়ার মর্জ্জি। গ্রামে ত তিনি থাকেনই না। বেলাত থেকে আসার পর কলকাতাতেই বেশী থাকেন। সাহেব-লোকের কি গ্রামে ভাল লাগে আর। আর তা লাগবেই বা কি সাহেব, রাণীমা ছিল যেন 'বেহস্তর পরী'। অমন জরু গেলে লোকে গলায় দড়ি দেয়।"

এবার নিখিল একটু হেসেই ফেললে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "রাজার ছেলেপিলে নেই বুঝি?"

"হায় আল্লা, ছেলেও ত ঐ এক সাথে গেছে। কত তল্লাস হ'ল সাহেব; তা কারোরই খোঁজ মিলল না।" ব'লে সারেঙ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েই বোধ করি বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করলে।

নিখিলনাথ এতক্ষণ অলস অবসর যাপন করবার আশায় শিথিল চিত্তে গল্প শুনছিল। হঠাৎ সে খাড়া হ'য়ে বসে সারেঙের হাত প্রায় চেপে ধরলে। এত বড় আশ্চর্য্য সংবাদ যে এই দুঃসময়ে তার কাছে এসে ধরা দেবে, তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিছুক্ষণের জন্যে সে কালকের দুর্ঘটনা, সীমার সর্ব্বনাশ, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা সব ভুলে গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, "বল, বল সাহেব, বল ত ব্যাপারটা কি? তোমাদের রাণীমা আর তাঁর ছেলে কি হারিয়ে গেছে?"

তার এই আগ্রহ এবং কৌতূহলে সারেঙ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'ল। বিরক্তও হ'ল মনে মনে। এতখানি গল্প করার তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নিখিলনাথের স্বাভাবিক সৌজন্য এবং সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে সেদিন গল্প করতে করতে তারও মনটা একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিল। এখন সচেতন হয়ে সে মনে মনে চটে গেল। তার মনে হ'ল ঘরের বৌয়ের নিরুদ্দেশের সংবাদে কেমন যেন ইজ্জতের হানি হ'য়ে যাচ্ছে—প্রায় একটা বে-আবরু হওয়ার সামিল যেন। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে, "অতশত জানি নে। হারিয়ে গেছে না চোরে নেছে, তাতে আপনার আমার কি? আমার অনেক কাজ সাহেব, তুমি আপনার কামরায় যাও।" ব'লে হঠাৎ পিছন ফিরে সে চলে গেল।

নিখিল ব্যাপারটা বুঝলে। ঘরের গৃহিণী নিরুদ্দেশ হওয়া যে আমাদের দেশে কত বড় দুর্নামের ব্যাপার ত

চিন্তা/ক’রে তার মনটা অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। সত্যিই যদি জ্যোৎস্না তার স্বামীর কোন সন্ধান পায়ও, তা হ’লেও তার উপায় কি হবে!

একবার ভাবলে নিতান্ত সেকেলে কনসারভেটিব বুড়ো নয় বোধ হয়, বিলাত যেত না তাহ’লে। আবার মনে হ’ল, কোথাকার কে তার ঠিক নেই—আগে থাকতেই একটা যোগাযোগ ক’রে সমস্যার সমাধান করতে বসেছি। যাই হোক, এই সূত্রটুকুকে ছাড়া হবে না; ভাল ক’রে অনুসন্ধান ক’রে শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে।

নানা চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে পরদিন সকালে তারা কমলাপুরীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। কমলাপুরী পৌঁছে সে শুনতে পেল যে পার্ব্বতী দেবী আশ্রমে নেই। সম্প্রতি অবশ্য পার্ব্বতী দেবীর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে তার দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। তাকে দেখবার আগ্রহ থাকলেও আসল লোকটির সন্ধান এখনই তার পাওয়া দরকার। সুতরাং যে-ভদ্রমহিলা পার্ব্বতীর বদলে আশ্রমের কর্ণধাররূপে ছিলেন, অগত্যা তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ ক’রে সে সীমার সংবাদে আরও দুশ্চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। পার্ব্বতীকে নিয়ে সীমা চলে গেছে, দুশ্চিন্তার কারণ বইকি? একে ত সীমাকে কলকাতার দুর্ঘটনার কথা ব’লে তার গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ সংযত হবার জন্যে সাবধান করবার অবসরই তার হ’ল না; তার উপর নারী-প্রতিষ্ঠানের অধিনেত্রীকে এই ক’দিনের আলাপে সে এমনভাবে আকর্ষণ কেমন ক’রে করতে সমর্থ হ’ল যাতে তার সমস্ত পরিবেষ্টন থেকে মুক্ত ক’রে এমন অনায়াসে নিজের অনুসরণ করতে তাকে প্রলুব্ধ করলে। পার্ব্বতী যে কিসের আকর্ষণে সীমার অনুসরণ করেছিল নিখিলনাথের তা জানবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং রুদ্রপন্থার অগ্নিমোহেই যে পার্ব্বতীকে সীমা আকর্ষণ ক’রে নিয়ে গেছে সেই কথা ভেবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বনাশ কল্পনা ক’রে সে সত্যই বিশেষ চিন্তিত হ’য়ে পড়ল। এতগুলি অল্পবয়সী নারীর সমগ্র ভবিষ্যৎ অচিরে তাণ্ডবের সর্ব্বনাশে ধ্বংস হয়ে যাবে, অথচ একমাত্র সীমার মোহে এই দুর্গতি থেকে এদের সে বাঁচাতে পারছে না এই মনে ক’রে অনুশোচনায় আবার তার চিত্ত পীড়িত হ’তে লাগল। মনে মনে কোন উপায় সে স্থির করতে পারলে না। কোন প্রকারে সীমাকে লুটে নিয়ে সে যদি উধাও হ’তে পারে, ভারতবর্ষের বাহিরে, জাভায় হোক, আফ্রিকায় হোক, বনে জঙ্গলে মরুভূমিতে, মনুষ্যবিহীন নির্জ্জন দ্বীপে, যেখানে হোক, যদি পালাতে পারে! উঃ সে আর ভাবতে পারে না। তার মনে হ’ল এতগুলি জীবনের নিশ্চিত সর্ব্বনাশের অভিশাপ তার উপর উদ্যত হ’য়ে উঠেছে। তার জীবনের সত্যব্রতের অগ্নিপরীক্ষায় সে একেবারেই অপদার্থ হয়ে রইল। যেমন ক’রেই হোক সীমাকে তার ধরাই চাই।

অন্তরের এই ঝঞ্ঝাকে অন্তরে অবরুদ্ধ রেখে সে উপনেত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, “দেখুন, অনিন্দিতা দেবীর আশ্রম থেকেই আমি আসছি। তাঁকে আমার বিশেষ দরকার। তাঁর বোর্ডিঙের একজন মেয়ের বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে তাঁর ভগ্নীপতিকে খুন করেছে। সেই সম্পর্কে অনিন্দিতা দেবীকে এখনই আবশ্যক। দয়া করে তিনি কোথায় গেছেন—।” নিখিলকে তার কথা শেষ করতে হ’ল না।

একটি বাঙালী মেয়ের কাছে অকস্মাৎ একটা খুনের কথা উল্লেখ করলে যে সে অভিভূত হয়ে পড়বে এবং অনেক প্রশ্ন ইত্যাদির বিড়ম্বনা থেকে সে বেঁচে যাবে এই উদ্দেশ্যে কথাটা সে বলেছিল। উদ্দেশ্য সফল হ’তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ’ল না। “ও মা গো, কি সর্ব্বনাশ! খুন করেছে? কি ভয়ানক। চলুন, নিয়ে যাই আপনাকে। ভোলাদা, ও ভোলাদা।” বিশেষ বিচলিত হয়ে সে ডাকাডাকি সুরু ক’রে দিলে। অল্প অনুসন্ধানের পর ভোলানাথকে তারা নদীর ধারে দেখতে পেল। নিখিল ভাবলে, “ভোলাদা” “ভোলাদা” এ নাম যেন কার কাছে শুনেছে। চিত্ত বিব্রত না থাকলে একথা স্মরণ করতে এতটুকু বিলম্বও তার হোত না! হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কমলার প্রলাপ, “ভোলাদা, খোকনকে একটু ধর না।”

আবার লঞ্চের সারেঙের কথাও মনে পড়ল। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সে শুভ্রকেশ সেই বৃদ্ধকে দেখতে লাগল। এই কয় বৎসরের মধ্যেই খোকনের শোকে এবং নানা চিন্তায় তার অনাগতপূর্ব্ব বার্দ্ধক্য তাকে এসে আক্রমণ করেছিল। তার বলিষ্ঠ দেহ অনেক কৃশ অল্প ন্যুব্জ, তার কেশ পলিত এবং মুখশ্রী বলিরেখায় আকীর্ণ হয়েছিল। জ্যোৎস্নার বর্ণিত যৌবনলাবণ্য এবং বলিষ্ঠতার বিশেষ চিহ্ন এই লোকটির

দেহে না দেখে সে একটু হতাশ হ'ল। তবু অনেক নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে জ্যোৎস্নার কাছে শোনা তাদের ভৃত্যের বর্ণনার অল্প কিছু মেলে বইকি? এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও কতকটা আশার সঞ্চার তার মনের মধ্যে হ'তে লাগল। আশাতেই আশার বৃদ্ধি। তার মনে হ'তে লাগল যে দুঃসময়ের দুর্গ্রহ যেন কেটে গেছে, যেন সৌভাগ্যের সূচনায় মন তার প্রসন্ন হয়ে উঠতে চাইছে। সীমা সম্বন্ধেও অকারণেই তার মনটা হাল্কা হ'য়ে উঠল।

ভোলানাথ কাছে আসতে না-আসতেই সেই মেয়েটি চীৎকার করে বলতে লাগল, "ভোলাদা, শীগ্‌গির শীগ্‌গির এঁর যাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

ভোলানাথ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "বাবু ত এখুনি এলেন, তা যাওয়া ত সেই কাল ভোরের ইষ্টিমারে। তার আগে ত হবার জো নেই। তা মা, বাবুরে খাওয়াও দাওয়াও, এখন যাবেন কেন?"

"আঃ ভোলাদা, বুড়ো হয়ে তুমি বড় বেশী কথা বল। ষ্টীমারে যাবেন কেন? ওঁর বাড়ীতে খুন হয়েছে যে, নৌকো, নৌকো ঠিক কর। উনি দিদিমণিদের কাছে যাবেন।"

ভোলানাথ এ-সব কথার মাথামুণ্ডু কিছু ঠিক করতে না পেরে একবার নিখিলনাথের দিকে, একবার সেই ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে কোথাকার খুন এবং সেই খুনের সঙ্গে দিদিমণিদের পিছনে নৌকা নিয়ে ধাওয়া করার কি যোগ থাকতে পারে তা ভেবে উঠতে পারলে না। নিখিল এই মহিলাটির এই স্নায়বিক উত্তেজনায় অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। সে লজ্জিত ভাবে বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভোলা-দার সঙ্গে আমি সব ঠিক ক'রে নেব। নমস্কার।" ব'লে আর পিছন না ফিরে ভোলানাথকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল, "ভোলাদা চল কথা বলি" বলে নদীর দিকে চলে গেল। কিছুমাত্র পরিচয় না থাকলেও এ-ক্ষেত্রে ভোলানাথকে সঙ্কোচ করবার অবসরমাত্র দিল না। ভোলানাথ বললে, "বাবু আপনারে ত আমি চিনি নে। আপনি নিশ্চয় ছোড়-দিদিমণির (অর্থাৎ ঐ মহিলাটির) কেউ হবেন। তা বাবু আপনার বাড়ী কোথায়? খুন হলেন কেমন করে?"

নিখিল হেসে বললে, "আমার বাড়ীতে খুন হয় নি। যে দিদিমণি পার্ব্বতী দেবীর সঙ্গে গেছেন তাঁর একজন আত্মীয় খুন হয়েছেন। তাই এখুনি তার নাগাল পাওয়া চাই।"

"ও তাই কও বাবু। তা দিদিমণিরা নৌকোয় গেছে বাবুর বাড়ী; তা নৌকো ঠিক করে দিচ্ছি।"

"নৌকায়?—সে ত ভয়ানক দেরী হবে। অন্য কোন উপায় নেই?"

"তা বাবু পায়ে হেঁটে যেতে পার ত তাড়াতাড়ি হ'তে পারে। পথ বেশী নয়। কোশ-দশ হবে। সন্ধ্যে নাগাদ ইষ্টিশান পৌঁছবে। আটটার গাড়ী ধরতে পারবে।"

"পায়ে হেঁটে খুব পারব। তুমি পথটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিও, তা'হলে আর ভাবনা থাকবে না।"

নিখিলনাথের কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে ভোলানাথের তাকে বেশ ভালই লেগেছিল। লঞ্চে ফিরে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে নিয়ে নিখিল প্রস্তুত হয়ে ভোলানাথের সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল। পথ বলতে সেখানে কিছু নেই। মাইল চারেক পথ চষা মাঠের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা পাওয়া যায়; সেই পর্য্যন্ত ভোলানাথ তাকে পৌঁছে দিয়ে এল।

পথে ভোলানাথের সঙ্গে গল্প করতে করতে নিখিল সব জেনে নিতে লাগল। গল্পে গল্পে ভোলানাথ বললে, "তা বাবু এত বড় জমিদারী, তা এর পর ভোগ করবে কে? বাবু ত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতায় থাকে, মাসে এক দিন ঐ কমলাপুরীতে যায়।"

"কেন বাবু বাড়ী যান না?"

"না বাবু, আগে যাও বা যেত এখন আর দু'বচ্ছর ওমুখো হয় না। আর পুরী খাঁ খাঁ করছে, কার তরেই বা যাবে বল।"

নিখিল জিজ্ঞেস করলে, "কেন বাবুর ছেলেপিলে নেই?"

"আর বাবু, ছেলে? সোনার চাঁদ ছেলে ছিল, বুকে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়। তা অদেষ্ট বাবু, কিছুই ত রইল না।" বলতে বলতে ভোলানাথের চোখ ছলছল ক'রে উঠল।

লজ্জিত হয়ে নিখিল বললে, "আহা! তা ভোলাদা দুঃখ ক'রো না, মরা-বাঁচা ত কারুর হাত নয়।"

ভোলানাথ বললে, "ষাট, ষাট, মরার কথা নয় বাবু

মরলে বরং সওয়া যায়। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল বাবু। কত খুঁজলাম, তা আর পাওয়া গেল না। সেই থেকে বৌমার শোকে বাবু কতদিন একেবারে পাগল-পারা হয়ে রইল। তার পর বেলাত চলে গেল। ফিরে এসে বৌমার নামে ঐ কমলাপুরী করলে। সে আজ পাঁচ-ছয় বছর হ'তে চলল। এদ্দিন কি আর আছে বাবু? তা বাবুর মতিগতি খারাপ নয়। আর বে-থা করলে না। সেই মাঝে মাঝে প্রাগে গিয়ে থাকে। ঐ খেনেই কুম্ভমেলায় বৌমা হেরিয়ে যান্ কি না। এবারে কোথায় যে গেল আমারে সঙ্গে নিলে না। কত বললুম তা শুন্‌লে না। গেছে ঐ প্রাগেই ঠিক।" ব'লে সে অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তামগ্ন হ'য়ে চলতে লাগল।

নিখিল আর কোন প্রশ্ন করলে না। আর কোন প্রশ্নের আবশ্যকও ছিল না তার। তার মনে আর সংশয় বড় ছিল না।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় তুলে দিয়ে ভোলানাথ ফিরে গেল। চিন্তায় নিমগ্ন নিখিল পথশ্রমের কষ্ট সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলতে লাগল। তার মনে নূতন আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছে। সীমা যে সম্প্রতি শচীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানেই তার গ্রামে গিয়েছে এ-বিষয়ে তার আর কোন সন্দেহমাত্র রইল না। এতে শচীন্দ্রের বিপদ কল্পনা ক'রে নিখিলের মন অত্যন্ত বিচলিত হ'ল। রঙ্গলালের কবলে পড়লে শচীন্দ্রনাথের যে কি পরিণাম হবে সম্প্রতি নন্দলালের হত্যার পর তা কল্পনা করতেও তার মন কণ্টকিত হয়ে উঠছিল।

শচীন্দ্রনাথ যদি সত্যই জ্যোৎস্নার স্বামী হয় এবং তার সমূহ বিপদ জেনেও যদি নিজের মোহের দুর্ব্বলতায় তাকে সেই বিপদে রক্ষা করবার চেষ্টা সে না করে, তবে সে অসহায় জ্যোৎস্নার শুভানুধ্যায়ী সেজে তারই সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করা সম্বন্ধে নন্দলালের চেয়ে কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? চিন্তার বেগে তার চলার গতিও বেড়ে চলল। উত্তেজনার আবেগে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, যেমন ক'রেই হোক সীমাকে সে নিবৃত্ত করবে—শচীন্দ্রের সর্ব্বনাশ সে ঘটতে দেবে না।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। বিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তসীমায় সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় দিকচক্র অনুরঞ্জিত। শ্যামায়মান ব্যাপ্ত আকাশের তলে জনমানব-পরিশূন্য বিরাট প্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা দীর্ঘপথ আশা আনন্দ আশ্রয় বিহীন মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ আপনার অগ্নিদাহে যেন মূর্চ্ছাতুর। ক্লান্ত চরণ চলতে আর চায় না। তবু তার বিশ্রাম করবার অবসর নেই। পথ এখনও মাইল চারেক বাকী।

ষ্টেশনে যখন সে পৌছল ট্রেন আসতে তখন আর বড় বিলম্ব নেই, বড় জোর আধ ঘণ্টা। ছোট ষ্টেশনটিতে তখনও তৈলাপচয়ের ভয়ে আলোগুলিকে সজীব ক'রে তোলা হয় নি। নিখিল সেই অন্ধকারপ্রায় প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা ক'রে নিলে। তার মনে ভয় ছিল যে সীমা সিংহযোড়ে না নেমে হয়ত সোজা কলকাতায় চলে গিয়েছে। খবরটা পাওয়া দরকার মনে ক'রে সে সোজা ষ্টেশন ঘরে ঢুকে সিংহযোড়ের একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট চাইল। ফল ফল্‌তে দেরী হ'ল না। একে প্রথম শ্রেণী, তায় সাহেবী পোষাক, গ্রাম-অঞ্চলে এ মণিকাঞ্চন বড় মেলে না। ষ্টেশন-মাষ্টার ভারি খাতির ক'রে নিখিলকে বসালে। সন্ধ্যাবেলায় যে দু-এক জন বৃদ্ধের পাশা খেলতে সেখানে সমাগম হয় তারাও নিখিলের উপর সসম্ভ্রম দৃষ্টি রেখে নড়ে-চড়ে ভব্য হয়ে বসল। নিখিল সবিনয়ে তাদের নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটু-আধটু খোঁজখবর নিতে লাগল। সাহেবের সমতুল্য একজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে এমন বিনীত ঘরোয়া রকমের আলাপপরায়ণ দেখে মহা খুশী হ'য়ে বৃদ্ধদ্বয় গল্প জুড়ে দিলে।

নিখিলনাথ শচীন্দ্রের পরিচিত নয় জেনে তাদের রসনা চটুল হ'য়ে উঠল। বললে, "হ্যাঁ, জমিদার ছিল বটে শচীন সিংহীর বাপ। তার দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। আর এ একটা মনুষ্য নয়। একটা বৌ হারিয়ে যে পাগল হয়, সে আবার কি একটা মানুষ? বৌ গেছে গেছে, তার কি হয়েছে? এতবড় জমিদারী, আবার বে-থা কর, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খা। তা নয়, বিলেত গিয়ে খ্রীষ্টান হয়েছে। আবার শুনতে পাই, বিলেত থেকে একটা খ্রীষ্টান মাগী এনেছে, তাকে দিয়ে বিধবাদের সব খ্রীষ্টান করাবার মৎলব। শুন্‌ছি তাকে নাকি বে করবে। ধম্ম আর রাখলে না।"

নিখিল জিজ্ঞেস করলে, "দেখেছেন তাকে ?"

"দেখব না কেন ? এই ত সেদিন আর একটা মেয়ে নিয়ে সিংঘোড়ে গেল। কি মতলব, সেই জানে।"

ট্রেন এসে পড়েছিল, সুতরাং কথাবার্ত্তা আর চলল না। বৃদ্ধদ্বয়কে নমস্কার ক'রে নিখিল বেরিয়ে গেল।

জমিদার বাড়ী যখন গিয়ে সে পৌছল তখন রাত অনেক। গ্রামের পক্ষে তখন নিশুতি রাত। তার সেবা-যত্ন-খাতিরের ত্রুটি হ'ল না বটে, কিন্তু ম্যানেজারের শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর সাক্ষাৎ সে রাত্রে আর সে পেল না। পার্ব্বতীরা যে কলকাতায় চলে গেছে সে সংবাদ দরোয়ানের কাছেই সে জেনেছিল। ক্লান্ত দেহ এবং চিন্তাকুল চিত্তে সে সমস্ত রাত নির্জ্জীব হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে রইল। দুর্দ্দৈব পদে পদে তাকে ব্যাহত করছে মনে ক'রে। একটা দুর্দ্দমনীয় সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় মনটা তার পূর্ণ হ'য়ে উঠল। (ক্রমশঃ)

অন্তঃসলিলা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

লোকে বলে বৃদ্ধা; কিন্তু হিমি-ঠানদি তাহা স্বীকার করেন না, বরং উষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া থাকেন, পোড়ার-মুখোদের কথা শুনেছিস্ বিশু—এই ত সেদিনের কথা, কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছুটোছুটি ক'রে পাড়া মাতিয়ে তুলতুম। নালুদের গাছ থেকে কোঁচড়-ভর্ত্তি জামরুল নিয়ে এসে বিলিয়ে দিয়েছি। দেশগাঁয়ে ত থাকিস নে, জানবি কি ক'রে। ঠানদি থামিলেন—চোখ বুজিয়া অতীতকে বোধ করি চোখের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া আর একবার অনুভব করিয়া পুনশ্চ তিনি কহিলেন, ওদের নজর শুধু বাবার টাকার দিকে জানিস্ বিশ্বনাথ। ওদের মুখে যদি না আমি ছাই তুলে দি তবে আমার নাম—

হেমাঙ্গিনী বৃদ্ধা হইয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু যে লোক তার বয়সের অঙ্কটা কিছু হ্রাস করিয়া খুশী থাকিতে চান তাঁহাকে এই সামান্য আনন্দটুকু হইতে বঞ্চিত করিতে আর যাঁহারা চান করুন, কিন্তু ইহাকে আমি ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঠানদির পক্ষাবলম্বন করিয়া কথা বলিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণের টীকাটিপ্পনী শুনিয়া থাকি—কথাগুলি মর্ম্মান্তিক হইলেও এখন কতকটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া কেন জানি না এই সামান্য কয়েকটা দিনের মধ্যেই আমি রূঢ়ভাষী কদাকার চেহারা ঠানদিটিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

আমার নীরবতাকে লক্ষ্য করিয়া ঠানদি পুনরায় কথা কহিয়া উঠেন, আচ্ছা তুই-ই বল্ বিশু, ওদের কি চোখ নেই রে, এই ত কয়েকটা বছর আগে রাঙা চেলী প'রে পাল্কী ক'রে শ্বশুরঘর করতে গিয়েছিলাম। কে ফিরে আসত বাপু! নিজের চেহারা করলে বেইমানী, তা দুষব কা'কে! এই চেহারা নিয়ে কখন পুরুষমানুষ ঘর করে!

ঠানদি তার দন্তহীন মুখে খানিক করুণ হাসিলেন—তাঁর বিগত দিনের অতৃপ্তির হাহাকার সে-মুখে আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠানদির জীবনের এই ইতিবৃত্ত আমি এরই মধ্যে অবগত হইয়াছি। তাঁর কুৎসিত চেহারা বাপের অগাধ পয়সাও চাপা দিতে পারে নাই—বিবাহের অনতিকাল মধ্যেই ঠানদিকে তাঁর বাপের কাছে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁর বাল্য-ইতিহাসও বৃদ্ধমহলে আলোচিত হইতে শোনা যায়। সুপারির খোলায় ঠোঙা তৈয়ারী করিয়া কবে লালমোহনদের কাঁচামিঠা আমগাছতলায় মধ্যরাত্রে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কবে শ্যাম গুপ্তের ছোট ছেলেটা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহাকে দেখিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিল এ-কথা শুনিয়া শুনিয়া এত পুরান হইয়া গিয়াছে যে উহার পুনরাবৃত্তি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ

যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা সম্ভবত চিরদিন আমার মনে থাকিবে। মনে থাকিবে কেমন করিয়া মানুষের অতৃপ্তি তার চেতনার সহিত সংগোপনে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া থাকে।

দশজনাকে ঠানদি এড়াইয়া চলেন, বলেন, কাজ কি বাপু আগাছা জড়ো ক'রে। কিন্তু আগাছা আপনি হয়—রোপণ করিবার প্রয়োজন হয় না।

পাশের বাড়ীর হরিহর খুড়োর ছোট মেয়ে শ্যামলীকে প্রায়ই ঠানদির গা ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি। মা-মরা ছোট মেয়ে সকলেই একটু বিশেষ চোখে দেখেন। ঐ অতটুকু মেয়েটাকে তার মাতৃবিয়োগের কথাটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিয়া আপশোষ করেন। বউরা বলে, আহা এই বয়সেই মা-মাগীকে খেয়ে ব'সে আছিস্! মাতার মৃত্যুকে আজকাল সে ভাবিয়া দেখে। ঠানদিকে সেদিন তার মার বিষয় বহু প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছি। ঠানদি উত্তরের পরিবর্ত্তে তাড়না করায় মেয়েটা পলাইয়া তাঁর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

দাওয়ায় বসিয়া জাল বুনিতেছিলাম, কিন্তু হাতের কাজ আমার অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। পুনরায় গোটা-দুই ফাঁস বুনিতেই শ্যামলীর কণ্ঠস্বর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। "দাও না তোমার পাতের দুটি পেসাদ খেতে দিদিমা।" ঠানদি মারমুখী হইয়া উঠিলেন, দুটি খেতে পর্য্যন্ত দেবে না হতভাগী—দূর হ বলছি। মুখপুড়ী বাপের কাছে খেতে পারিস নে। শ্যামলী হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

এই দৃশ্যটি রোজই অভিনীত হয়। আশ্চর্য্য হইলাম না। কিন্তু রোজই ভাবি, ঐ একরত্তি মেয়ে কেমন করিয়া ঠানদির অন্তরের খোঁজ পাইল।

শ্যামলী বলিতে লাগিল, আচ্ছা যাচ্ছি দূর হয়ে, তখন আবার পাকা চুল তুলতে বললে আর আসছি নে কিন্তু। শ্যামলী ঠানদির আরও সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিল, আব্দার করিয়া কহিল, আজকে তোমার বরের গল্প বলতে হবে দিদিমা, নইলে আমি শুনব না। ঠানদির পিঠের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া, এক হাতে তাঁর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পুনশ্চ বলে, সেই যে রাঙা চেলী প'রে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া··· তোমার বাবার কান্না···হ্যাঁ ঠানদি, তোমার বর খুব সুন্দর ছিল, না? ঐ যাত্রার দলের কেষ্টর চেয়েও?

ঠানদি তাকে এক হাতে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে থাকেন, অত কি আর মনে আছে মুখপুড়ী—তুই একরত্তি মেয়ে, অত খবরে কাজ কি! ঠানদি এক গ্রাস ভাত শ্যামলীর মুখে পুরিয়া দিলেন।

হাতের কাজে আমার মন বসে না। একাগ্রচিত্তে এই দুই কাঁচা-পাকার কথোপকথন শুনিতে থাকি। এ এক অদ্ভুত কৌতূহল আমার।

শ্যামলী পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ঠানদি বেশ উৎসাহের সহিত গল্প বলিতে লাগিলেন। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। তাঁর মাতাপিতার অশ্রু-সজল বিদায়ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেহারাদের পরিশ্রান্ত কণ্ঠের হুম হুম শব্দটি পর্য্যন্ত তাঁর গল্প হইতে বাদ পড়িল না। কিন্তু শ্যামলীর ইহাতে মন ওঠে না, বলিতে থাকে, তুমি ফাঁকি দিচ্ছ দিদিমা। তোমার বাবা যে সোনার গয়নাগুলো দিয়েছিল তার কথা একেবারে বল নি। সেই যে গো তোমার গা থেকে টেনে খুলতে গিয়ে হাত কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। মাগো, তোমার বরটা কি যাচ্ছেতাই।

ছেলেমানুষের আবোলতাবোল বকিয়া যাওয়া ইহা লইয়া খামকা মাথা ঘামাইবার মত কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। কিন্তু ঠানদির কোটরগত চোখ দুইটা সহসা ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামলী সভয়ে চুপ করিল। ঠানদি বাজিয়া উঠিলেন, মরবার আর জায়গা পাও না, আমায় এয়েছো জ্বালাতে।

চোখ তুলিয়া দেখি শ্যামলী তত ক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছে। আর ঠানদি আপন মনে বকিয়া চলিয়াছেন, যত সব আগাছা-দের ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে···এ-গুণ নেই সে-গুণ আছে··· বাপ ত দিনান্তে ডেকেও জিজ্ঞেস করে না···সৎমা বেটীও হয়েছেন সাপের সুলুই···দেবে এখন খেতে পিঠের উপর দিয়ে।

ঠানদি জোরগলায় হাঁকিলেন, এক বার এদিকে শুনে যা বিশু। হাতের কাজ গুটাইয়া রাখিয়া ঠানদির কাছে উপস্থিত হইতে আমার একটু বিলম্ব হইয়া গেল। ঠানদির

কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল, হাতের এ-পিঠ আর ও-পিঠ…সব সমান…এই বিশেটাই কি কিছু কম যায়। আমি সাড়া দিলাম,—অত বকছ কি ঠানদি? ঠানদি শূন্যে আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ভালমানুষ সেজে ব'সে আছেন যেন কিছু বুঝি নে আমি! ঠানদির রকম দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছিল। তাঁর এই ধরণের মধুর আপ্যায়ন রোজই আমার অদৃষ্টে জুটিয়া থাকে। ঠানদির চোখের সম্মুখে গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলাম, তোমার হ'ল কি ঠানদি?

ঠানদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, সে-খবরে তোর দরকার কি! এসেছেন মায়া দেখাতে, যেন ঐ মায়াকান্নায় আমার মন ভিজবে। এই যে মেয়েটা না খেয়ে রাগ ক'রে চ'লেই গেল, জানি ত আজ আর বরাতে ভাত জুটবে না—তা ব'লে ডেকেছি একবার! খেল খেল, না-খেল না-খেল—বয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শ্যামলী আসিয়া ঠানদির অঞ্চলাগ্র ধরিয়া তার গা ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম—কিন্তু না-দেখার ভান করিয়া বলিলাম, মেয়েটা না খেয়ে থাকবে—আমি বরং ডেকে আনছি।

আমার এই অভিনয় করিবার প্রয়াসটুকু ঠানদি বিফল হইতে দিলেন না। আমি নীরবে সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার কৌতুহলী চক্ষুজোড়া ওদের প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

ঠানদি শ্যামলীর হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ভাতের থালার কাছে বসাইয়া দিলেন, কহিলেন, এগুলো গিলবে কে শুনি?

শ্যামলী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, আমি—আমি দিদিমা—মধ্যপথে হঠাৎ থামিয়া গিয়া শ্যামলী পুনরায় কহিল, তোমার ঘরে আমি আর খাব না। তুমি মাকে বলেছ তোমার জিনিষপত্তর আমি চুরি ক'রে খাই।

পুনরায় ঠানদির ডাক আসিল, শোন বিশে শোন্, মেয়েটার কথা শুনে যা।

এবারে আর বিলম্ব হইল না।

ঠানদি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তুই ত বাপু দিনরাত ঘরেই ব'সে আছিস, শুনেছিস আমার মুখে এমন কথা কোন দিনও? ঠানদি এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন যেন আমার একটি মাত্র উত্তরে সকল গোলযোগের অবসান হয়। আমি কথা কহিলাম না। ঠানদি পুনরায় কি বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠানদির এমন ধৈর্য্যচ্যুতি আমার চোখে এই প্রথম। বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে আমি তাঁর শীর্ণ, লোল, কদাকার মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে-মুখে কেমন একটা ভীতিব্যাকুল ভাব, যেন কেহ জোর করিয়া তাঁর পাঁজরের হাড় ক-খানা খুলিয়া লইতে বল প্রয়োগ করিতেছে।

শ্যামলী একবার আমার, একবার ঠানদির মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিল, বা রে তুমি কাঁদছ কেন… আমি ত আর তোমায় কিছু বলি নি। তুমি বল না বিশুদা—

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও আমি বলিতে পারিলাম না। বলিবার মত আছেই বা কি! তা ছাড়া এমন করিয়া কাঁদিতে ঠানদিকে আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আজিকার ঘটনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। ঠানদির বাহিরের কাঠামোটাই যে তাঁর অন্তরের প্রতীক নয় এ-খবর আমি বহুবার পাইয়াছি কিন্তু তবুও তাঁকে একটু আলাদা চোখে দেখিতাম। ভাবিতাম, নারীর স্বভাব-কোমলতার সত্যকারের অভাব তার মধ্যে বড় বেশী, তাইতেই তার বহিরাবরণ এত রুক্ষ। কিন্তু আমার সে ধারণা আজ উল্টাইয়া গেল। ঠানদির দিকে চাহিয়া আমার থাকিয়া থাকিয়া মা'র কথা মনে পড়িতে লাগিল। এমনি কান্না আমি তাঁর চোখেও একদিন দেখিয়াছিলাম যেদিনে ইংরেজের হইয়া যুদ্ধ করিতে আমি দেশত্যাগ করিয়াছিলাম। আজ মা বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তাঁর সেই অশ্রুসজল মুখখানা যে আমি ভুলি নাই তাহা আজ নূতন করিয়া পুনরায় উপলব্ধি করিলাম।

ঠানদিকে আমি যতটা জানি যতটা চিনিয়াছি এতটা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, এমনি একটা মিথ্যা অহঙ্কার আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু আজ আমি আমার বৃথা দম্ভকে শাসন করিলাম।

ঠানদি সজল চোখে আমার প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, মেয়েটাকে ওরা সময়মত খেতে দেয় না, কথায় কথায় কিল চড়টা লেগেই আছে। পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়—

একটা মায়া প’ড়ে গেছে। নইলে কি এমন আমার দায় ঠেকেছে। সেদিনে মেয়েটাকে বলেছে, ও-বুড়ীর কাছে যাস নে, ও ডা’ন···সেইদিনই দিয়েছিলাম দূর ক’রে···তবুও আমার পিছু নেবে। ঐ একরত্তি দশ-এগার বছরের মেয়ে, মেরে ত আর তাড়িয়ে দিতে পারি না। আচ্ছা তুই-ই বল সে-দোষও কি আমার—

দোষ কাহার? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল বলি, দোষ তোমার নয় ঠানদি, দোষ তোমার কালো কদাকার দেহের অস্থায়ী ঐ মাংসপিণ্ডটার, আর তোমার বাপের জমার অঙ্কটার। কিন্তু মুখে আমি কোন কথাই কহিলাম না। নিজের শ্রীহীনতার দৈন্য যার প্রতি কথায় ও কাজে অহরহ প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে সে-কথা স্মরণ করাইয়া দিবার মত নিষ্ঠুরতা আমার মধ্যে নাই।

সহসা ঠানদি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শ্যামলীর পিঠের উপর ঘা-কয়েক বসাইয়া দিয়া কহিলেন, দূর হয়ে যা আমার চোখের স্মুখ থেকে। তোর মাকে বল গে দিদিমা আমায় মেরে তাড়িয়ে দেছে। ঠানদি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। যত সব আগাছা-পরগাছা কেটে সাফ ক’রে ফেলব। মেয়েটা কিছু সময় ঠানদির মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বিমর্ষ মুখে প্রস্থান করিল।

আমার অলক্ষ্যে ঠানদি তাঁর চোখের জল মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু আমার সতর্ক দৃষ্টিকে তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। হায় রে দুর্ভাগা মেয়েটা, কেমন করিয়া তুই বুঝিবি তোকে তাড়না করিবার অন্তরালে কতখানি স্নেহ লুকাইয়া রহিয়াছে ঐ রুক্ষ-মেজাজ ঠানদির অন্তরে। বুঝিলাম সবই মিথ্যা, তথাপি প্রতিবাদ করিলাম, লোকের কথায় কি এসে যায় ঠানদি—মেয়েটাকে মারধর ক’রে যখন নিজেই তুমি সকলের চেয়ে বেশী ব্যথা পাও তখন এ মিথ্যা আস্ফালনে লাভ কি! লোকের কথায় ত আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না।

ঠানদি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, আমি ব’লেই এত দিন পড়েনি, তোদের হ’লে ঘা হয়ে যেত রে বিশু।

ঠানদি আর দাঁড়াইলেন না।

মনটা আমার ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। সারাদিন আর ঠানদির সাক্ষাৎ মিলিল না। শ্যামলীর দেখা বার-কয়েক মিলিল। এত তাড়না খাইয়াও মেয়েটা ঘুর-ঘুর করিয়া ঠানদির ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। আমার কাছে আসিয়াও সে বহু প্রশ্ন করিয়াছে—ছেলেমানুষী প্রশ্ন, কিন্তু সাদা মনের অকপটতা তার প্রতিটি কথায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামলী বলে, দিদিমার ভাতগুলি তেমনি প’ড়ে আছে বিশুদাদা, আমি জানালার ফাঁকে দেখে এলাম।

বুঝিলাম, অভুক্ত মেয়েটাকে তাড়াইয়া দিয়া ঠানদিও উপবাসী আছেন, কিন্তু সে-কথা এই বালিকাকে বুঝাই কি করিয়া। বলিলাম, ঠানদির শরীর ভাল নেই, তাকে বিরক্ত করতে যাস নে শ্যামলী। মেজাজটা আমারও তেমন ভাল ছিল না, হয়ত শ্যামলীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমি দিতে পারি নাই, অথবা যাহা দিয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্যামলী কি বুঝিয়াছে জানি না, কিন্তু তার পরেও তাকে বার-কয়েক ঠানদির ঘরের আশেপাশে দেখিয়াছি, অথচ আমি ডাকাডাকি করিয়াও আর তার সাড়া পাই নাই।

ঠানদি দিনরাত ‘দূর দূর’ করিয়াও যাহা পারেন নাই আমার একটি মাত্র রূঢ় কথা তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করিয়াছে। তাই ত ভাবি, একরত্তি ঐ মেয়েটা কি একখানা আয়না যে এমনি করিয়া অন্তরের প্রতিবিম্ব তার বুকে প্রকাশ পাইতেছে। ছোট্ট মেয়ে মনস্তত্ত্বের ধার ধারে না, অথচ মানুষকে যাচাই করিবার কি নির্ভুল অদ্ভুত ক্ষমতা, আমার আহ্বানকে শ্যামলী উপেক্ষা করিয়াছে—ভালই করিয়াছে, আমার দম্ভকে পদাঘাত করিয়া।

কেন জানি না হঠাৎ মনটা আমার বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল, মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করি, মানুষকে চিনিবার এ তীক্ষ্ণ অনুভূতি তুই কোথায় পেলি? কিন্তু মনের এ-পাগলামি মনেই চাপিয়া রাখি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও-পাড়ার নরেশ আসিয়া জানাইয়া গেল, তাদের পাড়ায় আজ মুকুন্দ দাসের গান আছে। যাত্রাগানে আমার আকর্ষণ নাই, কিন্তু মুকুন্দর গানের প্রশংসা আমি সুদূর প্রবাসেও শুনিয়াছি।

ঠানদির দরজায় আঘাত করিলাম, বলিলাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ঠানদি। ঠানদি তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠে ঝঙ্কার দিলেন,

সে হুঁস আমার আছে, মিছে বিরক্ত করিস নে বিশ্বনাথ।

কথা বাড়াইবার ইচ্ছা আমারও ছিল না, তথাপি কহিলাম, ওগাঁয়ে মুকুন্দর যাত্রাগান আছে, যাবে নাকি ঠানদি?

ঠানদির আর সাড়া পাওয়া গেল না। আমাকে বাধ্য হইয়া নিজের পথ দেখিতে হইল।

পৌঁছাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। গান তখন প্রায় আরম্ভ হয়-হয়। কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিবার মত একটু স্থান হইল। গান সুরু হইয়াছে। ঘন ঘন হাততালিও কানে আসিতেছিল, কিন্তু সব চাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া আমার ঠানদির কথাই মনে পড়িতে লাগিল। হয়ত তিনি এখন তেমনি অভুক্ত অবস্থায় গৃহকোণে পড়িয়া আছেন—হয়ত শ্যামলী তার অপরিণত মনের দুর্ব্বার টানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠানদির গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত ফিরিয়া যাইতেছে।

বিবাহ আমি করি নাই। খামকা দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি! লোকে বলে আমি রূঢ়, দয়ামায়াহীন, যেহেতু আমার পিছুটান নাই। তাই ত ভাবি, মানুষ তার কল্পনায় রং চড়াইয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া কত বাহাদুরীই নেয়।

গান শোনার মত মন আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির করিলাম। রাত নিতান্ত কম হয় নাই। বারটা। উঠিয়া পড়িলাম। হেমন্তের শেষ। অন্ধকার রাত্রি, তায় গ্রামের পথ। রাস্তায় জনমানবের সাড়া নাই। দুই হাতে কুয়াশা-সিক্ত অন্ধকারকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সঙ্গে একটা টর্চ্চ পর্য্যন্ত নাই। পায়ের পাশ দিয়া সড়াৎ করিয়া কি একটা সরিয়া গেল। সাপ নয়ত···যদিও শীতের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছিল। এইটুকুই যা ভরসা। সূচীভেদ্য অন্ধকার···আশেপাশের ঘন সন্নিবেশিত গাছের ফাঁকে ফাঁকে আজ এই প্রথম উহার রূপকে উপলব্ধি করিলাম। কর্ম্মজীবনে এমনি কত অন্ধকার রাত্রে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতি কোন দিনই আমায় আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আজ সেদিন আর আমার নাই, চোখের দৃষ্টি আমার বদলাইয়া গিয়াছে। ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস আছে, যদিও চোখে কখন দেখি নাই। বুকে সাহস আছে, দুঃসাহস নাই। সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছিলাম। বাড়ীর সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছি। আর খানিক অগ্রসর হইতে পারিলেই আমার গান শুনিতে যাইবার দুর্ভোগের অন্ত হয়। কিন্তু সহসা সম্মুখে একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হাঁক দিলাম, কে?

ঠানদির গলার সাড়া পাইলাম, কে, বিশু? গান শেষ হয়ে গেল বুঝি?

বিস্মিত হইলাম, এত রাত্রে এ পোড়ো ভিটায় ঠানদির কি প্রয়োজন থাকিতে পারে! আরও খানিক অগ্রসর হইলাম। ততোধিক বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম, তোমার মাথায় ওগুলো কি ঠানদি?

ঠানদি শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিস কেন আর··· তা এ এক রকম মন্দ নয়...অবলা জীব, কথা কইতে ত আর পারবে না। বুঝিলাম না ঠানদি কি বলিতে চান। পুনরায় একই প্রশ্ন করিলাম। ঠানদি কহিলেন, ছাগলছানাটার জন্য দুটি কাঁঠালপাতা নিয়ে এলুম ভট্টাচায্যিদের বাগান থেকে। দিনের বেলায় কি আর আনবার যো আছে! আহা! অবলা জীব, দুটি পাতা খেতে গিয়েই না পা খোঁড়া ক'রে এল। ভটচায্যি ঠাকুরের কি মায়াদয়া আছে!—

বুঝিলাম ঠানদির এ-আয়োজন তার বছর-দুয়েকের লালিত পুরুষ্টু ছাগলটির জন্য। মানুষের কাছে যে-ভালবাসা তার আঘাত খাইয়া প্রতিহত হইয়াছে, তাহারই খানিক, আজ নিতান্ত সামান্য কারণে ছাগলটির উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঠানদি পুনশ্চ কহিলেন, মা-মরা ছাগলছানাটা কতকষ্টে এত বড় করেছি, তার ওরা কি বুঝবে। তেমনি আমিও হিমি বামনি···নিয়ে এসেছি বামুনের পোর সব ক-টা চারা গাছ উপ্‌ড়ে।

অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে ঠানদি পুনরায় কহিলেন, মেয়েটার জন্যে সত্যই মায়া হয় বিশু। ওরও যে মা নেই।

আমি নীরব রহিলাম।

ঠানদি বলিতে লাগিলেন, দিনরাত মুখ করি তবুও আমার কাছে ঘুরে ফিরে আসে। সন্ধ্যাবেলা ছুটে এসে

বললে, দিদিমা তোমার ছাগলকে ওরা মেরে ফেললে গো। কতক্ষণ আর চুপচাপ থাকা যায়। দরজা খুলতেই হ'ল। একটু থামিয়া ঠানদি পুনশ্চ করুণ কণ্ঠে কহিলেন, মেয়েটাকে যে একটু প্রাণ ভরে আদর করব তাও ভয় হয়।

অবাক হইলাম। কথাকটির সত্যতা সম্বন্ধে আমারও দ্বিমত নাই। ঠানদির আদরে যে মেয়েটার পীড়ন আরও বৃদ্ধি পায় এ কথা সত্য, কিন্তু এই সত্য যে ঠানদি এমন করিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁর বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের সংস্কার করিয়া লইয়াছেন এ-তথ্য আমার জানা ছিল না। ঠানদির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিকে আমি সাধুবাদ দিলাম।

কথা বলিতে বলিতে আমরা ঠানদির ঘরের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠানদি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইলাম।

এমনি ভাবেই দিন যায়।

জীবনের আরও গোটা-কয়েক বছর আগাইয়া গিয়াছে। ঠানদিকে এখন অথর্ব্ব বলিলেও ভুল বলা হয় না। তদুপরি দু-পায়ের আঙুল-ক'টা কি বিষাক্ত পদার্থ লাগিয়া খসিয়া গিয়াছে। ভাল চলিতে পারেন না। চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। দিনরাত ঘরেই বসিয়া থাকেন। নিজ-হাতে রান্না করিয়া খাইতে হয়। সেদিন ভাতের মাড় গড়াইতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন। একটি রাঁধুনী বামুনীর কথা বলিতে গিয়া তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। ঠানদি বলেন, টাকার তাঁর গাছ নাই।

শ্যামলী বড় হইয়াছে। যৌবনের আভাস তার দেহে দেখা দিয়াছে। লাজনম্র মেয়েটি,—বড় ভাল লাগে। কিন্তু এ-দিকে আজকাল আর তাকে দেখা যায় না। মেয়ের উপর খুড়োর কড়া নজর। ঠানদিকে রান্না করিয়া দিবার অপরাধে তিনি তার বয়স্থা কন্যাকে শাসন করিতে দ্বিধা করেন নাই। পথে দেখা হইতে শ্যামলী সেদিন পিঠের কাপড়টা সরাইয়া দেখাইয়াছিল। ম্লান হাসিয়া বলিয়াছিল, ঠানদিকে দেখবার কেউ নেই বিশুদা, তুমি তাকে দেখো।

বোকা মেয়ে জানে না ত তার বিশুদা কত বড় অপদার্থ। নিজের একক জীবনই তার কাছে কতবড় বোঝা। কিন্তু তথাপি নীরব থাকিতে পারি না। মানুষ ত বটে। চোখের সম্মুখে কত আর দেখা যায়। নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠানদির সহিতই করিলাম। ঠানদি খুশী হইয়াছেন বুঝি, কিন্তু মুখে তিনি বিষ ছড়াইতে ছাড়েন না। আমার আমোদ লাগে, হাসিয়া বলি, পয়সাকড়ি নিঃশেষ হয়েছে ঠানদি কিন্তু পেট ত আর তা শুনবে না! তা ব'লে বেইমান নই আমি—খেটে দেনা শোধ দিচ্ছি।

ঠানদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, শোন কথা—আজকেই না-হয় অচল হয়ে পড়েছি, নইলে এই হিমিও একদিন এক-শ জনার রান্না রেঁধেছে। ঠানদি থামিলেন। কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, হ্যাঁরে বিশু, সত্যিই কি অভাবে পড়েছিস? না আমার জন্যে তোকেও হবিষ্যি করতে হচ্ছে?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব! একটু হাসিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, তোমার কি মনে হয় ঠানদি?

ঠানদি হয়ত তাঁর প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছেই পাইয়াছেন। তিনি নীরব রহিলেন।

ইহারই দিনকয়েক পরে ভোর হইতে-না-হইতে ঠানদির ডাকাডাকিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতে হইল। ব্যাপার কি! ঠানদির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি কথা কহিয়া উঠিলেন, এ-কথা আমায় এত দিন বলিস্ নি কেন বিশু?

প্রশ্ন যে আমাকেই করা হইয়াছে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু ঠানদি কি যে বলিতে চান তাহা ঠাহর করিতে পারিলাম না।

আমার নীরবতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, তাই ত ভাবি মেয়েটা আর এদিকে আসে না কেন। ঠানদির কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল, দেহে কি মানুষের চামড়া আছে। নইলে নিজের মেয়ের উপর এমন অত্যাচার করতে পারে! পিঠের কোথাও জায়গা নেই বিশু। মেয়েটার কি কান্না।

আমি কথা কহিলাম না।

ঠানদির কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল, মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে। কহিলাম, তাদের মেয়ে তারা মেরে ফেললেই বা আমরা কি করতে পারি!

ঠানদি জ্বলিয়া উঠিলেন, কেন পারি নে—এক-শ বার

পারি—হাজার বার পারি। কানাকড়ির মুরোদ নেই, বাপ হয়েছেন।

হাসিলাম। এ ছাড়া আর কি করিতে পারি। ঠানদি স্নেহবশে যাহাই বলুন না কেন, আমি ত বুঝি, পরের মেয়ের উপর আমাদের অধিকার কতখানি।

ঠানদি রুখিয়া উঠিলেন,—হাসছিস—কিন্তু দেখে নিস বিশ্বনাথ, ওকে আমি জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব। এ কি মগের মুল্লুক ?

পুনরায় হাসিলাম।

ঠানদি থামিতে পারিলেন না—কালকেই তুই জেলার উকিল দিয়ে খুব কড়া এক নোটিস্ পাঠিয়ে দিস্।

তখনকার মত ঠানদিকে মানিয়া লইলাম। কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া ঠানদিকে নিরস্ত করার চেয়ে এই পথ অবলম্বন করাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হইল।

ঠানদি পুনরায় কহিলেন, সেদিনে কত যত্ন ক'রে শ্যামলী আমায় রান্না ক'রে খাওয়ালে। চমৎকার মেয়েটার হাত। খাসা রাঁধে। এ-সব কাজ কি আর পুরুষমানুষের। বলে মা-বাবা সব সময় চোখে চোখে রাখেন, নইলে তোমায় চাট্টি রান্না ক'রে খাওয়াতে আমি রোজ পারি দিদিমা। মেয়েটা একটু রোগা হয়ে গেছে। আহা এমন মিষ্টি ওর কথা-ক'টি।

একটু থামিয়া ঠানদি অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন,—একটি ভাল পাত্র জোগাড় করতে পারিস ? মেয়েটার একটা গতি ক'রে দিতাম। ওর বাপ এর বেলায় আপত্তি তুলবে না, সে তুই দেখে নিস্।

কিন্তু দেখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। এ-কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। শ্যামলীর জন্য উপযুক্ত পাত্র তল্লাস করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেদিনকার মত ঠানদির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার অবসর আমি পাইলাম না। আমার দীর্ঘ চার বছরের অবকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে। কথাটা ঠানদিকে সর্ব্বপ্রথম জানাইয়াছি। বুঝিলাম না, আমার তিরোধান তাঁহার কতখানি বাজিবে। তবে এ-কথা ঠিক, এই দীর্ঘ চার বছরে ঠানদিকে যতটা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় যতখানি হাহাকার লইয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়াছি তার চেয়ে ঠানদি কিছু কম অনুভব করিবেন না। আমি তাঁর মধ্যে পাইয়াছি আমার মায়ের বিকাশ—আমার মায়ের রূপ।

ঠানদি আর আমার সহিত একটি কথাও বলিলেন না গ্রামত্যাগের পূর্ব্বে শ্যামলী একবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমায় প্রণাম করিতে গিয়া পায়ের উপর কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। এই কি কম পাওয়া। তার দু-খানি হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, ঠানদির দোড় গোড়ায় অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও তার সাড়া পেলাম না। একবার দেখা পর্য্যন্ত হ'ল না।

আমি চুপ করিলাম, শ্যামলী নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠানদির আজিকার এই প্রকাণ্ড অবহেলা আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, আমাকে জোর করিয়া পিছনে টানিতে লাগিল। পুনরায় কহিলাম, আজ এই ক-টা বছরে বেশ বুঝতে পেরেছি তুই ঠানদিকে ভালবাসিস, আমার কথা আলাদা। শেকড় কোথাও গাড়ল না। রইলি তুই, রইল ঠানদি। তাঁর যত্ন নিতে চেষ্টা করিস, তোর ভাল হবে বোন।

ঝোঁকের মাথায় কথা-ক'টা বলিয়া চোখ তুলিয়া দেখি, চোখের জলে শ্যামলীর বুক ভাসিতেছে। আর অপেক্ষা করিলাম না। যাত্রা আমার সুরু হইল। একদিন যেমন অকস্মাৎ এদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম আজ আবার তেমনি অকস্মাৎ এদের ছাড়িয়া চলিলাম। কিন্তু এই আসা-যাওয়ায় কত প্রভেদ।

গ্রামকে কোনদিনই ভালবাসি নাই। আজও হয়ত গ্রামের প্রতি ততটা আকর্ষণ নাই। তবুও যেন মন রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছে "ফিরে চল্"। ফিরিয়া যাওয়া হইল না, কিন্তু বুকের মধ্যে আঁকিয়া লইলাম শ্যামলী ও ঠানদিদিকে ঠিক পাশাপাশি। যদি কখনও ফিরিয়া আসি তা কেবল এদেরই জন্য।

গ্রাম্য উঁচুনীচু রাস্তা ধরিয়া গরুর গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া আমার গ্রামের জীবনযাত্রার একটা হিসাব করিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম শ্যামলীর কথা, ভাবিতেছিলাম ঠানদির কথা। এমনি করিয়াই মানুষ সংসারকে ভালবাসিয়া ফেলে।

চোখ তুলিয়া চাহিলাম। বিস্মিত হইলাম না। বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করিলাম। অদূরে বট-গাছতলায় যেখানে শ্যামলী দাঁড়াইয়াছিল তাহার পাশে ঠানদিও আসিয়া জুটিয়াছেন। হায় রে অন্ধস্নেহ!

হাত নাড়িলাম—শ্যামলীর হাতখানাও নড়িয়া উঠিল। ঠানদি তার হাত দুখানা কোষ করিয়া চোখের উপর ধরিয়া এই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভাবিয়াছিলাম আর হয়ত ফিরিব না কিন্তু আমার ভাঙা স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগিল না। টানাহ্যাঁচড়া করিয়া আরও গোটা-দুই বছর চাকুরী করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে পেন্সন লইয়া গ্রামে ফিরিলাম, কিন্তু এখন ভাবিতেছি ফেরা আমার সার্থক হয় নাই।

কিছুদিন হইতে খুড়োই আমার কুঁড়েখানি দখল করিয়া বাস করিতেছিলেন। আমার আগমনে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে দখল ছাড়িতে হইল। কিন্তু যে-আগ্রহ লইয়া আমি গ্রামে ফিরিয়াছিলাম তাহার এক কণাও আর মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। ঠানদি নাই। বছরখানেক হইল তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার অবসান হইয়াছে। শ্যামলী করিয়াছে আত্মহত্যা। অনেকের মুখে অনেক গুজব শুনিলাম, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করি নাই—ভয় হইল, কি জানি কি রূঢ় সত্য আবিষ্কৃত হয়।

কিন্তু ওদের কাহাকেও আমি মন হইতে বিদায় দিতে পারি নাই। ঠানদির শূন্য ঘরের দিকে চাহিলেই একসঙ্গে আমার চোখের সম্মুখে দুইখানি ভিন্ন আকারের মুখ ভাসিয়া উঠে। রাস্তার পাশের বটগাছটার পাশ দিয়া চলিতে গেলেই আমার বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া ওঠে—চোখের সম্মুখে শ্যামলী ও ঠানদি আসিয়া দাঁড়ায়। মনে পড়ে বিদায়ক্ষণের একখানি জীবন্ত ছবি।

যারা ছিল তারা নাই। এই গ্রাম হইতে নিশ্চিহ্নে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তাহারা অক্ষয় অমর হইয়া রহিয়াছে। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব আমার চেতনার সহিত উহারা নিবিড় ভাবে জড়াইয়া থাকুক—এর চেয়ে বড় কামনা আপাততঃ আমার নাই।

একদা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক দিন এসেছিলে নিকটে আমার,
সেদিন দোঁহায় যেন স্বপন-আবেশে
এক হয়ে মিশেছিনু; কত কেঁদে হেসে
কেটেছিল কত দিন; কত বেদনার
রসঘন অনুভূতি, কত যন্ত্রণার
কেমন সহজে ভাগ কত ভালোবেসে
নিয়েছিনু দু-জনায়। আজ অবশেষে
দলিত কুসুম মাত্র জাগে স্মৃতি তার।
হেমন্তের হিমে হেথা ভরেছে বাতাস
ঝর-ঝর শতদলে শিশির শিহরে;
দিকে দিকে জাগিতেছে বেদনা-আভাস
ধূমল আকাশে আর পত্র-মরমরে।
এই পূর্ণ পরিব্যাপ্ত অবসাদ মাঝে
জানি না ফিরিছ তুমি কোথা কোন্ সাজে।

খাপছাড়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ও চিত্রিত। মূল্য—কাগজের মলাট ৩৲, কাপড়ের সুদৃশ্য বাঁধাই ৩॥০, এবং রাজসংস্করণ শোভন বাঁধাই ৫৲। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই অপূর্ব্ব বহিখানিতে ছড়া-জাতীয় নানা ছন্দে রচিত কবির ১০৯টি সরস কবিতা ও তাহার আনুষঙ্গিক ১০৯টি তাঁহারই আঁকা ছবি আছে। কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য—তবে অবশ্য যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে অবিমিশ্র অটল গাম্ভীর্য্যের অধিকারী তাঁহারা এগুলির রসে বঞ্চিত হইলেও হইতে পারেন। কতকগুলি কবিতার রস ছোট ছেলেমেয়েরা পুরাপুরি সম্ভোগ করিতে না পারিলেও সেগুলিরও ধ্বনি তাহাদিগকে আনন্দ দিবে।

দেয়াল-পঞ্জিকার ছবির রসগ্রাহী ও ভক্ত এবং ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের বিদ্রূপবিশারদ বিজ্ঞ সমালোচকেরা কবির আঁকা সর্ব্বশ্রেণীবিভাগের বহির্ভূত ছবিগুলি বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ও বয়স্কদিগের মধ্যে যাঁহারা থিওরির ধার ধারেন না তাঁহারা এইগুলির রসে মসগুল হইতে পারিবেন।

মনে করিয়াছিলাম, নমুনা-স্বরূপ একটু কিছু উদ্ধৃত করিব; কিন্তু কোনটি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, যে কবিতায় কবি বহিখানি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"যদি দেখো খোলষটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখো চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখো গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখো কথা তার
কোনো মানে বোঝার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় ক্ষ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার,
সুধাব বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রাবিত
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাসো, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না॥"

কবি 'সে' নামক আর একখানি বহি ছাপাইতেছেন। তাহা বৈশাখে তাঁহার জন্মদিনের উৎসবে প্রকাশিত হইবার কথা।

পুরানো কথা—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ২৲। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সুমুদ্রিত সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক বহিখানিকে গ্রন্থকারের আংশিক আত্মচরিত বা জীবনস্মৃতি বলা যাইতে পারে। গল্প বলিয়া আসর জমাইবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে। বহিখানিতে ইতিহাসের, কিম্বদন্তীর, আরও কত-কির টুকরা ছড়ান আছে। কুচবেহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সম্বন্ধে ইহাতে অনেক গল্প আছে। একটি উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সমস্ত বহিখানির পাতা তাড়াতাড়ি উল্টাইয়া সেটি খুঁজিয়া পাইলাম না। একটা সূচী থাকিলে হয়ত আমার এতটা সময় বৃথা যাইত না।

ঘরের মায়া—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২২৩ ডি নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, নবজীবন সংঘ হইতে শ্রীসুশীলকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই।

এই সুমুদ্রিত বহিখানি নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার সময় পাইয়া রেলগাড়ীতে বসিয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। লেখকের ভাষা নদীর স্রোতের মত; বুঝিতেও কোন কষ্ট হয় না।

বহিখানিতে ঘরের মায়া, ভালোবাসার যাদু, ভালোবাসা না অত্যাচার, মা ও বধূ, ঘরের ট্র্যাজেডি—এই পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেকটিতেই পুরুষ ও নারীদের স্মরণ করিবার স্মরণে রাখিবার, ভাবিবার বিস্তর কথা আছে। যাঁহারা সার্ব্বজনিক কাজ, দেশহিতের কাজ করিতে চান বা করেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ইহা পড়া উচিত। যাঁহারা শুধু গৃহস্থালী করেন বা করিতে চান, তাঁহাদেরও পঠিতব্য ও জ্ঞাতব্য জিনিষ ইহাতে আছে।

অনেক দিন আগে পড়িয়াছি বলিয়া এখন বহিটিতে আলোচিত দুটি বিষয়ের কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে।

লেখক বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগের উল্লেখ করিয়া বহিখানির আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে যাহা

লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনা আমি করিতেছি না; তাহাতে মোটামুটি আমার মন সায় দিয়াছিল। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইয়াছিল, এমন কি হইতে পারে না ও কখনও হইবে না, যে, বিশ্বমানবের সেবার জন্য পুরুষ সেই নারীকে ছাড়িয়া যাইবেন না বিবাহকালে যাঁহার চিরসঙ্গী থাকিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে বাদ দিয়া তিনি ধর্ম্মাচরণ না-করিয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া বিশ্বপ্রেম-প্রসূত বিশ্বসেবা রূপ ধর্ম্মাচরণ করিবেন? স্ত্রীকে ত্যাগ না করিলে কি অনাবিল বিশ্বপ্রেম হইতে পারে না? দাম্পত্য সম্বন্ধের সহিত আবিলতা কি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত?

আমার মনে এই সকল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছিল।

"মা ও বধূ" প্রবন্ধটিতে লেখক পুত্রের প্রতি মাতার প্রতিদ্বন্দ্বী-অসহিষ্ণু মমতাকে পুত্রবধূর প্রতি ঈর্ষার ও বধূনির্যাতনের একটা প্রধান কারণ বলিয়া লিখিয়াছেন, এইরূপ মনে পড়িতেছে। ইহা বহু স্থলেই অসত্য নহে। লেখক মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-এনালিসিস) অবলম্বন করিয়াছেন এবং লরেন্সের একখানি উপন্যাস হইতে নিজ মতের সমর্থক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

সে দিন একখানি আমেরিকান কাগজের এক জন প্রবীণ সম্পাদকের এই উক্তিটি আমার চোখে পড়ে—"It is an unhappy fact that bad news is more striking than good news," "এটা একটা দুঃখকর তথ্য যে, মন্দ খবর ভাল খবরের চেয়ে বেশী চমকপ্রদ।" সেই জন্য বধূনির্যাতনের ও বৌ-কাঁটকি শাশুড়ীর অনেক কাহিনী খবরের কাগজে বাহির হইয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া দিতে সমর্থ হয় যে, বধূকে খুব ভালবাসেন ও আদরযত্ন করেন এমন শাশুড়ী অনেক আছেন, এমন বউও অনেক আছেন যিনি পতিপ্রাণা আবার শাশুড়ীর প্রতিও সাতিশয় ভক্তিমতী। মনঃসমীক্ষণ-বিদ্যাবিদেরা এইরূপ শ্বশ্রূ ও বধূদের মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ কিরূপ করেন জানি না।

মানভূম জেলার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত—শ্রীবিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্‌এ, বি-এল প্রণীত। মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান বি সি চ্যাটার্জ্জি, মুন্সেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

এই বহিখানি মানভূম জেলার বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের জন্য লিখিত। কিন্তু ইহা মানভূম জেলার প্রাপ্তবয়স্ক লোকদেরও পড়া উচিত। ইহা হইতে তাঁহারা ঐ জেলা সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিবেন, যাহা তাঁহারা এখন জানেন না। ইহার ২৮ খানি ছবিও তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। আমি ইহা হইতে আমার অজ্ঞাত অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি।

বহিখানি যে শুধু মানভূমের লোকদেরই পড়া উচিত, তাহা নয়। অন্যান্য স্থানেরও যে-সব বাঙালী সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে চান, প্রধানতঃ বাংলাভাষী বাঙালীর বাসস্থান নৈসর্গিক সম্পৎশালী একটি ভূখণ্ডকে বাংলা হইতে কাটিয়া বিহারের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদেরও ইহা পড়া উচিত।

অতীতের ছবি। পরলোকগত সুকুমার রায় রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৵১০। ইহাতে সহজ কবিতায় লেখক ব্রাহ্মসমাজের অতীতের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন।

র. চ.

পশ্চিম প্রবাসী—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক, দি নিউ বুক ষ্টল, ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন কোয়ার্টো। ২৯৮ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

লেখক অল্প দিন ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া তাঁহার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই যে তিনি ভবিষ্যৎ ইউরোপভ্রমণকারীকে এই গ্রন্থের সাহায্যে অনেক অপরিচিত স্থান এবং ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে চান। কিন্তু অতি অল্পকাল নানা স্থানে ছুটাছুটি করিয়া সে উদ্দেশ্য সাধন করায় কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমত নূতন বিদেশে গিয়া বিস্ময়ের দৃষ্টি কাটে না; দ্বিতীয়ত কোন স্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। কিন্তু স্পষ্টতই লেখক সে সময় পান নাই। অভিজ্ঞতা লাভ না হইলে অন্যের মনে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা দুঃসাধ্য; অবশ্য অভিজ্ঞ লোকের লেখা বই পড়িয়া সেই লেখার পুনরুক্তি করা চলে, কিন্তু তাহার জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরিবার প্রয়োজন হয় না। লেখক প্যারিস, বার্লিন, রোম, কোপেনহাগেন প্রভৃতি শহরের নামগুলি স্থানীয় উচ্চারণে পারী, বেল্লিন, রোম, কোবেন-হাবুন্ প্রভৃতি লিখিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়াছেন। কারণ ইহা ছাড়া আর কোন জিনিষেরই নাম তিনি কোন দেশেরই প্রচলিত উচ্চারণে লিখিতে পারেন নাই।

গার ডি ইনভ্যালিড্‌স্, নেপোলিয়ঁ। চ্যাপেল ডি ইনভ্যালিড্‌স্, আর্ক ডি ত্রায়াম্প, সাঁজে এলিজ, প্লাস দি কোঁকর্দ্দ, নোত্রে দাঁ, প্যালে দি জাষ্টিস, চেরাবাঙ্ক, ফ্রেডেরিশ ষ্ট্রাশে, রাউকার (roucher), ইত্যাদি কোন দেশেরই উচ্চারণ নহে। ইহা ছাড়া তিনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার শি বা স্কি-কে স্কেটিং-এর সঙ্গে গোলমাল করিয়াছেন। শি'র বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন ইহাই স্কেটিং এবং স্কেটিং-এর বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন ইহাই শি বা স্কি। রোমের জন্মকাহিনী তিনি রোমে বসিয়া তাঁহার আমেরিকান বান্ধবীর নিকট প্রথম শুনিলেন এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া রোমের প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করিলেন, ইহা আমরা ইউরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে করিতে পারি না, কারণ এই বর্ণনায় ভুল আছে। এক স্থানে পড়িলাম, "প্রথম ল্যাটিনরা এখানে বাস করে তখন এর নাম ছিল কোয়াড্রালা (Quadrala)...।"

অপরিচিত নৃত্যসঙ্গিনীকে ইংরেজীতে 'Fiance' বলে না, ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীকে Fiance বলে। লেখক লণ্ডনে বসিয়া এরূপ ভ্রম করিলেন, এবং গ্রন্থ লিখিবার সময়েও তাহা খেয়াল করিলেন না ইহা আশ্চর্য্য।

প্রায় প্রতিদেশেই লেখকের বান্ধবী-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে এবং তাহাদের অনেকেই তাঁহার চেহারা এবং বিশেষ করিয়া চোখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে; কেহ কেহ তাঁহার প্রণয়িনী হইতেও চাহিয়াছে। কিন্তু ইহা বার-বার এত বিস্তারিত ভাবে লেখা সুরুচিসঙ্গত হয় নাই।

গ্রন্থে জানিবার বিষয়গুলি অনভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া মূল্যহীন। তবে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা আছে, কিন্তু তাহা স্বদেশে বসিয়াও লেখা চলিত। ইহা ছাড়া অনেক কথাই আছে যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত—নিজের এবং পরের।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

খেলাধূলা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয় ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। পৃষ্ঠা ১০৩।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সাহিত্যজগতে পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। প্রবীণ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সুনিপুণ লেখনীপ্রসূত কৌতুকোজ্জ্বল কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সমষ্টি এই শিশুপাঠ্য বইখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি কেবলমাত্র শিশু-মনোরঞ্জন উপযোগী কৌতুকহাস্যে অনাবিল রসেই ভরপুর নয়,—বিষয়-বস্তুগুলি শিক্ষণীয় তথ্যেও পরিপূর্ণ। পাখীর পল্প, ফলের ঝাঁকা, ফুলের

সাজি, জীবের দেশ, দুধে জন্তু, মিষ্টমুণ্ড জীবের দেশ, আলগা জোড়া শব্দ, প্রভৃতি কবিতাগুলিতে অকারাদি বর্ণক্রমে পাখী, ফল, ফুল, জীব, জন্তু প্রভৃতির সহিত ছেলেদের পরিচয় হইবে। 'কল্কই কোল' গল্পটিতে কোল জাতির আচার-ব্যবহারের পরিচয় সুকৌশলে লিখিত হইয়াছে। আদি মানুষ, বৌ গল্প দুটি অনুরূপ সুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ। প্রবন্ধগুলিও গল্পের মতই সুন্দর এবং কৌতুহলোদ্দীপক। শিশুসাহিত্যসৃষ্টির নামে আজকাল যে 'যার যাহা মন' গোছের পুস্তকের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই পাইয়া বড়ই তৃপ্তি হইল। বই-খানির ছবিগুলিও সুন্দর—প্রচ্ছদের ছবিখানি চমৎকার। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই খুব ভাল।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

সাহিত্যবার্ষিকী—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ। পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।

শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য-সম্মেলন', 'পূর্ণিমা-সম্মেলন' নামক মাসিক অধিবেশন ও অন্যান্য সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং পরিষদের বিংশ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ লইয়া এই গ্রন্থ গঠিত। গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ ভাল। প্রাচীন বা গ্রাম্য সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন 'সেকালের গীতিকার', 'সাহিত্যে শান্তিপুরের দান' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহাদের কাজে লাগিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই জাতীয় পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ সকল সময় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারায় লেখকের শ্রম সার্থক হয় না। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনগুলিতে যে-সমস্ত প্রবন্ধাদি পঠিত বা উপস্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে যেগুলি ব্যাপক আলোচনার অনুকুল উপকরণে পূর্ণ সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ সেগুলি দেশের কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রচার ও আলোচনার সুবিধা হয়—সম্মেলনের উদ্দেশ্য সফল হয়—লেখকগণও পরিশ্রম করিয়া প্রকৃত ভাল প্রবন্ধ লিখিবার জন্য যত্নবান্ হন। সম্মেলনের কার্যবিবরণে পঠিত প্রবন্ধের নাম ও প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রকাশ-স্থান প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেই চলিতে পারে। এইরূপে কার্যবিবরণ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে সম্মেলনের উদ্দেশ্যের অনুকুল বিবিধ কার্যে তাহা ব্যয়িত হইলে সম্মেলনের গৌরব ও উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইতে পারে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গীতগোবিন্দ—অনুবাদক শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ। প্রকাশক—গুপ্ত ফ্রেণ্ড স্ এণ্ড কোং, ১১, কলেজ স্কোয়ার। দাম—দেড় টাকা।

জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দ যে রসের পরিবেশক, মূল হইতে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে শিক্ষিত বাঙালীর অসুবিধা হয় না বলিয়া মনে করি। আলোচ্য কাব্য-অনুবাদ গ্রন্থে লেখক মূল পুস্তকের ভাব ও ছন্দ যথাসাধ্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোটামুটি মন্দ হয় নাই।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আলো-আঁধারি—কবিতাপুস্তক। শ্রীসজনীকান্ত দাস। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো। দাম—দেড় টাকা।

কবি হিসাবে সজনীবাবুর খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই আছে, তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত 'রাজহংসে'র সমালোচনা ব্যপদেশে বিভিন্ন পত্রে এই প্রসঙ্গের জের এখনও চলিতেছে। কিন্তু যখন পড়ি—

"ষ্টীমার ঘাটের কোঠাবাড়ীখানি আধেক ডুবে
মিনতি করিছে, থামো থামো নদী কীর্ত্তিনাশা!
পশ্চিমে রবি ঘুম-জড়া চোখে চাহিছে পূবে;
তটেরে বেড়িয়া পাগল নদীর কি ভালবাসা।
বৃহৎ ষ্টীমার, ছোট ডিঙি যেন জলের তোড়ে,
ক ক করে কাক, মিছা ডাকে আর মিছাই ওড়ে;
মাটির শিশুরা যতই শুনিছে স্বপন ঘোরে
নদীর ভাষা,
চরের মতন ডোবে জাগে বুকে তাদের আশা।" (২৮ পৃ.)

অথবা "প্রাবৃট্ নিশার আকাশের শশী ভূতলে নামে,
পিতা বসুদেব ইষ্টের নাম জপেন ভয়ে,
দেবকী মাতার কোলের কাছেতে সে আলো থামে,
আলেয়ার মতো ভেসে ভেসে চলে নন্দালয়ে,
হায় শিশুচাঁদ, তবু কোল খালি যশোদা মার,
এপার ওপার দুপারে যমুনা অন্ধকার।" (৭৭ পৃ.)

তখন সজনীবাবু যে কবি, একথা স্বীকার করিতে দ্বিধা হয় না। নির্দ্দোষ ছন্দের উপর তাঁহার জন্মগত অধিকার। তবে আঙ্গিকে বর্ত্তমান সংগ্রহের কবিতাগুলির উপর রবীন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীমণীশ ঘটক

বিজ্ঞান প্রবেশিকা—শ্রীসুকুমার বসু, বি. এস্-সি (কলিকাতা ও ডারহাম) প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ২৫।২ মোহনবাগান রো। কলিকাতা। ১৯৩৬: পৃ. ২৯১+৩। মূল্য ১৸৹।

প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় মাতৃভাষায় পড়াইতে হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এই নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে কতকগুলি বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি তাহাদের অন্যতম। পুস্তকে জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অবশ্যজ্ঞাতব্য মূল তথ্যগুলির আলোচনা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনানুসারেই পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদিন বাংলায় বিজ্ঞানপাঠ নামে যে-সকল পুস্তক পরিচিত ছিল তাহার অধিকাংশই নীরস দুর্বোধ্য এবং প্রথম শিক্ষার্থীর অযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানি সহজ ও অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কোথাও ভাষা বা ভাবের আড়ষ্টতা নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত পাঠক-সাধারণেরও বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা এই পুস্তকে পরিতৃপ্ত হইবে। জ্যোতিষের—বিশেষ ভারতীয় জ্যোতিষের—এমন সরল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখি নাই। যে লেখা পড়িলে বর্ণিত বিষয় স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানিতে আগ্রহ জন্মে সেই লেখাই সার্থক। সুকুমারবাবুর জ্যোতিষ-বিবরণে এই গুণ আছে। শারীরবিদ্যার ব্যাখ্যানও অনুপম হইয়াছে। গ্রন্থকার জ্যোতিষের যত বিশদ আলোচনা করিয়াছেন রসায়ন প্রভৃতির তত করেন নাই। আপাতদৃষ্টিতে ইহা বৈষম্যদোষ বলিয়া মনে হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডির মধ্যে নির্দিষ্ট প্রত্যেক বিজ্ঞানের সম্যক ব্যাখ্যা অসম্ভব, সেজন্য গ্রন্থকারকে হয় মূল তত্ত্বগুলি মাত্র উল্লেখ করিয়া সকল বিদ্যার সমান গৌরব দিতে হয় নচেৎ কোন একটির বিশদ আলোচনা করিয়া বাকিগুলি সংক্ষেপে সারিতে হয়। ছাত্রের বিজ্ঞানবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বিস্তারিত সরস বিবরণ অপরিহার্য। এজন্য দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বনই সমীচীন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য আয়ত্ত করা অপেক্ষা শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানদৃষ্টিলাভ অধিক বাঞ্ছনীয়। যাহার বিজ্ঞানে কৌতূহল জাগিয়াছে সে মনোমত যে কোন বিদ্যা

সহজে শিখিতে পারে। প্রশ্ন উঠিবে, প্রথম শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকে কোন্ বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানালোচনার ইতিবৃত্ত বিচার করিলে দেখা যায় যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা প্রভৃতি চর্চার বহুপূর্বে প্রাচীন মানব সমাজে জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ হয়। আদিম মানবের মনে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক অতি কৌতূহলের বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। অল্পবয়স্কদের মনোবিকাশেও এই প্রাচীন ধারার অনুবর্তন দেখা যায়, এজন্য তাহাদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞান হিসাবে বালকবুদ্ধিগ্রাহ্য সরল জ্যোতিষের উপযোগিতা শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থকার কি উদ্দেশ্যে জ্যোতিষের প্রাধান্য দিয়াছেন জানি না কিন্তু ইহাতে তাঁহার পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। এরূপ পুস্তক বাংলা ভাষার সম্পদ। লোকে এই পুস্তকের সমাদর করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

আবরণ মোচন—শ্রীবেণীমাধব দাস প্রণীত। শ্রীবিন্দুমাধব দাস কর্তৃক গাইবান্ধা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৩। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

লেখকের মতে জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ; ইহার মূলোচ্ছেদ বা আমূল পরিবর্তন না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই। পুস্তিকাখানিতে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

তৃণখণ্ড—"বনফুল" রচিত। কলিকাতা, রঞ্জন প্রকাশালয় ২৫-২ মোহনবাগান রো হইতে প্রকাশিত।

তৃণখণ্ড কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি। লেখক ডাক্তার ও কবি; ডাক্তার-কবি তাঁহার জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি জীবনের একটা যুক্তিপূর্ণ সঙ্গত অর্থ, একটা লজিকের সন্ধান করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই তাঁহার মনে হইয়াছে জীবনের স্রোতাবর্তে তিনি একটি তৃণখণ্ড মাত্র, ভাসিয়া যাইতেছেন; সে ভাসার মধ্যে কোন নীতি, কোন ছন্দ, কোন পৌর্বাপর্যই নাই; সংসারের সুখদুঃখের, হাসি-কান্নার আলোছায়ার ছকের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের কোন বিধানই চলে না। আজ যাহাকে অন্যায় বলিয়া নিন্দা করিতেছি কালই নূতনরূপে তাহাকে অভিনন্দন করিয়া লইতেছি, পরের মধ্যে যাহাকে নিন্দনীয় বলিতেছি নিজের মধ্যে তাহারই একটা সঙ্গত অর্থ ও যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি; আজ যাহা মিথ্যা কাল তাহা সত্যের আকারে দেখা দিতেছে। ইহাই জীবন, ইহাই মহাপ্রাণের স্রোতাবর্ত, ইহাই জগৎ যাহা অহরহ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নব নব রূপে চলিতেছে। ন্যায় অন্যায়ের কোন সনাতন মানদণ্ডে ইহাকে বিচার করা যায় না। মানুষের বুদ্ধি ও দৃষ্টি যেখানে একান্ত সীমাবদ্ধ, যেখানে মানুষ কোন কিছুরই শেষ কথা জানিতে পারে না, শেষ রূপ দেখিতে পায় না, সেখানে নিন্দা করিব কাহাকে, মিথ্যা বলিব কাহাকে? কোন্ মূঢ় অভিমানে বিচারকের আসন গ্রহণ করিব? যদি সে আসন গ্রহণ করি তবে নিজেই দেখিব যে পদে পদে ভুল করিতেছি। ইহাই তৃণখণ্ডের মূলকথা। কিন্তু লেখক দার্শনিকও নহেন, নীতিকথা প্রচার করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তিনি রসিক কবি; সংসারের লজিকহীন দুঃখের প্রতি তাঁহার সুগভীর সহানুভূতি আছে; সেই ভাবেই তিনি জীবনকে নানারূপে দেখিয়াছেন এবং তাহারই কথা কিছু এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তারের জগৎ রোগীর জগৎ; সে জগতে বীভৎস রসের প্রকাশ অতি সহজে হয়; তৃণখণ্ডের কয়েকটি চিত্রে বীভৎস রসের ইঙ্গিত যে নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে লেখকের মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি অপরিসীম সমবেদনা ও দরদ। কিন্তু সে দরদের মধ্যে ন্যাকামি নাই, তাহা অকারণে অসময়ে অশ্রুবিসর্জন করিয়া নিজেকে ভারমুক্ত করিতে চাহে নাই; যে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে তাহা লেখকের বুকেরই মধ্যে, চোখে ফোটে নাই। বরং স্থানে স্থানে লেখক সিনিসিজ্‌মের ভান করিয়াছেন। কিন্তু সে ভানও টিকে নাই; তাঁহার অন্তরের করুণাসমুদ্রের মানুষটি গ্রন্থের সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জাপানী এক চিত্রকরের সুদীর্ঘ একটি ছবি দেখিয়াছিলাম; তাহা খণ্ডে খণ্ডে অঙ্কিত; প্রত্যেক খণ্ডই একটি স্বতন্ত্র ছবি; কিন্তু একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র এই খণ্ডগুলিকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং শেষ ছবিটিতে প্রথম ছবিটি পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তৃণখণ্ড পড়িতে পড়িতে সেই ছবির কথা মনে হইল। সেই জন্যই ইহাকে উপন্যাস না বলিয়া ছবি-সমষ্টি বলিয়াছি।

সকলের তৃণখণ্ড পড়িয়া ভাল লাগিবে কিনা জানি না, আমার তো লাগিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার রিয়ালিজ্‌ম্ ক্ষণিকের জন্য মনকে রূঢ় আঘাত দিবে; কিন্তু জীবনই যে সেই রকম; ইহার রিয়ালিজ্‌ম্ যাহাকে বিমুখ করিয়া দিল সে জীবনের সমগ্র রূপ দেখিল না, কিন্তু যে দেখিল সে ধন্য হইল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ছন্দ-বীণা (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাল। রঞ্জন প্রিন্টিং হাউস ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা; মূল্য এক টাকা; পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৩।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, ছন্দ-প্রধান কবিতা, রুদ্র রসের কবিতা, পল্লীকবিতা ও প্রেমের কবিতা।

... মাতন, সাত মাইল ১৯৩৬, ১৫০০ মিটারস্, ছন্দ-প্রধান কবিতা। এই কবিতাগুলিতে ছন্দের লীলা এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল যে কবি ভাষাকে লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন, বিদেশী ও দেশী শব্দের যুগল অশ্ব অবলীলাক্রমে চালাইয়াছেন। সাধারণ পাঠকের এই কবিতাগুলি ভাল লাগিবে—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

আবিসিনিয়া, শ্মশান রুদ্র রসের কবিতা। জগতের অত্যাচরিত উৎপীড়িতদের জন্য কবির দরদ কাব্যমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে; রুদ্র রসের সঙ্গে করুণ রসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে; কবিতা দুটিতেও ছন্দের ঐশ্বর্য্য আছে।

পল্লী বর্ষা, ধান ক্ষেত, কৃপণের বাধা ও বরষায় পল্লীকবিতা। শান্তি বাবু প্রথমত পল্লীকবিতা দিয়া কাব্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন পল্লীকবির ন্যায় সেই খানেই থামিয়া যান নাই। পল্লী ছাড়াও আর দশটা বিষয়ে তাঁহার ঔৎসুক্য আছে; দশটা বিষয়ে তাঁহার ঔৎসুক্য আছে বলিয়াই তাঁহার পল্লীকবিতাও সার্থক হইয়াছে।

আবির্ভূতা, উৎকণ্ঠা, পলাতক, তুমি আর আমি, সুন্দর, অন্ধকার, আবেদন, প্রেমের কবিতা। এই গ্রন্থের নাম ছন্দ-বীণা হইলেও ছন্দের তার অপেক্ষা প্রেমের তারে বেশী ঝঙ্কার উঠিয়াছে। যাঁহারা শান্তি বাবুকে পল্লীকবি বলিয়াই জানেন তাঁহারা এ সব কবিতা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন; আমরা হই নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীমতা শান্তা দেবী রবীন্দ্রনাথের "পাশ্চাত্য ভ্রমণ" বহির সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন, যে, "ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে"র সেই গল্পটি বাদ পড়িয়াছে, যাহাতে এক ইংরেজ মহিলার শয়নকক্ষের বাহিরে দাঁড় করাইয়া রবীন্দ্রনাথকে বেহাগ রাগিণীর গান গাওয়াইবার কথা আছে। ইহা ভুল। গল্পটি "জীবনস্মৃতি"তে আছে। লেখিকা এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আমাকে সিঙ্গাপুর হইতে চিঠি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া ইহা জানাইয়াছিলেন।

—'প্রবাসী'র সম্পাদক

বীমাসংক্রান্ত নূতন আইন

অশোক চট্টোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় জীবন ও সাধারণ বীমা-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিদেশীয় সমব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতাবশত, ভারতে বীমাকার্য্যসংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে বহু সভাসমিতি, আন্দোলন, আলোচনা প্রভৃতির ফলে গত বৎসর ভারত-গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এক কমিটি নিযুক্ত হয় ও বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে একটি খসড়া আইন এ্যাসেম্বলীতে উপস্থিত করা হয়। বর্ত্তমানে এই বিষয়টি সিলেক্ট কমিটিতে রহিয়াছে। বীমার কার্য্যে সংশ্লিষ্ট সকল লোকের মতামত যাহাতে উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয় ও সকল দিক্ বিচার করিয়া নূতন আইন প্রণীত হয়, এই জন্য বীমা বীলটি বীমা আইনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কিছু সময় অতিবাহিত হইতে দেওয়া হইতেছে। এ-বিষয়ে বীমা-ব্যবসায়ীগণ যথেষ্টই সজাগ; কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে ততটা আকৃষ্ট হয় নাই। বীমা, বিশেষ করিয়া জীবনবীমা, বর্ত্তমান জগতে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের অনেকেরই সঞ্চিত অর্থ অল্পাধিক জীবনবীমায় রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত বীমার কার্য্যই বহু সহস্র লোকের প্রধান পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং নূতন আইন যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কয়েকটি বিষয়ে খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নূতন আইন আমরাই চাহিয়াছি, কিন্তু যাহাতে আমরা যাহা চাহিয়াছি তাহাই যেন ঠিক পাই সেদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

সকল প্রকার বীমার মধ্যে জীবনবীমার সহিতই ভারতীয় ব্যবসায়ী, কর্ম্মী ও জনসাধারণের অধিক সংযোগ, কারণ জীবনবীমা আজকাল বহু লোকে করিয়া থাকেন ও তজ্জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জীবনবীমার এজেণ্ট অথবা দালালের কাজ করিয়া অনেক কর্ম্মী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বীমা-ব্যবসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের মূলধন এই ব্যবসাতে নিযুক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন বীমা-প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র লোক নানা কার্য্যে চাকুরীতেও লিপ্ত আছেন। শিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের পক্ষে এই ব্যবসায়ের উন্নতি অথবা অবনতি বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ এই ব্যবসাতে তাঁহাদের যে পরিমাণ মূলধন, সঞ্চিত অর্থ ও পরিশ্রম কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, অপর কোন ব্যবসাতে সম্ভবত ততটা হয় নাই। অধুনা দুই শতাধিক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বীমার কার্য্য করিয়া থাকেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের হস্তে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার তহবিল মজুত আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় প্রায় ছয়-সাত কোটি টাকা হইবে। বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতে অর্জ্জিত তহবিল ও বাৎসরিক আয় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় কিছু কম হইলেও তাহাও প্রভূত। নূতন বীমা আইন প্রণয়নের একটা উদ্দেশ্য, এই সকল বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন করা। অদ্যাবধি ভারতে, ইংলণ্ড, জাপান, সুইৎজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্ম্মেনী, হলাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশের প্রতিষ্ঠানই শাখা ব্যবসায় খুলিয়া ইচ্ছামত ভারতীয় অর্থ অর্জ্জন করিতেছিলেন। বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের ভারতে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থ কোথায় কি ভাবে রক্ষিত হয় তাহা তাহাদের নিজেদের প্রায় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যবসায়-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহারা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিলে অর্থবল ও ভারতবাসীর স্বভাবসুলভ পরমুখাপেক্ষী মনোবৃত্তির সাহায্যে নিজ কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারিত। তাহাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও শুনা গিয়াছে যে তাহারা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অধিক

অর্থবল থাকায়, অন্যায় প্রতিযোগিতাও কখন কখন করিয়াছে।

বর্ত্তমানে যে নূতন আইন হইতেছে তাহার খসড়াটি আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, গবর্ণ্মেণ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করিয়া মন নিয়োগ করিয়াছেন। যথা :—

১। বীমা প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও গবর্ণ্মেণ্টের নিকট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ।

২। মোট তহবিলের কতটা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে গবর্ণ্মেণ্টের হস্তে রক্ষিত হইবে।

৩। বীমার এজেণ্টদিগের কমিশনের হার।

৪। বীমার এজেণ্টদিগের লাইসেন্স।

৫। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে বিধান।

মূলধন সম্বন্ধে নূতন আইনে যাহা দেখা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে অতঃপর কোন বীমা-প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসাতে আসিতে হইলে প্রচুর মূলধন না লইয়া আসিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে ২৫।৩০ হাজার টাকা লইয়া এই ব্যবসাতে নামা চলিত এবং ক্রমশঃ টাকা জমা দিয়া গবর্ণ্মেণ্টের নিয়ম রক্ষা করা চলিত। এখন প্রথম হইতেই ৫০০০০৲ টাকা জমা দিতে হইবে এবং অতি শীঘ্র টাকা জমা করিয়া দুই লক্ষ টাকা পূর্ণ করিতে হইবে। ভারতীয় বীমার ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে বহু বিরাট প্রতিষ্ঠান কর্ম্মীদের পরিশ্রমে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিক মূলধন থাকিলেই যে কোন ব্যবসায়ী অধিক ন্যায়বান্ হইবেন এ কথা বলে চলে না। ব্যবসাতে সততা ও কর্ম্মকুশলতাই প্রধান জিনিষ। বিরাট মূলধন থাকিলেও যে বহু ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করেন তাহার উদাহরণ দুর্ল্লভ নহে। ভারতীয় বীমা ব্যবসায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিশ্রম ও আদর্শবাদের নিদর্শন। এই ব্যবসাতে যদিও বর্ত্তমানে বণিক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, তথাপি প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরাই এই ব্যবসাটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া অল্পধনী-লোকেরা যে-প্রতিষ্ঠান প্রাণপাত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই ব্যবসাতেই অকস্মাৎ বিরাট মূলধনকে জয়যুক্ত করিয়া দেবতার স্থানে বসাইবার চেষ্টা বিশেষ লজ্জার কথা। অন্যায় কথাও। কারণ এখন বহুসংখ্যক ছোট ছোট বীমা-প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কার্য্য উত্তমরূপে চালাইয়া ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। নূতন আইনে এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে সৎ ও কর্ম্মকুশল বহু ব্যবসায়ী, শুধু স্বল্প মূলধন অপরাধে উৎপীড়িত হইবেন। বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইতিহাসে যেগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় তাহাদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই যে মূলধনের অভাবে নষ্ট হইয়াছে, এ-কথা আমরা অস্বীকার করি। নির্ব্বুদ্ধিতা ও প্রবঞ্চনা-চেষ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশতই বীমা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি প্রধানত হইতে পারে। গবর্ণ্মেণ্টের আইনে এই যে এককালীন অধিক মূলধন রিসার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা অথবা সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করার ব্যবস্থা হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য যদি বীমা ব্যবসায়ী অথবা বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা হয় তাহা হইলে এই চেষ্টা ইতিহাস ও সুবিবেচনা বিরুদ্ধ। কারণ যে ব্যবসায় মূলত সমবায়-জাতীয় তাহার পরিণতি মূলধনের উপর নির্ভর করে না—করে সততা ও কর্ম্মকৌশলের উপর।

দ্বিতীয়ত গবর্ণ্মেণ্ট চাহিতেছেন যে অতঃপর সকল বীমা-প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ মোট তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ সরকারী সিকিউরিটিতে মজুদ রাখিবেন। যে কোন ব্যাবসাতে তহবিল-সংরক্ষণ-নীতি চারিটি বিষয় বিচার করিয়া করা হয়।

১। নিরাপদে ও নষ্ট হইবার আশঙ্কা বর্জ্জিত ভাবে সংরক্ষণ

২। মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাসের আশঙ্কা বর্জ্জিত ভাবে সংরক্ষণ

৩। ইচ্ছামত নগদে পরিণত করিবার সুবিধা

৪। আয়

সরকারী সিকিউরিটি নিরাপদ সন্দেহ নাই। তাহা ইচ্ছামত নগদে পরিণতও করা যায়। কিন্তু তাহার মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি ক্রমাগতই হইয়া থাকে। আজ ১০০৲ শত টাকা এই সিকিউরিটিতে ন্যস্ত করিলে এক বৎসর পরে তাহা নগদে মাত্র ৯০৲ দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং যে অর্থ কোন-না-কোন সময় শতকরা এক শত টাকা হারে অপরকে ফিরাইয়া দিতে হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ সরকারী

সিকিউরিটিতে রাখা সমীচীন নহে। এতদ্ব্যতীত সরকারী সিকিউরিটির আয় আজকাল মাত্র শতকরা ২॥০ টাকা। বীমার ব্যাপারে বীমাকারীদিগকে যে ভাবে টাকা দেওয়া হয় তাহাতে শতকরা ৪।৫ টাকা আয় হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কোন তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ যদি অল্প হারে গচ্ছিত থাকে তাহা হইলে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ খুব অধিক হারে খাটাইতে হইবে, নতুবা তহবিলের মোট আয় কমিয়া ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে। এক-তৃতীয়াংশ সবিশেষ নিরাপদ রাখিয়া দুই-তৃতীয়াংশ উচ্চ লাভের আশায় লগ্নী করিলে বিপদের আশঙ্কা। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যবিধি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারী সিকিউরিটির উপর আসক্তি খুব বেশী নাই। যথা, আমেরিকার বীমা-ব্যবসায়ীগণ শতকরা মাত্র ৮।৯ টাকা সরকারী সিকিউরিটিতে লাগাইয়া থাকেন। ইংরেজও এক-তৃতীয়াংশের অনেক কম এই জাতীয় সিকিউরিটিতে ন্যস্ত করেন। বীমা-ব্যবসায়ীরা মোটামুটি নির্ব্বোধ নহেন। তাঁহারা নিজেদের ব্যবসা ভালই বুঝেন। সুতরাং আইন করিয়া তাঁহাদের হাত-পা বাঁধিবার প্রয়োজন এক্ষেত্রে নাই। ইহা ব্যতীত একথাও বলা যায় যে যদি কোন দিন ভারতীয় বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির মোট তহবিল এতটা বাড়িয়া যায় যাহাতে সেই তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ প্রমাণ গবর্ন্মেণ্ট সিকিউরিটি বাজারে পাওয়াই যাইবে না, তাহা হইলে কি বীমা ব্যবসার খাতিরে সরকার বাহাদুর পুনর্ব্বার অধিক করিয়া ঋণ গ্রহণ করিবেন? এই আইন হইলে ইহার ফলে বীমা ব্যবসার কোন লাভ হইবে না, শুধু সরকারী সিকিউরিটির বাজার তেজী হইবে মাত্র। এই কারণে শুধু সেই পরিমাণ সরকারী সিকিউরিটিই বীমার আপিসে রাখা প্রয়োজন—যাহা না রাখিলে অকস্মাৎ অধিক নগদ টাকার দরকার হইলে কার্য্যের ক্ষতি হয়। এই প্রকার নগদের প্রয়োজনের একটা সীমা আছে এবং বহু শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে বলা যায় যে বীমার কার্য্যে হঠাৎ নগদের প্রয়োজন উচ্চতম শতকরা ১০।১২ টাকার অধিক হইতে পারে না; সুতরাং শতকরা ১৫৲ টাকা যদি গবর্ন্মেণ্ট সিকিউরিটিতে রাখা যায় তাহা হইলে বীমা-ব্যবসায়ী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বাকী টাকা নিরাপদ, অথচ মূল্যহ্রাস-আশঙ্কাবর্জ্জিত উচ্চ আমদানী-দায়ক লগ্নীতে রাখা উচিত।

বীমার এজেণ্টদিগের কমিশন ও লাইসেন্স সম্পর্কে এই নূতন আইনে বিধান রহিয়াছে। বীমার এজেণ্টগণ কতটা কমিশন অর্জ্জন করিবে বহু বৎসরের ব্যবসার গতির ফলে তাহার একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সরকারী দণ্ডবিধি কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এজেণ্ট নামটি বাদ দিলেই এই দণ্ডবিধিরও আর কোন জোর থাকিবে না। বীমার কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম এজেণ্টরাই করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে বীমার প্রচলনও এজেণ্টদের চেষ্টাতেই হইয়াছে ও হইতেছে। ম্যানেজার, অংশীদার প্রভৃতির লাভের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া শুধু এজেণ্টদের রোজগার আইনের কবলে আনিয়া অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এই আইনের জোরে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা আরও অধিক করিয়া প্রকৃত শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবে। বীমার এজেণ্টদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে বিক্ষুব্ধ-চিত্ত ও অভিমানী। আজকাল যেরূপ দ্রুতগতি রুশিয়ার প্রলাপের প্রচার এদেশে হইতেছে, তাহাতে হঠাৎ একটা শিক্ষিত কর্ম্মীসঙ্ঘের মধ্যে এইরূপ একটা আইন জারি করিলে, তাহার বিশেষ কুফল ফলিতে পারে। কুফল আরও গভীর হইবে, কারণ আইনের মধ্যে ভেদাভেদ লক্ষিত হয়।

তৎপরে এজেণ্টদিগের লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইতেছে। লাইসেন্স জিনিষটির নিজের কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না; কিন্তু লাইসেন্স-দাতাদের দোষে অনেক সময় জিনিষটা উৎপীড়নের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাউক যে সকলকে থানায় গিয়া ফর্ম্ম লিখিয়া সনাক্ত হইয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। ব্যাপারটা যে কিরূপ কষ্টকর হইবে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। লাইসেন্স যদি লইতেই হয় তাহা হইলে তাহা সকল বীমা-প্রতিষ্ঠান মিলিয়া কোন একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলে উত্তম হয়। কারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে বীমার এজেণ্টগণ এমন কোন অপরাধ করেন নাই যাহার জন্য তাহাদের আইনের কবলে পড়িতে হইবে। ব্যবসাগত লাইসেন্স ও সরকারী লাইসেন্সে অনেক প্রভেদ।

যে ব্যবসা ও যে-সকল প্রধান কর্ম্মীদের সহিত এজেন্টদিগের কারবার, লাইসেন্স সেই ক্ষেত্র হইতে গ্রাহ্য হইলে কেহ আপত্তি করিবে না। আইন, আদালত, থানা, পুলিস, সনাক্ত হওয়া, ফি দেওয়া ও বৎসরে বৎসরে লাইসেন্স আপিসে খাতাপত্র লইয়া হত্যা দেওয়ার মজুরী বীমার এজেন্সীর কার্য্যে পোষাইবে না।

ভারত-গবর্ণ্মেন্টের নূতন আইনে বিদেশী বীমা ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু ভয় দেখান হইয়াছে। কিন্তু তদনুরূপ শাসন হইবে কি না এ বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই।

নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত বীমাকারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও ভারতীয় বীমা-ব্যবসার ক্রমোন্নতি সাধন। আইনের খসড়াটি দেখিয়া একটি বহু পুরাতন গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ অশ্বারোহণ-আকাঙ্ক্ষায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। তাহার কাতর "একঠো ঘোড়া দিলাদে রাম" প্রার্থনা ও প্রার্থনা পূর্ণ হইবার পরে "উল্টা বুঝলি রাম" আর্ত্তনাদের ইতিবৃত্ত সর্ব্বজন-বিদিত। বীমা-আইন-সংস্কারের প্রধান যে দুইটি উদ্দেশ্য, নূতন খসড়া আইনে তাহার কোনটিই সাধিত হইবে না। বর্ত্তমানে আইনের খসড়াটি সিলেক্ট কমিটিতে রহিয়াছে। আমরা আশা করি যথাযথ বিচার না করিয়া এবং জনসাধারণ ও বীমা ব্যবসার কর্ম্মীদিগের মতামত পর্য্যালোচনা না করিয়া এই খসড়াটি পাকা আইনে পরিণত হইবে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলগুলির উচিত এই বিষয়ে নিজ নিজ কমিটি বসাইয়া সম্যক্ আলোচনা করিয়া এ-বিষয়ে ভোটের বিধান করা।

চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন

বাংলা সন ১৩৩৬ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পর গত ফাল্গুন মাসে চন্দননগরে তাহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে ছয় বৎসর অধিবেশন বন্ধ ছিল। সাধারণ ভাবে তাহার কারণ চন্দননগরের অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার অভিভাষণে নির্দ্দেশ করেন। তাহা 'নৈতিক পঙ্গুতা'। এই নৈতিক পঙ্গুতার ব্যাখ্যাও তাঁহার অভিভাষণে আছে।

চন্দননগরের অধিবেশনে সমুদয় কাজ যে প্রাকৃতিক বিঘ্ন-বাধা সত্ত্বেও সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের ঐকান্তিক সানুরাগ চেষ্টা ও শৃঙ্খলার গুণে। স্বেচ্ছাসেবিকা ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের দল এই কর্ম্মীদের অন্তর্গত।

গঙ্গাতীরে শেঠ মহাশয়ের যে "জাহ্নবী-নিবাস" নামক বৃহৎ সৌধ আছে, তাহার বিস্তৃত হাতায় নবনির্ম্মিত মণ্ডপে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম দিন সেখানেই অধিবেশন হইয়াছিলও। পরে ঝড়বৃষ্টিতে মণ্ডপ ভূমিসাৎ হয়। পরবর্ত্তী সব অধিবেশন জাহ্নবী-নিবাসের বৃহৎ বৃহৎ কক্ষে এবং শেঠ মহাশয়ের অন্যতম কীর্ত্তি নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে হইয়াছিল। প্রদর্শনী হইয়াছিল জাহ্নবী-নিবাসের নীচের তলার কয়েকটি কক্ষে। তাহাতে চন্দননগরের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার ইতিহাস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। চন্দননগরের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগৃহীত হইতে পারে, হরিহর বাবু নিজ বাসভবনে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহ প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। তদুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য তাঁহার দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত করাইয়া নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"আমার শরীরের অপটুতার জন্য আমি লজ্জিত; বারংবার আমাকে অক্ষমতার কথা নিবেদন করতে হয়; এই ঘোষণা কোনো কালেই সুখকর বা গৌরবজনক নয়; কিন্তু আমার এ-বয়সে একথা আর গোপন করা সম্ভব নয়
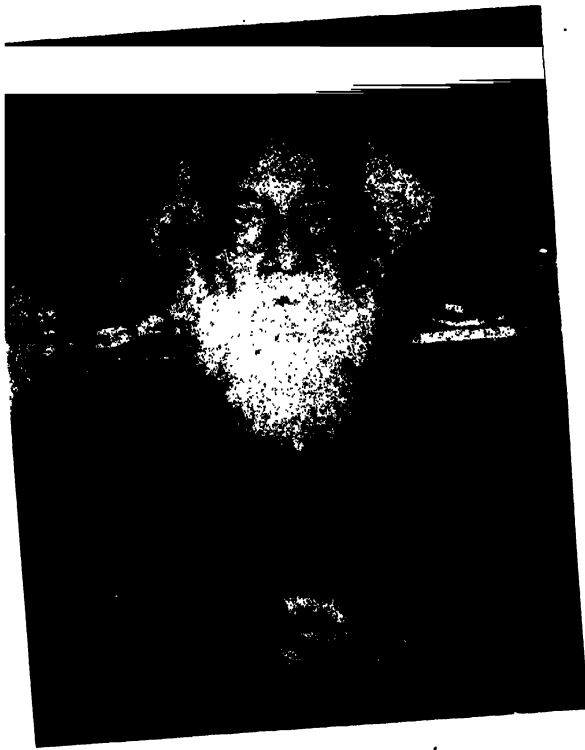
সম্মিলনের উদ্বোধয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[ফটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী]

ডক্টর সর্ যদুনাথ সরকার
ইতিহাস শাখার সভাপতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মূল সভাপতি
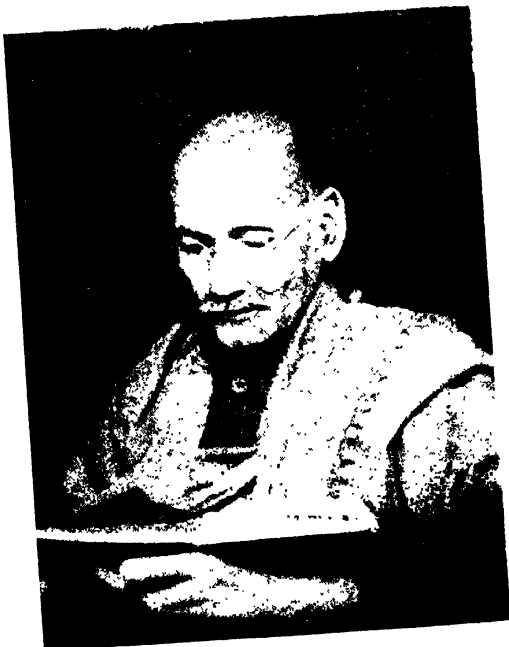
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
সাহিত্য শাখার সভাপতি

চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ম্মপরিচালকগণ
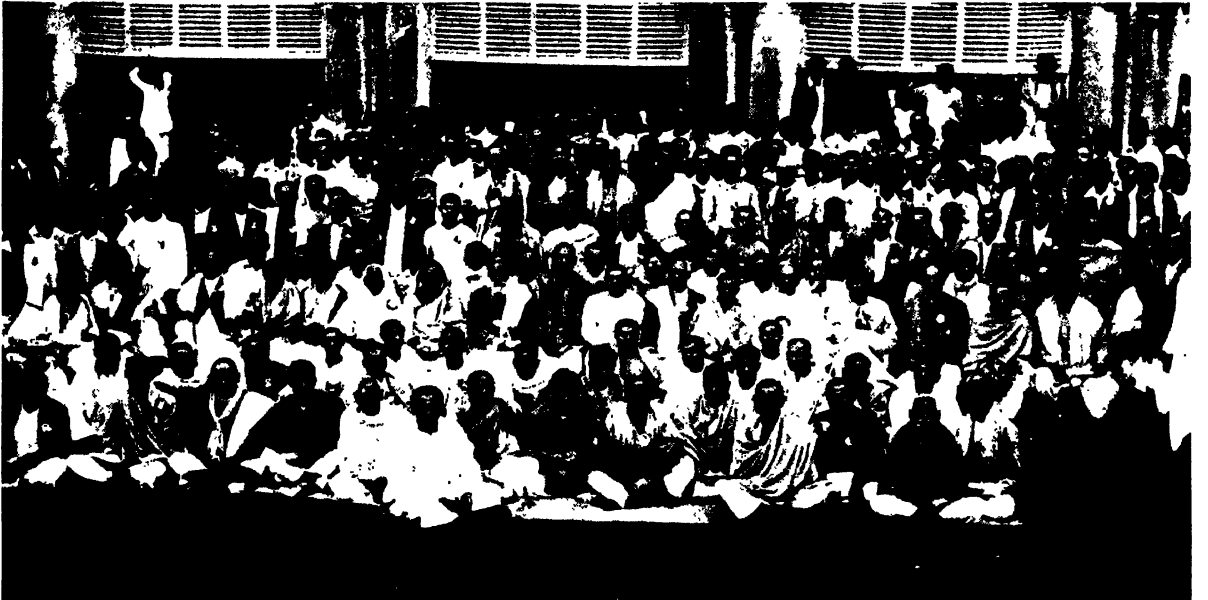
চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিবৃন্দ, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গ ও প্রতিনিধিগণ

শ্রীহরিহর শেঠ

ডাঃ শ্রী সুন্দরীমোহন দাস
চিকিৎসা শাখার সভাপতি

গৃহস্থ যত দিন বৈভবসম্পন্ন থাকে তত দিন চার দিকের নানা দাবী সহজে ও আনন্দের সঙ্গে সে স্বীকার ক'রে নেয়। একদিন তার তহবিল হয়ত ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু বাহিরের দাবী বন্ধ হয় না, তখন সে দাবী রক্ষা করতে না পারলে কৃপণতার অভিযোগ হয়। বারংবার আমার শারীরিক দীনতার কথা নিবেদন ক'রেও নিষ্কৃতি পাই নে, তাই জীর্ণ দেহ ক্ষীণ কণ্ঠ নিয়ে পরিচিত পথে চলেছি।

"এই সম্মিলনের উদ্বোধনের ভার আজ আপনারা আমার উপর অর্পণ করেছেন। 'উদ্বোধন' বাক্যটি শুনে আরেক দিনের কথা আমার মনে এল। একদা এই শহরের এক প্রান্তে এক জীর্ণপ্রায় বাড়ীতে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম, তার পর মোরান সাহেবের হর্ম্ম্যেও কিছুকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরেরই এক প্রান্তে আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন, সেই আমার জীবনের সহজ ও সত্য উদ্বোধন। সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করি যে বাংলা দেশের নদীই বাংলা দেশের প্রাণের বাণী বহন করে। নগরের ইট-কাঠের দুর্গের মধ্যে বাল্যবয়সে ছিল আমার অবরোধ। এই অবরোধ অনেককে দুঃখ দেয় না দেখি, কিন্তু আমাকে তা সর্ব্বদাই দুঃখ দিত, যে চিত্ত সর্ব্বদা আকাশকে কামনা করে তাকে করেছে অবরুদ্ধ। আমার চিত্ত সহজে সে-অবরোধ স্বীকার করে নি, মুক্তির সন্ধানে দূর আকাশের দিকে ছিল তার দৃষ্টি। তার পর একদা কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাবে আমাদের পেনেটির বাগানে আনা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন সঞ্চরণ আমার সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল, বাংলার নদী আমাকে ডাক দিয়েছিল। এত দিন আমার সেতার ছিল পড়ে, তার তার বাঁধা হয় নি, তাতে সুর ওঠে নি, এই সময় আমি বিশ্বের সুরে আমার সেতারের সুর বেঁধে নিয়েছিলেম। গঙ্গার তীরে আমি আমার জীবনের প্রথম মুক্তি পেয়েছিলেম, তাই নিজেকে আমি গাঙ্গেয় মনে করি।
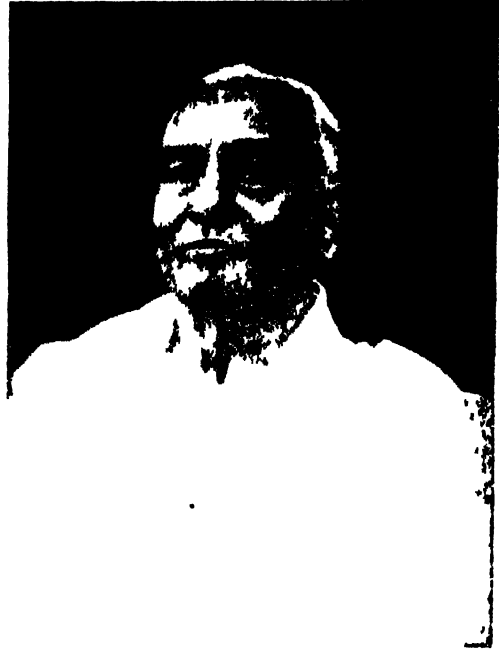
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সুকুমার কলা শাখার সভাপতি

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

"সেই গেল প্রথম বয়স, তখনও বাণী ফুটে ওঠে নি, সুর লাগে নি। তার পরে মোরান সাহেবের বাগানে কিছুকাল কাটিয়েছিলেম। গঙ্গার তীরে সেই হর্ম্যের অলিন্দে ও সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অনেক রাত্রি আমি কাটিয়েছি, আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে হয়েছিল বিশ্ব কত নিকটে এসেছে। আমার কবিজীবনের সেই প্রথম সূচনা।

"আমাদের দেশে সাহিত্যের সমাগম হয়েছে বসন্ত ঋতুর মত—কখন কি ভাবে এসেছে বসন্তের দূত তা জানি নে, তবে তা আমাদের অন্তরকে মাধুর্য্যে রসে বিকশিত পূর্ণ করেছে। সেদিনকার উদ্বোধনের ইতিহাস ভাল ক'রে লেখা হয় নি—ইংরেজী ভাষার অত্যন্ত গৌরবের দিনে, কেমন ক'রে কোন্ আহ্বানে কবিহৃদয়ে গান মুখরিত হয়ে উঠল, বাণী জাগরিত হয়ে উঠল, তার পরিচয় আজও হয় নি—কিন্তু সে-বসন্তসমাগম চিরবসন্ত হয়ে রইল। আমার জন্মের পূর্ব্বেই সে বসন্তের আরম্ভ।

"প্রথম যখন সাহিত্য-পরিষদের সূচনা হয় – আমিও হয়ত তার মধ্যে ছিলেম—তখন হয়ত এর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে অনুকরণস্পৃহা ছিল। কিন্তু সে তুচ্ছতা দূরে পড়ে আছে, এর মধ্যে যা সত্য তা অনুকরণকে অতিক্রম করেছে, এইটি আমাদের পরম আনন্দের বিষয়। আমি কামনা করি আমাদের এই আয়োজন সম্পূর্ণ হোক, কৃতার্থ হোক, বিকৃতি এসে যেন একে নষ্ট না করে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সকল দেশে আদর্শ আশা-আকাঙ্ক্ষা রসপুষ্ট হয়েছে। আমাদের দেশেও তার ভূমিকা হয়েছে—বিকার যেন একে নষ্ট না করে। সমস্ত পৃথিবীর বাতাসে আজ কলুষ, পরম দুঃখে মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস হারিয়েছে। আমরা যারা সেই ধারা থেকে দূরে আছি তাদের মধ্যেও যদি সেই বিকৃতির সংক্রমণ লাগে তবে তা থেকে আমাদের মুক্তি পাবার চেষ্টাই করতে হবে। যুদ্ধের সঙ্গে বিদেশে মানুষের যে চিত্তবিকৃতি ঘটেছে তাতে তারা সাহিত্যকে নামাবার চেষ্টা করছে ভূমিতলে, যাকে বলে তারা

বাস্তবতা। কীটের যা বাস্তবতা, পশুর যা বাস্তবতা, মানুষের বাস্তবতাও কি তাই?

"সাহিত্যকে নির্ম্মল রাখবার চেষ্টা যেন আমাদের থাকে। সঙ্কীর্ণ বা নীরসকে আমি নির্ম্মল বলি নে, কবি হয়ে তা আমি পারি নে। বিধাতা যে সৌন্দর্য্যে যে রসে আমাদের অধিকার দিয়েছেন তা স্বীকার ক'রে না নিলে সেই সৌন্দর্য্য ও রসের যিনি বিধাতা তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। বিধাতার দান এই আনন্দরস উপভোগ করা যাঁরা অন্যায় বলেন তাঁদের আমি ধিক্কার দিই। কিন্তু সেই আনন্দরসে যেন কলুষ প্রবেশ না করে, তাতে যেন বিষ মিশ্রিত না হয়।

"এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলি। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের কথা আজ আমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে, বাহিরের সঙ্গে সেই সময় আমার যোগ হয়েছিল। সেই সময় বক্তৃতামঞ্চে অনেক বাঁধা সভাপতি ছিলেন—কোন সুযোগে হীরেন্দ্রবাবুকে আমার কোন বক্তৃতায় সভাপতিরূপে পেলে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ'ত। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে আজ আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।"

হরিহরবাবুর অভিভাষণটিতে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দননগরের নানা ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে তথাকার মানচিত্র ও নক্সা, পুরাতন ও আধুনিক বহু দৃশ্য, সৌধ, দুর্গ, দলিল, এবং ঐতিহাসিক ভারতীয় ও বিদেশী ব্যক্তিগণের ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি মুদ্রিত হওয়ায় উহার মূল্য বাড়িয়াছে। চন্দননগরের প্রতি হরিহরবাবুর যেরূপ কর্ম্মিষ্ঠ অনুরাগ, বঙ্গের অন্য সব স্থানেরও কোন-না-কোন নাগরিকের যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশ নানা দিকে উপকৃত হইত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণটির উল্লেখ আগেই করিয়াছি। তাঁহার অভিভাষণটির এবং অন্য সমুদয় অভিভাষণের বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারা যাইবে না—সমুদয়ই খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায় তাহা আবশ্যকও নহে। হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণের কেবল তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

বাংলা বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্থান লাভ করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যাহা লাভ করিবে, সে বিষয়ে সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহাদের চেষ্টা ও কৃতিত্বের ন্যায্য প্রশংসা হীরেন্দ্রবাবু প্রদান করিয়াছেন। তিনি বঙ্গভাষাকে বাঙালীদের যাবতীয় শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টার কিছু ইতিহাসও তাঁহার অভিভাষণে দিয়াছেন। সে বিষয়ে তাঁহার উল্লিখিত প্রথম ঘটনা এই—

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্য যোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে বিতরিত হয়—তজ্জন্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া (আমিও ঐ কমিটির এক জন সদস্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত করেন। ঐ কমিটি সসঙ্কোচে প্রস্তাব করেন—

That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate.

ঐ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তবে মহামান্য সেনেট-সভা প্রজ্ঞার উচ্চ চূড়ায় চড়িয়া—'দিও হে কিঞ্চিৎ, কোরো না বঞ্চিত' এই

চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ

নীতির অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিধান করেন যে, "An *optional* examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate."

হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, বিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত দর্শন-ক্ষেত্রেও তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই, যে, এ বিষয়ে বাঙালী-দের চিন্তার যাহা কিছু উত্তম ফল, তাহা বাংলা ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর তিনি বাংলা দেশের আধুনিক নিম্নলিখিত দার্শনিকদের নাম করিয়াছেন,—

"অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কৈলাস শিরোমণি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি।"

আমার বোধ হয়, এই তালিকার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতিরও নাম নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণে লিখিত আর যে একটি বিষয়ের উল্লেখ আমি করিতে চাই, তাহা বঙ্গের তরুণ সাহিত্যিক দল সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন:—

বস্তুতঃ এই তরুণ দলই বাংলা সাহিত্যের ভাবী ভরসার স্থল। সেজন্য তাঁহাদের দায়িত্ব অসীম। প্রবীণ সাহিত্যিকদিগের অনেকেরই আয়ুঃসূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আর কয়দিন? বাংলা সাহিত্যের স্বস্তি ও সমৃদ্ধি এই তরুণদলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই তরুণদলকে আমি বেশ প্রীতির চক্ষে দেখি। যদিও কাহারও কাহারও মধ্যে অকালপক্বতার জরা ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু কয়েক জনের রচনায় প্রতিভার প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে—মনে হয় কাহারও কাহারও হৃৎপদ্মে শতদলবাসিনী তাঁহার রাঙা চরণ অর্পণ করিয়াছেন। বোধ হয় ঐরূপ তরুণদিগকেই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আশীষবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—

"ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।" ইত্যাদি

অবশ্য, হীরেন্দ্র বাবু তরুণদের কেবল প্রশংসাই করেন নাই, তাঁহাদিগকে "সাহিত্যের ভূমিতে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা" সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে সতর্কও করিয়াছেন। এরূপ সতর্ক করার প্রয়োজন আছে। আরও কেহ কেহ তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার উদ্বোধনে তাহা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা তরুণ, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ—বিশেষ কোন সাহিত্যিক দলের উদ্দেশে করেন নাই। হীরেন্দ্রবাবুও, তরুণ দলেরই উল্লেখ করিয়া থাকিলেও, যে দুই জন অ-তরুণ ঔপন্যাসিকের চারিখানি উপন্যাসবর্ণিত কোন কোন নায়িকা সম্বন্ধে নিন্দাপ্রশংসামিশ্রিত প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহাদের এক জনের বয়স ৭৫এর উপর, অন্য জনের ৬০এর উপর।

হীরেন্দ্রবাবুর সমুদয় উক্তির ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা বা ইঙ্গিত করা আমার অনভিপ্রেত। আমি অন্য একটা কথা বলিব।

সাহিত্যে অশ্লীলতার নিন্দাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। নিন্দা অনাবশ্যক নহে। কেহ কেহ অন্তবিধ শাস্তির প্রস্তাব এবং সমর্থনও করেন। কিন্তু আমাদের দেশে ও অন্য নানা দেশে কোন কোন যুগে অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব কেন হইয়াছিল বা হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা এবং সমুচিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক—হয়ত তাহাই অধিক আবশ্যক। ইংলণ্ডে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন আরোহণের পর একবার

ইংরেজী সাহিত্যে খুব অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব হয়। আবার গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে ইউরোপের বোধ হয় সর্ব্বত্র তাহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই উভয় যুগে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার কারণও নির্ণীত—অন্ততঃ অনুমিত হইয়াছে। আমাদের দেশের সম্বন্ধেও তাহা করিতে হইবে। মানুষের নানা অপরাধের জন্য আইনে নানা দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শুধু শাস্তির দ্বারা মানুষের সামাজিক ও চারিত্রিক উন্নতি হয় নাই। অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এবং বোধ হয় শাস্তির চেয়ে সেইগুলিই বেশী কার্য্যকর হইয়াছে। এ-বিষয়ে আমরা পরে কিছু লিখিব।

সর্ যদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখার সভাপতি রূপে তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ অভিভাষণে, ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন না হইয়া ফরাসীর অধীন হইলে কি হইত, তাহার কিছু আভাস দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা এরূপ অনুমান করি নাই, যে, তাঁহার মতে ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া উচিত নয় বা স্বাধীনতায় ভারতবর্ষের অধিকার নাই, বা তাঁহার মনে স্বাধীনতার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপ অনুমান না-করিবার নিমিত্ত যদুবাবুকে জেরা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার লিখিত এবং একাধিক বার মুদ্রিত ছত্রপতি শিবাজীর ইংরেজী জীবনচরিতে শিবাজী সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, তিনি স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন এবং হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের ও রক্ষণের সামর্থ্যে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে শিবাজী কি করিয়াছেন ?

"He has proved by his example that the Hindu race can build a nation, found a State, defeat enemies; they can conduct their own defence; they can protect and promote literature and art, commerce and industry; they can maintain navies and ocean-trading fleets of their own, and conduct naval battles on equal terms with foreigners. He taught the modern Hindus to rise to the full stature of their growth.

"He has proved that the Hindu race can still produce not only *jamaitdars* (non-commissioned officers) and *chitnises* (clerks), but also rulers of men, and even a king of kings (*Chhatrapati*). The Emperor Jahangir cut the *Akshay Bat* tree of Allahabad down to its roots and hammered a red-hot iron cauldron on to its stump. He flattered himself that he had killed it. But lo! in a year the tree began to grow again and pushed the heavy obstruction to its growth aside!

"Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead, that it can rise from beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage, exclusion from the administration, and legal repression; it can put forth new leaves and branches; it can again lift up its head to the skies."

ভারতবর্ষ ফরাসীর অধীন হইলে কি হইত, সে বিষয়ে যদুবাবুর অনুমান সর্ব্বাংশে বা সারতঃ ঠিক কি না তাহার আলোচনা করিব না। হয়ত এ বিষয়ে—অন্ততঃ কিছু—মতভেদ হইবে। ভারতবর্ষ অধিকার করিবার চেষ্টা ইউরোপের অনেক জাতি করিয়াছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের "Rise of the Christian Power in India" ("ভারতে খ্রীষ্টিয়ান শক্তির অভ্যুদয়") নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষ ফরাসীদের অধীন হইলে কি হইত, তাহার আলোচনা এই মূল্যবান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায় আছে। তাহা হইতে আমরা কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিব।

"..................it does not require any stretch of imagination to conceive what India would have been like to-day, had France occupied the position which England does now in India. Had the French driven out the English, almost the whole of India would have been Frenchified by this time."

তাহা হইলে, তাহা বোধ হয় বাঞ্ছনীয় হইত না।

ভারতবর্ষ ফ্রান্সের অধীন হইলে কি হইত, সে বিষয়ে যদুবাবুর অনুমান সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই হউক বা না-হউক, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ফরাসী দলিলপত্র ও সাহিত্যে যে-সকল মূল্যবান উপকরণের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রাঁচিতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে এবং চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যে দুটি অভিভাষণ পড়িয়াছেন, তাহা বাঙালীর মরণবাঁচনের সমস্যা সম্বন্ধে

চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

লিখিত। তাঁহার লিখিত বিষয়গুলির খুব আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শুধু আলোচনা নহে, বাঙালী যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং তাহার অভ্যুদয় হয় এরূপ উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করাও চাই। কিন্তু করিবে কে?

অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা বানান সম্বন্ধে অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি চান উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান। ইহা অযৌক্তিক নয়। ইহা স্বাভাবিকও বটে। আমাকে দুই জন শিক্ষয়িত্রী বলিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেক ছাত্রী উচ্চারণানুযায়ী বানান করে কিন্তু পরীক্ষকেরা নম্বর কাটিবে বলিয়া তাহাদের সে সব বানান সুধরাইয়া কেতাবী বানান শিখাইতে হয়! কিন্তু উচ্চারণানুযায়ী বানানের পথটা যে খুব সোজা, তা নয়। কারণ, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে একই শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রকম; এবং উচ্চারণের পরিবর্ত্তনও কালক্রমে হয় ও হইয়া আসিতেছে। অতএব, কতকটা স্থায়ী কোন এক রকম নির্দ্দিষ্ট বানানের পক্ষেও কিছু বলিবার আছে।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১১

তিব্বতের মত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত দেশ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ভারতের উত্তর সীমায় স্থিত, কিন্তু এ-দেশের জনসাধারণ কেন, শিক্ষিত লোকেও তিব্বতের বিষয় খুবই অল্প জানেন। আমার এক বন্ধুকে তিব্বত হইতে চিঠি লিখিয়াছিলাম পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিবার জন্য ডাকে কিছু কাগজ পাঠাইতে; তিনি পত্রোত্তরে লিখিলেন, ডাক অপেক্ষা রেলে পাঠাইলে মাশুল কম লাগিবে, সুতরাং রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম পাঠাইলে ভাল হয়। এই উত্তরে এ-দেশ সম্বন্ধে আমাদের ইংরেজী শিক্ষা জাত জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ তিব্বত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা কিছুই জানি না, লোকের ধারণা নাই যে, হিমাচলের পাদমূলস্থ ব্রিটিশ ভারতীয় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মাসের পথ চলিয়া বিশ হাজার ফুট উচ্চ কয়েকটি গিরিসঙ্কট পার হইলে তবে লাসা পৌছান যায়। কালিম্পং হইতে পথের দুই-তৃতীয়াংশ পার হইলে পর গ্যাঙ্‌চী; তাহাই ইংরেজের শেষ ডাকঘর, ঐ পর্য্যন্ত ভারতীয় ডাকমাশুলে চিঠিপত্র ও পার্শেল ইত্যাদি যায়। লাসা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাম ভারতীয় দরেই যায়।

সভ্য জগতে তিব্বতের এইরূপ অপরিচিত থাকার প্রধান কারণ ইহার দুর্গমতা। দক্ষিণ ও পশ্চিমে হিমালয়ের গগনভেদী বিরাট পর্ব্বতমালা, উত্তরে (লাসা হইতে এক শত মাইলের কিছু বেশী দূরে) বিশাল মরুভূমি; এই সকলই অতি দুর্গম। ভারত হইতে তিব্বত যাইবার প্রধান পথগুলি কাশ্মীর ও দার্জ্জিলিং অঞ্চল হইতে গিয়াছে; দার্জ্জিলিং হইতে লাসার দূরত্ব ৩৬০ মাইল। এ-দেশের অধিকাংশ স্থলই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফুটের উপরে, এইজন্য বৎসরের আট মাস এ-দেশের মাটি তুষারাচ্ছন্ন থাকে। তিব্বতই জগতের সর্ব্বোচ্চ জনপদ।

তিব্বত বিশাল দেশ। ইহা নামমাত্র চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ-দেশের লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু সামাজিক প্রথাদিতে এক প্রান্তের আচার-ব্যবহারের সহিত অন্য প্রান্তের মিল নাই, তথাপি এ-দেশে ধর্ম্মের প্রাধান্য অতি দৃঢ়। দেশের শাসক দলাই লামা ভগবান বুদ্ধের অবতার রূপে পরিচিত এবং লোকের বিশ্বাস যে নূতন দলাই লামা সিংহাসনে বসিলে তাঁহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আত্মা আবির্ভূত হয়। সারা দেশ বৌদ্ধ মঠে পরিপূর্ণ। লাসায় এরূপ তিনটি মঠ আছে, যাহার প্রত্যেকটিতে চার-পাঁচ হাজার ভিক্ষু বাস করে। ইহা ছাড়া আরও অনেক মঠ আছে যাহাতে শত শত ভিক্ষু থাকে।

প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে তিব্বত অন্য দেশ হইতে বিশেষ-ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ পরিস্থিতির প্রভাবে এ-দেশীয়েরাও অন্য দেশের অধিবাসীর সহিত মেলা-মেশায় অনিচ্ছুক। তিব্বতীয় ভদ্রলোক সাধারণতঃ শান্ত শিষ্ট এবং আপনভাবে ভরপূর। বিদেশীয়ের সহিত সম্পর্ক রাখা ইঁহারা ভাল মনে করেন না। নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মে ইঁহাদের অসীম শ্রদ্ধা, উপরন্তু প্রাচীন পন্থায় চাষবাস ও ক্রিয়াকর্ম্মাদি করিয়া সন্তোষের সহিত জীবন যাপন ইঁহারা সংসারের প্রধান লক্ষ্য মনে করেন। আধুনিক বিংশ শতকের সভ্যতা হইতে ইঁহারা যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চাহেন এবং সেই জন্যই এদেশে বিদেশীয়ের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা বিশেষ অতিথিবৎসল।

তিব্বতীয়েরা প্রচুর চা পান করে। নৃত্যগীতেও ইহাদের বিশেষ উৎসাহ। নৃত্য প্রধানতঃ পুরুষেরাই করে, স্ত্রীলোকের মধ্যে নৃত্যের বড় চলন নাই। এ-দেশে স্ত্রীলোকের পর্দ্দা নাই, পুরুষের মত তাহারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া উপার্জ্জনের পথ দেখে।

তিব্বতে, বিশেষতঃ লাসা অঞ্চলে, প্রবেশ করা কি কঠিন ব্যাপার তাহা তিব্বত-যাত্রা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। আমি ফাল্গুন শুক্লা ষষ্ঠীতে ভারতসীমান্ত হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া আষাঢ়ের শুক্লা ত্রয়োদশীতে লাসায় উপস্থিত হই। আমার এই যাত্রা আত্মতৃপ্তি অথবা ভৌগোলিক অনুসন্ধানের জন্য হয় নাই; এ-দেশের সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন এবং উহা হইতে ভারতীয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মনৈতিক তথ্য আহরণের জন্য আমি এ-দেশে আসি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার আচার্য্য শান্তরক্ষিতের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলার আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় পর্য্যন্ত ভারত ও তিব্বতের সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা ইতিহাসপ্রেমিক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারত তিব্বতকে ধর্ম্ম, অক্ষর ও সাহিত্যিক ভাষা দান করেন। ভারতীয়েরা এ-দেশে আসিয়া কিছু হিন্দী এবং বহু সহস্র সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ

করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের পরিমাণের ধারণা করিতে হইলে এখানে কংগ্যুর ও তংগ্যুর নামে যে দুইখানি বিশাল সংস্কৃতগ্রন্থানুবাদসংগ্রহ প্রচলিত তাহা দেখিতে হয়। এই দুইখানি সংগ্রহে বিশ লক্ষের অধিক অনুষ্টুপ শ্লোক আছে। তিব্বতীয়েরা যে-বচনগুলিকে ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বলিয়া মনে করে কংগ্যুর তাহারই সংগ্রহ; ইহা মুখ্যত সূত্র, বিনয় ও তন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত। কংগ্যুর এক শত বেষ্টনীতে বাঁধা, সেই জন্য ইহা শত-পুস্তক নামে কথিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সাত শত পুস্তকের সংগ্রহ আছে। কংগ্যুর-সংগ্রহের কতক পুস্তক সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ হইতে গৃহীত। কংগ্যুরস্থ অনেক গ্রন্থের টীকা, উপরন্তু দর্শন, সেব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যশাস্ত্র, মন্ত্রতন্ত্রের পুস্তক প্রভৃতি কয়েক শত গ্রন্থের ভাষান্তর তংগ্যুরে আছে। এই সকল সংগ্রহ দুই শত পুথীতে নিবদ্ধ। ভারতীয় দর্শন নভোমণ্ডলের প্রখর জ্যোতিষ্ক আর্য্যদেব, দিঙনাগ, ধর্ম্মরক্ষিত, চন্দ্রকীর্ত্তি, শান্ত-রক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতির মূল গ্রন্থ এই দুইখানি সংগ্রহে রক্ষিত আছে, যদিও ভারতে উঁহাদের কীর্ত্তির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই, কেবল তিব্বতী অনুবাদে তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। আচার্য্য চন্দ্রগোমীর চান্দ্র ব্যাকরণ—সূত্র, ধাতু, উনাদি পাঠ, বৃত্তি, টীকা, পঞ্জিকাদির সহিত এখনও বিদ্যমান। "ইন্দ্রশ্চন্দ্র কাশকৃৎস্নঃ" শ্লোক অনুসারে অষ্ট মহাবৈয়াকরণ মধ্যে চন্দ্রগোমী এক জন মহাবৈয়াকরণ ছিলেন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তংগ্যুর-সংগ্রহে তাঁহার লোকানন্দ-নাটক, বাদন্যায় টীকা প্রভৃতি হইতে আমরা তাঁহার কাব্যে ও দর্শনশাস্ত্রে অধিকার ও ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়াছি। অশ্বঘোষ, মতিচিত্র (মাতৃচেতা) হরিভদ্র, আর্য্যশূর প্রভৃতি মহাকবির কত-না বিনষ্ট কীর্ত্তি তংগ্যুর-সংগ্রহে কালিদাস, দণ্ডী, হর্ষবর্দ্ধন, ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতির সংস্কৃতে সুলভ গ্রন্থাদির সঙ্গে একত্রে রক্ষিত আছে। এই অমূল্য সংগ্রহেই অষ্টাঙ্গ হৃদয়, শালিহোত্র আদি বৈদ্যক-গ্রন্থ টীকা-উপটীকার সহিত রহিয়াছে, ইহাতেই মহারাজ কনিষ্ককে লিখিত মতিচিত্রের পত্র, মহারাজ চন্দ্রকে লিখিত যোগীশ্বর জগদ্রত্নের পত্র, পালবংশীয় রাজা জয়পালের প্রতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পত্র ও অন্যান্য বহু অমূল্য পত্রাবলী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু বৌদ্ধ যোগী অবধূত বৈরাগীর বচন দোঁহা প্রভৃতির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদ-সংগ্রহও ইহাতে সঞ্চিত আছে।

ঐ দুই বিরাট সংগ্রহ ছাড়া ভোট ভাষায় নাগার্জ্জুন আর্য্যদেব, অসঙ্গ বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, চন্দ্রকীর্ত্তি, ধর্ম্মকীর্ত্তি চন্দ্রগোমী, কমলশীল, শীল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতদিগের জীবনচরিত এবং তারানাথ, বুতোল পদ্মকর পো বেদুরিয়া সেরপো, কুন্‌গ্যাল প্রভৃতি লেখকের বহু "ছোজুঙ (ধর্ম্ম-ইতিহাস) আছে, যাহা হইতে ভারতীয় ইতিহাসের বহু গ্রন্থের আভাস ও প্রকাশ পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়াও অনেক গ্রন্থ আছে যাহা হইতে তৎকালীন ভারতের সাক্ষাৎ পরিচয় না পাইলেও পরোক্ষভাবে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থরাজির অধিকাংশই কৈলাস-মানস সরোবরের নিকটস্থ থোলিং গুম্বা ও মধ্য তিব্বতের সক্যা, সময়ে গুম্বা প্রভৃতি বিহারে অনূদিত হইয়াছিল। বিদেশীয়েরা ধ্বংস না করিলে আজও সে-সকল স্থানে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যাইত। এখনও খুঁজিলে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কিছু কিছু পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

সম্রাট অশোকের পুত্র যেমন সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, ভোটদেশে আচার্য্য শান্তরক্ষিত কর্তৃক সেইরূপ ধর্ম্ম দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়। সত্য বটে শান্তরক্ষিতের আগমনের পূর্ব্বেই ভোট সম্রাট স্রোঙচন-সগেম-পোর সময় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সম্রাটই (খ্রীঃ ৬১৮-৫০) নেপাল জয় করিয়া অংশুবর্ম্মার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন এবং চীন সীমান্তের বহু প্রদেশ নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া চীন সম্রাটের রাজকন্যারও পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই রাণীই বৌদ্ধ ছিলেন এবং ইঁহাদের সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভোট দেশে প্রবেশ করে; লাসার প্রাচীনতম বৌদ্ধ মন্দিরদ্বয় রশেছে ও চীরে স্পোছে সম্রাট স্রোঙচনই নির্ম্মাণ করেন। তাহা হইলেও ঐ সময়ে তিব্বতে ভিক্ষু বিহারও ছিল না বা কেহ ভিক্ষু হয় নাই, এবং বৌদ্ধধর্ম্মেরও কোন দৃঢ় স্থিতি ছিল না, সে কীর্ত্তি আচার্য্য শান্তরক্ষিতের; তাঁহার প্রতিভায় ঐদেশে স্থায়ীভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ লাগে। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত (তিব্বতী গ্রন্থের সূত্রে) পাঠক-দিগকে দিলাম।

মগধের পূর্ব্বসীমাস্থিত অঙ্গপ্রদেশ পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ, মধ্যযুগে ইহার পূর্ব্বাঞ্চল সহোর নামে বিদিত ছিল। ভোটিয়েরা এই সহোরকে জহোর নামকরণ করিয়াছে। ইহার অন্য নাম ভঙ্গল বা ভগলরূপে পাওয়া যায়, সে নামের ছায়া ঐ প্রদেশের প্রধান নগরী ভগলপুরে আজিও পাওয়া যায়। এই প্রদেশে গঙ্গার তটে এক ছোট পাহাড়ের নীচে পালবংশীয় নৃপতি দেবপাল (খ্রীঃ ৮০০-৮৩৭) এক বিহার নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম নিকটস্থ রাজপুরী বিক্রমপুরী হইতে বিক্রমশীলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা উক্ত বিক্রমপুরীর নিকটে উত্তর দিকে ছিল। ভোটীয় সাহিত্যে বিক্রমপুরীর অন্য নাম ভাগলপুর বলিয়া পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে উহা এক মাণ্ডলিক

রাজবংশের রাজধানী ছিল, তাহাতে লক্ষ পরিবারের বসতি ছিল। যাহা হউক, যে রাজবংশ ভোটদেশের অন্যতম মহান ধর্মপ্রচারক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অর্থাৎ অতীশের (জন্ম খ্রীষ্টাব্দ ৯৮২, মৃত্যু ১০৫৪) আবির্ভাবে গৌরবান্বিত, সেই রাজবংশেই সপ্তম শতকের মধ্যভাগে (অস্ত খ্রীষ্টাব্দ ৬৫০) আচার্য্য শান্তরক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন।

নালন্দার ভূমি তথাগতের চরণধূলাস্পর্শে বহুবার পবিত্র হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ এক বর্ষাঋতু যাপন এখানেই করিয়াছিলেন। ইহারই অতিসন্নিকটে নালক গ্রাম; নালক ভগবান বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ধর্ম্মসেনাপতি আর্য্য সারিপুত্রকে জন্মদান করে; এখানে বুদ্ধের জীবিতকালেই প্রাবারক শেঠ নিজের আম্রবন দান করিয়াছিলেন। এই স্থানের পবিত্রতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে পূর্ব্বকাল হইতেই বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে তৃতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতিতে (অর্থাৎ কনফারেন্সে) সর্ব্বাস্তিবাদ আদি নিকায় (সম্প্রদায়) স্থবিরবাদ হইতে বহিষ্কৃত হয়, ফলে সর্ব্বাস্তিবাদী ও অনুরূপ অন্য সাম্প্রদায়িকেরা নালন্দায় সভা স্থাপন করেন, সে কারণে নালন্দা সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের কেন্দ্রস্থল হয়। বৌদ্ধ মৌর্য্যকুলের ধ্বংস-সাধন করিয়া বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণমতাবলম্বী শুঙ্গবংশ ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধ সিংহাসন অধিকার করিলে, দেশের বিপরীত পরিস্থিতির ফলে সকল বৌদ্ধনিকায় মগধ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কেন্দ্রসমূহ দেশদেশান্তরে স্থাপিত করেন। সর্ব্বাস্তিবাদীরা মথুরার সন্নিকটে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এই সময় তাঁহারা নিজের পিটক সংস্কৃতে রূপান্তরিত করায় তৎকালীন সর্ব্বাস্তিবাদ ইতিহাসে "আর্য্য সর্ব্বাস্তিবাদ" নামে পরিচিত হয়। পরে মহাকুষাণ রাজকুল ইহাতে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় ইহাদের কেন্দ্র মথুরা হইতে কাশ্মীর-গন্ধারে স্থানান্তরিত হয়। কাশ্মীর-গন্ধারের সর্ব্বাস্তিবাদই মূল সর্ব্বাস্তিবাদ নামে খ্যাত। সম্রাট কনিষ্ক এই সম্প্রদায়ের পক্ষে দ্বিতীয় অশোক ছিলেন। তিনিই তক্ষশীলায় ধর্ম্মরাজিকা স্তূপে "আচরিয়ণাং সর্ব্বতথবদিনং পরিগাহে" শব্দ অঙ্কিত করিয়া উহা মূল সর্ব্বাস্তিবাদের নামে উৎসর্গ করেন। কনিষ্কের সংরক্ষণকালে চতুর্থ মহতী বৌদ্ধধর্ম্মপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে মূল সর্ব্বাস্তিবাদ অনুসারে ত্রিপিটকের বিস্তৃত টীকা প্রস্তুত হয়। এই টীকার নাম বিভাষা হওয়ায় মূল সর্ব্বাস্তিবাদের নামান্তর "বৈভাষিক"।

এই মূল সর্ব্বাস্তিবাদ হইতেই মহাযানের উৎপত্তি, তাহাতে বৈপুল্য (পালি—বেতুল্ল) অবতংসক আদি সূত্র নিজ সূত্রপিটক রূপে আসে, কেবলমাত্র বিনয়পিটক রূপে সর্ব্বাস্তিবাদের বিনয়ই থাকে। মহাযান হইতে বজ্রযান এবং ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভরাডুবি-যুগের সহজযান (১২শ শতক খ্রীঃ) নামক ঘোর বজ্রযান উদয় হইলে পরেও নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুরী আদি মহাবিহারে মূল সর্ব্বাস্তিবাদের বিনয়পিটক স্বীকৃত হইত। ভোটীয় ভিক্ষুরা আজও ইহাকে মানেন এবং অতি গর্ব্বের সহিত বলেন যে তাঁহারা মূল সর্ব্বাস্তিবাদের বিনয়, বোধিসত্ত্ব (মহাযান) ও বজ্রযান এই তিনেরই শীল ধারণ করেন! এই উক্তির অর্থ অন্য লোকের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কঠিন, কেন-না যদিও যে কোন লোক এক সহস্র প্রকার শীল ধারণ অনায়াসেই করিতে পারে তথাপি পরস্পরবিরোধী আলোক ও অন্ধকার কি প্রকারে এক স্থানে বিরাজ করিতে পারে তাহা ঐরূপ শীলধারিগণ প্রকাশ করিয়া বলেন না। বলা বাহুল্য, বিনয় ও বজ্রযান নিরতিশয় পরস্পরবিরোধী।

শান্তরক্ষিতের সময় নালন্দার মহিমা দিগন্তবিস্তৃত ছিল। উহার অল্প দিন পূর্ব্বেই য়ুয়ন্-চ্বাং ঐ স্থানে বিদ্যার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তখন ওখানে বজ্রযান বা তন্ত্রযানের প্রভাব। শান্তরক্ষিত ঐখানেই গৃহত্যাগ করিয়া আচার্য্য জ্ঞানগর্ভের নিকট মূল সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয় মতে প্রব্রজ্যা ও উপসংপদা (অনুমান ৬৭৫ খ্রীঃ) ও শান্তরক্ষিত নাম গ্রহণ করেন। নালন্দাতেই তাঁহার গুরুর নিকট সাঙ্গোপাঙ্গ ত্রিপিটক অধ্যয়নের পর তিনি বোধিসত্ত্ব মার্গীয় (মহাযানিক) অভিসময়ালঙ্কার আদি পাঠ করিবার আচার্য্য বিনয় সেনের নিকট উপস্থিত হন। আচার্য্যের নিমিত্ত নিকট তিনি মহাযান মার্গের বিস্তৃত ও গম্ভীর উভয় ক্রমের সহিত আর্য্য নাগার্জ্জুনের * মাধ্যমিক সিদ্ধান্তও পাঠ করেন। উহারই উপর পরে তিনি সটীক মধ্যমকালঙ্কার নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

চীনা ভিক্ষু ঈ-চিও নালন্দায় শান্তরক্ষিতের সমসাময়িক ছিলেন—খ্রীঃ ৬৭১-৯৫এর মধ্যেপ্রণীত তাঁহার পুস্তকে কিন্তু অন্য অনেক পণ্ডিতের নাম থাকা সত্ত্বেও শান্তরক্ষিতের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয় তখনও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই। পাঠ সমাপনান্তে শান্তরক্ষিত নালন্দাতেই অধ্যাপনকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে হরিভদ্র ও কমলশীল পরে যশস্বী লেখক হন। মূল ভাষায় লুপ্ত হইলেও ভোটীয় অনুবাদরূপে তংগ্যুরে তাঁহাদের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আচার্য্য শান্তরক্ষিতের অনেক দার্শনিক গ্রন্থও ঐ সংগ্রহে ভাষান্তর রূপে পাই; সংস্কৃতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কেবল অন্য পুস্তকে তত্ত্বসংগ্রহ বা উল্লেখরূপে তাহা বিদ্বৎসমাজের গোচরীভূত। আচার্য্য তন্ত্রেরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন

* নাগার্জ্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ কোশল (ছত্তিশগড়ে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অতি মহান্ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি অনেক নূতন বিচার ও তথ্যের প্রচলন করেন। তিনি মহাযানের প্রবর্ত্তক।

যদিও মূল সংস্কৃতে এখন মাত্র দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়—তত্ত্বসংগ্রহ-কারিকা ও জ্ঞানসিদ্ধি।

ঐ সকল কার্য্য আচার্য্য শান্তরক্ষিতের ভারতবাসকালের কীর্ত্তি। ভোটদেশে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের কাহিনী অতি আশ্চর্য্য। ৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভোট সম্রাট খ্রোঙ্‌চন্‌-সগেমের পঞ্চম উত্তরাধিকারী খ্রী-খ্রোং-ল্দে-ব্‌চন্ সিংহাসন আরোহণ করেন, তিনি তখন বালকমাত্র। এই সম্রাটই তিব্বতের ধর্ম্মাশোক। সে-সময় চীন ও ভোটদেশে ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল এবং লাসায় ঐ কারণে অনেক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমাগম হইত। সম্রাটের ধর্ম্মলিপ্সা তাহাতে তৃপ্ত না হওয়ায় তিনি ধর্ম্মে ও ধর্ম্মগ্রন্থে জ্ঞানবান কোন আচার্য্যকে আনিবার নিমিত্ত ভারতে লোক পাঠান। ভোট রাজদূত প্রথমে বজ্রাসন অর্থাৎ বুদ্ধগয়া গিয়া সম্রাটের দরুণ পূজা নিবেদন করেন, পরে নালন্দায় যান। আচার্য্য শান্তরক্ষিত নেপালে আছেন, সেখানে এই সন্ধান পাইয়া নেপালে গিয়া তিনি আচার্য্যের সম্মুখে সম্রাটের ভেট রাখিয়া রাজার প্রার্থনা নিবেদন করেন। আচার্য্য স্বীকৃত হওয়ায় বহু সম্মানের সহিত লাসায় আনীত হন। সেখানে তাঁহার উপদেশ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়, বিশেষতঃ তরুণ রাজা অত্যন্ত প্রভাবিত হইলেন। কিন্তু সভাসদ্‌বর্গ ও অন্য অনেকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, ঐ সময়ে দেশে পীড়ায় ও অন্য যে সকল উপদ্রবের প্রকোপ চলিতেছিল, শান্তরক্ষিতের শিক্ষার ফলে স্থানীয় দেবদেবীদের রোষই তাহার কারণ বলিয়া প্রচার করেন। ইহাতে শান্তরক্ষিত নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (খ্রীঃ ৭২৪)।

তিনি চলিয়া আসিলে চীন দেশের সঙশী প্রদেশের বহু বিদ্বান বৌদ্ধ লাসায় আগমন করেন। দরবারে তাঁহাদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, রাজাও যথেষ্টরূপে প্রভাবিত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে রাজার পুনর্ব্বার বর্ষীয়ান ভারতীয় আচার্য্যকে আনিবার ইচ্ছা হয় এবং এইরূপে রাজ-নিমন্ত্রণে আচার্য্য শান্তরক্ষিত দ্বিতীয় বার লাসায় গমন করেন (খ্রীঃ ৭২৬)। ভোট ইতিহাসে লিখিত আছে যে, এইবার স্থানীয় দেবদেবীর রোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি উড়িষ্যারাজবংশোদ্ভব আচার্য্য পদ্মসম্ভবকে আনয়ন করিতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন। কথিত আছে আচার্য্য পদ্মসম্ভব আসিয়া মন্ত্রবলে ভোটদেশের দেবদেবী ডাকিনী-যোগিনী যক্ষিণী-সর্পিণী ভূতপ্রেত যক্ষবেতাল আদিকে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞায় উহাদের আবদ্ধ করিয়া ছাড়েন।

আচার্য্য তাহার পর সম্রাটের সাহায্যে লাসা হইতে দুই দিনের পথ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রতটে বসম্ যস্ (সম্-য়ে) বিহার নির্ম্মাণ (অগ্নি-স্ত্রী-শশবর্ষ = ৭৩৭ খ্রীঃ) আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে (ভূমি-স্ত্রী-শশবর্ষ = ৭৩৮ খ্রীঃ) তাহার নির্ম্মাণ শেষ করেন। সম্-য়ে বিহার উদন্তপুরী বিহারের নমুনায় তৈয়ারী এবং ইহা দ্বাদশপ্রাঙ্গণযুক্ত; ইহাই ভোটদেশের প্রাচীনতম বিহার। বিহার নির্ম্মিত হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর, তিনি ভোট দেশে ভিক্ষু-আচার কিরূপে গ্রহণ করিতে হয় দেখাইবার জন্য দ্বাদশ জন মূল সর্ব্বাস্তিবাদীকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে জল-মেষবর্ষে (৭৪২ খ্রীঃ) যে শেস্ রঙ্‌পো (জ্ঞানেন্দ্র) আদি সাত জন ভোটীয়কে ভিক্ষু করেন।

আচার্য্য শান্তরক্ষিত তাঁহার ভোটীয় শিষ্যবর্গের সহিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু দু-একটি ভিন্ন সেগুলির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কথিত আছে, আচার্য্য অন্তিম সময়ে শিষ্য খ্রী-খ্রোংকে ডাকিয়া বলেন যে এদেশে অন্তর্বিবাদ আরম্ভ হইলে তাঁহার ছাত্র কমলশীলকে যেন ভারতবর্ষ হইতে আনা হয়, তিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আচার্য্য শান্তরক্ষিত তখন প্রায় শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, (আনুমানিক ৭৫০ খ্রীঃ), সে-সময় কোন দুর্ঘটনায় তাহার এই সুদীর্ঘ ও যশোময় যাত্রা সমুয়েতে শেষ হইয়া গেল। তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ আজও সম্-য়ের এক চৈত্যে, অতীতে ভারতীয় পণ্ডিতদের বার্দ্ধক্য ও জরার প্রতি অবহেলা ও কর্ত্তব্যে দৃঢ়সংকল্পের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দেহান্তের পর ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইলে রাজা আচার্য্যের উপদেশমত কমলশীলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে তিনি লাসায় আসিয়া শাস্ত্রার্থ প্রচার করিয়া বিবাদের শান্তি করেন।

আচার্য্য শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্থাপক বলিয়া ভোটবাসিগণ মানিলেও, সিংহলে যেরূপ মহেন্দ্রের স্মৃতি-পূজার উৎসব হয়, আচার্য্যের উদ্দেশ্যে সেরূপ কিছু ভোটদেশে হয় না। কারণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। ভোটদেশে ভগবান বুদ্ধের স্বাভাবিকতাপূর্ণ, মধুর, সরলহৃদয়স্পর্শী সূক্তের ততটা সম্মান নাই, যতটা ভূতপ্রেত-যাদুমন্ত্রের আছে। শান্তরক্ষিত যদিও তন্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি গম্ভীর দার্শনিকই ছিলেন, সুতরাং তাঁহাতে ভোটবাসীদের ভূতশান্তিমন্ত্র-ক্ষুধার উপশম হয় নাই। পদ্মসম্ভব ও অন্য লোক পাইয়া বোধ হয় তাহা হইয়াছিল, এই কারণেই অতি বৃহৎ গুম্বা ছাড়া অন্য কোথাও পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের (শান্তরক্ষিত) চিত্র বা মূর্ত্তি দেখা যায় না, যে-স্থলে পদ্ম-সম্ভবের চিত্র ঘরে ঘরে আছে। [ক্রমশঃ]
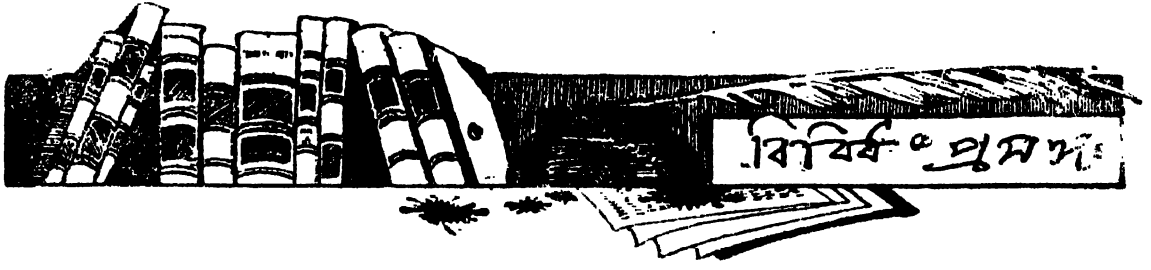
রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলন

গত ফাল্গুন মাসের অরাষ্ট্রনৈতিক সর্ব্বপ্রধান ঘটনা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকীর একটি অঙ্গ সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলন। ইহাকে অরাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা বলিলাম বটে; কিন্তু যে ভাবটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ সম্মেলনে নানা দেশের লোকদের যোগ দেওয়া উচিত, সেই ভাবটি যদি সেই সেই দেশের অধিবাসী জাতিদের এবং তথাকার রাষ্ট্রসমূহের পরিচালকদের চিন্তা ও কার্য্যের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়াও এরূপ সম্মেলনের গুরুত্ব ও সার্থকতা কম হইবে না। সেই ভাবটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুভাব পরিবর্ত্তে বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বের ভাব। রামকৃষ্ণ সমুদয় ধর্ম্মকে সত্য মনে করিতেন বলিয়া পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া সকল ধর্ম্মকে সত্য মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব উপলব্ধি করা এবং জীবনকে সেই উপলব্ধির অনুযায়ী করা কঠিন নহে। যাঁহারা ঠিক ঐ মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না অথচ মনে করেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই সত্য আছে এবং সেই সত্য তাহার সার-অংশ, তাঁহারাও সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব উপলব্ধি ও তদনুযায়ী জীবন গঠন ও যাপন করিতে সমর্থ। এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা এবং অন্য অনেকেও সকল ধর্ম্মের মজ্জাগত একটি ঐক্যে বিশ্বাস করেন। এই সমুদয় লোকের কাহারও পক্ষেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা কঠিন নহে।

এই কাজটি কঠিন কেবল সেই সকল সংকীর্ণচেতা ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে যাহারা অপর সকলকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে করে এবং কেবল আপন আপন মতকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলন দ্বারা সকল দেশে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইলে, সদ্ভাব স্থাপনের ইচ্ছা জন্মিলে ও বৃদ্ধি পাইলে, তাহা জগতের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

গত এক বৎসর ধরিয়া ব্যাপক ভাবে নানা নগরে ও গ্রামে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর যে অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে তাহা পরিসমাপ্ত হইল। নানা দেশের, নানা জাতির ও নানা ধর্ম্মের লোকদের সহযোগিতায় পুষ্ট এত বড় সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলন ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই।

এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও অন্যবিধ প্রদর্শনীর আয়োজনও হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সংগীতসম্মেলনও হইয়াছিল।

সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। শীল মহাশয় পরমহংসদেবকে সাক্ষাৎভাবে জানিতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সভাস্থলে তাঁহার এক জন প্রাক্তন ছাত্রের দ্বারা পঠিত হয়। এই পঠিত বক্তৃতা মডার্ণ রিভিয়ুর আগামী এপ্রিল সংখ্যায় আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইবে। শীল মহাশয় নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা হইতে যাহা বলিয়াছিলেন, অংশত তাহার অনুরূপ কথা পরে সর্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড এবং আরও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। উহা কতকটা আচার্য্য শীলের বক্তৃতা শ্রবণের ফলে হইয়া থাকিতে পারে, কিংবা তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তার ফলও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুদ্রিত অভিভাষণ অন্য প্রকারের। উহা তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া সর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড্ বলেন, যদি এই সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলনে কেবল এই অভিভাষণটিই পঠিত হইত, তাহা

হইলেও ইহার অধিবেশন সার্থক মনে করা যাইতে পারিত। পড়িবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুস্তিকাটি অল্প কিছু সংশোধন করেন। এই সংশোধন অনুসারে তাঁহার অভিভাষণটি মডার্ণ রিভিয়ুর এপ্রিল সংখ্যায় ছাপা হইবে।

সম্মেলনে সারবান্ আরও কয়েকটি বক্তৃতা হইয়াছিল এবং প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু দৈনিক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্ন

মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনকে যে বাণী প্রেরণ করেন, তাহার সঙ্গে এই প্রশ্নটি ছিল বলিয়া খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"Are all the religions equal, as we hold, or is there any one particular religion which is in the sole possession of truth, the rest being either untrue or a mixture of truth and errors, as many believe ?"

তাৎপর্য্য। সকল ধর্ম্মই কি সমান, যেরূপ আমরা মনে করি, অথবা বিশেষ এমন কোন একটি ধর্ম্ম আছে সত্যে যাহার একচেটিয়া অধিকার আছে, এবং অন্য ধর্ম্মগুলি হয় অসত্য কিম্বা সত্য ও অসত্যের মিশ্রণ—যেমন অনেকে বিশ্বাস করেন ?"

এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গিয়া সর্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড বলেন :

"যেমন প্রত্যেক শিশু মনে করে তাহার মা-ই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ঠিক্ সেই রকম আমি মনে করি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজের নিজের ধর্ম্মকে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি।"

অন্ততঃ সর্ ফ্রান্সিস প্রভৃতি গত বৎসর লণ্ডনে যে পৃথিবীর সব ধর্ম্মের কংগ্রেস করেন, তাহার ফলে তাঁহার ঐরূপ ধারণা জন্মে। ঐ কংগ্রেসে বক্তারা নিজের নিজের ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেন বলিয়া প্রকাশ পায়, এবং সর্ ফ্রান্সিসেরও নানা ধর্ম্মের লোকদের সহিত বাস করিয়া ঐরূপ ধারণা জন্মিয়াছে।

"I naturally consider my own religion as the best, although I endeavour to keep that impression, as far as possible, to myself."

"স্বভাবতই আমি আমার ধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম মনে করি, যদিও আমি সেই ধারণা যথাসম্ভব নিজের মনের মধ্যেই রাখিতে চেষ্টা করি।"

সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে সর্ ফ্রান্সিস ছাড়া এ বিষয়ে আর কে কি বলিয়াছিলেন, তাহা দেখি নাই, সব আলোচনার সম্পূর্ণ রিপোর্ট কাগজে বাহির হয় নাই। তবে মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের তিনি যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ বাহির হইয়াছে :—

"While each one regarded his own religion as the best at the same time they strongly felt that there was fundamental unity among all the religions. And it was this fundamental unity among all the faiths that they desired in this Parliament of Religions to realise. They desired to deepen this impression and make it permanent in their mind."

"প্রত্যেকে নিজের ধর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম বিবেচনা করে ইহা সত্য, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা প্রবলভাবে অনুভব করিতেছি যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ভিত্তিগত ঐক্য আছে। এবং এই সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে আমরা সকল ধর্ম্মের মধ্যে এই ভিত্তিগত ঐক্য উপলব্ধি করিতে চাই। আমরা এই ধারণাটির গভীরতা সাধন করিতে ও মনে তাহা স্থায়ী করিতে চাই।"

মহাত্মাজী এই প্রশ্নটি এই বিশ্বাসে সম্মেলনে পাঠাইয়াছিলেন, যে, এই প্রকার বিষয়ে সম্মেলনের মত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে সহায়ক পথপ্রদর্শকের কাজ করিবে।

সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনের ঠিক্ উদ্দেশ্য বিস্তারিত ভাবে উদ্যোক্তারা বলিতে পারিবেন। আমরা সেই উদ্দেশ্য যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয় মহাত্মাজীর প্রশ্নের মত কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্ত সম্মেলন আহূত হয় নাই।

এই রূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যদি তাহা সম্ভবপর হয়ও, তাহা হইলেও তাহার জন্য যেরূপ বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও শান্ত ধীর দীর্ঘ আলোচনা ও বিবেচনা আবশ্যক, তাহা সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনের মত একটি জনবহুল বিশাল সভার দ্বারা হইতে পারে না। মহাত্মাজীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথমে স্থির করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রনিবদ্ধ মতগত স্বরূপ, ক্রিয়াকর্ম্ম ও অনুষ্ঠানগত স্বরূপ, তাহার উপদেষ্টাদের উপদেশের স্বরূপ ও অর্থ, এবং সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসমষ্টির চরিত্র ও আচরণ দ্বারা এ পর্য্যন্ত জগতের হিত ও অহিত কি হইয়াছে। কেহ যদি কোন ধর্ম্মের কোন কোন দিক্ বাছিয়া লইয়া সেইগুলিকেই সেই ধর্ম্ম বলিয়া খাড়া করিয়া তাহার প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তাহা ঠিক্ হইবে না। আমরা সংক্ষেপে যে-যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি—হয়ত বিবেচ্য আরও বিষয় আছে—সবগুলিই

প্রত্যেক ধর্মসম্বন্ধে বিবেচনার মধ্যে আনিতে হইবে, এবং পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

যদি কেবল ঐতিহাসিক প্রাচীন ধর্মগুলি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার বিষয় এত আছে, যে, একটির সম্বন্ধে বিবেচনানন্তর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই দুঃসাধ্য। সবগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আরও কঠিন।

প্রাচীন ধর্মগুলি ব্যতীত অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধর্মও অনেক আছে। সেগুলিকেও বিবেচনার মধ্যে আনিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, সকল ধর্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য শুধু যে মনীষা, বহু অধ্যয়ন, আলোচনা, চিন্তনক্ষমতা প্রভৃতির প্রয়োজন তাহা নহে, নিরপেক্ষতাও অত্যাবশ্যক। ইহা অতি দুর্লভ। প্রত্যেক মানুষের মনে তাহার বংশ, সংসর্গ, শিক্ষা প্রভৃতি কারণে কোন-না-কোন প্রকার সংস্কার ও ধারণা বদ্ধমূল হয়। তাহা সম্পূর্ণ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য—হয়ত অসাধ্য। সেই জন্য যিনি যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ধর্মপ্রবণ হইলে তাঁহার পক্ষে সেই ধর্মের প্রতি অধিক অনুরাগ স্বাভাবিক। আবার যদি তিনি ধর্মবিষয়ে উদাসীন বা বিদ্রূপপরায়ণ হন, তাহা হইলে ত তাঁহার দ্বারা বিবেচনা হইতেই পারে না। যদি কেহ কোন ধর্মেই বিশ্বাস করেন না, কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে এক একটি ধর্মের ও পরে সকল ধর্মের বিচার করিতে চান, তাহা হইলেও প্রেম ও ভক্তি মানুষকে যে দৃষ্টি দেয় তাহার অভাবে তাঁহার বিচার সম্পূর্ণ ঠিক্ না-হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীনধর্মাবলম্বীরা নানা শাখা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাঁহারা নিজেদের শাখার বিশেষ মতগুলিকে সত্য ও অন্যদের বিশেষ মতগুলিকে ভ্রান্ত মনে করেন—এমন কি ভিত্তিগত বিষয়েও তাঁহাদের মতভেদ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মোহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্মসম্বন্ধে ইহা সত্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনেক ধর্মেরও শাখা আছে।

অতএব, কোন্ শাখার কোন্ মত ঠিক বা অঠিক, বা সব গুলির সব মতই ঠিক বা অঠিক, বলা সোজা নয়। এ বিষয়ে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই দারুণ মতভেদ রহিয়াছে। হিন্দুধর্মসম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে,

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্,"

অন্য বহু ধর্ম সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়।

প্রত্যেক ধর্মে যুগ-প্রভাবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, পরিবেষ্টনীর প্রভাবে, প্রাচীন কথার নূতন ব্যাখ্যার প্রভাবে, নব নব উপদেষ্টার আবির্ভাবে, নূতন প্রচেষ্টা, নব বিবর্তন, নব অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে। আধুনিক সম্প্রদায়-সকলেও ইহা লক্ষিত হইতেছে। কোনও ধর্মের সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা এই কারণেও কঠিন।

মহাত্মা গান্ধী যে প্রত্যেক ধর্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, উহা সম্পূর্ণ সত্য কিনা, একমাত্র উহাই সত্য ও অন্য সব ধর্ম অসত্য কিনা, কিংবা প্রত্যেক ধর্মই সত্যাসত্যের সংমিশ্রণ কিনা, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই সুনির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট ভাবে জানা চাই, হিন্দু ধর্ম কি, জৈন ধর্ম কি, বৌদ্ধ ধর্ম কি, জরথুস্ত্র ধর্ম কি, ইহুদী ধর্ম কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম কি, ইত্যাদি। ইহার ঠিক্ উত্তর মহাত্মা গান্ধী বা অন্য কেহ যদি দিতে পারেন, তাহা হইলে সেই উত্তর পাইলে তবে তাহার পর গান্ধীজীর উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিবার চেষ্টা হয়ত পণ্ডিত ও মনস্বী নিরপেক্ষ লোকেরা করিতে পারিবেন।

কোনও প্রাচীন বা আধুনিক ধর্মের সত্যতা অসত্যতা বা আংশিক সত্যতা ও অসত্যতার আলোচনা না করিয়া একটা কথা বলিলে হয়ত তাহা বিবেচনার অযোগ্য মনে না হইতে পারে। যাঁহারা পরব্রহ্মে পরমাত্মায় বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যক্ষবাদী মনে করেন, তাঁহারা ত দেখিতেছেন, বহির্জগতে নিত্য নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে এবং মনোজগতের বহু তত্ত্বও ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে—কোন জগতেরই সম্পূর্ণ জ্ঞান মানুষ নিঃশেষে এখনও পায় নাই। আর, যাঁহারা পরব্রহ্মে পরমাত্মায় বিশ্বাসী—যেমন হিন্দু ইহুদী খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি আস্তিকগণ, তাঁহারা স্বীকার করেন, যে, তিনি অনন্ত এবং তাঁহার সত্য অনন্ত। অতএব তাঁহার স্বরূপ এবং প্রকাশও অনন্ত। সুতরাং ইহা বলিলে বোধ হয় কোন ধর্ম, কোন শাস্ত্র, কোন মহাপুরুষ, কোন আচার্য্য, কোন উপদেষ্টা, কোন ব্যাখ্যাতার প্রতি অবিচার করা হয় না, কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় না, যে, সত্যের প্রকাশ শেষ হয় নাই ও শাস্ত্র এরূপ

একটি মহাগ্রন্থ যাহার শেষ খণ্ড বাহির হইতে বাকী আছে এবং অদূর ও দূর ভবিষ্যতে যেমন যেমন কিছু বাহির হইবে সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে কিছু বাকীও থাকিয়া যাইবে—শাস্ত্র বলিতে থাকিবেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে।"

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক কন্‌ভোকেশ্যনে অর্থাৎ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় কবিসার্ব্বভৌম বাংলায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা এই প্রথম হইল।

কবি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়।"

বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় কনভোকেশ্যনের বক্তৃতাকে যে একটি গৌরবের বিষয় বলিয়া সাংবাদিকদিগকে ও অন্য কাহাকেও কাহাকেও বলিতে হইয়াছে, "বিরোধের কণ্ঠে" সে সম্বন্ধে এই টিপ্পনী করিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের যে-কোন সভায় বাংলার ব্যবহার যে কর্ত্তব্য তাহা একটি স্বতঃ-স্বীকার্য্য সত্য, সুতরাং সেই সত্যের অনুসরণ জয়ধ্বনির সহিত ঘোষিত হওয়া "দুর্ভাগ্য দিনের" একটি "দুঃসহ লক্ষণ"। তথাপি, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, যে, যাহা স্বতঃস্বীকার্য্য, যে বাধাবশতঃ তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয় নাই, সেই বাধা অতিক্রান্ত হওয়া গৌরবের বিষয় এবং প্রধানতঃ যাঁহাদের চেষ্টায় তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা ধন্যবাদভাজন।

আর একটি স্বতঃস্বীকার্য্য সত্য এবার কনভোকেশ্যনে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে—বাঙালী ছাত্রেরা ধুতি পরিয়া পদবী-সম্মান লইতে পারিয়াছে। গাউনের পরিবর্ত্তে দেশী কোন রকম শোভন পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইতে পারিলে পরিবর্ত্তনটি পূর্ণাঙ্গ হইবে। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, কবি এই কারণে গাউন পরিতে রাজী হন নাই যে, উহাতে একটা অবাস্তবতা (unreality) আছে। তাহা সত্য।

কবি এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করেন—

এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তাবিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা যে-বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলঙ্কারপ্রসাধনের সামগ্রী ব'লেই আদরণীয় হয় নি, নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে শ্রী দেবে ব'লেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এই জন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে সেই শিক্ষার প্রসারসাধন-চেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশ মাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা—ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি, জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটা মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে বায়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্য্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারা-মরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটা ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থা· পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রশাসন এক কিন্তু শিক্ষার সঙ্কোচবশত চিত্তশাসন এক হ'তে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্য-জাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

বলা বাহুল্য, তাহার কারণ সেই সব দেশ স্বাধীন, আমাদের দেশ পরাধীন।

তাঁহার বক্তৃতার শেষে এই প্রার্থনাটি ছিল—

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হ'তে
সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা-বিসর্জন.
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে.
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ভাল হইয়াছিল।

চ্যান্সেলার-রূপী গবর্ণর সর্ জন এণ্ডার্সন একটি ছোট রাজনৈতিক বক্তৃতায় লোককে ইহা জানাইতে চাহিয়াছিলেন, যে, নূতন আইন অনুসারে দেশের লোক নিজেদের স্বদেশী মন্ত্রীদের নিকট হইতেই সব কিছু প্রাপ্তব্য পাইতে পারিবেন—ইংরেজেরা এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন! অর্থাৎ এ অবস্থায় যদি দেশের লোকেরা প্রাপ্তব্য না পান, তাহা মন্ত্রীদের দোষ, লোকপ্রতিনিধিদের দোষ এবং নির্ব্বাচক দেশী লোকদের দোষ! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

লাটসাহেবের বক্তৃতাটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য মার্চ মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে সবিস্তার বলিয়াছি।

—

২৩০ জন রাজবন্দীর খালাস পাইবার সংবাদ

খবরের কাগজে এইরূপ একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, বাংলা-সরকার অচিরে বিনাবিচারে-বন্দী ২৩০ জন পুরুষ ও নারীকে খালাস দিবেন, সামান্য যা কিছু সর্ত্ত তাঁহাদিগকে মানিতে হইবে তাহা অতি তুচ্ছ। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ সামান্য সর্ত্ত বা সর্ত্তগুলি কি, জানা আবশ্যক। সর্ত্ত সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলে বুঝিতে পারিব এইরূপ সর্ত্তাধীন মুক্তিতে বন্দীদের সুবিধা হইবে কিনা এবং হইলে কতটা সুবিধা হইবে। আপাততঃ মনে হইতেছে, ইহাতে গবর্ন্মেণ্টের সুবিধা হইবে। এই ২৩০ জনকে জেলে খাইতে পরিতে দিতে কিংবা অন্তরীণ-শিবিরে বা স্বগৃহে বন্দী অবস্থায় ভাতা দিতে গবর্ন্মেণ্টের যে ব্যয় হইত, তাহা বাঁচিয়া যাইবে। পুলিসেরও কৃতিত্ব দেখাইবার ইহাতে একটা সুযোগ হইতে পারে। তাহারা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের খোঁজ খবর হেফাজত উপলক্ষ্য করিয়া ২৩০টি গৃহস্থের এবং তাহাদের নিবাস-গ্রামগুলির উপর নজর রাখিতে পারিবে।

উপরের কথাগুলি লিখিত হইবার পর দেখিলাম, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্ হেনরী ক্রেক বলিয়াছেন, যে, ২৩০ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে, তাহার মধ্যে ৬ জন নারী। সর্ত্তের কথা তিনি কিছু বলেন নাই।

—

কুমারী রেণুকা সেন, এম্-এ,র মামলা

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিনা বিচারে কুমারী রেণুকা সেন, এম্-এ,কে বন্দী করা হয়। প্রথমে তাঁহাকে একটা আটক-শিবিরে রাখা হয়। পরে তাঁহাকে তাঁহার মাতামহের গৃহে অন্তরীণ করা হয়। মাতামহ গরীব লোক, দৌহিত্রীর ভার লইতে বরাবর অসম্মত ছিলেন। শ্রীমতী রেণুকার উপর হুকুম হয়, যে, তাঁহাকে সপ্তাহে একদিন করিয়া নিকটবর্ত্তী থানায় হাজির হইতে হইবে। এরূপ হুকুম গবর্ন্মেণ্ট যে আইনের যে ধারা অনুসারে দিতে পারেন, তাহাতে ইহাও লেখা আছে যে বন্দী বা বন্দিনীকে উপযুক্ত ভাতা দিতে হইবে। কিন্তু মাতামহ ও দৌহিত্রীর পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও অনেক দিন পর্য্যন্ত সরকার ভাতার কোন ব্যবস্থা না করায় শ্রীমতী রেণুকা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত গত বৎসর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় থানায় হাজিরি দিতে বিরত হন। তাহাতে তাঁহার নামে মোকদ্দমা হয় ও তাঁহার শাস্তি হয়। তিনি ঊর্দ্ধতন আদালতে ও শেষে হাইকোর্টে আপীল করেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ এই একটি যুক্তি দেখান হয়, যে, যেহেতু গবর্ন্মেণ্ট ভাতা দেন নাই, অতএব তাঁহার স্বাধীনতা সঙ্কোচের আদেশ আইনসঙ্গত হয় নাই। আপীল আদালত দুটি এই যুক্তি গ্রাহ্য করেন নাই, যদিও উভয় আদালত বলেন গবর্ন্মেণ্ট ভাতা দিতে বাধ্য।

প্রথম যে আদালতে শ্রীমতী রেণুকার বিচার হয়, সেখানে এবং দুই আপীল আদালতে—কোথাও—সরকার পক্ষ বলেন নাই, যে, তাঁহাকে ভাতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর একটি সরকারী

জাপানীতে বলা হয়, যে, তাঁহার ভাতা মঞ্জুর হইয়াছিল! হাইকোর্টে এই বিষয়টির শুনানীর সময় বিচারপতি কানলিফ সরকারী কৌঁস্থলিকে প্রশ্ন করেন যে ভাতার টাকা কখন পাঠান হইয়াছিল। কৌঁস্থলি বলেন তাঁহারা তাহা জানেন না! ডাকঘরে ত সরকারী বেসরকারী সব মনি অর্ডারেরই তারিখ থাকে। এক্ষেত্রে তাহা না জানিবার কারণ কি?

—

বিনাবিচারে-বন্দীদের ভাতা

উক্ত বিষয়টির শুনানীর সময় বিনাবিচারে-বন্দীদিগকে ভাতা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে সরকারী রীতি প্রকাশ পায়, এবং তাহা যে আইনসঙ্গত নহে বিচারপতি হেণ্ডারসন এই মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে শুনানীর রিপোর্টের আবশ্যক অংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Mr. Khundkar (the Deputy Legal Remembrancer) said that the policy of Government with regard to allowance was this. When a person was dependent upon another person, when a minor dependent on his parents and guardians was ordered to be interned with the parents or guardians, Government did not order an allowance, but when a person dependent upon another had been ordered to be interned elsewhere, then an allowance was given.

"Mr. Justice Henderson remarked that this was opposed to the Act surely. That was the legal position.

"Mr. Khundkar said that he was stating certain facts."

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্‌ব্র্যান্সার মিঃ খুন্দকার বলেন, ভাতা সম্বন্ধে সরকারী নীতি এই, যে, কাহারও পোষ্য কাহাকেও তাহার পোষকের বাড়ীতে, নাবালককে তাহার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের বাড়ীতে অন্তরীণ করিলে তাহার জন্য ভাতা দেওয়া হয় না; ইত্যাদি। তাহাতে বিচারপতি হেণ্ডারসন বলেন, ইহা নিশ্চয়ই আইন-বিরুদ্ধ। ইহাতে মিঃ খুন্দকার কোন তর্ক না করিয়া বলেন, তিনি কতকগুলি তথ্য বলিতেছেন মাত্র।

যে-যে স্থলে গবর্মেণ্ট হাইকোর্টের মতে আইনবিরুদ্ধ এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহা হাইকোর্টের ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য।

ভাতায় বঞ্চিত নাবালক অন্তরীণদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরা এবং বঙ্গীয় সিবিল লিবার্টিজ য়ুনিয়ন এই কাজটি করিতে পারেন।

—

বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান

প্রায় আটাশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, যুবা বয়সে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস স্বদেশ ছাড়িয়া যান। তখন হইতে তিনি বিদেশে—প্রধানতঃ আমেরিকায়—বাস করিতেছেন। সেখানে তিনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্‌-এ এবং পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন, এবং "কাথলিক য়ুনিভার্সিটি অব্ আমেরিকা" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদূর প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে অধ্যাপকতা করিয়াছেন। তথাকার শ্রমিক ও তদ্বিধ অন্যান্য দলে তাঁহার প্রতিপত্তি আছে। জার্ম্যানীর ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতিবৎসর ম্যুনিখ ডয়েটশে আকাডেমী কর্ত্তৃক বহু ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহা অনেকটা তাঁহার চেষ্টার ফল। তিনি ম্যুনিখের ঐ বিদ্বৎপরিষদের এক জন সম্মানিত সদস্য, এবং ভারতীয় ছাত্রদের জন্য অভিপ্রেত উহার একটি বৃত্তি তাঁহার নামে দেওয়া হয়। তিনি রোমের মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য সমিতির সম্মানিত সদস্য। ইংরেজীতে তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। স্বাধীন দেশে বাস করেন বলিয়া তিনি সব দেশের সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, আমরা চেষ্টা করিলেও তাহা করিবার সুযোগ পাই না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতি বুঝিতে হইলে যে-সকল খবর জানা এবং কাগজপত্র পড়া আবশ্যক, তাহার অনেকগুলি এদেশে পৌঁছেই না, পৌঁছিলেও প্রকাশিত হয় না বা সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

বিদেশবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ডক্টর তারকনাথ দাস সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ এবং প্রামাণিক লেখক। এ বিষয়ে তাঁহার ইংরেজী বহি আছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে "বিশ্বরাজনীতির কথা" নামক তাঁহার একখানি বাংলা বহি সরস্বতী লাইব্রেরী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বাঙালী পাঠকেরা অল্প আয়াসে পাশ্চাত্য ও জাপানী রাষ্ট্রনীতির অনেক নিগূঢ় কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সে বিষয়ে আমরা প্রবাসীর পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় কিছু

লিখিব। আপাততঃ আমরা "বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান" সম্বন্ধে ডক্টর দাসের মত ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আমাদের বড় বড় নেতারা বাঙালীর অনেক দোষ দেখাইয়াছেন। নিজেদের দোষ দেখা ও দেখান আবশ্যক। কিন্তু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আশার কথা শুনানও আবশ্যক। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শকেরা খেলা বেশী দেখে। সে হিসাবে ডক্টর দাসের কথা প্রণিধানযোগ্য।

বর্ত্তমানের তুর্কি বাঙ্গালার চেয়ে অনেক ছোট এবং উহার জনসংখ্যা বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম; কিন্তু বর্ত্তমানের তুর্কি বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী। গত দশ বৎসরের মধ্যে তুর্কিরাজ্যে রেলপথ বিস্তার হইয়াছে, শিল্পবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে সামরিক শক্তি, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বহর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুর্কিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিবিদ্যার প্রচার খুব বাড়িয়াছে। আজ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাজশক্তি ইংরাজ, ফ্রান্স, রুষিয়া ও ইতালী— তুর্কির প্রতি সদ্ভাব প্রকাশের জন্য অতিশয় ব্যস্ত।

বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায়? এই প্রশ্ন শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং কেহ বা বলিবেন যে, "বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের স্থান কোথায়, এ কথা বিবেচ্য; কিন্তু বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায়, এ কথা বাতুলের প্রশ্ন।" কেহ বা বলিবেন যে আমি প্রাদেশিক ভাবে মত্ত হইয়া ভারতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালার দেশভক্তেরা ভারতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, সেটা সুখের কথা, কিন্তু তাঁহারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে বাঙ্গালার উন্নতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে নির্ভর করে। বাঙ্গালার দায়িত্ব বড় বেশী। কাজেই সে বোঝা বহিবে তাহার যাহাতে শক্তি হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা দরকার।

ভারতের পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালা একটা বিশেষ বৃহৎ স্থান অধিকার করে, এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালার দায়িত্ব বাড়িবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার সঙ্গে ব্রহ্মদেশ সংলগ্ন। বাঙ্গালা ও আসামের প্রান্ত দিয়া চীনের সহিত সংস্রব। বাঙ্গালার উত্তরে তিব্বত দিয়া চীন ও রুষিয়ার সহিত সম্পর্ক হইতে পারে। একদিন বাঙ্গালার নৌ-বাহিনী ভারত মহাসমুদ্র তথা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রে বিরাজ করিবে; কিন্তু আজ ইংরেজ রাজনীতিবিশারদেরা বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে একটা নূতন উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ (North-Eastern Frontier Province) গঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষের আয়তন রুষিয়া ব্যতীত সমস্ত ইউরোপের সমান। বাঙ্গালার আয়তন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অপেক্ষা বড়। জনসংখ্যায় বাঙ্গালা সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কেবল চীন, রুষিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্ম্মানী— জনসংখ্যায় বাঙ্গালার চেয়ে বড়। জনসংখ্যায় বাঙ্গালা—ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালীর অপেক্ষা বড়। বাঙ্গালার ধনশক্তি, জনশক্তি, বিদ্যাবুদ্ধিশক্তি কম নয়। বাঙ্গালার সামরিক শক্তি কম নয়, কিন্তু উহা বিকাশের সুযোগ পায় নাই। বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তার হইলে তাহারা গুর্খা বা জাপানীদের চেয়ে কোন অংশে হেয় হইবে একথা আমি বিশ্বাস করি না।

আগামী পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নানা পরিবর্ত্তন হইবে এবং ঐ পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করিবে বলিয়া আশা হয়; কিন্তু বাঙ্গালীদের এ-বিষয়ে দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কাজেই বাঙ্গালার নেতাদের জিজ্ঞাসা করি "বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায়"?

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে একদিন বাঙ্গালীর রাজশক্তি ফ্রান্স বা ইতালীর তুল্য হইবে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে আমায় বলিবেন যে, "আপনি প্রায় ৩০ বৎসর বাঙ্গালা ছাড়া, কাজেই বাঙ্গালার অবস্থা জানেন না এবং আজ কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছেন!!" কথাটা সত্য— আমি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখিতেছি! যে বাঙ্গালা একদিন বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আপনার জাতীয় গৌরবের স্থান দখল করিবে, সেই বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখিতেছি। হয়ত এই স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হইবে।

যখন আমি বলি যে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাকে, বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব লইতে হইবে তখন কেহ যেন না মনে করেন যে, ঐ সময় ভারতবর্ষ ও ইংরাজের মধ্যে কোন প্রকারের শত্রুতা বা গণ্ডগোল হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব নয়। যত দিন ভারতবাসী শক্তিশালী না হইবে, তত দিন ইংরাজ ও ভারতের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ভারতের নেতারা যদি প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ভুলিয়া জাতির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য একত্রিত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরেজ রাজনীতিকেরা ভারতবর্ষের সমস্ত দাবী নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন। দলাদলিতে দুর্ব্বল রাজনৈতিক দূরদর্শিতাহীন জাতির সহিত কে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে? ইংরেজ রাজনীতিকেরা মূর্খ নহেন—তাঁহারা জানেন যে ভারতবাসীর সৌহার্দ্দ্য তাঁহাদের শিল্পবাণিজ্য সামরিক শক্তি, বিশাল সাম্রাজ্য সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। শক্তিসেবক বাঙ্গালী, তোমার গুরু দায়িত্ব পূর্ণ করিবার জন্য ও প্রকৃত উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও!

—

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের চেষ্টার সাফল্য

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্ব্বাচনের ফল হইতে দেখা যাইতেছে, যে, কংগ্রেসের চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে। এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় সদস্য-সংখ্যার অর্দ্ধেকের

বেশী হইয়াছে। অন্য পাঁচটিতেও কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যদের সংখ্যা নগণ্য নহে। অন্য প্রদেশগুলির কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গেও কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যদের সংখ্যা খুব বেশী হইত, যদি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট বাংলা দেশের স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত শ্রেণীকে নানা উপায়ে হীনবল করিবার নানা বিধি নূতন ভারত-শাসন আইনে নিবিষ্ট না করিতেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তন্মধ্যে প্রধান উপায়—যদিও সে উপায় সকল প্রদেশেই অবলম্বিত হইয়াছে। বাংলা দেশে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে হিন্দু বেশী। তাঁহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হিন্দুদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, সার্ব্বজনিক কর্ম্মোৎসাহ ও তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অনুপাতে তাহাদিগকে প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই, এমন কি তাহাদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য প্রতিনিধিও দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা অস্পৃশ্য বা অবনত জাতি নহে এবং অবনতদের তালিকায় যাইতে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছে, তাহাদিগকেও ঐ তালিকাভুক্ত করিয়া হিন্দুদের ৮০টি আসনের মধ্যে ৩০টি "অবনত" হিন্দুদিগকে দিয়া, "অবনত" ও "অনবনত" হিন্দুদের মধ্যে যোগ্যতম হিন্দুদের নির্ব্বাচনে বাধা দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু, বঙ্গে ইংরেজদিগকে ২৫টি আসন দেওয়া হইয়াছে। তাহারা লোকসংখ্যা অনুসারে ১টিও পাইত না। তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অনুপাতেও ২৫টি প্রাপ্য হয় না। তদ্ভিন্ন প্রদত্ত রাজস্ব অনুসারে আসন ভাগ করিয়া দিতে গেলে বঙ্গে ২৫০টি আসনের মধ্যে ১৮৭টি হিন্দুদের প্রাপ্য হয়।

যাহা হউক, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের এত চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গে কংগ্রেসের দলের সদস্যদের সংখ্যা অন্য যে কোন একটি দলের সদস্যদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কংগ্রেসের এই কৃতকার্য্যতার কারণ কি?

কারণ প্রধানতঃ দুটি। কংগ্রেস দেশকে স্বাধীনতা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু স্বাধীনতা দিবার আশা অন্য সকল দলের চেয়ে বেশী দিয়াছেন, স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগাইয়া রাখিবার ও প্রবল করিবার চেষ্টা সকলের চেয়ে বেশী করিয়াছেন, এবং নিজ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাও সকলের চেয়ে বেশী করিয়াছেন। এই চেষ্টা করিতে গিয়া কংগ্রেস দলের লোকদিগকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে।

স্বাধীন হইবার ও থাকিবার ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত। সুতরাং যাঁহারা দেশকে স্বাধীন করিবার আশা দেন ও চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে দেশের লোকদের প্রিয় হইবেন, তাহা স্বাভাবিক। সত্য বটে, কংগ্রেসের স্বাধীনতালাভচেষ্টা এখনও সফল হয় নাই; কিন্তু কয়টা পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-লাভচেষ্টা এত অল্প সময়ে জয়যুক্ত হইয়াছে?

কংগ্রেসপক্ষীয় কোন কোন লোকের দোষের বা সমগ্র কংগ্রেসের কোনও নীতির ভ্রমের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তদ্ভিন্ন, সম্পূর্ণ নিখুঁত কোন দল ও মানুষ আছে কি?

কংগ্রেসের লোকপ্রিয় হইবার আর একটি কারণ, গবর্ন্মেণ্টের প্রতি দেশের লোকদের বিরাগ। দেশের দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, অজ্ঞতা প্রভৃতির অন্য নানা কারণ থাকিতে পারে—তাহার আলোচনা এখন করিতেছি না। কিন্তু দেশের লোকদের ধনবৃদ্ধি, উৎপন্ন ধন দেশে রক্ষা, রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রোগের প্রতিষেধ, গ্রাম ও নগরসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা, দেশের শোচনীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা—প্রভৃতি বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট যথেষ্ট মন দেন নাই, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তাহার উপর আছে, গবর্ন্মেণ্টের বহুবর্ষব্যাপী দমননীতি—যাহার গুরুভার মানুষের মনকে অবসাদগ্রস্ত ও নৈরাশ্যপূর্ণ করিতেছে। সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট যে জনগণের অপ্রিয়, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভীক ও অক্লান্ত সমালোচক এবং সমালোচনা করিতে গিয়া দণ্ডিতও হইয়াছেন সকলের চেয়ে বেশী কংগ্রেসের লোকেরা। সুতরাং তাঁহাদের লোকপ্রিয় হওয়াটাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

—

কংগ্রেস জয়ের কি ব্যবহার করিবেন?

কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় (যেখানে যেখানে দুটি কক্ষ আছে, তথাকার নিম্ন কক্ষে) সর্ব্বাধিক আসন পাইয়াছেন। এই রূপ ক্ষমতা (তাহার মূল্য যাহাই হউক) লাভ করিয়া কংগ্রেস সেই ক্ষমতার ব্যবহার কিরূপ

করিবেন ? কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন ? তাহা দুই এক দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের নেতারা স্থির করিবেন।

কংগ্রেস বলিয়াছেন, কংগ্রেসওয়ালারা ব্যবস্থাপক সভায় যাইতেছেন, ভারতশাসন আইন অচল করিবার নিমিত্ত এবং ব্যবস্থাপক সভাগুলাকে ভাঙিয়া দিবার বা অকেজো করিবার নিমিত্ত। এখন আবার যাঁহারা মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষপাতী তাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু যে যে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস একাই বলবত্তম, সেখানে তাঁহারা মন্ত্রিত্ব না লইয়াও উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে পারিবেন—অবশ্য, যদি তাহা সম্ভবপর হয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু স্বীকার করিয়াছেন, যে, শুধু ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে কাজ করিয়া নূতন শাসনবিধিটাকে অচল ও অকেজো করা যাইবে না। তাহার জন্য ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে জনগণের সমষ্টিগত কাজ চাই। ইহা ঠিক কথা।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সপক্ষে একটি সত্যিকার প্রবল যুক্তি আছে। দেশের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কেন কংগ্রেসওয়ালা নির্ব্বাচন-প্রার্থীদিগকেই ভোট দেওয়া উচিত, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচন ম্যানিফেষ্টোতে (election manifestoতে) কৃষকদিগকে খাজনা কমাইবার আশা দেওয়া হইয়াছিল, শ্রমিকদের কোন কোন সুবিধা করিয়া দিবার আশা দেওয়া হইয়াছিল, ইত্যাদি। বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তন বা একেবারে নূতন আইন প্রণয়ন ব্যতিরেকে এসব আশা পূর্ণ করা যাইবে না। কংগ্রেসওয়ালারা মন্ত্রী না হইলে স্বয়ং আইন পরিবর্ত্তন বা নূতন আইন প্রণয়ন করাইতে পারিবেন না। অতএব নিজের কথা রাখিতে হইলে কংগ্রেসওয়ালাদিগকে মন্ত্রীর পদ লইতে হইবে।

কিন্তু এই যুক্তিটি কংগ্রেসওয়ালারা প্রয়োগ করিতেছেন না। তাঁহারা কেবল বলিতেছেন, মন্ত্রী হইয়া আইনটা অচল করিবেন, ব্যবস্থাপক সভা ও শাসনবিধি অকেজো করিবেন ইত্যাদি, কেবল ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে কাজের দ্বারা যাহার অসাধ্যতা বা দুঃসাধ্যতা নেহরু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন।

আর দু-একটা অপ্রকাশ্য কারণ থাকিতে পারে, যাহা কংগ্রেসওয়ালা বা অকংগ্রেসওয়ালা কোন মন্ত্রিত্বপ্রার্থীই স্বীকার করিবেন না। মন্ত্রীদের বেতনটা নিতান্ত সামান্য নয়। সকলের পক্ষে না হইলেও অনেকের পক্ষে ইহা সত্য, যে, তাঁহারা এখন যাহা রোজগার করেন, ঐ বেতনটা তার চেয়ে বেশী। তার উপর "পদমর্য্যাদা"টা আছে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে পেট্রনেজ (patronage)—লোকজনকে চাকরি ও নানা রকম ঠিকা (contract) দিবার ক্ষমতা, এটাও তুচ্ছ নয়। দুর্ম্মতিগ্রস্ত লোকদের বেশ উপরিপাওনাও যে না-হইতে পারে বা কাহারও কখনও হয় নাই, এমন নয়।

এই সমস্তই নিন্দনীয় কারণ। কোন মন্ত্রিত্বপ্রার্থীরই সম্বন্ধে এরূপ কোন কারণ না থাকিলে তাহা সুখের বিষয়।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিবার পক্ষে প্রবলতম যুক্তি এই, যে, কংগ্রেস বলিয়াছেন, নূতন শাসনবিধি অগ্রহণীয়, সাম্রাজ্যবাদ অতি নিন্দনীয়। কিন্তু প্রবলতম ও স্বাধীনচিত্ততম কংগ্রেস-ওয়ালাও মন্ত্রী হইলে তাহাকে শাসনবিধি অনুযায়ী কিছু কাজ করিতেই হইবে, সাম্রাজ্যবাদদুষ্ট কোন-না-কোন নীতির কিঞ্চিৎ সমর্থন করিতে হইবে—হয়ত বহুনিন্দিত দমননীতির সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সমর্থন—এমন কি প্রয়োগও—করিতে হইবে। অতএব মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের কথা ও কাজে মিল থাকিবে না।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। কংগ্রেসের নীতি সব প্রদেশে সমভাবে প্রযোজ্য ও অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা কংগ্রেস পক্ষপাতদুষ্ট হইবেন—এখনও যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত আছেন তাহা বলিতেছি না। কংগ্রেসের পক্ষে সকল প্রদেশেই একই নীতির অনুসরণ হইতে পারে কেবলমাত্র মন্ত্রিত্ব অগ্রহণের দ্বারা—কোথাও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না-করিয়া।

যদি কংগ্রেস প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নীতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের কার্য্যে স্ববিরোধ ও অসঙ্গতি দোষ আসিবে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পাইতে পারেন ছয়টি প্রদেশে। ঐ কয়টিতে যদি কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চয়ই কোন প্রকার সুবিধার জন্য। কংগ্রেস বলিবেন, সে সুবিধাটা ধ্বংস করিবার সুবিধা; অন্যেরা বলিবে হয় জাতিগঠনমূলক কিছু করিবার সুবিধা, নয় বেতনের, পদমর্য্যাদার ও মুরুব্বি হওয়ার লোভ।

ধরিয়া লওয়া যাক, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন ধ্বংস

করিবার নিমিত্ত। যাহা কংগ্রেস মন্দ মনে করেন তাহাই ধ্বংস করিবেন। তাহা হইলে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে দেশের লোকদিগকে মন্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা করিবেন, বাকী পাঁচটিতে তাঁহারা মন্দের আওতায় তাহাদিগকে পচিতে দিবেন।

ধরিয়া লওয়া যাক, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব লইবেন ব্যবস্থাপক সভায় গঠনমূলক কিছু করিবার নিমিত্ত। তাহার অর্থ হইবে এই যে, ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস হইবেন গঠনকারী। বাকীগুলিতে কি হইবেন ? বিরুদ্ধাচারী ? চীৎকারকারী ? না, আর কিছু ? সেই কিছুটা কি ?

বস্তুতঃ কংগ্রেস কোথাও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, কোথাও মন্ত্রিত্ব অগ্রহণের পক্ষপাতী হইলে কাজটা এই ইংরেজী কথাগুলার অনুসরণের মত হইবে—

Every one for himself, and
The Devil take the hindmost.

অর্থাৎ, "চাচা, আপন বাঁচা", এবং "সকলের পিছনের হতভাগাকে শয়তান ধরুক"।

অবশ্য, বাংলাকে শয়তানে ধরিলে কাহারও দুঃখ নাই ; অথবা এই দুঃখ আছে, যে, বাংলা রসাতলে গেলে এক্সপ্লয়েট করিবার সকলের চেয়ে সুবিধাজনক জায়গাটা লোপ পাইবে। কিন্তু বাংলা সত্যসত্যই ত আর রসাতলে যাইতেছে না। "After us the deluge"—আমাদের আমলের পরে "প্রলয়পয়োধিজল" আসুক না ?

—

বঙ্গে মন্ত্রিত্ব-সমস্যা

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যে ভূখণ্ডকে বাংলা প্রদেশ নাম দিয়াছেন, তাহার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। গবর্মেণ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্নকক্ষে মুসলমানদিগকে অন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকদের চেয়ে বেশী আসন দিয়াছেন। এই জন্য নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল হইয়াছে। এই এক একটি দলকে আলাদা আলাদা ধরিলে কংগ্রেসওয়ালা সদস্যদের চেয়ে এই দলগুলির কোনটির সদস্যসংখ্যা বেশী হয় না। যাহা হউক, জোড়াতাড়া দিয়া এই দলগুলিকে একত্র করিয়া একটি সম্মিলিত মুসলমান দল গঠিত হইয়াছে। ইহার সদস্যসংখ্যা অন্য যে-কোন দলের সদস্যসংখ্যার চেয়ে বেশী। সুতরাং এই দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতেই সম্ভবতঃ অধিকসংখ্যক মন্ত্রী মনোনীত হইবে। মোট কয়জন মন্ত্রী হইবে বলা যায় না। তাহা অনেকটা গবর্ণরের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। সম্মিলিত মুসলমান দলের নেতা যাঁহাদিগকে মন্ত্রী মনোনীত করিবেন, গবর্ণর যে তাঁহাদের সকলকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবেন বা নিযুক্ত করিবেন, এমন নয়।

মন্ত্রীদের মধ্যে ক'জন মুসলমান ক'জন হিন্দু বা অন্য ধর্ম্মের বা জাতির হইবেন, আইনে তাহা লেখা নাই। এই ভাগাভাগিও অনেকটা গবর্ণরের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। তবে নানা কারণে একাধিক হিন্দুকে লইতে হইবে। তাহার কারণ, ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদিগকে যত আসন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে ; মন্ত্রিমণ্ডল হইতে তাহাদিগকে বাদ দিলে অবিচার ও অন্যায়টা স্পষ্টতর হইবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের অবশ্য চক্ষুলজ্জা বলিয়া কোন বালাই নাই। তথাপি অপক্ষপাতিত্বের একটা অন্ততঃ ভানও ত চাই। সুতরাং একাধিক হিন্দুকে লইতে হইবে। ইহা গেল ব্রিটিশ পক্ষের হিন্দুকে একেবারে বাদ না দিবার কারণ।

সম্মিলিত মুসলমান দলের নেতা মিঃ ফজলল হক কেন হিন্দুকে বাদ দিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। তিনি যে সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন, তাহা কতকটা হিন্দুদের সাহায্যে। ভবিষ্যতেও তাঁহাকে হিন্দুদের সাহায্য লইতে হইবে। এই জন্য তিনি সমস্ত হিন্দুকে নারাজ করিতে পারেন না। হিন্দুদের সহিত যদি তাঁহার অন্য প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহা, সাক্ষাৎভাবে না হউক, হিন্দুদিগকে বাদ না দিবার পরোক্ষভাবে একটা কারণ হইতে পারে।

যে কয়টি মন্ত্রীর পদ মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে, তাহার জন্য উমেদার অনেক। ঢাকার নবাব-পরিবারই চাহিতেছেন দুটি! তাহার উপর উত্তরবঙ্গের দল বলিয়া হঠাৎ একটি দলের আবির্ভাব হইয়াছে। এই দলকে খুশি করিতে না পারিলে তাহারা মিঃ ফজলল হককে ও অন্য সব মুসলমান দলকে কতটা অসুবিধায় ফেলিতে সমর্থ জানি না—

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায় অপেক্ষা কে কত সাহায্য করিতে বা কষ্ট দিতে পারে, তাহাই অধিক বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহার পর মিঃ ফজলল হকের নিজের কৃষক-প্রজাদল আছে। তাহাদিগকেও ত কিঞ্চিৎ দিতে হইবে, একান্ত বঞ্চিত করিলে চলিবে না।

হিন্দুরা মন্ত্রীর পদ কয়টি পাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু "অবনত" শ্রেণীর নেতারা না-কি দুটি পদ চাহিতেছেন। ত্রিশটি আসনের অধিকারী তফসিলভুক্ত জাতিরা যদি দুটি পান, তাহা হইলে ৫০টি আসনের অধিকারী অন্য হিন্দুরা অন্ততঃ ৩টি পাইবার দাবী করিতে পারেন। তা-ছাড়া এই ৫০টি ব্যতীত হিন্দুরা বাণিজ্যিক, শ্রমিক এবং জমিদারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনগুলিরও কয়েকটি পাইয়াছেন। সুতরাং অন্য হিন্দুদিগকে তফসিলভুক্ত জাতিদের চেয়ে কমসংখ্যক মন্ত্রিপদ দেওয়া অসুবিধাজনক হইবে।

এই বিষয়ের আলোচনায় আমরা ন্যায় অন্যায়ের কথা তুলিতেছি না। কারণ, অন্যায়মূর্তি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তির উপর নির্ম্মিত শাসনবিধিটার মধ্যে ন্যায় খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষে মুসলমান সদস্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষের ২৭ জন সদস্য নিম্ন কক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে, নিয়ম এইরূপ। মুসলমানেরা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, যে, নিম্ন কক্ষের মুসলমান সদস্যেরা উচ্চ কক্ষের এই সাতাইশটি আসনের প্রার্থীদের মধ্যে মুসলমানদিগকেই ভোট দিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কেহ কোন কোন হিন্দুপ্রার্থীকেও ভোট দিয়াছেন। ফলে, নিম্ন কক্ষে মুসলমান সদস্যদের যেরূপ সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, উচ্চ কক্ষে সেরূপ হয় নাই। মুসলমানেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা উচ্চ কক্ষেও নিম্ন কক্ষের মত সংখ্যাধিক্য চান। শুনা যায়, তাহার জন্য তাঁহারা বঙ্গের লাটসাহেবকে এই অনুরোধ করিবেন, যে, তিনি যেন উপযুক্তসংখ্যক মুসলমানকে উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনয়ন করেন। ছয় হইতে আট জনকে উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা লাটসাহেবের আছে।

নিম্ন কক্ষের কোন কোন মুসলমান সদস্য কোন কোন হিন্দু প্রার্থীকে কেন ভোট দিলেন, তাহার কারণ প্রকাশ পায় নাই, পাইবেও না। হইতে পারে, যে, তাঁহারা কোন কোন হিন্দু প্রার্থীকেই কোন মুসলমান প্রার্থী অপেক্ষা যোগ্যতর মনে করিয়াছিলেন ; কিংবা অন্য কারণও থাকিতে পারে। এইরূপ ভোট যাঁহারা দিয়াছেন ও পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত তথ্য জানেন। যাহা হউক, মুসলমান সদস্যেরা ক্ষমতা থাকিতেও যখন মুসলমান সমাজের বাঞ্ছারূপ যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান সদস্যকে নির্ব্বাচিত করেন নাই, তখন তাঁহাদের বিবেচনায় যাহা ঘাটতি তাহা পূরণ করিতে লাটসাহেবকে বলা অশোভন ও অযৌক্তিক হইবে।

—

বঙ্গীয় উচ্চ কক্ষে তফসিলভুক্ত জাতির সদস্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষের মুসলমান সদস্যেরা যেমন ক্ষমতা থাকিতেও মুসলমান সমাজের বাঞ্ছারূপ যথেষ্টসংখ্যক মুসলমানকে উচ্চ কক্ষের সদস্য নির্ব্বাচন করেন নাই, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষের তফসিলভুক্ত জাতিদের সদস্যেরাও সেইরূপ নিজ শ্রেণীর যত জনকে উচ্চ কক্ষের সদস্য পদের জন্য ভোট দিতে পারিতেন, তাহা দেন নাই ; তাহার পরিবর্ত্তে কোন কোন "উচ্চ" জাতির হিন্দুকে ভোট দিয়াছেন। ফলে তফসিলভুক্ত জাতির লোকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে শুনা যায়। তাঁহারাও নাকি গবর্ণরকে কয়েক জন তফসিলভুক্ত জাতির লোককে উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করিবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অনুরোধ করিলে তাহা অশোভন ও অযৌক্তিক হইবে।

নিম্ন কক্ষের তফসিলভুক্ত জাতিদের কোন কোন সদস্য উচ্চ কক্ষের সদস্যপদপ্রার্থী কোন কোন "উচ্চ" জাতির হিন্দুকে কেন ভোট দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাদের যোগ্যতরতার জন্য দিয়াছেন, না অন্য কারণে দিয়াছেন, তাহা ভোটদাতারা জানেন, এবং যাঁহারা ভোট পাইয়াছেন, তাঁহারাও জানেন।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আংশিক ব্যর্থতা

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার একটা উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ও "উচ্চ" ও "নিম্ন" জাতির হিন্দুদিগকে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ ও জাতিনিরপেক্ষ দল গঠনে বাধা দেওয়া। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের বুদ্ধিতে এই উদ্দেশ্যসাধনের যত রকম ফন্দী আসিয়াছে, তাহা অবলম্বন সত্ত্বেও, হিন্দু মুসলমানের নির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়াছে, এবং মুসলমান হিন্দুকে ও তফসিলভুক্ত হিন্দু ও অন্য হিন্দুকে ভোট দিয়াছে। অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত যোগ্যতা ও সামাজিক প্রভাবের জয় হইয়াছে। অন্য কারণের যে ইঙ্গিত মুসলমান কাগজেই দেখা যায়, তাহা সত্য হইলে, কবি বায়রনের নারীদের প্রতি অবিচারিত অবজ্ঞাসূচক পংক্তি দুটার একটা শব্দ বদলাইয়া কোন কোন রকম সদস্যদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—

> "*Members*, like moths, are ever caught by glare,
> And Mammon wins his way where seraphs
> might despair."

—

কংগ্রেস-কমিটি দ্বারা অকংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়ন

উচ্চকক্ষের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য বলিয়া যাঁহাদের নামের তালিকা কংগ্রেস-কমিটি বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে কংগ্রেসওয়ালা নহেন এরূপ লোকদের স্থানপ্রাপ্তিতে নানাবিধ সমালোচনা হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহার স্পষ্টাস্পষ্টি জবাবও দিয়াছেন। এরূপ জবাব এক দিক দিয়া উপভোগ্য হইলেও, তাহাতে কংগ্রেসের শুধু প্রতিপত্তিই বাড়িয়াছে মনে হয় না।

যাহা হউক, কংগ্রেসওয়ালারা যে কোন কোন স্থলে নিজেদের দলের বাহিরের লোকদিগকেও মনোনীত করিয়াছেন, তাহার ভাল দিকটির উল্লেখ করা আবশ্যক। জন্ম ও বংশগত জাতিভেদ আছে, নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম এই দুই জাতি আছে, বাংলানবিস ও ইংরেজীনবিস এই দুই জাতি আছে, ধনী ও দরিদ্র দুই জাতি আছে, ধর্ম্মগত জাতিভেদ আছে, পেশাগত জাতিভেদ আছে—তাহার উপর নূতন এক প্রকার জাতিভেদের আবির্ভাব হইয়াছে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মতভেদ লইয়া। এবং এই মতভেদ যে একান্ত ও ভিত্তিগত তাহাও নহে। অতএব প্রত্যেক দলের লোক অন্য সব দলের যোগ্য লোকদের যোগ্যতা মানিয়া এই জাতিভেদ ভাঙিয়া দিলে তাহার প্রশংসা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

স্বাধীনতালিপ্সা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা দল-বিশেষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, এরূপ লোকদেখানো ভঙ্গিমা (pose) বাঞ্ছনীয় নহে।

—

মহাত্মা গান্ধীর "স্বাধীনতা"

দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ও সহকর্ম্মী অধুনা লণ্ডননিবাসী সলিসিটার মিঃ পোলাক গান্ধী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যে স্বাধীনতা চান, সে কি রকম? যখন গোলটেবিল কনফারেন্সের বৈঠকে গান্ধীজী লণ্ডন গিয়াছিলেন, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও কি তাঁহার মত সেইরূপ আছে? প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতার সার অংশ পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, এখনও তিনি স্বাধীনতার সার অংশ পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার মতে ওয়েষ্টমিন্স্টার ষ্ট্যাট্যুট নামক আইন অনুযায়ী ডোমীনিয়নত্ব পাইলে স্বাধীনতার সার অংশ পাওয়া যাইবে। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমীনিয়নগুলি নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইংলণ্ড তাহাদিগকে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধে যোগ দিতে বা তাহাদের সৈন্যদলকে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধে লাগাইতে পারে না। অবশ্য, তাহারাও ইংলণ্ডের অমতে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না, কিংবা ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত কোন দেশের সহিত মিত্রতা-মূলক সন্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহারা স্বাধীনভাবে বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক সন্ধি করিতে ও তথায় বাণিজ্য-দূত রাখিতে পারে। ওয়েষ্টমিন্স্টার ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে ডোমীনিয়নগুলি আবশ্যক হইলে ও ইচ্ছা হইলে ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া, ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। গান্ধীজী বিশেষ করিয়া এই অধিকারটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, তিনি ওয়েষ্টমিন্স্টার ষ্ট্যাট্যুট অনুযায়ী এই অধিকার সমেত ডোমীনিয়নত্ব পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে

উচিত। কিন্তু দৃষ্টি রাখা হয় কিসে ব্রিটিশ বাণিজ্য ও পণ্য-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, প্রধানতঃ তাহার উপর।

রেলওয়ে বজেটের আলোচনার সময় গবর্ন্মেণ্ট বার-বার পরাজিত হইয়াছেন। তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু এই মৌখিক ও কাগজী পরাজয়ে কিবা আসে যায়?

—

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের বজেট

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের বজেট আলোচনা উপলক্ষেও গবর্ন্মেণ্ট বার-বার পরাজিত হইয়াছেন। স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশে এরূপ একটা পরাজয় হইলেই গবর্ন্মেণ্ট-পরিবর্ত্তন ঘটে, দ্বিতীয় পরাজয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু এদেশে জয় পরাজয় উভয়ই গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে সমান।

—

বিনা-বিচারে বন্দীদের সংখ্যা

কয়েক দিন পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্ হেনরী ক্রেক বলেন, ১৯৩৫ সালে জেলসমূহে ১৫০০ জন বিনা বিচারে বন্দী ছিল, এখন আছে ১১০০ জন। সর্ হেনরী কেবল জেলবাসী বন্দীদের সংখ্যা দিয়াছেন; স্বগৃহে বা অভিভাবক-গৃহে বা অন্যের গৃহে যাহারা অন্তরীণ আছে, তাহাদের সংখ্যা কত?

গবর্ন্মেণ্ট এই ওজুহাতে এই সব বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে চান না, যে, তাহারা বাহিরে আসিলেই সন্ত্রাসক কিছু করিবে। এই জেলমুক্ত ৪০০ জন কি করিয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট কিন্তু তাহা বলিতে পারেন নাই।

—

বিনা বিচারে একুশ বৎসর বন্দী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ন্মেণ্টের দমননীতির বিরুদ্ধে যখন তর্কবিতর্ক হইতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি স্বয়ং এরূপ দৃষ্টান্ত জানেন যে, মানুষ বিনা বিচারে ২১ বৎসর কারারুদ্ধ আছে!

এই বন্দীরা কি অপরাধ করিয়াছে, যে, তাহাদের প্রকাশ্য বিচারও হইতে পারে না? অপরাধের প্রমাণ থাকিলে নিশ্চয়ই বিচার হইত এবং বিচারে যাবজ্জীবন কারাবাসের বেশী দণ্ড হইত না। যাবজ্জীবন কারাবাসের মানে কার্য্যতঃ ২০ বৎসরের বেশী কারাবাস নহে, অথচ যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবে বা যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে প্রকাশ্য বিচারই করা হয় নাই, তাহারা কুড়ি বৎসরেরও অধিক জেলে আছে!

—

বিনা-বিচারে বন্দীদের পিতামাতার ভাতা

যাহারা নাবালক, কিংবা নাবালক না হইলেও বিনা বিচারে বন্দী হইবার সময় উপার্জ্জক ছিল না, তাহাদের পিতামাতাকে কোন ভাতা দেওয়া হয় না, খবরের কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি। তাহা সত্য হইলে, সরকারী থিওরি এই, যে, যে নাবালক অবস্থায় বন্দী হইয়াছে, সে কালক্রমে কখনও সাবালক ও উপার্জ্জক হইত না, এবং যে সাবালক ব্যক্তি বন্দী হইবার সময় উপার্জ্জক ছিল না সে পরেও কখনও উপার্জ্জক হইত না। এই থিওরির ইহাও বোধ হয় একটা শাখা যে, কোন নাবালকই উপার্জ্জন করে না। কিন্তু বস্তুতঃ অনেক নাবালক রোজগার করিয়া থাকে।

বন্দীদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক যাঁহারা অনেক লেখালেখির পরও ভাতা বা তাঁহাদের চিঠির উত্তর পান না, তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে। যাঁহারা পান, তাঁহারাও ভাতার মঞ্জুরী পান বহু বিলম্বে।

—

সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য

দেশকে ও জাতিকে নিরাপদ রাখিবার জন্যই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের আইন অনুসারে নির্ব্বাচিত সেই দেশ ও জাতির প্রতিনিধিরা তাঁহার মুক্তি চান এবং খবরের কাগজওয়ালারাও মুক্তি চান। অতএব গবর্ন্মেণ্টের মতে দেশের প্রতিনিধিরা ও খবরের কাগজওয়ালারা হয় দেশের নিরাপদ অবস্থার অর্থ বুঝেন না কিংবা তাহা বুঝিয়াও দেশকে বিপন্ন করিতে চান। অবশ্য এই নিরাপত্তার মানে যদি হয় আমলাতন্ত্রের নিরুদ্বেগ আরাম ও অ-ব্যতিব্যস্ততা, তাহা হইলে সুভাষচন্দ্রের মুক্তি ও আরোগ্যলাভের পর তাঁহার সক্রিয়তা তাহার অন্তরায় হইতে পারে, স্বীকার করা যায়।

চীনের বিদ্রোহীদের হাতে জেনারাল চিয়াং কাই শেকের বন্দীকরণের স্থান বলিয়া সিয়ান-এর নাম সুপরিচিত হইয়াছে। চিয়াং কাই শেকের পঞ্চাশত্তম জন্মদিবসে দেশবাসীর উপহার এরোপ্লেনগুলি বিদ্রোহীরা তিন সপ্তাহ আটকাইয়া রাখিয়া অবশেষে মুক্ত করিয়া দিয়েছে।
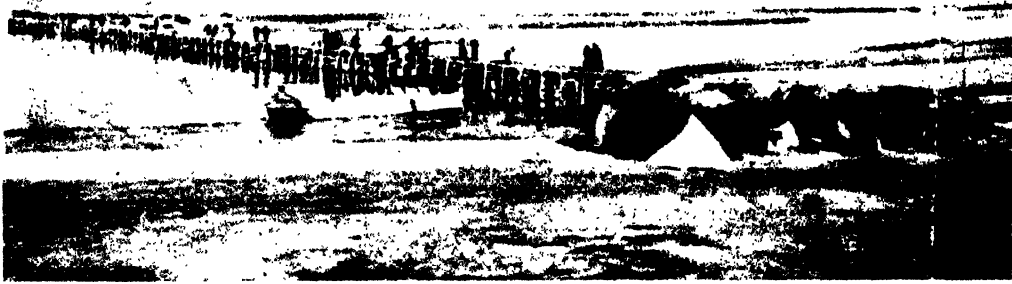
সিয়েন-ইয়াং সেতু—দক্ষিণে এই সীমানা পর্য্যন্ত চীনা বিদ্রোহীরা অগ্রসর হইয়াছিল

জেমি মোদী, সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণান্তে সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন

জাপানের সমরসজ্জা। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও রাইফেল ব্যবহার করিতে শিখিতেছে

গ্যাস-আক্রমণ প্রতিবোধের আধুনিক ব্যবস্থা। ইংলণ্ডের কোন সিনেমা-গৃহে গ্যাস-মুখোস পরিহিত কর্ম

জাপানের নূতন মন্ত্রীসভা গঠন। মিঃ ইয়োকোয়ামার এই ভবনে জেনারাল হায়াসির নায়কত্বে নূতন মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।
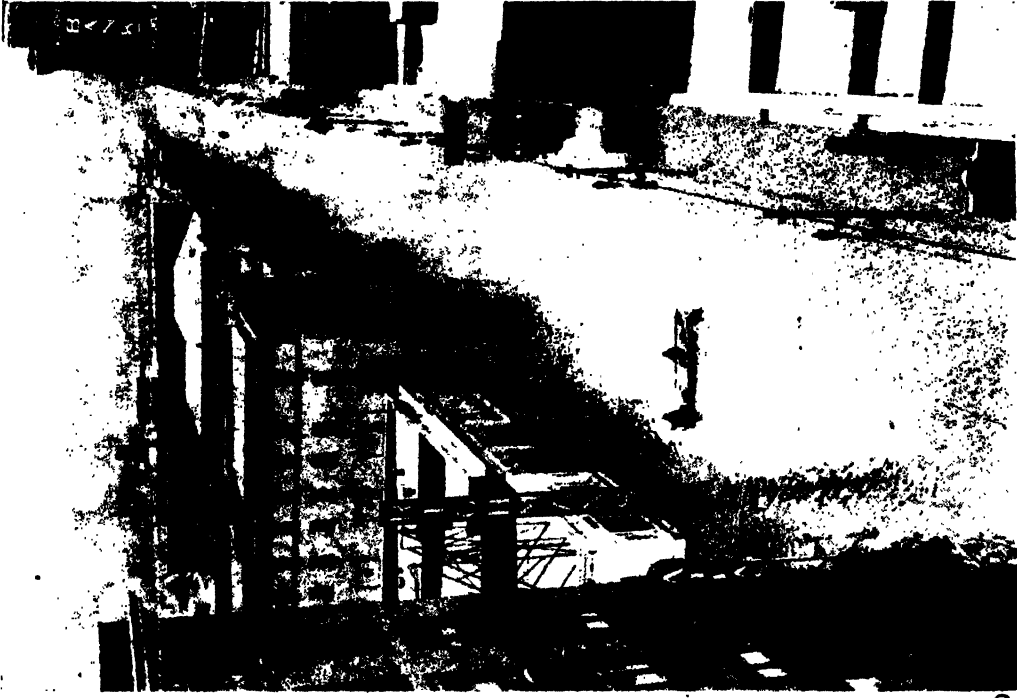
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বন্যার দৃশ্য
পোর্টসমাউথের প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র জলমগ্ন ; ট্রামগাড়ীর পরিবর্ত্তে নৌকায় চলাচল হইতেছে।

নিরাপত্তার কি মানে হইলে কি হয়, সে বিষয়ে অনুমান করিয়া সহজবোধ্য দু-একটা কথা বিবেচনা করা যাক্।

বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে না, রং খারাপ হইতেছে। ভিয়েনায় তাঁহার চিকিৎসক সত্যই লিয়াছিলেন যে, বন্দী দশায় তাঁহার এরূপ চিকিৎসা, থ্য ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতে পারে না যাহাতে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলে এখন বর্মেণ্টের বিবেচ্য এই, যে, বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের এক স্বাস্থ্যাবনতি ও তাহার ফলে অকালমৃত্যু বাঞ্ছনীয়, না তাঁহাকে মুক্তিদান ও তাহার ফলে তাঁহার আরোগ্যলাভ বাঞ্ছনীয়?

গবর্মেণ্ট কি তাঁহাকে এত বড় প্রতিভাশালী ও ক্তিমান পুরুষ মনে করেন, যে, তিনি খালাস পাইলে গ্ন অবস্থাতেও দেশটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতে পারেন? সরকার তাহা যদি মনে করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা একটা সান্ত্বনার কথা হইতে পারে, যে, দুদিনেও ভারতবর্ষে এ রকম সব মানুষ জন্মে আর, গবর্মেণ্ট যদি তাহা মনে না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্ত অবস্থায় সুস্থ হইয়া উঠিতে দিউন না। তিনি সুস্থ হইবার পর প্রয়োজন হইলে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আবার বন্দী করিতে পারিবেন।

ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

সামান্য বেতনে সরকারী কেরানীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র নিজ বুদ্ধি, দক্ষতা ও শ্রমশীলতার বলে সরকারী সামরিক-বিভাগের একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনার‍্যাল, ভারত-গবর্মেণ্টের শাসনপরিষদের সভ্য এবং শেষে লণ্ডনে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার হন। স্বাধীন দেশে জন্মিলে তিনি স্বদেশের প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব-সচিব হইতে পারিতেন এবং দেশের রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যাহাতে তাহার আর্থিক ক্রমোন্নতি হইতে পারে। কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মিয়া, দেশের উপকার করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তিনি কেবল চাকরিই করিয়া গেলেন—সে সে চাকরি যতই উচ্চ হউক না কেন।

স্বর্গীয় সর্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃষ্ণলাল দত্ত

এইরূপ আক্ষেপ উচ্চ রাজকার্য্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত আর এক জন বাঙালীর সম্বন্ধে করিতে হইতেছে। তিনি কৃষ্ণলাল দত্ত। সম্প্রতি ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনিও প্রথমে অল্প বেতনের কেরানী হন। তিনি পরে মান্দ্রাজের একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনার‍্যাল, বজেটের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, ডাক-বিভাগের কণ্ট্রোলার প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক সরকারী কাজ করেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি (Rise of Prices in India) বিষয়ে অনুসন্ধান বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়া তদ্বিষয়ে একটি মূল্যবান্ রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন। এই রিপোর্টটি সম্বন্ধে ভারত-গবর্মেণ্ট বলেন যে, ভারতবর্ষের আধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজস্ববিষয়ক ইতিহাসের ইহা একটি মূল্যবান উপাদান। ("a valuable contribution to the recent economic and financial history of India.")
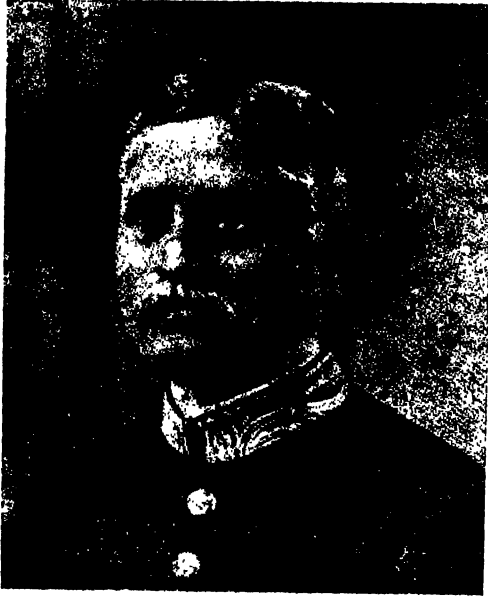
স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল দত্ত

তিনি মহীশূর গবর্ন্মেণ্টের রাজস্ববিষয়ক বিশেষ কর্ম্মচারীর কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে বিলাতে মুদ্রাবিষয়ক রাজকীয় কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রেরণ করা হয়।

তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের কাজ করিয়াছিলেন।

সমুদয় পদের কাজই তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, যদিও কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় গবর্ন্মেণ্টের খুব শক্ত শক্ত কাজ করিয়া দিয়াছিলেন এবং উচ্চপদও তাঁহার হইয়াছিল, তথাপি সরকার তাঁহাকে কোন উপাধি দেন নাই। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যে, তাঁহার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাহায্য সরকারকে অগত্যা লইতে হইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি উপরওয়ালাদের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই।

—

বিজয়কৃষ্ণ বসু

চিড়িয়াখানা নামে-পরিচিত আলিপুরের জীবনিবাসের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়-বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কন্যাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তাঁহার এই কন্যা ও জামাতা তাঁহার মৃত্যুকালে ইংলণ্ডে থাকায় তাঁহাদের সহিত দেখা হয় নাই।

স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বসু

তিনি পশুচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও উপাধি লাভের পর সেই সকল বিষয়ে কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। পরে আলিপুর জীবনিবাসে তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। এই কাজ তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শান্ত ও ধীর প্রকৃতির সদাপ্রফুল্লচিত্ত মানুষ ছিলেন। তাঁহার এইরূপ স্বভাবের প্রভাব পশুপক্ষীরাও অনুভব করিত। তাঁহার দক্ষতার জন্য তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইউরোপের অনেকগুলি জীবনিবাস (Zoological Gardens) দেখিতে পাঠান হইয়াছিল। জার্ম্মেনীর হাম্বুর্গের জীবনিবাস-উদ্যানের অধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটি মূল্যবান্

সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁহাকে একটি স্মারক উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্য, নম্রতা ও অমায়িকতার জন্য তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন।

—

দীর্ঘতম কাল অবিরাম সাইকেল-চালন

এলাহাবাদের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে, তখন পর্য্যন্ত দীর্ঘতম কাল অবিরাম সন্তরণের যে দৃষ্টান্ত ছিল, তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ কাল সন্তরণ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি, এ পর্য্যন্ত অবিরাম বাইসিকেল চালনের যে দীর্ঘতম কালের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা অতিক্রম
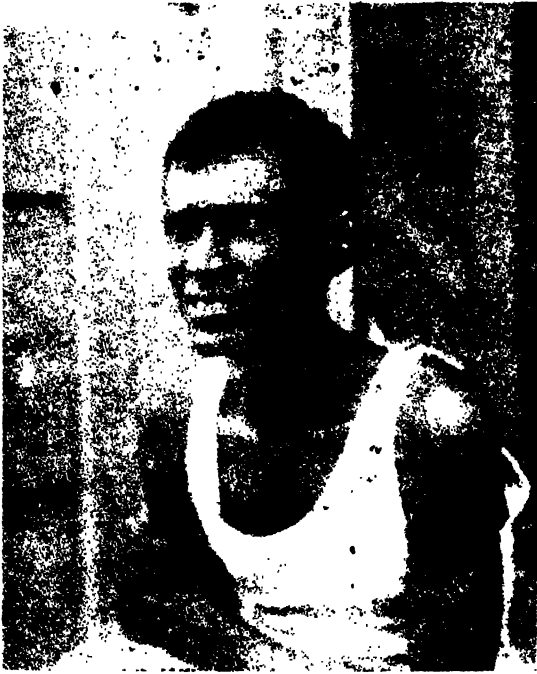
দীর্ঘতম কাল অবিরাম সাইকেল-চালক
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করিতে সঙ্কল্প করেন। এলাহাবাদের আর দুই জন ভদ্রলোকও এই প্রতিযোগিতায় নামেন। কিন্তু তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সাইকেল চালাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্র চাটুজ্যে অবিরাম ৭৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট সাইকেল চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যিনি দীর্ঘতম কাল বাইসিকেল চালাইয়াছিলেন, তিনি ৭৪ ঘণ্টা চালাইয়াছিলেন। সুতরাং তিন মিনিটে রবীন্দ্রের জিত হইয়াছে। এই চুয়াত্তর ঘণ্টা তিন মিনিটের মধ্যে একবার তাঁহার একটি পা মাটিতে ঠেকিয়াছিল, কিন্তু পাচ সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি পা তুলিয়া লইয়া আবার সাইকেল চালাইতে আরম্ভ করায় এই শক্তিপরীক্ষার বিচারক তাঁহাকে প্রতিযোগিতা হইতে নিরস্ত করেন নাই। আর একবার তাঁহার সাইকেল পথের পাশের একটা জালে জড়াইয়া যায়, কিন্তু তিনি মাটিতে না পড়িয়া গিয়া এক নিমেষে তাহা ছাড়াইয়া লয়েন।

—

আরসুলার পক্ষিত্ব

স্বাধীন গণতন্ত্র দেশের মন্ত্রীদের অনেক ক্ষমতা আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ও তাঁহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকিলে স্ব-স্ব দেশের অনেক হিত করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যদি ভাবেন যে তাঁহারাও স্বাধীন গণতন্ত্র দেশের মন্ত্রীদের মত, তাহা হইলে তাহা আরসুলার আপনাকে পক্ষী মনে করিয়া আত্মপ্রতারণার মত হয়।

পঞ্জাবে সর্ সিকন্দর হায়াৎ খান প্রধান মন্ত্রী হইবেন। তিনি তথাকার সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন, তিন বৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্জাব হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিয়া দিবেন। তাঁহার এই স্বপ্নের তারিফ অবশ্যই করি। ইহা সুস্বপ্ন।

তিনি বিষের প্রতিকার করিবেন, সেই সব সাংবাদিক-দিগকে শাস্তি দিয়া যাহাদের লেখা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়া দেয়। যাহারা এরূপ কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে বলিতেছি না; কিন্তু তিনি এংলো-ইণ্ডিয়ান সাংবাদিকদিগকে শাস্তি দিতে পারিবেন কি? ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের অপরাধী সাংবাদিকদিগকে সমভাবে শাস্তি দিতে পারিবেন কি?

শাস্তি দেওয়ার কথাটা ছাড়িয়া দি। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ভিত্তি, কাঠামো বা মেরুদণ্ড করিয়া নূতন ভারতশাসন আইন করিয়াছেন, সেই বাঁটোয়ারার উচ্ছেদ তিনি করিতে পারিবেন? নতুবা সাম্প্রদায়িক

ঈর্ষ্যাদ্বেষ কেমন করিয়া যাইবে? যোগ্যতা-অযোগ্যতা-নির্বিশেষে সম্প্রদায় অনুসারে চাকরির ভাগ যে-যে সরকারী প্রতিজ্ঞাপত্র (Resolution) দ্বারা করা হইয়াছে, তাহা তিনি রদ করিতে পারিবেন কি? নতুবা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষ কেমন করিয়া যাইবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থাতে পর্য্যন্ত যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়াছে, তাহার প্রতিকার তিনি করিতে পারিবেন কি? নতুবা সাম্প্রদায়িকতা সমূলে নষ্ট কি প্রকারে হইবে?

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের সাম্প্রদায়িকতাপরিপোষক পক্ষপাত-দুষ্ট আইনের কৃপায় যাঁহারা কিঞ্চিৎ উচ্চপদ পাইবেন, তাঁহারা করিবেন সাম্প্রদায়িকতার মূল উচ্ছেদ!

—

ব্রহ্মদেশের ডাকমাশুল বৃদ্ধি

ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইবার পর এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও সেই দেশের মধ্যে চিঠিপত্রের ডাকমাশুল ভারতবর্ষের যে-কোন অংশের সমান ছিল। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে চিঠিপত্র পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডে চিঠিপত্র পাঠাইবার মত অধিক ডাকমাশুল দিতে হইবে। যথা, এখন ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মে ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে পোষ্টকার্ড পাঠাইবার খরচ তিন পয়সা। ১লা এপ্রিল হইতে তাহা হইবে দুই আনা—আড়াই গুণেরও বেশী। ব্রহ্মের ডাক-বিভাগে বার্ষিক ১৬ লাখ টাকা লোকসান হয়। সেই ক্ষতি পূরণের জন্যই নাকি ডাকমাশুল বাড়ান হইতেছে। পরচিত্ত অন্ধকার, সুতরাং সত্য সত্যই কি উদ্দেশ্যে ইহা করা হইতেছে জানি না। কিন্তু ইহার একটা ফল এই হইবে, যে, ব্রহ্মে ও ভারতবর্ষে বাহ্য বাণিজ্যের অসুবিধা হইবে, এবং মানসিক বাণিজ্য, যাহাকে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান (cultural intercourse) বলা হয় ও যাহা বাড়াইতে লর্ড লিনলিথগো রেঙ্গুনে উপদেশ দিয়াছিলেন, কমিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রহ্মে ভারতীয়দের সুবিধা ও প্রভাব কমাইবার নিমিত্ত এবং আপনাদের সুবিধা বাড়াইবার নিমিত্ত ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ডাকমাশুল বৃদ্ধির সহিত তাহাদের নীতির সঙ্গতি আছে।

সিংহল ভারত-গবর্মেণ্টের অধীন নহে, এবং তাহা ভারতের অধিকাংশ স্থান হইতে ব্রহ্ম অপেক্ষাও দূরে। অথচ সেখানকার ডাকমাশুল পূর্ব্বাপর এবং এখনও ভারতবর্ষে সমান।

—

হাবড়ার নূতন পুলের জন্য কলিকাতায় করবৃদ্ধি

কলিকাতা ও হাবড়ার মধ্যে হইবে নূতন পুল। তাহাতে সুবিধা হইবে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের এবং বিদেশের বণিকদেরও, কিন্তু তাহা নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে, তাহা তুলিবার জন্য ট্যাক্স দিতে হইবে কলিকাতাকে। শুধু তাই নয়, এই ট্যাক্সটি আদায় করিয়া দিতে হইবে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিকে—ভারত-গবর্মেণ্ট ইহা নিজের লোক দিয়া আদায় করিবেন না, বাংলা-গবর্মেণ্টও করিবেন না। তাই কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্ম্মকর্তা উহার ১৯৩৭-৩৮ সালের বজেটের ব্যাখ্যা করিতে উঠিয়া এই আশা প্রকাশ করেন, যে, গবর্মেণ্ট অন্ততঃ এই ট্যাক্স আদায়ের খরচাটা যেন মিউনিসিপালিটিকে দেন।

এই ট্যাক্সটির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যটি উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিতে হইলে ইহা স্মরণ করিতে হইবে, যে, হাবড়ার নূতন পুল নির্ম্মাণের বড় ঠিকাটা ভারতবাসী, বাঙালী, বা কলিকাতাবাসী পায় নাই এবং ছোট ছোট ঠিকাগুলিও কলিকাতার বাঙালী বা বঙ্গের মফস্বলের বাঙালী পায় নাই। যাঁহারা কলিকাতার লোকদিগকে কেবল ট্যাক্স দিবার সুমহান অধিকার দিয়াছেন, তাঁহারা তাহাদিগকে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এত বড় এই যে ধর্ম্মোপদেশ, সে বিষয়ে গত মাসের সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনে কেহ কোন ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন না। কেহ তাহা করিলে, জগতের চারি দিক্ হইতে আগত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ বুঝিয়া যাইতেন, এদেশ প্রাচীন হইলেও এখানে ধর্ম্ম এখনও জরাগ্রস্ত হন নাই—বুঝিয়া যাইতেন, "ব্রিটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে কেন সবে আজি বলিছে জয়।"

—